"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫০শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ ১৩৫৭

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সাধারণ নির্ব্বাচন

সাধারণ নির্ব্বাচনের তারিখ যে মাসে স্থির করিয়া আবার পিছাইয়া দেওয়া হইল। তবে এই শেষ তারিখ আর নড়িবে না, ইহা এবার আশা করা যায়। যে মাসে নির্ব্বাচন হইলে অন্য কোন দল দানা বাঁধিবার সময় ও সুযোগ পাইত না, সুগঠিত দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ একমাত্র কংগ্রেসই পাইত। নির্ব্বাচন পিছাইয়া যাওয়ায় এবার বিরোধী দল অনেকে প্রস্তুত হইবার সময় পাইবে, সুতরাং সে হিসাবে বর্ত্তমান কংগ্রেসের অধিকারীবর্গের কিছু অসুবিধাই বাড়িবে। অবশ্য বিরোধী দলগুলির মধ্যে বাছিয়া লওয়ার মত কাহাকেও আমরা দেখিতেছি না, ইহা স্বীকার করিতে আমাদের দুঃখ নাই। তবে এবার নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে খুব সাবধানে ভোট দিতে হইবে। নির্ব্বাচন-বৈতরণী পার হইতে পারিলে প্রতিনিধি কি মূর্ত্তি ধারণ করেন এবং অযোগ্য লোককে ভোট দিলে তার দুর্গতি ভাত কাপড়ে ঔষধে পর্য্যন্ত কি সাংঘাতিকভাবে ভুগিতে হয় ইহা যাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহারা নিজেরা সাবধান হইলে, অপরকে বুঝাইয়া দিলে তবেই সাধারণ নির্ব্বাচনে কিছু উপযুক্ত লোক আসিবার এবং দেশের দুর্গতি মোচনের উপায় হইবে। নির্ব্বাচনের ডঙ্কা বাজিতে এখনও দেরি আছে। কিন্তু ইতি-মধ্যেই কংগ্রেসের দল-উপদলের মধ্যে ভাঙন ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত তিনটি দল মূল কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া নিজেদের পথ পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছে। দেশের জনসাধারণ ইহাদের মধ্যে কোন্‌টিকে কতটা সমর্থন করে তাহাই এখন দ্রষ্টব্য।

আমরা আগেই বলিয়াছি, বিরোধী দলের মধ্যে বাছিয়া লওয়ার মত আমরা কাহাকেও দেখিতেছি না। ইহা হয়ত আরও স্পষ্টভাবে বলা প্রয়োজন, সুতরাং প্রথমেই কংগ্রেস-ভাঙা দলগুলির কথা বলি।

ইংরেজীতে প্রবাদ আছে :

"When the Devil is ill, the Devil a monk would be
When the Devil is well, devil a monk is he."

"যখন শয়তান অসুস্থ হয় তখন তাহার প্রব্রজ্যা গ্রহণে ইচ্ছা হয়, কিন্তু রোগ সারিয়া গেলে সব ভুলিয়া সে পাপাচরণ করে।"

এই দলগুলির মধ্যে দুইটি, আচার্য্য কৃপালনীর দল ও ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের দল, স্বাধীনতালাভের পর প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়। কৃপালনীজী কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি হিসাবে বাংলার সরকার গঠনে ষোল আনা হাত দিয়াছিলেন। সে সময় তাঁহার "ডিমোক্রেসী", কংগ্রেসী "আদর্শবাদ" ইত্যাদির যে পরিচয় আমরা পাইয়াছিলাম তাহাতে তাঁহার মুখে ডিমো-ক্রেসীর নাম শোনাও হাস্যকর ঠেকে। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা নাই, দেশের লোকের প্রকৃত প্রতিনিধি কে সে বিষয়ে বিচার নাই, পশ্চিমবঙ্গের হিতাহিত সম্বন্ধে আলোচনা নাই, তাঁহার নিজের ইচ্ছামত এক দল পেটোয়াকে তিনি ক্ষমতা দিয়া গেলেন যাহাদের মোড়লদিগের কাহারও মধ্যে পশ্চিমবঙ্গবাসীর মঙ্গলচিন্তা লেশমাত্রও ছিল না, ছিল কেবলমাত্র দলগত স্বার্থান্বেষণ। তাহার পর পশ্চিমবঙ্গের শাসন-পোষণ কিভাবে হইয়াছে তাহা তো ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে। বলিতে গেলে কি, পশ্চিমবঙ্গের এই যে দুর্দশা এখন চলিয়াছে তাহার গোড়াপত্তন যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের এক দল দিল্লীতে বসিয়া "ডিমোক্রেসী" নাম জপ করিতেছেন, অন্য দল একেবারে ভোল বদলাইয়া আদর্শনিষ্ঠার তিলক কাটিয়া "কৃষক-প্রজা-মজদুর" আখড়া বাঁধিয়াছেন। বলা বাহুল্য, দুই দলেরই উদ্দেশ্য এক, স্তোকবাক্যে জনসাধারণের চোখে ধূলা দিয়া ভোটের কড়ি সংগ্রহ করিয়া নির্ব্বাচন-বৈতরণী পার হওয়া।

যদি সত্য সত্যই "ডিমোক্রেসী", অনাচার দমন, আদর্শনিষ্ঠাই লক্ষ্য ছিল তবে নির্ব্বাচনের জন্য এত তোড়জোড় কেন? দেশসেবার কি অন্য পথ ছিল না? দেশের লোকের দুর্দশার ত অন্ত নাই, সেদিকে দৃষ্টি দিলে অন্য সকল কথাই ভুলিতে

হয়, অন্য সকল কাজ ছাড়িতে হয়। সে সকল ছাড়িয়া কেবল "একঠো ভোট দিলাদে রাম"; ধন্য ডিমোক্রেসী, ধন্য আদর্শনিষ্ঠা!

ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের কংগ্রেস ত্যাগ

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সদলবলে কংগ্রেস পরিত্যাগ করিয়া একটি নূতন দল গঠন করিয়াছেন। নবগঠিত দলের নাম হইয়াছে কৃষক-প্রজা-মজদুর পার্টি। ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উহার সভাপতি এবং ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। নূতন দলের সভাপতি এবং সম্পাদক সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে নিজেদের কর্ম্মসূচী জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে তাঁহারা নিজেদের দলের প্রার্থী দাঁড় করাইবেন।

তাঁহারা আরও জানান যে, তাঁহাদের দলের যে সকল সদস্য পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদ বা অন্য কোন আইন সভার সদস্য আছেন, তাঁহারা কেহই আইন সভার সেই সদস্যপদ ত্যাগ করিবেন না।

ডাঃ ব্যানার্জ্জি ও ডাঃ ঘোষ উভয়ে দলের কর্ম্মসূচী সম্বন্ধে এক প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাদের আদর্শ লাভের উদ্দেশ্যে দলীয় কর্ম্মসূচীতে গণ-সত্যাগ্রহের পন্থা অবলম্বনও অসম্ভব নহে বলিয়া মন্তব্য করেন।

নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্বন্ধে ডাঃ ব্যানার্জ্জি ও ডাঃ ঘোষ বলেন, "আমাদের দল আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন যখন হইবে, তখন প্রত্যেকটি আসনের জন্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। তবে কংগ্রেস, সোস্যালিষ্ট দল অথবা অন্য কোন অসাম্প্রদায়িক দল যদি কোথায়ও কোন ভাল প্রার্থী দাঁড় করান, আমরা সেই প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিব না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, যেখানেই কম্যুনিষ্ট প্রার্থী দাঁড়াইবেন আমরা সেইখানেই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিব।"

তাঁহাদের দলের যে সকল সভ্য আইন সভার সদস্য তাঁহারা কংগ্রেসপ্রার্থীরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া কেন তাঁহারা আইন সভা হইতে পদত্যাগ করিবেন না—এরূপ প্রশ্নের উত্তরে উভয়ে বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি অত সহজ নহে। প্রথমতঃ, তাঁহারা ১৯৪৬ সালের প্রথমভাগে কংগ্রেসপ্রার্থীরূপে আইন সভায় নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সে সময় কংগ্রেস এক সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠান ছিল এবং উহার আদর্শে নিষ্ঠা ছিল। সুতরাং তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে সেই কংগ্রেসেরই প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন, বর্ত্তমান আদর্শচ্যুত কংগ্রেসের তাঁহারা প্রতিনিধি নহেন। অতএব তাঁহাদের আইন সভা ত্যাগের পক্ষে কোন সঙ্গত কারণ নাই। তারপর তাঁহারা সরকারী কংগ্রেস ত্যাগ করিলেও কংগ্রেসের আদর্শাবলী ত্যাগ করিতেছেন না। আদর্শাবলীই যদি কোন প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ বিবেচিত হয়, তবে তাঁহারাই প্রকৃত কংগ্রেসের প্রতিনিধি বলিয়া দাবি করিতেছেন। সুতরাং তাঁহাদের আইন সভা ত্যাগের মোটেই কোন যুক্তি নাই। তাঁহারা অবশ্য কংগ্রেস পরিষদ দলের সভাগুলিতে যোগদান করিবেন না। সরকারী কংগ্রেস পরিষদ দলের সিদ্ধান্তগুলির বাধ্যবাধকতা না মানিয়া তাঁহারা বরং কংগ্রেসের প্রকৃত আদর্শগুলি আইন সভা মারফত প্রচার করিবেন।

ডাঃ ব্যানার্জ্জি ও ডাঃ ঘোষ বলেন, পূর্ব্ব ঘোষণা অনুযায়ী এপ্রিল-মে মাসে যদি সাধারণ নির্ব্বাচন হইত, তাহা হইলে তাঁহারা না হয় আইন সভার সদস্যপদ ত্যাগের প্রশ্ন বিবেচনা করিতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে যখন নির্ব্বাচনের ঐ সময়টি নবেম্বর-ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং যখন ঐ সময়েও নির্ব্বাচন হইবে কি না, তাহাও কেহ জানে না, তখন আইন সভার ন্যায় এরূপ একটি প্রচারপীঠ পরিত্যাগ করা মুর্খতার পরিচায়ক হইবে। এক্ষণে পদত্যাগ করিয়া নবগঠিত দলের প্রার্থীরূপে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইবার প্রশ্ন সম্বন্ধে বলা যায় যে, অনেকগুলি আসনই দীর্ঘকাল যাবৎ শূন্য পড়িয়া আছে; ঐগুলিতে উপ-নির্ব্বাচন হইতেছে না। সুতরাং ঐ প্রশ্নের কোন যৌক্তিকতাই থাকিতে পারে না।

একটি প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারা বলেন যে, পরিষদে তাঁহারা স্বতন্ত্র দলরূপে কাজ করিবেন এবং প্রতিটি প্রশ্ন গুণাগুণের মাপকাঠিতে বিচার করিয়া তৎসম্বন্ধে কর্ম্মসূচী স্থির করিবেন। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারা বলেন, পরিষদের মুসলীম লীগপন্থী সদস্যগণের কোন অভিমত যদি যুক্তিযুক্ত হয়, তবে তাঁহাদের পক্ষে ঐ মত সমর্থনে কোন বাধা থাকিতে পারে না।

ডাঃ ব্যানার্জ্জি ও ডাঃ ঘোষ জানান যে, কংগ্রেস হইতে তাঁহাদের উভয়ের ও দলের অন্যান্য আরও অনেকের পদত্যাগ-পত্র ইতিমধ্যেই সহি হইয়া গিয়াছে এবং ঐগুলি বৃহস্পতিবারের মধ্যে নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কংগ্রেস সমিতির নিকট প্রেরণ করা হইবে।

তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা কংগ্রেস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের ও কংগ্রেসশাসিত বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রকার কমিটি এবং কংগ্রেসের প্রাথমিক সভ্যপদও ত্যাগ করিবেন। তবে কোন বিশেষ ব্যাপার বা পরিস্থিতিতে কংগ্রেস বা সরকার নিযুক্ত কোন কমিটিতে যোগদানের প্রশ্নটি উহার গুণাগুণের মাপকাঠিতে বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করা হইবে।

ডাঃ ব্যানার্জ্জি ও ডাঃ ঘোষ বলেন, দেশে কৃষক-প্রজা মজদুর-রাজ প্রতিষ্ঠাই তাঁহাদের দলের আদর্শ হইবে। নিম্নলিখিত চারিটি কর্ম্মসূচী কার্য্যকরী করিতে পারিলে ঐ আদর্শ লাভে বহুদূর অগ্রসর হওয়া যাইবে—একটা পুনর্বসতি ভাতাদানসহ জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া চাষীগণকে জমির মালিক করা; মূল ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রীয়করণ

ঙ্ক, ইন্সিওরেন্স প্রভৃতির ন্যায় প্রতিষ্ঠানগুলিও রাষ্ট্রীয়করণ ং দেশের আমদানী-রপ্তানির ভার সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের হাতে ওয়া।

তাঁহারা উত্তরে বলেন যে, তাঁহাদের দলের কার্য্যক্রম মবঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। ভারতের শাসন-ন্ত্রানুযায়ী রাজ্যের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তাই তাঁহাদের দলও ঐ মাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেই আদর্শগুলি যথাসাধ্য পূরণের জন্য াজ করিয়া যাইবে। তাঁহারা দুই ভাবে ঐ লক্ষ্যপথে গ্রসিলাভ করিতে পারেন। এক—তাঁহারা যদি পশ্চিমবঙ্গ গবর্ন্মেণ্টের ক্ষমতা অধিকার করিতে পারেন; দ্বিতীয়তঃ, যে দলই গবর্ন্মেণ্ট থাকিবেন তাঁহারা সেই দলকে বুঝাইয়া ঐ সকল উদ্দেশ্য সফল করিতে পারেন।

এক প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা শান্তিপূর্ণ ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাঁহাদের কর্ম্মসূচী পরিচালনা করিবেন। তাঁহারা আইন সভার অভ্যন্তর হইতে এবং আইন সভার বাহির হইতে গবর্ন্মেণ্টের উপর চাপ দিয়া উপরোক্ত কর্ম্মসূচী কার্য্যকরী করিবার চেষ্টা করিবেন।

আর এক প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারা উত্তরে বলেন যে, আমাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শলাভের জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমরা এমন কি গণ-সত্যাগ্রহের আশ্রয়ও লইতে পারি।

ডাঃ ব্যানার্জ্জি পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক সমাজের উপর তাঁহাদের প্রভূত প্রভাব আছে বলিয়া দাবি করেন এবং বলেন যে, তাঁহারা কংগ্রেস ত্যাগ করিলেও তাঁহাদিগকে যে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ত্যাগ করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। কারণ জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে সেরূপ কোন বিধান নাই।

নূতন দলের মোট বক্তব্য এইরূপ দাঁড়াইতেছে: (১) তাঁহারা নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন। (২) বর্ত্তমানে তাঁহাদের দলের যে সমস্ত সদস্য আইন সভায় রহিয়াছেন তাঁহারা পদত্যাগ করিবেন না। (৩) আদর্শ লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহারা গণ-সত্যাগ্রহ অবলম্বনও করিতে পারেন। (৪) অন্য কোন অসাম্প্রদায়িক দল ভাল প্রার্থী দাঁড় করাইলে তাঁহারা সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন না। কিন্তু কম্যুনিষ্ট প্রার্থী দাঁড়াইলে প্রতিযোগিতা করিবেন। (৫) তাঁহারা আসলে আদর্শনিষ্ঠ কংগ্রেসেরই প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন, আদর্শভ্রষ্ট বর্ত্তমান কংগ্রেসের প্রতিনিধি তাঁহারা নহেন। (৬) মুসলিম লীগ সদস্যগণের কোন অভিমত যুক্তিযুক্ত হইলে তাঁহারা উহা সমর্থন করিবেন। (৭) তাঁহাদের কর্ম্মসূচীতে চারিটি ধারা থাকিবে —পুনর্ব্বসতি ভাতা দানসহ জমিদারী উচ্ছেদ করিয়া চাষীকে জমির মালিক করা; মূল ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্তকরণ এবং দেশের আমদানী-রপ্তানীর ভার সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের হাতে আনয়ন।

ডাঃ ঘোষের দল নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন, ভাল কথা। না হইলে কংগ্রেস ছাড়ার প্রয়োজনও হইত না। বর্ত্তমান পরিষদ হইতে সদস্যপদ ত্যাগ করিবেন না ইহাও বুঝা যায়। দলের প্রয়োজন হইলে তাঁহারা সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিতেও পারেন। তাঁহারা "ভাল" প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবেন না; কিন্তু "ভাল প্রার্থী" বলিতে কি বুঝায় তাহা তাঁহারা স্পষ্টভাবে বলেন নাই। অতীতে ডাঃ ঘোষের "ভাল" প্রার্থীর অনেক পরিচয় আমরা পাইয়াছি। উপযুক্ত প্রার্থীকে বাধা দিয়া নিজের লোক পার করিবার জন্য তাঁহাকে আপত্তিজনক কৌশলের ও মিথ্যার আশ্রয় লইতেও দেখা গিয়াছে। ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ। দেশের সেবা, জাতির সেবা, সমাজের সেবায় যে কয়টি মহীয়সী নারী আমাদের দেশে জীবন তুচ্ছ করিয়া আজীবন পরিশ্রম করিয়াছেন, কোন স্বার্থের দিকে দৃক্‌পাত করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ীর স্থান অতি উচ্চে। অথচ নিছক দলগত স্বার্থের খাতিরে তাঁহার নির্ব্বাচন ব্যর্থ করার জন্য ডাঃ ঘোষ কি করিয়াছিলেন তাহার সাক্ষী অনেকেই রহিয়াছেন। বাঁকুড়ার নির্ব্বাচনেও তিনি যে চালাকী খেলিয়াছিলেন, তাহাও আমরা ভুলি নাই। এবারও সাধারণ নির্ব্বাচনে "ভাল" প্রার্থী বলিতে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি হইবে না ইহা আমরা কিরূপে বিশ্বাস করিব? ডাঃ ঘোষের দলের ইতিহাসে ভাল প্রার্থী বলিতে তাঁহাদের আজ্ঞাবহ সম্পূর্ণ দলগত স্বার্থবাহী লোক ভিন্ন কাহাকেও কখনও তাঁহারা দাঁড় করাইয়াছেন কি? কংগ্রেস নির্ব্বাচনেই বা ইঁহাদের কৃতিত্ব কিরূপ তাহাও তো অজানা নাই। নির্ব্বাচনে কূটকৌশল অবলম্বনে ইঁহারা কাহারও নীচে নহেন, তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। চক্রান্তে হারিয়া এখন ন্যায়ধর্ম্মের ভেক গ্রহণে তাঁহাদের আগ্রহ দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। আদর্শে নিষ্ঠা যদি তাঁহাদের সত্যই হইয়া থাকে তবে সুখের কথা। কিন্তু তাহা হইলে বিগত ২৫ বৎসরের পথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের আদর্শের পথে ফিরিতে হইবে, নহিলে ইহা প্রহসনমাত্র।

ডাঃ ঘোষ বলিয়াছেন, তাঁহারা আদর্শনিষ্ঠ কংগ্রেসের প্রতিনিধি, আদর্শভ্রষ্ট কংগ্রেসের কেহ নহেন। এ স্থলে আমাদের জিজ্ঞাস্য, বঙ্গীয় কংগ্রেসকে আদর্শভ্রষ্ট করিতে তাঁহার কোন হাতই কি ছিল না? প্রধান মন্ত্রী হইয়াই তিনি মেদিনীপুর ও ২৪-পরগণার চাউল সংগ্রহের ভার তাঁহার আজ্ঞাবাহী কংগ্রেসের কর্ত্তাদের দিয়াছিলেন, নদীয়ায় সুতা বিলির ভার দিয়াছিলেন এই কার্য্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ একজন দলীয় লোককে। সেক্রেটারীয়েট এবং পুলিসে বাছিয়া বাছিয়া পুরনো অযোগ্য লোকের নিয়োগে যে অসাধারণ কৃতিত্ব তিনি দেখাইয়াছিলেন তাহা আমরা অনেক বার আলোচনা করিয়াছি।

আদর্শ লাভের জন্য সত্যাগ্রহের কথা তিনি এখন বলিতে-

ছেন। কিন্তু এতদিন তিনি কি করিয়াছিলেন? আইন সভায় গবর্মেণ্টের দুর্নীতি বা স্বেচ্ছাচার প্রকাশ করিয়া দিয়া সরকারকে সৎপথে চালাইতে সাহায্য করিবার যে সুযোগ তাঁহার হাতে ছিল তার কোনও সদ্ব্যবহার এতদিন তিনি করিয়াছেন কি? বাহির হইতে শ্রীযুক্ত কুমারাপ্পাকে ডাকিয়া আনিয়া ধান আনাইবার প্ররোচনা দিতে তাঁহার উৎসাহের অভাব হয় নাই, কিন্তু যে ব্যাপক দুর্নীতি দীর্ঘকাল যাবৎ চলিতেছে তাহা নিবারণের জন্য একটি আঙুল তুলিতেও তো তাঁহাকে এতদিন দেখা যায় নাই। কি আইন সভায়, কি ওয়ার্কিং কমিটিতে, কি বাহিরে জনসভায়, কোথাও ত তাঁহাকে এত দিন কর্ত্তব্য পালন করিতে দেখা যায় নাই।

মুসলিম লীগ সদস্যদের যুক্তিসঙ্গত অভিমত তাঁহারা সমর্থন করিবেন, ডাঃ ঘোষের এই কথায় কোন নূতনত্ব নাই। বেশ কিছুদিন যাবৎ মুসলিম ভোট সংগ্রহের চেষ্টায় তিনি যে মুসলিম তোষণ চালাইয়াছেন তাহা আদর্শভ্রষ্ট কংগ্রেসের বৃহত্তম তোষণবিদ্‌দেরও ছাড়াইয়া গিয়াছে। দলের জন্য প্রয়োজন হইলে তিনি পাকিস্থানের সঙ্গেও হাত মিলাইতে দ্বিধা করিবেন না ইহারও ইঙ্গিত আমরা দেখিতে পাইতেছি।

তাঁহাদের কর্ম্মসূচীর মধ্যে প্রথমটিতে কোন নূতনত্ব বা বিশেষত্ব নাই। দ্বিতীয়টি নীতি হিসাবে ভারত-সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। তৃতীয়টি ইহারই এক ধাপ বেশী। চতুর্থটি কম্যুনিষ্ট বইয়ের একটি ছেঁড়া পাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্যবসা-বাণিজ্য, বিশেষতঃ আমদানী-রপ্তানি ব্যবসা, সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রায়ত্ত করা পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সম্ভব, কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজে উহার কার্য্যকারিতা বিষয়ে দ্বিমত রহিয়াছে। অবশ্য কম্যুনিজমের সস্তা শ্লোগানের যুগে সাধারণ নির্ব্বাচনে ইহা চটকদার ও লাভজনক হইতে পারে।

নেপাল

নেপাল লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। এই সম্পর্কে একটু পুরনো ইতিহাস বলা দরকার। ১৯৪২ সালে ক্রিপ্‌স মিশনের সময়, বোধ হয় মিশনের ব্যর্থতার পর, গোলযোগ আশঙ্কা করিয়া ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট নেপালের মহারাজা ভীম সামসের জঙ্গের নিকট বহু গুর্খা সৈন্য প্রার্থনা করেন। মহারাজা বলেন যে, তিনি লোক দিতে প্রস্তুত আছেন তবে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে এই সর্ত্ত করিতে হইবে যে, ভারতবাসীর বিরুদ্ধে তাঁহারা ঐ সৈন্য ব্যবহার করিবেন না। ইংরেজ প্রত্যুত্তরে বলেন যে, তাঁহাদের হাত হইতে যাহারা ক্ষমতা দখল করিতে চাহিতেছে তাহারা সফলকাম হইলে নেপালের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া তাহাকে কুক্ষিগত করিতে এক দিনও দ্বিধা করিবে না। মহারাজা তখন এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর মত জানিতে চাহেন এবং তাঁহার শ্রদ্ধাভাজন প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদককে এই কাজটি করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় গান্ধীজীর নিকট সংবাদ পাঠাইলে তিনি বলেন যে, কোন লিখিত কিছু তিনি দিবেন না, তবে মহারাজা তাঁহার বিশ্বস্ত লোক পাঠাইয়া মহাত্মাজীর অভিমত জানিয়া লইতে পারেন। তদনুসারে মহারাজা দুই জন লোক পাঠাইলে গান্ধীজী বলেন যে, আমরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছি—নিজেরা তাহা হইতে মুক্ত হইলে অপরকে পরাধীন করিতে চেষ্টা করিব ইহা আমি ভাবিতেও পারি না। মহারাজা ইহাতে সন্তুষ্ট হন এবং ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে এই সর্ত্তে লোক দেন যে, গুর্খাদের কেবলমাত্র বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাইবে এবং তাহারা এক জন গুর্খা জেনারেলের অধীনে কাজ করিবে। ১৯৪২-এর আন্দোলনে একদল গুর্খা দিয়া গুলী চালান হইলে মহারাজা সেই দলটিকে নেপালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া শাস্তি দিয়াছিলেন। নেপাল-সরকার এই ভাবে সর্ত্তরক্ষা করিয়াছিলেন। অন্যদিকে নেপালের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আমাদের এই বুঝাপড়া আছে। সুতরাং সে দেশের রাজনীতিতে আমাদের হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত হইবে না।

নেপালের সঙ্গে ভারতবাসীর এইরূপ সম্পর্কই চলিয়া আসিয়াছে। ইহার পরেও কংগ্রেস গবর্মেণ্টের সঙ্গে নেপালের অনেক কথাবার্ত্তা, বুঝাপড়া হইয়াছে। এখন সেখানে যে ঠিক কি ব্যাপার ঘটিতেছে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। রাণাদের মধ্যে এক দলের হাতে ক্ষমতা রহিয়াছে, আর এক দল ক্ষমতা হস্তগত করিতে চাহিতেছেন। নেপালী কংগ্রেসের বিশেষ কোন অস্তিত্ব বা শক্তি যে ইতিপূর্ব্বে ছিল তাহা আমাদের সঠিক জানা নাই। বর্ত্তমানে এই লড়াই সম্পূর্ণরূপে দুই দল রাণার ক্ষমতার লড়াই বলিয়াই মনে হইতেছে। ইহার মধ্যে প্রকৃত গণজাগরণ আদৌ আছে কি না বা থাকিলে কতটুকু আছে তাহা বুঝিতে আরও কিছুদিন সময় লাগিবে।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, গণজাগরণের সাড়া অশিক্ষিত জনতার মধ্যে যে পথে হয় সে পথ এবার খুলিয়া গেল। নেপালের জনসাধারণ এবার বুঝিবে যে, বর্ত্তমান জগতে চলিত সাধারণতন্ত্রে মানুষের যে সকল জন্মগত অধিকার আছে তাহা হইতে তাহারা কতটা বঞ্চিত।

বর্ত্তমানে যে প্রবল আন্দোলন চলিয়াছে তাহার ফলাফল যাহাই হউক, স্বাধীনতার চেষ্টা যখন একবার আরম্ভ হইয়াছে তখন তাহা সাফল্যলাভ পর্য্যন্ত চলিবেই। নেপাল-সরকার দমননীতি দ্বারা গণজাগরণ বন্ধ করিতে বা স্বাধীনতা-সংগ্রাম ব্যর্থ করিতে পারিবেন না ইহা নিশ্চিত। যদি তাঁহারা দেশে শান্তি চাহেন তবে তাঁহাদের বর্ত্তমান রাজতন্ত্রের সংস্কার ও পরিবর্ত্তন করিয়া সাধারণের অধিকার তাহাদিগকে দিয়া সরল পথে দেশ শাসন ও রক্ষা করিতে পারিবেন। ইতিপূর্ব্বে সে বিষয়ে ভারত-সরকারের সহিত ভূতপূর্ব্ব মহারাজার

কথাবার্ত্তা চলিয়াছিল। বর্ত্তমান মহারাজা ও তাঁহার পরিজন-বর্গ তাহাতে বাধা দিয়া বিদ্রোহের পথ খুলিয়া দিয়াছেন।

নেপালের মহারাজ-অধিরাজ নেপালের প্রকৃত অধিকারী-বর্গের সহিত শাসনতন্ত্র সংস্কার সম্পর্কে একমত নহেন, এই কারণে তাঁহাকে দেশত্যাগ করিতে হইয়াছে। এই ব্যাপারেই সমস্ত নেপালে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে এবং চিন্তাশীল নেপালী মাত্রই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। নেপাল কংগ্রেস দলের ইহাতে কাজ কিছু অগ্রসরও হইয়াছে। কিন্তু রাজনীতি সম্পর্কে নেপাল তিমিরাচ্ছন্ন দেশ, সুতরাং নিকট ভবিষ্যৎও অন্ধকার।

তিব্বত

তিব্বত লইয়া প্রায় বৎসরখানেক যাবৎ গোলযোগ চলিতেছে যদিও ব্যাপারটা পাকিয়া উঠিয়াছে অতি অল্পদিন। সেখানকার সঠিক খবর পাওয়া এবং বুঝা অত্যন্ত কঠিন হইতেছে। একবার সংবাদ আসিতেছে চীনা সৈন্য লাসায় প্রায় পৌঁছিয়া গিয়াছে, পরক্ষণেই শুনিতেছি তাহারা ৩০০ মাইল দূরে রহিয়াছে। তিব্বত অভিযানের ব্যাপারে আমাদের লাসা এবং পিকিং এই দুই স্থানেরই দূতাবাস অতি শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। তিব্বতী ও চীনা দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি। তিব্বত কিছুদিন চীনা সার্ব্বভৌমত্বের অধীন ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তিব্বতীদের স্বাধীন জাতি হিসাবে পরিগণিত হইবার দাবি ব্যর্থ হইতে পারে না। তিব্বত ভারতের প্রতিবেশী এবং বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে হিমালয় পর্ব্বতকে এখন আর উভয় দেশের মাঝখানে খুব বড় দুর্লঙ্ঘ্য বাধা বলিয়াও মনে করা যায় না। সুতরাং ভারতের সহিত একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী কম্যুনিষ্ট দেশের সীমান্ত এক হইয়া গেলে উদ্বেগের কারণ আছে ইহা মানিতেই হইবে। চীন গবর্ণমেণ্টের ব্যবহারও আমাদের কাছে খুব পরিষ্কার নহে। ভারতের মারফত চীন গবর্ণমেণ্ট তিব্বতের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা চালাইতে রাজী হইলেন। তিব্বতী প্রতিনিধিরা ভারতে আসিয়া নয় মাস বসিয়া রহিলেন, চীন যাওয়ার সুযোগ তাঁহাদের হইল না, ইহাও আমাদের নিকট রহস্যজনক লাগিতেছে।

তিব্বতের ব্যাপারে চীন রাষ্ট্রচালকগণ ভারতের সঙ্গে সরল ব্যবহার করেন নাই ইহা আমরা বলিতে বাধ্য। ভারত যে ভাবে সমস্ত জগতের সম্মুখে চীনের হইয়া ওকালতি করিয়াছে তাহার প্রতিদানে চীন যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে তাহাতে মনে হয় চীনের চালকবর্গ এশিয়ার প্রাচীন মৈত্রীর পথ ছাড়িয়া পশ্চিমের কপটনীতি আশ্রয় করিয়াছেন। ইহার ফলে ভারত ও চীনের মধ্যে বন্ধুত্ববিচ্ছেদ হওয়া অসম্ভব নহে। আমাদের রাষ্ট্রের পথ ক্রমেই দুরূহ হইয়া চলিতেছে ইহাও আমাদের সকলের বুঝা প্রয়োজন।

বাংলার ব্যাঙ্ক একত্রীকরণ

বাংলার চারিটি ব্যাঙ্ক একত্র হইয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া গঠিত হইয়াছে। এখন এই ব্যাঙ্কের শক্তি ও সম্পত্তি ভারতের যে কোন শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কের তুলনায় হীন নহে। তবে এই একত্রীকরণের সাফল্য কয়েকটি জিনিষের উপর নির্ভর করিবে। এতদিন ইঁহারা ডিরেক্টরবর্গের ইঙ্গিত অনুযায়ী বা সুপারিশ শুনিয়া ঋণ দানের যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়া-ছিলেন তাহা এবার ছাড়িতে হইবে। বাঙালী ব্যাঙ্কের পতনের মূল কারণ এইটিই ছিল। ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের সঠিক অবস্থা কখনও জনসাধারণকে জানাইত না। ইহা ভুল নীতি। বাঙালী ব্যাঙ্ককে সকল বাঙালী যাহাতে জাতির সম্পদ বলিয়া মনে করে তাহার জন্য উপযুক্ত প্রচারকার্য্য করা দরকার এবং জনসাধারণকে যতটা সম্ভব বিশ্বাস করা উচিত। অতীতে এই বিষয়ে যে ভুল করা হইয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তি আর যেন না হয়। শিক্ষিত বাঙালীকেও স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, বাঙালী ব্যাঙ্ক বাঙালী ব্যবসায়ীদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য না করিলে বাঙালী কখনও ব্যবসায়ক্ষেত্রে অপরের সহিত প্রতিযোগিতায় মাথা তুলিতে পারিবে না। কেননা বাঙালীকে সাহায্য করিতে অবাঙালী ব্যাঙ্ক কখনই অগ্রসর হইবে না। সেইজন্য শক্তিশালী বাঙালী ব্যাঙ্ক বাঙালী ব্যবসার পুনর্গঠনের পক্ষে একেবারে অপরিহার্য্য। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিলে উহার মূল উদ্দেশ্য সফল হইবে। সাধারণ হিসাবে এই ব্যাঙ্কের সাফল্যের সকল শুভ লক্ষণই রহিয়াছে। যদি পরিচালকগণ ব্যাঙ্কের স্বার্থের জন্য নিজের স্বার্থকে বর্জ্জন করিতে প্রস্তুত থাকেন তবে উভয় দিকেরই মঙ্গল হইবে। এখন নূতন প্রতিষ্ঠানের পরিস্থিতি সুদৃঢ় করাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার অবস্থা

লণ্ডন নগরীর 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকার মিঃ গুল্ড-এ্যাডামস সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া বি. বি. সি. হইতে এক বেতার বক্তৃতায় তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

মিঃ গুল্ড-এ্যাডামস বলেন যে বর্ত্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াতে দুই আদর্শবাদের যে সংঘাত চলিতেছে ইন্দো-চীন সমস্যা সমাধানের মধ্যে তাহা নিবারণের উপায় নিহিত রহিয়াছে :

"দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া পরিভ্রমণ কালে আমি অনেক কিছু দেখিয়াছি এবং প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি। কিন্তু আমার প্রথম ও প্রধান অভিজ্ঞতা হইয়াছে এই যে, এই অঞ্চলের

সমস্ত দেশ এবং তথাকার অধিবাসিগণ এক বিশেষ সঙ্কটের মধ্য দিয়াচলিয়াছে।

থাইল্যাণ্ড হইল একমাত্র ব্যতিক্রম। ব্যাঙ্ককের অবস্থা মোটামুটি শান্ত। কিন্তু ব্যাঙ্ককের অধিবাসীদের মনেও এই ধারণা বিরাজমান যে ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ ও মালয়ে হঠাৎ এমন কোন অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে থাইল্যাণ্ডেও যার প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার যে দেশেই গিয়াছি সেখানেই দেখিয়াছি যে আলাপ-আলোচনার বিষয় একই প্রকার; ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একই প্রকার ভীতি এবং একই প্রকার জল্পনা-কল্পনা, এবং সমস্ত কিছুর পশ্চাতেই দুইটি প্রধান প্রশ্ন রহিয়াছে—নিরাপত্তা ও কম্যুনিজম। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হইল এই—দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া কি সমগ্রভাবে কম্যুনিষ্ট কবলিত হইতে চলিয়াছে?···

সাম্প্রতিক কালে পৃথিবীর সর্ব্বত্র, বিশেষত এশিয়া ও আফ্রিকাতে, কম্যুনিষ্টগণ স্বীয় অভীষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে প্রচলিত গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সহিত নিজেদের যুক্ত করিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কম্যুনিষ্টগণ সুরু হইতেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারা আন্দোলনে যথেষ্ট পরিমাণ সাফল্য অর্জ্জন করা পর্য্যন্ত দূরে থাকিতেছে। ইন্দোনেশিয়ায় তাহারা এই কৌশলই অবলম্বন করিয়াছে।

অপর পক্ষে, ইন্দোচীনে কম্যুনিষ্টগণ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হইতেই তার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে। ফলে বর্ত্তমানে ভিয়েৎমিন সম্পূর্ণভাবে কম্যুনিষ্ট প্রভাবাধীন হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহারা পিকিঙের নূতন চীনা গবর্মেণ্টের নিকট হইতে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট পরিমাণ সাহায্য লাভ করিতেছে।···

আমার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা হইয়াছে এই যে, দুই আদর্শবাদের সঙ্ঘাত ও নেতৃত্বের লম্বাচওড়া বুলি সত্ত্বেও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার অধিকাংশ জনগণের দাবি অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ। এই দাবি হইল জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি এবং খুসীমত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করার স্বাধীনতা। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া বর্ত্তমানে যে অশান্তি ও পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, তাহাতে বিপ্লবীদের উগ্র মতবাদ ও অস্থির কর্ম্মচাঞ্চল্যের সহিত সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার পার্থক্য সহজেই নজরে পড়ে। ইহার ফলে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াতে দুই আদর্শবাদের যে সংগ্রাম চলিয়াছে জনসাধারণ তাহাতে সক্রিয়ভাবে যোগদান করে নাই; ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা দেখিবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে। সুতরাং গবর্মেণ্ট ও কম্যুনিষ্ট উভয় পক্ষই নিজেদের শক্তি সম্পর্কে জনগণের মনে কতটা আস্থা ও বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারেন এবং অনুগামীদের কিরূপে রক্ষা করিতে পারেন তাহার উপরই ভবিষ্যৎ ফলাফল বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে।

উদাহরণস্বরূপ, মালয়ের কথাই ধরা যাক। বিমান হইতে পর্ব্বতের ঢালুতে আমি যে সকল গভীর ও দুর্গম অরণ্য দেখিয়াছি তাহা কখনও ভুলিব না। এই সকল অরণ্যেই সন্ত্রাসবাদীরা আত্মগোপন করিয়া থাকে এবং এখান হইতে তাহারা তাহাদের আক্রমণ অভিযান চালাইয়া থাকে।

এই অরণ্যের প্রান্তে যাহারা বাস করে সন্ত্রাসবাদীরা তাহাদের উপর হানা দেয় এবং হত্যা ও লুণ্ঠনের পর পুনরায় জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করে। এই জঙ্গলের মধ্যে ইহাদের খুঁজিয়া বাহির করা এবং ধরা সত্য সত্যই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকে ধরা পড়িয়াছে। কি করিয়া ইহা সম্ভব হইল? মালয়ের কম্যুনিষ্ট সন্ত্রাসবাদীদলকে চূর্ণ করার প্রধান উপায় হইল তাহাদের গতিবিধি ও আক্রমণের স্থান ইত্যাদি সম্পর্কে দ্রুত ও সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা, এবং আমি জানিতে পারিলাম যে, সাধারণ শ্রমিক ও গ্রামবাসীরাই এই সকল গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সরবরাহ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে চীনা ও মালয়ী উভয় সম্প্রদায়ের লোকই আছে। গবর্মেণ্ট জনসাধারণকে রক্ষা করিতে সক্ষম তাহাদের মনে এই বিশ্বাস থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। এই বিশ্বাস থাকিলেই জনসাধারণ গবর্মেণ্টের সহিত অকুণ্ঠ ভাবে সহযোগিতা করিবে। কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয় যে; বর্ত্তমানে মালয় ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার অন্যান্ত দেশে গবর্মেণ্ট আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধানে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইতে পারিতেছেন না।

আমার আর একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার প্রত্যেকটি দেশে চীনাদের বিপুল সংখ্যাধিক্য আমাকে বিস্মিত করিয়াছে। ইন্দোচীন ও ব্রহ্মদেশে বহু লক্ষ, থাইল্যাণ্ডে চল্লিশ লক্ষ, মালয়ে কুড়ি লক্ষাধিক এবং ইন্দোনেশিয়ায় দশ লক্ষাধিক চীনা বাস করে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ব্যবসায়ী। সুতরাং স্বভাবতঃই ইহারা এরূপ স্থায়ী গবর্মেণ্ট পছন্দ করে যাহার অধীনে তাহারা নির্ব্বিঘ্নে তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে পারে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখিয়াছে। দুইটি বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—চীনদেশের প্রতি গভীর আনুগত্য এবং কোন স্থানীয় বিরোধে যে পক্ষের জয়লাভের সম্ভাবনা সেই পক্ষকে সাহায্য ও সমর্থন করা।

ইহার অর্থ হইল এই যে, ইহাদের মধ্যে নূতন পিকিং গবর্মেণ্টের প্রচারকার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। সকলেই

জানেন যে, প্রধানতঃ মালয়ের চীনা অধিবাসীরাই ব্রিটিশকে পরাজিত করিতে পারিবে, এই আশায় সন্ত্রাসবাদীদের দলে যোগ দিয়াছে।

মার্কিনের প্রশান্ত মহাসাগরীয় নীতি

কার্ত্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহে ওয়েক দ্বীপে মার্কিন রাষ্ট্রপতি মিঃ ট্রুম্যান তাঁহার অধীনস্থ সেনাপতি জেনারেল ম্যাকআর্থারের সঙ্গে মার্কিনের 'প্রশান্ত মহাসাগরীয় নীতি' সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আসিয়াছিলেন। গত ৮ই কার্ত্তিকের সংবাদপত্রে এই বিষয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা দেখিতে পাই। কেহ কেহ বলেন যে, ১৯৪৭ সালে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপখণ্ডে কম্যুনিষ্ট ভাব ও কর্ম্মের প্রসার রুদ্ধ করিবার জন্য গ্রীস, তুরস্ক ও ইরাণকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে, সেইরূপ বর্ত্তমানে পূর্ব্ব-এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার রক্ষাকল্পে তাহা করিবে।

শুনা যায় যে, ওয়েক দ্বীপে কথাবার্ত্তার ফলে এই দুই জন মার্কিন প্রধানের মতভেদ একেবারে দূর হয় নাই। সেইজন্যই 'প্রশান্ত মহাসাগরীয় নীতি' সম্বন্ধে প্রকাশ্যে উচ্চবাচ্য করা হইতেছে না। তার মোটামুটি পরিচয় নানা মার্কিনী সংবাদপত্র হইতে বুঝিতে পারা যায়। উক্ত নীতির মূল বিষয়গুলি নিম্নরূপ :—(১) সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় শান্তিরক্ষার জন্য জেঃ ম্যাকআর্থারের অধীনে অধিকতর নৌ, বিমান ও স্থলবাহিনী রাখা, (২) এই সকল সৈন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের আহ্বানে কোন আক্রমণ-প্রতিরোধের জন্য যাহাতে সত্বর সাড়া দিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা, (৩) যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক এশিয়ার যে সকল রাষ্ট্র কম্যুনিজমের প্রসার রোধের চেষ্টা করিতেছে, বিশেষভাবে ফিলিপাইন ও ইন্দোচীনকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দান, রাষ্ট্রসঙ্ঘের মারফত এই সাহায্য প্রেরণ করিতে হইবে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা থাকিবে না, (৪) যুক্তরাষ্ট্রের দলে থাকিলে যে লাভবান হওয়া যায় তাহা প্রমাণের জন্য অখণ্ড গণতান্ত্রিক কোরিয়ার জন্য একটি আদর্শ যুদ্ধোত্তর সামরিক ও বৈষয়িক পুনর্ব্বাসন কর্ম্মসূচী গ্রহণ, (৫) শান্তিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ জাপানের সহিত একটি 'আদর্শ' শান্তি চুক্তি, (৬) স্বাধীনতা, মুক্তি এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রবর্ত্তনে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব গ্রহণ, (৭) স্বাধীন এশিয়াবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অবিলম্বে যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক অর্থনৈতিক সাহায্য দান।

জাপানের সঙ্গে শান্তি-চুক্তির আভাষ

আজ প্রায় পাঁচ বৎসর হইল জাপান পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু বিজয়ী শক্তিমণ্ডলীর মধ্যে যে মতভেদ দেখা দিয়াছে, তার ফলে জাপানের সঙ্গে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় নাই। বিজয়ী রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিরূপে মার্কিন সেনাপতি জেনারেল ম্যাকআর্থার জাপানের ভাগ্য-বিধাতা হইয়া আছেন।

কোরিয়া যুদ্ধের প্রয়োজনে এই সন্ধির কথা বিবেচিত হইতেছে। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের কেন্দ্রীয় আপিস হইতে গত ১৪ই কার্ত্তিক এতৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে মার্কিনী মনোভাব বুঝা যায় :

"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য দেশের সহিত পরামর্শ করিয়া জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তির যে প্রাথমিক সর্ত্ত স্থির করিয়াছেন রাষ্ট্রসঙ্ঘে সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ জেকব মালিক তাহার মর্ম্ম মস্কোয় জানাইয়াছেন। মার্কিন মহল পূর্ব্ব-এশিয়া কমিশনের ১১ জন সদস্যের উপর শান্তিচুক্তির চূড়ান্ত খসড়া রচনার ভার দিতে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ভিত্তিহীন। এ পর্য্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন পুনঃ পুনঃ এই দাবি করিয়া আসিয়াছে যে, এই চুক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, চীন এবং ব্রিটেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত হওয়া প্রয়োজন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে মন্তব্যলিপি পূর্ব্ব-এশিয়া কমিশনের সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে দেখান হইয়াছে তাহা চূড়ান্ত কোন ব্যাপার নয়—পরিবর্ত্তন ও সংশোধন সাপেক্ষ।

এই মন্তব্যলিপির মূল মন্তব্য :—(১)জাপানকে কোরিয়ার স্বাধীনতা এবং রিউকিউ ও ডোনিন দ্বীপপুঞ্জের ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অছিগিরি ও আমেরিকার শাসন পরিচালনার ক্ষমতা মানিয়া লইতে হইবে।

(২) ফরমোসা, পেস্কাডোরস, দক্ষিণ সাখালিন এবং কুইরাইল দ্বীপপুঞ্জের অবস্থা সম্বন্ধে ব্রিটেন, সোভিয়েট রাশিয়া, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে হইবে। চুক্তি কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগের এক বৎসরের মধ্যেও যদি কোন ব্যবস্থা সম্ভব না হয় তাহা হইলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

(৩) ইতিপূর্ব্বে চীনে জাপান যে সব বিশেষ অধিকার ভোগ করিয়াছে সেগুলি পরিত্যাগ করিতে হইবে।

(৪) জাপানী, মার্কিন এবং সম্ভবতঃ রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্যান্য বাহিনীর সহযোগিতা দ্বারা সাময়িক ভাবে জাপানের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) জাপানকে যুদ্ধপূর্ব্বকালের দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলি পুনরুজ্জীবিত করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে। নূতন বাণিজ্য চুক্তিসমূহ সম্পাদিত না হওয়া পর্য্যন্ত জাপান সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সহিত সর্ব্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত দেশের ন্যায় ব্যবহার করিবে।

(৬) সন্ধিতে স্বাক্ষরকারী সকল পক্ষই যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবি পরিহার করিবেন।

(৭) জাপানের প্রাক্তন শত্রু দেশগুলির দাবি সম্পর্কে

যদি কোন আপত্তি দেখা দেয় আন্তর্জাতিক আদালত কর্ত্তৃক নিযুক্ত বিশেষ নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনালের দ্বারা উহার মীমাংসা করিতে হইবে।

এই প্রাথমিক খসড়া সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা শেষ হইতে যথেষ্ট সময় লাগিবে বলিয়া মনে হয়। কারণ এগারটি দেশের প্রত্যেককেই নিজ নিজ দেশের গবর্ন্মেণ্টের নির্দ্দেশের অপেক্ষা করিতে হইবে।"

এই সংবাদে সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে যে প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘকে কোনরূপ আমল না দিবার প্রবৃত্তি দেখা যায়; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাষ্ট্র, ব্রিটেন ও চীনকে জাপানের হর্ত্তাকর্ত্তা রূপে দাঁড় করাইতে পারিলে বর্ত্তমান গোলমালটা আরও ঘোরাল হইবে।

দ্রব্যমূল্য অর্ডিনান্স

দুই মাসের অধিককাল হইল ভারত-সরকার দ্রব্যমূল্য অর্ডিনান্স জারী করিয়াছেন। অর্ডিনান্সটি জারীর সময় এমন একটা ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল যেন ভারত-সরকার সত্যই এত দিনে চোরাকারবার দমনের জন্ত আগ্রহশীল হইয়াছেন। ইহাতে লোকে আশ্বস্ত এবং খুসী হইয়াছিল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই দেখা গেল যে, প্রাদেশিক সরকারেরা এইরূপ অর্ডিনান্সের দ্বারা মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং চোরাকারবার দমনের ক্ষমতা ভারত-সরকারের হাতে চলিয়া যাওয়ায় সন্তুষ্ট হন নাই। প্রাদেশিক সরকারগুলির নানাবিধ ওজর-আপত্তি এবং কার্য্যক্ষেত্রে অর্ডিনান্স প্রয়োগে সহস্র অসুবিধার কথা প্রকাশিত হইতে লাগিল। যে উৎসাহের সহিত জনসাধারণ অর্ডিনান্সটি গ্রহণ করিয়াছিল তাহা স্তিমিত হইয়া গেল।

ইহার পর একটি মূল্য নিয়ন্ত্রণ পরামর্শদাতা সমিতি গঠিত হইয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে যে অর্ডিনান্স জারী হইল তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার পরামর্শ সভার প্রথম অধিবেশন হইল ৩১শে অক্টোবর। পরামর্শদাতা সমিতির সদস্যেরা সাধারণ ভাবে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উক্ত অর্ডিনান্সের প্রয়োজন আছে এবং উহা বলবৎ রাখা উচিত। কয়েকজন সদস্য অবশ্য এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—অর্ডিনান্সটি সতর্কতার সহিত প্রয়োগ করা উচিত।

এই অর্ডিনান্সের প্রয়োগের সাফল্য সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেছি না। মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া, মজুত মালের পরিমাণ সরকারকে জানাইতে বলা, দোকানে মূল্যতালিকা টাঙাইয়া রাখা ইত্যাদি ব্যবস্থা অন্যান্ত নানা আইন ও অর্ডিনান্স বলে যুদ্ধের সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু জনসাধারণের কোন উপকারেই ঐগুলি লাগে নাই। যত দিন মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্ম্মচারীবৃন্দ এবং পুলিস সৎ ও কর্ম্মদক্ষ না হইবে ততদিন কাগজ-পত্রে সহস্র কঠোরতা অবলম্বন করিলেও তাহা ফলবতী হইবে না।

পানাগড় শিবিরের সমস্যা

গত বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বর্দ্ধমান জেলার পানাগড় অঞ্চলে সামরিক শিবির স্থাপনের প্রয়োজনে সহস্র সহস্র নরনারীর বাস্তভিটা ও শস্যক্ষেত্রাদি অধিকার করা হয়। তখন বলা হইয়াছিল যে, তাহাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। যুদ্ধ থামিয়াছে প্রায় পাঁচ বৎসর, তবুও এই বাস্তুচ্যুতদের জীবনে যে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, তাহা শোধরাইবার জন্ত স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রও সক্ষম হয় নাই। এই বিষয়ে বর্দ্ধমানের "দামোদর" পত্রিকার ২৯শে ভাদ্র সংখ্যায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে সমস্যাটি সমাধানের ইঙ্গিত আছে:

"বিগত মহাযুদ্ধের সময় পানাগড় মিলিটারী বেস প্রতিষ্ঠার জন্ত তৎকালীন সরকার বর্দ্ধমান সদর মহকুমার গলসী, আউস-গ্রাম ও আসানসোল মহকুমার কাঁকসা থানার কুড়িখানি গ্রামে ১৫ সহস্রাধিক অধিবাসীকে তাহাদের ৫০ সহস্রাধিক বিঘা জমি ও বাস্তভিটা হইতে উৎখাত করিয়াছিলেন। যুদ্ধ-শেষে ছয় মাসের মধ্যে উক্ত জমি-জায়গা ক্ষতিপূরণসহ ফেরত দিবার লিখিত অঙ্গীকার দেওয়া সত্ত্বেও বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার নামমাত্র মূল্যে উক্ত জমি স্থায়ীভাবে গ্রহণ করিতেছেন। সরকারের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে সকল জমি ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে, তাহাও জমির মালিক ও স্থানীয় উৎখাত কৃষককে না দিয়া বহিরাগত পঞ্জাবী ধনী কন্ট্রাক্টারকে দেওয়া হইতেছে। উদ্বাস্ত সম্মেলনে এই অব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করা হয় এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণসহ জমি গ্রাম-বাসীদিগকে অবিলম্বে ফিরাইয়া দিবার দাবি করা হয়।

অন্ত এক প্রস্তাবে পানাগড় বেসের জমি-জায়গা গৃহীত হইবার পর মাত্র ১৩৫০-৫২ সালের ফসলের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পর আজ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের ক্ষতিপূরণ না দেওয়ায় উদ্বাস্তদের যে দারুণ দুর্দশা হইয়াছে, তাহাতে সরকারের আচরণের নিন্দা করা হয় এবং অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ দিবার দাবি করা হয়। যে সমস্ত জমি ফেরত দেওয়া হইয়াছে, মূল্য দিবার সময় তাহা প্রজাদিগকে না দিয়া বেআইনী কবুলতি মূলে লক্ষ লক্ষ টাকা জমিদারদিগকে দেওয়া হইয়াছে, অবিলম্বে জমিদারদের স্বত্ব বাতিল করিয়া কৃষকদিগকে তাহা ফেরত দিবার জন্ত আর এক প্রস্তাবে দাবি করা হয়।"

কলিকাতা নগরীর ময়লা জল

পশ্চিম বাংলার "কংগ্রেস কর্ম্মিগণের" মুখপত্র বলিয়া পরিচিত "জনসেবক" পত্রিকায় কলিকাতা নগরীর ময়লা জল নিষ্কাষণ সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। এই মন্তব্যটি উদ্ধৃত করা গেল:

"বিদ্যাধরী নদী মজিয়া যাওয়ায় কলিকাতার ময়লা জল নিকাশনের পথে যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার উল্লেখ প্রসঙ্গে সেচমন্ত্রী শ্রীযুত ভূপতি মজুমদার এই বলিয়া মন্তব্য করেন যে, আপাততঃ মাতলা খালের মধ্য দিয়া কুলটির মুখে শহরের ময়লা গঙ্গার বাহির করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু এই খালের মুখও বুজিয়া আসিতেছে। সুতরাং এই ময়লা জল নিকাশনের অন্য কোন ব্যবস্থা না করিলে বিপদ অনিবার্য্য। শ্রীযুত মজুমদার ঘোষণা করেন যে, এই বিপদের আশঙ্কায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার গবর্ণেণ্ট হাউসকে কেন্দ্র করিয়া ত্রিশ মাইল ব্যাসার্দ্ধ বিশিষ্ট জল-নিকাশনের এক পথ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন। প্রসঙ্গক্রমে সেচমন্ত্রী আরও দুইটি সমস্যার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে একটি হইতেছে জাহাজ ও ষ্টীমার চলাচলের সুবিধার জন্য প্রস্তাবিত কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত খালটি নির্ম্মিত হইলে গঙ্গায় পলিমাটি ও চোরাবালি তুলিবার বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হইবে এবং তাহার ফলে হুগলী নদীর উপর নির্ভরশীল হাওড়া, বর্দ্ধমান অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ইহা ব্যতীত সমুদ্রের লবণাক্ত জলস্রোত নদীর জলকে বিষাদ করিয়া দিবে। এই দুর্বিপাক হইতে আত্মরক্ষার জন্য যে সকল পরিকল্পনা করা হইতেছে তন্মধ্যে প্রধান হইতেছে গঙ্গার উপর বাঁধ দিয়া নূতন খালের সাহায্যে নদীয়ার নদীগুলিকে সঞ্জীবিত করা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন এবং আশু প্রতিবিধানের পক্ষপাতী ইহা জানিতে পারিয়া আমরা আশ্বস্ত হইলাম। আশা করি, কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই পরিকল্পনাগুলি কার্য্যে পরিণত করিবেন।"

আজ কয়েক বৎসর হইতে কলিকাতার পোতাশ্রয়ের (Port) কর্ত্তৃপক্ষ কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত একটি নূতন খালের পরিকল্পনা লইয়া আলোচনা করিতেছেন। তাহার সুফল একটা আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তাহার কুফল ভোগ করিবে হাওড়া বর্দ্ধমান জেলা। এতৎসম্বন্ধে দামোদর বাঁধের ফলাফলের কথাও ভাবিতে হইবে। পশ্চিমবাংলার সমস্ত পরিকল্পনা এক গুচ্ছে গ্রথিত করা যায় না?

বুনিয়াদি শিক্ষার গোড়ার কথা

গান্ধীজী বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ভারতরাষ্ট্রে শিক্ষা-বিস্তারের একটা সুব্যবস্থার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বিষয়ে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহাদের কথার একটা বিশেষ মূল্য আছে। শিউড়ী হইতে প্রকাশিত "শিক্ষা ও কৃষি" পত্রিকার ১৪ই কার্ত্তিক সংখ্যায় বৈষ্ণবতী লোক-শিক্ষা সংসদের উপাধ্যায় শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা বুনিয়াদি শিক্ষাসেবী-বৃন্দের প্রণিধানযোগ্য।

"আজ সমাজব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, শিক্ষক শ্রদ্ধা পান না, অন্ন পান না, আত্মমর্য্যাদা ভুলিয়া পিয়নের বা ধনীর মোটর ড্রাইভারের সিকি বেতনের জন্য দরবার করিতে তাঁহাকে অবিরত নানা জনের মনোরঞ্জন কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়। বর্ত্তমান কাঞ্চন-কৌলিন্যের দিনে আর্থিক আয়ের হিসাবে সামাজিক মর্য্যাদা নির্ণীত হয়, সুতরাং ছাত্র এবং অভিভাবক সকলেই তাঁহাকে তাচ্ছিল্য করে, তিনিও ক্রমে দেহ-মনে শ্রমবিমুখ আদর্শভ্রষ্ট হইয়া সেই তাচ্ছিল্যের উপযুক্ত পাত্র হইয়া দাঁড়ান। অর্থের মূল্য কমিয়াছে কিন্তু মান্য কমিতেছে না, সেই মান্ত কমাইতে হইবে। কায়িক শ্রমের দ্বারা নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন করিয়া লইলে সাংসারিক দুশ্চিন্তা কমিবে, শিক্ষক পথ দেখাইলে তাঁহার প্রতিবেশী সমপদস্থ ব্যক্তিরাও কৃষিকে মর্য্যাদা দিয়া অন্ন-চিন্তার খানিকটা সুরাহা করিতে পারিবেন।...ঐ আদর্শে কাজ করিয়া ছাত্রদের সহায়তায় শাকসজী, ধান প্রভৃতি বিদ্যালয়-সংলগ্ন কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন করিয়া আমরা দীর্ঘকাল অতি সামান্ত ব্যয়ে একটি আশ্রম বিদ্যালয় চালাইয়াছি। বর্ত্তমানে মহাত্মাজীর প্রেরণায় রাষ্ট্র এদিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। আশা করা যায়, শিক্ষক এবং ছাত্রদের ঐকান্তিক চেষ্টায় শিক্ষাক্ষেত্রে কৃষি এবং কায়িক শ্রমের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটিবে; শিক্ষকের আত্ম-সম্মানবোধ এবং সামাজিক সম্মান বাড়িবে; অন্নচিন্তা, লোভ এবং দলাদলি কমিবে। আমার মনে হয় কৃষি সম্বন্ধে আপনাদের আরও একটু বেশী লেখা দরকার।...কৃষির সঙ্গে মৌমাছি পালন, পশুপক্ষী পালন, মাছের চাষ সম্বন্ধেও আলোচনা করিতে হইবে। সমাজহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই এই কার্য্যে আপনাদিগকে সাহায্য করিবেন বলিয়া আশা করি। ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার, কলাশালা এবং পাঠচক্রের প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহ দেওয়াও প্রয়োজন। আজীবন জ্ঞানার্জ্জনা না করিলে শিক্ষক হওয়া যায় না।

শিক্ষকের প্রয়োজন মিটাইয়া ছাত্রেরা যাহাতে উৎপন্ন ফসলের অংশ পায়, নিজেদের শিক্ষাকেন্দ্রের প্রয়োজন মিটাইয়া নগরে পাঠাইয়া যাহাতে অন্যান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য প্রয়োজনমত অর্থাগমের ব্যবস্থা হইতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কৃষি শিক্ষারই অন্তর্গত, গ্রামের ছেলে কৃষি-কার্য্য না জানিলে তাহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ।"

বুনিয়াদি শিক্ষার মূল মন্ত্র শিক্ষার্থীকে বিদ্যাদানের সঙ্গে সঙ্গে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলা। বলা বাহুল্য, শিক্ষকের অবস্থা, ব্যবস্থা ও উদাহরণ এই তিনটিই যদি ছাত্রের শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করিতে পারে তবেই ঐরূপ শিক্ষা ফলপ্রদ

হইতে পারে। শিক্ষক নিদারুণ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া ডুবিতেছে ইহা চক্ষের সামনে দেখিয়া কোনও ছাত্র বুনিয়াদি শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে পারে না। এ বিষয়ে রাষ্ট্রচালকদিগের দায়িত্ব শিক্ষককে চাষী বা চাষীকে শিক্ষকে পরিণত করিলেই শেষ হয় না। বুনিয়াদি বা প্রাথমিক শিক্ষকের দেহমন সুস্থ ও সবল না হইলে রাষ্ট্রের শিক্ষাদানের সমস্ত পরিকল্পনাই ব্যর্থ হইতে বাধ্য। প্রভাতবাবুর বক্তব্য সমর্থনযোগ্য, কিন্তু সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা মনে রাখা প্রয়োজন। অভাব-ক্লিষ্ট দুর্বল শিক্ষক কায়িকশ্রমে বিমুখ না হইলেও চাষের কাজে সফল হইতে পারিবেন না।

শিক্ষার বাহন

"হরিজন" পত্রিকার ১৮ই কার্ত্তিকের সংখ্যায় আচার্য্য বিনোবা ভাবের নিম্নলিখিত মন্তব্যটি প্রকাশিত হইয়াছে :

"আমার মতে স্থানীয় ভাষাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত—এই ভাষাকেই সাধারণভাবে মাতৃভাষা বলা হইয়া থাকে। শিক্ষার সকল অবস্থায় সকলের জন্যই জাতীয় ভাষা শিক্ষা আবশ্যিক হওয়া চাই। প্রত্যেক বিশ্ব-বিদ্যালয় অপর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অধ্যাপক আনিলে ও তথায় আপন অধ্যাপক পাঠাইলে অধ্যাপকগণ দেশের সর্বত্র ছাত্রদের পড়াইতে পারেন। স্থানীয় ভাষা ভাল করিয়া জানা না থাকিলে তাঁহারা জাতীয় ভাষার মাধ্যমে অধ্যাপনা করিতে পারিবেন। আমার মনে হয় এইরূপে সর্বভারতীয় ঐক্যরক্ষার দাবি মিটিবে এবং বৈজ্ঞানিক বিচারে শিক্ষার যথার্থ বাহন হিসাবে মাতৃভাষার দাবিও রক্ষিত হইবে।

মাতৃভাষা এখনই শিক্ষার বাহনস্বরূপে প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত এবং ৫ বৎসরের মধ্যে সকল শিক্ষাই মাতৃভাষার মাধ্যমে দেওয়া উচিত। বাঙলা বা মারাঠির মত সমৃদ্ধ ভাষা ত দুই-তিন বৎসরেই সর্বব্যাপারে পুরাপুরি প্রবর্ত্তিত হওয়া চাই।"

আচার্য্য ভাবে এই উপলক্ষে ইংরেজী ভাষার প্রতি আমাদের মধ্যে অনেকের মনে যে মোহ আছে তার নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে "হিন্দিওয়ালাদের" ও কোন কোন ভাষাভাষীদের দাপটে দেশের মনোভাব বিকৃত হইতে পারে। সম্প্রতি আসাম হইতে তার নূতন একটা প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কলিকাতা "যুগান্তর" (দৈনিক) পত্রিকার "নিজস্ব" সংবাদদাতা গত ২২শে কার্ত্তিক শিলং হইতে তারে বলিয়াছেন :

"অদ্য প্রকাশিত আসাম গেজেটের প্রথমভাগে একটা নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অদ্যকার গেজেটে নিয়োগ, বদলী প্রভৃতি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ইংরেজী ও অসমীয়া উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি আসাম গেজেটে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যে খসড়া বিজ্ঞপ্তি ও নিয়মাবলী ছাপা হইয়াছে তাহাতে আঞ্চলিক রাষ্ট্রভাষা হিসাবে অসমীয়াকে এবং হিন্দী ভাষাকে উক্ত পরীক্ষায় আবশ্যিক পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অবশ্য অসমীয়া ও হিন্দী ভাষাকে পার্ব্বত্য উপজাতীয় প্রার্থীদের পক্ষে দুই বৎসরের জন্য এবং কাছাড়ের প্রার্থীদের পক্ষে এক বৎসরের জন্য অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে গণ্য করার ব্যবস্থা আছে।

সম্মিলিত খাসিয়া-জয়ন্তীয়া পাহাড় উপদেষ্টা পরিষদের এক বৈঠকে এই সকল পরীক্ষায় অসমীয়া ভাষাকে অবশ্যগ্রহণীয় বিষয় করিবার মনোভাব পরিত্যাগের জন্য আসাম গবর্ন্মেণ্টকে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, এখনও এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের সময় হয় নাই এবং ইহাদ্বারা আসামের সকল শ্রেণীর অধিবাসীর স্বার্থ যথাযথভাবে রক্ষিত হইবে না। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

আজ আসাম গেজেটে ভারত-সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এই বিজ্ঞপ্তিতে শাসন-বিভাগের চাকুরীর নিয়মাবলীতে প্রদেশের ভাষার তালিকা সংশোধন করা হইয়াছে। এই সংশোধনে অসমীয়ার স্থলে অসমীয়া অথবা বাংলা, এবং হিন্দী, ওরাঁও, অথবা সাঁওতালীর স্থলে হিন্দী, ওরাঁও, সাঁওতালী অথবা বাংলা বসান হইয়াছে।

ধুবড়ী হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, গোয়ালপাড়ার ডেপুটি কমিশনার এক হুকুমনামা জারী করিয়া নির্দেশ দিয়াছেন যে, এখন হইতে সমস্ত দরখাস্ত, আবেদন প্রভৃতি হয় অসমীয়ায় অথবা ইংরেজীতে লিখিতে হইবে। ডেপুটি কমিশনারের এই আদেশ ভারতের সংবিধানের ৩৫০ ধারার বিরোধী বলিয়া চীফ সেক্রেটারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে সরকারী দপ্তরখানা হইতে ডেপুটি কমিশনারকে জানান হইয়াছে যে, অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য প্রদেশে প্রচলিত যে কোন ভাষা ব্যবহারের যে অধিকার জনসাধারণের আছে কোন শাসন বিভাগীয় আদেশের দ্বারাই সেই অধিকার হরণ অথবা সঙ্কোচ করা যায় না।"

উপরে উদ্ধৃত সংবাদ হইতে দেখা যায় যে, আসাম সরকার প্রথমে বাংলা, হিন্দি, ওরাঁও অথবা সাঁওতালী ভাষাকে নস্যাৎ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ধুবড়ীর অত্যুৎসাহী ডেপুটি কমিশনারকেও সংযত করা হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্ট সর্ব্বদা সজাগ না থাকিলে এইরূপ চোরা-গুপ্তি ব্যাপার অনেক ঘটিবে। স্থানীয় ভাষাকে কেন্দ্র করিয়া যে সব রাজ্যে নূতন জাগৃতি দেখা দিয়াছে, সেই সব রাজ্যেই এই অহমিকা ও দাম্ভিকতার প্রকাশ দেখা যাইতেছে। আসাম সম্বন্ধে এই কথা বিশেষভাবে সত্য।

আমরা ভাবিয়া পাই না কোন্ যুক্তির বলে আসামের

৫।৩০ লক্ষ লোকের প্রতিনিধি বাকী ৫৫।৬০ লক্ষ লোকের উপর নিজেদের ভাষা চাপাইয়া দিতেছেন। লোক গণনার হিসাবে দেখা যায় যে, আসামে প্রায় ২৫ লক্ষ বাংলা ভাষা-ভাষী লোক আছে; বাকী প্রায় ২০ লক্ষ খাসিয়া, মণিপুরী, লুসাই, মিকির প্রভৃতি লোকের জনসমষ্টি। প্রায় ১০ লক্ষ লোক চা-বাগানের শ্রমিক; তাহাদের মাতৃভাষা হিন্দি, ওরাঁও, সাঁওতালী, উড়িয়া, তেলুগু প্রভৃতি।

শ্রীহট্টের পাকিস্থানভুক্তিতে অসমীয়াদের আনন্দ

গৌহাটি হইতে 'অসমীয়া' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাঙালীবিদ্বেষ প্রচারে ইহার তুল্য আর কোন পত্রিকা নাই এবং বাঙালীদের প্রতি অসমীয়াদের আসল মনোভাব এই পত্রিকাটিতেই প্রতিফলিত হয়। আসামের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলসমূহ লইয়া পূর্ব্বাচল প্রদেশ গঠনের চেষ্টা অনেক দিন হইতেই চলিতেছে। সম্প্রতি এই চেষ্টা উপলক্ষ্যে 'অসমীয়া'তে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি নিয়ে দেওয়া গেল:

"শ্রীহট্ট জেলা প্রায় ১০০ বছর যাবৎ ভালুকের মত আসামের গলায় ঝুলিয়া ছিল। ইহাকে বন্ধু বা বান্ধবী যে যাহাই বলুক না কেন, এক শ এক বার চেষ্টা করিয়াও এই অজীর্ণ পাতকীর বন্ধন ছিন্ন করিতে পারা যায় নাই। নূতন স্বাধীনতার সঙ্গে পাকিস্থানের অনুগ্রহে এই মুক্তি আমরা লাভ করিয়াছি। এই অনুগ্রহের জন্ত অসমীয়ারা চিরকাল জিন্না সাহেবের স্বর্গীয় আত্মার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। দুঃখের বিষয়, শ্রীহট্ট গেল বটে কিন্তু শ্রীহট্টিয়ারা গেল না। যাহারা ছিল তাহারা তো রহিলই, উপরন্ত সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আরও লাখে লাখে আসিয়া জুটিতেছে। ইহার পর কাছাড় জিলাকে যদি আসামের অন্তর্গত বলিয়া মনে করা হয় তার চেয়ে মারাত্মক ভুল আর হইতে পারে না। ভয়ে ভয়ে আমরা দেশের প্রতি-নিধিস্থানীয় মহাশয় ব্যক্তিদের জানাইয়া রাখিতে চাই যে, বৃহত্তর আসামের স্বপ্ন দেখার সময় আর নাই। শ্রীশঙ্কর মাধবের পদধূলিপূত কুচবিহারই যখন আমরা রাখিতে পারিলাম না, তখন কচুপাতার মত কাছাড়কে ঝুলাইয়া আমরা আর কি দেখাইব? বাস্তহারার বোঝায় ভারাক্রান্ত এবং বাঙালীর দ্বারা আক্রান্ত কাছাড়কে আসাম স্বগৃহে স্থান দিলে নির্ব্বোধের সঙ্গে গৃহবাসের মত ঝগড়া ও সন্দেহ কখনও ঘুচিবে না। বাহুবলে অথবা পিতৃপিতামহের পৈত্রিক অধিকার বলে না পাইলেও জনবল এবং কলমের জোরে দ্বিখণ্ডিত বঙ্গের নিম্নাংশটি কেতু প্রভৃ চক্রের ভায় আসামকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। অতএব দুই পক্ষের মঙ্গলের জন্ত কাছাড়, মণিপুর, করিমগঞ্জ ও লুসাই পাহাড় লইয়া পূর্ব্বাচল প্রদেশ গঠিত হইতে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ এবং অসমীয়াদের প্রাণ রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। অবশ্য এইরূপ হইলে আসামের কলেবর আরও কমিয়া যাইবে এবং শিলং আইনসভায় আমাদের প্রতিনিধিদের আর কয়েকটি আসন কমিবে। কমিলেও এইটুকু স্বার্থ ত্যাগ করাই ভাল। দুই জনের স্থলে এক জন কমিশনারই এই কয়টি জেলার দায়িত্ব লইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত কাজ চালাইতে পারিবেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও অসমীয়াকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করিবার চেষ্টায় পথ হইতে কয়েকটি কাঁটা তুলিয়া ফেলিতে পারিব। আমাদের এই প্রস্তাব শুনিয়া বিশ্বপ্রেমিকের দল শিলাবৃষ্টি না করিলেই রক্ষা।"

এগার লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন ?

পশ্চিমবাংলার আইন সভার শারদীয় অধিবেশন উপলক্ষে প্রদেশপাল শ্রীকৈলাসনাথ কাটজু বলিয়াছিলেন যে, প্রায় এগার লক্ষ পূর্ব্ববাংলার হিন্দু উদ্বাস্ত পশ্চিমবাংলার দিকে দিকে বসতি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে। আইন সভার সভ্যবৃন্দের নিকট মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিধানচন্দ্র রায়ও এই হিসাব দিয়াছিলেন। সম্প্রতি মহীশূর রাজ্যে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ববাংলা হইতে প্রায় ৪৫ লক্ষ হিন্দু জন্মস্থান ত্যাগ করিয়াছে; তাহাদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ নানাভাবে পশ্চিমবাংলায় স্থির আশ্রয়লাভ করিয়াছে। এই হিসাবের মধ্যে সরকারী বে-সরকারী ও আধাসরকারী ব্যবস্থা ধরা হইয়াছে ও পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, ২৪-পরগণা প্রভৃতি সীমান্তবর্তী জেলায় যে হাজার হাজার টিনের চালা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে তাহাও গণনা করা হইয়াছে।

এই হিসাবের যাথার্থ্য সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে বারাসত, বনগাঁও, বসিরহাট প্রভৃতি সীমান্তবর্তী মহকুমার মুখপত্র "সংগঠনী" পত্রিকা অন্যতম। এই পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে এই পুনর্বাসন ব্যবস্থার নানারূপ দোষ ধরিয়াছেন। তাহা পশ্চিমবাংলার মন্ত্রিমণ্ডলীর ও নাগরিকবৃন্দের জানিয়া রাখা উচিত। তাঁহাদের নামে যে কাজ চলিতেছে তার মধ্যে গলদ কি আছে তাহা জানা না থাকিলে পশ্চিমবাংলার সংগঠন অসম্ভব। সেইজন্তই প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য আমরা এই মন্তব্যের মধ্যে তুলিয়া দিলাম, "ঐ ধরণের সীমান্তবর্তী একটি ক্যাম্প (যাহা বর্ত্তমানে তিনটি ক্যাম্পে ভাগ হইয়াছে) ২৪-পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত চাতরা চণ্ডী-পুর ইউনিয়নে স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত শিবিরে বাঁশের চটার বেড়া দেওয়া দুই-কামরাযুক্ত টিনের ৬১৮টি ঘর আছে এবং ঐ এক একটি কামরা বর্ত্তমানে এক একটি উদ্বাস্ত পরিবারকে বসবাসের জন্ত দেওয়া হইয়াছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় জন্ত যে হাজার হাজার ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার সবই প্রায় ঐ ধরণের এবং পরবর্তীকালে কোথাও একচালা ঘর না করিয়া

ছুই চালা করা হইয়াছে। ঐভাবে একটি করিয়া কামরা পাওয়ায় কোনক্রমে মাথা গুঁজিবার স্থান যদিও বা হইয়াছে কিন্তু অন্নসমস্যার সমাধান হয় নাই। উদ্বাস্তু শিবির-সমূহে যাহারা বাস করিতেছে তাহারা এখনও সম্পূর্ণরূপে সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই বাঁচিয়া আছে। চণ্ডীপুর শিবিরে যাহারা আছে তাহাদের মধ্যে কয়েক শত লোককে মাঝে মাঝে গ্রামের জঙ্গল পরি[illegible], পদ্মানদীর কচুরীপানা ধ্বংস, মসলন্দপুর তেঁতুলিয়া রাস্তা মাটি দেওয়া, নিজেদের ঘরের পোঁতা ভরাট ইত্যাদি কাজ [illegible]রাইয়া লইয়া দৈনিক প্রত্যেককে ১৷৷০ টাকা হিসাবে মজুরী দেওয়া হইতেছে এবং বাকী যাহারা কাজ পাইতেছে না ও স্ত্রীলোক বৃদ্ধ এবং ছাত্রছাত্রীদিগকে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইতেছে। ইহা ছাড়া কয়েকটি প্রাথমিক স্কুলে কয়েকজন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন, একটি কামারশালা খোলা হইয়াছে ও কয়েকজন ছুতারের কাজ করিতেছে এবং অগণিত লোক কোন বৃত্তির আশ্রয় না পাইয়া সরকারের গলগ্রহ হইয়া অভিশপ্ত জীবন-যাপন করিতেছে। কারণ এইভাবে কেবলমাত্র সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে তাহারা কাজ করার ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি হারাইবে এবং আর কোন দিন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না।

তাই আমরা বলিতে চাই যে, প্রকৃতপ্রস্তাবে পুনর্বাসন খুবই কমসংখ্যক উদ্বাস্তুর হইয়াছে। কারণ একজন ভিক্ষা-জীবীরও যেমন একটি কুটীর থাকা সত্ত্বেও আমরা তাহাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত বলি না বরং সমাজের গলগ্রহ হিসাবে দেখি, পরগাছা মনে করি—এই সমস্ত উদ্বাস্তুরাও সরকারের ভিক্ষা অন্নে প্রতিপালিত হইয়াও ঠিক সেই ভিক্ষুকের পর্য্যায়ে পড়িতেছে। সুতরাং আমরা কখনই ইহাকে পুনর্বাসন বলিতে পারি না। আমরা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্ভব হইয়াছে তখনই মনে করিব যখন দেখিব প্রত্যেকটি পরিবার স্ব-স্ব বৃত্তির আশ্রয় লইয়াছে—অর্থাৎ কৃষক চাষ করিয়া ফসল উৎপন্ন করিতেছে, কর্ম্মকার লোহার কাজ করিতেছে, ছুতার কাঠের কাজ করিতেছে, কুম্ভকার মাটির কাজ করিতেছে, তাঁতী তাঁত বুনিতেছে—চরকা কাটিতেছে, মৎস্যজীবি মাছ ধরিতেছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা করিয়া রোজগার করিতেছে, এবং বুদ্ধিজীবী চাকুরী করিতেছে। কিন্তু তাহা না দেখিয়া যদি দেখি উদ্বাস্তুরা মাথা গুঁজিবার স্থান পাইলেও সরকারের সাহায্যের উপরই নির্ভর করিতেছে—নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে নাই, তাহা হইলে তাহারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে মনে করিব না। সুতরাং তাহাদের পুনর্বাসন সম্ভব হয় নাই বুঝিতে হইবে।"

বলা বাহুল্য, ৪৫ লক্ষের পুনর্বসতির জন্য যেরূপ অর্থ, সামর্থ্য ও ব্যবস্থার প্রয়োজন, তাহার এক ভগ্নাংশও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নাই। উপরন্তু আছে অর্থের বিরাট অপচয় ও অব্যবস্থার চূড়ান্ত। এ বিষয়ে দেশের লোকের ও উদ্বাস্তুদিগের মধ্যে সহযোগ ও সহানুভূতি থাকিলে অনেকটা কাজ অগ্রসর হইত। কিন্তু তাহাতেও বাধা অশেষ। সুতরাং পুনর্বসতি ব্যাপারে সমস্যা পূরণের কোনও লক্ষণ আমরা আপাততঃ দেখি না।

বোম্বাই নগরীতে ধর্ম্মঘট

গত ভাদ্র আশ্বিন এই দুই মাস ব্যাপিয়া বোম্বাই নগরীর কাপড়ের কলে ধর্ম্মঘট চলিয়াছিল। তার ফলে সমাজের কি ক্ষতি হইয়াছে তার একটা হিসাব দেখিয়াছি। প্রায় ৫ কোটি গজ কাপড় বোনা হয় নাই; তার মূল্য ১০ কোটি টাকার কম নয়। কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের "শ্রমিক বুরো" নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত এই হিসাবটির অর্থ সমাজের সকল ব্যক্তির গোচরে আনিতে চাই।

বোম্বাই সুতাকল ধর্ম্মঘটের ফলে ১৯৫০ সালের আগষ্ট মাসে যত কাজের দিন নষ্ট হইয়াছে, ১৯২৮-২৯ সালের পর হইতে অন্য কোন সময় তত অধিক কাজের দিন নষ্ট হয় নাই। শ্রমিক বুরো কর্তৃক প্রকাশিত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, জুলাই মাসে ১৩৪৩২৫ কাজের দিন নষ্ট হয় এবং আগষ্ট মাসে ২৯৪৮৪১৫ কাজের দিন নষ্ট হয়। কর্ম্মবিরতির ফলে আলোচ্য মাসে ৭৪টি বিরোধের সৃষ্টি হয়। ইহার পূর্ব্ব মাসে ৫১টি বিরোধের সৃষ্টি হয়। আলোচ্য মাসে কর্ম্মবিরতির সহিত ২৪০৪৫২ জন শ্রমিক সংশ্লিষ্ট হয়। ইহার পূর্ব্ব মাসে ২০৭৩৩ জন শ্রমিক কর্ম্মবিরতির সহিত সংশ্লিষ্ট হয়। পশ্চিমবঙ্গের ৪টি ক্ষেত্রে কর্ম্মবিরতির ফলে ৩০৪১ জন শ্রমিক বেকার হয় এবং ইহার ফলে ১৯৩৪১ কাজের দিন নষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত আরও ২৫টি ক্ষেত্রে কর্ম্মবিরতি ঘটে। এগুলি শ্রমিক-মালিক বিরোধের সহিত সরাসরিভাবে সংশ্লিষ্ট নহে। এই সকল কর্ম্মবিরতির ফলে ১২২,৯১৭ জন শ্রমিক বেকার হয় এবং ১২৩,১৫৮ কাজের দিন নষ্ট হয়। সুতাকলের ধর্ম্মঘটি শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য বোম্বাইয়ের ২৪৫টি কারখানা ও অন্যান্য স্থানে একদিনব্যাপী যে ধর্ম্মঘট হয়, তাহা এই সকল কর্ম্মবিরতির অন্যতম। ইহার ফলে ৭৪২৭১ জন শ্রমিকের রোজ নষ্ট হয়। কর্ম্মবিরতির ফলে মোট যে পরিমাণ সময় নষ্ট হইয়াছে, একমাত্র বোম্বাইয়ে তাহার শতকরা ৯৫ ভাগ নষ্ট হইয়াছে; উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবাংলায় হইয়াছে শতকরা ৩ ভাগ; কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের শাসনাধীন অঞ্চলে ক্ষতির পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর—৯টি ক্ষেত্রে কর্ম্মবিরতি ঘটে; ১২৮০ জন শ্রমিক বেকার হয় ও ১৪৩৫ কাজের দিন নষ্ট হয়।

এই যে ক্ষতি হইল তার জন্য দায়ী কে, তার বিচার এখন করিব না। কিন্তু দুই মাসে এত কোটি টাকা নষ্ট হয় যে সমাজব্যবস্থায় তার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারি না।

বারোয়ারি দুর্গাপূজা

বারোয়ারি দুর্গাপূজার গতি-পরিণতি লক্ষ্য করিয়া অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দু মনে মনে পীড়িত হইতেছেন। সেই মনোভাবই "সৈনিক" (সাপ্তাহিক) পত্রিকার ১৬ই কার্ত্তিক তারিখের সম্পাদকীয় মন্তব্যে মূর্ত্ত দেখিতে পাই। তাহা পাঠ করিয়া আশা হয় যে, বর্ত্তমান উদ্দামতা ও হৈ-হুল্লোড় বেশীদিন টিকিবে না :

"দেবীপূজার রীতিনীতিগুলা ঠিকই আছে, কিন্তু তাহার বহিরঙ্গ এবং আদব-কায়দাগুলি বদলাইয়াছে। পরিবর্ত্তনে আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার একটা অর্থসঙ্গতি থাকা দরকার। পূজার সঙ্গে 'জয়হিন্দ' বা পতাকা উত্তোলনের কোন সম্বন্ধ নাই...সভাপতি, প্রধান অতিথিও সভাস্থলে থাকুন; পূজা-মণ্ডপে আনিয়া তাঁহাদের এ অপমান না করাই ভাল।

এই পদ্ধতির প্রবর্ত্তন...সার্ব্বজনীন-রুচি হইতে আসিয়াছে। কিন্তু ইহা তো কেবলমাত্র রুচির কথা নয়। তা ছাড়া এই রুচি এতদূর পর্য্যন্ত বিকৃত হইয়াছে যে, প্রতিমা বিসর্জ্জনকালে দেবী-মাহাত্ম্য ভুলিয়া গিয়া 'গান্ধীজীকি', 'নেতাজীকি' ধ্বনি তুলিয়া আমরা মিছিল পরিচালনা করিতে লজ্জাবোধ করি না। তাই মনে হয়, আজকের সার্ব্বজনীন-রুচি পূজা চাহে নাই, চাহিয়াছে উৎসব। অর্থাৎ এ উৎসব দেবীপূজার মধ্য দিয়া আসিলেও ক্ষতি নাই, কিংবা পূজা না থাক কেবলমাত্র উৎসব থাকিলেই হইল। দেশ স্বাধীন হইয়াছে...ইংরেজকে আমরা তাড়াইয়া ছাড়িয়াছি, কিন্তু ইংরেজী আদব-কায়দা আমরা জীবনের কোন ক্ষেত্র হইতেই বাদ দিতে পারি নাই। এই রুচি এবং রীতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক।"

আমাদের সহকর্ম্মী "সার্ব্বজনীন রুচির" কথা বলিয়াছেন। আমরা কিন্তু মনে করি এই অসংযমে বাঙালী জন-মনের স্বীকৃতি নাই। পরগাছা যে শ্রেণী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার কল্যাণে গজাইয়া উঠিয়াছে, তাহারাই এই "বিকৃত" রুচির প্রচারক।

পূর্ব্ববাংলায় বিক্ষোভ

পূর্ব্ববাংলার রাজনীতিক চেতনাবিশিষ্ট লোকসমষ্টি কেন্দ্রীয় পাকিস্থান সরকারের নানাবিধ ব্যবস্থায় ক্ষুব্ধ হইয়াছেন দেখিতেছি। ইহার কারণ সম্বন্ধে পাকিস্থানবন্ধু "ষ্টেট্স্‌ম্যান" (কলিকাতার দৈনিক) যাহা বলিয়াছেন তাহা এই মনোভাবের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করে না। পূর্ব্ববাংলা পাকিস্থানের সর্ব্বাপেক্ষা বড় অংশ। জনসংখ্যার দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় পাকিস্থানের ৭ কোটি লোকের ৪ কোটি পূর্ব্ববাংলার বাসিন্দা। গণতন্ত্রের নীতি অনুসারে ৪ কোটি লোকের প্রতিষ্ঠা ৩ কোটি লোকের প্রতিষ্ঠা হইতে বেশী হওয়া উচিত। কিন্তু পাকিস্থান গণপরিষদের শাসনতন্ত্র-গঠনকারী কমিটি এই নীতি মানিয়া লইতে অনিচ্ছুক বলিয়া মনে হয়। তাহাদের প্রস্তাবাদি এইরূপ :

"পাক" কেন্দ্র আইন সভায় দুইটি পরিষদ থাকিবে : (১) হাউস অব ইউনিটস্ বা রাষ্ট্র পরিষদ, এবং (২) "হাউস অব পিপলস্" বা লোক পরিষদ। উচ্চ পরিষদ বা হাউস অব ইউনিটসে সকল প্রদেশের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি থাকিবে এবং নিম্ন পরিষদ বা "হাউস অব পিপলসে" জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করা হইবে। উচ্চ ও নিম্ন উভয় পরিষদের ক্ষমতা সমান থাকিবে এবং বাজেট ও অর্থ বরাদ্দ সম্পর্কিত বিল উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে পাস হইবে। উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে পাকিস্থানের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইবেন।

পাকিস্থানের মোট লোকসংখ্যা সাড়ে সাত কোটি, তন্মধ্যে সাড়ে চার কোটি একমাত্র পূর্ব্ববঙ্গে, অবশিষ্ট তিন কোটি পশ্চিম পঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাকিস্থানভুক্ত অন্যান্য দেশীয় রাজ্য ও উপজাতি অঞ্চল সব কয়টি মিলিয়া। হাউস অব ইউনিটসে যদি দেশীয় রাজ্যসমূহকে পৃথক আসন দেওয়া হয় তাহা হইলে ইউনিটের সংখ্যা দাঁড়াইবে প্রায় ১৫—প্রদেশ পাঁচটি এবং ভাওয়ালপুর, কালাত, খয়েরপুর, লাসবেলা, খারান, চিত্রল, দীর, আম্ব ও কুলেরা এই দশটি দেশীয় রাজ্য। ইউনিটগুলির প্রতিনিধি সংখ্যা সমান হইলে সাড়ে চার কোটি লোকের পূর্ব্ববঙ্গের যতজন প্রতিনিধি থাকিবে সাড়ে আট লক্ষ লোকের বেলুচিস্তান বা নয় হাজার লোকের কুলেরা রাজ্যেরও ততজন প্রতিনিধি হাউস অব ইউনিটসে থাকিবে। এই ব্যবস্থায় নিম্ন পরিষদে পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যাধিক্য থাকিলেও উচ্চ পরিষদে সংখ্যা এত কমিয়া যাইবে যে উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে তাহাদের সংখ্যাধিক্য থাকিবে না। ফলে নিম্ন পরিষদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিয়া প্রকৃত ক্ষমতা রাখা হইয়াছে সম্মিলিত উভয় পরিষদের হাতে।

এই ব্যবস্থার ভাবী ফলাফল সম্বন্ধে পূর্ব্ববাংলার প্রতিনিধিবৃন্দ ভীত হইয়া উঠিয়াছেন। গত ১৫ই আশ্বিন তারিখের "আজাদ" পত্রিকায় যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এই বিক্ষোভের দ্যোতক। দীর্ঘ হইলেও তাহা উদ্ধৃত করিলাম :

"মূলনীতি কমিটির সুপারিশ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র পূর্ব্ব পাকিস্থান বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ কেন্দ্রে সমান ক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি আইন সভা গঠনের প্রস্তাবে সমগ্র দেশ আজ সমালোচনামুখর। আমরা পূর্ব্বেও আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, প্রস্তাবিত দুইটি সভা সম্পূর্ণ গণতন্ত্র-বিরোধী এবং একান্তভাবে পূর্ব্ব পাকিস্থানের স্বার্থের হানিকর। প্রথমতঃ, এই প্রস্তাব করিয়া যুগধর্ম্মকে অস্বীকার করা হইয়াছে। এ যুগে একটি উচ্চতর আইন সভা গঠনের বিরুদ্ধে

সকল গণতান্ত্রিক দেশেই প্রবল প্রবণতা দেখা দিয়াছে। কারণ ইহা অহেতুক, অবান্তর এবং অপ্রয়োজনীয় একটা শাসনতান্ত্রিক বিলাস-ভূষণ ছাড়া কিছুই নয়। শ্বেতহস্তী পোষণের এই বিরাট ব্যয়বহনের দায়িত্ব জনসাধারণ আজ আর কোন দেশেই বহন করিতে চায় না। তা ছাড়া নিম্নতর সভায় জনগণের প্রতিনিধিদের রচিত আইনের অগ্রগতির পথে এই বাধার বিন্ধ্যাচল আজ রচনা করিলে এই চলার যুগে কাজের চাইতে অকাজ হইবে বেশী।

"সব চাইতে মারাত্মক কথা হইল উচ্চতর সভাও সমান ক্ষমতার অধিকার পাইবে। এখানেই পূর্ব্ব পাকিস্থান আজ সমূহ বিপদের আশঙ্কা করিতেছে। জনসংখ্যার ও গণতান্ত্রিকতার স্বাভাবিক অধিকারে পূর্ব্ব পাকিস্থান একক নিম্ন-পরিষদে সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পঞ্জাব, সীমান্ত প্রভৃতি দেশের সম্মিলিত আসন-সংখ্যার চাইতে বেশী আসন লাভ করিবে। উচ্চপরিষদ প্রতি প্রদেশের সমান আসন লইয়া সমান ক্ষমতার অধিকারী হইলে নিম্নপরিষদের ক্ষমতাকে ইহা অনায়াসে অর্থহীন ও ব্যর্থ করিয়া দিতে পারিবে। এখানেই পূর্ব্ব-পাকিস্থানকে জবেহ্ করার সব চাইতে বড় ভয় রহিয়াছে। আর্থিক বিল প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে উচ্চপরিষদের কোন হাত না থাকিলে হয়ত তাকে কিছুটা কম বিপদমুক্ত মনে করা যাইত, কিন্তু এখানে ব্যাপার হইল তার সম্পূর্ণ উল্টা। তাই অভিযোগ উঠিয়াছে যে, পূর্ব্ব পাকিস্থানকে শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করার জন্য ষড়যন্ত্র পাকিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্ব পাকিস্থানের উপর কেন্দ্রের নানাপ্রকার অনধিকার হস্তক্ষেপ, অবিচার ও অন্যায়ের কথাও গত তিন বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে খোঁজাখুঁজি করার তাগিদ অনুভূত হইতেছে। আজ পূর্ব্ব পাকিস্থানের সকল মহলে মূলনীতি কমিটির প্রস্তাবকে কেন্দ্র করিয়া কেন্দ্রের প্রতি নানাপ্রকার সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ক্ষোভ দানা বাঁধিতেছে। একে উড়াইয়া দিতে গেলে এর পরিণাম সকলের পক্ষেই অশুভ হইবে।"

আমরা ভিন্ন রাষ্ট্রের লোক। সাধারণত: আমাদের এই বিষয়ে বলিবার কিছু নাই; পারতপক্ষে আমরা তাহা করি না। কিন্তু পূর্ব্ববাংলার মুসলিম মনের এই বিক্ষোভের গতি যদি সংখ্যালঘু হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে পরিচালিত করা হয়, তাহা হইলে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইব না। গত ফাল্গুন-চৈত্র মাসে পাকিস্থানের অবাঙালী পরিচালকবর্গ তাহাই করিয়াছিল। বর্ত্তমান মুসলিম বিক্ষোভ এক মাসের মধ্যে আরও শক্তিশালী হইয়াছে। একটি প্রতিরোধ সমিতি গঠিত হইয়াছে; গালভরা তার নাম। গণতন্ত্র রক্ষা করিবার দায়িত্ব তাঁরা নিজেদের মাথায় তুলিয়া লইয়াছেন। কৌশলী লোকের দ্বারা তাঁহাদের বিভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। মৌলানা আক্রাম খাঁ ইতিমধ্যেই তাহার আওয়াজ তুলিয়াছেন; নিজের সম্পাদিত "আজাদ" পত্রিকায় কঠোর মন্তব্য তুলিয়া বিরোধীদের "রাষ্ট্রের শত্রু" বলিয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিতেছেন। আমরা এই "বদলে গেল মতটা" এই ভেলকীবাজিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। মৌলানা সাহেব ত্রিশ বৎসরব্যাপী রাজনৈতিক ও সাংবাদিক জীবনে এইরূপ ডিগ্‌বাজী অনেকবার খাইয়াছেন।

আমরা এই আন্দোলনের ঐরূপ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে ভারত-সরকারকে ও পশ্চিমবাংলার প্রধান মন্ত্রীকে সাবধান করিয়া দিতে চাই।

"আজাদ" সম্পাদকের ভোল ফিরাইবার পরেও পূর্ব্ব-বাংলার রাজনৈতিক চৈতন্যশালী মুসলিমগণ পাক-কেন্দ্রীয় সরকারের খসড়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতেছেন।

শ্রীযোগেন্দ্র মণ্ডলের পদত্যাগ

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পাকিস্থানে থাকিয়া পদত্যাগপত্র পেশ করেন নাই, অসুস্থতার ছল করিয়া ভারতে আসিয়া পদত্যাগপত্র ডাকযোগে করাচী পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে পদত্যাগপত্রের গুরুত্ব অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, যদিও উহা হইতে অনেক মূল্যবান তথ্য জগদ্বাসী জানিতে পারিয়াছে।

মণ্ডল মহাশয়ের পদত্যাগপত্রের প্রতিক্রিয়া পূর্ব্ববঙ্গের উপর কি হইবে তাহাই সর্ব্বপ্রথমে বিবেচ্য। পূর্ব্ববঙ্গে যে সমস্ত হিন্দু এখনও রহিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বোধ হয় কিছুকম অর্দ্ধেক মণ্ডল মহাশয়ের স্বসম্প্রদায়ভুক্ত। মণ্ডল মহাশয় মন্ত্রিসভা এবং দেশ দুইটাই ছাড়িয়াছেন এই সংবাদে তাহাদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইবে অনেকে এই আশঙ্কা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেরূপ কিছু হয় নাই। ইহাতে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের উপর তিনি যে প্রভাব দাবি করিয়া থাকেন তাহা প্রমাণিত হইতেছে না।

মণ্ডল মহাশয়ের পদত্যাগের প্রধান কারণ পূর্ব্ববঙ্গ মন্ত্রি-সভায় তাঁহার মনোনীত লোকের বদলে শ্রীদ্বারিক বারোরীর নিয়োগ। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের ঘটনার যে পাঁচটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ঘটনার সহিত তাহা খুবই মেলে, কিন্তু তাঁহার পদত্যাগের পক্ষে তিনি উহাকেও যথেষ্ট বিবেচনা করেন নাই। মন্ত্রিমণ্ডলে নিজ দলের নিয়োগকেই তিনি অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছেন যদিও তিনি নিজের তিন বৎসরের কার্য্যকালে পাকিস্থান মন্ত্রিসভায় কোন হিন্দুর থাকা-না-থাকার মূল্য কতটুকু তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন। পাওয়ার-পলিটিক্সের জন্যই তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন, হিন্দুর সাধারণ স্বার্থ বা নিজ সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষাও পদত্যাগের মূল অভিপ্রায় নহে, ইহা লোকে ধরিয়া ফেলিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার পদত্যাগে কেহ বিচলিত হয় নাই।

বরিশালের শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেনও মণ্ডল মহাশয়ের পদত্যাগ বিষয়ে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা আমরা সমর্থন করি। পূর্ব্ববঙ্গে এখন এমন লোকের দরকার যাঁহারা দুই পা পূর্ব্ববঙ্গেই রাখিয়া সেখানে সংখ্যালঘুদের স্বার্থের জন্য লড়াই করিবেন। সেখানে এখন এমন লোকের থাকা দরকার যাঁহারা বিবৃতি প্রচার করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিবেন না, শক্ত হইয়া হিন্দু সমাজের সুখে দুঃখে জড়াইয়া নিজে সেখানে বাস করিবেন। যে নেতা শত বিপদ ও নির্যাতন সহ্য করিয়াও হিন্দু সংখ্যালঘুদের সভ্য সমাজানুমোদিত অধিকার বজায় রাখিবার জন্য শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন, তেমনি নেতার প্রয়োজন পূর্ব্ববঙ্গে রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীন সেন, শ্রীযুক্ত বসন্ত দাস, শ্রীযুক্ত প্রভাস লাহিড়ী প্রমুখ কয়েকজন এই ভাবেই সেখানে রহিয়াছেন; শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র মণ্ডল মন্ত্রিসভা ছাড়িয়া দিয়া যদি ইঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া পাকিস্থানেই বসবাস করিতেন তবে তাঁহার প্রতি পাকিস্থানবাসী হিন্দুদের আস্থা বাড়িত, ভারতের লোকেরাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে পারিত। শ্রীযুক্ত সতীন সেন এই সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন আমরা তাহা তুলিয়া দিলাম :

"কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলের অভ্যন্তরে শ্রীযুক্ত মণ্ডল কি ধরণের অসুবিধাসমূহের সম্মুখীন হইয়াছিলেন তাহা আমি জানি না। সম্মান ও কার্য্যকারিতার দিক হইতে মন্ত্রিমণ্ডলে তাঁহার অবস্থান অসম্ভব হইয়াছিল কি? সে ক্ষেত্রে তাঁহার পদত্যাগ সম্পর্কে বলিবার কিছু নাই। কিন্তু পদত্যাগ প্রয়োজন হইলেও, আমি তাঁহাকে পদত্যাগ করিয়া একজন পাকিস্থানের সাধারণ নাগরিকরূপেই পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া হিন্দু জনসাধারণের সেবায় নিযুক্ত হইতে দেখিতে পাইলে সুখী হইতাম। যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার ও অসাম্প্রদায়িক গণতন্ত্রের অভাবের জন্য তিনি বেদনা বোধ করিয়াছেন বলিয়া বিবৃতিতে দেখিতেছি হিন্দু-মুসলমান সাধারণ যাহাতে তাহা যথাযথ উপলব্ধি করিতে পারে সেইজন্যই পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া তাঁহাকে যদি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত অথচ উগ্র সাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তির মুখামুখি হইতে হয় এবং যদি অপমান নির্যাতন সহ্য করিতে হয়, অন্যায় ভাবে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইতে হয়, এমন কি যদি কর্ত্তব্য করিতে গিয়া মৃত্যুবরণ করিতেও হয়, তাহাই অধিকতর কার্য্যকরী হইত, সুফল প্রদান করিত।"

সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পর্য্যুদস্ত করার আবশ্যকতা

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে বলেন যে, জাতীয়তাবাদী, যুক্তিবাদী ও ভারত-পাকিস্থান চুক্তির সমর্থকগণ যদি সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের অপচেষ্টা ব্যর্থ করিতে না পারেন তবে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে ঘোরতর বিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা। তিনি বলেন, "এ কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, দাঙ্গা বহুদিন যাবৎ থামিয়া গেলেও উভয় রাষ্ট্রে এখনও ঘোর সাম্প্রদায়িকতা বর্ত্তমান এবং তাহা ভারত ও পাকিস্থানের জাতি গঠনকার্য্যে নিদারুণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতেছে। উভয় রাষ্ট্রে ইহা এক আলোড়ন জাগাইয়া তুলিতেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের উস্কানিতে এই সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি এবং দেশবিভাগের পর উহা আরও প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই শ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতা ভারত পাকিস্থান চুক্তি সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইবে আমি ইহা আশা করি না। উভয় রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ যদি সরল ভাবে সাম্প্রদায়িক নীতি অনুসরণের বোকামি নিরর্থকতা ও উহার আত্মঘাতী স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তবে উহাকে নির্ম্মূল করিবার জন্য ব্যাপক ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং নেতা, কর্ম্মী ও অফিসারদের অক্লান্ত পরিশ্রম একান্ত আবশ্যক। কয়েকটি আন্তর্জ্জাতিক শক্তি উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মতভেদ ও তিক্ততা সৃষ্টিতে সহায়তা করিতেছে। সৌভাগ্যবশতঃ উভয় রাষ্ট্রের অধিকাংশ লোকের মাথা ঠাণ্ডা ছিল। তাহাদের মাথা খারাপ হইলে এবং তাহারা সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবে মত্ত হইলে উভয় রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের অল্প লোকেই রক্ষা পাইত। দুইটি রাষ্ট্রের উভয় সম্প্রদায়ের সৎ লোকেরা অসৎ লোকদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইলে অতি সহজেই সাম্প্রদায়িকতার বিলোপ ঘটিবে।"

শ্রীযুক্ত সেনের উক্তিতে অনেকখানি সত্য আছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা বিরোধীদের পক্ষে সফল হইবার প্রধান সহায় সর্ব্বাগ্রে পাকিস্থান সরকার কর্ত্তৃক সাম্প্রদায়িক মনোভাব বর্জ্জন। ঢাকা সেক্রেটারিয়েট হইতে প্রকৃত পক্ষে ফেব্রুয়ারীর দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছিল এবং যে সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারীর মধ্যে তীব্র সাম্প্রদায়িক মনোভাব দেখা দিয়াছিল তাহাদের সংখ্যা উপেক্ষণীয় নহে। ইহা পরিষ্কার দেখা গিয়াছে যে, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীরা সাম্প্রদায়িকতা নিবারণে আন্তরিকতার সহিত অগ্রণী হইলে অধিক সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারেন। বর্ত্তমান অবস্থাতেও ইহা অসম্ভব নহে, যদিও খুবই কঠিন। কিন্তু এই ধরণের কর্ম্মচারীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। শ্রীযুক্ত সেন প্রথম হইতে একই মনোভাব দেখাইয়া আসিতেছেন, অথচ তাঁহাকে নানা ভাবে লাঞ্ছিত ও বিপদ্‌গ্রস্ত করিবার মত সরকারী কর্ম্মচারীরও অভাব হয় নাই। সাম্প্রদায়িকতা পরিহার না করিলে সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধান অসম্ভব, কিন্তু তার জন্য সর্ব্বাগ্রে শাসনযন্ত্র এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত করিতে হইবে। পাকিস্থানও যদি ভারতের ন্যায় ধর্ম্মনিরপেক্ষ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয় তবেই উভয় রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতা দূর করা সহজ হইবে। পাশাপাশি দুই রাষ্ট্রের একের মেজরিটি ধর্ম্ম অপরের মাইনরিটি ধর্ম্ম হইলে এবং একটি ধর্ম্মনিরপেক্ষ ও অপরটি [illegible] সাম্প্রদায়িকতার বিষ থাকিয়াই

যাইবে। ভারত-পাকিস্থানের সাম্প্রদায়িকতার মূল এখন অনেক গভীরে নামিয়া গিয়াছে, উহা উৎপাটিত করিতে হইলে আরও অনেক গভীর ভাবে চিন্তা করিতে হইবে।

জর্জ্জ বার্নার্ড শ'

গত ১৬ই কার্ত্তিক পাশ্চাত্ত্য জগতের ভাববিপ্লবী চিন্তানায়ক জর্জ্জ বার্নার্ড শ' ৯৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। সমাজের শিক্ষকরূপে তিনি যে জীবনব্যাপী সাধনা করিয়া গিয়াছেন তাহার মাহাত্ম্য ও গৌরব যুগে যুগে অম্লান থাকিবে।

এই মনীষী প্রধানের বিচার করিবার অধিকার অতি অল্প-সংখ্যক লোকেরই আছে। কারণ তিনি জ্ঞানে অজ্ঞানে আমাদের চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। ইংরেজী-শিক্ষিত শ্রেণীসমূহের মাধ্যমে তাঁহার চিন্তাই আমাদের বাক্যাবলীতে রূপ গ্রহণ করে; ইহারা তাঁহার মানস-সন্তান, যেমন বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণী বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি।

বার্নার্ড শ' নিজেই সাহিত্যিক রীতি-নীতি সম্বন্ধে আমাদের জন্ত দিগ্‌দর্শন করিয়া গিয়াছেন। প্রথম জীবনেই তিনি সমাজের অব্যবস্থা-কুব্যবস্থার পরিচয় লাভ করেন। তাহাদের পরিশুদ্ধ করিবার জন্ত তিনি বন্দুক-কামান লইয়া অগ্রসর হন নাই; বর্ত্তমান জগতের চিন্তাধারার মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়া কার্ল মার্কস জগতের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহাই সহজ ইংরেজী ভাষায় বোধগম্য করিয়া তিনি যুগস্রষ্টার মর্য্যাদা লাভ করিয়া গিয়াছেন। মানুষের মনকে তিনি খোঁচা দিয়া জাগাইয়া তুলিয়াছেন। কারণ তাঁহার ভাষায় বলিতে হয়—যদি লোকের মনকে জাগাইতে হয় তবে তার সংস্কারকে আঘাত কর; যদি তোমার কিছু বলিবার থাকে তবে তীরের মত তীক্ষ্ণ করিয়া তাহা বল।

এই বিশ্বাসের প্রেরণায় বার্নার্ড শ' বর্ত্তমান যুগের জ্ঞান-বিশ্বাসকে আঘাত করিয়াছেন; আমাদের নানাবিধ সংস্কারের মধ্যে যে গোঁজামিল আছে, তাহা ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছেন; তার জন্ত বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। ইহাই হইল বার্নার্ড শ'-এর জীবনের ইতিহাস।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫ই কার্ত্তিক, বুধবার বাঙালী-জীবনের এক জন মরমী ব্যাখ্যাতা মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে মরজগৎ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। বাঙালী জাতির সহানুভূতি বিভূতি-ভূষণের পরিবার-পরিজনকে শান্তিদান করুক।

প্রবাসী-গোষ্ঠীর সঙ্গে বিভূতিভূষণের প্রাণের যোগ ছিল; এই গোষ্ঠীর সহায়তায় তাঁহার সাহিত্যসাধনা চরিতার্থতার পথে অগ্রসর হয়। বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' প্রবাসী মাঘ ১৩২৮ সংখ্যায় বাহির হয়। তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস 'অপরাজিত', 'দৃষ্টিপ্রদীপ' এবং 'আরণ্যক'ও প্রবাসীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া তাঁহার অন্যান্য বহু গল্পও ইহাতে পত্রস্থ হইয়াছে। প্রবাসীর সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথার স্বীকৃতি বিভূতিভূষণের দিন-পঞ্জীর মধ্যে আমরা দেখিতে পাই। ২৬শে জুলাই, ১৯২৯, শুক্রবার —"আজ প্রবাসীতে গিয়া বইটার ("পথের পাঁচালী") প্রথম কর্ম্মাটা ছাপা হয়েছে দেখে এলুম। সে হিসাবে আমার সাহিত্য-জীবনের আজ একটা স্মরণীয় দিন।..."

তখন হইতে ২১ বৎসরের মধ্যে বিভূতিভূষণ বাংলার সাহিত্যগগনে একজন দিক্‌পালরূপে বিরাজ করিয়াছেন। রবীন্দ্র-যুগে এই কীর্ত্তি অর্জ্জন করা সহজ ছিল না। কিন্তু নিজের প্রকৃতির প্রেরণায় তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আমাদের মনে-প্রাণে-চোখে দেশের গাছপালা, লতাপাতা, ফল-ফুল, দেশের পাখীর কাকলী তাঁহার ভাষার জালে ধরা দিয়া এক নূতন সৌন্দর্য্যলাভ করিল। বিভূতি-ভূষণ বুদ্ধির বা জ্ঞানের সাহায্যে এই অগম্য রাজ্যে পরিভ্রমণ করেন নাই; তিনি "হৃদয়" দিয়া প্রকৃতিকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং প্রকৃতি তাহার হৃদয় খুলিয়া দিয়াছিলেন এই মানব-শিশুর নিকট।

সেই কথা মনে করিয়া আজ শোকাকুল হৃদয়ে বিভূতি-ভূষণের বিদেহী আত্মার উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়

খ্যাতনামা যক্ষ্মা-চিকিৎসক ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় মেডিক্যাল কাউন্সিলের সভায় যোগদানের জন্ত মাদ্রাজ গিয়াছিলেন। সেখানে অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫৯ বৎসর হইয়াছিল। ডাঃ রায় যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের সেক্রেটারী, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। ১৯২২ সন হইতে তিনি এই কাজ করিতেছেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় যাদবপুর হাসপাতাল একটি পূর্ণাঙ্গ আধুনিক যক্ষ্মা হাসপাতালের মর্য্যাদা লাভ করিতে পারিয়াছে। মাত্র ৪টি কটেজ-বেড লইয়া হাসপাতালটি আরম্ভ হইয়াছিল, এখন উহার বেড সংখ্যা ৪৬০। কার্সিয়াং-এর ৪০ বেড-যুক্ত এস-বি-দে স্যানাটোরিয়াম তাঁহারই চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছে। ডাঃ রায় জাতীয় আয়ুর্ব্বিজ্ঞান পরিষদেরও প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী ছিলেন। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ এবং ন্যাশনাল ইনফারমারী ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট। বাংলাদেশে যক্ষ্মা চিকিৎসার উন্নতিতে ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়ের দান অতুলনীয়। শুধু যক্ষ্মা-চিকিৎসক হিসাবে নহে, এই দুরন্ত রোগের চিকিৎসার সংগঠনকর্ত্তা হিসাবে বাঙালীর মানসপটে তাঁহার নাম চিরদিন অঙ্কিত হইয়া রহিবে।

আর্টে সার্বিকতা বা ইউনিভার্স্যালিটি

অধ্যাপক শ্রীসুধীরকুমার নন্দী, এম-এ

আর্ট বলতে আমরা বুঝি আত্ম-অনুভূতিকে আত্মস্বতন্ত্র রূপে প্রত্যক্ষ করা। যে মন অনুভব করে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দকে, সেই মনই করে শিল্পের রচনা। শিল্পসৃষ্টির পিছনে জেগে থাকে শিল্পীর বহু বিনিদ্র রাতের সাধনা, বহু অনলস দিনের প্রয়াস। সত্যিকারের শিল্পবোধ সহজাত। একে ঘষে মেজে উজ্জ্বল করা যায় সত্য, কিন্তু যেখানে এর দৈন্য অনস্তিত্বের পর্যায়ে এসে ঠেকেছে সেখানে শিল্পের রসোপলব্ধি সম্ভব নয়। মূলতঃ শিল্পীর সাধনা হ'ল প্রকাশের অনন্ত প্রয়াস। তরুর জীবনে যেমন চলে ফুল ফোটাবার দুশ্চর তপস্যা, ঠিক তেমনি করেই শিল্পী-মন প্রকাশের পথ খোঁজে। হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন শিল্পী-মনে চমক লাগায়, অমনি ঘটে শিল্প-বোধের উদ্বোধন। যে মন উন্মুখ হয়ে আছে বন-বেতসের ক্ষীণতম নৃত্যছন্দে আত্ম-বিস্মরণের জন্য, উপলব্ধির পথে তার প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই বললেই চলে; তবে এটা সত্য তখন পর্যন্ত, যতক্ষণ শিল্পানন্দের অনুভব চলে অন্তরলোকে। বাইরের জগতে তাকে রূপাশ্রয়ী করবার তাগিদ এলেই সাধনার কথা ওঠে, শিল্প-মননের অনলস প্রয়াসের কথা আমরা চিন্তা করি।

আঁধার রাতে সাগর-সৈকতে ভেঙে পড়া ঢেউয়ের মাথায় যখন ফসফরাসের দ্যুতিমান আলো ক্ষণিক ঘর্ষণের উত্তেজনায় জ্বলে ওঠে তখন অনন্ত কালোর অবগুণ্ঠনের ফাঁকে ফাঁকে যে শুভ্র সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর বারে বারে আবির্ভাব ঘটে তাকে অকুণ্ঠ চিত্তে অভিবাদন জানায় মানুষের বিমুগ্ধ শিল্পী-মন। সে অন্তরশায়ী বিমুগ্ধতার উপলব্ধি ঘটে গ্যেটে বা রবীন্দ্রনাথের চিত্তলোকে আবার সাধারণ মানুষেরও অন্তরে। মানুষের বিরহী চিত্ত কাঁদে, অশ্রু-ধৌত হৃদয়-আকাশে দূর স্বর্গপুরীর সন্ধানও হয় ত মেলে, কিন্তু চিত্তের বহিরঙ্গনদ্বারের বাইরে এনে তাকে সবার সামনে মেলে ধরবার শক্তিটুকুই হ'ল শিল্পীর নিজস্ব সম্পদ। পরমের গীতি বহুবার ধ্বনিত হয়েছে সাধারণ মানুষের মনে; কিন্তু আমি যদি তাকে মনোলোকের বাইরে এনে বিশ্ব-মানবের গোচর না করতে পারি, তবে তা আমার একান্ত আপন বস্তু হয়ে রইল। কৃপণের অনুদার উপভোগে তার বিস্তৃতি ঘটল না সারা দেশের ঘাটে মাঠে। অশক্ত মনের বেড়া ডিঙিয়ে সে ধারার গতি হ'ল না সর্বত্রগামী। যে জল-রেখা সীমা-বিস্তৃতির আনন্দ-প্রাচুর্যে তটে তটে রচনা করতে পারত অগণ্য রসতীর্থ, সে রইল মনের অতলে ঘুমিয়ে। যে নির্ঝরের মধ্যে ছিল প্লাবনের সম্ভাবনা, তার স্বপ্নভঙ্গ ঘটল না। অখ্যাত মূক মিল্টনের দল প্রকাশের অভাবে সমাজে স্বীকৃতি পেলে না। এদেরও হয়ত ছিল কল্পনার উদাত্ত সঞ্চরণ, ছিল সৌন্দর্য-ভোগের অপরিসীম তন্ময়তা।

উপলব্ধির দৃষ্টিকেন্দ্র থেকে বিচার করলে আমি যে অসীম আনন্দ লাভ করলাম সুন্দরের অনুধ্যানে, তাকেই চরম বলে স্বীকার করব। নাই বা হ'ল আমার নিগূঢ় অনুভূতির বাইরে প্রকাশ, নাই বা অন্তরলক্ষ্মীকে সকলের সামনে মেলে ধরলাম আত্ম-বিজ্ঞাপনের মোহে। বাইরে প্রকাশ করার শক্তির বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করছি না। তার প্রকৃতি ভিন্ন। শুধু বলছি প্রকাশ-ক্ষমতাহীন শিল্পীও শিল্পী। যে শিল্পী কায়া দিলে না তার অনুভূতিকে, রূপ পেল না যার শিল্প-অনুভূতি, তাকে আমরা একেবারে অস্বীকার করব না। কারণ বাইরে কাগজে-কলমে বা ক্যানভাসের বুকে রূপ দেওয়া হ'ল আঙ্গিকের ব্যাপার। দার্শনিক ক্রোচে একে 'টেক্‌নিক' বলেছেন। এই টেক্‌নিকের সাহায্যে আত্ম-অনুভূতিকে বিশ্বের রসিক জনের দরবারে হাজির করা হয়, এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য। তবে এই প্রকাশ-শক্তিহীন শিল্পীর দল যে কাব্যানন্দের আস্বাদন করে তা কোন অংশে কম নয়। সুন্দরের সামনে নতজানু হয়ে এরা গোপনে যে অর্ঘ্য রচনা করে তার মূল্য অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ বুঝি এই ধরণের শিল্পীমনের আত্মকথাই ব্যক্ত করেছেন :

> "সঙ্গীত তরঙ্গধ্বনি উঠিবে গুঞ্জরি
> সমস্ত জীবন ব্যাপি থর থর করি।
> নাই বা বুঝিনু কিছু নাই বা বলিনু
> নাই বা গাঁথিনু গান, নাই বা চলিনু
> ছন্দোবদ্ধ পথে, সলজ্জ হৃদয়খানি
> টানিয়া বাহিরে। শুধু ভুলে গিয়ে বাণী
> কাঁপিব সঙ্গীতভরে, নক্ষত্রের প্রায়
> শিহরি জ্বলিব শুধু কম্পিত শিখায়।...
>
> [মানসসুন্দরী]

আবার মন যেখানে প্রকাশের সাধনা করেছে, শিখেছে কেমন করে ব্যক্তিগত আনন্দকে ছড়িয়ে দিতে হয় বিশ্বভুবনে সেই পেয়েছে আত্মপ্রকাশের বিমল আনন্দের আস্বাদ, যাকে আমরা প্রতিভা বলি, সেখানে আমার আনন্দ আর আমার

রইল না—সে হ'ল বিশ্বমানবের। সেখানে সম্ভব হ'ল বীটোফেনের 'মুনলাইট সোনাটা'র মত অপূর্ব সুর-সম্পদের সৃষ্টি। শিল্পীর মন যেন ক্যামেরা। খোলা চোখ দিয়ে শুধু দেখা যায়। আরও দশ জনকে দেখাতে হলে ক্যামেরার সাহায্য না নিলে চলে না। শিল্পীর প্রতিভা হ'ল এই ক্যামেরার ভিতরের কলকব্জা। কেমন করে উল্টোপাল্টা রীতিপদ্ধতির মাধ্যমে সুন্দর ছবিখানি পাই তা আমরা জানি না। প্রতিভার জারকরসে জারিত হয়ে কেমন করে অতিপরিচয়ের মরচে-ধরা বস্তু-জীবন স্বপ্নলোকের স্বর্ণাভায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তা আমাদের অজ্ঞাত। প্রতিভার ইন্দ্রজালস্পর্শে কেমন করে মরামানুষের শুকনো মাথার খুলি হয়ে ওঠে সদ্যফোটা হাস-নু-হানার গুচ্ছ, তা আমাদের অজানা থাকলেও, তার স্বীকৃতিকে খর্ব করে না আমাদের এই অজ্ঞতা। হঠাৎ কখন আপন গোপন ঘরের আগল খুলে প্রতিভা এসে ছুঁয়ে গেল বস্তু-জীবনের আবেদনকে, তা আমরা সঠিক বলতে পারি না, তবে তার গোপন অভিসারকে মানি। এই মানার মধ্যেই রয়ে গেল শিল্পলোকে প্রতিভার দ্বন্দ্বহীন স্বীকৃতি।

এবার বলি 'ইউনিভার্সালিটি'র কথা। এই শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে গ্রহণ করছি 'সর্বজন-অধিগম্যতা'কে। শিল্প হবে বিশ্বমানবের অধিগম্য। এ হ'ল অতি সাধারণ কথা। এর মধ্যে জটিলতা নেই। দেশ এবং কালের সীমা ছাড়িয়ে শিল্পের আবেদন পৌঁছুবে সর্বত্র। এদেশের কবি যে বিরহ-মিলনের কাহিনী বলবে তার বুকের রঙে রাঙিয়ে, তাকে অভিনন্দিত করবে ওদেশের মানুষ অশ্রুর অর্ঘ্য দিয়ে। এই ইউনিভার্স্যালিটির ধারণা শিল্প-ধারণার সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে মিশে আছে। শিল্প-ধারণাকে বিশ্লেষণ করলেই আমরা এই ইউনিভার্সালিটির ধারণা পাই। "শিল্প হ'ল সর্বজন-অধিগম্য"—একে আমরা 'এনালিটিক জাজমেণ্ট' বলতে পারি মহাদার্শনিক কাণ্টের ভাষায় (*Critique of Pure Reason* দ্রষ্টব্য)। যদি শিল্পকে 'উদ্দেশ্য' বলি তবে 'সর্বজন-অধিগম্য' হবে তার 'বিধেয়' এবং এই বিধেয়ের ধারণা উদ্দেশ্যের মধ্যেই নিহিত আছে।

আমরা শিল্পকে ইউনিভার্স্যাল বলি এবং সহজেই স্বীকার করে নিই যে, রসোত্তীর্ণ হয়েছে যে শিল্প তার আবেদন পৌঁছুবে সকল মানুষের মনের মণি-কোঠায়। এ তত্ত্ব যদি এতই স্বচ্ছ, তবে আর্টে ইউনিভার্স্যালিটির প্রশ্নে এত জটিলতা আসে কেন? সমস্যাটা যদি এতই সহজ হয় তবে রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবির মুখে কেন শুনি এই কথা যে তাঁর কবিতা সর্বত্রগামী হয় নি। কেন তিনি তাঁর পরে যে কবি আসবেন, গাঁথবেন নূতন কথার মালা, আঁকবেন নূতন ধরণের ছবি, 'সে কবির বাণী লাগি' কান পেতে থাকেন? কেনই বা দশকার হয় একই বিষয়বস্তু নিয়ে ফিরে ফিরে গান গাওয়া? যে কথা বলেছেন পূর্ব-সূরীরা, সেই কথাই নূতন ছন্দে, নূতন-শৈলীতে পরিবেশন করলেন এ যুগের শিল্পী। তার জন্য ত তিনি অপাংক্তেয় হয়ে থাকেন না। পুরাতন, বহু-কথিত বিষয়বস্তুর জন্য তাঁর শিল্প অস্বীকৃতির অপমানে লাঞ্ছিত হয় না।

আবার নূতন কথা, নবতম সমস্যা নিয়ে শিল্প-রচনা করেও শিল্পী স্বীকৃতির মর্যাদা পান না। এমনটা কেন হয়? কোথায় ঘটে রসাভাস? আমাদের বিচার করতে হবে কোথায় ত্রুটি ঘটলে রসের উৎস যায় শুকিয়ে। আবার শিল্প রসোত্তীর্ণ হলেও তা কি সকলে বোঝে? বর্ষার গান শুনে সকলের মনেই কি বর্ষা নামে? আধুনিক বাংলা কবিতা পড়ে বুদ্ধিজীবী সমস্ত বাঙালী পাঠকই তার রস-গ্রহণ করতে পারে কি? এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, সকল সমাজেই অন্ততঃ কয়েকজন থাকেন যাঁরা না-বোঝার আনন্দেও মেতে ওঠেন। এঁরাই হলেন আমাদের সমস্যার মূল। প্রশ্নটা এখানেই ওঠে যে শিল্পের সাফল্য কি তবে রসবেত্তার শিক্ষাদীক্ষা ও মনন-রীতির উপর নির্ভর করে?

এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, শিল্প-জগতের অনেক মহারথীই আজ 'ক্লাসিক' হয়ে গেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর এমন অনেক খ্যাতনামা কবি আছেন যাঁদের কবিতা আজ আর আমাদের অনেককে তেমন আনন্দ দিতে পারে না। সে যুগের 'এপিক' পড়ে আধুনিক অনেক পাঠকের মনে সাড়া দেয় না অধিকাংশ সময়েই। আবার হয়ত কারুর বিচারে দুর্বোধ্যতার ধার ঘেঁষা আধুনিক কবিতাগুলি অনবদ্য। আপনার মন হয়ত অনুভূতির সহজতাকে ছাড়িয়ে উঠে গেছে শুষ্ক বুদ্ধির অনুর্বর লোকে, তাই আপনার ভাল লাগে এই ধরণের কাব্যকে। আমার যা ভাল লাগে তাকে ইউনিভার্স্যাল বলা চলে না আপনার তা না-ভাল-লাগার জন্য, আবার আপনার যা ভাল লাগে তাকে গ্রহণ করা চলে না ইউনিভার্স্যাল বলে, কারণ আমি সেটা অনুমোদন করি না।

আপনি এবং আমি উভয়েই গোষ্ঠীপতি। আমাদের একই ধরণের চিন্তাজগতে বহু লোকই আছেন যাঁদের অনায়াসে খুঁজে বার করা যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে অভিধানগত অর্থে কোন কাব্য বা শিল্পই ইউনিভার্স্যাল নয়। আপনি হয়ত সেক্সপীয়র পড়ে যে আনন্দ পান, বাবু মুচিরাম গুড় হয়ত সে রসে বঞ্চিত। অবনীন্দ্রনাথের ছবিগুলি আমার বেশ ভাল লাগে; আবার রবীন্দ্রনাথের

অনেক ছবিই বুঝি না। কবির ব্যঞ্জনাবহুল ছবির প্রদর্শনী দেখে ফরাসী দেশের লোকেরা খুশি হয়েছিল, অঙ্কনশিল্পী হিসাবে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দিগ্বিদিকে। আমাদের এই ভাল-লাগা, এই খুশি হওয়া, এটাই শিল্পীর চরম পুরস্কার। এই ভাল-লাগা আবার নির্ভর করে রসবেত্তার রুচির উপর।

মানুষের রুচি ভিন্নধর্মী। শিক্ষা, দীক্ষা ও পরিবেশ মানুষের রুচিকে গড়ে তোলে, তার মনোধর্মকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়। শিল্প আবার এই মনের কাছেই দরবার করে। তাই কোন শিল্পই সর্বজন-অধিগম্য হতে পারে না। শিল্প-সৌধের বিশেষ বিশেষ কারুকার্য বিশেষ বিশেষ মনে সাড়া তোলে। কেউ হয়ত সৌধের বিরাটত্বে মুগ্ধ হয়। কেউ আবার খুশি হয়ে ওঠে খিলানের উপরের মিনে-করা কারু-কার্য দেখে। যে অর্থে আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন ইউনিভার্স্যাল, সে অর্থে আর্ট ইউনিভার্স্যাল নয়। শিল্প-বস্তুর আবেদন শিল্প-বোদ্ধার রসবোধের উপরে নির্ভরশীল, একথা আগেই বলেছি। একজন খাঁটি বৈষ্ণব যে ভাবে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে সারা অন্তরকে উন্মুখ করে উপভোগ করেন কৃষ্ণ-প্রেমলীলার একটি উপাখ্যানকে, ঠিক তেমনই করে সে কাব্য-কাহিনীর রস গ্রহণ করবার শক্তি সাধারণ পাঠকের নেই! ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে বৈষ্ণব-সাহিত্যের সাহিত্যাতীত একটা মূল্য আছে। তাঁর কাছে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার কাহিনী রসমাধুর্যে অনুপম। আমরা সে রসে বঞ্চিত। উদাহরণ দিই:—

> পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
> অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।
> না সো রমণ, না হাম রমণী
> দুঁহ মন মনোভব পেশল জানি।
> এ সখি! সে সব প্রেমকাহিনী।
> কানুঠামে কহবি, বিছুরহ জানি।
> না খোজলুঁ দূতী, না খোজলুঁ আন
> দুঁহ কেরি মিলনে মধ্যত পাঁচ বাণ।
> অব সোই বিরাগ, তুঁহ ভেলি দূতী।
> সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি।

অর্থাৎ, কলহান্তরিতা রাধা দূতীতে বললেন 'দূতি! কৃষ্ণকে বলো যে আমাদের মনে নয়নভঙ্গী দ্বারা সৃষ্ট পূর্বরাগ ক্রমেই সীমাহীন বিস্তৃতি লাভ করেছিল। যদিও পত্নী-পতির বন্ধনে আমরা আবদ্ধ নই তবুও কন্দর্প আমাদের দুটি মনকে নিবিড় ঐক্যে এক করে দিয়েছিল। আমাদের মিলনের দূত ছিল স্বয়ং পঞ্চবাণ মদন। আর আজ কৃষ্ণ বীতরাগ হওয়ায় তোমাকে দূতীরূপে মধ্যস্থতা করতে হচ্ছে। সুপুরুষের প্রেমের রীতি এমনই হয়।' এ কবিতার আবেদন আমাদের কাছে সাহিত্যমূল্য দাবি করে আর ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে বিকায় ভক্তিমূল্যে। যিনি ভক্ত, যিনি মধুর রসের রসিক, তাঁর কাছে এই কয়েক ছত্রের মূল্য ভক্তির দিক দিয়ে অপরিসীম। তাঁর দৃষ্টি দিয়ে রসবিচার করতে পারি না বলেই তাঁর অনুভূতির গভীরতা আমাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যায়। তাই বলছিলাম শিল্প-সুরের ধ্বনি বিভিন্ন মনে বিভিন্ন ধরণের প্রতিধ্বনি তোলে। কোথাও হয়ত আবার কোনও সাড়াই জাগল না। রসবেত্তার আবেগ-প্রবণতা, মননধর্ম ও রুচির উপরে শিল্পের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে, এ কথা আবার বলছি।

হয়ত কোন কোন সমালোচক বলবেন যে, আর্টের ইউনিভার্স্যালিটিকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করলে আর্টের প্রকৃতিকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। কিন্তু এ ছাড়া পথ নেই। মানুষের অনুভূতি-লোকে শিল্পের আবেদন গিয়ে পৌঁছয়। সে যে বুদ্ধির দ্বারে ভুলেও যায় না এ কথা আমি বলছি না। বুদ্ধিই বলুন বা অনুভূতিই বলুন, তা ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি। এমন নিরালম্ব বা প্রত্যক্ (abstract) বুদ্ধি অথবা অনুভূতি নেই, যাকে আশ্রয় করে শিল্প বাঁচতে পারে। তাই ব্যক্তিবিশেষের মনে যে সাড়া জাগে, তারই উপর শিল্পের সাফল্য নির্ভর না করে পারে না। যদি কেউ আপত্তি তোলেন এই বলে যে, শিল্পের মূল্যকে সম্পূর্ণরূপে বোদ্ধার রসবোধের উপরে নির্ভরশীল করলে আর্টের অনাত্ম (objective) মূল্য অনেকখানি কমে যাবে। শুদ্ধমাত্র 'সাবজেকটিভ' বা ব্যক্তিনির্ভর হলে শিল্পের অপমৃত্যু ঘটবে। এই আপত্তির উত্তরে আমরা অধ্যাপক কলিংউডের কথায় বলব যে, শিল্পমূল্য সব সময় নির্ণীত হয় ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা ['*The Principles of Art*' দ্রষ্টব্য]। ব্যক্তি না থাকলে শিল্প থাকে না। আমি গোলাপের দিকে চেয়ে তাকে সুন্দর বলেছি, তাই সে সুন্দর হয়েছে। আমি চোখ মেলেছি বলেই পূবে-পশ্চিমে আলো জলে উঠেছে। যাঁরা শিল্পে বা আর্টে এই 'subjectivity'কে অস্বীকার করেন— তাঁদের ধারণা স্বতন্ত্র।

তা হলে আমরা দেখলাম আর্টের ক্ষেত্রে 'ইউনিভার্স্যালিটি' কথাটির অর্থ বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। শিল্পের আবেদন সর্বশ্রেণীতে পৌঁছুতে পারে। বুর্জোয়া শিল্প বা প্রলেটারিয়েট শিল্প বলে কিছু নেই। কোন শিল্পের আবেদনই সমগ্র শ্রেণীমানসের কাছে পৌঁছয় না। অর্থাৎ এক শ্রেণীর সমস্ত মানুষই কোন বিশেষ শিল্পের রস গ্রহণ করতে পারবে, এ কথা মোটেই যুক্তিসহ বলে মনে হয় না। শিল্পীর সমসাময়িক কোন মানুষই হয়ত তাঁর শিল্পকে বুঝতে পারল না। তাই শিল্পীর জীবনে হয়ত এল না

কোন রসবেত্তার কাছ থেকে সানন্দ স্বীকৃতির অভিনন্দন। কিন্তু তার পরের যুগের এক রসজ্ঞ সমালোচক হয়ত খুঁজে বার করলেন এই অখ্যাত শিল্পীকে। এ ত মানব-ইতিহাসের অতিপরিচিত ঘটনা। হয়ত হাজার বছর আগে এক অখ্যাত শিল্পীর হাতে শিলাগাত্রে যে ছবি ফুটে উঠেছিল, তাকে মর্যাদা দিলে এ যুগের মানুষ। তবে এ যুগের সবাই যে তাকে বুঝবে এ কথা আমি বলছি না। সকল শিল্প বা আর্ট সবার জন্য নয়। এখানে অধিকারভেদ মানতেই হবে। রোঁমা রোলাঁ্যা ঠিক এই কথাই বলেছেন: "**Art is not the Ren-dez-vous for all**" (*John Chaittopher*, *Vol, III*)। শিল্পের ক্ষেত্রে অধিকারীর প্রবেশাধিকার আছে, সকলের তা নেই। যিনি সাধনা করেছেন শিল্প-সৃষ্টির জন্য আর যিনি করেছেন রসোপলব্ধির সাধনা, তাঁরা দু'জনে একই 'কোটির' মানুষ। পূর্ণ রসোপলব্ধির জন্য সাধন-মননের প্রয়োজন হয় ঠিক যেমনটি হয় সত্যিকারের শিল্প সৃষ্টি করতে হলে।

সেক্সপীয়রকে পুরোপুরি বুঝতে হলে তাঁর মননধর্মী এক অনন্যসাধারণ মানুষের দরকার যাঁর জীবনে আছে সেক্সপীয়রের মত দুরূহ তপস্যা আর অন্তহীন রসবোধ—তিনিই পাবেন সেক্সপীয়রের রসলোকে সঞ্চরণের অবাধ অধিকার। সে লোকে সাধারণ মানুষের থাকবে শুধু খুঁড়িয়ে চলার অধিকারটুকু। আবার অনেকের পক্ষে হয়ত সে জগৎ হবে নিষিদ্ধ ভূমি। তাঁদের জীবনে রসের সাধনা নেই, সৃষ্টির তপস্যা নেই, তাই শিল্পলোকের অমৃত থেকে তাঁরা বঞ্চিত হবেন। আমাদের দেশের এ যুগের মানুষের কথাই বলি। আমরা আজও গ্রীক ভাস্কর্য দেখে মুগ্ধ হই। হোমারের কাব্য আজও আমাদের আনন্দ দেয়। ডান্টে, ভার্জিল আজও আমাদের মুগ্ধ করে। অনেক প্রাচীন শিল্পীই আজও দীপক তানে আমাদের মনে আগুন জ্বালায়; আবার তাদের মল্লার সুরে বর্ষা নামে। দেশ-কালের ব্যবধান শিল্পের আবেদনকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আর্টের আবেদনের 'ইউনিভার্স্যালিটি' স্থান-কাল নিরপেক্ষ। কোন এক দেশের বা কোন এক কালের সমস্ত মানুষকে আনন্দ দিতে না পারলেও সত্যিকারের শিল্পসৃষ্টি রসবেত্তা মানুষকে চিরকালই আনন্দ দেবে, সে যে কোন দেশেরই হোক না কেন। এই অর্থেই আর্ট বা শিল্প ইউনিভার্স্যাল বা সার্বলৌকিক। এখানেই শিল্পীর এবং শিল্পের চরম সার্থকতা।

বাঙালী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আমরা বাঙালী, হয় ত বা বটি দূষী,
নিন্দাটা জানি করে যার যত খুশী।
'মেকলে' করিয়া বিষের কুম্ভ খালি,
সাধ মিটাইয়া আমাদিকে দিল গালি।
'কার্জ্জন' হতে মার্কিনী 'মিস্ মেয়ো',
গালাগালি দিতে কসুর করে নি কেহ।
ডাকুক মশা ও লাগুক যতই মাছি,
যেমন ছিলাম—তেমনি আমরা আছি।

২

ক'টা সেনা লয়ে খিলিজি 'বক্তিয়ার'—
শুনেছি এ দেশ করেছিল অধিকার।
'ক্লাইভ' কয়টা ফাঁকা গোলাগুলি ছাড়ি'
হেলায় নবাবী মসনদ নিল কাড়ি'।
নবাবে বধিতে, করিতে জাতির ক্ষতি,
সবেগে হাজির হইল 'মহম্মদী'।
'মিরজাফরে'র বাড়িল কমিল দর,
ছিলাজরেক এলো মন্বন্তর।

৩

সিরাজী শাসনে বাঙালী হইয়া দেক্
ইংরেজ-রাজে করে নিল অভিষেক।
ভারত-বিজয় করিতে হল না দেরী,
বাঙালী বাজালো বৃটিশের জয়-ভেরী।
প্রতীচ্যের যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান,
লয়েছে বাঙালী আগে হয়ে আগুয়ান।
বাঙালী মনীষা অপ্রতিহত গতি—
সতত সেধেছে ভারতের উন্নতি।

৪

ইংরেজ যবে ত্যজিল ন্যায়ের পথ,
নিরপেক্ষতা লুকালো স্বপ্নবৎ,
দিল সত্য ও যুক্তিকে উপহাসি',
কুবিচারে যবে 'নন্দকুমারে'র ফাঁসি,
স্বেচ্ছাচারের সাথে যবে নিপীড়ন—
রাজলক্ষ্মীরে করিল আলিঙ্গন,
জানালো বাঙালী স্পষ্ট সত্য ভাবে
ঘুণ লাগিয়াছে তোমাদের কাঁচা বাঁশে।

এলো দুর্দ্দিন, এলো সন্ত্রাসবাদ,
বিকট দণ্ড, উদ্ভট অপরাধ।
যুধিষ্ঠিরের উষ্ণ শোণিতবৎ
বাঙালী রক্ত রঞ্জিল এ ভারত।
বাঙালী তরুণ ঝাঁকে ঝাঁকে দিল প্রাণ,
আকাশ-বাতাস মাতালো তাদের গান।
বাঙালী দেখিল সজল উজল আঁখি—
তিমিরে ডুবিছে বৃটিশের রাঙা চাকি।

৬

নামিল বাঙালী কল্পনালোক থেকে,
জ্যোতির্ম্ময়ের আলোক-আবীর মেখে।
দুর্দ্দমনীয় মানে না সে আর মানা—
হানাদার ঘরে দেবেই দেবে সে হানা।
যাহারা হরেছে করেছে অত্যাচার
প্রায়শ্চিত্ত হল আরম্ভ তার।
যে যেথায় আছে কীচক দুঃশাসন
এলো তাহাদের শোণিতের তর্পণ।

৭

বাঙালী কপিল সগরবংশ দহি'
সুন্দর করে গড়িতে চাহে এ মহী।
সাগর তাহারি, গঙ্গাসাগর তারি,
পরশুরামের উগ্র পরশুধারী।
তার 'করতোয়া' তাহার 'চন্দ্রনাথ'
হয়েছে তাহার কামাখ্যা-সাক্ষাৎ
ভগীরথ তারে দিয়াছেন তপোবল
নব গঙ্গারে টানিছে সে অবিরল।

৮

বাঙালী দিয়াছে ভারতকে সেরা কবি,
বাঙালী দিয়াছে ভারতকে সেরা ছবি,
বাঙালী দিয়াছে দরদী বৈজ্ঞানিক,
বীর সন্ন্যাসী, বাগ্মী অলৌকিক,
দেছে অনশনে দৃঢ়পণে তনুত্যাগী,
দেশবন্ধু ও জেতা নেতা অনুরাগী,
বাঙালী ঘটালে অঘটন ধরা-গায়,
অদল বদল পূজারী ও দেবতায়।

৯

সোনার বাংলা ঘেরা মহাপীঠ দিয়ে
বেড়েছে বাঙালী সতীর স্তন্য পিয়ে,
শব-সাধনায় করেছে সিদ্ধিলাভ
হেরেছে 'কমলে কামিনী' আবির্ভাব।
বাঙালী প্রেমিক রসের ব্যবসা করে,
গৌর করেছে সেই শ্যামসুন্দরে।
তার ভজনের ক'জন নাগাল পাবে?
কাঁদিয়া আকুল পুরুষ-প্রকৃতি-ভাবে।

১০

পৃথক ধাতুতে গঠিত এদের হিয়া
বজ্র এবং ব্রজের নবনী দিয়া।
বিজয়ায় এরা কাঁদিয়া ফোলায় আঁখি
করুণ কোমল হেন জাতি আছে নাকি?
জগৎকে এরা আপন করিতে চায়
মুখের অন্ন পরকে বিলায়ে খায়।
করিবে বাঙালী ভুবন কান্তি মৎ
অকুৎসিত আর শুদ্ধ শান্ত সৎ।

১১

'এটম বম্' কি লয়ে 'কস্‌মিক রে'
সৃষ্টির নাশ করিতে আসে নি সে।
দেশ কালজয়ী তাহার আবিষ্কার
ঘুচাইয়া দিবে বিশ্বের জরাভার।
বাঙালীর ভাষা মুগ্ধ করিবে ধরা
জীবনীশক্তি ভরা সে মধুক্ষরা।
সুসভ্যতর হইবে জগৎ যবে
বাংলাভাষায় মন্ত্র রচিত হবে।

১২

শ্রীগৌরাঙ্গ গঙ্গার এই দেশ
নবচেতনার করিয়াছে উন্মেষ,
বাঙালী জাতিই বাঁচাইবে এ ভুবন
রণমুখী নয়—হরিমুখী করি মন।
সুধাসত্রের সেই অধিকারী ভাবী
সারা ধরণীর গুরুপদে তার দাবী।
ভালে দাও তার প্রথম হোমের টিকা,
গানে উষ্ণতা সাঁজের দীপের শিখা।

অমূর্ত্ত ইঙ্গিত

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

মহিম বলছিল :

অজানাকে জানার সাধনাই হ'ল জীবনের ধর্ম্ম। যাকে অল্প জেনেছি তাকে বেশী করে জানবার কৌতূহল যেমন স্বাভাবিক, তেমনি যে জগৎ-রহস্য প্রত্যক্ষ ও পুঁথিতে কিছু কিছু উদ্ঘাটিত হচ্ছে তাকে জ্ঞানের ক্ষুধা আত্মসাৎ করছে—আরও জানবার আগ্রহে আমরা দুষ্কর তপস্যা করে চলেছি। এই ধরণের একটি দুষ্কর তপস্যা প্রেত-চক্রের মারফত সুরু হয়েছে বহুকাল থেকে। সূক্ষ্মদেহীর জগতে হানা দিয়ে তাদের রীতিনীতি আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি জানবার বাসনাই শুধু নয়—আমাদের মৃত প্রিয়-পরিজনদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা চলে তার সঙ্গে। সাদা কথায় বলতে গেলে—আমার ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে সেইটি জেনে ভরসা আনা মনের মধ্যে। পরলোক মানি না বললেই কৌতূহল নিবৃত্ত হয় না—সূক্ষ্ম একটি 'যদি'র সূত্রে সে কৌতূহল যুক্তিগুলিকে দোলাতে থাকে। যুক্তিবহির্ভূতকে জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করতে নিয়তই চেষ্টা করছি আমরা।

এক দিন এই প্রেত-চক্রের সভ্য হয়ে পড়লাম। ঠিক প্রিয়-পরিজন বিয়োগ-বেদনা ভুলতে বা পরলোকের তত্ত্ব জানতে এর সভ্য হই নি—ইহজগতের একটি রহস্যের সমাধান এই চক্রের মারফত হতে পারে কিনা এই কৌতূহল নিয়েই এলাম এখানে। একটু আগে থেকে আরম্ভ করি গল্পটা।

১

তোমরা তো জান—উত্তরাধিকারসূত্রে বাবা পেয়েছিলেন কলকাতায় খান দুই বাড়ী ও গ্রামাঞ্চলে বেশ কিছু ধানী জমি। সে জমি দু'চারশো বিঘের কম নয়। ঠিক বলতে পারব না এইজন্য যে, বাবার সঙ্গে কোন দিন সে জমি দেখতে যাই নি—বাবাও হয় তো জানতেন না তার সীমা-চৌহদ্দি। দলিল-দস্তাবেজ পরচা-দাখিলায় কোন কোনটার নির্দ্দেশ ছিল। প্রজাবিলির ব্যাপার—কতক ছিল বসতভূমি—কতক বা চাষের ক্ষেত বর্গাদারের হাতে—ভাগে চাষ হ'ত—আধাআধি ফসলের বন্দোবস্ত। বাবা ছিলেন একমাত্র সন্তান—কাজেই জমির বা বাড়ীর ভাগ নিয়ে কেউ গোলযোগ বাধাবে এ সন্দেহ তাঁর মনেই হয় নি। অবশ্য আমাদের দূরসম্পর্কের জনকয়েক আত্মীয় ছিলেন—তাঁরা থাকতেন কলকাতার বড় বাড়ীটায় মাস মাস ভাড়া দিয়ে। আর ছোট বাড়ীটায় থাকতো এক-জন নিঃসম্পর্কীয় ভাড়াটে। আত্মীয়দের মধ্যে একজন ভাড়ার টাকা আদায় করে পাঠিয়ে দিতেন কখনও সিমলের—কখনও বা দিল্লীতে। লাটদপ্তরে বড় চাকুরে ছিলেন বাবা—ত্রিশ বছর বাংলাদেশ ছাড়া। মাঝে একবার বাংলায় এসে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন—সেই থেকে এ দেশের জলহাওয়াকে প্রীতির চক্ষে দেখতেন না।

আমার কাছে বাংলাদেশ প্রথমটা ছিল কৌতূহলের বস্তু—পরে আত্মীয়তার সূত্রেও মনকে টেনেছিল। দিল্লী-সিমলার দোটানায় পড়ে পড়াশুনা আমার ভাল হচ্ছে না দেখে বাবার এক অধ্যাপক-বন্ধু তাঁর তত্ত্বাবধানে আমাকে কলকাতায় রাখেন ও প্রেসিডেন্সিতে ভর্ত্তি করিয়ে দেন।

যাই হোক—এই ভাবে চারটি বছর কেটে যাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়েছি যে সময় তখন জীবনে এল বিপর্য্যয়। সিমলা থেকে জরুরি তার এল :—বাবা পীড়িত, শীঘ্র এস।

সিমলায় পৌছে দেখি অবস্থা গুরুতর। বাক্‌রুদ্ধ রোগী শুধু আমাকে দেখবার আশায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন নি। আমাকে দেখে তাঁর দু'চোখ জলে ভরে গেল। কিছু বলবার প্রয়াসে ঠোঁট দুখানি থর থর করে কাঁপতে লাগল—একখানি হাত উঠিয়ে কি ইসারা করলেন। ঘরের দেওয়ালে গাঁথা একটা লোহার আলমারি ছিল, তার দিকে হাতখানি একবার মেলে ধরলেন। সেই প্রয়াসে হাতখানা কাঁপতে কাঁপতে বালিশের উপর পড়ে গেল। ডাক্তার আমাকে ইসারা করলেন সেখান থেকে উঠে যেতে।

সেই দিনই বাবা মারা গেলেন।

শোকের তীব্রতা কিছু হ্রাস পেলে ভাবতে লাগলাম—কি এমন কথা যা বলবার জন্য মৃত্যুপথযাত্রীর অমন ব্যাকুলতা? কি সে রহস্য? আলমারিটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম—কোন রহস্যের সমাধান হ'ল না। সেটা বইয়ে ভর্ত্তি। মোটা মোটা বই—দর্শন বিজ্ঞানের—তার সঙ্গে সাহিত্য ও সমাজনীতির। তিনি কি ইঙ্গিতে আমাকে জানালেন—ওই জ্ঞানসমুদ্রের অতল থেকে মণিমুক্তা আহরণ করতে? কিন্তু উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে, আমি যদি জ্ঞানসাধক হই তো ওগুলি হবে আমার আদরের বস্তু—আর জ্ঞানপিপাসা না থাকলে বদ্ধ আলমারির আশ্রয়ে ওগুলি যাবে উই ইঁদুর পোকার পরিপুষ্টিতে—এ কি তিনি জানতেন না? অনুরোধে ঢেঁকি গেলার মতই জ্ঞান গলাধঃকরণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। ভাবাবেগবশতঃ প্রতিশ্রুত হলেও কেউ তা পালন করতে পারে না। মনের সংযোজনায় জ্ঞানের বর্ত্তিকার শিখাটি উজ্জ্বল হতে থাকে। মৃত মন তৈলহীন প্রদীপের মতই—মাত্র ঘরের শোভা বর্দ্ধন করে—তিমির হরণের দায়িত্ব তার নয়—সে সামর্থ্যও তার থাকে না। এমনি করে বহুদিন ভেবেছি—কূল-কিনারা পাই নি। তার পর কলকাতায় চলে এলাম।

এক দিন আমার পিতৃবন্ধু অধ্যাপক বললেন, মহিম—তোমার বাবার বিষয়সম্পত্তি কোথায় কি ভাবে আছে জেনেছ?

না।

কোন দলিলপত্র পাও নি?

না। উত্তর দিয়েই মনে হ'ল—তবে কি ইঙ্গিতে আলমারিটা দেখিয়ে বাবা দলিলপত্রেরই নির্দ্দেশ দিয়ে গেছেন? কিন্তু কোথায় দলিলপত্র? সিমলায় পাই নি, দিল্লীর বাড়ীতেও না। ছেলেবেলা থেকে আমি মাতৃহারা—আর কোন ভাইবোন আমার ছিল না—বাবার কাছেও কোন রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন না—চাকর ও 'মহারাজে'র জিম্মায় ওসব জরুরি নথিপত্র রেখে দেওয়ার কথা নয়।

তোমার আত্মীয়দের জিজ্ঞাসা করেছ?

না।

আচ্ছা এক দিন বাদুড় বাগানে গিয়ে তোমার ভাড়াটে বাড়ীর যে সব আত্মীয় আছেন তাঁদের কাছে সব জেনে এস। বল ত তোমার সঙ্গে যেতে পারি।

না—আমিই পারব।

সেখানকার আবহাওয়া বেশ উষ্ণ বলেই বোধ হ'ল। তাঁদের কাছে শুনলাম—বাবা নাকি ওদের একবিন্দুও বিশ্বাস করতেন না। তিনি ছিলেন ম্লেচ্ছভাবাপন্ন—উন্মার্গ-গামী। এই সম্পত্তি ঠিক তাঁর একার নয়—শরিকানি। যে ক'ঘর এখানে আছেন সবাই এর অংশীদার। নিজের হিস্যা বুঝে নিতে গেলে—আদালতের আশ্রয় নিতেই হবে। ভাড়া হিসাবে যে টাকাটা পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত ওটা ঠিক এই বাড়ীটার ভাড়া নয়—আর একখানা বাড়ী ছিল তারই ভাড়া। তা সে বাড়ীটাও বছরখানেক আগে বিক্রী হয়ে গেছে।

বুঝলাম আইনের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু কি দিয়ে প্রমাণ করব—এই বাড়ীটি ভাগের নয়—আমার নিজস্ব সম্পত্তি! বাড়ী-ভাড়ার বিল নেই কাইলে। কয়েকটা মনিঅর্ডারের চিলতে আছে বটে টাকা পাঠানোর জন্য—কিন্তু কি বাবদ টাকা পাঠানো হচ্ছে—তার উল্লেখ কোনটাতেই নেই। আর সেগুলি অনিয়মিত—টাকার অঙ্কও সবগুলির সমান নয়। আশ্চর্য্য, এমন সরল ভাবে বাবা বিশ্বাস করে গেছেন এদের—অথচ ম্লেচ্ছ দুর্নাম দিয়ে এরা বলছে—তিনি এদের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করতেন না!

সত্য বলতে কি বিষয়সম্পত্তি নিয়ে আমিও কোনদিন মাথা ঘামাই নি—কোন খোঁজখবর রাখি নি ওসবের। বিষয়কে বিষ মনে করব এমন বৈরাগ্য-সঞ্জাত মনোবৃত্তি অবশ্য পোষণ করি না—কিন্তু বিষয়-অর্জ্জনের লালসাও উগ্র হয়ে মনকে আচ্ছন্ন করে নি। তবে অহেতুক প্রতারিত হলে মানুষের পৌরুষগর্ব্বে যে প্রচণ্ড আঘাত লাগে—তারই বেদনা বোধ করতে লাগলাম। অনুভব করলাম কোথায় যেন গ্লানি জমছে—তা থেকে মুক্ত হওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। প্রতারক আত্মীয়দের কবল থেকে যেমন করে পারি বিষয়-সম্পত্তি উদ্ধার করব। এগুলির উদ্ধারসাধনকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করলাম।

যথাসাধ্য অনুসন্ধানপর্ব্ব শেষ করে প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছি—এমন সময় এক বন্ধুর মুখে শুনলাম প্ল্যানচেটের কথা। যেমন তেমন ঘরোয়া অনুষ্ঠান নয়, রীতিমত একটা সমিতি আছে—তার নির্দ্দিষ্ট ঘর আছে—শিক্ষিত ও গুণী লোক সব সেখানকার সভ্য। সপ্তাহে মাত্র দু'দিন সমিতির অধিবেশন হয়। শুধু প্রেত নামিয়ে তামাশা উপভোগ করেন না তাঁরা—ইউরোপ-আমেরিকার নামজাদা প্রেততাত্ত্বিকদের সঙ্গে রীতিমত যোগাযোগ রয়েছে তাঁদের। একখানি মাসিক পত্রে পারলৌকিক তত্ত্ব নিয়ে প্রবন্ধ ও তাঁদের অনুসন্ধানের ফলাফল বার হয়। আর এই অনুসন্ধানের ফলে এই শহরে এমন বহু আশ্চর্য্য ঘটনার রহস্য-সূত্র পাওয়া গেছে যা ডিটেক্‌টিভ পুলিস প্রাণপাত পরিশ্রম করেও উদ্ঘাটিত করতে পারে নি। কয়েকটি উদাহরণও শুনিয়ে দিলেন বন্ধু।

শুনে অবশ্য বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত হই নি—তবে কৌতূহল আমার অদম্য হয়ে উঠল। সন্দেহপ্রবণ চিত্তে বিশ্বাসের ক্ষুদ্র অঙ্কুর মাথা তুলল। বিচার আরম্ভ হ'ল। একান্ত ভুয়ো জিনিষ নিয়ে এতগুলি শিক্ষিত লোক কি করে দিনের পর দিন মেতে রয়েছেন? পরলোকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে কেন এঁদের এই প্রয়াস? পণ্ডশ্রম মনে করলে কি সার অলিভার লজ—মাদাম ব্লাভাট্‌স্কি—কর্ণেল অলকট—

অবশেষে এক সন্ধ্যায় বন্ধুর সঙ্গে সেই চক্রে গিয়ে হাজির হলাম। কোলাহলমুখর শহরের একান্তে অবস্থিত পুরাতন বড় একটি বাড়ী। একতলায় কাগজের গুদাম—ছোটমত একটা প্রেস—কয়েক ঘর দারোয়ান, মালী ও দপ্তরির বাস। এদের কোলাহল শনিবারের সন্ধ্যায় তেমন জমজমাট বোধ হ'ল না। নোনাধরা দেওয়ালের গা বেয়ে একটা সিঁড়ি দোতলায় উঠেছে। সিঁড়ির শেষে দীর্ঘ বারান্দা পেরিয়ে একেবারে কোণের দিকে পাওয়া গেল একটা দরজা। সেটা ঠেলতেই এসে পড়লাম যেন আর এক জগতে। দরজাটি বন্ধ করে দিলে এদিকের জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা। প্রকাণ্ড একটা ঘর—সুসংস্কৃত—সুসজ্জিত। এটা পুরাতন বাড়ীর অংশ বলেই মনে হয় না—সদ্য-সমাপ্তির ঔজ্জ্বল্যে এই সুবৃহৎ ঘরখানি ঝক্ ঝক্ করছে। বড় বড় সব দরজা জানালা—ভাল ভাল অয়েল-পেন্টিং আয়না কার্পেটমোড়া মেঝে—কোণে একটা পালিশ করা টেবিল—তার চারদিক ঘিরে কয়েকখানি চেয়ার। প্রত্যেক দরজা বা জানালায় কালো রঙের সুদৃঢ় পরদা—ঘরের মধ্যে জ্বলছে একটি স্বল্প-

শক্তির বৈদ্যুতিক আলো—ফানুসটা তার নীলরঙের। কোথা থেকে ভেসে আসছে—ধূপ ধুনা গুগ্‌গুল ও ফুলের গন্ধ। পরিচিত জগতের মধ্যে অপরিচিত পরিমণ্ডলের সৃষ্টি। এতে মনের বিস্তৃতি বাড়ে—মন প্রসন্ন সুরময় হয়ে ওঠে, ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিতে বিচিত্র জগতের বার্তাবহনের কাজটি অত্যন্ত সহজ হয়ে ওঠে।

বন্ধুর নির্দেশে চেয়ারে বসলাম। টেবিলের উপর সবুজ রঙের একটি কাগজের প্যাড—তার পাশে দোয়াত কলম পেন্সিল। টেবিলের চার পাশে মোরাদাবাদী মিনেকরা ফুলদানিতে কয়েকটি করে সদ্য-ফোটা গোলাপ—পল নীরো মার্শাল নীলের সংমিশ্রণ। ধুনা অগুরুর গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত। আর টেবিলের ঠিক মাঝখানে হরতনের টেক্কার মত একটা জিনিস—সবুজ ভেলভেটের কভারে মোড়া। ওটি শুনলাম প্ল্যানচেট—বিদেহী আত্মা আকর্ষণের যন্ত্র। আমার পাশে বন্ধু বসলেন এবং সেই টেবিল ঘিরে আরও তিন জন লোক।

বন্ধু বললেন, এখনই চক্রের কাজ আরম্ভ হবে—তুমি কি যোগদান করবে?

যোগদানের নিয়মকানুন কিছু জানি না—কি ভাবে ভাবিত হয়ে অশরীরী আত্মাকে আহ্বান করতে হয় তার প্রক্রিয়াও জানা নেই অথচ অজানাকে জানবার জন্য মনে রয়েছে অদম্য কৌতূহল।

বন্ধু ব্যাপারটা বুঝে উপস্থিত কয়েকজনের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে পরামর্শ করে বললেন, বেশ চেয়ার টেনে একটু দূরে বস। যা দেখবে চুপ করে দেখবে—কোন মন্দ চিন্তা করবে না—বা কথা কয়ে নীরবতা ভাঙবে না।

দূরে সরে বসতেই নীল শেড দেওয়া আলোটা অকস্মাৎ জ্যোতিহীন হয়ে গেল—একেবারে নিবল না। কোথা থেকে টুং টাং যন্ত্রসঙ্গীত ভেসে আসতে লাগল। অসীম নিস্তব্ধতার মধ্যে তন্দ্রা-পীড়িত স্নায়ু নিয়ে কোন্ অভাবিতের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম জানি না—তবে ঘরের পারিপার্শ্বিক আমায় অভিভূত করে আর এক জগতে টেনে নিয়ে গেল। টেবিলে ঠক্ ঠক্ করে শব্দ—তা ছাড়া একটা অস্ফুট গোঙানি—ঠিক গোঙানি ত নয়—অতিদূর থেকে ভেসে-আসা সকরুণ এক সুর—অতীন্দ্রিয় জগতের বার্তাবহনের উপযোগী সুরই হয়তো আমার মনেও শঙ্কার সঞ্চার করলে। সমস্ত ব্যাপারটাই স্বভাববহির্ভূত ভয়ের বস্তু অথচ ভয়ে অভিভূত হয়ে তা থেকে পরিত্রাণলাভের চেষ্টা জাগছে না মনে। সুরে গন্ধে এবং নূতন রসাস্বাদে বিহ্বল হয়ে পড়েছি।

জ্ঞান ফিরল বন্ধুর স্পর্শে। ঘরে তখন আলোটা উজ্জ্বল হয়েছে—যন্ত্রসঙ্গীত থেমে গেছে এবং আর সকলে মৃদু আলোচনা করতে করতে কক্ষান্তরে যাচ্ছেন।

বন্ধু বললেন, চল বাড়ী যাই। চলতে চলতে বললেন, তোর কথা ওঁদের বলেছি—ওঁরা রাজী হয়েছেন। তবে তোর পুরোপুরি ইতিহাসটা ওঁরা জানতে চান। তোর বাপের আকৃতি প্রকৃতি মৃত্যুকালীন কিছু বলবার চেষ্টা—সব লিখে দিস একটা কাগজে—সকলে মিলে সেই বিষয়ে চিন্তা করা যাবে। সকলের চিন্তায় সমতা আনতে হবে—সবগুলি মনকে মেলাতে হবে একটি কেন্দ্রে। এই একাগ্র ইচ্ছার দ্বারা সূক্ষ্ম দেহকে আকর্ষণ করে চক্রের আসনে টেনে আনব।

পরের শনিবারে আমাদের চেষ্টা অবশ্য সফল হ'ল না—তার পরের শনিবারেও নয়। চক্রে আমিও বসেছিলাম—হাতে হাত মিলিয়ে বসে ভাবছিলাম বাবার কথা—একাগ্রচিত্তে ভাবছিলাম, কিন্তু কোন ফল হ'ল না।

বন্ধু বললেন, সব সময়ে তাড়াতাড়ি ফললাভ হয় না—তোমার জন্য আরও দু'একদিন দেখব। সেদিন গঙ্গাস্নান করে শুদ্ধচিত্তে আসবে আর মাছমাংস খাবে না।

সেদিনও শিথিল বিশ্বাসের ভার নিয়ে চক্রে গিয়ে বসলাম। মৃদু যন্ত্রসঙ্গীত, আবছা অন্ধকার আর ফুলের গন্ধ আমার চেতনায় ঘনিয়ে তুলল আবেশ। চোখ বুজে বাবার কথাই ভাবছিলাম—কখন চেয়ে দেখি ঘরের অন্ধকার তরল হয়েছে আর সেই তরল অন্ধকারে প্রসারিত হয়েছে একটি পথ—সুদীর্ঘ বল্লালোকিত। সেই পথ দিয়ে চলছে এক অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি। সে মূর্তির হাতে একটি চেরি কাঠের লাঠি—তাঁর ঈষৎ নম্র চলার ভঙ্গিটি ভারি চেনা। সে মূর্তির গায়ে গলাবন্ধ কোট, মাথায় বাঁকা করে বসানো টুপি—আর ক্রীজদোরস্ত হ্যাটের রং অত্যন্ত পরিচিত। লোকটি যদি এক বার মুখ ফিরিয়ে এদিকে চান তা হলে ওঁকে যেন চিনতে পারব সেই দণ্ডে। যেমন মনে হওয়া অমনি মূর্তি ফিরে দাঁড়াল। কোন সন্দেহ রইল না—ইনি আমার পিতৃদেব। কি জানি চীৎকারের বাসনা হয়েছিল কিনা—হাতের ছড়ি তুলে মূর্তি আমাকে নীরব থাকতে ইসারা করলে। সেই ছড়ি প্রথমে পথের দিকে, পরে পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষাবলীর দিকে আন্দোলিত করে—আবার পিছন ফিরে তিনি চলতে সুরু করলেন। সে যেন ছায়াছবির খেলা। কোন্ সুদূরে চলে গেছে আঁকাবাঁকা পথ—কত মাঠ সাঁকো পুকুর বাগান গাছপালা গির্জা মন্দির সিনেমা-ভবন ছাড়িয়ে চলে গেছে—সেই পথে চলেছে পথিক—তাকে অনুসরণ করছে আমার দৃষ্টি। অলোক-দৃষ্টির পথে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে চলেছি মূর্তির সাথী হয়ে—নির্ব্বাক সম্মোহিত কৌতূহলাক্রান্ত।

অবশেষে একটা মোড়ের মাথায় একটা বাড়ীর কাছে এসে মূর্তি থামল। বাড়ীর লোহার গেটটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম, পাঁচিলের মাথায় একটা পেয়ারাগাছ ঝুঁকে পড়েছে—গেটের ভিতরের লাল সুরকির পথটা সোজা গিয়ে মিশেছে পাটকিলে রঙের দোতলা বাড়ীটার প্রান্তে। পথের দু'পাশে গোলাপ ও রজনীগন্ধার ঝাড়—ফুল ফুটেছে অজস্র, ঘন গন্ধে বাতাস

বছর। বাড়িটার দিকে দৃষ্টি উঠাতেই দৃশ্য ফিকে হয়ে গেল। যেন গলে মিলিয়ে যেতে লাগল সেই পথ, বাড়ী এবং ছায়ামূর্ত্তি।

বন্ধুর বহু ধাক্কায় অভিভূত ভাবটা কাটল। সে বললে, ব্যাপার কি? কিছু দেখলি?

তাকে সব বললাম।

সে বললে, ব্যাপারটা স্পষ্ট হ'ল না—ওঁকে আর একদিন এনে লিখিয়ে নিতে হবে সব। বললাম, যা জানাবার উনি জানিয়েছেন।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ ওই বাড়ীটা আমাকে খুঁজে বার করতেই হবে।

বন্ধু হেসে বললে, তোর মাথা খারাপ!

দৃঢ় কণ্ঠে বললাম ও বাড়ি খুঁজে বার করবই। খুঁজতে লাগলাম সেই থেকে। শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলাম। কোথাও প্রার্থিত বস্তর দর্শন মিলল না। অবশেষে শহর ছাড়িয়ে শহরতলীতে আরম্ভ হ'ল আমার অনুসন্ধান। কিন্তু কোথায় বাড়ীর নিশানা? তবু নিরাশার মধ্যেও উৎসাহ অনুভব করি। কে যেন আমার কানে কানে বলে, জীবনভোর ত কাজ তোকে করতেই হবে।

এমনি করে খুঁজতে খুঁজতে দু' বছর কেটে গেল।

কিছুদিন ম্রিয়মাণ হয়ে রইলাম—আর একবার বন্ধুর শরণাপন্ন হব কিনা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হ'ল—দীর্ঘ প্রসারিত পথ—তার দু'ধারে মাঠ পুকুর সাঁকো···এ জিনিষ শহরের বাইরেই থাকা সম্ভব। দ্বিগুণ উৎসাহে উত্তর-পশ্চিম-পূর্ব্ব প্রান্তের মাইল আষ্টেক করে ঘুরে এলাম—কাটল আরও আট-দশ মাস। কোথাও মিলল না সেই ধরণের লোহার গেট, উঁচু পাঁচিলের মাথায় ঝুঁকে-পড়া পেয়ারাগাছ, পাটকিলে রঙের বাড়ীর পদতলে প্রসারিত লাল টুকটুকে পথ।

বন্ধু বললে, ধন্য তোর অধ্যবসায়। যদি বাড়ীটা খুঁজেই পাস তো তা থেকে কি স্বার্থসিদ্ধি হবে শুনি?

বললাম, একটি সিদ্ধান্তের কথা মনে উঠেছে বলেই আশা ছাড়ি নি। আমার ধারণা হয়েছে বাড়ীটা কোন এটর্নীর—তিনি বাবার পরিচিত আর আমাদের বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধারক। আমার বিশ্বাস তাঁর কাছেই আছে বিষয়-সম্পত্তির দলিল।

সে এটর্নীর নাম তুমি জান না?

জানলে এত খোঁজাখুঁজি করি। তুমি তো জান, ছেলেবেলা থেকে আমরা প্রবাসী। কিছু বড় হয়ে অর্থাৎ পনেরো বছর বয়সের সময় কলকাতায় পড়তে আসি। সেই থেকে বাবার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কমই হয়েছে—কথাবার্তা হয়েছে আরও কম। যা আলাপ হয়েছে শিক্ষাসংক্রান্ত—বিষয়সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার অবসর ঘটে নি। বাবা ভাবতে পারেন নি—এত শীঘ্র মারা যাবেন। তাঁর নীতিই ছিল বিদ্যাশিক্ষার সময় ছেলেদের মাথায় বিষয়-চিন্তা ঢুকিয়ে দেওয়া অন্যায়। তাতে করে ছেলেরা স্বার্থান্ধ বিষয়ী হয়—মানুষ হয় না।

সব শুনে বন্ধু বললে, শহরের একটা দিকে এখনও সন্ধান চালাও নি—দেখ দক্ষিণ দিকটা।···

সেই দিকেই ঘুরতে সুরু করলাম। এক দিন শীতকালে খুব সকালবেলায় শাঁ গঞ্জের দিকে চলেছি। চলতে চলতে এসে পড়লাম—একটা বিরলবসতি ফাঁকা জায়গায়—তার অল্প দূরে নালার মত একটি নদী, তার ওপর ছোট একটি সাঁকো, পথ আঁকাবাঁকা। ঠিক—ঠিক আড়াই বছর আগে এই দৃশ্য এক নিস্তব্ধ সন্ধ্যার পরিবেশে প্রতিভাসিত হয়েছিল আমার চৈতন্যে। মানসপটে অগ্নিরেখায় স্বাক্ষরিত হয়ে আছে সে দৃশ্য। একে ভুলতে পারব না জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত।

মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই পথ অতিক্রম করতে লাগলাম। ক্রমে বসতি ঘন হ'ল। আলো, জলের কল, পীচ বাঁধানো রাস্তা··· বুঝলাম এটিও শহরের অংশ—মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত।

চলতে চলতে যেমন মোড় ঘুরেছি—বিস্ময়ে আনন্দে চীৎকার করে উঠলাম। সেই লোহার গেট, উচ্চ প্রাচীর তার ওপর ঝুঁকে-পড়া পেয়ারাগাছ। স্বপ্নের ছবি বাস্তবে রূপ নিলে। ছুটতে ছুটতে গেটের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ঘেউ ঘেউ রবে অভ্যর্থনা করে উঠল বাড়ীর ভিতরে শৃঙ্খলিত একটি নেকড়ে-মার্কা কুকুর। তার চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে দেখলাম, লাল টুকটুকে সঙ্কীর্ণ পথ—সটান শুয়ে পড়েছে পাটকিলে রঙের দোতলা বাড়ীটার সামনে।

কড়া নাড়লাম সজোরে।

তখন সাতটাও বাজে নি—শীতের সকাল। এত সকালে সাহেবি ফ্যাসানের বাড়ীর বাসিন্দা যে শয্যাত্যাগ করবেন সে ভরসা ছিল না—আর তাঁকে ডেকে তুলে বিরক্তি উৎপাদন করাটাও ভদ্রোচিত নয়। তা ছাড়া যে বাড়ীতে অমন উগ্র মেজাজের কুকুর রয়েছে অবাঞ্ছিত অতিথিকে 'প্রবেশ-নিষেধ' অনুজ্ঞা জানাতে—সেখানে আমি কি ভাবে অভ্যর্থিত হব—তাও অনায়াসে অনুমান করা যায়। কিন্তু সুদীর্ঘ আড়াই বছর পরে প্রার্থিত বস্তর দর্শন পেয়ে মানুষের হিসাববোধ মুছে যায়। সজোরে ঘন ঘন কড়া নাড়তে লাগলাম।

চাকর বেরিয়ে এসে রুক্ষ কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, কে আপনি—কাকে চাই?

তাই ত—কে আমি সে পরিচয় এর কাছে বা গৃহস্বামীর কাছে মূল্যহীন, কাকে চাই তা বলা আরও শক্ত। ইতস্ততঃ ভাব কার্য্যসিদ্ধির অন্তরায় বলে তাড়াতাড়ি বললাম, তোমার মনিবকে ডেকে দাও তো। জরুরি দরকার।

তার মনিব এলেন। আধা-বয়সী বেঁটে তামাটে রঙের এক অপ্রিয়দর্শন ব্যক্তি—অকাল নিদ্রাভঙ্গ-ব্যথিত

অপরিমিত বিরক্তি ও যৎসামান্য কৌতূহল নিয়ে আমার সামনে এসে নীরস স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, কে আপনি? কি দরকার?

সসঙ্কোচে প্রশ্ন করলাম, আপনি কি এটর্নী?

না। সংক্ষিপ্ত জবাব ধমকের মত শোনাল।

আমি ভেবেছিলাম—

ভাববার তো কিছু ছিল না—গেটের নেম-প্লেটটা দেখলে আর এ ভুল হ'ত না।

সেদিকে দৃষ্টি পড়ল। কালো বোর্ডে সাদা হরফে লেখা আছে—ডি. সি. গাঙ্গুলি, এসিসট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার—জেসপ এ্যাণ্ড কোম্পানী—

ফিরে দেখি গেট বন্ধ হয়ে গেছে—মনিব ও চাকর দু'জনেই অন্তর্হিত। বুঝতেই পারছ তখন আমার মনের অবস্থা। এক-রাশ মোটঘাট নিয়ে প্ল্যাটফরমে পা দিতেই ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার মত।

ফিরে চললাম হতাশ হয়ে।

শীতের সকাল—পথে লোক চলাচল নেই। অদূরে একটা বাড়ীর রোয়াকে বসে একজন লোক দাড়ি কামাচ্ছিলেন। কি জানি কেন—তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালাম—এবং তাঁর দাড়ি কামানো শেষ হবার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। আমায় দাঁড়াতে দেখে তিনি বললেন, কি চাই? দাঁড়ান এক মিনিট।

সসঙ্কোচে বললাম, ওই যে মোড়ের মাথায় পাটকিলে রঙের বাড়ীটা—যার বারান্দায় একটা কুকুর বাঁধা—

আর বলবেন না মশাই—রাক্ষুসে কুকুর। ভদ্রলোক কাজ করেন কোন সাহেব কোম্পানীতে—বলেন তো ইঞ্জিনিয়র—তাও সহকারী—কিন্তু থাকেন যে ষ্টাইলে—

উনি কত দিন এখানে আছেন?

কতদিন আর—বড়জোর বছর দুই।

বটে! তার আগে ও বাড়ীতে কে ছিলেন?

জানেন না তাঁকে? তিনি হলেন কলকাতার একজন নামজাদা এটর্নী—এম. এল. বাসু।

ভীষণ ভাবে চমকে উঠলাম—এটর্নী? বছর দুই আগে? অর্থাৎ যে সময়ে চক্রে বসে দৃশ্যটা দেখেছিলাম।

বললাম, বলতে পারেন তিনি বেঁচে আছেন কিনা? কোথায় আছেন? এখনও এটর্নীগিরি করেন কিনা?

দাঁড়ান মশায়—আপনি একরাশ প্রশ্ন ছুঁড়ে মেরেছেন—একটু দম নিতে দিন—একে একে আপনার কথার জবাব দিচ্ছি।

প্রতীক্ষমাণ মুহূর্তগুলি অসহ্য। তিনি কামানো শেষ করে ক্ষুরখানি ধুয়ে মুছে ভেসেলিন মাখিয়ে বাক্সে তুললেন। সাবান-দানের মধ্যে সাবান আর ব্রাশদানের মধ্যে ব্রাশ পুরলেন। মনে হ'ল মিনিটগুলি ঘণ্টার মত্যরূপে আমার ধৈর্য্য পরীক্ষা করছে। অবশেষে সে পরীক্ষার শেষ হ'ল—তিনি বললেন, আপনার এক নম্বর প্রশ্নের জবাব হচ্ছে—ভদ্রলোক বেঁচে আছেন। দু' নম্বরের জবাব—এই গলিতেই আছেন—এই গ্যাস পোষ্ট থেকে ঠিক চার নম্বরের পোষ্টের গায়ে সাতাশি নম্বরের বাড়ীতে আছেন। নেম-প্লেট সাঁটা আছে দরজার গায়ে। তিন নম্বরের উত্তর—তিনি কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন। তবে কথায় বলে না—ঢেঁকী স্বর্গে গেলেও ধান ভানে—ওঁরও হয়েছে তাই। নইলে আপনি আর খোঁজ করবেন কেন!

আচ্ছা—নমস্কার।

ও মশায়—শুনছেন? উনি কিন্তু কোন কেস নেন না—বৃথাই যাবেন ওখানে। তার চেয়ে—আর দুটো পোষ্ট ছাড়িয়ে পঞ্চু উকিলের বাড়ী যান—

আমি ততক্ষণে ঠিকানায় পৌঁছে গেছি। খবর দিতেই এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ এসে আমার আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলেন, এবং আমার পরিচয় শুনে জড়িয়ে ধরলেন বুকের মধ্যে।

তুমি—তুমি রাসবিহারীর ছেলে—মহিম? তুমি আমার নাতির বয়সী—আমার নাতিই। ওরে জগা—ওরে মধু—চা খাবার নিয়ে আয়—

আদর আপ্যায়নে প্লাবিত হয়ে গেলাম। তাঁর আবেগ কমলে—সমস্ত ব্যাপার খুলে বললাম।

শুনতে শুনতে তাঁর মুখ গম্ভীর হ'ল। বললেন, তাইতো ভায়া—বড় অসময়ে এসেছ। কোন দলিলপত্র তো আমি নিজের কাছে রাখি নি—যাকে বলে পরিপূর্ণ অবসর তাই ভোগ করছি। তোমাদের কাগজপত্র আমার জুনিয়র সুকেশবাবুর কাছে দিয়েছিলাম। তাঁর ঠিকানা আর তাঁর নামে চিঠি দিচ্ছি—দেখ যদি কোন হদিস মেলে।

গেলাম সুকেশবাবুর কাছে।

তিনি বললেন, সরি, আপনাদের কোন কাগজপত্র আমার কাছে নেই।

ফিরে এসে বললাম, দাদু, সেখানে কোন কাগজপত্র নেই।

বৃদ্ধ বললেন, তাই ত ভায়া—কি উপায় করা যায় বল তো? হকের পাওনায় বঞ্চিত হবে আমরা থাকতে! আচ্ছা ভাবতে দাও আমায়। তবে মাঝে মাঝে আসবে এখানে, খবর নেবে, খবর দেবে। আর আমাদের মত বুড়ো মানুষের খবরাখবর নেওয়া তো তোমাদের কর্ত্তব্য।—

খবর দেওয়া নেওয়া করতে করতে আরও দু'মাস কাটল, ক্রমে স্তিমিত হয়ে এল অন্যায়ের প্রতিকার-বাসনা। তখন কেবলই মনে হয় আর কিছুদিন আগে অর্থাৎ বছর তিনেক আগে যখন চক্রে বসে সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিলাম—তখন যদি বাড়ীটা খুঁজে পেতাম! আমারই দুর্ভাগ্য!

এর পর বিশ্ব যুদ্ধ সুরু হ'ল। যুদ্ধের শেষ অঙ্কে

একটা কমিশন পেয়ে পুনরধিকৃত বর্মায় যাব কিনা অপিসে বসে ভাবছি—বেয়ারা এসে বললে, মেজর সাহেব আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এডভোকেট বাসু নাকি আপনাকে ফোনে ডাকছেন।

বাসু বললেন, শীঘ্র চলে এস আমাদের বাড়ীতে—জরুরি দরকার আছে।

বৃদ্ধ বৈঠকখানায় বসে আমার প্রতীক্ষাই করছিলেন। আমি যেতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরলেন প্রথম দিনের মত। বললেন, ল্যাকি চ্যাপ—ল্যাকি চ্যাপ।

হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন টেবিলের কাছে। টেবে সাজানো ছিল একটা কাগজের বাণ্ডিল। সেটা হাতে তুলে নিয়ে বললেন, এই তোমার দলিল—বাড়ীর জমির সব কিছুর। এই প্রমাণের বলে ফিরে পাবে তোমার সম্পত্তি।

কিন্তু এ আপনি কোথায় পেলেন ?

আমার আয়রণ সেফের মধ্যে। বছর কয়েক আগে এটা রং করানো হয় তখন আমরা ও বাড়ীতে। তারপর এই বাড়ীতে এসে যার যা কাগজপত্র সব দিয়ে দেওয়া হয়—আমি রিটায়ার করি। এটা ছিল সিন্দুকের নীচতলায়। নতুন রং-করা সিন্দুক—রঙের আঠায় লেপটে ছিল বাণ্ডিলটা—তার ওপর ছিল খবরের কাগজ বিছানো—কেউ লক্ষ্য করে নি। আজ এই সিন্দুকটা ফের রং করবার জন্য খালি করতে গিয়ে তোমার দলিলপত্র পেয়ে গেলুম। তোমার তিন বছরের সাধনা আজ সফল হ'ল।

আমরা নিশ্বাস বন্ধ করে গল্প শুনছিলাম। বললাম, তার পর ?

মহিম বললে, তার পর অত্যন্ত সোজা। এই এই বাড়ী আর বর্দ্ধমানের দু'শো বিঘে খামজমি—আর মিলিটারিতে মোটা মাইনের চাকরি—ভালই আছে।

প্ল্যানচেটে বস নি আর ?

হুঁ—কিন্তু সেই একটিবার ছাড়া বাবাকে আর দেখি নি—বা অন্য জগতে তিনি আছেন এ প্রমাণও পাই নি।

তোমার বিশ্বাস—

মহিম হাসল, বললে—দেয়ার আর মেনি থিংস্—যা আমাদের যুক্তি বুদ্ধির বাইরে, দর্শন-বিজ্ঞানের তথ্যে যা ধরা যায় না।

আমি হেসে বললাম, তুমি প্ল্যানচেটের কারবার খুললে আমরা কিন্তু অন্যরকম ভাবতাম !

মধু

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

পনর হাজার বৎসর পূর্ব্বে স্পেনদেশে একটি গুহার প্রাচীরে এক জন শিল্পী একখানি ছবি আঁকিয়াছিলেন ; ছবিটিতে ছিল—এক জন লোক মৌচাক হইতে মধু চুরি করিতেছে, ছবির নীচে লেখা ছিল "স্বর্ণভাণ্ডার লুণ্ঠিত হইতেছে।" এই পনর হাজার বৎসরের মধ্যে বহু বিস্ময়কর ও ভয়াবহ বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে ; কিন্তু অদ্যাপি মধু অপেক্ষা অধিকতর বিশুদ্ধ এবং মিষ্ট খাদ্য কেহই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। ইক্ষু-চিনি অপেক্ষা মধু দ্বিগুণ মিষ্ট ; লবণের ন্যায় চিনির কেবল এক রকমের আস্বাদ আছে ; কিন্তু বিভিন্ন মধুর আস্বাদ বিভিন্ন রকমের। আমেরিকায় ২০০০ বিভিন্ন জাতীয় পুষ্প হইতে মৌমাছি পুষ্প-রস সংগ্রহ করিয়া মৌচাকে সঞ্চিত করে এবং উহা হইতে বিভিন্ন আস্বাদের মধু প্রস্তুত হয়।

সকল প্রকার খাদ্য অপেক্ষা মধু বিশুদ্ধ ; ইহাতে যে সকল শর্করা জাতীয় পদার্থ (sugars) বিদ্যমান থাকে তাহাদের সংকেন্দ্রণ (concentration) এত অধিক যে, পুষ্পক মধুতে কোন প্রকার বীজাণু এক বা দুই ঘণ্টার বেশী জীবিত থাকিতে পারে না ; সুতরাং অনাবৃত অবস্থায় মধুকে রাখিলেও ইহার দূষিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে না। মিশর দেশের এক জন রাজার কবরের মধ্যে ৩৩০০ বৎসরের পুরাতন মধু পাওয়া গিয়াছিল ; এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে অবশ্য উহা খুবই ঘন এবং কালো হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ছিল। কোন প্রকার ধূর্ত্ততা মধুকে দূষিত করিতে পারে না, উহা ধরা পড়িবেই। মধুতে যদি জল মিশ্রিত করা হয়, উহা গাঁজিয়া উঠিবে ; উহার সহিত যদি শস্যের সিরা (corn syrup) মিশানো হয়, মধু পৃথক হইয়া যাইবে।

মনে হয়, মধুর বিশুদ্ধতা এবং মিষ্টত্বের জন্যই অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহা বহু দেশের বহু আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে এবং ধর্ম্ম-প্রণালীর প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। রোমদেশে বিবাহের পর নূতন দম্পতির প্রথম গৃহ প্রবেশ কালে দ্বারের নিয়ে একটি পাত্রে মধু রাখা প্রচলিত প্রথা। হাঙ্গেরী হইতে হিন্দুস্থান পর্য্যন্ত বহু সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানে (বিশেষতঃ বিবাহে) মধু ব্যবহৃত হয়। এই কারণেই হয় ত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার পর নবদম্পতির প্রথম আনন্দ

উপভোগ করাকে 'মধুচন্দ্র' (honey mooon) বলা হইয়া থাকে।

কিন্তু এই অতি প্রাচীন ও অতি স্বাভাবিক খাদ্যের সঙ্গে বহু রহস্য জড়িত আছে; ইহাকে পৃথিবীর অন্যান্য 'আশ্চর্য্যের' মধ্যে অন্যতম একটি আশ্চর্য্য বলা যাইতে পারে। ফুলের সহিত মৌমাছির যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। প্রকৃতি ফুলকে এমনভাবে প্রস্তুত করিয়াছে যাহাতে ফুল মৌমাছিকে সহজে আকৃষ্ট করিতে পারে। কেবল ইহাই নহে, মৌমাছির দেহ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতি আবার এমনভাবে গঠিত, যাহাতে উহা ফুলের সহিত ঠিকভাবে লাগিয়া যায় এবং এক ফুলের পর অন্য ফুলের উপর ছড়াইতে পারে ও তাহাদের পরাগ-রেণু ও রস মধু প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার করিতে পারে। ফুলের এবং মৌমাছির এইরূপ অদ্ভুত সম্পর্ক না থাকিলে অন্ততঃ ১০,০০০ শ্রেণীর ফুল পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইত; ফুল ব্যতীত মৌমাছি জীবিত থাকিতে পারে না।

আমেরিকার এক জন মৌমাছি-পালক বলেন যে, যখন কোন উষ্ণ অথচ আর্দ্র আবহাওয়ার দিনে আমি আমার কমলা-লেবুর বাগানে যাই তখন দেখি যে কমলালেবুর ফুলের পাপড়ির তলায় যেন পুষ্প রসের প্রবাহ চলিতেছে; আমি যদি ফুলগুলি একটু নাড়া দিই তখন দেখি যেন একটি পাত্রের মধ্যে পরিষ্কার স্বচ্ছ জলের মত পুষ্পরস খেলিয়া বেড়াইতেছে। নাড়া দিলে আমার হাতের উপরে দুই-চার ফোঁটা পড়ে, মনে হয় যেন বোতল হইতে সুগন্ধ দ্রব্য পড়িতেছে। বাগানের বাতাস এক অপূর্ব্ব সৌরভে ভরা; যদিও আমি অল্প দূর হইতে ইহার ঘ্রাণ পাই, কিন্তু মৌমাছি ইহাদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বহু দূর হইতে ছুটিয়া আসে। এক একটি গাছের উপর যেন আনন্দের সোরগোল পড়িয়া যায়, যখন মৌমাছি ফুলকে আলিঙ্গন করে এবং প্রমোদ কোলাহলের সহিত পুষ্পরস পান করে। প্রত্যেক মৌমাছি যখন সন্ধ্যার পূর্ব্বে মৌচাকে ফিরিয়া যায় তাহার দেহের ওজন ৫০০ গুণ বর্দ্ধিত হয়; অর্থাৎ প্রচুর পুষ্পরসে উদর ভর্ত্তি করিয়া সে চাকে ফেরে। একটি মৌমাছির দল প্রত্যেক দিন অন্ততঃ দুই-তিন লক্ষ ফুলের রস পান করিয়া মৌচাকে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

এক কণিকা পুষ্পরস বা উহা হইতে প্রস্তুত মধু যেন শরীরের পুষ্টির প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের "সমুদ্র" বিশেষ। মৌমাছি রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কিন্তু মৌমাছি জানে না যে, বহুমূত্র রোগীর পক্ষে চিনি অপকারক, কিন্তু মধু নহে; এবং মধু শিশুদেহে ক্যালসিয়ম সংরক্ষণে সাহায্য করে ও উহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বিশেষতঃ দাঁতকে শক্ত করে। মোট কথা, শর্করা জাতীয় খাদ্য হিসাবে মধুর সমকক্ষ আর কোন খাদ্য নাই; মধু বিলাসী-খাদ্য নহে (luxury food); অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য। আমেরিকা হইতে পূর্ব্বে ইউরোপে প্রতি বৎসর ১২,০০০,০০০ পাউণ্ড মধু রপ্তানী হইত; বর্ত্তমানে 'মার্শাল-প্ল্যান' অনুসারে অধিকতর পরিমাণে রপ্তানী হইতেছে।

এক পাউণ্ড মধুর জন্য উহার তিন গুণ পুষ্পরসের প্রয়োজন। মোটামুটি হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, এক পাউণ্ড মধুর জন্য ৩৭,০০০ মৌমাছিকে ফুলে যাওয়া-আসা করিতে হয়।

অন্যান্য মক্ষিকা বিভিন্ন রকমের ফুলে যাওয়া-আসা করে এবং ইহার ফলে বিভিন্ন রকমের ফুলের পরাগ-রেণু মিশ্রিত হইয়া যায়। কিন্তু এক সময়ে মৌমাছি একই ফুলে যায়, যে ফুলের পুষ্পরস অধিক। ইহার ফলে সে একই ফুলের পরাগ-রেণু মৌচাকে আনয়ন করে এবং এক সময়ে একই রকমের মধু প্রস্তুত করে। এইজন্যই মৌমাছি-পালক ভিন্ন ভিন্ন ফুলের বিশুদ্ধ মধু বাজারে বিক্রয় করিতে পারে এবং ফুলের নাম অনুসারে উহাদের বিভিন্ন নাম আছে।

আমেরিকায় দশ লক্ষের অধিক মৌমাছি-পালক আছে। বৎসরে তাহারা ২০০,০০০,০০০ পাউণ্ড মধু বিক্রয় করে। এই প্রসঙ্গে এ কথাও তাহারা নিঃসন্দেহে বলে যে, তাহাদের মৌমাছির দল কর্ত্তৃক পরাগ ছড়ানোর ফলে মধু হইতে যে মূল্য পাওয়া যায় তাহার ৩০ গুণ মূল্য কৃষি হইতে পাওয়া যায়। কালিফর্ণিয়া প্রদেশ সকল প্রদেশ অপেক্ষা বিভিন্ন রকমের অধিকতর পরিমাণ মধু প্রস্তুত করে এবং অধিকতর পরিমাণে মধু ব্যবহার করে। সেই প্রদেশে ৮,০০,০০০ একরের শস্যের ফলন (প্রধানতঃ লেবু জাতীয়) মৌমাছির কার্য্যতৎপরতার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে।

কয়েক রকমের গাছ হইতেই অত্যুত্তম পুষ্পরস এবং মধু পাওয়া যায়। কিন্তু আরও অনেক রকমের ফুলের রস হইতেও মধু পাওয়া যায়, যদিও সেই সকল মধুর রং কালো, ঘ্রাণও তৃপ্তিদায়ক নহে। রুটি ও মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক-গণ এই প্রকারের মধু অধিকতর পরিমাণে ব্যবহার করে। জ্বাল দিলে এই প্রকারের মধুর মন্দ ঘ্রাণ নষ্ট হয়, কিন্তু উহার মিষ্টত্ব ও খাদ্য হিসাবে মূল্য কমে না। তামাক ব্যবসায়ীগণ এই প্রকারের মধু প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করে; ইহার দ্বারা তামাকের সুঘ্রাণ বাড়ে, তামাককে কোমল করা যায়। 'লোশন', সর্দ্দি কাশীর ঔষধেও এই প্রকারের মধু ব্যবহৃত হয়।

উত্তম মধুর শ্রেণী বিভাগ আছে; আস্বাদের জন্য ৬০ পারসেণ্ট, রঙের জন্য ২০ পারসেণ্ট, গন্ধের জন্য ১০ পারসেণ্ট এবং ঘনতার জন্য ১০ পারসেণ্ট এই হিসাবে মধুকে শ্রেণী বিভক্ত করা হয়। আমেরিকায় ফুলের নামানুসারে কয়েক রকমের উৎকৃষ্ট মধুর প্রচলন আছে: যথা—'থাইমেটস' মধু, (ইহা থাইম নামক বন্য ফুল হইতে পাওয়া যায়), 'মলটা' মধু (কমলা লেবুর ফুল হইতে পাওয়া যায়,) প্রভৃতি। আমেরিকার 'সাদা ক্লোভার'

ফুলের মধুর প্রসিদ্ধিই অধিক। ইহা ছাড়া আমেরিকার প্রায় প্রত্যেক অংশেই এক এক রকমের বা অনেক রকমের মধু পাওয়া যায়। বিভিন্ন ফুল হইতেই ইহাদের উৎপত্তি। টেক্সার উভালডি (Uvalde) নামক স্থানের অধিবাসীরা বলে যে, তাহাদের দেশে যে মধু পাওয়া যায় তাহা পৃথিবীর সকল স্থানের মধু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই মধু 'ক্যাটস-ক্ল' এবং 'হুয়াজিলা' ফুল হইতে প্রস্তুত হয়।

মৌমাছির জীবন এবং কর্মপ্রণালী অদ্ভুত। কীটতত্ত্ববিদ-গণ এখনও সঠিক ভাবে বলিতে পারেন না কি ভাবে পুষ্পরস মধুতে পরিণত হয়।

যাহা হউক, মৌমাছি আমাদের দংশন করিলেও আমাদের পরম বন্ধু; ছোট ছোট ক্ষুদ্র প্রাণী ও ছোট ছোট ফুলের সম্বন্ধ ও সহযোগিতার সাহায্যেই আমরা এক শ্রেষ্ঠ খাদ্য লাভ করি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীগুলি যেন মানবজাতির হিতার্থেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। আমেরিকার একজন মৌমাছি-পালক বলেন, জিহ্বার উপর এক কোঁটা মধু গ্রহণ করার সময় মনে হয় যেন প্রকৃতির সহিত এক কোঁটা পবিত্র বারি গ্রহণ করিতেছি।*

* *Farmer's Digest*-এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

উজ্জয়িনী ও প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা

ডক্টর শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত

উজ্জয়িনী একটি অতি প্রাচীন নগরী এবং এর বর্ণনা আমরা ভারতীয় সাহিত্যে, অনুশাসনে ও বৈদেশিক রচনাতে পাই। স্কন্দ পুরাণের অবন্ত্য খণ্ড অনুসারে মহাদেব যখন ত্রিপুরাসুরকে বধ করেন তখন অবন্তীপুরের নাম হয় উজ্জয়িনী। পুরাণের এই বর্ণনা ছেড়ে দিলেও আমাদের বলতে হয় যে অবন্তীবাসি-গণ যখন ত্রিপুরাবাসিগণকে জয় করেন তখন থেকে এর নাম হয় উজ্জয়িনী অর্থাৎ বিজয়িনী। এই নগরী শিপ্রা নদীর তট-দেশে অবস্থিত ছিল। ইহা এখন মধ্য প্রদেশের গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত উজ্জয়িনী প্রদেশের রাজধানী। প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ এখন বর্তমান উজ্জয়িনী হতে এক মাইল দূরে দেখতে পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালে উজ্জয়িনী যে রাজ্যের রাজধানী ছিল তার নাম হচ্ছে অবন্তী। পরবর্তী যুগে এ রাজ্যের নাম হয়েছিল মালব। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, পুলিক নামে প্রাচীন অবন্তী রাজবংশের একজন নৃপতির মন্ত্রী তাঁর প্রভুকে হত্যা করেন এবং তাঁর পুত্র প্রদ্যোতকে সিংহাসনে বসান। এই বংশ ১৩৮ বৎসর রাজত্ব করে। বুদ্ধ ও মহাবীরের তিরোধানের পর মগধ ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ক্ষমতা হয়ে উঠল। অবন্তী খুব সম্ভবতঃ নন্দ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। মৌর্য্য সম্রাট বিন্দুসারের সময় অবন্তী মৌর্য্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল এবং অশোক এই প্রদেশের রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি উজ্জয়িনীতে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যখন শুঙ্গগণ রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন, তখন অবন্তী শুঙ্গসাম্রাজ্য-ভুক্ত হয় কিন্তু রাজধানী উজ্জয়িনী হতে বিদিশাতে স্থানান্তরিত হয়। অবন্তীরাজ্য সাতবাহন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে মনে হয়। অবন্তীরাজ্য সুরাষ্ট্রের শকক্ষত্রপদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে প্রথমে বিদিশা এবং পরে উজ্জয়িনী প্রাদেশিক রাজধানী রূপে পরিগণিত হয়। চন্দ্রগুপ্তকে সাধারণতঃ উজ্জয়িনীর শকারি বিক্রমাদিত্যরূপে ধরা হয়। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালেও উজ্জয়িনী প্রাদেশিক রাজধানীরূপে পরিগণিত ছিল। পরবর্তী যুগে পালবংশের নৃপতি ধর্মপাল যখন ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করে চক্রায়ুধকে পঞ্চালের নৃপতিপদে অভিষিক্ত করেন, তখন তিনি অবন্তী দেশের নৃপতির পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। এরপর পরমার নৃপতিগণ মালবদেশের প্রভু হয়ে পড়েন। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে উপেন্দ্র বা কৃষ্ণরাজ এই বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের প্রসিদ্ধ নৃপতি হচ্ছেন মুঞ্জ ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ভোজ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তোমর বংশ এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে চৌহান নৃপতিগণ এখানে রাজত্ব করেন। ১৪০১ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানগণ উজ্জয়িনী অধিকার করেন।

বিভিন্ন যুগে উজ্জয়িনী প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র বলে খ্যাত থাকলেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল গুপ্তযুগে ও পরমার যুগে। গুপ্তযুগে উজ্জয়িনী এক বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য ও তাঁর নবরত্নের কাহিনী হতে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, সে সময়ে এই নগরী শিক্ষাকেন্দ্র রূপে বিখ্যাত ছিল। যে সব বিষয়ের এখানে খুব চর্চা হ'ত তা হচ্ছে সাহিত্য, শব্দতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও জ্যোতির্বিদ্যা।

গুপ্তযুগ সংস্কৃত ভাষার যুগ-সন্ধির সময়। এ সময় প্রাকৃতের প্রাধান্য অনেক কমে যায়। এর প্রমাণ আমরা এ যুগের, এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের অনুশাসন আলোচনা করলে বুঝতে পারি। এ সময়ে কালিদাস আবির্ভূত হন। তিনি উজ্জয়িনী-বাসী ছিলেন কিনা তা ঠিক করে বলা যায় না; তবে তিনি যে এই নগরীর সঙ্গে খুব ভাল ভাবে পরিচিত ছিলেন তা তাঁর গ্রন্থগুলি, বিশেষ ভাবে মেঘদূত হতে বুঝতে পারা যায়। তাঁর রচিত নাটকগুলি উজ্জয়িনীতে অত্যন্ত আদৃত ছিল।

এ যুগে উজ্জয়িনীতে যে শব্দতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হ'ত তা আমরা অনুমান করতে পারি। এটা আমরা বুঝতে পারি

অমর সিংহের কোষগ্রন্থ হতে। সংস্কৃত ভাষাতে এই বিষয়ে এই গ্রন্থই সর্বপ্রথম রচনা এবং প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার খনি-স্বরূপ।

ব্যাকরণ নিয়েও উজ্জয়িনীতে যথেষ্ট আলোচনা হ'ত। এ সম্বন্ধে বররুচি ও তাঁর প্রণীত প্রাকৃত প্রকাশের উল্লেখ করা যেতে পারে।

জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনাতে উজ্জয়িনী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যাতে উজ্জয়িনী হতে দ্রাঘিমান্তর স্থির করা হয়। এর কারণ হচ্ছে যে, প্রাচীন সিদ্ধান্তগুলির যুগ হতে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা উজ্জয়িনীতে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পঠিত হ'ত। এখন আমরা যে সব রাশির নাম হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যাতে পাই তাদের অধিকাংশ গ্রীসবাসিগণের নিকট হতে পাওয়া। এরূপে আমরা ২৭টি নক্ষত্র ও ১২টি রাশির বর্ণনা পাই। অশোকের সময় থেকে উজ্জয়িনীতে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার জন্য বিদ্যালয় ছিল। প্রাক্-খ্রীষ্ট যুগে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া নগরী হতে উজ্জয়িনীতে ব্যবসা-বাণিজ্যের সামগ্রী আসত এবং খুব সম্ভব এর সঙ্গে গ্রীসীয় জ্যোতির্বিদ্যাও উজ্জয়িনীতে এসে পৌঁছেছিল।

সর্বপ্রাচীন পঞ্চসিদ্ধান্ত গ্রন্থ দুই শত খ্রীষ্টপূর্বাব্দে উজ্জয়িনীতে লিখিত হয়েছিল। শকগণ যখন উজ্জয়িনীতে রাজত্ব আরম্ভ করেন তখনও সেখানে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা অব্যাহত ছিল। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলীপুত্রের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে উজ্জয়িনীতে তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আর্য সিদ্ধান্ত রচনা করেন।

বরাহমিহির পরবর্তী সময়ের লোক। তিনি উজ্জয়িনীর অধিবাসী ছিলেন এবং ৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চসিদ্ধান্ত রচনা করেন। তিনি জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রেরও চর্চা করতেন এবং এ বিষয়ে বৃহৎসংহিতা ও লঘুজাতক বলে দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

উজ্জয়িনীতে জ্যোতির্বিদ্যার বিশদ চর্চা হতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে আরও নূতন সিদ্ধান্ত রচিত হয়। এদের মধ্যে সূর্যসিদ্ধান্ত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।

পরমার নৃপতিগণের সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যে মালব বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। উজ্জয়িনী সে সময়েও নিজ কীর্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিল। পরমার নৃপতিগণ শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ সময়ে উজ্জয়িনীতে সাহিত্য, দর্শন, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয় বিশেষ ভাবে পঠিত হ'ত। হর্ষের সভাকবি বাণভট্ট কাদম্বরীতে বলেছেন যে, "উজ্জয়িনীর অধিবাসিগণ সর্বপ্রকার কলাবিদ্যাতে পারদর্শী, বৈদেশিক ভাষাতে সুনিপুণ, বাক্যবিন্যাসে সুচতুর, সর্ব প্রকার কাহিনীতে সুপণ্ডিত ও শত্রু বিদ্যায় ধুরন্ধর।"

পরমার যুগে উজ্জয়িনীর খ্যাতি এত বিস্তৃত হয়েছিল যে, দূর দেশান্তর হতে উজ্জয়িনীতে বিদ্যার্থিগণ আসতেন। এ সময়ে উজ্জয়িনীতে অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। উজ্জয়িনীতে মহাকালের মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে খোদিত দুটি তালিকা পাওয়া গিয়াছে—একটিতে অক্ষর ও আর একটিতে ব্যাকরণের নিয়ম দেখতে পাওয়া যায়। কি ভাবে উজ্জয়িনীতে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হ'ত তা ঠিক ভাবে বুঝবার পক্ষে এ দুটি তালিকা বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রথমটিতে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রচলিত নাগরী লিপি ও দ্বিতীয়টিতে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রধান প্রধান নিয়মগুলি দেখতে পাওয়া যায়। ছাত্রদের শিক্ষার জন্য এ দুটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল।

গুপ্তযুগের ন্যায় পরমার যুগেও উজ্জয়িনীতে সাহিত্যের বিশেষ চর্চা হ'ত। এ বিষয়ে নৃপতি ভোজ, উদয়াদিত্য, নরবর্মণ ও অর্জুন বর্মণের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। যে সব সাহিত্যিক এ সময়ে উজ্জয়িনীতে বসবাস করতে আরম্ভ করেন তাঁদের ভিতরে সর্বদেবের পুত্র ধনপালের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

এ সময়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও আলোচনা উজ্জয়িনীতে খুব হ'ত। এই নগরী দর্শনশাস্ত্রের চর্চার কেন্দ্র বলে এত খ্যাত হয়েছিল যে শঙ্করাচার্য এখানে আগমন করেছিলেন এবং এক পাশুপতাচার্যকে তর্কে পরাস্ত করেছিলেন।

বিজ্ঞানের চর্চাতেও এ যুগে উজ্জয়িনী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। পরবর্তী যুগের প্রসিদ্ধ মুসলমান পর্যটক ও লেখক আল বেরোনি লিখেছেন কি প্রকারে রসায়নবিদ্ ব্যক্তি এখানে বিজ্ঞানের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

পূর্ববর্তী যুগের ন্যায় এ যুগেও উজ্জয়িনী জ্যোতির্বিদ্যার সবচেয়ে বড় শিক্ষাকেন্দ্র বলে পরিগণিত ছিল। রাজ মৃগাঙ্ক নামক জ্যোতির্বিদ্যার একখানি গ্রন্থ পরমার নৃপতি ভোজ কর্তৃক রচিত বলে ধরা হয়েছে; কিন্তু কাহারও মতানুসারে এই গ্রন্থটি তাঁর সভা জ্যোতির্বিদ বিদ্যাপতির দ্বারা রচিত হয়েছিল।

উজ্জয়িনীতে কি কি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হ'ত তার বিশদ বিবরণ না পেলেও তার আভাস নৃপতি ভোজের উদয়পুর প্রশস্তি হতে জানতে পারা যায়। এতে পঁচিশখানা গ্রন্থের উল্লেখ আছে যেগুলি নাকি নৃপতি ভোজ কর্তৃক রচিত হয়েছিল। এগুলির বিষয়বস্তু হচ্ছে সাহিত্য, দর্শন, জ্যোতিষ, চিকিৎসা শাস্ত্র, ধর্ম, শব্দবিজ্ঞান, শিল্পকলা, ব্যাকরণ, স্থাপত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র। বর্তমান মতানুসারে নৃপতি ভোজ এ সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেন নি; তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। অবশিষ্ট গ্রন্থ তাঁর অনুগৃহীত পণ্ডিতগণের দ্বারা রচিত হয়েছিল। যে সব বিষয় নিয়ে এ সকল গ্রন্থ রচনা করা হয়েছিল সে সব বিষয় উজ্জয়িনীতে নিশ্চয়ই পঠিত হ'ত।*

* অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর সাহিত্য-বাসরে পঠিত এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

বাঁধ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

১৭

এমনি করিয়াই তাহাদের দিন কাটিতে থাকে। মৃন্ময় আজকাল আবার নূতন করিয়া পড়াশুনায় মন দিয়াছে। রাজাবাবুর গ্রন্থাগারেই ইদানীং বেশীর ভাগ সময় তাহার কাটিয়া যায়। মহীপাল ক্ষুব্ধ হয়—অনুযোগ দেয়। মৃন্ময় শুধু হাসে, কোনও জবাব দেয় না। রাজাবাবু মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দেন। মৃন্ময়কে তিনি ভুল বুঝিয়াছিলেন। প্রকাশ্যে বলেন, জানেন মৃন্ময় বাবু, পয়সা থাকাটাও যেমন পাপ, ওটা না থাকাও তেমনি পাপ। মৃন্ময় একাগ্র চিত্তে পড়িতেছিল, অকস্মাৎ চমকাইয়া উঠিল। বলিল, আমাকে কিছু বলছেন নাকি ?

হ্যাঁ বলছি। রাজাবাবু জবাব দিলেন, কত সামান্য কারণ থেকে ভুলের সৃষ্টি হয় অথচ এই সামান্যকে গায়ে না মাখলে কত সহজে গোল মিটে যায়।

মৃন্ময় বলিল, কিন্তু সব সময় মানুষ তা পারে কোথায়। মানুষের মনেই বাসা বেঁধে আছে সন্দেহ আর অবিশ্বাস। এর থেকে মুক্ত থাকা সহজ নয়।

রাজাবাবু বলিলেন, আপনি চমৎকার কথা বলতে পারেন, কিন্তু আর আপনাকে বিরক্ত করব না—আপনি পড়ুন।

রাজাবাবু চলিয়া গেলেন, কিন্তু মৃন্ময় আর পড়ায় মন দিতে পারিল না। কিছু দিন হইতেই থাকিয়া থাকিয়া তার মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। এমন অনেক কথা, এমন অনেক ঘটনা আসিয়া হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছে—যাহা সে কোন দিন মনে স্থানও দেয় নাই। আজ এই নির্ব্বাসিত জীবনের পথে সেই সব অতি তুচ্ছ ঘটনাগুলিই অসামান্য হইয়া উঠিয়াছে। একটা অভিনব অনুভূতিতে তাহার সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন হইয়া যায়। মঞ্জুষা আজ কোথায় কেমন আছে এ খবর সে রাখে না। জানিবার উপায়ও নাই, কিন্তু তাহার কথা ভাবিতে বসিলে আর একটি মেয়ে আসিয়া তার মনের একাংশ জুড়িয়া বসে। সে লিলি। নিজের দুঃখটা তাই আর বড় হইয়া উঠিতে পারে না। বুঝিবার ভুলের জন্য আজ মঞ্জুষার এবং তার মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হইলেও তারা একে অপরকে আজও অবজ্ঞার চোখে দেখে না, কিন্তু লিলির বেলায় দাঁড়াইয়াছে অন্যরূপ, সে হইয়াছে একেবারে নিরবলম্ব। ঘৃণার বিষে তার সারা অন্তর জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে—খানিক কাল্পনিক আনন্দ পাইবার মত সম্বলও ত তার নাই।...

ভাবিতে ভাবিতে মৃন্ময় একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। এমনি ভাবে বেশ কিছুক্ষণ কাটিল। এতক্ষণ তার একটি পৃষ্ঠাও পড়া হয় নাই। মৃন্ময় বুঝিল, আজ আর কোন কাজ হইবে না। এই মুহূর্ত্তে নিজেকে তাহার বড় একলা মনে হইল, মানুষের সঙ্গ লাভের জন্য মন তার সহসা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এমন মাঝে মাঝে হয়। জীবনটা স্বাদহীন, রসহীন প্রস্তরখণ্ড নয়। এই পৃথিবীর মৃত্তিকার উপরে দাঁড়াইয়া নিয়ত সে দেখিতেছে জীবনের বিপুল সমারোহ। যে মাটি হইতে মানুষ ও প্রকৃতি উভয়ে আহরণ করিতেছে প্রাণরস তারই সঙ্গে যেন তার নাড়ীর যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে—সে যেন শূন্যে ঝুলিতেছে ত্রিশঙ্কুর মত।

সহসা মহীপাল ডাকিল, মাষ্টার মশাই—

স্বপ্নলোক হইতে মৃন্ময় সহসা যেন বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিল। তাহার দু'চোখে কেমন এক প্রকারের বিহ্বলতা—অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষার এক বেদনাময় অভিব্যক্তি ;

মহীপাল পুনরায় ডাকিল। মৃন্ময় এতক্ষণে কতকটা ধাতস্থ হইয়াছে। সে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, পড়তে পড়তে বড্ড অন্যমনস্ক হঁয়ে পড়েছিলাম। একেবারেই খেয়াল ছিল না। কিছু বলবে আমায় মহীপাল ?

হাঁ—মহীপাল বলিল, চলুন না খানিক বেড়িয়ে আসি। যাবেন ? কোন অসুবিধা হবে না ত ?

মৃন্ময় কহিল, না অসুবিধে আবার কি। মাথাটা ধরেছে বেড়িয়ে এলে একটু ভাল বোধ করব হয়ত।

মহীপাল বলিল, আপনার শরীরটা কি তেমন ভাল যাচ্ছে না মাষ্টার মশাই ?

বাধা দিয়া মৃন্ময় কহিল, না বেশ ভালই আছি ত। মাথাটা একটু ভারী বোধ হচ্ছে। তা অনেকক্ষণ একদৃষ্টে বইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকার দরুনই বোধ হয়।

মহীপাল বলিল, আমি তিনবার এসে ঘুরে গেছি। আপনি কিন্তু একেবারেই পড়ছিলেন না। অথচ—

মৃন্ময় একটু হাসিয়া বলিল, হাঁ টের পেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি ডাক নি বলে আমিও সাড়া দিই নি।

মহীপাল বলিল, আপনি হাসছেন, কিন্তু আমি সত্যিই আশ্চর্য্য হয়ে আপনাকে দেখছিলাম।

স্মিত হাস্যে মৃন্ময় কহিল, অবাক হয়ে দেখবার কি ঘটেছিল মহী ?

মহীপাল বলিল, সে আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না, কিন্তু ভারি আশ্চর্য্য লাগছিল আপনাকে।

মৃন্ময় আবার হাসিল, বলিল, ও কিছু নয়—চলো কোথায়

যাবে বলছিলে না। কিন্তু যাওয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের হইল না। লিলি খবর পাঠাইল এখনই বাংলোয় ফিরিতে হইবে। বিশেষ প্রয়োজন আছে নাকি।

মৃন্ময় বলিল, তোমার দিদিমণি ডেকে পাঠিয়েছেন। আজ আর তোমার সঙ্গে যাওয়া হ'ল না মহীপাল।

মহীপাল বলিল, সে ত শুনতেই পেলাম মাষ্টার মশাই। মৃন্ময় চলিয়া গেল।

মৃন্ময় বাংলোয় ফিরিবামাত্র লিলি আসিয়া হাসিমুখে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। খুশী হইয়া বলিল, খবরটা তা হলে ঠিক সময়ই পৌঁছে দিয়েছে মিনুদা।

তা দিয়েছে। মৃন্ময় কহিল, কিন্তু এমন জরুরি তলব কেন লিলি?

লিলি জবাব দিল, বলছি, কিন্তু তার আগে কিছু খেয়ে নাও। তুমি হাত মুখ ধুয়ে বসো, আমি এখুনি নিয়ে আসছি। লিলি চঞ্চল চরণে প্রস্থান করিল।

মৃন্ময়ের চোখেমুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল। লিলির চলায় বলায় অকস্মাৎ যেন প্রাণচাঞ্চল্যের জোয়ার আসিয়াছে। কিন্তু ভাবিবার সময় কম। মৃন্ময় অল্পক্ষণেই হাত মুখ ধুইয়া ফিরিয়া আসিল। লিলিও সঙ্গে সঙ্গে হাজির—পিছনে লছমিয়া খাবার বহিয়া আনিয়াছে। আহার্য্যের প্রাচুর্য্যে মৃন্ময় বিস্মিত হইল, বলিল, এ সব কি লিলি? সারাদিন বসে আজ কি এইগুলোই করেছ?

লিলি হাসিমুখে বলিল, নইলে সময় কাটাই কেমন করে মিনুদা। তোমার মত আমার জন্তে ত কেউ তাঁর পাঠাগার খুলে রাখেন নি—

মৃন্ময় পরিহাস-তরল কণ্ঠে বলিল, তা রাখলেও তুমি পারতপক্ষে ওদিক মাড়াতে না। তার চেয়ে বোধ করি রান্নার নূতন নূতন প্রণালী আবিষ্কারের দিকে তোমার আগ্রহ বেশী।

লিলি তেমনি হাসিমুখে জবাব দিল, তুমি মিথ্যে বলো নি মিনুদা, কিন্তু এই আবিষ্কারকে কখনো ছোট করে দেখো না। তোমাদের অধ্যয়ন আর গবেষণার চেয়ে এর মূল্য ঢের বেশী।

মৃন্ময় খুব একচোট হাসিল। লিলি চোখেমুখে গাম্ভীর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়া কহিল, এটা বুঝি হাসির কথা হ'ল?

হয় নি বুঝি? মৃন্ময় বলিল, কিন্তু নিজেও যে হাসি চেপে রাখতে পারছ না লিলি। বলিয়া সে পুনরায় হাসিয়া উঠিল।

লিলি সে হাসিতে যোগ দিল না। বলিল, এমনি করেই তোমরা সত্যকে সব সময় অস্বীকার করো মিনুদা, কিন্তু এসব কথা এখন থাক, খাবারগুলোর একটা গতি করো।

মৃন্ময় কহিল, তুমি খাবে না?

লিলি কহিল, এগুলো সবই তোমার একলার জন্তে এনেছি নাকি? বলিয়া কত খাবারগুলি ভাগ করিয়া মৃন্ময়ের অংশ তার দিকে ঠেলিয়া দিল এবং নিজেরটা টানিয়া লইয়া কহিল, নাও তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও মিনুদা।

মৃন্ময় বলিল, এত তাড়া কিসের লিলি—

লিলি কহিল, ঐ দেখ আসল কথাই তোমায় এখনও বলা হয় নি। আমার সঙ্গে একবার তোমায় যেতে হবে মিনুদা। আমার একটি ছাত্রীর কিছুদিন ধরে শরীর খারাপ যাচ্ছে—তার একটা খোঁজ নিয়ে আসব আর সেই সঙ্গে খানিকটা বেড়ানোও হবে।

মৃন্ময় বলিল, কোন্‌টা মুখ্য লিলি?···

উত্তরে লিলি বলিল, এ প্রশ্ন অনাবশ্যক মিনুদা। তার চেয়ে বলো ক্ষীরের লুচি কেমন হয়েছে?

মৃন্ময় ততক্ষণে একটা লুচি মুখে পুরিয়াছে, সে ইঙ্গিতে জানাইল যে, জবাবটা সে পরে দিতেছে। মৃন্ময়ের রকম দেখিয়া লিলি কৌতুক বোধ করিল। অনেকদিন এমন সহজ এবং স্বচ্ছন্দ ব্যবহার তাহার নিকট হইতে সে পায় নাই। হঠাৎ আজ মৃন্ময়ের কি হইয়াছে তাহা না বুঝিলেও একটা অকারণ পুলকে তাহার সারা দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

মৃন্ময় এতক্ষণে কথা কহিল, মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক লিলি। এ যা তৈরি করেছ মনে হচ্ছে গবেষণা আর অধ্যয়নের চেয়ে এর স্বাদ অনেক বেশী। কিন্তু তোমার উপর আজ আমি রীতিমত চটে গেছি।

লিলি হাসিমুখে কহিল, ক্ষীরের লুচি আর সরপুরিয়া খাওয়ানোর জন্তে?

মৃন্ময় বলিল, না—এতদিন ঠকিয়ে এসেছ বলে।

লিলির চোখমুখ খুশীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। স্নিগ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, সত্যিই ভাল হয়েছে মিনুদা? বাড়িয়ে বলছ না ত?

মৃন্ময় পুনরায় একটা সরপুরিয়া মুখে দিয়া ইশারায় জানাইল যে, সে বাড়াইয়া বলে নাই।

অল্পক্ষণ পরে উভয়ে বাহির হইয়া পড়িল। হাসি গল্পে আজ সারাটা পথ মুখরিত করিয়া তাহারা আগাইতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত লিলির ছাত্রীর বাড়ীতে যাওয়াই হইল না। সেখানে গেলে হয়তো সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফেরা হইবে না এই ওজুহাতে তাহারা সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিল। কিন্তু এ যে নিছক আত্মপ্রবঞ্চনা সে কথা তাহাদের মনের অগোচর রহিল না। কাছাকাছি একটা পাহাড়িয়া ঝর্ণার কাছে বসিয়া বসিয়া তাহারা অনেকটা সময় নীরবে কাটাইয়া দিল। অকস্মাৎ মৌনভঙ্গ করিয়া লিলি বলিয়া উঠিল, জান মিনুদা অনেক দিন পরে আজ আমার মনে হচ্ছে যে, আমি এখনও বেঁচে আছি। আমার দেহের রক্ত চলাচলের শব্দ আজ যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। মানুষের মন বড় বিচিত্র মিনুদা। কিছুদিন আগেও মনে হয়েছিল যে, আমার
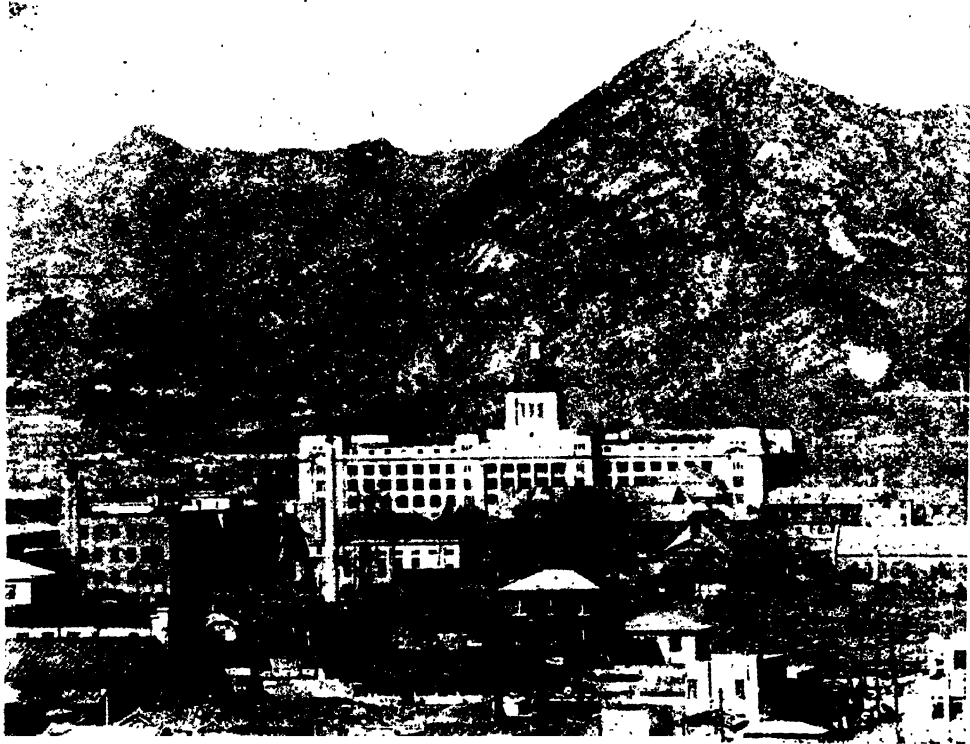
দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলের একটি দৃশ্য

নিউইয়র্কে উত্তর আটলান্টিক অঞ্চলের বারটি রাষ্ট্রের বৈদেশিক সচিবদের সম্মেলন

আই. এ. এফ-এর দুইটি বিমান আসামের ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত
ডুমডুমায় খাদ্যবস্তু নিক্ষেপ করিতেছে

নিউইয়র্কে রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদের নবনির্মিত উনচল্লিশ
তলাবিশিষ্ট সেক্রেটারিয়েট ভবন

আসল সত্তাটা যেন মরে গেছে। আজ মনে হচ্ছে ওটা ভ্রম, কিছুদিন অচেতন থাকবার পর নিজেকে যেন আজ আবার আমি ফিরে পেয়েছি।

মৃন্ময় নিঃশব্দে লিলির কথাগুলি শুনিতেছিল। প্রশ্ন করিয়া বাধার সৃষ্টি করিল না। লিলি যেন ছোট্ট বালিকার মত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। মৃন্ময়ের ভারি আশ্চর্য্য লাগিতেছিল।

লিলির কণ্ঠস্বর আবেগে গাঢ় হইয়া উঠিল। সে বলিতে লাগিল, এক এক সময় আমার মনে হয় মিনুদা যে, সুনির্ম্মল শত্রুতা করতে গিয়ে আমার বন্ধুর কাজই করেছে, নইলে তোমার সাক্ষাৎ···সহসা মৃন্ময়ের মুখের পানে দৃষ্টি পড়িতেই সে মাঝ পথে থামিল। এক মুহূর্ত্তে সে অনেক কথা চিন্তা করিয়া লইল—এতক্ষণ ধরিয়া সে যত কথা বলিয়াছে তাহা এক একটি করিয়া মনে পড়ায় নিজের কাছেই সে যেন ছোট হইয়া গেল। লিলির মুখে বড় সুন্দর একটুখানি হাসির রেখা দেখা দিয়া পর-মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গেল। সে সংযমের রাশ দৃঢ় হস্তে টানিয়া ধরিল। প্রকাশ্যে কহিল, তুমি বোধ হয় ভয় পেয়ে গেছ আমার রকম দেখে, না মিনুদা? অনেক দিন পরে পুরনো আর এক-ঘেয়ে গণ্ডির বাইরে এসে হয় তো একটু আত্মবিস্মৃতি ঘটেছিল তাই ঐ ঝরণার জলোচ্ছ্বাস দেখে মনটাও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তুমি সত্যিই অদ্ভুত মিনুদা।—লিলির কণ্ঠস্বরে বেদনা এবং হতাশার আভাস। মৃন্ময় তাহা লক্ষ্য করিল না বরং লিলির কথাটা এক প্রকার মানিয়া লইয়াই বলিল, ভয় ঠিক নয়, কিন্তু সত্যিই ভারি আশ্চর্য্য লাগছিল আমার।

লিলি বলিল, দিনরাত সর্ব্বাঙ্গ একটা মিথ্যা খোলসে ঢেকে রেখে নিজের আসল চেহারাটাকেও যেন ভুলে গিয়ে-ছিলাম। যেমনি বাইরে এসে আত্মপ্রকাশ করতে গেলাম—তোমরা হলে বিস্মিত। বুঝলাম আমার আমিত্বটুকু মরে গেছে, খোলসটাই সত্য হয়ে উঠেছে। সেই ভাল, সত্য আমার বুকের মধ্যেই থাক।···লিলির চোখে মুখে একটা স্নিগ্ধ আভা ফুটিয়া উঠিল।

মৃন্ময় একটু জোরে ডাকিল, লিলি—তাহার বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। সত্যই লিলির এ যেন আর এক রূপ—যার সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে তার পরিচয় ঘটে নাই।

লিলি হাসিল। তার ঠোঁট দুখানি থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। চোখে গভীর উজ্জ্বল দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে জ্বালা নাই—আছে অন্তরের আকুতির প্রকাশ। মৃন্ময় স্নিগ্ধ শান্ত কণ্ঠে পুনরায় ডাকিল—লিলি—

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া লিলি সাড়া দিল, জান মিনুদা ঠিক এইজন্যেই বহুদিন তোমার কথার অবাধ্য আমি হয়েছি। এখানে এসেই জীবনটা আমার গানের মত সুন্দর হয়ে ওঠে—তার রেশ আমায় মুগ্ধ করে···চঞ্চল করে তোলে। আমি কান পেতে শুনি, সব ভুলে যাই। কিন্তু এখানে আর একটি মুহূর্ত্ত নয়, এর পরে ফিরে যেতে প্রাণান্ত হবে।

লিলি তার এই ভাবান্তরের যত কৈফিয়ৎই দিক না কেন মৃন্ময়ের কাছে সে আজ আরও খানিকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাপারটা মৃন্ময়কে নূতন করিয়া ভাবাইয়া তুলিল।

বাংলোয় ফিরিয়া লিলি সোজাসুজি নিজের ঘরে চলিয়া গেল। মৃন্ময়ও তার ঘরে আসিয়া বিছানার উপর হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। এ ভাবে বেশ কিছু সময় কাটিল। কতক্ষণ তাহা তার নিজেরই হুঁস নাই। সম্ভবতঃ ইতিমধ্যে সে খানিক ঘুমাইয়া লইয়াছে। সহসা লিলির আহ্বানে চমকাইয়া উঠিল।

লিলি বলিল, ওকি সেই থেকে শুয়ে রয়েছ। বাইরের কাপড় জামা ছাড়তেও তোমার সময় হ'ল না। কত রাত হয়েছে তা জান। নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। খাওয়া-দাওয়ার কথাও কি ভুলে গেছ তুমি। নাও ওঠো—

লিলি প্রস্থান করিল।···পরস্পরবিরোধী দুইটি রূপ। নিভৃত নির্জ্জনতায়, ঝরণাতলায় লিলির যে রূপের সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছিল তার সহিত কোথাও যদি একবিন্দু মিল থাকে। আশ্চর্য্য!

লিলি পুনরায় দেখা দিল। মৃন্ময় তখনও চুপ করিয়া বসিয়া আছে। লিলি বলিল, কি বলে গেলাম আমি মিনুদা—

মৃন্ময় বলিল, ভাবছি খাব না। তেমন খিদে নেই।

লিলি রাগ করিয়া বলিল, কথাটা আগে বললেই হ'ত, তা হলে আর রান্নার হাঙ্গামা পোহাতে হ'ত না।

মৃন্ময় কহিল, কেন তোমার জন্য—

লিলি হাসিল, কোন জবাব দিল না। কিন্তু আর দ্বিতীয় বার কোন অনুরোধ না করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইতেই মৃন্ময় তাহাকে ডাকিল, দাঁড়াও লিলি, আমিও আসছি।

লিলি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, খিদে না থাকলে জোর করে খাবার দরকার নেই মিনুদা। আমি বরং লছমিয়াকে সব দিয়ে দিচ্ছি।

মৃন্ময় কহিল, তা দিতে হয় দাও, কিন্তু তোমার ক্ষীরের লুচি আর সরপুরিয়া থাকে ত খানকয়েক দিয়ে যেও।

লিলি হাসিয়া প্রস্থান করিল। কিছু পূর্ব্বে তার চতুর্দ্দিকে যে খণ্ড মেঘের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল মৃন্ময়ের শেষ কথায় তাহা এক নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

১৮

একটু বেলায় আজ মৃন্ময়ের ঘুম ভাঙিয়াছে। এমন বড় একটা হয় না। প্রত্যূষে ঘুম ভাঙাটা তার নিয়মিত, যদিও নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন দিন সে শয়ন করে না। পড়াশুনা আছে—মাঝে মাঝে রাত জাগিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে।

কাল সারারাত অত্যধিক গরম গিয়াছে। শেষ রাত্রে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা থাকায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

লিলি ইতিমধ্যে বারকয়েক খোঁজ করিয়া গিয়াছে। মৃন্ময় দরজা খুলিতেই তাহার পুনরাবির্ভাব ঘটিল। সে কহিল, তোমার শরীর খারাপ নয় ত?

মৃন্ময় নিদ্রালস চোখে ক্ষণকাল লিলির মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, অসুখ হবে কেন—ঘুমটা সময়মত ভাঙে নি।

লিলি চলিয়া গেল এবং অল্প পরেই চা লইয়া উপস্থিত হইল। চায়ের পেয়ালা টিপয়ের উপর রাখিয়া মৃন্ময়ের হাতে একখানি চিঠি দিল। বলিল, কাল বিকেলের ডাকে এসেছে, লাইব্রেরীতে দিতে ভুলে গিয়েছিল। সম্ভবতঃ নান্টুবাবুর চিঠি। লিলি প্রস্থান করিল।

চিঠিখানি নান্টুই লিখিয়াছে। মৃন্ময় তখুনি পড়িতে বসিল।

'মিনু

তোমার দ্বিতীয় চিঠিও আমি যথাসময়ে পেয়েছি। কিন্তু কিছুদিন ধরে নিজেকে নিয়ে একটু বেশী ব্যাপৃত থাকায় অন্য কোন দিকে দৃষ্টি দেবার অবসর হয় নি। কিন্তু মনে হচ্ছে জবাবটা এখন যদি না দিই তা হলে ভবিষ্যতে আবার কবে সময় পাব সে একটা সমস্যার কথা।

লীলা রাওয়ের সঙ্গে আমার শেষ পর্য্যন্ত বনল না। কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারলাম না। কি বিপুল অর্থের মালিক সে হয়েছে তা কল্পনা করতেও পারবে না। বোম্বাইয়ের মালাবার পাহাড়ের উপর তার নূতন বাড়ী হয়েছে। শুনতে পাই দশ লাখের বেশী তাতে খরচ পড়েছে। কিন্তু লীলা বলে, দশ লক্ষ টাকার যে বাড়ী হ'ল তাকে নিরাভরণ রাখতে পারি না নান্টু—উপযুক্ত ভূষণের ব্যবস্থা করো। তাকে জবাব দিলাম, এত পয়সা খরচ করে ওর দেহে যে সুষমা ফুটিয়ে তুলেছ, সে কি অলঙ্কারে ঢেকে রাখবার জন্যে? থাক না যেমন আছে তেমনি।

লীলা বুদ্ধিমতী, কথার ইঙ্গিতটা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে নিয়েছে, কিন্তু এর পরে আর একটি কথাও সে আমায় বলে নি। আবার নূতন করে সুরু হ'ল আমার দেখাশুনার পালা। দশ লক্ষের মহিমা বৃদ্ধি করার জন্যে তাকে আরও লাখ দুই ব্যয় করতে হ'ল। কথা বলার পথ নিজেই যখন বন্ধ করে দিয়েছি, তখন চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে হ'ল, কিন্তু মন আমার বেদনায় ভারী হয়ে উঠল। পয়সার এত বড় অপচয় ইতিপূর্ব্বে আর কোনদিন চোখে পড়ে নি। বিদেশী চিত্রকরদের ছবির প্রতিলিপি এল অনেক। ইটালিয়ান শিল্পী পিয়ের দি কসেমোর "প্রোক্রিসের মৃত্যু", আলবার্তানিলের "সাক্ষাৎ", জেমতিল বেল্লেনির "ম্যাহমেট", ক্রিভেল্লির "ম্যাডোনা এবং শিশু", রাফায়েলের "ম্যাডোনা ডি ভান সিদো" আজ লীলার ড্রয়িং রুমের শোভা বর্দ্ধন করছে। শুধু কি এই—নেদারল্যাণ্ডসের শিল্পী ভ্যানডাইক, জার্মানীর ক্রানাখ, স্পেনের থামো এবং পুজিস, ফ্রান্সের দাভিদ ও করোত, ইংরেজ শিল্পী হগার্থ এবং উইলসনের ছবিও বাদ পড়ে নি। আর এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আসবাবপত্র পাঠিয়েছে বিদেশী কোম্পানী হোয়াইটওয়ে লেইড ল।

লীলাকে ডেকে বললাম, তোমার বয় বাবুর্চ্চির এলাকায় আর একখানা ঘর পাওয়া যায় না লীলা?

লীলা বিস্মিত ভাবে চেয়ে থাকে। এতটা হয়তো সে আশা করতে পারে নি। বললাম, নইলে একেবারেই যে হারিয়ে যাব।

লীলার চোখমুখ আরক্ত হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পেল তীব্র শ্লেষ। বললে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত আমি কিছুই করি নি নান্টু।

বাধা দিয়ে একটু হেসে জবাব দিলাম, ঠিক সেইজন্যেই আমিও প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই গ্রহণ করতে চাইছি না লীলা।

লীলা রাগে অপমানে লাল হয়ে উঠছে। কিন্তু সত্যিই আমি ওকে অপমান করতে চাই নি। কেনই বা করব। শুধু নিজের সত্তাকে আমি প্রাচুর্য্যের এই জঞ্জালের মধ্যে হারিয়ে ফেলতে চাই না। এতে যদি কেউ ভুল করে রাগ করে তা হলে আমি নাচার। লীলা কিন্তু আমার কথায় এতই রেগে গিয়েছিল যে, পর পর দু'দিন আমার সঙ্গে কথাই বললে না। কতটুকু সময় সে বাড়ীতে থাকে। তৃতীয় দিনে তাকে সামনাসামনি পেয়ে গেলাম। আর নয়। তাকে ডেকে বললাম, আজ এখান থেকে আমি চলে যাচ্ছি লীলা। অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হ'ল না। মনের সায় পেলাম না। তোমার দেওয়া ময়ূরপুচ্ছ আমার অসহ্য ঠেকছে। মনে হ'ল লীলা যেন একটু চমকে উঠেছে, পরমুহূর্ত্তেই তার চোখমুখের ভাব বদলে গেল। রাজ্ঞীর মত দৃপ্ত ভঙ্গীতে আমার মুখের পানে চেয়ে পরুষ কণ্ঠে বলে উঠল, তুমি কি আমায় ভয় দেখাতে চাও নান্টু?

হেসে জবাব দিলাম, তুমি কি তাই মনে করো লীলা?

লীলা পুনরায় দৃঢ় স্বরে বললে, যাচ্ছ যাও, কিন্তু আমাদের সম্পর্ক যেন এইখানেই চিরদিনের মত শেষ হয়ে যায়।

বড় হাসি পেল লীলার শেষ কথাটায়। জবাব দিলাম, আমি মুক্তিই চাইছি লীলা।

লীলার মুখে একটুখানি বাঁকা হাসি দেখা দিল, বললে, দয়া করে এখানে না এলেই হ'ত। আমি নিশ্চয় তোমায় ডেকে আনি নি। ভাল না লাগে চলে যাও, তাই বলে তোমার জন্যে আমার প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তিকে একবিন্দু ক্ষুণ্ণ করতে পারব না।

জবাবটা হাসিমুখেই দিলাম, তা সম্ভব নয় বলেই তো আজ আমায় চলে যাবার প্রয়োজন হয়েছে লীলা। তুমি আরও বড় হও, আরও ঢের বেশী প্রতিষ্ঠা লাভ করো। আমি দূর থেকে শুনেই আনন্দ পাব। কাছে থেকে অংশীদার হতে আমি চাই না।

তখনকার মত লীলা চলে গেলেও বেরিয়ে পড়বার সময় সে এসে আমার পথরোধ ক'রে দাঁড়াল। ওর চোখ মুখের ভাব কেমন থমথমে। কিন্তু লীলা অভিনেত্রী, একথা ভুলে যাই কেমন করে। স্মিতমুখে বিদায় চাইলাম।

লীলা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিলে, এ কর্ত্তব্যবোধ তোমার এতক্ষণ কোথায় ছিল? সাবাস নানু—তোমার তুলনা মেলা ভার। মানুষের কৃতজ্ঞতা বলেও একটা বস্তু থাকা উচিত।

হাসিমুখেই জবাব দিয়েছি, কৃতজ্ঞতাটা একটু বেশী মাত্রায় আছে বলেই এমন করে চলে যাচ্ছি লীলা।

মনে হ'ল লীলা একটু দমে গেছে। কিন্তু তা মুহূর্ত্তের জন্ত। পরক্ষণেই সে দৃপ্ত ভঙ্গীতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, আমি যেতে না দিলে তুমি চলে যেতে পার?

এবারে আমার বিস্মিত হবার পালা। বললাম, এটাতো তোমার উপযুক্ত কথা হ'ল না। তুমি আমার চলে যাওয়ায় বাধা দেবে কিসের জন্ত আর আমিই বা সে বাধা মানব কেন লীলা!

লীলা সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলে, কেন আমি কি তোমার কেউ নই? অন্ততঃ বান্ধবী বলেও কি দাবি করতে পারি না?

জবাব দিলাম, অবশ্যই পার লীলা, কিন্তু তার একটা সীমা থাকা উচিত।

লীলা পুনরায় বললে, যখন কোন কথাই তুমি শুনবে না তখন আমি আর কি করতে পারি, কিন্তু এমন রিক্ত নিঃসম্বল অবস্থায় এই বিদেশে বিভুঁয়ে বিপদে পড়বে যে। না হয় কিছু টাকা পয়সা নিয়ে যাও—

বললাম, না লীলা, তাও নেব না। আমার আদর্শকে বলি দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চাই না।

লীলার চোখ দুটি সহসা জলে উঠল। সে তার আর এক মূর্ত্তি। আমি তার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পথের মানুষ আবার পথেই এসে দাঁড়িয়েছি। আবার নূতন করে সুরু হ'ল একলা পথ চলা। কোথায় কখন থাকি, কোথায় যাই তার কিছুই নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এতক্ষণ ধরে শুধু নিজের কথাই লিখে গেছি। তোমার চিঠির জবাব এখনো দেওয়া হয় নি।

তোমার পাঠশালার পরিকল্পনাটি ভাল হলেও আমার মনে হয় এ কাজে তোমার হাত না দেওয়াই উচিত হবে। লোকে তোমায় ভুল বুঝবে। তা ছাড়া যে কাজের মধ্যে সত্যিকারের প্রেরণা থাকে না, তা কখনও সার্থক হয়ে ওঠে না। ওসব তোমার আমার জন্তে নয়। মিথ্যে শুধু জল ঘাঁটাই সার হবে—কাজ কিছুই হবে না। শুনতে পাই মহুও নাকি তোমারই মত কি সব কাজ নিয়ে মেতে উঠেছে। তোমাদের আজও আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি মিনু। মনে মুখে তোমরা সম্পূর্ণ আলাদা। এর কি সত্যই কোন প্রয়োজন আছে? এর সার্থকতা কতখানি!

মনে হচ্ছে লিলির বেশ বুদ্ধি আছে। তাকে জানবার চেষ্টা করো না। তাতে খানিকটা বিপদ আছে। মানুষ সব সময়ই দোষ গুণ, সবলতা দুর্ব্বলতা নিয়ে মানুষ—যখন আত্মরক্ষা করবার আর কোন পথ থাকে না তখন তার বুদ্ধিকে ছাপিয়ে আর একটি বস্তু বড় হয়ে ওঠে—আমার এ কথাটা মনে রেখো মিনু।...

তোমার কাছে যাবার জন্ত লিখেছ। কথা দিতে পারছি না। তবে পথ চলতে চলতে যদি ও রাস্তায় গিয়ে পড়ি সে আলাদা কথা।

আজ এই পর্য্যন্ত। খুব শীঘ্রই আবার চিঠি দেব।

ইতি—নানু'

চিঠিখানি শেষ করিয়া মৃন্ময় সযত্নে বাক্সে রাখিয়া দিল।

লিলি ফিরিয়া আসিল, কিন্তু মৃন্ময়কে চুপচাপ বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অনুযোগ দিয়া কহিল, এখনও বসে আছ—চা খেতে হবে না?

মৃন্ময় একটু হাসিয়া কহিল, শুধু চা খাব?

লিলি কহিল, খানকয়েক ক্ষীরের লুচি এখনও আছে। খাও ত নিয়ে আসি।

মৃন্ময় বলিল, এ আবার একটা জিজ্ঞেস করবার কথা হ'ল নাকি। তোমার পেটুক মিনুদাকে আজও চিনলে না?

বেলা আটটা বাজিয়া গিয়াছে। আকাশ মেঘে ছাইয়া আছে। এখনো সূর্য্যের মুখ দেখা যায় নাই। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে। মৃন্ময় পুনরায় শুইয়া পড়িল। আজ আর উঠিতে ইচ্ছা করিতেছে না। বিছানায় বসিয়াই মৃন্ময় চায়ের পাট শেষ করিয়া ফেলিল, লিলিকে বলিল, তোমার লছমিয়াকে দিয়ে মহীপালকে একটা খবর পাঠিয়ে দিও, নইলে এসে আবার বিশ্রামের ব্যাঘাত জন্মাবে।

লিলি হাসিয়া কহিল, আজ কি সত্যিই কোথাও বেরুবে না ঠিক করেছ?

মৃন্ময় কহিল, ঠিক তাই—

লিলি প্রস্থান করিল এবং খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, পাঠিয়ে দিয়ে এলাম। শরীর খারাপ তাই যেতে পারবে না এই কথা বলতে বলে দিলাম, কিন্তু ভাবছি এতে কি রেহাই পাবে? বরং আমার মনে হচ্ছে এতে তাকে আরও বেচে ডেকে আনা হচ্ছে।

মৃন্ময় সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, তুমি ঠিক

কথাই বলেছ লিলি। দেখ ত লছমিয়াকে ফেরাতে পার কিনা ?

লিলি হাসিয়া ফেলিল। বলিল, তা হলে তোমাকেই উঠতে হবে। এতক্ষণে সে বহু দূরে চলে গিয়েছে। ছুটে না গেলে নাগাল পাওয়া যাবে না।

মৃন্ময় পুনরায় শুইয়া পড়িল। বলিল, তা হলে আর গিয়েও কাজ নেই। কিন্তু মহীপালের ভার তুমিই নিও। যা হোক কিছু বলে বিদায় করে দিও।

মৃন্ময়ের কথায় লিলি খানিক হাসিয়া অন্ত প্রসঙ্গে উপস্থিত হইল, বলিল, কি লিখেছেন তোমার নান্টুদা—ভাল আছেন ত ? সত্যিই এই খাপছাড়া লোকটিকে মাঝে মাঝে দেখতে ইচ্ছে হয়। জান মিনুদা সংসারের ভিড়ের মধ্যে বহু লোকের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ আমার কোন দিন হয় নি, কিন্তু যাদের সম্বন্ধে সামান্ত কিছু জানবার সুযোগ আমার হয়েছে তাদের পাশাপাশি রেখে মাঝে মাঝে আমি বিচার করে দেখি। বড় আশ্চর্য্য লাগে।

মৃন্ময় কহিল, হঠাৎ একথা কেন লিলি ?

লিলি বলিল, এই ধরো সুনির্ম্মল, তার পরে তুমি, তোমার মুখ থেকে শুনে জানলাম নান্টুবাবুকে। কোন দিক দিয়ে এদের মধ্যে কি এতটুকু মিল আছে। সুনির্ম্মলকে চেনা সহজ, তুমি দুর্জ্ঞেয় না হলেও সহজবোধ্য নও, আবার নান্টুবাবু একেবারেই ধরাছোঁয়ার বাইরে। যতটুকু তার কথা শুনেছি তাতে মনে হয় আশ্চর্য্য মানুষ তিনি।

মৃন্ময় বলিল, আমার মনে হয় অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক এবং খাঁটি মানুষ এই নান্টুদা। জীবনের সুখদুঃখ ভালমন্দকে সহজভাবেই সে মেনে নিতে পেরেছে। তাকে কোন দিন চোখে দেখ নি বলেই তাকে আশ্চর্য্য মনে হয়। নইলে দেখতে তার সম্বন্ধে আমি এক তিল বাড়িয়ে বলি নি।

লিলি বলিল, এখানে আসবার জন্ত লিখেছিলে না ?

মৃন্ময় জবাব দিল, তা লিখেছিলাম, কিন্তু জানিয়েছে ঘটনা-চক্র টেনে নিয়ে গেলে হয়ত এক দিন যেতেও পারি। লীলা রাওয়ের বাড়ী থেকে সে চলে গেছে। লিখেছে পথের মানুষ আবার পথেই এসে দাঁড়ালাম।

লিলি বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলিল, বল কি মিনুদা। লীলা কেমন মেয়ে যে তাকে ছেড়ে দিলে !

মৃন্ময় কহিল, ধরে রাখবার শক্তি না থাকলে রুখবে কিসের জোরে লিলি। বাধা সে ঠিকই দিয়েছিল, কিন্তু নান্টু হাসিমুখে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। আদর্শের যেখানে অপমান নান্টু সেখানে নিয়তির মতই নিষ্ঠুর অথচ এমনি আশ্চর্য্য যে অনাবশুক রূঢ়তা তার কোন আচরণেই প্রকাশ পেতে দেখা যায় না। তাই তো মাঝে মাঝে ভাবি যে এই ভবঘুরে লোকটির যথার্থ মর্য্যাদা হয়তো কোনদিনই হবে না।

মৃন্ময়ের কণ্ঠস্বর সহসা আবেগপূর্ণ হইয়া উঠিল, সে বলিতে লাগিল, প্রথম ছাত্রজীবনে বছর পাঁচ ছয় আমাদের একসঙ্গেই কাটে। আমাদের মধ্যে একটা প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। যেদিন সে কাউকে কিছু না বলে গৃহত্যাগ করেছিল, সেদিন থেকে তাকে দেখতাম কৃপার চক্ষে। কিন্তু এর পিছনে কারণ কিছু ছিল কি না সে খোঁজ পর্য্যন্ত আমরা কেউ নিই নি।

মৃন্ময় সহসা থামিল। বলিল, এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াবে লিলি ?

লিলি উঠিয়া গিয়া এক গ্লাস জল গড়াইয়া দিল। মৃন্ময় এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, তোমাকে মিথ্যে বলব না লিলি। নান্টুদা চলে যাবার পর তাকে ভুলে যেতে আমার খুব বেশী দেরি লাগে নি। জীবনের ছোট বড় নানা উৎসবের মধ্যেও তার কথা তেমন করে কোনদিন অনুভব করি নি। কিন্তু নান্টু আমাকে এক দিনের জন্তও ভোলে নি—তার দুঃখের দিনেও নয়, সুখের দিনেও নয়। অথচ সবচেয়ে আশ্চর্য্য যে কোন বন্ধনকেই সে আজ পর্য্যন্ত পুরোপুরি স্বীকার করে নিতে পারলে না। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তার সত্য পরিচয় হয়ত আজও আমি পাই নি।

মৃন্ময় থামিল। খানিক কি চিন্তা করিল। হয়ত এই অল্প সময়ের মধ্যে সে একবার তার অতীতের দিনগুলির কথাও একটু ভাবিয়া লইল। মৃদু কণ্ঠে পুনরায় বলিতে লাগিল, আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ এবং লজ্জা যে নান্টুদাকে আমি দেখতে গিয়েছিলাম কৃপার চোখে। তার চরম উত্তরও সে আমার দিয়ে গেছে। মঞ্জুষাকে সে স্নেহ করত এ কথা আমি জানতাম, কিন্তু তা যে কত গভীর, এ কথা সে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে, তাকে সম্পূর্ণ হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও মুক্তি দিয়ে। তাই তো আমার মধ্যে দেখা দিলে দ্বিধা। একটা বিরাট্ সমস্তা এসে আমার পথরোধ করে দাঁড়াল। আমি না পারলাম এগিয়ে যেতে, না পারলাম পিছিয়ে আসতে। সব দিক দিয়ে আমার ঘটল পরাজয়।

লিলি নিঃশব্দে শুনিতেছিল। বাহিরের থমথমে প্রকৃতির সহিত ঘরের আবহাওয়ারও যেন চমৎকার মিল হইয়াছে। মৃন্ময় পুনরায় বলিতে লাগিল, নিজেও সুখী হতে পারলাম না—অপরকে সুখী করতে সক্ষম হলাম না। স্থির হয়ে একটা পথও বেছে নিতে পারি নি। কেমন যেন থেমে গেলাম। ঘরকেও স্বীকার করে নিতে পারলাম না, পথে এসে দাঁড়াতেও ভয় পেলাম। মাঝে মাঝে বড় ক্লান্তি বোধ করি তাই কাজের ঝড়ে ক্ষেপে উঠি, কিন্তু এর পিছনে কোন প্রেরণা না থাকার জন্তেই আবার দমে যাই। কথাটা নান্টুদা ঠিকই বুঝেছে, কিন্তু আমি বাঁচি কি করে বলতে পার লিলি।

লিলি এতক্ষণে কথা কহিল, তোমাকে এই মধ্যপথ

ছাড়তে হবে মিনুদা। নইলে তোমার মনের জড়ভাব কোনদিন কাটবে না।

মৃন্ময় মৃদুকণ্ঠে বলিল, কথাটা কি আমি বুঝি না মনে কর লিলি, তবুও কোন নির্দ্দিষ্ট পথে আমি অগ্রসর হতে পারছি না। চেষ্টা করে এগিয়ে গিয়েও আবার ফিরে আসি। শেষ পর্য্যন্ত সবই মিথ্যে হয়ে যায়।

নিজের অজ্ঞাতেই লিলির একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল তোমার মনের উৎস মঞ্জুষা। তাকে বাদ দিয়ে তুমি নির্জ্জীব—তোমার দেহে রক্তের প্রবাহ নেই। কিন্তু এরই নাম কি বেঁচে থাকা মিনুদা? তোমার চারিদিকে শুধু পাষাণ-প্রাচীর—হয় সব ভেঙেচুরে বেরিয়ে এসো নয় অযথা বিলাপ করো না।

লিলির সব কথা মৃন্ময়ের কানে গিয়াছে কিনা তাহা বোঝা গেল না, শুধু একটা কথাই সে বার বার আওড়াইতে লাগিল, মঞ্জুষাই তোমার মনের উৎস—

বাহিরে বাতাস বহিতে সুরু করিয়াছে—সেই সঙ্গে বৃষ্টি। মৃন্ময় একটু নড়িয়া চড়িয়া স্থির হইয়া বসিল। লিলি উঠিয়া গিয়া জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিতে লাগিল। শিয়রের দিকে আসিতেই মৃন্ময় বাধা দিয়া কহিল, ওটা খোলাই থাক লিলি—বড় ভাল লাগছে। জান তুমি ছেলেবেলায় বৃষ্টির সময় কেউ আমায় ঘরে আটকে রাখতে পারত না। মঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে কতদিন যে লুকিয়ে ভিজেছি তার কি কোন হিসেব আছে। বলিয়া মৃন্ময় হাসিল।

লিলি বলিল, আজ আর সে মনও নেই, সে উৎসাহও নেই, শুধু অভ্যাসের দোষে জানালাটা বন্ধ করতে দিলে না মিনুদা।

জানালা-পথে বাহিরের বর্ষণক্লান্ত আকাশের পানে দৃষ্টি ফিরাইয়া মৃদু হাসিয়া মৃন্ময় বলিল, তুমি মিথ্যে বলো নি। তবুও মাঝে মাঝে কেন জানি না আমার মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন অনুভব করি। ক্ষণস্থায়ী একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েই মনটা অবসাদে আরও বেশী করে ভেঙে পড়ে। মানুদার মত ভাবতে চেষ্টা করি—যেখানে যার শেষ করে দিয়েছি সেই-খানেই তার শেষ হয়ে যাক। কিন্তু পেরে উঠি না, বরং জোর টানতে গিয়ে মন আরও বেশী ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

লিলি বলিল, যে ঢিল ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ তার জন্তে অনুতাপ না করে হাতের পাশে আরও যে রয়েছে তার থেকে তুলে নিলেই পার মিনুদা—

মৃন্ময় বার বার মাথা নাড়িতে লাগিল, বলিল, এ তোমার উপযুক্ত কথা হ'ল না লিলি। এই যদি তোমার মনের কথা তবে কেন পড়ে আছ এখানে, কেন তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলির এমন করে অপচয় করছ। যা নিজে পারছ না তা অপরের কাছে আশা করতে নেই।...

লিলির মুখে বড় বিচিত্র একটুখানি হাসি ফুটিয়া উঠিল। এ হাসি চোখে পড়িলে মৃন্ময় চমকিত হইত, কিন্তু তাহার দৃষ্টি তখন বাহিরে নিবদ্ধ ছিল। মৃন্ময় মুখ ফিরাইতেই লিলি বলিল, এ একটা কথাই না। আমি পারি নি বলে আর কেউ পারবে না এ যুক্তি নয়। তা ছাড়া স্থান কাল এবং পাত্র ভেদে বিচার করা উচিত। কিন্তু এ সব আলোচনা এখন থাক। বৃষ্টি থেমে গেছে—দেখি লছমিয়া ফিরে এল কি না। রান্নার ব্যবস্থা করতে হবে ত।

মৃন্ময় কহিল, তোমার এই বড় কাজটা আর কাউকে দিয়ে হয় না লিলি?

লিলির কণ্ঠস্বরে খানিকটা পরিবর্ত্তন ঘটিল। মৃন্ময় বিস্মিত হইল। লিলি বলিল, আমারও সময় কাটাতে হয় যে—এই বড় কাজটাই বরং আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে।

বলিয়াই আর কোন দিকে দৃকপাত না করিয়া দ্রুত ঘর হইতে চলিয়া গেল। মৃন্ময় শুধু তার চলার পথের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, কোন জবাব দিল না।

ক্রমশঃ

গাণ্ডীবী জাগে কই

শ্রীচুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

শত যুগ পরে আজিও হাঁকিছে দুর্ম্মতি কুরুকুল—
নাই শুধু নাই যুগের পার্থ ভাঙিতে তাদের ভুল।
দুর্য্যোধনের বিরাট দম্ভ আজও পুনঃ ধীরে ধীরে
পাণ্ডবগণে পাঠায়ে দিতেছে বনবাসে ফিরে ফিরে।
মরে নাই আজও সমাজ হইতে দুঃশাসনের দল—
চক্রী শকুনী আজও বেঁচে আছে রচিতে নতুন ছল;
নাই শুধু আজ ন্যায়ের প্রতীক বৃদ্ধ সে ধৃতরাষ্ট্র
নাই আজ নাই পার্থ সারথী গড়িতে ধর্ম্মরাষ্ট্র।
ন্যায়েরে দলিয়া দিকে দিকে হল অন্যায় জয়ী ঐ
গড়িতে সমাজ গড়িতে রাষ্ট্র গাণ্ডীবী জাগে কই?

কাব্যে ঋতুমঙ্গল ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীজয়দেব রায়

প্রাচীন সংস্কৃত কবিগণের ন্যায় রবীন্দ্রনাথও ছন্দে-গানে ঋতুমঙ্গল রচনা করিয়াছেন। মহাকবি কালিদাসের ঋতু-সংহার অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্র বিস্তৃত—প্রাচীন কবিগণের ব্যবহৃত অলঙ্কার, উপমা, ব্যঞ্জনা সকলই তিনি লাভ করিয়াছিলেন। দেবমহিমার পরিবর্ত্তে তিনি নানা দৃষ্টিভঙ্গীতে মুগ্ধচক্ষে বিশ্বপ্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। বাংলাদেশের পল্লীজীবনে ছয়টি ঋতুর নৃত্যলীলায় নানা সুরের ব্যঞ্জনা তাহার গ্রামপ্রান্তের বেণুবনে, সহকারশাখায়, দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রে, কালো মেঘে, নবোদিত সূর্য্য-রশ্মিতে রূপ পায়—শিল্পীর দৃষ্টিতে কবি তাহার প্রতিলিপি সুরজালে ধরিয়া রাখিয়াছেন। আমরা—যাহাদের সামান্য অনুভূতি আছে, সেই একই দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া থাকি, আমাদের প্রাণেও দোলা লাগে, কিন্তু আমরা প্রকাশ করিতে জানি না, কবি আমাদের সেই কথাগুলিই সুরে বলিয়াছেন, তাই তা আমাদের এত ভাল লাগে!

প্রকৃতির পূজারী কবি বাল্যকাল হইতে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির লীলা হইতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। এই ব্যবধান তাঁহার মনে প্রকৃতির প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ ও গভীর প্রীতির সৃষ্টি করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, বিশেষতঃ তাঁহার গানে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি অসীম মমতার কারণ—বাল্যকাল হইতে তিনি প্রকৃতির রাজ্য হইতে বহু দূরে মহানগরীর প্রাচীর-বেষ্টিত কক্ষে লালিত হইয়াছিলেন, প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়ের ইচ্ছাই প্রকৃতিকে তাহার নিকট আকর্ষণীয় করিয়াছে এবং আমরাও সেই তাঁহার প্রকৃতি-গাথা উপভোগ করিয়া রস গ্রহণ করিতে পারিতেছি।

বিহারীলালের কাব্য পড়িয়াই 'সুদূরে'র জন্য রবীন্দ্রনাথের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবাকুলতা জন্মে! বিহারীলাল বাংলার রোমান্টিক কবি, তাঁহার রচনায় এই অতৃপ্তির সুর এবং ব্যাকুলতাই রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করিয়াছিল। কবির এই প্রকৃতিপ্রীতি, এই Yearning for Nature, পরে আরও গভীর হইয়াছিল শেলীর কাব্য পড়িয়া। কবি স্বয়ং বলিতেছেন :

> "যে ভাবের উদয় হইলে পরিচিত গৃহকে প্রবাস মনে হয় এবং অপরিচিত বিশ্বের জন্য মন কেমন করিতে থাকে, বিহারীলালের গানেই সেই ভাবের প্রথম প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

সংস্কৃত কাব্যধারায় বাল্মীকি-ব্যাসের রচনা হইতে প্রকৃতির পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করা হইতেছে। জানকীর দুঃখে বসুন্ধরার সমবেদনাই এই প্রকৃতি-প্রীতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

আদিকবির কাব্যে সীতার বিরহে রামচন্দ্রের দুঃখ-বর্ণনায় কবি প্রকৃতিকে প্রাণবন্ত করিয়াছেন, অন্যত্র বর্ণনার মধ্যে প্রকৃতির স্বতন্ত্র স্পন্দন তেমন অনুভূত হয় না; আরণ্য কাণ্ডের (৬০।১২-২০) বিরহের মধ্যে বৈচিত্র্য অল্প :

> অস্তি কচ্চিৎ ত্বয়া দৃষ্টা সা কদম্বপ্রিয়া প্রিয়া।
> কদম্ব যদি জানীষে শংস সীতাং শুভাননাম্।
> স্নিগ্ধপল্লবসঙ্কাশাং পীতকৌষেয়বাসিনীম্।
> শংসস্ব যদি সা দৃষ্টা বিল্ব বিল্বোপমস্তনী।
> অথবার্জ্জুন শংস ত্বং প্রিয়াং তামর্জ্জুন প্রিয়াম্।
> জনকস্য সুতা তন্বী যদি জীবতী বা ন বা।
> ককুভঃ ককুভোরুং তাং ব্যক্তং জানাতি মৈথিলীম্।
> লতাপল্লবপুষ্পাঢ্যো ভাতি হ্যেষ বনস্পতিঃ।
> ভ্রমরৈরুপগীতশ্চ যথা দ্রুমবরো হ্যসি।
> এষ ব্যক্তং বিজানাতি তিলকস্তিলক প্রিয়াম্।
> অশোক শোকাপনুদ শোকোপহতচেতনম্।
> ত্বন্নামানং কুরু ক্ষিপ্রং প্রিয়াসন্দর্শনেন মাম্।
> যদি তাল ত্বয়া দৃষ্টা পক্কতালোপমস্তনী।
> কথয়স্ব বরারোহাং কারুণ্যং যদি তে ময়ি।
> যদি দৃষ্টা ত্বয়া জম্বে জাম্বুনদ সমপ্রভা।
> প্রিয়াং যদি বিজানাসি নিঃশঙ্কং কথয়স্ব মে।
> অহো ত্বং কর্ণিকারাদ্য পুষ্পিতঃ শোভসে ভৃশম্।
> কর্ণিকার প্রিয়াং সাধ্বীং শংস দৃষ্টা যদি প্রিয়া।

বিরহাকুল রামচন্দ্র প্রকৃতির নানা বস্তুকে সীতার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন—ইহাই বক্তব্য।

বাল্মীকির বর্ষা-বর্ণনায় প্রকৃতি স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বর্ষা বিরহের ঋতু; ঝর ঝর ধারা, ঘন কালো মেঘ, গুরু গুরু গর্জ্জন, সচকিত বিদ্যুৎ, কেতকীর সুবাস বিরহ-বেদনকে নিবিড় করিয়া তোলে। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে নবীন মেঘের ছায়ায় রামচন্দ্রের মানসের ছবির সঙ্গে :

> বর্ষোদকাপ্যায়িতশাদ্বলানি
> প্রবৃত্তনৃত্যোৎসববর্হিণানি।
> বনানি নির্বৃষ্টবলাহকানি
> পশ্যাপরাহ্নেষধিকং বিভান্তি।
> নিদ্রা শনৈঃ কেশবমভ্যুপৈতি
> দ্রুতং নদী সাগরমভ্যুপৈতি।
> হৃষ্টা বলাকা ঘনমভ্যুপৈতি
> কান্তা সকামা প্রিয়মভ্যুপৈতি।
> জাতা বনান্তাঃ শিখি সুপ্রনৃত্যা
> জাতাঃ কদম্বা সকদম্বশাখাঃ।
> জাতা বৃষা গোষু সমানকামা
> জাতা মহী শস্যবনাভিরামা।

বহন্তি বর্ষন্তি নদন্তি ভান্তি
ধ্যায়ন্তি নৃত্যন্তি সমাশ্বসন্তি।
নদ্যো ঘনা মত্তগজা বনান্তাঃ
প্রিয়াবিহীনাঃ শিখিনঃ প্লবঙ্গাঃ।

'ঋতুসংহারে'র কবি কালিদাসের মেঘদূত বর্ষাকাব্য—কুমারসম্ভবেও আছে ঋতুরঙ্গের বর্ণনা। কবি নারী-সৌন্দর্য্যকে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের তুলিকায় আঁকিয়াছেন 'কুমারসম্ভবে':

অশোকনির্ভৎসিত পদ্মরাগ
মাকৃষ্টহেমদ্যুতিকর্ণিকারম্।
মুক্তাকলাপীকৃত সিন্ধুবারং
বসন্ত পুষ্পাভরণং বহন্তী।
আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্ক রাগম্।
পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।

'বিক্রমোর্ব্বশী'তে বিরহী রাজা বনভূমির দৃশ্য দেখিতেছেন:

তন্বী মেঘজলার্দ্রপল্লবতয়া ধৌতাধরেবাশ্রুভিঃ শূন্যেবাভরণৈঃ স্বকাল-বিরহাদ্ বিশ্রান্ত-পুষ্পোদ্গমা চিন্তামৌনমিবাস্থিতা মধুলিহাং শব্দৈর্বিনা লক্ষ্যতে চণ্ডী মামবধূয় পাদপতিতং যাতা প্রকুপেব সা।

'ঋতুসংহারে' শরতের প্রকৃতি-বর্ণনায়:

স্ফুট কুমুদচিতানাং রাজহংসাশ্রিতানাং
মরকতমণিভাসা বারিণা ভূষিতানাম্।
শ্রিয়মতিশয়রূপাং ব্যোমতোয়াশয়ানাং
বহতি বিগতমেঘং চন্দ্রতারাবকীর্ণম্।

'মেঘদূত' মহাকবির ঋতুমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। বর্ষার ছায়াঘন গ্রামপ্রান্তে কেতকী-মুকুল, শ্যামল বনভূমি, বকের পাঁতি সব মিলিয়া একটি চিত্র:

পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈ-
র্নীড়ারম্ভৈর্গৃহবলি ভুজামা কুলগ্রামচৈত্যাঃ।
ত্বয্যাসন্নে পরিণত ফলশ্যামজম্বুবনান্তাঃ
সম্পৎস্যন্তে কতিপয় দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ।

বৈষ্ণব কবিগণ ঋতুপ্রকৃতির মধ্যে মন্দাক্রান্তার পরিবর্ত্তে দ্রুত ছন্দের সৃষ্টি করিলেন। বৈষ্ণব-গাথাও বিরহেরই গান, প্রকৃতি সেখানেও সমবেদনায় ব্যথিত। বিদ্যাপতি প্রধানতঃ মিলন-সম্ভোগের কবি, তাঁহার গানেও কিন্তু চিরবিরহের সুর ধ্বনিত হইল। বিদ্যাপতির পদাবলীর সেই অমর গানটি আমাদের হৃদয়কে দোলা দেয়:

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।
ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খরশর হন্তিয়া।
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী, ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।
তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনী
থির বিজুরি পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া।

অলঙ্কারের কবি, রাজসভা-কবি বিদ্যাপতি ঋতুরাজ বসন্তের বন্দনাগীতিও গাহিয়াছেন:

আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবী-পন্থ।
দিনকর কিরণ ভেল পগণ্ড।
কেশর-কুসুম ধরল হেমদণ্ড।
নৃপ আসন, নব পাটল-পাত।
কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধরু মাথ।
মৌলি রসাল মুকুল ভেল তায়।
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায়।
শিখিকুল নাচত, অলিকুল যন্ত্র।
আন দ্বিজকুল পঢ় আশিস্-মন্ত্র।
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম-পরাগ।
মলয়-পবন সহ ভেল অনুরাগ।
কুন্দ বেলী তরু ধরল নিশান।
পাটল তূণ, অশোক দল বাণ।
কিংশুক লবঙ্গলতা এক সঙ্গ।
হেরি শিশির ঋতু আগে দিল ভঙ্গ।
সৈন্য সাজল মধু মক্ষিক-কুল।
শিশিরক সবহু করল নিরমূল।
উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ।
নিজ নবদলে করু আসন দান।
নব বৃন্দাবন রাজ্যে বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার।

বাংলার জয়দেব গীতগোবিন্দের প্রেমগানে বসন্তের শোভা-বর্ণনায় গাহিয়াছেন:

ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে।
মধুকর-নিকর-করম্বিত কোকিল-কূজিত কুঞ্জ কুটীরে।
বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে।
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহি জনস্য দুরন্তে।
উন্মদ-মদন মনোরথ-পথিক বধূজন জনিত বিলাপে।
অলিকুলসঙ্কুল কুসুমসমূহ নিরাকুল বকুল কলাপে।
মৃগমদ সৌরভ রভস বশংবদ নবদল মাল তমালে।
যুবজন-হৃদয় বিদারণ মনসিজ নখরুচি কিংশুক জালে।

এবার রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-প্রেমের কথা আলোচনা করিব। কবি এক সময়ে বলিয়াছেন:

"এই পৃথিবীর সঙ্গে কতদিনের চেনা শোনা। বহু যুগ পূর্ব্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে সেদিনকার নবীন সূর্য্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হ'য়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্য্যালোক

পান করেছিলুম, অন্ধ জীবনের গূঢ় পুলকে নীলাম্বর তলে আন্দোলিত হয়ে, উঠেছিলেম ; মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত, নব পল্লবে ডাল ছেয়ে যেত বর্ষার মেঘের ঘন নীল ছায়া আমার সমস্ত পাতাগুলিকে পরিচিত করতলের মত স্পর্শ করত। তারপরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি ক'রে বস্‌লেই আমাদের পরিচয় অল্প অল্প মনে পড়ে।"

এ সেই কালিদাসের :

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকীভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি।

প্রকৃতি-অবলোকনে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের পথ অনুসরণ করিয়াছেন। সংস্কৃত কবিরা প্রকৃতিকে দেখিয়াছিলেন মুগ্ধ রসিকের চোখে, রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন প্রেমিকের চোখে। সব সময় নানা রঙে রঙীন হইয়া আছে সুন্দরী ধরণী।

ইহার মূল সেই—'রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্ পর্য্যুৎসকিভাব' কিংবা 'মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্য অন্যথা বৃত্তি চেতাঃ···মেঘোদয় দেখিয়া 'গন্ধবি সমীরণে' কবির চিত্ত যেন কার সন্ধান করিয়া ফিরে, কবির বল্লভ আনন্দময় আবেষ্টনীর মধ্যে 'সুন্দর কান্তের আহ্বান' শুনিতে পান।

তাঁহার কবিপ্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতিকে অনুভূতিময় স্তরে লইয়া গিয়াছিল, ইহার মাধুরীকে কবির আনন্দময় সত্তার সঙ্গে একীভূত করিয়া কবি সুরে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতির অন্তরালে চিরসুন্দরের যে ধ্যানময় রূপ কবি তাঁহাকেই প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতির এই রূপ-কল্পনায় তিনি সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন আমাদের সুখ-দুঃখের, বিরহ-মিলনের ভাবময় ক্ষণগুলির। প্রকৃতি-গীতির মধ্যে কবি নানা ভাবেই অরূপের রূপ কল্পনা করিয়াছেন, সুদূরের বাণী কান পাতিয়া শুনিয়াছেন। গানের ভিতর দিয়া কবি নানা ঋতুতে তাঁহার আনন্দময় অরূপকে বিচিত্র-রূপে দেখিয়াছেন :

"ঈশানের পুঞ্জ মেঘে কালবৈশাখীর অন্ধ বেগে
ধেয়ে আসা গতিগন্ধহারা···" রূপে
"নীল গগনে আলোক-ধেনুর রাখাল···" রূপে
"বাদল বরিষণে পিপাসাহরা আঁখি
শীতল করা স্নিগ্ধ সজল···" রূপে
"শ্রাবণ ঘন গহন মোহে গোপন তব
চরণ ফেলে···" রূপে
শিউলিতলার পাশে পাশে ঝরা
ফুলের রাশে রাশে, নয়ন-ভুলানো···" রূপে

এই দেখাই শেষ নয়। প্রতি দিনে প্রতি ক্ষণেই ভিন্ন চোখে কবি ঋতু-রঙ্গ দেখিতেছেন। প্রতি দিনের সকালে ভৈরবী-রামকেলিতে স্নিগ্ধ প্রভাতী হাওয়ায় যে রূপটি দেখিতেছেন, মধ্য দিনে খর সূর্য্যালোকে ছায়া-ঘেরা বনবীথিতে তাহারই অন্য রূপ দেখিতেছেন।

প্রকৃতির গতি বৈচিত্র্যকে কবি চির কল্যাণময়ের দাক্ষিণ্যভরা প্রকাশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন :

এই যে মধুর আলসভরে
মেঘ ভেসে যায় আকাশ 'পরে,
এই যে বাতাস দেহে করে অমৃতক্ষরণ
এই তো তোমার প্রেম ওহে হৃদয়হরণ।

বাংলাদেশের মধুর রূপটি প্রকৃতির স্নেহের দান। কবি তাহার ঋতুপ্রকৃতিকে সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছেন।

সোনার বাংলার বনের নাম-না-জানা ফুল, দোয়েল, শ্যামা, কোকিল, বউ কথা কও, বৈশাখের শীর্ণা নদী, তালতমালের অরণ্য কিছুই তাঁহার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হয় নাই :

কোন্ বনেতে জানিনে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠেরে চাঁদ
এমন হাসি হেসে।

বাউলের চোখে কবি পল্লী বাংলার বিচিত্র রূপ দেখিয়াছেন। ফাল্গুনে আমের বনে বউল যখন ধরে, 'অঘ্রাণে ধানের ক্ষেতে' ঢেউ খেলে যায় যখন, নদীর কূলে নেমে-আসা বটের তলে যখন জল উছলিয়া পড়ে ধেনু-চরা উদার বিস্তীর্ণ মাঠে, পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা পল্লীর প্রান্তরে, ধানে ভরা আঙিনাতে, ধূলামাখা পল্লী পথে—কবি এই বাউলের সুরেই তখন তাঁহার বন্দনা গান গাহিয়া উঠেন :

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।
ওমা ফাল্গুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে, (মরি হায় হায় রে)
ওমা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে,
কি দেখেছি মধুর হাসি।
কি শোভা কি ছায়া গো,
কি স্নেহ কি মায়া গো,
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে,
নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে,
লাগে সুধার মত (মরি হায় হায় রে)
—মা, তোর বদনখানি মলিন হ'লে
আমি নয়নজলে ভাসি।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের সন্ধান পাইয়াছিলেন। প্রকৃতির সঙ্গে এক হইয়া তিনি ঋতুসঙ্গীত রচনা

করিয়াছিলেন। বাংলা কাব্যে প্রকৃতি-গাথার ক্রম-বিকাশধারার অনুসরণ এখানে অবান্তর হইবে না। প্রথমেই আমরা পাই মঙ্গলকাব্যগুলির 'বারমাস্যা'। এইগুলিতে বিভিন্ন ঋতুতে নায়ক-নায়িকার বিচিত্র মনোভাবের বর্ণনা আছে। তাহার পর পদাবলী সাহিত্যে প্রকৃতি রাধার সঙ্গিনী হইলেন, কিন্তু সেখানে প্রকৃতির প্রয়োজন কেবল রাধিকার অনুভূতি প্রকাশের সহায়তার জন্যই।

ঈশ্বর গুপ্তপ্রথম প্রকৃতি-বর্ণনার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মধুসূদন তাঁহার গীতিকবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এবং সীতার বনবাসের কথা বর্ণনায় প্রকৃতির সমবেদনার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। হেমচন্দ্র প্রকৃতি-বর্ণনায় প্রাণস্পন্দন প্রকাশে আশানুরূপ সাফল্যলাভ করেন নাই, নবীনচন্দ্র এই বিষয়ে কতকটা সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের শরৎ ঋতুর রূপ এই প্রকার:

অই দেখ প্রিয়তমে বারিধারা থামিল।
শরতে সুন্দর মহী সুধা মাখি বসিল।
হরিৎ শস্যের কোলে দেখরে মঞ্জরী দোলে
ভানুছটা তাহে কিবা শোভা দিয়া পড়েছে।

নবীনচন্দ্রের প্রকৃতি বর্ণনা এই রূপ:

মরালের কলরব বিহগ কূজন
তরুতলে শূন্যমনে রাখালের গীত;
দূরবহ সন্ধ্যানিলে মধুর হইয়া
বিমোহিত করিতেছে শ্রবণ-বিবর।

আমাদের মনের একটি রসঘন অবস্থায় যখন প্রকৃতির পানে তাকাই এবং মুগ্ধ হই তখনই প্রকৃতি রসবস্তু হইয়া সজীবতা লাভ করে। বাংলাসাহিত্যে বিহারীলালের কাব্যে ইহার সূত্রপাত; তাঁহার প্রকৃতিদেবী এই ধরণের:

বেলা ঠিক দ্বিপ্রহর।
দিনকর খরতর,
নিঝুম নীরব সব—গিরি, তরু লতা।
কপোতী সুদূরবনে
ঘুঘু-ঘু করুণস্বনে
কাঁদিয়ে বলিছে যেন শোকের বারতা।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি শান্তি, কল্যাণ, মঙ্গলের প্রতিরূপ। প্রকৃতির মধ্যে মাতৃস্নেহকে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছিলেন। রবীন্দ্র-কাব্য ঋতুতে ঋতুতে নব নব রূপ লইয়াছে। বৈশাখের দিনে গ্রীষ্মের শুষ্ক তাপস বৈরাগের কথা স্মরণ করিয়াছেন:

হে বৈরাগী কর শান্তি-পাঠ
উদার উদাস কণ্ঠ যাক্ ছুটে দক্ষিণে ও বামে।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা অপেক্ষা বর্ষার শান্তস্নিগ্ধ রূপ তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। বর্ষার অবসাদময় মুহূর্তগুলি তাঁহার মনের মধ্যে হয় বিরহ, না হয় অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া তুলে। আষাঢ়-সন্ধ্যায় তাঁহার ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে:

দূরের পানে মেলে আঁখি
কেবল আমি চেয়ে থাকি
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে।

সৃষ্টির মধ্যে একটি অসম্পূর্ণতার বেদনা আছে, প্রকৃতির দিকে চাহিয়া কবির প্রাণে তাহাই জাগিতেছে, তাই তো এত বিষাদ, এত করুণ সুর। কবির ঋতুমঙ্গলের গানে এই উদাসীনতা প্রকৃতিকে অতি নিবিড় করিয়া অনুভব করার ফল।

তাঁহার প্রকৃতিবর্ণনার প্রধান বৈশিষ্ট্য উহার বৈচিত্র্য। ধ্যানগম্ভীর হিমালয় হইতে ঘাসের উপরকার ক্ষুদ্র শিশির-বিন্দুটি পর্য্যন্ত বিশ্বপ্রকৃতির সকল বস্তুই তাঁহার অন্তরে প্রেরণা জাগাইয়াছে। 'বনবাণী'তে বৃক্ষলতাকে সম্বোধন করিয়া তিনি কবিতা রচনা করিয়াছেন। কুন্দকুসুমকে লক্ষ্য করিয়াও বলিয়াছেন:

শুভ্র ফেনের কুন্দমালায়
বিন্ধ্যগিরির বক্ষ সাজাই,
যোগীশ্বরের জটার মধ্যে
তরঙ্গিণীর নূপুর বাজাই!

বনস্পতির বন্দনা করিয়াছেন:

তুমি বৃক্ষ, আদি প্রাণ
ঊর্দ্ধশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ 'পরে; আনিলে বেদনা
নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে।

উত্তাল সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ রূপ তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে:

লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে'
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে;…

বিদেশী লতা, নাম-না-জানা ফুলকে তিনি অভিনন্দিত করিয়াছেন, দেশী অবজ্ঞাত পুষ্পকে তিনি কাব্যে স্থান দিয়াছেন। প্রকৃতিকে ভালবাসিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার ঋতুচক্রের এই অজস্র গানের ধারা। প্রবাহিণীর 'ঋতুচক্রে'র গান, নটরাজ ঋতুরঙ্গশালায়, ঋতুমালার গান, নবীন বসন্ত এবং বর্ষামঙ্গল শেষবর্ষণের গানগুলিই রবীন্দ্র-নাথের ঋতুমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ অবদান।

রবীন্দ্রনাথ বর্ষার কবি, তাঁহার সঙ্গীতে বর্ষার মহিমময় রূপের পরিচয় আছে। তবে গ্রীষ্মের তাপসমূর্ত্তিও তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। গ্রীষ্মের রিক্ততা, শুষ্কতার মধ্যে তিনি মহানের ধ্যানস্তব্ধ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার এই সর্ব্বশূন্য রিক্ততার ঐশ্বর্য্য বসন্তের পরিপূর্ণ দাক্ষিণ্য অপেক্ষা কম সুন্দর নয়।

গ্রীষ্মের শান্ত তপস্যাই বর্ষার ঐশ্বর্য্য পূর্ণ করে, বর্ষার অপরূপ উজ্জল প্রকৃতি গ্রীষ্মের গভীর ধ্যানেরই রূপ-ভেদ। বর্ষাও রবীন্দ্রনাথের গীতসম্রাজ্ঞী; অবিরাম জল-ধারার কলরোলে রবীন্দ্রনাথের গীতিধারা অজস্র ঝরিয়াছে।

বর্ষার মধ্যে কবি তাঁহার চিরবিরহী প্রেমকে আহ্বান করিয়াছেন, বর্ষার বিদায়ের আয়োজনে ব্যথিত হইয়াছেন।

শরতের নীল আকাশ, সাদা মেঘ, শিউলি ফুল, কাশের গুচ্ছ, নবীন ধানের মঞ্জরী কবির নিকট চিরযৌবনের প্রতীক রূপে আসিয়াছে। কবি তাই তরুণ দলের সঙ্গে শারদোৎসবের আনন্দে মাতিয়াছিলেন। শরতের মধ্যে কবি তাঁহার চিরপরিচিত সঙ্গীর সন্ধান পাইয়াছিলেন।

হেমন্তে কবি শিশিরকণায় বিশ্বপ্রকৃতির আশীর্ব্বাদ পাইয়াছেন। শস্যের ডালি সারা বৎসরের জন্য সাজানোর ভার কবি হেমন্তের উপরই অর্পণ করিয়াছেন।

শীতে জীর্ণ সজ্জার আড়ালে তিনি বসন্তের আগমনী শুনিয়াছেন। শীত তাঁহার নিকট কৃপণ মহারাজ, সকল ঐশ্বর্য্য আড়াল করিয়া বসিয়া আছে।

বসন্তে কবি চিরন্তন নব-যৌবনের সাড়া পাইয়াছেন। বসন্ত ঋতুরাজ, কাব তাঁহারই সভাসদ; ঋতুরাজের গুণগানই সভাকবির উদ্দেশ্য। কিন্তু এই বসন্তের আনন্দের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বিরহের যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস, যে ঝরাফুলের খেলা আছে তাহাকেও কবি ঋতুমঙ্গলে স্বীকার করিয়াছেন।

কবি অতুলপ্রসাদ সেনও ছিলেন ঋতুপ্রকৃতির গায়ক। তিনিও ঋতু-বন্দনা করিয়া গাহিয়াছেন:

প্রকৃতির ঘোম্‌টাখানি খোল্ লো বধূ
ঘোম্‌টাখানি খোল্।
আছি আজ পরাণ মেলি' দেখ্‌ব বলি'
তোর নয়ন ঢুলিটোল লো বধূ।
নয়ন ঢুলিটোল।
কত আর নীরব র'বি
কবে তুই ফিরে চাবি,
মোরে বরি' ল'বি বধূ।
কবে জীবন-বাসর-বাটে
বাজ্‌বে শঙ্খ ঢোল লো বধূ!
বাজ্‌বে শঙ্খ ঢোল?
আজি নিঝিল কুঞ্জবনে,
মিল্‌ব পরম বধূর সনে,
বড় সাধ মনে বধূ!
এ মোহন রাতে, আমার সাথে
বিশ্বদোলায় দোল্ লো বধূ!
বিশ্ব-দোলার দোল্।

তিনি ছয়টি বিশুদ্ধ রাগে ছয় ঋতুর বন্দনা করিয়াছেন, ইহাদের গীতি-মাধুর্য্য অপূর্ব্ব।

শরৎ ঋতু বাংলায় উৎসবের কাল, পুরাকালে রাজারা এই সময়ে দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন, চারণ-কবি তাঁহার বন্দনাগান রচনা করিতেন।

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যে বিভিন্ন ঋতুর রসবৈচিত্র্য রূপ পাইয়াছে; কবি এই তত্ত্বীর নাম দিয়াছিলেন 'ঋতু-চক্র'। গ্রীষ্ম এবং বর্ষার চক্র—'অচলায়তন'—রুক্ষ প্রাচীন প্রথার ধ্বংসে নবীনের আগমন, গ্রীষ্মের রসশূন্যতায় বর্ষার মহোৎসবের আমন্ত্রণ এই রূপকের ভাব:

"ভাবনা নেই, আচার্য্য ভাবনা নেই—আনন্দের বর্ষা নেমে এসেছে—তার ঝর্ ঝর্ শব্দে মন নৃত্য করছে আমার। বাইরে বেরিয়ে এলেই দেখ্‌তে পাবে চারিদিক ভেসে যাচ্ছে। ঘরে বসে ভয়ে কাঁপছে কারা? এ ঘনঘোর বর্ষার কালো মেঘে আনন্দ তীক্ষ্ণ বিদ্যুতে আনন্দ, বজ্রের গর্জনে আনন্দ। আজ মাথার উষ্ণীষ যদি উড়ে যায় তো উড়ে যাক্, গায়ের উত্তরীয় যদি ভিজে যায় তো ভিজে যাক্ আজ দুর্য্যোগ একে বলে কে? আজ ঘরের ভিত যদি ভেঙে গিয়ে থাকে যাক্—আজ একেবারে বড়ো রাস্তার মাঝখানে হবে মিলন।"

বর্ষা এবং শরতের চক্র 'বিসর্জ্জন'—সারা বর্ষাকাল নানা দুর্য্যোগের মধ্য দিয়া যে নাটকের গতি, শরতের প্রথম প্রভাতে অম্লান আলোতে তাহার পরিসমাপ্তি।

শরতের এবং হেমন্তের চক্র 'ঋণশোধ'—শরৎ নবীনের উৎসবক্ষণ, দিগ্বিজয়ীর রাজ্যজয়ের সঙ্গী কবিও শারদোৎসবের আনন্দে যোগ দিয়াছেন:

"শরতের রঙ্‌টি প্রাণের রং। এই জন্য শরতে সাড়া দেয় আমাদের প্রাণকে। বলিতেছিলেম শরতের মধ্যে শিশুর ভাব। আমার কাছে শরৎ শিশুর মূর্ত্তি ধরিয়া আসে। সে একেবারে নবীন। বর্ষার গর্ভ হইতে এইমাত্র জন্ম লইয়া ধরণী ধাত্রীর কোলে শুইয়া সে হাসিতেছে। ছেলেদের হাসিকান্না প্রাণের জিনিস, হৃদয়ের জিনিস নহে। প্রাণ জিনিসটা ছিপের নৌকার মতো ছুটিয়া চলে, তাতে মাল বোঝাই নাই।"

হেমন্ত-শীতের চক্র 'রক্তকরবী'—রক্তকরবীর প্রধান রূপ পৌষের পাকা ফসলের ভরা ক্ষেত। যক্ষপুরীর রত্নভাণ্ডার যে মাঠের সোনার ধানের নিকট অসার, মূল্যহীন—কবি তাহাই রূপকে রূপায়িত করিয়াছেন।

শত বসন্তের চক্র 'ফাল্গুনী':

"বিশ্বপুরাণে এই শীতের পালা আছে। ঋতুর নাট্যে বৎসরে বৎসরে শীত বুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে তার বসন্তরূপ প্রকাশ করা হয়—দেখি পুরাতনটাই নূতন।"

"বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলছে আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা। বিশ্বকবির সেই গীতিকাব্য থেকেই তো ভাব চুরি করেছি।"

বসন্ত শেষের পালা 'অরূপরতন'—বসন্তের উন্মাদনা, যৌবনের জয়োল্লাস-শেষে যখন শান্ত মনের পালা, তখন রাজসন্ন্যাসী বসন্তেরও অধিকার বিস্তারের সময়। নানা ঋতুর রঙ্গ প্রকাশে কবি সকল সময়েই সুরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ষামঙ্গল, শেষ বর্ষণ, নবীন, বসন্ত, ঋতুরঙ্গ, নটরাজের ঋতুরঙ্গশালা প্রভৃতি নানা গীতসূত্র কবি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

এইগুলি কবির ঋতুসঙ্গীতসমূহের গ্রন্থনে পরিপূর্ণ রূপ পাইয়াছে, শীতের রিক্ত রূপটি অত্যন্ত বাস্তব রূপে চিত্রিত হইয়াছে।

রাগরাগিণীর ক্ষেত্রে কবি ঋতুমঙ্গলের গানে নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন। বর্ষার গানে মেঘ রাগের শ্রেণীর অথবা মল্লার ঠাটের সুরই কেবল ব্যবহার করেন নাই, অন্য শ্রেণীর সুরও নানা গানে ব্যবহার করিয়াছেন—এমন দিনে তারে বলা যায় (দেশ ও মল্লার), কে দিল আবার আঘাত (কেদারা), এস হে এস, সজল ঘন (নটমল্লার), আজ বারি ঝরে ঝর ঝর (ইমন), আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল (ইমন কল্যাণ), আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার (সিন্ধু কাফি), মেঘের পরে মেঘ জমেছে (মিশ্র সিন্ধু)।

শরতের গানেও নানা রাগিণীর ব্যবহার করিয়াছেন। প্রথম যুগের গান—আজি শরত তপনে, প্রভাত স্বপনে, কি জানি পরাণ কি যে চায় (যোগিয়া বিভাস), আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা (কালাংড়া), আহা জাগি পোহাল বিভাবরী (মিশ্র ভৈরোঁ), আমার নয়ন ভুলানো এলে (মিশ্র বেলাবল), আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ (মিশ্র কালাংড়া), আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় (মিশ্র দেশকার)। বসন্তের গানে কবি convention (প্রাচীন রীতি) মানিয়া আসিয়াছেন—এ কি আকুলতা ভুবনে (বাহার), আজু সখি মুহু মুহু (বেহাগ), আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে (খাম্বাজ ব্যহার), আজি দক্ষিণ দুয়ার খোলা এ গন্ধবিধুর সমীরণে (পরজ বসন্ত) প্রভৃতি শীত এবং হেমন্তের গানের সুরে যে বৈরাগ্য ও রিক্ততার আভাস পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা অপূর্ব্ব—যেমন "শীতের বনে কোন্ সে কঠিন।" গভীর গহন রাত্রির রূপ প্রকাশে তাঁহার ক্ষমতা সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে "গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে" পরজ সুরের এই গানটিতে।

দক্ষিণ-ভারতীয় কর্ণাটী সঙ্গীতের "শঙ্করাভরণ" রাগিণীতে অর্থাৎ হিন্দুস্থানী গানের বিলাওল ঠাটের একটি গানে কবি এক সঙ্গে ষড় ঋতুর সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন—"বিশ্ব বীণারবে বিশ্বজন মোহিছে।"

আর্টিষ্টের Courtship

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নন্দীশর্ম্মা)

দোলের সময়—বেথুন থেকে ফেরবার পথে রাধারাণী শ্রীগোবিন্দের পাল্লায় পড়েছেন।

রাধা— খবরদার—
দিওনা বলছি গায়।
গোবিন্দ— তুমিও দাও—
মানা নাই তো তায়।
রা— তোমার মত
নইতো আমি অসভ্য।
গো— গোলাপী রং
দেখাবে না অভব্য।
রা— Careful!
ভালো হবে না তাইলে।
গো— Beg pardon
একটু না হয় সইলে।
রা— দেখচোনা
সাড়ীখানা কী দামী!
গো— Permit পেলে
Replace করব আমি।
রা— (কি আপদ) Shut up
শুনবে না কি কথা।
গো— খুল্‌বে ভালো,—
দিও না আর ব্যথা।
রা— Brute
তোমার সাথে কিসের পরিচয়
গো— এইত' হ'ল,
অমন কথা অন্যে কে কায় কয়!
রা— দিলে?
Incorrigible beast!
গো— Ever so—
সন্দেহ নাই least.
রা— দেখো দিকি
করলে তুমি কি?
গো— Art for arts' sake
মূর্ত্ত করিছি!
রা— ছাই করেছ,
যাই কি ক'রে ঘর?
গো— সহজ হবে—
না ভাবলেই পর।
রা— You—
Nonsense খাঁটি!
গো— Art-এ যে
Sense থাকলেই মাটি!

রাধা তখন—এদিক-উদিক চাই
whisper-এ কন 'right'
উবচে পড়ে হাসি।
'যাই' না ব'লে—
ব'লে ফেললেন 'আসি'!

বিশ্ব-ভাষা

শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য, এম-এ

যানবাহনের উন্নতি হওয়ায় বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর এক প্রান্তের লোক অপর প্রান্তের প্রতিবেশী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইহাদের মধ্যে প্রতিবেশীসুলভ মেলামেশা ও ভাব-বিনিময় এখনও সম্ভব হইতেছে না—তাহার একটি প্রধান কারণ, ইহাদের একের ভাষা অন্যে বুঝে না। বিজ্ঞান দূরত্বকে নিকটে আনিলেও ইহাদের মনের দুয়ার খুলিয়া দিতে পারে নাই, সেজন্য ভৌগোলিক দূরত্ব ঘুচিলেও ইহাদের মনের দূরত্ব সম ভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে।

ইহার প্রতিকার কি? ভাষার প্রাচীর অপসারিত করিয়া মিলনের পথ সুগম করিতে হইলে কোন একটি ভাষাকে পৃথিবীর সমস্ত দেশে অতিরিক্ত ভাষারূপে প্রচলিত করিতে হইবে। বিশ্ব-মৈত্রীর জন্য একটি বিশ্ব-ভাষার বিশেষ প্রয়োজন। ইংরেজী, ফরাসী বা এইরূপ অন্য কোন ভাষা দিয়া এই কাজ চলিতে পারে না। কারণ স্বাধীন ও আত্ম-সচেতন কোন দেশই অপর দেশের ভাষাকে এই মর্য্যাদা দিতে সম্মত হইবে না। সেজন্য ভাষা-বিজ্ঞানের গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে বিশ্ব-ভাষা সৃষ্টি করার চেষ্টা হইয়াছে। প্রায় ৭০।৮০ বৎসর ধরিয়া এই চেষ্টা চলিতেছে, এবং এ পর্য্যন্ত অনেকগুলি বিশ্ব-ভাষার খসড়া প্রস্তুত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। এস্পেরান্টো, ভোলাপুক, ইন্টারলিঙ্গুয়া, নোভিয়াল, ইন্টারগ্লসা প্রভৃতি প্রস্তাবিত বিশ্ব-ভাষার নামের সহিত আমরা পরিচিত। ইহাদের মধ্যে এস্পেরান্টো এখন গবেষণা আলোচনার শৈশব অতিক্রম করিয়াছে বলা চলে। পৃথিবীর নানা স্থানে প্রায় আট দশ লক্ষ লোক আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই ভাষায় সাহিত্য রচিত হয়, সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয় এবং সভাসমিতিতে বক্তৃতা দেওয়া হয়। এই ভাষা প্রচারের জন্য নানা দেশে অনেক প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া উঠিয়াছে।

এস্পেরান্টো সম্বন্ধে আমাদের দেশেও শিক্ষিত-সাধারণের মনে কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক বলিয়া আমরা এখানে এই ভাষার কথা আলোচনা করিতেছি। ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত লাটিন ও মূল জার্ম্মান ভাষা হইতে উপকরণ আহরণ করিয়া এবং তাহার সহিত আর্য্যেতর কোন কোন ভাষা-গোষ্ঠীতে যে agglutination বা সংশ্লেষণ-পদ্ধতি (অর্থাৎ শব্দের কারক, বচন, ক্রিয়ার রূপ প্রভৃতি বুঝাইবার জন্য বিভক্তি ব্যবহার না করিয়া অন্য শব্দ বা শব্দাংশ আলগা ভাবে শব্দের সহিত যুক্ত করার রীতি) পাওয়া যায়, তাহা মিশাইয়া এই ভাষা গঠিত হইয়াছে, এবং যাহাতে অনায়াসে শিখিতে পারা যায় সেজন্য ইহার ব্যাকরণ ও উচ্চারণ যতদূর সম্ভব সহজ ও সরল করা হইয়াছে। প্রচলিত সমস্ত ভাষার ব্যাকরণই শিক্ষার্থীর মনে বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া থাকে। এই দিক দিয়া এস্পেরান্টো এক অসাধ্য সাধন করিয়াছে বলিতে হইবে, কারণ এস্পেরান্টো-ব্যাকরণ আয়ত্ত করিতে অর্দ্ধ ঘণ্টার অধিক সময় লাগে না, ইহা এতই সংক্ষিপ্ত, সহজ ও জটিলতাশূন্য। ভাষার খুঁটিনাটি বর্জন করিয়া কি ভাবে ইহাকে স্বাভাবিক ও সহজ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে তাহা আমরা মোটামুটি দেখাইতে চেষ্টা করিব।

একটি বিদেশী ভাষা শিক্ষা করা মুখ্যতঃ তিনটি কারণে বিশেষ আয়াসসাধ্য বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ, নূতন শব্দভাণ্ডার; দ্বিতীয়তঃ, নূতন নূতন ধ্বনি ও লিপিচিহ্ন; তৃতীয়তঃ, ব্যাকরণের অনন্ত অনভ্যস্ত খুঁটিনাটি। দেখা যাক, এস্পেরান্টোর স্রষ্টারা কি ভাবে এই তিনটি সমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন।

এস্পেরান্টো ভাষার একটি অভিধান সঙ্কলন করা হইয়াছে। আমাদের চিন্তা-রাজ্যে যে সকল প্রধান প্রধান ভাব আনাগোনা করে, তাহাদের দ্যোতক প্রতিশব্দ ইহাতে স্থান পাইয়াছে। শব্দগুলি লাটিন ও জার্ম্মান মূল ভাষা হইতে গৃহীত। সেজন্য ফরাসী, ইটালীয়, স্প্যানিশ, জার্ম্মান, ইংরেজী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষাসমূহের যে-কোন একটি জানা থাকিলে এই ভাষার অধিকাংশ শব্দের সহিত পরিচয় হইবে। এই শব্দগুলির সহিত প্রত্যয় (prefix ও suffix) যোগ করিয়া নূতন নূতন শব্দ গঠন করা হয়। প্রত্যয়-গুলির সংখ্যা অল্প এবং ইহাদের অর্থ স্পষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট। সেজন্য বক্তা সহজে নিজে নিজেই নূতন শব্দ গঠন করিতে পারেন এবং অন্যের পক্ষেও তাহা সহজবোধ্য হয়। যেমন বিপরীত ভাব বুঝাইতে 'mal' এই উপসর্গটি সর্ব্বত্র ব্যবহার করার নিয়ম। তাহা হইলে দাঁড়াইল, মূল্য (cost) = kosto; উচ্চমূল্য = multekosto; কিন্তু ইহার বিপরীত অর্থাৎ অল্পমূল্য (cheap) = malmultekosto। স্বাধীন = librea; স্বাধীনতার স্থান = liber-ej (তুঃ lerni = শেখা, lernejo = বিদ্যালয়); কিন্তু ইহার বিপরীত অর্থাৎ কারাগার = malliberejo। এইরূপ প্রত্যয়ের (prefix, suffix-উপসর্গ, অনুসর্গ) সংখ্যা মোট ৩২টি। এই পদ্ধতি অবলম্বন করায় শব্দের অল্প মূলধন লইয়াও বেশ কাজ চলিতে পারে।

তাহা ছাড়া, এই ভাষার উচ্চারণ ধ্বনি-বিজ্ঞানসম্মত। ধ্বনির উচ্চারণে কোন ব্যতিক্রম নাই এবং প্রতিটি ধ্বনির জন্য

পৃথক পৃথক লিপিচিহ্ন ব্যবহার করা হয়। বাংলায় 'মণি' শব্দ লেখা হয় ম্-য়ে অ-কার দিয়া, কিন্তু উচ্চারণ করার সময় ম্-য়ে হ্রস্ব ও-কার যোগ করা হয়। 'ছেলেবেলা' শব্দে প্রথম এ কার দুইটি এ-কার বুঝাইতেছে, কিন্তু তৃতীয় এ-কার অন্ত একটি ধ্বনি (যাহা সাধারণতঃ বাংলায়-যা-কার দ্বারা বুঝান হয়) সূচিত করে। ইংরেজীতে b t, put, unit, এই তিনটি শব্দে 'u' তিন প্রকার ধ্বনি বুঝাইতেছে এবং cat ও cite, এই দুই ইংরেজী শব্দে c-র প্রয়োগ লক্ষ্য করুন। সব ভাষাতেই এই প্রকার উচ্চারণ-বৈষম্য আছে, এবং নূতন ভাষা শিক্ষার ইহা একটি প্রধান অন্তরায়। ইহার প্রতিকারকল্পে এস্পেরান্টো ভাষায় যথাসম্ভব অল্প ধ্বনি ব্যবহার করা হইয়াছে এবং এই সকল ধ্বনির উচ্চারণ ও লিপিচিহ্ন নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ভাষায় g, w, x, y—এই চারিটি হরফ ছাড়া রোমান লিপির অবশিষ্ট ২২টি হরফ দিয়া ২২টি ধ্বনি বুঝান হয়। স্বরধ্বনির উচ্চারণ এইরূপ: a= আ, e=এ, i=ই, o=ও, u=উ। ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ ইংরেজীর মত, কেবল c=ts বা ট্‌স্। এই ২২টি ধ্বনির অতিরিক্ত আরও ছয়টি ধ্বনি এই ভাষায় ব্যবহার করা হয়; ইহাদের লিপিচিহ্ন: ĉ, ĝ, ĵ, ŝ, ŭ, ĥ—চ, গ, জ প্রভৃতি ধ্বনির উষ্ম বা spirantized উচ্চারণ বুঝাইতে ইহাদের প্রয়োগ হইয়া থাকে। উষ্ম উচ্চারণের অর্থ জিহ্বা ও তালুর মধ্যে ধ্বনিটিকে কিয়ৎক্ষণ আবদ্ধ রাখিয়া প্রলম্বিত উচ্চারণ; যেমন, বাংলা প্রাদেশিক উচ্চারণে 'জানতি পারো না' এই বাক্যাংশে জ-এর উচ্চারণ। সংস্কৃতে এই জাতীয় উষ্ম ধ্বনি ছিল না বলিয়া লিপিচিহ্নও প্রবর্তিত হয় নাই। ফলে এই প্রাদেশিক উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য একজন বিখ্যাত লেখককে বাধ্য হইয়া "zানতি পার না" লিখিতে হইয়াছিল।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, এস্পেরান্টো সর্বসমেত ২৮টি ধ্বনি দ্বারা গঠিত। এই সকল ধ্বনি ২৮টি লিপিচিহ্ন দ্বারা বুঝানো হয়। ধ্বনি ও লিপির প্রয়োগ নির্দিষ্ট, কোন বিকল্প বা ব্যতিক্রম নাই। অন্যান্য প্রধান প্রধান ভাষার ধ্বনিসংখ্যা এই সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী। ইংরেজীতে মোট ২৬টি হরফ হইলে কি হইবে, ইহার প্রকৃত ধ্বনি-সংখ্যা অনেক বেশী। ইংরেজীতে স্বরধ্বনির সংখ্যাই ১২টি, মাত্র পাঁচটি হরফ দিয়া এই ১২টি ধ্বনি লিপিবদ্ধ করা হয়। তামিল বর্ণমালায় খ, ঘ প্রভৃতি মহাপ্রাণ ধ্বনির জন্য কোন লিপিচিহ্ন না থাকায় হরফের সংখ্যা অনেক কম, কিন্তু তাই বলিয়া ধ্বনি-সংখ্যা কম নয়।

এস্পেরান্টো ভাষায় কি ভাবে ধ্বনি ও উচ্চারণ-গত জটিলতা দূর করা হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিলাম। এবার ব্যাকরণগত খুঁটিনাটি হইতে এই ভাষাকে কি ভাবে এবং কতখানি মুক্ত করা হইয়াছে, তাহা আলোচনা করা যাক। প্রকৃতপক্ষে সরলতার দিক দিয়া এস্পেরান্টো-ব্যাকরণ তুলনাহীন। এই ব্যাপারে ইহার স্রষ্টাগণ প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ আয়ত্ত করিতে হইলে হয়তো দ্বাদশবর্ষ ব্যাকরণ-সাধনা করা আবশ্যক। সে সুযোগ না হইলেও, স্বীকার করি, দ্বাদশ বর্ষের অধিক কাল চর্চা করিয়াও ইংরেজী ব্যাকরণ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারি নাই। ফরাসী ও জার্মাণ ভাষার ব্যাকরণ, সে আরও ভয়াবহ ব্যাপার। লিঙ্গ, বচন ও ক্রিয়ার এত নিয়ম-বাহুল্য মানিয়া সে দেশের সাধারণ লোকেরা যে কি ভাবে কথাবার্তা বলে, তাহা আশ্চর্যের বিষয়। এস্পেরান্টো-ব্যাকরণ সে দিক দিয়া আশ্চর্য্য রকম সরল। সংস্কৃত-ব্যাকরণের সূত্র-সংখ্যা গণনা করিতে কখনও সাহস হয় নাই। কিন্তু এস্পেরান্টো ব্যাকরণের সূত্র-সংখ্যা অঙ্গুলিমেয় অর্থাৎ ১৬টির বেশী হইবে না। তাহার উপর, নিয়মগুলির কোন ব্যতিক্রম নাই, আর্ষ প্রয়োগ নিয়মের বিপক্ষতা করে না।

এস্পেরান্টো ব্যাকরণের মূল কথা, অর্থাৎ ইহার শব্দ ও বাক্য-গঠনে সংশ্লেষণ-রীতি অবলম্বনের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। Prefix, suffix ও preposition দ্বারা এই ভাষায় শব্দের ও ধাতুর রূপ নিষ্পন্ন হয়। বিশেষ্য বুঝাইতে—ও (-o), বিশেষণ বুঝাইতে—আ (-a), ক্রিয়া বুঝাইতে—ই (-i) এবং adverb বা ক্রিয়ার বিশেষণ প্রভৃতি বুঝাইতে—এ (-e) চিহ্ন শব্দের শেষে ব্যবহার করা হয়। যেমন, বই=libro, দরজা=pordo। ভাল=boria, সুন্দর=bela, কুৎসিত= malbela, উঁচু=alta। পড়া (to read)=legi, তাড়াতাড়ি করা=rapidi। ধীরে=malrapide, প্রায়ই=ofte।

লিঙ্গের বা অন্য কোন কিছুর ভিত্তিতে বিশেষ্যের শ্রেণী-ভেদ করা হয় না। সুতরাং এই ভাষায় বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া প্রভৃতির লিঙ্গ-ভেদ লইয়া ফরাসী, জার্মান বা হিন্দীর মত মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। এক মস্ত ঝামেলা চুকিয়া গেল। বহুবচন বুঝাইতে সর্বত্র j ব্যবহার করা হয়। যেমন বইগুলি=libroj; idea—ideoj ইত্যাদি। কর্তৃকারক ও কর্মকারকে যথাক্রমে -o এবং -n যোগ হয়। যেমন, The son reads good books=la filo legas bonajn librojn—লা ফিলো লেগাস্ বোনাজ্‌ন্ লিব্রোজ্‌ন্। বিশেষণ বিশেষ্যের কারক ও বচন (দ্র: bonajn) অনুসরণ করে।

এই ভাষায় ধাতুরূপও খুব সহজ। হিন্দীতে মৈঁ জাতা, তু জাতা, হম্ জাতে; কিন্তু কর্তা বহুবচন হইলেই ক্রিয়ার রূপ বদলাইবে: হম্ জাতে, তুম জাতে, বে জাতে। বাংলা ধাতুরূপে এইরূপ বচন-ভেদ না থাকিলেও পুরুষ-ভেদ আছে। যেমন, আমি যাই, তুমি যাও, সে যায়। কিন্তু এস্পেরান্টোতে পুরুষ বা বচন অনুসারে ক্রিয়ার পরিবর্তন হয় না। সুতরাং ব্যাকরণ অনেকটা সরল হইয়া পড়িল। শুধু ছয়টি কাল অনুযায়ী

হয়টি চিহ্ন ক্রিয়ার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হয়। যেমন, বর্তমান—as ; অতীত—is ; ভবিষ্যৎ—os ; সম্ভাব্য (conditional)—us ; অনুজ্ঞা (imperative)—u ; নিত্য (infinitive)—i।

এই ভাষায় মাত্র একটি definite article (la) দিয়া কাজ চালানো হয়। লিঙ্গ বা বচনভেদে ইহার রূপান্তর নাই। কিন্তু ফরাসী ভাষায় আছে। যেমন, the brother—le fre´re ; the sister—la soeur ; আবার the brothers, sisters—les fre´res, soeurs। জার্মান ভাষায় ক্লীব লিঙ্গ অনুসারেও article-এর ভেদ হইবে। হিন্দীতে লিঙ্গ অনুসারে না হইলেও বচন অনুসারে article বদলায়। যেমন, উহু লড়কা, বো লড়কে। এই ব্যাপারে ইংরেজী ও বাংলা বেশ সরল, 'the' এবং 'ঐ' দিয়াই সব কাজ চলে। এস্‌পেরান্‌টো ভাষাতেও এই পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছে।

এস্‌পেরান্‌টো ভাষার নিয়মকানুন সম্বন্ধে মোটামুটি প্রায় সব কথাই বলা হইল। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে, এই ভাষা আয়ত্ত করা কত সহজ। বৃহৎ মানব-সমাজের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই ভাষা নূতন করিয়া গড়া হইয়াছে। কৃত্রিম উপায়ে গঠিত হইলেও, অনেক ভাষাতত্ত্ববিদ্ বলেন, এই ভাষা শক্তি-সামর্থ্যে ধ্বনি-মাধুর্যে, সূক্ষ্ম ভাব ও কাব্য-কলা প্রকাশের যোগ্যতায় কোন শক্তিশালী ভাষা অপেক্ষা হীন হইবে না। ভাষা কৃত্রিম উপায়ে গঠিত হইলেই শক্তিহীন বা অকুলীন হইবে, এমন কথা স্বীকার করা যায় না।

এস্‌পেরান্‌টো ভাষায় 'esperanto' শব্দের অর্থ আশাবাদী। যাঁহারা এই ভাষা লইয়া আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইবে কি না দেখা যাক্।

আচার্য্য-বন্দনা

শ্রীঅজিতকুমার সেন, এম-এ

হে জ্ঞানের অগ্নিহোত্রি, হে আচার্য্য, সৌম্য, মহাভাগ,
তোমার মানস লোকে রহে চির অকম্প্র সজাগ
অমিত প্রজ্ঞায় দীপ্ত অনির্ব্বাণ হোম-বহ্নিশিখা।
যতনে পরায়ে গলে দিয়েছেন স্বদেশমাতৃকা
আপন প্রসাদী মালা—গৌরবের হেম-কণ্ঠহার।
বাণীর সাধন পীঠে ধ্যানমন্ত্রে প্রাণের সঞ্চার
করেছ নিষ্ঠার বলে; সে সিদ্ধির ধ্রুব পরিচয়—
স্নিগ্ধ প্রশান্তির মাঝে চিত্তে তব নিত্য ফুটে রয়।
প্রাচী-র জীবন-বেদ, বিরাটের দুস্তর সাধনা—
উন্মুখ করিল তোমা—যাত্রা তব তাই এ ভাবনা
অনন্ত জ্ঞানের পথে, হে পথিক, সত্যের সন্ধানী।
মূর্ত্ত রহে ভারতের মরমের সনাতন বাণী—
তোমার জীবন-পটে। ধন্য তুমি, তুমি পূর্ণকাম।
তোমার উদ্দেশে রহে আমাদের সবার প্রণাম।*

* আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের দ্বিনবতিতম জন্মদিবসে বাঁকুড়ায় অনুষ্ঠিত জনসভায় পঠিত।

জগদীশচন্দ্র

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী

জড় প্রকৃতির বুকে দিলে গান, দিলে তুমি প্রাণ,
মূক-ম্লান-মৌন মুখে দিলে তুমি নব নব ভাষা,
আর্য্য ঋষিদের তুমি, হে আচার্য্য, রাখিলে সম্মান—
যাঁদের ধ্যানের মাঝে ছিল সত্য-দৃষ্টির পিপাসা,
যাঁহাদের কণ্ঠ হ'তে উচ্ছ্বসিত হয়ে ছিল সুর,
"অনন্ত এ সৃষ্টি মাঝে সবি এক, সবি প্রাণময়,"
বহুর মাঝারে তুমি হেরিয়াছ এক অন্তঃপুর,
সাধন-বীণায়, গুণী, গাহিয়াছ সে-প্রাণেরই জয়।
ঋষিকণ্ঠসমুত্থিত সে-বাণীর ধ্বনি অগ্নিময়
তোমার ধ্যানের মাঝে গূঢ় ভাবে মিলায়েছ তুমি,
প্রাণেরে জেনেছে যেবা, প্রাণহীন কভু কি সে হয়?
মৃত্যুহীন তুমি, দেব, আছ ব্যাপি' মহা প্রাণ-ভূমি।

শুধু কি প্রকৃতি জড়? ঐ আজি করিছে ক্রন্দন
মানুষের জড় আত্মা, মৃত্যু ভয়ে ভীত সবে আজ;
সঙ্কীর্ণের মাঝে বন্দী, চারিদিকে চলে নিষ্পেষণ,
আত্মাও অসাড় মূক; কেবা প্রাণ দিবে তারি মাঝ?
হে দেব, তাদেরে তুমি বলো বলো দৃপ্ত কণ্ঠে ডাকি'—
"ওরে ভীরু, ওরে ক্ষুদ্র—মিথ্যা মৃত্যু, মিথ্যা তোর ভয়,
মৃত্যুই নহে রে শেষ জীবনের, মৃত্যু শুধু ফাঁকি,
বহুর মাঝারে এক, মৃত্যু মাঝে ভাখ্ মৃত্যুঞ্জয়।"
মৌন এ প্রকৃতি নয়, জড় মানবাত্মা তার সাথে
ভাষা পাক্, প্রাণ পাক্, এক হোক্ বহুর সভাতে।

মেঘ-পরিচিতি

শ্রীমনতোষ গঙ্গোপাধ্যায়

শস্যশ্যামলা নদীমেখলা বাংলা মায়ের আকাশের শোভা কতই না সুন্দর! কতই না রংবেরঙের বিচিত্র আকারের মেঘের খেলা তার আকাশে। বর্ষার বারিধারার এমন প্রাচুর্য্য—যেখানে সেখানে মেঘের খেলা, তাদের ভাঙা-গড়ার শোভা নয়ন মুগ্ধ করে। তাহারা কখনও উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-মালার ন্যায়, কখনও রুদ্রের ধূম্রবর্ণ জটাজালের মত, কখনও বায়ুবিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষের বীচিমালার মত, কখনও সদ্য-কর্ষিত ক্ষেতের মত, কখনও বেলাভূমির মত আকাশের বিস্তীর্ণ পটে দৃশ্যমান হয়। কখনও দুগ্ধফেননিভ শুভ্র, কখনও রক্ত-রাগে রাঙা, কখনও ধূসর আবার কখনও কালিমাময়—এমনি সব বিচিত্র বর্ণের মেঘের খেলা বাংলাদেশের অধিবাসী আমরা প্রতিনিয়ত দেখিতে পাই। এই দিক হইতে আমরা ভাগ্যবান। কিন্তু এমন অনেক দেশ আছে যেখানকার আকাশে সামান্য এক টুকরা মেঘ দেখিতে পাওয়া যেন একটা অভাবনীয় ব্যাপার। সেখানকার আকাশের না আছে রূপ, না আছে রঙ। কোনও কোনও দেশের আকাশ আবার বেশীর ভাগ সময়ই থাকে কুয়াসায় ঢাকা। সেই সব দেশের লোকদের পক্ষে রৌদ্রোজ্জ্বল মুক্ত আকাশের শ্রী দেখিতে পাওয়া একটা পরম আনন্দের বিষয়।

এ কথা সুবিদিত যে, মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না; কিন্তু সব মেঘেই ত আর বৃষ্টি হয় না। বৃষ্টি হয় কতকগুলি বিশেষ রকমের মেঘ হইতে। সুতরাং মেঘ ঠিকমত চিনিতে পারিলে এবং তাহাদের সৃষ্টি ও ক্রমপরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিলে অনেক সময়েই বৃষ্টি হওয়া না-হওয়া অর্থাৎ আবহাওয়ার পূর্ব্বাভাসের কথা বলিতে পারা সম্ভবপর হয়, সেজন্য আর অভিজ্ঞ আবহতত্ত্ববিদের শরণাপন্ন হইতে হয় না।

একটা কথা এখানে বলিয়া রাখা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই যে বিভিন্ন রকমের মেঘ, ইহাদের প্রত্যেকটিরই এক একটা আন্তর্জাতিক নাম আছে। বাংলায় তাহাদের কোনও প্রতিশব্দ কেহ তৈয়ারি করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি প্রত্যেক শ্রেণীর মেঘের আন্তর্জাতিক নামের পাশে একটি বাংলা নামও দিলাম। বলা বাহুল্য, যথার্থ, সংক্ষিপ্ততা ও সহজবোধ্যতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই প্রতিশব্দ সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

বিভিন্ন মেঘের আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনার আগে মেঘের সৃজন সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কিছু বলিয়া লওয়া সমীচীন। তাহা হইলে বিষয়টি বুঝিতে সুবিধা হইবে।

মেঘের সৃজন

বায়ুর (air) সহিত যে অদৃশ্য জলীয় বাষ্প (water vapour) থাকে তাহা সকলেরই জানা আছে। যদি বায়ু একেবারে জলীয় বাষ্পহীন হয় তাহা হইলে তাহাকে বলা হয় শুষ্ক বায়ু (dry air), আর যদি কিছু জলীয় বাষ্প তাহাতে বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে তাহাকে বলা হয় আর্দ্র বায়ু (humid air)। আর্দ্র বায়ুর কিন্তু আর্দ্রতার মাত্রার হেরফের হইতে পারে; অর্থাৎ এক কথায় আর্দ্রতা আংশিক বা পূর্ণ হইতে পারে। কথাটা একটু বুঝাইয়া বলা প্রয়োজন। বায়ুর জলীয় বাষ্প ধারণ-ক্ষমতা সীমাহীন নয়। যদি একটি বদ্ধ ফ্লাস্কে কিয়ৎ পরিমাণ আংশিক আর্দ্র বায়ু লইয়া তাহাতে খুব অল্প অল্প করিয়া জল দেওয়া হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে, প্রথম প্রথম যে জল দেওয়া হইতেছে তাহা অদৃশ্য হইয়া বাষ্পাকারে বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে। ক্রমে এমন একটা অবস্থা আসিবে যখন আরও জল দিলে যেমন তরল জল তেমনি থাকিয়া যাইবে, তাহা আর বাষ্পীকৃত হইয়া ফ্লাস্কের বায়ুর সহিত মিশিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে না। অর্থাৎ ফ্লাস্কের বায়ুর পিপাসা মিটিয়াছে, উহা আর জলীয় বাষ্প ধারণ করিতে পারিতেছে না বলিয়া অতিরিক্ত জল তরল জলই থাকিয়া যাইতেছে। বায়ু যখন এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হয় তখন তাহাকে সংপৃক্ত বায়ু (saturated air) বলা হয়। সংপৃক্ত অবস্থায় তাহার আর্দ্রতা পূর্ণমাত্রায় থাকে। এখন যদি ঐ বদ্ধ ফ্লাস্কের সংপৃক্ত বায়ুকে একটু গরম করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ঐ বায়ু আরও জলকণাকে জলীয় বাষ্পাকারে ধারণ করিবার ক্ষমতা রাখে এবং যে অতিরিক্ত জল ফ্লাস্কের তলায় পড়িয়াছিল তাহার কিয়দংশ বাষ্পরূপে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। এই পরীক্ষা দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে, বায়ুর জলীয় বাষ্প ধারণ-ক্ষমতা নির্ভর করে তাহার উষ্ণতার উপরে। যে বায়ু যত উষ্ণ তাহাকে সংপৃক্ত করিতে তত বেশী জলীয় বাষ্পের প্রয়োজন।

এই বিষয়টি আরও একটু সহজবোধ্য করিবার জন্য অন্যভাবে বলিতেছি। উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন বায়ুর পিপাসা বাড়ে তখন সংপৃক্ত বায়ুকে গরম করিলে সে আর সংপৃক্ত থাকিবে না এবং তাহার আর্দ্রতাও পূর্ণ মাত্রায় থাকিবে না। ঠিক এই কারণেই আংশিক আর্দ্র বায়ুকে (যাহা সংপৃক্ত নয়) যদি ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা করা যায় তাহা হইলে তাহার উষ্ণতা হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য তাহার জলীয় বাষ্প ধারণ-ক্ষমতাও কমিতে থাকিবে এবং ক্রমে এমন একটা অবস্থা আসিবে যখন পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হইবে যে, যে পরিমাণ বাষ্প আছে তাহাতেই উষ্ণতা কমিবার জন্য সেই

১নং চিত্র ২নং চিত্র

বায়ু সংপৃক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার পরেও যদি বায়ুকে আরও ঠাণ্ডা করা যায় তাহা হইলে তাহা হইতে কিছু জলীয় বাষ্প তরল জলের আকারে আলাদা হইয়া নির্গত হইবে।

কাচের গ্লাসে কিছুক্ষণ বরফ জল রাখিলে দেখা যায় যে, গ্লাসের গায়ে কুয়াসার মত ছোট ছোট জলবিন্দু লাগিয়া গিয়াছে। ঐ জলকণাসমূহ আসিল কোথা হইতে? গ্লাসের চারি পাশে যে বায়ু ছিল তাহা ঠাণ্ডা গ্লাসের গায়ে লাগিয়া শীতল হইয়া ক্রমে সংপৃক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, পরে অধিকতর শীতল হওয়ার দরুন তাহা হইতে কিছু জল ঘনীভূত হইয়া ছোট ছোট বিন্দুর আকারে গ্লাসের গায়ে লাগিয়া যায়। ইহা হইতে আমরা এইটুকু বুঝিতে পারিলাম যে, বায়ুকে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করিতে থাকিলে ক্রমশঃ তাহার আর্দ্রতা বাড়িতে থাকে এবং ঐ শীতলীকৃত বায়ু সংপৃক্ত অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং অবশেষে সেই বায়ু সংপৃক্ত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। যে উষ্ণতায় কোনও বায়ু সংপৃক্ত হয় সেই উষ্ণতাকে ঐ বায়ুর শিশিরাঙ্ক (dew point) বলা হয়। এই শিশিরাঙ্কের বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। কোন বায়ুকে তাহার শিশিরাঙ্কের নীচেও ঠাণ্ডা করিলে তাহা হইতে জলীয় বাষ্পের ঘনীভবন (condensation) আরম্ভ হইবে। সকল বায়ুর শিশিরাঙ্ক সমান নয়। যে বায়ুতে বেশী পরিমাণ জলীয় বাষ্প আছে তাহাকে সামান্য ঠাণ্ডা করিলেই শিশিরাঙ্ক প্রাপ্তি হইবে, অর্থাৎ তাহার শিশিরাঙ্ক বেশী হইবে। সুতরাং বিভিন্ন বায়ুর শুধু শিশিরাঙ্ক তুলনা করিলেই আমরা বলিতে পারি, কোন্‌টাতে কি পরিমাণ জলীয় বাষ্প আছে এবং কোন্‌টার কতটুকু উষ্ণতা কমাইলে ঘনীভবন আরম্ভ হইবে। মেঘের উৎপত্তি কিরূপে হয় তাহা বুঝিতে হইলে এই কথাটি খুব ভাল করিয়া মনে রাখিতে হইবে।

মেঘ আর কুয়াশা বায়ুতে ভাসমান অতি ক্ষুদ্র জলকণা-সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নয়। শীতের দিনে ভোরের দিকে ভূপৃষ্ঠ যখন খুব ঠাণ্ডা হইয়া যায় তখন তৎসংলগ্ন বায়ুস্তরের উষ্ণতাও ক্রমে কমিতে কমিতে এমন হইয়া থাকে যে, উহার উষ্ণতা শিশিরাঙ্কের নীচে চলিয়া যায়। তাহা হইলেই তাহাতে জলীয় বাষ্পের ঘনীভবন আরম্ভ হয় এবং ছোট ছোট বিন্দুর আকারে সেই সব জলকণা হাওয়াতে ভাসমান অবস্থায় থাকে। এইরূপ অসংখ্য জলকণা হাওয়ায় ভাসমান থাকে বলিয়া আমরা দূরের জিনিসকে ঝাপসা দেখি। ইহাই কুয়াশা।

মেঘের সৃষ্টিও ঠিক কুয়াশার মতই। কেবলমাত্র তফাৎ এই যে, মেঘের সৃষ্টি বায়ুর উচ্চস্তরে আর কুয়াশা সৃষ্ট হয় ভূমি-সংলগ্ন বায়ুর স্তরে। কুয়াশার বেলায় বায়ুকে উহার শিশিরাঙ্কের নীচে ঠাণ্ডা করে শীতল ভূপৃষ্ঠ; কিন্তু মেঘের বেলায় বায়ু ঠাণ্ডা হয় অন্য প্রকারে। ভূপৃষ্ঠ হইতে যতই উপরে উঠা যায় বায়ুর চাপ (pressure) ও উষ্ণতা ততই কমিতে থাকে। প্রায় সকল বায়বীয় পদার্থের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, হঠাৎ চাপ কমাইয়া সম্প্রসারিত হইতে দিলে উহাদের উষ্ণতা কমিয়া যায়। সুতরাং নিম্নস্তরের বায়ুকে যদি কোন উপায়ে উচুতে উঠানো যায় বা ঐ বায়ু নিজে হইতেই উপরে উঠিতে থাকে তাহা হইলে ক্রমহ্রাসপ্রাপ্ত বায়ুর চাপের জন্য তাহা সম্প্রসারিত এবং শীতল হইতে থাকিবে। যতই উপরে উঠিবে বায়ু ততই ঠাণ্ডা হইবে। নিম্ন স্তর হইতে যে বায়ু উপরে উঠিতেছে তাহাতে যদি কিছু জলীয় বাষ্প থাকে তাহা হইলে উপরে উঠিতে উঠিতে ক্রমে সেই বায়ুর উষ্ণতা যখন তাহার শিশিরাঙ্কের নীচে নামিয়া যাইবে তখনই তাহা হইতে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া ছোট বিন্দুর আকারে বায়ুর উচ্চস্তরে হাওয়ায় ভাসিতে থাকিবে, এবং মেঘের সৃষ্টি করিবে। ১ নং ও ২ নং চিত্রের সাহায্যে এই ব্যাপারটি বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ১ নং চিত্রে দেখান হইয়াছে বায়ু যখন নিজে নিজেই উপরে ঠেলিয়া উঠিতে থাকে তখনকার অবস্থা। কি করিয়া নীচের বায়ু উপরে ঠেলিয়া উঠিতে পারে তাহা এখানে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা সম্ভব নয়। মেঘের জন্ম-কথা বুঝিবার জন্য এইটুকু মনে রাখিলেই চলিবে যে, বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ুস্তরের বিন্যাস কখনও কখনও এমন হইয়া থাকে যে, নীচের বায়ু উপরে ঠেলিয়া উঠিতে বাধ্য হয়। ২ নং চিত্রে দেখান হইয়াছে—হাওয়া যখন পাহাড়ের গায়ে বাধা পাইয়া পাহাড়ের
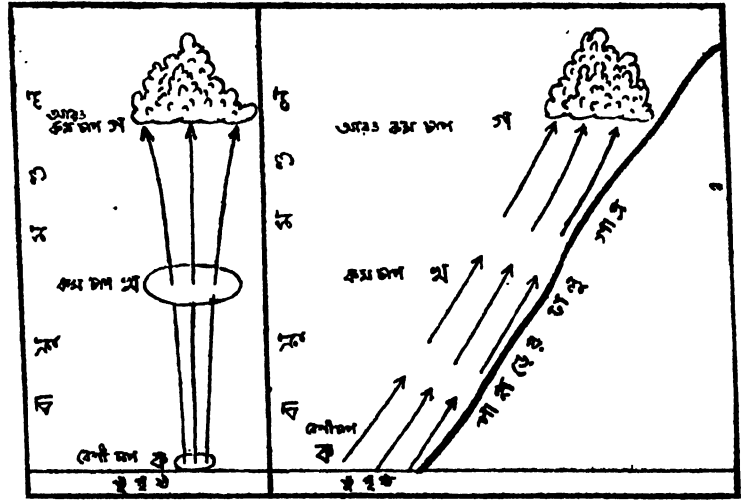
ঢালু গাত্র বাহিয়া উপরে উঠিতে বাধ্য হয় তখনকার অবস্থা। এই দুই চিত্রেই দেখা যাইতেছে, নিম্নস্তরের বায়ু যখন 'ক' হইতে 'খ'তে পৌঁছিয়াছে তখন বায়ুর চাপ হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ার দরুন 'খ'তে উঠিয়া তাহা সম্প্রসারিত হইয়া ঠাণ্ডা হইয়া পড়িয়াছে। এইভাবে আরও উঁচুতে উঠিয়া 'গ'তে পৌঁছিয়া সেই বায়ু অধিকতর শীতল হওয়ায় তাহার উষ্ণতা শিশিরাঙ্কের নীচে চলিয়া গিয়াছে এবং সেখান হইতেই ঘনীভবন আরম্ভ হইয়া মেঘের সৃষ্টি হইয়াছে।

সাধারণতঃ যে দুই উপায়ে মেঘের সৃষ্টি হয় এখানে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল। এতদ্ব্যতীত আরও নানা উপায়ে মেঘের সৃষ্টি হইতে পারে। মোটামুটি বলা যায় যে, যে-কোনও কারণে বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরের বায়ু যদি এমন ঠাণ্ডা হয় যে উহার উষ্ণতা উহার শিশিরাঙ্কের নীচে চলিয়া যায় তবেই মেঘের সৃষ্টি হইয়া থাকে। নিম্নস্তরের বায়ুকে উঁচুতে তুলিয়া লইলে সম্প্রসারণ-হেতু যে তাহা ঠাণ্ডা হয় সেকথা বলা হইয়াছে। আরও এক প্রকারে উপরকার বায়ু হঠাৎ ঠাণ্ডা হইতে পারে। কখনও কখনও এমন হয় যে, বায়ুর উচ্চস্তরে কাছাকাছি কোনও স্থান হইতে হঠাৎ খুব শীতল হাওয়া আসিয়া ঐ বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাকে এত ঠাণ্ডা করিয়া ফেলে যে, উহার উষ্ণতা শিশিরাঙ্কের নীচে চলিয়া যায় এবং মেঘের সৃষ্টি হয়। এইভাবে মেঘের সৃজন খুব কমই হয়। নীচের বায়ু উপরে উঠার দরুন প্রায় সকল ক্ষেত্রেই মেঘের সৃষ্টি হয়।

মেঘের গোষ্ঠী

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে বেশ বুঝাইতেছে যে, সকল সময়েই মেঘ একই উচ্চতায় সৃষ্ট হয় না। কারণ যে বায়ু উপরে উঠিয়া মেঘের সৃষ্টি করে তাহার আর্দ্রতা যত বেশী হইবে তাহার উষ্ণতাকে শিশিরাঙ্কের নীচে লইয়া যাইবার জন্য তাহাকে ততই কম ঠাণ্ডা করিতে হইবে, অর্থাৎ তাহাকে কম উঁচুতে উঠাইতে হইবে। সুতরাং যে বায়ুর আর্দ্রতা যত বেশী তাহা হইতে তত নীচে মেঘের সৃষ্টি হয়।

উচ্চতার দিক দিয়া মেঘগুলিকে তিন গোষ্ঠীতে ভাগ করা হইয়াছে। (ক) যে সব মেঘ ৩০,০০০ হইতে ২০,০০০ ফুটের উপরে থাকে তাহাদের বলা হয় উচ্চ মেঘ (high clouds), (খ) যেগুলি ২০,০০০ হইতে ১০,০০০ ফুটের মধ্যে থাকে সেগুলিকে বলা হয় মধ্য মেঘ (medium clouds) এবং (গ) যে সব মেঘ ১০,০০০ ফুটের নীচে সৃষ্ট হয় তাহাদের বলা হয় নিম্ন মেঘ (low clouds)।

এই মেঘগোষ্ঠীর মধ্যে আবার শ্রেণীবিভাগ আছে। আকৃতি অনুসারেই প্রধানতঃ মেঘের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, মেঘগুলি আকারে হয় স্তূপাকৃতি (cumuliform) নয় স্তরাকৃতি (stratiform)। বায়ু যখন নিজে নিজেই ঠেলিয়া সোজা উপরে উঠে তখনই হয় স্তূপাকৃতি মেঘের সৃষ্টি, আর যখন বায়ু ধীরে ধীরে কোনও ঢালু তল (inclined surface) বাহিয়া উপরে উঠিতে বাধ্য হয় তখনই স্তরাকৃতি মেঘের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক গোষ্ঠীর মেঘের মধ্যেই স্তূপাকৃতি এবং স্তরাকৃতি এই দুই রকমের মেঘ হইতে পারে। নিম্নে বিভিন্ন শ্রেণীর মেঘের আকার এবং বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

মেঘের শ্রেণী

(ক) উচ্চ মেঘগোষ্ঠী—এই গোষ্ঠীর মেঘের শ্রেণী তিনটি।

(১) সিরাস (cirrus) বা পালক-মেঘ—এই মেঘগুলি দেখিতে ধপধপে সাদা। এই মেঘমালাকে জড়ান রেশম, পাকা চুলের গোছা কি পাখীর পালকের মত দেখায়। এই মেঘ ছায়াপাত করে না এবং সেইজন্য সূর্য্য, চন্দ্র ইত্যাদির আলো এই মেঘের মধ্য দিয়া আসিতে বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হয় না। এইগুলি সর্ব্বোচ্চ স্তরের মেঘ—প্রায় ৩০,০০০ হইতে ৪০,০০০ হাজার ফুট উচ্চে ইহাদের অবস্থান। নীল আকাশে এই অতি শুভ্র মেঘমালা অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করে। সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে এবং সূর্য্যোদয়ের কিছু পরে এই মেঘে সূর্য্যের আলো প্রতিসৃত (refracted) হইয়া লাল, কমলা ইত্যাদি বিচিত্র রঙের সৃষ্টি করে, এবং সেইজন্য গোধূলিবেলায় এই মেঘগুলিকে ঐ সব বিবিধ বর্ণচ্ছটারঞ্জিত দেখায়, প্রকৃতপক্ষে মেঘগুলি শাদা। এই মেঘ শীতকালে আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায়। এই মেঘ হইতে বৃষ্টিপাত হয় না। কিন্তু কখনও কখনও ইহারা দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। যদি কখনও শীতকালে আমরা দেখিতে পাই যে, এই মেঘ পশ্চিমাকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে এবং ক্রমশঃ ঘন হইতেছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, দুই হইতে চারি দিনের মধ্যে আকাশ মেঘলা হইবে ও সামান্য বৃষ্টিপাত হইবে। একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, এই মেঘ আকাশে অল্প পরিমাণে থাকিলে আবহাওয়ার বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। আকাশের অনেকটা জুড়িয়া থাকিলে এবং ক্রমে ঘন হইতে থাকিলে তবেই বুঝিতে পারা যাইবে, শীঘ্রই জলঝড় হইবার সম্ভাবনা আছে।

(২) সিরোকিউমুলাস্ (cirrocumulus) বা উচ্চ স্তূপ-মেঘ—উঁচু মেঘের মধ্যে অনেক সময়ই অসংখ্য ছোট ছোট স্তূপের সৃষ্টি হয় এবং সেই স্তূপগুলি সারবন্দী ও সুবিন্যস্ত ভাবে সাজান থাকে। মাছের গায়ে আঁশ যে রকম সাজান থাকে এই মেঘগুলি দেখিতে অনেকটা সেই রকম। সামান্য বাতাস উঠিলে বালুচর বা ছোট ছোট ঢেউ উঠিলে জলাশয় যেমন দেখায় এই মেঘগুলির আকৃতি অনেকটা তদ্রূপ।
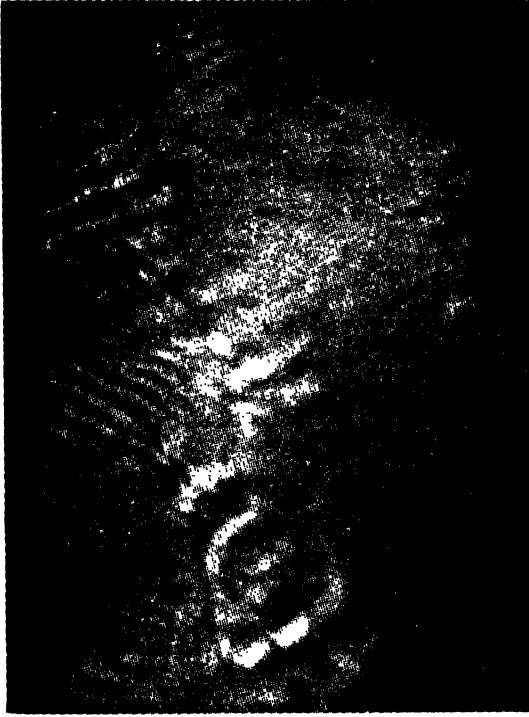
৩নং চিত্র—সিরোকিউমুলাস্ (উচ্চস্তূপ মেঘ)।

৩ নং চিত্রে এই মেঘের ছবি দেখান হইয়াছে। পালক-মেঘের মত এই মেঘও ছায়াপাত করে না এবং দেখিতে ধপধপে সাদা হইলেও গোধূলি সময়ে এইগুলিকে রঙীন দেখায়। এইগুলিও খুব উঁচু মেঘ। সাধারণত: আমাদের দেশে ৩০,০০০-২৫,০০০ হাজার ফুটের নীচে এই মেঘ দেখা যায় না। আবহাওয়ার পূর্ব্বাভাস ঠিক করা বিষয়ে পালক-মেঘের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা এই মেঘের বেলায়ও প্রযোজ্য।

(৩) সিরোষ্ট্রাটাস্ (cirrostratus) বা উচ্চ স্তরমেঘ—স্তরাকৃতি বলিয়া এই মেঘ দেখিতে একখানি সাদা চাদর বা কাপড়ের মত। ৪ নং চিত্র দেখিলেই উহাদের আকার সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা হইবে। এই মেঘও বেশ উচ্চে থাকে; ২০,০০০ হাজার ফুটের নীচে সাধারণত: ইহারা সৃষ্ট হয় না। এই মেঘও ছায়াপাত করে না। আকাশে অল্প পরিমাণে থাকিলে পালক-মেঘ হইতে এই মেঘের পার্থক্য বুঝিতে পারা একটু কঠিন এবং অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। পালক-মেঘ দেখিতে ধপধপে সাদা আর অনেকটা লম্বা আঁশযুক্ত; কিন্তু এই মেঘ সেইরূপ আঁশযুক্ত দৃষ্ট হয় না। এই মেঘ আকাশে থাকিলে আকাশের রং হয় ঘোলাটে সাদা (milky white)। সমস্ত আকাশ এই মেঘে ঢাকা থাকিলে আকাশে কোনও মেঘ আছে কি না অনেক সময়ে তাহা বুঝাই মুশকিল হইয়া দাঁড়ায়। উক্ত মেঘের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এই মেঘখণ্ডগুলি একটু ঘন হইলে সূর্য্য বা চন্দ্রের চারিদিকে কয়েকটি রঙীন বৃত্ত দেখা যায়। এই বৃত্তগুলিকে চলিত কথায় সূর্য্য বা চন্দ্রের
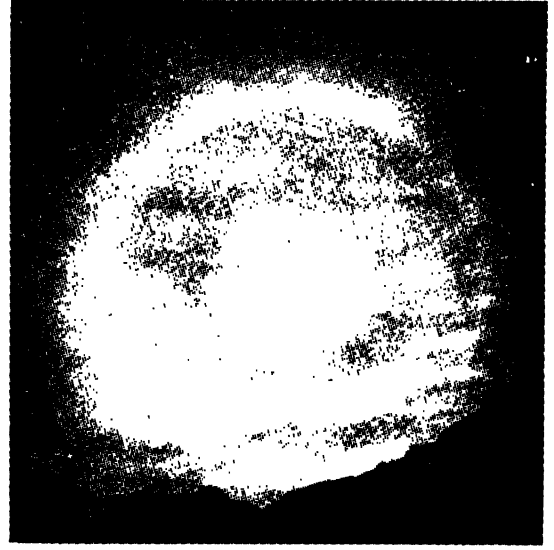
৪নং চিত্র—সিরোষ্ট্রাটাস্ (উচ্চ স্তরমেঘ)।

'সভা' বলা হয়। পালক-মেঘে সূর্য্য বা চন্দ্রের 'সভা' দেখা যায় না। ৪ নং চিত্রে সূর্য্যের সভা বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। উচ্চ-স্তরমেঘও পরবর্ত্তী আবহাওয়ার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। এই মেঘ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আকাশে থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, বড় রকমের একটা ঝড় কিংবা আবহাওয়া-সংক্রান্ত

৫নং চিত্র—অল্টোকিউমুলাস্ (মধ্য স্তূপমেঘ)।

দুর্য্যোগ আসন্ন। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্ব্বর্ত্তী দেশসমূহে এই মেঘ দেখা দিলে দুই হইতে চারি দিনের মধ্যে জলঝড় অবশ্যম্ভাবী।

(খ) মধ্য মেঘগোষ্ঠী—ইহাদের শ্রেণী দুইটি।

৬নং চিত্র—অল্টোষ্ট্রাটাস্ (মধ্য-স্তরমেঘ)

(৪) অল্টোকিউমুলাস্ (Altocumulus) বা মধ্য স্তূপমেঘ—এই মেঘের চেহারা বহু রকমের হয়। এই মেঘের স্তূপগুলি উচ্চ স্তূপমেঘের স্তূপ হইতে দেখিতে কিছু বড় এবং ঘন হয়। এই মেঘ অল্পবিস্তর ছায়াপাত করে এবং ইহারা ১০,০০০ হইতে ২০,০০০ হাজার ফুটের মধ্যে থাকে। এই মেঘকে অনেক সময়েই কোপান ক্ষেতের মত কিংবা চষা ক্ষেতের মত দেখায়। (৫ নং চিত্র দ্রষ্টব্য।) এই দুই রকম আকৃতিই এই শ্রেণীর মেঘের মধ্যে খুব বেশী পাওয়া যায়। ইহা ছাড়াও এই মেঘের অন্ত বহু রকমের আকার দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু যত রকম আকৃতিবিশিষ্টই হোক না কেন, সারবন্দী স্তূপের সন্নিবেশ অল্পবিস্তর থাকিবেই। আমাদের দেশে শীতকালে এই মেঘ দেখা গেলে সাধারণতঃ ১২ হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সামান্ত বৃষ্টি হয়। শীতকাল ছাড়া বর্ষার প্রারম্ভে এবং পরে এই মেঘ আকাশে সৃষ্ট হইলে ১২ হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সর্বত্র পশলা বৃষ্টি হওয়ার কিছু সম্ভাবনা থাকে।

(৫) অল্টোষ্ট্রাটাস (Altostratus) বা মধ্য-স্তরমেঘ—এই মেঘকে উচ্চ-স্তরমেঘের ন্তায় একখানা চাদরের মত দেখায়। কিন্তু অধিকতর ঘন এবং নীচের মেঘ বলিয়া এই মেঘের রং সাদা না হইয়া হয় ঈষৎ ধূসর, কখনও কখনও বা ঈষৎ নীলাভ। এই মেঘ থাকিলে সূর্য্য ও চন্দ্রকে একটু ঝাপসা দেখায়, মনে হয় যেন একখানা ঘষা কাচের মধ্য দিয়া দেখা যাইতেছে। এই মেঘ ছায়াপাত করে। (৬ নং চিত্র পশ্য) এই মেঘে সাধারণতঃ সূর্য্য বা চন্দ্রের 'সভা' দেখা যায় না; খুব পাতলা হইলে অনেক সময় উচ্চ-স্তরমেঘে সৃষ্ট কয়েকটি রঙীন বৃত্তের পরিবর্ত্তে একটি মাত্র বেশ বড় বৃত্ত দেখা যায়। অনেক সময়েই উচ্চ-স্তরমেঘ ঘনীভূত হইয়া নীচে নামিয়া আসে এবং মধ্য-স্তরমেঘের সৃষ্টি করে। উচ্চ-স্তরমেঘ ও মধ্য-স্তরমেঘের ভিতরে পার্থক্য এই যে, মধ্য-স্তরমেঘ অপেক্ষাকৃত গাঢ় রঙের, ইহা হইতে সূর্য্য বা চন্দ্রের চারিদিকে রঙীন
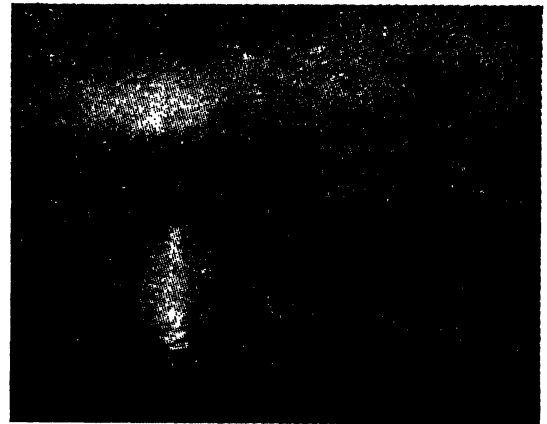
৭নং চিত্র—ষ্ট্র্যাটাস্ (স্তরমেঘ)।

বৃত্তের সৃষ্টি হয় না এবং চন্দ্র, সূর্য্য, তারা এই মেঘে ঢাকা পড়ে। মধ্য-স্তরমেঘ আসন্ন দুর্য্যোগের পূর্ব্বাভাস সূচিত করে—অনেক সময় এই মেঘ হইতেই একটানা পাতলা বৃষ্টি কিবা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয়। যদি উচ্চ-স্তরমেঘ ঘনীভূত হইয়া ক্রমে এই মেঘের সৃষ্টি করে তবে বুঝিতে হইবে যে বেশ বড় রকমের দুর্য্যোগ প্রত্যাসন্ন।

(গ) নিম্ন মেঘগোষ্ঠী—আবহাওয়া সংক্রান্ত সব দুর্য্যোগেরই সৃষ্টি হয় নিম্নমেঘ হইতে। এইজন্ত আবহতত্ত্ববিদগণ নিম্ন মেঘের শ্রেণী বিভাগে একটু বেশী তারতম্য করিয়াছেন—কেবল স্তূপাকৃতি ও স্তরাকৃতির বিভাগ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। দেখা গিয়াছে, নিম্ন মেঘের স্তূপের ছোট বড় আকারের জন্ত আবহাওয়ার বিশেষ তারতম্য হয়। এইজন্ত নিম্ন স্তূপমেঘের স্তূপের আকার ও চেহারা পর্য্যবেক্ষণ এবং বিচার করিয়া তাহাদের একাধিক শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। সেই রকম নিম্ন-স্তরমেঘের বেলায়ও তাহাদের চেহারা এবং গঠনের উপর লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদিগকে একাধিক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। মোটামুটি বলা যায় যে, নিম্ন মেঘগোষ্ঠীকে ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে।

৬। ষ্ট্রাটাস্ (Stratus) বা স্তরমেঘ—ইহা স্তরাকৃতি নিম্ন মেঘ—দেখিতে অনেকটা কুয়াশার মত। কুয়াশা থাকে মাটির উপরে, কিন্তু এই মেঘ সাধারণতঃ থাকে ৪০০ হইতে ১,০০০ ফুট উঁচুতে। মিলাইয়া যাইবার আগে অনেক সময়

ভূমিসংলগ্ন কুয়াশা উঁচুতে উঠিয়া গিয়া এই মেঘের সৃষ্টি করে। পার্ব্বত্য অঞ্চলে এই মেঘ খুব বেশী দেখা যায়।
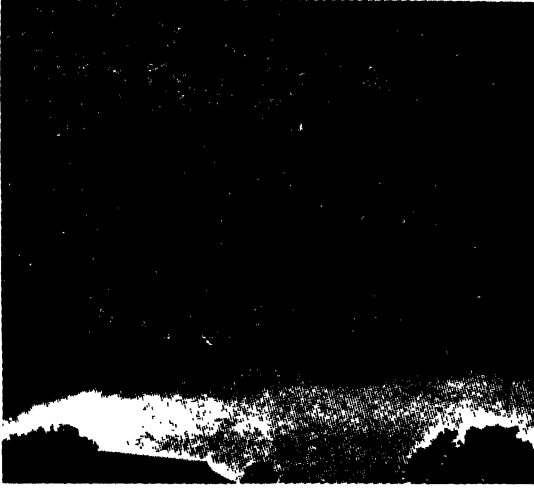
৮নং চিত্র—নিম্বোষ্ট্র্যাটাস্ (জলবাহী স্তরমেঘ)।

আমাদের দেশে চৈত্র-বৈশাখ মাসের সকালবেলায় প্রায়ই এই মেঘ দৃশ্যমান হয়। পার্ব্বত্য অঞ্চলে এই মেঘে কখন কখন পত্‌লা বৃষ্টি হয়, বিশেষ করিয়া বর্ষাকালে।

৭। নিম্বোষ্ট্রাটাস্ (Nimbostratus) বা জলবাহী স্তরমেঘ—এইগুলিও নিম্নমেঘের মধ্যে স্তরাকৃতি মেঘ। কিন্তু স্তরমেঘের সঙ্গে ইহার প্রধান পার্থক্য ঘনত্বে ও রঙে। এই মেঘ ঘোর ধূসর রঙের, অনেকটা শ্লেটের রঙের মত। এই মেঘ দেখিলেই মনে হয় যে, বৃষ্টি আসন্ন। আমাদের দেশে বর্ষাকালে এই মেঘ প্রায়ই দেখা যায়। এদের চিনিতে বেগ পাইতে হয় না। এই মেঘ হইতে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইয়া একটানা খুব জোর বৃষ্টিও হইতে পারে। যখন সাইক্লোন হয় বা নিম্নচাপ (Depression) আসিতে থাকে তখন লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, জলবাহী স্তরমেঘের সৃষ্টির একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। নিম্নচাপ ছয়-সাত শত মাইল দূরে থাকিতে প্রথমে উচ্চ-স্তরমেঘ দেখা দেয়। ঐ নিম্নচাপ যতই কাছে আসিতে থাকে উচ্চ-স্তরমেঘ ততই ঘনীভূত হইতে থাকে। এইরূপে ক্রমে মধ্য-স্তরমেঘের সৃষ্টি হয়। নিম্নচাপ আরও নিকটবর্ত্তী হইলে মধ্য-স্তরমেঘ অধিকতর ঘন হইয়া কৃষ্ণবর্ণ জলবাহী স্তরমেঘের সৃষ্টি করে। সুতরাং মেঘের এই রকম ক্রমপরিবর্ত্তন দেখা গেলে অনেকটা নিঃসংশয়ে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, ঝড় ও জোর বৃষ্টি হইবে। জলবাহী স্তরমেঘের আরও একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, বৃষ্টি হওয়ার ঠিক পূর্ব্বক্ষণে এইগুলি থাকে খুব নীচে—অনেক সময়ে ভূমি হইতে মাত্র এক শত কি দুই শত ফুট উচ্চে। এবং রঙ্ থাকে ঘন ধূসর কিংবা কালো। কিছুক্ষণ বৃষ্টি হওয়ার পরেই ইহাদের রঙ্ অনেকটা পাতলা হইয়া যায় এবং মনে হয় ঐ মেঘ যেন অভ্যন্তরভাগ হইতে আলোকিত হইতেছে।
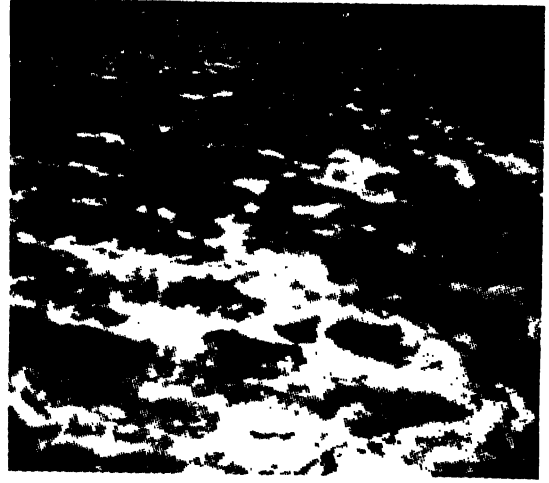
৯নং চিত্র—ষ্ট্র্যাটোকিউমুলাস্ (স্তরাকৃতি স্তূপমেঘ)।

৮। ষ্ট্র্যাটোকিউমুলাস্ (Stratocumulus) বা স্তরাকৃতি স্তূপমেঘ—এই মেঘ দেখিতে কতকটা স্তরাকার এবং কতকটা স্তূপাকার। ইহাদের স্তূপগুলি কখনও বেশী বড় হয় না এবং স্তূপগুলি এত ঘনসন্নিবিষ্ট থাকে যে, দেখিলেই বুঝা যায় যেন অনেকগুলি স্তূপ ঠাসাঠাসি হইয়া একটা স্তরের সৃষ্টি করিয়াছে। এই মেঘের চেহারা অনেক রকমের হয়। কখনও ইহাদের দেখায় কতকগুলি প্রায় সমান্তরাল তরঙ্গ-সমষ্টির মত, আবার কখনও বেশ বড় বড় ডেলাওয়ালা কোপান ক্ষেতের মত।

বর্ষাকালে এই শ্রেণীর মেঘ আমাদের দেশে প্রায়ই দৃষ্ট হয়। ইহাদের অবস্থান সাধারণতঃ ২,৫০০ হইতে ৮,০০০ হাজার ফুট উচ্চে। এই মেঘ এবং মধ্য-স্তূপমেঘের আকার-গত সাদৃশ্য খুব বেশী। এই জাতীয়মেঘের উচ্চতা কম এবং ঘনত্ব বেশী বলিয়া এইগুলিকে দেখায় ধূসর রঙের আর মধ্য-স্তরমেঘগুলি প্রায় সাদা রঙের। এই মেঘ যখন একটু বেশী উচ্চে থাকে (প্রায় ৬,০০০ হইতে ৮,০০০ হাজার ফুট) তখন এই মেঘ এবং মধ্য-স্তরাকৃতি মেঘের পার্থক্য বুঝা খুবই কঠিন, বিশেষজ্ঞরাও তখন ঠিকমত শ্রেণী নির্ণয় করিতে পারেন না—না পারিলেও ক্ষতি নাই। কারণ উহারা কেবল যে আকৃতিতেই এক রকম তাহা নহে। সেই সু-উচ্চ স্তরে ইহাদের প্রকৃতি এবং আবহাওয়া-সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যও একই রকমের হইয়া থাকে। এই মেঘ বেশী নিয়ে থাকিলে এবং

১০ নং চিত্র—কিউমুলাস্ (স্তূপমেঘ)।

১১ নং চিত্র—লার্জকিউমুলাস্ (অতি-স্তূপমেঘ)।

ঘন হইলে ইহা হইতে সামান্য বৃষ্টি হইতে পারে। আমাদের দেশে বর্ষাকালে ইহা প্রায়ই হইয়া থাকে। এই মেঘ হইতে কখনও জোর বৃষ্টি হয় না বা বৃষ্টি বেশীক্ষণ স্থায়ীও হয় না।

৯। কিউমুলাস্ (Cumulus) বা স্তূপমেঘ—এই মেঘ আমাদের খুবই পরিচিত। অনেক সময়েই, বিশেষতঃ বর্ষার পূর্ব্বে এবং হেমন্তকালে, পূর্ব্বাহ্নে কি মধ্যাহ্নে পেঁজা তুলার অথবা পশমের স্তূপের ন্যায় ধপধপে সাদা ছোট ছোট গম্বুজাকৃতি খণ্ড খণ্ড মেঘ আকাশে ইতস্ততঃ ছড়ান থাকে। (১০ নং চিত্র)। ইহাদের চিনিতে কোনও কষ্ট নাই। শীতকাল ছাড়া প্রায় সকল ঋতুতে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর মেঘ আমাদের দেশের আকাশে প্রায়ই দেখা যায়। সূর্য্যের তাপে নীচের বায়ু গরম হইয়া সোজা উপরে ঠেলিয়া উঠিয়া এই মেঘের সৃষ্টি করে বলিয়া এইগুলি গম্বুজাকৃতি হয়। এই মেঘ হইতে বৃষ্টিপাত হয় না। ইহাদের উচ্চতা সাধারণতঃ ২,০০০ হইতে ৬,০০০ বা ৭,০০০ হাজার ফুট পর্য্যন্ত হয়।

(১০) লার্জ কিউমুলাস্ (Large Cumulus) বা অতি-স্তূপমেঘ—১১ নং চিত্র হইতেই ইহাদের আকার বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। ইহারা দেখিতে অনেকটা গম্বুজাকৃতি ছোট পাহাড়ের মত। ইহাদের শীর্ষদেশ প্রকাণ্ড ফুলকপির মত আকৃতিবিশিষ্ট। ঠিক স্তূপমেঘের মতই নীচের বায়ু সোজা ঠেলিয়া উপরে উঠার জন্য এই মেঘের সৃষ্টি হয়। প্রচণ্ড বেগে বায়ুর ঊর্দ্ধগতির জন্য এই মেঘের স্তূপ বহু উচ্চ পর্য্যন্ত গড়িয়া উঠে এবং অনেক বড় দেখায়। লক্ষ্য করিলে অনেক সময় দেখা যাইবে যে, একটি ক্ষুদ্র স্তূপ-মেঘ, বায়ুর ঊর্দ্ধগতির জন্য ক্রমাগত ফুলিয়া ফুলিয়া এই জাতীয় মেঘের সৃষ্টি করিতেছে। এই মেঘের তলদেশের উচ্চতা সাধারণতঃ ২,০০০ হইতে ৪,০০০ হাজার ফুট এবং শীর্ষদেশের উচ্চতা ১০,০০০ হইতে ১৫,০০০ হাজার ফুট। এই মেঘ হইতে পশলা বৃষ্টি এবং কখনও কখনও বিদ্যুদ্বিকাশ হয়। আমাদের দেশে বর্ষাকালের ক্ষণস্থায়ী পশলা বৃষ্টি প্রায়শঃ এই মেঘ হইতেই হয়। এই মেঘগুলি দ্বিপ্রহরে এবং বিকালের দিকেই বেশী দৃষ্ট হয়।

(১১) কিউমুলোনিম্বাস্ (Cumulonimbus) বা মহাস্তূপমেঘ—এইগুলি অতি বৃহৎ স্তূপমেঘ। দূর হইতে এইগুলিকে দেখায় প্রকাণ্ড পাহাড়ের মত; কিন্তু এগুলির শীর্ষদেশ গম্বুজাকৃতি নয়—লোহকারের নেহাইয়ের মত। ১২ নং চিত্র হইতেই এই মেঘের আকার সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে। এই মেঘগুলি দেখিতে ভীষণাকার। ইহাদের নীচের দিকটা থাকে মিশকালো, জলবাহী স্তরমেঘের মত এবং উপরের দিকের রঙ ক্রমশঃ পাতলা হইতে থাকে। একেবারে শীর্ষদেশটি দেখিতে সাদা ছিন্ন পালক-মেঘের মত। নীচেকার বায়ুর অতি দ্রুত বহু ঊর্দ্ধে ঠেলিয়া উঠার দরুন এই মেঘের সৃষ্টি হয়। ঊর্দ্ধগামী বায়ুর গতিবেগ বেশী জোরালো বলিয়া এই মেঘের শীর্ষদেশ অনেক উচ্চ হয়। প্রায়শঃ ইহাদের শীর্ষদেশ ৩০,০০০ বা ৪০,০০০ হাজার ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। কচিৎ কখনো কখনো ইহাদের শীর্ষদেশ ৬০,০০০ হাজার ফুট অবধি পৌঁছায়। ইহাদের তলদেশ ৬০০ হইতে ২,০০০ হাজার ফুট উঁচুতে থাকে। এই মেঘ হইতে বজ্রপাত-সহ পশলা বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, বিদ্যুদ্বিকাশ ও দমকা হাওয়ার

১২নং চিত্র—কিউমুলোনিম্বাস্ (মহাস্তূপমেঘ)।

সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের "কালবৈশাখী" এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের "আঁধি" ঝড়ের উৎপত্তি এই মেঘ হইতেই হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে উত্তর-পশ্চিমাকাশে এই মেঘ দেখিলে ইহা প্রায় নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে, দু'এক ঘণ্টার মধ্যেই দমকা হাওয়া সহ পশলা বৃষ্টি হইবে; এমন কি শিলাবৃষ্টিও হইতে পারে। এই মেঘগুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিকালের দিকে দৃষ্টিগোচর হয়।

মহাস্তূপমেঘ এবং অতিস্তূপমেঘের মধ্যে বায়ুর গতি এমন উদ্দাম থাকে যে, বিমান চালনার পক্ষে তাহা মারাত্মক। বিশেষ করিয়া এই মেঘগুলি শিলা ও বিদ্যুতে পূর্ণ থাকে বলিয়া ইহাদের মধ্যে বিমান যদি একবার পড়ে তবে তাহাকে নিরাপদে গন্তব্যস্থলে চালনা করিয়া লইয়া যাওয়া দুষ্কর হইয়া দাঁড়ায়। বিমানের পক্ষে আবহাওয়া-জনিত বিপত্তির দিক দিয়া এই মেঘ অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ।

মেঘের বিভিন্ন শ্রেণীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হইল। একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, মেঘের অসংখ্য প্রকারভেদ হইতে পারে। উপরে যে ভাবে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা বিভিন্ন শ্রেণীর পূর্ণাবয়ব এবং বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর যাবতীয় লক্ষণযুক্ত মেঘেরই বর্ণনা। আকাশের দিকে তাকাইলে অনেক সময়েই দেখা যাইবে যে, যে মেঘ আকাশে আছে তাহা উপরি-লিখিত কোনও মেঘশ্রেণীর পর্য্যায় পড়িলেও তাহাতে শ্রেণীগত সবগুলি লক্ষণ বিদ্যমান নাই। প্রকৃতপক্ষে মেঘের আকৃতিগত অসংখ্য প্রকারভেদ থাকিবেই। মেঘ যখন সৃষ্ট হয় তখন যে আকারের থাকিবে, বিলীন হওয়ার আগে যে সেই আকারের সবিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে। মেঘের প্রথমাবস্থা, পরিণত অবস্থা ও বিলোপ কয়েক দিন ধরিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহার সঠিক শ্রেণীবিচার করিতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। উপরি-লিখিত শ্রেণীবিভাগ ছাড়াও অনেক সময়ে কোনও মেঘের অবস্থার যথাযথ বর্ণনার জন্য "ছিন্ন" (fracto or broken) বা "টুকরা" ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। স্তূপমেঘ বিলোপ হওয়ার আগে যখন ভাঙিয়া যাইতে থাকে তখন তাহাকে বলা হয় ফ্রাক্টো কিউমুলাস্ (Fracto cumulus) বা ছিন্ন-স্তূপমেঘ। সেইরূপ স্তরমেঘ যখন ছোট ছোট টুকরার আকারে হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়ায় তখন তাহাকে বলা হয় ফ্রাক্টো ষ্ট্র্যাটাস (Fracto stratus) বা ছিন্ন-স্তরমেঘ।*

* মেঘের চিত্রগুলি ভারত-সরকারের আবহবিভাগ-কর্তৃক প্রকাশিত 'Cloud Atlas'-হইতে গৃহীত।

হরিদ্বারের গঙ্গা

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কোথা পেলে এক রাত্রে এই প্রাণ, উদ্বেল যৌবন?
কা'ল দেখিয়াছি তোমা' জীর্ণ অস্থি, পাষাণ-কঙ্কাল,
আজি পূর্ণ কূলে কূলে স্রোতোবেগে উদ্দাম অধীর,
উপলে উপলে বাজে রিণিঝিনি নর্ত্তনের তাল।

শরতের নীলাকাশ, দূরে শান্ত নীল গিরি-রেখা,
যমপার্শ্বে চলিয়াছ, থরথর নয়ন উন্মীল,
ললিত লাবণ্য তব টলমল ত্বরিত গমনে,
ছায়া রৌদ্রে ঝিকিমিকি কাঁপি ওঠে নিচোল আনীল।

শিবজটাসমুত্তীর্ণা, লীলাময়ী স্ফটিক নির্ম্মলা,
অতিক্রমি' অবহেলে লক্ষ লক্ষ শৈলের সোপান,
পূর্ণকুম্ভ লয়ে শিরে দেখা দিলে আমারে চকিতে,
রাখিয়া রূপের ছায়া কোথা পুনঃ করিলে প্রয়াণ?

অশ্বিনীকুমার-স্মরণে

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বাখরগঞ্জ জেলার একটি নিভৃত পল্লীতে আমার জন্ম। কৈশোরে যে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতাম তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে তিন-চারি জনই ছিলেন বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালয়—স্কুল ও কলেজের ছাত্র। তাঁহাদের আলাপ-ব্যবহার, আচার-আচরণ, এমন কি শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যেও বেশ একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। অনুভব করিতাম, বিদ্যালয়ের নৈতিক পরিবেশও অনেকটা উন্নত হইয়া উঠিতেছে। এই শিক্ষকগণের মধ্যে একজনের নিকট আমি বড়ই ঋণী। তাঁহার নাম নিবারণচন্দ্র বৈদ্য। তিনি জাতিতে নমঃশূদ্র, বি-এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। তাঁহার মধ্যে যেন ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সত্য-প্রেম-পবিত্রতার আদর্শ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার মুখ হইতে যে সব উপদেশ শুনিতাম তাহা মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিত; ইহার কারণ তিনি নিজ জীবনে এই সকল পালন করিয়া আসিতেছিলেন। ইংরেজী প্রবচন "Example is better than precept" এর মর্ম্মার্থ তাঁহার জীবন দেখিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি।

তখন অল্প বয়স, সব কথা যে বুঝিতাম তাহা নহে। তবে তাঁহার নিকট অনেক কথা শুনিতাম। ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত রজনীকান্ত গুহ নিয়ত পুস্তক অধ্যয়নে রত থাকিতেন। গ্রন্থাগারের এমন কোন পুস্তক প্রায় ছিলই না, যাহা তিনি অধ্যয়ন করেন নাই। বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠার মার্জিনের নোটগুলি ইহার সাক্ষী। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং স্কুল-বিভাগের কর্ত্তা আচার্য্য জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে স্বচক্ষে দেখিবার বড়ই আগ্রহ জন্মিল। বাখরগঞ্জ জেলার অধিবাসী হইলেও এমন সুযোগ-সুবিধা ছিল না যে বরিশাল শহরে হামেশা যাই। যাহা হউক, আমি মাত্র তিন বার বরিশালে গিয়াছি। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার আইন-বলে প্রথম বার যে নির্ব্বাচন হয় তাহাতে কংগ্রেস যোগ দেয় নাই। তখন গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই সময় দক্ষিণ বাখরগঞ্জ হইতে রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী সদস্যপদ প্রার্থী হইলে আমরা, পল্লীর ছেলেরা, তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াই এবং অন্য একজনের সপক্ষে ভোট ক্যানভাস করি। আমি যে তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছি, এ কথা তাঁহার কাণে যাইতে বিলম্ব হয় নাই। তিনি পিতৃদেবের নিকট আমার কার্য্য সম্বন্ধে অনুযোগ করিলেন; বাবাও বাড়ীতে আসিয়া আমাকে কিঞ্চিৎ ভৎর্সনা করিলেন, তবে তাহা যে তাঁহার হৃদয় হইতে উৎসারিত নহে তাহাও যেন কতকটা বুঝিতে পারিলাম।

বড়দিনের ছুটি আসন্ন। স্থির করিলাম বাড়ীতে ছুটির ক'দিন পিতৃ-সন্নিধানে না থাকিয়া বরিশালে যাইব। তবে ষ্টীমারে নহে, পদব্রজে। ক্লাশে প্রথম হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়াছি, ইহাতে বাবা প্রসন্নই ছিলেন। আবার স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতেও তিনি আমাকে সুযোগ দিতেন। তাঁহার নিকট হইতে যৎসামান্য পাথেয় মাত্র লইলাম। বরিশাল আমাদের গ্রাম হইতে অন্যূন ত্রিশ মাইল দূরে। রাস্তা থাকিলেও বহু বড় বড় নদী-নালা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। পিতৃদেব এ সকল জানিয়াও কিন্তু আমার সঙ্কল্পে বাধা দিলেন না। দ্বিপ্রহরে বাড়ী হইতে রওনা
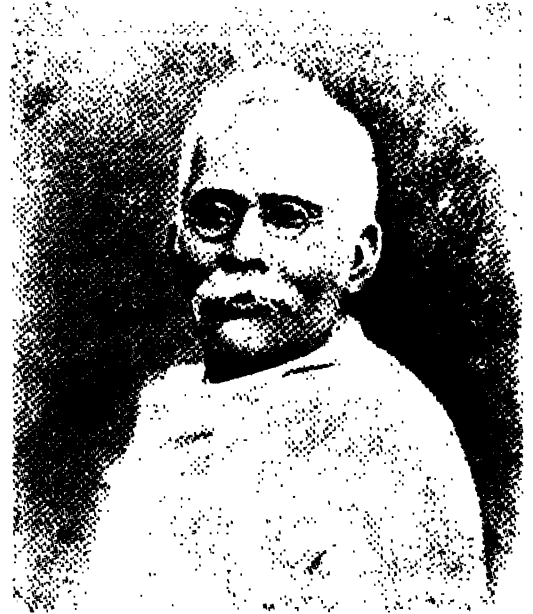
অশ্বিনীকুমার দত্ত

হইয়া রাত্রে মাঝপথে এক আত্মীয়-বাড়ীতে অতিথি হইলাম। ভোরবেলা সেখান হইতে পদব্রজে বেলা অনুমান দশটার সময় বরিশালে পৌঁছিলাম। কোথায় উঠিব, কাহার নিকট থাকিব কিছুই ঠিক নাই। অকস্মাৎ বাড়ীর নিকটের এক পূজারী ব্রাহ্মণের সঙ্গে কালীবাড়ীতে দেখা হইল। তিনি হোটেলে আমার মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমি এ যাত্রা দুই দিন মাত্র বরিশালে ছিলাম। ইহার

মধ্যেই সুন্দর সুন্দর অভিজ্ঞতা হইল। আমাদের স্কুলের প্রথম বারের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র জিতেন্দ্রনারায়ণ বসুর সঙ্গে পথিমধ্যে দেখা হইল। তাঁহার নিকট এক রাত্রি এই সর্ত্তে ছিলাম যে, ভোর হইবার পূর্ব্বেই সেখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে।

এখন আসল কথায় আসা যাক। বরিশালে আসিয়াছি। এত দিন যাঁহাদের কথা শুনিয়া আসিতেছিলাম, সেই অশ্বিনীকুমার-জগদীশচন্দ্রকে দেখিয়া না গেলে যে আমার বরিশাল আগমনই বৃথা। অশ্বিনীকুমারের ভবনে গেলাম, শুনিলাম তিনি তখন বরিশালে নাই। বড়ই নিরাশ হইলাম। ইহার পরে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। মনে হইতেছে, এক দিন বৈকালে গিয়াছিলাম। জগদীশচন্দ্রের সৌম্য মূর্ত্তি। আমি তাঁহার ছাত্রের ছাত্র বলিয়া পরিচয় দিলাম। কত কালের পরিচিত—এইরূপ ভাবে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি আমাকে কি কি বলিয়াছিলেন ঠিক মনে নাই, মাত্র একটি কথা মনে আছে। তিনি বলিয়াছিলেন, 'ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি'। তিনি ইহার মানেও করিয়া দিয়াছিলেন। এই কথাটি তাঁহার মুখে সেই প্রথম শুনি। তদবধি ইহা আমার মনে গাঁথা রহিয়াছে। মানুষের যথার্থ উন্নতির মূলে যে এই বোধ, বয়স যতই বাড়িতেছে ততই উপলব্ধি করিতেছি।

অসহযোগ আন্দোলনের ঘনঘটা সুরু হইয়াছে। এবারেও বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন হইবে। বিপিনচন্দ্র পাল সভাপতি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আসিবেন, আরও রটিয়া গেল মহাত্মা গান্ধীও আসিতে পারেন। ঈষ্টারের ছুটিতে, ১৯২১ সনের ২৪শে মার্চ্চ এই সম্মেলন আরম্ভ হইবে। আমাদের পল্লীতে এবং স্কুলেও এ সংবাদ যথাসময়ে পৌছিল। আমরা তিন বন্ধুতে এবারেও পদব্রজে বরিশাল রওনা হইলাম। এবার থাকা-খাওয়ার অসুবিধা হয় নাই। জনৈক বন্ধুর পরিচিত কি আত্মীয় এক উকীলের বাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। মহাত্মা গান্ধী আসিবেন না জানিয়া বড়ই দুঃখ হইল। তবে এবার অশ্বিনীকুমারকে দেখিলাম। বার্দ্ধক্যেও প্রিয়দর্শন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ মাত্র এক পৃষ্ঠা পড়িয়াই, অন্যের উপর পাঠের ভার দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার গলা ভাঙিয়া গিয়াছে। সম্মেলন-মণ্ডপে এবং অন্যত্র সর্ব্বসাকুল্যে তাঁহাকে তিন-চারি বার দেখিয়া লইলাম।

ইহার পর দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। স্বদেশী আন্দোলন দেখি নাই, অসহযোগ আন্দোলন আমাদের মনে যে দোলা দিয়াছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না। প্রবেশিকা পরীক্ষার তারিখ পিছাইয়া ১৯২২ সনের ৬ই এপ্রিল আরম্ভ হইবে ধার্য্য হইল। প্রথম শ্রেণীতে উঠিতেই অসহযোগ আন্দোলন ভারতব্যাপী জোর আরম্ভ হয়। আমাদের পল্লী অঞ্চলেও ইহার তরঙ্গ এমন ভাবে অনুভূত হইতে থাকে যে, আমরা কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলাম না; আমাদের যেন কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল। বলিতে কি, এক বৎসরের মধ্যে অল্প সময়ই পাঠে মনঃসংযোগ করিতে পারিয়াছি। দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত যাহা পড়িয়াছি একরূপ তাহার উপরই পরীক্ষা দিয়াছিলাম। তখন সমগ্র বরিশাল জেলায় একটি মাত্র পরীক্ষা-কেন্দ্র। আমরা যথাসময়ে বরিশালে উপনীত হইলাম।

এইবার বরিশালে একাদিক্রমে নয় দিন থাকি। ইহার পর আর সেখানে যাওয়ার সুযোগ ঘটে নাই। শুনিলাম অশ্বিনীকুমার বরিশালে আছেন। ইহার পূর্ব্বে একবার তাঁহার ভীষণ অসুখ হয়, কিন্তু তাহা তিনি কাটাইয়া উঠিয়াছেন। তবে এখনও রুগ্ন। নয় দিন বরিশাল বাসের সময় স্নানাহার বাদে আমার দুইটি মাত্র কাজ ছিল—পরীক্ষা দেওয়া আর অশ্বিনীবাবুর বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপাদি করা। প্রথমটি সম্বন্ধে এখানে কিছুই বলিবার নাই। দ্বিতীয়টি আজিও আমার সমগ্র মন জুড়িয়া আছে।

আচার্য্য জগদীশের সৌম্য মূর্ত্তি; আর অশ্বিনীকুমারের শান্ত শুভ্র কান্তি। আমার সেই একই পরিচয়, তাঁহার ছাত্রের ছাত্র। বহু দিন পরে আগত পৌত্রকে দেখিয়া দাদামহাশয়ের যেমন আনন্দ, এই পরিচয়ে অশ্বিনীকুমারও যেন সেইরূপ আনন্দ পাইলেন। আমি তখন অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক, বা কিশোরও বলিতে পারেন, কিন্তু বৃদ্ধ অশ্বিনীকুমার যেন আমাকেও হার মানাইয়াছেন। তাঁর আচরণ ঠিক শিশুর মত; কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, একজন মহামনা লোকের সম্মুখে আসিয়াছি। কতকালের পরিচিতের মত আমার সঙ্গে কথা জুড়িয়া দিলেন। কোন্ দিন কি কথা হইয়াছে ঠিক স্মরণ নাই। প্রথম দিন পরিচয়ের অতিরিক্ত কথা কিছু হইয়াছে কিনা তাহাও বলিতে পারিতেছি না। আমি যখন পরীক্ষান্তে বৈকাল বেলা দেখা করিতে যাই তখন আর এক ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

পরদিনও পরীক্ষা, সন্ধ্যা না হইতেই চলিয়া আসিলাম। প্রত্যহ পরীক্ষার পর বৈকালে যাইতে লাগিলাম। তাঁহার তক্তপোষের কোণের দিকে আলাদা উঁচু করিয়া একখানি অতিকায় পুস্তক রাখা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—গ্রন্থসাহেব; হিন্দুর যেমন বেদ, মুসলমানের

যেমন কোরাণ, খ্রীষ্টানের যেমন বাইবেল, শিখদের তদ্রূপ এই গ্রন্থখানি। দেখিলাম সযত্নে ইহা রক্ষিত হইয়াছে। অশ্বিনীকুমার বলিলেন, যখন লক্ষ্ণৌ জেলে ছিলাম, গুরুমুখী শিখিয়া এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। তখন মনে পড়িল, আমার শিক্ষক নিবারণবাবুর কথা। তিনি বলিয়াছিলেন, অশ্বিনীকুমার যত দিন জেলে ছিলেন, এক মুহূর্ত্তও আলস্যে কাটান নাই, রাশি রাশি বই পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি যে এখানে বসিয়া বহু কবিতা এবং সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন তাহা পরে জানিতে পারিয়াছি।

অশ্বিনীকুমার পিতা ব্রজমোহন দত্তের সঙ্গে শৈশবে ও কৈশোরে বাংলার বিভিন্ন জেলায় বাস করিয়াছেন। তিনি যখন যেখানে ছিলেন, সেখানকার কথ্য ভাষা (dialect) বেশ আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেন। ভাষা শুনিয়া বুঝাই যাইত না তিনি কোথাকার লোক। অশ্বিনীকুমার আমার সম্মুখেই কলিকাতার ও বাখরগঞ্জীয়া ভাষায় এমন চমৎকার কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন যে, আমার একেবারে তাক্ লাগিয়া গেল।

তাঁহার প্রমুখাৎ আর একটি উপভোগ্য বিষয় শুনিয়াছিলাম—আশুতোষের আহার। স্যাড্‌লার কমিশনের সদস্যরূপে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বরিশাল ব্রজমোহন কলেজেও গিয়াছিলেন। ব্রজমোহন কলেজ তাঁহার নিকটে নানা কারণেই ঋণী। অশ্বিনীবাবু বলিলেন, আশুতোষ যখন বরিশালে যান, তখন আমি বরিশালে অনুপস্থিত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার আদর-যত্নের ত্রুটি হয় নাই। আশুতোষ কিরূপ ভোজনপটু, শোন্। চৌষট্টিটি বাটিতে খাদ্যদ্রব্যাদি থালার চারিদিকে সাজাইয়া রাখা হয়। আশুতোষ একে একে সবই নিঃশেষ করিলেন। এ ধরণের লোককে খাওয়াইয়াও আনন্দ হয়।

অশ্বিনীকুমারের নিকট কলেজের ছাত্রদের বহু কাহিনী শুনিতাম। বলা বাহুল্য, এ সকল আগেকার কালের কথা। কারণ তখনকার সরকার-পোষিত ব্রজমোহন কলেজের উপর অশ্বিনীকুমার বড়ই বিরক্ত ছিলেন, কথা বলিতে বলিতে তাঁহার ভাষা তীব্র হইয়া উঠিত। তখনও কালীপ্রসন্ন ঘোষ সহকারী অধ্যক্ষ। তিনি বলিয়াছিলেন, কলেজে ঐ একটিমাত্র লোক আছেন যিনি পুরাতনের জের যৎকিঞ্চিৎ টানিয়া চলিয়াছেন। যাহা হউক, সেকালের ছেলেদের কথা বলিতে বলিতে অশ্বিনীকুমার একেবারে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। একদিন একটি ছাত্র আসিয়া খবর দিল, তাঁহার বাবা ও কাকারা বিষয় লইয়া এমনই কলহোন্মত্ত হইয়াছে যে, তখনই তিনি গিয়া তাঁহাদিগকে না থামাইলে খুনাখুনি হইয়া যাইবে। অশ্বিনীকুমার কহিলেন, তখনই সতীশকে (সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) পাঠাইলাম। দেরী করিলে চলিবে না। তিনি সাইকেলে ছাত্রটিকে লইয়া প্রায় পনর মাইল দূরের সেই গ্রামটিতে চলিয়া গেলেন। বিবাদ মিটাইয়া যথাসময়ে আসিয়া আমাকে খবর দেন।

আর এক দিনের কথা। একটি ছাত্র—বোধ হয় তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর—আসিয়া অশ্বিনীকুমারের কাছে বসিয়া বড়ই কাঁদিতে লাগিল। যেন সে কত বড় অপরাধী। বাস্তবিকই সে ভয়ানক অপরাধ করিয়াছিল। অপরাধের কথা বলিতে বলিতে ছাত্রটি কাঁদিয়া ঘর ভাসাইয়া দিতেছে। অশ্বিনীকুমার কিছুক্ষণ থ' হইয়া রহিলেন। পরে সান্ত্বনা দিতে দিতে কোলে জড়াইয়া ধরিলেন। ছাত্রটিকে বলিলেন, তোমার যখন সত্যই অনুতাপ হইয়াছে তখন আর তোমার পাপ নাই, তুমি পাপ হইতে মুক্ত, চোখের জলে এমন গুরুতর অপরাধও ক্ষালন হইয়া গিয়াছে। অশ্বিনীকুমারের কথায় যুবক আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেল। এই যুবক পরে নাকি বেশ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

বালসুলভ চাপল্যবশতঃ অশ্বিনীকুমারকে অনেক প্রশ্ন করিতাম। এখন মনে এই বলিয়া আক্ষেপ হয় যে, তাঁহাকে তখন আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না কেন। তখন অসহযোগ আন্দোলনে অনেকটা ভাটা পড়িয়াছে। বাংলার ও বাহিরের বহু নেতার নাম শুনিয়াছি, পল্লীগ্রামের স্কুলের ছাত্র; এমন কোন পুস্তকাদি তখন পাই নাই যাহা দ্বারা কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারি। পূর্ব্ববারে বরিশাল সম্মিলনে আসিয়া চিত্তরঞ্জন দাশ এবং বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়কে দেখিয়া গিয়াছি। চিত্তরঞ্জন এখন সর্ব্বত্যাগী 'দেশবন্ধু'। তাঁহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় অশ্বিনীকুমার বলিলেন, দাশ সাহেবের ত্যাগ অনন্যতুল্য। কি সাহেব ছিলেন, এখন একেবারে সর্ব্বত্যাগী, দেশবন্ধু! অশ্বিনীকুমার চিত্তরঞ্জনকে দাশ সাহেব বলিতেন, পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। চিত্তরঞ্জন অসহযোগের পূর্ব্বে এই নামেই পরিচিত ছিলেন। বিপিনচন্দ্রকে অশ্বিনীকুমার প্রসিদ্ধ বক্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন মনে পড়ে।

দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথের তখন বড়ই দুর্নাম। সরকারের সঙ্গে তাঁহার সহযোগিতার নিন্দা করিয়া বাংলার চরমপন্থী সংবাদপত্রসমূহে প্রায় প্রত্যহই কিছু-না-কিছু লেখা হইত। ইহার মধ্যেও কিন্তু তাঁহার প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব লক্ষ্য করিতাম। 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় সুরেন্দ্রনাথকে 'Surrender Not' বলিয়া উল্লেখ করিতে দেখিয়াছি। সুরেন্দ্রনাথ অশ্বিনীকুমার অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ, অথচ তাঁহার তখনও কি রকম শক্তি। জিজ্ঞাসা করিলাম, সুরেন্দ্রনাথ অপেক্ষা অল্পবয়স্ক হইয়াও তাঁহার শরীর এরূপ ভাঙিয়া

পড়িল কেন? অশ্বিনীকুমার একটু উত্তেজিত হইয়াই বলিলেন, 'সুরেন্দ্রবাবু দু'বেলা ডাম্‌বেল ভাঁজেন, রোজ একটা করিয়া মুরগী খান। আমি কি ডাম্‌বেল ভাঁজি না মুরগী খাই যে, আমার শরীর এখনও তাঁহার মত থাকিবে?' :'ফেডারেশন হল'-প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তাঁহার প্রতি অশ্বিনীকুমারের ভাল ধারণা ছিল না। তিনি বলিলেন, "টাকাগুলি কি হইল তাহারও কেহ হদিস্ জানে না।" বহু পরে জানিতে পারিয়াছি, এই টাকা ভারত-সভার হেপাজতে আছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহার দ্বারা জমি কেনা ব্যতিরেকে বিশেষ কোন কাজ হয় নাই। তবে এই টাকার সুদ হইতে নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে কিছু কিছু সাহায্য করা হইতেছে। জনসাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত টাকার হিসাবপত্র রীতিমত বিজ্ঞাপিত না হইলে এইরূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। দেখিলাম, সর্ব্বজনমান্য অশ্বিনীবাবুও এবিষয়ে ঠিক খবর জানিতেন না।

লজপত রায়, মদনমোহন মালবীয় প্রমুখ নিখিল-ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কথাও একে একে জিজ্ঞাসা করি। লজপত রায় পঞ্জাবের সিংহ; তাঁহার প্রতি অশ্বিনীকুমার শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বস্তুতঃ লজপত রায়ের ত্যাগ কাহার না দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে? তাঁহার মত জ্ঞানী, গুণী, ত্যাগী নেতা যে-কোন দেশেই বেশী মিলিবে না। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় কাশীধামে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, আবার তিনি একজন প্রসিদ্ধ দেশ-নেতাও। তাঁহার প্রতি আমার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। তবে তিনি যে তখন বাঙালীদের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না একথা শিক্ষকগণের কাহারও কাহারও মুখে পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম। অশ্বিনীকুমারকে মালবীয়জীর কথা জিজ্ঞাসা করায় তাঁহার প্রমুখাৎও বিশেষ কোন সদুত্তর পাই নাই।

অশ্বিনীকুমারের গৃহ-প্রাঙ্গণের বিখ্যাত তমালগাছটি সিমেণ্ট-বাঁধানো। বৈকালবেলা আমি এখন তাঁহার প্রাত্যহিক সঙ্গী। তিনি আমার স্কন্ধে ভর দিয়া ইহার চারিদিকে দু-তিন দিন বৈকালে পায়চারি করিয়াছেন। প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে বিষ্ণুমন্দির, তাহার মধ্যে অতি শুভ্র একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি। অশ্বিনীকুমার বলিলেন, এই মূর্ত্তিটি তিনি জয়পুর হইতে আনিয়া এখানে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আরও বলিলেন, প্রাঙ্গণের ভিতরে কয়েকটি ঘর ছিল, প্রথমে স্কুল ও কলেজ বহুদিন যাবৎ এখানে ছিল। পরে অন্য বাড়ীতে দুইই চলিয়া যায়। ফাঁকা জায়গা অনেকটা পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম। তখন ছোট ছোট কোন গাছ দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে, তবে ফুলগাছ ছিল না নিশ্চয়। কারণ আমি বেড়াইতে বেড়াইতে এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, প্রাঙ্গণের ভিতরে এত জায়গা পড়িয়া আছে, কিন্তু কোন ফুলগাছ নাই কেন? তিনি বলিতে লাগিলেন, 'কেন নাই জানিস্? স্কুল কলেজ অন্যত্র যাওয়ার পর জায়গা যখন পরিষ্কার হইল, তখন অনেক ফুলগাছ লাগানো হয়। ফুলও ফুটিত। কিন্তু ফুল রাখা যাইত না।' বলিতে বলিতে তিনি খানিকটা উচ্চস্বরে বলিলেন, ফুল যাহারা ছিঁড়ে তাহারা এরূপ অপকর্ম্ম নাই যে না করিতে পারে। অশ্বিনীকুমারের সৌন্দর্য্যবোধ এতই তীব্র ও গভীর ছিল।

আমার ·পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। পরদিনই বরিশাল ত্যাগ করিতে হইবে। শেষ দিন বৈকালে তাঁহার নিকট যথারীতি গেলাম, বিদায়কালে পদধূলি লইবার জন্য। আমি যাইবার পরই মনে হয়, তিনি নীচতলার প্রকোষ্ঠ হইতে আঙিনায় আসিয়া আরাম কেদারায় বসিলেন। আমি সম্মুখে বসিয়াছিলাম। সবেমাত্র সূর্য্যাস্ত হইয়াছে, কিন্তু গোধূলি তখনও রাত্রির ঘনান্ধকারে মিলাইয়া যায় নাই। সম্মুখে অর্দ্ধশায়িত প্রশান্ত মূর্ত্তি। এই ক'দিন যখনই তাঁহার কাছে গিয়াছি, তাঁহার মস্তকের তালুদেশে তৈল মালিস করিতে দেখিতাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম, কবিরাজী তেল, ঔষধরূপে ব্যবহার করিতেছেন। এদিনও মাথায় দেওয়া হইতেছিল। পরদিনই বরিশাল হইতে বাড়ী রওনা হইব। বলিলাম বিদায় লইতে আসিয়াছি। অসহযোগের মরশুমে প্রচলিত কালেজী শিক্ষার উপর আমি বীতরাগ হইয়াছিলাম, একজন বন্ধুর পরামর্শে এখানে সেখানে চিঠি লিখিয়া কোন কারিগরি বিদ্যাশিক্ষার জন্য Prospectus বা অনুষ্ঠানপত্র আনাইতাম। অশ্বিনীকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার পর কি করিব। যেমন প্রশ্ন, তেমনি উত্তর, "ঘোড়ার ঘাস কাটবি"। আর অফুরন্ত হাসি। একটু পরে ভাবিয়া বলিলেন, কোন টেক্‌নিক্যাল লাইনে যাওয়াই ভাল। আমার মনের মত কথা পাইলাম। ইহার পর টেক্‌নিক্যাল লাইনে যাওয়ার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু বিধি বাম। টেক্‌নিক্যাল লাইনে যাওয়া হইল না। কালেজী শিক্ষা পাইয়া এখনও 'ঘোড়ার ঘাস'ই কাটিতেছি। অশ্বিনীকুমারের নির্দ্দেশে ব্রজমোহন কলেজে প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থীদের বিদায়-অভিনন্দনে যোগ দিলাম। বর্ম্মিষ্ঠ ভাষায় বক্তৃতা বড়ই ভাল লাগিল। পরদিন বাড়ী রওনা হইলাম। অশ্বিনীকুমারকে সেই আমার শেষ দেখা।

প্রতিচ্ছবি

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

পাঁচ বৎসর পরে আবার পুজোর ছুটিতে বাড়ী ফিরছি। বোম্বে থেকে কলকাতা পর্য্যন্ত যদি বা একরকম করে এলাম, কিন্তু শেয়ালদা ষ্টেসনে এসে যাত্রীর ভিড় দেখে ত একেবারে চক্ষুস্থির! একে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী তায় আবার আমি নেহাত গোবেচারা লোক, আস্তিন গুটিয়ে গায়ের জোরে স্থান করে নেবার মত অবস্থা আমার নয়। তবু ভাগ্য আমার ভালই বলতে হবে—গাড়ীর এক কোণে মুখ কাঁচুমাচু করে বাঙ্কের শিকল ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম. ব্যারাকপুর গাড়ী থামতেই আমার সামনের লোকটি, যিনি অন্ততঃপক্ষে দু-জনের জায়গা দখল করে বসেছিলেন, নেমে গেলেন। আমি অপ্রত্যাশিত আনন্দে বসে পড়ে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে লাগলাম। নিতান্ত দৈব কৃপা ছাড়া এত বড় অঘটন কিছুতেই ঘটতে পারে না! জুতো জোড়া খুলে বেঞ্চের একপাশে রেখে (নইলে চুরি যাবার ভয় আছে) দু'পা তুলে দিয়ে ঢুলতে লাগলাম। বসে বসেই যে নাক ডাকাচ্ছিলাম তাতে আর সন্দেহ নেই। এমনি করে গাড়ী রাণাঘাট এসে গিয়েছিল, সেখানে কাষ্টমস্ অফিসারদের ঠেলায় একবার চোখ মেলে চাইলাম—দেখি গাড়ী অনেকখানি ফাঁকা হয়ে গেছে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। পরক্ষণেই আবার চোখ বন্ধ করে পূর্ব্বের মত ঢুলতে লাগলাম। রাণাঘাটে গাড়ী কতক্ষণ ছিল জানি না—কিন্তু সেখান থেকে গাড়ী ছাড়বামাত্রই দারুণ হৈ-হল্লায় আবার চোখ মেলে তাকালাম। আমার সামনের বেঞ্চের দিকে চেয়ে দেখি তিন-চারটি মেয়েছেলে এসে সব জায়গাটুকু একেবারে দখল করে বসেছে। কিন্তু যারা আগে বসেছিল তারা এসে দাবি জানাচ্ছে—"উঠ, আমাদের জায়গা ছেড়ে দাও।" মেয়েরাও জবাব দিচ্ছে—"ইস্, জায়গা কি কারু কেনা? না নাম লেখা আছে?" যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের ভিতর থেকে একজন বলে উঠল—"না, কেনা তোমাদেরই—ডবল টিকিট কিনেছ কি না?" সঙ্গে সঙ্গে আর একটি মেয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠল—"রাণাঘাট পর্য্যন্ত টিকিট কিনেই এত চোট—সবটা কিনলে ত কথাই ছিল না।" এই মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল একে যেন চিনি—কোথায় দেখেছি, কিন্তু মনে করতে পারলাম না।

ঝগড়া যখন এদের একেবারে সপ্তমে চড়ে উঠল তখন একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম, বললাম—একি, আপনারা কি আর গাড়ীতে টিকতে দেবেন না—কোন রকম করে একটা ব্যবস্থা করে নিন্ না। মেয়েদের দিকে ফিরে বললাম—আপনারা একটু সরে সরে বসুন, তা হলে পাশেও ত কয়েকজন বসতে পারবে। সেই অল্পবয়সী মেয়েটি এবার আমার পানে চেয়ে চট করে মুখটি ফিরিয়ে একেবারে জানালার বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল—মাথায় কাপড় টেনে দিলে। বুঝলাম মেয়েটিও তা হলে আমাকে চেনে—কিন্তু আমি অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। ক্রমে ক্রমে তাদের ঝগড়া মিটে গেল, আমিও আবার ঢুলতে লাগলাম। কয়েকটা ষ্টেশন পরে আবার একবার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। একি, গাড়ীর ভেতর যে একেবারে বাজার বসে গেছে—জোড়ায় জোড়ায় নূতন ধুতি শাড়ী বিক্রী হচ্ছে।

আমার সামনের বেঞ্চের দিকে তাকিয়ে সেই মেয়েটিকে আর দেখতে পেলাম না। ষ্টেশনে এসে যখন নামলাম তখন সকাল হয়ে গেছে। বাক্স বিছানা নামিয়ে একটু-খানি অপেক্ষা করতে হ'ল, বাড়ী থেকে চাকর নৌকা নিয়ে আসবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের বাড়ীর চাকর নটবর এসে হাজির হ'ল। তার মাথায় বাক্স বিছানা চাপিয়ে নদীর দিকে চললাম। ষ্টেশন থেকে আধ মাইলটাক হেঁটে যেতে হয়। কিছুদূর আসতে না আসতেই ঝর ঝর করে বৃষ্টি নামল—তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গিয়ে সামনের একখানা গুদামঘরের বারান্দায় উঠলাম। ইতিমধ্যে এখানে আরও কয়েকজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে—জনকতক স্ত্রীলোকও আছে। পুরুষদের সকলেরই হাতে একটা করে চটের ব্যাগ আর মেয়েদের সঙ্গে নানা আকারের পুঁটুলি। হঠাৎ একটি মেয়ে তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে একপাশে জড়সড় হয়ে দাঁড়াল। গাড়ীর সেই মেয়েটিই ত! কিন্তু তবু মেয়েটিকে চিনতে পারলাম না।

নৌকায় এসে নটবরকে জিজ্ঞাসা করলাম—"আচ্ছা ঐ যে গুদামঘরের বারান্দায় আমাকে দেখে ঘোমটা টেনে দিলে—ঐ মেয়েটি কে বল ত নটবর?" নটবর বললে—"ওকে চিনলেন না? ও যে হারাণ মাঝির বউ।"—"কোন হারাণ মাঝি?" "আপনাদের বাড়ীর পাশের হারাণ।" আমি একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম—"বলিস কি নটবর?" নটবর বলতে লাগল—"আজ বছর চারেক হ'ল হারাণ মারা গেছে। তারপর থেকে ত তার বউই সংসার চালাচ্ছে—ওরা সবাই "বেলাক মারকেটের" দল।"—"বলিস কি—পাড়াগেঁয়ে মেয়ে গৃহস্থঘরের বউ!" "আর গেরস্থঘরের বউ, এমনি কতজন করতিছে। গাঁয়ে গেলি দেখতি পাবেন সারা গাঁ একেবারে বেলাক মারকেটে ভরে গেছে।" আমাদের বাড়ীর পাশেই হারাণ মাঝির বাড়ী। হারাণের অবস্থা নিতান্ত

মন্দ ছিল না—সেবারকার দুর্ভিক্ষে সে বাড়ীর খানদুই টিনের ঘর বিক্রী করে কোন রকমে বেঁচে গিয়েছিল।—তার বউটি ত বড় লক্ষী ছিল। মা মাঝে মাঝে নিতান্ত ঠেকা পড়লে তাকে দিয়ে কিছু কিছু কাজকর্ম্ম করিয়ে নিতেন। কাজেই আমাদের বাড়ীতে বউটির আসা যাওয়া ছিল—কিন্তু মুখখানি তার ভাল করে কোন দিনই দেখতে পাই নি। মা বলতেন, খুব লক্ষী মেয়ে—এমন চমৎকার মেয়ে ভদ্দর লোকের ঘরেও বড় একটা দেখা যায় না। সেই বউটি আজ চোরাই কারবার করছে? এ যে ভাবতেই পারা যায় না। জিজ্ঞাসা করলাম—"হারাণের কি হয়েছিল নটবর?" নটবর বললে, "সে আজ বছর চারেকের কথা। তা এক রকম না খাতি পায়েই মলো বলতি পারেন। সেবার দুর্ভিক্ষের বছরে তার হাতে যা ছিল, আর ঘর দুইখানা বেচে খাইছিল। কিন্তু চালির দাম ত আর এর মধ্যি একেবারে কমে নাই—কখনও শস্তা হ'ল ত আট আনা—আর আক্রা হ'ল ত বার আনা—এবার ত আঠার আনা তক্ উঠছিল। সেবার পর পর কয়েক দিন খাতি না পায়ে—পন্নায় গিছিল—

থেমে বললে—"পন্নায় কয়দিন খুব খাওয়া দাওয়া করে প্যাটের অসুখ হ'ল—আস্‌ল বাড়ী—বাড়ী আসে না জুটল ওষুদির দাম, না জুটল পথ্যি। কয় দিন তুগে মারা গেল।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নটবর বললে, "মাঝিগেরে দশাই এই দাদাবাবু—কোন বার জলে ভাল মাছ হ'ল ত দুই পয়সা পালো—আর যেবার মাছ হ'ল না সেবার উপোস করে মরল। এবার ত ভাশে এত জল—কিন্তক এট্টা মাছ নাই—না আছে পন্নায় ইল্‌সে না আছে বিলি নউছি কাভোল। মাঝিরা এবার সব একেবারে মারা গেল। আর মাঝি কেন—আমরা সকলি এবার মরব। সেবার ছিল ক্যাবল এক চালির দর, এবার সব জিনিষই একেবারে ধরা ছোঁয়া যায় না। বললি বিশ্বেস করবেন না বাবু এট্টা মদনা কলার দাম চার পয়সা—যা আগে পয়সায় দুভো পাওয়া যাত।" মনের খেদ মিটিয়ে নটবর নিজের মনেই আরও অনেক কিছু বলে যেতে লাগল। কিন্তু সমস্ত ছাপিয়ে আমার মনে বারে বারে জাগতে লাগল কেমন করে সেই হারাণের বউ এমন চোরাকারবারী হয়ে উঠল। সেই রেল-গাড়ীতে একগাদা লোকের মাঝখানে কেমন করে ঝগড়া করতে পারল—ভারি আশ্চর্য্য ত!

২

পরের দিন সকালবেলায় খবর পেয়ে আমাদের পাড়ার হরিহর কাকা দেখা করতে এলেন। পায়ের ধুলো মাথায় নিতেই তিনি প্রাণ ভরে আশীর্ব্বাদ করলেন। কুশল-প্রশ্নের পর জিজ্ঞাসা করলেন—"কাপড়-চোপড় দু'চার জোড়া এনেছ ত?" আমি বললাম—"না, আনতে যে বাধা আছে—তা ছাড়া রাণাঘাটে আর বানপুরে বাক্স পেঁটরা সব তল্লাস করে দেখে।" হরিহর কাকা ক্ষুণ্ণ মনে বললেন—"তুমি ত দেখছি আচ্ছা মানুষ—শুধু হাতে কি কেউ আসে। আর ভদ্দরলোক দেখলে তেমন একটা ধরে না। যারা ব্ল্যাক করে তাদের টের পায়।" "কিন্তু দৈবাৎ ধরা পড়লে ত আর লজ্জার শেষ নাই।" "তেমন হলে হাতের ভেতর এক টাকার একখানা নোট গুঁজে দিলে সব ঠিক হয়ে যায়। তুমি দেখছি কোন কর্ম্মের নও। দু'চার জোড়া ব্ল্যাকের দরে বিক্রী করে দিলেও ত গাড়ীভাড়ার খানিকটা উঠত।" আমি শুধু অবাক হয়ে খানিকক্ষণ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম—কোন কথা বললাম না। হরিহর কাকা পুনরায় বললেন—"আমি ভেবেছিলাম তোমার কাছ থেকে এক জোড়া ধুতি নেব—বাড়ীতে একেবারে কাপড় নেই।"

বিকালবেলায় গ্রামের ভিতর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, কে যেন পিছন থেকে ডেকে উঠল—"কে ছোটবাবু না? কবে এলেন?" ফিরে তাকিয়ে দেখি—অবিনাশ কুণ্ডু, সঙ্গে একটা ছেলে। দু-চারটি কুশল প্রশ্নের পর জিজ্ঞেস করলাম—"ছেলেটি কে?" "আজ্ঞে আমার ছোট ছেলে।" দিব্যি ছেলেটি! জিজ্ঞেস করলাম—"তোমার নাম কি খোকা?" ছেলেটি চট্‌পট্ করে জবাব দিলে—"পরেশচন্দ্র কুণ্ডু।" "কোন ক্লাশে পড়?" ছেলেটি সহসা কোন জবাব না দিয়ে একটু ইতস্তত করতে লাগল। "আজ্ঞে ও ত আর ইস্কুলে যায় না ছোটবাবু—ব্লেক মারকেট করে।" আমি বললাম—"ছেলেটি যে ওসব করে একেবারে খারাপ হয়ে যাবে?" অবিনাশ বললে, "খারাপ হবে কেন?" "এখন থেকে এমনি চোরাই কারবার শিখলে এ অভ্যাস যে যাবে না।" "তাতে কি? ব্যবসায়ীর ছেলে ব্যবসা করেই ত খেতে হবে বরং আরও পাকাপোক্ত হয়ে উঠবে।" দেশের হ'ল কি? আর কথা না বাড়িয়ে এগিয়ে চললাম—সামনেই বিজয়দার বাড়ী। বিজয়দা গ্রামের মাইনর স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার। ডাক দিতেই তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে বললেন—"আরে শৈলেন যে, এস এস—কদ্দিন পরে বাড়ী এলে। দেশের কথা কি আর মনে আছে তোমাদের?" আমি বললাম—"অত দূরের পথ সময় করে উঠতে পারি নি—তাই বলে কি দেশের কথা ভুলতে পারি?"

বিজয়দা বললেন—"আর দেশ ভাই, গাঁ ত' শ্মশান হয়ে উঠল, যাদের অর্থ-সামর্থ্য আছে তারা সবাই দেশ ছেড়ে গেছে, কেউ কেউ যাওয়ার যোগাড় করছে। আমি বললাম—"কিন্তু আমাদের অঞ্চল ত ভাল—সত্যি কথা বলতে কি এখান থেকে পালানোর কারণ ঘটে নি। কিন্তু আমার কি মনে হয় দাদা—মানুষ এখান থেকে চলে যাচ্ছে—ভবিষ্যৎ ভেবে—অর্থনৈতিক কারণে। আর বলব কি দেশ আজ দুর্নীতিতেও ভরে গেছে—কণ্ট্রোলের প্রত্যক্ষ দুষ্ট ফল ত হাতে হাতে পাওয়া যাচ্ছে।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিজয়দা বললেন—

"দুর্নীতির কথা যখন তুললে তারা তখন আর না বলে পারলাম না। আগেই জানিয়ে রাখি ব্ল্যাক মার্কেটিং আমিও করি। ওটার বাংলা করে যদি চোরাই কারবার বল তো মুখে আটকাবে—আমি তা বলি না।" আমি অবাক হয়ে বললাম—"আপনি ব্ল্যাক মার্কেটিং করেন!" "হ্যাঁ। জানি তুমি বিস্মিত হবে—হয়ত এ নিয়ে মস্ত বড় একটা বক্তৃতা দেবে—কারণ তুমি বদলাও নি। অন্ততঃ অভাবের তাড়নাটা যে কি তা আজও বোঝবার মত দুর্ভাগ্য তোমার হয় নি। কৃষক প্রজা মজদুর রাজ বলে খুব চেঁচামেচি চলছে আজকাল। কিন্তু মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের কথা কেউ ভেবেছে?"

একটু দম নিয়ে ফের সুরু করলেন, এই যে বেলা দশটায় নাকে মুখে দুটো গুঁজে কাজে বেরুই তার বিনিময়ে কি পাই? লিখি পঁয়ত্রিশ টাকা, পাই পঁচিশ টাকা। তাও চার পাঁচ মাস পরপর। আমাদের মুখের দিকে তাকাবে কে? আর ছেলে পড়ান যদি এমনই বাজে কাজ—দেশের স্কুলগুলো সব তা হলে তুলে দিলেই হয়। সুতরাং ব্ল্যাক মার্কেটিংই করি। বাঁচতে হবে ত—এর চাইতেও যদি নীচে নামতে হয় তাতেও দ্বিধা করব না।" বিজয়দার কথা শেষ হ'ল, কিন্তু আমি না পারলাম তাকে সমর্থন করতে, না পারলাম তার কথার প্রতিবাদ করতে। নানা কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরে এলাম।

৩

আমাদের গ্রামটি এ অঞ্চলে একটা নাম-করা গ্রাম ছিল। আমাদের ছোটবেলায়ও দেখেছি গ্রামের বেশ সমৃদ্ধ অবস্থা। কিন্তু আজ সারাটা গাঁ খুঁজলে তিন চারশ' লোক হবে কিনা সন্দেহ। ছোটবেলায় ঠাকুদ্দার কোলে বসে এই গ্রামের কত গল্প শুনেছি। তখন অগুন্তি লোক ছিল গ্রামে। পাঁচালী, যাত্রা, কীর্ত্তন চব্বিশ ঘণ্টা ধরে চলত। কোন অভাব ছিল না তখন। গ্রামে ছিল কামার, কুমোর, তাঁতি, চাষী, তিলি, জেলে সব সম্প্রদায়ের লোক। হিন্দু-মুসলমান সত্যি তখন ভাই ভাই ছিল। আর আজ—সে গ্রাম আর নেই। প্রতিটি জিনিসের জন্যে এখন শহরের পানে হা-পিত্যেশ করে তাকিয়ে থাকতে হবে—কামার নেই, কুমোর নেই, তাঁতিপাড়ার একখানা তাঁতও চলে না। দেশের যারা শিক্ষিত তারা অনেক আগেই পেটের ধান্ধায় গ্রাম ছেড়েছে। গ্রাম আজ হতশ্রী।

হারাণ মাঝির মা আর এক পিসি ছিল—তারা এখনও বেঁচে আছে। মা ভাল করে চোখে দেখতে পায় না, পিসির বয়স সত্তরের কম নয়—এক প্রকার অচল বললেই হয়। সেদিন তাদের উঠানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, হারাণের মা দাওয়া থেকে প্রশ্ন করলে—কে যায়? আমি পরিচয় দিলাম। হারাণের মা বললে—"ছোট খোকা? বসো—বসো। বউর কাছে শোন্‌লাম তুমি বাড়ী আইছ।" হারাণের পিসি একখানা আসন পেতে দিলে। বসে এ কথা সে কথার পর জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমাদের আজ কাল চলছে কি করে হারাণের মা?" হারাণের মা জবাব দিলে, "তা ভগমানের ইচ্ছেয় এক রকম চলে যাত্তিছে। হারাণ আমাগোর অকুলি ভাসায়ে গেছে, কিন্তু বউর ঋণ কোন দিন শোধ দিতে পারব না বাবা। কোন দিন একটু কষ্ট আমাগোর পাত্তি দেয় নাই—বড় লক্ষী মেয়া।"

হারাণের পিসিও ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানালে। আমাদের পাড়ার রসিকদাসের বউ দুটি ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছিল। কয়েক দিন পরে শুনতে পেলাম তার নাকি ভেদ বমি হচ্ছে। মা বললেন, "আহা বড় গরীব মানুষ বাবা—দুটো কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে কি যে কষ্টে আছে। না আছে কোন আত্মীয়-স্বজন, না আছে কোন সহায়-সম্বল। গাঁয়ে ত ডাক্তার আর কেউ নেই—পরেশ ডাক্তার চাকরী নিয়ে গেছে—যতীন রাণাঘাট গিয়ে বসেছে, একটা অসুখ-বিসুখ হলে আর দেখবার কেউ নাই।"

আমি আমার হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ব্যাগটি নিয়ে প্রস্তুত হলাম। মা বললেন, "তুই যাবি?" বললাম, "দেখি কি করতে পারি—আমার বিদ্যের দৌড় ত জানই।"—"খুব সাবধানে থাকিস কিন্তু যে ছোঁয়াচে ব্যারাম। আর ওষুধ দিলেই বা কি হবে—কে দেবে পথ্যি, কে করবে সেবাযত্ন?" রসিক দাসের বাড়ী এসে খানিকটা আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম—ঘরের ভিতর চেয়ে দেখি—হারাণের বউ এসে রোগীর শুশ্রূষায় লেগে গেছে—দুই হাত দিয়ে ভেদ-বমি নির্বিকার চিত্তে পরিষ্কার করে যাচ্ছে। আমাকে দেখে মাথায় খানিকটা ঘোমটা টেনে দিয়ে বললে, "ছোটবাবু একটু বারান্দায় দাঁড়ান আমি ঘরখানা একটু সাফ করে নেই।"

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার সেবানিপুণ হাতের দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে ছিলাম। বড় ভাল লাগল আমার। যে এমনি করে নির্ভয়ে কলেরা রোগীর ভেদ-বমি ঘাঁটতে পারে তাকে ত প্রশংসা করতেই হয়। ঘর-দোর পরিষ্কার হলে আমি লক্ষণ মিলিয়ে ওষুধ দিলাম। তার পর বউটির দিকে তাকিয়ে বললাম, "কিন্তু রাত্রে যে চার-পাঁচ বার ওষুধ খাওয়াতে হবে, রাত্রে থাকবে কে এর কাছে?" সে জবাব দিলে, "কাল অসুখ করিছে, এ পর্য্যন্ত কেউ ত একবার দেখতিও আসে নাই। আর একজন কেউ থাকলি আমি থাকতে পারি।" যা হোক আর বেশী মাথা না ঘামিয়ে রাত্রের ওষুধ কয়টি হারাণের বউয়ের হাতে দিয়ে চলে এলাম। বললাম রাত্রে একবার এসে দেখে যাব। রাত্রি প্রায় বারটায় সময় আবার রসিকের স্ত্রীকে দেখতে গেলাম। আমার সাড়া পেয়ে হারাণের বউ ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আর কেউ এসেছে?"

"না আর ত কেউ আলো না, কয়েক জনের বাড়ী বাড়ী ঘুরলাম—ভয়ে কেউ আসতি চায় না।"

বললাম, "ছেলে মেয়ে দুটির কি হ'ল ?"

"তাগেরে আগেই আমার বাড়ী পাঠায়ে দিছি।"

কিন্তু এই রাত্রে রোগীর কাছে বউটি একা একা কেমন করে থাকবে ? উপায়ই বা কি করব কিছুই বুঝতে পারলাম না। অগত্যা রোগী দেখে কোন ব্যবস্থাই না করে বাড়ী ফিরে এলাম, কিন্তু মনে মনে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। দিনতিনেক এমনি চলল, রোগীর অবস্থা মনে হ'ল একটু ভাল। এই তিন দিনই হারাণের বউ কি অমানুষিক পরিশ্রমই না করেছে। অন্য কেউ তাকে কিছুমাত্র সাহায্য করতে আসে নি। সেদিন সন্ধ্যার পরে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। রাত আন্দাজ দশটার সময় রোগী দেখতে গিয়ে রীতিমত ভয় পেয়ে গেলাম—রোগীর অবস্থা একেবারে খারাপ হয়ে পড়েছে—হাতে পায়ে রীতিমত খিল ধরেছে, নাড়ী বসে যাচ্ছে—হারাণের বউও অবস্থাটা বুঝতে পেরেছিল। এবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল—কেমন দেখলেন ছোটবাবু।"

বললাম, ভাল নয়, রাত কাটবে কিনা সন্দেহ।

এবার হারাণের বউ খানিকটা বিচলিত হয়ে প্রশ্ন করলে—আমি একলা একলা কেমন করে থাকব ছোটবাবু। আমি খানিকটা চুপ করে ভেবে নিয়ে বললাম, আচ্ছা একটু অপেক্ষা কর। আমি বাড়ী থেকে ঘুরে আসছি—আমিই থাকব। অন্য লোক যখন কাউকে পাওয়া গেল না তখন এই রোগী নিয়ে তোমাকে একা একা থাকতে দিতে পারি নে। বাড়ী এসে মাকে বলে আবার রসিকের বাড়ী চলে এলাম। হারাণের বউ বাইরে একখানা জলচৌকী পেতে দিয়ে বললে আপনি এখানেই বসে থাকেন—এই ছোঁয়াচে রুগীর কাছে আপনার বসে কাজ নাই। আমি বললাম—আর তুমি ?—"আমি তো আজ কয়দিনই এই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতেছি।" আমার চাইতে তা আর বেশী কে জানে—সুতরাং মনে মনে লজ্জা পেলাম। ভোরবেলা রসিকের স্ত্রী মারা গেল—আমি বাড়ী ফিরে এলাম।

সেদিন সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরছি—হারাণ মাঝির বাড়ীর কাছে আসতেই তার মায়ের চেঁচামেচি শুনতে পেলাম। যা শুনলাম তার সারমর্ম এই—আজ কয়েক দিন থেকে তাদের আর পূর্ব্বের মত ভালভাবে চলছে না। দু' বেলা দু'মুঠো ভাত জোটে না এমনি অবস্থা। তার পর আবার রসিকদাসের দুটি ছেলেমেয়েকে হারাণের বউ নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছে। অকথ্য গালাগাল দিচ্ছে হারাণের মা। হারাণের বউ বলে উঠল—"আজ দুতে দিন ধরে জ্বরে ভুগতেছি—আমারে কেডা দেখে, নিজে বাঁচলি তো বাপের নাম।"

বুঝলাম আজ কয়েক দিন ধরে রসিকদাসের স্ত্রীর সেবা-শুশ্রূষা করার আর ব্ল্যাকমার্কেটিং করতে যেতে পারে নি—তা ছাড়া হয়তো জ্বরও হয়ে থাকবে। পর পর যা রাত্রি জেগেছে বউটি, অসম্ভব কি ? কিন্তু রসিকদাসের ছেলেমেয়ে দুটির কি করা যায় ? হারাণের বউ তাদের বোঝা আর কতদিন বইবে ? কি আশ্চর্য্য গ্রামের আর সবাই তো বেশ নিশ্চিন্ত আছে, কেউ একটা কথাও বলছে না।

কয়েক দিন পরে গ্রামের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম—দেখি মথুর পালের বৈঠকখানায় গ্রামের অনেক লোক জুটেছে—মনে হ'ল কিসের যেন সালিশী দরবার চলছে সেখানে। আমাকে দেখতে পেয়ে ছোটবেলার বন্ধু সতীশ ডাকল—আরে শৈলেন এদিকে এসো, যাচ্ছ কোথায় ? এগিয়ে গিয়ে দেখলাম গ্রামের অনেকে রয়েছেন ওখানে। ব্যাপার কি জানতে চাইলে সতীশ আমাকে সব বুঝিয়ে বলতে লাগল—গ্রামের ভিতরে ভারী অনাচার চলছে আজকাল শৈলেন—দেশে তো থাক না—জানবে কি করে। হারাণের স্ত্রীর কথা বলছি। সারাটা গ্রাম ও একেবারে নষ্ট করে ফেলবে। নারাণপুরের হরিসার সঙ্গে মিলে ব্ল্যাকমার্কেটিং করে এক নৌকোয় দু'জনে ষ্টেশান থেকে আসে। তা ছাড়া আরও কত সব নোংরা কথা রটেছে। অবিশ্বাস করবারও উপায় নেই, একেবারে লোকের চোখে দেখা। হরিসা এবং আরও দু'জনে একসঙ্গে কলকাতায় যায়—সেখান থেকে ওকে নিজের স্ত্রী সাজিয়ে ট্রাঙ্কে বোঝাই কাপড় সমেত মেয়েদের গাড়ীতে তুলে দেয়। পোত্তাদার দিকে একখানা ঘর ভাড়া করেছে—সেখানে কাপড়চোপড় সব বিক্রী করে, স্বামী-স্ত্রীর মতই দুই-চার দিন সেখানে থেকে আবার গাঁয়ে ফিরে আসে। অথচ আমাদের গাঁয়ে মথুরবাবু শ্রীপুর ব্ল্যাকমার্কেটিং সমিতি গড়েছেন, যারা যারা ব্ল্যাকমার্কেটিং করবে এই সমিতির ভিতর দিয়ে করবে। কিন্তু ওকে অনেক বার বলা হয়েছে এই সমিতিতে যোগ দিতে ও কিছুতেই রাজী নয়। আজ এর একটা বিহিত করতে হবে বলে সব্বাই এসে জুটেছে। ওকে ডাকতে পাঠানো হয়েছে—তুমি একটু বস।

আমি শশব্যস্তে বললাম, আমার অত্যন্ত জরুরী কাজ আছে তাই এখনই একবার ওপাড়ায় যেতে হবে—আচ্ছা সেখান থেকে পারি তো ঘুরে আসব। আর কোন কথার অবসর না দিয়ে উঠে পড়লাম। বাড়ী ফিরে এসে হারাণের স্ত্রীর কথাই ভাবছিলাম—মেয়েটি ভাল কি মন্দ জানি না—সেদিন ট্রেনের মধ্যে তার আচরণ আমার ভাল লাগে নি—আর যাই হোক, স্ত্রীসুলভ লজ্জাসরমের কোন বালাই তার মধ্যে ছিল না। কিন্তু এই যে কয়টা দিন ধরে এমন নিঃস্বার্থভাবে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে রসিকদাসের স্ত্রীর সেবা করলে—কয়জন লোক তা পারে ? কই গ্রামের আর কোন লোক তো এগিয়ে এল না—খোঁজটি পর্য্যন্ত নিলে না। রসিকদাসের ছেলেমেয়ে দুটিকেও তো সেই আজও খেতে

দিচ্ছে। যে যাই বলুক—মেয়েটিকে কিন্তু আমার মন কিছুতেই খারাপ বলতে চায় না।

আমার ছুটি শেষ হয়ে এসেছে। বিদায়ের উদ্যোগ-আয়োজন চলতে লাগল। মাঙ্গলিক বিল্বপত্র কাণে গুঁজে—মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে যাত্রা করলাম। মা ছল-ছল নেত্রে আমার যাত্রা-পথের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। এই বুঝি আমার শেষ যাত্রা, এ গ্রামে আর যে জীবনে কোন দিন ফিরে আসব— সে সম্ভাবনা বুঝি আর নাই। যার জলে জলে মানুষ হয়েছি যে গাঁয়ের পথে পথে মাঠে মাঠে দিনরাত ঘুরে বেরিয়েছি—যার প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে আমার নাড়ীর যোগ তাকে আর কোনদিন দেখতে পাব না। দু'চোখ ভরে জল গড়িয়ে এল পা আর চলতে চায় না। নটবর খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল পথের বাঁক-ঘুরতে একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল হারান মাঝির বউ। আমার দিকে মুখ তুলে বললে, ছোটবাবু একটু দাঁড়ান। দূর থেকে পথের উপরে মাথা ঠেকিয়ে আমাকে প্রণাম করে বললে—"আমার কি গতি হবে বলেন তো? এরা কেউ আমার গাঁয়ে বাস করতি দিতি চায় না, আর এখেনে থাকতিও আমার ইচ্ছে হয় না।" তারপর একটু চুপ করে থেকে বললে, "কলকাতায় গেলে শুনিছি একটা উপায় হয়, ঝির কাজ করতিও আমার আপত্তি নাই। আমার কথাডা মনে রাখবেন।" তাকিয়ে দেখি তার দু'চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ছে। আমি খানিকটা অভিভূত হয়ে পড়লাম। সহসা কোন জবাব দিতে পারলাম না। সামলে নিয়ে বললাম, "কিন্তু কলকাতা কি অত সহজ জায়গা মনে করেছ—এখানে ত তবু খেয়ে পরে আছ। আর গাঁয়ের লোকের সঙ্গে ত মানিয়েই চলতে হবে তাদের বিরুদ্ধে গেলে ত চলবে না।"

আমি কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে একবার পিছন ফিরে তাকালাম—হারাণের বৌ তখন একদৃষ্টে আমার চলার পথের পানে চেয়ে আছে। তার চোখের দৃষ্টিতে কি ছিল জানি না, কিন্তু সহসা আমার মনে হ'ল যেন হারাণের বৌকে আমি মিথ্যা বুঝিয়ে এসেছি। হয়তো সেই পরিবেশ থেকে তাকে উদ্ধার করাই আমার কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু আমি থামতে পারলাম না—এগিয়ে চললাম।

দিল্লী

শ্রীঅমল সেন

দিল্লীর মাটি ভিজে না অশ্রুজলে
দিল্লীর মাটি কঠিন অনুর্বর—
দিগন্ত ছাওয়া প্রান্তরে শুধু জলে
অমানিশা রাতে আলেয়ার খর্পর।

দিল্লীর মাটি খাঁটি মৃত্তিকা নয়—
মাটিতে মিশানো আছে মানুষের হাড়,
ভয় পেয়ো নাকো চলে এসো নির্ভয়
কলরব শোনো অশরীরী আত্মার।

ভগ্ন সমাধি অসংখ্য গম্বুজ
ছেঁড়া কাঁথা গায় বসে আছে থুত্থুড়ী,
ভয় কি? এসো না! তুমি তো নও অবুঝ!
অন্ধকারেও নেমেছে বটের ঝুরি।

তাইমুর আর নাদিরের খঞ্জর
এই দিল্লীতে রক্ত ঝরালো ঢের,
ভাঙা ইটগুলো যেন ভাঙা পঞ্জর
নাম নাহি জানা অসংখ্য মানুষের।

ইন্দ্রপ্রস্থ হতে এ দিল্লীতক্
কত মানুষের পায়ের চিহ্ন পাই—
শাহজী থেকে মাহমুদ তোগলক
সব বরবাদ! কেহ নাই, কিছু নাই।

ভাঙা মসজিদে ভোরের আজান্ দেয়—
শুনি আনমনা, হঠাৎ হয় না হুঁস,
মসনদে নাই আজ বাদশাহ কেহ
লাল-কেল্লায় শূন্য তখ্ত্-তাউস্।

বঙ্গের ব্রজভূমি

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত

চণ্ডীদাস প্রাকৃতের কবি। অনেকে মনে করেন জয়দেবও। জয়দেবের প্রাকৃত কাব্য নাকি সংস্কৃতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। জগন্নাথবল্লভ নাটকে রামানন্দ রায়ের পদাবলী, সনাতন গোস্বামীর পদাবলী, গীতগোবিন্দের পদাবলী একই রকমের। পদাবলী রচনায় রায় রামানন্দ, সনাতন গোস্বামী জয়দেবের অনুকরণ করিয়াছিলেন মনে করা স্বাভাবিক। রামানন্দ, সনাতন দক্ষিণাপথের লোক। জয়দেব, চণ্ডীদাস বাঙ্গালী কবি। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের মহিমা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর্য্য-বাঙ্গালী ব্রজের কৃষ্ণ পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের কাব্য রসকাব্য। প্রাকৃতের কবি রসকাব্য রচনায় কোনও পুরাণের অনুসরণ করেন নাই। তাঁহাদের কালের পূর্ব্বের বঙ্গীয়গণ অবশ্য কৃষ্ণকে চিনিতেন। বঙ্গদেশে যমুনা, কালিন্দী, মথুরাপুর ছিল, এখনও রহিয়াছে। দ্রাবিড়দের রসসাহিত্য ছিল তামিল ভাষায়। সে সাহিত্যেও ব্রহ্ম—কৃষ্ণ, জীবাত্মা—নায়িকা। সে সাহিত্যেরও সংস্কৃত অনুবাদ হইয়াছিল। তাম্রলদ্রাবিড় হইতে নাকি তাম্রলিপ্ত। ভক্তিধর্ম্ম দ্রাবিড়দের নিজস্ব। আর্য্যেরা ছিলেন জ্ঞান-কর্ম্মবাদী। টলেমির গ্রন্থে তাম্রলিপ্ত গঙ্গাতীরবর্ত্তী ভূমি। ভূতাত্ত্বিকেরা মনে করেন সুন্দরবন অঞ্চল এককালে শুষ্ক ভূমি ছিল। সেখানে জনবহুল নগর ছিল। সে ভূমি প্রাচীন রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল মনে করা যাইতে পারে। প্রাচীন রাঢ়ের প্রধান নগর ছিল তাম্রলিপ্ত এবং বর্দ্ধমান। রাঢ়ভূমি গোপপ্রধান ছিল। গোপেরা ছিলেন রাজার জাতি। তাঁহারা বিষ্ণু-উপাসক ছিলেন। দ্রাবিড়-প্রভাব হেতু হয়ত তাঁহারা পরে ঘৃণ্য হইয়াছিলেন। গোপকুলে বিষ্ণু অবতার হইয়াছিলেন। জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রের অভিধান-চিন্তামণি গ্রন্থে তাম্রলিপ্তের অপর নাম বিষ্ণুগৃহ। দ্রাবিড়-জাতির আলোয়ারদিগের প্রভাবহেতু হয়ত কোনওকালে রাঢ়-ভূমি ব্রহ্মভূমি হইয়াছিল। কাব্যমীমাংসার অঙ্গের পর বঙ্গ, বঙ্গের পর সুহ্ম, তার পর ব্রহ্ম। ঐ গ্রন্থের অন্যত্র—সুহ্ম ব্রহ্মোত্তর। অর্থাৎ ব্রহ্মের উত্তরে সুহ্ম। ধোয়ীর পবনদূত কাব্যে ব্রহ্মভূমির একটি স্থান—'ভাগীরথ্যাগুপনতনয়া যত্র নির্য্যাতি দেবী'—অর্থাৎ বর্ত্তমান ত্রিবেণী। বিষ্ণুই ব্রহ্ম, আবার তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই হরি। রাঢ়ভূমে অর্থাৎ ব্রহ্মভূমে হরি কেলি করিয়াছিলেন। সেইজন্য ইহা তাম্রশাসন সাহিত্যে 'হরিকেল মণ্ডল' হরিকেল মণ্ডলই বঙ্গের ব্রজমণ্ডল এবং এই ব্রজ-ভূমি বা ব্রহ্মভূমিই জৈন আয়ারাঙ্গ সুত্তের বজ্জভূমি। চীনদেশীয় মানচিত্র অনুসারে হরিকেল তাম্রলিপ্ত (গঙ্গাতীরবর্ত্তী?) ও উৎকল এই দুই দেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইৎসিঙ-এর বিবরণ অনুসারে ইহা পূর্ব্ববঙ্গের (বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা?) সহিত অভিন্ন বলিয়া অনুমান হয়।

বঙ্গদেশের এই ভূমে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ রচিত হইয়াছিল। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনে শ্রীচৈতন্য ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের অনুসরণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচরণ-ঠাকুর-শিষ্য বৃন্দাবনদাস তাঁহার তত্ত্ব-বিলাস গ্রন্থে লিখিয়াছেন:

> "ব্রহ্মবৈবর্ত্ত নামে সে শাস্ত্রের ভিতরে।
> তাহার ভিতরে ছিল বেদের আদরে॥
> * * *
> হেন নাম প্রকাশ যে কৈল দেশে দেশে॥
> * * *
> যে নাম লাগিয়া ব্রজে কৃষ্ণ অবতার॥
> * * *
> অতএব এই কথা নাঞি ভাগবতে॥" ইত্যাদি

শ্রীমদ্ভাগবত দাক্ষিণাত্যে রচিত হইয়াছিল। ভাগবতের উপর দ্রাবিড়জাতির আলোয়ারদের প্রভাব পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন। শ্রীমদ্ভাগবত চৈতন্যধর্ম্মীদিগেরও বেদস্বরূপ। অদ্বৈত-বাদের সহিত ভক্তিধর্ম্মের মিলনে শ্রীমদ্ভাগবত। চৈতন্য-ধর্ম্মীদের ভক্তি রাগানুগা। তাঁহাদের ক্রিয়াকাণ্ড, পঞ্চরাত্রের অনুসারী। যামুনাচার্য্য রাগানুগা ভক্তির প্রচারক। তিনি আলোয়ার-সাধক নাথমুনির পৌত্র। নাথমুনি পঞ্চরাত্রঃ সম্প্রদায়ের সাধক। যামুনাচার্য্যের শিষ্য রামানুজ। রামানুজ শ্রী-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। রামানুজ সম্প্রদায়ের দুই শাখা। আচারী ও রামানন্দী। উভয় সম্প্রদায়েরই ধর্ম্ম বঙ্গদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশীয় রামানন্দীরা রামচন্দ্রকেও রাসলীলা করাইয়াছিলেন। রুদ্রযামলে রামরাস আছে, হনুমৎ সংহিতায়ও আছে। রুদ্রযামলে নাকি আছে—নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ—সে অন্ত। অর্থাৎ বাসুদেব নন। পুরীধামে দক্ষিণাপথের সর্ব্বপ্রকার বৈষ্ণব ধর্ম্মের সমাবেশ। ভারতের সমুদয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সমাবেশের জন্যই কি উত্তরাপথে শচীদুলালের দ্বারা বৃন্দাবন?

ঐতিহাসিকেরা কি বলেন?

শ্যাম-ভ্রমণ

শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম-এ

১৯৪৮ সনে জানুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে খবর পেলাম, রাজপুত্র ধ্যানী নিবাতের উদ্যোগে বিখ্যাত 'শ্যাম সোসাইটি'র
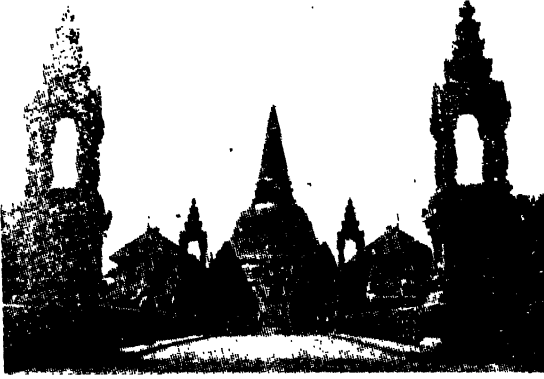
ফ্রা পাথোম চৈত্য

'সমাখোম শ্যাম') সভ্যগণ নগর-প্রথম ('নাখন পাথোম') যাবার তোড়জোড় করছেন। শহরটি ব্যাঙ্কক থেকে মাত্র ৩১ মাইল দূরবর্ত্তী, ইহার গৌরবময় প্রাচীন ঐতিহ্য আছে। ভগবান বুদ্ধ নাকি এখানে একবার পদার্পণ করেছিলেন এবং আগেকার দিনে এখানেই নাকি সামুদ্রিক বঞ্ঝাতাড়িত ভারতীয় নাবিকেরা এক আলোক-শিলাস্তম্ভের নীচে আশ্রয়লাভ করত। থাইদের মধ্যে একটি জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে, সম্রাট্
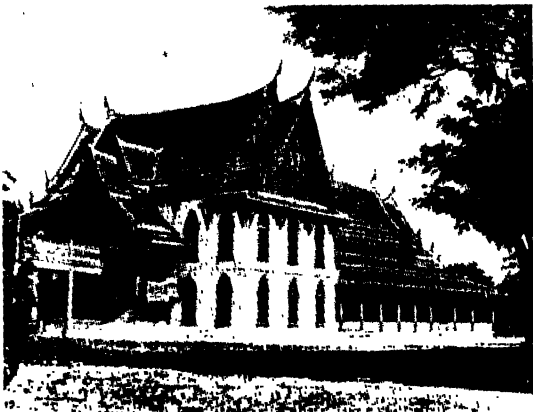
'সানাম চান' প্রাসাদের একাংশ

অশোক (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৭২-২৩২ অব্দে) এখানে দুই জন বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক প্রেরণ করেছিলেন।

অতীতের বহু স্মৃতিবিজড়িত এই স্থানটির উপর একটা গভীর আকর্ষণ ছিল। সেইজন্য নগর-প্রথম ভ্রমণের সুযোগ অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত হওয়ায় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। শ্যাম-সোসাইটির সভ্যগণ 'থাই-ভারত সাংস্কৃতিক আশ্রমে'র সেক্রেটারি পণ্ডিত রঘুনাথ শর্ম্মা, ব্যাঙ্ককের ইংরেজী দৈনিক কাগজ 'Liberty'র সহ-সম্পাদক সৌরীন দাশগুপ্ত এবং বর্ত্তমান লেখককে এই ভ্রমণে তাঁদের সঙ্গী হবার জন্যে

ফ্রা পাথোমে আবিষ্কৃত বিখ্যাত ধর্ম্মচক্র

অনুরোধ জানিয়ে পত্র দিলেন—আমরা সানন্দে সম্মত হলাম। আমাদের যাবার দিন ঠিক হ'ল জানুয়ারি মাসের ১৮ তারিখ। নির্দ্দিষ্ট দিনে আমরা প্রায় ৭০ জন নগর-প্রথম যাত্রী হুয়ালাম্ফোং রেল ষ্টেশনের সামনেকার বিস্তৃত চত্বরে এসে মিলিত হলাম। আমাদের দলটিতে জার্ম্মান, ফরাসী, স্পেনিশ, ব্রিটিশ, আমেরিকান, চীনা ইত্যাদি পৃথিবীর নানা জাতির পুরুষ এবং মহিলা ছিলেন। সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে ভারি আনন্দ-

বৌদ্ধধর্ম-জ্ঞাপক প্রাচীন মৃগমূর্ত্তি (ফ্রা পাথোম)

লাভ করা গেল। এই দলটিতে সৌরীনবাবু এবং আমি এই দু'জনেই মাত্র ছিলাম বাঙালী।

ঠিক আটটার সময় বড় বড় 'বাস'গুলি আমাদের নিয়ে রওনা হ'ল। সঙ্গে চলল মোটর সাইকেল আরোহী চারজন সৈনিক আমাদের গাড়ীগুলিকে পাহারা দেবার জন্য।

দু'ধারের অসংখ্য ধানের ক্ষেত, খাল, নালা এবং বাঁশ-ঝাড় পিছনে ফেলে বাসগুলি চলতে লাগল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে শ্যামের সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশের সাদৃশ্য খুবই বেশী। ধানক্ষেতের পাশে কুঁড়েঘরের দাওয়ায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করছে। বেলা প্রায় দশটার সময় আমাদের বাসগুলি সুবর্ণ (স্থানীয় নাম 'সুপান') নদীর তীরে এসে থামল। নদীটি এঁকে বেঁকে চলেছে, তার স্বচ্ছ বুকে সবুজ বনানীর ছবি প্রতিফলিত। যখন আমাদের বাস ভাসমান প্ল্যাটফর্ম্মে নদী পার হতে লাগল, তখন মন ডুবে গেল অতীত স্মৃতির মধ্যে। প্রাচীন ভারত, তথা বাংলার সঙ্গে অতীতে এই সুবর্ণভূমির যে কি গভীর যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল মনে মনে তাই ভাবতে লাগলাম। আমার মনে এই একটা ধারণা বদ্ধমূল যে, 'ঠাকুরমার ঝুলি'র রূপকথাসমূহে উল্লিখিত রাজপুত্রদের কারও কারও লীলাভূমি ছিল সুদূর প্রাচ্যের এই সব মায়াঘেরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আলোচনার স্থান এটা নয়।

নদী পার হয়ে আরও আধ ঘণ্টা চলবার পর আমরা থামলাম এসে 'ফ্রা পাথোম' চৈত্যের পাদদেশে। এটি একটি অতিপ্রাচীন পুণ্যস্থান। নানা প্রমাণ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেতে পারে যে, খ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্বে এখানে একটি সুন্দর নগরী বিদ্যমান ছিল। সেই নগরীর ধ্বংসাবশেষ আজ ফ্রা পাথোমের চারদিকে ছড়িয়ে আছে। কথিত আছে যে, বহুদিন পূর্ব্বে এখানে একটি উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। এখানকার পুরোহিতগণ নাকি ভগবান বুদ্ধেরও পরম ভক্ত ছিলেন। এখানকার বিরাট স্তূপের নীচেকার অংশটি খুবই পুরাতন। উপরের অংশটি যে বহু পরবর্ত্তী যুগে নির্ম্মিত হয়েছিল, তা এর গঠনকৌশল দেখলেই বুঝতে পারা যায়। এর গা বেয়ে একটি সিঁড়ি উঠে গেছে একেবারে উপরের অংশ পর্য্যন্ত। উপরের অংশটি আসলে অতি পুরাতন স্তূপের উপর পরবর্ত্তীকালে প্রতিষ্ঠিত একটি আলাদা চৈত্য। এতে একটি সুন্দর বুদ্ধমূর্ত্তি আছে।

'ফ্রা পাথোম' চৈত্য

প্রায় দশ বছর আগে "Ecole Francais d' Extreme Orient" নামক ফরাসী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে 'ফ্রা পাথোম'-এর নিকটে একটি জায়গায় খননকার্য্য করা হয়। আমরা সেই স্থানটি দেখতে গেলাম। একটি স্তূপের নীচে দু' এক জায়গায় পাথরে খোদিত কতকগুলি অদ্ভুত আকারের দানবের মুখ দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সম্ভবতঃ এগুলিতে প্রাচীন ভারতীয় যক্ষের কল্পনা রূপায়িত হয়েছে। অনেক কষ্টে কাঁটাগাছে আবৃত এই স্তূপটি বেয়ে উপরে উঠলাম। কিন্তু তাড়াহুড়ো করে নেমে আসতে হ'ল বলে ভাল করে কিছুই পর্য্যবেক্ষণ করা গেল না।

এরপর আবার আমাদের বাসগুলি বন্ধুর পথ দিয়ে চলতে লাগল। পনর কুড়ি মিনিট পরে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি দূরে নগর-প্রথমের বিখ্যাত ফ্রা পাথোম চৈত্যের অভ্রভেদী চূড়া সূর্য্যকিরণে ঝকঝক করছে। কি বিরাট এই

ত্য। রেঙ্গুনের বিখ্যাত "শোয়ে ডাগন" প্যাগোডার অপরূপ সৌন্দর্য্যও যেন এর তুলনায় ম্লান। যখন এই স্তূপের সামনে গিয়ে নামলাম তখন এর গুরুগম্ভীর বিরাট রূপ হৃদয়কে নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিলে। সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত হলদে রঙের পালিশ করা টালি দিয়ে ছাওয়া এই বিশাল স্তূপটি থেকে যেন এক জ্যোতির্ম্ময় মহিমা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

। (ক্রা পাথোম)

প্রাচীন বিষ্ণুমূর্ত্তি (দক্ষিণ-শ্যাম)
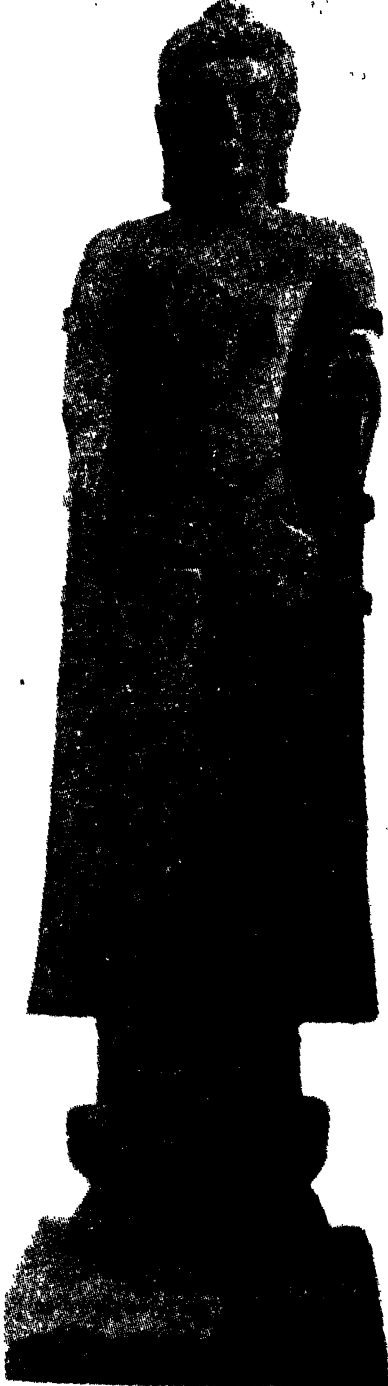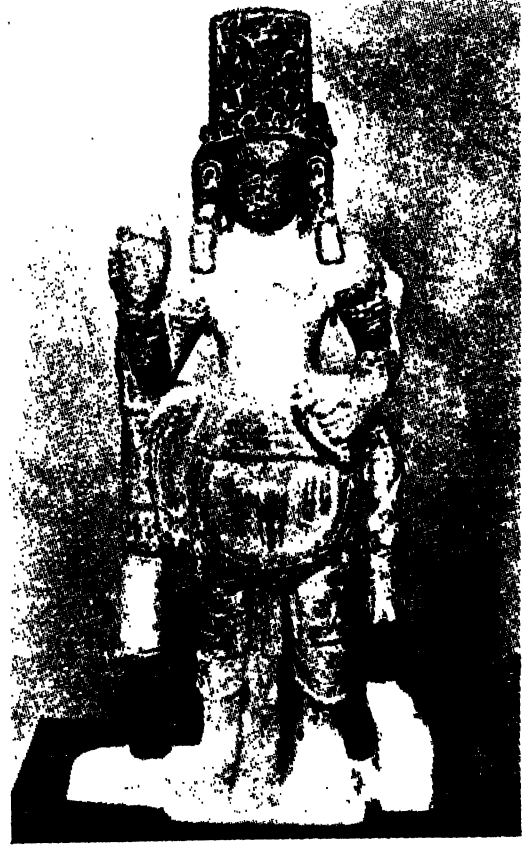
স্তূপটির সিঁড়ি বেয়ে উঠবার সময় বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ভগবান বুদ্ধের দণ্ডায়মান অবস্থার এক বিরাট মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নৃপতি ষষ্ঠ রামের রাজত্বকালে। মূর্ত্তির মস্তকটি সুখোথাই (সুখোদয়) যুগের (ত্রয়োদশ শতাব্দী)। পুরাতন এক ভগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তির ছাঁচ থেকে নেওয়া হয়েছে।

. গোলাকার স্তূপটির চতুর্দ্দিক বেষ্টন করে একটি বারান্দা আছে। তাতে প্রাচীন শিল্পকলার অজস্র নিদর্শন বিদ্যমান।

এই স্তূপটির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে নানারূপ কিংবদন্তী শোনা যায়: খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জয়শ্রী (নগর-প্রথমের অন্যতম

প্রাচীন নাম) নগরে ফায়া গং নামে এক ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন। কালক্রমে তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মে। তাঁর

পাল-শিল্পরীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত লোকেশ্বর মূর্ত্তি

নাম রাখা হয় 'পান'। শিশুটির জন্মের পর গণৎকারেরা বললে যে, এই শিশু বড় হয়ে তার পিতাকে হত্যা করবে। নিজের ভবিষ্যৎ নিষ্কণ্টক করবার জন্য নৃপতি ফায়া গং এই নবজাতককে এক নিবিড় জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসবার জন্তে হুকুম দিলেন। রাজ-আজ্ঞা প্রতিপালিত হ'ল বটে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শিশু পান থাইহোম নামে এক মমতাময়ী নারীর দ্বারা উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে লালিত-পালিত হতে থাকেন। নিজের জন্মরহস্য এই রাজকুমারের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। বড় হয়ে তিনি ফায়া গং-এর এক সামন্ত রাজার অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি তার মনিবকে ফায়া গং-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্ত প্ররোচিত করেন। এই রাজকুমার যুদ্ধে নিজের পিতাকে বধ করে তাঁর রাজধানী জয়শ্রী দখল করেন। পান যে পিতৃহত্যা করেছেন এ কথা কিন্তু তিনি ভাবতেও পারেন নি। যুদ্ধজয়ের পর রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করে তিনি যখন তাঁর মাতার নিকট থেকে প্রকৃত ব্যাপার জানতে পারলেন তখন তাঁর হৃদয় নিদারুণ অনুশোচনায় পূর্ণ হয়ে উঠল। পাপক্ষালনের উদ্দেশ্যে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের এক সভা আহ্বান করলেন। সেখানে স্থির হ'ল যে, তাঁকে এমন এক সু-উচ্চ চৈত্য নির্ম্মাণ করতে হবে যার শীর্ষদেশ দিয়ে কেবলমাত্র বলাকারা উড়ে যেতে পারবে। তখন পান এরূপ একটি স্তূপ নির্ম্মাণের আয়োজন করলেন। এই চৈত্যই মূল ফ্রা পাথোন চৈত্য। নগর-প্রথম দক্ষিণ শ্যামের 'দ্বারাবতী' রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যতদূর জানা যায় একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই নগর কম্বোজের রাজা প্রথম সূর্য্যবর্ম্মণের দ্বারা অধিকৃত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উত্তর থেকে আগত থাইজাতির আধিপত্য বিস্তারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নগর-প্রথম "খোম" অথবা কম্বুজীয়দের অধীনে থাকে। কোনও কোনও ঐতিহাসিক মনে করেন যে, একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত পগানের বৌদ্ধরাজা অনুরুদ্ধ (Anawrotha) নগর-প্রথম আক্রমণ করে সেখানকার বহু দ্রব্য লুণ্ঠন করেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুখোদয়ের বিখ্যাত থাই নৃপতি রাম খাম্‌হেং-এর একটি অনুশাসন থেকে জানা যায় যে, তিনি দক্ষিণ মালয়ে অবস্থিত নগর শ্রীধর্ম্মরাজ (বর্ত্তমান লিগোর) পর্য্যন্ত জয় করেছিলেন। পরবর্ত্তী কালে (১৫শ এবং ১৮শ শতাব্দীতে) উপর্য্যুপরি কয়েকবার এই নগরটি ব্রহ্মদেশীয়দের দ্বারা আক্রান্ত হলেও বর্ত্তমানে তা থাইদের কর্ত্তৃত্বাধীনেই আছে। যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির আক্রমণে এবং কালের স্থূল হস্তাবলেপে ফ্রা পাথোম চৈত্যের শীর্ষদেশের শ্রী বিনষ্ট হয়। অবশেষে আধুনিক 'চক্রি' বংশের বিদ্যোৎসাহী রাজা মহা মংকুত এবং তাঁর বংশধরগণের চেষ্টায় এই সুপ্রাচীন চৈত্য ও তৎসংলগ্ন বিহারগুলির পুনরায় সংস্কারসাধন হয়।

ফ্রা পাথোম চৈত্যে অনেক দর্শনীয় বস্তু আছে। যে বারান্দা স্তূপটিকে বেষ্টন করে রয়েছে তাতে অগণিত প্রস্তু-দ্রব্য এবং ভাস্কর্য্য-শিল্পের নিদর্শন বিদ্যমান। কোথাও ভগবান বুদ্ধের নির্ব্বাণ-রূপ, কোথাও অদ্ভুত আকারের সিংহমূর্ত্তি, কোথাও বা বোধিসত্ত্বের পবিত্রতাব্যঞ্জক সুন্দর প্রস্তরমূর্ত্তি। বুদ্ধমূর্ত্তির সঙ্গে নাগমূর্ত্তির সংযোগ এই চৈত্যে বিশেষভাবে নজরে পড়ে। এটা শ্যামদেশের আরও নানা জায়গায় লক্ষ্য করা যায়। এ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় সুপ্রাচীন কাল হতে নাগ-পূজার বহুল প্রচলনের আভাস পাওয়া যায়। শ্যাম দেশের অধিবাসিগণ প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হলেও বহু প্রাচীন সংস্কারকে আজও আঁকড়ে ধরে আছে। এ বিষয়ে Reginald le May যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে—

"It must not be forgotten that to the vast majority of Siamese (and Burmese) peasants Buddhism is, and always has been, what I call 'The Decoration of Life,'

and the people themselves have remained at heart animists. Their lives fall into two parts. They pay their devotions and give their offerings to the Lord Buddha, so that their merit may increase and their karma may enrich them in future lives, but in the present life there are a host of 'p'i' or spirits, to be propitiated if evil is not to befall them, and the latter are, therefore, continually courted and feasted to this end."

"Buddhist Art in Siam," Cambridge, 1938, p. 102.

নগর-প্রথমে ভগবান বুদ্ধের যে সমস্ত মূর্ত্তি আছে তার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

১। সারনাথে শাস্তার পঞ্চ-বর্গীয় ভিক্ষুগণের কাছে প্রথম ধর্ম্ম-প্রচার। এই পাঁচ জন মুণ্ডিতমস্তক ভিক্ষু যুক্তকরে উপবেশনপূর্ব্বক তথাগতের কারুণ্যপূর্ণ বাণী তন্ময়ভাবে শ্রবণ করছেন।

২। লুম্বিনী-গ্রামে সিদ্ধার্থের জন্ম। মূর্ত্তিগুলি ধাতু-নির্ম্মিত। নবজাতকের দু'ধারে দু'জন রাজকুমারী তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

৩। বুদ্ধের চির-নিদ্রা অথবা মহাপরিনির্ব্বাণ।

এ ছাড়া একটা প্রকাণ্ড গৃহের প্রাচীরগাত্রে আধুনিককালে অঙ্কিত অনেক দেবমূর্ত্তি এবং সাধুসন্ত রাজা ইত্যাদির চিত্র আছে। এই সব মনুষ্য এবং দেবমূর্ত্তির মধ্যে কাহারও চেহারা তামিলদেশীয়ের ন্যায়, কাহারও সিংহলদেশীয়ের মত এবং দেবমূর্ত্তির মধ্যে কেউ বা শ্যামদেশীয়ের মত আকৃতি-বিশিষ্ট। প্রত্নতাত্ত্বিক Majar Seidenfaden-এর মতে,

"This great gathering represents all the races and peoples of mankind, demigods and spirits, who follow the Law of Buddha."

এই ঘরের একটি বেদীর সম্মুখে রাজকুমার ধ্যানী এবং আর সব শ্যামদেশীয় ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ ভক্তিপূর্ণ ভাবে ভারতীয় ভঙ্গীতে মাটিতে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করলেন।

মূর্ত্তিসমূহ দর্শন করে আমরা নাখোন পাথোম ত্যাগ করে প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত "সানাস চান্" রাজপ্রাসাদের দ্বারদেশে গিয়ে পৌছলাম। এই রাজপ্রাসাদেই মহারাজ বজিরাবুধ অথবা বজিরজ্ঞান বাস করতেন (১৯১০-১৯২৫)।

এখানে এই নৃপতির একটি অতি আদরের পোষা কুকুরের প্রস্তর-মূর্ত্তি আছে। এই কুকুরটিকে নাকি কোনও দুর্বৃত্ত গুলি করে হত্যা করে। রাজপ্রাসাদের সন্নিকটেই নজরে পড়ে "ওয়াট ক্রা জাম" এবং "ওয়াট সানে হা" নামক দুটি মন্দিরের চূড়া। স্থানটির পরিবেশ রমণীয়।

ফিরবার পথে ক্রা পাথোম চৈত্যের কিছু দক্ষিণ-পূর্ব্বে অতিপ্রাচীন "ক্রা মেন" স্তূপের ধ্বংসাবশেষের সামনে আমাদের বাসগুলি কিছুক্ষণ থামল। এই স্তূপের চারপাশে যে চারটি মন্দির ছিল, ধ্বংসাবশেষ দেখে তা বুঝতে পারা যায়।

প্রাচীন 'মন' জাতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নাগাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি

ক্রা মেন দেখা হলে আমাদের গাড়ীগুলি চলল সোজা ব্যাঙ্ককের দিকে। ছুয়ালামফোং-এর চত্বরে যখন পৌছলাম, তখন সূর্য্যের শেষ কিরণচ্ছটা পশ্চিমাকাশে বিলীন হয়ে গেছে।

গরুড়ের সাতটি প্রশ্ন

শ্রীজগদীশচন্দ্র দে

তুলসীদাসের রামচরিত মানসের উত্তরকাণ্ডে দেখা যায়, পক্ষিরাজ গরুড় রাম-কথা শুনিবার জন্ত ভুশুণ্ডি কাকের নিকট যান। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ভুশুণ্ডিকে সাতটি প্রশ্ন করেন। ভুশুণ্ডি প্রশ্ন কয়টির সদুত্তর দেন। মূল দোঁহা ও শ্লোকগুলিসহ প্রত্যেকটির অনুবাদ নিয়ে দেওয়া হইল।

পুনি সপ্রেম বোলেউ খগরাউ। জো কৃপাল মোহি-উপর ভাউ॥
নাথ মোহি নিজ সেবক জানী। সপ্ত প্রশ্ন মম কহহু বখানী॥

[রাউ—রায়, রাজা। ভাউ—ভাব, স্নেহ। বখানী—কৃত্তিবাসের বাখানি।]

খগরাজ গরুড় পুনরায় প্রেমের সহিত বলিলেন, "প্রভু, যদি আমার উপর আপনার স্নেহ হয়, তবে আমাকে আপনার সেবক জানিয়া আমার সাতটি প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিত ভাবে দিন।"

প্রথমহি কহহু নাথ মতিধীরা। সব তেঁ দুর্লভ কবন সরীরা॥
বড় দুখ কবন কবন সুখ ভারী। যো সংছেপ হি কহহু বিচারী॥

[কবন—উচ্চারণ কওন, কোন্। সংছেপ—সংক্ষেপ।]

হে ধীরমতি প্রভো, (১) প্রথমে বলুন কোন্ শরীর সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লভ, (২) সবচেয়ে বড় দুঃখ কি, (৩) সবচেয়ে বড় সুখ কি? বিচার করিয়া সংক্ষেপে বলুন।

সন্ত অসন্ত মরম তুম্হ জানহু।
তিন্হকর সহজ সুভাব বখানহু॥
কবন পুণ্য শ্রুতিবিদিত বিশালা।
কহহু কবন অধ পরমকৃপালা॥

[প্রাচীন বাংলায় তুহ্ম পদটি দেখা যায়। উহা হইতে 'তুমি' হইয়াছে। প্রাচীন ও আধুনিক মারাঠি ভাষায়ও তুহ্ম বা তুহ্মি দেখা যায়।]

হে পরম কৃপালু, (৪) আপনি সন্ত ও অসন্ত ব্যক্তির মর্ম্ম জানেন। তাঁহাদের সাধারণ স্বভাব বর্ণনা করুন। (৫) বেদ-বিদিত বিশাল পুণ্য কি, এবং (৬) পাপ কি? তাহা বলুন।

মানসরোগ কহহু সমুঝাঈ। তুম্হ সর্ব্বজ্ঞ কৃপা অধিকাঈ॥
তাত সুনহু সাদর অতিপ্রীতী। মৈঁ সংছেপ কহউঁ যহ নীতি॥

আপনি সর্ব্বজ্ঞ এবং আমার উপর আপনার অত্যধিক কৃপা। (৭) মানসরোগ কি, তাহা আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

ভুশুণ্ডি উত্তর করিলেন, তাত, শুনুন, আমি অত্যন্ত আদর ও প্রীতির সহিত সংক্ষেপে এই নীতি বলিতেছি।

নর তন সম নহিঁ কবনিউ দেহী। জীব চরাচর জাঁচত জেহী॥
নরক স্বর্গ অপবর্গ নিসেনী। জ্ঞান বিরাগ ভগতি সুখ দেনী॥

[তন—তনু। জেহী—যাহা। ভগতি—ভক্তি। দেনী—দানী, দাতা। নিসেনী—মই, সিঁড়ি।]

(১) নরদেহের মত দেহ আর নাই, চরাচরের সকল জীবই ইহা প্রার্থনা করে। ইহা স্বর্গ, নরক ও মোক্ষের সিঁড়ি এবং জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তিসুখ দান করে।

যো তনু ধরি হরি ভজহিঁ ন জেনর।
হোহিঁ বিষয় রত মন্দ-মন্দতর॥
কাঁচ-কিরিচ বদলে তে লেহী।
করতেঁ ডারি পরসমনি দেহী॥

এই দেহ ধারণ করিয়া যে লোক হরিভজন না করে এবং বিষয়ে লিপ্ত হয়, সে মন্দ হইতেও মন্দ। সে নিজ হাতে পরশমণি ফেলিয়া দিয়া তাহার বদলে কাঁচখণ্ড লয়।

নহিঁ দরিদ্র-সম দুখ জগ মাহীঁ।
সন্তমিলন সম সুখ কছু-নাহীঁ॥
পর-উপকার বচন মন কায়া।
সন্ত সহজ সুভাউ খগরায়া॥

[মাহীঁ—মধ্যে। কছু—কিছু। সুভাউ—স্বভাব।]

(২) দরিদ্র হওয়ার মত দুঃখ জগতে কিছু নাই, (৩) সন্ত-পুরুষের সহিত মিলনের মত সুখ আর কিছু নাই। (৪) হে খগরাজ, কায়মনোবাক্যে পরের উপকার করা সন্তপুরুষের সাধারণ স্বভাব।

সন্ত সহহী দুখ পরহিত লাগী।
পরদুখ হেতু অসন্ত অভাগী॥
ভু-রজ তরু সম সন্ত কৃপালা।
পরহিত নিত সহ বিপতি বিসালা॥

[নিত—নিত্য। বিপতি—বিপত্তি। বিসালা-বিশেষ।]

সন্তপুরুষ পরহিতের জন্ত দুঃখ সহেন, আর অভাগা অসন্ত ব্যক্তি পরের দুঃখের হেতু হয়। কৃপালু সন্ত পৃথিবীর ধুলা ও তরুর সমান; তিনি পরহিতের জন্ত নিত্য মহা বিপত্তি সহেন।

সন ইব খল পরবন্ধন করঈ। খাল কঢ়াই বিপতি সহি মরঈ॥
খল বিনু স্বারথ পর অপকারী। অহি মূষক ইব সুনু উরগারী॥

[খাল—ছাল, চামড়া। কঢ়াই—কাড়িয়া। ইব—মত।]

হে সর্পকুলের শত্রু, শুনুন, খল ব্যক্তি শণের মত, সে অপরকে আবদ্ধ করে এবং নিজের ছাল উঠাইয়া দিয়া বিপত্তি সহিয়া মরে। সাপ ও ইঁদুরের মত স্বার্থ না থাকিলেও খল পরের অপকার করে।

পরসম্পদা বিনাসি নসাহীঁ।
জিমি কৃষি হতি হিম উপল বিলাহী॥

দুষ্ট উদয় জগ আরত হেতু।
জথা প্রসিদ্ধ অধম গ্রহ কেতু॥

[নসাহী—নাশপ্রাপ্ত হয়। জিমি—যেমন। হতি—নষ্ট করিয়া। বিলাহী—বিলুপ্ত হয়। আরত—আর্ত।]

দুষ্ট পরের সম্পদ বিনষ্ট করিয়া নিজেও নষ্ট হয়। শিলা-বৃষ্টির সময় শিলা যেমন কৃষিজাত দ্রব্যকে নষ্ট করিয়া দিয়া নিজেও বিলুপ্ত হয়। গ্রহ কেতু যেমন অধম বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেইরূপ দুষ্টের উদয় হয় জগতের দুঃখের জন্য।

সন্ত উদয় সন্তত সুখকারী।
বিশ্ব সুখদ জিমি ইন্দু তমারী॥
পরম ধরম শ্রুতি বিদিত অহিংসা।
পরনিন্দা সম অঘ ন গিরিংসা॥

ইন্দু যেমন বিশ্বের তমসা দূর করিয়া সুখ দান করে, সন্ত পুরুষের উদয়ও সেইরূপ সদা সুখকর। (৫) পরম ধর্ম্ম হইতেছে বেদবিদিত অহিংসা; (৬) পরনিন্দার মত পর্ব্বতপ্রমাণ পাপ আর নাই।

হরিগুরু নিন্দক দাদুর হোঈ।
জনম সহস্র পাব তন সোঈ॥
দ্বিজ নিন্দক বহু নরক ভোগ করি।
জগ জনমই বায়স শরীর ধরি॥

[দাদুর—ভেক। হোঈ—হয়, মারাঠী 'হোয়ে'। পাব—উচ্চারণ পাও, পায়। সোঈ—সেই।]

হরি ও গুরুর নিন্দক হইতেছে ভেকের মত, সে সহস্র জন্ম সেই তনু পায়। দ্বিজনিন্দক বহু নরক ভোগ করিয়া বায়স-শরীর ধারণ করিয়া জন্মে।

সুর শ্রুতি নিন্দক জে অভিমানী।
রৌরব নরক পরহিঁ তে প্রাণী॥
হোহি উলূক সন্ত নিন্দারত।
মোহনিসা প্রিয়জ্ঞান ভানু গত॥

যে অভিমানী দেবতা ও শ্রুতির নিন্দা করে, সে রৌরব নরকে পড়ে। সন্ত-নিন্দা-রত ব্যক্তি পেচক হইয়া জন্মে, মোহরূপ নিশা তাহার কাছে প্রিয়, জ্ঞানরূপ ভানু তাহার নিকট প্রকাশিত হয় না।

সবকৈ নিন্দা জে জড় করহীঁ।
তে চমগাদর হোই অবতরহীঁ॥
সুনহু তাত সব মানস রোগা।
জেহিতে দুখ পাবহি সব লোগা॥

[জড়—মূর্খ। চমগাদর—চমগাদড়, বাদুড়। অবতরহীঁ—জন্মে। জেহিতে—যাহা হইতে, যাহাতে।]

যে মূর্খ সকলেরই নিন্দা করে, সে বাদুড় হইয়া জন্মে। হে তাত, এখন (৭) মানসরোগের কথা শুনুন, যে সকল রোগে সমুদয় লোকে কষ্ট পায়।

মোহ সকল ব্যাধিন কর মূলা।
তেহি তেঁ পুনি উপজই বহু মূলা।
কাম বাত কফ লোভ অপারা।
ক্রোধ পিত্ত নিত ছাতী জারা॥

মোহ সকল ব্যাধির মূল; পরে উহা হইতে বহু পীড়ার উৎপত্তি হয়। কাম হইতেছে বাত, অত্যধিক লোভ হইতেছে কফ, আর ক্রোধ হইতেছে পিত্ত, যাহার দ্বারা নিত্য বুক ফাটিয়া যায়।

প্রীতি করহি জো তীনিউ ভাঈ। উপজই সন্নিপাত দুখ দাঈ॥
বিষয় মনোরথ দুর্গম নানা। তে সব মূল নাম কো জানা॥

এই তিন ভাই (বাত-পিত্ত-কফ) যদি পরস্পর প্রীতি করিয়া লয়, তবে দুঃখদায়ক সন্নিপাত রোগ জন্মে। বিষয়ের যে নানা দুষ্পূরণীয় মনোরথ আছে, তাহাও পীড়া। উহাদের নাম কে জানে?

মমতা দাদু কণ্ডু ইরষাঈ। হরষ বিষাদ গহরু বহুতাঈ॥
পর সুখ দেখি জরনি সোই ছাঈ। কুষ্ঠ দুষ্টতা মন কুটিলাঈ॥

[জরনি—জ্বলুনি। ছাঈ—ক্ষয়। গহরু—গ্রন্থিবাত।]

মমতা হইতেছে দদ্রু, ঈর্ষা হইতেছে কণ্ডূয়ন, হর্ষ ও বিষাদ কঠোর গ্রন্থিবাত। পরের সুখ দেখিলে যে জ্বালা হয়, তাহা হইতেছে ক্ষয়রোগ আর দুষ্টতা ও কুটিলতা হইতেছে কুষ্ঠ-ব্যাধি।

অহংকার অতি দুখদ ডঁবরুআ। দম্ভ কপট মদ মান নহরুআ॥
তৃষ্ণা উদরবৃদ্ধি অতি ভারী। ত্রিবিধ ঈষণা তরুণ তিজারী॥

[ডঁবরুআ—জলোদরী। নহরুআ—রোগবিশেষ। তিজারী—দুই দিন অন্তর যে জ্বর হয়। তরুণ—প্রবল।]

অহংকার অতি দুঃখদায়ী জলোদরী রোগ; দম্ভ, কপটতা মদ, অভিমান হইতেছে নহরুয়া রোগ; তৃষ্ণা (লিপ্সা) অতি প্রবল উদরবৃদ্ধি আর তিন প্রকার লালসা হইতেছে প্রবল জ্বর।

জুগ বিধি জ্বর মৎসর অবিবেকা।
কহঁ লগি কহউ কুরোগ অনেকা॥

[জুগ—যুগ, যুগল।]

মাৎসর্য্য ও অবিবেক হইতেছে দুই প্রকারের জ্বর। অনেক প্রকারের কুরোগের কথা আর কত বলিব?

এক ব্যাধি বস নর মরহিঁ, এ অসাধ্য বহু ব্যাধি।
পীড়হিঁ সংতত জীব কহঁ সো কিমি লহই সমাধি॥

[কিমি—কেমন করিয়া। সমাধি—শান্তি।]

একটি ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেই লোকে মারা যায়, আর এ ত হইতেছে বহু অসাধ্য ব্যাধি। এই রোগে লোককে সতত পীড়া দেয়; লোকে কেমন করিয়া শান্তি পাইবে?

নেম ধর্ম্ম আচার তপ জ্ঞান জজ্ঞ জপ দান।
ভেষজ পুনি কোটিক নহী রোগ জাহি হরিজান॥

হে হরিবাহন গরুড়, নিয়ম, ধর্ম্ম, আচার, তপ, জ্ঞান, যজ্ঞ, জপ, দান ইত্যাদি কোটি প্রকারের ভেষজ আছে, কিন্তু রোগ যায় না।

এহি বিধি সকল জীব জড় রোগী।
শোক হরষ ভয় প্রীতি বিয়োগী॥
মানস রোগ কছুক মৈঁ গায়ে।
হহিঁ সবকে লখি বিরলই পায়ে॥

[কছুক—কিছু। মৈঁ—উচ্চারণ ম্যাঁয়, আমি। গায়ে—গাহিলাম।]

সকল মূর্খ লোক এইরূপ রোগী। শোক, হর্ষ, ভয় ও প্রীতিতে সকলে লিপ্ত। কিছু কিছু মানস রোগের কথা আমি বলিলাম। এ সকল রোগ খুব কম লোকেই দেখিতে পায়।

জানে তে ছীজহিঁ কছু পাপী।
নাস ন পাবহিঁ জন পরিতাপী॥
বিষয় কুপথ্য পাই অঁকুরে।
মুনিহু হৃদয় কা নর বাপুরে॥

[ছীজহি—কম হয়। বাপুরে—বেচারা, হতভাগ্য।]

দুঃখদায়ী এই সকল পাপী রোগের বিষয় জানিতে পারিলে কিছু কম হয়; কিন্তু একেবারে নষ্ট হয় না। বিষয়রূপ কুপথ্য পাইলে মুনিজনের হৃদয়েও ঐ সকল রোগের অঙ্কুর জন্মে। বেচারা সাধারণ মানুষের কথা আর কি বলিব?

রোগের কথা বলা হইল। এখন ঔষধ নির্ণয় করা আবশ্যক। ভুশুণ্ডি তাহাই করিলেন।

রামকৃপা নাসহিঁ সব রোগা।
জো এহি ভাঁতি বনই সংজোগা॥
সদ্‌গুরু বৈদ বচন বিস্বাসা।
সংজম গ্রহ ন বিষয় কৈ আসা॥

[ভাঁতি—রকম। বনই—বনিয়া যায়, হয়।]

যদি এইরূপ সংযোগ সাধিত হয়, তবে রামের কৃপায় সকল রোগ নষ্ট হয়। সদ্‌গুরু-রূপ বৈদ্য, তাঁহার বচনে বিশ্বাস এবং বিষয়ে আশা না রাখিবার সংযম—এই তিনের সংযোগ হওয়া চাই।

রঘুপতি ভগতি সজীবন মূরী।
অনুপান শ্রদ্ধা অতি পূরী॥
এহি বিধি ভলেহি সো রোগ নসাহীঁ।
নাহি ত জতন কোটি নহি জাহীঁ॥

[মূরী—বটিকা। ভলেহি—ভালয় ভালয়, সহজে। নহি জাহীঁ—যায় না।]

রামভক্তি হইতেছে সঞ্জীবনী বটিকা, তাহার অনুপান হইতেছে পূর্ণ শ্রদ্ধা। এইরূপ হইলে সহজেই রোগ নাশ হয়। নহিলে কোটি যত্ন করিলেও রোগ যায় না।

পরে এই প্রসঙ্গের উপসংহার-রূপে ভুশুণ্ডি বলিলেন—

কমঠ পীঠি জামহিঁ বরুবারা।
বন্ধ্যাসুত বরু কাহুহি মারা॥
ফূলহিঁ নভ বরু বহু বিধি ফুলা।
জীব ন লহ সুখ হরি প্রতিকূলা॥

[কমঠ—কচ্ছপ। জামহিঁ—জন্মে। বরু—বরং। বারা—বার, চুল।]

কচ্ছপের পিঠে চুল জন্মিলেও জন্মিতে পারে, বন্ধ্যার পুত্র কাহাকেও মারিতে পারে, নভোদেশে বহুবিধ ফুল ফুটিলেও ফুটিতে পারে, কিন্তু হরি প্রতিকূল হইলে জীব সুখ পায় না।

কচ্ছপের পিঠে চুল হওয়া, বন্ধ্যার পুত্র হওয়া আর আকাশে ফুল ফোটার মত অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু হরি প্রতিকূল হইলে সুখ পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।
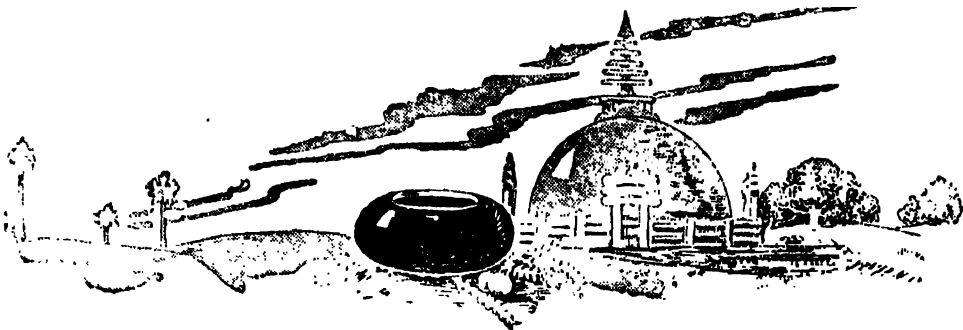
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৬৬—১৯২৩

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ; বংশ পরিচয় : ১৮৬৬ সনের ২০এ ডিসেম্বর (৬ পৌষ, ১৭৮৮ শক) বৃহস্পতিবার ভাগলপুরে পাঁচকড়ির জন্ম হয়; এই তারিখ তাঁহার কোষ্ঠী হইতে গৃহীত। তাঁহার পিতার নাম—বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাস—২৪-পরগণার হালিশহরে।

বিদ্যাশিক্ষা : পাঁচকড়ি পিতা-মাতার এক মাত্র আদরের সন্তান। তাঁহার পিতা বেণীমাধব ভাগলপুরে কলেক্টরী আপিসে ওয়ার্ডস ক্লার্ক ও বাটোয়ারি ক্লার্কের কাজ করিতেন। পাঁচকড়ির শিক্ষা-দীক্ষা পিতার কর্ম্মস্থল ভাগলপুরেই সম্পন্ন হয়। আশৈশব বিহারে অবস্থান করায় হিন্দী ভাষায় পাঁচকড়ির বিলক্ষণ অধিকার জন্মিয়াছিল। বিদ্যালয়ে কৃতী ছাত্র হিসাবে তাঁহার সুনাম ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি তিনি কোন্ সালে কিরূপ স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন, ক্যালেণ্ডার-অনুযায়ী তাহার পরিচয় দিতেছি :—

ইং ১৮৮২—প্রবেশিকা, ১ম বিভাগ (১৬ বৎসর বয়স)··· ভাগলপুর জিলা স্কুল

১৮৮৫—এফ. এ. ২য় বিভাগ···পাটনা কলেজ

১৮৮৭—বি.এ. (সংস্কৃত অনার্স), ২য় বিভাগ···পাটনা কলেজ

বি.এ. পাস করিবার অল্প দিন পরেই তিনি কাশীর সংস্কৃত-সাহিত্য ও সাংখ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "সাহিত্যাচার্য্য" উপাধি লাভ করেন।

বক্তা ও ধর্ম্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যাতা : তরুণ বয়সে পাঁচকড়ি ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের দ্বারা বিলক্ষণ প্রভাবিত হইয়াছিলেন। যে বৎসর তিনি বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, সেই বৎসর হইতে তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন-সম্পাদিত 'ধর্ম্মপ্রচারক' পত্রে নিয়মিতভাবে লিখিতে সুরু করেন। এই প্রসঙ্গে 'জন্মভূমি' (আষাঢ় ১৩০৫) লেখেন :—

"শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের সহিত এক সময়ে পাঁচুবাবুর খুব মাখামাখি ভাব ছিল। শৈশবকাল হইতেই পাঁচুবাবু,—শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের দলে ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের 'ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা' এবং 'সুনীতিসঞ্চারিণী সভা'র জন্য পাঁচুবাবু এক সময়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। পাঁচুবাবু ইহা মুক্তকণ্ঠে বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের উৎসাহেই তাঁহার বাঙ্গলা লেখায় প্রবৃত্তি জন্মে। এবং তাঁহারই উৎসাহে তিনি 'ধর্ম্মপ্রচারক' [১৮৮৭ সনে ভূধর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রথম প্রচারিত], 'বেদব্যাস' প্রভৃতি পত্রে, ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করেন। কিছু দিন পরে, নানা কারণে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সহিত তাঁহার মনের অকুশল ঘটে; তাই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে হয়।

ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের সহিত পাঁচুবাবু বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নিকট পাঁচুবাবু অনেক শাস্ত্রার্থ অবগত হইয়াছেন।"

পাঁচকড়ি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন :—"বি.এ. পাস করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলাম; পণ্ডিত শশধর তর্ক-চূড়ামণি মহাশয়ের হিন্দুধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে লেখক ও বক্তারূপে সহায়তা করিতাম।···১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত আমি কলিকাতায় আসিতাম যাইতাম, সাহিত্য-চর্চ্চা করিতাম, মাসিক ও সাপ্তাহিকে লিখিতাম, তখন আমাদের একটা বড় দল ছিল, সে দলের আনুকূল্য লাভ করিবার জন্য অনেকে আমার আনুগত্য করিতে বাধ্য হইতেন" ('মানসী,' জ্যৈষ্ঠ ১৩২০)।

প্রথম যৌবনে পাঁচকড়ি যে বক্তৃতা-শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, কালক্রমে তাহাই বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া দেশবাসীর নিকট তাঁহাকে বাগ্মী-রূপে পরিচিত করিয়াছিল। স্বভাব-দত্ত সতেজ ও মধুর কণ্ঠে বহু সভা-সমিতিতে তাঁহাকে বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দীতে অনর্গল বক্তৃতা দান করিতে দেখা গিয়াছে।

অধ্যাপনা : কলেজ হইতে বহির্গত হইবার পর পাঁচকড়ি ভাগলপুরে—সম্ভবতঃ টি. এন. জুবিলী কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্রতী হন। কিছুদিন পরে তিনি অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া সংবাদপত্র সেবায় আকৃষ্ট হন।

সাময়িকপত্র সম্পাদন : পাঁচকড়ি আমরণ সংবাদ-পত্রের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বহু পত্র-পত্রিকা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, ইহার কয়েকখানির কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

'বঙ্গবাসী' : পাঁচকড়ির সংবাদপত্র সেবায় হাতেখড়ি হয় 'বঙ্গবাসী'তে। তিনি ইং ১৮৯২ (?) সনে 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদকীয় বিভাগে প্রবেশ করেন। স্বনামধন্য ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই 'বঙ্গবাসী'র সহিত তাঁহার সংযোগ ঘটান। এই প্রসঙ্গে পঞ্চানন তর্করত্ন যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"'বঙ্গবাসী'র এক সময়ে রক্ষাকর্ত্তা, বাঙ্গালা ভাষার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যঙ্গসাহিত্যকেশরী স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে পাঁচকড়ি বাবু যেদিন বর্দ্ধমানে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের ভবনে উপস্থিত, সেদিন বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকেও আমন্ত্রণ করেন। আমি গিয়া দেখিলাম একজন পঞ্চবিংশ-

বয়সীয় গৌরবর্ণ যুবা বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। আলাপ আপ্যায়ন হইল, ঘনিষ্ঠতা অল্প সময়ের মধ্যেই পাঁচকড়ি বাবু করিয়া লইলেন এবং আমাকে পৃথক্‌ভাবে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া সংবাদপত্র সেবার পথে যাইব কি না? ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে জানিয়াছেন। আমি তাঁহার পত্র লইয়া যোগেন্দ্র বাবুর নিকট যাইব কিন্তু আমার ইহাতে কি উন্নতি হইবে?' পাঁচকড়ি বাবু তখন শিক্ষকতা করিতেন। তাঁহার বাক্‌পটুতা বুদ্ধিমত্তা ও লোকসংগ্রহের সামর্থ্য দেখিয়া ও তাঁহার তাৎকালিক প্রয়োজন বুঝিয়া আমি তাঁহাকে কিছু দিন সংবাদপত্র সেবার পরামর্শ দিয়াছিলাম, কিন্তু আইন পরীক্ষা দিয়া উকীল হইবার দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছিলাম। অল্প দিন মধ্যেই 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রের সংস্রবে পাঁচকড়ি বাবু যখন আসিলেন তখন তাঁহার কর্ম্মপটুতা, লিপিকৌশল ও বুদ্ধিমত্তা সকলকেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল।

সে সময় 'বঙ্গবাসী'র সর্ব্বস্ব স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু তাঁহাকে সর্ব্বগুণসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র তাঁহাকে কি ইংরাজি কি বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া মনে করিতেন। বঙ্গসাহিত্যসিংহ অক্ষয়চন্দ্র সরকার আমার সমক্ষে ও পাঁচকড়ির অসাক্ষাতে পাঁচকড়ি বাবুর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। 'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত তদানীন্তন দৈনিক ইংরাজী সংবাদপত্র 'টেলিগ্রাফে'র সম্পাদক পাঁচকড়ি বাবু ছিলেন।" ('বঙ্গবাণী,' পৌষ ১৩৩০)

কর্ম্মদক্ষতাগুণে পাঁচকড়ি ১৮৯৫ সনে 'বঙ্গবাসী'র প্রধান সম্পাদকের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন।* 'বঙ্গবাসী'র সংস্রবে আসিয়া পাঁচকড়ি আত্মোন্নতির প্রভূত সুযোগ পাইয়াছিলেন। 'বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুকে স্মরণ করিয়া তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন :

"আপনার 'বঙ্গবাসী'র সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আমি বাঙ্গালা লিখিতে শিখিয়াছি, আপনার 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক-পদে উন্নীত হইয়া আমি বাঙ্গালীর সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত হইয়াছি। এখন ভাগ্যবশে আমি স্বতন্ত্র; কিন্তু 'বঙ্গবাসী'র ভাব ও ভাষা চিরদিনই আমার হইয়া থাকিবে।" ('রূপ-লহরী', উৎসর্গপত্র)

কিন্তু এ সকলের মূলে ছিলেন ইন্দ্রনাথ,—'বঙ্গবাসী'র হিতৈষী, পরামর্শদাতা ও লেখক। পাঁচকড়ি ইন্দ্রনাথকে তাঁহার সাহিত্যগুরু বলিয়া স্বীকার করিতে কোন দিনই কুণ্ঠিত হন নাই; তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে লিখিয়া গিয়াছেন :—

"তিনি আমার খাঁটি গুরুমহাশয় ছিলেন, হাতে ধরিয়া লিখিতে শিখাইয়াছিলেন, কত ভঙ্গী করিয়া পড়িতে, বুঝিতে এবং বুঝাইতে শিখাইয়াছিলেন। আমার লেখায় এবং বলায় যদি কিছু মাধুরী থাকে তবে সে তাঁহার; আর বাকী উদ্ভটতা, উৎকটতা—সে সব আমার। এখনও তাঁহারই কথা বেচিয়া খাইতেছি, তাঁহারই সিদ্ধান্তসকল ব্যাখ্যা করিয়া সমাজে স্থান পাইয়া আছি। গুরু, বন্ধু, সখা, ভ্রাতা, পরিচালক—তিনি আমার সব; অধম অযোগ্য আমি তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ কিছুই আদায় করিতে পারি নাই। যাহা পারিয়াছি তাহাই আমার জীবনের অবলম্বন, দারিদ্র্যের তৃপ্তি, নিরাশার সুখ।" ('প্রবাহিণী,' ২০ বৈশাখ ১৩২২)

'বসুমতী' : কংগ্রেস বিরোধী 'বঙ্গবাসী' বর্জ্জন করিয়া পাঁচকড়ি ১৮৯৯ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি হইতে কংগ্রেস-সমর্থনকারী 'বসুমতী'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। 'বসুমতী'র (তৎকালে সাপ্তাহিক) তখন শৈশবকাল; ১৮৯৬ সনের ২৫এ আগষ্ট ইহার প্রথম আবির্ভাব। দুই বৎসর পরে স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত মতবিরোধের ফলে তিনি অমরেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রবর্ত্তিত **'রঙ্গালয়'** পত্রে যোগদান করেন। ইহার ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—১ মার্চ ১৯০১।

পাঁচকড়ি স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের দৈনিক **'সন্ধ্যা'**তেও নিয়মিতভাবে লিখিতেন। ১৯০৮ সনে তিনি দৈনিক **'হিতবাদী'**র সম্পাদক হন। **'বাঙ্গালী'** ও হিন্দী দৈনিক **'ভারতমিত্র'**ও তাঁহার সম্পাদনায় কিছু দিন পরিচালিত হইয়াছিল। ১৯২২ সনের জুন মাসের মধ্যভাগ হইতে তিনি মাসিক এক শত টাকা পারিশ্রমিকে **'স্বরাজে'** প্রতি দিন অন্যূন এক পাটি করিয়া লিখিতেন। এক মাত্র **'নায়ক'** পত্রের সহিতই পাঁচকড়ি দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন।

পাঁচকড়ির সম্পাদিত আরও দুইখানি পত্রিকার উল্লেখ করা প্রয়োজন; উহার প্রথমখানি—সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা 'প্রবাহিণী', প্রবর্ত্তক—সতীশচন্দ্র মিত্র। ইহার ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—৩ মাঘ ১৩২০। পাঁচকড়ি দুই বৎসর 'প্রবাহিণী' সম্পাদন করিয়াছিলেন। প্রথম বর্ষে তিনি কেবল প্রথম চারি মাস ও শেষের দুই মাস (২৫শ-৪৪শ সংখ্যা বাদে) ইহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। 'প্রবাহিণী'র প্রত্যেক সংখ্যায় তাঁহার রচনা স্থান পাইত; "নানাকথা" বিভাগটিও তিনি নিজে লিখিতেন।

'সাহিত্য' : সুরেশচন্দ্র সমাজপতি অকালে পরলোক গমন করিলে পাঁচকড়ি প্রিয় সুহৃদের এই সাধের মাসিক পত্রিকাখানি সহজে বিলুপ্ত হইতে দেন নাই; তিনি স্বয়ং ১৩২৭ সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যা হইতে 'সাহিত্যে'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ

---

* "আজ প্রায় দুই বৎসর কাল তিনি বঙ্গবাসী সংবাদপত্রের প্রধান সম্পাদকের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন" (জন্মভূমি,' আষাঢ় ১৩০৫)। "বঙ্গবাসীর সম্পাদক হইবার পর, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগ হইতে সুরেশের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হয়" ('সাহিত্য,' পৌষ-মাঘ ১৩২৭)।

করেন। 'সাহিত্যে'র পৃষ্ঠায় তাঁহার বহু রচনা—প্রবন্ধ, গ্রন্থ-সমালোচনা, 'সহযোগী সাহিত্য', 'বৈঠকী' প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে।

সাংবাদিক হিসাবে দোষগুণ: এই প্রসঙ্গে শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ তাঁহার একটি প্রবন্ধে ('মানসী ও মর্ম্মবাণী,' পৌষ ১৩৩০) যে মন্তব্য করিয়াছেন, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"পাঁচকড়ির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আনা হয়, তাঁহার মতস্থৈর্য্য ছিল না। বাস্তবিক আজ তিনি কোনও রাজনৈতিক বিষয়ে এক প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, কল্য পুনরায় তাহার বিপরীত মত প্রকাশ করিতেছেন। অবশ্য সকলেরই ভ্রান্তি ঘটিতে পারে এবং মত পরিবর্ত্তন করা কোনও লোকের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু পাঁচকড়ি প্রকাশ্যেই স্বীকার করিতেন যে তিনি পেটের দায়ে কোনও বিশেষ নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।...বাস্তবিক তিনি স্বাধীনভাবে কিছুই লিখিতে পারেন নাই, সেই জন্ত তিনি কিরূপ রাজনীতিক ছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। স্তর আশুতোষ চৌধুরী বলিয়াছেন পরাধীন জাতির রাজনীতি নাই। আমরা আশ্চর্য্য হইতাম সাহিত্যিক-রূপে তাঁহার অপূর্ব্ব ক্ষমতা দেখিয়া; 'বাঙ্গালী'তে একপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া এক মতের সমর্থন করিয়াছেন—সেই দিনই 'নায়কে' অপর একপ্রকার যুক্তি প্রদর্শিত করিয়া অপূর্ব্ব নিপুণতার সহিত পূর্ব্বমতের খণ্ডন করিয়াছেন।...

পাঁচকড়ির বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ আনয়ন করা হয় তাহা এই যে, তিনি সম্পাদকীয় লেখনী সময়ে সময়ে এরূপ অসংযতভাবে ব্যবহার করিতেন যে তাহাতে অনেকে মর্ম্মাহত হইতেন। তাঁহার নামে অনেক বার মানহানির মকদ্দমা হইয়াছে। প্রায়ই তিনি তাঁহার শ্লেষবাণাহত প্রতিপক্ষের রহস্য-রসাস্বাদন-শক্তি-অভাবের জন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতেন। প্রাচীন বাঙ্গালার রসিকতায় যে আধুনিক বাঙ্গালীর মানহানি হইতে পারে ইহা তিনি আইন সত্ত্বেও বিশ্বাস করিতে চাহিতেন না। অধিকাংশ স্থলেই এই সকল বিবাদ হাস্য-পরিহাসের মধ্যেই বিলয়প্রাপ্ত হইত। পাঁচকড়ি যথার্থই লিখিয়াছিলেন—'যে আজ আমাকে গালাগালি করে, সে কাল আমার হাত ধরিয়া লইয়া যায়। যে আজ আমার নিন্দায় দুন্দুভি বাজায়, সে কাল প্রশংসার সানাইয়ে সুর জমাইবার চেষ্টা করে। তোমাদের নিন্দা স্তুতির মূল্য বুঝিয়া আমার কেবল হাসি পায়। আমাকেও চিনিলে না, চিনিতে পারিবেও না।'*

গ্রন্থাবলী: আমরা পাঁচকড়ির রচিত ও সম্পাদিত যে কয়খানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিলাম। বন্ধনী-মধ্যে ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।

১। আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী। আশ্বিন ১৩০৬ (১০-৩-১৯০০)। পৃ ৯৫+১।

"ফ্রান্সিস্ গ্লাডউইন কর্তৃক অনূদিত ইংরাজী হইতে অনূদিত" ও বসুমতী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

২। শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত আদি, মধ্য, অন্ত্যলীলা (কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত)। চৈতন্তাব্দ ৪১৪ (১২-৫-১৯০০)। পৃ. ৩৭৮। বসুমতী-কার্য্যালয়।

৩। উমা (গৃহচিত্র)। ১ ফাল্গুন ১৩০৭ (৭-৫-১৯০১)। পৃ. ১৬২।

৪। রূপ-লহরী বা রূপের কথা। ১৩০৯ সাল (১৫-৬-১৯০২)। পৃ. ১৮৭।

সূচী: কালিন্দী, মনোরমা, ফুলকুমারী, অনুপমা, দোপাটি, মালতী, হাবী।

৫। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস, ১ম খণ্ড। আশ্বিন ১৩১৬ (ইং ১৯০৯)। পৃ. ২৫৩। (সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়)

৬। বিংশ শতাব্দীর মহাপ্রলয়, ১ম খণ্ড (সচিত্র)। ইং ১৯১৫ (১৮ নবেম্বর)। পৃ. ২২৩।

৭। সাধের বউ (উপন্তাস)। ২৫ ভাদ্র ১৩২৬ (ইং ১৯১৯)। পৃ. ১৬৪।

৮। দরিয়া (উপন্তাস)। ১ আষাঢ় ১৩২৭ (২৬-৬-১৯২০)। পৃ. ১৭৪।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা: পাঁচকড়ির অধিকাংশ রচনাই প্রধানত: সাময়িক বিষয় অবলম্বনে লিখিত, এগুলি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; এই সকল সংবাদপত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি অধুনা দুষ্প্রাপ্য। তিনি প্রতিষ্ঠাপন্ন কতকগুলি সাহিত্যবিষয়ক মাসিকপত্রেও গল্প-উপন্তাস, সমাজনীতি, সাহিত্য, জীবনচরিত, জাতিতত্ত্ব, দর্শন, বৈষ্ণবশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র, সমালোচনা—সকল বিষয়েই বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; দৃষ্টান্তস্বরূপ—'বেদব্যাস' (১২৯৪-১৩০২), 'জন্মভূমি' (১৩০৭-৮,-১২,-২০,-২৭), 'অনুসন্ধান,' 'মানসী,' 'বিজয়া,' 'নারায়ণ,' 'সাহিত্য,' 'বঙ্গবাণী,' 'ধ্রুব' প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল রচনার অধিকাংশই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

মৃত্যু:—পাঁচকড়ি দীর্ঘায়ু ছিলেন না। ১৩৩০ সালের ২৯-এ কার্ত্তিক (১৫ নবেম্বর ১৯২৩), ৫৭ বৎসর বয়সে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

পাঁচকড়ি ও বাংলা-সাহিত্য: পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সে-যুগের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় মতে উচ্চশিক্ষিত এক জন সাহিত্যসেবী ছিলেন। তাঁহার স্থায়ী সাহিত্যকীর্ত্তি যৎসামান্ত হইলেও সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনায়

* "আমার আসিলাম": 'প্রবাহিণী,' ২১ অগ্রহায়ণ ১৩২১ (৪২শ সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।—ব্র-না-ব.

তিনি যে অসামান্ত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা এ যুগেও আদর্শ ও অনুকরণীয় বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। এই কারণে তাঁহার সেই সকল রচনার সঙ্কলন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত। তাহা ছাড়া বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার বহু প্রবন্ধে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ ছড়াইয়া আছে। তাঁহার সাহিত্য-সাধনার অবিসম্বাদিত কীর্ত্তি সেইগুলি। শুধু ইতিহাস নয়, রচনা-কৌশলের দিক্ দিয়াও সেগুলি অসাধারণ এবং এইগুলির উপর ভিত্তি করিয়াই তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা। শুধু সাময়িকপত্রের মধ্যেই আবদ্ধ আছেন বলিয়া তাঁহার এই প্রতিষ্ঠা আজিও সর্ব্বজনগ্রাহ্য হয় নাই এবং তিনি হারাইয়া যাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার রচনাগুলি সংগৃহীত ও সুসম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইলে সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের যথাযথ মূল্য নির্দ্ধারণ সহজ হইবে এবং আমাদের বিশ্বাস তিনি এ যুগের বাঙালীর শ্রদ্ধাও আকর্ষণ করিবেন।

পাঁচকড়ির রসসমুজ্জ্বল রচনার নিদর্শনস্বরূপ আমরা নিম্নে তাঁহার একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"মাটি নিবি গো।—'মাটি নিবি গো'—চীর পরিধানা, শুষ্কা, শীর্ণা, কর্দ্দমপরিলিপ্তা দুঃখিনী মাথায় এক ঝুড়ি মাটি লইয়া, পাড়ায় মাটি বেচিতেছে। অনাহারে তাহার কণ্ঠরব মৃদু, দারিদ্র্যের পীড়নে তাহার দেহযষ্টি কিঞ্চিৎ ন্যুব্জ, তাহার আশা নাই, ভরসা নাই, সুখ নাই, স্বস্তি নাই—আছে কেবল পেটের জ্বালা, আছে কেবল জীবনের মায়া। সে বাঁচিতে চাহে—জীবন-সুখেই সে কেবল বাঁচিতে চাহে; কিন্তু বাঁচিবার উপায় তাহার কিছু নাই, আছেন কেবল মা গঙ্গা; যখন ভাঁটার টানে জল নামিয়া যায়, তখন সে গঙ্গার মাটি, নখাঙ্গুলের শীর্ণ নখের সাহায্যে চাঁচিয়া আনিয়া পাড়ায় পাড়ায় বেচিয়া বেড়ায়। অথবা যখন কোন ঐশ্বর্য্যশালী ধনবান পুরুষ নূতন ভবন নির্ম্মাণ করিবার আয়োজন করেন তখন বুনিয়াদ খুঁড়িতে যে মাটি বাহির হয়, তাহাই কিছু সংগ্রহ করিয়া সে ক্ষুধার অন্ন সঞ্চয় করে। মাটিই তাহার অন্ন। মাটিই তাহার জীবন।

'মাটি নিবি গো'—কাতর কণ্ঠে দুঃখিনী আবার ডাকিল। কৈ কেহ ত সাড়া দেয় না, কেহ ত দরজা খুলিয়া মাটি কিনিতে পথে আসিয়া দাঁড়ায় না! বুঝি, দুঃখিনী আর মাটির বোঝা বহিতে পারে না। বুঝি, তাহার আজ অনাহারে দিন যায়! বেলা দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে, কলিকাতার শান-বাঁধান 'ফুটপথে' আর পা পাতিয়া চলা যায় না; পিপাসায় তাহার তালু শুষ্ক হইয়াছে, অধরোষ্ঠে ধূলা উড়িতেছে; দুঃখিনী আর সহিতে পারে না, তাহার দুই চক্ষুর কোণ হইতে অশ্রুর দুইটি মোটা ধারা গড়াইয়া পড়িল। হা বিধাতঃ! মাটিও কেহ কিনিতে চায় না! এমন সময়ে বাবুদের বাড়ীর একটি চাকরাণী চাঁচা বাখারীর মতন কালো-কালো দেহখানিকে দোলাইয়া, এক পিঠ চুল নাচাইয়া, আহারান্তে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে সেই পথে আসিয়া দাঁড়াইল। রোরুদ্যমানা মৃত্তিকা-বিক্রয়িত্রীকে চোখের জল ফেলিতে দেখিয়া ঝি মহাশয়া চোখ-মুখ বাঁকাইয়া বলিল—"আঃ মর মাগী, দরজায় ব'সে আবার কান্না হচ্চে।"

ঝিয়ের মিষ্ট সম্ভাষণ শুনিয়া, একটু সামলাইয়া, মাটিওয়ালী উদাসভাবে বলিল—"হ্যাঁ মা, তোমাদের পাড়ায় কি কেহ উনান পাতে না, কাহারও বাড়ীতে কি রসুই-ঘর নাই, কোন গৃহে কি তুলসীমঞ্চ নাই? তোমরা কি হাতে মাটি কর না?"

এক গাল হাসিয়া, যেন সোহাগে আটখানা হইয়া ঝি উত্তর করিল—"না রে না;—এ যে বাবুসাহেবদের পাড়া। এখানে কাহারও চাল-চুলা নাই, তুলসীমঞ্চ নাই; হাতে মাটির রেওয়াজও নাই। এ পাড়ায় কি মাটি বেচিতে আসিতে আছে?"

মাটিওয়ালী—"তবে ইহারা খায় কি? খায় না। খেত-খানাও যায় না।"

ঝি—"খাবে না কেন? দিনের মধ্যে পাঁচ বার খায়। বাবুর্চ্চিখানায় রান্না হয়, রসুই-করা সামগ্রী ঘরে আনিয়া খায়। হাতে মাটি দেয় না, সাবান মাখে। বুঝিলি, এ পাড়ায় কোন বাড়ীতেই মাটি বিকাইবে না।"

মাটিওয়ালী ঝিয়ের কথা শুনিয়া চোখের জল মুছিল এবং নিরাশভাবে মাটির ঝুড়িটা মাথায় তুলিতে চেষ্টা করিল। বৃদ্ধা দুই দিন একটি চণকও দাঁতে কাটে নাই, ক্ষুধায় স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছে না, মাটির ঝুড়ি মাথায় তুলিবে কি! ঝুড়ি তুলিতে গিয়া সে উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। ঝি নিতান্ত হৃদয়-হীনা নহে, সেও এক দিন অনাহারে কষ্ট পাইয়াছে, ক্ষুধার্ত্তের জ্বালা সে বেশ বুঝে; সে-বেদনার স্মৃতি এখনও সে হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। ঝি তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর হইতে এক ঘটী জল আনিয়া মাটিওয়ালীর চোখে মুখে দিল। দুঃখিনীর একটু জ্ঞান হইল, পাঁজর-ভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে আবার বলিল—"হা ভগবান্, মাটি কেহ খরিদ করিতে চাহে না।" এই কথা শুনিয়া এবং দরজায় একটা হাঙ্গামা হইতেছে বুঝিয়া বাড়ীর গৃহিণী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—"মাটিওয়ালী, তোর এক ঝুড়ি মাটির দাম কত?" অতি ধীরে দুঃখিনী বলিল—"চারি পয়সা।"

গৃহিণী—অত মাটির দাম চার পয়সা! আমি দুই আনা দেব, আমায় সব মাটি দিয়ে যা।

শীর্ণ মুখে একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া মাটিওয়ালী উত্তর করিল—"আর দয়া করিতে হবে না মা। দেবতাই আমাকে যথেষ্ট

দয়া করিয়া'ছেন। চারি পয়সা পাইলে আমার শ্রম সার্থক হইবে।"

গৃহিণী—সে কি! দয়া কেমন! দেবতার দয়া কি দেখিলে?

মাটিওয়ালী—যখন আমার দেহে বল ছিল, তখন আমি যত মাটি বহিতে পারিতাম, তাহার দাম পাড়ার লোকে চারি পয়সা দিত। এখন তাহার অর্দ্ধেক বহিতে পারি, তবু চারি পয়সাই পাই। বার্দ্ধক্যে ইহাই আমার পক্ষে দেবতার দয়া। আর তুমি মা যখন নেমে আসিয়াছ, তখন দেবতার দয়া বাকী কি আছে!

গৃহিণী—চাট্টি ভাত খাবি? ভাত যদি খেতে না চাস্ ত একটু গরম দুধ দিব—খাইবি?

মাটিওয়ালী—অত সুখ সহিবে না মা! আমার চারিটি পয়সা দেও, আমি ঝুড়িটা উপুড় করিয়া খালি ঝুড়ি লইয়া চলিয়া যাই।

এইটুকু বলিয়া মাটিওয়ালী জোর করিয়া উঠিয়া বসিল, জীর্ণ বস্ত্রাঞ্চলে কোটরগত দুইটি চক্ষু মুছিল, একটা ঢোক গিলিয়া সাম্‌লাইয়া গৃহিণীর মুখের পানে চাহিয়া আবার বলিতে লাগিল—

"মাটি কেনা বন্ধ করিও না মা;—আমার কথা শুন—যখন তোমার দ্বারে আমার মতন আর কেহ মাটি বেচিতে আসিবে, অমনি তখনই দুই এক পয়সার মাটি তাহার নিকট হইতে খরিদ করিও। মাটি লক্ষ্মী, মাটি শেষের সম্বল। যাহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, তাহার মাটি আছে। মাটি আছে বলিয়াই, মা আমি এমন দুঃখিনী হইয়াও ভিখারিণী হই নাই—কাঙ্গালিনী সাজিতে পারি নাই। চারিটার উপর আর চারিটা পয়সা তুমি আমায় ভিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলে। আমি তাহা লইব কেন। যত ক্ষণ মাটি আছে তত ক্ষণ আমার অন্ন আছে। আমি ভিক্ষা করিব কেন মা। সৌখীন ঘরের গৃহিণী তুমি মা, তোমার দয়াটাও সৌখীন রকমের। আজ তুমি আমায় দুধ খাওয়াইতে চাও, কাল আমার কি দশা হইবে? আজ তুমি আমার চার পয়সার মাটি আট পয়সায় কিনিলে কাল অমন দাম কে দিবে? লাভের মধ্যে আমার লোভ বাড়িয়া যাইবে, আমার মাটি বেচায় ব্যাঘাত ঘটিবে। না মা, তোমার পয়সা তোমার থাকুক; আমাকে ন্যায্য মূল্য দিলেই আমি সুখী হইব। তোমার মাটির প্রয়োজন নাই, তবুও যে মাটি কিনিলে, দুঃখিনীর বোঝার লাঘব করিলে, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট দয়া।"

গৃহিণী নীরবে মাটিওয়ালীকে চারিটি পয়সা দিয়া, স্বয়ং নিজ হস্তে মাটির ঝুড়ি তুলিয়া ঘরে রাখিলেন। কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, অঞ্চলের বস্ত্র গলায় জড়াইয়া গললগ্নীকৃতবাসে, সাষ্টাঙ্গে মৃত্তিকার স্তূপকে প্রণাম করিলেন। এবং করজোড়ে বলিলেন—

"মাটি তুমি সত্যই মা-টি। যাহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে তাহার মাটি আছে। তুমি শেষ, তুমি অনন্ত। মা-টি আমার তুমি স্থির হইয়া আমার ঘরে থাক। মূঢ়া আমি, জানিতাম না, তাই তোমায় তোমার যোগ্য মর্য্যাদা দিই নাই, তোমার উপাসনা করি নাই। আজ আমার সুপ্রভাত, এমন মহীয়সী দুঃখিনী আমার গৃহদ্বারে আসিয়াছিল, তাইতে তোমার মহিমা বুঝিলাম। থাক মা, যুগে যুগে যেমন আমার শ্বশুর-বংশে পূজিতা হইয়া আসিয়াছ, আবার তেমনি ভাবে থাক। তুমি অন্ন, তুমি প্রাণ, তুমি মান, তুমি ধর্ম্ম, তুমি বাঙ্গালার বাঙ্গালীর সর্ব্বস্ব, তুমি আমার ঘরে স্থির হইয়া থাক। তোমায় বার বার নমস্কার করিতেছি।"

এইভাবে মৃত্তিকার স্তব করিয়া গৃহিণী চোখের জল মুছিয়া পবিত্রা হইলেন—ধন্যা হইলেন। জ্ঞানময়ী, ভাবময়ী লক্ষ্মী-স্বরূপিণী তিনি, মাটিওয়ালীর কথায় তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল, তাঁহার জীবনের ভাবের ধারা নূতন প্রণালী অবলম্বন করিল। তিনি বাঙ্গালিদের মহিমা বুঝিলেন।

আইস বাঙ্গালী, একবার মাটিওয়ালীর মতন আমরাও মাটির—আমাদের মা-টির ফেরি করিয়া জীবন ধন্য করি। মাটি নিবি গো—যে মাটিতে তুমি মা শিব গড়িয়া পূজা কর, এবং সংসারে কল্যাণের ধারা প্রবাহিত করিয়া দেও—সেই মাটি নিবি গো? এই মাটি চোরে চুরি করে না, বিদেশী ব্যবসায়ী কাটিয়া দেশান্তরে লইয়া যায় না; এ মাটির মূল্য নাই, যথার্থ মূল্য আজ পর্য্যন্ত কেহ করিতেও পারে নাই। তোরা কেউ মাটি নিবি গো! এ মাটির প্রতি কণা বিশাল ভারতবর্ষের বক্ষবিধৌত হইয়া সঞ্চিত হইয়াছে, পতোতোদ্ধারিণী গঙ্গার কোটি তরঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া এ মাটি সর্ব্বতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া গঙ্গার স্রোতোমুখে বাঙ্গালার বক্ষে আসিয়া সঞ্চিত হইয়াছে। এ মাটির স্তরে স্তরে ভারতেতিহাস গাঁথা রহিয়াছে, যুগ-যুগান্তরের কত গাথা ইহাতে খচিত রহিয়াছে। আমাদের বড় সাধের মা-টি নিবি গো! এ মাটি আমার সত্যই কল্পলতিকা; যাহা চাও তাহাই দিবেন, দিতেছেন, দিয়াছেন। এই মা-টির প্রভাবে আমাদের সকল অভাব দূর হইয়াছে, সকল কষ্টের মোচন হইয়াছে। এই মাটি হইতেই বাঙ্গালার কার্পাস, এবং সেই কার্পাস হইতে ঢাকার মলমল্। এই মাটি হইতেই বাঙ্গালার কার্পাস, এবং সেই কার্পাস হইতেই তুঁতের চাস আর সেই তুঁতে হইতেই রেশমের গুটি এবং বাঙ্গালার পট্টবস্ত্র। এই মাটি হইতেই অন্ন আর সেই অন্নের জোরেই বঙ্গভূমি ভারত-বর্ষের অন্নপূর্ণা। আমাদের বাঞ্ছাকল্পলতিকা মৃত্তিকা তোরা কেউ নিবি গো! ছার রজত কাঞ্চন, ছার দ্বিরদরদনির্ম্মিত আসন, ছার মণিমুক্তা, প্রবাল হীরা—ছার বিভব বাণিজ্য! আমার মাটি বজায় থাকিলে, তাহা হইতে পাট উৎপন্ন হইয়া

কোটি কোটি টাকা ঘরে আনিয়া দেয়। আমার মাটি বন্ধ্যা থাকিলে তাহা হইতে ঘাস উৎপন্ন হইলেও, অন্নজলের সংস্থান করিয়া দেয়। আমার মাটির বাঁশবনেও টাকার তোড়া সাজান আছে, কলাবনে মণিমুক্তা ছড়ান আছে। হায় বাঙ্গালী, এমন মাটিকেও অবহেলা করিতেছ।

মাটি নিবি গো—যাহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, তাহার মাটি আছে। ঐ শুন, ইউরোপে মহারণের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে। আর ব্যবসায়ীর জাহাজ আসিবে না, আর বিলাস-দ্রব্য পাইবে না, আর নগদ টাকার মুখ দেখিতে পাইবে না। সর্ব্বস্ব যাইবে, থাকিবে কেবল মাটি। সে মাটিকে মাথায় করিয়া রাখিতে পার যদি, তবেই ক্ষুধার অন্ন পাইবে, তৃষ্ণার জল পাইবে, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র জুটিবে। এমন শ্যামা মাটিকে—তোমাদের বাঙ্গালী জাতির মা-টিকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিও না। তোমার আধুনিক শহর, নগর, রাজধানী—সকলই ব্যাস-কাশী; ঐখানে মরিলে গাধা হয়, বাঁচিয়া থাকিলে মর্কট হইতে হয়। এ সব থাকে না, থাকে নাই। গৌড়, রাজমহল, একদলা, পাণ্ডুয়া, রমাবতী, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা—একে একে কত হইয়াছে, কত গিয়াছে। কোথায় নবদ্বীপ—কোথায় বা জগদ্দল! সব গিয়াছে, সব যাইবে—থাকিবে কেবল মাটি, স্তরবিন্যস্ত ভাবে, সদাস্নিগ্ধ কোমল পেলবরূপে থাকিবে কেবল মাটি। ঐ মাটিই অহঙ্কারের এবং স্পর্দ্ধার চিহ্নগুলিকে স্বীয় কুক্ষিগত করিয়া ঢাকিয়া রাখিবে—এখনও তেমন অনেক দর্পের ভস্মস্তূপ বাঙ্গালার সর্ব্বাঙ্গে এবং সর্ব্বত্র ঢাকা আছে। ঐ মাটির গুণে আজ বাঙ্গালা মরুভূমে পরিণত হয় নাই। ঐ মাটির স্তন্য-পীযূষধারা শত ধারায় বিদূরিত হইয়া তোমাকে এখনও ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল দিতেছেন। এমন অক্ষয় ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার মাটিকে ঘরে তুলিয়া রাখ না? এই মাটি অমূল্য নিধি। এই মাটিতেই খোল হয়, যে খোলের চাঁটি শুনিলে এখনও বাঙ্গালী নাচিয়া উঠে। এই মাটিতে নিমাই ও নিতাইয়ের দিব্যমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়, যাহাদের পুণ্য প্রভাবে আজও বাঙ্গালায় ভাবের তরঙ্গ উছলিয়া উথলিয়া উঠিতেছে। এই মাটিতেই দশভুজার প্রতিমা গড়িয়া বাঙ্গালী জীবন সার্থক কর! এক বার এই মা-টিকে মা-মা বলিয়া বাঙ্গালী এক বার গড়াগড়ি দেও! তোমার দেহ পবিত্র হউক, তোমার মনুষ্য-জন্ম সার্থক হউক।

মা-টি নিবি গো—বাঙ্গালার মাটি-হারা, মায়ের ছেলে, তোমরা যদি দেহ পবিত্র রাখিতে চাও, তৈজসপত্র পবিত্র রাখিতে চাও, পবিত্র অঙ্গনে যদি গোপালদের লইয়া দেবতার খেলা খেলিতে চাও,—তবে মাটি লও। মেয়েদের প্রবচন আছে—কোলের ছেলে কোল ভাঙ্‌ভা, মাটির ছেলে সোনার চাকড়া। এ মাটিতে গড়াগড়ি দিলে সত্যই সোনার চাকড়া হওয়া যায়। এই মাটি মাখিয়া আমরা নীরোগ, মাটি হইতেই আমাদের সর্ব্বস্ব। যেদিন হইতে মাটি ছাড়িয়াছি, সেই দিন হইতে চিররোগা, দুঃখী হইয়াছি। যেদিন হইতে মাটি ভুলিয়াছি, সেই দিন হইতে মা-টির স্নেহ হারাইয়াছি। বাঙ্গালার মাটি অতি পবিত্র, তাই বাঙ্গালার মাটিতেই দেবপ্রতিমা নির্ম্মিত হয়। বঙ্গভূমি মৃন্ময়ী, তাই বাঙ্গালার সর্ব্বস্ব মৃন্ময়! এ মাটিতে কাঁকর নাই, পাথর নাই, কোনখানে কাঠিন্য নাই। এমন মাটি লইবে না? লও—লও, আমার সোনার মাটি, ক্ষীরের মাটি—লও, লও! দুধটুকু মারিয়া যেমন ক্ষীরটুকু হয়, ভারতের পীযূষধারাকে শুকাইয়া, গঙ্গার কটাহে নাড়িয়া বাঙ্গালার ক্ষীর মাটি হইয়াছে। এমন ক্ষীরের মাটিকে অবহেলা করিও না। বলিয়াছি ত, এ মাটি কেহ কাড়িয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। তুমি বাঁচিয়া থাকিতে পারিলে' এ মাটি তোমারই থাকিবে, তোমারই আছে। যে মাটি ভগবানের চরণতাড়নায় দশ বার পবিত্রীকৃত, যে মাটি গঙ্গাজলে সদা সিক্ত, যে মাটির স্তরে স্তরে জীবনী শক্তি সঞ্চারিত—লও, লও, সাধের মাটি, সোহাগের মাটি, আদরের মাটি, স্নেহের মাটি—লও, লও। মা-টির কোলে যাইবেন, মাটিকে কোলে রাখিলে সকল পাপ-তাপ শীতল হইয়া যায়, সকল জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হইয়া যায়, সকল অভাবের বিমোচন হয়। এমন কোমল মাটিকে ভুলিও না।

মাটি নিবি গো—সাবান-পমেটম ভুলিয়া—মাটি নিবি গো! বিদেশের প্রসাধন-উপাদান সকলকে মাটিতে ফেলিয়া মাটি নিবি গো! ইউরোপের পাউডার-ভস্ম ফুৎকারে উড়াইয়া মাটি নিবি গো! একবার দাঁড়াও, কোঠা বালাখানা ত্যাগ করিয়া, মর্ম্মরকুটীরকে বর্জ্জন করিয়া, নগরের সৌধশুভ্রতাকে পরিহার করিয়া, নিত্য স্নিগ্ধ, নিত্য শ্যামল বাঙ্গালার মাটির উপর দাঁড়াও। মাটির উপর দাঁড়াইলেই মাটির আদর করিতে শিখিবে, তখন আমার মাটি-বেচা সার্থক হইবে। সর্ব্বস্বান্ত বাঙ্গালী, তোমার কেবল মাটিই ত আছে। মাটি আছে বলিয়াই তুমি এখনও বাঁচিয়া আছ, মাটি আছ বলিয়াই তোমার সোহাগের স্মৃতি আছে; মাটি আছে; বলিয়াই মা-টির ক্রোড়ের প্রচ্ছন্ন নিধি খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এমন দিনে মাটি গ্রহণ কর, সে মাটিতে আবার শিব গড়িয়া পূজা কর, তোমার অশেষ কল্যাণ হইবে।

—মাটি নিবি গো।—

('প্রবাহিণী,' ১৮ মাঘ ১৩২১)

নেপাল স্বাধীন না পরাধীন ?

শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

নদীতে যখন বান ডাকে তখন খাল বিল ডোবা নালা সব বানের জলে ভরে যায়। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা লাভ করেছিল, তার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা লাভ করেছিল ব্রহ্মদেশ ও সিংহল। এশিয়ায় ইন্দো-চীন, মালয়, যবদ্বীপও স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন সুরু করেছিল। আর সেই সঙ্গে স্বাধীন অথচ স্বেচ্ছা শাসনতন্ত্রের দেশ নেপালেও গণতন্ত্রের আন্দোলন দেখা দেয়।

অতি বিচিত্র দেশ এই নেপাল। গিরিরাজ হিমালয় একে প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য করে রাখলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ করেছেন। চারদিকে তার অপরূপ রূপ। সেদিকে তাকালে চোখ ফেরান যায় না। এভারেষ্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা, ধবলগিরি প্রভৃতি হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গগুলি নেপালের সীমারেখার মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। নেপালের দৈর্ঘ্য ৫০০ মাইল—প্রায় দার্জ্জিলিং থেকে হরিদ্বার পর্য্যন্ত। আর প্রস্থ ১৫০ মাইল।

এ দেশের লোকসংখ্যা ৬০ লক্ষ। অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশ হিন্দু, অবশিষ্ট বৌদ্ধ। নেপালের উপত্যকাগুলি অতি রমণীয়। এই সমস্ত উপত্যকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে সরযূ, গণ্ডক ও কুশী নদী। কাঠমাণ্ডু উপত্যকাই সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ—তার দৈর্ঘ্য ২০ মাইল ও প্রস্থ ১৪ মাইল। কাঠমাণ্ডু নগর নেপালের রাজধানী—বাঘমতী নদীর তীরে অবস্থিত।

সমগ্র নেপাল উপত্যকা এককালে ছিল এক দীর্ঘ সরোবর—এই রকম কিম্বদন্তী নেপালে প্রচলিত আছে। মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্ব এই সরোবরকে শোষণ করে দিয়েছিলেন। এই মঞ্জুশ্রী এখনও নেপালে পূজা পেয়ে আসছেন। এখানে তাঁর একটি মন্দিরও আছে।

পূর্ব্বকালে এখানে নে নামে এক সাধু ছিলেন। তিনি বাঘমতী ও কেশবতী নদীর সংযোগস্থলে পূজা অর্চনা করতেন। তিনি ছিলেন স্বয়ম্ভূ ও বজ্রযোগিনীর পূজারী। তিনি নেপালের নরনারীকে ধর্ম্মের প্রকৃত পথ দেখিয়েছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পর সন্ন্যাসী উপগুপ্তের সঙ্গে ২৫০ অথবা ২৪৯ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে মহারাজ অশোক বুদ্ধদেবের জীবনের চারটি প্রধান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে বার হয়েছিলেন। সেই সময় বুদ্ধদেবের জন্মস্থান কপিলাবস্তু দেখতে অশোক নেপালে আসেন। রাজকন্যা চারুমতী পিতার সঙ্গে এসেছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর জীবন অবলম্বন করেছিলেন। মহারাজ অশোক তাঁর নেপাল পরিদর্শন স্মরণীয় করবার জন্য নেপাল শহর প্রতিষ্ঠা করেন। রাজকন্যা ভিক্ষুণী চারুমতী ও তাঁর স্বামী দেবপাল ক্ষত্রিয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য এখানে দেবপত্তন নামে এক নগরের প্রতিষ্ঠা হয়। মহারাজ অশোক নেপাল পরিদর্শনের পর ফিরে যান। কিন্তু চারুমতী সেই দেশেই থেকে গেলেন। পশুপতিনাথের উত্তরে একটি মঠ নির্ম্মাণ করে সেখানেই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর নাম সেই মঠের সঙ্গে এখনও জড়িয়ে আছে।
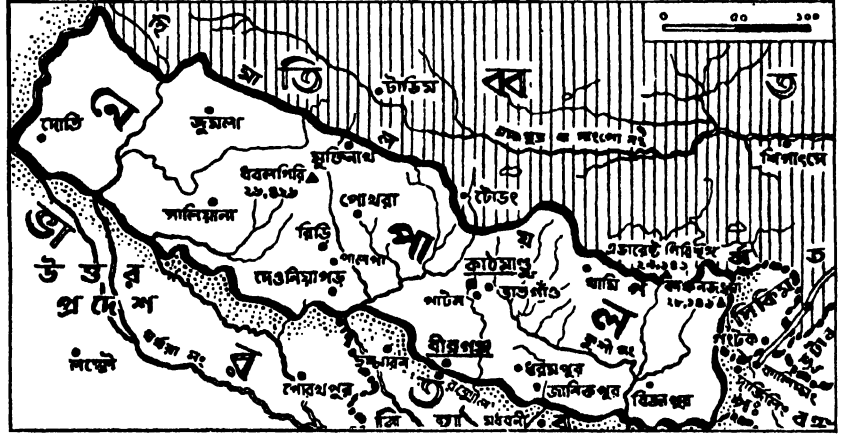
এলাহাবাদে যে অশোকস্তম্ভ আছে সেই শিলালিপি থেকে জানতে পারা যায় যে, নেপাল ছিল সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের অধীনস্থ এক করদ-রাজ্য। রাজপুতানায় হরিসিংহদেব নামে এক রাজপুত রাজা ছিলেন। ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে তোগলক শাহ কর্ত্তৃক তিনি পরাজিত হন। পরাজিত হরিসিংহদেব নেপালে গিয়ে মল্লরাজাকে পরাজিত করে এক শক্তিশালী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। গুর্খারাজ হরিসিংহদেবকে পুনরায় পরাজিত করলেন। পৃথ্বীনারায়ণ শাহ ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র দেশ জয় করে গুর্খা রাজ্য স্থাপন করেন। বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ তাঁরই বংশধর। তাঁর বয়স ৪৫ বৎসর এবং তিনি

পিতার মৃত্যুর পর ১৯১১ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মুসলমান অত্যাচারের হাত হতে রক্ষা পাবার জন্ত মেবারের শিশোদীর বংশের রাণারা নেপালে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরা জাতিতে রাজপুত। বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী এই রাণা বংশসম্ভূত। জং বাহাদুর (১৮৪৬-৭৭) ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী। তিনিই প্রকৃতপক্ষে দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা হন। পরে তাঁর ভাই রণোদীপ সিং তাঁর পদ লাভ করেন; কিন্তু তিনি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নিহত হন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র তার পর প্রধান মন্ত্রী হলেন। বীর সামসেরের পর দেব সামসের এই পদ লাভ করলেন। কিন্তু তিনি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে পদচ্যুত হন। তাঁর ভাই মহারাজা চন্দ্র তাঁর পর প্রধান মন্ত্রী হন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর ভ্রাতা ভীম সামসের এই পদে নিয়োজিত হলেন। দু' বৎসর পরে তাঁর কনিষ্ঠ ভাই যোধা সামসের জং বাহাদুর রাণা প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। পদ্ম সামসের জং বাহাদুর ছিলেন পরবর্ত্তী প্রধান মন্ত্রী। তিনি গত বৎসর জুন মাসে ৬৬ বৎসর বয়সে বিশ্রাম গ্রহণ করে রাঁচিতে অবশিষ্ট জীবন যাপন করছেন। তাঁর ভাই মহারাজ মোহন সামসের জং বাহাদুর রাণা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। তিনি ছিলেন নেপাল রাজ্যের প্রধান সেনাপতি।

নেপালের শাসনতন্ত্র বিচিত্র। নেপালের রাজা নেপালের রাজপদে বংশানুক্রমে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর উপাধি মহারাজ-অধিরাজ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, রাজ্যশাসন কার্য্যে তাঁর কোন হাত নেই—তিনি সম্পূর্ণ শক্তিহীন। তিনি তাঁর রাজ্যে স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের এক জন নীরব দর্শক মাত্র। জাপানের মত তিনি নেপালে প্রায় দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত। তিনি কোন প্রকাশ্য স্থানে উপস্থিত হলে নেপালের নরনারী তাঁকে দেবতার সম্মান দিয়ে থাকে। এর একটা দৃষ্টান্ত এই, প্রতি বৎসর দশহরার রাত্রে রাজা তাঁর প্রাসাদের বারান্দা হতে সমবেত জনতার দিকে যব ছড়িয়ে দেন। সকলে সেই যব এক-একটি করে অতি যত্নসহকারে সংগ্রহ করে রাখে। তাদের বিশ্বাস যে, সেই যবের সাহায্যে সকল আধি-ব্যাধি দূর হয়। রাজার প্রতি নেপালবাসীর ভক্তি এতই প্রবল।

নেপালরাজ কখনও নেপালের বাইরে যান না। চার শতাব্দী ধরে এই প্রথা ছিল। বর্ত্তমান মহারাজা এই নিয়ম প্রথম লঙ্ঘন করেছেন। ১৯৪৪ সালে তিনি হৃদরোগের চিকিৎসার জন্ত এক বার ভারতবর্ষে এসেছিলেন। আর দ্বিতীয় বার এসেছিলেন ১৯৪৭ সালে পুরীতে রথযাত্রা দেখবার জন্ত।

মহারাজা অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী শাসনকার্য্যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পরিচালনা করলেও আধিপত্য-মর্য্যাদা তিনি কখনও লাভ করেন নি। নেপালী শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রধান মন্ত্রী হলেন

নেপালের মহারাজ-অধিরাজ

'তিন সরকার' এবং মহারাজ-অধিরাজ হলেন 'পঞ্চ সরকার' অর্থাৎ সর্ব্বাধিনায়ক। ১৮৪৬ সালে নেপালের তৎকালীন মহারাজ-অধিরাজ পাঞ্জাপত্র দ্বারা প্রধান মন্ত্রী জঙ্গ বাহাদুর রাণার পরিবারকে পুরুষানুক্রমিক ভাবে প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভের যে অধিকার দিয়েছেন তাতে মহারাজার ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় নি।

রাজ্যের প্রকৃত শক্তি নিহিত আছে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর হাতে। তাঁর উপাধি মহারাজা। তাঁর শক্তি অসীম; তিনিই রাজ্যের স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্ত্তা। অধিকাংশ জমিও তাঁদের আত্মীয়স্বজনের। তাঁর এক নামমাত্র মন্ত্রিসভা আছে। সৈন্তদলের কর্তৃত্বভারও তাঁরই উপর। তিনিই সর্ব্বোচ্চ আদালতের বিচার-কর্ত্তা। তিনি আইন সভারও সর্ব্বময় কর্ত্তা। এক কথায় তিনিই নেপালের সর্ব্বেসর্ব্বা। তাঁর আদেশ ব্যতীত নেপালে কারও কিছু করবার ক্ষমতা নেই। এমন কি, বর্ত্তমান আইনে তাঁর কাজের সমালোচনা করাও দণ্ডনীয়।

বিদায়ী প্রধান মন্ত্রীর বংশের প্রধানতম ব্যক্তিই প্রধান মন্ত্রী হয়ে থাকেন।

গত ২৪শে অক্টোবর মহারাজা (প্রধান মন্ত্রী) নেপাল আইন সভার উদ্বোধন করেন। সেই সময় তিনি এই ঘোষণা করেন যে, গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের দুই জনকে মন্ত্রিমণ্ডলীতে গ্রহণ করা হইবে। মহারাজা যে শাসন-সংস্কারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনা করেন নেপালের জনসাধারণ সেই শাসন-সংস্কারকে রাণাতন্ত্রের একটা প্রকার-ভেদ বলে মনে করে। নেপালী কংগ্রেস একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। তাদের লক্ষ্য হ'ল মহারাজ-অধিরাজকে যথার্থ নিয়মতান্ত্রিক রাজা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে, জন-সাধারণের নির্ব্বাচিত পরিষদের দ্বারা নেপালের শাসন-ব্যবস্থার পরিচালনা করা।

নেপালের রাজ্য শাসনের ভার প্রধান মন্ত্রীর স্বজনের হস্তে আছে, তাঁদের ঐশ্বর্য্য অপরিমিত। আজিও যখন স্বাধীনতা লাভের জন্য এশিয়ার সকল দেশ আত্মসচেতন হয়ে উঠছে, তখনও তাঁদের কর্ত্তৃত্ব একটুও ছাড়েন নি। আধুনিক কালের গণতন্ত্রের সম্বন্ধে তাঁদের কোন ধারণা নেই। তবে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁরা অত্যন্ত ভদ্র ও নম্র। তাদের চরিত্রে ছলনা ও চাতুরীর স্থান নেই। সুতরাং তাঁদের সরল ও অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হয়।

নেপালের সাধারণ অধিবাসীদের মধ্যে ব্রাহ্মণই প্রধান; তার পর গুর্খা, নেওয়ার, মগর অথবা গুরুং এবং লেপচা। ব্রাহ্মণেরাই স্বভাবতঃ সমাজের মধ্যে উন্নত ও শীর্ষস্থানীয়। সকলেই ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধাভক্তি করে; এমন কি নেপালে কোন ব্রাহ্মণের ফাঁসি হয় না।

তার পরই হ'ল গুর্খা। তারা সৈনিক; সৈনিকের সম্মান তারা পেয়ে থাকে। নেপালে একটা প্রচলিত কথা আছে—তার অর্থ হ'ল কাপুরুষতার চেয়ে মৃত্যুও বরণীয়। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যে পালিয়ে যায় সে নিজ সমাজে আর স্থান পায় না। এমন কি, তার স্ত্রীও আর তার সঙ্গে একত্রে আহার করে না। বীরত্বের আদর্শ তাদের নিকট এতই উচ্চ ও সম্মানিত। খুকুরী তাদের জাতীয় অস্ত্র। শিখদের কৃপাণের মত খুকুরী সব সময়ে গুর্খাদের সঙ্গে থাকে।

তার পর নেওয়ার জাতি। তারা হ'ল নেপালের আদিম অধিবাসী। গুর্খারাই তাদের জয় করে। নেওয়ারগণ সকলের সঙ্গে মেশে, খুব সামাজিক তাদের ব্যবহার। খুব বড় বাড়ীতে সকলের সঙ্গে একত্রে তারা বাস করে। গল্পে, গানে ও হাসিতে তাদের প্রাণের আনন্দ প্রকাশ পায়। কোন পর্ব্বতের উপত্যকায়, কোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পরম রমণীয় পরিবেশের মধ্যে, কোন নদীর তীরে অথবা কোন প্রাচীন মন্দিরে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তারা চড়ইভাতি করতে যায়। আনন্দই তাদের জীবন, এই আনন্দেই তাদের জীবনের অভিব্যক্তি। তাতে যদি তারা একটু উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে, শালীনতার সীমা অতিক্রম করে ফেলে, তাকে তারা দোষের

নেপালের প্রধান মন্ত্রী মহারাজা মোহন সামসের জং বাহাদুর

মনে করে না। তাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। প্রত্যেক নেওয়ার মেয়ের প্রথম একটি গাছের সঙ্গে বিয়ে হয়। সেই গাছটিকে পরে জলে ফেলে দেয়। বিবাহিত স্বামীর অবর্ত্তমানে সেই মেয়েটির কোন স্বজাতি অথবা উচ্চতর জাতির লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়। নেওয়ার মেয়েরা কখনও বিধবা হয় না, কারণ তার স্বামীর মৃত্যু নেই, বিবাহের পর সে অনায়াসে তার স্বামীকে পরিত্যাগ করতে পারে। নেওয়ার স্ত্রী অনায়াসে বিছানার ওপর দুটি সুপারি রেখে, তার স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে পারে। এতে তাদের কোন অপমান বা কলঙ্ক হয় না। তবে নেওয়ারীদের শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই সব সামাজিক প্রথা দ্রুত অন্তর্হিত হয়ে আসছে।

নেপালে স্বাধীনভাবে শাসনতন্ত্রের সমালোচনা করবার অধিকার কারও নেই, করলে তার দণ্ড হয়। কোন সভা-সমিতি করলেও দণ্ডনীয় হতে হয়। সাধারণে দলবদ্ধভাবে কোন সভাসমিতি গঠন করতে পারে না।

১৮৪৬ সালে রাণাবংশের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে মহারাজ-অধিরাজের এক সর্ত্ত হয়। তাতে লিপিবদ্ধ আছে যে, রাজ্যশাসনে রাজার কোন অধিকার থাকবে না বা তিনি রাজ্যের কোন কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। তিনি শুধু নামমাত্র রাজা থাকবেন। সমস্ত রাজশক্তি, সেই দলিল অনুসারে, এক শতাব্দীর অধিককাল যাবৎ প্রধান মন্ত্রী বংশ-পরম্পরায় পরিচালনা করে আসছেন।

এক শতাব্দীর অধিককাল থেকে নেপালের কাঠমাণ্ডু, পাটান ও ভাতগাওন শহরে চার জনের অধিক লোক একত্রে পথে ঘাটে চলাফেরা করতে পারে না। রাত্রি ন'টা থেকে ভোর ছ'টা পর্য্যন্ত লোকে বাড়ীর বার হলে দণ্ডিত হয়। নেপালে কোন ব্যক্তিস্বাধীনতা নেই; সাধারণ নগরবাসীর কোন অধিকার নেই। দেশে কোন আইন-সভা নেই, আছে শুধু স্বেচ্ছাচার শাসনের চূড়ান্ত নিদর্শন। বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর দৃষ্টির অন্তরালে স্বাধীন নেপালের অগণিত নরনারী এই স্বেচ্ছাচার শাসন সহ্য করছে। স্বাধীন নেপালের এই অত্যাচারের মুখোস খুলে দেবার দিন এসেছে।

নেপাল উপত্যকা

প্রজাসাধারণের প্রতি নেপালের রাজার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। তিনি এই স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের অত্যন্ত বিপক্ষ। কিন্তু কোন অধিকারই তাঁর হাতে নেই। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তিনি এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন বলে শোনা যায়। এক দিন দেশের কতকগুলি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে স্থির করেন যে, প্রধান মন্ত্রীকে তাঁর প্রাসাদে অতর্কিতে অবরুদ্ধ করে রেখে, রাজাকে দিয়ে দেশে গণতন্ত্র শাসনব্যবস্থা ঘোষণা করাবেন। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে রাজা এই বিষয়ে এক অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন এরূপও শোনা গিয়েছিল। কিন্তু এই ষড়যন্ত্র নিষ্ফল হয় এবং এর ফলে দু'জনের ফাঁসি হয় ও দু'জনকে গুলি করে মারা হয়। যে দু'জনের ফাঁসি হয়, তাদের মৃতদেহ চব্বিশ ঘণ্টা ধরে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে এক সাধারণ স্থানে টাঙিয়ে রাখা হয়—প্রধান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার ভয়াবহ পরিণাম সকলকে দেখাবার জন্ত। এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত কয়েক ব্যক্তি সেই সময় (১৯৪০ সালে) নেপাল থেকে ভারতে পালিয়ে আসেন। তাঁরা আর কখনও দেশে ফেরেন নি। কিন্তু ভারতবর্ষে থেকেই তাঁরা নেপালে প্রচারকার্য্য চালিয়ে আসছেন।

নেপাল জাতীয় কংগ্রেস বেআইনী প্রতিষ্ঠান। নূতন দিল্লী হতে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ পরিচালিত হয়ে আসছে। বহু নির্যাতিত কংগ্রেসকর্ম্মী নেপালের কঠোর কারাপ্রাচীরের অন্তরালে পরাধীনতার গ্লানি ভোগ করছেন। তাঁদের হৃদয়ে বিপুল বিপ্লবের প্রেরণা, নব-জীবনের প্রবাহ। তাদের অন্তরে দৃঢ়তা, চক্ষে অনলবর্ষী দৃষ্টি, মুখে অগ্নিজ্বালাময়ী বাণী। তাদের প্রতি এই অত্যাচার, অবিচার ও নির্যাতনের করুণ কাহিনী আজ দেশবাসীকে উদ্বেলিত করে তুলেছে।

মহারাজা মোহন সামসের জং বাহাদুর রাণা গত বৎসর জুন মাসে যেদিন প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন তার পূর্ব্বদিন কয়েকজন সাধারণ কয়েদীকে মুক্তি দিয়ে ঘোষণা করা হ'ল যে, রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হ'ল। কিন্তু প্রকৃত দেশপ্রেমিক রাজবন্দীদের একটিকেও মুক্তি দেওয়া হয় নি। প্রধান মন্ত্রী শাসনভার গ্রহণ উৎসব উপলক্ষে দু'ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতায় এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন। দেশে প্রচুর বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন, শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার প্রভৃতি এই পরিকল্পনার অন্তর্গত। এই নির্দ্ধারিত দিন থেকে নেপালে ব্যক্তি-স্বাধীনতা দেওয়া হবে একথাও ঘোষিত হয়েছিল। কংগ্রেস-কর্ম্মীগণ ঐদিন দলে দলে সভায় যোগ দিয়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রকৃত রূপের পরীক্ষা করবার জন্ত প্রস্তুত হয়েছিল। সম্প্রতি গত ৬ই নবেম্বর নেপাল থেকে এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ এসেছে। তাতে জানা গেছে যে, ঐ দিন প্রাতে নেপালের মহারাজ-অধিরাজ তাঁর দুই পুত্র ও পরিবারের পনর জনকে নিয়ে চড়ুইভাতি করতে বার হন। নেপালের কাঠমাণ্ডুস্থিত ভারতীয় দূতাবাস 'শীতল-নিবাসে'র নিকট পৌঁছলে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

নেপালের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক এবং শাসনতন্ত্রগত সমস্যাকে কেন্দ্র করেই যে বিরোধ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নেপালী শাসন-ব্যবস্থার পুরাতন ঐতিহ্য এবং বৈশিষ্ট্য, মহারাজার অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতার সীমা, মহারাজ-অধিরাজের মর্য্যাদা ও অধিকারের সংজ্ঞা, প্রজাসাধারণের পক্ষ থেকে উত্থাপিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দাবি এবং সেই সঙ্গে নেপালী কংগ্রেসের উদ্যোগে গণ-আন্দোলন—এই সকল বিষয় একসঙ্গে মিলেই এই বিরোধের পটভূমিকা রচনা করেছে।

রাণা-শাসনের প্রতিকারের জন্য নেপালে ১৯৩০ সাল থেকে আন্দোলন চলছে। সেই সময় খড়্গমান সিংহ এবং তাঁর সহকর্ম্মীদের হাতকড়া দিয়ে কারাগারে প্রেরণ করা হ'ল। তখন থেকে তাঁরা কারারুদ্ধ হয়ে আছেন। ১৯৪১ সালে গঙ্গালাল এবং দশরথচন্দ্রকে গুলি করে হত্যা করা হ'ল, ধর্ম্মভক্তকে ফাঁসি দেওয়া হ'ল, শঙ্করপ্রসাদ, চুদাপ্রসাদ এবং অপর বহু লোককে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করা হ'ল। তখন এই আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই আন্দোলন দেশের জনসাধারণের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল। আন্দোলনের উদ্দেশ্য স্বৈর-শাসনের অবসান ঘটিয়ে নেপালে দায়িত্বশীল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এবং দেশের শাসন-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে দেশবাসী জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার-প্রতিষ্ঠা। এই আন্দোলন বন্ধ করবার জন্য শাসকবর্গ নেপালে যে দমননীতি চালিয়েছেন, যে প্রকার জেল, জরিমানা ও দণ্ড প্রয়োগ করেছেন তা মহারাজ-অধিরাজের অভিপ্রেত ছিল না। তিনি প্রজা-সাধারণের ন্যায়সঙ্গত দাবিদাওয়ার সমর্থকই ছিলেন—একথা কয়েকজন নেতৃস্থানীয় নেপালীর বিবৃতি থেকে জানা যায়। তাই মনে হয় মন্ত্রীসভার সর্ব্বময় শাসনকর্তৃত্ব খর্ব্ব করে, প্রজা-আন্দোলনের পক্ষ অবলম্বন করেছেন বলে রাজা ও প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে এবং তারই পরিণামে আজ রাজাকে সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়েছে।

চন্দ্রগিরি গিরিসঙ্কট হইতে চিৎলাং উপত্যকার দৃশ্য

কিছুকাল পূর্ব্বে ভারত-সরকার নেপালস্থিত রাজনীতিক আন্দোলনের সম্ভাবিত পরিণতি চিন্তা করে সেখানে দ্রুত শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের জন্য পরামর্শ দেন। তদনুসারে কতকটা শাসন-সংস্কারও প্রবর্ত্তিত হয়েছিল, কিন্তু তা জনসাধারণের দাবির অনুপাতে মোটেই সন্তোষজনক হয় নি। নেপালে এই আন্দোলন এর পরও সমভাবেই চলছে। ভারতে স্থিত নেপাল জাতীয় কংগ্রেসের নেতা শ্রীযুক্ত মাতৃকাপ্রসাদ কৈরালা একটি সাম্প্রতিক বিবৃতিতে রাজার পদত্যাগকে প্রজা-আন্দোলনের অনুকূলে রাজার সুচিন্তিত সিদ্ধান্তরূপেই অভিহিত করেছেন।

নেপালের অধিপতি ত্রিভুবন বীরবিক্রম দেবকে ১১ই নবেম্বর অপরাহ্ণে নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু থেকে ভারত গবর্ণমেণ্ট বিমানে দিল্লীতে নিয়ে এসেছেন। সেই সঙ্গে দুই রাণী, জ্যেষ্ঠপুত্র প্রভৃতি আছেন। যে তিন বৎসর-বয়স্ক শিশু রাজপুত্রকে প্রধান মন্ত্রী সিংহাসনে স্থাপন করে নিজে সর্ব্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করাই স্থির করেছেন—তিনি মহারাজ-অধিরাজের জ্যেষ্ঠপুত্রের পুত্র। তাঁর নাম জ্ঞানেন্দ্র বীরবিক্রম শাহদেব।

ভারত-সরকারের নির্দ্দেশে নেপাল গবর্ণমেণ্ট রাজা ত্রিভুবন শাহ দেবকে ভারতে আসতে দিতে বাধ্য হন। তিনি দিল্লী এসে উপস্থিত হলে ভারতের প্রধান মন্ত্রী সদলবলে তাঁদের অভ্যর্থনা করেন।

নেপাল কংগ্রেসবাহিনী ইতিমধ্যে বীরগঞ্জ, সেমরা, আমলেখগঞ্জ প্রভৃতি শহর অধিকার করেছে। ত্রিমুখী অভিযান চালিয়ে নেপালের রাজধানী কাটমাণ্ডু অধিকার করবার চেষ্টা চলছে। নেপালের তৃতীয় শহর বিরাট নগরও এই কংগ্রেসবাহিনী অধিকার করেছে। আজ সমগ্র পৃথিবী নেপালের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছে।

বেকার-সমস্যা ও খাদ্যাভাব

শ্রীহলধর মিত্র

দ্বিতীয় বৎসর ষষ্ঠ সংখ্যা ফাল্গুন-চৈত্রের 'বসুন্ধরা'র "বেকার সমস্যা ও খাদ্যাভাব" শীর্ষক প্রবন্ধে আছে :

"সাত বন্ধু বেকার এবং শিক্ষিত, তাহাদের তিন জন বিবাহিত। তারা চাকুরির জন্ত নানাস্থানে দরখাস্ত করে, নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়ায় ; চাকুরি কিন্তু হয় না। নিরাশ হইয়া তাহারা ঠিক করিল, চাকুরির খোঁজে আর নয়—অন্নাভাব ঘুচাইবার সত্যকার পথের সন্ধানে এবার নামিতে হইবে। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাহারা কৃষিকার্য্যে নামিয়া পড়াই স্থির করিল। নিজেদের সোনারূপা বিক্রয় করিয়া, হাওলাত করিয়া এবং নানাপ্রকারে তাহারা ১০,০০০ টাকা জোগাড় করিল। কাজ সুরু হইয়া গেল। তাহাদের প্রাথমিক সম্বল চারিটি গাই—প্রতিদিন সকাল বিকালে পনরো-ষোল সের দুধ পাওয়া যায়। নিজেদের জন্ত পাঁচ সের রাখিয়া বাকি দুধ তাহারা বিক্রয় করে। তাহাতে গড়ে রোজ আট টাকা রোজগার হয়। জলতোলা ও ধানভানা কল আসিল। যখন জল তুলিবার দরকার হয় না তখন ঐ কল দিয়া ধান ভানিয়া কিছু রোজগার হইতে লাগিল। ছয় ঘণ্টাতে গড়ে চব্বিশ মণ ধান ভানিয়া আঠারো টাকা মুনাফা আসিতে লাগিল। এ দিকে ঐ পঞ্চাশ বিঘা জমি নিম্নলিখিত ভাবে চাষের জন্ত তৈয়ারি করা হইল :

(১) আলু ১০ বিঘা (২) লঙ্কা ১০ বিঘা (৩) পালং ১ বিঘা (৪) বেগুন ২৷ বিঘা (৫) বিলাতী বিগুন ২৷ বিঘা (৬) রাঙা আলু ৫ বিঘা (৭) মুলা ১ বিঘা (৮) পেঁয়াজ ৪ বিঘা (৯) গম ১০ বিঘা (১০) কপি ১ বিঘা (১১) সরিষা মটর ২ বিঘা (১২) বীজক্ষেত্র ১ বিঘা।

কর্ম্মীদলের মধ্যে নূতন উত্তম আর আশার আলো জাগিয়া উঠিল। ভোর চারিটায় উঠিয়া তাহারা কোদাল নিয়ে জমিতে যায়, জমি তাড়াই আরম্ভ করে দেয় ; আর তিনটি বধূ ভোরে উঠিয়া গাই-এর দুধ দুহিয়া, গরুগুলিকে আহার দিয়া, নিজেদের আহারের ব্যবস্থা সারিয়া তাহার পর মাঠে যায়, যথাসাধ্য সাহায্য করে পুরুষদের কাজে। পৌষ, মাঘ, ফাল্গুনের মধ্যে প্রথম ফসল তোলা হইল। ফসল ফলিল নিরূপণ।

শস্ত	পরিমাণ মণ	মূল্য টাকা	খরচ টাকা	মুনাফা টাকা
১। আলু	৬০০	৬,০০০	২,০০০	৪,০০০
২। লঙ্কা	৬০০	১২,০০০	১,০০০	১১,০০০
৩। পালং		৪৫০	৫০	৪০০
৪। বেগুন	২৫০	১২,৫০	২৫০	১০০০
৫। বিলাতী বেগুন	২৫০	১,২৫০	২৫০	১,০০০
৬। রাঙা আলু	৫০০	২,৫০০	৫০০	২,০০০
৭। মুলা		৫০০	৫০	৪৫০
৮। পেঁয়াজ	১৬০	৮০০	১৫০	৬৫০
৯। গম	৬০	১২০০	২০০	১,০০০
১০। কপি	৪০	৪০০	১০০	৩০০
১১। সরিষা মটর	১২	২৫০	৫০	২০০
				২২,০০০৲

বৎসরের প্রথম চাষে তাহাদের মুনাফা হইল বাইশ হাজার টাকা। তাহারা এক বৎসরের মধ্যে চারিটি ফসল ফলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

এই ভাবে বৎসরের দ্বিতীয় চাষে তাহাদের ১৩,৪০০৲ টাকা এবং তৃতীয় ও চতুর্থ চাষে ১৫,৬০০৲ টাকা আয় হইল। এই ভাবে এক বৎসরে ৫০ বিঘা জমিতে ৫১,০০০৲ টাকা আয় হইল। এদিকে গরুর দুধ হইতে যে ২৪০৲ টাকা মাসিক আয় হইতে লাগিল, তাহা দিয়া প্রতি মাসে একটি করিয়া নূতন গাভী ক্রয় করা হইতে লাগিল। এখন এই দশ বন্ধুর আর বেকারের সমস্যা নাই, খাদ্যাভাবও নাই।"

উপরের চিত্রটি খুবই মনোরম এবং বিরল। ৫০ বিঘা জমি হইতে এক বৎসরে ৫১,০০০ টাকা নিট্ লাভ, তবুও বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় চাষে ব্রতী হইতেছেন না কেন ?

সরকারী কৃষিক্ষেত্রের এইরূপ হিসাব-নিকাশ আমরা কোন দিন পাই নাই, আর পাইলেও উহা এত বেশী লোভনীয় হইবে না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

"বসুন্ধরা" পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি, পশুপালন ও মৎস্য-চাষ বিভাগের মুখপত্র ; সুতরাং কৃষি ও খাদ্য-সচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় প্রবন্ধটি নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন, এবং এই দশ জন কর্ম্মীর কর্ম্মস্থল (মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানা) পরিদর্শন করিয়াছেন। তবে তিনি অধিকতর খাদ্য উৎপাদনে হতাশ হইতেছেন কেন ? গড়বেতাই কৃষি বিভাগের কর্মচারিগণের শিক্ষাক্ষেত্র হওয়া উচিত।

পশ্চিমবাংলার গবাদির খাদ্যসমস্যা

শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়

অবিভক্ত বাংলাদেশে গো-মহিষের সংখ্যা ২২৬ লক্ষের কিছু অধিক ছিল। উত্তরপ্রদেশ ব্যতীত ভারতের অন্য কোনও প্রদেশে এত অধিকসংখ্যক গো-মহিষ ছিল না। বর্ত্তমান পশ্চিমবাংলার গো-মহিষের সংখ্যা প্রায় ৮৭ লক্ষ।

উত্তরপ্রদেশে দুগ্ধ ও ঘৃত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সেখান হইতে দুগ্ধজাত পদার্থ ও গো-মহিষাদি আমাদের দেশে রপ্তানী হয়। আমাদের দেশের গরু সাধারণতঃ ঐ পরিমাণে দুগ্ধ উৎপাদন করিতে পারে না; অথচ গো-মহিষের তত্ত্বাবধান ও খাদ্যাদির খরচও নানা কারণে বেশী হয়।

বাংলাদেশের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, এখানে যেসব খাদ্যবস্তু উৎপন্ন হয় তাহা মানুষ ও পশু উভয়েরই পক্ষে মাথাগুন্তি হিসাবে কম, উহাদের পুষ্টিগুণও অল্প।

বাংলাদেশে গো-খাদ্যোপযোগী সবুজ বা কাঁচা শস্যের (Green fodder) চাষ নামমাত্র হয়। প্রধানতঃ আবাদী ধানের খড়ের উপরই তাহাদের নির্ভর। ইহা শস্যের পরিত্যক্ত অংশ মাত্র। পশ্চিম-বাংলায় ২৮০ লক্ষ বিঘা ধান-জমিতে ইহা উৎপন্ন হয়। তাহার খানিকটা ঘর ছাওয়া প্রভৃতি অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়। তাহা যদি না-ও হইত তাহা হইলেও মাথাগুন্তি হিসাবে ইহা এতই অপ্রচুর যে, শুধু পরিণতবয়স্ক গরুর জন্য ব্যবহৃত হইলেও মাথাপিছু আড়াই সের হইতে তিন সেরের অধিক পড়ে না; এত অল্প পরিমাণ খাদ্য উদরপূর্ত্তির জন্য যথেষ্ট নহে। তারপর অল্পবয়স্ক গরু, বাছুর, ঘোড়া, ছাগল প্রভৃতি অন্য জন্তুর প্রয়োজন ত আছেই।

খড়ের মধ্যে পুষ্টিমূলক উপাদানও অল্পই থাকে। উত্তাপ বা তেজ (energy) সরবরাহ ব্যতীত ইহার কার্য্যকারিতাও বেশী নয়। আবার যে পরিমাণে পাইলে যথোপযুক্ত তেজ সরবরাহ হইতে পারে তাহা বেশীরভাগ গরুর ভাগ্যে জুটিয়া উঠে না।

পৃথিবীর অগ্রগামী দেশগুলিতে গোজাতির উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ প্রদান করা হয়। কিন্তু তাহার তুলনায় ভারতবর্ষে যৎসামান্যই হয়। আবার ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে যতটুকু মনোযোগ দেওয়া হয় বাংলাদেশে তাহা অপেক্ষাও কম হয়। ইহার ফলে বাংলার মানুষ ও গবাদি পশুর কর্ম্মক্ষমতা কি পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে নিম্নের চিত্রে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে।

এই চিত্র হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, বাংলাদেশে একজন মানুষ এক জোড়া বলদ দ্বারা ৫·৬ একর বা ১৬৮ বিঘা জমি চাষ করে; কিন্তু বোম্বাই প্রদেশে এইরূপ অবস্থায়
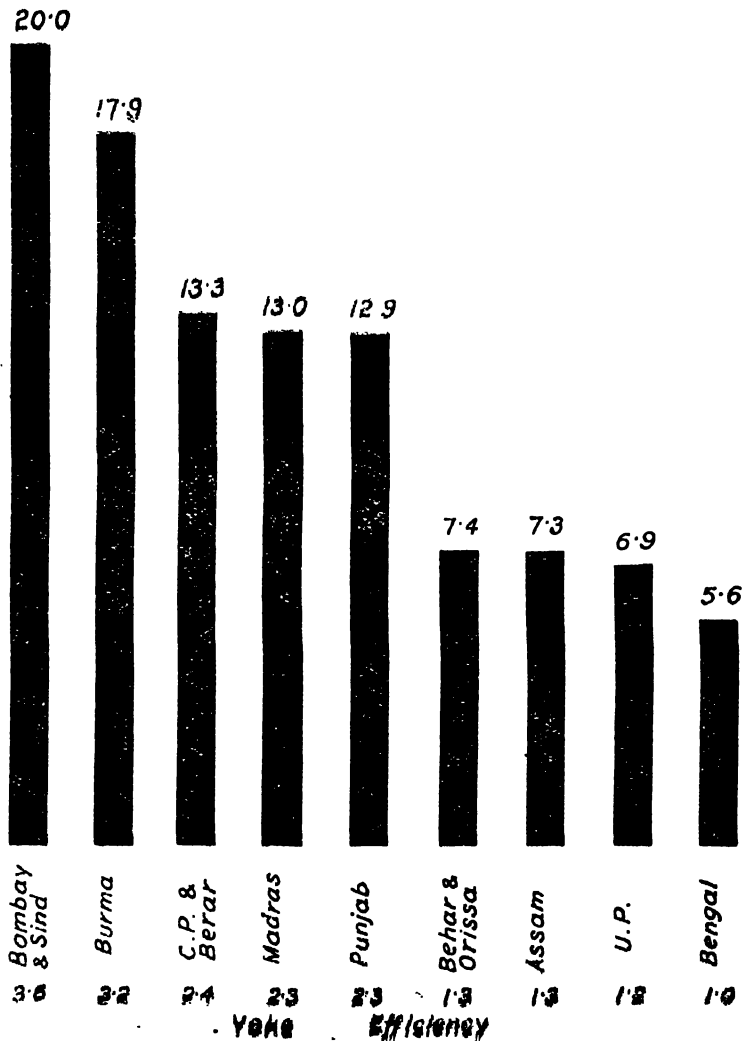
তাহারা ৬০ বিঘা জমি চাষ করে। অর্থাৎ সেখানকার গো-জাতির কার্য্যক্ষমতা বাংলাদেশের তুলনায় ৩'৬ গুণ বেশী। এইরূপ প্রভেদের নানা কারণ আছে, তাহার মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

আমরা সকলেই জানি, যে গরু যত বড় তাহার খাদ্যের প্রয়োজন তত বেশী, অর্থাৎ আয়তন ও ওজন অনুপাতে গরুর খোরাক কম বা বেশী হয়। ইহা কিন্তু আংশিক সত্য। প্রথমতঃ একটা বড় গরু যে পরিমাণ খাইবে, তার অর্দ্ধেক ওজনের একটা ছোট গরুর খোরাক ঠিক তার অর্দ্ধেক হয় না বরং কিছু বেশীই হয়। সমানুপাতিক হিসাবে ইহা যতখানি বেশী হয় তাহা উপেক্ষা করিবার মত নহে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যতখানি খাদ্যে পাঁচটি ১২ মণ ওজনের গরুর খোরাক মিটিবে তাহাতে দশটি ৬ মণ ওজনের গরুর খোরাক মিটিবে না; আটটি গরুতেই তার প্রায় সমস্ত খাইয়া ফেলিবে। সেইজন্য সমানুপাতে ছোট গরু অপেক্ষা বড় গরুর খোরাক কম লাগে। অথচ পর্য্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের খরচ মাথাগুনতি হিসাবে উভয়ের জন্য একই রকম হয় বলিয়া বড় গরুই স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ।

গবাদির খাদ্য

গরুর খাদ্যসম্ভারকে তিন-চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, খড়জাতীয় মোটা বিচালি; দ্বিতীয়তঃ, কাঁচা ঘাস ও সবুজ শস্য, শাঁসালো গুল্ম (succulant fodder), মূল বা শিকড়জাত শস্য (root fodder), যথা—গাজর, শালগম, লাল আলু প্রভৃতি; তৃতীয়তঃ, ঘনতাপূর্ণ বা পুষ্টিকর খাদ্য (Concentrates), যথা—সরিষা, তিসি, তিল, চিনাবাদাম প্রভৃতির খইল, গমের চাকল, চালের কুঁড়ার অবিকৃত অংশ প্রভৃতি। ইহার মধ্যে কতকগুলি খাদ্য মাঝামাঝি রকমের পুষ্টিকর।

খাদ্য হইতে পুষ্টি আহরণ ও সংরক্ষণ

খাদ্যের পুষ্টিকারিতা সুষম করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে-কার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির এক-একটির সমষ্টি কতখানি ও তাহাদের কার্য্যকরী বা পরিপাচ্য ভাগ কি অনুপাতে আছে তাহা নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। এই জাতীয় পরীক্ষা জটিল ও আয়াসসাধ্য। ইহার জন্য গরুর শারীরিক অবস্থা ও ওজন হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার খাদ্য, খাদ্যাবশিষ্ট, গোবর, চোনা, দুগ্ধ প্রভৃতি অতি সাবধানে বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করিতে হয়। এই বিভিন্ন দ্রব্যের অভ্যন্তরস্থ সার-উপাদানগুলির পরিমাণ রাসায়নিক উপায়ে নির্ণয় করিয়া জমা-খরচের মত খতাইয়া গুণাগুণ সাব্যস্ত করিতে হয়।

লেখক যখন অবিভক্ত বাংলার পশুখাদ্য-তত্ত্ববিদের কাজে নিযুক্ত ছিলেন তখন তিনি এ দেশের গো-জাতির কয়টি মূল খাদ্য একত্রে ও স্বতন্ত্রভাবে খাওয়াইয়া কিরূপ ফল পাওয়া যায় নানাভাবে তাহার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। মাত্র দুইটি পরীক্ষার ফলাফল নিম্নের দুইটি হিসাবে প্রদর্শিত হইল:

১নং হিসাব

অমিশ্র বা কেবলমাত্র আমন ধানের খড় খাওয়াইবার ফলাফল

(সংখ্যাগুলি তুলনামূলক করিবার জন্য একটি ৬। মণ গরুর সমান ওজনে সঙ্কলিত।)

বিবরণ	টাটকা অংশ		শুকনা অংশ		প্রোটিনের অংশ	চুনের অংশ	ফস্ফরাসের অংশ	বলদের আসল ওজন (১২৬ দিনে)		
								প্রারম্ভে	পরীক্ষার শেষ	ক্ষতিবৃদ্ধি + −
	সের	ছটাক	সের	ছটাক	তোলা	তোলা	তোলা	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
খড়ের ভুক্তাংশ হইতে গ্রহণ	৪	০	৩	।/১২	৮।/১৬	১৶১১	।৶৮			
গোবর বা অপাচ্য অংশ	৮	০	২	।/	১১।/২।	১।৬	।/১২			
অবশিষ্ট বা পরিপাচ্য অংশ			১	৫১২	−২৸৶৬।	−।/১৪	−৶৪	৩৯০	৩১২	−৬৮
শতকরা হারে পরিপাচ্য অংশ °/.			২৮৯°/.		—	—	—			
চোনা ও চোনা সংযোগে অপসরণ					৩।৶১।	৫৭	৫৩			
মোট ক্ষতিবৃদ্ধি					−৬।/৮	−।৶২	−৶৭			

এই হিসাবের বলদটিকে একাদিক্রমে ১২৬ দিন কেবলমাত্র ধানের খড় খাওয়াইয়া রাখা হইয়াছিল।

এখন এই হিসাবটি প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে, যদি গরুকে কেবলমাত্র খড় খাওয়াইয়া রাখা হয় তাহা হইলে তাহার শরীরে প্রোটিন (মাংসপেশীর মূল উপাদান) ও অস্থিসংলগ্ন চুণ এবং ফস্‌ফরাস্ (হাড়ের মূল উপাদান) যে পরিমাণে খাদ্যের সহিত গৃহীত হয় তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে গোবর ও চোনার সঙ্গে নিঃসারিত হয়। ফলে গরুর ক্ষয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যে গরুটি লইয়া এই পরীক্ষা হইয়াছিল তাহার ওজন পরীক্ষার প্রারম্ভে ৩৯০ পাউণ্ড ছিল। ১২৬ দিন একাদিক্রমে কেবলমাত্র খড় খাওয়াইবার ফলে তাহার ওজন হ্রাস পাইতে পাইতে ৩১২ পাউণ্ডে নামিয়া আসিয়াছিল; অর্থাৎ চার মাস ছয় দিনে তাহার ওজন প্রায় ৩৪ সের কমিয়া যায়।

উপরের হিসাব হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, খড়ের নিরেট বা শুষ্ক অংশ হইতে গরুটি মাত্র ২৯·৯% ভাগ পরিপাক করিতে পারিয়াছিল, অর্থাৎ খাদ্যের শতকরা ৭০ ভাগ অজীর্ণ অবস্থায় গোবরের সহিত বিনষ্ট হইয়াছিল। এরূপ অত্যধিক অপচয়ের একমাত্র কারণ এই যে, অমিশ্র খড় অত্যন্ত অসম ও অপূর্ণ খাদ্য। অথচ এই খড়ের সহিত খইলজাতীয় খাদ্যের সংমিশ্রণ করিয়া দিলে এই পরিপাকের অংশ শতকরা ৩০ ভাগের স্থলে ৪৫ হইতে ৫০ ভাগ অবধি বৃদ্ধি পায় এবং অতি প্রয়োজনীয় প্রোটিন, চুণ ও ফস্‌ফরাস্ এইরূপ ভয়াবহভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত না হইয়া শরীর গঠন ও পুষ্টিসাধন কার্য্যে সম্পূর্ণ নিয়োজিত হয়। নিম্নের হিসাব হইতে ইহা পরিস্ফুট হইবে।

গরুকে একমাত্র খড় খাওয়াইবার পরিণাম কিরূপ ভয়াবহ এই দুইটি হিসাব হইতে তাহা সম্যক্ উপলব্ধি হইবে।

এখানে ইহাও বলা প্রয়োজন যে, প্রথম হিসাবে যে অমিশ্র খড় খাওয়াইবার ফলাফল দেখানো হইয়াছে তাহা এই জাতীয় যতগুলি পরীক্ষা করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে পুষ্টিক্ষয়ের একটি চূড়ান্ত ও শিক্ষাপ্রদ উদাহরণ। বস্তুতঃ সমস্ত ক্ষেত্রেই যে এই রকম হইবে তাহা নহে। কোন কোন খড় ইহা অপেক্ষা ভাল থাকে, আবার কোন কোন খড় অত্যন্ত খারাপ বা মধ্যম শ্রেণীর হয়। তা ছাড়া প্রায় সকল গরুই প্রত্যহ খড়ের সহিত কিছু-না-কিছু অন্য জাতীয় খাদ্য সংগ্রহ করিয়া লয়। সেইজন্য পরীক্ষার নিরবচ্ছিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে যে দোষ বা গুণ প্রতিফলিত হয়, দৈনন্দিন আংশিক মিশ্র খাদ্য সংযোগে ততখানি হয় না; কিন্তু পুষ্টিকর উপাদানের অপ্রাচুর্য্যবশতঃ ক্ষতির মাত্রা চলিতেই থাকে। ইহার একমাত্র প্রতিকার সমতাপূর্ণ খাদ্য সমন্বয়ে খড়ের ত্রুটি নিরাকরণ করা। খড়ের সহিত আংশিক পরিমাণেও খইল বা দানাজাতীয় খাদ্য দিলে তাহাদের পরিপাকশক্তি যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় এবং প্রোটিন, চুণ ও ফসফরাস যে পরিমাণে কার্য্যকরী হয় তাহার তুলনায় বাড়তি যেটুকু খরচ পড়ে তাহা অতি সামান্য।

খাদ্যের প্রক্রিয়া (Function of food): খাদ্য নানা ভাবে কার্য্য করে। ইহা পেটের গহ্বর ভরাইয়া একটা তৃপ্তির অবস্থা সৃষ্টি করে। শরীরের রক্ষণ সহজসাধ্য করে, তেজ (energy) সরবরাহ করে, প্রোটিন, স্নেহ-পদার্থ (oil and fat), শ্বেতসার প্রভৃতি জৈবিক ভেষজ ও চুণ, ফসফরাস প্রভৃতি খনিজ এবং অতি প্রয়োজনীয় ভাইটামিন সরবরাহ করে। মোট কথা, খাদ্য শরীরের সর্ব্বপ্রকার সংগঠন-কার্য্যে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করে। আর ঐ সকল উপাদানের আহরণ, বিতরণ ও সমন্বয় সুনিশ্চিত করিয়া পুষ্টির পথ সুগম, সরল ও

২নং হিসাব

সরিষার খইল ও আমন ধানের খড় খাওয়াইবার ফলাফল

(সংখ্যাগুলি একটি ৬। মণ গরুর সমানুপাতে সঙ্কলিত)

বিবরণ	টাটকা ওজন	শুকনা ওজন	প্রোটিনের অংশ	চুণের অংশ	ফস্‌ফরাসের অংশ	গরুর ওজন (৮৩ দিনে)		
	সের	সের	তোলা	তোলা	তোলা	প্রারম্ভে	পরীক্ষার শেষে	ক্ষতিবৃদ্ধি
						পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
খড়	৩।	৩/১০	৮৶৪	১৲১০	।/২৷			
সরিষার খইল	।৶	।/১০	১০৶১৭	।/১০	৸১৫			−
জল হইতে				/৫				+
লবণ হইতে	৲১১	৲১০		৲২।		৭২০	৭৫৩	+৩৩
সর্ব্বসমেত গ্রহণ		৩।৶১০	১৮।৶১	১।৶৭৷	১/১৭৷			
গোবর ও তৎসহ নিষ্ক্রান্ত		১৸০	৮॥/৬	১।/৫	১/৮৷			
অবশিষ্ট বা পরিপাচ্য অংশ		১৸৶১০	৯৸/১৫	৶২।	৲৯			
শতকরা হারে পরিপাক		৪৮·৭%						
চোনার সহিত নিষ্ক্রান্ত			৬।৶৭৷	/১২।	৫৬			
			+৩।৶৭৷	+৲১০	×৲৩			

মোট ক্ষতিবৃদ্ধি।+

নির্বিঘ্ন করে। খাদ্যোপযোগিতায় ধানের খড় অনেক ত্রুটিপূর্ণ হইলেও বাংলাদেশে ইহা গরুর প্রধান খাদ্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইহার অপূর্ণতা যাহাতে বিদূরিত হয় সেই দিকে আমাদের মনোযোগ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

বিবিধ ধানের খড় : বাংলাদেশে যে সব ধানের আবাদ হয় তাহার মধ্যে রোয়া আমন, বোনা আউশ ও রোয়া বোরো ধানের খড় লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, তাপ বা তেজ সরবরাহের দিক দিয়া এই তিন শ্রেণীর খড়ের গুণাগুণ প্রায় একই রকম। ইহাদের ভিতর মাংসপেশী নির্মাণোপযোগী প্রোটিন বা ছানাজাতীয় উপাদান অল্পই আছে। তবে ইহাদের মধ্যে বোরো ধানের খড়ে এই প্রোটিনের পরিমাণ বেশী আছে। বোরো ধানের খড় অপেক্ষা আউশ ধানের খড়ে ইহা কম এবং আমন ধানের খড়ে আরও কম। খড়ের মধ্যে এইরূপ অপূর্ণতা আশ্চর্য্য নয়, কারণ ফসফরাসের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টির মূল উপাদানগুলি ফল ও বীজের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

পরীক্ষা ও অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা : এইখানে ইহাও বলা প্রয়োজন যে, যদিও মোটামুটি ভাবে খড়ের সহিত অন্য খাদ্য মিলাইয়া খাওয়াইলে প্রচুর সুফল পাওয়া যাইবে, তথাপি এই সকলের পরীক্ষা একান্ত প্রয়োজন। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারাই অনেক অপ্রত্যাশিত জটিলতার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাদের সমাধান সম্ভব হইয়াছে। ধানের খড়ের উপাদানগুলি যখন প্রথম বিশ্লেষিত করা হয় তখন আমাদের মনে এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ইহার মধ্যে যে পরিমাণে চূণজাতীয় উপাদান আছে তাহা হইতে শরীর সংরক্ষণের চাহিদা মিটাইয়াও কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে, চুণ উদ্বৃত্ত তো থাকেই না, অধিকন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত গরুর ওজন-অনুপাতে খড়ের অভ্যন্তরস্থ একটা ন্যূনতম পরিমাণ চুণ উদরস্থ না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত শরীরের চুণও ক্ষয় পাইয়া গোবর এবং চোনার সহিত নিষ্ক্রান্ত হইতে থাকে। একটা ছয় মণ গরুর শরীর সংরক্ষণের জন্ম প্রতিদিন অন্ততঃ ১২ গ্রাম বা এক তোলা আন্দাজ চুণের প্রয়োজন। পরীক্ষা-দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, আমন খড়ের মধ্যে যদি ১৮ গ্রাম বা দেড় তোলা চুণ না দেওয়া যায় তাহা হইলে শরীর হইতে চুণের ক্ষয় বন্ধ হয় না। শুধু ইহাই নহে, আউশ ধানের খড়ে এই অবস্থায় ২৪ গ্রাম বা দুই তোলা ও বোরো ধানের খড়ে ৩০ গ্রাম বা ২। তোলা চুণ সংযুক্ত হইলে তবে ক্ষয় রোধ হয়।

পরীক্ষাদ্বারা জানা গিয়াছে, ধানের খড়ের মধ্যে এক দিকে পটাশ ও অন্যদিকে অক্সালিক অম্লের (oxalic acid) পরিমাণ অত্যধিক আছে। বোরো ধানের খড়ের মধ্যে এই অম্ল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তা ছাড়া খড়ের মধ্যে ছিবড়া বা fibre অধিক পরিমাণে থাকে। ইহাও চুণ এবং ফসফরাসের কার্য্যকারিতা নষ্ট করে। ধানের খড়ে এই বিঘ্ন দুই দিক দিয়া হইতেছে।

প্রতিকারের উপায়: আমাদের দেশে ধানের খড় যে অবস্থায় খাওয়ানো হয় তাহাতে তাহার অভ্যন্তরস্থ চুণ, ফসফরাস প্রভৃতি সামান্তই কাজে আসে বা আসিতে পারে। অথচ এইগুলিকে কার্য্যকরী করিবার জন্য বেশী কিছু করারও প্রয়োজন হয় না। শুধু খড়গুলিকে পরিষ্কার জলে ঘণ্টাকয়েক ভিজাইয়া (সম্ভব হইলে দুই তিন বার ধুইয়া) খাওয়াইলে, ইহার চুণ ও ফসফরাসের বার আনা হইতে চৌদ্দ আনা অবধি কাজে লাগাইতে পারা যায়।

খড়কে কষ্টিক সোডা টাটকা চুণের জলে এবং কখনও শুধু জলে ভিজাইয়া সেই খড় লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, স্বল্প কষ্টিক সোডা মিশ্রিত জলে শোধিত করিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া লইলে খড়ের দোষ অনেকটা বিদূরিত হয় এবং সেই অনুপাতে পুষ্টিগুণও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইহা ব্যয়সাপেক্ষ। তবে মাত্র জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন খড় নিংড়াইয়া জল বাহির করিয়া সেই খড় খাওয়াইলে অনেক সুফল পাওয়া যাইবে এবং অল্প আয়াসেই পুষ্টি-উপাদানগুলি প্রভূত কাজে আসিবে।

বিভিন্ন জায়গার খড় পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, মাটি, জল ও বায়ু ভেদে খড়ের গুণাগুণ পৃথক। ইহা লইয়া সবিশেষ গবেষণা না করিলে ত্রুটি দূর করা সম্ভব নহে। দুঃখের বিষয়, অবিভক্ত বাংলাদেশে এই সব লইয়া যেটুকু কাজ ঢাকায় হইত বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পর পশ্চিমবঙ্গে সে কাজ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

পুস্তক পরিচয়

মার্ক্সবাদ—ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষ ডি-লিট। বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, কুলগাছিয়া, মাহিষরেখা, জেলা হাওড়া। মূল্য তিন টাকা।

এই পুস্তকের ছয়টি অধ্যায়ে—মার্ক্সবাদ ও সমাজতন্ত্র, জড়বাদ ও সমাজতন্ত্র, অভিব্যক্তি, প্রগতি ও বিপ্লব, সাম্য ও স্বাধীনতা, মার্ক্সীয় অতিমূল্যবাদ এবং ঘন ও সুদ—গ্রন্থকার কার্ল মার্ক্সের মতবাদের আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের সুনিপুণ আলোচনা বিষয়টির উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছে। লেখক বলেন :—মার্ক্সবাদ বিজ্ঞান হইলে তাহা অভ্রান্ত নহে, কারণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পরিবর্ত্তনশীল, বিজ্ঞানের ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই নূতন নূতন সত্য ও জ্ঞান প্রকটিত হয়। গোঁড়া মার্ক্সবাদীরা ইহাকে বৈজ্ঞানিক মর্য্যাদা দিতে চান অথচ অভ্রান্তও বলিতে চান, ইহাতে লেখকের আপত্তি। লেখক স্বীকার করেন যে, বর্ত্তমান পৃথিবীর গতি সমাজতন্ত্রের দিকে। কিন্তু তাই বলিয়া মার্ক্স যে যুক্তি দ্বারা ইহার প্রতিষ্ঠা সমর্থন করিয়াছেন তাহা অভ্রান্ত নহে। এতদ্ব্যতীত মার্ক্সের অনেক মতবাদই ভ্রান্ত। অবশ্য একথা সত্য যে, তাঁহার হৃদয় মানুষের দুঃখে খুবই সহানুভূতিশীল। যে Das Capital গ্রন্থকে মার্ক্সবাদীগণ তাঁহাদের বাইবেল বলিয়া শ্রদ্ধা করেন, লেখকের মতে "তাহাতেও কোন দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টামাত্র নাই।" ইহা "সমসাময়িক সমাজ সম্বন্ধে অর্থনীতি বিষয়ক গভীর গবেষণা।" লেখক বলেন, যাহা মার্ক্সের নামে চলিতেছে তাহার অধিকাংশই এঞ্জেলস-এর মত—বর্ত্তমান রুশিয়ায় চলিতেছে লেনিনিজম্ এবং ষ্ট্যালিনিজম্, মার্ক্সিজম্ নহে। সোভিয়েটের মানব-হিতের চেষ্টাকে লেখক অভিনন্দিত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতে তথাকথিত মার্ক্সবাদীদের অপচেষ্টা ও স্বদেশদ্রোহিতাকে নিন্দা করিয়াছেন। মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক জড়বাদ (Dialectic Materialism) একটি মস্ত বড় মিথ্যা মতবাদ প্রচার মাত্র। হেগেলের ডায়ালেক্‌টিকের উপর ইহার ভিত্তি স্থাপন করা ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। মার্ক্স সপ্রাণবাদে (animism) বিশ্বাসী ছিলেন। এইজন্য তাঁহার কাছে ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, সাধুতা-অসাধুতা একই মুদ্রার দুই পৃষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ধর্ম্মের পরিণতি হইতেছে অধর্ম্মে, সুতরাং অধর্ম্মে লজ্জার কিছুই নাই। সহজ কথায় মার্ক্সপন্থীর ডায়ালেক্‌টিক ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদের নামান্তর মাত্র। এইজন্য মার্ক্সপন্থী নিজের কাজের জন্য নিজেকে দায়ী মনে করে না। মার্ক্সীয় অতিমূল্যবাদও (surplus value) নির্ভুল নহে। মার্ক্স ছিলেন শ্রম-মূল্যবাদে বিশ্বাসী। ইতিহাসের যে সকল ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া মার্ক্স স্বকীয় সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহ ঐ সকল অনুমানকে মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছে। রাশিয়ায় সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাই উহার অন্যতম নিদর্শন।

এই গ্রন্থ পাঠ করিলে পাঠকগণের মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে নূতন করিয়া ভাবিবার আগ্রহ জন্মিবে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সচিত্র যৌনবিজ্ঞান—প্রথম খণ্ড। আবুল হাসানাৎ। বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লিমিটেড, ৫নং বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৯৲ টাকা।

মানুষের যৌনজীবন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করার যে প্রয়োজনীয়তা আছে এ কথা আজ আর সুধী ব্যক্তিরা অস্বীকার করেন না। মানুষ মাত্রেরই ব্যক্তিত্ব গঠনে, চরিত্রের বিকাশে যৌনপ্রবৃত্তি কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করে এবং কিরূপ সূক্ষ্ম ও জটিলভাবে তাহা করে মনোবিদ্‌রা, শুধু ফ্রয়েড-মতাবলম্বীরাই নহে, এখন তাহা সম্যক্‌ উপলব্ধি করিতেছেন এবং সেই জন্যই তাঁহারা যৌনজীবন সম্বন্ধে আলোচনার পক্ষপাতী। বহু মানসিক ব্যাধি এবং চরিত্রের বিকার যৌনবৃত্তির অপরিণতি বা অস্বাভাবিক পরিণতিরই প্রতীকস্বরূপ। সুতরাং ভবিষ্যতে মানসিক স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে, চরিত্র সুষ্ঠু ভাবে গঠন করিতে হইলে অন্যান্য ব্যাপারের সহিত শিশুর কাম-জীবনের দিকেও নজর রাখিতে হইবে। কিন্তু আমাদের অনেকেরই কাম-জীবনের বিকাশের ধারা সম্বন্ধে সঠিক কোন জ্ঞানই নাই।

আবুল হাসানাৎ সাহেব আলোচ্য পুস্তকখানিতে অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাষায় এই জ্ঞান আমাদের বিতরণ করিয়াছেন। তিনি শুধু যে বহু দেশের বিবিধ পুস্তক হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন তাহা নহে, নিজেও ব্যক্তিগত চেষ্টায় নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া পুস্তকখানিকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। প্রথম সংস্করণের সমালোচনার সময় বলিয়াছিলাম, বাংলা ভাষায় কাম বিষয়ে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে লিখিত এরূপ পুস্তক আর নাই। ইতিমধ্যে বহু পুস্তক রচিত হইয়াছে, কয়েকখানিতে বিষয়টি সুন্দরভাবেই আলোচিত হইয়াছে, যেমন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'যৌনজিজ্ঞাসা' পুস্তকে—কিন্তু এরূপ তথ্যপূর্ণ, পথনির্দ্দেশক, ইঙ্গিতপূর্ণ পুস্তক আজও আমাদের ভাষায় নাই, একথা এখনও বলা যাইতে পারে। গিরীন্দ্রশেখর সত্যই বলিয়াছেন, বইখানিকে কামসংহিতা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কাম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ই পরিপূর্ণভাবে ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার বিবাহ সম্বন্ধে বহু সামাজিক প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন এবং নানাদিক হইতে বিচার করিয়াছেন। সকলে হয়ত সকল বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত হইবেন না। কিন্তু প্রচলিত বিবাহপ্রথার যে সংস্কারের প্রয়োজন আছে, একথা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। যে সমস্ত সারগর্ভ যুক্তি গ্রন্থকার প্রয়োগ করিয়াছেন, সমাজ-নেতাদের সেগুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত বিবেচনা করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। সমাজ-সেবক, ডাক্তার, গৃহী, শিক্ষক সকলেরই এ পুস্তক অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র

যাযাবর—শ্রীসুধীর গুপ্ত। চয়নিকা, ১৪০ এ, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা। মূল্য ১৸০।

এখানি কবিতা-পুস্তক। আটাশটি গীতিকবিতায় বইখানি সম্পূর্ণ। স্বপ্ন, অতীত, অবসর এবং বিস্ময় লেখককে অনুপ্রাণিত করে। বর্ত্তমান কালের হইয়াও নিজেকে রোমাণ্টিক বলিয়া পরিচিত করিতে এই তরুণ লেখকের কিছুমাত্র কুণ্ঠা নাই।

"প্রয়োজন-হারা একটি পলকও নাই
মানুষের লাগি আধুনিক ধরাতলে।"

'অবকাশ-ভরা অতীতেরে তাই স্মরি' বলিয়া দূর দিগন্তের পানে তিনি দৃষ্টিপাত করেন। 'বহুদূরে যেন ইসারায়—চিরদিন ডাকে সে আমায়।'

"নন্দিত সুন্দর পন্থে
আমি তাই যাযাবর যাত্রী,
জানি এই দুঃখের অন্তে
পন্থার শেষ, আর পার এই রাত্রি।"

তিনি বলেন, 'অধরার পিছে আজীবন মিছে ছুটিতেছি অকারণ… চলেছি ফেলিয়া দু'পাশে ঠেলিয়া জীবনের আয়োজন।' প্রথম কবিতা 'বাণী-সাধক'—'উদাসিনী বাণী বরিল যাহারে',

"মর-দেহ তার ধূলা হয়ে যায়—
কথা যে তাহার কভু না মরে।"

সুধীর গুপ্তের ছন্দ সাবলীল, কাব্যে প্রবাহ আছে, উপল-নূপুরা তটিনীর মত তাহা ছুটিয়া চলে। "যাযাবরে"র কবিতাগুলি কাব্যামোদী পাঠককে আনন্দদান করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

মংপুতে রবীন্দ্রনাথ—শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী। অভিযান পাবলিশিং হাউস—৪৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ৪৲ টাকা।

বিচিত্র বাংলা-সাহিত্যের প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথ। সেই স্রষ্টাকে একান্ত সন্নিকটে বসিয়া দেখিবার ও জানিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে—তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশী নহে। মৈত্রেয়ী দেবী এই দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। মৃত্যুর মাত্র চার বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ কিছু দিনের জন্য মংপুতে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে স্রষ্টার সান্নিধ্য-লব্ধ প্রতিটি দিনের অবসর-ক্ষণগুলি হাসি গল্প কৌতুক কবিতা পাঠ বাগ্‌-বৈদগ্ধ্যে যে ভাবে কাটিয়াছে—তাহার নির্ভুল রেখাপাত হইয়াছে লেখিকার দিনলিপির পৃষ্ঠায়। শুধু রেখাপাত বলিলে ঠিক বলা হয় না। সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া, শ্রদ্ধা ও প্রীতির স্রক্‌চন্দনে অভিষিক্ত করিয়া পরম মমতায় দিনলিপির পৃষ্ঠাগুলি কবি-সঙ্গ-কীর্ত্তন রসে লেখিকা ভরাইয়া তুলিয়াছেন। লোকোত্তর প্রতিভার সামান্যতম অংশ—পরিবেশহীন শুধু বাক্যকে—ধরিয়া রাখার এই ধরণের চেষ্টাকে লেখিকা বলিয়াছেন সকরুণ ব্যর্থতা। তিনি হয়তো জানেন না যে, রবীন্দ্র-রচনামুগ্ধ শত-সহস্র পাঠকের কাছে কালির অক্ষরে বন্দী এই বর্ণনাগুলি আসল মানুষটিকে পরিবেশসমেত কতখানি উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কবির বিদগ্ধজনোচিত পরিহাস—সরস বাক্যযোজনা-রীতি, এক একটি বিখ্যাত কবিতার জন্মমুহূর্ত্তের তথ্য, তার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন প্রভৃতি অমূল্য রত্নের মতই বাংলা-সাহিত্যে সঞ্চিত হইয়া থাকিবে এবং রবীন্দ্র-জীবনী রচনার মূল্যবান উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হইবে।

বইয়ের প্রচ্ছদপট, ভিতরের ছবিগুলি ও মুদ্রণ পরিপাট্য—সব কিছুতেই সুরুচির ছাপ বিদ্যমান। এখানি তৃতীয় সংস্করণ।

১নং ও ২নং—শ্রীসুরুচি সেনগুপ্তা। কেতাব ভবন। ২৭।১, ডিক্সন লেন, কলিকাতা। দাম ২৲ টাকা।

গল্প-সঙ্কলন। গল্পগুলি আকারে ছোট—হালকা কৌতুকরসাশ্রিত।

কোন কোনটিতে সাম্প্রতিক ঘটনা ও সমস্তার স্পর্শ আছে। গল্প বলার সরস ভঙ্গি মনকে গল্পের মধ্যেই টানিয়া রাখে; সেই সঙ্গে ছবিগুলিও চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

সুরাসুর (পৌরাণিক নাটক)—শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১১১২৮, শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির পথ, উত্তর ব্যাঁটরা, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২

হেমচন্দ্রের 'বৃত্রাসুর বধ' কাব্য অবলম্বনে গৈরিশ ছন্দে 'সুরাসুর' নাটকখানি রচিত হইয়াছে। ঘটনা-সংস্থান এবং সংঘাতসৃষ্টির কৌশল এই নাটকখানিকে রসোত্তীর্ণ করিয়াছে। ভাষার বেগ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। নাটক-রচনায় লেখক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

পূর্ণাহুতি (পৌরাণিক নাটক)—শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষাল। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

লেখক 'নিবেদনে' লিখিয়াছেন, "নাগযজ্ঞেই মহাভারতের সমাপ্তি কেন? এই প্রশ্ন মনের মধ্যে যে আলোড়ন তুলিয়াছিল 'পূর্ণাহুতি' নাটকখানি সেই প্রশ্নেরই সমাধান-প্রচেষ্টা। সফল হইয়াছে কিনা, তাহা সুধীবর্গের বিচার্য।" নাট্যকারের সেই প্রয়াস সফল হইয়াছে। তবে অভিনয়ের পক্ষে নাটকখানি একটু দীর্ঘ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

দানবীর—শ্রীকিরণবিকাশ মুচ্ছদ্দী। প্রাপ্তিস্থান—ক্রিমিন্যাল বার এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম, গ্রন্থকারের নিকট। মূল্য—দুই টাকা

নাটকখানি বৌদ্ধ-জাতকের বোধিসত্ত্ব বিশ্বন্তরের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে জাতকের বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত নাটক নাই বলিলেই চলে। নাট্যকার সেই অভাব পূরণের চেষ্টা করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বিশ্বন্তর-কাহিনী খুবই করুণ। এই নাটকের প্রতিটি দৃশ্য পাঠকের মনকে করুণ রসে সিক্ত করিয়া তুলে। নাট্যকার সুপ্রায়নার সঙ্গে বৌদ্ধ জাতকের এই কাহিনীর নাট্য রূপ দিয়াছেন। দানবীর' নিঃসন্দেহে সকলের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

বাংলা ছোট গল্প—সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—(প্রারম্ভ-কাল হইতে ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত): অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। ১৩৫৭। মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলিকাতা। পৃ. ২২০+১৬। মূল্য চারি টাকা।

গায়ের জোর থাকিলে পর্ব্বতকে পর্ব্বত উপড়াইয়া আনা যায়, কিন্তু বিশল্যকরণী, মৃতসঞ্জীবনী চিনিয়া বাছিয়া প্রয়োগ করিতে হইলে জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন। আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকারের শুধু কায়িক পরিশ্রমের বহর দেখিয়া যেমন চমৎকৃত হইয়াছি, বিচার ও সমন্বয়-শক্তির অভাব দেখিয়া তেমনই দুঃখবোধ করিয়াছি। তিনি সাময়িক পত্রিকা ঘাঁটিয়া অসংখ্য গল্পের তালিকা আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন, কিন্তু বাংলা-সাহিত্য সুরু হইতে যে-সকল শিল্পীর সাধনার দ্বারা সমৃদ্ধ, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহাদের গল্প-গ্রন্থগুলির সহিত তাঁহার পরিচয় না থাকাতে বহু প্রসিদ্ধ জ্ঞাত গল্পও অজ্ঞাতের পর্য্যায়ে পড়িয়া বিভ্রাট বাধাইয়াছে। ফলে বইখানি তালিকাই হইয়াছে, সমালোচনা হয় নাই। বহু খ্যাতনামা গল্পলেখকের সম্বন্ধে এই গ্রন্থে কোন আলোচনাই নাই অথচ অনেক অখ্যাতনামা লেখককে লইয়া অশোভন উচ্ছ্বাস আছে। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, মণীন্দ্রলাল বসু প্রভৃতি—বাংলা-সাহিত্যে ইঁহারা কেহই উপেক্ষণীয় নন গ্রন্থকার ত্রৈলোক্যনাথ ও শ্রীশচন্দ্রের নামোল্লেখ মাত্র করিয়াছেন, বাকী কয় জন সে সৌভাগ্য হইতেও বঞ্চিত। "সূচনা" অধ্যায়ে তথ্যেরও ভুল আছে, যথা, 'নব বাবু বিলাসে'র প্রকাশকাল ইং ১৮২৫,—১৮২৩ নহে। 'আশ্চর্য্য উপাখ্যান' গল্প নহে, ইহা পয়ারাদি ছন্দে নড়াইলের জমিদার কালীশঙ্কর রায়ের জীবনী মাত্র, ইহার প্রকাশকাল ইং ১৮৩৫,—১৮৩৪ নহে। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'বাসবদত্তা' একখানি সুললিত কাব্যগ্রন্থ, গল্পের বই নয়। 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদ নয়, ইত্যাদি।

বাংলা সাহিত্যের কথা: শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সরস্বতী লাইব্রেরী, কলিকাতা। পৃ. ২৯৮। মূল্য সাড়ে ছয় টাকা।

নামের জন্য বইখানিকে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু আসলে ইহা লেখকের নিজস্ব মতবাদ সম্বলিত ১৩টি সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধের সমষ্টি মাত্র। প্রবন্ধগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন। সাময়িক-পত্রের জন্য লিখিত বলিয়া সাময়িক প্রয়োজনে অনাবশ্যক বিষয়েও অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। "চণ্ডীদাসের নবাবিষ্কৃত পুথি" প্রবন্ধে অনেক চিন্তার খোরাক আছে, উদ্ধৃত পদগুলি কৌতূহলোদ্দীপক। "ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধটি সুলিখিত।

ব.

গান্ধী-উপাখ্যান—জি রামচন্দ্রন। অনুবাদক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গুহ। হিন্দ্ কিতাব্‌স্, বোম্বাই, মূল্য ১৷৹।

মহাপুরুষদের আদর্শ অথবা সাধনতত্ত্ব পরম মূল্যবান হইলেও তাঁহাদিগকে সংসারের মানুষরূপে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা ও কৌতূহল আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। ছোটখাটো ঘটনার মধ্য দিয়া তাঁহাদের আরও কাছে পাই, আপন বলিয়া ভাবিতে পারি। আর ঐ সকল ঘটনাতেও তাঁহাদের মহত্ত্বের ছাপ পড়ে। এই সত্য কাহিনীগুলিতে গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে।

কাকলী—শ্রীরাধিকারঞ্জন ঘটক। রিভলভার পাবলিশিং কোং। ৭০-এ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোড, কলিকাতা। মূল্য ২৲।

পংক্তিবিন্যাস দেখিয়া মনে হয় কবিতার বই। কিন্তু আমি আপনি যাহাকে কবিতা বলিয়া জানি, এ তাহা নয়। রিভলভার পাবলিশিং কোং কাব্যপিপাসুদের ঘায়েল করিতে পারিবেন।

উৎসর্গপত্রে গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের কবিতা তুলিয়া 'নবীন' ও 'কাঁচা'দের আহ্বান করিয়াছেন। "যে যা বলে বলুক", তিনি "পুচ্ছটি উচ্চে" তুলিয়া নাচাইতে কৃতসংকল্প। গোড়াতেই শুনি,

"তোমার দাড়ি ধরছি,
দেখ,
আমার হাত কত সাফ্।

দেখ,
পা-ও কত সাফ,
আমার পা
তোমার মাথায় রাখছি।"
একটু পরে,
"পেনিসিলিন?
ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন?
নেই?
তবে, কি করে [illegible]?"

বুঝিতে পারিলাম না। কাহাকে [illegible] কি বলিয়া [illegible] হইয়াছেন?

বন্দেমাতরম— [illegible] অরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। মূল্য তিন টাকা।

অধিকাংশ কবিতা [illegible] প্রথম কবিতা 'বন্দনা' শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের [illegible] রচিত। কবিতাগুলিতে [illegible] সংস্কৃত শব্দ ও ছন্দ [illegible] আছে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] হইয়া [illegible] কিন্তু [illegible] নাই, [illegible] অবশ্যই, তাঁহার তব সুলিখিত।

শ্রী[illegible]

জনান্তিকে— [illegible] গ্রামবিহারী [illegible], কলিকাতা [illegible]

গ্রন্থকারের [illegible] রচনায় তাঁর নিপুণ হাতের পরিচয় পাইলাম। ইহাতে ভ্রমণকাহিনীর ভূমিকা, সঙ্গীত ও বিনয়, তর্ক ও তার্কিক, দেশলাই, ঘড়ি, ভূতের বিলোপ, অতিবাদ এই সাতটি নিবন্ধ আছে। [illegible] essay বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের পর্যায়ভুক্ত। বাংলা সাহিত্যে এ পর্যায়ের প্রবন্ধের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু সার্থক হইলে এ ধরণের প্রবন্ধ যে সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে—অজিতবাবুর বইখানি তাহার প্রমাণ।

এই ধরণের রচনার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, পাঠক ইহাতে নিজের ব্যক্তি-মানসের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত দেখিয়া লেখকের সঙ্গে একটা মানসিক আত্মীয়তা অনুভব করেন। বইখানি পড়িয়া মনে হয়, লেখক যেন অনর্গল নিজের মনের সঙ্গে কথা বলিয়া যাইতেছেন—সেই কথাগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে তাঁহার কলমের ডগায় আসিতেছে। সেইজন্য রচনার কোথাও টানা-বোনার লক্ষণ নাই, চমক লাগাইবার প্রয়াস নাই। কিন্তু স্থানে স্থানে তাঁহার অন্তরের গভীর সত্যোপলব্ধি এমন প্রোজ্জ্বল মহিমায় প্রকাশিত হইয়াছে যে তাহা পাঠককে বিস্মিত ও চমকিত করিয়া দেয়।

আমাদের সব চেয়ে ভাল লাগিয়াছে "ভ্রমণকাহিনীর ভূমিকা" নামক নিবন্ধটি। লেখক যা বলিতেছেন তার নিগলিতার্থ এই যে, দেখিবার চোখ থাকিলে আমাদের চতুষ্পার্শ্বের অতিতুচ্ছ সামান্য জিনিষের মধ্যেও পরমাত্মাকে দেখা যায়, নতুবা হাজার হাজার মাইল ঘুরিয়া আসিলেও কিছুই দেখা হয় না। শুধু চোখের দেখাটা কিছুই নয়, মনের রসে রসায়িত করিয়া দেখিলে তবেই নিতান্ত সাধারণ দৃশ্যও অসাধারণ এবং অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠে। যে মন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একীভূত [illegible] মনে নৈসর্গিক কোন ছবিই হারাইয়া যায় না—এই কথাগুলি লেখক শুধু যে অপূর্ব্ব ভাষায়, চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে বলিয়াছেন তাহা নয়, স্থানে স্থানে কবিদৃষ্টি এবং সত্যদৃষ্টিরও পরিচয় দিয়াছেন।

'তর্ক ও তার্কিক' 'দেশলাই' 'ঘড়ি' এবং 'অতিবাদ' এই কয়টি [illegible] আমাদের নিকট খুব উপভোগ্য এবং উপাদেয় মনে হইয়াছে। [illegible] বিষয়বস্তু লইয়াও কেমন চমৎকার সাহিত্য-[illegible] 'দেশলাই' নামক প্রবন্ধটিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। মনের ভাবসমূহকে নীহারিকাময় অবস্থা হইতে সাকার [illegible] প্রকাশ করাই যদি সৃষ্টিধর্ম্মী রচনার চরম সার্থকতা হয় তাহা হইলে অজিতবাবুর এই প্রবন্ধগুলি যে সার্থক সাহিত্যসৃষ্টির পর্য্যায়ে [illegible] তাহাতে সন্দেহ নাই। রচনা-কৌশলে নিবন্ধগুলিতে [illegible] লাগিয়াছে।

[illegible] অনেক সুবাক্য প্রবন্ধগুলিতে ইতস্ততঃ ছড়ানো রহিয়াছে। [illegible] মনন এবং নিদিধ্যাসনের যোগ্য। দু'একটি মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি—"[illegible] আমি, স্বীকার করি। কিন্তু এ [illegible] জল আমার আজও পান করা শেষ হয় নি; আমার ছোট পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যই আজ[illegible] উপভোগ করা শেষ হ'ল না—এর চেয়ে বেশি হলে কি [illegible] পাব"। (ভ্রমণকাহিনীর ভূমিকা)। "ললিতকলার যিনি প্রকৃত সাধক—তিনি কবি বা শিল্পী যাই হোন না কেন—নিজের যা দেবার তা পারবেশনেই তাঁর আনন্দ।" (সঙ্গীত ও বিনয়)। "পাত্রাধার তৈল কিম্বা তৈলাধার পাত্র" এই হচ্ছে তর্কের খাঁটি আদর্শ। বীজ আগে না গাছ আগে—এই হচ্ছে আদি ও অকৃত্রিম তর্ক। কেননা এ তর্কের আর শেষ নাই।" (তর্ক ও তার্কিক)। "সময় স্থাবর নয়, জঙ্গম। নদীর স্রোতের চেয়েও অব্যাহত, সহজ তার গতি। তার উপর বশ [illegible] কোন বস্তু দিয়ে, সাঁকো বাঁধা যায় না।" (ঘড়ি)। "উপভোগের ভিত্তিটাই তো প্রত্যয়। (ভূতের বিলোপ)। "আর্ট মাত্রই সেইখানে সবচেয়ে সার্থক যার বেশিও বলা চলে না, কমও নয়।" (অতিবাদ)।

আর অধিক উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন। অল্প কথায় অনেককিছু বলার এবং গভীর ভাব প্রকাশের ক্ষমতা যে লেখকের আয়ত্ত তাহা এই সমস্ত বাক্য হইতেই বুঝা যাইবে। ভাষার মাধুর্য্য, ভাবের গভীরতা এবং দৃষ্টি-ভঙ্গীর স্বকীয়ত্বে বইখানি সমঝদার পাঠককে মুগ্ধ করিবে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

আমাদের সহযোগী, সংবাদ-পরিবেশনকারী শচীন্দ্রনাথের দেহত্যাগে আমরা আত্মীয়বিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি। তিনি সংবাদপত্র-সেবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন; প্রায় ৩০ বৎসর কাল নীরবে ইহার সেবা করিয়াছেন। ইহজীবনের সুখ দুঃখ তিনি হাসিমুখে সহ্য করিয়াছেন, অন্তিম সময়ে তাঁহার সেই হাসি অব্যাহত ছিল।

সংবাদ-পরিবেশন-ব্রত তিনি এরূপ নিষ্ঠা ও কৌশলের সহিত উদ্‌যাপন করিতেন যে, গান্ধীজী পর্যন্ত তাঁহার প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই। নানা কাগজে তাঁহার সম্মান পাওয়া যায়। নাম কিনিবার জন্য তিনি তাঁহার কর্মদক্ষতার অপব্যবহার করেন নাই।

ভাওয়াল মামলার একটি প্রামাণ্য পুস্তক তিনি সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তাহা তাঁহার সাংবাদিক জীবনের কৃতিত্ব প্রচার করিবে।

মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী

চট্টগ্রামের জাতীয়তাবাদী মুসলিম-প্রধান মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী পরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে স্বদেশী যুগে, যে আদর্শে স্বদেশ-সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, জীবনের শেষ তিন-চার বৎসরে তাহার ব্যর্থতা তিনি দেখিয়া গিয়াছেন। এই ব্যর্থতা বাঙালী হিন্দু-মুসলমান জাতীয়তাবাদীর অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। তাহার প্রতিকার একদিন হইবে। সেই সময়ে মনিরুজ্জমানের কথা ভাবিয়া বাঙালী নূতন অনুপ্রেরণা লাভ করিবে।

বাঙালী বৈজ্ঞানিকের কৃতিত্ব

হায়দ্রাবাদ সরকারের মৎস্য-বিভাগের বায়োকেমিষ্ট শ্রীঅবনীকুমার দাশ, এম-এস্‌সি, আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ আন্তর্জাতিক শারীরতত্ত্ববিদ্‌ মহাসম্মেলনে যোগদান করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। মিঃ দাশ বহুদিন যাবৎ মৎস্য-সংক্রান্ত গবেষণায় ব্রতী আছেন ও এই বিষয়ে বহু প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া পাশ্চাত্যের কৃতী বৈজ্ঞানিক মহলের বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন।

শ্রীঅবনীকুমার দাশ

বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রদর্শনের জন্য তিনি হায়দ্রাবাদ হইতে নানা প্রকার জীবিত মৎস্য সংগ্রহ করিয়া ডেনমার্কে লইয়া যান। ১৮ই আগষ্ট মিঃ দাশ ডেনমার্কের টেলিভিশন রেডিয়োতে তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয় আলোচনা করেন। তিনি তথাকার বহু স্থানে বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রিত হন। অবনী-বাবু বর্ত্তমানে কোপেনহেগেনে মৎস্যের শারীরবৃত্ত (Physiology of fishes) সম্বন্ধে গবেষণায় রত আছেন।

বাঁকুড়ায় আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ের সম্বর্দ্ধনা

গত ৪ঠা কার্ত্তিক স্থানীয় এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হলে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি, আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের নবতিতম জন্মদিবস প্রতিপালিত হইয়াছে। মাঙ্গলিক চিহ্নদ্বারা হলটি সুন্দর ভাবে সজ্জিত করা হয়। আচার্য্যদেব গাড়ী হইতে অবতরণ করিলে মহিলারা হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করেন এবং পুষ্পবৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে স্বাগত জানান।

তিনি মঞ্চের উপর আসন গ্রহণ করিলে পর সংস্কৃতে রচিত একটি প্রশস্তি-গান শ্রীবৈদ্যনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক ধ্রুপদ পদ্ধতিতে গীত হয়। অতঃপর জন্মোৎসব-সমিতি, বিষ্ণুপুর শিল্পীদল, যুবক সঙ্ঘ, নারীসম্মেলন, ছাত্রসমাজ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে আচার্য্যদেবকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয়।

আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

শ্রীঅজিতকুমার সেন এতদুপলক্ষে বিশেষ ভাবে রচিত একটি কবিতা পাঠ করেন। (এই কবিতাটি বর্ত্তমান সংখ্যার ১৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।) জন্মোৎসব সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যদেবকে গরদের উত্তরীয় ও একটি অঙ্গুরীয় উপহার দেন। অভিনন্দনের উত্তরে আচার্য্যদেব একটি সুদীর্ঘ ও চিন্তাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর অনুরোধে তিনি তাঁহার প্রথম জীবনের ঘটনাবলী এবং অভিজ্ঞতার কথাই বিশেষভাবে বর্ণনা করেন। তাহা বিশেষ উপভোগ্য, চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল।

বিষয়-সূচী—পৌষ, ১৩৫৭

বিষয়-সূচী—পৌষ, ১৩৫৭

জননী

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

অন্তিম শয়নে শ্রীঅরবিন্দ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫০শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ ১৩৫৭

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল

ভারত এখন সমূহ বিপদের প্রায় সম্মুখীন। জগদ্ব্যাপী সমরানল ধূমায়মান, দেশের উত্তর সীমান্তে বিপ্লব ও সংঘর্ষ চলিতেছে। দেশের ভিতরে বিদেশীর পঞ্চমবাহিনী রাষ্ট্রধ্বংসের ষড়যন্ত্র সক্রিয়ভাবে চালাইতেছে। দারুণ অন্নাভাব এবং মুনাফাখোর দুরাচারদিগের অত্যাচারে দেশবাসী দৈন্যক্লিষ্ট ও বিভ্রান্ত। এইরূপ নিদারুণ দুর্য্যোগের মধ্যে আমরা এই দিকপালকে হারাইলাম।

পাকিস্থান গঠনের পর হইতেই ভারতরাষ্ট্র যে সকল বিষম বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয় সে সকল ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত দেশ অতিক্রম করিয়াছিল এই একটি বজ্রকঠোর দৃঢ়চিত্ত পুরুষসিংহের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য সাহসের ফলে। যে দুর্বিপাকের মধ্যে আমাদের ফেলিয়া দিয়া ব্রিটিশ সরকার বিদায় গ্রহণ করে তাহার অন্ত এখনো হয় নাই বলিয়া দেশের লোকে হয়ত সর্দ্দার প্যাটেলের কীর্ত্তি ও পৌরুষের পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করিতে পারে নাই। কিন্তু যখন সুদিনের সুপ্রভাত দেখা দিবে, তখন এই শ্রান্ত-ক্লান্ত দেশ সেই অমর কীর্ত্তিকে চিরস্মরণীয় জ্ঞানে শ্রদ্ধাদান করিবে। সর্দ্দারের নিকট বাংলা বিশেষরূপে ঋণী। সময় আসিবে যখন সে ঋণের সম্যক্ পরিচয় সাধারণকে দেওয়া যাইবে:

১৮৭৫ সালের ৩১ অক্টোবর করমসদ গ্রামে বল্লভভাইয়ের জন্ম হয়। বল্লভভাইয়ের পিতার ৫টি পুত্রসন্তান এবং একটি কন্যা হইয়াছিল। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট পরলোকগত ভি. জে. প্যাটেল ছিলেন এই পাঁচটি পুত্রের মধ্যে একজন। অতি অল্প বয়সেই বল্লভভাই জাবেরবাকে বিবাহ করেন। মণিবেন ১৯০৩ সালে এবং দয়াভাই ১৯০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বহুদিন টিউমারে ভুগিয়া ১৯০৮ সালে বোম্বাই হাসপাতালে জাবেরবার মৃত্যু হয়।

শৈশবে বল্লভভাই নাদিয়াদ শহরে মাতুলালয়ে লালিত-পালিত হন। ১৮৯৭ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯০১ সালে ওকালতী পরীক্ষা পাস করেন। ব্যারিষ্টারী পাশ করিবার জন্য ১৯১০ সালে তিনি ইংলণ্ড যান এবং ১৯১২ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করিয়া তিনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি আমেদাবাদে আইনব্যবসায় আরম্ভ করেন।

আমেদাবাদে আইনজীবী হিসাবে সর্দ্দার প্যাটেল উত্তরোত্তর সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতেছিলেন। এই সময়ে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ ও নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন সম্পর্কে পশ্চিম-ভারতে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। আমেদাবাদকে কেন্দ্র করিয়া তিনি এই প্রচারকার্য্য চালাইতেছিলেন।

গান্ধীজীর আন্দোলন সম্পর্কে প্রথমে প্যাটেল শুধু উদাসীন ছিলেন না, অনেকটা উপেক্ষার ভাবেই ইহাকে দেখিতে-ছিলেন। কেবল অহিংস প্রতিরোধ অস্ত্র লইয়া ভারতে শক্তি-শালী ব্রিটিশরাজের এবং দক্ষিণ আফ্রিকা কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখীন হওয়া যায় তরুণ সর্দ্দার ইহা বিশ্বাস করেন নাই।

কিন্তু ১৯১৭ সালে গান্ধীজী যখন গুজরাট সভায় সভা-পতি হন, সেই সময় হইতেই সর্দ্দার প্যাটেল তাঁহার অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী হইতে আরম্ভ করেন। সর্দ্দারজী এই সভার সদস্য ছিলেন। গান্ধীজী তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহযোগে আসিয়া তাঁহার নিকট একটি কর্ম্মসূচীর বিষয় প্রকাশ করেন। যদিও উচ্চতম নৈতিক আদর্শই ছিল এই কর্ম্মসূচীর ভিত্তি তবুও প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহার সংগ্রামশীলতা এবং কার্য্যকারিতার প্রতি সর্দ্দারজী আকৃষ্ট হন। গুজরাটে এই কর্ম্মসূচী সম্পর্কে কার্য্য পরিচালনা ব্যাপারে সর্দ্দারজী ক্রমেই গান্ধীজীর অধিকতর সান্নিধ্যে আসিতে থাকেন। এই সময়ে তিনি আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির বিশিষ্ট কমিশনারদের অন্যতম ছিলেন। ১৯১৬ সালে সর্দ্দার প্যাটেল গুজরাট সভা কর্ত্তৃক গুজরাট হইতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন।

১৯১৮ সালে কয়রা সত্যাগ্রহ ব্যাপারে বল্লভভাই গান্ধীজীর

সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যোগ দেন। ইহার পূর্ব্বে ১৯১৭ সালে গান্ধীজী চম্পারণ জিলার মতিহারীতে সত্যাগ্রহ করিয়া সাফল্য লাভ করেন। নীলকরগণ কর্ত্তৃক করবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এই আন্দোলন হইয়াছিল। গান্ধীজী এবং গবর্মেণ্টের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার ফলে কর হ্রাস পায় এবং রায়তগণের নিকট হইতে যে টাকা আদায় করা হইয়াছিল তাহা তাহারা ফেরত পায়।

যথারীতি শস্যোৎপাদন না হওয়ায় কয়রা জেলায় দুর্ভিক্ষ চলিতেছিল। ইহার ফলে কয়রা জেলার কৃষকবৃন্দ কর আদায় স্থগিত রাখিবার আবেদন জানায়। কিন্তু গবর্মেণ্ট ইহাতে কর্ণপাত না করায় গান্ধীজী তাহাদের সত্যাগ্রহ করিবার পরামর্শ দেন। গান্ধীজী স্বয়ং এই সত্যাগ্রহ পরিচালনভার গ্রহণ করেন এবং জনসাধারণের নিকট সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আবেদন জানান। বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা এই সময়ে গান্ধীজীর সঙ্গে সহযোগিতা করিবার জন্য আগাইয়া আসেন সর্দ্দার প্যাটেল তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি নিজের সুপ্রতিষ্ঠিত আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া গান্ধীজীর রাজনীতির মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং কয়রার সত্যাগ্রহে সম্পূর্ণভাবে যোগ দেন।

কয়রা সত্যাগ্রহের অল্প পরেই ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমেদাবাদ মিলসমূহে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হয়। গান্ধীজী শ্রমিকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এখানে সর্দ্দারজী তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। যে সংগঠনশক্তি তাঁহার মধ্যে এতদিন সুপ্ত ছিল, এই আন্দোলনে যোগ দিয়া তাহা বিকাশের সুযোগ পায়। ইহার ফলেই পরবর্ত্তীকালে ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁহার অতুলনীয় স্থান সম্ভব হইয়াছে। কঠোর পরিশ্রমে এই সময়ে বল্লভভাই শৃঙ্খলাহীন শ্রমিকগণকে নিয়মশৃঙ্খলায় আবদ্ধ করেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে তিনি বস্ত্র-শ্রমিক প্রতিষ্ঠান নামে একটি ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করেন। ভারতে এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান ইহাই প্রথম।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এই সময়ে প্রায় সমাপ্তির মুখে, মিত্রপক্ষের চূড়ান্ত জয় প্রায় আসন্ন, এই যুদ্ধজয়ে ভারতের দানের জন্য তাঁহাকে "দায়িত্বশীল গবর্মেণ্টে"র প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। ইহার প্রথম পর্য্যায় হিসাবে ১৯১৮ সালের জুন মাসে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সরকারী কর্ম্মচারী মহল এবং মডারেট দল ইহাকে গ্রহণ করিলেও দেশের জনসাধারণ ইহাতে নিরাশ হন। আগষ্ট মাসে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়। পরলোকগত হাসান ইমাম এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সর্দ্দার প্যাটেলের অগ্রজ পরলোকগত ভি. জে. প্যাটেল অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন। অধিবেশনে শাসন-সংস্কার সংক্রান্ত রিপোর্ট "নৈরাশ্যজনক" বলিয়া ঘোষিত হয়। ১৯১৯ সালের ১লা জানুয়ারী রৌলাট রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্ট অনুযায়ী বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ৬ই ফেব্রুয়ারী আইন সভায় রৌলাট বিল পেশ করা হয়। মার্চ্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এই সংক্রান্ত দ্বিতীয় বিলটি গৃহীত হয়।

এই বিল গৃহীত হইবার পূর্ব্বে ২৪শে ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী গবর্মেণ্টকে জানাইয়া দেন যে, বিল আইনে পরিণত হইলে তিনি সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবেন। বিল পাস হওয়ায় তিনি ৩০শে মার্চ্চ হরতাল দিবস ধার্য্য করেন। ঐ দিবস সমগ্র ভারতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইবে, তিনি স্থির করেন। বিশেষ কারণে ঐ দিন পরিবর্ত্তন করিয়া পরবর্ত্তী ৬ই এপ্রিল স্থির হয়, কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের তারিখ যথারীতি ঘোষিত না হওয়ায় ভারতের সর্ব্বত্র, বিশেষভাবে পঞ্জাব ও বোম্বাইতে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়া যায়।

রৌলাট এক্ট আন্দোলনে সর্দ্দার প্যাটেল পশ্চিম ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। তিনি গুজরাটে আন্দোলন পরিচালনা করেন। পুলিসের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিহিংসা গ্রহণের ফলে এখানকার আন্দোলন কঠোর আকার ধারণ করে। কিন্তু সর্দ্দার প্যাটেল সুনিয়ন্ত্রিত গান্ধী-পদ্ধতিতে সত্যাগ্রহ-আন্দোলন পরিচালনা করিয়া তাঁহার দক্ষ পরিচালনা-শক্তির পরিচয় দেন। এই আন্দোলন সম্পর্কে আমেদাবাদে যাঁহারা গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন, সর্দ্দার প্যাটেল তাঁহাদের মধ্যে বহু ব্যক্তির পক্ষ সমর্থন করেন। ইহাই ব্যবহারাজীবরূপে আদালতে তাঁহার শেষ উপস্থিতি।

ভারতের পরবর্ত্তী রাজনৈতিক ইতিহাসে অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কিত প্রস্তাব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সর্দ্দার প্যাটেল এই আন্দোলনে ভারতের জাতীয় নেতারূপে পরিচিত হন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই অমৃতসরে কংগ্রেস অধিবেশন হয়। ইহার পর ১৯২০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইল। এই সময় মধ্যে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিবার জন্য দেশকে প্রস্তুত করিতে থাকেন। কলিকাতায় গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কিত প্রস্তাব সামান্য সংখ্যাধিক্য ভোটে গৃহীত হয়। কিন্তু ইহার কয়েক মাস পরে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে বিপুল-সংখ্যক সদস্য গান্ধীজীকে সমর্থন করেন।

গুজরাটে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে আন্দোলন পরিচালনা করার ফলে সর্দ্দার প্যাটেল নবগঠিত বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ইহা ভিন্ন জাতীয় আন্দোলনে তাঁহার অপূর্ব্ব সংগঠনী শক্তি এবং নেতৃত্বের ফলেই ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় কংগ্রেসের ৩৬শ অধিবেশন আমেদাবাদে সম্ভবপর হয়।

১৯২২ সালের জানুয়ারীতে আমেদাবাদ কংগ্রেসের অব্যবহিত পরে বারদৌলী তালুকে বিঠলভাইয়ের নেতৃত্বে যে সম্মেলন হয় উহাতে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করার সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১লা ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী তদানীন্তন বড়লাট লর্ড রেডিংকে সাত দিন সময় দিয়া এক পত্র দেন। এই পত্র অনুযায়ী অসহযোগ আন্দোলনের সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দিলে এবং সংবাদপত্রের উপর হইতে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া লইলে তিনি বারদৌলী সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখিবেন বলেন।

লর্ড রেডিং ইহার প্রতি কর্ণপাত না করায় গান্ধীজী এবং সর্দার প্যাটেল আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। কিন্তু ইতিমধ্যে চৌরীচৌরা হত্যাকাণ্ড ঘটে এবং গান্ধীজী সমগ্র ভারতে আন্দোলন স্থগিত রাখিবার নির্দেশ দেন।

১৯২২ সালে গয়ায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

গয়া কংগ্রেসের পর দেশবন্ধু শীঘ্রই "স্বরাজ্য দল" গঠন করেন। গান্ধীবাদী কংগ্রেস চাহিয়াছিল বাহির হইতে সরকারের অসহযোগিতা করিতে, কিন্তু স্বরাজ্য দল তাহা চাহিল আইন সভায় প্রবেশ করিয়া।

দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভের পূর্ব্বে নাগপুরের রাজনৈতিক ঘটনাবলী দেশবাসীর নিকট গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে। নাগপুরে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল জাতীয় পতাকা সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯২৩ সালের ১লা মে ১৪৪ ধারা জারী করিয়া শহরের সিভিল লাইনের অভিমুখে জাতীয় পতাকা লইয়া শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহা হইতেই এখানে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের উৎপত্তি।

নাগপুর সত্যাগ্রহ কাহিনীর মত সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। প্যাটেল ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহসিকতা ও ত্যাগের সংবাদে সকলে মুগ্ধ হইয়া গেল। তাঁহাদের দৃঢ় সঙ্কল্প ও আন্দোলন সর্বশেষে জয়ী হইল। ১৯২৩ সালের ১৮ই আগষ্ট ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকা সত্ত্বেও যে কোন রাস্তা দিয়া পতাকা শোভাযাত্রা যাইতে দেওয়া হইল। দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে আন্দোলনের নেতা ও স্বেচ্ছাসেবকদের সাহসিকতা, স্বাদেশিকতা ও ত্যাগের প্রশংসা করা হয় ও তাহাদিগকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

বারদৌলী গুজরাটের একটি তহশীল। এখানে কৃষিজীবীদেরই বাস। ১৯২৮ সালে রাজস্ব বোর্ড ভূমি-ব্যবস্থার সময় রায়তদের খাজনার হার শতকরা ২০৲ টাকা বর্দ্ধিত করিয়া দেয়। পশ্চিম-ভারতের মধ্যে এখানকার কিষাণেরা খুবই আত্মসচেতন। এই তহশীলে গান্ধীজীর পরীক্ষামূলকভাবে আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্কল্প হইতেই বুঝা যায়, এখানকার কৃষকদের মানসিক দৃঢ়তা কিরূপ।

কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত পরামর্শ না করিয়া তাহারা নিজেরাই খাজনা বন্ধের সিদ্ধান্ত করে। তালুকবাসী রায়তদের এক সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সম্মেলনেই রায়তদের আন্দোলনে সাহায্য ও নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য সর্দার প্যাটেলকে আহ্বান জানানো হয়।

সর্দারজীও অবিলম্বে এই আন্দোলনে সাড়া দিলেন। বারদৌলীতে গিয়া তিনি বলিষ্ঠ কিষাণদিগকে লইয়া একনিষ্ঠ সত্যাগ্রহী দল গঠন করিলেন। কিষাণদিগকে লইয়া তিনি খাজনা বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন।

সরকার রায়তদের গবাদি পশু ও তাহাদের সম্পত্তি ক্রোক করিতে লাগিল। নানাভাবে কিষাণদের উপর নির্যাতন চলিতে লাগিল। শত শত কিষাণ বন্দী হইল ও কারাবরণ করিল। শুধু পুরুষদিগকে নয়, নারী-নির্যাতনের সংবাদও শুনা যাইতে লাগিল। কিষাণদিগকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিতে পাঠানদিগকে আমদানী করা হইল। সত্যাগ্রহ দমন করার জন্য যেন শক্তিমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল শক্তি নিয়োজিত করা হইল। বোম্বাইয়ের তদানীন্তন গবর্ণর পুণায় এক বক্তৃতায়ও এই কথাই শাসাইয়া বলিয়াছিলেন।

সকল প্রকার অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে বারদৌলীর সত্যাগ্রহী রায়তগণ মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়।

এই সমগ্র আন্দোলন একজন মাত্র মানুষের—সর্দার প্যাটেলের সৃষ্টি। প্রথম অবস্থায় এই সংগ্রামে কংগ্রেস হস্তক্ষেপ করে নাই অথবা বাহিরের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রায়তদিগকে সাহায্যের জন্য সরাসরি আগাইয়া আসেন নাই।

সর্দার প্যাটেলই জয়ী হইলেন। এই বিরাট সংগ্রামে জয়লাভের পরই তিনি ভারতের দুর্দ্ধর্ষ কৃষক, "লৌহমানব" এবং "বারদৌলীর সর্দ্দার" বলিয়া গণ্য হইলেন।

১৯২৯ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর লক্ষ্ণৌয়ে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির বিশেষ অধিবেশন বসিল। সর্দারজী বিশেষ সতর্কতা সহকারে নিজেকে গান্ধীজীর মন হইতে দূরে রাখিয়া কংগ্রেসের ১৯২৯ সালের লাহোর অধিবেশনে জবাহরলালকে সহজে সভাপতি নির্ব্বাচিত করার সুযোগ দিলেন।

৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রদত্ত চরমপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে নেহরু রিপোর্টও বাতিল হইয়া গিয়াছে বলিয়া লাহোর কংগ্রেসে ঘোষণা করা হয়। এই হেতু কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন; ইহার অর্থ ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ। ইহা ছাড়া প্রতি বৎসর ২৬শে জানুয়ারী সমগ্র জাতি স্বাধীনতা দিবস পালন করিবে বলিয়াও স্থির হয়।

২৬শে জানুয়ারী প্রথমবার সমগ্র ভারতে স্বাধীনতা দিবস বিপুল সাফল্যের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানকল্পে লর্ড আরুইন ও ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে গান্ধীজী পত্র ব্যবহার করিতে থাকেন। বড়-লাটের সঙ্গে গান্ধীজীর আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হওয়ায় ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি সবরমতীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠক আহ্বান করা হয়। বৈঠকে এক যুগান্তকারী প্রস্তাব গৃহীত হইল। উহাতে গান্ধীজীকে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। গান্ধীজীও কার্য্যারম্ভের জন্য দ্রুত পরিকল্পনা রচনা করিতে থাকেন। তিনি লবণ আইন ভঙ্গ করিয়া আইন অমান্য করিবেন বলিয়া স্থির করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অনুগামীসহ সবরমতী হইতে সমুদ্রতীরবর্ত্তী ডাণ্ডিতে সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিবার জন্য যাত্রা করিবার ব্যবস্থা করেন।

গান্ধীজীর পূর্ব্বগামী পথ-প্রস্তুতকারক হিসাবে সর্দ্দার প্যাটেল স্বেচ্ছায় যে কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তাহার মধ্যে আন্তরিকতা, মহত্ত্ব ও অভিনবত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যীশুর পূর্ব্বগামী জন দি ব্যাপ্টিষ্টের সঙ্গে একমাত্র তাঁহারই তুলনা চলে। পৃথিবীর ত্রাণকর্ত্তার আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুতের অথবা তাঁহাকে গ্রহণের উপযোগী শিক্ষাদানের চেষ্টা ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে জুডার কর্ত্তৃপক্ষ যেরূপ নির্য্যাতন আরম্ভ করে, ভারতের ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষও প্যাটেলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য দ্রুত অনুরূপ দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। গান্ধীজী অভিযান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই ১২ই মার্চ্চ রাস নামক স্থানে বল্লভভাইকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গান্ধীজীর ডাণ্ডী অভিযান ২৪ দিন স্থায়ী হইয়াছিল। এই অভিযানে কর্ত্তৃপক্ষ কোনরূপ বাধা দেন নাই; ইহাতে তিনি ও লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী অবাক হইয়া যান। অভিযানের প্রারম্ভেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহার জনপ্রিয়তা ও প্রভাব এত বেশী ছিল যে, তাঁহাকে গ্রেপ্তার করার অর্থ সমগ্র দেশ-বাসীকে গ্রেপ্তার করা হইবে বলিয়া লর্ড আরুইন বুঝিতে পারেন।

ইহার পর গোলটেবিল বৈঠক সাফল্যমণ্ডিত না হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার তাহার সকল প্রতিশ্রুতি জলাঞ্জলি দিয়া কঠোর দমননীতি সুরু করিয়া দেয়।

গান্ধীজী ব্রিটিশ বড়লাট লর্ড উইলিংডনের নিকট সরকারের অত্যাচার সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করিয়া এক তার প্রেরণ করেন এবং বড়লাটও সঙ্গে সঙ্গে তারের জবাব দেন, কিন্তু উহাতে প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা তো ছিলই না, অধিকন্তু গান্ধীজীর শান্তির প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করা হয়। গান্ধীজী ও ১৯৩১ সালের কংগ্রেস-সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহা-দিগকে যারবেদা জেলে আটক রাখা হয়। ১৬ মাস পর তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন। গান্ধীজী সর্দ্দার প্যাটেলের সহিত বাস করিবার সুযোগকে 'শ্রেষ্ঠ অধিকার' বলিয়াছেন। গান্ধীজী লিখিয়াছেন, "আমি তাঁহার অপরিসীম বীরত্বের কথা জানি। তিনি যে স্নেহ দিয়া আমাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, তাহা আমার মায়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাঁহার যে মায়ের মত গুণ আছে, তাহা আমি জানিতাম না।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে গান্ধীজী যুদ্ধের বিরোধিতা করিয়া ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন। সর্দ্দার প্যাটেলকে ভারতরক্ষা আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয়। পরে ক্রীপস আলোচনার পূর্ব্বে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধিবেশনে "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গৃহীত হয়। সর্দ্দার প্যাটেল এই উপলক্ষে বলেন, "ব্রিটিশদের অপেক্ষা বরং আমরা ডাকাতদের দ্বারা শাসিত হইব।"

নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের পর মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবর্গকে গ্রেপ্তার করা হয়। সর্দ্দার প্যাটেল ও অন্যান্য নেতৃবর্গকে আমেদাবাদ কোর্টে আটক রাখা হয়। ১৯৪৫ সালে সর্দ্দার প্যাটেল আমেদাবাদ কোর্ট হইতে মুক্তিলাভ করেন।

১৯৪৬ সালে কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনানুযায়ী শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তর করা হইলে শ্রীজবাহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং সর্দ্দার প্যাটেল উক্ত মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত-ব্যবচ্ছেদের পর ভারত স্বাধীন হইলে সর্দ্দার প্যাটেল প্রথম সহকারী প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং তিনি দেশীয় রাজ্য ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার গ্রহণ করেন। সর্দ্দার প্যাটেল ভারতের ইতিহাসে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সম্রাট্ অশোক, সমুদ্র গুপ্ত, আকবর, আওরঙ্গজেব এবং ব্রিটিশ শাসনের আমলে যাহা সম্ভব হয় নাই, সর্দ্দার প্যাটেল তাহাই করিয়াছেন। তিনি প্রায় ছয় শত সামন্ত রাজ্যকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া একশাসনব্যবস্থার অধীনে আনিয়াছেন। তিনি সামন্ত প্রথার বিলোপসাধন করিয়াছেন।

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু যখনই দেশের কোন স্থানে সমস্যা দেখা দেয়, তখনই সেই বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই হেতু তাঁহাকে একের পর আর বহু দূর স্থানে যাইতে হয়। কলিকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানে অন্তর্ঘাতী কার্য্য-কলাপের ফলে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে এক বিরাট সমস্যা দেখা দেয়। এইজন্য ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে সর্দ্দারজীকে কলিকাতা আসিতে হয়।

ইহার কিছুকাল পরই পূর্ব্ববঙ্গে ভয়াবহ দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ হয়। এই সময় পূর্ব্ববঙ্গের ব্যাপক অঞ্চলে গোঁড়া ও গুণ্ডাশ্রেণীর মুসলমানগণ সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অবাধে যে নৃশংস অত্যাচার চালাইয়াছে, তাহার কোন তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পূর্ব্ববঙ্গের এই সকল শোচনীয় ঘটনার ফলে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে অবিরাম উদ্বাস্তু আগমনের ফলে কিছুকালের জন্য কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানে অবস্থা বিশেষ গুরুতর আকার ধারণ করে। দিল্লী চুক্তির ফলেও সেই অবস্থা শান্ত হয় নাই। এই হেতু ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ১৯৫০ সালের ১৬ই এপ্রিল পুনরায় কলিকাতা পরিদর্শনে আসিতে হয়। (এই সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা "আনন্দবাজার পত্রিকা" হইতে গৃহীত।)

শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষের বিবৃতি

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের পদত্যাগের পর একটি বিবৃতি দিয়াছেন। বিবৃতিটিকে দুই অংশে ভাগ করা যায়। ডাঃ ঘোষের পদত্যাগপত্রে বলা হইয়াছিল যে, পুনরায় যাহাতে দেশে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গঠিত হয় তাহার জন্যই তিনি কংগ্রেস ছাড়িয়াছেন। বিবৃতির প্রথমার্দ্ধে এই কথার জবাবে শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলিতেছেন, "আমরা বিশ্বাস করি না যে ডাঃ ঘোষ কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া কোন নূতন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গঠন করিতে সক্ষম হইবেন।" যে যুক্তিক্রম অবলম্বনে শ্রীঅতুল্য ঘোষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা এই :

"১৯২৩ সালে স্বরাজ্য পার্টি গঠনের পর ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি নির্ব্বাচনে ডাঃ ঘোষের দল দেশবন্ধুর দলের নিকট পরাজিত হন। তাহার পর বাস্তবিক পক্ষে ডাঃ ঘোষের সহিত কংগ্রেসের বহু বৎসর কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না এবং ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ডাঃ ঘোষ এবং তাঁহার অভয় আশ্রমের সহকর্ম্মীরা অভয় আশ্রমের নাম দিয়া বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর জেলায় আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করেন। ১৯৩৪-এর পর যখন কংগ্রেসের উপর হইতে সর্ব্বপ্রকার বিধিনিষেধ উঠিয়া যায়, প্রকৃতপক্ষে তিনি তখন সক্রিয়ভাবে কংগ্রেসের কার্য্যে যোগদান করেন। ১৯৩৪ হইতে ১৯৫০-এর সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত আচার্য্য কৃপালনী এবং শ্রীশঙ্কররাও দেও নিখিল-ভারত কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন এবং ১৯৩৪ সাল হইতে ১৯৫০ এর সেপ্টেম্বরে সভাপতি নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত ডাঃ ঘোষ এবং তাঁহার সমর্থকগণের মনোমত ব্যক্তিরাই কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিয়াছেন। মধ্যে অবশ্য সামান্য সময়ের জন্য ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল নেতাজীর নির্ব্বাচনে। ডাঃ ঘোষ নিজেও ১৯৪০ হইতে ১৯৫০-এর সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে ছিলেন। ইহা কাহারও পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব নহে যে, ১৯৫০-এর সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৫০-এর নবেম্বরের মধ্যে কংগ্রেসের পতন হইয়াছে। পতন যদিই হইয়া থাকে, তাহা ধীরে ধীরে বহু বৎসর ধরিয়াই হইয়াছে এবং ডাঃ ঘোষের সমর্থিত ব্যক্তিগণের সভাপতিত্বে এবং সম্পাদনায় সঙ্ঘটিত হইয়াছে, আর এই দশ বৎসর ধরিয়া ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরূপে এই অনাচার বৃদ্ধিতে তাঁহারও অংশ কম নহে। এই অবস্থায় তিনি যে বিবৃতিই প্রকাশ করুন না কেন, কংগ্রেসের অনাচার বৃদ্ধির দায়িত্ব তিনি এড়াইয়া যাইতে পারেন না। যদি তাঁহার বিবৃতি সত্য হয় অর্থাৎ কংগ্রেস সত্যই অনাচারে পূর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি এবং তাঁহার সমর্থিত ব্যক্তিরাই ধীরে ধীরে কংগ্রেস ধ্বংস করিবার জন্য কংগ্রেসে অনাচার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেইজন্যই তাঁহার দ্বারা দেশের মধ্যে সবল ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। সেইজন্যই আমরা বিশ্বাস করি না যে, ডাঃ ঘোষ কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া কোন নূতন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গঠন করিতে সক্ষম হইবেন। আর যদি তাঁহার বিবৃতি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।"

দেশবন্ধুর দলের নিকট পরাজয়ের পর ডাঃ ঘোষের কংগ্রেসের সহিত বহু বৎসর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নহে। ঐ সময় কংগ্রেস 'নো-চেঞ্জার এবং 'প্রো-চেঞ্জার' দলে ভাগ হইয়া যায়। এই সময় দেশবন্ধুর দলে না থাকাটা কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ না রাখার নিদর্শন নয়। ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচনে বাংলাদেশে একমাত্র ডাঃ ঘোষের দলের ৮০ জন তাঁহার বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন। এই সব কাজকে কংগ্রেস ছাড়া বলিলে অত্যুক্তি হয়। ১৯৪০ হইতে ১৯৫০ পর্য্যন্ত ডাঃ ঘোষ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে ছিলেন—এটাও ঠিক নয়। এই সময়ের মধ্যে কিছুকাল শরৎচন্দ্র বসু ওয়ার্কিং কমিটিতে ছিলেন। ডাঃ ঘোষকে সমালোচনা করিবার অনেক কারণ আছে, গত সংখ্যা প্রবাসীতে আমরা তাহা করিয়াছি। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া কোন নূতন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গঠন করিতে পারিবেন না, শ্রীঅতুল্য ঘোষের এই সিদ্ধান্ত আমরা সমর্থন করি ; কিন্তু তার জন্য যে যুক্তিক্রম তিনি দিয়াছেন তাহার মধ্যে বহু মারাত্মক ভুল কথা আছে। প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতির পক্ষে কংগ্রেসের অতি আধুনিক ইতিহাস সম্বন্ধে এরূপ অজ্ঞতা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। এই বিবৃতি ইংরেজী কাগজেও ফলাও করিয়া সম্পূর্ণ ছাপা হইয়াছে। ভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস কর্ম্মীদের নিকট বাংলা কংগ্রেসের সভাপতির এই প্রচণ্ড অজ্ঞতা হাস্যকর বলিয়াই মনে হইবে।

বিবৃতিটির দ্বিতীয়াংশে শ্রীঅতুল্য ঘোষ বাংলায় কংগ্রেস আন্দোলন সম্বন্ধে যে সব উক্তি করিয়াছেন তাহা শুধু যে ভুল তাহা নহে, নিতান্ত আপত্তিকর এবং বাঙালীর পক্ষে কলঙ্কজনক। তিনি বলিতেছেন যে, বাংলাদেশে কংগ্রেসের শক্তি কোন দিনই ছিল না, ডাঃ ঘোষ উহাকে আর বেশী কি শক্তিহীন করিবেন। ঘোষ মহাশয়ের বিবৃতির এই অংশটি এইরূপ :

"এই বাংলাদেশের কলিকাতা মহানগরীতে ১৯২০ সালে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে কংগ্রেস হইতে অসহযোগ

প্রস্তাব গৃহীত হয়। অধিবেশন বাংলায় হইয়াছিল, কিন্তু অধিকাংশ বাঙালী প্রতিনিধি অসহযোগ প্রস্তাবে বিরোধিতা করেন এবং প্রদেশের সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা দেশবন্ধু অসহযোগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করিবার জন্য নাগপুর অধিবেশনে যোগদান করেন। অবশেষে দেশবন্ধু অসহযোগ প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়ায় বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয় এবং তাহাও মাত্র কলিকাতা মহানগরী ও কয়েকটি প্রদেশ, বোম্বাই, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশের সর্ব্বস্তরের গ্রাম ও শহরের জনসাধারণ যে ভাবে সাড়া দেয়, বাংলায় তাহার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ১৯৩০-এর লবণ সত্যাগ্রহে বাংলার ছাত্ররা যোগদান করিতে অস্বীকার করেন এবং দেশপ্রিয় সেনগুপ্তকে কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে (হেদুয়া) বেআইনী পুস্তক পাঠ করিয়া বাংলাদেশে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিতে হয়। মেদিনীপুর এবং আরও দু-একটা ছোটখাট জেলার গ্রামে এ আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকে। ১৯৩২-এর আন্দোলনেও অনুরূপ। ইহা সত্য যে সমগ্রভাবে মেদিনীপুর জেলায় গণজাগরণের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তাহা ৪২-এর বিপ্লবেও অব্যাহত ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের অন্য কোন জেলা সে গৌরব ও মর্য্যাদার অধিকারী হয় নাই। খণ্ড খণ্ড ভাবে কয়েকটা জেলায় সামান্য আন্দোলন হইয়াছিল; কিন্তু জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সমগ্র দেশ তাহাতে সাড়া দেয় নাই। কলিকাতা মহানগরীতে সামান্য দু-একটা ট্রাম ও বাস ধ্বংস করিয়াই এবং কয়েকটা শোভাযাত্রা বাহির করিয়াই আগষ্ট বিপ্লবের অবসান ঘটে। বিশেষ বিচার করিলে বুঝা যায় যে, বাংলাদেশের গণমন কখনও কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দেয় নাই। যদিও ইহা সত্য যে, নির্ব্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থীরা জনসাধারণের সমর্থন লইয়াছেন, কিন্তু সময়-সুযোগমত বাংলার জনসাধারণ ইহাও প্রমাণিত করিয়াছেন যে, নির্ব্বাচনেও বাংলাদেশ কংগ্রেসকে সমর্থন করে না! ১৯৩০ হইতে ১৯৩৪-এর আইন অমান্য আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় শেষ হইবার পর কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্ব্বাচন হয়। সেই নির্ব্বাচনে বাংলাদেশের সব কয়টি আসনে কংগ্রেসপ্রার্থী পরাজিত হন। ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা, ইহা সত্য। বাঙালী ব্যক্তিগত ভাবে বহু ত্যাগস্বীকার করিয়াছে, নির্য্যাতন বরণ করিয়াছে; কিন্তু সমষ্টিগতভাবে বাঙালী জাতি হিসাবে কংগ্রেস আন্দোলনকে বিশেষভাবে গ্রহণ করে নাই। ১৯৪২-এর আগষ্ট বিপ্লবে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, গুর্জ্জর, মদ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ বিপ্লবের অগ্নিতে নিজেদের আহুতি দিয়াছে। বাঙালী সেই বিপ্লবকে শ্রদ্ধা করিয়াছে, কিন্তু সমগ্রভাবে গ্রহণ করে নাই। এই অবস্থায় বাংলাদেশে কংগ্রেস শক্তিহীন হইতেছে, এই বিবৃতি জনসাধারণকে উদ্‌ভ্রান্ত করিতে পারে, কিন্তু ইহার সহিত সত্যের সম্পর্ক নাই। কেন বাংলাদেশের এই অবস্থা, তাহার আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা আমরা আলোচনা করিতেছি।"

"অসহযোগ আন্দোলনে বোম্বাই, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশের সর্ব্বস্তরের গ্রাম ও শহরের লোক যেভাবে সাড়া দেয় কলিকাতা ছাড়া বাংলাদেশে তাহা হয় নাই"—অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে এই উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। বাংলার প্রায় প্রত্যেক মফস্বল শহরে অসহযোগ আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

"১৯৩০ সালের লবণ সত্যাগ্রহে বাংলার ছাত্রেরা যোগদান করিতে অস্বীকার করেন এবং দেশপ্রিয় সেনগুপ্তকে কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে বেআইনী পুস্তক পাঠ করিয়া বাংলাদেশে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিতে হয়। মেদিনীপুর এবং আরও দু-একটা ছোটখাট জেলার গ্রামে এ আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকে।" এই উক্তি শুধু মিথ্যা নহে, ইহা ক্ষতিকারক। বাংলার তরুণ সমাজ কোন সময়েই গান্ধীবাদে বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগদানের জন্য গান্ধীজীর ডাক আসিবামাত্র তাহারা উহাতে যোগ দিয়াছে। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দ্বারা বিপ্লব আন্দোলনেরও আরম্ভ হয়। বাংলার যুবসমাজ ও ছাত্রসমাজ উভয় আন্দোলনেই ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। বাংলায় লবণ তৈরির সুবিধা সব জায়গায় নাই বলিয়া কতকগুলি স্থানে লবণ সত্যাগ্রহ সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু বেআইনী পুস্তক পাঠ, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ প্রভৃতি অন্যান্য উপায়ে সর্ব্বত্রই আইন অমান্য আন্দোলন চলিয়াছে। দেশপ্রিয় সেনগুপ্তকে বেআইনী পুস্তক পাঠ করিয়া আইন অমান্য আরম্ভ করিতে হয় একথা বলা সম্পূর্ণ সত্য নয়; আইন অমান্য তার আগেই আরম্ভ হইয়াছিল, দেশপ্রিয় স্বয়ং বেআইনী পুস্তক পাঠ করিয়া কলিকাতার আন্দোলনে শক্তি সঞ্চার করেন। বিলাতী পণ্য বর্জ্জন এবং বিলাতী কাপড় পোড়ানো অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনের অঙ্গ ছিল। বাংলাদেশে দুইটিই প্রবলভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়। অতুল্য বাবুর এ সম্বন্ধে কোনই জ্ঞান নাই দেখা যাইতেছে। বাংলায় বিলাতী বর্জ্জন আন্দোলন এতো সফল হইয়াছিল যে, খুব কম প্রদেশেই এরূপ হইয়াছে। বাংলার এই বয়কটের পূর্ণ সুযোগ বোম্বাই ও আমেদাবাদের মিল মালিকেরা লাভ করিয়াছিল। বিলাতী কাপড়ের প্রতিযোগিতায় যে সময়ে ইহাদের মিল বন্ধ করিবার উপক্রম হইয়াছে সেই সময়ে বয়কট আন্দোলনে আলোড়িত বাংলা সিল্কের দামে ইহাদের চট কিনিয়া কত কোটি টাকা ইহাদের পকেটে ঢালিয়াছে তার হিসাব বাহিরের লোক করিবে না সত্য, কিন্তু বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতির পক্ষে এ কথা ভুলিয়া যাওয়া অমার্জ্জনীয় অপরাধ। লবণ সত্যাগ্রহের আন্দোলন সর্ব্বশেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল বাংলায়, মেদিনীপুর ও আরামবাগে।

"১৯৪২ সালে খণ্ড খণ্ড ভাবে কয়েকটা জেলায় সামান্য আন্দোলন হইয়াছিল, কিন্তু সমগ্র দেশ তাহাতে সাড়া দেয় নাই; কলিকাতায় সামান্য দু-একটা ট্রাম ও বাস ধ্বংস করিয়া এবং কয়েকটা শোভাযাত্রা বাহির করিয়াই আগষ্ট বিপ্লবের অবসান ঘটে"—অতুল্য বাবুর এই উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। মেদিনীপুরের নাম তিনি উল্লেখমাত্র করিয়াছেন, কিন্তু ঐ জেলার আগষ্ট বিপ্লব আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে বালিয়া বা সাতারা জেলার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বলিয়াছিলেন যে, মেদিনীপুরের একাংশে ব্রিটিশ শাসন বিদ্যমান নাই,

সরকারের সৈন্য ও পুলিস সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। ঘূর্ণীবাত্যার সুযোগে ইংরেজ সেখানে এই আন্দোলনের যে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়াছিল তার কথা শ্রীঅতুল্য ঘোষের জানা না থাকিতে পারে কিন্তু উহার বহু সাক্ষী এখনও জীবিত আছেন। কলিকাতা শহরেও আগষ্ট বিপ্লব আন্দোলন প্রবল ভাবে চলিয়াছিল, প্রায় তিন শত লোক পুলিসের গুলিতে নিহত ও আহত হইয়াছিল। যে অবস্থায় এই সময়ে কলিকাতায় শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছে, ভারতবর্ষের আর কোনও শহরে এতখানি বিপদ এবং এত বেশী ঝুঁকি লইয়া অনুরূপ শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছে বলিয়া জানি না। কলিকাতার শান্তিরক্ষার উপর ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট মুসলীম লীগ ও মুসলমান সৈন্য ও পুলিসের সাহায্যে সমগ্র শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়াছিল এবং সেই শক্তি বাঙালী তরুণেরা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল। ১৯৪২ সালে বাংলায় যত যুবক হতাহত, গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে আটক হইয়াছে আর কোন প্রদেশে এত হয় নাই। অতুল্যবাবু অন্যান্য প্রদেশের "সর্ব্বস্তরের গ্রাম ও শহরের জনসাধারণ" আন্দোলনে যোগ দিয়াছে বলিয়া বলিয়াছেন, ইহাও তাঁহার অজ্ঞতার নিদর্শন। এক শ্রেণীর আত্মভোলা লোক চিরদিনই কংগ্রেস আন্দোলন পরিচালিত করিয়াছে। তবে একদল ধনিক ভবিষ্যৎ স্বার্থের লোভে কিছু টাকা দিয়াছে এবং বুদ্ধিমান সুবিধাবাদীরা বাক্স-বিছানা বাঁধিয়া, জেলে ঢুকিয়া "রাজনৈতিক উপবীত" লাভের আশায়, জেল-গেটে ধর্ণা দিয়াছে। কিন্তু স্বদেশী যুগ হইতে স্বাধীনতা লাভ পর্য্যন্ত এই আত্মভোলাদের সংখ্যা ভারতের কোন প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশে কম ছিল না। কংগ্রেস বা বিপ্লব আন্দোলনের আগুনে যাহারা হাত দেয় নাই, কংগ্রেস আপিসের দোর গোড়া পর্য্যন্ত যাহাদের দৌড় ছিল, সেই জাতীয় ভলাণ্টিয়ার কংগ্রেস-সভাপতির আসনে বসিয়া বিদ্যা জাহির করিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু তাহা করিতে দিলে সমগ্র দেশের মুখে চুণকালি পড়ে এইটাই আমাদের বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখা দরকার।

১৯২০, ১৯৩০ ও ১৯৪২ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। সেই সূত্রেই অতুল্যবাবুর বিবৃতির তীব্র সমালোচনা আমরা করিতেছি। ১৯৪২ সালের গণআন্দোলনের সময় বাংলা, বিহার, আসাম ও যুক্তপ্রদেশের বিপ্লবে যাঁহারা চালক ছিলেন তাঁহাদের নেতৃস্থানীয়দিগের অধিকাংশের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। অতুল্যবাবু সে সময় কোথায় গা-ঢাকা দিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু এ কথা সত্য যে তিনি সে সময় এই কয় প্রদেশের আন্দোলনে কোন অংশই গ্রহণ করেন নাই। অসহযোগ আন্দোলনে তাঁহার নামও কেহ জানিত কি না জানি না, লবণ সত্যাগ্রহের সময়ের কথাও তিনি ঠিক জানেন না ইহা আমরা দেখিতেছি।

পরিশেষে শ্রীমান্ প্রফুল্ল সেনকে আমরা বলিব যে, তাঁহার এখনও যদি চোখ না খোলে তবে "পার্টি চেষ্ট"-এ কোটি টাকা আসিলেও তাঁহার জাতও যাইবে পেটও ভরিবে না, সঙ্গদোষের ফলে। বাজারে অযথা ও অকারণ বদনাম অর্জ্জন করাই যদি তাঁহার ঈপ্সিত হয় তবে তথাস্তু!

শ্রীঅতুল্য ঘোষের ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ এতাদৃশ বিবৃতি প্রকাশ করিয়া পশ্চিম বাংলার ইংরেজী ও বাংলা সংবাদপত্রগুলি যে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে তাহাতে আমরা অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করিতেছি।

কম্যুনিজম ও হাইকোর্ট

কলিকাতা হাইকোর্ট কম্যুনিষ্ট বন্দীদের ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, ইঁহাদিগকে আটক রাখা বেআইনী হইয়াছে এবং যে ১৯ জন বন্দী হেবিয়াস কর্পাস দাবি করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে অবিলম্বে মুক্ত করিবার জন্য হাইকোর্ট আদেশ দিয়াছেন। হাইকোর্টের রায়ের প্রকাশ্য সমালোচনা বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ ইহাতে সামান্য সামান্য ব্যাপারে বিরূপ আলোচনার দ্বারা বিচারকার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। কিন্তু হাইকোর্টের রায় সকল সমালোচনার একেবারে উর্দ্ধে যাওয়া উচিত নহে ইহাই আমাদের বিশ্বাস এবং যাঁহাদের তাহা করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা ও দায়িত্বজ্ঞান আছে তাঁহারা এরূপ করিলে তাহাতে দেশের অকল্যাণ না হইয়া কল্যাণ হইবারই সম্ভাবনা সমধিক। বিচারের সময় হাইকোর্টের বিচারপতিদের মনে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব বা রাষ্ট্রচালকদিগের প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আক্রোশ যাহাতে না থাকে তাহা বিশেষ ভাবে না দেখিলে ন্যায় বিচারকেও লোকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করে।

ভারতবর্ষে কম্যুনিষ্ট আন্দোলন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, মাদ্রাজে কম্যুনিষ্টরা কতদূর ব্যাপক সশস্ত্র আন্দোলন করিয়াছে তাহার নিদর্শন দিল্লীতে এক কম্যুনিষ্ট অস্ত্র প্রদর্শনীতে দেখানো হইতেছে। বাংলাদেশেও কম্যুনিষ্টদের হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ সুবিদিত। ইহারা যানবাহন চলাচল, খাদ্য সংগ্রহ প্রভৃতি জাতির অত্যাবশ্যক কার্য্যে প্রবলভাবে বাধা দিয়াছে, তার জন্য বোমা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছে। সশস্ত্র ডাকাতিগুলিতে ইহাদের হাত আছে তাহা সন্দেহ করা অন্যায় হইবে না। জাতির শান্তিপূর্ণ জীবন এবং অত্যাবশ্যক কার্য্যকলাপে বাধা দান দেশের প্রতি শত্রুতা ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ইহাদের দেশদ্রোহাত্মক কার্য্যকলাপ বন্ধ করিবার জন্যই বাংলাদেশে কম্যুনিষ্ট দলকে বেআইনী ঘোষণা করা হইয়াছে। এই ঘোষণার পরমুহূর্ত্তে কম্যুনিষ্ট দলের নেতৃবৃন্দ আত্মগোপন করিয়াছেন। ইঁহাদের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে, তার বিরুদ্ধে তাঁরা আদালতে প্রতিকার প্রার্থনা করেন নাই। পুলিস যখন ধরিয়াছে তখনই তাঁহারা আইনের ফাঁক ধরিয়া মুক্তিলাভের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হইয়াছেন।

যে সমস্ত কম্যুনিষ্ট বন্দীকে ধরিয়া রাখা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া আদালত রায় দিয়াছেন তাহাদের মামলা সম্পর্কে কেবল এইটুকু মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে যে, ইহাদিগকে আটকানো বেআইনী হইয়াছে। ইহার চারটি অর্থ হইতে পারে। হয় আইনে ফাঁক আছে, নয় ভুল লোক ধরা হইয়াছিল, নতুবা ইহাদের বিরুদ্ধে পর্য্যাপ্ত প্রমাণ আদালতে উপস্থিত করা হয় নাই অথবা

বিচারে ভুল আছে। কম্যুনিষ্টদের কার্য্যকলাপ জাতীয় স্বার্থের বিরোধী ইহাতে দ্বিমত নাই, ইঁহাদের অন্যায় কাজ বন্ধ করিবার উপযুক্ত আইন যদি না থাকে, বা আইনে যদি কোন ফাঁক থাকে তবে তাহা মেরামত করিতে লেশমাত্র বিলম্ব হওয়া উচিত নহে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দেশবাসীর অভিমত তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিকাংশের মতের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়। আইন সভায় এরূপ যে অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দ্বিধা করিবার কিছু নাই। প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের আইন সভাতেই ইহাদের রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যকলাপ দমন করিবার জন্য আইন পাস হইয়াছে। যদি সেই সমস্ত আইনে ত্রুটি থাকে, তবে তাহা সংশোধনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। আইনের মর্য্যাদা অবশ্যই পালিত হইবে, কিন্তু দেশের স্বার্থ এবং জনসাধারণের অভিমতের স্থান তাহারও উর্দ্ধে। ভারত-সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহের আইন-সচিবদের ইহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রশ্ন, ভুল লোক ধরা এবং পর্য্যাপ্ত প্রমাণ উপস্থিত না করা। এখানে পুলিসের দায়িত্ব আসিয়া পড়িতেছে। ইংরেজ আমলে বিপ্লবীদের কার্য্যকলাপ এবং ষড়যন্ত্রের সংবাদ ও প্রমাণ সংগ্রহের জন্য যত টাকা ব্যয় হইত এবং যত লোক নিযুক্ত ছিল এখন দুইটিই তার চেয়ে অনেক বাড়িয়াছে। তখন বিপ্লবীদের প্রতি জনসাধারণের পরোক্ষ সহানুভূতি গভীর ছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহও তাই রীতিমত কঠিন ছিল। কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে এখন সে কথা খাটে না। দেশের বৃহত্তম অংশ কম্যুনিষ্টদের ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপ সমর্থন করে না, ইহাদের রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যকলাপ দমনে সংবাদপত্রগুলি গবর্ন্মেণ্টকে সমর্থন করিয়া থাকে। আগে অনেকগুলি বিপ্লবী দল ছিল, তাহাদের খোঁজ খবর লওয়া যত কঠিন ছিল এখন একটি মাত্র দল কম্যুনিষ্ট-পার্টির সংবাদ লওয়া তার চেয়ে অনেক সহজ হওয়া উচিত। আগে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার ন্যায় বিরাট মামলা গোয়েন্দা পুলিস পরিচালিত করিয়াছে এবং বড় বড় কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে এত প্রমাণ আদালতে উপস্থিত করিয়াছে যে, অভিযুক্তেরা দণ্ডিত হইয়াছে। এখন বিনা বিচারে আটক রাখা সহজ হইয়াছে এবং তার জন্য প্রমাণ সংগ্রহের দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এত কমিয়া গিয়াছে যে, পুলিসের পুরাতন কৃতিত্ব জাহান্নমে গিয়াছে। ফেরারী পরিচিত কম্যুনিষ্টরা পুলিসকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া প্রকাশ্য বিবাহ সভায় পুলিস কর্ত্তাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াও নিরাপদে ফিরিয়া গিয়াছে ইহা তো আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। বড় বড় কম্যুনিষ্ট নেতাদের অধিকাংশই এখনও ফেরার। ইহার একমাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, হয় পুলিস একেবারে অযোগ্য, নতুবা ইহাদের সহিত কম্যুনিষ্টদের যোগাযোগ রহিয়াছে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে দুইটিই সমান বিপজ্জনক। কলিকাতা পুলিসের অপদার্থতা সম্বন্ধে আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম এবং বর্ত্তমানে পুলিস কমিশনারের কার্য্যকলাপের ফল সম্বন্ধে যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম তাহা এখন অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিসে অন্যতম দক্ষ লোক একজন ছিলেন, তিনি ইন্সপেক্টর জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়া অনেক ভাল কাজ করিয়াছেন। কলিকাতা পুলিস যখন কিছুতেই কম্যুনিষ্ট ধরিতে পারিতেছে না তখন ইঁহার উপর কয়েকটি লোককে ধরিবার ভার দেওয়া হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই ইনি তাহাদিগকে কলিকাতা হইতেই ধরিয়া দেন। ইহার পর কলিকাতা পুলিসের অনেকের সহিত কম্যুনিষ্টদের যোগ আছে একথা কে না বলিবে? পুলিস তৎপর হইলে কম্যুনিষ্টদের বিনা বিচারে আটক রাখিবার দরকার হয় না। তাহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মামলা উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকে আদালতে সোপর্দ্দ করিয়া প্রচলিত আইনানুসারেই দণ্ডিত করিতে পারিত। জনসাধারণ যেখানে ষড়যন্ত্রের কথা বোঝে, পুলিস সেখানে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারে না ইহার চেয়ে কলঙ্কের কথা পুলিস বিভাগের পক্ষে আর কিছু হইতে পারে না।

ইন্সপেক্টর জেনারেল সুকুমার গুপ্ত অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছেন। তাঁহার স্থলে যিনি বসিবেন তিনি কতদূর সফল হইবেন আমরা জানি না। তবে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ, বুদ্ধির অভাবে অথবা নীতিজ্ঞানহীনতাবশতঃ কম্যুনিষ্টদের সহিত পুলিসের উচ্চ অধিকারীদিগের মধ্যে কাহারও কোন সংযোগ যদি থাকে তবে তাহা রাষ্ট্রের পক্ষে পরম অনিষ্টের কারণ হইবে।

চতুর্থ প্রশ্ন বিচারে ভুল আছে কিনা। বাংলা সরকারের উচিত এ বিষয়েও উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণে ইহার নিষ্পত্তি করাইয়া লওয়া। জনসাধারণকে বুঝিবার অবসর দেওয়ার প্রয়োজন যে, সত্য সত্যই নিরাপরাধদের উপর অত্যাচার হইয়াছিল বা আইনের কূটচক্রে দোষী নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইল।

আসামের বিপদ

আসামের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের কাছে নাকি চীনা সৈন্য-বাহিনীর আবির্ভাব হইয়াছে। দৈনিক পত্রে প্রকাশিত এই সংবাদে আমরা তত ভীত নহি যত ভীত আসামের অন্তর্বিরোধে। কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্ট ও রাজ্যের গবর্ন্মেণ্ট বাঙালী-অসমিয়ার বিবাদ মিটাইতে সক্ষম হন নাই। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে তদানীন্তন প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীদেবেশ্বর শর্ম্মা এক বক্তৃতায় বলেন :

"কতকটা অর্থনৈতিক চাপ হ্রাস করার জন্য পূর্ব্ব পাকিস্থান আসামে সুপরিকল্পিত ভাবে লোক পাঠাইতেছে। ফলে বদরপুর, গোলকগঞ্জ ও সীমান্তের অন্যান্য প্রবেশপথ দিয়া প্রত্যহ পরম উৎসাহী পাকিস্থানী মুসলমান ভয়াবহ সংখ্যায় আসামে আসিয়া ঢুকিতেছে। আমাদের গবর্ন্মেণ্ট শুধু কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের মুখের দিকে চাহিয়া থাকা ছাড়া এই বিপদ প্রতিরোধ করার কোনই চেষ্টা করিতেছেন না। আসামের বর্ত্তমান জটিল ও সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা এই : প্রত্যহ বহুসংখ্যক পাকিস্থানী বদ মতলব লইয়া আসামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে ; এই অভিযান রোধ করিতে এখন পর্য্যন্ত কিছুই করা হয় নাই ; কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্ট, কি কারণে জানি না, এ বিষয়ে উদাসীন

এবং আমাদের প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট অসহায়ভাবে শুধু তাকাইয়া আছেন।"

তাহার ৬ মাস পরে শ্রীকামিনীকুমার সেন, শ্রীসতীন্দ্র-মোহন দেব,* শ্রীবিদ্যাপতি সিংহ, অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র লস্কর ও শ্রীরমেশচন্দ্র দাস, কাছাড় জেলার এই পাঁচ জন কংগ্রেসী এম-এল-এ, যুক্ত স্বাক্ষরিত এক পত্রে প্রধানমন্ত্রী গোপীনাথ বড়দলৈকে লিখেন: "আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের নির্ব্বাচন কেন্দ্রের সংস্পর্শে রহিয়াছি। আমাদের সুনিশ্চিত অভিমত এই যে ভূতপূর্ব্ব মুসলীম লীগওয়ালাদের নেতৃত্বে বহুসংখ্যক রাষ্ট্রবিরোধী লোক গুরুতর গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে এবং কতকগুলি কমিউনিষ্টও তাহাদের সহিত হাত মিলাইয়াছে। আসাম বর্ত্তমানে অত্যন্ত বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। এই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য অবিলম্বে সাংসের সহিত যথাবিহিত ব্যবস্থা করা অতীব প্রয়োজন।"

এই চিঠিতে তাঁহারা আসাম মন্ত্রিসভার মুসলমান মন্ত্রী কাছাড়ের জনাব আবদুল মতলিব মজুমদার সম্পর্কে বলেন: "কাছাড়ে আসিলে মজুমদার সাহেব কোন কংগ্রেস এম-এল-এ কিংবা কংগ্রেস অফিসের খবর করেন না। এমন কি জাশগালিষ্ট মুসলমানেরাও তাঁহার সফরের খবর জানিতে পায় না। তিনি তাঁহার চেলা ইব্রাহিম ও আবদুল লতিফকে পরামর্শ দিবার জন্যই কাছাড়ে আসেন। এই ইব্রাহিম এক মুসলমান জনতা লইয়া করিমগঞ্জ রেল ষ্টেশন ও মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে আক্রমণ করিয়াছিল। এখন সিলেটে (পাকিস্থান) পলাইয়া গিয়া সেখান হইতে তাহার এজেন্টদের মারফত রাষ্ট্র-বিরোধী কাজ চালাইতেছে। আবদুর লতিফ ও তাহার কয়েকজন অনুচরকে চোরাই অস্ত্রশস্ত্র আমদানির ও আরও কতকগুলি গুরুতর অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছিল। মজুমদার সাহেব স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিত আদেশ দিয়া পুলিশের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইহাদের খালাস করিয়াছেন। আসামের অন্য কোন মন্ত্রী, এমন কি বিরোধীদলের কোন এম-এল-এ পর্য্যন্ত পাকিস্থানের ভিতর দিয়া যাতায়াত করেন না। শুধু মতলিব সাহেবের পক্ষে পাকিস্থান অত্যন্ত নিরাপদ হইয়াছে, তিনি অবাধে উহার ভিতর দিয়া ভ্রমণ করেন।"

১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসেও এই রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্য-কলাপ যে থামিয়াছে তার প্রমাণ পাই না। তার উপর চীনা সৈন্যবাহিনীর আবির্ভাব পাকিস্থান 'পঞ্চমবাহিনী'কে উৎসাহ দিবে। ভবিষ্যতে যে তারাও নিরাপদে থাকিবে তার ভরসা কম। কিন্তু "আপনার নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ" করিবার লোক পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও অপ্রতুল হয় নাই।

"রাজার পাপে প্রজার কষ্ট"

উক্ত সংস্কারের অনুপ্রেরণায় পুরুলিয়ার "মুক্তি" পত্রিকা সম্প্রতি একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। একটি বালকের অকাল মৃত্যুর জন্য তাহার পিতা শ্রীরামচন্দ্রকে দোষ দিয়াছিলেন, কৃত্তিবাসের রামায়ণে বর্ণিত এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধটি লেখা। কংগ্রেসের মধ্যে যে দুর্নীতি দেখা দিয়াছে তাহার ফলে দেশের লোক কষ্ট পাইতেছে—এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বেশী দূর যাইতে হয় না। আমাদের সহযোগী বিহারের এক জন মন্ত্রীর উক্তি চূড়ান্ত বলিয়া মনে করেন; প্রজাপুঞ্জের মনোভাব এই উক্তির মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধের এই অংশ উদ্ধৃত করিলাম:

"সম্প্রতি পাটনার ইংরেজী দৈনিক 'ইণ্ডিয়ান নেশনের' ৪ঠা নবেম্বর তারিখে প্রকাশিত বিহারের সেচমন্ত্রী শ্রীযুক্ত রামচরিত্র সিংহের এক বক্তৃতার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। মুঙ্গের জিলার বেগুসরাই সাবডিভিজনে তেঘরা থানার রাজ-ওয়ারা গ্রামে কংগ্রেস-কর্ম্মীদের এক সম্মেলনে বিহারের কংগ্রেস-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রামচরিত্র সিং বলেন, 'বিহারের উচ্চ-পদস্থ নেতৃবৃন্দ যেভাবে প্রাদেশিক রাজনীতি ক্ষেত্রে উলঙ্গ ফ্যাসিবাদের খেলা খেলিতেছেন তাহাতে আর চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।' তিনি সাম্প্রতিক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নির্ব্বাচনের উল্লেখ করিয়া ইহাকে নিয়ম-তান্ত্রিক ভণ্ডামী বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'সুধাংশুজী (যিনি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন) কেবলমাত্র প্রভাবশালী মন্ত্রীদের একটি হাতের পুতুল মাত্র এবং তিনি এই উচ্চপদের সম্পূর্ণ অযোগ্য। তিনি জনসাধারণকে পরিস্থিতি উপলব্ধি করিয়া প্রদেশের বর্ত্তমান ফ্যাসিষ্ট শাসকদের উচ্ছেদ করিতে বলেন। * * *' তিনি বলেন, 'আমাদের নেতৃবৃন্দের পাপে জনসাধারণ তাহাদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। নেতৃবৃন্দের দিন শীঘ্রই শেষ হইয়া আসিতেছে।' "

বাঁকুড়া জেলায় চলাচল অব্যবস্থা

বাঁকুড়া শহরে "নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক প্রচার" বাঁকুড়া রেল-ষ্টেশনের অবস্থার প্রসঙ্গ লইয়া গত ২০শে কার্ত্তিক সংখ্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন:

"আমাদের ইহা দৃঢ় ধারণা যে, আদ্রা-হাওড়া সেক্সনের মধ্যে বাঁকুড়া ষ্টেশন হইতে রেল কোম্পানীর যে আয় হয় সেরূপ আয় এই সেক্সনের মধ্যে অন্য কোন ষ্টেশনেই হয় না। কোম্পানীর হিসাবাদি দেখিবার সুযোগ আমাদের না থাকিলেও আমরা ইহা অনুমানের ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারি যে, প্রতি মাসে বাঁকুড়া ষ্টেশন হইতে সর্ব্বরকমে রেল কোম্পানীর প্রায় ছয় লক্ষ টাকা আয় হইয়া থাকে। মাসিক এইরূপ আয় হওয়া কথার কথা নহে। অথচ ষ্টেশনের অবস্থা যাহা তাহা মেদিনীপুর পুরুলিয়া হইতে শত গুণে

নিকৃষ্ট। ষ্টেশনে উচ্চ 'প্ল্যাটফরম' না থাকার জন্ত মহিলা, রুগ্ন, বৃদ্ধ ও শিশুদিগকে লইয়া যাত্রীদিগকে যে কি হয়রানিই হইতে হয় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বিশ্রামাগারটির যখন সংস্কার করা হইল এবং অপর একটি নূতন ছাউনী (শেড) তৈয়ারী করা হইল তখন আশা হইয়াছিল যে এই সঙ্গে ষ্টেশনের প্ল্যাটফরম উচ্চ করা হইবে। কর্তৃপক্ষের এই অসুবিধার প্রতি নজর পড়ে নাই কেন?"

কিন্তু ইহাই শেষ অভিযোগ নয়। জেলার চলাচল ব্যবস্থার উন্নতির পরিকল্পনা যেভাবে ব্যাহত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের সহযোগী যে অভিযোগ করিতেছেন, তাহার জন্য কেবল জেলার শাসকবর্গ নয়, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা বা তাঁহাদের পরামর্শদাতাগণও দায়ী বলিয়া মনে হয়।

"বাঁকুড়া শহরের সন্নিকটে পাতাকোলার ঘাটে দারকেশ্বর নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণের জন্য আনুমানিক লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে যে সব মাল-মসলা লোহা-লক্কড় আমদানী করা হইয়াছিল, শুনা যাইতেছে সে সব অন্যত্র সরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে—পাতাকোলার ব্রিজ নির্ম্মিত হইবে না। কেন হইবে না, তাহার কোন কৈফিয়ৎ কাহারও নিকট পাওয়া যাইতেছে না। আমরা বহুবার জেলার অহিতকর এই কর্ম্মের তীব্র সমালোচনা করিয়াছি, এই ব্রিজটির আবশ্যকতা সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মনোভাবের পরিবর্তনসাধন করিতে সক্ষম হই নাই—আমাদের আবেদন-নিবেদন কর্তৃপক্ষের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশই করিতে পারে নাই, এরূপ আশঙ্কা অনায়াসে করা যাইতে পারে।"

দামোদর পরিকল্পনা

এই পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করিয়া অনেক আশা লোকের মনে জমাট বাঁধিয়াছে। তাহা কি ব্যর্থ হইবে? বর্দ্ধমানের "দামোদর" পত্রিকার ১৫ই সংখ্যায় যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে আর কোন ভরসা করা চলে না:

"গত ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে ভারত-সংসদের অধিবেশনে শ্রীবসন্তকুমার দাসের প্রশ্নের উত্তরে পূর্ত্তসচিব শ্রীএন. ভি. গ্যাডগিল বলিয়াছিলেন, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উৎপাদনকেই সেচব্যবস্থা ও বন্যা-প্রতিরোধক ব্যবস্থার পূর্ব্বে স্থান দেওয়া হইবে। ১৯৫০ সালের ২৪শে জুলাই অল-ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ কাটজুর অভিভাষণে দামোদর পরিকল্পনার বন্যা-প্রতিরোধ ব্যবস্থা গৃহীত হইবে না বলিয়া প্রকাশ পায়। এই পরিকল্পনায় ইতিমধ্যেই নয় কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং বর্ত্তমান বৎসরেও নয় কোটি টাকা ব্যয় হইবার কথা। একমাত্র বোকারো বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র ও তাহাকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্ত দুইটি জলাধার নির্ম্মাণ করিতেই ইহা অপেক্ষাও বহু অর্থ ব্যয়িত হইবে।"

এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের আগ্রহ ও স্বার্থ বেশী। দামোদর নদকে সংযত করিতে পারিলে, তাহার জল-প্রবাহকে সুনিয়ন্ত্রিত খাল ও বাঁধ দ্বারা পরিচালিত করিতে পারিলে পশ্চিমবঙ্গের অতীত সম্পদ শস্য উৎপাদনের গৌরব ফিরিয়া আসিত। সার উইলিয়ম উইলকক্‌স গঙ্গা-নদীর স্রোত-জলের সদ্ব্যবহারের কথা বলিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগে সেই সংগঠনকর্ত্তার অভাব হইবে কেন বুঝি না। ভারতীয় বুদ্ধি ও কৌশলের বন্যাই কি কবিকল্পনা মাত্র!

বীরভূম ও ময়ূরাক্ষী

ময়ূরাক্ষী নদীর বিরাট জল-সরবরাহের ব্যবস্থায় বীরভূম জেলার কোন কোন অঞ্চল উপকৃত হইবে না। রাজনগর, খয়রাসোল, দুবরাজপুর থানা এই বঞ্চিতদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য। জমি তাদের উঁচুনীচু; সেইজন্য সাধারণ জলসেচন রীতি তৎসম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। শিউড়ী (বীরভূম) হইতে প্রকাশিত 'শিক্ষা ও কৃষি' পত্রিকার ৫ই অগ্রহায়ণ তারিখের সংখ্যায় জনাব মাঃ হুশেন খাঁ, প্রধান শিক্ষক বড়বন বোর্ড বিদ্যালয়, এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং এই প্রাকৃতিক অসুবিধা দূর করিবার জন্ত যাহা প্রয়োজন তাহার নির্দ্দেশও দিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম, কেননা ইহা অন্য কয়েকটি জেলাতেও প্রযোজ্য:

"জাতীয় সরকার এই অঞ্চলবাসী চাষীদের জমি সেচনের জন্য ঐ অঞ্চলের মজা পুকুরগুলোর সংস্কার সাধনে যত্নবান হয়েছেন—এ অবশ্যই আশ্বাসের কথা। কিন্তু শুধু মজা পুকুর সংস্কার সাধনেই এ অঞ্চলের সেচনকষ্ট ঘুচবে না। এদের সেচনকষ্ট দূর করে অধিক ফসল-ফলান অভিযান সার্থক করতে হলে আর এক দিকে সরকারকে এগোতে হবে। সেটা হচ্ছে—ঐ অঞ্চল দিয়ে যে সকল ছোট ছোট ঝরণা, জল-প্রবাহ বর্ষাকালে প্রচুর জল বয়ে নিয়ে বড় নদীগুলোকে স্ফীত করছে সেই জলপ্রবাহগুলোর মাঝে মাঝে লোহার কপাট বসানো, পাকা সাঁকো তৈরি করে যথাসময়ে জল আটকাতে পারলে তার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী জমির অনেক পরিমাণে সমৃদ্ধি সাধিত হয়। জমির উর্ব্বরতা শক্তিও ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় অথচ সময়মত জল আটকিয়ে উভয় পার্শ্বস্থ জমি ভাল ভাবেই সেচন করা সম্ভব হয়। ফলে অধিক ফসল ফলান অভিযান এ অঞ্চলবাসীর পক্ষে সার্থকতা লাভ করে। এইরূপ ভাবে জল আটকিয়ে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা থাকলে ধান-চাষের পর থেনো জমিতেই অন্যান্য রবিশস্য যথা—খেসারী, বুট, গম, যব, রাই-সরিষা, মটর ইত্যাদি ফলানও অধিকাংশে সম্ভব হয়ে ওঠে, উপরন্তু মাছের প্রাচুর্য্যও ঘটে।"

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলন

ইংরেজ রাজশক্তি প্রত্যাহৃত হইবার পর হইতে প্রায় প্রতি দিন "মালটি-পারপাস সোসাইটি" প্রভৃতি গালভরা নামের সমিতির উদ্ভব হইতেছে। সমাজের নানা প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্য লইয়া সমিতির সংগঠনকারিগণ অগ্রসর হইতেছেন। অধিকাংশ সমিতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বেচাকেনা করিয়া থাকেন। উৎপাদন কেহ বাড়াইয়াছেন বলিয়া সংবাদ খুব কমই পাওয়া যায়। সমবায় বা সমবেত শক্তির প্রয়োগে কত বড় কাজ করা যায় তার কল্পনা করা সহজ, কিন্তু তাহাতে রূপদান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা কঠিন।

"এত ভঙ্গ" পশ্চিমবঙ্গে সমবায় সমিতির সংখ্যা ও সামর্থ্য কম নয়। একটি হিসাবে দেখিয়াছি যে ১৯৪৮-৪৯ সালের শেষে ৬৮টি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে ৭৩৬ লক্ষ টাকা মূলধন আছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এই মূলধন ১৮৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সদস্য সংখ্যা তের হাজার হইতে চৌদ্দ হাজার হইয়াছে। অন্যদিকেও সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৩,৩৩,০০০ ও মূলধন ১৪৪ লক্ষ টাকা হইয়াছে। কৃষি সমবায় সমিতি ব্যতীত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৪,১০,০০০ ও মূলধন ৯৩৫ লক্ষ টাকা হইয়াছে।

তিন কোটি নরনারীর শ্রমশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি যথোপযোগী ব্যবহৃত হইলে পশ্চিমবঙ্গে ভাত-কাপড়ের দুঃখ থাকিত না; ৫০ লক্ষ নরনারী পূর্ব্ববঙ্গ হইতে গত তিন বৎসরে এই রাজ্যে আসিয়াছেন। তাঁহাদের একাংশও ক্রিয়াশীল হইলে দেশের চেহারা ফিরিয়া যাইত। উদ্যোগী নেতা নাই বলিয়াই নিরাশার কথা শুনা যায়। সমবায় মন্ত্রী ডাঃ আহমেদ পূর্ব্ববঙ্গের লোক; জাতীয়তার প্রতি তাঁহার অকুণ্ঠ বিশ্বাস সুবিদিত। তিনি আজ প্রায় ৫ মাস হইল এই পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার অনুপ্রেরণায় কি করা সম্ভব হইয়াছে তাহা জানিলে সুখী হইব। অন্যান্য দপ্তরের মত তাঁহার দপ্তরও গতানুগতিকের উপাসক। সেই কথা বুঝিয়াই তাঁহাকে চলিতে হইতেছে, তাহাও আমরা বুঝি। তবুও আশা করিয়া আছি।

"আত্রেয়ী"

এই পত্রিকাখানির প্রথম সংখ্যা পাইয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। দিনাজপুর জেলার এক-তৃতীয়াংশ আয়তন লইয়া ভারতরাষ্ট্রের এই জনপদটি গঠিত হইয়াছে। জেলার নূতন নাম পশ্চিম দিনাজপুর, বালুরঘাট তাহার—কেন্দ্র। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের কল্যাণে তাহার এইরূপ সঙ্কুচিত মূর্ত্তি দেখা দিয়াছে; সমগ্র ঠাকুরগাঁ মহকুমা, থামইরহাট, পত্নীতলা, দিনাজপুর সদর প্রভৃতি আরও কয়েকটি থানায় হিন্দুর সংখ্যা বেশী হওয়া সত্ত্বেও ঐ জনপদগুলি পাকিস্থানের কুক্ষিগত হইল! এই সীমানার ঠেলাঠেলি হয়ত একদিন থামিবে, না হইলে ভারত-পাকিস্থানের দুর্গতির সীমা-পরিসীমা থাকিবে না। ভাগবাঁটোয়ারায় যে সমস্যাসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার আলোচনা আমরা "আত্রেয়ী"র পৃষ্ঠায় দেখিব, এই ভরসা রাখি। সরকারী কাগজপত্রে আমরা সারা বাংলার অনেক বিবরণ দেখিতে পাই। কিন্তু তাহা কেতাদুরস্ত, প্রাণহীন। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জীবনের সম্যক্ পরিচয় লাভই কাম্য। সেই পরিচয় আত্রেয়ীর প্রথম প্রবন্ধে কিছু কিছু আছে:

"শোনা যায় ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে হিমালয়-সানুদেশ প্রবল বন্যায় স্ফীত হইয়া উঠে; তিস্তা এই উচ্ছ্বাসময়ী দুর্ব্বার বন্যার বিপুল জলরাশি বহন করিতে অসমর্থ হইয়া পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে একটি নামহারা মৃত নদীখাত প্লাবিত করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদে তাহার বিপুল জলসম্ভারের অর্ঘ্য রচনা করে। সেদিন হইতে তিস্তা আর তাহার পুনর্ভবা, আত্রেয়ী, করতোয়ার ত্রিস্রোতে হিমালয়ের স্নিগ্ধ বারি সিঞ্চন করে না। সেদিন হইতে আত্রেয়ী ক্ষীণা হইতে ক্ষীণতরা হইতেছে।...

শ্রাবনের দুর্ব্বার জলধারায় বাহিত পলিমৃত্তিকায় আত্রেয়ী বালুরঘাট তথা পশ্চিম দিনাজপুরের বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড উর্ব্বর করিয়া তুলিয়াছে। আমাদিগকে দান করিয়াছে খাদ্য-প্রাণ— অফুরন্ত শক্তির সঞ্চারময় প্রেরণা!

বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানী দৃষ্টি দিনাজপুরবাসীর পূর্ব্ব গৌরব ফিরাইয়া আনুক।"

বর্দ্ধমানের পূর্ত্ত বিদ্যালয়

বর্দ্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ কারিগরি বিদ্যালয়টি পূর্ত্ত-বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হইয়াছে। ইহা যাহাতে কলেজে রূপান্তরিত হয়, তাহার জন্য নাগরিকবর্গ, জেলাবাসী সকলে ব্যগ্র। 'দামোদর' পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদটি এই মনোভাবের পরিচায়ক:

"ইহা যাহাতে ভবিষ্যতে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে উন্নীত হয় তাহার জন্য বিস্তৃত ভূমি ক্রয় করিয়া অর্দ্ধেক মূল্য ১০,০০০৲ টাকা বর্দ্ধমানের নূতনগঞ্জ, আলমগঞ্জ, বাজেপ্রতাপপুর ও সদরঘাট প্রভৃতির ব্যবসায়ীগণ দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

বর্ত্তমান ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলটি বর্দ্ধমান মহারাজের সাধনপুর কুঠিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহারাজা-প্রদত্ত ২০ বিঘা জমির উপর যে ইমারত আছে, তাহার মূল্য ২৷৹ লক্ষ টাকা। সরকার উহা মেরামতের জন্য ৪৭ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। নূতন ইমারত ও কারখানা স্থানান্তরিতের জন্য সরকার হইতে ১ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলের নিজস্ব বৈদ্যুতিক যন্ত্র ও আলো, পাখা বাবদ যথাক্রমে ২৭ হাজার ও ১৬ হাজার টাকা সরকার দিবেন। নানাবিধ হস্ত-শিল্পের জন্য ভারত-সরকারও ৭৩,০০০৲ টাকা দিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য আরো ২০ বিঘা জমি দখলের জন্য

২০,০০০৲ টাকার অর্দ্ধেক ১০,০০০৲ টাকা স্থানীয় সাহায্য দিলে, সরকার অবশিষ্ট ১০,০০০৲ টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।"

প্রাথমিক শিক্ষার ভ্রাম্যমাণ শিক্ষণকেন্দ্র

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগ শিক্ষাবিস্তারকল্পে একটি নূতন ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে কি ভাবে বিনা পুস্তকের সাহায্যে কার্য্যের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা সম্ভব তাহা সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে শিখাইবার বা দেখাইবার জন্য নবেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সালের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত কয়েকদল ভ্রাম্যমাণ বুনিয়াদী শিক্ষকদল (Training Squad) প্রতি জেলায় পরিভ্রমণ করিবেন। প্রত্যেক কেন্দ্রে তাঁহারা ছয় দিন ধরিয়া থাকিয়া এই শিক্ষাদান করিবেন—এবং সেই কেন্দ্রে যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক অনায়াসে আসিয়া শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারেন তাঁহাদিগকে যোগদান করিতে হইবে। প্রত্যেক শিক্ষণদলে এই বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত তিন জন করিয়া প্রাথমিক শিক্ষক থাকিবেন। কবে কোথায় বা কোন্ কেন্দ্রে এই শিক্ষণ-শিবির বসিবে এবং কোন্ কোন্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে তথায় যোগদান করিতে হইবে সে সম্বন্ধে স্কুলবোর্ডগুলি সিদ্ধান্ত করিবেন বা শিক্ষকদিগকে জানাইবেন ইহাই আশা করা যায়।

যাহাতে এই সকল ভ্রাম্যমাণ শিক্ষণকেন্দ্রে সকল প্রাথমিক শিক্ষক যোগদান করেন তজ্জন্য ব্যবস্থা করা উচিত।

বিদেশীর চক্ষে বুনিয়াদী শিক্ষা

গত ১৮ই অগ্রহায়ণে প্রকাশিত হরিজন পত্রিকায় নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে :

উনেস্কো (সর্ব্বজাতিক শিক্ষা-বিজ্ঞান-কৃষ্টি সংস্থা) কর্ত্তৃক প্রেরিত মনস্তত্ত্ববিদ্ ডক্টর মারফী ও মিসেস মারফী বর্ত্তমানে ভারত গবর্ণমেন্টের পক্ষে সাম্প্রদায়িক রেষারেষির মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। ১লা ও ২রা নবেম্বর তাঁহারা সেবাগ্রামে আসেন। পোষ্টগ্রাজুয়েট শিক্ষক-শিক্ষণের ছাত্রদের সমক্ষে ডক্টর মারফী আলোচনা আরম্ভ করেন। মিসেস মারফী বুনিয়াদী ও উত্তর-বুনিয়াদী ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদিগের প্রতি ভাষণ দেন। তিনি বলেন :

"পল্লী ভারতের জন্য বুনিয়াদী শিক্ষার কার্য্যকারিতা প্রমাণ করিবার এখন আর প্রয়োজন নাই। পল্লীবাসীদের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনের পথে এই শিক্ষার যোগ্যতাও আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এই শিক্ষায় যতটুকু সাধন করা গিয়াছে তাহাই জগতের সর্ব্বত্র শিক্ষাবিদ্গণের পক্ষে উৎসাহ ও প্রেরণার বিষয়।

"যে সৃজনী প্রতিভার দ্বারা এতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইয়াছে তাহা বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অবিচ্ছিন্ন ধারায় বাহিত হইয়া সহরে শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হউক। এখানে যেমন সাহসের সহিত নূতন চিন্তা ও বিপ্লবাত্মক পরীক্ষা করিয়া চলা হইয়াছে, সহরে শিক্ষায় ও উচ্চ শিক্ষায় তাহাই করা প্রয়োজন। এইরূপ করিলে তবে একঘেয়ে ধারাবাহিক প্রচলিত শিক্ষার ধারাকে বদলানো যাইবে। জগতে সর্ব্বত্র শিক্ষার জড়তা মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। উহার পরিপূরক এমন শিক্ষা চাই যাহাতে তরুণ মনের স্বাভাবিক সৃজনী শক্তি স্ফুরিত হইতে পারে।"

ইংরেজ-রাজ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল ; তৎপরিবর্ত্তে কয়েকটি নূতন ঐতিহ্য স্থাপন করিয়া দিয়া গিয়াছে। তার মধ্যে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সাধন করিতে না পারিলে আমাদের স্বাধীনতা সার্থকতা লাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু ইংরেজকৃত অভ্যাস আমাদের মনকে এম্নি অনড় করিয়া ফেলিয়াছে যে বুনিয়াদী শিক্ষা বিষয়ে পরীক্ষা করিবার ধৈর্য্য অনেকের মনে নাই। গান্ধীজী এক নূতন আদর্শের আশায় ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন অভ্যাসের সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন। সেই পরীক্ষায় ভীত হইবার কি আছে? বিদেশীয়েরাও এই সহজ কথাটা বুঝে। আমরা পারি না কেন?

ভাষার বিরোধ

বাংলা "হরিজন" পত্রিকার একটি সংখ্যায় শ্রীকিশোরলাল মশরুওয়ালার একটি প্রবন্ধ অনূদিত হইয়াছে। তিনি মুখবন্ধে বলিতেছেন : "গুজরাটে থানা জেলার চিনচনি গ্রামের লোকেরা থানা জেলা বোর্ডের এক আদেশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছে, কারণ ঐ আদেশে উক্ত থানা এলাকার প্রাথমিক পাঠশালাগুলিতে আবশ্যিকভাবে মারাঠী ভাষা শিক্ষা দিবার কথা বলা হইয়াছে।" এই বিক্ষোভের সংবাদ পাঠ করিয়া মনে হয় যে, এই জেলা দ্বি-ভাষাভাষী। এরূপ অঞ্চলের সমস্যা মিটাইবার জন্য তিনি কয়েকটি সর্ত্ত দিয়াছেন : (১) এইরূপ অঞ্চলের লোকেদের মাতৃভাষার মাধ্যমে সমগ্র শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে (ছাত্রসংখ্যা সম্পর্কীয় সর্ত্তটি স্বীকার করিয়া) এবং (২) তাহাদিগকে স্থানীয় অপর ভাষাও শিক্ষা করিতে হইবে। বোম্বাইয়ের মত বহু ভাষাভাষী শহরে যাহাদের মাতৃভাষা গুজরাটী বা মারাঠীর কোনটিই নয় তাহাদিগের এই সর্ত্ত অনুযায়ী ঐ উভয় ভাষার একটি শিখিলেই চলিবে। তাহা ছাড়া রাষ্ট্রের সাধারণ ভাষা হিসাবে হিন্দী শিক্ষা করিতে হইবে। অর্থাৎ পঞ্চম মানের উপরের শ্রেণীর শিক্ষার্থীর তিনটি ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে।

বাস্তবের ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব কিনা তৎসম্বন্ধে কিশোর-

লালজীর মন্তব্য লক্ষণীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বিহারের মানভূম জেলার কথা বলিয়াছেন। যে কোন রাজ্যের যে কোন দ্বি-ভাষাভাষী অঞ্চল সম্বন্ধে তাহা প্রযোজ্য। "বিহার প্রদেশ যদি মানভূম অঞ্চলকে দ্বি-ভাষাভাষী বলিয়া স্বীকার করে এবং সেখানে প্রত্যেকেরই যদি বাংলা ও হিন্দী উভয় ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যিক হয় এবং সরকারী দপ্তরসমূহে উভয় ভাষাতেই কর্ম্মনির্ব্বাহ হয়, তবে ঐ অঞ্চলে বাঙালী ও বিহারীর মধ্যে যে তিক্ত মনোভাব রহিয়াছে তাহা থাকে না, লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু তাহা হইবে না; বিহারীরা বাঙালীর উপর জবরদস্তি করিবে এবং কলিকাতার বাঙালীরা তাহার শোধ লইবে। তারপর ইহার ফলে যখন ক্ষতি সাধিত হইবে তখন তাহা সামলাইয়া লইতে সদিচ্ছা-মিশন প্রেরিত হইবে। আমরা এই সকল অন্যায়কে কি আরম্ভেই বন্ধ করিয়া দিতে পারি না?"

পারি হয়ত, কিন্তু সেইরূপ সহিষ্ণুতার পরিচয় এখনও আমরা দিতে পারিতেছি না। কেন্দ্রীয় পরিষদে একজন হিন্দী ভাষাভাষী সভ্য একজন তামিল ভাষাভাষী সভ্যকে বলিলেন: "আপনারা শীঘ্র রাষ্ট্রের ভাষা শিক্ষা করিয়া ফেলুন।" এদিকে আবার মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, হিন্দী ভাষাভাষী নাগরিকের পক্ষে তামিল ভাষা অবশ্য শিক্ষণীয় করা উচিত। ইহার প্রত্যুত্তরে শ্রীমহাবীর ত্যাগী কি বলিবেন তাহা কল্পনা করা কঠিন নয়।

পৌষ মাসের প্রথম সপ্তাহে দিল্লীতে হিন্দী ও অন্যান্য ভাষা-ভাষী সাহিত্যিকবৃন্দের সমাবেশ হইবে। সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন ভাষার উন্নতি এবং বিভিন্ন ভাষার প্রচারের উপায় নির্দ্ধারিত করা হইবে এবং সকল ভারতীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যের মধ্যে একটা সংহতি রক্ষার চেষ্টা করা হইবে। এই সংবাদের উপর মন্তব্য করিতে গিয়া "পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস-কর্ম্মিগণের পত্রিকা"—"জনসেবক" বলিতেছেন: "ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রত্যেক প্রদেশে হিন্দীর যথেষ্ট প্রচলন এবং হিন্দীভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা যেমন বাঞ্ছনীয়, তেমনই প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষারও চর্চ্চা এবং প্রচার প্রচেষ্টার পূর্ণ সুযোগ এবং সুবিধা থাকাও দরকার। হিন্দী ব্যতীত ভারতের অন্যান্য ভাষার উন্নতির সুযোগ যদি না থাকে তা হলে সেই সকল প্রদেশবাসীর মধ্যে হিন্দী-বিরাগ দেখা দিতে পারে। বিশেষতঃ বাংলাদেশ সম্বন্ধে একথা বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। একটি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ভাষারূপে বাংলা-ভাষা আজ সু-উচ্চ মর্য্যাদার অধিকারী। ইহার প্রসারের পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকই কার্য্যকরী হইবে না। তাহা ব্যতীত এই সম্মেলনে আলোচ্য সূচী অনুযায়ী বিভিন্ন ভাষায় রচিত সাহিত্যের মধ্যে পারস্পরিক সংহতি রক্ষা করিবার যে পরিকল্পনার কথা বলা হইয়াছে, তাহার ফলে অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল এবং উন্নত প্রাদেশিক ভাষাগুলির প্রভাবে এবং অনুপ্রেরণায় অপেক্ষাকৃত কম অগ্রসর প্রাদেশিক ভাষাগুলির উন্নতি-প্রচেষ্টাও সার্থক হইবে।"

এই মন্তব্যের মধ্যে দুইটি মনোভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম আশঙ্কা একটি যে, হিন্দীর প্রসারে বাংলা ভাষার বিপদ দেখা দিতে পারে; দ্বিতীয়, আশা যে, বাংলা ভাষার "সু-উচ্চ মর্য্যাদার" যথাযোগ্য সম্মান অদূর ভবিষ্যতে দিতে হইবে। এই আশা ও আশঙ্কা সংযত হইত যদি হিন্দীভাষাভাষী অঞ্চলের নাগরিককে—সরকারী চাকুরীপ্রার্থী নাগরিককে—হিন্দী ছাড়া ভারতবর্ষের চৌদ্দটি শ্রেষ্ঠ ভাষার মধ্যে আইনের বলে অন্ততঃ একটি অবশ্য শিক্ষণীয় করা হইত। কেবলমাত্র একটি ভাষা শিখিয়া হিন্দী-ভাষাভাষী অঞ্চলের লোক রাষ্ট্রের অনেক সুবিধা ভোগ করিবে আর অন্যদের দুইটি শিখিতে হইবে—এই ব্যবস্থা দৃষ্টিকটু ও একটি ভাষার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক। ভাষার বিরোধের বিপদ এখানে। সময় থাকিতে সাবধান হইলে সেই বিপদের মেঘ কাটিয়া যাইবে। নতুবা, তামিল ভাষা-ভাষী লোকের মনে যে বিক্ষোভ জমা হইতেছে তাহা ভারতাকাশে বিস্তৃত হইবে।

বাংলা না আরবী হরফ?

পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের কোন রাষ্ট্রীয় অধিকার এখন পর্য্যন্ত স্বীকৃত হয় নাই। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, রাষ্ট্রের বর্ত্তমান অধিকারীবর্গ সহজে তাহা স্বীকার করিবেন না। পৃথিবীর ইতিহাসে যে শক্তির ব্যবহার করিয়া রাষ্ট্রে নিজ নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, পূর্ব্ববঙ্গেও তাহা হইবে। সেদিন কত দূরে জানি না। আমরা দেখিতেছি পূর্ব্ববঙ্গে কেবল ভাষা লইয়া নয়, হরফ লইয়াও বিরোধ চলিতেছে। ঢাকার "সোনার বাংলা" পত্রিকার ২রা অগ্রহায়ণ সংখ্যায় পূর্ব্ববঙ্গের হরফ-যুদ্ধের বিবরণ পাইতেছি। নিম্নোক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রত্যেক বাঙালীর জানিয়া রাখা ভাল:

"আরবী হরফে বাংলা ভাষা শিক্ষা করা সম্ভব কিনা তাহা লইয়া ইতিপূর্ব্বেও বহু আলোচনা হইয়াছে। আরবী হরফে বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের বাসনা পাকিস্থান শিক্ষামন্ত্রীর যতই থাকুক, ইহা সম্ভব কিনা, যুক্তিযুক্ত কি না, বাংলা-ভাষাভাষী পূর্ব্ববঙ্গের চারি কোটির অধিক নরনারীর স্বার্থের অনুপন্থী কিনা, তাহাই সর্ব্বাগ্রে ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। এই বিষয়ে শিক্ষাব্রতী, ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তির মতামতেরই মূল্য দিতে হয়। এই বিষয়ে ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র মত যোগ্য ব্যক্তির অভিমত অবশ্যই সর্ব্বত্র মর্য্যাদা লাভ করিবে। তিনি হবিগঞ্জে এক জনসভায় স্পষ্ট বলিয়াছেন, আরবী হরফে বাংলা ভাষা লেখা সম্ভবই নহে। উহার প্রচলনের দ্বারা পূর্ব্ববঙ্গের জনসাধারণের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইবে। বাংলা ভাষার যে সংস্কার হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে টাইপ-রাইটিং ও সাইক্লোষ্টাইল লেখন বাংলা ভাষায় সহজসাধ্য হইবে।"

ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক

গত ১০ই ডিসেম্বর আচার্য্য যদুনাথ সরকার একাশী বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে বঙ্গীয় ইতিহাস-পরিষদ ও এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশের এই দুইটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান দেশের বিদ্বৎসমাজের পক্ষ হইতে আচার্য্য-দেবকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া উদ্যোক্তাগণ নিজেদের কর্ত্তব্যপথে অবিচলিত থাকিবার ব্রতে নূতন করিয়া সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য যদুনাথ নিন্দা ও প্রশংসার ঊর্দ্ধলোকে বিরাজ করিতেছেন। সেই মনোভাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি তাঁহার অভিভাষণ শেষ করিয়াছেন; তাঁহার "শেষ বাণী" দেশের লোকের জন্য রাখিয়া যাইতেছেন, তাহা এই সংখ্যায় অন্যত্র মুদ্রিত হইল।

"১৮৯১ সাল হইতে ১৯৫০ সাল, এই ষাট বৎসর, এই জ্ঞানযোগী ভারত ইতিহাসের ঘটনাবলীর পশ্চাতে যে মানবমন সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটাইয়াছে, সেই রহস্যের অনুসন্ধানে আত্মভোলা সাধনা করিয়াছেন; আপনি আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন জ্ঞানের পথের নানা বিঘ্ন, নানা প্রলোভন। তাহা জয় করিয়াই তিনি হইয়াছেন বর্ত্তমান ভারতের ব্যাসদেব। তিনি মুঘলের জয়স্কন্ধবারের সঙ্গে সঙ্গে ভারত-পরিক্রমা করিয়াছেন; শক্তির আস্ফালন ও বিলাস-বিভ্রমের অন্তরালে দিন দিন সঞ্চিত দৈন্যের গ্লানি তাঁহার সন্ধানী চক্ষু এড়ায় নাই। মুসলমানকে বাদশাহী ভারতের, হিন্দুকে হিন্দুপাদ-পাদশাহীর অলীক স্বপ্ন হইতে তিনি রূঢ়ভাবে জাগরিত করিয়াছেন। সেই আত্মঘাতী স্বজন-বিরোধ, সীমাহীন লোভ, নির্ম্মম শোষণ ও মূঢ় স্বার্থপরতার ভয়াবহ পটভূমিকায় জাতীয় জীবনের যে চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা ভাবী কালকে মহতী বিনষ্টির হাত হইতে রক্ষা করিবে। নির্ম্মোহ বাণীতে ইতিহাস-বিধাতার অমোঘ ন্যায় নীতি বিঘোষিত।"

বঙ্গীয় ইতিহাস-পরিষদের অভিনন্দনপত্রের এই শব্দগুলি আচার্য্য যদুনাথকে বিশ্বজগতের শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ যুগে যুগে আত্মঘাতী হইয়াছে। এই বিনষ্টির হাত হইতে মুক্তির পথ যিনি প্রদর্শন করিতে পারেন, তিনিই ত জগতের গুরু। ষাট বৎসরের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া যদুনাথ এই পদের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করুন। তাঁহার অমোঘ নীতি আমাদিগকে রক্ষা করুক।

শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়ার নব কলেবর

শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়া সম্প্রতি দেশের নানা সমস্যা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলে কোটি কোটি টাকা উপায় করিয়াছেন, তন্মধ্যে যুদ্ধের মার্কিনী মাল (disposal) বিক্রয় উপলক্ষে অনেক "রূপেয়া" ঘরে তুলিয়াছেন। তারপর কি হইল বুঝিলাম না। শেঠজী প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে আপনার ও আপনার ব্যবসায়ী শ্রেণীর নানা 'কুলের কথা' কহিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এই বিষয়ে কলিকাতার "শিল্প ও সম্পদ" (সাপ্তাহিক) যাহা লিখিয়াছেন তাহা যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য তাহা উদ্ধৃত করিলাম:

"দিল্লীতে বিড়লা ব্রাদার্সের যেমন ঘাঁটি আছে, ডালমিয়া-জৈনেরও সেইরূপ আড্ডা রহিয়াছে। সম্ভবত: তথায় শেঠজীর জোরই বেশী। তৎসত্ত্বেও তিনি ভারত-সরকার হইতে তেমন সুবিধা পাইতেছেন না, বিড়লাই সব সুবিধা আদায় করিয়া লইতেছে। এই আক্রোশ ও জিদই বাদানুবাদের সূচনা করে এবং পরিণতি দাঁড়ায় শেঠজীর বৈরাগ্য। ইতিমধ্যে ডালমিয়া-জৈন ভাঙিয়া গিয়াছে, কত যে রকমফের হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। শেষে চারিঘরে ইহা চূড়ান্তভাবে ভাঙিয়া নিষ্পত্তি হইয়াছে। শেঠজী যে ইহাতে বিশেষ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন তাহা বলাই বাহুল্য। কাজেই বিড়লার সহিত যুদ্ধে তাঁহাকে সম্মানজনকভাবে পশ্চাদপসরণ (successful retreat) করিতে হইলে একটা 'বিরাট্ আদর্শে'র বা 'মহৎ উদ্দেশ্যে'র দরকার হয়, উহাই হইল 'বাস্তহারা সমস্যা'। সেই মুহূর্ত্তে শেঠজী উহা পাইয়া গিয়াছিলেন। আমরা শেঠজীর এই পরিবর্ত্তনে কৌতুক অনুভব করিয়া ঈশপের গল্পের নখদন্তহীন বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের কথা চিন্তা করিতেছি।"

মালিক ও শ্রমিকের বিবাদে শেঠজীর সাহায্য ও পরামর্শ প্রথম পক্ষেরই পাওয়া উচিত। কিন্তু সম্প্রতি তিনি সকলকে তাক লাগাইয়া দিয়াছেন। বোম্বাই কাপড়ের কলের শ্রমিক দুই মাস কাল কর্ম্মে বিরত থাকে। তাহার ক্ষতির পরিমাণ—১০ কোটি টাকা মূল্যের কাপড় তৈয়ার হয় নাই, শ্রমিকেরা প্রায় তিন কোটি টাকার মজুরী হারাইয়াছে। এই উপলক্ষে বোম্বাই রাজ্যের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই এই কর্ম্মবিরতির সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ ডালমিয়ার নাম টানিয়া আনিয়াছেন। আমেদাবাদের কলমালিকদের নামও উঠিয়াছে। বোম্বাইয়ের কাপড়ের কল বন্ধ থাকিলে এবং তাঁহাদের কল চালু থাকিলে কাপড়ের বাজারে তাঁহাদের একচ্ছত্র আধিপত্য থাকিবে, এই ভাবিয়া তাঁহারা এই কর্ম্মবিরতির জন্য টাকা জোগান দিয়াছেন।

এই আলোচনার মূল কথা হইল যে, শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়ার বহুমুখী প্রতিভা আছে, এবং তিনি হাটে খেলিয়া অনেককে কাবু করিতেছেন—রাষ্ট্রকেও, প্রজাকেও। অতি বুদ্ধির আবার বিপদও আছে।

পূর্ব্ব-এশিয়ার আর্থিক উন্নয়ন

পূর্ব্ব-এশিয়ার অধিবাসীবর্গের সামগ্রিক উন্নতিকল্পে দুইটি পরিকল্পনা কাগজপত্রের মধ্যে আবদ্ধ আছে। একটি "ব্রিটিশ" রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর তরফ হইতে প্রস্তুত করা হইয়াছে; অন্যটি রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের "প্ল্যান ফোর" (Plan Four) নামে পরিচিত। প্রথমোক্তটির খসরা ১২ই অগ্রহায়ণ ভারতের কেন্দ্রীয় সংসদে পেশ করা হয়।

গত সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ পরামর্শ কমিটির অধিবেশনে যে সকল রাষ্ট্র যোগদান করিয়াছিল তাহাদের অর্থাৎ অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, সিংহল, ভারত, নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্থান ও ব্রিটেনের অনুমতিক্রমে এই রিপোর্ট আজ একযোগে প্রকাশ করা হইতেছে।

রিপোর্টে উল্লিখিত পরিকল্পনায় ভারত, পাকিস্থান, সিংহল, মালয় ও ব্রিটিশ বোর্ণিওকে ধরা হইয়াছে। পরিকল্পনায় যোগ দিবার জন্য দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিকে আহ্বান জানান হইয়াছে। এ সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রস্তুত হইলে রিপোর্টের পরিশিষ্ট হিসাবে পরে প্রকাশিত হইবে।

পরিকল্পনাটি ছয় বৎসরব্যাপী উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং এই অঞ্চলের বৈষয়িক উন্নয়ন সাধনই ইহার মূল উদ্দেশ্য। কৃষি, সেচ, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, রেলওয়ে, পথ, বন্দর, পোতাশ্রয় প্রভৃতি উন্নয়নের প্রধান পরিকল্পনাগুলি ইহার মধ্যে রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মত সমাজ-জীবনের মূল বিষয়গুলি উন্নয়নের ব্যবস্থাও ইহাতে থাকিবে। ভারত, পাকিস্থান, সিংহল, মালয় ও ব্রিটিশ বোর্ণিওর জন্য যে পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে তাহাতে মোট ব্যয় পড়িবে ১৮৬ কোটি ৮০ লক্ষ ষ্টার্লিং। ইহার মধ্যে ১০৮ কোটি ৪০ লক্ষ ষ্টার্লিং বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হইবে; ব্যয়ের বাকীটা সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারই বহন করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে।

পরিকল্পনাগুলি সাফল্যজনক ভাবে কার্য্যকরী করা হইলে ১৯৫৬-৫৭ সালে নিম্নোক্ত রূপ ফলাফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে:

আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি—১ কোটি ৩০ লক্ষ একর জমি
অধিক খাদ্য উৎপাদন—৬০ লক্ষ টন
অধিক জমিতে সেচের ব্যবস্থা—১ কোটি ৩০ লক্ষ একর
অধিক বিদ্যুৎ শক্তি-উৎপাদন—১১ লক্ষ কিলোওয়াট

ভারত, পাকিস্থান, সিংহল, মালয় ও ব্রিটিশ বোর্ণিওর জন্য যে পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে তার হিসাব এইরূপ:

ভারত—দামোদর, হীরাকুণ্ড ও ভাখরা-নাঙ্গল বাঁধ পরিকল্পনা, একীভূত শস্য উৎপাদন পরিকল্পনা, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থাদির উন্নয়ন। উন্নয়নের মোট ব্যয় ১,৮৩৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা।

পাকিস্থান—গঁণ পরিকল্পনা; ভাবামওয়ালা ইরাবতী খাল পরিকল্পনা; রসুল জল-বিদ্যুৎ পরিকল্পনা; দক্ষিণ সিন্ধু বাঁধ; চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয়ন; মালখণ্ড জল-বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ পরিকল্পনা। উন্নয়নের মোট ব্যয়—২৬০ কোটি টাকা।

সিংহল—কৃষি উন্নয়ন; কলম্বো বন্দর উন্নয়ন; নূতন রাস্তা ও রেলপথ নির্ম্মাণ; মূল-শিল্প প্রতিষ্ঠা; সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান স্থাপন। উন্নয়নের মোট ব্যয়—১০৫ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা।

মালয়, সিঙ্গাপুর, উত্তর-বোর্ণিও ও সরবক—কৃষি উন্নয়ন, যোগাযোগ ও পরিবহন উন্নয়ন, জ্বালানী ও বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন, শিল্প ও জন-মঙ্গল ব্যবস্থার উন্নয়ন; সিঙ্গাপুর বন্দরের উন্নয়ন। মোট ব্যয় প্রায় ২০০ কোটি টাকা।

ইন্দোচীনের সমস্যা

ফরাসী গবর্ন্মেণ্ট এত দিন পরে, অনেক ধার-করা অর্থ ও অনেক লোকক্ষয় করিয়া উক্ত সমস্যার কতকটা সমাধান করিয়াছেন। ১৩ই অগ্রহায়ণ এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। মার্কিনী পত্রিকাগুলি এই ব্যবস্থার প্রশংসা করিতেছে।

'ওয়াশিংটন পোষ্ট' বলেন: "একেবারেই কিছু না করা অপেক্ষা দেরীতে করাও ভাল। সামরিক বিপর্য্যয় এবং মার্কিন রাষ্ট্রের পরামর্শের ফলে ইন্দোচীন, ভিয়েৎনাম, লাওস্ এবং কাম্বোডিয়াকে লইয়া গঠিত মিলিত রাষ্ট্রকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে ফরাসী সরকার এখন সম্মত হইয়াছেন।

"রাজনীতি এবং সমরনীতি—উভয় দিক দিয়াই ব্যবস্থাটি গঠনমূলক হইয়াছে। ইন্দোচীনে নিযুক্ত অধিকাংশ ফরাসী কর্ম্মচারীকেই আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে সরাইয়া লওয়া হইবে এবং কেবল ফরাসী দেশের উপকারার্থে যে সকল ট্যাক্স ইন্দোচীনে আদায় করা হইত সে সমস্তই তুলিয়া দেওয়া হইবে। এই দুইটি কাজের দ্বারা ইন্দোচীনের নবলব্ধ স্বাধীনতার যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যাইবে। সম্মিলিত রাজ্য তিনটিকে ফরাসী ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইলেও বৈদেশিক রাষ্ট্রে নিজ রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি পাঠাইবার মর্য্যাদা এই মিলিত রাষ্ট্রের থাকিবে। ইহা ছাড়াও যে বিষয়টি এশিয়াবাসী জনগণের মনে বেশী রেখাপাত করিবে, তাহা হইতেছে—বাওদাইয়ের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বাধীনে একটি ইন্দোচীন বাহিনীর সংগঠন।

নবগঠিত স্বাধীন ইন্দোচীন মিলিত-রাষ্ট্র এবং ফরাসী সরকারের পারস্পরিক সখ্য সূত্রের আরও পরিচয় ফরাসী সরকার দিবেন; ২৫ হাজার নূতন আমদানি করা ফরাসী সৈন্য আর ৩০ কোটি ডলারের অধিক মূল্যের মার্কিন রাষ্ট্র-প্রেরিত সামরিক সরঞ্জামকে তাঁহারা কমিউনিষ্ট চালিত বিদ্রোহী দমনে নিযুক্ত করিবেন। ফরাসী সরকারের শৈথিল্যে এই ব্যবস্থা বিলম্বিত হইয়া পড়িলেও ইন্দোচীনের জনসাধারণ এখন বুঝিতে পারিবে, কোন্ পথে তাহাদের যাওয়া উচিত।"

'নিউ ইয়র্ক টাইমস' সেই সুরেই গাহিয়াছেন :

"যথার্থ জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন করিয়াই ইন্দোচীনের ফরাসী নীতি চালিত হইতেছে, আশা করা যায় প্রকৃত স্বদেশ-ভক্ত ইন্দোচীনবাসীরা ইহার সমর্থক হইবেন এবং রাশিয়ার কৃত্রিম সাম্রাজ্য বিরোধিতাকে বর্জ্জন করিবেন।

এই স্বাধীনতা দানে ফরাসী সরকারের ক্রমান্বিত মন্থর গতির কারণ বুঝিতে পারা যায়, যখন দেখা যায় যে, স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনার সর্ব্বক্ষেত্রে যথার্থ যোগ্যতাসম্পন্ন ভিয়েৎনাম-বাসীর সংখ্যাল্পতা বিদ্যমান রহিয়াছে।"

আগামী দুই-চারি মাসের মধ্যে প্রমাণিত হইবে, এই ব্যবস্থা অতি বিলম্বে করা হইয়াছে কিনা। সোভিয়েট একনায়কত্বের ভয় বা মার্কিন পুঁজিবাদের ভয়—এই দুইটি ছাড়া তৃতীয় শক্তির আগমনের কোন প্রমাণ পাইতেছি না।

বাংলা ও আসাম ব্রাহ্ম সম্মিলনী হীরক জয়ন্তী

হাওড়া জেলায় বাণীবন একটি গ্রাম, সেখানে ব্রাহ্ম সমাজের অনুপ্রেরণায় একটি উচ্চ পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে। বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া সমাজ সকলের অনুকরণীয় পল্লী-সংগঠনের একটি কাঠামো তৈয়ার করিয়াছেন।

সেই গ্রামে প্রায় এক মাস পূর্ব্বে বাংলা ও আসাম ব্রাহ্ম সম্মিলনীর হীরক জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ঢাকার ব্রাহ্মপ্রধান শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন তাহার সভাপতিপদে বৃত হন। তদুপলক্ষে তিনি যে অভিভাষণ প্রদান করেন তাহার মধ্যে ভারতের ধর্ম্ম-জীবনের, সমাজ-জীবনের নানাবিধ সমস্যার আলোচনা আছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের "বিশ্বজনীন" আদর্শ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার মূল্য আজ অত্যধিক যখন খণ্ডবিখণ্ড ভারতের চিন্তাশীল সমাজ নানা ভাবনায় ক্লিষ্ট হইতেছেন।

"রামমোহন তাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের কোন নাম দিয়ে যান নি বটে, কিন্তু তাঁর ধর্ম্ম যে বিশ্বজনীন এ কথাটি তিনি বার বার বলেছেন। "My religion is universal"—একথা বলতে বলতে তাঁর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠত। তিনি দেখেছিলেন যে মানবের ধর্ম্ম যদি সত্য, বিশুদ্ধ জ্ঞান, বিমল ঈশ্বরপ্রীতি ও মানব-সেবার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে সে কল্যাণপ্রসূ না হয়ে ভ্রম, কুসংস্কার ও ধর্ম্মান্ধতা সৃষ্টি ক'রে জীবনে ও সমাজে অপরিসীম দুঃখ, অকল্যাণ উৎপন্ন করে। তাই তিনি বিবিধ ধর্ম্মের সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হলেন এবং এমন একটি নব-ধর্ম্মের প্রেরণা দিয়ে গেলেন, যে ধর্ম্মের মধ্যে হিংসায় উন্মত্ত ও যুদ্ধবিগ্রহে জর্জ্জরিত পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের বীজটি নিহিত আছে, যে ধর্ম্মের মধ্যে শতধা বিভক্ত ও পরস্পর বিবদমান দেশ ও জাতি সকলের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী ও ঐক্যের সূত্রটি বর্ত্তমান, যে ধর্ম্মের আদর্শের মধ্যে ভারতের নবযুগের সর্ব্ববিধ কল্যাণ ও উন্নতির বীজটি নিহিত আছে। রামমোহন এই লক্ষণ-যুক্ত ধর্ম্মকেই বিশ্বজনীন বলে অনুভব করেছিলেন।"

রামমোহন রায়ের আদর্শ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইলে যে সব সমস্যা যে মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে তাহা হইত না। হিন্দু সমাজ নানা শ্রেণী ভেদে দুর্ব্বল হইত না, হিন্দু মুসলমানের রেষারেষিতে দেশ বিভক্ত হইত না। অতীতের জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই। বর্ত্তমানের লোকক্ষয়-কর শিক্ষা ভবিষ্যতের জন্য আমাদের সাবধানী করিলে, ব্রাহ্ম সমাজের জীবন সার্থক হইবে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র

৭২ বৎসর বয়সে এই সমাজসেবাব্রতী চিকিৎসক-প্রধান দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি তাঁর সমাজ-সেবার আগ্রহের মধ্যে অটুট থাকিবে। বঙ্গীয় হিতসাধনী সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া, কলিকাতার খোলার ঘরে কদর্য্য পরিবেশের মধ্যে যাহারা বাস করে তাহাদের সেবা আরম্ভ করেন। তাহা-দের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজের উপার্জ্জন হইতে ব্যয় করিতে কখনও কুণ্ঠিত ছিলেন না। বয়স্ক শিক্ষার প্রসার দ্বিজেন্দ্রনাথকে বাংলার দিকে দিকে লইয়া গিয়াছিল।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও দ্বিজেন্দ্রনাথের গতিবিধি ছিল। সেই আবেগই তাঁহাকে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে লইয়া যায়। আমরা এই বন্ধুর তিরোধানে তাঁহার পুত্র-কন্যার উদ্দেশে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

প্রশান্তকুমার সেন

এই জ্ঞান-বৃদ্ধের দেহত্যাগে আমরা আত্মীয়জন বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছি। তাঁহার পুত্র ও স্ত্রীর প্রতি আমাদের সহানুভূতি জানাইতেছি।

প্রশান্তকুমার নব-বিধান ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে নিজের জীবন গঠন করেন। নির্বিরোধী প্রকৃতির গুণে তিনি সর্ব্ব সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন। বিহারে তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়াছে ; সেই প্রদেশের হাইকোর্টে তিনি আইন-ব্যবসা করিতেন ; সেখানকার তিনি বিচারক ছিলেন। বিহারের ভোটেই তিনি ভারতীয় বিধান পরিষদের সভ্য মনোনীত হন। এই ঘটনা তাঁহার লোকপ্রিয়তার পরিচায়ক।

আইনশাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান ছিল লক্ষণীয়। তাঁহার লিখিত আইনের একখানি বই কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আদৃত হয় ; পাণ্ডিত্যের গুণে তিনি একটি বিশেষ উপাধিলাভ করেন। পরিণত বয়সে তিনি প্রার্থিত লোকে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আত্মা শান্তিলাভ করুক।

দ্রষ্টব্য—সম্প্রতি তিব্বতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করায় ১৩৫৭, বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত পোতালা রাজপ্রাসাদ ও দালাইলামার ছবি বর্ত্তমান সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত করা হইল।

বার্নার্ড শ

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ

বার্নার্ড শ সম্বন্ধে আকস্মিকতার চমক বহু দিন কাটিয়া গিয়াছে। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম আবির্ভাবের সময়ে আমাদের অনভ্যস্ত কর্ণে তিনি যে সমস্ত কথা বলিয়া আমাদের চিরলালিত ধারণার উপর রূঢ় আঘাত করিয়াছিলেন এবং দুঃসাহসের সহিত প্রচলিত সমাজব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করিয়া যে অদ্ভুত বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত এই দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে অনেকটা শান্ত হইয়া গিয়াছে। তাই আজ প্রশান্ত মনে আমরা তাঁহার কথা আলোচনা করিতে পারি।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে বার্নার্ড শ-এর আকস্মিকতা কোন্‌খানে? এই আকস্মিকতা আছে নানা দিক দিয়া—সাহিত্যের বিষয়বস্তু, সাহিত্যের রীতি, আদর্শবাদ প্রভৃতি অনেক দিক দিয়াই তাঁহার অভিনবত্ব আছে।

এত দিন আমরা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি যে, তার্কিকের তর্কযুদ্ধ সাহিত্যের লীলাক্ষেত্র নয়, রাজনীতিকের কলহও তার লীলাক্ষেত্র নয়, ব্যক্তিগত মতবাদের ঢক্কা-নিনাদও নয়। আমরা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি যে, সাহিত্য দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার ঊর্দ্ধে নীড় রচনা করিবে, আলু-পটল-বেগুন, 'তেল-নুন-লকড়ি'র কথা তাহার মধ্যে থাকিবে না। যাহাকে আমরা Utility বলি, সাহিত্যে তাহার প্রসঙ্গ থাকিবে না। সেইজন্যই আমাদের মনে হয় সজিনা ফুল, কুমড়া ফুল, বেগুন ফুল দেখিতে যত ভালই হোক না কেন, তাহাদের সঙ্গে 'ইউটিলিটি'র সম্পর্ক আছে বলিয়া তাহা লইয়া কাব্য-রচনা হয় না, অথচ কচুরীপানার ফুল লইয়াও কাব্য-রচনা হইয়াছে।

কবি রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী'তে দেখিতে পাওয়া যায় বসন্ত-বর্ণনা প্রসঙ্গে বিদূষক বসন্তের সাদা ফুলগুলিকে তাহার প্রিয় মহিষের দুগ্ধের সঙ্গে এবং কলমা ধানের ভাতের সঙ্গে তুলনা করিয়াছিল বলিয়া সখী বিচক্ষণা তাহাকে প্রচুর উপহাস করিয়াছিল। তাহার উপহাস হইতে এইটুকুই বুঝা গিয়াছে যে, যাহা শিল্পকলার জিনিষ তাহার সহিত দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার কোনও স্পর্শ থাকিবে না। কাজেই রাজনীতি, সমাজনীতি, হাট-বাজারের কথা, মিল, কল-কারখানা,—এ সবের কথা সাহিত্যে থাকিবে না। সাহিত্য হইতেছে একটা রসের জিনিস, একটা সখের জিনিস, বিলাসের পরিবেশে পুষ্ট একটা ভাব-পদ্ম মাত্র!

এই ত হইল সাহিত্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আগেকার দিনের ধারণা। এই বিষয়বস্তুকে আবার কি ভাবে উপস্থাপিত করা হইবে, তৎসম্বন্ধেও আমাদের একটা নির্দ্দিষ্ট ধারণা ছিল। কবির স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণের সঙ্গীতের কথা আমরা অনেক শুনিয়াছি। একজন বিখ্যাত ইংরেজ কবি বলিয়াছেন—ফুলগাছের ডগায় ফুলটি যে ভাবে ফুটিয়া উঠে, কবির লেখনীতে কাব্যও সেই ভাবেই ফুটিয়া উঠিবে, তাহার মধ্যে আত্মসচেতনতা কিছুই থাকিবে না।

বার্নার্ড শ-এর পূর্ব্ববর্ত্তী রোম্যান্টিক কাব্যে ছিল হৃদয়ের প্রেরণার অভিব্যক্তি, তাহা আত্মসচেতনতার ফলমাত্র নয়। আত্মসচেতনতা ত সেখানে নাই-ই; বরং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে সাহিত্যিকের ব্যক্তিসত্তার বিলুপ্তিই হইতেছে ইহার শ্রেষ্ঠত্বের একটা বড় মাপকাঠি।

আত্মবিলুপ্তিই যদি সাহিত্যের উৎকর্ষের মাপকাঠি হয়, তাহা হইলে সাহিত্যিক, আত্মপ্রচারই হোক অথবা আত্মতত্ত্ব প্রচারই হোক, কোনটাই করিতে পারিবেন না। কবির বীণা শুধু সঙ্গীতই সৃষ্টি করিবে, সে সঙ্গীতের ইঙ্গিত যতই গভীর হউক, ব্যঞ্জনা যতই সুদূরপ্রসারী হউক, সেটা সোজাসুজি, উদ্দেশ্যমূলক বা প্রচারমূলক ভাবে সাহিত্যিক প্রকাশ করিতে পারিবেন না। প্রচারমূলক কাজ হইতেছে "জর্ণালিজম্"-এর বিষয়; সাহিত্যের নয়।

বার্নার্ড শ-এর বিশেষত্ব হইতেছে—তিনি এই 'জর্ণালিজম্'কেই সাহিত্য—একমাত্র সাহিত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। শুধু তাই নয়, অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণায় যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, বুদ্ধির চেয়ে হৃদয়ের কাজ যে সাহিত্যে বেশী প্রয়োজনীয়, এ সব কথাও তিনি স্বীকার করেন নাই। শুধুই কি তাই, সাহিত্যকে তিনি তার্কিকের মল্লভূমিতে নামাইয়া আনিয়াছেন, সাহিত্যকে সমাজ-সংস্কারের চাবুক হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন, সাহিত্যকে "প্রোপাগাণ্ডা"র বাহন হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন।

প্রথম প্রথম তাঁহার এই অভিনব সাহিত্য-প্রচেষ্টাকে কেহ কেহ সার্কাসের ক্লাউনের ভাঁড়ামি বলিয়া তুচ্ছ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কেহ কেহ প্রগল্‌ভ 'ফাজিলে'র পাকামি বলিয়া উড়াইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, কেহ কেহ বা টেক্‌নিকের বিচারে তাঁহাকে কোণঠাসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় নাই। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী বার্নার্ড শ চিরাচরিত টেক্‌নিককেও

অগ্রাহ্য করিলেন, প্রচলিত বিশ্বাসকেও আঘাত হানিলেন, তথাকথিত আদর্শবাদকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিলেন, বিবাহ ধর্ম সমাজ সম্বন্ধে এমন সব কথা বলিতে লাগিলেন যে, আমরা তখন ক্ষেপিয়া গিয়া তাঁহাকে পাষণ্ড, নাস্তিক, সমাজদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী বলিয়া গালাগালি দিয়াছি। কিন্তু যতই তাঁহাকে গালাগালি দিয়াছি, ততই তাঁহার যুক্তির নিকট হার মানিয়া নিজেদের অজ্ঞাতসারে তাঁহার মতবাদে দীক্ষিত হইয়া উঠিয়াছি।

'জর্ণালিজমে'র ছোটখাটো কাজের মধ্য দিয়াই তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন। কবিতা এবং উপন্যাসও তিনি লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পরিচয় সে দিক দিয়া নহে, তাঁহার পরিচয় বর্তমান যুগের ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে। কিন্তু এই নাটকের স্বরূপ কি ?

ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে নাটকের ঐতিহ্যের গৌরব কম নহে। যে এলিজাবেথীয় যুগের নাটক লইয়া ইংলণ্ডের গৌরব, বার্নার্ড শ-এর নাটক সে জাতীয় নহে। এলিজাবেথীয় নাটক ছিল কাব্যধর্মী; কল্পনার বর্ণাঢ্যতায়, শব্দের ঝঙ্কারে, মানবহৃদয়ের মর্মভেদী যন্ত্রণা ও বিস্ময়কর স্ফুরণের মধ্য দিয়া একটা অতিনাটকীয় পরিবেশে সেই নাটকগুলি যেন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতার ঊর্দ্ধলোকের বস্তু ছিল। জনসনের *Every Man in his Humour* জাতীয় দুই-একখানি নাটকের কথা বাদ দিলে মোটামুটি আমরা বলিতে পারি এলিজাবেথীয় নাটকের আবেদন ছিল হৃদয়গত, কিন্তু বার্নার্ড শ-এর নাটকের আবেদন হইতেছে বুদ্ধিগত। ধারালো সংলাপ, সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কমূলক বাদ প্রতিবাদ, মতবাদের সংঘর্ষ, এইগুলি হইতেছে বার্নার্ড শ-এর নাটকের বিশেষত্ব। এইজন্য তাঁহার নাটকের কুশীলবদের জীবন্ত মানুষ বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার নাটকের মধ্যে কিং লীয়ার, ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, রোজালিণ্ড প্রভৃতির মত চরিত্রের সন্ধান আমরা পাই না। আমরা যাহা পাই, তাহা হইতেছে এক-একটি মতবাদের জীবন্ত বিগ্রহ,—যেন এক-একটি মতবাদ, এক-একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী, সাজ-পোশাক পরিয়া নাট্যকারের নির্দেশমত ষ্টেজের উপর বিতর্ক করিয়া যাইতেছে এবং নাট্যকার সস্মিত বদনে তাহা উপভোগ করিতেছেন।

এই দিক দিয়া বার্নার্ড শ-এর সমস্ত নাটকই সমগোত্রীয়। সবগুলি নাটকই এক-একটি সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে—সামাজিক বৈষম্য, দুর্নীতির প্রভাব, অর্থনৈতিক অব্যবস্থা, ভ্রান্ত আদর্শবাদ প্রভৃতি লইয়া তিনি লেখনী চালাইয়াছেন।

অবশ্য এ দিক দিয়া তিনিই যে পথিকৃৎ তাহা নহে; তাঁহার পূর্ব্বে ডিকেন্স, থ্যাকারে ও মেরিডিথ উপন্যাসের এবং গলস্‌ওয়ার্দি নাটকের মধ্য দিয়া এই কাজ করিয়াছিলেন। তবে বার্নার্ড শ-এর ঋণ এই সমস্ত পূর্ব্বসূরীর নিকট ততটা নহে যতটা কার্ল মার্কস, স্যামুয়েল বাটলার এবং ইব্‌সেন-এর নিকট। ইব্‌সেন-এর *Doll's House* ইংলণ্ডে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত হয়। এই নাটক ইংলণ্ডের সমাজে একটা প্রলয়ঙ্কর ঝটিকা অথবা ভীষণ ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে নাই বটে, তবে তথাকার আত্মসন্তুষ্ট গতানুগতিক চিন্তাধারার মোড় ফিরাইয়া দিতেছিল। ফলে দুধের মধ্যে দম্বল দিলে যেমন ধীরে ধীরে দুধ দইয়ে পরিণত হইতে থাকে, ইংলণ্ডের চিন্তাধারার মধ্যেও সেই রকম পরিবর্ত্তন আসিতেছিল এবং তাহারই পরিণতি দেখিতে পাওয়া গেল ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বার্নার্ড শ-এর *Widower's House*-এ।

এক হিসাবে এই *Widower's House* হইতেই বার্নার্ড শ-এর যাবতীয় রচনার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারা যায়। তীক্ষ্ণ যুক্তিতর্ক ও মর্মভেদী ব্যঙ্গের ভিতর দিয়া তিনি আমাদের প্রচলিত সংস্কারগুলির অসারতা দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই যে ব্যঙ্গ ইহা জেরিমিয়া প্রভৃতির মত দুঃখ-বেদনা, বা অশ্রুপাতের ভিতর দিয়া করা হয় নাই, সুইফটের মত তিক্ত বাক্যবাণে পরিস্ফুট হয় নাই, কার্লাইলের মত অভিশাপের কশাঘাত-স্বরূপ আমাদের পৃষ্ঠে পতিত হয় নাই। তিনি যেখানে আঘাত করিতে চাহিয়াছেন, আঘাত সেখানে পৌঁছিয়াছে ঠিকই, কিন্তু মজা হইতেছে এই যে, আমরা তাঁহার আঘাতে যতই ব্যথা পাই, ততই আনন্দও উপভোগ করি, তাঁহার আঘাত মর্মে মর্মে অনুভব করি, কিন্তু মর্মাহত হই না। আমাদের মনে হয়, এই সমস্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আড়ালে আছে একটা সহৃদয় মহৎ প্রাণ, একটা প্রেম-স্নিগ্ধ মধুর হাসি, আর আত্মীয়তার একটা অনিবার্য্য আকর্ষণ। কাজেই তাঁহার বাক্যের অগ্নিবাণ আমাদের পুড়াইয়া মারে না, শুধু নিজের দীপ্তির ঝলকে রংমশালের আলোকের মত আমাদের কুশ্রীতা, দীনতা ও অসঙ্গতিগুলিকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিয়া চলিয়া যায়; তাঁহার তর্কের ফুলঝুরি ফুল কাটে প্রচুর, কিন্তু ঘরে আগুন লাগায় না। সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন, "হিতং মনোহারী চ দুর্লভং বচঃ"; কিন্তু বার্নার্ড শ-এর হিতবাক্য সত্যই মনোহারী, এবং দুর্লভ নয়। সে হিতবাক্য আনন্দের চমক হইয়া আমাদের মনে প্রথমে দোলা দেয়, থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহে আনন্দ উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে আমরা শিক্ষার বীজ সংগ্রহ করিয়া আনি, তার পর ধীরে ধীরে লোকচক্ষুর

অস্তরালে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইতে থাকে, পরে তাহা আমাদের সংস্কারের বনেদী পাকা প্রাচীরের ভিতর দিয়া শিকড় চালাইয়া তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলে।

বস্তুতঃ অতীতের সংস্কারের অচলায়তন যে আজ বহু ক্ষেত্রেই ভাঙিয়া পড়িতেছে, তাহার মূলে বার্নার্ড শ-এর অবদান অনেকখানিই আছে। ভিক্টোরীয় যুগের গোড়ার দিকে আমাদের জীবনের অসঙ্গতি প্রচুরই ছিল, তাহা তিনি সেদিন চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া না দিলে তাহা এত দিনেও আমাদের নজরে পড়িত কিনা সন্দেহ। ভিক্টোরীয় যুগের ডিকেন্সের উপন্যাসের শিশু Nell বা Paul Dombey'র দুঃখে আমরা চোখে জল ফেলিয়াছি প্রচুর, কিন্তু শিশুদের দুঃখ ঘুচাইবার নিমিত্ত যখন কল-কারখানায় শিশু-শ্রমিকদের নিয়োগ বন্ধ করিবার জন্য আন্দোলন করা হইয়াছে, তখন আমরা তাহার বিপক্ষতা করিতেও কসুর করি নাই। সেদিন সবাই জাঁকজমক করিয়া রবিবারের সন্ধ্যায় গীর্জ্জাতে প্রার্থনা করিতে যাইত, আর সোমবার সকালেই গলাকাটা ব্যবসাদারের কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইত। সেদিন অভিজাত রমণীরা পথপ্রান্তে শীর্ণা কুক্কুরীকে দেখিয়া করুণায় মূর্চ্ছা যাইতেন, অথচ তাঁহাদেরই স্বজাতি অন্য নারীকে কল-কারখানায় পরিশ্রমে ও ক্ষুধার তাড়নায় শীর্ণা হইয়া যাইতে দেখিলে বেদনা অনুভব করিতেন না। তখনকার দিনে সাহিত্য-সভায়, পাঁচ জনের মজলিশে, ড্রয়িং রুমে একটা রূপ ফুটিয়া উঠিত, আর কল-কারখানায়, ব্যবসাক্ষেত্রে ফুটিয়া উঠিত অন্য একটি রূপ। সেদিন বাক্যের সঙ্গে কাজের মিল ছিল না, তথাকথিত জীবনাদর্শের সঙ্গে জীবনের মিল ছিল না, সাহিত্যের রোমান্সের সঙ্গে বাস্তব জীবনের কদর্য্যতা, দুর্নীতি ও ভ্রান্তনীতির ছিল ঘোর অমিল। সেদিন বিবাহ সম্বন্ধে, সতীত্ব সম্বন্ধে আমরা বড় বড় কথা বলিয়াছি, যুদ্ধ সম্বন্ধেও বড় বড় আদর্শ ঘোষণা করিয়াছি, আভিজাত্য সম্বন্ধেও গালভরা কথা বলিয়াছি। কিন্তু এই সমস্ত বড় বড় কথার মধ্যে যে প্রচুর ফাঁকি, প্রচুর বঞ্চনা এবং হয়ত আত্মপ্রবঞ্চনাও ছিল, বার্নার্ড শ তাহা আমাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছেন।

মানুষের চিরপোষিত বিশ্বাসকে তিনি এই ভাবে আঘাত করিয়াছেন বলিয়া অনেকেই মনে করেন তিনি প্রকাণ্ড নাস্তিক। তিনি ধর্ম্ম মানেন না, সমাজ মানেন না, আদর্শ মানেন না, নীতি-সংস্কার কিছুই মানেন না।

শরৎ চন্দ্রের শেষ প্রশ্নের 'কমল' আমাদের সমাজের সবকিছুকেই ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং তাহার যাহা কিছু প্রশ্ন, তাহা শুধু "শেষ প্রশ্ন" হইয়াই আমাদের মনের প্রশান্তিকে বিক্ষুব্ধ করিয়াছে; অথচ এই বিক্ষোভের মধ্যে আমাদের বিভ্রান্ত মন যখন একটা নির্ভর-যোগ্য অবলম্বন চাহিয়াছে, সেই অবলম্বনটি দিতে পারে নাই; "শেষ প্রশ্নে"র শেষ "উত্তর" দিতে পারে নাই। বার্নার্ড শ এর প্রশ্নগুলি সে জাতীয় নহে; তাঁহার প্রশ্নগুলি যতই অতর্কিত হউক না কেন, যুক্তিগুলি যতই আকস্মিক হউক না কেন, শেষ পর্য্যন্ত এই প্রশ্নগুলিই তাহাদের সমাধানের পথ নির্দ্দেশ করে। প্রাথমিক বৈরিতা যেমন ভক্তি-মার্গে প্রবেশের একটা উপায়, বার্নার্ড শ-এর নাস্তিকতাও তেমনই আস্তিকতার একটা কৌশলী উপায় মাত্র। নীতির লাগাম কসিয়া তিনি আমাদের ক্রিয়াকলাপকে প্রাচীনের পথে জোর করিয়া চালাইতে চাহেন নাই, বরং নীতির রাশ একেবারে আলগা করিয়া দিয়া খুশিমত আমাদের চলিতে দিয়াছেন। এই জীবন-দর্শনের মধ্যেই বার্নার্ড শ-এর প্রাণ-শক্তির একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই প্রাণ-শক্তিই দেখাইয়া দেয়, খেয়ালমত চলিতে চলিতে উচ্ছৃঙ্খলতার বেপরোয়া গতিবেগে আমরা চলার চেয়ে ধাক্কাই খাই বেশী। তখন ঠেকিয়া শিখিয়া আমরা নীতির পথটিকেই বাছিয়া লই। নীতির সংযমটা তখন আমাদের কাছে অভিজ্ঞতালব্ধ এবং সাধনার সিদ্ধির মত বহুকাঙ্ক্ষিত জিনিস হইয়া উঠে, শুষ্ক আচারের বন্ধন মাত্র থাকে না। গ্রীক নাটকে 'Cathersis' জাতীয় একটা জিনিস থাকে, তেমনই একটা জিনিস বার্নার্ড শ-এর নাটকের মধ্যেও অলক্ষিতে কাজ করিয়া যায়।

বার্নার্ড শ এর প্রথম নাটক-ত্রয়ী *Plays Unpleasant*-এর অন্যতম *Philanderer* হইতেই আমরা তাঁহার রচনাশৈলীর একটা পরিচয় পাই। Chateris, Grace, Julia প্রভৃতি নূতন যুগের ('ইব্‌সেন ক্লাবে'র) মানুষ; তাহারা মেয়েলি মেয়ে, অথবা পুরুষভাবাপন্ন পুরুষ হওয়াকে সেকেলে জিনিস বলিয়া মনে করে। কাজেই নরনারীর মিলনের ব্যাপারে সেকেলে রীতি তাহারা পছন্দ করে না; নারী নরকে বিবাহ করিয়া স্বাধিকারপ্রমত্তা হইবে না, প্রিয়-বান্ধব বা প্রিয়-বান্ধবীর আকর্ষণটুকুকেই শুধু তাহারা স্বীকার করিবে, বিবাহের বাড়তি বন্ধনটুকুকে স্বীকার করিবে না, জীবনের চলতি পথে চলিতে চলিতে যখন যাহাকে যে ভাবে পাইবে, নিরুত্তাপ আবেগহীন বন্ধুত্ব দিয়া তাহাকে সেই ভাবে গ্রহণ করিবে, তাহার মধ্যে সেকেলে মান-অভিমান, প্রণয়-কোপ, ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব প্রভৃতি কিছুই থাকিবে না।

কিন্তু নাটক যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই দেখিতে পাওয়া গেল যে, *New Woman*-এর [নূতন কালের

নারী] চিরন্তন নারীত্বের দিকটিই প্রকট হইয়া উঠিতে লাগিল। চেটারিসকে জুলিয়া শুধু প্রিয়-বান্ধব হিসাবে পাইতে চায় না, আরও একটু গভীর ভাবে পাইতে চায়। চেটারিস কিন্তু উগ্র প্রগতিবাদী; প্রেমের নিষ্ঠাকে সে স্বীকার করে না। এই নিষ্ঠার অভাবের জন্যই সে জুলিয়ার সঙ্গে প্রেম করিয়া মাঝপথে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গ্রেস-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে লাগিল। নব্যা নারী হইয়াও জুলিয়া ইহা সহ্য করিতে পারে না। প্রাচীন সাহিত্যের খণ্ডিতা ও বিপ্রলব্ধা নায়িকার মতই অভিমানপুষ্ট কোপে সে একবার বা চেটারিসকে ভর্ৎসনা করে, একবার বা প্রতিদ্বন্দ্বী নায়িকাকে অনুনয়-বিনয় করে, তাহার প্রেমাস্পদকে ফিরাইয়া দিবার জন্য। কিন্তু ইহাতে গ্রেস বা চেটারিস বিগলিত হয় না। বরং জুলিয়া যে এ যুগের মেয়ে হইয়াও সেকেলে মেয়েদের মত আচরণ করিতেছে, এজন্য তাহাকে 'ইবসেন ক্লাব' হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। চেটারিস ত জুলিয়ার প্রেমপত্রগুলি আগুনে পুড়াইয়াই ফেলিল; সে দেখাইতে চায় এই সমস্ত হৃদয়গত দুর্ব্বলতা, এই সমস্ত মেয়েলী প্যানপ্যানানি তাহার পছন্দ হয় না, তাই জুলিয়ার সঙ্গে তাহার পুরাতন প্রেমের কোন চিহ্নও অবশিষ্ট রাখিতে চায় না।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল, প্রেমাস্পদাকে লইয়া এই ছিনিমিনি খেলা বেশী দিন চলে না। প্রত্যাখ্যাতা জুলিয়া যখন ডক্টর প্যারামোরের নিকট স্থান পাইল, তখন চেটারিসের মধ্যে চিরন্তন পুরুষের ঈর্ষা জাগিয়া উঠিল, সে জুলিয়াকে গ্রহণ করিতে চাহিল। এইবার জুলিয়ার প্রতিশোধের পালা। সে চেটারিসকে প্রত্যাখ্যান করিল। ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হইল না। যে গ্রেসকে লইয়া চেটারিস জুলিয়াকে অবহেলা করিয়াছিল, সেই গ্রেসও তাহাকে নির্ভরযোগ্য স্বামী বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিল না এবং সেও তাহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিল। চেটারিস তখন তাহার ভুল বুঝিতে পারিল; সে বলিল, "আমি এত দিন শুধু নাগরালি করে এসেছি, প্রেমের নিষ্ঠাকে স্বীকার করিনি, তাই আমার এই পরাজয়; গার্হস্থ্য সুখ আমার মিলবে না, বিবাহ আমাকে কেউ করবে না।" তখন বৃদ্ধের দল বিজয়-গৌরবে বলিলেন, "পবিত্র জিনিসকে নিয়ে ছেলেখেলা করলে এই রকম দুর্দ্দশা হয়। এই তোমাদের প্রগতি! আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের মত বৃদ্ধদের প্রগতির বালাই নেই!"

এই জাতীয় সিদ্ধান্তের মধ্যে একটা আদর্শবাদের সুর ধ্বনিত হয়। বার্নার্ড শ *Plays Unpleasant* গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন, "সাধারণ শিল্পের সম্বন্ধে আমার রুচি নেই, সাধারণ নীতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা নেই, সাধারণ ধর্ম্মবিশ্বাসে আমার আস্থা নেই, এবং সাধারণের মধ্যে প্রচলিত বীরত্বের প্রতিও আমার শ্রদ্ধা নেই।" শিল্প-রীতি বা টেক্‌নিক সম্বন্ধে এ কথা সত্য, কিন্তু নীতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নাই—এই উক্তিটির সম্বন্ধে একটু মন্তব্যের প্রয়োজন। 'নীতির প্রতি শ্রদ্ধা নেই' এই কথাটির অর্থ এই নয় যে, তিনি নীতির প্রয়োজন অনুভব করেন না; গতানুগতিক নীতির যে বন্ধনটি আমাদের যুক্তির পায়ে শিকল পরাইয়া দিয়াছে, সেই নীতিকেই তিনি মানেন না। শেলী *Epipsychidion* কাব্যে বলিয়াছেন:

> "I never was attached to that great sect
> Whose doctrine is that each should select
> Out of the crowd a mistress or a friend
> And all the rest though fair and wise, commend
> To cold oblivion..............and so
> With one chained friend perhaps a jealous foe
> The drearest and longest journey go."

শেলীর এই মতবাদটি 'ইবসেন ক্লাবে'র সভ্যদের মতবাদের চেয়ে কম বৈপ্লবিক নয়। কিন্তু ইহার মধ্যে আদর্শবাদ নাই। অপর পক্ষে বার্নার্ড শ-এর চেটারিসের পরিণতির মধ্যে একটা আদর্শবাদের স্পর্শ আছে। বার্নার্ড শ' সেখানে শেলীর তত্ত্বটিকে লাগাম খুলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তাহার দৌড় কত দূর পর্য্যন্ত তাহাও দেখাইয়া দিয়া শেষ পর্য্যন্ত বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, সংস্কারকে না মানার মধ্যে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশী।

বার্নার্ড শ-এর প্রায় সমস্ত নাটক এই প্রকার উদ্দেশ্য-মূলক বলিয়া মনে হয়। *Arms and the Man* নাটকে তিনি যুদ্ধকে ঠিক আক্রমণ করেন নাই, তবে যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সমস্ত মিথ্যা গৌরব ঘোষণা করা হয়, তাহাকে আক্রমণ করিয়াছেন। *Candida* নাটকে প্রেমকে অস্বীকার করেন নাই, তবে প্রেমের মোহ ও ভ্রান্তিকে অস্বীকার করিয়াছেন; "*You Never Can Tell*" গ্রন্থে তিনি দেখাইয়াছেন, যে 'গ্লোরিয়া' নির্বিকল্প মতবাদ লইয়া প্রেমকে অস্বীকার করিয়াছে, সে-ই প্রেমের অনিবার্য্য প্রভাবে অভিভূত হইল। কাজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে ভাসা ভাসা ভাবে দেখিলে তাঁহাকে যেরূপ প্রচলিত সমাজবিধি ও সংস্কারের বিরোধী বা নাস্তিক বলিয়া মনে হয়, তিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা নহেন।

গভীরভাবে না দেখিলে আরও মনে হয়, বার্নার্ড শ-এর জীবনদর্শন হইতেছে হৃদয়াবেগের মোহকে অস্বীকার করিয়া বুদ্ধিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা। মোহকে তিনি স্বীকার করেন না, বুদ্ধিবাদও তাহার একটা বিশেষত্ব, কিন্তু হৃদয়াবেগকেও

তিনি অস্বীকার করেন না, এইখানেই বার্নার্ড শ-এর সম্বন্ধে আর একটা দুর্জ্ঞেয়তা রহিয়াছে।

এই দুর্জ্ঞেয়তার সমাধান অসাধ্য নহে। মোহকে তিনি স্বীকার করেন না বলিয়াই যুক্তিবাদের সাহায্যে খ্রীষ্টধর্ম, বিবাহ, আভিজাত্য, রোম্যান্টিসিজম প্রভৃতির বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়াছিলেন ; কারণ এইগুলিকে কেন্দ্র করিয়া অনেক মোহের সৃষ্টি হইয়াছিল। অপর পক্ষে যাঁহারা নিছক যুক্তিবাদ মানিয়া চলেন, তাঁহাদের নাস্তিকতাও তিনি স্বীকার করেন না। সেইজন্যই তিনি যুক্তিবাদী হইয়া ডারউইন প্রভৃতির "জীবন সংগ্রাম", "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" ইত্যাদি অসামাজিক নীতি মানেন না। "জীবন সংগ্রাম", "যোগ্যতমের বাঁচিবার অধিকার" প্রভৃতি মতবাদ এই পৃথিবীকে একটি "গ্লাডিয়েটারে"র নিষ্করুণ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করিয়া তুলে। বার্নার্ড শ তাহা চাহিতেন না ; "স্নেহসুধামাখা বাসগৃহতলে" ভালবাসার নীড় রচনা করিয়াই আমরা বাস করিতে চাই, শুধু হানাহানি করিয়া টিঁকিয়া থাকিতে চাহি না। ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদ হইতেছে হানাহানি ও প্রতিযোগিতার দর্শন, কিন্তু বার্নার্ড শ-এর জীবন-দর্শন ছিল হিতবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, ব্যবহারিক নীতি ও মূল্য প্রভৃতির সহিত খানিকটা কল্পনাপ্রবণ ভাবুকতার সমন্বয়। এইখানেই তাঁহার আকস্মিকতা, এইখানেই তাঁহার দুর্জ্ঞেয়ত্ব। শ নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি "implacably anti-ritualistic and anti-materialist", অর্থাৎ একান্তভাবে চিরাচরিত প্রথাবিরোধী এবং জড়বাদবিরোধী। এই দুইটি গুণের একত্র সমাবেশ আমরা সচরাচর দেখিতে পাই না। সেইজন্যই বার্নার্ড শকে ঠিকমত বুঝিয়া উঠা আমাদের পক্ষে কঠিন।

পৃথিবী, তুমি কি বধির হলে ?

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবী, তোমার গিরি-কন্দরে
ও কিসের গর্জ্জন—?
আকাশে বজ্র ফেটে ভেঙে পড়ে
তপ্ত মাটির বুকে
বনস্পতির শাখাপ্রশাখার
জটিল অন্ধকারে
যেন বিদ্যুৎ-ফলায় বহ্নি
হঠাৎ জ্বলিয়া ওঠে।

পৃথিবী, তোমার অন্তস্তলে
ও কিসের আলোড়ন—?
কোন্ বেদনায় মাটি ফেটে যায়
ফাটলে জলোচ্ছ্বাস,
শত মুখে তার বেগবান স্রোত
প্রবল বন্যা আনে,
অকূল পাথারে ভাসে জনপদ
শত সমৃদ্ধ নগর চিহ্নহীন ?
ক্ষেত-খামারের ফাটলে ফাটলে
সর্ব্বনাশের বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
নূতন ধানের সোঁধাল গন্ধ নাই ;
গন্ধক আর যবক্ষারের ক্লেদাক্ত আবিলতা
তৃষ্ণার জলে ঘোলা হয়ে ওঠে শুধু।
ক্ষুধার অন্ন ছিল গোলাভরা ধানে,
তৃষ্ণার জল স্বচ্ছ নদীর বুকে,
মাথার উপরে আশ্রয় ছিল
পর্ণকুটীরে বৃহৎ হর্ম্ম্যতলে
কোথায় ভাসিয়া গেল !
পৃথিবী, তোমার একি কম্পন
মৃত্তিকা হতে আকাশে তাহার গতি,
বৃহদরণ্য নদনদী গিরি
কর্ম্মমুখর শত শত লোকালয়
কাঁপিয়া উঠিল ঘুম থেকে জাগা
দুঃস্বপ্নের ভয়ার্ত্ত বিস্ময়ে।

পৃথিবী, তোমার গিরি-কান্তার
হিমবান হিমালয়
নদ নদী বন সকলই শুভঙ্কর,
ভুবনপালিকা অগ্রগামিনী তুমি,
বিমলানন্দ-বিধায়িনী জগমাতা,
ভব করপুটে করিছ ধারণ

ওষধি বনস্পতি,
হিরণ্যপ্রভ হে তুমি তোমারে নমি !
মহৎ আবাস তব পাদমূলে
আপনার মাঝে তুমি যে মহিমময়ী,
তুমি বেগবতী, প্রচণ্ড তব
কম্পন জাগে যুগে কস্মিন্‌কালে,
আত্মতৃপ্ত ভোগসুখী জনে
তাই মাঝে মাঝে দিয়ে যাও তুমি নাড়া,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাপের সংক্রমণ
মুহূর্তে তুমি করে দাও পরাহত।
আজি তাই বুঝি অন্তরদাহে
জ্বলিয়া উঠিলে তুমি
ঘৃণায় তোমার বিরাট ও দেহ
বিদ্যুৎ বেগে করিলে সঙ্কুচিত ?

হে পৃথিবী, তব বিরাট আধারে
আবেষ্ট জীবন মৃত্যু মাঝে,
চন্দ্রসূর্য্য করিছে খেলা
তারকার মালা পরিয়া গলে ;
ঊর্দ্ধে আলোর খর তরঙ্গ
নিয়ে আঁধারে তুফান ওঠে,
ইথারে নিথর বেগবান বায়ু
ঝড়েরে পাঠায় শালের বনে।
পাহাড় ভাঙিয়া উপত্যকায়
নেমে আসে শত জলপ্রপাত,
তারি উচ্ছ্বাসে নদীর মোহনা
সহস্র নদী সৃজন করে
চিরপরিচিত গতিপথ ছাড়ি'
গতিবেগে ছোটে দিগ্‌বিদিকে ;
অচল পাহাড় গতি-চঞ্চল
গুহায় গুহায় চঞ্চলতা
কেহ মাথা তোলে গর্ব্বে আকাশে
কেহ লজ্জায় পাতালে ডোবে।

হে পৃথিবী, তব ষড় ঋতু মিলি
কামধেনুসম দিবস রাতি,
দোহনে বিলাক অমৃতকল্প
ক্ষুধার অন্ন তৃষার বারি,
তব কল্যাণে মুক্ত রাখিও
আমা সবাকারে ফেলো না দূরে,
তব পশ্চাতে রাখিয়া যেও না
কখনও ঊর্দ্ধে তুলো না ধরে,
নিয়ে যদি বা নিক্ষেপ কর
তাঁর চেয়ে দিও মৃত্যু সবে।

হে পৃথিবী, তব গভীর হইতে
সম্ভূত যেই গন্ধ লভি'
ওষধি ও বারি সুরভিত হয়
পুষ্করে যাহা ওতপ্রোত,
সুরভিত কর সেই সৌরভে
এই প্রার্থনা তোমার কাছে।
হে তুমি, তোমারে যত দিন আমি
দেখিব মুক্ত সূর্য্যসাথে,
যেন তত দিন নাহি হয় ক্ষীণ
আমার দৃষ্টি তোমার 'পরে,
নাহি হয় ম্লান পরিশ্রান্ত
ঊষর উদাস হয় না কভু।
পৃথিবী, তোমারে মধুময় দেখি
জীবনে গোধূলি ঘনায়ে এল,
আজি কি দেখিব ভয়ঙ্কর ?
ভূমিশয্যায় পাতিয়া আসন
মুখে ব্যোম ব্যোম তুলিছ ধ্বনি,
ধ্বংসের একি সূচনা তবে ?
জীবন হইতে জীবনের ধারা
ঋক্‌ সূক্তের অমর বাণী
আজি কি তাহলে বিফলে যাবে ?
বিফল হইবে মুক্ত আকাশে
নব সূর্য্যের স্বপ্ন দেখা ?
স্বর্ণশস্যে জীবনের আয়ু
ঊষর মরুতে শুকায়ে যাবে ?
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
হেথায় খামারে হর্ষ জাগে ;
হোথা বিমর্ষ ভুখমিছিলের
নূতন দাবির আওয়াজ ওঠে,—
পৃথিবী তুমি কি বধির হলে ?
বধির হইয়া র'বে কতকাল
এদিকে রাত্রি ঘনায়ে এল !

প্লবমান

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

তখন মহারুদ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আকর্ষণ করিয়া মুষ্টিপেষণে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

চূর্ণীকুর্বন্ত ব্রহ্মাণ্ডং পৃথিব্যাপি বিচূর্ণিতা।

দলিতাঞ্জনপুঞ্জসদৃশ মেঘ সকল, ধূম্রবর্ণ, রক্তবর্ণ, শুক্লবর্ণ, নীলবর্ণ রাশি রাশি মেঘ মহাশব্দে স্তম্ভসদৃশ স্থূল ধারাপাত করিতে লাগিল। জল, জল, জল,—একীভূতেষু তোয়েষু সর্বব্যাপিষু সর্বতঃ। সেই সর্বব্যাপী জলের মধ্যে চূর্ণীকৃত পৃথিবী নিমজ্জিত হইল। দিবা ও রাত্র, তম ও জ্যোতি, আকাশ ও পৃথিবী সমান হইয়া গেল।

তারপর? তারপর কল্প অতীত হইল। কল্পান্তে বিষ্ণু বরাহরূপে জলে নিমগ্ন পৃথিবীকে আকর্ষণ করিলেন। মহাবরাহ কর্তৃক আকর্ষিত হইয়া পৃথিবী প্লবন্নাসীৎ নৌরিব, নৌকার মত জলের উপর ভাসিতে লাগিল। যুগ যুগান্ত চলিয়া গেল, সর্বব্যাপী তোয়রাশি সবিতা শোষণ করিয়া লইলেন।

পিণ্ডবৎ পৃথিবী সবিতার দিকে চাহিয়া বলিলেন—ভগবান, আমি নগ্না, সৌরসভায় মুখ দেখাইতে পারিতেছি না, আমাকে আবরণ দাও। আমি বন্ধ্যা, আমাকে সন্তান দাও।

পৃথিবী আবরণ পাইলেন। মহাকায় সাইক্যাড ও কণিফার, ক্যাকটাস ও ফার্ণ, শৈবাল, গুল্ম, ফণীমনসা, তাল ও দেবদারু জাতীয় মহীরুহের নিবিড় অরণ্য ভূপৃষ্ঠ আচ্ছাদিত করিল। নির্বাত, আলোকহীন সে আদিম অরণ্য। সবিতা-দীপ্ত পৃথিবী সেই অরণ্যমধ্যে সন্তান প্রসব করিলেন।

জুরাসিক যুগের পৃথিবী। ফুল, ফল, রং, গন্ধহীন, পাখীর গান ও মানুষের হাসিশূন্য সেই মহাকায় সাইক্যাড, কণিফার ও ক্যাকটাসের জঙ্গলে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল পৃথিবীর সন্তান, অতিকায় সরীসৃপদল। অতিকায় সরীসৃপগোষ্ঠীর ডাইনোসর, টিরেনোসর, ষ্টেগোসর, জাইগ্যাণ্টোসর, শৃঙ্গধারী ট্রিছেরাটপ বীভৎস উল্লাসে, হিংস্রগর্জ্জনে, পরস্পরের মধ্যে উন্মত্ত সংগ্রামে নিবিড় অরণ্য আলোড়িত, বিপর্য্যস্ত করিতে লাগিল। যুধ্যমান হইয়া তাহারা পরস্পরের দিকে চাহিয়া থাকিত; তাহাদের হিংস্র দৃষ্টিতে পরস্পরের প্রতি অন্ধ অসূয়া ও উন্মত্ত আক্রোশে যেন স্ফুলিঙ্গ ছুটিত। আক্রমণকারীর সদম্ভ গর্জ্জন ও আক্রান্তের ভয়ার্ত্ত, তীব্র চীৎকার অহোরাত্র পৃথিবীকে পীড়িত করিত।

অতিকায় সরীসৃপ-প্রসবিনী পৃথিবী সন্তানবাৎসল্য ভুলিয়া আর্ত্তবিলাপে বায়ুমণ্ডল বিদীর্ণ করিলেন। সেই আর্ত্তধ্বনিতে ধ্যানমগ্ন সবিতার ধ্যান ভঙ্গ হইল। সবিতা শুনিলেন পৃথিবী বিলাপ করিতেছে—হে হিরণ্যবর্ণ, হে প্রভু, এ কি সন্তান দিয়াছ আমার গর্ভে? ভগবান, অনন্তকাল জলে নিমজ্জিত থাকাও যে আমার ভাল ছিল।

সবিতা আপনমনে মৃদু হাস্য করিয়া দুই চক্ষু নিমীলিত করিলেন।

মেরু হইতে হিমশীতল বায়ুস্রোত বিশাল সাইক্যাড, কণিফার ও ক্যাকটাসের নিবিড় অরণ্যের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিল, চতুর্দ্দিকে মৃত্যু বিকীর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইল তুষার-স্রোত, আরম্ভ হইল ভূপৃষ্ঠের উন্মত্ত আক্ষেপ।

ভাঙ্গিয়া, চুরিয়া, ফাটিয়া, গলিয়া পৃথিবী নূতন রূপ ধরিল। ধীরে ধীরে ভূপৃষ্ঠের আক্ষেপ শান্ত হইল। তারপর ক্রমে শ্যামল বনভূমিতে পৃথিবী আবৃত হইল, লতাশীর্ষে বিচিত্র বর্ণ ও গন্ধ বহন করিয়া আসিল ফুল, বৃক্ষশাখায় আসিল ফল। পাখীর কলকাকলীতে নিস্তব্ধ বনভূমি মুখরিত হইল। সবিতার প্রসন্নহাস্যে দীপ্ত পৃথিবী নূতন সন্তান প্রসব করিলেন—মানুষ।

নবজাত সন্তানের মুখ দেখিয়া বাৎসল্যে পৃথিবীর হৃদয় গলিয়া গেল।

শ্যামল বনভূমিপ্রান্ত আশ্রয় করিয়া মানুষ ঘর বাঁধিল, গৃহস্থালী পাতিল। মাতৃস্নেহে বিগলিতহৃদয় বিমুগ্ধা পৃথিবী নির্নিমেষ নয়নে নবজাত সন্তানের জীবনলীলা দেখিতে লাগিলেন।

১

১৯৪৫-এর পূজার কিছু আগে।

ঠাকুমা পূজায় বসিয়াছেন, কাছে পঞ্চবর্ষীয় পৌত্র বসিয়া পূজা দেখিতেছে ও মাঝে মাঝে ঠাকুমার অনুকরণ করিয়া হাত নাড়িতেছে, ব-ব বম্ শব্দ করিতেছে। কি মনে হওয়ায় সে হস্ত প্রসারণ করিল তামার টাটে বসানো মাটির শিবলিঙ্গটি লইবার জন্য। তাড়াতাড়ি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া ঠাকুমা বলিলেন—ওরে ডাকাত, করিস কি? ঠাকুর রাগ করবেন।

তিনি পুত্রবধূকে ডাকিলেন, অ বৌমা, তোমার ছেলেকে নিয়ে যাও।

দ্বাবিংশ বর্ষীয়া পুত্রবধূ সরমা ঘরের বারান্দায় বঁটি পাতিয়া তরকারি কুটিতেছিল। শাশুড়ীর ডাক শুনিয়া বঁটি কাৎ করিয়া রাখিয়া উঠিল। অতিশয় সুশ্রী মুখ, লাবণ্য গড়াইয়া পড়িতেছে সর্ব্বদেহ হইতে। মুখচোখ চাপা খুশিতে উজ্জ্বল। মাথায় অল্প একটু ঘোমটা তুলিয়া দিয়া সে ঘরে আসিল।

মাকে দেখিয়া পৌত্র তাড়াতাড়ি ঠাকুমাকে জড়াইয়া ধরিল। মাকে বলিল, বৌমা, তুমি ভাত রান্না করগে। কত্তাবাবুর খিদে নেগেছে।

সরমা হাসিয়া বলিল—এসো দুষ্ট, তোমার কান মলে দিচ্ছি।

শাশুড়ীকে বলিল—শুনেছেন মা, আপনার নাতির কথা, কত্তাবাবুর খিদে লেগেছে।

শাশুড়ী হাসিলেন, পৌত্রের মাথায় চুমা খাইলেন। পুত্রবধূর দিকে চাহিয়া বলিলেন—হাঁ বৌমা, নরু কবে আসবে লিখেছে? কর্ত্তা বলছিলেন কাল তার চিঠি এসেছে।

ছেলে বাধা দিয়া বলিল—বৌমা, ভাত রান্না করগে, নরু খাবে।

তাহার কথা শুনিয়া পুত্রবধূ ও শাশুড়ী উভয়ে হাসিলেন। ঠাকুমা বলিলেন, কি চালাক ছেলে তোমার দেখেছ?

সরমা বলিল, লিখেছেন ১৫ই রওনা হবেন।

শাশুড়ী—আজ বুঝি দশুই? তা হলে এখনও পাঁচ দিন দেরি। ষষ্ঠীর দিন পৌঁছবে।

পুত্রবধূ—পঞ্চমীর দিন পৌঁছবেন।

শাশুড়ী—পঞ্চমীর দিন? সেদিন ত সরি আসবে তার শ্বশুর-বাড়ী থেকে। ভূপীন ও সন্তুর আসবার কথা কবে জান বৌমা?

পুত্রবধূ—ওঁরা আসবেন চতুর্থীতে, লতা ও নতুন জামাই আসবে ষষ্ঠীর দিন।

শাশুড়ী—তা হলে চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, রোজই নৌকে পাঠাতে হবে ষ্টেশনে। মেয়ে, জামাই, নাতি, নাতনি, ছেলেতে বাড়ী ভরে উঠবে। কর্ত্তার বড় সাধ, যে যেখানে আছে পুজোয় সবাই এসে আমোদ-আহ্লাদ করবে ক'দিন।

নাতি—আমি করব ঠাকুমা।

ঠাকুমা—তুমি আমোদ-আহ্লাদ করবে বই কি দাদু। তোমারই ত পুজো।

নাতি—আমি ঢাক বাজাবো ড্যাং ড্যাং।

ঠাকুমা—বাজাবে বই কি। ঢাক কাঁধে করে নাচতে পারবি ত দাদু যেমন ভোলা ঢাকী নাচে?

নাতি—নরু ঢাক আনবে।

ঠাকুমা—তা হলে নরুকে লিখে দাও আর সব জিনিসের সঙ্গে একটা ঢাকও যেন কিনে আনে।

ছেলে মাতার মুখের দিকে চাহিল। বলিল—বৌমা লিখবে।

মাতা—আমি লিখব না।

ছেলে—আমি কত্তাকে বলে দেব, কত্তা বকবে।

সরমা হাসিয়া হাত বাড়াইয়া ছেলেকে টানিয়া লইল। বলিল, তুমি এখন এসো ত ফাজিল ছেলে। ঠাকুমাকে পুজো করতে দাও।

ছেলেকে কোলে লইয়া সরমা চলিয়া গেল।

নিজের ঘরে আসিয়া সরমা ছেলেকে বিছানায় বসাইয়া দিল। একরাশ খেলনা তাহার সম্মুখে রাখিয়া বলিল, লক্ষ্মী ছেলের মত খেলা কর, আমি কাজ করি।

স্বামীর চিঠি পাইবার পর হইতে সরমার হাসিখুশি বাড়িয়াছে। সে ঘরের টুকিটাকি সাজাইতে লাগিল। দিনে দুই বার তিন বার করিয়া সে এই কাজ করে। ঘর সাজাইতে সাজাইতে সে নিজের মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে লাগিল।

ছেলে মায়ের মুখে গান শুনিয়া চাহিয়া দেখিল। বলিল, বৌমা, আমি গান করি?

মা হাসিল বলিল—করো।

ছেলে গান করিতে লাগিল—তাই তাই তাই, মাসীর বাড়ী যাই।

নরেন ও আর সকলে আসিয়া বাড়ী ভরিয়া ফেলিল। মহা ধুমধামে, আমোদ আহ্লাদে পূজার কয়টা দিন কাটিল।

দশমীর দিন ভাসান শেষ করিয়া ও পাড়ায় ঘুরিয়া একটু রাত করিয়া নরেন বাড়ীতে ফিরিল। আহারাদি শেষ হইবার পর সে যখন শয়ন করিতে আসিল পুত্র তখন এক ঘুম দিয়া উঠিয়া মায়ের সঙ্গে গল্প করিতেছে।

নরেন ঘরে ঢুকিতে সরমা বলিল—গাঁয়ের সকলের সঙ্গে প্রণাম, কোলাকুলি সেরে তবে ঘরে এলে। আমার পালা সকলের শেষে।

সে বিছানা হইতে ছেলেকে নামাইয়া দিয়া বলিল—যা, প্রণাম কর।

পুত্র নামিয়া আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিল। নরেন তাহাকে কোলে তুলিয়া চুমা খাইল।

সরমা বলিল—ওকে নামিয়ে দাও, আমি প্রণাম করি।

ছেলে—আমি নামবো না।

সরমা—তা নামবে কেন? নেমক হারাম ছেলে।

সে গলায় আঁচল দিয়া স্বামীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ছেলে পিতাকে বলিল—বৌমাকে চুমু খাও।

পিতা—তুমি খাও।

ছেলে দুই হাত বাড়াইয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুমা খাইল। তারপর বলিল—নরু, তুমি খাও।

সরমা—চুপ, দুষ্ট ছেলে।

বারান্দা দিয়া ঠাকুমা মেয়ের ঘরের দিকে যাইতেছিলেন। নাতির গলা শুনিয়া বলিলেন—কি দাদু, তোমার ঘুম ভাঙল?

ছেলে বলিল—অ ঠাকুমা, নরু কথা শোনে না। বৌমাকে চুমু—

সরমা তাড়াতাড়ি ছেলের মুখে হাত চাপা দিল। তাহার মুখ লাল হইল। বলিল—কি দুষ্টু ছেলে দেখেছ?

ছেলে মুখ সরাইয়া লইয়া বলিল—অ ঠাকুমা—

ঠাকুমা তখন বড় মেয়ের ঘরের কাছে পৌঁছিয়াছেন, নাতির ডাক শুনিতে পাইলেন না।

পরের দিন সন্ধ্যা। বাহিরের ঘরে কর্তার আসরে গল্প চলিতেছে। নাতি একটি সন্দেশ হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া কর্তা বলিলেন, কি দাদু, ঘুমোও নি?

নাতি সন্দেশটি মুখে পুরিয়া বলিল—আমি গপ্‌পো করব।

সে ফরাসে উঠিয়া দাদুর কোলে গিয়া বসিল।

গল্প চলিতেছিল ৩০শে আশ্বিন রাখীবন্ধনের কথা লইয়া। গল্প করিতেছিলেন রামবাবু। স্বদেশী আমলে ছাত্রাবস্থায় তিনি ছয় মাসের জন্য জেল খাটিয়াছিলেন। তাঁহাদের গ্রাম কুসুমপুরে প্রথম রাখীবন্ধনের উৎসব কি ভাবে প্রতিপালিত হইয়াছিল সেই গল্প করিতেছিলেন। রাত থাকিতে উঠিয়া—"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নেরে ভাই" গান গাহিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ, সারাদিন উপবাস, রাখীবন্ধনের মন্ত্র—

ভাই ভাই এক ঠাঁই
ভেদ নাই ভেদ নাই,

বলিয়া ছেলেবুড়োর পরস্পরের হাতে রাখী বাঁধা; এই সব পুরাতন কাহিনী তিনি উৎসাহের সঙ্গে বলিতেছিলেন।

কিছুক্ষণ রামবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া গল্প শুনিয়া নাতি বলিয়া উঠিল—দাদু, আমি গপ্‌পো বলি।

দাদু—বল দাদু।

নাতি—(হাত নাড়িয়া) ভেদ নাই, ভেদ নাই। ভেদ কি দাদু?

দাদু পৌত্রকে বুঝাইতে লাগিলেন ভেদ মানে কি। নাতির চোখ ঘুমে ঢুলিতেছিল। সে হাই তুলিল। বলিল—আমি শোব দাদু।

দাদুর কোলে মাথা রাখিয়া সে শুইল ও ঘুমাইয়া পড়িল।

যদুবাবু বলিলেন—সে একদিন গেছে। তার পর ভাঙ্গা বাংলা জোড়া লাগল, লোকে রাখীবন্ধন ভুলে গেল। আবার ভাগ-বিভাগের কথা শোনা যাচ্ছে। কংগ্রেসের সঙ্গে নাকি কথাবার্তা চলছে।

রামবাবু—কংগ্রেস জন্ম থেকে চিরকাল একতার কথা বলছে, দেশ ভাগের প্রস্তাব কি কংগ্রেস কখনো মানতে পারে? দেখো ইংরাজের এ সব চাল ভেস্তে যাবে।

তামাক দিতে চাকর ঘরে আসিল। ঘুমন্ত নাতিকে দেখাইয়া কর্তা বলিলেন—ওকে ঘরে দিয়ে আয়।

নাতি মুখে আঙুল পুরিয়া ঘুমাইতেছিল। চাকর তাহার গায়ে হাত দিতে সে জাগিয়া উঠিল, ঠেলিয়া চাকরের হাত সরাইয়া দিল। বলিল—দাদু, আমি গপ্‌পো বলব।

দাদু—(হাসিয়া) কি গল্প বলবে দাদু?

নাতি—আমি ভালো গপ্‌পো বলব। (হাত নাড়িয়া) —এক ঠাঁই, ভেদ নাই, নাই।

দাদু—বেশ গল্প বলেছ দাদু। এবার যাও ত, বৌমার কাছে পান নিয়ে এসো।

নাতি—বৌমা পান ছেঁচে দেবে দাদু?

দাদু—(হাসিয়া) হাঁ, দাদু, ছেঁচে দেবে। যাও কোলে চড়ে গিয়ে পান আনো।

নাতি চাকরের কোলে উঠিল। উঠিয়া তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া সে আবার ঘুমাইয়া পড়িল। চাকর তাহাকে ঘরে লইয়া গিয়া সন্তর্পণে বিছানায় শোয়াইয়া দিল। শুইয়া একবার চোখ মেলিয়া সে বলিল—পান ছেঁচে দেবে।

তার পর মুখে আঙুল পুরিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতে সে শুনিল তাহার পিতা-মাতা মৃদুস্বরে কথা বলিতেছেন। সে উঠিয়া বসিল। বলিল—বৌমা, চুপ করো, আমি ভাল গপ্‌পো বলব। (হাত নাড়িয়া) ভেদ নাই, নাই।

মাতা—দস্যি ছেলে, তুমি এর মধ্যে জেগে উঠেছ?

নরেন—ও কি বলছে শুনলে?

সরমা—ওর কথার কোন মাথামুণ্ডু আছে? কি কোথায় শুনেছে তাই বলছে।

নরেন—ও বলছে রাখীবন্ধনের মন্ত্র, রবীন্দ্রনাথের তৈরি। সেই পুরনো দিনের পুরনো ভুলে যাওয়া মন্ত্র—'ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই।' আজকের দিনে এ মন্ত্র ও শুনল কোথায়?

সরমা—বোধ হয় কর্তার বৈঠকখানায় কেউ গল্প করছিলেন তাই শুনেছে। ছেলের এদিকে স্মরণশক্তি খুব। একটা গল্প মনে হ'ল। এবারকার ভাদ্রমাসের বানের সময়কার।

নরেন—ভাদ্র মাসের বান? ও তাই ত, বাবা লিখেছিলেন বটে বিল ভাসি হয়ে ধান নষ্ট হয়েছে, গরু মহিষ অনেক মরেছে বিলের মধ্যে গাঁগুলোতে, ঘরবাড়ী ভেসে গেছে।

সরমা—দু'জন মানুষও মরেছিল। বিলের জল এসে কয়ালী নদীতে পড়ে নদীতে বান ডাকল। নদীর জল এসে গাঁয়ে ঢুকল, ক্ষেতখামার, বাগান ডুবে গেল। সদর রাস্তায় আধ মানুষ জল হ'ল। জলটা শিগগির নেবে গেল নইলে আমাদের হয়ত দালানের ছাদের ওপর বসে থাকতে হ'ত। আর ভাই কি থাকতে পারতেম? কি বিষ্টির বিষ্টি! তিন দিন ধরে একটু বিরাম নেই।

নরেন হাসিয়া বলিল—এক কৌটা কয়েলী নদীর বানে এত ভয় পেয়েছিলে। যদি উত্তর বঙ্গের বন্যা, দামোদরের

বন্যা চোখে দেখতে। স্কুলে পড়বার সময় আমরা একবার বন্যায় স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করতে গিয়েছিলেম। দেখে মনে হ'ত যেন গোটা দেশ জলে তলিয়ে গিয়েছে। মানুষ ভাসছে, গরু, মহিষ, কুকুর, বেরাল, গাছ, ঘরের চালা ভেসে চলেছে। বাঘ, শেয়াল, বরা পর্যন্ত জলে ভেসে চলেছে। সারা সৃষ্টি ভাসমান আর কি। যাক্‌, কি গল্পের কথা বলছিলে।

সরমা—তোমার কথায় আমার ভয় ধরে গেছে, আর গল্প ভাল লাগছে না।

নরেন—(হাসিয়া) আচ্ছা ভীতু মানুষ তুমি, ভয়ের কথা কি হয়েছে ?

সরমা—তুমি কয়েলীকে এক ফোঁটা বলে ঠাট্টা করলে, তার তখনকার চেহারা যদি দেখতে। গাঁয়ে জল ঢুকতে সবাই ভয় পেয়ে গেলেন। আমার মনে হ'ত, আচ্ছা, আরও জল বাড়লে না হয় ছাদে উঠলেম। যদি ছাদ সমান জল হয় তখন ? ভাবতেম খোকনকে পিঠে বেঁধে সাঁতার দেব। কিন্তু সাঁতরে যাবো কোথায়। চারদিকেই ত জল। আর সেই জলে সাপ, ব্যাং সব ভাসছে। কি ভয় হয়েছিল দু'তিন দিন।

ছেলে আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নরেন হাসিয়া স্ত্রীর গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল,—মিছেমিছি ভয় পেলে চলবে কেন সরমা ? সংসারে সত্যিকারের ভয়ের জিনিষ কত আছে ; সে সব জিনিষের সামনে পড়লে কি করবে ?

সরমা রাগ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। বলিল—কুক্ষণে আমি বানের কথা তুলেছিলাম। তুমি কেবলই ভয় পাইয়ে দিচ্ছ। লক্ষ্মী পুজোর পর দিন ত চলে যাবে। এই সব বিশ্রী গল্প করে রাত কাটাবে ?

নরেন হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, একটা খুব ভাল গল্প বলছি, শোন। কই, এ দিকে মুখ ফেরাও।

সরমা—কি রকম গল্প আগে শুনি।

নরেন—শোন। অনেক রাত হয়েছে। সানাইওয়ালারা ক্লান্ত হয়ে সবে থেমেছে। ঘরে যারা হুল্লোড় করছিল তারা সবাই চলে গেছে। ছেলেটি উঠে বিছানায় বসল। পাশে শাড়ী গহনায় ঢাকা মেয়েটি বালিশে মুখ গুঁজে ঘুমোবার ভান করছিল। তার পিঠে হাত রেখে ছেলেটি বলল—তুমি বড় সুন্দর। বালিশে মুখ গুঁজে রাখলে আমি তোমার মুখখানা দেখব কি করে ? একবারটি মুখখানা তোল। মেয়েটি কি বলল জানো ?

সরমা হাসিয়া বলিল—বড্ড চালাক তুমি। একটু মুশকিল দেখলেই ঐ ছয় বছরের পুরনো গল্প তুলে বাজিমাৎ কর।

নরেন—হুঁ, মেয়েটিকে তা হলে যেন মনে হচ্ছে ? সে কি বলল বল ত।

সরমা হাসিয়া বলিল—বলল, আমি সুন্দর না ছাই।

নরেন—শুনে ছেলেটি বলল—তাই নাকি ? দেখি, দেখি ছাই মুখখানা।

ছেলে ঘুমের ঘোরে কি যেন বলিল বুঝা গেল না।

সরমা তাড়াতাড়ি বলিল, এই, চুপ। খোকন জেগে উঠবে। এত রাতে জাগলে বাকী রাত কেবল বায়না করবে।

২

১৯৪৬-এর পূজার কিছু আগে।

সরমা ঘরে ঢুকিয়া বলিল—মা, আর কোন খবর এল কলকাতা থেকে ?

শাশুড়ী বলিলেন—না বৌমা, আর কোন খবর ত আসে নি।

সরমার আর সে রূপ নাই, স্নিগ্ধ লাবণ্য নাই, সে শুকাইয়া উঠিয়াছে। মেঝেতে বসিয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—মা, এমন করে আমি যে আর থাকতে পারছি নে। আছেন কি নেই খবরটুকু কেউ দিল না।

শাশুড়ী কাঁদিতে লাগিলেন, পুত্রবধূর কথার কোন জবাব দিলেন না।

সরমা উঠিয়া শ্বশুরের ঘরের দিকে গেল। দরজার কাছে গিয়া গলা শুনিয়া বুঝিল বাহিরের লোক আছে ঘরে। সে আর ঘরে না ঢুকিয়া দরজার পাশে মেঝেতে বসিল কি কথা হয় শুনিবার জন্য।

রামবাবু বলিতেছিলেন—কত রকমের কথা শুনছি লোকের মুখে, খবরের কাগজে। কাল রাত্রে একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিলেম। সারা পৃথিবীর হাওয়ায় যেন বিষ ঢুকেছে। এই হাওয়া লেগে যেমন শেয়াল-কুকুর ক্ষেপে যায়—তেমনি মানুষ ক্ষেপে গেছে। সব জায়গায় কামড়াকামড়ি, খেয়োখেয়ি লেগে গেছে। কামড়াকামড়ি করতে করতে পৃথিবীর সব মানুষ মরে ভূত হয়ে গেল। পৃথিবীতে রইল কেবল জন্তু জানোয়ার।

হরিবাবু—গোটা দেশটার ওপর কোন দেবতার অভিশাপ নেমে এসেছে। তিন বছর আগের কথা মনে কর একবার। অজন্মা নেই, কিছু নেই, যাদুমন্ত্রে চাল কোথায় উড়ে গেল, লাখ লাখ লোক না খেতে পেয়ে শুকিয়ে পথে ঘাটে, যেখানে সেখানে পড়ে মরল। এবারকার কলকাতার কাণ্ডের কথা—

হরিবাবু কথা শেষ না করিয়া থামিলেন।

নরেনের পিতা বৃদ্ধ হরেনবাবু শূন্য দৃষ্টি মেলিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে দাঙ্গার দ্বিতীয় দিনে নরেনের অন্তর্হিত হইবার সংবাদ আসিবার পর হইতে তিনি ভাঙিয়া পড়িয়াছেন। সদানন্দ, মজলিসী মানুষ ছিলেন তিনি, পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত অথর্ব হইয়াছেন। মাঝে মাঝে বিড়-

বিড় করিয়া কি বলেন, কেহ বুঝিতে পারে না। একটা কথা স্পষ্ট বুঝা যায়—মানুষ এমন হয়? বার বার এই কথাটাই যেন কোন অদৃশ্য শ্রোতাকে জিজ্ঞাসা করেন। সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা, রাত্র, সব সময় কেমন যেন একটা ঘোর ভাব।

গত দুর্ভিক্ষের সময়ে তিনি হিসাব করিয়া নিজের খোরাকী মাত্র হাতে রাখিয়া শত শত মণ ধান অনাহার ক্লিষ্টদের মধ্যে বিলাইয়াছিলেন। অভাবীদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান বলিয়া বিচার করিবার কথা তাঁহার মনে হয় নাই। হঠাৎ এ প্রশ্নটা বড় হইয়া উঠিল কেন? কে বড় করিল? পুত্রের অন্তর্হিত হইবার সংবাদ পাইয়া এই প্রশ্ন কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আপনাকে? কি উত্তর পাইয়াছিলেন নিজের মনের কাছে?

হরিবাবুকে শোকার্ত্ত হরেনবাবুর শূন্যদৃষ্টির অজিজ্ঞাসিত প্রশ্নের সম্মুখে নির্ব্বাক হইয়া থাকিতে দেখিয়া রামবাবু আবেগ-পূর্ণ স্বরে বলিলেন—আমার কি মনে হয় জান হরি? মানুষের পাপের মাত্রা পূর্ণ হয়েছে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি, মারা-মারি, কাটাকাটি করে মানুষ শেষ হয়ে যাবে। পৃথিবী নির্ম্মানুষ হবে। তাই হোক। মানুষ পৃথিবীর অলঙ্কার না হয়ে হয়েছে পৃথিবীর ভার। ভগবান যেন সব মানুষ ধ্বংস করে পৃথিবীকে ভাল করে ধুয়ে পুঁছে নূতন সৃষ্টি করেন।

হরেনবাবু শূন্যদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—সেই ভাল, সেই ভাল।

সরমা দরজার আড়ালে বসিয়া শ্বশুরের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। নিজের মনে বলিল—আমার খোকন, আমার খোকনের কি হবে?

সে উঠিয়া তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গেল তাহার ছেলে ঘুমাইতেছে না পিতার মত অন্তর্ধান করিয়াছে দেখিবার জন্য।

৩

১৯৪৭-এর পূজার কিছু আগে।

স্বপ্নের আসমুদ্র হিমাচল অখণ্ড ভারত খণ্ডিত হইয়াছে। সমুদ্র মন্থনে উঠিয়াছিল অমৃত ও গরল। আর উঠিয়াছিলেন লক্ষ্মী। ভারতমন্থনে কি উঠিয়াছে? কোথায় লক্ষ্মী, কোথায় অমৃত?

কয়ালীতে এবার বান আসে নাই। বিলে বান নাই, কয়ালীতে বান নাই, বান আসিয়াছে বাতাসে। কি প্রবল স্রোত সে বানে! সব ভাসিয়াছে সে বানের জলে। সব নয়, শুধু মানুষ। বৃদ্ধ, যুবক, বালক, শিশু, স্ত্রী, পুরুষ, সমর্থ, অসমর্থ, ধনী, নির্ধন, শহরের মানুষ, গাঁয়ের মানুষ, কারবারী মানুষ, ক্ষেতের মানুষ, সাধু মানুষ, অসাধু মানুষ সকলে ভাসিয়াছে হাওয়ার বানে। লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ বানভাসি। ভাসিতে ভাসিতে কতজন ডুবিবে, কতজন চড়ায়, আঘাটায় আটকাইয়া যাইবে, কতজন হাঙ্গর, কুমীরের পেটে যাইবে কে জানে?

এক হাতে ছেলের হাত অন্য হাতে শাশুড়ীর হাত ধরিয়া সরমা চলিতেছে, আগে চলিতেছেন লাঠি ধরিয়া বৃদ্ধ হরেন বাবু। সেই হরেনবাবু দুর্ভিক্ষের সময় আহার দিয়া শত শত লোককে যিনি বাঁচাইয়াছিলেন। বাড়ীঘর, জিনিসপত্র, ক্ষেত-খামার সব ফেলিয়া এই বৃদ্ধ কোথায় চলিয়াছেন? কেন চলিয়াছেন?

ছেলের হাত শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া সরমা বলিল—মা, আমার খোকনকে কি বাঁচাতে পারব? আমরা কোথায় চলেছি মা?

শাশুড়ী বলিলেন—বাঁচবে বই কি বৌমা। ওকে বাঁচাবার জন্যই আমরা পথে বেরিয়েছি।

সরমা—আমরা কি পৌছুতে পারব মা?

শাশুড়ী—পৌছুবার ত কোন জায়গা নেই আমাদের বৌমা।

সরমা—খোকনের জন্য বড় ভয় করছে মা।

শাশুড়ী—ভয় কি বৌমা? আমরা দু'জন যদি পথের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে যাই ঐ দেখ আগে পিছনে কত লোক চলেছে। খোকনকে নিয়ে ওদের সঙ্গে তুমি চলে যাবে।

সরমা—ও কথা মুখে আনবেন না, মা। শুনে আমার হাত-পা কাঁপছে।

শাশুড়ী—হাত-পা কাঁপতে দিও না বৌমা, আমাদের খোকনকে বাঁচাতে হবে। যদি কখনও সুদিন আসে সেই আশায় ওকে বাঁচাতে হবে। নরুর ছেলে, আমাদের বংশের প্রদীপ। (নিজের মনে হাসিয়া) আমাদের বংশ! একসঙ্গে বংশের তিন পুরুষ আজ পথে ভেসেছে হাতধরাধরি করে।

সরমা এক হাতে ছেলের হাত অন্য হাতে শাশুড়ীর হাত ধরিয়া চলিতে লাগিল। আগে চলিয়াছেন বৃদ্ধ হরেনবাবু। কুসুমপুরের বনিয়াদী, বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের তিন পুরুষ নীড়চ্যুত হইয়া পথে ভাসিয়াছে। আজ তাহারা বানভাসি।

৪

ধীরে ধীরে গোধূলির ছায়া নামিতে লাগিল চারিদিকে।

যে স্নেহমুগ্ধা জননী পৃথিবী একদিন শ্যামল বনভূমির আঁচল পাতিয়া দিয়াছিলেন তাঁহার নবজাত সন্তানের জন্য গোধূলির ম্লানায়মান ছায়ার মধ্য দিয়া দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া তিনি দেখিলেন লক্ষ লক্ষ আতঙ্কিত মানুষের লক্ষ্যহীন সঞ্চরণ, দেখিলেন ছিন্নমূল লতার মত ভাসিয়া চলিয়াছে কত সরমা, বৃন্তচ্যুত পুষ্পকোরকের মত কত সরমার দুলাল, উন্মূলিত শুষ্ক তৃণখণ্ডের ন্যায় হরেনবাবুর মত কত বৃদ্ধ, সরমার শাশুড়ীর মত কত বৃদ্ধা। চাহিয়া দেখিয়া তাঁহার মাতৃবক্ষ মথিত করিয়া একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়িল।

তাঁহার মনে পড়িল নবজাত সন্তানের মুখ দেখিয়া কি উজ্জ্বল স্বপ্ন জাগিয়াছিল তাঁহার মনে, কত আশায় তাঁহার বক্ষ পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি সস্নেহে লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাঁহার সন্তান ক্ষুদ্রাকৃতি বটে, কিন্তু তাহার ঐ ক্ষুদ্র বক্ষে কত আশা, ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে কত বুদ্ধি, ক্ষুদ্র বাহুতে কত শক্তি! স্নেহবিগলিত হইয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন বড় হইয়া তাঁহার সন্তান নব নব কীর্ত্তিতে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল করিবে।

উদ্‌গত অশ্রু রোধ করিয়া জননী পৃথিবী আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ত সেদিন মানুষ গৃহস্থালী পাতিয়াছিল, এমন দুষ্কৃতী কে জন্মিল মানুষের মধ্যে যাহার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের সুখের সংসার পুড়িয়া গেল, ছন্নছাড়া হইয়া তাহারা বন্যার স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে? আপনার মনের কাছে উত্তর না পাইয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলিয়া তিনি ঊর্দ্ধে সবিতার দিকে চাহিলেন। চাহিতে বহুদিনের অতীত আত্মজীবনের বিস্মৃত এক অধ্যায়ের কথা মনে পড়িতে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল এক বিস্মৃত চিত্র। দেখিলেন, শ্যামল, বিস্তীর্ণ বনভূমিকে কুক্ষিগত করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে বিরাট সাইক্যাড, কণিকার, ক্যাকটাসের নিবিড় অরণ্য। সেই বিস্তীর্ণ অরণ্যের মধ্যে উন্মত্ত, হিংস্র আক্রোশে বীভৎস গর্জ্জন করিতেছে অতিকায় সরীসৃপযূথ, ডাইনোসর, টিরেনোসর, ষ্টেগোসর, আইগ্যান্টোসর, শৃঙ্গধারী ট্রিছেরাটপ। যুধ্যমান হইয়া হিংস্র দৃষ্টিতে তাহারা পরস্পরের দিকে চাহিতেছে, এই বুঝি লাফাইয়া একটা আর একটার ঘাড়ে পড়িবে।

চিত্র দেখিয়া আত্মবিস্মৃতা, শঙ্কিতা, জননী পৃথিবী ব্যাকুল দৃষ্টিতে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন মানুষ কোথায় গেল। অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান, আদরের দুলাল মানুষ কি আজ আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে উন্মত্ত অতিকায় সরীসৃপে পরিণত হইয়াছে? এই জন্যই কি আজ দুঃখ দুর্দ্দশার সীমা নাই মানুষের সংসারে? এই চিন্তা মনে উদয় হইতে তাঁহার সকল অঙ্গ হিম হইয়া আসিল।

ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে সবিতার দিকে চাহিয়া আত্মবিস্মৃতা পৃথিবী আর্ত্তনাদ করিলেন—হে হিরণ্যবর্ণ, হে সবিতা, হে প্রভু, একি সন্তান দিয়াছ আমার গর্ভে? মানুষরূপী বীভৎস সরীসৃপকে কি আমি বক্ষরক্ত দিয়া পালন করিয়াছি এত দিন? কেন এ ছলনা করিলে দুর্ভাগিনী ধরিত্রীকে? ভগবান, অনন্তকাল জলে নিমজ্জিত থাকাও যে আমার ভাল ছিল।

ভয়ার্ত্তা পৃথিবীর বিলাপে সবিতার ধ্যান আজিও ভাঙ্গিল না। কে শঙ্কিতা জননী পৃথিবীকে সান্ত্বনা দিবে? কে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিবে—জননী, তোমার সন্তান মানুষ অতিকায় সরীসৃপে পরিণত হয় নাই, সে মানুষই রহিয়াছে?

স্বর্গ ও নরক

শ্রীকালিদাস রায়

কাঠের প্রতিমা ভরি' ঘরে ঘুন আগুনে তা' পোড়ে,
গলায়ে সোনাটা বেচে সোনার প্রতিমা লয় চোরে।
সীসার প্রতিমা ভেঙে র'য়ে যায় মাটির তলায়,
তাহারে উদ্ধার করি রাখে নর সংগ্রহ-শালায়।
পূজা শেষে তিন দিন মাটির প্রতিমা জলে গলে,
খড়ের কাঠামোখানা রয়ে যায় দোচালার তলে।
মাংসের প্রতিমাগুলি কিছু দিন পায় পূজা ভোগ
তাহারে আশ্রয় করে বহু কীট, শোক জরা রোগ,
মিশে শেষে মৃত্তিকায়, ভস্ম হয় অথবা পাবকে,
দুই দিন স্মৃতি থাকে প্রিয়জন-চিত্তের ফলকে।

দারু নয়, শিলা নয়, তবু এই মাংস-প্রতিমায়
দেবতা আশ্রয় লয় যুগে যুগে তুল নাহি তায়।
পদচিহ্ন রেখে গেছে যারা মহামানব-জীবনে,
যাহাদের করস্পর্শ—বর হয়ে রাজিছে ভুবনে,
অশ্রুজলে করে গেছে প্রতি জলধারারে জাহ্নবী।
নিশ্বাসে করিয়া গেছে এ বিশ্বের পবনে সুরভি।
আত্মার কল্যাণ ধর্ম্মে, জ্ঞান কর্ম্মে, শত অবদানে,
আপন দেবত্বটুকু রেখে গেছে শিল্পে কাব্যে গানে।
বৈশ্বানরে দেহ দগ্ধ, বিশ্বময় চিত্তে পেল ঠাঁই
তাহারা অমর আর, তাই স্বর্গ, স্বর্গান্তর নাই।
লক্ষ লক্ষ ডুবে যারা বিস্মৃতির গভীর অতলে,
তারাই সত্যই মরে, তারা সবে নরকেই চলে।

সূর্য্য

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস

আমাদের সূর্য্য অতি সাধারণ এক তারা, অপেক্ষাকৃত কাছে থাকায় এত বড় দেখায়; আকাশের অন্যান্য অনেক তারকাই এক-একটি মহাসূর্য্য, বহু দূরে অবস্থিত বলিয়া এত ছোট মনে হয়। সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো—এই নবগ্রহ নিরন্তর মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্যের প্রবল আকর্ষণশক্তি গ্রহগণকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে চলিতে বাধ্য করিয়াছে। সূর্য্য হইতেই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণের জন্ম। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন, কোনক্রমে সূর্য্যেরই একাংশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে নবগ্রহের সৃষ্টি হয়। সকল গ্রহই সূর্য্যের আলোকে আলোকিত এবং সূর্য্যের তাপে উত্তপ্ত। চন্দ্রের জ্যোৎস্না প্রতিফলিত সূর্য্যালোক ভিন্ন আর কিছুই নয়।

প্রাচীনকালে অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করিত—পৃথিবী স্থির, সূর্য্য ও গ্রহগণ ইহার চতুর্দ্দিকে বিচরণ করে। পোলাণ্ডের অমর জ্যোতির্বিদ নিকোলাস কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) সর্ব্বপ্রথম এই ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় প্রচার করেন, সূর্য্য মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং পৃথিবী ও অন্যান্য সব গ্রহ ইহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তবে বোধ হয়, কোপারনিকাসের পূর্ব্বে প্রাচীন কালের কোন কোন জ্যোতিষীর মনে সূর্য্য স্থির, পৃথিবী সচল—এরূপ একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল, কারণ খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে গ্রীক পণ্ডিত এরিষ্টারকাস বিশ্বাস করিতেন, পৃথিবী প্রত্যহ আপনার চারিদিকে একবার আবর্ত্তিত হয় এবং বৎসরান্তে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। পাইথাগোরাসের অনুরূপ ধারণা ছিল। ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মনীষী আর্য্যভট্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, পৃথিবীর নিজের চতুর্দ্দিকে একটি দৈনিক গতি আছে এবং সূর্য্যের চারিদিকে ইহার আর এক প্রকার বাৎসরিক গতিও বিদ্যমান। পণ্ডিত পৃথূদক দশম শতাব্দীতে আর্য্যভট্টের এই ভূভ্রমণবাদ পুনরায় সমর্থন করেন।

সূর্য্য হইতে আলোক ও উত্তাপ আসে এবং তাহার ফলেই জীবনধারণ সম্ভবপর হয়। সেইজন্য স্বভাবতঃই প্রাচীন কালের লোকেরা প্রথম হইতেই নীল আকাশের এই মহা জ্যোতির্ম্ময় বস্তুটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহারা দেবতা-জ্ঞানে সূর্য্যের পূজা করিত। সূর্য্যোপাসনা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ছিল। বিশেষ করিয়া কৃষিজীবী লোকেরা সূর্য্যপূজা করিত। মিশরে রা নামে, পারস্যে মিত্রাস নামে, গ্রীসে এপোলোরূপে এবং ভারতে বিভিন্ন নামে সূর্য্যদেবের পূজা হইত। জাপান ও মধ্য আমেরিকায় যে এককালে সূর্য্যপূজার প্রচলন ছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

ঋগ্বেদে সূর্য্যের স্তবস্তুতি ও বন্দনাসূচক বহু শ্লোক দেখা যায়। কোনার্কের সূর্য্যমন্দির পূর্ব্ব যুগের সৌরভক্তির নিদর্শন। ভারতীয় ঋষিগণ উচ্ছ্বসিত হইয়া সূর্য্যের অনেক-গুলি নামকরণ করিয়া গিয়াছেন, যথা—রবি, ভানু, দিবাকর, প্রভাকর, অহস্কর, ভাস্কর, সবিতা, দিনমণি, অংশুমালী, মার্ত্তণ্ড, মিহির, আদিত্য, অর্ক, বিভাবসু, তপন, অরুণ, মহাদ্যুতি, বিকর্ত্তন, বিবস্বান, তমোহর, মরীচিমালী, গ্রহ-পতি, কিরণমালী ইত্যাদি।

উপনিষদে সূর্য্যের প্রশস্তিব্যঞ্জক এইরূপ শ্লোক আছে—

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং
পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্।
সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্ত্তমানঃ
প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্য্যঃ।

বিশ্বরূপ, রশ্মিমান, জাতপ্রজ্ঞ, অখিল প্রাণাশ্রয়, নিখিলের চক্ষুস্বরূপ, অদ্বিতীয় তাপক্রিয়াকারী সূর্য্যকে (জ্ঞানীরা জানেন)। অনন্ত কিরণশালী (প্রাণিভেদে) শতধা বিদ্যমান, প্রাণিবর্গের প্রাণস্বরূপ এই সূর্য্য উদয় হইতেছেন (স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত অথর্ব্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষৎ)। অন্য স্থলে আবার বলা হইয়াছে—আদিত্যো হ বৈ প্রাণো —সূর্য্যই প্রাণ (প্রশ্নোপনিষৎ)।*

সুদূর অতীতের মানুষের স্বাভাবিক সূর্য্যভক্তিকে সম্পূর্ণ রূপে কুসংস্কার বলা চলে না, ইহার কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পাওয়া যায়; আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত, সূর্য্য আমাদের সমস্ত শক্তির মূল:

"Almost every kind of activity here on the earth can be traced back to the energy that comes to us in the sun's radiation. Power derived from the waterfall, from the wind, and from fuel and food has its origin in the great power plant of the sun."—*Astronomy* by Prof. Robert Baker, Ph.D.

বায়ুপ্রবাহের কারণ সূর্য্যের উত্তাপ। প্রখর সূর্য্যকিরণে

* মহাভারতে বনপর্ব্বে আছে—পুরোহিত ধৌম্য যুধিষ্ঠিরকে বলিতে-ছেন, সূর্য্যই সর্ব্বভূতের পিতা, প্রাণীদের প্রাণধারণের নিমিত্ত অন্নস্বরূপ।

বায়ু উত্তপ্ত হইয়া উপরে উঠিতে থাকে এবং অন্য দিক হইতে শীতল বায়ু আসিয়া সেই স্থান পূর্ণ করে। এই রূপে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। মেঘবৃষ্টিরও হেতু সূর্য্য-রশ্মি। সূর্য্যতাপে সমুদ্রের জল বাষ্প হইয়া উপরে গিয়া মেঘে পরিণত হয়, তাহাই আবার বৃষ্টিরূপে নীচে ফিরিয়া আসে।

গাছ সূর্য্যকিরণের সাহায্যেই দেহ-গঠন (photo synthesis) করে। গাছের পাতার সবুজ কণা বা chlorophyll সূর্য্যালোকের সহায়তায় বায়ুমধ্যস্থ কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস হইতে কার্বন বা অঙ্গারটুকু আত্মসাৎ করিয়া অক্সিজেন পরিত্যাগ করে। এই কাজ অন্ধকারে সম্ভব নয়, ইহা কেবল দিবালোকে সাধিত হয়। এইরূপে সংগৃহীত অঙ্গার এবং শিকড়ের দ্বারা আনীত জল ও খনিজ লবণ সহযোগে গাছ দিনের আলোতে দেহের পুষ্টি-সাধন করে এবং উদ্বৃত্ত অংশ খাদ্যরূপে সঞ্চয় করিয়া রাখে। মানুষ ও জীবজন্তু গাছের সযত্নে সঞ্চিত এই খাদ্যবস্তু আহার করিয়া জীবনীশক্তি লাভ করে। পৃথিবীর সমস্ত জীবের প্রাণশক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সূর্য্যকিরণের উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদের জীবনীশক্তিকে রূপান্তরিত সূর্য্যশক্তি বলা যাইতে পারে:

"The whole of life upon earth depends entirely upon Solar energy. The sun's energy is the physical source of all life."—*Science of Life* by Wells & Huxley.

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, সূর্য্য হইতেই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের উৎপত্তি। উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর শরীর কতিপয় পার্থিব পদার্থেরই রাসায়নিক সংযোগে গঠিত; সেই হিসাবে জীবদেহ সূর্য্যেরই এক ক্ষুদ্র অংশ মনে করা যাইতে পারে।

কয়লা পোড়াইলে যে তাপ উৎপন্ন হয়, তাহাই যান্ত্রিক শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া কলকারখানা চালায়। তেল বা কয়লা জ্বালিলে যে উত্তাপ হয় উহাও প্রকারান্তরে সূর্য্যশক্তি। যে সব গাছ বহু যুগ পূর্ব্বে সূর্য্যালোকের সাহায্যে কাষ্ঠময় দেহ গঠন করিয়াছিল তাহাই বহু বৎসর-কাল মাটির নীচে থাকিয়া চাপ ও তাপের প্রভাবে কয়লায় পরিণত হইয়াছে। খনিজ তৈলসৃষ্টির আদি কারণও পরোক্ষ ভাবে সূর্য্য। সুতরাং কলকারখানা যে সূর্য্যের বলেই চালিত হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সূর্য্য একটি জ্বলন্ত গ্যাসের গোলক। অত্যুষ্ণ বায়বীয় পদার্থে গঠিত বলিয়া ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব খুব কম—মাত্র ১'৪। সূর্য্যের যে উজ্জ্বল ভাগ সচরাচর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, উহাকে আলোকমণ্ডল (photo sphere) বলে। এই আলোকমণ্ডলেই কৃষ্ণবর্ণের সূর্য্য-কলঙ্ক এবং প্রদীপ্ত ক্যালসিয়ামের অত্যুজ্জ্বল দাগ (flocculi) দেখিতে পাওয়া যায়। আলোকমণ্ডলকে ঘিরিয়া লাল রঙের এক আবরণ আছে, ইহার নাম বর্ণমণ্ডল (chromo-sphere)। পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের সময় এই বর্ণমণ্ডল পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হয়। সেই সময় ঐ স্থান হইতে সুদীর্ঘ রক্তবর্ণের অগ্নিশিখা বহু উচ্চে উঠিতে দেখা যায়। বর্ণমণ্ডলের চারি দিকে মকুটমণ্ডলের (corona) আর এক বেষ্টনী আছে। মকুটমণ্ডলের রজতশুভ্র ছটা পূর্ণগ্রাসের সময়ই সুস্পষ্ট নয়ন-গোচর হয়।

বহুদিন পর্য্যন্ত সূর্য্যের প্রচণ্ড আলোক ও উত্তাপ উৎ-পত্তির কারণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের কোন সঠিক ধারণা ছিল না। এখন জানা গিয়াছে, সূর্য্যের অভ্যন্তরে রেডি-য়ামের মত পদার্থের পরমাণু চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার ফলে তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয়।

চাঁদের কলঙ্কের মত সূর্য্যেও কলঙ্ক আছে। বিজ্ঞানী গ্যালিলিও তাঁহার নির্ম্মিত দূরবীণের দ্বারা ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে সৌর-কলঙ্ক দেখিতে পান। সূর্য্যকলঙ্ক-তপ্ত বাষ্পের ঘূর্ণি সূর্য্যাভ্যন্তরের জ্বলন্ত বাষ্পরাশি আলোকমণ্ডলের স্থানে স্থানে ভেদ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে উপরে উঠিয়া আসে এবং উপরকার উষ্ণ বাষ্প এই আবর্ত্তে নীচে নামিয়া যায়। উপরে আসিয়া হঠাৎ স্ফীত হওয়ার ফলে এই তপ্ত বাষ্প-রাশি শীতল হইয়া কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে, পারিপার্শ্বিক উজ্জ্বল স্থানের তুলনায় তখন উহাকে অপেক্ষাকৃত অন্ধকার ও কৃষ্ণবর্ণের দেখায়। দূরবীণ দিয়া দেখিলে কলঙ্কগুলি সূর্য্যের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছে এরূপ দৃষ্ট হয়। কলঙ্কের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহাই স্থির হইয়াছে যে, পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্যও স্বীয় অক্ষের চারিদিকে আবর্ত্তিত হয়। তবে বায়বীয় বস্তুতে গঠিত বলিয়া সূর্য্যের আবর্ত্তন-কাল সকল স্থানে সমান নয়। উহার মধ্যবর্ত্তী স্থান ২৫ দিনে একবার ঘুরপাক খায়, কিন্তু উহার মেরুপ্রদেশ আবর্ত্তিত হইতে প্রায় ৩৪ দিন সময় লাগে। এই সকল কলঙ্ক কয়েক সপ্তাহ হইতে কয়েক মাস পর্য্যন্ত সূর্য্যগাত্রে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া যায়। সূর্য্যকলঙ্ক সকল সময় সমান থাকে না। এগার বৎসর অন্তর ইহারা আকারে ও সংখ্যায় খুব বাড়িয়া যায়, তাহার পর ক্রমশঃ কমিতে আরম্ভ করে। জার্মান জ্যোতির্ব্বিদ শোয়াব ২০ বছর সৌরকলঙ্ক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ১৮৪৩ সনে এই ব্যাপার আবিষ্কার করেন।

যখন কলঙ্কের সংখ্যাধিক্য ঘটে, সেই সময় পৃথিবীর

উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর রঙীন আলোকদীপ্তি (Aurora Lights) বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং কম্পাস-যন্ত্রেও চাঞ্চল্য দেখা যায়। আসল কথা, সূর্য্যকলঙ্ক অসংখ্য বিদ্যুৎকণার উৎস। কলঙ্কবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অগণিত নেগেটিভ বিদ্যুৎ-কণা আসিয়া পৃথিবীতে ধাক্কা মারে। ইহার ফলে রেডিও, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা সাময়িক ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং কম্পাস-কাঁটাও বিশেষ বিচলিত হয়। এই সকল বিদ্যুৎকণাই পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে জড় হইয়া সেখানকার হাল্‌কা বায়ুরাশিতে রঙীন আলোক সৃষ্টি করে। এরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডগলাস্ দেখাইয়াছেন, সৌরকলঙ্কের এগার বৎসরকালীন হ্রাসবৃদ্ধির সহিত গাছের গুঁড়ির বাৎসরিক চক্রবৃদ্ধির আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বর্ত্তমান। গাছের বার্ষিক চক্রও এগার বৎসর অন্তর বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহাতে অনেকে মনে করেন সৌরকলঙ্কের সহিত পৃথিবীর আবহাওয়ার নিকট সম্বন্ধ আছে।

সূর্য্য সম্পর্কে এখন কতকগুলি বিরাট বিরাট সংখ্যা পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিব। সূর্য্যের আয়তন পৃথিবী অপেক্ষা ১৩০০০০০ গুণ বড়। সূর্য্যের ব্যাস প্রায় ৮৬৪০০০ মাইল। পৃথিবী সূর্য্য হইতে গড়ে ৯৩০০০০০০ মাইল দূরে অবস্থান করে। যদি একখানি মেল ট্রেন পৃথিবী হইতে ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে সূর্য্যাভিমুখে যাত্রা করে, তাহা হইলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে উহার ১৭৫ বৎসর সময় লাগিবে। পৃথিবীতে সূর্য্যের আলো পৌঁছিতেই আট মিনিট সময় লাগিয়া যায়, যদিও আলোকের গতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। জ্যোতির্ব্বিদগণ সূর্য্যের ওজন কত তাহাও হিসাব করিয়া বাহির করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ২-এর পিছনে ২৭টি শূন্য বসাইলে যত বড় সংখ্যা হয়, সূর্য্যের ওজন তত টন। এক টন প্রায় ২৭ মণের সমান। সূর্য্যের বাহ্য উত্তাপ ১২০০০° ডিগ্রী ফারেন-হাইট। সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর আকর্ষণ অপেক্ষা ২৮ গুণ বেশী, অর্থাৎ এখানকার পৌনে দু' মণ ভারী মানুষকে সূর্য্যে লইয়া গেলে তখন উহার ওজন দাঁড়াইবে ৫৪ মণের কাছাকাছি।

আকাশের সমুদয় নক্ষত্রকে আপাতদৃষ্টিতে চিরস্থির মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন তারকাই নিশ্চল নয়, প্রত্যেকের পৃথক গতি আছে। সহস্র সহস্র বৎসর পরে উহাদের স্থানচ্যুতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এডমণ্ড হ্যালী ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখেন—খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমি যে নক্ষত্র-মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন—লুব্ধক, আর্দ্রা, রোহিণী ও স্বাতী, এই কয়টি তারকা সেই নির্দ্দিষ্ট জায়গা হইতে পূর্ণচন্দ্রের ব্যাস পরিমিত স্থান সরিয়া আসিয়াছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে আমাদের সূর্য্যও অন্যান্য নক্ষত্রের মত গতিশীল। বৈজ্ঞানিকেরা সূক্ষ্ম গণনার দ্বারা স্থির করিয়াছেন, সূর্য্য তাহার গ্রহ পরিবারবর্গসহ মহাবেগে আকাশের হারকিউলিস নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে সেকেণ্ডে ১২ মাইল গতিতে ধাবিত হইতেছে।

চাঁদ চলিতে চলিতে কখনও-কখনও সূর্য্য ও পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে আসিয়া পড়ে; চাঁদ যখন এইরূপে সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে তখন আমরা সূর্য্যগ্রহণ দেখি। সূর্য্যগ্রহণের সময় পৃথিবীর উপর চন্দ্রের ছায়া পড়ে। প্রথমে সূর্য্যের পশ্চিম প্রান্তে সামান্য একটু খাঁজ দেখা দেয়, তাহার পর চাঁদ ক্রমশঃ সমস্ত সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে। এই সময় চতুর্দ্দিক অস্বাভাবিক পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে। পূর্ণগ্রাসের সময় আকাশ এ রকম অন্ধকার হইয়া আসে যে, সময় সময় কোন কোন উজ্জ্বল গ্রহনক্ষত্র আত্মপ্রকাশ করে। তাপ-রশ্মি অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে বাতাস বেশ ঠাণ্ডা বোধ হয়, এমন কি কখনও কখনও শিশিরবিন্দু উৎপন্ন হয়। দুর্য্যোগের আশঙ্কায় প্রাণীবর্গ বিভ্রান্ত হইয়া বিচরণ করে, পাখীরা নীড়ে প্রত্যাবর্ত্তনে আগ্রহান্বিত হয়। কোন কোন ফুলের পাপড়ি আপনা হইতেই বুজিয়া যায়। এই সময় সূর্য্যের রক্তাভ বর্ণমণ্ডল ও শুভ্র মকুটমণ্ডল সুস্পষ্ট পরিদৃষ্ট হয়। পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ সচরাচর আট মিনিটের বেশী স্থায়ী হয় না। ইহার পর চাঁদ ধীরে ধীরে সূর্য্যের সম্মুখ হইতে সরিয়া যায় এবং তৎকালীন গ্রহণেরও সেই সঙ্গে অপসারিত হয়।

খ্রীষ্টের জন্মের বহু শত বৎসর পূর্ব্বেই বেবিলনবাসী ক্যালডিয়ান জ্যোতির্ব্বিদগণ চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণের পুনরাবির্ভাব সম্পর্কে এক আশ্চর্য্য নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বহু পর্য্যবেক্ষণের পর তাঁহারা দেখেন চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ আঠার বৎসর এগার দিন অন্তর ঠিক পর পর ফিরিয়া আসে। তাঁহারা এই পুনরাবির্ভাব-কালকে Saros বলিতেন।

সূর্য্যালোক যে অবিমিশ্র নয়, উহা যে সপ্তবর্ণের সমষ্টি মাত্র তাহা সপ্তদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানবীর নিউটন প্রথম প্রকাশ করেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখান সূর্য্যের আলো কোন তিন কোণা কাচের ভিতর দিয়া আসিলে উহা সাত রঙে ভাগ হইয়া যায়। এই সাতটি রঙ যথাক্রমে —বেগুনী, গাঢ় নীল, নীল, সবুজ, হলদে, কমলা ও লাল। পরে জানা গিয়াছে, এই বর্ণচ্ছত্রের (spectrum) বেগুনী বর্ণের পরেও অদৃশ্য অতি-বেগুনী রশ্মি (ultra-violet rays) বর্ত্তমান। ইহার অস্তিত্ব কেবল ফোটোগ্রাফির কাচে ধরা পড়ে। অতি-বেগুনী রশ্মির রাসায়নিক ক্রিয়া খুব প্রখর। রক্তবর্ণের অগ্রে অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া

সেইরূপ আমাদের চক্ষুর অগোচর তাপোৎপাদক লোহিত-পূর্ব্ব রশ্মি (infra-red rays) বিদ্যমান।

একখানি উন্নতোদর পরকলার (convex lens) দ্বারা সূর্য্যালোক কেন্দ্রীভূত করিলে সেই সঙ্গে আলোক-মধ্যস্থ লোহিত-পূর্ব্ব তাপরশ্মিও কেন্দ্রীভূত হয় এবং তখন এই কেন্দ্রে কাগজ প্রভৃতি দাহ্যবস্তু ধরিলে তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠে। এই ব্যাপার অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

প্রাকৃতিক কারণেও সূর্য্যের আলোককে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাত রঙে বিশ্লিষ্ট হইতে দেখা যায়। সূর্য্যের আলোক-ধারা জলবিন্দুর ভিতর দিয়া যাইবার কালে সপ্তবর্ণে বিভক্ত হইয়া আকাশে বিচিত্র রামধনু বা ইন্দ্রধনু উৎপন্ন করে। কখনও কখনও পার্ব্বত্য নির্ঝরের উৎক্ষিপ্ত জলকণায় ঐরূপ বর্ণবৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। তেলের পাতলা স্তরে আলোকরশ্মি পড়িলে উহা কিরূপ রঙীন পর্দ্দার সৃষ্টি করে তাহাও অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন।

সূর্য্য হইতে যে কিরণ ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় তাহার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (wave length) নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সূর্য্যালোকের তরঙ্গ সাধারণতঃ ·০০০০২ সেন্টিমিটার হইতে প্রায় ·০০১২৮ সেন্টিমিটার পর্য্যন্ত লম্বা হয়। এই বিপুলাংশের যে ক্ষুদ্র ভাগ দৃশ্যমান আলোক, তাহার তরঙ্গ মাত্র ·০০০০৪ সেন্টি-মিটার হইতে ·০০০০৮ সেন্টিমিটার পর্য্যন্ত দীর্ঘ। সূর্য্যালোকের প্রখর দীপ্তি দীপশক্তির (candle power) হিসাবে নির্ণীত হইয়াছে। সার্ জেম্স জিনসের মতে ৩২৩-এর পাশে ২৫টি শূন্য বসাইলে যত বড় সংখ্যা হয়, সূর্য্যের আলো প্রায় তত দীপশক্তিবিশিষ্ট। শুনিতে অদ্ভুত ঠেকিলেও সূর্য্যালোকের যৎসামান্য ওজন আছে। জিন্স ইহারও এক হিসাব দিয়াছেন—প্রতি মিনিটে এক বর্গমাইল পরিমাণ স্থানে যে সূর্য্যালোক পতিত হয়, তাহার ওজন এক আউন্সের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। এজন্য ধূমকেতুর ধূম্রময় পুচ্ছ সূর্য্যালোকের চাপে পড়িয়া সর্ব্বদা বিপরীত দিকে অবস্থান করে।

সূর্য্যকিরণের জীবাণুনাশের ক্ষমতা আছে, প্রখর রৌদ্রে অধিকাংশ রোগের জীবাণু কিছুক্ষণের মধ্যে বিনষ্ট হয়। সূর্য্যালোকের অতি-বেগুনী রশ্মি প্রধানতঃ ব্যাধিবীজাণুর ধ্বংসসাধন করে। এজন্য বাসগৃহে যাহাতে অবাধে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। সূর্য্যের আলো অনাবৃত গাত্রে পতিত হইলে উহা চর্ম্মমধ্যস্থ ergosterol নামক পদার্থকে ভিটামিন 'D'তে পরিণত করে। ইহাও অদৃশ্য অতি-বেগুনী রশ্মির ক্রিয়া। 'ডি' ভিটামিনের সাহায্যেই শরীরে ক্যাল-সিয়ম বা চূণজাতীয় বস্তু গৃহীত হয়। ভিটামিন 'ডি'র অভাব ঘটিলে রিকেট্স নামক অস্থিরোগ দেখা দেয়। এই রোগে হাড় বাঁকিয়া যায়। এইজন্য রিকেট্স রোগীর পক্ষে সূর্য্যালোকে অবস্থান বিশেষ উপকারী। ইহা ছাড়া সূর্য্যকিরণের সাহায্যে অনেক দুঃসাধ্য ব্যাধি নিরাময় হয়। সুইজারল্যাণ্ডের ডাক্তার রোলিয়ার গত অর্দ্ধশতাব্দী কাল বহু কঠিন রোগের চিকিৎসায় স্বাভাবিক সূর্য্যরশ্মি ব্যবহার করিয়া আশ্চর্য্য সুফল পাইয়াছেন। তাঁহার মতে অস্থি ও গ্রন্থির ক্ষয়রোগ, বাত, বেদনা, ঘা, চর্ম্মক্ষত, প্রভৃতি কতিপয় দুরারোগ্য ব্যাধি শুধু নিয়মিত ভাবে পরিমাণমত রৌদ্র-সেবনে নিরাময় হইতে পারে। তবে সূর্য্যস্নানের সময় ও পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময় সূর্য্যস্নান করিলে দেহের রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতা রীতিমত বর্দ্ধিত হয়। সূর্য্যালোকের বিলক্ষণ উত্তেজক (tonic) ক্রিয়া আছে। এজন্য অন্ধকার মেঘলা দিনে শরীর অস্বাচ্ছন্দ্যময় ও গ্লানিযুক্ত মনে হয়। সূর্য্যকরোজ্জ্বল পরিষ্কার দিনে সকলেরই দেহমন উৎফুল্ল বোধ হয়।

সূর্য্য অশেষ গুণসম্পন্ন হইলে নিদাঘকালীন প্রচণ্ড রৌদ্র অনেক সময় ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। গ্রীষ্মকালে অধিকক্ষণ সূর্য্যের উত্তাপ লাগিলে সর্দ্দিগরমি হইতে পারে। অন্য সময় বেশীক্ষণ প্রখর রৌদ্রে থাকিলে কখনও কখনও এক রকম্ তাপজ্বর হয়। বলা বাহুল্য, এই উভয় রোগের প্রতিকার ছায়াশীতল স্থানে অবস্থান, শীতল জল পান এবং শীতল বায়ু সেবন। সূর্য্যের দিকে কখনও খালি চোখে বেশীক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা উচিত নয়, কারণ ঐরূপ করিলে অনেক সময় স্থায়ীভাবে অক্ষিপর্দ্দা অনুভূতিশূন্য এবং নেত্রমণি অস্বচ্ছ হইয়া যায়; ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দৃষ্টিশক্তি হ্রাস ও অন্ধত্ব। তীব্র সূর্য্যালোক হইতে চক্ষুকে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া চলাই বিধেয়, গ্রহণের সময়েও সূর্য্যকে ধূম্রকাচের ভিতর দিয়া দেখা উচিত।

সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটা সকলকেই মুগ্ধ করে। প্রকৃতির এই অপরূপ বর্ণশোভার কারণও সূর্য্যালোকের স্বাভাবিক বিভাগ। সকাল সন্ধ্যায় সূর্য্য-কিরণ তির্য্যগ্‌ভাবে ধরাপৃষ্ঠে পতিত হয়। তাহার ফলে ক্ষীণ নীল আলোকরশ্মি অসংখ্য ধূলিকণা ও জলবাষ্পপূর্ণ বিপুল বায়ুস্তর ভেদ করিয়া আর পৃথিবীতে পৌঁছিতে পারে না—তৎপূর্ব্বেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়, কেবল গাঢ় কমলা ও লাল আলো অক্লেশে বায়ুস্তর বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া আসে, সেইজন্য আমরা এ সময় আকাশকে কমলাভ বা রক্তাভ দেখি।

বাংলাদেশের মন্দির

শ্রীবিমলকুমার দত্ত, এম-এ

ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্যের ইতিহাসে বাংলার দান অবিসম্বাদিত। যুগে যুগে বাংলার স্থাপত্যশিল্প নানা রূপ পরিগ্রহ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; এই প্রকাশের মধ্যে ভারতীয় স্থাপত্যরীতির প্রভাব এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দুই-ই পরিলক্ষিত হয়।

বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান (৫ম খ্রীষ্টাব্দ) ও হিউ-এন-সাঙের (৭ম খ্রীষ্টাব্দ) ভ্রমণ-কাহিনী, গুপ্তযুগের তাম্রলিপিসমূহ এবং তদানীন্তন গ্রন্থাদি হইতে জানা যায় যে, প্রাচীন কালে সারা বাংলাদেশে প্রস্তর ও ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দিরের প্রাচুর্য্য ছিল। বর্ত্তমানে অবশ্য দশম ও একাদশ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত কয়েকটি মন্দির ছাড়া বিশেষ কোন প্রাচীন স্থাপত্য-নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক অবস্থাবিপর্য্যয় ও বিধর্ম্মীদের গোঁড়ামির ফলেই অধিকাংশ প্রাচীন নিদর্শন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন মন্দিরাদি নির্ম্মাণের প্রধান উপাদান ছিল কাঠ ও বাঁশ। ইহার পর ইষ্টক ও প্রস্তর ব্যবহারের প্রচলন হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশই সমতলভূমি, সেই কারণে এদেশে প্রস্তর দ্বারা মন্দির নির্ম্মাণ দুঃসাধ্য ব্যাপার। যে কয়টি প্রস্তর-মন্দির দৃষ্ট হয় তাহাদের অধিকাংশ বাংলা-বিহারের প্রান্তসীমায় অবস্থিত রাজমহল পাহাড়ের প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। দূরবর্ত্তী অঞ্চল হইতে ঐ সকল গুরুভার দ্রব্যাদি আনয়ন করা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ ও আয়াসসাধ্য ছিল, সেই কারণেই বাংলাদেশে ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দিরের এত আধিক্য। প্রস্তর-মন্দির সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প এবং তাহাদের অধিকাংশই এই প্রদেশের পশ্চিম ভাগে—বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় অবস্থিত। একই মন্দিরে যুক্তভাবে ইষ্টক ও প্রস্তর এবং ইষ্টক ও কাষ্ঠ ব্যবহারের প্রচলন ছিল।

প্রাক্-মুসলমান যুগ হইতে সমান্তরাল ভাবে শায়িত বা পাড়া-খিলান (Corbelled arch) ও ঋজুভাবে দণ্ডায়মান বা খাড়া-খিলান (Radiating arch) উভয়ই বাংলার স্থাপত্যে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু তন্মধ্যে প্রথমটির প্রচলন ছিল অধিক। অনেকের ধারণা যে, ঋজুভাবে দণ্ডায়মান বা খাড়া-খিলান মুসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। গুপ্তযুগের স্থাপত্যের নিদর্শন পাহাড়পুরে এবং ২৪-পরগণার অন্তর্গত সুন্দরবন অঞ্চলে বিদ্যমান—বোনশ্যামনগর মন্দিরে উক্তরূপ খিলান পাওয়া গিয়াছে। শেষোক্ত খিলানটি জয়নগর-মজিলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয় সর্ব্বপ্রথম সুধীসমাজের

একক মন্দির
পালপাড়া, চাকদহ

গোচরে আনেন। এই প্রসঙ্গে ভিনসেণ্ট স্মিথের নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র প্রণিধানযোগ্য :

"The Bengali builders being brick-layers rather than stone masons had learnt to use the radiating arch, whenever it was useful for Constructive purpose long before the Muhamedans came here."

সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতের সর্ব্বত্র দুই দিকে ঢালু চালাবিশিষ্ট কুঁড়েঘর নির্ম্মাণের রেওয়াজ চলিয়া আসিতেছে। এগুলির উপকরণাদি অস্থায়ী। সেজন্য এই কুটীরসমূহ অতি শীঘ্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পঞ্জাবের ওডুমবারা মুদ্রায় এবং মধ্যপ্রদেশের সোহাগুরা তাম্রলিপিতে অঙ্কিত চিত্র হইতে বুঝা যায় যে, প্রথম ও দ্বিতীয় খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে উক্ত

স্থানগুলিতে অনুরূপ কুঁড়েঘর নির্ম্মিত হইত। বংশনির্ম্মিত ঐরূপ ঘরের নিদর্শন আমরা সাঁচী ও ভারহুত স্তূপের গাত্রে

দ্বিতল মন্দির
কাঁচড়াপাড়া

খোদিত দেখিতে পাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ মহাভগ্‌গ ও চুল্লভগ্‌গ (২য় খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের) হইতে সেই যুগের স্থাপত্য-রীতির বিষয় জানিতে পারা যায়। উহাদের মধ্যে একটির নাম অর্দ্ধযোগ। ডাঃ আচার্য্য উক্ত অর্দ্ধযোগ নামক স্থাপত্য-নিদর্শনকে বাংলার কুঁড়েঘর বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন, কিন্তু এই মন্তব্য কত দূর যুক্তিসহ তাহা বিচারসাপেক্ষ।

সুতরাং দেখা যায় যে, উপরোক্ত আকারের গৃহাদি নির্ম্মাণ-পদ্ধতি অতি প্রাচীন। অন্যান্য প্রদেশের স্থপতিগণ ক্রমে ক্রমে গৃহনির্ম্মাণের স্থায়ী উপকরণ—যথা প্রস্তরাদি ও বিভিন্ন গঠন-কৌশলের আবিষ্কার করেন। বাঙালী স্থপতিগণও এ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু স্থানীয় আর্দ্র জলবায়ুর জন্য ইহা সম্ভবপর হয় নাই। তাঁহারা প্রাচীন পদ্ধতি বজায় রাখিতে বাধ্য হন, কারণ দুই দিক ঢালু চালাঘরই এদেশের বর্ষার পক্ষে উপযোগী। বর্ষার জল পড়িবামাত্রই চারি দিক দিয়া জল গড়াইয়া পড়িয়া যায়, সেজন্য ক্ষতির মাত্রা কম হয়। উপরোক্ত কারণেই এ প্রদেশের বাসগৃহ এবং ধর্ম্মমন্দির একই আকারে তৈয়ারি।

বাংলাদেশের মন্দিরগুলি সাধারণতঃ চার হইতে ছয় ফুট উচ্চ একটি ইষ্টক-মঞ্চের উপর নির্ম্মিত হয়। দক্ষিণ-বাংলায় এই মঞ্চের উচ্চতা অপেক্ষাকৃত অধিক। কারণ এই অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ অত্যন্ত বেশী, আর অধিকাংশই জলাভূমি।

বঙ্গের কুঁড়েঘরের মত আকৃতিবিশিষ্ট মন্দিরগুলিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা:—(১) একক মন্দির, (২) দ্বিতল মন্দির, (৩) জোড়বাংলা ও (৪) দ্বাদশ বা বহু মন্দির। প্রথম শ্রেণীর মন্দিরগুলি সাধারণতঃ চালাঘরের আকারে নির্ম্মিত। ইহাদের সম্মুখে পশ্চাতে অথবা চারিদিকে বারান্দা থাকে। বর্দ্ধমানের গারুই মন্দির এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু ইহা প্রস্তরনির্ম্মিত। মুর্শিদাবাদের চরবাংলা মন্দির উপরোক্ত শ্রেণীর একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। পালপাড়া, চাকদহের মন্দিরটিও ঐ শ্রেণীর।

একক মন্দিরগুলির উপরে অনুরূপ অথচ ক্ষুদ্রাকৃতি একটি অংশ যোগ করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্দির নির্ম্মিত হইত। কাঁচড়াপাড়ার কৃষ্ণরায়ের মন্দিরটিকে দ্বিতল মন্দির বলা যায়।

বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন হিসাবে বাংলাদেশের গৌরবের বস্তু। প্রথম শ্রেণীর মন্দির দুইটি যুক্ত করিলে যে আকার হয় তাহাই জোড়বাংলা নামে আখ্যাত।

চতুর্থ শ্রেণীর মন্দিরগুলির কোন অভিনবত্ব নাই; ইহারা প্রথম শ্রেণীরই অনুরূপ, তবে সংখ্যা বাড়ানো হয়।

বাংলার কুঁড়েঘরের আকৃতিবিশিষ্ট মন্দিরের অনুরূপ মন্দির উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজে দেখিতে পাওয়া যায়। মহাবল্লীপুরমের (মাদ্রাজ) দ্রৌপদীরথ মন্দিরের আকৃতি কুঁড়েঘরের ন্যায়। বর্দ্ধমানাধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্র তাঁহার মাতার পুরীভ্রমণের স্মারকচিহ্ন হিসাবে মার্কণ্ড-ঘাটের দক্ষিণে অনুরূপ একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের হরিপুরস্থিত রসিকরাজের মন্দিরও উপরোক্ত ধাঁচের। মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জেলার বিলহারী নামক স্থানে বাংলার পঞ্চরত্ন মন্দিরের ন্যায় একটি মন্দির বিদ্যমান। প্রাচীনকালে এই বিলহারী চেদী রাজাদের রাজধানী ছিল। পরবর্ত্তী মোগল স্থাপত্যকেও বাংলার পদ্ধতি বিশেষ প্রভাবিত করিয়াছিল।

বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে বাংলার এই নিজস্ব স্থাপত্যরীতি অনুসৃত হয় না, বরং ইহার পরিবর্ত্তে সমতল ছাদের প্রচলন হইয়াছে। আমাদের দেশে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত বেশী হওয়ার দরুন সমতল ছাদ অত্যন্ত অনুপযোগী। সেইজন্য আমাদের নিজস্ব প্রাচীন স্থাপত্যরীতির পুনঃপ্রবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়।

গবাদি পশুর খুরুয়া বা এঁষো রোগ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পথে গরু, বলদ আমাদের অন্যতম প্রধান সহায়ক ; কিন্তু আমাদের দেশে গরু, বলদের হীন অবস্থাকে একটি "জাতীয় গ্লানি" বলা যাইতে পারে। আর এ কথা বলিলেও সত্য ছাড়া মিথ্যা বলা হইবে না যে, আজ পর্য্যন্ত গো-জাতির উন্নতিবিধানে কি সরকার, কি দেশের নেতৃবৃন্দ, যেমন মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, তেমন কোন মনোযোগ দেন নাই। উন্নত জাতীয় গরুর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকার এলোমেলো ভাবে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু ব্যয়ের তুলনায় স্থায়ী ফল বিশেষ কিছুই হয় নাই। বর্ত্তমানে 'হরিণঘাটা'র দিকে আমরা চাহিয়া আছি। ইহার ফল কি হইবে এখনও সঠিকভাবে বলা যায় না ; এই পরিকল্পনা সম্বন্ধেও বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন।

খুরুয়া বা এঁষো রোগ : মারাত্মক অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর ক্ষয়

গরু, বলদের কোন উন্নতি ত হয়ই নাই ; ইহাদের রোগ দমনের জন্যও তেমন কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে না। পল্লী অঞ্চলে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ গরু, বলদ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে ; লক্ষ লক্ষ বলদ রোগাক্রান্ত অবস্থায় লাঙ্গল ও গাড়ী টানিতেছে, লক্ষ লক্ষ রোগাক্রান্ত গরু দুধ দিতেছে। অথচ এই সকল রোগের মধ্যে অনেক রোগই নিবার্য্য।

গরু, বলদের একটি রোগকে ইংরেজীতে "ফুট এণ্ড মাউথ ডিজিজ্" বলে। বাংলায় ইহার নাম খুরুয়া বা এঁষো রোগ। অতি সূক্ষ্ম জীবাণু বা সংক্রামক বিষ (virus) হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। এই রোগ খুবই সংক্রামক। সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ ভাবেই এই রোগের সংক্রমণ হয়। এই রোগের জীবাণু বা

খুরুয়া বা এঁষো রোগ : পায়ের খুর আল্‌গা হইয়া যায় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক পায়ের আঙুলের পিছনে দেখা যায়

বিষ লালার সাহায্যে আক্রান্ত পশু হইতে সুস্থ পশুর দেহে প্রবেশ করে। আবার অনেক সময়ে পরিচর্য্যাকারী, দূষিত খাদ্য, পানীয় জল, ভোজনপাত্র, রাস্তাঘাট, আক্রান্ত পশুর চামড়া, পশম, দুধ প্রভৃতির সাহায্যে এই রোগ বিস্তৃতি লাভ করে। প্রধানতঃ গবাদি পশু (cattle) এই রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। তবে ভেড়া, ছাগল, শূকরের মধ্যেও এই রোগ দেখা যায়। কখন কখন মানুষও এই রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়।

খুরুয়া বা এঁষো রোগ : পালানের ও বোঁটার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক ও ক্ষত হইয়া উহার উপর মামড়ি পড়িয়াছে

এই রোগের প্রধান প্রধান লক্ষণ এই : দাঁতের মাড়ি, জিহ্বা এবং পায়ের খুরের মাঝখানে ফোসকা উঠে ; এই সব ফোসকাতে জল থাকে এবং তাহা ফাটিয়া ঘা হয়। রোগাক্রান্ত পশুর মুখ দিয়া লাল পড়িতে থাকে। ইহা মাঝে মাঝে জিহ্বা বাহির করে এবং চক্ চক্ শব্দ করে। ইহার জ্বরও হয়। দুগ্ধবতী গরুর পালানে ও বাঁটে ফোসকা দেখা দেয়।

ভারতবর্ষে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ পশু প্রতি বৎসর এই রোগ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। এই রোগের দ্বারা নানাদিক দিয়া যে ক্ষতি হয় তাহার পরিমাণ খুবই বেশী।

খুরুয়া বা এঁষো রোগ : দন্তমাড়ির উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক ও ক্ষত হইয়াছে। নাসিকার মধ্যেও ক্ষত দেখা যাইতেছে

রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় দেখা গিয়াছে যে, মৃত্যুর হার শতকরা একটি ; বাছুরের মৃত্যুর হার ইহা অপেক্ষা কিছু অধিক। ভারতে প্রতি বৎসর এই রোগে ৪০০০ পশু মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। এক একটি পশুর মূল্য যদি ১০০৲ টাকাও ধরা যায় তাহা হইলে বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় চার লক্ষ টাকা।

এই রোগে আক্রান্ত হইলে পশুদের কার্য্যশক্তি বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। হিসাবে দেখা যায়, ভারতরাষ্ট্রে ৪·৩ কোটি কাজের পশু (working animals) অর্থাৎ ষাঁড়, বলদ এবং পুরুষ-মহিষ আছে ; দুগ্ধবতী গরু এবং স্ত্রী মহিষের সংখ্যা হইতেছে ৪·২ কোটি, এবং ইহাদের বাছুরের সংখ্যা ৩·৮ কোটি। উপরোক্ত প্রত্যেক শ্রেণীর পশুই খুরুয়া বা এঁষো রোগে আক্রান্ত হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর আক্রান্ত পশুর সংখ্যা প্রায় এইরূপ :

ষাঁড়, বলদ, পুরুষ-মহিষ	১২৮,৫০০
দুগ্ধবতী গরু এবং স্ত্রী-মহিষ	১২৫,৫১৪
বাছুর	১১৩,৫৬০

১৯৩৭ সালে রাইট হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের উৎপন্ন শস্যাদির মোট মূল্য যদি ২,০০০ কোটি টাকা ধরা যায় তাহা হইলে গবাদি পশুর শ্রমের মূল্য তিন শত হইতে চার শত কোটি টাকা ধরিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে ইহার মূল্য হয়ত ১,০০০ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক, বর্ত্তমান ভারতরাষ্ট্রের গোসম্পদের মূল্য ৮০০ কোটি টাকা ধরিলে ভুল হইবে না। সুতরাং ৪·৩ কোটি পশুর (ষাঁড়, বলদ, পুরুষ-মহিষ) মধ্যে ১২৮,৫০০ পশু খুরুয়া রোগে আক্রান্ত হইলে এবং উহাদের কর্ম্মশক্তি তিন ভাগের এক ভাগ হ্রাস পাইলেও বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৮০ লক্ষ টাকা।

এই রোগে আক্রান্ত হইলে ষাঁড়ের প্রজননশক্তিও কমিয়া যায়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, ষাঁড় ও গরুর অনুপাত ১:৩। বার্ষিক রোগাক্রান্ত ষাঁড়ের সংখ্যা প্রায় ৪১,৮৩৮ ; প্রতি ষাঁড়ের মূল্য ৩০০৲ টাকা ধরিলে ইহাদের মোট মূল্য ১·৩ কোটি টাকা। আক্রান্ত পশুর প্রজননশক্তি কত পরিমাণ হ্রাস পায় তাহার সঠিক হিসাব নাই ; তবে অনুমান দশ ভাগের এক ভাগ কম হয়। এই হিসাবে ক্ষতির পরিমাণ ১৩ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয়ত:, এই রোগে আক্রান্ত হইলে কতক দুগ্ধবতী গরুর গর্ভপাত হয়। আক্রান্ত গরুর মধ্যে ইহার হার শতকরা এক ধরিলেও ইহার সংখ্যা দাঁড়ায় ১,২৬০ ; আর প্রত্যেকটির মূল্য ২০০৲ টাকা ধরিলে ক্ষতির পরিমাণ ২·৫ লক্ষ

খুরুয়া বা এষো রোগ : জিহ্বার নীচের দিকে ক্ষত হইয়াছে

খুরুয়া রোগ : জিহ্বার ঝিল্লির নীচে ও জিহ্বার আগায় স্ফোটক হইয়াছে

টাকা। এই সম্পর্কে ইহাও বলা যায় যে, একটি গরুর গর্ভপাত হইলে উহার মূল্য অর্দ্ধেক কমিয়া যায়; সুতরাং এই হিসাবেও ক্ষতির পরিমাণ ১'২৫ লক্ষ টাকা। প্রজননশক্তির হ্রাস হেতু মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪'২৫ লক্ষ টাকা।

আক্রান্ত পশু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং উহার দেহের মাংসও কমিয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে গড়ে ৩৫ লক্ষ পশু এই রোগ কর্তৃক আক্রান্ত হয়; খুব সম্ভব আরোগ্যের পর শতকরা ১০টি পশু জবাইখানায় যায়। গড়ে এইরূপ একটি পশুর মাংস ২০ পাউণ্ড কমিয়া যায় এবং এক পাউণ্ড মাংসের মূল্য চারি আনা —এই হিসাব ধরিলে ক্ষতির পরিমাণ ১'৭৫ লক্ষ টাকা।

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, একই কালে দুগ্ধদায়িনী পশুদের মধ্যে সাড়ে তিন ভাগের এক ভাগ দুগ্ধ দেয়; আক্রান্ত গরুর দুগ্ধের পরিমাণ খুবই হ্রাস পায়; কেবল যে সেই সময় দুগ্ধ প্রদানের কালে (lactation period) ইহা হ্রাস পায় তাহা নহে, কোন কোন ক্ষেত্রে পরেও পরিমাণে কম হইয়া থাকে। ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংসদ (Indian Council of Agricultural Research) কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি হইতে জানা যায়, আক্রান্ত পশুর দুগ্ধের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস পায়। ভারতরাষ্ট্রে বার্ষিক দুগ্ধের উৎপাদন ৪,৬২৯'৪২ লক্ষ মণ। এই হিসাবের ভিত্তিতে আক্রান্ত পশুসমূহ ১৩'৮ লক্ষ মণ দুগ্ধ দেয়; শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস পাইলে এবং দুগ্ধের মূল্য প্রতি সের আট আনা ধরিলে মোট ক্ষতির পরিমাণ ১'৪ কোটি টাকা।

উপরের হিসাব হইতে দেখা যাইবে, খুরুয়া বা এঁসো রোগের জন্য মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২'৪৬ কোটি টাকা। এই হিসাব সম্পূর্ণভাবে সঠিক না হইলেও ইহা হইতে মোটামুটি ভাবে বুঝা যাইবে যে, গবাদি পশুর একটি মাত্র রোগ ভারতরাষ্ট্রের কত বেশী ক্ষতির জন্য দায়ী।

খুরুয়া রোগের চিকিৎসা এইরূপ : পীড়িত পশুকে পরিষ্কার খট্‌খটে এবং ছায়াযুক্ত স্থানে রাখা দরকার। পথ্য হিসাবে ভাতের মাড় দিতে হইবে। লবণমিশ্রিত জলে রোজ ৪।৫ বার মুখ ধুইয়া দেওয়া দরকার। এক সের জলে এক ছটাক লবণ যথেষ্ট। ইহার সহিত এক কাঁচ্চা ফিট্‌কারী মিশাইলে ভাল হয়। পা ধুইবার সময়ে ইহার মাত্রা দ্বিগুণ হইবে। পায়ের চামড়ায় ঘা হইলে তুঁতের জলে উহা ভালভাবে ধুইয়া উহার উপর আলকাতরা লাগাইয়া দিলে মাছি বসিবে না; পায়ে পোকা জন্মিবে না।

"খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি" পরিকল্পনায় গরুর রোগ দমনের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা থাকা খুবই বাঞ্ছনীয়।*

* *Indian Farming*-এ প্রকাশিত "Economic Importance of Foot and Mouth Disease" নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে।

বাঙালীর ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়

অধ্যাপক শ্রীরঞ্জিতাশ্ব মণ্ডল, এম-এ

বিখ্যাত মনীষী হাণ্টার এই মর্ম্মে লিখেছেন যে, ইংলণ্ডের প্রতি প্রদেশ, প্রতি বিভাগ, এমন কি প্রতি পল্লীর ইতিহাস পাওয়া যায়, আর সুবিশাল ভারতের অতীত কীর্ত্তি ঘোষণা করবার প্রকৃত ইতিহাস নেই। বাংলা সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র এ অভাব গভীরভাবে উপলব্ধি করে বলেছিলেন—"বাঙালীর ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙালী মানুষ হইবে না।" অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় আরও পরিষ্কারভাবে ইতিহাস-উদ্ধারের প্রশ্ন এবং এর আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দাবি তুলে বলেছেন—"রাজা, রাজ্য, রাজধানী, যুদ্ধবিগ্রহ এবং জয়পরাজয় ইহার সকল কথাই ইতিহাসের কথা। তথাপি কেবল ঐ সকল কথা লইয়াই ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না। বাঙালীর ইতিহাসের প্রধান কথা—বাঙালী জনসাধারণের কথা।"

প্রাচীন ইতিবৃত্তে "জনসাধারণ" প্রায় হারিয়ে গিয়েছে বিশেষ স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত একশ্রেণীর লোকের দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে। এ ছাড়া আমাদের সঙ্কীর্ণ মনোভাব এবং জ্ঞান-স্পৃহার অভাব তথ্য আবিষ্কারের পথকে কম কণ্টকিত করে রাখে নি। "গৌড়মালার" ভূমিকায় মৈত্রেয় মহাশয় এই বলে দুঃখ করেছেন—"এখনও আমাদিগের ব্যক্তিগত, জাতিগত বা সম্প্রদায়গত অনুরাগ বিরাগ আমাদিগকে পূর্ব্ব হইতে অনেক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের অনুকূল বা প্রতিকূল করিয়া রাখিয়াছে।" তবুও অতীতের অন্ধকার থেকে বিস্ময়বস্তু আহরণের অদম্য উৎসাহ, ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা ঐতিহাসিকগণকে রেহাই দেয় নি। তাই ইতিহাস লেখা হয়েছে, এখনও হচ্ছে, পরেও হবে। লুপ্ত তথ্যের সন্ধান, চর্চ্চা ও গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে "আত্মবিস্মৃত বাঙালী"র ইতিহাস তিল তিল করে রচিত হচ্ছে। মানুষের প্রয়াস এবং কর্ম্মনিষ্ঠার কাছে অজানা ও ভুলে-যাওয়া অতীত ধরা দিচ্ছে। স্যার জন মার্শাল তাঁর "মহেঞ্জো-দড়ো ও সিন্ধুসভ্যতা" পুস্তকে বলেছেন—"আর্য্য-সভ্যতার পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মেসো-পোটেমিয়া ও মিশরের সভ্যতার সহিত তুলনীয়, এমন কি কোন কোন অংশে শ্রেষ্ঠ সভ্যতা পঞ্জাব ও সিন্ধুতে প্রচলিত ছিল। হরাপ্পা এবং মহেঞ্জো-দড়োর আবিষ্কারের পরে ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে।" সেরূপ পাহাড়পুরের স্তূপ ও মহাস্থানগড় (পৌণ্ড্রবর্দ্ধন) খননের ফলে বাংলার ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠা উজ্জ্বল হয়েছে। বাংলার গৌড় লেখমালা, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, ঢাকার ইতিহাস, বিক্রমপুরের ইতিহাস, তমলুকের ইতিহাস, বরেন্দ্রের কাহিনী, বাংলার ইতিহাস, বাঙালীর ইতিহাস ইত্যাদি গ্রন্থ ইহার জলন্ত সাক্ষ্য।

পালযুগের (৭৫০-১১৩০ খ্রীঃ) অন্তর্ব্বর্ত্তী একটা অধ্যায় "মিলিতানন্তসামন্তচক্র" বা "কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ" (১০৭৫-১১০০ খ্রীঃ) আজও তেমন আলোচিত হয় নি। নির্ভরযোগ্য উপাদান ও মালমশলার অভাব এর আংশিক কারণ হতে পারে। কিন্তু তা বলে এ যুগের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী ঘটনাপুঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত তথ্যসংগ্রহ দ্বারা এ অর্দ্ধাবলুপ্ত অধ্যায় উদ্ধারের প্রয়াস কেন হবে না? সমসাময়িক তাম্র-শাসন, শিলালিপি, পুথি এবং বিশেষ করে "রামচরিত" এ বিষয়ে খুব সহায়ক ও তথ্যনির্দ্দেশক। অতএব পাল রাজ-শক্তির প্রবাহে কৈবর্ত্তবিদ্রোহ-কৃত ছেদকে অগ্রাহ্য করা চলে না।

"পালরাজত্বকাল বাঙলাদেশের ও বাঙালীর ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের যুগ। এই সময়ে কলাবিদ্যার চর্চ্চায় বাঙালী উত্তরাপথে বরেণ্য আসন লাভ করিয়াছিল।" "পাল-বংশকে বাঙালী ভাল বাসিয়াছিল।" পালরাজাদের সুষ্ঠু রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আমরা অসীম তৃপ্তি ও গৌরববোধ করে থাকি। আবার তাঁদের কয়েকজনের অব্যবস্থাপ্রসূত প্রজাপীড়ন ও নিষ্ঠুরতায় আমরা মর্ম্মাহত না হয়ে পারি না। দ্বিতীয় মহীপালের রাজ্যশাসনে অযোগ্যতার প্রমাণ পাল-রাজকবি সন্ধ্যাকর নন্দী দিয়েছেন। তিনি অরাজক-তার তীব্র সমালোচনা করেছেন—"রামচরিতে"র শ্লোকে (১৷৩১-৩৮) রাষ্ট্রবিপ্লবের বর্ণনা আছে। মহীপাল রাজ্যভার গ্রহণ করে সন্দেহবশে নূতন মন্ত্রীবৃন্দের কুপরামর্শে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় শূরপাল ও রামপালকে কারাগারের লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন। তিনি ছিলেন "অনীতিকারম্ভরত" অর্থাৎ নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যে রত; এবং "ভূতনয়ত্রাণমুক্ত" অর্থাৎ সত্য ও নীতির মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী। তাঁর আমলে সার্ব্বজনীন সুখ ও কল্যাণের অপহ্নব পরিলক্ষিত হয়েছিল। তাঁর অকর্ম্মণ্যতা ও দুর্ব্বলতা প্রজাবৃন্দকে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য করেছিল। উপরন্তু সেদিন আত্মশক্তিতে বাঙালীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস শিথিল হয় নি। পালযুগের শ্রেষ্ঠত্বের মোহ তাঁদের বুদ্ধিবিচারকে পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট ও কলুষিত করে নি। ১৩৪২ সালে যদুনাথ সরকার এইরূপ অনুরোধ করেছিলেন:—"সাড়ে আট শ' বছরের ধুলা-বালু-ঘাস-জঙ্গল খুঁড়িয়া কাটিয়া এই রাজবংশের (দিব্যাদির) কীর্ত্তিচিহ্নগুলি বাহির করিতে হইবে।...বরেন্দ্রীর নিজস্ব রাজার গৌরব প্রকাশ করা সকল বরেন্দ্রী সন্তানেরই কর্ত্তব্য। কুমার শরৎকুমার রায় এবং স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্র নিজ হাতে এই কাজ আরম্ভ

করেন। সে দৃষ্টান্ত কি আমরা লোপ পাইতে দিব? সাহিত্যে দিব্য বা ভীমের স্মৃতি রক্ষা পায় নাই; কোন পণ্ডিতই সংস্কৃত কাব্য লিখিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তি বর্ণনা করেন নাই। গ্রাম্য কবিরা তাঁহাদের নামে যে সব গীত গাহিত তাহাও এই আটশ' নয়শ' বৎসরে আমরা একেবারে ভুলিয়াছি। সুতরাং মাটি খুঁড়িয়া পাথুরে ইতিহাস বাহির করাই এখন আমাদের একমাত্র সম্বল।"

বর্ত্তমান রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা, রাজসাহী ও মালদহ এই ক'টি জেলা নিয়ে ছিল বরেন্দ্রভূমি। ভীমের জাঙ্গাল, কোদাল ধোওয়া, ভীমের পান্টি, ভীম সাগর, দিবর দীঘি, দিব্যক স্তম্ভ, বিরাটের রাজবাড়ীর বিপুল ধ্বংসস্তূপ আজও বিদ্যমান। অতীতের স্মৃতিবিজড়িত কীর্ত্তিমুখর এ স্থানগুলির মধ্যে ইতিহাস মুক্তির জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রতীক্ষমাণ।

এ প্রজা-বিদ্রোহের ব্যাপকতার মূলীভূত কারণ তৎকালীন রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতিতে প্রচুর পাওয়া যায়। সামন্ত-রাজগণের অধীনে দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রে বিভক্ত ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এর বহু নিদর্শন মেলে। প্রজাসাধারণের বিপৎকালে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি "প্রধান" বা "রাজার" নেতৃত্বে মিলিত হ'ত। দেশে মাৎস্যন্যায়ের (অরাজকতা) প্রাদুর্ভাবে প্রজাগণ ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে গোপালকে রাজপদে নির্ব্বাচিত করে পালবংশের পত্তন করেছিলেন। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত একরাষ্ট্রীয় সংহতিকে "প্রথম সামাজিক সমীকরণ" আখ্যা দিয়েছেন (*The Modern Review*, July-Sept., 1937)। এরূপ সম্মিলিততন্ত্রের অধীন ছোট ছোট রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ বিরাজ করত। বর্ত্তমান গ্রাম্য পঞ্চায়েতের আদর্শ এখানে নিহিত ছিল। দেশের সুশাসনের নিমিত্ত প্রজাশক্তি সম্পূর্ণ সজাগ ও সচেতন ছিল। তারা স্ব স্ব অধিকার ও দায়িত্ব বুঝতে পারত। মেগাস্থিনিস বলেন, "প্রত্যেক ভারতবাসী মুক্ত, তাঁদের মধ্যে একজনও গোলাম (দাস) ছিল না।" এরূপ অনুকূল পটভূমিকা ও পরিস্থিতিতে একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সবল প্রজাশক্তির পক্ষে অরাজকতার অবসানকল্পে দিব্যকে রাজপদে বরণ করা খুব স্বাভাবিক। "আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে" ভদ্র নামক একজন শূদ্রকে রাজা করার কথা লেখা আছে। "ময়নামতীর গাথা" সাক্ষ্য দেয় যে, রাজার পীড়নে "প্রজারা ধর্ম্মঠাকুরকে প্রসন্ন করিয়া রাজার মৃত্যুর জন্য অভিচার অনুষ্ঠান করিয়াছিল।" গ্রীয়ারসন সাহেব গাথাটিকে একাদশ শতাব্দীর বলে উল্লেখ করেছেন। সাধারণের স্বার্থ-রক্ষার্থে দিব্যকে রাজা নির্ব্বাচন এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের "বাঙালীর ইতিহাস"-এর পরিচয় পত্রে লেখা হয়েছে, "ইহার মহিমাই বিচারের বস্তু, গ্রহণের বস্তু, ছিদ্রগুলি নয়।" কিন্তু ইতিহাসের সত্যের আলোকে প্রকাশিত ত্রুটিবিচ্যুতির সংশোধনের অবকাশ আছে। পাল যুগের উল্লিখিত অধ্যায়ের প্রতি লেখকের ঔদাসীন্য পাঠকের মনে পীড়া দেয়। তিনি বিস্তৃত বিবরণ না দিয়ে এ অধ্যায়কে যবনিকার অন্তরালে ঢেকে রেখেছেন। গ্রন্থখানির এই অধ্যায় সম্বন্ধে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উক্তির উল্লেখ এখানে

দিব্যের জয়স্তম্ভ

অপ্রাসঙ্গিক হবে না। "আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি যে পালবংশকে দুর্ব্বল করে তুলেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ, বরেন্দ্রীতে কৈবর্ত্তাধিপত্য (১০৭৫-১১০০ খ্রী:), দিব্যের ভূমিকা, ক্ষৌণীনায়ক ভীমের চরিত্র ও কীর্ত্তি সম্বন্ধে তাই অনেক কিছু জানার রয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষীয় ঐতিহাসিকেরা দিব্য ও ভীম সম্পর্কে উদাসীন ও বিরুদ্ধভাব দোষের বলে যদি নীহাররঞ্জন তাদের বিষয়ে আমাদের ঔৎসুক্য পূরণ না করেন তো বাস্তবিকই দুঃখ হয়। তথ্যকে বিকৃত না করে তদানীন্তন সমাজবিক্ষোভের আলেখ্য তিনি নিশ্চয়ই দেবার চেষ্টা করতে পারতেন।" (সাহিত্যপত্র, শ্রাবণ, ১৩৫৭।)

সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিতে"র মীমাংসা গ্রাহ্য হয় নি। অপব্যাখ্যার মূলসূত্র গ্রন্থটির ৩৮ শ্লোকে নিহিত। দিব্যকে "দস্যু", "মাৎসভুজা" ও "উপধিব্রতিনা" বলা হয়েছে। রামায়ণের কাহিনীর উপমা-মাধ্যমে পাল-নরপতি রামপাল ও তাঁর বংশধরগণের ইতিহাস বর্ণনা ইহার বিষয়বস্তু। রমাপ্রসাদ চন্দের মতে উক্ত কাব্যের শ্লোকগুলির দুই প্রকার অর্থ আছে। রাবণের পক্ষে "মাংসাশী"র অর্থ মাংসাশী রাক্ষস; দিব্যের পক্ষে লক্ষ্মীর অর্থাৎ রাজলক্ষ্মীর অংশভাগী। দিব্য গৌড়রাজলক্ষ্মীর অংশভাগী অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী বা সেনাপতি ছিলেন। "উপধিব্রতিনা"র দ্বারা দিব্যের রাজদ্রোহিতা সূচিত হয়। 'উপধি' শব্দের অর্থ কপট। রাবণের পক্ষে 'উপধিব্রতী' মানে "ভণ্ডতপস্বী"—কারণ সে তপস্বীর বেশে সীতাকে হরণ করেছিল। দিব্যের পক্ষে উক্ত শব্দের অর্থ "ভণ্ডবিদ্রোহী" বলা যেতে পারা যায়। ভণ্ডতপস্বী হওয়া দোষের কথা, কিন্তু ভণ্ডবিদ্রোহী অর্থাৎ যে কপটতার সপক্ষে বিদ্রোহ করে না অথচ কর্ত্তব্যের অনুরোধে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদ্রোহ

করে, সে মহৎ ব্যক্তি। উক্ত শ্লোকের টীকায় আছে—"অবশ্য কর্ত্তব্যতয়া আরব্ধং কর্ম্মব্রতং ছদ্মনি ব্রতী।" "এই বিদ্রোহ কোন জাতিবিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। ইহা সর্ব্বজনীন বিদ্রোহ বা রাষ্ট্রবিপ্লব।" আরও উল্লেখযোগ্য যে, যৌবনে দিব্য পাল-রাজার পক্ষে দেশের শত্রু কর্ণাটাধিপতি জাতবর্ম্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিলেন। জনস্বার্থপুষ্টি ও কর্ত্তব্যের অনুরোধে দিব্যের এ ভূমিকা নিতে হয়েছিল। তাঁকে 'দস্যু' বলে অভিহিত করলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

বিপক্ষীয় রাজকবির উক্তির এরূপ ব্যাখ্যা করাই সঙ্গত। পক্ষান্তরে সরকার মহাশয়ের সিদ্ধান্তও প্রণিধানযোগ্য। "রাম-পালের বংশের খোষামুদে কবি নিজ কাব্যে দিব্যকে রাবণ বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহা মানিব কেন? দুইজনার কাজ দেখিয়া মহীপালকে রাবণ এবং দিব্যকে দৈত্য-নাশকারী অবতার বলিলে সত্য কথা বলা হইত।···বীর অথচ ধর্ম্মপরায়ণ দিব্য বিদ্রোহীদলে যোগ দিয়া কলির দুষ্ট রাবণকে বধ করে বরেন্দ্র মাতাস্বরূপা সীতাকে উদ্ধার করেন।" অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল বলেন,"যদি দিব্যের পক্ষভুক্ত কোনও কবি স্বহস্তে তুলিকা ধারণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি মহীপালের কবল হইতে বরেন্দ্রীর উদ্ধারকর্ত্তা দিব্য ও ভীমকে কংসের অত্যাচার হইতে রক্ষাকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণরূপে চিত্রিত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।" তিনি আরও লিখেছেন, "ইংলণ্ডের ইতিহাসেও এইরূপ পক্ষপাতদোষের অভাব নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রধান নায়ক অলিভার ক্রমওয়েল প্রতিপক্ষ ষ্টুয়ার্ট রাজবংশের আশ্রিত ঐতিহাসিকগণের নিকট "ভণ্ড" ও "দুষ্ট" আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।" শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও "রামচরিতে"র প্রমাণের বলে ইতিহাসের এ অধ্যায় সম্বন্ধীয় পূর্ব্বধারণা ও মন্তব্যের সংশোধন দাবি সমর্থন করেছিলেন।

তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে বিরাট নামক স্থানের সামন্তরাজ ছিলেন দিব্য। তাঁর বাহুবলে পরাজিত হয়ে চেদীপতি কর্ণ বিগ্রহপালকে স্বীয় যৌবনশ্রী নাম্নী কন্যা সমর্পণ করে মিত্রতাস্থাপন করেছিলেন। পরে দিব্য পালরাজ্যের "মহাবলাধ্যক্ষ" বা প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হন। তাঁর হয়, হস্তী, পদাতিক সৈন্য সর্ব্বদা সজ্জিত থাকত। রাজ্যমধ্যে "নাবতাক্ষেণী" বা পোত-নির্ম্মাণ-স্থান ছিল। দিব্যের বিশাল ভুজদ্বয় শত্রুপক্ষের ভীতিস্বরূপ ও বিরাট বক্ষ গুণীজনের আশ্রয়স্থল ছিল। তিনি ধর্ম্ম বিষয়ে উদার ও প্রজারঞ্জক ছিলেন। গ্রাম্য শাসন সুন্দরভাবে চলত। যুবক দিব্য জাতবর্ম্মার সঙ্গে সহসা কয়েকটি অতর্কিত খণ্ড স্থল ও জল যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দুর্গ, সৈন্যশ্রেণী ও রণ-পোতসমূহের অভিনব সংস্কার করেছিলেন। (তাম্রশাসন)

বিগ্রহপালের পর দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে প্রজাপীড়ন ও অত্যাচার সমানে চলল। তুচ্ছ কারণে বা বিনা দোষে তিনি প্রবীণ মন্ত্রিবর্গকে তিরস্কৃত ও বিতাড়িত করতে পশ্চাৎপদ হন নি। রাজকুমারদ্বয় শূরপাল ও রামপালকে সন্দেহের বশে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন দুর্গে তিনি আবদ্ধ রাখেন এবং বহু সামন্তকে অপমানিত ও রাজ্যচ্যুত করেন। নবনিযুক্ত মন্ত্রীবৃন্দের কুপরামর্শে করভার বর্দ্ধিত ও গুপ্তচর নিযুক্ত হয়। তখন সর্ব্বত্র জনগণের হাহাকার ও বিপদ প্রকটিত। ফলে "অনন্ত সামন্তচক্র" ও বরেন্দ্রের "প্রজাপুঞ্জ" অত্যাচারী রাজশক্তির অমার্জ্জনীয় উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ন্ত্রণে বদ্ধপরিকর হলেন। বিরাটপতি দিব্য, পদীরাজ ভীম, রাজনগরীর গোবর্দ্ধন, ফণির অধিপতি হরি, দেদ্দপুররাজ, দেবীকোটপতি, সর্ব্বখির নগরীর মহাবীর প্রভৃতি বিপদে একত্রিত হলেন। বহু সৈন্য সজ্জিত হ'ল। এ 'ধর্ম্মযুদ্ধে' সম্রাটসৈন্য "ভয়ভীত-রিক্তমুক্তকুণ্ডল" হয়ে পলায়ন করায় ঐক্যবদ্ধ প্রজাশক্তির জয় হ'ল। "আত্মশক্তিতে বিশ্বাসপরায়ণ বাঙালী প্রধানগণ ধর্ম্মযুদ্ধের অবসানে কারাগারের লৌহকপাট উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন যে শূরপাল বা রামপাল তথায় নাই। সুতরাং কাহার শিরে রাজমুকুট স্থাপিত হইবে? পুনরায় সামন্তবর্গ সম্মিলিত হইলেন—প্রজাবর্গও আহূত হইল—স্থির হইল বরেন্দ্রীর রাষ্ট্রনীতিবিশারদ সামন্তপ্রধান নেতা শ্লাঘ্যজন দিব্য হিমাচল মুকুটিত গঙ্গাকরতোয়া হার আভরণ বিশাল গৌড় বঙ্গের অগণিত প্রজাপুঞ্জ ও সামন্তচক্রের মহিমান্বিত প্রতিনিধি-স্বরূপ রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।" ("মহারাজ দিব্য" —শ্রীঅযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ)

মহারাজ দিব্যের পর তাঁর অনুজ রুদক অল্পদিনের জন্য রাজত্ব করেন। পরে তাঁর সর্ব্বগুণান্বিত পুত্র ভীম রাজা হন। পরবর্ত্তীকালে তাঁর "মহামারক" শত্রু রামপালের কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী মুক্তকণ্ঠে রামচরিতে ভীমের প্রশংসা করেছেন (২।২১-২৭)। ভীম রক্ষণীয়দিগের রক্ষক ছিলেন। তিনি সরস্বতী ও লক্ষ্মীর আবাসস্থল ছিলেন, তাঁকে প্রাপ্ত হয়ে পৃথিবী অতিশয় সম্পদ লাভ করে। তাঁর প্রকৃতি কল্পদ্রুমস্বরূপ ছিল। সর্ব্বপ্রকার অধর্ম্ম হতে মুক্ত থাকায় লোভ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। তাঁর হৃদয়ে দেবাদিদেব মহাদেব মহেশ্বরী ভবানীসহ সদা বিরাজমান থাকতেন। স্বীয় চরিত্রগুণে প্রতিপক্ষের আশ্রিত কবির এরূপ অকুণ্ঠ ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কোন আদর্শ ও পুণ্যশ্লোক নরপতি ব্যতীত লাভ করতে পারেন না।

'ভীমের রাজ্যের আশেপাশে রামপালের পৈত্রিক করদ রাজ্য ও কুটুম্বদের দেশ ছিল (ঢাকা ও ময়মনসিংহ হতে পাটনা পর্য্যন্ত)। কারামুক্ত রামপাল এ সমস্ত জেলায় সৈন্যসংগ্রহে রত ছিলেন। তাঁর মামাতো ভাই শিবরাজ গৌড়ে খণ্ড আক্রমণ ও অতর্কিত লুঠ করতে আরম্ভ করে-

ছিলেন। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর উপহার ও ঘুষ দিয়ে দেশবিদেশের বহু রাজা ও মণ্ডলদের হাত করে অগণিত সৈন্য নিয়ে রামপাল বরেন্দ্রী আক্রমণ করেন। ভীম যুদ্ধে বন্দী হলেও তাঁর সেনানায়ক হরি ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের আবার একত্রিত করে যুদ্ধ করেন; কিন্তু তিনিও পরাজিত হন। পরে বন্দী ভীম ও হরিকে বধ করা হয়। এভাবে প্রজাশক্তির প্রতিষ্ঠার শেষ উদ্যম ব্যর্থ হ'ল। দিনাজপুর জেলার পত্নীতলা থানার দিবর গ্রামে প্রজাশক্তির এ অভ্যুত্থান ও জাগরণের "জয়স্তম্ভ" বা "দিব্যের জয়স্তম্ভ" আজও বিদ্যমান আছে।

বাংলার ইতিহাসের এই অধ্যায়কে অধিকাংশ ঐতিহাসিক গৌরবময় আখ্যা দিয়েছেন এবং একে বিপদে বাঙালীর ঐক্য, আত্মনির্ভরতা ও আত্মমর্য্যাদার জ্বলন্ত নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন। যদুনাথ সরকার লিখেছেন, "বাঙালীরা দুর্ব্বল, কাপুরুষ চিরপরাধীন বলিয়া যে নিন্দা শুনা যায়, সেই অপবাদ খণ্ডন করিবার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ দিব্য ও ভীমরাজাদের সত্য জীবন-কাহিনী। তাঁরা সমগ্র বঙ্গদেশের সমগ্র বাঙালী জাতির গৌরব।" রমাপ্রসাদ চন্দ বলেন—"যে দু'জন মহাপুরুষ বিশেষ বিপদকালে এদেশে অনন্তসামন্তচক্রের মঙ্গলময় ঐক্যের সুমতি উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, তাঁদের চরিত-কথা আমাদের স্মরণীয়, মননীয় এবং কীর্ত্তনীয়।" ভিন্সেণ্ট স্মিথের কথায়—"ইহা বরেন্দ্রের সমস্ত জাতির ও সমস্ত প্রজাপুঞ্জের বিদ্রোহ, সমস্ত সামন্তচক্রের বিদ্রোহ, অত্যাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের বিদ্রোহ।" দুর্গাদাস লাহিড়ী তাঁর "পৃথিবীর ইতিহাসে"র ৮ম খণ্ডে ৩৩৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—"মহীপালের অত্যাচারণে প্রজাশক্তি জাগরিত হইয়া উঠে। প্রজাগণের সঙ্ঘশক্তির নিকট রাজশক্তি যে তিষ্টিতে পারে না কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত মনে করি। প্রজাশক্তির নিকট রাজশক্তি বিপর্য্যস্ত হইল। জগৎ দেখিল, স্বাধীন বঙ্গের প্রজাশক্তি কত ক্ষমতাশালী। আর তাহার নিকট রাজশক্তি কত দীন। জগৎ আরও দেখিল, যে প্রজাশক্তি একদিন মহীপালের পূর্ব্বপুরুষকে সিংহাসনে বসাইয়াছিল, সেই প্রজাশক্তি আবার তাঁহার বংশধরগণকে সিংহাসনচ্যুত করিল।" ভীম ও হরির পরাজয় সম্বন্ধে মৈত্রেয় মহাশয় লিখেছেন, "রামপালের বিপুল বাহিনী কর্ত্তৃক ভীম ও হরির পরাজয় কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের পরাজয় নহে। ইহা একটি মহাব্রতের অবসানকাহিনী। দিব্যক কর্ত্তৃক এই মহাব্রত আরব্ধ হইয়াছিল।" (মানসী ১৩২২—চৈত্র) বাঙালীর ইতিহাসের এ অধ্যায় ফ্রান্সের ষোড়শ লুই ও ইংলণ্ডের প্রথম চার্লসের নিহত হওয়ার পরবর্ত্তীকালীন অবস্থার সহিত তুলনীয় নয় কি?

হারানো স্মৃতি

শ্রীকরুণাময় বসু

আকাশ সীমন্তে জাগে শুক্তিশুভ্র পূর্ণিমার চাঁদ,
পুষ্পের মঞ্জরী ছুঁয়ে উড়ে যায় উদ্‌ভ্রান্ত বাতাস
বন হ'তে বনান্তরে; নদীপ্রান্তে জাগে স্তব্ধ রাত
মূর্ত্তিমতী বিরহিণী; মনে লাগে বেদনা-আভাস।

পূর্ণিমার রাত্রি যেন ছায়াশুদ্ধ স্বপ্নসরোবর,
হারানো স্মৃতির সিঁড়ি নেমে যায় পাতালপুরীতে;
সোনার প্রদীপ জ্বলে, ফেলে আসা সেই খেলাঘর
আবার উজ্জ্বল হ'ল, কতো মুখ দেখিনু নিভৃতে।

কৈশোরের স্মৃতিগুলি মুকুলিত অবোধ বাসনা
কখন শুকায়েছিল দিবসের আতপ্ত ধূলায়,—
সহসা মেলিল বুঝি শতদল চিত্রিতা কামনা
পূর্ণতার প্রাণস্পর্শে; স্পর্শমণি বুঝি ছুঁয়ে যায়।

একটি কোমল মুখ দেখেছিনু বহুদিন আগে,
তখন শরৎকাল, পথ ছিল শিউলিতে ঢাকা,
বাতাসে গানের কলি; প্রেমের বিচিত্র স্বপ্ন-রাগে
ললিত লাবণ্যস্মৃতি মোর মর্মে রক্তে হ'ল আঁকা।

তার পর ভুলে যাই দৈনন্দিন সংঘাত-জীবনে
আঁধারে ভুলেছি মোরা, সেই মতো ভুলেছিনু তারে,
ভেবেছিনু প্রেম মিথ্যা, তার বাণী নির্ব্বোধেরা শোনে,
স্বপ্ন দেখে, হায় মূঢ় সূর্য্য কি ঢাকিবে আঁধারে?

সহসা দেখিনু ঊর্দ্ধে কোজাগরী শরৎ-পূর্ণিমা,
স্মৃতির জোয়ার-জলে ভেসে আসে অতীত অধ্যায়;
মুখখানি মনে পড়ে, প্রেম তার বিস্তারিল সীমা
মর্ত্ত্য হ'তে স্বর্গপ্রান্তে আজি এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়।

বাঁধ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

১৯

আরও কয়েক মাস গত হইয়াছে। মঞ্জুষার প্রতিষ্ঠানের কাজ-কর্ম্ম দেখাশুনা আজকাল রাধু বোষ্টম করে। বড়ি আর পাঁপড়ের কাজ সে সুরুতেই বন্ধ করিয়াছে। সেলাই ফোঁড়াই এবং বহুবিধ মাটির মূর্ত্তি সেখানে তৈরি হইতেছে। কিন্তু তাদের উদ্যম প্রধানতঃ অন্য কাজে ব্যয়িত হইতেছে। মঞ্জুষার উৎসাহ সেইদিকেই বেশী। রাধুর ত কথাই নাই। এমন কি জীবানন্দ পর্য্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি বলেন, এতদিনে তোমরা ঠিক রাস্তায় চলতে সুরু করেছ। আজকের দিনে দেশের ও দশের জন্যে এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। মঞ্জুষার কাজের দিকে ছিল তাঁর সজাগ দৃষ্টি। শহরের উপকণ্ঠে তাহার কয়েক বিঘা জমিতে আজ সোনা ফলিতেছে, এ কথা তিনি ভাল করিয়াই জানেন।

মঞ্জুষাদের শ্রম সার্থক হইয়াছে। জীবানন্দ আজকাল প্রায়ই মেয়ের সহিত কাজকর্ম্ম দেখিতে আসিয়া থাকেন। সময় সময় নানা উপদেশও দেন।

মঞ্জুষা এবং রাধুর চেষ্টায় অভাবগ্রস্ত বহু পরিবারের অন্নসংস্থান হইয়াছে। যাহারা অকারণে ভিড় করিয়াছিল তাহারা বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। রাধু বোষ্টম তাহাদের চলিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছে। উহারা কাজের চেয়ে অকাজই বেশী করিতেছিল।

মঞ্জুষা উহাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া বলিয়াছিল, কোথায় যাবে ওরা বোষ্টমদা, থাক না যে ক'দিন একটা ব্যবস্থা করে নিতে না পারে। বিপদে পড়েছে যখন—

বাধা দিয়া রাধু জবাব দিয়াছিল, পরের পয়সায় দয়া দেখাবার লোভ যখন আমি সম্বরণ করেছি তখনই তোমার বোঝা উচিত যে, ওরা নিতান্তই অপাত্র। আমি শুধু আগাছা সাফ করছি। ওরা নিজেরা অভাবগ্রস্ত নয়, অথচ যাদের সত্যিকারের প্রয়োজন তাদের পথ আটকে দাঁড়িয়ে ছিল। শুধুই কি তাই—এখানকার স্বাভাবিক আবহাওয়াটাকেই যেন বিষাক্ত করে তুলেছিল। কিন্তু অপাত্রে কৃপা দেখানও পাপ দিদি। তুমি কি মনে কর যাদের আমি বিদায় করে দিয়েছি তারা সত্যিই বিপদে পড়ে এসেছিল? তা নয়, বরং বিপন্নদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবার জন্যই সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

ইহার কোন জবাব মঞ্জুষা খুঁজিয়া পায় নাই। রাধু মুহূর্ত্তের জন্য কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল—মঞ্জুদিদি কি ভাবিল কে জানে। তবে এ কথাও ঠিক যে, রাধু তার নিজের জন্য একটা কথাও বলে নাই।

কিছুদিন যাবৎ কোনকিছুতেই মঞ্জুষার তেমন উৎসাহ দেখা যাইতেছে না। যতই সে প্রতিষ্ঠানের নানা কাজের খুঁটিনাটি তলাইয়া দেখিতেছে ততই মানুষের মনের একটা অতি কদর্য্য নোংরা দিক তার কাছে প্রকাশ পাইতেছে। অথচ একথা বলিবে সে কাহাকে। তাহার চোখে পৃথিবীর চেহারাটাই যেন বদলাইয়া যায়—মানুষের উদগ্র লোভ, উৎকট স্বার্থপরতা তার মনকে বেদনায় পরিপূর্ণ করিয়া তোলে। রাধু বলে, তোমার প্রতিষ্ঠান ত তাদেরই জন্যে দিদি যারা কতকগুলো অত্যাচারীর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে চায়।

মঞ্জুষা বলিল, কিন্তু দেখে শুনে যে নিজের উপরই আস্থা হারিয়ে ফেলছি বোষ্টমদা। এ সব কি দেখছি—

রাধু খুব একচোট হাসিল। বলিল, নূতন কিছুই নয়। পাপ চিরদিন এমনি ভাবে ছিদ্রপথ দিয়েই প্রবেশ করবার চেষ্টা করে। তোমার চোখে এই ঘটনাগুলো অভিনব বলেই তুমি বেদনা পাচ্ছ। তা ছাড়া সমাজের অতি ক্ষুদ্র অংশেরই এ সব কাজে সায় আছে, কিন্তু আসল কথা হ'ল এটা যাতে না বাড়তে পারে সে চেষ্টা করা।

মঞ্জুষা কহিল, কিন্তু যেদিকে তাকাই আশার আলো ত কোথাও চোখে পড়ে না বোষ্টমদা। এত নীচাশয়তা হীনতার মধ্যেই মুষ্টিমেয় ক'জন তোমরা কতক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে।

রাধু শান্ত কণ্ঠে বলিল, তুমি ব্যাপারটাকে অত্যন্ত বাড়িয়ে দেখছ দিদি। ভুলে যেও না যে, এই মন্দ লোকগুলোও এক দিক দিয়ে সমাজের উপকার করে। এরা মানুষকে নীচেই টেনে আনবার চেষ্টা করে সত্য, কিন্তু এদের অত্যাচার উৎপীড়নে অনেকে আবার আত্মনির্ভরশীলও হয়ে ওঠে। আজ যে ক'টি মেয়ে তোমার আশ্রয়-কেন্দ্রে স্থান পেয়েছে তারা নিজেদের সম্বন্ধে চিন্তা করতে শিখবে—জীবনযাত্রার একটা সুষ্ঠু পথও নিজেরাই বেছে নেবে এ তুমি দেখে নিও।

মঞ্জুষা কহিল, তোমার এসব কথা আমি মেনে নিতে পারছি না।

রাধু বলিল, সেটা তোমার দোষ নয়—দোষ আমার। আমি হয়ত ঠিকমত বুঝিয়ে বলতে পারি নি, কিন্তু চোরের উপর রাগ করে ঘরের দরজা খুলে রাখার যুক্তিকেও মেনে নেওয়া যায় না দি'দি।

মঞ্জুষা হাসিল, বলিল, রাগ অভিমানের কথা এটা নয়, তা ছাড়া তুমি জান যে, আমার আজকের এই প্রতিষ্ঠানের

-জন্য শুধু সাময়িক প্রয়োজনে নয়, সেকথা তোমরা এখন বিশ্বাস করবে না, কিন্তু মিনুদা জানে আমার মনের কথা। কত স্বপ্নই না দেখেছি···মঞ্জুষা একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

রাধু বলিল, অথচ আজ যখন তোমার সেই স্বপ্ন সার্থক হয়ে উঠতে চলেছে তখনই তুমি পিছিয়ে পড়বে দিদি!—মঞ্জুষা নীরব।

রাধু একটু থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, আজকের দিনে সাহায্যের প্রয়োজন যাদের সবচেয়ে বেশী তাদের তুমি প্রতিপালন করছ। যারা এদের এমন ক'রে সর্বহারা করেছে, তাদের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

মঞ্জুষা ধীরে ধীরে বলিল, পিছিয়ে পড়া ঠিক নয় বোষ্টমদা। তোমার কথা যে ঠিক বুঝতে পারছি না তাও নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় কোনকিছুতেই যেন আমার প্রয়োজন নেই। মনটা অবসাদে ভেঙে পড়ে। কোন প্রশ্ন করো না, আমি জবাব দিতে পারব না বোষ্টমদা।

রাধু একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, প্রশ্ন করে সব কথা জানতে হবে কেন মঞ্জুদিদি, কিন্তু থেমে গেলে ত তোমার চলবে না। ওদের চলার পথ থেকেই পাথেয় সংগ্রহ করে নিয়ে আমাদেরও যে চলতে হবে।

মঞ্জুষা ডাকিল, বোষ্টমদা—

রাধু সাড়া দিল, কি দিদি—

মঞ্জুষা মৃদুকণ্ঠে বলিল, কিন্তু পাথেয় নিয়ে মন যে ভরে উঠছে না বোষ্টমদা, বরং অন্তরের শূন্যতা দিন দিন আরও অতলস্পর্শ হয়ে উঠছে যে।

রাধু চুপ করিয়া রহিল—কথা কহিল না। মঞ্জুষা বলিতে লাগিল মন যখন পরিপূর্ণ ছিল, তখন মনে কত পরিকল্পনা করেছি, সবকিছুকেই সুন্দর বলে মনে হয়েছে. কিন্তু আজ আর কিছুই মনকে আকর্ষণ করতে পারছে না। বরং মনে হচ্ছে সবই যেন নিতান্ত পণ্ডশ্রম।

আরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাধু যখন মুখ তুলিল তখন নিজের অজ্ঞাতেই তার একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। সে মৃদুকণ্ঠে কহিল, অথচ তুমিই তাকে দিলে ফিরিয়ে। মুখের উপর দরজাটা চিরদিনের জন্য দিলে বন্ধ করে। এর কি সত্যিই কোন প্রয়োজন ছিল? কি বলব তোমায় দিদি—তোমাদের মত লেখাপড়াও শিখি নি, তেমন করে ভাবতেও জানি না, তবুও মনে হয় জেনে শুনে কাজটা তুমি ভাল কর নি। তাকেও ঠকালে নিজেও ঠকলে।

মঞ্জুষা তেমনি শান্ত কণ্ঠেই জবাব দিল, ঠকা জেতার কথা এটা নয় বোষ্টমদা। কিন্তু এ ছাড়া আমার যে আর কোন পথ ছিল না।

রাধু বলিল, এটা তোমার অহঙ্কারের কথা।

কোথা-দিয়া কি হইল বোঝা গেল না, কিন্তু মঞ্জুষা সহসা বারুদের ন্যায় জলিয়া উঠিল। বলিল, কেনই-বা থাকবে না আমার অহঙ্কার। আমি কি তার কাছে কৃপাপ্রার্থী হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, তবু কেন সে অমন করে আমায় এড়িয়ে চলে গেল। এর পর যদি তার ফিরে আসার পথ আমি বন্ধই করে দিয়ে থাকি সেটা কি অন্যায় করেছি! না, আমার অপরাধ হয়েছে।

তার এই আকস্মিক উষ্মায় প্রথমটা রাধু একটু বিস্মিত হইলেও সঙ্গে সঙ্গেই সে ভাব কাটাইয়া উঠিয়া স্বাভাবিক সুরে কহিল, অপরাধ করেছ এমন অনুযোগ তো তোমায় কেউ দেয় নি দিদি, শুধু তোমার মনের কথাটাই আমি বলবার চেষ্টা করেছিলাম।

এ কথার মানে বোষ্টমদা? মঞ্জুষা বলিল।

রাধু তেমনি মৃদু শান্তকণ্ঠে বলিল, সে কথাও কি আমাকেই বলে দিতে হবে।

তোমার নিজের অন্তরের কাছে নিজেরই আচরণের সায় নেই বলে আজ ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নটা তোমার মনে দেখা দিয়েছে। মিছিমিছি আমারই উপর না হয় রাগ করলে, কিন্তু তাতে সত্য কখনও চাপা পড়বে না।

মঞ্জুষা ডাকিল, বোষ্টমদা—

রাধু বোষ্টম সাড়া দিয়া বলিল, আমি তোমায় মিথ্যে বলছি না দিদি—

মঞ্জুষা যেন একটু অন্যমনস্ক ভাবে বলিতে লাগিল, তোমাকে মাঝে মাঝে বড় অদ্ভুত মনে হয় আমার। মনে হয় তোমার জীবনে কি যেন একটা গভীর রহস্য রয়ে গেছে যার কোন খবরই আমরা জানি না।

রাধু জোরে হাসিয়া উঠিল। বলিল, হঠাৎ এত দিন পরে একথা তোমার মনে উঠল কেন দিদি?

মঞ্জু কহিল, তা তো জানি না বোষ্টমদা—মনে প্রশ্ন জাগে তাই বললাম। যে রাধু বোষ্টম ভিক্ষে করে দিন কাটাত, দিনরাত গান গেয়ে জগৎসংসার ভুলে থাকত তাকে যেন আর খুঁজে পাচ্ছি না।

রাধুর চোখে মুখে যেন একটা চাপা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। প্রকাশ্যে বলিল, কাজের সময় তো বোষ্টম কোন দিন অকাজে মন দেয় নি দিদি। তা ছাড়া গানটা ছিল তখন পেশা নেশা দুই-ই।

হয় তো তাই হবে। মঞ্জুষা মৃদু হাসিয়া বলিল, কিন্তু আমার মন বলে এ কখনও সত্য হতে পারে না। তুমি যেন মুখোস পরে তোমার আসল রূপটাকে লুকিয়ে রেখেছ।

রাধু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, তা হলে নিশ্চয় কোন পলাতক খুনী আসামী।

মঞ্জুষা বলিল, তুমি হাসছ। রহস্য করে নিজেকে খুনী আসামীও বলছ, অশিক্ষিত বলে প্রমাণ করবার চেষ্টাও কিছু

কম কর নি, কিন্তু তোমার নিজের আচরণই তোমার উক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

রাধু তেমনি হাসিমুখেই জবাব দিল, সঙ্গগুণে অনেক-কিছুই সম্ভব হয় দিদি। এত দিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থেকেও যদি দুটো চারটে ভাল ভাল কথা শিখতে না পারি তা হলে আর হ'ল কি! পরশপাথরের ছোঁয়া পেলে লোহাও যে সোনা হয়ে ওঠে!

মঞ্জুষা কহিল, ওটা গল্প মাত্র—কোন প্রমাণ নেই। কোন ক্ষেত্রে এরূপ হয়েছে বলে অন্তত: আমার ত জানা নেই।

রাধু হাসিয়া ফেলিল, বলিল, যত অপরাধ বুঝি রাধু-বোষ্টমের। তার বেলায় কোন প্রমাণের দরকার হয় না?

মঞ্জুষা কহিল, তার প্রমাণ ত তুমি নিজেই বোষ্টমদা। দেখতেও পাচ্ছি শুনতেও পাচ্ছি। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সে পুনশ্চ বলিতে লাগিল—তোমাকে বিব্রত করবার উদ্দেশ্যে এ কথা আমি জিজ্ঞেস করিনি বোষ্টমদা। কথাটা প্রায়ই আমি ভাবি, আজ হঠাৎ প্রকাশ করে ফেলেছি—সত্য মিথ্যা যাচাই করবার জন্যে নয়। মঞ্জুষা থামিল। রাধু কোন জবাব না দিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। এমনি ভাবে বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর এক সময় রাধু মুখ তুলিয়া চাহিল। মৃদু কণ্ঠে বলিল, আমার একটা কথার জবাব দেবে দিদি?

মঞ্জুষা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল।

রাধু বলিতে লাগিল, একটা কথা জিজ্ঞেস করি আমার মধ্যে যে একটা রহস্য আছে, এ সন্দেহ তোমার মনে জাগল কেন?

মঞ্জুষা কহিল, এ কৌতূহল আজকের নয়—বহু দিনের। তোমার নানা কাজ দেখে এবং কথা শুনেই মনে হয়েছে তুমি যে রূপে আমাদের কাছে পরিচিত তার চেয়ে তুমি সম্পূর্ণ আলাদা। তুমি নিজেকে গোপন করে রেখেছ।

রাধু বলিল, সন্দেহ নিছক সন্দেহই দিদি।

অনেক ক্ষেত্রে আবার তা সত্যও হয়—মঞ্জুষা বলিল, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। রাধু বোষ্টমের আসল পরিচয়টা কি তা জানবার জন্যে মনে একটা কৌতূহল ছিল এইমাত্র। সে কৌতূহল চরিতার্থ না হলেও কোন আপশোষ থাকবে না।

মঞ্জুষা থামিল।

আবার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। মনে হইল রাধু কিছু ভাবিতেছে। হঠাৎ দেয়াল-ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া এগারটা বাজিল। মঞ্জুষা চমকাইয়া উঠিল। ইস! অনেক বেলা হয়ে গেল যে। বলিয়া মঞ্জুষা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং রাধুকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিল, এ নিয়ে তোমাকে আর ভাবতে হবে না। কিন্তু ওকি তুমিও উঠছ যে? এতখানি বেলায় তোমাকে না খাইয়ে তো ছাড়া হবে না বোষ্টমদা।

রাধু বিব্রত হইয়া বলিল, সে কেমন করে হয় দিদি? ঘরের লোক যে আবার আমার জন্যে না খেয়ে বসে থাকবে।

মঞ্জুষা হাসিয়া বলিল, তা থাকলেই বা খানিক বসে। তার চোখে মুখে হাসি দেখা দিল। বলিল, মেয়েদের ওতে কষ্ট হয় না। আর বল তো না হয় নিতাইকে দিয়ে একটা খবর পাঠিয়ে দিই।

রাধু একটু কুণ্ঠিত ভাবে কহিল, আমি বলছিলাম—কি দরকার খামোকা হাঙ্গামায়।

জীবানন্দের আহ্বানে মঞ্জুষা উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, সে ভাবনা তোমার নয় বোষ্টমদা। নিতাইকে আমি এক্ষুণি তোমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মঞ্জুষা দ্রুত প্রস্থান করিল।

২০

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাধু বোষ্টমকে মঞ্জুষার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হইতে প্রায় একটা বাজিল। রাধু বলিল, এমন খাওয়া ভুলেই গিয়েছিলাম। আর এত যে খেতে পারি তাই কি ছাই আগে জানতাম।

মঞ্জুষা মৃদু হাসিয়া বলিল, জানলে তবেই কিন্তু তোমার ভোলার প্রশ্ন আসে বোষ্টমদা।

রাধু প্রথমে একটু বিস্মিত হইলেও পরমুহূর্তেই হাসিমুখে কহিল, তা ঠিক যদি নাই জানলাম তবে ভুলব কেমন করে? কিন্তু কথাটা আর একটু খুলেই বল দিদিমণি।

মঞ্জুষা বলিল, এমন কিছু দুরূহ কথা আমি বলিনি বোষ্টম-দা, যে না বোঝার ভান করছ।

একটু থামিয়া পুনরায় সে বলিল, আচ্ছা বোষ্টমদা, তোমার মা বাবার কথা মনে পড়ে।

রাধু বোষ্টমের চেহারা অকস্মাৎ যেন বদলাইয়া গেল। তার চোখের দৃষ্টি গভীর হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সে চোখ বুজিল, তার সমস্ত সত্তা যেন কোন গভীর অতলে ডুবিয়া গেছে। মঞ্জুষা বিস্ময়ভরা চোখে তাহার পানে চাহিয়া রহিল, কোন কথা কহিতে পারিল না। কিন্তু রাধু চোখ চাহিতেই মঞ্জুষার মুখ হইতে আপনিই বাহির হইয়া আসিল, তোমার হ'ল কি বোষ্টমদা?

রাধুর মুখখানি স্নিগ্ধ হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে মৃদু কণ্ঠে বলিল, পড়ে বৈকি দিদি।

মঞ্জুষা কহিল, কিন্তু ভুলেও ত তাদের কথা কোন দিন তুমি বল না।

রাধু একটুখানি হাসিল, বলিল, এমন আগ্রহের সঙ্গেও নতে কোন দিন চাও নি বলেই হয়ত বলি নি দিদি।

আমার মাতৃ-পিতৃ-পরিচয়ের দুটো দিক আছে। তা একদিকে যেমন গর্ব্বের অন্যদিকে তেমনি লজ্জার। আমার বাপ মা দু'জনেই ছিলেন খাঁটি মানুষ, কিন্তু এমনি আমার

অদৃষ্ট যে এমন পিতামাতার সন্তান হয়েও সংসারে নিজের সত্য পরিচয় দিতে পারলাম না। এইটে আমার মায়ের অমোঘ আদেশ। ফলে না হতে পারলাম একান্তভাবে মায়ের, না পেলাম বাবাকে। অথচ বিচার করে দেখতে গেলে তাঁরা কেউই কারুর চেয়ে ছোট নন। কিন্তু আমি ভুলতে পারি নে যে, আমি মা এবং বাবা উভয়েরই সন্তান। না না, চমকে উঠো না দিদি—আমি তোমায় মিথ্যে বলছি না।

রাধু মুহূর্ত্তের জন্ত থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, মায়ের কাছে তথাকথিত ধর্ম্মের অনুশাসন এবং সমাজই হয়ে উঠল বড়। সমাজকে উপেক্ষা করে পারলেন না তিনি বাবাকে মেনে নিতে—এইখানেই জটিলতার সৃষ্টি হ'ল। আমার বয়েস তখন কতই বা হবে। শুনেছি বছর ছয়-সাত। মা আমাব বাবাকে মেনে নিতে না পারলেও আমাকে ছাড়তে পারলেন না। মায়ের সঙ্গে বাবার হ'ল চিরবিচ্ছেদ—বাবাকে রিক্ত হাতেই ফিরে যেতে হ'ল।

তারপর কত দিন, কত বছর চলে গিয়েছে, কিন্তু আমার আজও সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে। বাবার মুখে সর্ব্বস্ব হারানোর যে ছবি ফুটে উঠেছিল আমার পরবর্ত্তী জীবনে তা একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল।

রাধু থামিল। তার মুখখানি যেন বেদনায় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। হয়তো অতীত জীবনের কথা নূতন করিয়া ভাবিতে গিয়া তার এই অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে। মঞ্জুষা তাহার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, না বুঝিয়া সে রাধু বোষ্টমকে না জানি কত বড় আঘাত করিয়া বসিয়াছে।

মঞ্জুষা স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকিল, বোষ্টমদা—

রাধু বোষ্টম সাড়া দিল। তার কণ্ঠস্বর আবেগে গাঢ় হইয়া উঠিল। মঞ্জুষা পুনরায় বলিল, থাক বোষ্টমদা। ওসব শুনে আমার দরকার নেই।

রাধু শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, কিন্তু আমার প্রয়োজন আছে দিদি। সবটুকু না শুনলে হয়তো আমার মা বাবার উপর অবিচার করে বসবে। কিন্তু আগে তোমার নিতাইকে এক গ্লাস জল দিতে বল দিদি। বড় তেষ্টা পেয়েছে।

মঞ্জুষা ডাকিতেই নিতাই এক গ্লাস জল দিয়া গেল। রাধু এক নিঃশ্বাসে তাহা নিঃশেষ করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, জ্ঞান হওয়া অবধি দেখে এসেছি যে, আমরা মামার বাড়ীতে আছি। মামাদের অবস্থা ছিল খুবই ভাল। তাঁদের পয়সায় এবং তত্ত্বাবধানে আমার পড়াশুনো চলতে লাগল। মা সারাদিন তাঁর পাথরের বিগ্রহ গোবিন্দকে নিয়েই থাকেন। আমার মা ছিলেন সম্পূর্ণ অন্ত ধাতুতে গড়া। কত জননীকেই দেখেছি, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমার মায়ের একতিল মিলও খুঁজে পাই নি। আমার কাঙাল মন মায়ের হুটো মিষ্টি কথা শুনবার জন্ত সব সময় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। সময় পেলেই তাঁর ঠাকুরঘরের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম। বেশ মনে পড়ে, এক দিন ধরা পড়ে গেলাম। যেন একটা অন্তায় কাজ করেছি এমনি কুণ্ঠিতভাবে মায়ের মুখের পানে তাকিয়েছিলাম। মা আমায় কাছে ডেকে নিয়ে তাঁর বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন। তার পর সে কি কান্না তাঁর। বিস্মিত হয়েছিলাম, তখন বুঝি নি, কিন্তু এখন বুঝি জীবনের কত বড় ব্যর্থতা নিয়ে তিনি ঐ ঠাকুরঘরে দিন-রাত পড়ে থাকতেন। আজীবন মা শুধু পাথরের মধ্যেই সত্যের সন্ধান করে গেলেন, আসল সত্যকে আর পেলেন না।···

রাধু একটু থামিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিল, কিন্তু কিসে যেন কি হয়ে গেল, ক্রমে আমার বাবা মায়ের কাছে থাকবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন। তাঁর শিক্ষা, তাঁর ভদ্র মন, ব্যক্তিত্ব এসবকে কেউ উপযুক্ত মর্য্যাদা দিলে না। জ্ঞান হয়ে কতবার মাকে বাবার বিষয় প্রশ্ন করেছি, কিন্তু কোন উত্তর পাই নি। তিনি শুধু অসহায় দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চেয়ে চোখের জল ফেলেছেন আর আমি দিনের পর দিন অধীর আগ্রহে পাগলের মত হয়ে উঠেছি। দাছুকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছি তিনি বাবার সম্বন্ধে গোটাকয়েক অসম্মানসূচক উক্তি করে আমায় বিদায় করে দিয়েছেন।

রাধু থামিল, মঞ্জুষার মুখ দেখিলে মনে হয় সে স্বপ্ন দেখিতেছে। মুখে তার কথা নাই, শুধু হুই চোখে রাজ্যের বিস্ময় পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

রাধু পুনরায় বলিতে লাগিল, মনে রূঢ় আঘাত পেয়ে সত্য-মিথ্যার মীমাংসা করতে মায়ের কাছে গেলাম। দাছু বাবার সম্বন্ধে যে সকল অপমানকর কথা বলেছেন সেগুলোর উল্লেখ করলাম। মা আমার প্রশ্নের জবাবে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, তোমার বাবাকে ওঁরা জানেন না বলেই তাঁর সম্বন্ধে এত বড় অসম্মানসূচক কথা বলতে পেরেছেন। তোমার বাবা নিন্দা-সুখ্যাতির অনেক উপরে সাধু। এর পরে পারতপক্ষে আমি আর মার কাছে বাবার কথা তুলি নি। আমি লক্ষ্য করেছি বাবার প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়তেন। তাই তো আজও মাঝে মাঝে ভাবি যে, এত বড় শ্রদ্ধা, এতখানি গভীর ভালবাসা বুকের মধ্যে পুষে রেখেও কেমন ক'রে বাবাকে মা বিদায় করে দিতে পেরেছিলেন। এ প্রশ্নের উত্তর আজও আমি পেলাম না।···

রাধু কেমন যেন অন্তমনস্ক হইয়া পড়িল, কিন্তু মুহূর্ত্তেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, আমার বাবা আমার ঠাকুরদাদার ঔরসজাত হলেও তাঁর জন্মবৃত্তান্ত অত্যন্ত রহস্যময়। মোটের উপর ঠাকুরদাদার বিবাহিতা স্ত্রী বাবাকে লালনপালন করেছিলেন মায়ের ভূমিকা নিয়ে। সত্য বৃত্তান্ত জানতেন আমার ঠাকুরদাদা, তাঁর স্ত্রী আর বাবার গর্ভধারিণী। দাছু আর যাই হোন, একথা সত্য

যে, তাঁর বিচার-বিবেচনা ছিল। তিনি বাবাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন তাঁকে রীতিমত উচ্চ শিক্ষা দিয়ে। কিন্তু গোল বাধল দাদুর সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে। ঠাকুরমার স্বার্থবুদ্ধি আমাদের চরম সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করে দিলে। বাবার জন্মবৃত্তান্তটা প্রকাশিত হয়ে পড়ল, সমস্ত বিশ্ব-সংসারের কাছে তিনি ঘৃণা ও কৃপার পাত্র হয়ে দাঁড়ালেন।

মঞ্জুষা সহসা মৌন ভঙ্গ করিয়া প্রশ্ন করিল, কিন্তু তোমার মা আর দশ জনের মত বিমুখ হয়ে সরে দাঁড়ালেন কোন যুক্তিতে বোষ্টমদা।

রাধু শান্তকণ্ঠে বলিল, এর উত্তর তিনিই দিতে পারতেন দিদি। কথাটা জানবার সুযোগ আমার কোন দিন হয় নি। তাই আজও এটা একটা জটিল প্রশ্ন হয়েই আমার মনে জেগে আছে। তবে মনে হয়, পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে অথবা অন্ধ সংস্কারের মোহে তাঁর আসল সত্তার অপমৃত্যু ঘটেছিল। এর জন্যে দায়ী আমার দাদামশাই আর আমার বড়মানুষ মামারা। কথাটা যেদিন বুঝতে পারলাম তার পর আর একটি দিনও আমি সেখানে থাকি নি। মাকে প্রণাম করে বললাম, এবারে আমাকেও বিদায় দিতে হবে মা। আমার আসল পরিচয় যাকে নিয়ে তাঁর যেখানে স্থান হ'ল না, আমারও সেখানে থাকবার অধিকার নেই। কাজেই আমার যথাযোগ্য স্থান আমায় খুঁজে নিতে হবে। মা ভাবলেশহীন চক্ষে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন, কোন কথা বলতে পারলেন না, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই ছুটে গেলেন ঠাকুরঘরে। আমি নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। বহুক্ষণ মা নিষ্পন্দভাবে পড়ে রইলেন পাষাণ-বিগ্রহের পদতলে—তার পরে নির্ম্মাল্য হাতে উঠে এলেন। আমার মাথায় ঠেকিয়ে পুনরায় গিয়ে ঠাকুরঘরে ঢুকলেন। একটি কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল না, শুধু মনে হ'ল যেন কিছু বলতে গিয়েও তিনি থেমে গেলেন। আমি মায়ের মৌন আশিস সম্বল করে বেরিয়ে পড়লাম।

আবেগে রাধুর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। মুখের ভাব কেমন করুণ বিমর্ষ। মঞ্জুষাও নির্ব্বাক বিস্ময়ে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া আছে।

রাধু সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল। অস্থির পদক্ষেপে একবার গিয়া খোলা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল। মাথার ভিতরটা তার যেন একেবারে শূন্য হইয়া গিয়াছে। বাহিরে রাস্তা জনবিরল। একটা চকচকে মোটরগাড়ী হাওয়ার বেগে ছুটিয়া গেল। পরমুহূর্ত্তেই শব্দ হইল ঠং ঠং। রাস্তার মোড়ে একটা রিক্সা গাড়ী দেখা দিয়াছে।

রাধু পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া স্থির হইয়া বসিল। মঞ্জুষার মুখের পানে খানিক চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় আরম্ভ করিল, দাদামশাই অনেক কথাই বললেন। আমাকে চুপ করে থাকতে হ'ল মায়ের কথা ভেবে।

কিন্তু শেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন বাবার সাক্ষাৎ পেলাম তখন বিস্ময় আমার সীমা ছাড়িয়ে গেল। তিনিও আমায় নিজের কাছে রাখতে রাজী হলেন না। কাছে বসিয়ে পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন, "তুমি এখন বড় হয়েছ, তোমার বুদ্ধিবিবেচনা হয়েছে। হয়তো সব কথা শুনেও থাকবে, তাই বলছিলাম তুমি তোমার মায়ের কাছেই ফিরে যাও সামু।" আমি সোজা হয়ে বসে তাঁর মুখের পানে তাকালাম। কি গভীর তাঁর দুই চোখের দৃষ্টি। কিন্তু সেখানে কারুর বিরুদ্ধে তিলমাত্র অভিযোগ নেই। আমি যা বলতে উদ্যত হয়েছিলাম তা আর বলা হ'ল না। তিনি একটু হেসে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন, কিছু বলতে চাইছ সামু? স্পষ্ট এবং সত্য কথা শুনতে আমি খুব ভালবাসি। আমি বললাম, আমি তো ফিরে যাবার জন্যে আসি নি বাবা! তা ছাড়া যেখানে আমার বাবাকে অপমান করা হয়েছিল, যেখানে তাঁর কথা নিয়ে এখনও চলে ব্যঙ্গবিদ্রূপ সেখানে আমার থাকা সম্ভব নয়।

বাবার মুখে প্রশান্ত হাসি ফুটে উঠল। তিনি স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, কিন্তু অন্যের উপর রাগ করে তুমি নিজের মাকে এত বড় শাস্তি দিতে চাইছ কোন বুদ্ধিতে সামু। তোমার মায়ের বুক একেবারে খালি হয়ে যাবে যে। নইলে আমারই কি ইচ্ছে করে না আমার ছেলেকে নিজের কাছে রাখি। এর পরে বাবা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথাই জিজ্ঞেস করলেন। অবশেষে তিনি বললেন যে, যদি মা রাজী হন তো আমরা কলকাতায় আলাদা ভাবেই থাকতে পারি। খরচপত্র তিনিই চালাতে পারবেন। তিনি আরও বললেন, তুমি মানুষ হয়ে ওঠ। মনুষ্যত্বকে মর্য্যাদা দিতে শেখ। সাময়িক উত্তেজনাবশে কোনকিছুর উপর অকারণে বিরূপ হয়ে উঠ না—যদি হও, তা হলে সে হবে মস্ত বড় ভুল।

আমি জবাব দিয়েছিলাম, "একথা কেন বাবা? আমার আন্তরিকতায় কি আপনার বিশ্বাস নেই?" তিনি বেশ স্পষ্ট ভাষায়ই বললেন, "সম্পূর্ণ আস্থা আছে, এমন কথাও বলতে পারি নে সামু। তুমি দুঃখ পেতে পার কিন্তু…" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি চুপ করিয়া গেলেন।

ফিরে এসে দেখি মামার বাড়ীর দরজাও আমার কাছে রুদ্ধ হয়ে গেছে। এতে আমার দুঃখ নেই, কিন্তু মায়ের সঙ্গে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে যে দেখা করা প্রয়োজন। অথচ তা যে সহজসাধ্য নয়, একথা ভেবে চিন্তিত হলাম।

রাধু বোষ্টম থামিল, সে উত্তেজনায় হাঁপাইতেছিল, খানিক দম লইয়া সে পুনরায় বলিতে সুরু করিল, প্রথমে কথা-কাটাকাটি, তার পরে রীতিমত উচ্চকণ্ঠে চেঁচামেচি সুরু করে দিলাম। সম্ভবতঃ আমার কণ্ঠস্বর শুনেই মা ব্যস্তভাবে ছুটে বাইরের মহলে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি নিঃশব্দে কাঠের

পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থেকে দাদামশায়ের বক্তব্য শুনলেন, তার পরে একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, তোমাদের জন্তে একে একে সকলকে আমি হারাতে পারি না বাবা? আমার ছেলের যদি এ বাড়ীতে স্থান না হয় তা হলে আমাকেও তুমি বিদায় দাও।

দাদামশাই চিৎকার করে উঠলেন, তবু তোর ছেলের অন্যায়টা চোখে পড়ল না নারায়ণী?

মা তেমনি শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন, ন্যায় অন্যায়ের কথা এখানে না তোলাই ভাল বাবা, তা হলে আমার নিজের কাজের বিচার সবার আগে হওয়া উচিত। সামু আমার চেয়ে বেশী অন্যায় করে নি। তিনি ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে এলেন। বুঝলে মঞ্জুদিদি এই হ'ল আমার মা—

রাধু চোখ বুজিল, সম্ভবতঃ সে তার মাকে মনে মনে স্মরণ করিল। মঞ্জুষা আগ্রহভরে রাধুর মুখের পানে একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া রাধু পুনরায় বেদনার্ত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, কিন্তু দিদি মানুষ ভাবে এক হয় আর। আমার স্বপ্ন, আমার কল্পনা সব দিক দিয়ে ব্যর্থ হয়ে গেল। এই সঙ্কট-সময়ে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত বাবার আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদে মুহ্যমান হয়ে পড়লাম।

অজ্ঞাতেই মঞ্জুষার কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিল, তিনি মারা গেলেন।...

রাধু বোষ্টম শান্ত সুরে জবাব দিল, হ্যাঁ মারা গেলেন, কিন্তু এখানেই সব শেষ হ'ল না। মা কেমন আশ্চর্যরকম বদলে গেলেন। সেই যে লালপেড়ে শাড়ী আর মাথাভরা সিন্দুর নিয়ে তিনি ঢুকলেন ঠাকুরঘরে আর বেরুলেন না। মা জীবন দিয়ে হয়তো তাঁর আজীবনের সাধ মিটিয়ে গেলেন, কিন্তু আমি বাঁচি কি করে—কোথায় যাই—রাজ্যের যত প্রশ্ন মনের মধ্যে ভিড় করে এসে আমাকে বিহ্বল করে ফেললে। কর্তব্য হিসেবে খবরটা দাদামশাইকে চিঠিতে জানালাম।

রাধু থামিল। মঞ্জুষা বলিল, তার পর বোষ্টমদা?

রাধু জ্বালাময় কণ্ঠে জবাব দিল, জীবনে দেখা দিলে বিপর্যয়। আশ্রয়হীন, সহায়-সম্পদহীন আমি—কোথায় যাই, কি করি। মঞ্জুষা বলিল, তোমার দাদামশাই কোন খবর নেন নি?

রাধু একটুখানি হাসিল। বলিল, না তা নেন নি, কিন্তু তিনি আমাকে নিতে চাইলেও আমি রাজী হতাম না দিদি। যেখানে এত বড় আদর্শগত পার্থক্য সেখানে গিয়ে মানুষের মত বাঁচা সম্ভব নয়। একবার মায়ের পাষাণ-বিগ্রহের পানে চেয়ে দেখলাম। মা আমার সারাজীবন ঐ পাথরের দেবতাকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। কি শান্তি পেয়েছেন তিনি ওঁর দোর-গোড়ায় দিনরাত পড়ে থেকে! আমি ত পাঁচ মিনিটও চোখ বুজে ঐ বিগ্রহের সামনে বসে থাকতে পারি না। অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার ভগবানকে ঐ পাথরের মধ্যে খুঁজে পাই নি। মন বলেছে, ভগবান ওখানে নেই...আছেন মানুষের মধ্যে। যুগে যুগে ভগবান তো মানুষের মধ্যেই দেখা দিয়েছেন। তাই বুঝি মা আমার শুধু খুঁজেই গেলেন—তাঁর পাওয়া আর হ'ল না।

রাধু কিছুক্ষণের জন্য থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে বাবার রেখে যাওয়া কিছু টাকা আমার হাতে এল। বাইরে বেরিয়ে পড়বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। মনটা খুশী হয়ে উঠল। একটা মস্ত বড় দুশ্চিন্তার হাত থেকে আপাততঃ নিস্তার পেলাম; অন্ততঃ একটা সান্ত্বনা যে, সেই মুহূর্তে আমি কপর্দকশূন্য নই। অকস্মাৎ মনে পড়ল বাবাকে আর মনে পড়ল আমাদের সেই শেষ সাক্ষাতের মূল্যবান মুহূর্তগুলির কথা। মনে পড়ল তাঁর উপদেশ। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কোথাও যাওয়া আমার হ'ল না। আমার সাময়িক বৈরাগ্য কেটে যেতে দেরি হ'ল না। সত্যিই তো যেখানেই যাই না কেন নিজের কাছ থেকে কোথায় পালিয়ে যাব; কিন্তু শহরের কোলাহলের মধ্যেও আমার মন হাঁপিয়ে উঠেছিল। এখানকার সমাজে আমার সহজ প্রবেশাধিকার থাকবে না অথচ—

এই পর্যন্ত বলিয়া রাধু থামিল। ঈষৎ দ্বিধা এবং সঙ্কোচের আভাস তার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্য, পরমুহূর্তেই সোজা হইয়া বসিয়া সে পুনরায় বলিতে লাগিল, মানুষ এমনি করে কত দিন বাঁচতে পারে দিদি? একটা আশ্রয় যে তার চাই-ই। অবশেষে আমার জীবনে দেখা দিলে সেই পরম ক্ষণ। আমার চলার পথে নারীর আবির্ভাব ঘটল, তাকে অবলম্বন করে আমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠতে চাইলে। মনে পড়ল বাবার কথা, মনে পড়ল মায়ের কথা। জীবনের ঋণ কি ভাবে তাঁরা পরিশোধ করেছেন সে তো নিজের চোখেই দেখেছি। কিন্তু আমার ভিতরকার মানুষটি কোন যুক্তি মানলে না। কতই বা তখন আমার বয়স—তবুও সব কথা তাকে আমি খুলে বললাম। সে জবাব দিলে, যে আসল মানুষটিকেই সে চিনেছে। এ ছাড়া কোন পরিচয় সে জানতে চায় না—এর বেশী সে কোন কিছু ভাবতে পারে না। ঠিক আমারই মনের কথাটি সে বলেছে। হাতে আমি স্বর্গ পেলাম। আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।

মঞ্জুষার অজ্ঞাতেই তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, বিয়ে হয়ে গেল!

রাধু বলিতে লাগিল, গেল বৈ কি—কিন্তু ফলে সে হারাল বাপের আশ্রয় আর আমি ধীরে ধীরে খোয়াতে লাগলাম সহসালব্ধ পিতৃবিত্ত। আর সেই সঙ্গে স্বপ্নের মাদকতাও টুটে যেতে লাগল, কিন্তু হেরে গেলে আমার

চলবে না—আমাকে বাঁচতে হবে। স্ত্রীকে বললাম, দুঃখকষ্ট সইতে পারবে তো?

তিনি হাসলেন, কিন্তু সে হাসিতে খানিকটা বিরক্তি প্রকাশ পেল। মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। ভাবলাম, এরই নাম কি স্বর্গ? তার পরেই তোমাদের গ্রামে গিয়ে ঘর বাঁধলাম। ভেবেছিলাম হয় তো গ্রাম্য পরিবেশে স্ত্রীর মনটা স্থির হবে; কিন্তু চঞ্চলা নারী তার স্বভাবধর্মকে ভুলতে পারলে না। একদিন এক দুর্যোগের রাত্রে আমার কুঁড়ে ঘর-খানির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকেও হারালাম।...

রাধু একটু থামিল, ঈষৎ হাসিবার চেষ্টা করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, বড় আঘাত পেলাম। সে আঘাত আমার জীবনের ধারাকে আগাগোড়া বদলে দিলে। মায়ের সেই পাষাণ-দেবতার কাছে আবার গিয়ে দাঁড়ালাম। এর পরেই গ্রামবাসীদের সঙ্গে ধীরে ধীরে নিবিড় পরিচয় ঘটতে লাগল রাধু বোষ্টমের। সাধু চিরদিনের জন্য মরে গেল।

রাধু বোষ্টম স্তব্ধ হইয়া গেল। মঞ্জুষা ডাকিল, বোষ্টমদা।

রাধু সাড়া দিল, কি দিদি?

মঞ্জুষা বলিল, এ কথা এত দিন বল নি কেন ভাই।

রাধু বলিল, রাধু বোষ্টমের সুখদুঃখের কথা এতদিন এমন করে ত কেউ জানতে চায় নি দিদি? তা ছাড়া আমার এই দুর্ভাগ্যের কথা কি বলবার মত।...

বহুক্ষণ উভয়ে চুপ করিয়া থাকিবার পর মঞ্জুষা প্রশ্ন করিল, তোমার সেই স্ত্রীর আর কোন খবর পাও নি বোষ্টমদা?

রাধুর মুখে পুনরায় বড় মধুর একটু হাসি দেখা দিল। সে বলিল, পেয়েছি কিন্তু বড় দেরিতে। তার জন্যে অবশ্য কারুর বিরুদ্ধে আমার নালিশ নেই। ভুল করে সে-ই কি দীর্ঘকাল কম কষ্ট পেয়েছে। ফিরে পেয়ে তাই আর নূতন করে তাকে অপমান করতে পারলাম না।

মঞ্জুষা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, তুমি মহৎ...তুমি প্রণম্য বোষ্টমদা।

রাধু শান্ত হাসিয়া বলিল, এই ভয়েতে তোমাকেও এড়িয়ে যেতে চেয়েছি। আমি আর কোন দিন সাধু হতে চাই না ভাই। আমার মাতৃপিতৃ-পরিচয়ও আজ অতীতের কথা। আমার বোষ্টম-জীবন সার্থক হয়েছে। মানুষকে সেবা করবার যে অধিকার আমি পেয়েছি তা আর কোন দুর্লভ বস্তুর পরিবর্তে কিছুতেই আমি ছেড়ে দিতে রাজী নই। কিন্তু আজ আর নয় দিদি, আমাকে এবারে বিদায় দাও।

বলিয়া আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিবার অবকাশ না দিয়া রাধু দ্রুত ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মঞ্জুষা কিন্তু বহুক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেখানে বসিয়া রহিল। রাধুর কাহিনী যেন জীবন্ত হইয়া তাহার চোখের সম্মুখে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। মঞ্জুষা যেন জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে।

নিতাইয়ের আহ্বানে সে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল। নিতাই বলিল, চা আর জলখাবার দেওয়া হয়ে গেছে। বড়বাবু আপনার জন্যে বসে আছেন। মঞ্জুষা উঠিল এবং তার বাবার ঘরে প্রবেশ করিতেই তিনি হাসিয়া বলিলেন, রাধু চলে গেল বুঝি?

মঞ্জুষার একটি নিঃশ্বাস পড়িল। সে বলিল, হ্যাঁ চলে গেছে। কিন্তু জান বাবা আসলে রাধু বোষ্টম নয়! ওর কথাবার্তায় মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হলেও এতটা কোন দিন ভাবতে পারি নি।

জীবানন্দ মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসিলেন, বলিলেন, আমি জানি মঞ্জু মা।

মঞ্জুষার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল। অবাক হইয়া সে তাহার বাবার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

জীবানন্দ বলিলেন, জমিদারি চালাতে গেলে অনেক খবরই রাখতে হয় মা। রাধুর সব খবরই আমি রাখতাম।

বাধা দিয়া মঞ্জুষা কহিল, সে কথা ত একদিনের জন্যও আমায় বল নি বাবা।

জীবানন্দ কহিলেন, সব কথা কি সব সময় বলা চলে মঞ্জু। তাতে হয় তো রাধু চলার পথে বাধা পেত। ওর বাবাকে ব্যক্তিগত ভাবে আমি জানতাম। অমন অমায়িক, চরিত্রবান, সদাশয় লোক বড় একটা দেখা যায় না। বিনয় বাগচীর কথা তোমাকে বোধ হয় গল্পচ্ছলে বহু বার আমি বলেছি।

মঞ্জুষা অপলকনেত্রে চাহিয়া রহিল। কথাটা সে মনে করিতে পারিতেছিল না।

জীবানন্দ বলিলেন, একটা চরের মামলা ওঁরই হাতে ছিল। আমার বিরুদ্ধ পক্ষ থেকে মোটা টাকা পাঠান হ'ল। তিনি কি জবাব দিয়েছিলেন জান মা? বলেছিলেন, টাকা দিয়ে সবাইকে কেনা যায় না।

মঞ্জুষা কহিল, এত খবর তুমি কোথায় পেলে বাবা?

জীবানন্দ হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, জমিদারিটাও একটা ছোটখাট রাজত্ব মা। চোখ বুজে বসে থাকলে রাজত্ব থাকে না। আমার কথাটা বুঝেছ মঞ্জু?

মঞ্জুষা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে বুঝিয়াছে—

জীবানন্দ পুনশ্চ বলিলেন, খবরটা পেলাম আমার কোন অনুচরের মুখে। বিনয় বাগচী সম্বন্ধে মনে একটা কৌতূহল জন্মাল। ফলে দিনের পর দিন আরও অনেক নূতন খবর পেতে লাগলাম। তাতে মন আমার শ্রদ্ধায় ভরে উঠল। একটা সত্যিকারের মানুষের পরিচয় পেলাম।

মঞ্জুষা মৃদু কণ্ঠে বলিল, অথচ এদের আমরা চিরদিন ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রাখি।

জীবানন্দ বলিলেন, সব সময় সেটা সম্ভব হয় না মঞ্জু মা। তাতে শৃঙ্খলা রক্ষা হয় না। স্বেচ্ছাচারিতা বেড়েই চলে।

বিনয় বাগচী অথবা রাধুর মত লোকের সাক্ষাৎ সচরাচর মেলে না। কিন্তু এদের সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করলেও একেবারে বর্জ্জন করতেও আমরা পারি নি মঞ্জু। নইলে রাধুকে কি আজ আমার বাড়ীতে বসিয়ে এমন করে আদর-আপ্যায়ন করতে পারতে? আমিই হয়ত সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতাম। মোদ্দা কথা আমাদের মনকে তৈরি হবার জন্যে কিছু সময় দিতে হবে বৈকি মা। এ যত দিন না হবে তত দিন কিছুতেই এ প্রশ্নের মীমাংসা হবে না।

কথাটা মঞ্জুষার মনের কোন দুর্ব্বল স্থানে গিয়া আঘাত করিল। তার বাবা সত্য কথাই বলিয়াছেন। মঞ্জুষা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। জীবানন্দ তাহার মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, মন যেদিন তৈরি হবে মঞ্জু দেখবে কোন বাধাই সেদিন পথরোধ করে দাঁড়াবে না। কিন্তু চা যে এতক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কখন আর দেবে মা?

মঞ্জুষা একটু লজ্জিত হইল।

জীবানন্দ হাসিমুখে কহিলেন, তোমাকে আর বলব কি মঞ্জু—কথা পেলে আমারই কি কাণ্ডজ্ঞান থাকে। কিন্তু তোমার কোকোটা ঢেলে নিলে না? একটু থামিয়া তিনি পুনশ্চ কহিলেন, ভাবছি চা আমিও ছেড়ে দেব।

মঞ্জুষা প্রশ্ন করিল, হঠাৎ এ কথা কেন বাবা?

জীবানন্দ জবাব দিলেন, হঠাৎ না মা, কথাটা অনেক দিন ধরেই ভাবছি।

মঞ্জুষার মুখে মুহূর্ত্তের জন্য একটু হাসি দেখা দিয়াই পুনরায় মিলাইয়া গেল। সে কহিল, বেশ তো বাবা চায়ের চেয়ে যদি কোকোটাই তোমার পছন্দ হয়, না-হয় সেই ব্যবস্থাই কাল থেকে হবে, কিন্তু আজকের চা-টা নষ্ট করো না।

জীবানন্দ চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলেন।

ক্রমশঃ

শৈবাচার্য মাণিক্কবাচকর

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

দক্ষিণ-ভারতের আধ্যাত্মিক ভূমিতে ভক্তিমার্গকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দুধর্ম্মের দুইটি বিশিষ্ট শাখা জন্মলাভ করে। বিষ্ণু এবং শিব প্রতীক—পৌরাণিক যুগের এই মহতী কল্পনার অবলম্বনে শৈব এবং বৈষ্ণব ধর্ম বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

শৈব সাধকগণ 'নায়নার' নামে বিখ্যাত। এই নায়নারগণের মধ্যে জ্ঞান-সম্বন্ধর, আপ্পার (অপ্পর-স্বামী), সুন্দরর ও মাণিক্কবাচকর সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করেন। আরাধ্য দেবতা দেবাদিদেব মহাদেবের উদ্দেশে শ্রদ্ধি-নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া ইঁহারা ভক্তিরসাত্মক ছন্দোবদ্ধ গীতিস্তোত্র রচনা করেন। চোল-সম্রাট রাজরাজের রাজত্বকালে জনৈক তামিল কবি কর্তৃক উক্ত শৈব ভক্তগণের প্রথম তিন জনের স্তোত্রসমূহ 'তেবারম্' (দেবহার) নামক গ্রন্থে নিবদ্ধ হয়। মাণিক্কবাচকরের স্তোত্র-গাথাগুলি পৃথক আকারে 'তিরুবাচকম্' (শোভন-উক্তি) নামক পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। 'তিরুবাচকম্' ৫১টি 'পদিকম্-' এর সমষ্টি। ইহাতে তিন হাজারেরও অধিক পংক্তি আছে। এই সকল সন্ন্যাসীর আধ্যাত্মিক প্রভাব মহাবল্লীপুরম্ ও কাঞ্চীর অপরূপ স্থাপত্যশিল্পকলাপূর্ণ মঠ-মন্দিরে রূপায়িত হইয়া আজও বিগত মধ্যযুগের সাধনার ধারাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে।

খ্রীষ্টীয় নবম শতকের প্রথম দিকে মাণিক্কবাচকর আবির্ভূত হন। তৎপ্রণীত 'কুবাই' ধর্মগ্রন্থে পাণ্ড্যরাজ বরগুণের কথা আছে। খ্রীষ্টীয় নবম শতকের শেষভাগে তিনি সিংহলীদের শৈবধর্মে দীক্ষিত করেন। সিংহলের 'রাজরত্নাকরী' পুস্তকেও এই ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শৈব সাধক এবং 'তেবারম্' স্তোত্র-গাথার অন্যতম কবি সুন্দররের রচিত স্তব-কুসুমাঞ্জলির মধ্যে বিভিন্ন শৈব সন্ন্যাসীদের নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু কোথাও তিনি মাণিক্কবাচকরের নামোল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, 'তিরুবিলৈয়াডল্ পুরাণম্' নামক গ্রন্থে মাণিক্কবাচকরের জীবন-আলেখ্য চিত্রিত হইয়াছে।

মাণিক্কবাচকরের আবির্ভাবকালে দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চের, চোল, পল্লব, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সময় বৌদ্ধ জৈন ও ব্রাহ্মণ্য—এই তিন ধর্মই দক্ষিণ দেশে প্রচলিত হয়। কিন্তু কোন ধর্মমতই জনগণের উপর বিশেষ প্রাধান্য বিস্তারে সমর্থ হয় নাই। অবশেষে তামিল সাধকগণের শিব-বিষ্ণুভক্তিবাদ প্রচারের ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রবল হইয়া উঠে।

পাণ্ড্য রাজধানী মদুরা শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সে যুগে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। ইহার অনতিদূরে বাদবুর্ নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে মাণিক্কবাচকর জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব আশ্রমে মাণিক্কবাচকর তিরুবাদবুরর্ নামে পরিচিত ছিলেন। তিরুবাদবুরর্ 'নামের অর্থ—তিরুবাদবুর্-জনপদের অধিবাসী। অতি অল্প বয়সেই তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি স্বীয় বুদ্ধিকৌশল দ্বারা পাণ্ড্যরাজ

অরিমর্দনের স্নেহলাভে সমর্থ হন। ষোল বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি রাজসরকারে কার্য গ্রহণ করেন। ক্রমশঃ স্বীয় কার্যাবলী দ্বারা মহারাজাধিরাজ অরিমর্দনের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তিনি প্রধান সচিবের পদলাভ করেন। সম্ভবতঃ পাণ্ড্যরাজ বরগুণ এবং অরিমর্দন একই ব্যক্তি।

ক্রমশঃ পাণ্ড্যরাজ তিরুবাদবুরের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইলেন। মহারাজ তাঁহার পার্থিব ভোগৈশ্বর্যের সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এই সময় তিরুবাদবুরের উপাধি হইল—'তেন্নবর ব্রহ্মরায়র্' (পাণ্ড্যের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী) সাম্রাজ্যের সর্বপ্রকার দায়িত্বপূর্ণ কার্য তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল। তিরুবাদবুরর্ সুপুরুষ এবং ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন। কিন্তু প্রচলিত কোন ধর্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল না। ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকাকালে মাঝে মাঝে তিনি এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাব অনুভব করিতেন। সমস্ত বিলাসব্যসন তাঁহার নিকট মিথ্যা বলিয়া অনুভূত হইত। দিব্যভাবের দ্বারা তাঁহার অবচেতন মন ভগবানের সান্নিধ্যলাভের জন্য একান্ত উন্মুখ হইয়া উঠিত। তিরুবাদবুরের এই অশান্ত মানসিক ভাব উত্তরকালে 'তিরুবাচকম্' পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে।

ইতিমধ্যে রাজধানীতে সংবাদ আসিল, তিরুপ্পেরুন্দুরৈ বন্দরে আরব দেশের বহু অশ্বের আমদানি হইয়াছে। আরবের অশ্ব প্রসিদ্ধ। মহারাজাধিরাজ কতিপয় সুন্দর তেজস্বী অশ্ব ক্রয় করিতে মনস্থ করিলেন। তদনুসারে প্রধান মন্ত্রী তেন্নবর ব্রহ্মরায়র্ প্রভূত অর্থ এবং শরীররক্ষীদলসহ তথায় প্রেরিত হইলেন। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে বহু দিন লাগিল। বহু অরণ্য এবং পাহাড়-পর্বতের মধ্য দিয়া যাত্রীদল অগ্রসর হইতে লাগিল। বাহকগণ অতিকষ্টে বন্ধুর পথে মন্ত্রীর শিবিকা বহন করিয়া যাইতেছিল। বন্দরের সন্নিকট এক অরণ্যবীথিকা অতিক্রমকালে অপূর্ব সঙ্গীতধ্বনি শ্রুত হইল। সঙ্গীতের ভাবমাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়া তিনি বাহকগণকে শিবিকা থামাইতে আদেশ করিলেন। শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া সঙ্গীত-লক্ষ্যে তিনি অরণ্যবীথিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। শাখাপ্রশাখাবিলম্বিত এক প্রকাণ্ড কুরুন্দ বৃক্ষমূলে তিনি জনৈক শৈব সাধুকে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মস্তকে জটাজুট, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা এবং সর্বাঙ্গে বিভূতি মাখা। তাঁহার চতুর্দিকে শিষ্য-প্রশিষ্যগণ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহারা ভক্তিসহকারে সমস্ত অন্তর দিয়া শৈব আগম গাহিতেছেন। সন্ন্যাসীর ধ্যানগম্ভীর মূর্তি এবং তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত শৈব ধর্মের ব্যাখ্যা শ্রবণে তেন্নবর ব্রহ্মরায়র্ একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করিলেন, সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমের মূর্ত প্রতীক হইলেন দেবাদিদেব মহেশ্বর। মনের সংশয় অপনোদনের নিমিত্ত তিনি সন্ন্যাসীকে পারমার্থিক জ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। যোগীবর স্মিতমুখে তাঁহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন। আত্মদর্শনের পথপ্রদর্শক ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসীর পদতলে পতিত হইয়া ব্রহ্মরায়র্ স্বীয় ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। তিনি শৈবধর্মে দীক্ষিত হইলেন।

ভগবানের ঐশী শক্তির নিকট আত্মনিবেদন করিয়া তিনি এক অভিনব অনুভূতি লাভ করিলেন। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর সমস্তই মিথ্যা বলিয়া তিনি প্রকাশ করেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর তিনি মাণিক্কবাচকর নামে সাধারণ্যে পরিচিত হন। তাঁহার দীক্ষা-গুরু আর কেহই নহেন, স্বয়ং ছদ্মবেশী ভগবান শিব (সুন্দরেশ)। একটি শিব-মন্দির নির্মাণের জন্য মাণিক্কবাচকর রাজদত্ত অর্থ গুরুদেবকে প্রদান করিলেন। উদ্বৃত্ত অর্থ দরিদ্রের কল্যাণে ব্যয়িত হইল। রাজ-অনুচরবর্গ প্রধানমন্ত্রীর ঈদৃশ পরিবর্তনে সবিশেষ মর্মাহত হইল; বিশেষতঃ রাজকোষের অর্থের অপব্যয় হইতে দেখিয়া তাহারা ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহারা মনে করিল, মহামন্ত্রীর এই উন্মত্ততা শীঘ্রই দূরীভূত হইবে। প্রকৃতিস্থ হইলে তাহারা তাঁহাকে কর্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। এজন্য তাহারা কিছুকাল তথায় অবস্থান করিল। কিন্তু মন্ত্রীর মধ্যে কিছুমাত্র পরিবর্তন দেখা গেল না। অনন্যোপায় হইয়া তাহারা মাণিক্কবাচকরকে রাজকার্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। সংসারের প্রতি তাঁহার কোন আকর্ষণ ছিল না; তখন তিনি সকল বন্ধনের অতীত। তিনি তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। অগত্যা তাহারা ক্ষুণ্ণমনে ভয়কম্পিত হৃদয়ে তথা হইতে মদুরার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল।

অনুচরবর্গের মুখে সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া মহারাজাধিরাজ প্রথমে উক্ত ঘটনা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার বিশ্বস্ত মন্ত্রী এরূপ কার্য করিবেন—তাহা যে স্বপ্নেরও অগোচর। কিন্তু যখন তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার নির্দেশমত অশ্ব ক্রয় করা হয় নাই তখন তিনি অনুচরবর্গের সংবাদে কতকটা আস্থা স্থাপন করিলেন। মাণিক্কবাচকরের নিকট সন্দেশবহ প্রেরিত হইল। 'অগৌণে তিরুবাদবুরর্ যেন রাজসকাশে উপনীত হন'—এই বার্তা বহন করিয়া রাজ-দূতগণ মাণিক্কবাচকরের নিকট হাজির হইল। রাজাদেশ শ্রবণে নবীন সন্ন্যাসী তাচ্ছিল্যভরে উত্তর করিলেন—

"একমাত্র ভগবান সুন্দরেশই আমার রাজা; আমি অন্য কোন রাজার কথা জানি না। তথাকথিত এই সমস্ত রাজা আমার কি ক্ষতি করিতে পারে? এমন কি যে যমরাজের ভয়ে সমস্ত চরাচর থরহরি কম্পমান, তিনি পর্যন্ত প্রভুর নিকট শক্তিহীন।"

রাজদূতেরা তাঁহার নির্ভীক উত্তরে বুঝিতে পারিল বিপদ

আসন্ন। অগত্যা তাহারা মাণিক্কবাচকরের গুরুদেবের শরণাপন্ন হইল। গুরুদেব শিষ্যকে রাজসকাশে উপনীত হইবার জন্য আজ্ঞা দিলেন। বিদায়ের পূর্বে তিনি শিষ্যকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন :

"বৎস, নির্ভীক হৃদয়ে রাজসন্দর্শনে গমন কর। ভয়ের কোন কারণ নাই। আমার শুভাশীষ বর্মের ন্যায় সমস্ত আপদ-বিপদে তোমাকে রক্ষা করিবে। মহারাজকে বলিবে, বর্তমান মাসের উনিশে তারিখ তিনি তাঁর ঈপ্সিত ঘোড়াগুলি অবশ্য পাইবেন।"

মাণিক্কবাচকর গুরুদেবের নির্দেশমত রাজসকাশে সমস্ত বিষয় বিবৃত করিলেন। ইহা ভণ্ডামি মনে করিয়া মহারাজ তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে নির্দিষ্ট দিবস উপস্থিত হইল। প্রাতঃকালে মহারাজ এবং রাজপ্রাসাদের সকলে বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে দেখিতে পাইলেন, একজন যোদ্ধা কতিপয় সুশ্রী এবং তেজস্বী অশ্বসহ দরবার-কক্ষের দিকে আগমন করিতেছেন। মাণিক্কবাচকরের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইল। অশ্বগুলি দেখিয়া মহারাজ অত্যন্ত প্রীত হইলেন। যোদ্ধা আর কেহই নহেন, স্বয়ং ভূতেশ্বর শিব। ভক্তের গৌরববর্ধনের নিমিত্ত ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছেন। গুরুদেবের অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়া মাণিক্কবাচকরের দুই নয়নে অবিরলধারায় প্রেমাশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল। মহারাজ স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন।

দিবাবসান হইল। রজনীর অন্ধকারে সমস্ত চরাচর আচ্ছন্ন। রজনীর শেষ যামে বিকট চীৎকারধ্বনিতে সমস্ত নগরী চকিত হইয়া উঠিল। সবাই শুনিতে পাইল, শব্দ রাজবাটীর অশ্বশালা হইতে আসিতেছে। রহস্যোদ্ঘাটনের জন্য প্রাতঃকালে লোকসকল অশ্বশালার দ্বারদেশে আসিয়া ভিড় জমাইতে সুরু করিল। তাহারা দেখিল, কোন এক যাদুমন্ত্রবলে পূর্বদিনের ক্রীত অশ্বগুলি অদৃশ্য হইয়াছে। তৎস্থলাভিষিক্ত শিবাকুল তারস্বরে ঐকতানে রত হইয়াছে এবং যদৃচ্ছাক্রমে পুরাতন অশ্বগুলিকে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাঘাতে বিদীর্ণ করিতেছে। এই বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া রাজাধিরাজ ক্রোধে-ক্ষোভে জ্ঞানহারা হইলেন। ভণ্ড তপস্বী মাণিক্কবাচকরকে ভীষণ শাস্তি দিতে অনুচরবর্গকে আদেশ দিলেন। রাজাদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল। তাহারা দ্বিপ্রহরে মাণিক্কবাচকরকে উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর দণ্ডায়মান করাইয়া এক বিরাট প্রস্তরখণ্ড তাঁহার স্কন্ধদেশে চাপাইয়া দিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া মাণিক্কবাচকর অগতির গতি আশুতোষকে স্মরণ-মনন করিতে লাগিলেন। ভক্তের কাতর আহ্বানে ভগবানের আসন টলিল। লীলাময়ের লীলা অপূর্ব! শীর্ণকায়া বৈগৈ নদীর জল ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া উঠিল। ক্ষুব্ধ চঞ্চল উচ্ছ্বসিত জলরাশি বর্ধিত আকারে সমস্ত নগরী গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। সমস্ত জনপদবাসী মৃত্যুভয়ভীত হইয়া পড়িল। মহারাজাধিরাজ এই অভূতপূর্ব বন্যার আবির্ভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইহার কারণ নির্ধারণে সচেষ্ট হইলেন। অবশেষে তিনি বুঝিতে পারিলেন, মাণিক্কবাচকরের প্রতি অন্যায় ব্যবহারের শাস্তিস্বরূপ সংহারের রুদ্রমূর্তিতে বন্যা দেখা দিয়াছে। কালবিলম্ব

মাণিক্কবাচকর, আপ্পার, জ্ঞানসম্বন্ধর, সুন্দরমূর্তি

না করিয়া মহারাজ শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত মাণিক্কবাচকরকে মুক্তি দিলেন এবং দেবরোষ হইতে জনপদরক্ষার নিমিত্ত অনুরোধ জানাইলেন। বন্যা প্রতিরোধকল্পে প্রাচীর নির্মাণের ব্যবস্থা হইল। ভগবান সুন্দরেশ যুবকের ছদ্মবেশে এই কার্যে যোগদান করিয়া নগরীকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

মহারাজাধিরাজ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, তদীয় প্রাক্তন মন্ত্রী সাধারণ ব্যক্তি নহেন। ঐশী শক্তিতে তিনি বীর্যবান্। স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তিনি অনুতপ্ত হইলেন। পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি মদুরারাজ্য তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। মাণিক্কবাচকর স্মিতহাস্যে মহারাজের দান প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ তিনি যে 'অরূপ রতনে'র সন্ধান পাইয়াছেন, তাহার তুলনায় পার্থিব ধন-দৌলত অতীব তুচ্ছ। অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ইন্দ্রত্বও তিনি কামনা করেন না। তিনি মহারাজের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক মুক্তি-তীর্থ তিরুপ্পেরুন্দুরৈ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মাণিক্কবাচকর গুরু-ভ্রাতাদের সহিত গুরুদেবের মধুর সান্নিধ্যে ধর্মশাস্ত্রাদির আলোচনায় দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। একদিন গুরুদেব তাঁহাকে নিভৃতে বলিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু আসন্ন। তিনি তাঁহার উপর শৈবধর্ম প্রচারের সম্পূর্ণ ভার দিয়া অল্পকাল পরে ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। গুরুদেবের সান্নিধ্যলাভে চিরতরে বঞ্চিত হইয়া মাণিক্কবাচকর গভীর শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই মানসিক অবস্থার বিষয় তৎপ্রণীত 'নীত্তল্ বিণ্ণপ্পম্' (সন্ন্যাসীর বিজ্ঞপ্তি) নামক স্তোত্রে পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর কিছুকাল অতিবাহিত হইল। মাণিক্কবাচকরের গুরুভ্রাতাগণও একে একে মহাসমাধিলাভ করিলেন। তিরুপ্-পেরুন্দুরৈ তাঁহার নিকট মরু-সদৃশ প্রতিভাত হইল। এখানে তাঁহার কিছুমাত্র আকর্ষণ রহিল না। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ-ভারতের শিব-মন্দিরগুলি পরিদর্শন করিয়া অবশেষে 'চিদম্বরম্' নামক দেব-দেউলে উপনীত

নটরাজ

হইলেন। ইহা শৈব তীর্থগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান এবং ভূ-কৈলাস নামে অভিহিত। ইহা শৈব ভক্তগণের নিকট বারাণসী। মন্দিরে নটরাজের মূর্তি অবস্থিত। শৈব সাধকগণের সমাগমে ইহা সর্বদা কলকোলাহলে মুখরিত থাকে। পুরাকালে চিদম্বরম্ 'তিল্লৈ' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। পূর্বে সেখানে নাকি তিল্লৈ নামক বৃক্ষের এক বিস্তৃত অরণ্যানী ছিল। এই হেতু ইহা তিল্লৈ নামে সাধারণ্যে পরিচিতিলাভ করে। উক্ত স্থানের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং মন্দিরে স্থিত নটরাজের রসঘন বিগ্রহ মাণিক্কবাচকরের উপর প্রভাব বিস্তার করিল। তিনি তথায় বসবাস করিতে মনস্থ করিলেন। মাণিক্কবাচকরের অমর স্তোত্র-গাথার অধিকাংশ 'পদিকম্' সেখানে রচিত হয়। উক্ত 'পদিকম্'গুলি আধ্যাত্মিক ভাব-মাধুর্যে পূর্ণ। এ সম্বন্ধে জনৈক মনীষী বলিয়াছেন—

এই সময় বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনমানসে সিংহলের বৌদ্ধরাজ চিদম্বরম্ সেখানে আগমন করেন। ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সিংহলরাজ এবং মাণিক্কবাচকরের মধ্যে তর্কযুদ্ধ হইল। শৈব ধর্মের অন্তর্গূঢ় ভাব-ঐশ্বর্যে বৌদ্ধরাজ মুগ্ধ এবং বিস্মিত হইলেন। তিনি সানুচর শৈবধর্মে দীক্ষিত হইলেন। এইরূপে মাণিক্কবাচকর গুরুদেবের অন্তিমকালীন নির্দেশ পালন করিয়া স্বীয় জীবনের আরব্ধ ব্রত সম্পন্ন করিলেন। এইবার তিনি পারমার্থিক মহামিলনের জন্য ব্যাকুলচিত্তে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

মহাশৈব মাণিক্কবাচকরের তিরোভাব অতীব বিস্ময়জনক। একদিন স্বীয় নির্জন কুটীরে বসিয়া তিনি দেবাদিদেব সুন্দরেশের উদ্দেশ্যে নিবেদিত স্বরচিত 'পাড়ল্' (গান) গুন গুন স্বরে গাহিতেছিলেন এমন সময় এক জন সৌম্যকান্তি সন্ন্যাসী সেখানে উপনীত হইলেন। তিনি মাণিক্কবাচকরের 'তিরু-বাচকম্' ও 'তিরুক্কোবৈয়ার' স্তোত্র-গাথাগুলি লিপিবদ্ধ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। সাধক মাণিক্কবাচকরের শ্রীমুখ-বিনিঃসৃত শৈব আগমগুলি সন্ন্যাসী তালপত্রে লিপিবদ্ধ করিলেন। অতঃপর তিনি তথা হইতে বিদায় লইলেন। এক দিন প্রাতঃকালে নটরাজের দেব-দেউলে অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ঘটিল। মন্দিরের পুরোহিতগণ নটরাজের অর্চনা করিতে আসিয়া বিস্মিত চিত্তে দেখিলেন, মাণিক্কবাচকরের পাণ্ডুলিপি দেবতার বেদীমূলে রক্ষিত আছে। উহাতে তিরুচিত্রম্বলম্ নামক লেখকের নাম স্বাক্ষরিত রহিয়াছে। রহস্যোদ্‌ঘাটনে অসমর্থ হইয়া তাঁহারা অবিলম্বে মাণিক্কবাচকরের সমীপে উপনীত হইলেন এবং উক্ত পাণ্ডুলিপির 'পদিকম্'গুলির ব্যাখ্যা করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। প্রত্যুত্তরে পরম শৈব মাণিক্কবাচকর একটি কথাও বলিলেন না। পুরোহিতবর্গ সমভিব্যাহারে তিনি চিদম্বরম্ মন্দিরের গর্ভগৃহে গমন করিলেন। বিগ্রহের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অঙ্গুলি নির্দেশে নটরাজের মূর্তি দেখাইয়া বলিলেন যে, এই মহান্ দেবতার মধ্যেই সমস্ত স্তোত্রগাথার তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। সাধনার দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিও। অতঃপর মাণিক্কবাচকর তিমিরান্তক নটরাজের মূর্তির সহিত মিশিয়া গিয়া অগাধ শান্তি—চিরমুক্তি লাভ করিলেন।

মাণিক্কবাচকরের কবিত্ব ও ধীশক্তি ছিল যথেষ্ট। তাঁহার প্রথম রচনা 'শিবপুরাণম্' নামে খ্যাত। রচনাটি আরাধ্য দেবতার প্রতি ভক্ত-হৃদয়ের আকুল আবেদন। ইহা ছন্দোবদ্ধ প্রার্থনাসঙ্গীত—ভাব-মাধুর্যে পরিপূর্ণ। 'নমঃ শিবায়'—এই পবিত্র মন্ত্রে রচনাটির নান্দীপাঠ করা হইয়াছে। তাঁহার 'পাড়ল্'গুলি আত্মদর্শনের ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ—স্বর্গীয় ভাবধারায় রসমণ্ডিত। তৎপ্রণীত 'তিরুচটকম্' একটি প্রার্থনাসঙ্গীত। ইহা 'মেয়্যুনর্দল্' (প্রকৃত জ্ঞানোন্মেষ), 'অরিবুরুত্তল্' (উপদেশ), 'শুটকুত্তল্' (ভেদাভেদ বর্জন), 'আত্মশুদ্ধি', 'কৈম্মারুকোতুত্তল্' (প্রতিদান), 'অনুভোগ শুদ্ধি', 'কারুণ্যত্তিরঙ্গল্' (ভগবানের করুণালাভের জন্য ব্রহ্মপদে আত্মসমর্পণ), 'আনন্দত্তাষ্‌দল্' (আনন্দসাগরে নিমগ্ন হওয়া), 'আনন্দপরবশম্' এবং 'আনন্দত্তায়'

নামক দশটি অংশে বিভক্ত। এই কবিতায় একশতটি স্তবক স্থান পাইয়াছে। ভক্ত-কবিশ্রেষ্ঠ মাণিক্কবাচকরের রচনাশৈলী শব্দের ঝঙ্কারে এবং ছন্দের মাধুর্যে প্রাণবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার রচিত স্তোত্র-গাথাগুলি আধ্যাত্মিকতাপূত-মন্দাকিনীধারায় পরিপ্লুত। আজও তামিল জাতি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে এগুলি গাহিয়া থাকে।

ভ্রমণ

শ্রীপরেশ চক্রবর্ত্তী

সপ্তমী পূজার দিন 'যাত্রা হ'ল সুরু'। গাড়ী 'জনতা' এক্সপ্রেস্। ইংরেজী 'ক্রাউড' শব্দের বাংলা তর্জমায় আমরা 'জনতা' শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। সুতরাং এ শব্দটার সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতা, প্রভৃতি কতকগুলি শব্দও বিশেষভাবে জড়িত। কিন্তু রাষ্ট্র-ভাষায় 'জনতা'র মানে জনসাধারণ। শেষটায় কিন্তু একই জায়গায় আসতে হয়।

জনতা এক্সপ্রেসে একটি মাত্র শ্রেণী—রেলের নিম্নতম। কিন্তু সবটাই রয়ে-সয়ে করতে হয়, অন্ততঃ অহিংস উপায়ে করতে হলে। তাই জনতা এক্সপ্রেসেও একটু বিশেষ শ্রেণীর আভাস রাখা হয়েছে—সে হচ্ছে 'সুরক্ষিত' আসনগুলি। প্রচলিত সমাজনীতির সাবেক বিধানে আমরা মধ্যবিত্ত (ইণ্টার) শ্রেণীতে পড়ি। কিন্তু অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমরা যে ক্রমশঃ 'সবার পিছে, সবার নীচে সর্ব্বহারাদের মাঝে' গিয়ে পড়ছি তার খবর ক'জন রাখেন? তাই আমরা অন্ততঃ রেলের ব্যাপারে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করাটাই সুবিধাজনক বলে মনে করি। সেখানে কিন্তু শ্রেণী-সম্মানে বাধে না। সরকার বহু গবেষণা করে রেলের মধ্যম শ্রেণীটি তুলে দিয়েছিলেন, তা ভালই করেছিলেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন, সত্যই মধ্যবিত্ত বলে কোন শ্রেণী সমাজে নেই। তাই রেলের ইণ্টার ক্লাস নামটা একটু বেখাপ্পা শুনাত। দেখে শুনে মনে হয় সমাজে মাত্র দুটি শ্রেণী আছে; শোষক ও শোষিত। আর এ দুটি মিলে যে এক নূতন শ্রেণী হতে পারে তা অবিশ্বাস্য। কারণ এমন সমাজের কল্পনা করতে পারেন যেখানে শোষিত আছে কিন্তু শোষক নেই, অথবা শোষক আছে, শোষিত নেই?

রাত ন'টায় হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছলাম। পথে দু-একটি 'ঠাকুর' দেখে নিলাম বাস থেকে। পূজার সময় হাওড়া ষ্টেশনের অবস্থাটা যাঁরা নিজের চোখে দেখেন নি বা সশরীরে উপস্থিত হয়ে উপভোগ করেন নি, তাঁদের বুঝানো শক্ত। গাড়ী প্ল্যাটফরমে আসতেই কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বেধে গেল। আমরা সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নিজেদের 'সুরক্ষিত' আসনে গ্যাঁট হয়ে বসে পড়লাম। আসন-মাহাত্ম্যেই বোধ করি মনে দার্শনিক চিন্তার উদ্রেক হ'ল। মনে যে চিন্তার স্রোত বয়ে চলল তার মোদ্দা কথাটা এই যে, শ্রেণীহীন সমাজ তৈরি করলে সুখ বা আরাম বস্তুটি মর্ত্ত্যলোক থেকে অন্তর্হিত হবে। কোটি কোটি মানুষের দুঃখের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যদি একজন ভাগ্যবান্ সুখভোগ না করল তবে সে সুখের কি মূল্য আছে? শিল্পে, সাহিত্যে আপনারা কনট্রাষ্ট বা বৈষম্য পছন্দ করেন কিন্তু এ ক্ষেত্রে নয় কেন? সাম্যবাদ চায় সকলকে সুখী করতে; কিন্তু সকলকে একই অবস্থায় ফেললে দেখা যাবে সুখের অনুভূতিটাই মানুষ হারিয়ে ফেলেছে।

রেলওয়ে-কর্ত্তৃপক্ষ সুরক্ষিত আসনগুলি দেখাশুনা করবার জন্য কয়েকজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেছেন। তাঁরা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে টিকিট দেখে একটি একটি করে যাত্রীকে ভিতরে তুলে দিচ্ছেন। এত সতর্কতার মধ্যেও কিভাবে যেন দুটি অবাঞ্ছিত লোক উঠে পড়েছিলেন। তাঁরা উভয়েই বৃদ্ধ। নামবেন বর্দ্ধমানে। কিন্তু ইন্সপেকশনের বেলায় একজনকে নামিয়ে দেওয়া হ'ল। অপর জন কোন রকমে রয়ে গেলেন। বৃদ্ধটি বেশ মিশুক ও সজ্জন। আমাদের স্বেচ্ছায় ভ্রমণ সম্বন্ধে রকমারি উপদেশ দিলেন। 'তাজ'কে একবার দিনের আলোয় দেখা উচিত, আবার 'মুনলাইটে'; দু'বারই অপূর্ব্ব ঠেকবে; মনে হবে যেন দুটি আলাদা জিনিষ; ত্রিবেণী সঙ্গমে কচ্ছপের ভয় আছে, ইত্যাদি। অবশ্য আমরা তাঁকে বসবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলাম। বর্দ্ধমান ষ্টেশন আসতেই তিনি বাক্যব্যয় না করে নেমে গেলেন। রাতটা বেশ কাটল। শারদীয়া সংখ্যা কতকগুলি মাসিক, সাপ্তাহিক ছিল সঙ্গে। আকারে ছোট দেখে একখানি মাসিকপত্র তুলে নিলাম।

পরদিন সকালবেলা। পাটনা ষ্টেশনে গাড়ী থামল। ভাবলাম একটু চা খেয়ে নিই। দরজা খুলতেই কয়েকজন পাঞ্জাবী স্ত্রী পুরুষ গট গট করে ঢুকে পড়তে লাগল। প্রথমে রিজার্ভ কামরার দোহাই দিলাম, তারপর দরজাও ভেজাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সবই বৃথা। 'জনসংহরণ' বিভাগের উপর মনটা ভারী চটে গেল। কামরায় ঢুকে তাদের সে কি তেজ! পরের ষ্টেশনে বীরপুঙ্গব ও বীরাঙ্গনারা নেমে গেলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। বড়দিনের ছুটিতে পুরী যাওয়াটা

এখানেই বাতিল হয়ে গেল। কারণ স্থির হ'ল মা তখনও কাশীতেই থাকবেন। ট্রেন মোগলসরাই পৌঁছল বেলা প্রায় দেড়টায়। এখানে গাড়ী বদল করে বেনারসের গাড়ীতে উঠতে হবে। মোগলসরাইয়ের কুলিরা দেখলাম বেশ সেবাপরায়ণ। আপনাকে তারা সুস্থির থাকতে দেবে না; শুধুই 'সেবা' করবার আগ্রহ জানাবে—সেবাধর্ম্মের যদি ব্যাঘাত হয় পাছে! 'সেবা' করবার আগ্রহটা সমাজের উঁচু তলাতেও বর্ত্তমান। 'দেশের সেবা' করবার জন্য অনেককে জমিজমা বন্ধক দিয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, লোকাল বোর্ডের মেম্বর, সর্ব্বশেষে স্বাধীন ভারতের নেতা হতে চেষ্টা করতেও দেখেছি।

কাশী আর কলকাতায় আকাশপাতাল পার্থক্য। প্রমাণ দিচ্ছি: ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশন থেকে পাঁড়ে হাউলি প্রায় তিন মাইল রাস্তা। রিক্সা ভাড়া নিলে শুধু ছ'আনা করে। তাতেও কি 'কম্‌পিটিশান'। কিন্তু কলকাতায় তারাই এলে হাঁকবে 'দেড় রুপিয়া'। মনে আছে একবার এস্‌প্লানেড থেকে ডালহৌসি নিয়ে যেতে এক রিক্সাওয়ালা 'পান্ সিকি' হেঁকেছিল। পূজার ছুটির আসল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত লোককে কয়েক দিনের জন্য কলকাতা ছাড়বার সুযোগ দেওয়া। এখানে কেবল শোষণ আর শোষণ। ব্যবসায়ী মহাজন, দুধওয়ালা, মাছওয়ালী, কর্পোরেশন, সবকিছু মিলে এক মহা পাপচক্রের সৃষ্টি করেছে কলকাতায়।

ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত কাশীতেই কাটালাম। অনেক বাঙালী বাস করে সেখানে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশখানা 'ঠাকুর'। একটা জিনিষ লক্ষ্য করবার—এখানকার ঠাকুর এখনও সেই সাবেক আমলের, যার চিহ্ন আমরা পটে বা ছবিতে এখন দেখতে পাই। সব মূর্ত্তিকে একত্র করে একই চালচিত্রের মধ্যে রাখা হয়েছে। বাংলাদেশে আমরা স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে একটু বেশী ওয়াকিবহাল বলে দেবদেবীদের বোধ করি একটা স্বল্প পরিসর জায়গায় ঘেঁষাঘেঁষি ভাবে রাখতে পারি নে। আর দেবী ও তাঁর ছেলেমেয়েরা পর্ব্বতে থেকে অভ্যস্ত বলে এখানেও সত্যিকারের পাহাড় না হলেও কৃত্রিম পাহাড়ে রাখাটাই আমাদের মতে যুক্তিযুক্ত। আর কলকাতার অন্ধকার সরু গলিতে অনভ্যস্ততার দরুন দর্শকদের অসুবিধে হতে পারে বিবেচনা করে আমরা মায়ের পিছনে সতত-আবর্ত্তমান অগ্নিগোলকের ব্যবস্থা করেছি, কিন্তু এখানে আজও চলছে মান্ধাতার আমলের রীতি। তবে এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, আমাদের দেবীকে দেখে মনে হয় তিনি যেন কয়েক দিন হাড় জুড়াবার জন্যেই ছেলেপুলে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে এসেছেন। অসুর মারাটা যেন গৌণ। অসুরের দিকে তিনি এমনভাবে তাকিয়ে থাকেন যে তাতে অন্তরের তেজ কিছুমাত্র প্রকাশিত হয় না! কিন্তু এখানকার মায়ের মূর্ত্তি কি তেজোদৃপ্ত, কি রোষকষায়িত চাহনি! আবার সব মিলিয়ে কি অপূর্ব্ব শান্তশ্রী। এ যে "চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা"র নিখুঁত প্রাণবন্ত রূপায়ন!

এখানেও বাঙালীরা বেশ সভাসমিতি ক্লাব করেছেন। পূজার সময় আমোদস্ফূর্ত্তির ব্যবস্থাও প্রচুর হয়। অষ্টমী রাতে 'হরিহর সমিতি' কর্ত্তৃক অভিনীত 'দুই পুরুষ' দেখেছিলাম। পরের রাতে হয়েছিল 'কর্ণার্জ্জুন'। অভিনয় খুব নিখুঁত না হলেও তারা যে নিজস্ব সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এতে বেশ আনন্দ পেলাম। বিহারে বাঙালীদের অনেককে দেখেছি বাংলা ভাষাটা ব্যবহার না করলেই যেন তাদের সুবিধে হয়। বাঙালী যদি বেঁচে থাকতে চায় তবে তার একটা প্রধান করণীয় হবে প্রবাসী বাঙালীদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করা। রাষ্ট্রভাষার প্রতি আমাদের একটা তীব্র বিতৃষ্ণা আছে। কিন্তু মাতৃভাষার প্রতিই-বা আমাদের শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা কতখানি?

রামকৃষ্ণ আশ্রমের মত যে সব সঙ্ঘ সেবাধর্ম্ম উদ্‌যাপন করছে তাদের মধ্যে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ পুরোভাগে। এখানেও সঙ্ঘ দুর্গাপূজায় বেশ জাঁকজমক করে থাকেন।

বাড়ী বাড়ী স্বামীজী ও স্থানীয় গণ্যমান্যদের বক্তৃতা, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা এবং বিজয়া সম্মিলনীর ব্যবস্থা দ্বারা তারা আসর জমিয়ে বসেছেন। শহরের এক পাশে হাসপাতাল ইত্যাদি নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন মন্দির—কিন্তু যেন অপেক্ষাকৃত নীরব। সেখানেও মায়ের আরাধনা হয়ে থাকে। নবমীর অপরাহ্ণে ভারত সেবাশ্রমে গিয়েছিলাম। বক্তৃতার বিষয় ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব। বিষয়টি অতি পরিষ্কার, বক্তা, শ্রোতা, বিচারক সবাই এক পক্ষের; সুতরাং সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে বেগ পেতে হয় নি। তবু বক্তাদের হুমকির অন্ত নেই, যেন কেউ তাদের কথার প্রতিবাদ করছে।. সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা অল্পই হয়েছিল, প্রায় সবটাই ছিল অপরের, বিশেষ করে নাস্তিকদের প্রতি বিষোদ্গীরণ—কংগ্রেসী সরকারও বাদ পড়ে নি। সভাপতি ছিলেন একজন গোঁড়া কংগ্রেসী। ভারতীয় সংস্কৃতির গুণগানে তাঁর বিন্দুমাত্র অরুচি নেই, কিন্তু সরকারের প্রতি খোঁচাটা তিনি সইতে পারলেন না; এর প্রতিবাদ করলেন তীব্র ভাবে। অপরপক্ষ থেকে এল পাল্টা প্রতিবাদ। এ ভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলল। কোথায় ভারতীয় সংস্কৃতি, বা তার শ্রেষ্ঠত্বের কথা! সভা শেষ হ'ল এক সম্পূর্ণ অবান্তর আলোচনা দিয়ে।

বারানসী থেকে আবার যাত্রা সুরু করলাম। এবার এলাহাবাদ, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন। প্রথমে এলাহাবাদ। বেশ পরিষ্কার শহর, রাস্তাগুলি বেশ চওড়া এবং ভিড়ও খুব, বাঙালীও অনেক চোখে পড়ল। এখানে বাঙালীরা দোকানও করেছে দেখলাম। তবে খাবারের দোকান, হোটেল-

রেস্তোরাঁ ও দরজীর দোকান সবই স্থানীয় লোকের। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রয়াগ আশ্রম শহরের শেষপ্রান্তে, প্রায় ত্রিবেণীসঙ্গমের কাছে। সেদিনই ত্রিবেণীতে তীর্থস্নান করে নিলাম, মা মস্তক মুণ্ডন করলেন। নদীর ধার হতে সঙ্গম একটু দূরে। নৌকা করে যেতে হয়। স্নান সেরে এলাহাবাদ কোর্টে দর্শনীয় সবকিছু দেখে নিলাম। বিকেলবেলা টাঙ্গা করে শহরটা ঘুরে দেখা হ'ল—আনন্দভবন, স্বরাজভবন, কমলা নেহরু হাসপাতাল কিছুই বাদ গেল না। এলাহাবাদের রাস্তাগুলি দেখলাম নেহরু-পরিবারের ছাপমারা। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু রোড্, কমলা নেহরু রোড, এমনি অনেক রাস্তা শহরকে বেষ্টন করে আছে। কমলা নেহরু রোডে দেখলাম একটা বিরাট অট্টালিকা তৈরি হচ্ছে, অনেকটা কলিকাতার হিন্দ্ সিনেমার মত। টাঙ্গাওয়ালা আমার কৌতূহল চরিতার্থ করলে—এটাও একটা সিনেমা। এর মালিকের পুষ্যি মাত্র দুটি, তার স্ত্রী এবং তিনি নিজে। ভাবলাম, সেই জন্যই ত তাঁদের একটা সিনেমা চাই—ভরণপোষণের-জন্য। কিন্তু তিনি কি শুধু এই সিনেমারই মালিক?

সেদিনই রাতের গাড়ীতে আগ্রা রওনা হলাম। আগ্রায় পৌঁছুতেই কয়েকজন বাঙালী আমাদের ঘিরে ফেলল। তারা হোটেলের লোক, হাতে নিজ নিজ হোটেলের কার্ড। হোটেলে উঠবার ইচ্ছাই আমাদের ছিল। কিন্তু তখন আগ্রায় খুব ভিড়। পূর্ণিমা রাত্রে তাজ দেখবার জন্য আমাদের মত অনেকে জড়ো হয়েছে সেখানে। আমাদের সুবিধামত ঘর হোটেলে পাওয়া গেল না। অগত্যা আমাদের উঠতে হ'ল এক মাড়োয়ারী ধর্ম্মশালায়। এমন নোংরা বাড়ী আর জীবনে দেখি নি। তবু এর মধ্যেই থাকতে হবে। অবশ্য প্রাইভেট ঘর পাওয়া যেত, কিন্তু আমাদের সেখানে থাকতে ভরসা হ'ল না। তার চেয়ে ধর্ম্মশালাই নিরাপদ। বিকেলবেলা আগ্রা কোর্টে গেলাম। মনে কত উৎসাহ উদ্দীপনা, এতদিন যা ছিল কল্পনা আজ তা প্রত্যক্ষ করতে পাব! সঙ্গে একজন গাইড নেওয়া হ'ল। লোকের যা ভিড়, তাতে আবার গাইডপুঙ্গবটি দর্শনার্থীর কৌতূহলনিবৃত্তির দিকে লক্ষ্য না দিয়ে নিজের ট্যাঁকের দিকেই নজর দিলে বেশী। এত বড় জায়গাটা কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমাদের দেখিয়ে দিলে। আগ্রা কোর্টে সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহ্জাহানের কীর্ত্তির নিদর্শন রয়েছে। তবে বিশেষ করে শাহ্জাহানের নির্ম্মিত অংশগুলিই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশী। দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, শিশ্মহল, মমতাজের আঙ্গিনা—জাহানারা ও রোশ্নারার কক্ষ ইত্যাদিও বেশ দর্শনীয়। সবচেয়ে দ্রষ্টব্য সেই জায়গাটা যেখান থেকে সম্রাট শাহ্জাহান বন্দীজীবনে তাজমহল দেখতেন। একটি কাচ এমনভাবে বসানো হয়েছে যে তার মধ্য দিয়ে গোটা তাজকে বেশ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। মৃত্যুর আগে নাকি শাহ্জাহানকে এখানে আনা হয়েছিল এবং তাজ দেখতে দেখতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস এখানেই ত্যাগ করেন। কথাটা শুনে নদীর ওপারে তাজের দিকে তাকালাম। দেখলাম ধ্যাননিমগ্ন তাজ দাঁড়িয়ে আছে অপূর্ব্ব প্রশান্তির মধ্যে।

রাত ন'টায় তাজ দেখতে বেরুলাম। ট্যাক্সি, টাঙ্গার কি দর সেদিন! বেশ কিছু দক্ষিণা দিয়ে আমরা একটা টাঙ্গা ভাড়া করলাম। রাত প্রায় পৌনে দশটায় পৌঁছানো গেল তাজের পাদদেশে। লোকে লোকারণ্য। চাঁদনীরাতে তাজকে অপরূপ দেখায় বটে, কিন্তু সে সৌন্দর্য্য কি উপভোগ করবার জো আছে? শান্তচিত্তে কি তাজকে দেখবার জো আছে? কেবল লোক আর লোক, আর তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও হট্টগোল। এতে সমাধি-মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট হয় বলে আমার বিশ্বাস। মা, মামীমা, দাদা সবাই খুঁটে খুঁটে দেখতে লাগলেন। আমি যেন পালাতে পারলে বাঁচি। মেঘমুক্ত শারদাকাশ থেকে পূর্ণিমার চাঁদ নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছে তার নির্ম্মল রশ্মিজাল তাজের উপরে, নীচে ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে যমুনা। সবটা মিলিয়ে কি এক অপূর্ব্ব পরিবেশের সৃষ্টি! আর বিকৃতরুচি কতকগুলি লোক কি নির্ম্মমভাবে এই সৌন্দর্য্যালোকে কুশ্রীতার সৃষ্টি করছে! মনে হ'ল যেন শাহ্জাহান-মমতাজের আত্মা আকুলভাবে আবেদন জানাচ্ছে—"তোমরা চলে যাও, আমাদের শান্তিতে ঘুমুতে দাও।" কে শুনবে তাঁদের কাতর আবেদন?

রাত প্রায় একটায় ফিরে এলাম ধর্ম্মশালায়।

পরদিন সকালবেলা মথুরার গাড়ীতে চড়লাম। রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতায় আছে প্রথমে তিনি শ্রীধামে (বৃন্দাবনে) নেমেছিলেন পরে দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পিছনে যত পাণ্ডা লেগে তাঁর প্রাণটাকে নিমেষে কণ্ঠাগত করেছিল। কিন্তু আমাদের পাণ্ডাগণ দয়া করে মথুরাতেই এগিয়ে এসেছেন। কোন্ জেলায় বাড়ী? কোন্ মহকুমায়? ইত্যাদি হরেক রকম প্রশ্ন করে একদল পাণ্ডা আমাদের ছেঁকে ধরল। আমি কুতূহলী হয়ে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম—"তা আপনি চিনবেন কি করে?" যেই বলা আর যায় কোথায়? "বলুন না একবার, জানি কিনা পরে হবে।" বেশ নির্ভুল বাংলায় উত্তর এল। আমি পরীক্ষামূলকভাবে বললাম, ধরুন, ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমায়।

সুরু হ'ল সে মহকুমার যত রাজ্যের গ্রাম এবং প্রত্যেক গ্রামের কর্ত্তাব্যক্তিদের নামের বিরাট ফর্দ্দ। আমার কাছে সে সব অনাবশ্যক, কারণ আমি কিছুই জানি না। বাংলা হতে হাজার বার শ' মাইল দূর থেকেও তিনি আমার জন্মভূমির এত জায়গার নাম জেনে রেখেছেন, বোধ হয় গিয়েছেনও, আর আমি নিজের দেশে যাই নি। খুব লজ্জা হ'ল

যমুনাতে স্নান করা গেল। ঘাটটা সত্যি নয়নমুগ্ধকর, চারদিকে কচ্ছপ, মানুষ দেখে এতটুকুও ভয় নেই। আশ্চর্য্য ঠেকল, হৃষীকেশ হরিদ্বারেও দেখেছিলাম বড় বড় মাছ এমনি অকুতোভয়ে ভেসে চলেছে।

সেদিনই শ্রীধাম বৃন্দাবনে রওনা হলাম। সেখানেও সেবাশ্রম সঙ্ঘের আশ্রমেই উঠলাম। সে রাত্রে বেশী দেখা হ'ল না। পরদিন প্রথমে 'যমুনাজী'তে স্নান। তারপর মন্দির-দর্শন। বৃন্দাবনে মন্দিরের সংখ্যা অগণ্য। প্রতি বাড়ীই মন্দির। শেষ রাত্র থেকে সুরু হয় 'জয় রাধে' 'রাধেকৃষ্ণ' রব; আর চলে প্রায় রাত বারটা অবধি। বাঙালী ভক্তের সংখ্যাও কম নয়। অনেকে বেশ বড় বড় মন্দিরের মালিক। কাশীতে দেখেছি বাঙালী বিধবারা দশাশ্বমেধ ঘাট, বিশ্বনাথ মন্দির, অন্নপূর্ণা মন্দির প্রভৃতি স্থানে আঁচল বিছিয়ে বসে থাকে ভিক্ষার আশায় আর এখানে 'রাধা-কৃষ্ণ' 'জয়-রাধে' করলেই তাদের অন্ন জোটে। অনেক অতিথিশালা আছে সেখানে অন্ন জোটাবার একমাত্র উপায় ঘণ্টাখানেক 'রাধেকৃষ্ণ' চীৎকার করা। খুব সহজপন্থা সন্দেহ নেই। আমাদের সমাজ বিধবাদের জন্যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে কিন্তু কি সুষ্ঠুভাবে তার সমাধানেরও পথ করে রেখেছে! বুদ্ধির তারিফ করতে হয়।

শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরি গোবর্দ্ধন, কুঞ্জবন, নিধুবন, গোবিন্দজীর মন্দির, শেঠজীর মন্দির, মদনমোহনের মন্দির, আরও অনেক দর্শনীয় বস্তু এখানে আছে। কোন কোন মন্দিরের কারুকার্য্য দেখলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতে হয়। কতক-গুলি মন্দির খুব প্রাচীন; মোগল আমলেরও আগেকার। বিভিন্ন যুগের স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন শ্রীধামে প্রত্যক্ষ করা যায়। কুঞ্জবন, নিধুবনের কর্ত্তাদের রুচিবোধ সত্যই প্রশংসনীয়।

সব দেখে শুনে আমরা আবার যাত্রা করলাম পোড়ামাটির দেশে।

ছোট্ট ট্রটের বড়দিন

শ্রীপূর্ণা সিংহ

আজ বড়দিন—ছোট্ট ট্রটের ঘুম তখনো ভাল করে ভাঙে নি। এমন সময়ে কে যেন কানের কাছে ফিসফিস করে বলে গেল—আজ বড়দিন। ছোট্ট ট্রট এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। কাল রাত্রে অনেকক্ষণ সে জেগে জেগে বিছানায় শুয়ে ছিল, আর ভাবছিল, কালকের দিনটা কিছুতেই বুঝি আর এসে পৌঁছবে না। এক দৌড়ে ট্রট চুল্লীর ধারে যেখানে সে তার ছোট্ট হলদে রঙের চটিজোড়া কাল রাত্রে রেখে দিয়েছিল, সেখানে হাজির হ'ল। বিস্মিত আনন্দে সে চেঁচিয়ে উঠল। একটা ঢাক, একটা তলোয়ার, দুটো ছবির বই, এক বাক্স চকোলেট আরও কত কি টুকিটাকি জিনিষে তার চটি-জোড়া উপচে উঠে চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। সবকিছু ট্রটের জন্যে—সব। ট্রট ঘাড় ফেরাতেই দেখলে, তার মা হাসি-মুখে দরজার কাছে তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ট্রট ছুটে গিয়ে মাকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলে।

—ছোট্ট যিশু তোমাকে এই সব উপহার দিয়েছেন, তাঁর কথা তুমি ভুলে যাও নি তো সোনামণি?—মা তাকে আদর করে বললেন।

নাঃ, ট্রট যিশুকে ভোলে নি। সে ছোট্ট যিশুর ছবি অনেক দেখেছে, তাঁকে সে ভাল করেই চেনে। ওই অতটুকু যিশু কি করে যে এত সব ভারী ভারী খেলনার বোঝা নিয়ে উঁচু উঁচু সব চিম্‌নি বেয়ে নেমে বাড়ী বাড়ী খোকাখুকুদের বড়দিনের উপহার দিয়ে বেড়ান ট্রট তা ভেবেই পায় না। তাঁর ছবি দেখে তো কৈ কিছু বোঝা যায় না? দিব্যি টুকটুকে গোলাপী গায়ের রং, ফুটফুটে মুখ ছোট্ট খোকা। এত কাজ করে একটুও তো হাঁপাচ্ছেন না। ট্রটের কি রকম যেন আশ্চর্য্য লাগে। সে কৃতজ্ঞভাবে ছোট্ট যিশুকে ধন্যবাদ জানালে।

ট্রটের নার্স জেন এসে জানলার খড়খড়ি খুলে দিলে—চমৎকার এক ঝলক আলো এসে পড়ল ঘরের ভিতর। উজ্জ্বল নীল সমুদ্র দেখা গেল। ট্রটের মনে হল বাতাস যেন হাসি আর আনন্দে ভরা—খুশির চোটে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হাতমুখ ধোয়া আর পোশাক পরা একরকম অসম্ভব হয়ে উঠল ট্রটের পক্ষে—কেবলই তার লাফাতে ইচ্ছে করতে লাগল। খাবার বাসনা পর্য্যন্ত তার হ'ল না একটুও; অনেক বার বলে তাকে সকালের খাবার খাওয়াতে হ'ল। কোন রকমে খাওয়াদাওয়া শেষ করে সে মায়ের চেয়ারের পায়ার কাছে মাটিতে নতুন পাওয়া খেলনাগুলো নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসল। খেলনাগুলো ট্রট নানারকম ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। এটা এইভাবে দেখতে বেশ সুন্দর! আচ্ছা এবার আরও সুন্দর—বাঃ।

হঠাৎ ট্রটের বাবার কথা মনে পড়ল। বাবা চলে গেছে মস্ত বড় একটা নৌকায় চড়ে অনেক দূরে পৃথিবীর একেবারে অন্ত প্রান্তে।

পোতালা রাজপ্রাসাদ, লাসানগরী

দালাইলামা ও তাঁহার কিহোণী বা প্রতিনিধি

আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকার

মন্দির-অভ্যন্তরে পদ্মসম্ভবের পীঠ

—বাবা যদি এখন এখানে থাকতেন বেশ মজা হ'ত। ট্রট বলে উঠল।

মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন—ট্রট শুনতে পেলে।

বাইরের দরজায় ঘণ্টা বাজবার আওয়াজ শোনা গেল, তার পরেই জেন একটা মস্ত ফুলের তোড়া আর প্রকাণ্ড একটা পুতুল নিয়ে ঘরে ঢুকল। মাকে তোড়াটা আর ট্রটকে পুতুলটা দিয়ে জেন বললে, মঁসিয়ে আর্ঁ পাঠিয়েছেন। মায়ের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল আর লাল হয়ে উঠল। তিনি তোড়াটাতে মুখ লুকিয়ে ফেললেন। ট্রটের কিন্তু মোটেই পছন্দ হ'ল না ব্যাপারটা। মঁসিয়ে আর্ঁকে তার একটুও ভাল লাগে না যদিও ট্রট জানে তিনি খুব বড়লোক আর তাঁর চেহারা বেশ সুন্দর। ট্রটকে তিনি অনেক মিষ্টি খেতে দেন, মাঝে মাঝে তাঁর গাড়ীতে করে বেড়াতে নিয়ে যান। কিন্তু হলে কি হয়—ট্রট তাঁকে পছন্দ করে না, একেবারেই নয়। ট্রটের কাছ থেকে মাকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়াই হচ্ছে আর্ঁর কাজ। কত বারই না ট্রট বেড়িয়ে ফিরে এসে দেখতে পায় আর্ঁ মায়ের পাশে বসে গল্প করছেন। ট্রট ঠিক জানে তক্ষুনি জেন আসবে আর তাকে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি অন্যত্র নিয়ে যাবে।

মা বললেন—বাঃ ট্রট, মঁসিয়ে আর্ঁ তোমাকে কি সুন্দর পুতুলটা দিয়েছেন—

ট্রট ঘাড় গুঁজে বললে ছাই, বিচ্ছিরি পুতুল।

মা একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। অনেকক্ষণ ধরে ট্রটকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, পুতুলটা বেশ সুন্দর—একেবারে চমৎকার। ট্রট শেষকালে বলে ফেললে—এর নাকটা ঠিক মঁসিয়ে আর্ঁর মত, বাঁকা—বিচ্ছিরি দেখতে।

মা খুব হাসতে লাগলেন ট্রটের কথা শুনে। ট্রট রেগে গিয়ে নাকটা দেয়ালের দিকে করে পুতুলটাকে ঘরের এক কোণে বসিয়ে রাখলে, আর মাঝে মাঝে কটমট করে চেয়ে ভয় দেখাতে লাগল তাকে।

ঘড়িতে এগারোটা বাজল। ট্রট তার নতুন ভেলভেটের কলার দেওয়া জামা, হলদে রঙের দস্তানা আর রেশমের ফিতে বাঁধা টুপি পরে মায়ের সঙ্গে গীর্জ্জায় চলল। ঢুকবার পথে আর্ঁর সঙ্গে তাদের দেখা হ'ল। মা আর্ঁকে ধন্যবাদ জানালেন সুন্দর উপহার পাঠানোর জন্যে। ট্রট কিন্তু মুখ গুঁজে রইল—আর্ঁর সঙ্গে একটা কথাও বলতে রাজী নয় সে। ট্রটের অশোভন আচরণে আর্ঁ যাতে কিছু মনে না করেন সেইজন্যে মা তাকে বিকেলে চা খাবার নিমন্ত্রণ করলেন। আর্ঁ খুশি হয়ে মুখের কাছে হাত তুলে খুব নীচু গলায় কি বললেন ট্রট শুনতে পেলে না—তবে মা যে হাসলেন আর সেই সঙ্গে তাঁর মুখখানি লাল হয়ে উঠল তা ভাল করেই ট্রটের নজরে পড়ল।

গীর্জ্জায় গিয়ে ট্রট মায়ের পাশে বসল। গান হ'ল, তার পর যাজক উঠলেন বক্তৃতা দিতে। তিনি বললেন, যিশুর জন্মের কথা—সেই আস্তাবলের ভিতর যেখানে গরু আর গাধাদের রাখা হ'ত সেখানে তিনি জন্মেছিলেন। আর বললেন, তাঁর মৃত্যুর কথা।—শেষকালে তিনি উপদেশ দিলেন যে, প্রত্যেক মানুষের উচিত অন্যকে খুশি করা, অন্যকে আনন্দ দেওয়া।

ট্রট খুব মন দিয়ে যাজকের কথাগুলো শুনল—আহা সে যদি কাউকে আনন্দদান করতে পারত ত' হলে ছোট্ট যিশু নিশ্চয়ই তার উপর খুশি হতেন। কিন্তু কি করে সে অন্যকে আনন্দ দেবে? ট্রট যে বড্ড ছেলেমানুষ!—তাকেই সবাই জিনিষপত্র উপহার দেয়, সে তো কাউকে কিছু দিতে পারে না—কেউ তার কাছ থেকে কিছু নেয় না।

বাড়ী ফিরে এসে ট্রট গম্ভীরভাবে ভাবতে লাগল কি করে অন্যকে আনন্দ দেওয়া যায়! মা কি সব বললেন ট্রটের কানে তা পৌঁছলই না। সে তখন ভেবে দেখছে এমন কে আছে যে খুব গরীব; খুব দীনহীন, যাকে ছোট্ট ট্রটও একটু আনন্দ দিতে পারে।

চিঁ চিঁ হাঁ হাঁ হাঁ—হঠাৎ বাইরে একটা বিকট আওয়াজে ট্রট চমকে উঠল। জীন-বাঁধা গাধাটাকে নিয়ে সেই মেয়েটা এসেছে। ঐ গাধায় চড়ে ট্রট মাঝে মাঝে বেড়িয়ে আসে। হঠাৎ ট্রটের একটা কথা মনে হ'ল:—

আঃ! এই তো, এই গাধাটাই তো রয়েছে, যাকে বড়দিনে একটুও খুশী বলে মনে হচ্ছে না। নিশ্চয়ই যিশু নিজেই একে ট্রটের কাছে নিয়ে এসেছেন, যদি ট্রট একে একটু আনন্দ দিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে। আজ ট্রট শুনে এসেছে ছোট্ট যিশুর যেদিন জন্ম হয়েছিল সেদিন তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল একটা গাধা। এই গাধাটাই হয় তো যিশুর সেই বন্ধু—কে জানে? আর সে কিনা এতদিন এর পিঠে চড়েছে—ছিঃ ছিঃ ট্রটের দস্তুরমত লজ্জা করতে লাগল।

দুপুরের খাওয়া শেষ হলে মা চলে গেলেন মঁসিয়ে আর্ঁকে চা খাওয়াবার জন্যে সব গোছগাছ করতে। ট্রট এক দৌড়ে হাজির হ'ল সেই ছোট মেয়ে আর তার গাধাটার কাছে। খেতে বসে ভেবে ভেবে সে ঠিক করেছে গাধাটাকে নিজের খাবার থেকে কিছু ফল খেতে দিয়ে খুশী করবে।

ট্রট খুব সাবধানে আস্তে আস্তে খাবারঘরের কাছে এনে দাঁড় করাল গাধাটাকে—তার পরে ফল আনতে গেল। হায় হায়! কি হবে, লুইজা ঝি খাবার টেবিল পরিষ্কার করে ফেলেছে। একটা ফলের টুকরোও সেখানে পড়ে নেই। ট্রট জানলা দিয়ে তাকাতে গাধাটা তাকে দেখতে পেয়ে খিদে খিদে মুখ করে আরও এগিয়ে এল। চিঁ হাঁ—ছোট্ট একটা আওয়াজ বেরল তার মুখ দিয়ে—ট্রটের মনে হ'ল গাধাটা বলছে—

ছিঃ আমার মত দুঃখীকে মিথ্যে আশা দিয়ে ডেকে আনলে ?

দুঃখে ক্ষোভে ট্রটের চোখে জল এসে পড়ল। হঠাৎ তার চোখ পড়ল সকালবেলা মঁসিয়ে আরঁর দেওয়া ফুলগুলো যে ফুলদানীতে সাজান রয়েছে তার উপর।

—ঠিক, ঠিক হয়েছে ওই দুষ্টু ইহুদীটার ফুলগুলোই সে খেতে দেবে ছোট্ট যিশুর বন্ধুকে।

ট্রট ফুলগুলো এনে রাখল গাধাটার সামনে। গাধাটা সেগুলো একবার শুঁকে দেখল, তার পর চটপট খেয়ে নিতে সুরু করলে। আনন্দে ট্রটের বুকের ভিতরে ঢিপ ঢিপ করে শব্দ হতে লাগল।

ট্রট, ট্রট, কি করছ ? তুমি কি করছ ওখানে ?

মায়ের গলার স্বরে ট্রট বুঝতে পারল একটা কিছু গণ্ডগোল হয়েছে।

শীগ্‌গির ভেতরে এস, আমার ফুলগুলো নিয়ে।

ফুলের তোড়ার অবশিষ্ট ডাঁটাগুলো নিয়ে ট্রট আস্তে আস্তে মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ইস্—মা চেঁচিয়ে উঠলেন—দুষ্টু পাজী ছেলে, কেন মঁসিয়ে আরঁর দেওয়া ফুলগুলো নষ্ট করলে ?

আজকে গীর্জ্জায় যে বললেন অন্যকে আনন্দ দেওয়া প্রত্যেক মানুষের উচিত। তা—তাই আমি গাধাটাকে আনন্দ দিচ্ছিলাম। আমি বুঝতে পারি নি যে তুমি রাগ করবে। মঁসিয়ে আরঁকে তুমি এত ভালবাস তা আমি জানতাম না।—আমতা আমতা করে ট্রট বললে।

মা কিন্তু কিছু বুঝতে চাইলেন না, বরং শেষ কথাটাতে ট্রটের উপর আরও রেগে গিয়ে বললেন—

মঁসিয়ে আরঁকে আমি মোটেই ভালবাসি না, তবে তিনি এক জন ভদ্রলোক, ভালমানুষ। ভদ্রতা করে তিনি উপহার পাঠালেন, তুমি অসভ্য ছেলে তা নষ্ট করলে কেন ?—তাঁর পর আরও অনেক কথা বলে মা ট্রটকে বেজায় বকতে লাগলেন।

ট্রটের চোখ দিয়ে দর দর করে জল পড়তে লাগল। মা তা দেখেও থামলেন না। শেষে তিনি ট্রটকে বসবার ঘরের এক কোণায় নিয়ে গিয়ে সেখানে চুপ করে বসে থাকতে বললেন।···

ওঃ,—মা কক্ষনো ট্রটকে এ রকম করে বকেন নি। এমন কি চলে যাবার সময় বাবার দেওয়া সেই সুন্দর লকেটটা যখন ট্রট ভেঙে ফেলেছিল তখনও না। ট্রট হাতে মুখ ঢেকে অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগল। অনেকক্ষণ কাঁদবার পর চোখ মুছে সে উঠে বসল।—নাঃ পৃথিবীতে ভাল যে কি আর মন্দ যে কোন্‌টা তা বোঝবার জো নেই। ট্রট উদাস ভাবে ভাবতে লাগল।—ছোট্ট যিশু ট্রটকে ঠকিয়েছেন, গাধাটা ট্রটকে ঠকিয়েছে···

—ট্রট !

ট্রট চুপ করে শুনল।

ট্রট খোকনমণি !

ট্রট আস্তে আস্তে ঘাড় একটুখানি ফিরিয়ে দেখে মা হাসি-মুখে তার দিকে চেয়ে আছেন। আঃ ! মা তা হলে আর তার উপর রাগ করে নেই—

—ট্রট সোনামণি আমার কাছে এস—

ট্রট ঝাঁপিয়ে মায়ের কাছে গেল। মা তাকে কোলে তুলে নিলেন। দুই হাতে মার গলা জড়িয়ে ছোট্ট ট্রট চোখ বুজল। নাঃ, আর কক্ষনো ট্রট মায়ের জিনিষ নষ্ট করে তাঁর মনে কষ্ট দেবে না। কক্ষনো নয়।

ফুলের ডাঁটাগুলো দেখিয়ে মা হেসে বললেন—'বাঃ বেশ হয়েছে। এইটুকুই বা আর থাকে কেন, যাও তোমার গাধাটাকে এটুকুও খেতে দাও গিয়ে।' লাফাতে লাফাতে ডাঁটাগুলো নিয়ে ট্রট গাধার কাছে চলল।···

'আর শোন গাধাকে খাওয়ানো শেষ হলে, দৌড়ে গিয়ে আমার চিঠি লেখার কাগজ আর কলমটা নিয়ে এসে আমাকে দিও। মঁসিয়ে আরঁকে আজকে চা খেতে আসতে বারণ করে একখানা চিঠি লিখে দেব—আমার ভারি মাথা ধরেছে। তুমি তোমার গাধার পিঠে চড়ে চিঠিটা মঁসিয়ে আরঁকে দিয়ে আসবে।'

* * *

সেদিন রাত্রে ট্রট শুতে যাবার সময় রোজকার মত মা তার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন। ট্রট অভ্যাসমত প্রার্থনা আরম্ভ করলে। প্রার্থনার শেষের দিকে সে যখন বলতেলাগল, 'আমাদের প্রলোভনের মোহ থেকে মুক্ত কর, হে প্রভু ! বিপথ থেকে আমাদের তোমার মঙ্গলময় পথে নিয়ে যাও···' তখন তার কপালে এক ফোঁটা গরম কি যেন পড়েছিল।—ছোট্ট ট্রট কিন্তু তা জানতে পারে নি। প্রার্থনা শেষ না হতেই তার চোখ দুটি জড়িয়ে এসেছিল গভীর নিদ্রায়।*

---

* আঁদ্রে লিখ্যাবেরগের 'ট্রটস্ ক্রিস্‌মাস্' অবলম্বনে।

রাজনৈতিক পটভূমিকায় তিব্বত

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

তিব্বতের সংস্কৃতি, ধর্ম্ম এবং আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থার মর্ম্মকথা বুঝিতে হইলে চারিদিকের দেশগুলির সহিত উহার সম্বন্ধ কিরূপ তাহা জানা থাকা দরকার। তিব্বতের ধর্ম্ম ও শিক্ষাগুরু আসিয়াছিল ভারত হইতে। রাজনীতি আমদানি হইয়াছিল বিশেষ করিয়া চীন হইতে। মোঙ্গোলিয়ার সহিতও রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার উপলক্ষ্যে রুশিয়ার সহিতও রাজনৈতিক বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। তিব্বতের বিষয় বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে চীনের নবজন্ম, এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার লইয়া রুশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে টক্কর, ভারতের স্বাধীনতা লাভ, পাকিস্থানের জন্মের মর্ম্মকথা, অমীমাংসিত কাশ্মীরসমস্যা, ব্রহ্মের উত্তরে ও আসাম আবর পাহাড় এবং চীন ও তিব্বতের মধ্যস্থলের অঞ্চলগুলির অধিকার লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা। আসামের পেট্রলও ভুলিলে চলিবে না। আর মনে রাখিতে হইবে ইংরেজ ও আমেরিকার পর্দ্দার আড়াল হইতে রাজনৈতিক দাবা খেলা।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে তিব্বতের কোনও খাঁটি ইতিহাস জানা যায় না। তখনকার তিব্বতীয়গণ ছিল হিংস্র মেষপালক।

সে যুগের তিব্বত ছিল বহু খণ্ডে বিভক্ত রাজ্য। সপ্তম শতাব্দীতে রাজা সোং-ৎসেন্-গাম্পো এক অখণ্ড তিব্বত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার জন্ম হয় ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে।* তের বৎসর বয়সে তিনি রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাকে লোকে 'অবলোকিতেশ্বরে'র অবতার মনে করিত। তিনি লাসাতে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। তিনি তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যের সাহায্যে উত্তর ব্রহ্মের অরণ্যময় অঞ্চল জয় করিয়া চীনেরও কতক অংশ দখলে আনিলেন। তিব্বত-ইতিহাসে আছে যে, তিনি বঙ্গদেশও জয় করিয়া বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। বঙ্গোপসাগরকে তিব্বত উপসাগর বলা হইত। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে এরূপ কোনও তথ্যের উল্লেখ নাই। তবে আধুনিক নৃতত্ত্ব ও ভাষার গবেষণায় নাকি প্রমাণ হয় বঙ্গের উপর তিব্বতের প্রভাব। এই রাজা প্রথমে বিবাহ করেন নেপাল-রাজকন্যাকে। তারপর বিবাহ করেন চীন সম্রাট্‌কন্যা ম্যিম্‌শ্যাংকে। দুই রাণীই ছিলেন বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাসী এবং উচ্চশিক্ষিতা। তাঁহাদের, বিশেষ করিয়া চীনা রাণীর প্রভাবে রাজা বৌদ্ধধর্ম্মে গভীর বিশ্বাসী হইলেন, এবং তিব্বতীয়গণ অসভ্য তিব্বতীয় জীবনযাত্রা প্রণালী ত্যাগ করিয়া সভ্য চীনের রীতিনীতি গ্রহণ করিতে লাগিল। রাজা নিজে সংস্কৃত, নেওয়ারী ও চীনভাষা জানিতেন। তিনিই ভারত হইতে গ্রহণ করিয়া তিব্বতী বর্ণমালা সৃষ্টি করেন। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য ভারত, হইতে পণ্ডিতকুশর এবং শঙ্কর ব্রাহ্মণকে, নেপাল হইতে পণ্ডিত শীলমঞ্জু ও চীন হইতেও পণ্ডিত আনাইয়া বৌদ্ধ গ্রন্থাদি তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করান। অসংখ্য বৌদ্ধমঠও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারত হইতে তিনি বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত ও ধর্ম্মগুরু আনাইয়া তিব্বতে শিক্ষা ও সভ্যতার আলো ছড়াইয়া ছিলেন। প্রথম হইতেই ভারত ও চীন উভয় দেশের প্রভাব তিব্বতের উপর রহিয়াছে। চীনাগণ বলেন যে, বর্ত্তমান তিব্বত প্রথম হইতে কেবলমাত্র চীনের প্রভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা সত্য নহে। এই রাজার আমলেই তিব্বতে সর্ব্বপ্রকার উন্নতি হয়।

সোং-ৎসেন্-গাম্পোর প্রপৌত্র রাজা তি-সোঙ্-ডেত্-স্যান্-এর রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্মের শান্তিপূর্ণ আওতায় আসিয়া পশ্চিম তিব্বতের হিংস্র তিব্বতীয়গণ শান্ত ও সভ্য হইয়া উঠিল। ইনিই ভারতের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধক 'পদ্মসম্ভব'কে ও সাধক "শান্তরক্ষিত"কে ভারতের উদ্দয়ন হইতে তিব্বতে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পদ্মসম্ভব 'ঙিঙ্গ-মা-পা' সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্প্রদায়কে এখন 'লাল টুপি'র (Red hats) সম্প্রদায় বলে। ইহাই মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের এক বিশিষ্ট শাখা লামাধর্ম্ম নামে পরিচিত। তিনি সেম্যেতে প্রথম বৃহদাকার বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত করেন; এবং বহু বৌদ্ধ

* তিব্বতীয় ঐতিহাসিকগণ জন্ম সন সম্বন্ধে একমত নহেন। ৬০০ হইতে ৬১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল সে সম্বন্ধে দ্বিমত নাই।

ও তন্ত্র গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনূদিত করাইয়া দেন। এই রাজার আমলেই ভারত হইতে পণ্ডিত কমলশীল লাসায় গিয়া চীনে হসানমহাযানের বৌদ্ধধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা বন্ধ করেন। পদ্মসম্ভবকে মন্দিরে মন্দিরে দ্বিতীয় বুদ্ধদেব হিসাবে পূজিত হইতে দেখিয়াছি।

পায়ে তেল মাখিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া কুস্তি

সোং-ৎসেনের এক পুত্র 'মুনি-ৎসানপো' রাজা হইয়া ধনী-দরিদ্রের বিভেদ বন্ধ করিবার মানসে ধনীর ধন গরিবকে বিলাইয়া দিয়া ধনসাম্য প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন। তিন তিন বার চেষ্টা বিফল হয়। ফলে কর্ম্মঠ দরিদ্র প্রচুর ধন পাইয়া হইল অলস। দেশের হইল ক্ষতি। এই দেখিয়া রাজমাতা বিষ প্রয়োগে পুত্রকে বধ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্রকে সিংহাসনে বসাইলেন।

আর একজন রাজা খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে তিব্বতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও শিক্ষার বিস্তার করেন। তিনি ছিলেন, র‍্যাল্পা চ্যান্। পূর্ব্বপুরুষদিগের সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া তিনি পুনরায় মগধ, উজ্জয়িনী, নেপাল ও চীন হইতে পুঁথি আনাইয়া অনুবাদ করাইলেন। অনুবাদের কাজের জন্য আনিলেন ভারতবর্ষ হইতে অধ্যাপক জীন মিত্র, সুরেন্দ্র বোধী, শীলেন্দ্র বোধী, দানশীল এবং বোধি মিত্রকে। তাঁহাদিগকে সাহায্য করিলেন তিব্বতী পণ্ডিত রত্ন রক্ষিত, মঞ্জুশ্রী বর্ম্ম, ধর্ম্ম রক্ষিত, জীন সেন, রত্নেন্দ্র শীল, জয় রক্ষিত, কওয়াপলৎ সেগ্। বহু অসমাপ্ত গ্রন্থ সমাপ্ত হইল এবং নূতন পুস্তক অনূদিত হইল। এই রাজার আমলে তিব্বত ও চীনের মধ্যে বিরোধ বাধায় র‍্যাল্পা-চ্যান্ এক ভীষণ যুদ্ধে চীনকে হারাইয়া স্বরাজ্য বিস্তার করিলেন। উভয়পক্ষে এত লোকক্ষয় হইয়াছিল যে, চীন ও তিব্বতের বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের মধ্যস্থতায় রাজা যুদ্ধে ক্ষান্ত হন, এবং চীন ও তিব্বতের সীমানা পাকাপাকি ভাবে চিহ্নিত হয়।

ক্রমশঃ বৌদ্ধ বিরোধী দল প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহারাই র‍্যাল্পা-চ্যান্‌কে হত্যা করিল। তিব্বত সাম্রাজ্যও খণ্ডিত হইয়া গেল। পুনরায় স্ব স্ব দুর্গ ও সৈন্যসহ ছোট ছোট রাজ্য গড়িয়া উঠিল।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরুত্থান হইল ১০১৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময়ে মগধ হইতে আসিলেন পণ্ডিত ধর্ম্মপাল এবং তাঁহার তিন জন ছাত্র (তাঁহাদের উপাধি ছিল 'পাল')। তাহার পর অতীশ আসিলেন গয়া হইতে তিব্বতের ঙারিতে ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দে। তখন তাঁহার বয়স ৫৯। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মকে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন প্রধান লামা। একাদশ শতাব্দীতে পদ্মসম্ভব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত লামাধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। লামাগণই রাজনৈতিক ও পার্থিব বিষয়ে মাথা দিয়া কোনও কোনও ছোট রাজাকে পরাভূত করিয়া নিজেরাই রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। পশ্চিম-তিব্বতের শাক্য বিহারে প্রথম লামারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন ইউরোপ এশিয়ায় সুপ্রসিদ্ধ চেঙ্গিজ খাঁর প্রতাপ। তিনি তিব্বত জয় করিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে। মোঙ্গোলগণ এই প্রথম তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্পর্শে আসিল। ইহার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে কুবলাই খাঁ যখন চীনের সম্রাট্ তখন তিনি শাক্য মন্দিরের লামা, ফাগ্‌পা—লোদই গ্যায়াল্‌ট্‌স্‌নকে (বয়স ১৯ বৎসর) ডাকাইয়া পিকিং-এ আনাইয়া নিজের ধর্ম্মগুরুরূপে গ্রহণ করিলেন। ইহার পরিবর্ত্তে শাক্য বিহারের লামারাজকেই সমগ্র তিব্বতের অধিপতি এবং বৌদ্ধ জগতের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগুরু বলিয়া চীন সম্রাট্ স্বীকার করিয়া লইলেন। তিব্বতে লামা রাজত্ব চলিল প্রায় ৭৫ বৎসর যাবৎ (১২৭০ হইতে ১৩৪৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত)। এই শাক্য লামা-দিগের রাজত্বকালেই তাঁহারা মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম অথবা লামা-ধর্ম্ম মোঙ্গোলিয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

বহুদিন পরে শাক্য-লামার শাসনের অধোগতি আরম্ভ হইল। পরস্পর কলহ চলিতেই লাগিল। লামা ধর্ম্মের মধ্যেও অনাচার প্রবেশ করিল। তখন তিব্বতে ধর্ম্মসংস্কারের চেষ্টা সুরু হইয়াছে। এই সময়টা খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষাশেষি। উত্তর-পূর্ব্ব তিব্বত হইতে সোঙ্-কাপা নামক এক ব্যক্তি ভারতীয় ধর্ম্মগুরু অতীশের শিষ্য ব্রম্‌টনের সাহায্যে অতীশের প্রতিষ্ঠিত "কদম্-পা" সম্প্রদায়টিকে সংস্কৃত করিয়া উহার নাম দিলেন "গেলুক্-পা"। এই সম্প্রদায়ের লামাগণ বিবাহ করিতে পারেন না, মদ্যপান বা ধূমপানও করিতে পারেন না। কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া থাকিতে হয়। পদ্মসম্ভব-প্রতিষ্ঠিত ঞিঙ্-মা-পা সম্প্রদায়ের লামাগণ বিবাহ করিতে পারেন। তাঁহাদের জীবনযাত্রায় খুব বজ্র আঁটুনি

নাই। এই সম্প্রদায়ের সাধারণ নাম "ডুক্ পা"। পূর্বোক্ত সম্প্রদায়ের পোশাক হরিদ্রাবর্ণের, আর ডুকপা সম্প্রদায়ের পোশাক লাল। সোঙ্-কাপা গ্যানডেন ও শেরাতে বিরাট গোম্ফা বা বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠা করেন।

গেলুক্পা সম্প্রদায় শাক্য বিহারের ডুকপাদিগের চেয়ে বেশী সংযমী ও সঙ্ঘবদ্ধ ছিল। কাজেই পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইঁহাদের হাতে রাজ্যের ক্ষমতা আসিয়া পড়িল। পারমার্থিক ক্ষমতার দুইটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল, একটি লাসায়, অপরটি তাশিলুন্‌পোতে।

এই সময়ে তিব্বতের এক দরিদ্র মেষপালকের পুত্র ভাগ্যচক্রে ও সাধনার ফলে বড় বৌদ্ধ সাধক হইয়া উঠেন। তিনিই শেষে গেলুক্পা সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ লামা হন। তিনি ড্রেপুং-এর বিহার নির্মাণ করান। ড্রেপুং, শেরা ও গ্যানডেনের বিহারগুলির লামাগণই আজ পর্য্যন্তও শক্তিশালী এবং দেশশাসনে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন। তিব্বতের লোক বিশ্বাস করে এই গেলুক্পা সম্প্রদায়ের প্রধান লামা, গ্যান্-ডুন্-ড্রুপা তাঁহার জীবদ্দশাতেই বোধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহরক্ষার দুই বৎসর পরে তিব্বতবাসীরা বিশ্বাস করিল যে, একটি শিশু হইয়া তিনি পুনরায় জন্ম লইয়াছেন। এই শিশুই পুনরায় প্রধান লামা হইলেন। বোধিলাভ করিয়া পুনরায় জন্ম লইবার ধারা তিব্বতী বৌদ্ধ সমাজে এই প্রথম ঢুকিল এবং আজ পর্য্যন্তও চলিতেছে। এইরূপ ভাবে জন্ম লইয়া যিনি তৃতীয় লামা হইলেন—তাঁহার নাম সোনাম্ গ্যায়াট্সো। তিনি মোঙ্গোলিয়ার কয়েকজন রাজকুমার ও জনসাধারণের মধ্যে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া তাঁহাদিগকে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লন। ইঁহার ফলে তখনকার মোঙ্গোলিয়ার শাসক, আল্‌তান্ খাঁ সোনাম্ গ্যায়াট্সোকে "দলাইলামা বজ্রধর" উপাধি দিলেন। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত দলাইলামার ধারা ঐ প্রণালীতে চলিয়া আসিতেছে। এইজন্য দলাইলামাকে সজীব বুদ্ধ বলা হয়। অর্থাৎ তিনি বোধিসত্ত্বপদ্মপাণি এবং অমিতাভের পুনরাবির্ভাব এবং ৎসোঙ্গকাপার সর্বশক্তির উত্তরাধিকারী। পঞ্চম দলাইলামা ছিলেন লোব্‌জাঙ্গ গ্যাম্বাট্ সো। তিনি মোঙ্গোলদিগের সাহায্যে সমগ্র তিব্বতের সম্রাট্ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করিলেন, তিনিই তিব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 'চেন্-রে-সি'র অবতার। তিনি জ্ঞানী ও শক্তিশালী রাজা ছিলেন। পিকিং-এ গেলে চীন সম্রাট্ তাঁহাকে তিব্বতের স্বাধীন অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন।

পঞ্চম দলাইলামা লোব্‌জাঙ্গের বৃদ্ধ শিক্ষকও দ্বিতীয় অবতার বা দ্বিতীয় সজীববুদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া ট্যাশিলম্পুর মন্দিরে প্রধান লামার পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইঁহাকে পঞ্চেন্ রিম্‌পোচে বা পঞ্চেন্ লামা বা টাশিলামা বলা হয়।

কয়েক বৎসর পরেই অবতারবাদে বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তিব্বতের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ সুরু হয়; এবং অনেকেই

তিব্বতী দম্পতি। মেয়েদের পরিচ্ছদ, গহনা, চুলবাঁধার প্রণালী, শিরস্ত্রাণ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য

দলাইলামা হইবার জন্য সচেষ্ট হন। দেশের আভ্যন্তরিক বিক্ষোভের সুযোগ লইয়া তাতার দেশীয় মুসলমানগণ লাসা দখল করিয়া বিহার ও মন্দির সব লুঠ করে। তিব্বতীয়গণ হতাশ হইয়া চীন সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি তিব্বত জয় করিয়া পুনরায় দলাইলামাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন; কিন্তু এইবার দলাইলামা হইলেন কেবল পারমার্থিক গুরু। পার্থিব বিষয়ে ক্ষমতা গেল দুই জন চীন আম্‌বান্ বা রাজপ্রতিনিধির হাতে। তাঁহারাই হইলেন লাসায় সর্ব্বেসর্ব্বা। তিব্বত হইয়া পড়িল চীনের আশ্রিত রাজ্য। চীনের নীতি হইল যেন-তেন-প্রকারেন তিব্বতকে হাতের মুঠায় রাখা। ক্ষমতাশালী চীনসম্রাটের প্রতিনিধি পর পর নাবালক দলাইলামাকে সাবালক হইবার পূর্ব্বেই হত্যা করিয়া দেশ-শাসনের ক্ষমতা আমবানের হাতে রাখিতে লাগিলেন।

কিছুদিন যাইতে না যাইতেই তিব্বতে চীনের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব জাগিয়া উঠিল। সেই হইতে চীন ও তিব্বতের মধ্যে চলিয়াছে মনকষাকষি, এবং প্রভুত্বের জন্য নানারকম চালবাজি।

উনবিংশ শতাব্দীতে চীনের ক্ষমতা যখন কমিয়া আসিতেছিল তখন মোঙ্গোল ও তিব্বতীয়েরা মাথা চাড়া দিয়া উঠিল।

মোঙ্গোলরা কতকটা রুশ-ঘেঁষা হইয়া পড়িল। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন জাপানের কাছে পরাভূত হইল। বক্সার বিদ্রোহও নিবিয়া গেল। এই সুযোগে তিব্বত চীনকে অগ্রাহ্য করিয়া কার্য্যত: স্বাধীন হইয়া পড়িল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে

ফারিজং-এর পথে

ত্রয়োদশ দলাইলামা স্বাধীনভাবে তিব্বতের শাসন চালাইতে লাগিলেন। চীনের আধিপত্য নামেমাত্র রহিল।

এদিকে দক্ষিণে ভারতবর্ষ হইতে নূতন বিপদের মেঘ ঘনাইয়া উঠিল। ব্রিটিশ ভারত-সাম্রাজ্য নিরাপদ রাখিবার জন্য দার্জ্জিলিং, কালিম্পোং তাঁবে আনিয়া সিকিম ও ভুটান রাজ্যে প্রভাব বিস্তারের পর ভাবিতেছিল তিব্বতেও প্রভাব বিস্তার করা যায় কিনা। কারণ তিব্বতের সহিত সীমানা লইয়া প্রায়ই ইংরেজের মতান্তর হইতেছিল। কিন্তু তিব্বত সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান না থাকায় শরৎচন্দ্র দাস প্রভৃতি কয়েকজন ভারতীয়কে সর্ব্ববিধ সংবাদ সংগ্রহের জন্য ছদ্মবেশে তিব্বতে পাঠান হয়। চীন চায় না যে ইংরেজ তিব্বতের মিত্র হয় বা তথায় আসে। চীন তিব্বতকে বুদ্ধি দিল যে ইংরেজ তিব্বত দখল করিবার মতলবে আছে। ইহাতে উপস্থিত হইল আতঙ্ক। ঠিক এই সময়ে ডর্জ্জিফ্ নামে একজন তিব্বত-প্রবাসী রুশদেশীয় বৌদ্ধছাত্র দলাইলামাকে বুঝাইল, রুশের মত শক্তিশালী দেশ পৃথিবীতে আর নাই এবং বহু রুশদেশীয় লোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইতেছে। রুশ তিব্বতের খাঁটি মিত্র। এই ছাত্রটি ছিল রুশসম্রাটের একজন চর। তিব্বতের ব্যাপারে রুশ হস্তক্ষেপ করায় ইংরেজের পক্ষেও নিষ্ক্রিয় থাকা সম্ভবপর হইল না। তাই লর্ড কার্জ্জন ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কর্ণেল ইয়ং হাজ্ব্যাণ্ডের অধিনায়কত্বে তিব্বত অভিযান পাঠাইলেন। ইংরেজের সৈন্য লাসায় পৌঁছিয়া দেখিল যে দলাইলামা মোঙ্গোলিয়াতে পলাইয়া গিয়াছেন। এই সময়ে চীন গোপনে পঞ্চেন লামাকে তিব্বতের শাসনতক্তে বসাইয়া দুইয়ের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া তিব্বতকে দুর্ব্বল করিতে চেষ্টা করিল। পঞ্চেনলামা স্বীকৃত হইলেন না। কারণ তিব্বতে চীনের প্রভাব হ্রাস পাইতেছিল এবং তিব্বতীয়গণ চীনবিদ্বেষী হইয়া উঠিতেছিল।* যাহা হউক, তিব্বত ও ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে এইরূপ চুক্তি হইল—(১) গ্যাংচি, ইয়াটুং ও গার্টকে বাণিজ্য কেন্দ্র খোলা, (২) ক্ষতিপূরণ দেওয়া, (৩) ভারত ও তিব্বতের মধ্যে বাণিজ্যশুল্ক বন্ধ করা, (৪) ইংরেজের অনুমতি ছাড়া তিব্বতে কোনও ভূমি বিদেশী রাষ্ট্রকে লিজ বা অন্যভাবে না দেওয়া। আজ ইয়াটুং ও গ্যাংচিতে এক একটি করিয়া সরকারী ভারতীয় ট্রেড এজেন্ট ও ডাকঘর এবং মাঝপথে ফারিজং-এ একটি ডাকঘর আছে। গার্টকে সাময়িকভাবে ভারতীয় বাণিজ্যদূত বাস করেন।

দলাইলামা মোঙ্গোলদেশে উর্গাতে আসিলে পিকিংস্থ রুশদেশীয় দূত মি: পোকোটিলফ্ উর্গাতে আসিয়া রুশসম্রাটের উপঢৌকন প্রদান করিয়া দলাইলামাকে আশ্বাস দিলেন যে রুশের বন্ধুত্বে ও সাহায্যে তিব্বত নির্ভর করিতে পারে। দলাইলামা খুশী হইয়া রুশের সাহায্য চাহিয়া দেশে ফিরিয়া চলিলেন। চীন তাঁহার তিব্বত যাওয়ায় বাধা দিল। যখন তিনি জানিলেন যে, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ইংরেজ-রুশ চুক্তি অনুসারে রুশ আর তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারে না তখন হতাশ হইয়া দলাই-লামা ইংরেজের শরণাপন্ন হইলেন। জয় হইল ইংরেজের চালবাজির। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে দলাইলামাকে দেশে ফিরিবার অনুমতি দিয়া সুচতুর চীন দ্রুত তিব্বত আক্রমণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব-তিব্বত দখল করিয়া লাসাতে দলাইলামাকে বন্দী করিবার জন্য ব্যগ্র হইল। সেই খবর পাইয়া দলাইলামা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ভারত আশ্রয়ে পলাইয়া আসিলেন। এইবারও (১৯১০ খ্রী:) চীন দলাইলামাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পঞ্চেন-লামাকে সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করিল। এবারও তিনি

* এখন সংবাদপত্রে এক পঞ্চেনলামার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তিনি যথার্থ পঞ্চেনলামা নহেন। পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চেনলামা দেহরক্ষা করার পর কোথায় তিনি পুনর্জ্জন্ম লন তাহা তিব্বতের লামাগণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। চীন নিজের পছন্দমত এক নাবালককেই পঞ্চেন লামা বলিয়া চালাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। তিব্বত হইতে কতবার চীনকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে, বালককে তিব্বতে পাঠান হউক, যথারীতি পরীক্ষিত হইয়া স্থির হউক যে, পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চেনলামা এই বালকের ভিতর পুনর্জ্জন্ম লইয়াছেন কিনা। কিন্তু চীন তাহাতে রাজী না হইয়া নিজেরাই ঐ বালককে পঞ্চেনলামা বলিয়া অভিষিক্ত করিয়া লইয়াছে। তাঁহাকে তিব্বতে আসিতেও দেয় নাই। ইহা হইল রাজনৈতিক চালবাজি।

রাজী হইলেন না। তাহার ফলে চীন পূর্ব্বসীমান্ত হইতে পশ্চিমে লাডাকের কাছাকাছি গার্টক পর্য্যন্ত তিব্বত দখল করিল। দলাইলামা নেপালের মহারাজা, ইংরেজ ও রুশসম্রাট জারের নিকট সাহায্যের জন্ত অনুরোধ করিয়াও বিফলমনোরথ

কুলীদিগের চায়ের মজলিশ

হইলেন। অবশেষে দলাইলামা তিব্বতে তাঁহার কয়েকজন চর পাঠাইলেন। তাঁহারা চীনের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহের জন্ত জমিন তৈয়ারী করিল। এত বড় চীনসাম্রাজ্যকে পর-রাজ্যে বসিয়া পরাভূত করা কি স্বপ্নস্বরূপ নহে? কিন্তু অঘটন ঘটিল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ সান্-ইয়াট্ সেনের নায়কত্বে চীন-সম্রাটের বিরুদ্ধে চীনের জনগণের বিদ্রোহ ঘোষিত হইল। সুযোগ বুঝিয়া তিব্বতের চীন কর্ম্মচারীদিগকে যুদ্ধে হারাইয়া তিব্বতের জনগণ পুনরায় স্বাধীন হইল। দলাইলামা ভারত হইতে ফিরিয়া আসিলেন লাসায়।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে তিব্বত স্বাধীন দেশ বলিয়াই স্বরাজ ভোগ করিতেছে। চীন ও লাসার মধ্যে অনেকটা বন্ধুত্বভাব জমিয়া উঠিয়াছিল। তিব্বতে চীন গবর্ণমেন্টের স্বার্থ দেখিবার জন্য কয়েকজন নিম্নস্থ কর্ম্মচারীসহ একজন চীন অফিসার লাসায় আছেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সন্ধিসূত্রে নেপাল রাজের প্রতিনিধি তিব্বতে আছেন। ব্রিটিশের এবং তৎপরে ভারতের প্রতিনিধিও তথায় আছেন ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে। ১৯৩৬ সন হইতে লাসাতে একটি ব্রিটিশ মিশনও আছেন। ভারত স্বাধীন হইবার পর উহাই হইয়াছে তিব্বতে ভারতীয় মিশন। আমাদের জাতীয় পতাকা এখন ঐ মিশনের এলাকায় উড়িতেছে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে তিব্বত ও ভারতের বন্ধুত্বও জমিয়া উঠিয়াছে।

এক দিকে যেমন তিব্বত হইতেছিল সংহত ও স্বাধীন, অপর দিকে চীনে মাঞ্চু সাম্রাজ্য ভাঙিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। তিব্বত মনে করিল মাঞ্চুসাম্রাজ্যের পতনের পর চীন ও তিব্বতের মধ্যে পূর্ব্ব রাজনৈতিক সম্বন্ধও আর রহিল না। কিন্তু চীন আদর্শে গণতন্ত্রী হইয়া কাজে সাম্রাজ্য-বাদী রহিল। পূর্ব্ব-তিব্বতের দুই-একটি করিয়া দেশ দখল করিতে লাগিল। এইবার দলাইলামা ইংরেজের পরামর্শ লইয়া চালবাজির খেলা খেলিতে সুরু করিলেন, কিন্তু সুবিধা হইল না। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম চীনের স্থানীয় নেতাগণ তিব্বতীয়দিগকে যুদ্ধে হারাইয়া পূর্ব্ব তিব্বতের বহু দেশ নিজেদের দখলে আনিলেন। চীনগণতন্ত্র তিব্বতের এই সব দেশকে দিয়া দুইটি প্রদেশ গড়িয়া তুলিলেন—(১) চিংঘাই (উত্তর-পশ্চিমে); (২) খাম্ বা সিকাঙ্ (দক্ষিণ-পশ্চিমে)। চিংঘাই-এ চীনা মুসলমানের বসতিই বেশী। মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণের ফলে এবং তুর্কীদিগের সহিত বিবাহ করিয়া চীনা-মুসলমান সম্প্রদায় সিংকিয়াং-এর মুসলমান তুর্কী এবং চীনের বৌদ্ধ চীনাগণ হইতে বিভিন্ন প্রকারের হইয়াছিল। তাহারা বসবাস করিল তিব্বত-মোঙ্গোল বাণিজ্যপথের পাশাপাশি। ফলে দুই দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বাধা সৃষ্টি হইল। এই চীনা মুসলমানের ভিতর শ্রেষ্ঠ সৈন্ত গড়িয়া

চুম্বি উপত্যকায় আমোচু নদী

উঠিল। ক্রমশঃ তিব্বত, মোঙ্গোল ও সিংকিয়াং এবং তুর্কীদিগের মত ইহাদেরও স্বাধীনতালিপ্সা জাগিয়া উঠিল। তিব্বতের পশ্চিমে কাশ্মীরে, উত্তরে সিংকিয়াং এবং পূর্ব্বে চিংঘাই প্রদেশগুলিতে মুসলমানের আধিক্য। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে লাসাতে এক চীনা মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মিশনের সঙ্গে রহিল বেতার ষ্টেশন, ছাপাখানা, চীনা স্কুল ও সশস্ত্র রক্ষী ইত্যাদি। অবস্থা বুঝিয়া একটি ব্রিটিশ ভারতীয় (আজ যাহা ভারতীয়) মিশনও লাসায় বসিল।

এদিকে চীনে মার্কসবাদ শিকড় গাড়িতেছে দেখিয়া তিব্বতের হইল আতঙ্ক। তাহারা চীনের অধীনতার নাগপাশ হইতেও ইহাকে অধিকতর বিপদের বিষয় মনে করিল।

ইয়াটুং-এ বন্যা-বিধ্বস্ত পল্লীর অবশিষ্ট কয়েকটি ঘর

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিল। ত্রয়োদশ দলাইলামা দেহরক্ষা করিলেন। তিব্বতের নূতন দলাইলামা কে হইবেন তাঁহাকেও চীনের এলাকাধীন পূর্ব্ব-তিব্বতে খুঁজিয়া পাওয়া গেল। তাঁহার অভিষেক হইল ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া দখল করিয়া ব্রহ্মদেশও জয় করিল। চীন-ব্রহ্মদেশ পথটি দিয়া চীনে আর কিছু পাঠানো সম্ভব হইল না। চীন কোণঠাসা হইয়া গেল। এই যুদ্ধে চীনের মিত্রগণ উহাকে সাহায্য করিবার জন্য নানা ফন্দি-ফিকির খুঁজিতে লাগিলেন।

কম্যুনিষ্ট যখন চিংধাই প্রদেশ আক্রমণ করিল তখন তিব্বত কলহ ভুলিয়া চীনকে সাহায্য করিল। কম্যুনিষ্টদিগের এই অভিযানে ক্ষতিও হইল যথেষ্ট, এবং অবশেষে হটিতেও হইল।

ইতিমধ্যে চীনের সহিত জাপানের বিরোধ বাধিয়া উঠিল। জাপান অন্তর্মোঙ্গোলিয়া দখল করিয়া তথায় চীনবিদ্বেষী প্রদেশ-পালের অধীনে গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিল। ইহার দক্ষিণে পড়িল চীনা কম্যুনিষ্টগণ। ফলে তাহারা সোভিয়েট রুশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। সোভিয়েট রুশিয়াও তাহাদিগকে সাহায্য করার আশা ছাড়িয়া দিল। তাহারা নিজ শক্তির বলেই বাঁচিয়া রহিল। সোভিয়েট রুশিয়ার তিব্বতে প্রবেশের আশাও আর রাখিল না। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বন্ধুত্বের চুক্তি করিয়া সোভিয়েট মোঙ্গোলিয়াতেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। সেখানকার জনগণ স্বাধীনতালাভ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিল সোভিয়েট রুশিয়ার হুকুমদার গবর্ণমেণ্ট। ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্মেও ভাটা পড়িল।

পশ্চিমে সিংকিয়াঙে সোভিয়েট রুশিয়া নিজেদের ইচ্ছামত গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজেদের সৈন্য মোতায়েন রাখিয়া সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিল। ব্রিটিশ-ভারত প্রমাদ গণিয়া কাশগড়ের মুসলমানদিগের সাহায্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করাইল। তিব্বত মনে করিল এত বড় কুয়েনলুন্ পর্ব্বতমালা যখন পথ আগলাইয়া আছে তখন ঐ পথে সোভিয়েট তিব্বতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

জাপান ক্রমশঃ চীনের বহু দেশ দখল করিতে লাগিল। চিয়াং-কাইশেক মনে করিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিলেই তাঁহার হইবে কিস্তিমাত। মধ্য এশিয়ায় ও তিব্বতে তিনি ক্ষমতা বিস্তার করিবেন।

পশ্চিমে রুশিয়া জার্ম্মানীর সহিত যুঝিতে ব্যস্ত। চীন-তুর্কীস্থানের ভিতর দিয়া চীনকে সাহায্য করা রুশিয়ার পক্ষেও সম্ভব হইল না। চীনকে সাহায্যের একমাত্র পথ রহিল ভারত-তিব্বতের মধ্য দিয়া। আমেরিকা লাসায় এক মিশন পাঠাইল। তাঁহারা ভারত-তিব্বত-পশ্চিমচীনের ভিতর দিয়া চীনকে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলেন। আমেরিকানরা বুঝিতে পারিল তিব্বত সুশাসিত স্বাধীন দেশ; এবং ভবিষ্যতে ইহাই হইবে আকাশ-যানের একটি বড় ঘাঁটি। তিব্বত সম্বন্ধে তাহাদিগের এই মনোভাব চিয়াং-কাইশেকের ভাল লাগিল না।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কিংবা উহার কাছাকাছি সময়ে চীনের কম্যুনিষ্ট সৈন্যগণ চীনের জাতীয় সেনাদলের সহিত মিশিয়া গেল। ইহার ফলে জাপান-অধিকৃত চীনের অংশে কম্যুনিষ্ট প্রভাব বাড়িল।

যুদ্ধের সময়ে রুশিয়া যখন জার্ম্মানীর কাছে হারিতেছিল তখন চিয়াং-কাইশেক চীনা তুর্কীস্থানে (সিংকিয়াং) রুশিয়ার প্রভাব নষ্ট করিয়া দিয়া নিজের ইচ্ছামত গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন। রুশিয়ার তখন উপায়ান্তর ছিল না। তাই সে কাজাক বিদ্রোহ সৃষ্টি করিয়া উত্তর সিংকিয়াঙের তিনটি জেলা নিজ তাঁবে আনিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চীনাতুর্কীর জাতীয়তা-বোধকে চীনা-বিদ্বেষের কাজেও লাগান হইল।

ইহার পরেই চিয়াং-কাইশেক তিব্বত অধিকারে আনিবার জন্য পুনরায় মন দিলেন। পশ্চিমচীনের চিংধাই ও সিকাঙ প্রদেশের গবর্ণর দুই জনকে তিব্বত আক্রমণের আদেশ দিলেন। সিকাঙের প্রদেশপাল ত আদেশ পালনে অস্বীকারই করিলেন। আমেরিকা হইতে যে সকল যুদ্ধোপকরণ অনেক কষ্টে চিয়াং-কাইশেককে দেওয়া হইয়াছিল জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার জন্য, তিনি উহারই কতক অংশ পাঠাইলেন চিংধাইতে তিব্বত

আক্রমণ করিতে। চিংহাই-গবর্ণর জয়কুণ্ডের (চীন-তিব্বত সীমান্তে) কাছে একটা নামমাত্র আক্রমণ করিয়া থামিয়া গেলেন। তিব্বতের রিজেণ্ট ও জাতীয় পরিষদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া বোধ হয় চীন-প্রদেশপালের চেষ্টা থামিয়া গেল। চীনের তিব্বত-জয়ের সুযোগও নষ্ট হইয়া গেল।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান যখন হারিয়া গেল তখন সোভিয়েট রুশিয়া মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া চীনের কম্যুনিষ্ট-দিগের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্রমশঃ চীনে কম্যুনিষ্টগণ বাহুবলে দেশ-শাসনের ভার লইলেন। চিয়াং-কাইশেকের পতন হইল।

এদিকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত স্বাধীন হইল। ইংরেজ ভারত ত্যাগ করিল। স্বাধীনতালাভের পর খণ্ডিত ভারতের কতকটা দুর্ব্বলতা আসিবেই। একে একে ব্রহ্মদেশ, লঙ্কাদ্বীপও স্বাধীনতালাভ করিল। তিব্বতের ডেক্যি লিঙকাতে ব্রিটিশ-ভারতীয় মিশন থাকিত। এখন মধ্য-এশিয়া ও হিমালয়ে অবস্থিত জাতিগুলির রক্ষার ভার পড়িল ভারতের উপর। তিব্বত এতকাল শক্তিশালী ব্রিটিশ-ভারতের নিকট যে সাহায্য নানাভাবে পাইয়া আসিতে-ছিল স্বাধীন ভারতের নিকট ঠিক সেই সাহায্য আশা করিতে পারে কি? তিব্বতের সমস্যা—খণ্ডিত দুর্ব্বল ভারতের সঙ্গে যোগ রাখিয়া ভবিষ্যতে তাহার সাহায্যের উপর নির্ভর করিবে, না তাহার স্বাধীনতা পৃথিবীর বড় বড় শক্তিশালী জাতিগুলির দ্বারা স্বীকৃত করাইয়া লইবে?

তিব্বতের বর্ত্তমান কর্ণধারগণের মধ্যে এই বিষয়ে দুইটি দল আছে। এক দলের আশা—নেহরু গবর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ-ভারতের নীতিই পালন করিবেন; চীন ও কম্যুনিজম্ হইতে তিব্বতকে রক্ষা করিতে পারিবেন। অপর পক্ষ মনে করেন, খণ্ডিত দুর্ব্বল ভারতের নিজেরই বা ভবিষ্যৎ কি তাহা কে জানে? বর্ত্তমান ভারতের সাহায্যের উপর নির্ভর করা সমীচীন হইবে না। তিব্বতীয় সেনাকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া নিজেদের পায়ে দাঁড়াইয়া শক্তিশালী হওয়া দরকার। পৃথিবীর বড় বড় জাতিগুলির সহিত যোগ রাখিয়া ইউনাইটেড নেশ্যনস্-এর সদস্তশ্রেণীভুক্ত থাকাই ভাল।

তিব্বত যদি আকাশযানের ঘাঁটি হয়, তাহা হইলে পাকি-স্থান, চীন, রুশিয়া, নেপাল, সিকিম, ভুটান, আবর ও মিশমি পাহাড়, আসাম, কাশ্মীর কোন অঞ্চলই বেশী দূরে হইবে না। এই প্রকার দেশ যে শক্তিশালী জাতির তাঁবে থাকিবে তাহার পক্ষে সমগ্র এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার করা সহজ হইবে। সুতরাং সমগ্র এশিয়ার উপর নজর রাখিয়া সোভিয়েট রুশিয়া যদি চীনা তুর্কীস্থানে এবং কম্যুনিষ্ট চীন যদি তিব্বতে পা বাড়ায় তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে কূট-নীতি হিসাবে উহা ভুল হইবে কি?

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে চীনের তিব্বত আক্রমণের উদ্দেশ্য বুঝা সহজ হইবে। এই প্রসঙ্গে পূর্ব্ব-তিব্বত ও পশ্চিমচীনের সীমানা সম্বন্ধেও মোটামুটি ধারণা থাকা দরকার। মানচিত্রে দেখিতে পাইবেন আসামের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে তিব্বতের চংরেঙ মঠ। ইয়াংৎসি নদীর প্রায় ৫০ মাইল পশ্চিমে তিব্বতের চামডো শহর। এ স্থানটি লাসা হইতে চীনের টচিয়েনলু পর্য্যন্ত বাণিজ্যপথের ধারে অবস্থিত। এখানে তিব্বতীয় সৈন্যের একটি ঘাঁটি আছে। ১৯৪৭ হইতে চামডোর শহরতলীতে একটি বেতার ষ্টেশনও খোলা হইয়াছে। নদীর অপর পারে চীন অধিকৃত পূর্ব্বতিব্বতস্থ বাটাং শহরে চীনা সৈন্যের ঘাঁটি আছে। চামডোর উত্তরে ৎসাঙনে গিরিবর্ত্ম দিয়া কোকোনর হ্রদ হইয়া মোঙ্গোলিয়ায় যাওয়া যায়। এই পথের মাঝে জয়কুণ্ড শহর। এখানে আছে জেনারেল মা-পু-ফাং-এর দুর্দ্ধর্ষ চীনা মুসলমান সৈন্যের সমাবেশ। এই সেনানী লক্ষ্য করিয়া তিব্বত গবর্ণমেণ্ট নাগচুকাতে সৈন্য বসাইয়াছেন। চংরেঙ মঠ হইতে আসামে আসিতে হইলে পথে পড়ে জঙ্গলময় প্রদেশ (যাহা পণ্ডিত নেহেরু পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন উহা ভারতের, কিন্তু চীনা গবর্ণমেণ্ট নিজেদের মাপে দেখায় তাহাদের বলিয়া, আর এতকাল তিব্বত করিত জোর করিয়া খাজনা আদায়), তাহার পরেই আবর ও মিশমি পাহাড়। খাস আসামে আছে পেট্রল। কাজেই উত্তর-পূর্ব্ব সীমানায় ভারতকে যথেষ্ট সজাগ থাকিতে হইবে। নেপাল, কাশ্মীর ও ভুটানের ত চিন্তা আছেই।

যে উদ্দেশ্যেই চীন তিব্বত আক্রমণ করুক, স্বাধীন ভারতের গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দ্রুত কাজ করিবার সময় আসিয়াছে। এখন আমাদের সমাজ-সংহতি, নৈতিক উচ্চমান, স্বদেশীয় সংস্কৃতিপ্রীতি ও স্ব-ধর্ম্মমতের দৃঢ়তা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলায় ঐতিহাসিক গবেষণার সমস্যা

শ্রীযদুনাথ সরকার

ভারতের ইতিহাসে গবেষণা করিবার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আমার মনে প্রথম জেগে উঠে, বি-এ পরীক্ষা দিবার পরই, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। আর আজ সে দিন হইতে ষাট বৎসর পরে এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমাদের দেশে ঐতিহাসিক গবেষণার কি প্রগতি হয়েছে তা বিচার করিবার অবসর পেয়েছি। এই ষাট বৎসরে বাংলা দেশে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে তাহা তুলনা করিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাই। আমাদের দেশের প্রবীণ লেখক ও নবীন গবেষক ছাত্র ইতিহাস-চর্চ্চার প্রণালীতে এবং রচিত ইতিহাসের উৎকর্ষে আশ্চর্য্য উন্নতি সাধন করেছেন এবং সে উন্নতি এ পর্য্যন্ত ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এই সব কর্মী বছর বছর উচ্চ হইতে উচ্চতর, কঠিন হইতে কঠিনতর স্তরে উঠেছেন।

দু' একটা দৃষ্টান্ত দিলেই এই সত্যটি পরিষ্কার বুঝান যাবে। বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের আদি যুগের কর্মী কৃষ্ণবিহারী সেন অথবা রামদাস সেনের লেখার পাশে আজ-কার দিনের বেণীমাধব বড়ুয়া অথবা প্রবোধচন্দ্র বাগচীর রচনা রাখা যাউক। অথবা ব্রিটিশ-যুগের ইতিহাসে রজনী গুপ্ত এবং অক্ষয় মৈত্রেয়র গ্রন্থ ও প্রবন্ধের পাশে আমাদের সমসাময়িক ব্রজেন বন্দ্যো ও অন্যান্য নবীন গবেষকের শ্রমফল বসাইয়া বিচার করা যাউক। প্রাচীন হিন্দু-যুগের গবেষণার সেই সেকালে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদিত বৃহদ্দেবতা ও ললিত-বিস্তরের সঙ্গে ত্রিশ বত্রিশ বৎসর পরে অধ্যাপক ম্যাকডনেল-সম্পাদিত বৃহদ্দেবতা এবং লিউমান-সম্পাদিত ললিতবিস্তর তুলনা করা যাউক।

অথচ ইংরেজী শিক্ষার সেই প্রথম যুগের ভারতীয় গবেষক-গণ প্রত্যেকে অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন এবং যথাসাধ্য শ্রমও করেছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের শ্রমফল জগতের পণ্ডিত-সভায় খাঁটি জিনিষ বলিয়া স্থান অধিকার করিতে পারে নাই, পরবর্তী কর্মীদের রচনা তাহা বাতিল করিয়া দিয়াছে।

এই পার্থক্যের কারণ দুটি। প্রথমত: বর্ত্তমানের কর্মীরা এক ভিন্ন প্রণালী মেনে চলে, এবং দ্বিতীয়ত: এখন আমাদের হাতে যে ঐতিহাসিক উপাদান এসে জমা হয়েছে তাহা রাম-দাস সেন বা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের যুগ থেকে অনেক বেশী, ফলে তাঁহারা ও আমরা যেন দুটি ভিন্ন দেশের, ভিন্ন যুগের লোক। এখন আর সিয়ার-উল-মুতাখরীনের হাজী মুস্তাফা-কৃত ইংরেজী অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া আলীবর্দী ও সিরাজ, মিরজাফর ও নবাব কাসিম আলীর ইতিহাস লেখা চলে না।

গবেষণার এই নবীন প্রণালীর দুইটি ধারা—প্রথমটি এই যে, গবেষককে একেবারে আদিতম ঐতিহাসিক উপাদান অর্থাৎ দলিলে পৌঁছিতে হবে। সর্ব্বপ্রথম সাক্ষীর এজাহার যত দূর সম্ভব বাহির করিতে হইবে এবং তাহা আদি ও অ-বিকৃত আকারে, অর্থাৎ সাক্ষীর নিজের কথাগুলি পড়িতে হইবে, তাহার অনুবাদ বা পরবর্তী কালের অন্য লেখকের গ্রন্থে দেওয়া সংক্ষিপ্তসার পড়িলে চরম সত্যে পৌঁছান যায় না। আমাদের মধ্যে প্রথম যুগে বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চা আরম্ভ হয়, বির্নুফ যে সংস্কৃত হইতে ফরাসী অনুবাদ এবং সঙ্কলন প্রকাশ করেন অথবা কাউএল ও রিজ্‌ডাভিডস্‌ পালি গ্রন্থের যে ইংরেজী অনুবাদ ছাপাইয়াছেন তাহার উপর নির্ভর করিয়া। সে প্রণালী এখন অচল হয়েছে। আমাদের হালের গবেষকগণ আদি পালি এবং নেপাল ও মধ্য-এশিয়ায় পাওয়া সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য না পড়িয়া এক কথাও লিখিতে পারেন না।

তেমনি মুঘল ইতিহাসের ক্ষেত্রেও। খাফি খাঁ তাঁহার ইতিহাস হায়দরাবাদে বসিয়া ১৭৩৪ সালে সমাপ্ত করেন। শাহজহান (রাজত্ব শেষ ১৬৫৮ সালে) এবং আওরংজীব (মৃত্যু ১৭০৭ সালে) এই দুই বাদশা সম্বন্ধে খাফি খাঁ প্রত্যক্ষ-দর্শী নহেন; অথচ যেহেতু খাফি খাঁর পার্সী ইতিহাসের এই অংশটা এলিয়ট ও ডসন ইংরেজীতে অনুবাদ করে ছেপেছেন, অতএব আমাদের সেকালের কর্মীদের এই অনুবাদের উপর নির্ভর করা ভিন্ন পন্থা ছিল না। কিন্তু ইহাতে মৌলিক গবেষণা হইতে পারে না। ঐ দুই বাদশার হুকুমে লিখিত পার্সী ইতিহাসই আদি উপাদান। অবশ্য তাহার মধ্যে খোশামোদ ও অতিরঞ্জনের সম্ভাবনা পদে পদে বিচার করিয়া, কষ্টিপাথরে ঘষিয়া তবে খাঁটি সত্য লাভ করিতে হইবে। কিন্তু ঐ বাদশাহের সরকারী ইতিহাস, অর্থাৎ পার্সী বাদশানামা, আলমগীরনামা ইত্যাদি পর্য্যন্ত আদিতম উপাদান নহে; এগুলি পরে রচিত গ্রন্থ। তাদের ভিত্তি অপর এক শ্রেণীর পার্সী দলিল, যাহার নাম আখ্‌বারাৎ অর্থাৎ হাতে লেখা সংবাদপত্র, এবং ডেস্‌প্যাচ্‌ অর্থাৎ কর্ম্মচারীদের পক্ষ হইতে পাঠানো রিপোর্ট বা চিঠি। এগুলি বাদশাহী দপ্তরখানায় জমা রাখা হইত, এবং ইহা পড়িয়া ঐসব 'নামা' বা সরকারী ইতিহাসের লেখক তাঁহাদের গ্রন্থের তথ্য সংগ্রহ করিতেন, যেমন আজকাল সব দেশে সরকারের পক্ষ হতে গত দুই বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস সঙ্কলন করা হচ্ছে। আমি আওরংজীবের রাজ্য-কালের এবং অষ্টাদশ শতাব্দী ধরিয়া, মারাঠা আবদালী শিখ রাজপুতদের দিল্লীর তখ্‌ৎ ঘিরিয়া সন্ধি-বিগ্রহের সহস্র সহস্র আখ্‌বারাৎ ও পত্র সংগ্রহ করিয়া কাজে লাগাইয়াছি।

এই হ'ল ইতিহাস-রূপিণী ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে অক্লান্ত যাত্রা। তার পর, নবীন প্রণালীর দ্বিতীয় ধারা হচ্ছে এই যে, সবগুলি সাক্ষীকে একত্র করতে হবে। যত বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন স্থানে, আমার নির্বাচিত বিষয়ের উপাদানগুলি আছে তাহা সংগ্রহ করে পড়তে হয়, ভিন্ন ভিন্ন দলের সাক্ষীর জবানবন্দীর ঘাতপ্রতিঘাত সন্দেহের চোখে নিরপেক্ষভাবে বিচার করে তবে প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করা যায়। যেমন, ভাওয়াল-সন্ন্যাসীর মোকদ্দমায় সবজজের সামনে কুমারের পক্ষে এক হাজার এবং রাণীর পক্ষে ১১৯ জন সাক্ষী—অথবা ঐমত—ডাকা হয়। যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত একতরফা বিচারের রায় মাত্র তাহা স্থায়ীভাবে গৃহীত হতে পারে না।

এইরূপে সব দেশ থেকে সব ভাষায় লেখা ঐতিহাসিক মালমসলা সংগ্রহ করবার সুযোগ আজকাল যেমন হয়েছে তাহার দশ ভাগের এক ভাগও ষাট বৎসর আগে ছিল না। এর কারণ এখন একরকম খুব শস্তা ফটোগ্রাফ হয়েছে যাহাতে বিলাতের দুষ্প্রাপ্য বই বা হস্তলিপির অবিকল ছবি আমরা এদেশে বসে আনাতে পারি, এগুলিতে হাতে নকল করার ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা ও বিরাট ব্যয় নাই। আর জগতে যত বিখ্যাত গ্রন্থাগার আছে তাহাদের মুদ্রিত গ্রন্থ ও হস্তলিপি, শিলালিপি, মুদ্রা প্রভৃতির অতি বিস্তৃত বর্ণনাপূর্ণ তালিকা ছাপা হয়েছে। এই সব *Catalogue raisonne*গুলি পর্যন্ত আশ্চর্য শিক্ষাপ্রদ।

বিগত ষাট বছরে আমাদের মধ্যে মৌলিক গবেষণায় এত উন্নতি হয়েছে, তাহা যে ইউরোপীয়দের শিক্ষা, দৃষ্টান্ত ও সংঘর্ষের ফলে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। ভারত স্বাধীন হওয়ার ফলে এই ইউরোপীয় শিক্ষা ও সংঘর্ষ বন্ধ হইয়াছে। এই রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে আমাদের মধ্যে ঐতিহাসিক গবেষণার উৎকর্ষ যাহাতে দিন দিন নিকৃষ্ট এবং অবশেষে বিনষ্ট হইয়া না যায়, সেদিকে আমাদের শিক্ষক ও চিন্তারাজ্যের নেতাদের সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ গবেষণার জীবনমন্ত্র হচ্ছে ক্রমোন্নতি, eternal progression; এই রাজ্যে কোথায়ও পৌঁছিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বসিয়া থাকিবার, ঘুমাইবার সাধ্য নাই; থামিলেই অবনতি, এবং পশ্চাদ্‌গমনেই মৃত্যু। সেইজন্ত আমাদের দেশে মৌলিক গবেষণাকে স্থায়ী এবং প্রাণবন্ত করিতে হইলে দুটি জিনিষ চাই—গুরুপরম্পরা ও গ্রন্থভাণ্ডার। অর্থাৎ যতটুকু জ্ঞান আজ পর্যন্ত লাভ করিয়াছি তাহা চালাইবার, বাড়াইবার জন্য আমাদের পুত্রপৌত্রদের মধ্য হইতে ক্রমাগত নেতা সৃষ্টি করিতে হইবে। জ্ঞানের প্রদীপ একবার নিবিলে আবার জ্বালান কঠিন।

এই সব গুরু ও তাঁহাদের শিষ্যগণ মাতৃভাষা ও বিশ্বভাষা (অর্থাৎ ইংরেজী) ছাড়া আবশ্যকমত আর কোন কোন ভাষা শিখিতে বাধ্য। মরাঠী ও পার্সী ভাষা না জানিলে মহারাষ্ট্রের এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর দিল্লী-সাম্রাজ্যের ইতিহাসে গবেষণা মৌলিক হইতে পারে না, সত্যফলপ্রদ হইতে পারে না। এক শিবাজীর জীবনী রচনা করিতে গিয়া আমাকে ভাল করিয়া পার্সী ও মরাঠী ভাষা, এবং কাজ চলার মত পোর্তুগীজ ও ফরাসী ভাষা শিখিতে হয়, তা ছাড়া ইংরেজী, সংস্কৃত ও রাজস্থানী ডিঙ্গল ভাষা ত আছেই।

দ্বিতীয় সমস্যা, উপকরণের পুঁজী, অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর এবং পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরী এদেশে আমাদের হাতের কাছে রাখিতে, গড়িতে হইবে। এই সব গবেষণার লাইব্রেরীতে হস্তলিপি ও দলিলের ত কথাই নাই, ছাপান প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, পণ্ডিত-সমিতির পত্রিকার ধারাবাহিক সেট, প্রামাণিক এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বা বিশ্বকোষ, যেমন *Encyclopædia of Islam* ৪ ভলুমে সম্পূর্ণ—যাহা এখন আড়াই হাজার টাকায়ও পাওয়া যায় না, এলিয়ট ও ডসন ৮ ভলুম—যাহার দাম এখন এক হাজারে পৌঁছিয়াছে অথচ দু-তিন বৎসর পরেও এক সেট বাজারে দেখা দেয় না—এবং বিস্তৃত ম্যাপ সংগ্রহ, ও জগতের সব বিখ্যাত লাইব্রেরীগুলির হস্তলিপির ও মুদ্রার কেটেলগ, এ সমস্ত জুটাইয়া পূর্ণাঙ্গ করিতে হইবে। গবেষণার কাজে এরূপ পূর্ণাঙ্গ reference libraryর যে কত মূল্য তাহা অনেকে জানেন না। সেই ভুক্তভোগী গবেষক ছাত্র যে কাজ করিতে করিতে একখানা দুষ্প্রাপ্য হস্তলিপি বা পুরাতন মুদ্রিত পুস্তকের অভাবে হঠাৎ বাধা পাইয়াছে, এবং কোন কূলকিনারা দেখিতে পাইতেছে না, সেই জানে।

পুণার মহারাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয় দু'বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। এখানে প্রধানতঃ হিন্দু-যুগের ইতিহাস ও সাহিত্যে গবেষণা হইবে। সুতরাং তাঁহারা অধ্যাপক দেবদত্ত ভাণ্ডারকরের ব্যক্তিগত গ্রন্থ ও পত্রিকা-সংগ্রহ বত্রিশ হাজার টাকায় কিনিয়া কলিকাতা হইতে পুণায় লইয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ এই ক্ষেত্রে কাজ আরম্ভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আমেরিকার সিরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয় জগদ্বিখ্যাত জর্মান ঐতিহাসিক রন্‌কের সমস্ত লাইব্রেরী—পুস্তক, হস্তলিখিত পুঁথি, তাঁর নিজ হাতে লেখা নোট, তর্জমা ও সংক্ষিপ্তসার, এমন কি খণ্ড খণ্ড কাগজ পর্যন্ত কিনিয়া বার্লিন হইতে মার্কিন দেশে লইয়া গিয়া, তাহা সাজাইয়া তালিকা বাহির করিতেছে, গবেষকগণ ঐ শহরে ছুটিয়া যাইবে। আর ভারতের কি দশা, তাহা আমিই জানি, যখন আমার নিজস্ব লাইব্রেরীর সাহায্য লইবার জন্য ব্যাকুল অসহায় গবেষকগণ আমাকে চিঠি লেখে। আমার লাইব্রেরী কোন কোন বিভাগে ভারতবর্ষে অতুলনীয় হইলেও এটা একজন মধ্যবিত্ত লোকের গড়ে তোলা, একটা ব্যক্তিগত নিজস্ব সম্পত্তি। আমরা চাই কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠানে সর্বসাধারণের জন্য এরূপ সংগ্রহ রাখা।

১৯১১ সালে রবীন্দ্রনাথ একবার কাশীতে যান।

সেখানকার বঙ্গসাহিত্য সভার অভ্যর্থনার উত্তরে তিনি একটি মর্মান্তিক দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন—"আমরা কি চিরদিনই ইউরোপের কাছে ঋণী থাকব? চিরকালই কি তাদের কাছে ভিক্ষা চাইব? আমাদের সৃষ্টি-করা কিছুই কি বিশ্বজগৎকে দিতে পারব না? আমাদের দেশে অনেক উচ্চ-শিক্ষিত এলোপাথিক ডাক্তার আছেন, যাঁদের মধ্যে প্রত্যেকে লক্ষ টাকার বেশী উপার্জন করেছেন, অথচ তাঁহারা কেহই একটি নূতন ঔষধ বাহির করিতে পারেন নাই, ক্ষ্যাপা কুকুরে কাটার অব্যর্থ ঔষধ, ডিপথেরিয়ার ঔষধ, ইত্যাদি সব সাহেবেরা গবেষণা করে বাহির করেছেন, জগৎকে দিয়াছেন। আমরা কোন ব্যারামেরই বিশ্বমানবের গৃহীত ঔষধ আবিষ্কার করিতে পারি নাই। আবার, ভারতে এত ছোট ছোট উপভাষা আছে, তাহার ব্যাকরণ ও শব্দকোষ সাহেব মিশনরীরা চর্চা করে প্রকাশ করিতেছেন; অসংখ্য ছোট অসভ্য জাতি আছে, তাহাদের ধর্ম, রীতিনীতি জনশ্রুতি ও ছড়া, এসবই সাহেবেরা লিপিবদ্ধ করছেন। বঙ্গের বাহিরে অসংখ্য শিক্ষিত অবস্থাপন্ন বাঙ্গালী আছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই কাজগুলি করবার প্রচুর সুবিধা আছে, অথচ তাঁহাদের কেহই এদিকে দৃষ্টি দেন না। ভারতের এই দৈন্য কিসে ঘুচবে?"

গবেষণার প্রণালী ও উপকরণ সম্বন্ধে যে এত কথা বলিলাম, তাহা আমাদের সমস্যার অন্তরের কথা নহে। চৈতন্যচরিতামৃতে ভক্তির নানা ভাবের ব্যাখ্যা করিবার পর রামানন্দ বলিতেছেন, "এহ বাহ্য"—এটা বাহিরের কথা, ভক্তিশাস্ত্রের মূল তত্ত্ব নহে। সেইরূপ যদি আমাদের দেশে মৌলিক গবেষণাকে সজীব সবল রাখিতে হয় তবে আমাদের কর্মীদের চাই চিত্তশুদ্ধি। অর্থাৎ ঐতিহাসিক গবেষণার সত্য-সন্ধানী নিষ্কাম সাধককে দেশ-কাল-সমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরে যাইতে হইবে, স্বদেশী লোকের শস্তা বাহবা পাইবার লোভ সম্বরণ করিতে হইবে। হোগলকুড়ীয়া বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে এই রচনার জন্য ডাক্তার উপাধি দিবেন, অথবা ছকুখানসামা লেনের সাহিত্যসভা আমার এই গ্রন্থ পুরস্কৃত করবেন—এইরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকৃত গবেষকের আদর্শ হইতে পারে না। বাহিরের বিশ্বসভায়—যাহাকে republic of letters বলা হয় সেই সর্বজনীন পণ্ডিতসমাজে—যতক্ষণ পর্যন্ত আমার গবেষণা স্বীকৃত হয় নাই ততক্ষণ আমি নিজ শ্রমফলে সন্তুষ্ট থাকতে পারি না,—এই কঠোর ব্রত বুক পেতে নিতে হবে। এই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে, আমাদের মধ্যে কম কর্মীই নিজ সাধনার সিদ্ধিতে পৌঁছিতে পারে। কিন্তু এই মন্ত্র ভুলিলে আমরা নিশ্চয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইব।

ইহাই আমার শেষ বাণী।

বঙ্গীয় ইতিহাস-পরিষদ্ কর্তৃক অর্ঘ্যদান উপলক্ষে আচার্যের অভিভাষণ।

ভগ্নপোত

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস

মনের গভীরে একটা কামনা অনেক কাল
সাতটা রাজার মাণিকের মতো ঝলতেছিল,—
সে ছিল আমার গোপন বুকের লাল প্রবাল,
বহুবাঞ্ছিত স্বপ্নের দ্বীপ গড়তেছিল।

হঠাৎ সাগর-গর্ভে জাগল আন্দোলন,
ফেনিয়ে উঠল ঘন-সঞ্চিত লাভার স্রোত,
দৃষ্টি হারাল জীবন-নাবিক বিচক্ষণ,
ঢেউয়ের ধকলে বিপন্ন হ'ল পলকা পোত।

জলতলে ঠেকে খান্ খান্ হ'ল যে তরী,
প্রবালের দ্বীপ দিষ্টি-দিগন্তে রইল প'ড়ে,
আমরা হতাশ মাল্লার দল শিউরে মরি,
সাগরের বুকে শয়তান যেন নৃত্য করে।

কামনা যাচায়ে জীবন বাঁচাতে চেষ্টা আজ,—
মাটি যদি পাই, স্বপ্ন-প্রবাল ফেলব ছুঁড়ে,
মণি-মাণিক্যে তুষ্ট থাকুক রাজাধিরাজ,
আজ মুমূর্ষু বাঁচার চেষ্টা জগৎ জুড়ে।

হেরেছে নাবিক, ভেঙেছে তরণী, ছিঁড়েছে পাল,
আকাশে-সাগরে ধ্বংস-রভসে আলিঙ্গন,
কামনা টুটেছে, চক্ষে ছেয়েছে অশ্রুজাল,
তবু এস, করি বাঁচার চেষ্টা জীবনপণ।

ভেসে যাই ভাঙা হালে ভর দিয়ে তীরের খোঁজে,
যদি বাঁচি ফের গড়ব প্রবাল চোখের জলে,
সুপ্ত কামনা লুপ্ত ত নয়—কেবা তা জানে,—
বাঁশী নিয়ে ফের বসতে ত পারি বটের মূলে।

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

১৮৭২ সালের ১৫ই আগষ্ট যে দিব্যজ্যোতি মানবদেহ ধারণ করিয়া এক বাঙালী হিন্দু পরিবারে আবির্ভূত হয়, তাহা ১৯৫০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর মরধাম হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ, মাতা স্বর্ণলতা; রাজনারায়ণ বসু ছিলেন তাঁহার মাতামহ। তিনি পরবর্ত্তী-যুগে ভারতীয় জাতীয়তার মাতামহ বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছিলেন।

"ইয়ং বেঙ্গল"

এই বাঙালী-পরিবারের জীবন-ধারা বিস্ময়কর বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া সার্থকতালাভ করিয়াছে। পরিবারের কর্ত্তা কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন "ইয়ং বেঙ্গল"—নবীন বাঙালী শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণী ছিলেন ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষার পরমভক্ত, ইংরেজী রীতি-নীতির অন্ধ অনুকরণ-প্রয়াসী। ডিরোজিও, রিচার্ডসন ছিলেন তাঁদের শিক্ষাগুরু; তাঁদের পাঠ ছিল নব্যবঙ্গের জীবনবেদ। হিন্দু ও ভারতীয় রীতি-নীতি, সভ্যতা-সাধনা ছিল বিচারে নগণ্য, বেন্থাম-মিল ছিলেন তাঁদের মনু-যাজ্ঞবল্ক্য।

দেশের শিক্ষিত-সমাজের মন একান্তভাবে বিজাতীয় আদর্শে আচ্ছন্ন ছিল প্রায় ত্রিশ বৎসর—উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক পর্য্যন্ত। এই সময়ের মধ্যেই কিন্তু "পুনরাবর্ত্তনের" যুগ আরম্ভ হইয়াছে। বিজাতীয় শিক্ষার বহু দোষ ছিল; কিন্তু তার একটি গুণে সকল দোষ নিরাকৃত হইবার উপায় হইল। এই শিক্ষার কল্যাণে আমরা বুঝিতে আরম্ভ করিলাম যে, বিশ্ব-মানবের চিন্তা ও ভাবের ক্ষেত্রে আমাদের ভিখারীর মত হাত পাতিয়া দাঁড়াইবার প্রয়োজন নাই; ভারতবর্ষের মুনি-ঋষি, সাধু-সন্ত জগতের গুরু হইবার অধিকারী।

"সংস্কৃতের আবিষ্কার"

এই বোধ "নবীন বাঙালীর" মনে জাগিয়া উঠে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসুর চিন্তা ও কর্ম্মসাধনায়। তাঁহারাই প্রথম বুঝিতে পারেন যে, "কূর্ম্মনীতি" সমাজ ও রাষ্ট্রের জীবনে সব সময়ে কল্যাণকর নয়। সেই কথাই রাজনারায়ণ বসু তাঁহার "বৃদ্ধ হিন্দুর আশা" (*Old Hindu's Hope*) নামক পুস্তকে জলন্ত ভাষায় বিবৃত করেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট এই জাগৃতির জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তাঁহাদের গবেষণার ফল "সংস্কৃতের আবিষ্কার" (Discovery of Sanskrit) বলিয়া ইংরেজী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই আবিষ্ক্রিয়ার ফলে আমরা আমাদের পূর্ব্বগামীদের কীর্ত্তি-কথার—জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁহাদের কৃতিসমূহের পরিচয়লাভ করি; এই পরিচয় আমাদের মনে আত্মপ্রত্যয় ফিরাইয়া আনিল।

শ্রীঅরবিন্দের জন্মক্ষণ এই বোধের উষাকাল। তাঁহার জীবনাদর্শে দেখিতে পাই প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয়, দুই সংস্কৃতি-ধারার মিলন। এই মিলনের তত্ত্ব ভুলিয়া গেলে শ্রীঅরবিন্দের জীবনকথার অর্থ আমরা অনুভব করিলেও বুঝিতে পারিব না। তিনি "স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্ত্তি" ছিলেন। কিন্তু সেই "বাণীমূর্ত্তি" প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পুষ্ট বলিয়াই বেদের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার উপর নূতন আলোক নিক্ষেপ করিতে পারিয়াছিলেন। সেই আলোক ভারতের অধ্যাত্মতত্ত্ব ও বর্ত্তমান বিজ্ঞানের মিলিত রশ্মির সমষ্টি।

শ্রীঅরবিন্দ বর্ত্তমান যুগের মানুষ; তাঁহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রত্যয়সমূহ বর্ত্তমান যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানলব্ধ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই সত্যও প্রজ্ঞার কষ্টি-পাথরে যাচাই করা হইবে। এই পরীক্ষার হাত হইতে মুক্তি পাইবার উপায় নাই। আমি নিজে শ্রীঅরবিন্দের জ্ঞান-ভাণ্ডারের ব্যাপারী নহি। কিন্তু প্রথম যৌবনে সাংবাদিকের ব্রত যখন স্বীকার করিয়া লই, তখন সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছিলাম। তখন আকাশে-বাতাসে যে-সব সত্য ভাসিয়া বেড়াইতেছিল তাহা শ্বাস-প্রশ্বাসে আমরা গ্রহণ করিয়াছি। জনতার কোলাহলের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের ধ্যানী মূর্ত্তি দেখিয়াছি; বন্ধুগোষ্ঠীতে হাসি-ঠাট্টার মধ্যে তাঁহার নির্লিপ্ত যোগদান লক্ষ্য করিয়াছি, এখনও তাঁহার হাসির 'নূপুর-ধ্বনি' কানে বাজিতেছে।

সেই অভিজ্ঞতা হইতে ইহা বুঝি যে, শ্রীঅরবিন্দ সনাতন সত্যের ঋষি এবং সাধক হইলেও তখন তিনি তাঁহার সাধনালব্ধ সত্যকে চূড়ান্ত বলিয়া হয় ত প্রচার করিতে পারেন না। তাঁহার মন ছিল সদাজাগ্রত, সতত অনুসন্ধানী। ১৯১০ সালের পর আর শ্রীঅরবিন্দের দর্শনলাভের সৌভাগ্য ঘটে নাই; তাঁহার প্রচারিত "দিব্য-জীবনের" কথা বুঝিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে পারি নাই। কিন্তু প্রথম জীবনে তাঁহার সম্বন্ধে যে ধারণা মনে মনে পোষণ করিতাম তাহা হইতে বিচ্যুত হইতে পারি নাই। বিচ্যুত হইলে নিজেকে দুর্ভাগা মনে করিব। সত্যদ্রষ্টা, সত্যলোকের সাধক তিনি

আমাদের জীবনে যে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিলেন, ঋজু-কুটিল পথে ভ্রমণ করা সত্ত্বেও তাহা আমাদের জীবনকে নানাভাবে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। সেই যুগের আমাদের মধ্যে যে অল্প কয়েকজন এখনও বাঁচিয়া আছেন তাঁহারা মনে করেন যে, বাঁচিয়া থাকা সার্থক হইয়াছে, জীবন হইয়াছে ধন্য।

নব-জাগৃতির ব্যাখ্যাতা

শ্রীঅরবিন্দ ভারতের নবজাগৃতির ব্যাখ্যাতা। কিন্তু এই কথা বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত-সমাজ জানেন না, বুঝিবার চেষ্টাও করেন না। তাঁহারা ফলভোগ করিয়াই সন্তুষ্ট। আর শ্রীঅরবিন্দের আধুনিক ভক্তবৃন্দের মধ্যে এই জাগৃতির রাজনৈতিক অধ্যায় মুছিয়া ফেলিবার প্রবৃত্তি প্রবল বলিয়া মনে হয়। শ্রীঅরবিন্দ সশস্ত্র ও রক্তাক্ত বিপ্লবের তন্ত্রধারক ছিলেন—সেই স্মৃতি ম্লান করিয়া দিবার প্রেরণা কোথা হইতে তাঁহারা পাইলেন তাহা বুঝিতে পারি না। যুগের সাক্ষী আমাদের নিকট এই মনোভাব নিন্দনীয় বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য শ্রীঅরবিন্দের লেখার মধ্যে যেখানে কোন ব্যাপক ব্যাখ্যানের পরিচয় পাই, তাহা পাঠ করিবার জন্য মন ব্যগ্র হয়। সেই ব্যাখ্যানসমূহের অনেকগুলি এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৯৩ সালের কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক চিন্তা ও ভাবের পরিচয় পাই। এইগুলি বোম্বাই নগরীর "ইন্দুপ্রকাশ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী কে. জি. দেশপাণ্ডে।

রাজনৈতিক চিন্তা

তখন সবেমাত্র শ্রীঅরবিন্দ বরোদার মহারাজার অধীনে চাকুরী লইয়া আসিয়াছেন। ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ১৪ বৎসর বিলাতে কাটাইয়া তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন। ১০ বৎসর বয়সে বিলাতে গিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি কেবল পাণ্ডিত্যের বোঝা লইয়াই আসেন নাই, আসিয়াছিলেন দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য সুস্পষ্ট চিন্তা ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টার পরিকল্পনা লইয়া। "ইন্দুপ্রকাশ" পত্রিকায় সেই পরিকল্পনার ইঙ্গিত মাত্র করিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধাবলী আজ পর্য্যন্ত পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত। সেই প্রবন্ধের চুম্বক—যাহা শ্রী কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের শ্রীঅরবিন্দ-চরিতে দেখিয়াছি, পাঠ করিলে তদানীন্তন কংগ্রেস-নীতির ব্যর্থতার বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। আবেদন-নিবেদন লইয়া ইংরেজের দরবারে হাজির হইলে ফললাভ হইবে না, এই সম্বন্ধে এই বাঙালী যুবকের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। এই সন্দেহ প্রকাশে শ্রীঅরবিন্দ একক ছিলেন না; বঙ্কিমচন্দ্রের "লোকরহস্য" নামক প্রবন্ধাবলীতেও তার পরিচয় পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের গানে ও প্রবন্ধে। "বঙ্গবাসী" পত্রিকা তখন বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। ইহার প্রবন্ধে "কঙ্গরস" বলিয়া কংগ্রেসী আন্দোলনকে ব্যঙ্গ করা হইত। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধাবলীর মধ্যে তাহা বিশেষভাবে পরিস্ফুট দেখিতে পাই।

বঙ্কিমচন্দ্র-মধুসূদন

শ্রীঅরবিন্দ ঠিক সময়েই রাজনীতির ক্ষেত্রে বিদ্রোহের সুর তুলেন। মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে প্রভৃতি কংগ্রেসের নেতৃবর্গ এই সুরে অতিষ্ঠ হইলেন। তাঁহাদের চাপে পড়িয়া "ইন্দুপ্রকাশের" কর্ত্তৃপক্ষ নয়টি প্রবন্ধের পর তাহা প্রকাশ করিতে বিরত থাকেন। কিন্তু সেই বিদ্রোহের সুর অন্য ভাবে প্রকাশ পাইল। শ্রীঅরবিন্দ বাংলার নব-জাগৃতির পরিচয় প্রদান আরম্ভ করিলেন অবাঙালীর নিকট। বঙ্কিমচন্দ্র ও তৎকালীন বাঙালী সমাজের চিন্তাজগতে যে বিপ্লব ঘটিয়াছে, তার ব্যাখ্যা করিলেন এবং ভারতের সামগ্রিক জীবনে বিপ্লব যে ভাবে দানা বাঁধিতেছে তার সম্ভাব্য পরিণতির প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। সাতটি প্রবন্ধে তিনি এই আলোচনা শেষ করেন। ১৮৯৪ সালের ১৬ই জুলাই প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়; এবং ২৭শে আগষ্ট তাহা শেষ হয়। এই প্রবন্ধাবলীও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই; টাইপ করা অবস্থায় মাত্র তাহা আমি দেখিয়াছি।

যে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন প্রথমে তার বর্ণনার মধ্যে এইরূপ উল্লেখ পাই:

"সেই যুগ নূতন চিন্তায় অনুপ্রাণিত ও নূতন ভাবের আবেগে আবিষ্ট (loaded)।···দেশে ক্ষুদ্র একটি নব-জাগরণের বন্যা নামিয়াছে···দুই ভিন্নদেশী সংস্কৃতির ও সভ্যতার মিলনে এইরূপ ঘটিয়া থাকে—একটা নূতন সংস্কৃতির ও সভ্যতার সৃষ্টি হয়। অপরের প্রভাব হইতে দূরে থাকা, অপরের প্রভাবকে দূরে রাখাই মৌলিকত্বের (originality) লক্ষণ নয়। অপরের প্রভাবকে নিজের মনোমত, প্রয়োজনীয় ছাঁচে ঢালিয়া সাজানোই মানব-প্রকৃতির মাহাত্ম্য ও শক্তির পরিচায়ক। বাংলাদেশে তাহাই ঘটিতেছে। ভারতে নব-জাগৃতির (renaissance) স্ফুরণ বিরাট (gigantic) আকারে দেখা দিয়াছে এবং তার তন্ত্রধারক বিরাট পুরুষগণ আত্ম-প্রতিভার দীপ্তি পাইতেছেন।· রামমোহন রায় আসিলেন এক নূতন ধর্ম্ম হাতে করিয়া; তাঁর মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিলেন দুই ব্যক্তি যাঁরা, আমার মনে হয়, রামমোহন হইতে শক্তিশালী ছিলেন; তাঁদের নাম রাজনারায়ণ বসু ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'দত্ত' উপাধিধারী দুই জন—অক্ষয়কুমার ও মধুসূদন—আরম্ভ করিলেন নূতন গদ্য ও নূতন পদ্য রচনা। বিদ্যাসাগর মহামানব (Titan)—পণ্ডিত, জ্ঞানী, সংস্কৃতির রাজ্যে সর্ব্বাধিনায়ক (dictator)। তিনি সৃষ্টি করিলেন নূতন বাংলা ভাষা, গোড়াপত্তন করিলেন নূতন সমাজের। বিদ্যায় ও জ্ঞানের বৈশিষ্ট্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তুলনা পাওয়া কঠিন। এই সব বিরাট পুরুষকে কেন্দ্র করিয়া গান ও শিল্পকলায় কৃতী, সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ লোকোত্তর মানব-গোষ্ঠীর আবির্ভাব হইয়াছে বাংলা দেশে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতি

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর প্রকাশভঙ্গি (style) সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন :

"এই সম্বন্ধে আমি উচ্ছ্বাসবর্জ্জিত ভাষায় আমার মতামত প্রকাশ করিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। ইহার লালিত্য, ইহার প্রকাশ-মাধুর্য্য, ইহার শক্তি সম্বন্ধে লেখনী আমায় কোথায় লইয়া যাইবে তাহা জানি না। তাঁহার সৌন্দর্য্যানুভূতি অতুলনীয়; ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ইহাই হইয়াছে আমাদের লাভ। রাবণের দশ-মুণ্ডের ও রামের বানর-সেনার বর্ণনায় আর আমরা ফিরিয়া যাইতে পারিব না। 'কপালকুণ্ডলা' ও বিষবৃক্ষে'র কল্পনার মধ্যে যে মাধুর্য্য দেখিতে পাই, তাহা 'শকুন্তলা' নাটকের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়।"

অরবিন্দ ও বাংলা ভাষা

এই সমালোচনা-পাঠের পর একথা মানিয়া লওয়া কঠিন যে, শ্রীঅরবিন্দ তৎকালে বাংলা ভাষা জানিতেন না, তার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না, তার মাধুর্য্য ও মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারিতেন না। সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাস ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে তাহা জানি না। মধুসূদনের কোনও বাংলা কাব্য তখন ইংরেজী ভাষায় রূপান্তরিত হয় নাই। অথচ দেখিতে পাই শ্রীঅরবিন্দ মধুসূদনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ :

"মধুসূদন একটি অবলা কথ্য ভাষাকে জগতের আদিম দেবগণের ভাষায় উন্নীত করিয়াছেন। সেই ভাষার মধ্যে সমুদ্র-গর্জ্জনের ধ্বনি শোনা যায়; তাঁহার বর্ণিত নায়কবৃন্দের মুখে কবি আনিয়াছেন ঐ বঙ্কার। মানব-হৃদয়ের উদ্দাম ভাবসমূহ পাইয়াছে নূতন প্রকাশ—'বিরাটে'র প্রকাশ। মিলটনের বর্ণিত শয়তানের আক্রোশ যেন আমাদের কাণে নূতন করিয়া বাজিতেছে।"

বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-মধুসূদন

বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-মধুসূদন, এই ত্রয়ীর আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাংলা সাহিত্যের বিবর্ত্তন সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। তিনি বলিয়াছেন তৎপূর্ব্বে বঙ্গ-ভারতীর হাতে একটি একতারা ছিল; এই সাহিত্যসাধকেরা তাহাতে অনেকগুলি তার যোজনা করিয়া দিলেন। বঙ্কিম-চন্দ্র মানব-হৃদয়ের রুদ্র-কোমল বৃত্তি প্রকাশের যন্ত্র তুলিয়া দিলেন আমাদের হাতে। বঙ্কিম, মধুসূদন পৃথিবীকে তিনটি শ্রেষ্ঠ দ্রব্য দান করিয়াছেন :

"তাঁরা এমন বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন যার রাজোচিত (princelier) নিদর্শনের সঙ্গে ইউরোপের যে-কোন সাহিত্য-সৃষ্টির তুলনা করা যাইতে পারে।" "তাঁহারা বাংলা ভাষা দিয়াছেন, ইহা আর গ্রাম্য বা প্রাদেশিক সাহিত্য মাত্র নয়, ইহা আজ দেবগণের ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে।... (বঙ্কিম) একটি জাতিকে দিয়াছেন ভাষা; দিয়াছেন সাহিত্য, সৃষ্টি করিয়াছেন একটি জাগ্রত জাতি (ন্যাশন)।"

শ্রীঅরবিন্দের সমালোচনার আলোকে সারা ভারতের সংস্কৃতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে; এই সমালোচনার কষ্টি-পাথরে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের যাচাই করা যাইতে পারে এবং তার ইতিহাস হইবে তখন সর্ব্বভারতীয় নবজাগৃতির ইতিহাস, বিশ্বমানবের বিবর্ত্তনের ইতিহাস। ইহা যে সত্য তাহা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর জীবনে প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতের মানব-প্রকৃতির মধ্যে যে অসাধারণ উন্নতির বীজ উপ্ত আছে, এই দুই মহাপুরুষ তার সাক্ষ্য ও স্বীকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। সেই সম্ভাবনার উদ্দেশ্যেই মানবের যাত্রাপথ চিহ্নিত হইয়াছে, এবং সেই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াই যুগে যুগে মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুর্গম পথ অতিক্রম করিতেছে। সেই যাত্রার আদিও নাই, অন্তও নাই। "চরৈবেতি, চরৈবেতি"—ইহাই তার সার্থকতা।

শ্রীঅরবিন্দের এই সাতটি প্রবন্ধ নবভারতের জাতীয়-তার সাফল্যের ইঙ্গিতে পূর্ণ। বাংলা সাহিত্য অন্যান্য ভাষা-সাহিত্যের সহযাত্রী। সমাজ যখন জাগিয়া উঠে, তখন শরীর মনের অনুপ্রেরণায় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে সে আত্মশক্তির পরিচয় দিতে আগ্রহান্বিত হয়। কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সেই জাগরণের অগ্রদূত হইতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাঙালীর অদৃষ্টে সেই বিঘ্নসঙ্কুল পদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। রাজনীতি ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। শ্রীঅরবিন্দের জীবন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ইংলণ্ডে প্রবাস

১৮৯৩ সালে যে যুবক কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন, তিনি দশ বৎসর বয়সে মাতৃক্রোড় বিচ্যুত হইয়া বিদেশে গিয়াছিলেন; বিদেশের নূতন আবহাওয়ায় ও মানসিক পরিবেশের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া তিনি সেখানকার জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা

লাভ করেন। নিজের জন্মভূমি তাঁহার কাছে ছিল অপরিচিত। প্রবাস-কালে জানি না, এই কিশোরের মনে কি আবেগ জমিয়া উঠিত, বিদেশে পারিবারিক স্নেহ হইতে বঞ্চিত তাঁহার বুকে কি আশা-আকাঙ্ক্ষা গুমরিয়া মরিত! নিজের সমাজ স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের যে শিক্ষাদান করে, তার ভয়-ভাবনা রীতি-নীতি যে শিক্ষা দেয়, তাহা ছিল তাঁহার নিকট অপ্রাপ্য। ইংরেজ সহপাঠীর সাহচর্য্যে তিনি বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে যে জ্ঞান অর্জ্জন করিতেন তাহা বর্ত্তমান যুগের বাস্তব জ্ঞান। নিজের দেশ তাঁহার নিকট ছিল "স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা" কল্পলোকের বেশী কিছু নয়।

ভবিষ্যৎ জীবনের কল্পনা

একথা সত্য যে "সংস্কৃতের আবিষ্কারে"র ফলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক তথ্য বিলাতের সুধীবর্গের অধিগত হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ তাহা হইতে নিজের দেশের সভ্যতা, সাধনা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি মাতৃভূমিতে ফিরিয়া আসেন। শ্রীঅরবিন্দের সেই সময়কার মনোভাব সম্বন্ধে তাঁহার জীবনচরিত-লেখক "অব্যক্ত" (unutterable)—এই বিশেষণটি ব্যবহার করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। তিনি আবার বলিয়াছেন যে, এই পণ্ডিত-যুবকের মনে রাজনীতিকের ও কবির ভাস্বর (glamorous) জীবনের কল্পনাও খেলা করিতেছিল। প্রমাণ-স্বরূপ তিনি শ্রীঅরবিন্দের দুইটি কবিতার উল্লেখ করিয়াছেন—'*Hic JaCet* (হিক জেসেট) ও 'Charles Stewart Parnell' (চার্লস ষ্টুয়ার্ট পার্নেল) এই দুইটি কবিতার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার রাজনৈতিক অনুভূতিসমূহ (political sensibilities)। শ্রীঅরবিন্দ কৈশোর ও প্রথম যৌবন বিলাতে কাটাইয়াছিলেন। সেই সময়ে, প্রায় ১৮৮১ সাল হইতে, পার্নেলের নেতৃত্বে আইরিশজাতির মুক্তিসংগ্রাম আবার নূতন রূপে আরম্ভ হয়। আইনানুগ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হয় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (passive resistance), সমাজ-বর্জ্জন (boycott) ও বোমা বিভলবারের ব্যবহার। এই পদ্ধতি আইরিশ জাতির ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে "নিউ ডিপার্‌চার" (new departure) নামে; মাইকেল ডেভিটের নাম এই উপলক্ষে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

রাজনৈতিক অনুপ্রেরণা

শ্রীঅর...ন্দের বর্ত্তমানের শিষ্যবৃন্দ বলেন যে, তিনি পার্নেল-প্রব...ত্তিত রাজনৈতিক বিদ্রোহের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন নাই। এ...ই যুক্তি মানিয়া লইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, সেযুগে অরবিন্দের রাজনৈতিক মন ছিল অনড়। আয়ারল্যাণ্ড সম্বন্ধে কবিতাকয়টি ভাববিলাসমাত্র! গত ১৫ই আগষ্টের বোম্বাইয়ের "মাদার ইণ্ডিয়া" (ভারতমাতা) নামক পত্রিকায় পার্নেলের প্রভাবের সম্পর্কে ইঙ্গিত করিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে সম্পাদক মহাশয় একটি ক্ষুদ্র পাদটীকায় এই প্রভাবের কথা নস্যাৎ করিবার চেষ্টা করেন।

"বন্দেমাতরম" (দৈনিক) পত্রিকার স্তম্ভে শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৭ সালে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন, ইহাতে তিনি পার্নেলের রাজনৈতিক মনীষার (genius) উল্লেখ করেন। পার্নেল সম্বন্ধে কবিতার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এইরূপ আরও প্রমাণ আছে নিশ্চয়ই। ১৮৯৩ সালে লিখিত রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলী "নিউ ল্যাম্‌প্‌স্ ফর ওলড" (New Lamps for Old)—পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে এই বিষয়ে সংশয়ভঞ্জন হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে জোরগলায় বলা যায়, শিক্ষার্থী অরবিন্দ তখন সক্রিয় ও সজাগ মন লইয়া দেশবিদেশের জ্ঞান অর্জ্জন করিতেছিলেন। ইউরোপে নবজাগৃতির (Renaissance) ইতিহাস ছিল তাঁহার নখাগ্রে। ফরাসী বিপ্লব, ইটালীর নবসংগঠন (resorgimento), জার্ম্মান রাজ্যসমূহের রাজনৈতিক মিলন, রুশিয়ার গণজাগরণের প্রচেষ্টা, আয়ারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন—এ সমুদয়ের অনুপ্রেরণা ও আদর্শ শ্রীঅরবিন্দের হৃদয়কে উদ্বেলিত করে নাই—এ-কথা অবিশ্বাস্য।

বাক্য ও রচনা দ্বারা যিনি আমাদের জীবনে যুগান্তর আনয়ন করেন, তিনি অপর দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নির্ব্বিকার ছিলেন, এই কথা বিশ্বাস করিতে বলিলে শ্রীঅরবিন্দের জীবনের কোন অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। তিনি প্রথম যৌবনে কেবল কবি ছিলেন না। "ইন্দুপ্রকাশে" প্রকাশিত রাজনৈতিক ও সাহিত্য-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী তাহার প্রমাণ। রাজনৈতিক মতামত প্রকাশে তিনি বাধা পান নিজের দেশের রাজনৈতিক নেতৃবর্গের নিকট হইতে। কিন্তু মানবের বুদ্ধি কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমেই স্বচ্ছ হয় না। মানবের মন সত্যসন্ধ ও নির্ভীক হয় জাতির পুরাতন গৌরবের অনুচিন্তনে, নিজের পারিপার্শ্বিকের আলোড়নে। মনস্তত্ত্বের এই অনুভূতি ছিল বলিয়াই শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবাদর্শ অবলম্বন করিয়া ভারতের নবজাগৃতির পরিচয় দিলেন অ-বাঙালীকে; বাংলার নব-জাগৃতির বার্ত্তা প্রচার করিয়া সর্ব্বভারতীয় জাগৃতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। পরাধীন জাতির মনে ফিরাইয়া আনিলেন আত্মজ্ঞান, আত্মপ্রত্যয়, আত্মবিশ্বাস—যার কল্যাণে মানুষ হয় স্বরাট্।

উপরোক্ত সাতটি প্রবন্ধ পাঠ করিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না জাতীয় জীবনের উন্মেষসাধনের মধ্যে কবি ও সাহিত্যিকের কি বিরাট স্থান রহিয়াছে; তদ্বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের মনোভাব ছিল পরিষ্কার। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে অরবিন্দ "আর্য্য" (Arya) মাসিকের পৃষ্ঠায় "দি ফিউচার পোয়েট্রি" (ভবিষ্যতের কবিতা) শীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে আমরা কবি-মানসের বিবর্ত্তনের একটি বর্ণনা পাই। তিনি বলিতেছেন:

"কবির আত্মা আত্মকেন্দ্রিক বা নক্ষত্রের মত দূরে অবস্থিত থাকিতে পারে; তাঁহার আত্মা জাতীয় মনের সংকীর্ণ পরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পারে; তার ব্যতিক্রম ত নিশ্চয়ই। কিন্তু তবুও বলিতে হইবে যে তাঁহার ব্যক্তিত্বের, তাঁহার সমগ্র সত্তার শিকড় প্রোথিত হইয়া আছে জাতীয় মনের বীজক্ষেত্রে, কবির ব্যতিক্রম ও বিদ্রোহ প্রমাণিত করে যে, জাতীয় সত্তার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা সুপ্তভাবে বিরাজ করিতেছে বা বাহিক ঘটনার চাপে মাথা তুলিতে পারিতেছে না অথবা যাহা দেশের হৃদয়, জাতির নিগূঢ়, সুক্ষাতিসুক্ষ্ম আত্মাকে জাতির বাস্তব জীবনের নানা প্রকাশের মধ্যে উচ্চ করিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।"

স্বাজাত্যবোধ ও কবিতা

এই প্রবন্ধের নাম 'নেশন্যাল ইভোলিউসন অব পোয়েট্রি' বা কবিতার স্বাজাতিক বিবর্ত্তন। এই প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয় তখন শ্রীঅরবিন্দের অজ্ঞাতবাসের চার পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, পণ্ডিচেরী নগরীতে তাঁহার অবস্থানের কথা আর গোপন ছিল না। বাহ্যতঃ তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সক্রিয়ভাবে তিনি বিপ্লব আন্দোলন চালাইতেছিলেন কিনা এই বিষয়ে মতভেদ আছে; তৎসম্বন্ধে গোপনীয়তা এখনও পর্য্যন্ত রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু ভারতের নব-জাগৃতির তন্ত্রধারক একজন নিজের জাতির ভালমন্দ সম্বন্ধে নির্ব্বিকার হইয়া গিয়াছেন, এই কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

ভারতের ও জগতের প্রতি সঙ্কটের সময়ে শ্রীঅরবিন্দ নিজের মতামত প্রকাশ করিয়া জাতিকে কর্ত্তব্যপথের সন্ধান দিয়াছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তাহা করিয়াছিলেন; "সুরা-সুরের" সংগ্রাম বলিয়া তাহার বর্ণনাও করিয়াছিলেন। গান্ধীজী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁহাকে বাংলায় কংগ্রেসের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন —জাতির মুক্তির, তাহার সামগ্রিক মুক্তির সাধনায় তিনি নিমগ্ন আছেন; যখন তাঁহার সেবার প্রয়োজন হইবে ভগবানের নির্দ্দেশে তখনই তিনি পণ্ডিচেরী হইতে বাহির হইয়া আসিবেন; তিনি সেই আহ্বানের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েও তিনি জার্ম্মানী ও জাপানের বিরোধী শক্তিবর্গের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে এই যুদ্ধ পরস্পরবিরোধী নেশ্যন বা গবর্ণমেণ্টের মধ্যে নয়, সৎ জাতির অসৎ জাতির মধ্যে নয়।

শ্রীঅরবিন্দ

"দুই শক্তির মধ্যে, দেব ও অসুর শক্তির মধ্যে।...মিত্র-শক্তি গোষ্ঠীর (Allies) জয় জগতের ভাবী বিবর্ত্তনের পথ মুক্ত রাখিবে; অপর পক্ষের জয় মানব-জাতিকে পেছনে টানিয়া আনিবে, ঘৃণ্যভাবে তাকে অবনমিত করিবে এবং তাকে চূড়ান্ত বিনাশ ও বিলয়ের পথে লইয়া যাইবে। অতীতে নানা জাতি বিনষ্ট হইয়াছিল বিবর্ত্তনের পথে ভাগবত বিধান অনুসারে চলিবার অসামর্থ্যের জন্য।"

দিব্য-জীবন

আজ যখন আবার বিশ্বযুদ্ধের মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে তখনই এই "জগদ্ধিতায়" নিবেদিত-প্রাণ যোগী-প্রবর বিশ্ব-সৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেলেন। শোক আমরা করিব না, বিশ্বাস রাখিব যে, এই পরিনির্ব্বাণ বিশ্ববিধাতার অমোঘ বিধান। কোন দুর্জ্ঞেয় শক্তির প্রেরণায় শ্রীঅরবিন্দ ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন তাহা

বলিতে পারি না, কিন্তু ১৯২১ সালেও তিনি আমাদের ভরসা দিয়াছিলেন: "যে-যোগ আমি শিক্ষা দিতে চেষ্টা করি ইহা কেবল আমাদের জন্য নয়; ইহা মানব-জাতির জন্য। ইহার উদ্দেশ্য ব্যষ্টির মুক্তি নয়… ইহার উদ্দেশ্য মানবসমষ্টির, সমগ্র মানবের মুক্তি।" সেই সমষ্টি ও সমগ্রের প্রতি নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইতে পারে "কোটিকে গোটিক" মাত্র। সেইজন্যই আমরা ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্ত প্রদীপের নির্ব্বাণে দিশাহারা হইয়াছি; ভারতের নবজাগৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ তন্ত্রধারকের তিরোধানে নিজেদের অসহায় বোধ করিতেছি। শ্রীঅরবিন্দ "দিব্য-জীবনে" সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; সমগ্র মানবজাতির দিব্য-জীবন লাভের প্রচেষ্টার পরিণতি দেখিবার পূর্ব্বেই চলিয়া গেলেন। জাতির স্রষ্টা মহামানব-গণের তপস্যার ফলে আমরা যে মুক্তিলাভ করিয়াছি শ্রীঅরবিন্দ-প্রদর্শিত "দিব্য-জীবন" লাভের পথে তাহা পরিপূর্ণ ভাবে সার্থক হইবে।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার দাবি

ইহার প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গরূপে তিনি আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন। সেই ক্ষুরধার পথে তিনি ছিলেন জাতির পথিকৃৎ। আমাদের যুগে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন মুক্তি-পথের আলোকের কেন্দ্রস্বরূপ।

এই আলোক অনির্ব্বাণ না রাখিতে পারিলে স্বাধীনতার প্রকৃত রূপ জাতির জীবনে উদ্ভাসিত হইবে না। তাহা রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। জীবনের সমগ্র প্রকাশের মধ্যে তার জ্যোতি বিচ্ছুরিত হওয়া চাই। সেই জন্যই শ্রীঅরবিন্দ আমাদের শুনাইয়াছিলেন প্রথম পাঠরূপে বাংলার নব-জাগৃতির ইতিহাস। এই ইতিহাসের মর্ম্মকথা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিলে জাতি দুর্গম পথে চলিবার সাহস ফিরিয়া পায়, অন্ধকারের পথে একলা চলিতে সক্ষম হয়। মনের এই প্রস্তুতি স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম ও অপরিহার্য্য অস্ত্র।

জনসাধারণ ও জাতীয়তা

প্রথম যৌবনে শ্রীঅরবিন্দ শিক্ষিত ভারতীয়ের নব-জাগৃতির ইতিহাস বর্ণনা করিতে গিয়া প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন। সেই সময়েও তিনি জানিতেন যে, "ইয়ং-বেঙ্গল", "ইয়ং-বোম্বাই" পরানুকরণকারী, আত্মবিশ্বাসহীন, অস্বাভাবিক; তাঁহারা চাহিতেন ভারতবর্ষকে ইউরোপে রূপান্তরিত করিতে। তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন গীতার উপদেশ—স্বধর্ম্মে নিধন পরধর্ম্মের বাহ্যিক সাফল্যের অপেক্ষা শ্লাঘ্যতর। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে এই পরানুকৃতির বিরুদ্ধে আমাদের জাতীয় মনের বিদ্রোহ দানা বাঁধিতে আরম্ভ করে; শ্রীঅরবিন্দ কৈশোর ও যৌবন অতিক্রম করিয়া নব অনুভূতির মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেই সময়েই তিনি বুঝিতে পারেন যে, ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় জাতীয় জীবনে ব্যাপক জাগৃতির স্রোত বহাইতে পারিবে না। এই অনুভূতির প্রেরণায় তিনি বলেন:

"তবুও স্বীকার করিতে হয় যে, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জীবন বিনষ্ট হইল না; এই মৃত্যুর হাত হইতে জাতি মুক্তিলাভ করিল অপ্রত্যাশিত উপায়ে (miraculously)…তার কারণের অনুসন্ধানে অধিক দূর যাইতে হইবে না। ভারতবর্ষের গ্রামীণ জীবন বরাবরই ভারতীয় সংস্কৃতিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল; কোন প্রলোভনে তাহা বর্জ্জন করিতে স্বীকার করে নাই (remained inveterately Indian)। দয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ এবং রাণাডের মতন ব্যক্তি বিজাতীয়তার স্রোতে বাধা দিয়াছেন নানা ভাবে—ভাব-রাজ্যে।…ইহা এক যুক্তি-তর্কের অতীত ব্যাপার' (irrational phenomenon) যাহা ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।"

এই অনুভূতি ও সিদ্ধান্তের প্রকাশ দেখিতে পাই শ্রীঅরবিন্দের একটি বক্তৃতায়:

"ভগবান জানিতেন তিনি কি করিতেছেন। তিনি এই লোকটিকে বাংলায় পাঠাইলেন, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিলেন তাঁহাকে। উত্তর-দক্ষিণ হইতে, পূর্ব্ব-পশ্চিম হইতে, শিক্ষিত লোকসকলের সমাগম হইতে লাগিল সেই মন্দিরে। তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের রত্ন; তাঁহারা ইউরোপীয় বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন। তাঁহারা কিন্তু আসিলেন এই সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে; তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন তাঁহারা। ভারতের মুক্তি আরম্ভ হইল; ভারতের উদ্বোধন ও উত্থানের সূচনা হইল।"

শ্রীঅরবিন্দের এই অনুভূতি বিশ্বাসে পরিণত হইল। তিনি সত্যদ্রষ্টার ভরসা লইয়া, প্রদীপ্ত বুদ্ধি লইয়া গাহিলেন অবতারতত্ত্বের কথা:

"যিনি মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করিবেন দেবলোককে
তাঁহাকে অবতরণ করিতে হইবে কাদার মধ্যে;
তাঁহাকে পৃথিবীর ধূলার শরীরের বোঝা বহিতে হইবে;
দুঃখকষ্টকণ্টকিত পথে তাঁহাকে চলিতে হইবে।"

ভারতের অধোগতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন: জন্ম-মৃত্যুর ঘটনাকে "মায়া" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া ও সেই বিশ্বাসের বশে চলিয়া ভারতবাসী নিজের স্বরাজ্য হারাইয়াছিল। এই বিপর্য্যয় এক দিনে ঘটে নাই। নানা সময়ে নানা ঘটনার উপলক্ষে ভারতের অধঃপতন আসিয়াছিল।

"প্রথমে আবির্ভাব হইল সন্ন্যাসের অস্বীকৃতি, সন্ন্যাসীর (ascetic) বিশ্বাস, পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ হইতে তাঁহার মানস-চক্ষু অপসারিত হইল, কোটি পদ্মের মতন প্রকৃতির জগতে যে ঐশ্বর্য্যের বিকাশ দেখিতে পাই, তার প্রতি ভ্রুকুটি নিক্ষেপ করিলেন তিনি।...তারপর পড়িল মানসিক শক্তির উৎস-মুখে বাধা...ঘুমাইয়া পড়িল বৈজ্ঞানিক ও বিশ্লেষণকারী মন, হারাইয়া ফেলিল এই মনের সহজ অনুভবের শক্তি;... ন্যায়ের কূট তর্ক আসর জমাইয়া বসিল...। সর্ব্বাপেক্ষা বড় সর্ব্বনাশ হইল যখন আধ্যাত্মিকতা জীবনের সাধনা না হইয়া হইল ঘটনা...জাতীয় জীবনের সর্ব্বস্তরে পরিব্যাপ্ত না হইয়া এই শক্তির ছায়ায় নির্ব্বিরোধী মনোভাবের প্রাবল্য দেখা দিল; কেবল বাঁচিয়া থাকার উপায়রূপে আধ্যাত্মিকতার খোলস টিকিয়া রহিল সমাজের ব্যবহার ও রীতি-নীতির মধ্যে...।"

শ্রীঅরবিন্দের সাধনা

এখন আমার এই আলোচনা শেষ করিতে হইবে। রাজনীতির কথা আমি বেশী বলি নাই। শ্রীঅরবিন্দের কর্ম্ম-জীবনের প্রেরণার পরিবেশ বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীণ দুর্গতির কারণসমূহের ব্যাখ্যা করিয়াই তিনি কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। মানব-প্রকৃতির পরিবর্ত্তনকল্পে সাময়িক এবং চিরন্তন উপায়েরও নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তাঁহার দেশবাসীর জীবনে যে তামসিকতা বাসা বাঁধিয়া বসিয়া আছে, যে কৃপণস্বভাব ক্লৈব্য তাঁহাদের জাতীয় চরিত্রের সহস্র গুণকে দোষে পরিণত করিয়াছে, সেই তামসিকতা ও ক্লৈব্য দূর করিবার জন্য ভাবের রাজ্যে আনিয়াছিলেন তিনি রাজসিকতা, কর্ম্মের রাজ্যে আনিয়াছিলেন ক্ষত্রিয়ের সাধনা। ১৮৯৩ সালে ভারতবর্ষের রাজনীতি হৃদয়-দৌর্ব্বল্যে ছিল ক্লিষ্ট; দেশের শিক্ষিত মনও ক্লিষ্ট হইতেছিল। "ইন্দুপ্রকাশের" প্রবন্ধাবলী তার বহিঃপ্রকাশ। ১৮৯৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যে প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয় তাহাতে বর্ণিত নব-জাগৃতির ব্যাখ্যা দেখিতে পাই—আত্ম-প্রত্যয়ের সুর; নিখিল ভারতের প্রস্তুতির আহ্বান। তার পর ১৯০২ সালে শ্রীঅরবিন্দ নামিয়া আসিলেন কর্ম্মজগতে, বিপ্লবের রক্তমাখা পথে। বাংলায় ও পঞ্জাবে মাত্র সেই পথে চলার প্রবৃত্তি ও শক্তি বহু দিন অটুট ছিল। ১৯১৯ সালের রাউলাট রিপোর্টে তার স্বীকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। তারপরেও বাংলা ও পঞ্জাবের বিপ্লবী হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকে নাই। আত্মনিবেদনের মানসিক প্রস্তুতি ছিল এই দুই প্রদেশবাসীর। শ্রীঅরবিন্দ সেই প্রস্তুতির তত্ত্বধারক ছিলেন, অগ্রগামী ছিলেন এই যাত্রাপথে।

সেই প্রস্তুতি চিরন্তন করিবার প্রয়াস তাঁহাকে লইয়া যায় যোগ-সাধনায়, "দিব্য-জীবনের" অন্বেষণে। তিনি এই যাত্রাপথে কত মানস-মুকুল পদদলিত করিয়াছিলেন! মৃণালিনী দেবীর নিকট পত্রে তার আকুল প্রকাশ দেখিতে পাই। এই তরুণীকে সহধর্ম্মিণী করিয়াছিলেন তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে। কিন্তু তাঁহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন বিবাহের পরে; বিশেষ করিয়া আলীপুর বোমার মামলা হইতে মুক্তিলাভের পরে। বোমার মামলার বিচারের সময় তিনি সর্ব্বভূতে "নারায়ণ" দর্শনের বার্ত্তা প্রচার করেন। এই অভিজ্ঞতার পর তিনি নিজের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতির ইঙ্গিতমাত্র করিলেন। "কারাকাহিনী" পুস্তকে সেই ঘোষণা দেখিতে পাই:

"আবার যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিব তথায় সেই পুরাতন অরবিন্দ ঘোষ প্রবেশ করিবে না। একটি নূতন মানুষ, নূতন চরিত্র, নূতন বুদ্ধি, নূতন প্রাণ, নূতন মন লইয়া, নূতন কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া আলিপুরস্থ আশ্রম হইতে বাহির হইবে।"

পণ্ডিচেরী নগরীতে শ্রীঅরবিন্দ "নূতন মানুষ" হইবার সাধনা করিয়াছিলেন চল্লিশ বৎসর। সেই সাধনার পথে তিনি "দিব্য-জীবন" লাভের অন্বেষণে বাহির হন। তাহাতে তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

বাস্তহারা

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

ওরা কাঁদে আর অভিশাপ দেয় মিছা।
জনতা-জটিল রাজপথে করে ভিড়।
আঁধারের শিশু আঁধারেই ঘুরে মরে;
ভাগ্যচক্রে হয়েছে ভগ্ন-নীড়।
আলোর ক্ষুধায় করুণ আর্ত্তনাদ
ওদের বক্ষে আছাড় খাইয়া মরে।
ধমনীতে নাহি বাজে ডম্বরু-ধ্বনি।

উপবাসী চোখে শুধু বিক্ষোভ ঝরে।
ব্যথা-কিংশুকে দিগন্ত হয় লাল।
নিয়তির ডাকে রাজপথ ভরে যায়।
জমা হয় যত জীবনের জঞ্জাল
বঞ্চিত মন করে উঠে হায় হায়।
শবের মাঝারে জাগিবে শিবের ধ্বনি
সেই আশাতেই অনাগত দিন গণি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী

বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ অবিস্মরণীয় স্রষ্টা। তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর সৌভাগ্য জীবনে কয়েকবার এসেছে—কখনও আনুষ্ঠানিক আয়োজনে, কখনও মুগ্ধ প্রাণের সমারোহে। মানপত্র লিখেছি, বক্তৃতা দিয়েছি, তাঁর জন্মদিনের অভিনন্দনে কত না শ্রদ্ধা ও প্রীতি উপচার সাজিয়েছি।

যখনই বাড়ীতে এসেছেন, বাগানের ফুল তুলে তোড়া বেঁধে দিয়েছি হাতে, বাংলার পল্লীকবি ঘাসে ঝরে পড়া দুটি শিউলি ফুলও পেয়ে কত না উচ্ছ্বসিত হয়েছেন! সৌন্দর্য্যের উপাসক ভাবুক মানুষ তিনি, বাংলার মাঠ-ঘাট বন ফুল পাতার গল্প করতে করতে কখনও তন্ময়, কখনও আনমনা হয়ে গিয়েছেন।

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি তাঁর প্রতিভাদীপ্ত, ভাবমুগ্ধ দুটি চোখের দিকে, ভেবেছি বিভূতিভূষণ তুমি সার্থক শিল্পী এই জন্যে যে তোমার প্রতিভা ও চরিত্র এক হয়ে মিশেছে একটি স্রোতের অববাহিকায়। যেখানেই চরিত্র ও প্রতিভার সমন্বয় ঘটে সেখানেই স্রষ্টা সার্থক, তাঁর সৃষ্টিও সার্থক।

তিনি সমগ্র অনুভূতি দিয়ে ভালোবেসেছিলেন প্রকৃতির অতুলনীয় সৌন্দর্য্যকে, পল্লীর মানুষের সুখ-দুঃখকে গভীর বেদনার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজের এই উপলব্ধিকেই তিনি স্বকীয় রচনার মধ্যে নিপুণ তুলিকায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

আমি দেখেছি বালক 'অপু'র সঙ্গে শিশুর মতই সরল অনাড়ম্বর বিভূতিভূষণের কোনই পার্থক্য নেই—দেখেছি "আরণ্যকের" রাজু পাঁড়ের সঙ্গে বিভূতিভূষণ একাত্ম। চরিত্রের এই অকৃত্রিমতাই তাঁকে করেছে অমায়িক নিরহঙ্কার, নিস্পৃহ; তাঁর সৃষ্টিকে করেছে বাংলা-সাহিত্য-ভাণ্ডারের অপূর্ব সম্পদ।

একবার কলিকাতার এক বিশিষ্ট অভিজাত সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির গৃহে সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকগণের এক মজলিশে আমন্ত্রিত হয়ে আমাকে যেতে হয়েছিল, বিভূতিভূষণও তাতে যোগ দিয়েছিলেন। প্রত্যেকেই দেখলাম ফিটফাট কেতাদুরস্ত—হাতে সিগ্রেট, বর্মা চুরুট। সবাই ধনী পরিবারের সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করতে তৎপর। কিন্তু বিভূতিভূষণ যেন নির্বিকার নির্লিপ্ত, এ সকল আড়ম্বরে যেন তাঁর লেশমাত্র আগ্রহ নেই। সেদিন ঘাটশিলায় যাবেন, সঙ্গে একটা সুটকেশ রয়েছে, উস্কখুস্ক চুল, ময়লা জামা কাপড়, কপালের ঘাম যখন গড়িয়ে গাল বেয়ে নামছে তখন চকিত হয়ে আধময়লা রুমালে মুছে ফেলছেন।

মার্জিত রুচিসম্পন্ন গৃহকর্ত্তা কিন্তু তাঁর সুসজ্জিত ড্রয়িং-রুমে আগত এই খাপছাড়া মানুষটির অভ্যর্থনার ভার স্বয়ং গ্রহণ করেছিলেন। প্রকাণ্ড হলঘরে অনেক মানুষ—বয়, বেয়ারারাই অতিথিদের অভ্যর্থনার ভার গ্রহণ করেছে, কিন্তু গৃহকর্ত্তা বার বার এগিয়ে এসে বিভূতিভূষণের হাতে সিগ্রেট তুলে দিচ্ছিলেন। সেইদিন আমি উপলব্ধি করেছিলাম জীবনে যে জিনিষকে তিনি প্রয়োজন বলে মনে করেন নি, কৃত্রিমতার সঙ্গে তাকে তিনি গ্রহণ করতেও পারেন নি। তাই ধনী নির্ধন সাধারণ অসাধারণ নির্ব্বিশেষে সকলের মনকে তাঁর সৃষ্টি স্পর্শ করতে পেরেছে।

প্রতিভার সঙ্গে তাঁর চরিত্রে আন্তরিকতা ও অকৃত্রিমতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল বলেই গণ-সাহিত্য রচনাকে তিনি কোনও দিন স্বীকার করেন নি। তিনি বলতেন, স্রষ্টা এবং শিল্পী যে সমাজ থেকে আসবেন তাঁরা সেই সমাজেরই কথা বলবেন।

আমি প্রশ্ন করে বলতাম "অজ্ঞতার কালো অন্ধকার-গহ্বরে যারা পশুর মত জীবন যাপন করছে, তাদের কি জাগাতে হবে না?" তিনি বলতেন—"জাগাতে হবে বৈকি, কিন্তু যারা জাগাবে, তারা আসবে সেই সমাজ থেকে।"

বিভূতিভূষণের সঙ্গে আমার সকল ক্ষেত্রে মতের মিল না হলেও তিনি যে নিজেকে ফাঁকি দেন নি এ কথা ভেবে আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে উঠতাম। একথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলাম যে, যশের প্রলুব্ধকারী হাতছানি তাঁকে মরীচিকার পথে টেনে নিয়ে যায় নি, আধুনিক সভ্যতার মধ্যে যেখানেই তিনি কৃত্রিমতা দেখেছেন, তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁর অভাববোধ তেমন তীব্র ছিল না, তাই জীবনধারণ করতে যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে অধিক আহরণের মোহে তিনি বিভ্রান্ত হতেন না।

এক দিন যশোহর সাহিত্য-সঙ্ঘের একটি সভা থেকে বিভূতিভূষণের সঙ্গে ফিরছিলাম। ট্রেনের কামরায় নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি আধুনিক সভ্যতার কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলার পর হঠাৎ বললেন, "আচ্ছা মেয়েরা ওই ঠোঁটে গালে কেন রং মাখেন

বলুন তো? আপনি মেয়ে এবং তাই এ বিষয়টার ঠিক উত্তর দিতে পারবেন।"

আমি বললাম—"আপনি আমায় জটিল প্রশ্ন করলেন, আমি আশৈশব ওই প্রসাধন থেকে একেবারেই বঞ্চিত, তাই ছোটবেলায় আমাকে সকলে ছেলে বলত।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—"না না ছেলে মেয়ের প্রশ্ন নয়—কি ছেলে, কি মেয়ে প্রত্যেকের মধ্যে কতকটা সাত্ত্বিকতা থাকা প্রয়োজন, রং মাখলেই কি মানুষ সুন্দর হয়?"

আমি বললাম—"ওটা মেয়েদের কতকটা সহজাত প্রবৃত্তি, কতকটা সময় কাটাবারও একটা অবলম্বন।"

"না-না" তিনি একটু উত্তেজিত ভাবেই বলে উঠলেন—"সময় কাটানোর জন্যে অনেক কাজ রয়েছে—এখনকার মেয়েরা তো অধ্যাত্মবাদ, ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা এ সব মোটেই করেন না…।" আর এক দিন সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "আজকাল সব ফিল্মের গানে আর কান পাতা যায় না—আপনি আমাকে একটা শ্যামাসঙ্গীত শোনান।"

বিভূতিভূষণের সঙ্গে আমার যত ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, ততই উপলব্ধি করেছি, তাঁর জীবন-দর্শন অধ্যাত্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত—তাই তিনি অতীন্দ্রিয় রহস্যসন্ধানীর মত বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরে ঘুরে প্রকৃতি ও জীবনের রহস্যের সন্ধান করেছেন; তিনি ছিলেন আসলে কবি, প্রকৃতির একনিষ্ঠ উপাসক। সেই কবি-কণ্ঠের কাকলি হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে থেমে গেল।

মনের দুকূল ছাপিয়ে বিভূতিভূষণের কত কথাই না স্মৃতিতে জাগছে! তাঁর সঙ্গে একবার নদীপথে একটি সাহিত্য-সভার আমন্ত্রণে খুলনা গিয়েছিলাম। ছই-ঢাকা নৌকা হরিহরের বুকে পাল তুলে এগিয়ে চলে। কোথাও শান্ত তরঙ্গগুলি অস্তসূর্য্যের রঙিন আলোয় ঝলমল করে, কোথাও নদী অশ্রান্ত কলরোলে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। ধারে ধারে সুবিন্যস্ত কত বন উপবন, তরুলতা, বেতস-কুঞ্জ অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। হোগলা কেয়া আর কচুরীবন গায়ে গায়ে জড়িয়ে চলেছে। উজান বেয়ে নৌকা এগিয়ে চলল। বিচিত্রপক্ষ বিহগের সান্ধ্য কূজনে ঘননিবদ্ধ ঝাঁকবন আর বাঁশঝাড় মুখরিত। "আরণ্যকে"র মুগ্ধ কবি বিভূতিভূষণ সমগ্র সত্তা দিয়ে যেন বনলক্ষ্মীর ওই অতুলনীয় সম্পদকে আত্মবিস্মৃত হয়ে অনুভব করছিলেন। নদীর কলতান বোধ করি তাঁর প্রাণের তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলেছিল। মধ্যে মধ্যে তিনি আত্মগত ভাবে বলে উঠছিলেন—"বাঃ বাঃ, চমৎকার, গ্র্যাণ্ড।" আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম—তাঁর সৃজনী প্রতিভা কেন এমন প্রাণ-প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ—প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এবং সমৃদ্ধিকে তিনি সমগ্র হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন।

শেফালিকুঞ্জে বিভূতিভূষণ

আমার অজানা কত বন্য ফুল পাতা লতা নদীর কিনারে কিনারে ফুটেছিল, মাঝে মাঝে দু' একটি ফুল জলে ঝরে পড়েছিল। আমি বিভূতিভূষণের কাছে সেগুলোর নাম জেনে নিয়ে নোট বুকে লিখে নিলাম। কয়েকটি ফেজেন্ট ক্রো এবং কুকো নীড় অভিমুখে উড়ে গেল। এই পাখীগুলির সৌন্দর্য্যের প্রশংসায় তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

এক দিন সাহিত্যসেবীর পরম তীর্থ 'পথের পাঁচালী'র স্রষ্টার পল্লীগ্রামের বাসভবনে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেবার বনগ্রামে বিভূতি-সম্বর্দ্ধনা সমিতির পক্ষ থেকে তাঁকে তাঁর ৪৮তম জন্মদিনে অভিনন্দন জানানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। আমাকে করা হয়েছিল অভ্যর্থনা-সমিতির সভানেত্রী। তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে তাঁর পল্লীনীড়ে গিয়েছিলুম। পল্লীর নিরালা নির্জন শান্ত পরিবেশে কবির ছোট্ট বাড়ীখানি। চতুর্দিকে বড় বড় গাছপালা, আশে-পাশে বন্য ফুলপাতার বিপুল সমারোহ—আগাছাই না কত চারপাশে গজিয়েছে। দূরে বয়ে চলেছে ইছামতী। বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে বসেছিলেন বিভূতিভূষণ, সম্মুখে জলচৌকীর উপর তাঁর রচনার সরঞ্জামাদি রয়েছে—শারদীয়া সংখ্যার জন্য গল্প লিখছিলেন। আমাদের দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললেন, "এত রাস্তা হেঁটে এলেন? আমি

ভাবছিলুম বর্ষা শেষ হলে আপনাকে গাড়ী করে এখানে নিয়ে আসব, এখন কাদায় চাকা বসে যায়।" এর পর তিনি কত না উৎসাহের সঙ্গে যে মাটির গহনতলের উৎস থেকে অপুর প্রাণসত্তা উৎসারিত হয়েছে, "দুর্গার" স্বল্পস্থায়ী জীবন বিকশিত হয়েছে, সেই সব স্থান আমাদের ঘুরে ঘুরে দেখালেন। অনভ্যস্ত পদে আগাছাগুলির উপর দিয়ে চলতে মাঝে মাঝে বিব্রত বোধ করছিলাম। তাই দেখে তিনি বললেন, "অনেকে বলে এই জঙ্গলগুলি নির্মূল করে দিতে, কিন্তু সত্যি বলছি আপনাকে, এইগুলি কেটে ফেলতে আমার বড় কষ্ট হয়।" আমি অনুভব করলাম বলতে বলতে তাঁর গলার স্বর আর্দ্র হয়ে এল। বারান্দায় একখানা লাল সিমেণ্ট-মাটির আসন পাতা ছিল, সেই আসনখানির নিকটে নিয়ে গিয়ে তিনি আমাকে বললেন, "খুব ভোরে সূর্যোদয়ের সময়ে এসে এই আসনে বসবেন, মনের মধ্যে এক অদ্ভুত অনুভূতি আপনার হবে, যেন মনে হবে আপনার মধ্যে একটি নূতন আত্মা অধিষ্ঠিত হয়েছে, আপনি স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করবেন।" তিনি আরও বললেন, উড়িষ্যার কবি ও সাহিত্যিক পাণিগ্রাহীকে তিনি এই আসনে এনে বসিয়েছিলেন। এর পর মুখর কণ্ঠে কত কথা বললেন, কত গল্প করলেন। কল্যাণী দেবীকে বললেন, "দাওগো এঁদের গরম গরম তালের বড়া।"

আমরা কবির নিজে হাতে তুলে দেওয়া তালের বড়া পরম পরিতোষের সঙ্গে আহার করে বিদায় গ্রহণ করলাম। ফেরবার সময় তিনি আমার হাতে একখানা মাসিক পত্রিকা দিয়ে বললেন, "এতে আনাতোল ফ্রাঁসের একটা গল্প আছে পড়বেন। আমি প্রথম জীবনে কত যে ইংরেজী সাহিত্য পড়েছি তার হিসাব নেই।"

আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সদর পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে এসেছিলেন। সেদিন পূর্ণিমার চাঁদ ছিল আকাশে—মুগ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, "কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে আকাশে, এক দিন পূর্ণিমা তিথিতে আসবেন, আমরা ইছামতী নদী দিয়ে অনেক—অনেক দূরে চড়ুইভাতি করতে যাব। ওই বালু কপিক্ষেতে পিক্‌নিক্ আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারি না।" আমি জিজ্ঞেস করলাম—"আপনি এবার কি বই লিখবেন?"

"এইবার আমি 'ইছামতী' উপন্যাস লিখব। এ পরিকল্পনা আমার কবেকার জানেন?

"কবেকার?"

"এই ইছামতী আমার প্রথম উপন্যাসের পরিকল্পনা।" আজ আমার মনে হচ্ছে এই প্রথম পরিকল্পিত উপন্যাসই তাঁর প্রতিভার শেষ স্বাক্ষরস্বরূপে বাংলা-সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিভূতিভূষণের কথা বলতে গিয়ে বড় বেদনার সঙ্গে এই কথাটাই মনে পড়ছে, এত শীঘ্র যে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে হবে তা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। রাঁচীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ট্যাক্সিতে বিখ্যাত হুডরু জলপ্রপাত দেখতে গিয়ে মর্মবিদারক সংবাদ পেলাম। বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কেটে গেল। শোকে অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম উচ্ছলিত জলপ্রপাতের ধারে।

ব্যথিত কণ্ঠে ডাক্তার বললেন, "আমার কানে আজও বেজে উঠছে তাঁর সেই ডাক—"ডাক্তারবাবু আছেন নাকি?"

বিভূতিভূষণের প্রসঙ্গ শেষে করবার আগে আজ বার বার করে তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের ও শেষ দেখার কথাটাই মনে জাগছে। আমরা বৎসর তিনেক বনগাঁয়ে ছিলাম, কত সময় তিনি এসেছেন, কত গল্প শুনিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা আমার দেখা হয়েছিল ১৯৪৮ সনে এপ্রিল মাসে। রাত্রি ১১টার সময় এসেছেন—ডাক শুনে আমরা দরজা খুলে দিলাম। এত রাত্রে ব্যারাকপুর যাওয়া সম্ভব নয়। আমরা খুশি হয়ে তাঁর থাকবার ব্যবস্থাদি করে দিলাম। রাত্রি দুটো পর্যন্ত তিনি বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের গল্প করলেন। শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলেন—সে পরিবারের মধুর আপ্যায়নের গল্পে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বললেন, শিবদাসবাবু ধনীমানুষ হয়েও গুণীর মর্যাদা দিতে ভোলেন নি। কথাপ্রসঙ্গে বললেন, "কৃষ্ণা হাতিসিং-এর সঙ্গে আমার এক দিন আলাপ হয়েছিল—ভদ্র মহিলার ব্যবহার খুব মার্জিত, কিন্তু বড় বেশী সাহেবীভাবাপন্ন। তিনি বললেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম তাঁকে 'আপনার *The Regret* বইখানি চমৎকার। আপনি নিজের ভাষায় লেখেন না কেন?' কৃষ্ণা হাতিসিং জবাব দিলেন, 'I cannot do this, I dream in English'। ইংরেজী চালচলন বিভূতিভূষণ মোটেই পছন্দ করতেন না—এ বিষয়ে নানা আলোচনা করতে লাগলেন। আমি বললাম—"তবু দেখুন ওঁরা গুণী মেয়ে, ওঁদের দোষ, গুণের আড়ালে চাপা থাকে। কিন্তু যারা সময়ের প্রাচুর্য থাকায় অকারণে সাহেবী আদবকায়দা আয়ত্ত করেন—তাঁদের কি শাস্তি দেওয়া যায় বলুন তো?"

"বিশেষ কিছু না"—বিভূতিভূষণ বললেন, "ওদের কিছুদিন ঢেঁকির পাড়ে দাঁড় করিয়ে ধান ভানতে দিন, ক্ষারে কাপড় সিদ্ধ করিয়ে ঘাটে পাঠিয়ে দিন শায়েস্তা হয়ে যাবে।"

হুডরু প্রপাতের কাছে দাঁড়িয়ে—এই সব কথাই

ভাবছিলাম। এই গর্জনমুখর প্রপাত পাহাড় পর্বত বন-বনান্ত কাঁপিয়ে দুর্বার আবেগে ছুটে চলেছে—সমতলে গিয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে সুবর্ণরেখা নদীতে। গ্রাম-গ্রামান্তর পার হয়ে সুবর্ণরেখা বয়ে চলেছে অবিরাম গতিতে। আমরা ভাবছিলাম—এতক্ষণে বিভূতিভূষণের নশ্বর দেহ চিতাভস্মে বিলীন হয়ে গেল, এই সুবর্ণরেখা ধুয়ে-নিয়ে গেল তাঁর শেষ চিহ্ন ভস্মরাশি, এই গিরিনদীর তীরে তীরে মিশে রইল বিভূতিভূষণের শেষ নিঃশ্বাস।

হুডরুর অশ্রান্ত গর্জন ছাপিয়ে আমার মনের মধ্যে স্মৃতির সায়র উদ্বেলিত হয়ে উঠল। বিভূতিভূষণের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের সেই স্মরণীয় দিনটির কথা মনে পড়ল। বৎসর পাঁচেক আগে তখন সবে আমরা বনগাঁ বদলি হয়ে এসেছি। একদিন খবর পেলাম, এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। আমি ঘরে এসে ঢুকতেই মৃদু হেসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি অন্নপূর্ণা ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

তিনি বললেন—"আমি আপনার লেখার একজন Admirer, আপনি বনগ্রামে এসেছেন জেনে দেখা করতে এলুম—"

আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি, বনগ্রাম আসা অবধি অনেকেই দেখা করতে এসেছেন, কিন্তু যেন মনে হচ্ছিল তিনি সাধারণের মধ্যে অসাধারণ, তবু পরিচয় জিজ্ঞেস করতে কুণ্ঠা বোধ করছিলাম।

তিনি বলতে লাগলেন—"আপনি সুন্দর ছোট গল্প লেখেন। আপনার বই কবে প্রকাশিত হচ্ছে ?"

এবার আমি সঙ্কোচ কাটিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—"আপনার নামটা যদি জানতে পারি—কিছু মনে করবেন না—"

তিনি বললেন—"বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়"

"বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়" বিস্ময়ের সঙ্গে আমি জিজ্ঞেস করলাম—"পথের পাঁচালীর অমরস্রষ্টা বিভূতিভূষণ ?"

স্নিগ্ধ অথচ গম্ভীর হেসে তিনি উত্তর দিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

আমি আনন্দপ্রকাশ করে জানালাম—কি সৌভাগ্য আমার, আপনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার মত নগণ্যা লেখিকার বাড়ী এসেছেন ? কোথায় আমি যাব আপনার বাড়ীতে ? এর পর আমি তাঁকে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতে লাগলাম। অপুর কথা, দুর্গার কথা সদ্যপ্রকাশিত 'দেবযানে'র কথা।...

আমরা যতদিন বনগ্রামে ছিলাম আমার সাহিত্য-চর্চায় কত উৎসাহ, কত অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। কেবলই বলেছেন—"থেমে যাবেন না, দাঁড়িয়ে পড়বেন না, আপনার মধ্যে শক্তি রয়েছে, সাংস্কৃতিক জীবনকে আপনি সর্বাঙ্গীণ ভাবে বিকশিত করে তুলুন। নিজের চেষ্টাই মানুষকে বড় করে।" আরও বলেছেন, "আমি যদি ভাগলপুরে থাকতাম আমার 'পথের পাঁচালী' বনে ফুটে বনেই তার সৌরভ বিকীর্ণ করে ঝরে পড়তো। উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর কাছে প্রেরণা পেয়ে আমি কলকাতা এসেছিলাম। সাহিত্য-জীবনে তাঁর কাছে পাওয়া এই উৎসাহ, এই প্রেরণা কত যে দুর্লভ তাই শুধু আমি ভাবছি।" আজ বার বার শুধু এই কথাই মনে হচ্ছে, এমনি শিশুর মত সরল, নিরহঙ্কার অমায়িক ছিলেন বলেই তাঁর সার্থক সৃষ্টি 'পথের পাঁচালী'র অপু ও দুর্গা বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে রইল। এই অমর সাহিত্য-স্রষ্টার উদ্দেশে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

দাবাখেলা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

দাবাখেলার জন্মস্থান ভারতবর্ষ। ইহা বহু প্রাচীন যুগের খেলা। ত্রেতাযুগে নাকি রাবণ মন্দোদরীর সহিত দাবা খেলিতেন, দ্বাপরে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত দাবা খেলিয়া সৈন্যসমাবেশের কৌশলাদি বুঝাইতেন। সংস্কৃতে এই খেলার নাম চতুরঙ্গ খেলা। সংস্কৃত "চতুরঙ্গ" হইতে আরবি "শতরঞ্জ" শব্দের উৎপত্তি অনেকের ধারণা যে, মুসলমান আমলে বাংলার এই খেলাকে 'শতরঞ্জি' খেলাবলা হইত। বহু পুরনো পুস্তকেও এই খেলার উল্লেখ দেখা যায়; কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় কিংবা অপর কোন ভারতীয় ভাষায় শুধু দাবাখেলার বর্ণনামূলক গ্রন্থের সন্ধান বেশী পাওয়া যায় নাই। কেবল-মাত্র নিছক দাবাখেলা সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকের সংখ্যা নগণ্য। ১৯৩৬ সালে দাবাখেলার বিশদ বর্ণনামূলক পুস্তক "চতুরঙ্গ

দীপিকা" আবিষ্কৃত হইয়াছে। কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির এক অধিবেশনে অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় দাবাখেলা সম্পর্কিত আরও তিনটি সংস্কৃত পুস্তকের সন্ধান দেন। সেগুলির নাম—(১) বিলাসমণি মঞ্জরী—রচয়িতা ত্রিবেঙ্ক আচার্য্য ; তিনি পেশোয়া বাজীরাওয়ের আদেশে এই গ্রন্থ রচনা করেন ; (২) চতুরঙ্গ রচনা—শিবের পৌত্র ও শঙ্করের পুত্র জ্যোতির্বিদ গিরিধর এই গ্রন্থের রচয়িতা ; (৩) শতরঞ্জ কুতূহলম্ বা বুদ্ধিবলম্—লেখকের নাম জানা যায় না ; শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে এই খেলার বিষয় বুঝাইতেছেন এই ভাবে দাবা-খেলার বর্ণনা করা হইয়াছে। চিন্তাহরণ বাবু এই শেষোক্ত পুস্তকখানি সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন এবং উহার ভূমিকায় দাবাখেলা সম্বন্ধীয় আরও কয়েকখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা :—গৌড়দেশীয় স্মার্ত্তপ্রবর শূলপাণি কৃত বলিয়া অনুমিত চতুরঙ্গ-দীপিকা, পূর্ব্বোক্ত ত্রিবেঙ্ক উপাচার্য্য প্রণীত বুদ্ধিবলসপ্তকং, নেপালের চতুরঙ্গ পদ্ধতি (এই গ্রন্থের উল্লেখ চতুরঙ্গ দীপিকায় আছে) ; দিব্যমালিকা নামক গ্রন্থ—ইহারও উল্লেখ চতুরঙ্গ-দীপিকায় দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ আরও কত গ্রন্থ আছে কে জানে ? এগুলির সন্ধান হওয়া আবশ্যক। চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত "সতরঞ্জকুতূহলম" পুস্তকে অন্যান্য অনেক বিষয়ের অবতারণা করিলেও দাবাখেলার পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন নাই।

বর্ত্তমান কালে দাবার ছক্ ছাপানো কাগজের হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ইহা বস্ত্রখণ্ড সেলাই করিয়া তৈয়ারি হইত। লেখক তাঁহার অতিবৃদ্ধ পিতামহীর স্বহস্তে প্রস্তুত, বনাতের উপর নানা বর্ণের ছিট দিয়া ঘর-করা দাবার ছক্ দেখিয়াছেন। চেপ্‌টা মাটির সরার উপর প্রতিমার গায়ে যে রকম রং দেওয়া হয় সেইরূপ রং দেওয়া দাবার ছকও দেখিবার সুযোগ তাঁহার হইয়াছে। পূর্ব্বে যে বস্ত্রনির্ম্মিত ছকের প্রচলন ছিল তাহা 'সতরঞ্জকুতূহলমে'র নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে বুঝা যায় :

সহ্ননামন্বে বস্ত্রখণ্ডে বিশালে
চতুঃ কোণযুক্তে সমন্তাৎ সমানে।
চতুঃষষ্টি কোষ্ঠানি কৌষেয়সূত্রৈ-
র্বিধায়াদিকোণাদিকোষ্ঠাদি-ভাজাঃ ॥

বর্ত্তমানে বাংলায় প্রচলিত সাধারণ দাবাখেলার "বলের" (ঘুঁটি) নাম ও স্থান যথাক্রমে নিম্নে দেওয়া হইল :

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বোড়ে	বোড়ে	বোড়ে	বোড়ে	বোড়ে	বোড়ে	বোড়ে	বোড়ে
নৌকা	ঘোড়া	গজ	রাজা	মন্ত্রী	গজ	ঘোড়া	নৌকা

উপরোক্ত গ্রন্থে কিন্তু এইরূপ দেওয়া আছে :

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
পত্তি	পত্তি	পত্তি	পত্তি	পত্তি	পত্তি	পত্তি	পত্তি
হস্তী	হয়	উষ্ট্র	সেনাপতি	সার্ব্বভৌম	উষ্ট্র	অশ্ব	নাগ

নৌকার কোন উল্লেখ নাই—উষ্ট্র একটি নূতন 'বল'। সাধারণতঃ মন্ত্রী (যে নামেই এই 'বল' অভিহিত হউক না কেন) রাজার ডাহিনে থাকে ; এই পুস্তিকার বর্ণনা অনুসারে মন্ত্রী (সেনাপতি) রাজার (সার্ব্বভৌমের) বাঁ দিকে বসেন। ইহা একটি বৈশিষ্ট্য। বলের গতি সম্বন্ধে বর্ত্তমানে প্রচলিত খেলার সঙ্গে উক্ত পুস্তকের বর্ণনার বিশেষ পার্থক্য নাই। "হস্তী"র সাধারণ নৌকার ন্যায় গতি। "হয়" ঘোড়ার ন্যায় আড়াই ঘর যায়। "উষ্ট্র" সাধারণতঃ গজের ন্যায় কোণাকুণি চলে।

মহাভারতের যুদ্ধের সময় চতুরঙ্গের 'বল' বলিতে রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক বুঝাইত। যুদ্ধে উষ্ট্রের ব্যবহার কদাচিৎ হইত। রাজপুতানার মরুপ্রান্তরে উষ্ট্রসাদী সৈন্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের অনুমান লেখক রাজপুতানা অঞ্চলের লোক। বাংলার নৌ-বলের কথা আমরা কালিদাসের রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে পাই। বার ভুঁইয়ার নৌ-বল ইতিহাসপ্রসিদ্ধ—ইঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য মোগল বাদশাহেরা 'নৌয়ারা' প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার দাবাখেলায় চতুরঙ্গ 'বলে'র মধ্যে নৌকার স্থান হওয়া বিচিত্র নহে। এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান এবং অধিকতর তথ্যসংগ্রহ করা আবশ্যক।

"সতরঞ্জ-কুতূহলম"-এর মতে খেলার নাম 'শতরঞ্জ' হইয়াছে, কেননা ইহা শত (বহু) লোকের মনোরঞ্জন করে।

নরশতান্ননুরঞ্জতি ধ্রুবং
তদুদিতং শতরঞ্জমতোঽর্থতঃ।

আরও একটি কারণে এই খেলার নাম "শতরঞ্জ" হইতে পারে। আজকালকার ন্যায় আগেকার দিনেও কাপড়ের ছক্ একরঙা বস্ত্রের উপর ছিটের কাপড় সেলাই করিয়া তৈরি হইত। সে কারণ ৩২টি ঘর কাপড়ের যে রং সেই রঙের হইত ; কিন্তু বাহারের জন্য বাকি ৩২টি ঘর নানা বিচিত্র বর্ণের ছিটের কাপড় দিয়া তৈরি করা হইত। এইরূপ ছক বহুবর্ণবিশিষ্ট শতরঞ্জের ন্যায় বলিয়া এই ছকের উপর যে খেলা হয় তাহার নাম শতরঞ্জ খেলা হইয়াছে, এইরূপ অনুমিত হয়।

ঘোড়ার চৌষট্টি ঘর ভ্রমণের সঙ্কেতবিষয়ক বাংলা ভাষায় ছাপা পুস্তকও দেখিয়াছি। এ বিষয়ে হস্তলিখিত বা মুদ্রিত বাংলা পুস্তক সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান হওয়া উচিত। তাহা হইলে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

আপতাবে মোসিকী ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ

শ্রীওঁকারনাথ চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীত-সম্রাট্ ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেব বিগত ৫ই নভেম্বর বরোদায় পরলোকগমন করিয়াছেন। ইং ১৮৮১ সালে রমজানের সময় আগ্রায় এই কলাবিৎ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মিঞা রঙ্গীলের পৌত্র; মিঞা রঙ্গীলে সহস্র রঙ্‌দার গান রচনা করিয়া রঙ্গীলে নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের মাতৃকুলও খ্যাতনামা গায়ক-বংশ—তাঁহার মাতামহ গোলাম আব্বাস খাঁ ওরফে খোদাবক্‌স্ অতি প্রসিদ্ধ কলাবিৎ ছিলেন; খোদাবক্‌সের কণ্ঠস্বর ছিল গুরুগম্ভীর। 'মলুহা কেদার', 'মিয়া মল্লার' 'দরবারী কানড়া' প্রভৃতি গম্ভীর প্রকৃতির রাগ তাঁহার কণ্ঠে মূর্ত্ত হইয়া উঠিত।

খোদাবক্‌সের গম্ভীর সুরাল আওয়াজ ফৈয়াজ খাঁ উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন। খাঁ সাহেব যখন মাতৃগর্ভে, তখন তাঁহার পিতা সব্দর হোসেন খাঁর মৃত্যু হয়। গোলাম আব্বাস খাঁ এই পিতৃহীন বালককে শৈশবকাল হইতে লালন-পালন করেন। গোলাম আব্বাস খাঁ আগ্রায় বাস করিতেন। ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের পিতৃকুল মাতৃকুল উভয় দিকেই ধ্রুপদ ধামারের ঘরওয়ানা, এই জন্য খাঁ সাহেব প্রথম ধ্রুপদ ধামারের শিক্ষাই পাইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ বেজ বোওয়া তাঁহার 'সঙ্গীতকলা প্রবেশ' নামক পুস্তকের ১ম ভাগে গোলাম আব্বাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"আমি...নত্থন খাঁর সঙ্গে আগ্রায় গিয়াছিলাম। সেখানে জহরা বাঈ-এর বাড়ীতে এক জলসায় গোলাম আব্বাস খাঁর গান শুনিবার সুযোগ মিলিয়াছিল; আব্বাস খাঁ দুটি রাগ গাহিয়াছিলেন, মিয়াঁকী তোড়ী ও আশাবরী। এরূপ বিলম্ব পদ গায়ক খুব কমই দেখা যায়; প্রথমতঃ বিলম্ব পদ বা বিলম্বপৎ গাওয়া সহজসাধ্য নহে, তাহার উপর তোড়ী ও আশাবরী রাগের রূপসৃষ্টি অত্যন্ত কঠিন। এই সকল রাগ তানবাজীর রাগ নহে, তান-সুলভ রাগ ভিন্ন প্রকৃতির; সব রাগে তানবাজী কি ভাল? ফৈয়াজ খাঁ সাহেব বিলম্বিত গায়কীতে পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি তোড়ী, আশাবরী, রামকেলি প্রভৃতি রাগে অসামান্ত কুশলতার পরিচয় দিতেন। এই কুশলতার কিছু নমুনা, 'গরবা মৈয় সংগ লাগী', এই গ্রামোফোন রেকর্ডে তিনি রাখিয়া গিয়াছেন; ইহা তাঁহার উৎকৃষ্ট রেকর্ড। ইহার স্থায়ী, অন্তরা, আলাপ ও তোড়ীর বিশিষ্ট গান্ধার এবং বোলতানের তুলনা নাই। বরোদার চাকরী লওয়ার কিছু পূর্ব্বে ফৈয়াজ খাঁ সাহেব মহীশূরে ১৯১১ সালে আপতাবে মোসিকী উপাধি পাইয়াছিলেন। ঐ সময় সয়াজী রাও মহারাজের এক পর্ব্ব উপলক্ষে বরোদায় গিয়াছিলেন; খাঁ সাহেবের গানে মহারাজ মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দরবার-গায়ক নিযুক্ত করেন। বরোদা-সরকার খাঁ সাহেবকে 'জ্ঞান-রত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন।

ফৈয়াজ খাঁ

খাঁ সাহেব অনেক শিষ্যকে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর (অধ্যক্ষ, মরিস কলেজ, লক্ষ্ণৌ), দিলীপচাঁদ বেদী (ভাস্কর বুয়ার প্রাক্তন শিষ্য), প্রসিদ্ধা মানকাজান (আগ্রাওয়ালী), সয়াকৎ হোসেন, শ্যাম জোশী, মোহন সিংহ, সব্বীর মহম্মদ খাঁ (মৃত), আতা হোসেন, স্বামী বল্লভদাস, অজমত হোসেন, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও পরলোকগত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী ইত্যাদি।"

ইন্দোরের মহারাজ তুকাজীরাও প্রসিদ্ধ সঙ্গীতরসিক। তিনি ১৯০৫ সালে হোলি উৎসবে খাঁ সাহেবকে দশ হাজার টাকার রত্নহার, পাঁচ হাজার টাকার বস্ত্র ও নগদ দশ হাজার টাকা উপহার দিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেন। ফৈয়াজ খাঁ সাহেব 'প্রেম প্রিয়া' এই নামে গান রচনা করিতেন। তাঁহার স্ব-রচিত কয়েকটি গানের উল্লেখ নিম্নে করা হইল:—'মোরে মন্দর অবলো' (জয়-জয়ন্তী), 'আঁখিয়া উন সোঁ লাগ রহি' (ঝিঁঝিট), 'এ মরি হোড় (সুখরাই), 'সগরী ডমরিয়া সোরি' (বৃন্দাবনী সারঙ্গ), আলি হটো যাও সৈঁয়া (সোহিনী), কৈ সে কর রাদু জিয়া (শ্যাম কল্যাণ), তন মন ধন পরবার (গারা কানড়া)। ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের গায়কী সম্বন্ধে, পরলোকগত প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য রামকৃষ্ণ বেজ বোওয়ার এই উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"বিগত দিনের ইন্দ্র, চন্দ্র, সাদৃশ্য গায়কসমূহ, যথা—ভুগন্ধর্ব্ব

রহিমত খাঁ (হদ্দূ খাঁ সাহেবের পুত্র), প্রখ্যাত নত্থন খাঁ ও ভাস্কর বোওয়া প্রভৃতির অস্থায়ী অন্তরা গাহিবার অপূর্ব্ব ঢং,

বাম দিক হইতে : সরাফৎ হোসেন, গোলাম রসুল, ফৈয়াজ খাঁ ও আতা হোসেন

সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য, রাগশুদ্ধ তথা তাল শুদ্ধ গায়কী এই ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের গানেই অবশিষ্ট আছে।" খাঁ সাহেবের গায়কীর আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি গানের মধ্যে সময় সময় কৌতুকাবহ রীতিতে রঙ্ সৃষ্টি করিতেন। ইহা যেন মনে হয়, দুরূহ স্বরসংযোজনা, কঠিন 'লয়' ও রাগদারীর সংযম-প্রসূত কঠোরতা, পাছে শ্রোতাদের মনকে ক্লিষ্ট বা ক্লান্ত করে সেইজন্য উক্তরূপ রঙ্গভঙ্গী আনিয়া তাদের মনকে হাল্কা করিয়া দিতেন যাহার ফলে বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার গান শুনিবার পরও মনে কোন অবসাদ আসিত না। শ্রাব্য সৌন্দর্য্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও রসসৃষ্টি করিবার অতুলনীয় দক্ষতা ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের ছিল। তিনি গানের ভাব ও ভাষাকে মূর্ত্ত করিয়া শ্রোতাদের মনে এমন ভাবে চিত্রিত করিতেন যে তাহা একটি কাব্য অথবা নাটকের রূপ ধারণ করিত। এই অনুপম কলা কি ভাবে প্রদর্শিত হইত, তাহা নিম্নে তাঁহার একটি গান উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছি।

(নট—বেহাগ)

"ঝন্ ঝন্ ঝন্ পায়েলিয়া বাজে,
জাগে মোরি শাষ ননদীয়া, ঔরে দেওরনীয়া।"

ভাষার দিক দিয়া, এই শব্দগুলির এমন কিছুই মহিমা নাই, কিন্তু বৈচিত্র্যপূর্ণ সুর ও ছন্দের মাধ্যমে যখন এই পদগুলি অভিব্যক্ত হইত, তখন "ঝন্ ঝন্ ঝন্" শব্দ কণ্ঠে ধ্বনিত হইলেও মনে হইত উহা যেন প্রকৃতই নূপুরের একটি স্বপ্নময় ছন্দ। পরে শঙ্কা-শিহরিত ভঙ্গীতে "জাগে মোরি শাষ ননদীয়া" পদটি গীত হইবার সময়, শ্রোতাদের মনে এইরূপ একটি চিত্র ভাসিয়া উঠিত :—প্রেমাস্পদের সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষায়, গভীর নিশীথে নীরব ও নিদ্রিত পুরী হইতে গোপনে বাহির হইবার কালে, অভিসারিকা এই ভাবিয়া শঙ্কাকুলা যে, অধীর-চরণে বদ্ধ নূপুরের রুনুঝুনু আওয়াজ ননদী দেওরাণী (দেবরের স্ত্রী) প্রভৃতিকে জাগাইয়া তুলিলে, অথবা তাহারা জাগিয়া থাকিলে আর রক্ষা নাই। লগ্নভ্রষ্ট হইয়া সকলই বিফল হইবে—এই আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত অভিসারিকার হাবভাব ও মনের উৎকণ্ঠা-দ্যোতক উক্ত গানের পদগুলি ভাবানুকূল ধ্বনি ও ছন্দে লীলায়িত হইয়া শ্রোতাদের মানস-পটে একটি গতিশীল চিত্রের আকার ধারণ করিত এবং তাহা ধীরে ধীরে মনকে আচ্ছন্ন করিয়া এক অভিসার-নাটকের রঙ্গমঞ্চে টানিয়া লইয়া যাইত। গান শেষ হইলে, স্বপ্নোত্থিতের মত শ্রোতাদের মনে হইত—নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই যেন নাটকের অবসান হইল। এইরূপ মায়ালোক রচনা করার শক্তিকেই সঙ্গীতকলার সাধনার চরম সিদ্ধি বলা যাইতে পারে।

এখন প্রকৃতির লীলা এবং শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকলাবিদের রূপ ও রসসৃষ্টির মধ্যে কিরূপ ঐক্য আছে তাহারই আলোচনা করিব।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের প্রখর রৌদ্রের পরে, আষাঢ় শ্রাবণের ধারায় ধরা সিক্ত-শ্যামল হইয়া উঠে। আবার মেঘমুক্ত আকাশে মধুর হাসিয়া শরতের চন্দ্র উদিত হয়, সেইরূপ কলাবিদের গুরুগম্ভীর কণ্ঠের গমক ও তানের ঘন-ঘটায় যে রুদ্ররূপ প্রকাশ পায়, তাহাই বিয়োগান্ত শৃঙ্গারের বিগলিত করুণায় ঝুরিয়া ঝুরিয়া এক নব বসন্তের সূচনা করে। এই ভাবে রৌদ্র, শৃঙ্গার, বিয়োগান্ত শৃঙ্গার, হাস্য-কৌতুক প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী রসের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাবেশে যে কি অপূর্ব্ব অখণ্ড রসের সৃষ্টি হয়, তাহা ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের গায়কীর মর্ম্মকথার বোদ্ধামাত্রেই অবগত আছেন।

ফৈয়াজ খাঁ সাহেব কখনই একথা বিস্মৃত হইতেন না যে, গানের আসরে লয়, মান, রাগ ঠিক ঠিক অনুধাবন করিবার মত মুষ্টিমেয় কয়েকজন রসজ্ঞ শ্রোতা ব্যতীতও যে বহু জন শুধু মাধুরীর জন্য লালায়িত, রসাস্বাদের জন্য তৃষ্ণার্ত্ত, তাহাদের বিমুখ করা চলে না। সেইজন্য তিনি ঠুংরী, গজল, লাউনী, শাউনী প্রভৃতি লঘু চালের গানও গাহিতেন। গত বৎসর কলিকাতায় নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে খাঁ সাহেব, এই অনুষ্ঠানের শেষ রজনীতে, রাত্রির অন্তিম প্রহর হইতে প্রভাত অবধি, ভৈরবী, দাদরায়—"বাতিয়াঁ বনাও"—গানটি গাহিয়া শ্রোতাদের মনে অপূর্ব্ব আনন্দ দান করিয়াছিলেন।

মুঘল বাদশাহী আমলের জাঁকজমকপূর্ণ চমকদার গায়কীর রঙ্গীন বিকাশের রশ্মি ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেব যে ভাবে বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার স্মৃতিকে বরণীয় করিয়া রাখিবে।*

* এই প্রবন্ধের ছবি দু'খানি শ্রীআশারাম চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে।

মোগলযুগে ভারতীয় জীবন

ডক্টর শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত

মানুষের চিন্তাশক্তির চিরনূতনত্বের জন্ত যুগে যুগে প্রত্যেক বিষয়ের আলোচনার দ্বারা পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। এক সময়ে ঐতিহাসিকগণ রাজনৈতিক বিষয় নিয়েই ইতিহাসের আলোচনা করতেন; কিন্তু আজকাল এ মতবাদের পরিবর্ত্তন হয়েছে। এখন অনেক ঐতিহাসিক সামাজিক ইতিহাসের উপর বিশেষ জোর দিচ্ছেন। তাঁরা বলতে চান যে, সামাজিক ইতিহাস বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়—কারণ এই আলোচনার দ্বারা আমরা জনসাধারণের ইতিহাস জানতে পারি। জানতে পারি তাদের সুখদুঃখের কথা, তাদের আশা-নিরাশার কাহিনী।

ভারতবর্ষের ইতিহাস নিয়ে আজ প্রায় দুই শতাব্দী হ'ল ভারতীয় ও অভারতীয় পণ্ডিতদের গবেষণা চলছে। এর ফলে আমরা অনেককিছু জানতে পেরেছি। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে প্রধানত: তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা, প্রাচীন বা হিন্দু যুগ, মুসলমান যুগ এবং বর্ত্তমান বা ইংরেজ আমল। মধ্যযুগের সবচেয়ে গৌরবময় কাল হচ্ছে মোগলযুগ। মোগলযুগ আরম্ভ হয় ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে, যখন বাবর ভারতে এসে এক নূতন রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং শেষ হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন হৃতসর্ব্বস্ব মোগলবাদশা বাহাদুর শাহ ইংরেজের হাতে বন্দী হন। মোগল-রাজত্বের গৌরবময় যুগে বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাজাহান ও আওরঙ্গজেব ভারতবর্ষকে শ্রেষ্ঠ রাজ্যে পরিণত করেন। মোগলসাম্রাজ্যের গৌরব-রবি ধীরে ধীরে অস্তমিত হয়ে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে চিরতরে বিলীন হয়ে যায়।

এ যুগের ভারতীয় জীবনের ইতিহাস আমরা সমসাময়িক ফরাসী ও ভারতীয় ভাষাসমূহে লিখিত গ্রন্থ, সমসাময়িক ইউরোপীয় পর্য্যটকদের রচনা এবং ইউরোপীয় বাণিজ্যদপ্তরের বিবরণ থেকে প্রাপ্ত হই।

তখনকার দিনে এদেশেও সম্রাট্ ছিলেন সবার উপরে। তাঁর পরই ছিলেন তাঁর প্রসাদভোগী ধনী ব্যক্তিগণ। তাঁরা এমন সম্মান ও প্রতিপত্তি ভোগ করতেন যা অন্যান্য শ্রেণীর লোকের আয়ত্তের বাইরে ছিল। মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকেরা সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। ভারতের পশ্চিমপ্রান্তস্থিত প্রদেশের সওদাগরেরা বিলাস-ব্যসনে মগ্ন থাকতেন। নিম্নশ্রেণীর লোকেদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। তাদের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অন্নবস্ত্র জুটত না; কিন্তু তাদের চাহিদাও বেশী ছিল না। মিতাচার সমাজের প্রধান বিশেষত্ব ছিল।

যে সব সামাজিক প্রথা প্রচলিত ছিল তন্মধ্যে সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলিন্যপ্রথা ও বিবাহে যৌতুকদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান যুগে এদের কোনও কোনওটি একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছে। সেযুগেও এসব প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা গিয়েছে। যাতে বাল্যবিবাহ ও যৌতুকপ্রথা লোপ পায় তার জন্ত আকবর চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু তাঁর চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। বিধবা-বিবাহ মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণেতর জাতি এবং পঞ্জাব ও যমুনা-উপত্যকার জাঠজাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। অন্যান্য প্রদেশে ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিধবা-বিবাহের প্রচলন ছিল না।

সেযুগেও চাল, ডাল, মাছ, মাংস, চিনি, নুন, ঘি, গুড় প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী দ্বারা আহার্য্য প্রস্তুত হ'ত। তবে কিভাবে এ সব খাদ্যসামগ্রী রন্ধন করা হ'ত সে সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। জন ফ্লেট নামক একজন ওলন্দাজ লেখক বলেছেন যে, চাল-ডাল মিশ্রিত খিচুড়ি একটি প্রধান খাদ্য ছিল। কিছু মাখন মিশিয়ে রাত্রিতে সাধারণ লোকেরা ঐ খিচুড়ি খেত। জনসাধারণ দিনে একবারই পেট ভরে খেত।

ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ; সেজন্ত এদেশে কখনও বেশী কাপড়-জামা পরার রেওয়াজ ছিল না। মোগলযুগেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। সমাজের বিভিন্ন স্তরের নরনারীর জন্ত বিভিন্ন প্রকারের বেশভূষা প্রচলিত ছিল। সম্রাট্ আকবরের পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা হতে আমরা শ্রেষ্ঠ সমসাময়িক অভিজাতসম্প্রদায়ের পোশাক-পরিচ্ছদের আভাস পাই। আকবর পায়জামা, আলখেল্লা ও প্যাগড়ী পরিধান করতেন এবং পাদুকা পরতেন। মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ এর চেয়ে কিছু নিম্নস্তরের পোশাক পরিধান করতেন। নিম্নস্তরের ব্যক্তিগণের পোশাক-পরিচ্ছদের কোনরূপ বাহুল্য ছিল না।

মোগলযুগে কয়েক প্রকার ঘরের ও বাইরের ক্রীড়া প্রচলিত ছিল। মোগল-সম্রাটগণ মৃগয়া করতে ও অন্যান্য বাইরের ক্রীড়াতে যোগদান করতে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁরা পশুতে পশুতে লড়াই, মানুষে মানুষে যুদ্ধ এবং পশু ও মানুষের মধ্যে যুদ্ধ দেখতে ভালবাসতেন। যে সব বাইরের ক্রীড়া মোগলসম্রাটগণ ভালবাসতেন তার মধ্যে কুস্তি, পায়রা-উড়ানো প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সে যুগের ঘরের ক্রীড়ার মধ্যে দাবা, দশ-পঁচিশ ও তাসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

হিন্দুদের ভেতরে তীর্থযাত্রার খুব প্রচলন ছিল; মুসল-

মানদের মধ্যে মক্কাতে তীর্থযাত্রা করায় প্রথাও বিদ্যমান ছিল। এজন্ত জাহাজ রাখা হ'ত। ইটালীয় পর্য্যটক নিকোলো কণ্টি ও ইংরেজ পর্য্যটক এডওয়ার্ড টেরীর বিবরণ থেকে আমরা এর বর্ণনা পেয়ে থাকি। খুব বড় বড় জাহাজ যাত্রীদের মক্কাতে নিয়ে যেত।

সেযুগে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রচলন ছিল, সম্রাট্ ও ধনী ব্যক্তিগণ শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

তখন স্ত্রীশিক্ষা কিছু পরিমাণে ছিল। সম্রাট্-পরিবারের ও অভিজাত-পরিবারের নারীগণকে গৃহেই শিক্ষা দেওয়া হ'ত। মোগলযুগে কয়েকজন উচ্চশিক্ষিতা রমণীর কথা জানতে পারি; যথা—গুলবদন বেগম, সালিমা সুলতানা, নুরজাহান, মমতাজ, জাহানারা বেগম ও জেবুন্নিসা।

মোগল যুগে ভারতীয় জীবনে নূতন ভাবের সংমিশ্রণ হয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমানের অনেক সময় সংঘাত হয়েছে বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু সম্রাটের সুযোগ্য রাজ্য-শাসন-ব্যবস্থার ফলে হিন্দু-মুসলমানের জীবন সুখময়ই হয়েছিল।

* অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর সাহিত্য-বাসরে পঠিত এবং কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

আমন্ত্রণ

শ্রীঅমরকুমার দত্ত

ঝড়-ঝঞ্ঝার দাপট চলেছে চারিধার মোর ঘিরে
তার মাঝে একা চলিয়াছি আমি প্রান্তর-পর্ব্বতে।
মোর সাথে সাথে চলিবে কি কেহ? উর্দ্ধ গিরির শিরে?
তুষারের পথে, পথ করি লয়ে উজান খরস্রোতে?

বসতি আমার শহরের এই পরিধিতে নহে কভু,
বন্ধ দুয়ার প্রাচীরেতে ঘেরা ক্ষুদ্র ঘরের মাঝে;
আমার উপরে সুনীল স্বর্গে শোভিছে জগৎ-প্রভু,
মত্ত তুফান আঘাতিয়া মোরে বিদ্রোহ তুলিয়াছে।

খেলা করি আমি হেথায় বসিয়া এই বিজনতা লয়ে,
বিপদ হয়েছে বন্ধু আমার দুঃসাহসের সাথী।
মহান্ জীবন কে লভিবে আজ? কে রবে মুক্ত হয়ে?
বাত্যা-তাড়িত উচ্চ অচলে উঠ তবে ধরি বাতি।

স্বামী আমি আজ মত্ত ঝড়ের, গিরিনাথ আমি আজ,
প্রেরণা যে আমি মহামুক্তির, মহাজাতি মহিমায়,
বিপদ-দোসর হবে সেই জন, প্রলয়ের নটরাজ,
সাথে যে চলিবে, হবে যে আমার রাজ্যের ভাগীদার।*

* আলিপুর জেলে রচিত শ্রীঅরবিন্দের 'Invitation" নামক কবিতার মর্ম্মানুবাদ।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী অরুণা সেনগুপ্তা এই বৎসর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় ইংরেজীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। প্রথম ভাগে (অর্থাৎ part I এ) তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন এবং কেবলমাত্র তিনিই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। বহু বৎসর যাবৎ ইংরেজী এম-এ. পরীক্ষায় পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেহ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন নাই। দ্বিতীয় ভাগে শ্রীমতী অরুণা দ্বিতীয় শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এবারেও কেহই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন নাই।

শ্রীমতী অরুণা বিহারের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্স লে: কর্ণেল এম, এক. গুপ্ত, আই-এম-এস-এর কন্তা।

শ্রীঅরুণা সেনগুপ্তা

আলোচনা

"আসামের আদিম জাতি"

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

গত ভাদ্র মাসের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গের উপরোক্ত নিবন্ধে আপনারা লিখিয়াছেন যে, "অহোমিয়া" ভাষাকে আসামের রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা হইতেছে ও "আহোম" ভাষা-ভাষী লোকের সংখ্যা জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। আপনাদের এই উক্তি যথাযথ নহে। আসামে অহোমিয়া ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার কোন চেষ্টা হয় নাই, অসমীয়া (Assamese) ভাষাকেই রাজ্য-ভাষা করার চেষ্টা হইতেছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, "অসমীয়া" বাংলা ভাষার মতই মাগধী প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত একটি "নব্য-ভারতীয় আর্য্য-ভাষা"। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পর্য্যন্ত এই ভাষায় পঠন-পাঠন ও পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা আছে। ভারতবর্ষের নূতন রাষ্ট্র বিধির ৮ম তপশীলে ভারতে প্রচলিত ১৪টি ভাষার মধ্যে এই প্রগতিশীল ভাষাটিও গৃহীত হইয়াছে।

বাংলাদেশে যেমন "ব্রাহ্ম", ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি হিন্দু সমাজের এক একটা সম্প্রদায়, আসামে আহোমেরাও তেমনি একটি সম্প্রদায়, "আহোম" মাত্রই "অসমীয়া" কিন্তু অসমীয়া মাত্রই "আহোম" নহেন···যেমন বাঙ্গালী মাত্রই "ব্রাহ্মণ", "ব্রাহ্ম" অথবা "বৈদ্য" বা কায়স্থ নহেন। মানব-জাতির ভোট-মোঙ্গোল শাখার অন্তর্ভুক্ত এই "আহোমেরা" খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আসামে প্রবেশ করেন ও বাহুবলে এই দেশের বিস্তীর্ণ ভূভাগ অধিকার করিয়া তদবধি এই দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। কালে ইঁহারা হিন্দুধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বহুলাংশে আর্য্য-সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়াছেন। আহোমদের নিজস্ব ভাষা ও লিখনরীতি আছে তবে উহার ব্যবহার খুব সীমাবদ্ধ, অহোমিয়া ভাষাকে রাজ্যভাষা করার কোন আন্দোলনের অস্তিত্ব আসামে নাই, সুতরাং আপনাদের উল্লিখিত "অহোমিয়া" চক্রান্তও আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক বিষয়। বাংলাদেশে অসমীয়া ও আহোম বা অহোমিয়া কথাগুলি সমার্থক ভাবে ব্যবহৃত হওয়ায় বহু ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বাংলাদেশের অনেক সংবাদপত্রে ভিন্ন প্রদেশের ভাষা ও অধিবাসীদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ মন্তব্যাদি প্রকাশিত হয়, ইহার ফলে প্রবাসী বাঙালীদের প্রবাসের দুঃখ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় মাত্র। প্রদেশে প্রদেশে শ্রদ্ধা ও প্রীতির বন্ধন যাহাতে দৃঢ়তর হয় বর্ত্তমানে সেইরূপ চেষ্টারই প্রয়োজন।

প্রবাসী-সম্পাদকের মন্তব্য

পত্রলেখক যে ভুল দেখাইয়া দিয়াছেন তাহার জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকার বাসিন্দা। অতীত যুগে যেমন অনেক বাঙালী আসামে গিয়াছিলেন, এবং কালক্রমে আসামের সমাজে মিশিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আজ সম্ভব হইতেছে না কেন? পত্রলেখক বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশিত আসাম সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করিতে পারেন। গত একশত বৎসরে অনেক বাঙালী আসামে গিয়াছেন, তাঁহারা পরস্পরের সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান-বিস্তার করিয়া দুই সমাজের মধ্যে যোগসূত্ররূপে কাজ করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা হয় নাই। এবং সেইজন্য ভারতবর্ষের নানা সংস্কৃতির লোকেরা রেষারেষি করিয়া নিজেরাও মজিতেছেন, রাষ্ট্রকেও বিপন্ন করিতেছেন। সংবাদ-পত্রের মন্তব্যাদি তাঁহার জন্য দায়ী নয়। আমরা অনেকেই প্রতিবেশী-সমাজের মন বুঝিতে চেষ্টা করি না, তাহাদের স্বার্থের কথা ভাবি না। এই মনোভাবই বিরোধের সৃষ্টি করে।

উপরোক্ত পত্রে "আহোম" ও "অসমীয়া" এই দুইটি কথার পার্থক্যের কথা বলা হইয়াছে। লেখক এই বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিতে পারেন।

কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৬৭। পৃঃ।০+২২৩+১৬০। মূল্য ৪্ টাকা।

জয়দেব বাংলাদেশের বাঙালী কবি। তাঁহার অপূর্ব্ব সংস্কৃত-কাব্যগ্রন্থ গীতগোবিন্দ কেবলমাত্র বৈষ্ণবদিগের নহে, সকল শিক্ষিত বাঙালীর গৌরবের জিনিস। বাংলার বাহিরেও এই গ্রন্থের সমাদর ও প্রভাব যে কত বিস্তৃত এবং গভীর ছিল, তাঁহার সাক্ষ্য দিতেছে ইহার বার-তেরোটি অনুকরণ ও প্রায় চল্লিশটি বিভিন্ন প্রদেশে রচিত টীকাগ্রন্থ। বাংলার বাহিরে রাজস্থানের রাণা কুম্ভ ও মিথিলার শঙ্কর মিশ্রের টীকাসম্বলিত দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা একটি সংস্করণ প্রচলিত আছে, কিন্তু ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বাংলাদেশে বাঙালীর টীকাসমেত কোনও বিশুদ্ধ সংস্করণ সম্পাদিত হয় নাই। সেইজন্য যখন ১৩৩৬ সালে চৈতন্য-সম্প্রদায়ের চৈতন্যদাস (পূজারী গোস্বামী) রচিত বালবোধিনী টীকা-সমেত বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন বর্ত্তমান সমালোচক ভারতবর্ষ পত্রিকায় (আশ্বিন, ১৩৩৯) বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া তাহার সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সেখানে কবি ও কাব্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আজ দীর্ঘ একুশ বৎসর পরে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল; এরূপ গ্রন্থের এত বিলম্বিত সমাদর বোধ হয় এক বাংলাদেশেই সম্ভব!

দ্বিতীয় সংস্করণের আকার অনেক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, এবং প্রথম সংস্করণের যাহা কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল, সম্পাদক তাহা বিশেষ যত্নের সহিত সংশোধিত করিয়াছেন। তাহা ছাড়া অনেক নূতন তথ্য এবং তত্ত্বের সমাবেশে ইহার মূল্য ও সমৃদ্ধি যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে।

বাংলাদেশে হয়ত রসপিপাসু পাঠকের অভাব নাই, কিন্তু তথ্য ও তত্ত্বের কথা শুনিলে অনেকে সম্ভবতঃ শিহরিয়া উঠিবেন। কিন্তু কাব্য-আলোচনায় কবির দেশ-কাল ও পারিপার্শ্বিকের তথ্য অপ্রাসঙ্গিক নয়। কিংবদন্তী, আখ্যায়িকা, ঐতিহাসিক উপকরণ ও কাব্যের মধ্যে কবির পরিচয়—এ সমস্তই সম্পাদক যথাযথ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে গুজরাতের শার্ঙ্গদেব বাঘেলার সময়ে উৎকীর্ণ (সংবৎ ১৩৪৮ =ইং১২৯১) শিলালিপির ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের উল্লেখ দেখিলাম না। এই শিলালিপিতে জয়দেবের দশাবতার-স্তুতি শ্লোক (বেদানুদ্ধরতে ১।১৬) মঙ্গলশ্লোকরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

কাব্য হিসাবে জয়দেবের রচনা উপভোগ্য হইলেও বৈষ্ণব-সাধকদের মতে গীতগোবিন্দ শুধু কাব্যগ্রন্থ নয়, তাঁহাদের ভক্তিরসশাস্ত্রে বর্ণিত উজ্জ্বল রসের উৎকৃষ্ট নিদর্শনস্বরূপ ধর্ম্মগ্রন্থ, যাহা স্বয়ং চৈতন্যদেবের আস্বাদনে প্রমাণীকৃত। এদিক হইতেও সম্পাদক নানা তত্ত্বের বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন। রচনার ভাষা ও সঙ্গীত, পাঠভেদ, পুরাণাদির সহিত ইহার সম্বন্ধ, ইহার প্রথম শ্লোকের রহস্য, অন্যত্র উদ্ধৃত শ্লোক বা পদাবলীর উল্লেখ প্রভৃতি কোনও প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ সম্পাদক বাদ দেন নাই। কিন্তু সম্পাদক শুধু পণ্ডিত নহেন, রসিকও বটে। তাই তাঁর ভূমিকায় সংবাদের সঙ্গে রসবিচারেও সমন্বয় হইয়াছে। মূলের বঙ্গানুবাদও সুপাঠ্য। বহু যত্ন ও পরিশ্রমের দ্বারা সম্পাদিত, বঙ্গবাণীর আদি জয়কেতু জয়দেবের এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থের আমরা বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীসুশীলকুমার দে

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা—শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। পৃ. ১৮/০+১২০। মূল্য দুই টাকা।

বঙ্কিমচন্দ্রের লিপিকুশলতা ও ভাষাবৈশিষ্ট্য লইয়া বহু আলোচনা হইয়াছে। অজরচন্দ্র গল্প বলার সরস ভঙ্গিতে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার ক্রমবিকাশ দেখাইয়া সেই আলোচনায় নূতন প্রাণসঞ্চার করিলেন। প্রধানতঃ রূপচিত্রাঙ্কন অবলম্বনে এই আলোচনা করা হইলেও অজরচন্দ্র বাংলাভাষা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিগুলি উদ্ধৃত করিয়া বইখানিকে মূল্যবান করিয়াছেন। পিতৃভক্তিবশতঃ বইখানি একটু 'সাধারণী'-ঘেঁষা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা দোষের হয় নাই, সমসাময়িক পরিবেশ-সৃষ্টিতে সুখপাঠ্যই হইয়াছে। গোড়ায় ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকা কিন্তু অকারণ দুরূহতার সৃষ্টি করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে জটিলতা ও দুর্ব্বোধ্যতা হইতে ভাষাকে উদ্ধার করিতে চাহিয়াছিলেন, এই "ভূমিকা" তদ্দ্বারা গুরুতরভাবে পীড়িত; "যৌনবুভুক্ষার কেন্দ্রিকতা," "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নৈর্ব্যক্তিকতার অন্তরাল," "সার্বভৌমতার বৃহত্তর সত্তা"র ঘা খাইলে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র শিহরিয়া উঠিতেন। আর একটি কথা, আমরা মনস্বী ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ বা মনঃসমীক্ষণের কথাই জানি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু অধ্যাপক মহোদয় "ফ্রড-প্রতিষ্ঠিত যৌনবিজ্ঞানে"র পাঠ লইলেন কোথায়?

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমিধ—শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী। "নমামি" প্রকাশ মন্দির, ৮।২, গোপ লেন, ইণ্টালী, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১০৩। মূল্য দেড় টাকা।

বিপ্লব যুগের বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে লেখকের "নমামি" নামক পুস্তক যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলাম। তাঁহার বর্ত্তমান পুস্তকখানি ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়া অভিনব। "অনুশীলন সমিতির" নেতৃবর্গ এবং কর্ম্মিবৃন্দের কীর্ত্তিকথা অবলম্বন করিয়া জিতেশবাবু যে যুগের চিত্র আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া অনেকে সেই গৌরবময় যুগের শেষ হইয়াছে মনে করিয়া অতীতের জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিবেন।

দুর্গম পথের অভিযাত্রী ঐ সব বাঙালী-যুবকের প্রাণে যে রস ছিল, যখন তখন যে হাসি তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হইত তার পরিচয় পাই এই পুস্তকের দশ-এগারো পৃষ্ঠায়। এই পুস্তকের প্রত্যেকটি আখ্যানে দেখিতে পাই বাঙালী পুরুষ-রমণীর "মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনা"র নিষ্ঠা। এই নিষ্ঠা দিকে দিকে বিস্তৃত হইয়াই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনিয়াছে। তার পরিচয়-প্রদানের দায় বাঙালী লেখক-সমাজের। হিন্দী ভাষায় অভিজ্ঞ কোন বাঙালী-লেখক সেই দায় স্বীকার করিলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকিব। তবেই অ-বাঙালী সমাজ বাঙালী বিপ্লবীর প্রকৃত পরিচয় পাইবেন, বাঙালী সমাজও বর্ত্তমানের নিরাশার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

বাপু-দর্শন—শ্রীকাকা কালেলকর। অনুবাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ। সুপ্রকাশন, ৩, সার্কাস রেঞ্জ, কলিকাতা-১৯। ১১৭ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই টাকা।

শ্রীকাকা কালেলকর গান্ধীজীর অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের অন্যতম। তৎপূর্ব্বে তিনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন। শিক্ষকরূপে এবং এই সেবার মাধ্যমে তিনি রবীন্দ্রনাথের ভাব ও কর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছেন। এই পুস্তকে তাঁহার সেই সময়কার নানা অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

কাকা তাহা লিপিবদ্ধ করান মধ্যপ্রদেশের সিউনী জেলে, এবং ১৯৪৮ সালে তাহা প্রকাশিত হয়। সেই হিন্দি পুস্তকের নাম 'বাপুকী ঝাঁকিয়া'। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ তাহা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

কাকা কালেলকর প্রায় চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এই ক্রম উক্ত বর্ণনায় অনুসৃত হয় নাই। আলোচনাকালে "প্রসঙ্গক্রমে যে ঘটনার কথা মনে আসিত" তাহাই তিনি "সেই দুপুরে" লিখাইয়া লইতেন। বর্ণনার আন্তরিকতায় তাহা আমাদের নিকট অপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত হইয়াছে। বীরেনবাবুর অনুবাদের মধ্যেও সেই গুণ আছে। তিনি অতিশয় সাবধানী লেখক; বাংলা ও অন্যান্য ভাষা হইতে অনূদিত তাঁহার নানা লেখার মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়—গান্ধী-"দর্শন" (পরিচয়) সম্বলিত এই পুস্তকেও তার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই নাই। মাঝে মাঝে হিন্দী ভাষার বর্ণনারীতি তিনি অনুসরণ করিয়াছেন; তাহা বাঙালীর কানে নূতন ঠেকিবে। কাকা কালেলকরের ভাবধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে গেলে তাহা ছাড়া উপায় নাই। অনুবাদকের পক্ষে ইহা একটা মস্ত গুণ। বাঙালী পাঠক গান্ধী-জীবনের অনেক কথা এই পুস্তকে জানিতে পারিবেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

ছন্দ পতন—শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়। ডি এম লাইব্রেরি। ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲ টাকা।

কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। সাহিত্য-জগতে লেখক নবাগত। কাহিনীর সম্পূর্ণতা বিচার না করিলেও একটি জিনিস গল্পগুলিতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—তা মানুষের প্রতি লেখকের অকৃত্রিম কল্যাণ-কামনা; দেশকে ও মানুষকে ভালবাসার সুর প্রায় প্রত্যেকটি লেখার মধ্যে আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তরুণ-মনে স্বদেশ বা মানব-হিতৈষণাজনিত ভাবালুতা সার্থক গল্প-রচনার পথে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় এবং প্রায়ই দেখা যায়—হৃদয়ের আবেগ গল্পের প্রয়োগ-মাত্রা-বিচ্যুত হইয়া দীর্ঘ বক্তৃতাতে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অভিজ্ঞতা, অধ্যবসায় ও সাহিত্য-প্রীতি লেখকের সর্ব্বোত্তম সম্বল—গল্প বলার কৌশলের সঙ্গে এইগুলি যথাযথ প্রযুক্ত হইলে রচনা সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির পর্য্যায়ে উন্নীত হয়।

একদম বাঁধকে জানানা—শ্রীপ্রভাত বসু। কমলা বুক ডিপো। ১৫, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২।০ টাকা।

সাহিত্যে, সমাজ-জীবনে ও রাজনীতি-ক্ষেত্রে যে-সব সমস্যা আজ জটিল আবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছে—তাহার কিছু অংশ বর্ত্তমান পুস্তকে গল্প, নাটিকা প্রভৃতি রসরচনায় রূপায়িত হইয়াছে। কয়েকটি গল্প ও নক্সা বেশ উৎরাইয়াছে। ব্যঙ্গ-কৌতুকের মোড়কে মোড়া থাকিলেও সেগুলি শুধু হাসির বস্তু হয় নাই—হাসির পিছনে অশ্রু এবং তাহারও গভীরে চিন্তার সম্পদ বহন করিয়া সেগুলি হইয়াছে সার্থক চিত্র। এই চিত্র পরিস্ফুটনে রেখার সহযোগিতাও উল্লেখযোগ্য। প্রথম গল্পটিতে এবং নাটিকা দু'খানিতে সস্তা হাস্যরস জমাইবার প্রয়াস দেখা যায়। অন্যান্য রচনার তুলনায় এগুলি অপেক্ষাকৃত ম্লান হইয়াছে।

বিখ্যাত বিচার-কাহিনী—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৷৹ টাকা।

বর্ত্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকের মধ্যে এই দেশে কয়েকটি চাঞ্চল্যকর বিচার-কাহিনীর কথা সংবাদপত্রের মারফত আমরা জানিতে পারিয়াছি। সেগুলি যে-কোন মনঃকল্পিত গোয়েন্দাকাহিনীর চেয়েও চাঞ্চল্যকর এবং উপভোগ্য। বিখ্যাত বাওলা-হত্যাকাণ্ড—যাহার সঙ্গে ইন্দোরের মহারাজা ও নর্ত্তকী মমতাজ বেগম জড়িত, প্লেগ-বীজাণুঘটিত পাকুড় ষড়যন্ত্রের মামলা, লাহোরের পঞ্চদশবর্ষীয়া বাঈজী সামসেদ বাঈয়ের রহস্যজনক মৃত্যু, উড়িয়ার বারো বছরের অপরূপ লাবণ্যবতী কুমারী কনকের অন্তর্দ্ধান-রহস্য, কলিকাতার বিখ্যাত খোকা গুণ্ডার প্রাণদণ্ড, মীরাটের ক্লার্ক-ফুলাম হত্যার কথা প্রভৃতি ঘটনাবলী এককালে প্রতিদিনের আলোচনার বস্তু ছিল। এগুলি আজ সময়ের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, আমাদের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। লেখক এই বিখ্যাত বিচার-কাহিনীগুলিকে একত্রে সংগ্রথিত করিয়াছেন—কাহিনী-গ্রন্থনে তাঁহার শ্রম ও যত্ন পরিস্ফুট। সমসাময়িক সংবাদপত্র, দলিল, সাক্ষীদের জবানবন্দী, কৌঁসুলি ও বিচারপতিদের সওয়াল ও মন্তব্য প্রভৃতি হইতে উপকরণ সংগৃহীত হইয়া এক একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী রচিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি কাহিনীর মূলে আছে মানব-মনের অদম্য ভোগস্পৃহা ও লালসা যাহা ইন্দ্রিয়ের তাড়নায়, বিষয়তৃষ্ণায়, জন্মগত পাপ-প্রবণতায় মানুষকে পশুর স্তরে নামাইয়া দেয়—সমাজের আবহাওয়া বিষাক্ত করিয়া তুলে।

কাহিনীর অনুসরণ করিতে করিতে তমোগুহাশ্রিত বেগবান বৃত্তিগুলি ঘটনারাজির আবর্ত্তে কোন্ পরিণাম-ভয়ঙ্কর লক্ষ্যে মানুষকে টানিয়া লইয়া যায় তাহা জানিবার কৌতূহলে মন ভরিয়া উঠে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

মহামায়া—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স। ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দেড় টাকা।

চণ্ডীর তত্ত্ব নিরূপণ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যের আখ্যায়িকা বর্ণন আলোচ্য গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গক্রমে বাংলা শাক্ত সাহিত্য, বৌদ্ধধর্ম্মে শক্তিবাদ ও বেদান্তে শক্তিবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রন্থকারের কতকগুলি প্রবন্ধ এক একটি পরিচ্ছেদ হিসাবে গ্রন্থ-মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দেবীমাহাত্ম্যে অনুল্লিখিত অথচ প্রাসঙ্গিক কতকগুলি বিবরণ অন্যান্য পুরাণ হইতে সংকলন করিয়া গ্রন্থকার উপাখ্যানাংশটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করিয়াছেন। সাধারণ পাঠক এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া চণ্ডী সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য জানিতে পারিবেন। তবে আশঙ্কা হয় তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠককে ইহা সকল ক্ষেত্রে পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে না।

গ্রন্থের রচনা সাধারণতঃ পল্লবিত—স্থানে স্থানে পুনরুক্তি দোষদুষ্ট। মুদ্রাকরপ্রমাদ ও বর্ণাশুদ্ধির বাহুল্য পীড়াদায়ক। আকরনির্দ্দেশ বা বিস্তৃত বিবরণের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে অনেক কথার তাৎপর্য্য বা যুক্তি ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। এই প্রসঙ্গে 'চণ্ডীর ভূমিকা' পরিচ্ছেদের ঐতিহাসিক আলোচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'বাংলা শাক্তসাহিত্য' পরিচ্ছেদের বক্তব্য বিষয়গুলি বিক্ষিপ্ত ও অসংবদ্ধ।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

ব্যালান্স শীট—শ্রীরাখালদাস সোম। এস্. কে. লাহিড়ী এণ্ড কোং লিঃ। ৫৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ মূল্য ৩৲।

কল্পনা এবং অনুভূতি থাকিলে যে সকল বিষয়কেই সাহিত্যের এলাকায় লইয়া যাওয়া যায়, তাহারই নিদর্শন বইখানিতে পাইলাম। লেখক গণনাবিদ্—চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট, বইয়ের নামকরণ করিয়াছেন 'ব্যালান্স শীট'। প্রবন্ধগুলির নাম—'সেপারেট রিপোর্ট', 'ট্রেডিং একাউন্ট', 'প্রফিট এণ্ড লস্ একাউন্ট', 'এলোকেশন একাউন্ট', 'ব্রাঞ্চ একাউন্ট', 'ব্যালান্স শীট'। আসলে, এখানি সংখ্যাশাস্ত্রের বা ধনবিজ্ঞানের বই নয়। 'আসল ও মেকী, সত্য ও ছল, পুণ্য ও পাপের জমা-খরচ করিয়া লেখক সংসারের বাস্তব রূপটি দেখাইয়াছেন। আয়করের অসঙ্গতি, ডাকমাশুলের উঠানামা, বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতিনীতি, চোরাবাজারীর কূট-কৌশল কিছুই তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়ায় নাই এবং বিদ্রূপবাণ হইতে অব্যাহতি পায় নাই। এ গ্রন্থ পারিভাষিক শব্দের আবরণে উপভোগ্য সমসাময়িক-'সংসার'-চিত্র।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

স্বপনী—শ্রীরবি গুপ্ত। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। ২৪, প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা।

এখানি কবিতা-পুস্তক। চুয়াল্লিশটি কবিতার সমষ্টি। বিবিধ ছন্দে রচিত এই গীতিকবিতাগুলির মধ্যে একটি ভক্তিপূত আত্মনিবেদনের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

"হে অসীম! তব সুদূরপথের অতল-অন্ত দিশার পানে
দিয়েছি খুলিয়া মোর জীবনের নির্ভাবনার তরণীখানি।"

প্রথম কবিতাটিতেই লেখক বলিতেছেন,

"নিশীথ ধরার উদয়ালোকের স্বপনী আমি,
নামে অমরার অরুণ বিথার—দীপ্ত যামি।"

'সন্ধানী'তে পাই,

"অনুভূতি মোর প্রতি অক্ষরে—
তোমারে ধরে।"

কবিতাগুলির মধ্যে একটি স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য আছে। "পদ্মবনের গন্ধ দিয়ে আমার সে-গান গড়া।"

"ও শেফলি, শেফালিকা!
কার মরমের শুভ্র-শিখা—
দীপের মত উঠল জলে আমার অচিন-গহনে।"

"প্রস্ফুট" কবিতায় আছে,

"মর্ম্ম আমার চূর্ণ ক'রে রুদ্ধ প্রাচীর সদা
মন্ত্রে লভে অভ্রভেদী তুঙ্গ-শিখর-তল।"

"উৎসে" পাই,

"নেহারি' তোমার জ্যোতি-নির্ঝর যুগ-প্রভাতের অভ্যুদয়,
তব মর্ম্মের চিরসুগভীর শান্তি-সাগর জাগে।"

কবিতাগুলি গতানুগতিক নয়। ছন্দ সাবলীল। শব্দ সুনির্ব্বাচিত। রচনার মধ্যে তরুণ লেখকের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাই।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

লক্ষবর্ষ পরে—শ্রীপ্রবোধ সরকার। এইচ, ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং। ২৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

ছোটদের জন্য বই লিখিয়া যাঁহারা খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, শ্রীপ্রবোধ সরকার তাঁহাদের অন্যতম। হাস্যরসের পরিপ্রেক্ষিতে নূতন আঙ্গিকে রচিত এই উপন্যাসখানি ছোটদের মনকে কল্পনার বিচিত্র লীলায় আবিষ্ট এবং মুগ্ধ করিবে সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া কাহিনীর অভিনবত্ব তাহাদের মনকে শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইবে।

সার্ব্বজনীন লোকসভা—শ্রীসুশীলচন্দ্র দাস। প্রাপ্তিস্থান—৪-ডি, নাসিরুদ্দিন রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

"সার্ব্বজনীন লোকসভা" নির্ম্মল কৌতুক-নাট্য, ইংরেজীতে যাকে বলে comedy of situation—বইখানি কয়েকবার সাফল্যের সঙ্গে ঢাকা বেতারকেন্দ্রে অভিনীত হইয়াছে। কৌতুক-নাটিকা হিসাবে বইখানি যে রসোত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের ছা-পোষা কেরাণীকুলের যে চিত্র লেখক আমাদের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন তা সত্যচিত্রই হইয়াছে। নাট্যকারের সিচুয়েশ্যন সৃষ্টির বাহাদুরি আছে এবং তাহার ফলে সামান্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তিনি একখানি উৎকৃষ্ট হাসির নাটক রচনা করিতে পারিয়াছেন। সংলাপ খুব স্বাভাবিক অথচ জোরালো।

বাংলা-সাহিত্যে উচ্চাঙ্গের কৌতুক-নাট্য খুব কমই আছে। সেজন্য এই নবীন নাট্যকারের এই প্রয়াস প্রশংসনীয়।

নেতাজীর জয়যাত্রা—শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। নিউ বুক ষ্টল। ৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চৌদ্দ আনা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের 'আজাদ হিন্দ ফৌজের কীর্ত্তিকলাপ সম্পর্কে ছোটদের জন্য রচিত একখানি উচ্ছাসপূর্ণ নাটক। বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত।

ভাঙন-কূল—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়। প্রাপ্তিস্থান—২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

একখানি সামাজিক নাটক। "আধুনিক যুগে প্রত্যেক দেশহিতৈষী ব্যক্তির মনে গ্রামোন্নতির পরিকল্পনার যে আদর্শ জাগিয়া আছে ও যে যে কারণে এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার প্রচেষ্টা ব্যাহত হইতেছে তাহাই নাটকের আলোচ্য বিষয়⋯।"

বিষয়বস্তু পুরাতন সন্দেহ নাই, কিন্তু ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণের মুন্সীয়ানার গুণে নাটকখানি পাঠকের মনে আবেগ সৃষ্টি করে—রসিকচিত্তে আবেগ সৃষ্টি করাই শ্রেষ্ঠ নাটকের একটি প্রধান লক্ষণ। সংলাপ-রচনায়ও নাট্যকার নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। তবে দীর্ঘ সঙ্গীত যোজনা করায় নাটকীয় গতি ব্যাহত হইয়াছে। গানগুলি যতই সুরচিত হউক না কেন, তাহা নাটকের 'টেম্পো' নষ্ট করিয়াছে। পরবর্ত্তী সংস্করণে এই ত্রুটি বর্জ্জন করিলে 'ভাঙন-কূল' একখানি ভাল নাটকের পর্য্যায়ে উন্নীত হইবে।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

জিজ্ঞাসা—শ্রীতরুণ রায়। ভবানীপুর বুক ব্যুরো। ১বি, রসা রোড, কলিকাতা। দাম আড়াই টাকা।

পূর্ব্বপাকিস্তান হইতে জাহাজে উদ্বাস্তুদের আনিতে গিয়া লেখক যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন তাহাকেই ভিত্তি করিয়া এই কাহিনীটি রচনা করিয়াছেন।

লেখক উদ্বাস্তুদের কাহিনী লিখিয়াছেন বুকের দরদ দিয়া। স্থানে স্থানে বর্ণনা এত মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে যে পড়িতে পড়িতে অশ্রুসংবরণ করিতে পারা যায় না। যে ধর্ষিতা মেয়েটি উদ্বাস্তু-শিবিরে অবাঞ্ছিত সন্তানের জন্মদান করিয়াছিল তার বেদনাকরুণ মুখচ্ছবি পাঠকের চিত্তপটে যেন চিরতরে আঁকা হইয়া যায়। যে সন্তানের মৃত্যুকামনা সে একান্ত মনে করিয়াছিল, নিদারুণ অসুখের সময় যাহাকে সে ঔষধ পর্য্যন্ত খাওয়ায় নাই, অদৃষ্টের চরম অভিশাপের প্রতীক্ সেই সন্তানের মৃত্যুসংবাদ যখন তাহার কানে পৌঁছিল তখন তাহার মায়ের প্রাণ ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, তাহার আহারনিদ্রা ঘুচিয়া গেল। বেদনাবিদীর্ণ মাতৃহৃদয়ের এ অপরিমেয় শোক এতই মর্ম্মান্তিক এবং তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব এমনি জটিল যে, পাঠককে তাহা যুগপৎ অভিভূত ও বিভ্রান্ত করিয়া ফেলে।

আর একটি কাহিনীও মনের মধ্যে গাঁথা হইয়া যায়। ষ্টীমার চলিয়াছে হাজার হাজার উদ্বাস্তুকে লইয়া। দুর্য্যোগ-রাত্রি। কালবৈশাখীর ঝড় উঠিয়াছে। ষ্টীমারের জেটিতে দাঁড়াইয়া লেখক দেখিতেছেন একটি মেয়ে হাতে একটা কাপড়ের পোঁটলা লইয়া সন্তর্পণে আসিল নদীর ধারে। হঠাৎ সেই পোঁটলার ভিতর হইতে সদ্যোজাত শিশুর কান্না শুনিয়া লেখক চমকাইয়া উঠেন। পুলিশের জেরায় প্রকাশ পায়, মেয়েটি এই নবজাতককে নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দিতে আসিয়াছিল, কেননা সদ্যভূমিষ্ঠ শিশু আর প্রসূতিকে উদ্বাস্তু-জাহাজে যাইতে দেওয়া হয় না। কিন্তু দুটি অসহায় প্রাণীর মুখ চাহিয়া পরিবারের আর সকলে টেশনের নীচেকার সাময়িক আশ্রয়-স্থলে এবং ষ্টীমার-কোম্পানীর ঘরে পড়িয়া থাকিতে রাজী নয়। তাই প্রসূতিকে না জানাইয়া তার এই আত্মীয় আসিয়াছিল শিশুটিকে সলিল-সমাধি দিবার উদ্দেশ্যে। প্রতিকূল অদৃষ্ট যে উদ্বাস্তুদের কোন্ স্তরে আনিয়া দাঁড় করায়, মানুষের সুকুমারবৃত্তি ধীরে ধীরে কেমন করিয়া লোপ পাইয়া যায় তাহার বর্ণনা পড়িয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। এই কাহিনীর উপসংহারে লেখক বলিতেছেন—"কেন জানি না ছবি ফুটে উঠল—কুন্তী এক শিশুকে জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে—নদীর তীরে কর্ণ কুন্তীকে ভর্ৎসনা করছে—কে জানে কলিযুগের কর্ণরা আবার বেড়ে উঠছে কিনা—অধিরথদের ঘরে।"

বইখানিতে এমনি ধরণের অনেকগুলি কাহিনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—লেখক যেন প্রাণের সবটুকু দরদ ঢালিয়া দিয়া একখানি বেদনার মালা গাঁথিয়া পাঠকদের উপহার দিয়াছেন। এ উপহার অশ্রু উপহার। বিশু, সলিল, পণ্ডিতমশাই, হাবিলদার, ডাক্তার প্রভৃতি চরিত্রগুলি ভালই ফুটিয়াছে। আর এই কাহিনীর সূত্রে মধ্যমণির মত বিরাজ করিতেছে ত্যাগে অনুপম, সেবায় নিরলস, তিতিক্ষায় মহীয়সী বাসনাদির চরিত্র।

অবশ্য কাহিনীটি নিখুঁত এমন কথা বলিতেছি না—স্থানে স্থানে অসঙ্গতি আছে, জায়গায় জায়গায় অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে, বিশেষতঃ উপসংহারটি হইয়াছে বড়ই কাঁচা। এসব ত্রুটি সত্ত্বেও কিন্তু রচনার মধ্যে এমনি একটা আন্তরিকতা আছে যে, ত্রুটিগুলি মার্জ্জনীয় বলিয়া মনে হয়।

বইখানি শেষ করিবার পর উদ্বাস্তুদের বহুবিধ সমস্যার কথা ভাবিয়া চিত্ত বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। চোখের সামনে দিয়া যেন জিজ্ঞাসার মিছিল চলিতে থাকে। মনের মধ্যে এই প্রশ্নটাই বড় হইয়া উঠে যে, এক

রাষ্ট্র হইতে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া যাহারা আর এক রাষ্ট্রে আসিল, তাহাদের আসল দুঃখের লাঘব কতটুকু হইল—আশ্রয়-শিবির স্থাপন, রিলিফওয়ার্ক, মায় দিল্লীচুক্তি সবই হইল, কিন্তু 'ততঃ কিম্'।

কৃষাণ—শ্রীমন্মথ রায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে গ্রন্থকারের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। পৌরাণিক কাহিনী এবং ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে নাটক-রচনায় অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া একজন প্রথম শ্রেণীর নাট্যকাররূপে তিনি বিপুল খ্যাতির অধিকারী হইয়াছেন। বর্ত্তমান চিত্রনাট্যখানি রচনা করিয়াছেন তিনি বাস্তব-জীবন হইতে উপকরণ আহরণ করিয়া।

মহাজনের শোষণে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বাংলার কৃষাণ-পরিবার কি ভাবে তিল তিল করিয়া ধ্বংসের পথে আগাইয়া যায় তাহারই আলেখ্য বর্ত্তমান পুস্তকখানিতে ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস লেখক পাইয়াছেন এবং এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার কি তাহারও নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

কৃষক অর্জ্জুনের পুত্র লক্ষ্মণ দশ বৎসর কলিকাতায় 'নতুন দাদুর' স্নেহ-চ্ছায়াতলে কাটাইয়া 'মানুষ' হইয়া যেদিন নিজের জন্মপল্লী কল্যাণপুরে ফিরিয়া আসিল সেদিন গাঁয়ের কৃষকদিগকে সমবায়-সমিতির সভ্য করিয়া এই কথাই সে বুঝাইল যে, সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠার মধ্যেই কল্যাণপুরের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত। সমালোচ্য পুস্তকখানি উদ্দেশ্যমূলক তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু পুস্তকখানিতে প্রচার কতকটা প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, তদুপরি সাহিত্যরসের মিশাল থাকায় ইহা বাংলা চিত্রনাট্যের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যের দাবি করিতে পারে।

গ্রন্থকারের উচ্চাঙ্গের রসসৃষ্টি-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় চাষী অর্জ্জুন মণ্ডল আর তাঁর স্ত্রীর খড়ম ও শাঁখা কেনার ব্যাপারের বর্ণনায়। গরীব স্বামীস্ত্রী পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসে। গ্রামের মেলায় গিয়া দুর্গার এক জোড়া খড়ম ভারি পছন্দ হইল। তাহার ইচ্ছা অর্জ্জুনের জন্য খড়ম-জোড়া কিনিয়া লয়। কিন্তু দেড় টাকা দাম শুনিয়া অর্জ্জুন স্ত্রীকে লইয়া দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করে।

শেষে সুরু হয় স্বামীস্ত্রীর মধ্যে লুকোচুরি। দুর্গা দূরে সরিয়া যায় এবং নিজের হাতেকাটা সুতা বেচিয়া দেড় টাকা দিয়াই সেই খড়মজোড়া ক্রয় করে। বাড়ী আসিয়া খড়মজোড়া বাহির করিয়া দুর্গা বলে, "মণ্ডল মশাই, একবার পায়ে দিন তো"—কিন্তু "মণ্ডল মশাই" যে "দেখি তোমার হাতখানা" বলিয়া মেলায় পছন্দকরা শাঁখাজোড়া বাহির করিয়া তাহার হাতে পরাইয়া দিতে উদ্যত হইবে কৃষাণগিন্নীর বোধ করি তাহা ধারণারও অতীত ছিল। অত্যন্ত হাল্‌কা তুলির টানে দীনদরিদ্র সরল কৃষক-দম্পতির গভীর প্রেম ও মধুর ছলনার এই যে মনোরম চিত্রটি গ্রন্থকার আঁকিয়াছেন সেজন্য তাঁহাকে মনে মনে সাধুবাদ জানাই। এই বর্ণনায় তিনি যে লিপিসংযমের পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়।

অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে দীর্ঘ বিচ্ছেদের অবসানে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাত্রির অন্ধকারে দুর্গার সঙ্গে পুনর্ম্মিলনের সঙ্গে সঙ্গেই অর্জ্জুন যখন চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিতে চাহিল, তখন দুর্গার—"কিন্তু তুমি তো কিছুই পেলে না জীবনে···আমি কি শুধুই লক্ষ্মণের 'মা'। আমি তোমার স্ত্রী, অনেক দুঃখের পর ফিরে পেয়েছি তোমাকে। আর তোমাকে হারাতে পারব না।" এই মর্ম্মস্পর্শী কথাগুলির ভিতর দিয়া ভাগ্যবিড়ম্বিতা, কৃষক-রমণীর অন্তর্গূঢ় বেদনা যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

জন্মভিটার জন্য পরাণের আকুল আকুতি, অর্জ্জুন, দুর্গা ও লক্ষ্মণের জন্য প্রতিবেশিনী রুক্মিণীর স্নেহের আকস্মিক প্রকাশ পাঠকচিত্তে রেখা-পাত করে। কৃষকদের জন্মগত দাবির কথা ইদানীং আমরা নূতনভাবে ভাবিতে সুরু করিয়াছি। স্বাধীন ভারতে আজ কৃষাণমজদুরপ্রজা-রাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে অনেকেই মশগুল। এমতাবস্থায় বর্ত্তমান পুস্তকখানির প্রকাশ বেশ সময়োপযোগী হইয়াছে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

ছড়া ছবিতে অ আ ক খ—শ্রীসুনির্ম্মল বসু লিখিত এবং শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত চিত্রিত। শিশু সাহিত্য সংসদ, ৩২-এ, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

বাংলাভাষায় বর্ণপরিচয়ের বই অনেক আছে। আমরা ছেলেবেলায় যে সচিত্র বাল্যশিক্ষা পড়িয়াছি তাহার মত এখন আর দেখি না। 'অজগরটি আসছে তেড়ে আমটি আমি খাব পেড়ে' হইতে আরম্ভ করিয়া 'নীতি এই যথা তথা বল সদা সৎ কথা' পর্য্যন্ত সেই বাল্যশিক্ষাখানিতেই পাঠ করিয়াছিলাম। পরে বহু বর্ণপরিচয় দেখিয়াছি, কিন্তু তেমনটি কচিৎ দৃষ্ট হইয়াছে। ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর ছেলেদের জন্য রচিত সচিত্র বই দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। শিশুদের শিক্ষার প্রতি ইংরেজ সাহিত্যরসিক, সাহিত্যিক ও জনসাধারণের কত দরদ, কত ভাবনা। মনে প্রশ্ন জাগিত, আমরা কি ঐরূপ করিতে পারি না?

ইদানীং এই প্রশ্নের জবাব মিলিয়াছে। শিশু সাহিত্য সংসদ কিছুকাল যাবৎ বাঙালী বালক-বালিকাদের জন্য সচিত্র প্রাথমিক পাঠোপযোগী পুস্তকাদি প্রকাশ করিয়া শিশুশিক্ষার একটি নূতন পথ প্রদর্শন করিতেছেন। অ আ ক খ শিখিতে ছেলেমেয়েদের কতই না কষ্ট। তাহারা যদি সুপরিচিত চিত্রের সহযোগে সেগুলির রূপের সঙ্গে পরিচিত হয় তাহা হইলে অনায়াসে এবং অজ্ঞাতসারেই সকল অক্ষর আয়ত্ত করিয়া ফেলিতে পারে। আলোচ্য পুস্তকখানি অ আ ক খ বর্ণ-পরিচয়। কিন্তু চিত্রসৌষ্ঠবে এবং অক্ষর ও রচনাসজ্জার পারিপাট্যে ইহা প্রচলিত বর্ণপরি-চয়গুলিকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। বাঙালী ছেলেমেয়ের দেখা ও জানা জীব-জন্তু, তরু-লতা, ফুল-ফল, খাল-বিল, নদ-নদী, চন্দ্র-সূর্য্য, তারকাদির চিত্রে অক্ষরগুলি যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের শিক্ষণীয় বিষয় মানুষকে বাদ দিয়া চলে না। আবার শিশুশিক্ষার পুস্তকাদিতে শিশুই নায়ক। শিশুকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন ধরণের ও বয়সের নরনারীর চিত্র বইখানিকে চিত্তাকর্ষক করিয়াছে। অক্ষর-কেন্দ্রিক ছড়াগুলি মুখস্থ করিয়াও শিশুরা আনন্দ পাইবে। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার জাতির পক্ষে আশার সঞ্চার করে।

ছেলেভুলানো ছড়া—শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী। পাঠভবন পুস্তকপ্রকাশ সমিতি, শান্তিনিকেতন, বীরভূম। মূল্য এক টাকা।

আমরা কৈশোরে বৃদ্ধবৃদ্ধাদের মুখে অনেক ছড়া, হেঁয়ালি প্রভৃতি শুনিয়াছি। এখনও যে দুই-একটা মনে নাই তাহা নহে। তুলনা করিতে করিতে 'দুধ' শেষ পর্য্যন্ত 'কাঁচি'র মত হইয়া যাইত। কোন কোন ছড়া কিঞ্চিৎ 'vulgar' বা গ্রাম্যতা-দোষে দুষ্ট হইলেও তাহার মধ্যে বেশ একটা সহজ প্রকাশভঙ্গী লক্ষ্য করিয়াছি। আলোচ্য পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার এইরূপ উনষাটটি ছড়া সংগ্রহ করিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। এখানি পাঠ করিলেই প্রতীতি হইবে—বাংলার সংস্কৃতি বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই কিরূপ ব্যাপকতালাভ করিয়াছিল। বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান বিস্তর, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কয়েকটি শব্দ বা বাক্যাংশ কিঞ্চিৎ অদলবদল হইয়া একই ভাবে ছড়াগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চলিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম—বঙ্গের সর্ব্বত্রই যে ভারতীয় সংস্কৃতি একটি বিশিষ্ট রূপে ধরা দিয়াছে, গ্রাম্য ছড়া ও হেঁয়ালিগুলি দৃষ্টে তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও এই ছড়াসমূহের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া নিজে অনেকগুলি ছড়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এ সম্পর্কে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "লঘুকায় বন্ধনহীন মেঘ আপন লঘুত্ব এবং বন্ধনহীনতা গুণেই জগদ্ব্যাপী হিতসাধনে স্বভাবতই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে এবং ছড়াগুলিও ভারহীনতা, অর্থবন্ধনশূন্যতা এবং চিত্রবৈচিত্র্য বশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে—শিশুমনোবিজ্ঞানের কোন সূত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত হয় নাই।"

নূতন নূতন ভাব-সংঘাতে আমাদের পুরাতন অনেক কিছুই ঝরিয়া পড়িতেছে। তাহার সঙ্গে ভাল জিনিষগুলিও যাহাতে বিলুপ্ত না হয় বাঙালী মাত্রেরই সেদিকে দায়িত্ব রহিয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানিতে ছড়াগুলি একত্র গ্রথিত পাইয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। শিল্পাচার্য্য শ্রীযুত নন্দলাল বসু পরিকল্পিত প্রচ্ছদপটটি বিষয়ানুগ এবং শিল্প সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব।

হিং টিং ছট্—শ্রীদেড়কড়ি শর্ম্মা। এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স, ১৪নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

পুস্তক ও গ্রন্থকার উভয় নাম হইতেই বুঝা যাইবে, পুস্তকখানি ব্যঙ্গরসাত্মক। বাস্তবিকই ছন্দে ও চিত্রে শিশুচিত্তের উপযোগী তেরটি বিদ্রূপাত্মক হাসির কবিতা ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীযুত সজনীকান্ত দাসের 'পরিচয়'টিও বেশ উপভোগ্য। পুস্তকখানি পুনরায় পাঠ করিয়া বেশ খানিকটা হাসিয়া লওয়া গেল। একারণ বলা যায়, শুধু শিশুগণই ইহা পাঠে আনন্দ পাইবে না, বয়স্কেরাও বেশ উপভোগ করিতে পারিবেন। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি ছেলেমেয়েরা কবিতাগুলি পাঠ করিয়া বা শুনিয়া শুনিয়া একেবারে মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ যে এত শীঘ্র বাহির হইয়াছে, এতাদৃশ জনপ্রিয়তাই ইহার কারণ। প্রত্যেকটি কবিতার সঙ্গে তদুপযোগী ব্যঙ্গচিত্রও সন্নিবেশিত হইয়াছে। হাসির খোরাকে এখানি ভরপুর।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

আলোচ্য পুস্তকখানি 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র অন্তর্গত ৮০ সংখ্যক গ্রন্থ। গ্রন্থকার বাংলা সাহিত্যের সেবকদের কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল যাবৎ আলোচনা দ্বারা ইহার ইতিহাসের একটি কাঠামো খাড়া করিতে যত্নপর হইয়াছেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের গবেষকদের ইহা যে বিশেষ কাজে লাগিতেছে, ইতিমধ্যেই তাহা বুঝা যাইতেছে। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় একজন সমাজ, ধর্ম্ম ও রাজনীতি বিষয়ক কর্ম্মী বলিয়াই সাধারণের নিকট পরিচিত। তিনি যে বাংলা-সাহিত্যের একজন অকৃত্রিম সেবকও ছিলেন, পুস্তকখানি পাঠে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, দ্বারকানাথের অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগই তাঁহাকে মাতৃভাষার চর্চ্চাতেও প্রেরণা দেয়। মাতৃভাষার মাধ্যমেই তিনি স্বদেশীয়দের যাবতীয় বিষয় শিক্ষাদানে উদ্যোগী হন। 'অবলাবান্ধব' পত্রিকা তাঁহার একটি প্রধান কীর্ত্তি।

দ্বারকানাথ ১৮৭০ সনের মধ্যভাগে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় বেথুন স্কুল সংলগ্ন সরকারী মহিলা নর্ম্যাল স্কুলের জন্য তিনি ছাত্রী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। আর ইহা লইয়া নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে যুঝিতেও ক্ষান্ত হন নাই। কুমারী এনেট এক্রয়েডের হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের তিনি বাংলা পণ্ডিত ছিলেন। তবে ইহার প্রতিষ্ঠায় দ্বারকানাথের অনেকখানি হাত থাকিলেও বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় স্থাপনের মূলেই তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। আর ইহা যে তখন বাঙালী বালিকাদের উচ্চশিক্ষার আদর্শ বিদ্যাপীঠে পরিণত হয় তাহাও তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টায়, বলা যায়। ১৮৯০ সনের নবেম্বর মাসে মাত্র ছয়টি বালিকা লইয়া যে ব্রাহ্ম বালিকা বোর্ডিং বিদ্যালয় ("Brahmo Girls' Boarding Institution") প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাই ১৮৯১-৯২ সনে "ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়" নামে একটি বেসরকারী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। দ্বারকানাথ ১৮৯৫ সন হইতে ইহার পরিচালনভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করেন। পত্নী ডাঃ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রথমে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে এবং পরে ব্রিটেনে উচ্চতর চিকিৎসাবিজ্ঞান আয়ত্ত করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। নারীজাতীর চিরকল্যাণকামী 'অবলাবান্ধব' সাহিত্যসেবী দ্বারকানাথের জীবনকথা স্বল্পপরিসরে আলোচিত হইলেও বড়ই সুখপাঠ্য হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথ একটি সত্যকার অভাব দূর করিয়া পাঠকমাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় স্থান পাইয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

হায়দ্রাবাদ-প্রবাসী বাঙালীদের বিজয়া-সম্মেলন

বিগত ২০শে অক্টোবর হায়দ্রাবাদ-প্রবাসী বাঙালী সমিতির উদ্যোগে হায়দ্রাবাদের নারাণগুডা ইয়ং মেন্‌স্ ক্রিশ্চিয়ান এসোসিয়েশনের সভাগৃহে বিজয়া উপলক্ষে শ্রীশচীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে একটি বিরাট উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। জাতিবর্ণধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকল সম্প্রদায়ের প্রবাসী বাঙালীরাই যোগদান করিয়া উৎসবটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিয়াছিলেন।

বিজয়া-সম্মেলন

নৃত্যগীত, আবৃত্তি, হাস্যকৌতুকাদির অভিনয়ে সভাগৃহ আনন্দমুখর হইয়াছিল। কুমারী লীলা শীলের পূজারিণী নৃত্য এবং নন্দা সুধীরা জিতেনের ময়ূরনৃত্য সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের "বশীকরণ" নাটিকাখানি বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। শ্রীপুষ্পরেণু দাশ রচিত ও পরিচালিত "গ্রাম্য পাঠশালা" নামক হাস্যরসাত্মক নাটকের অভিনয়ে বালক-বালিকারা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে এবং সভাগৃহে অনাবিল হাস্যরসের সৃষ্টি হয়।

"জনগণমন অধিনায়ক" গানটির দ্বারা সভার পরিসমাপ্তি হয়।

নরসিংদাস বাংলা পুরস্কার, ১৯৪৯

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, 'কলিকাতা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস'-এর ডিরেক্টর শ্রীনরসিংহ দাস আগরওয়ালার প্রদত্ত অর্থ হইতে "কলিকাতা, প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে"র মারফত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাংলা পুস্তকের জন্য 'নরসিংহ দাস বাংলা পুরস্কার' নামে একটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। এই পুরস্কারের পরিমাণ দশ হাজার টাকা।

প্রথমে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, সাহিত্য এবং বিজ্ঞান এই উভয় বিষয়ক গ্রন্থের জন্য পর্য্যায়ক্রমে উক্ত পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। ১৯৪৯-এর পুরস্কার প্রথমে বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থের জন্য ঘোষণা করা হয়। কিন্তু যথাসময়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় কোন পুস্তক না পাওয়াতে, পুরস্কারটি সাহিত্যবিষয়ক পুস্তকের জন্য প্রদত্ত হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। যে বৎসরের পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে সেই বৎসরে প্রকাশিত পুস্তকসমূহের মধ্যে যে পুস্তকখানি নির্ব্বাচক কমিটি কর্ত্তৃক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহার প্রণেতাকে উক্ত পুরস্কার প্রদান করা হইবে।

কমিটি বাংলা সাহিত্যবিষয়ক পুস্তকের লেখক, প্রকাশক, এবং বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকদের এই অনুরোধ

[জা]নাইতেছেন যেন তাঁহারা ১৯৪৯-এর ৩০শে জুনের অব্যবহিত [পূ]র্ববর্তী দুই বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত পুস্তকসমূহের প্রত্যেকটির [পা]টখানি করিয়া কপি ১৯৫০-এর ৩০শে ডিসেম্বরের পূর্ব্বে [ক]মিটির বিবেচনার্থ প্রেরণ করেন। পুস্তকাবলী দিল্লী বিশ্ববিদ্যা[ল]য়ের রেজিষ্ট্রার টি. পি. এস. আয়ারের নিকট প্রেরিতব্য।

হেমচন্দ্র বসু

মুঙ্গের-প্রবাসী এই বাঙালী-প্রধান পরিণত বয়সে মর[জ]গত ত্যাগ করিলেন। এক জন সমাজ-নেতার তিরোধান বিহারের বাঙালী-সমাজকে দুর্ব্বল করিয়া দিল। হেমচন্দ্র আইন-ব্যবসায়ে বিহারে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। সমাজের সকল শ্রেণীর লোক তাঁহার গুণ-মুগ্ধ ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকসমূহে গুরুপ্রসাদ সেন প্রমুখ বাঙালী-প্রধান বিহারে, লোক-সেবার যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেন হেমচন্দ্র মনে হয় তার শেষ ধারক ও সাক্ষী বলিয়া পরিগণিত হইবেন। সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে; বিহারে বাঙালীর স্থান সঙ্কুচিত হইতেছে। এই নূতন পরিবেশে হেমচন্দ্রের মতন লোকের নেতৃত্ব জনসাধারণের মনে সাহস দিত। তাঁহার অভাব আজ বিহারের বাঙালীকে ব্যথিত করিবে। হেমচন্দ্রের পরিবার-পরিজনের উদ্দেশে আমাদের সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯২৬ সালের মে মাসে এলাহাবাদে প্রশান্তকুমারের জন্ম হয়। তিন বৎসর পূর্ণ হইতেই তাঁহাকে স্থানীয় সেণ্ট মেরিজ কনভেণ্টে ভর্ত্তি করানো হয়। ১৯৪০ সালে মাত্র ১৩ বৎসর ১০ মাস বয়সে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইণ্টারমিডিয়েট কলেজিয়েট স্কুল হইতে বালক প্রশান্তকুমার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতেপদার্থ বিদ্যায় এম-এসসি পাশ করিবার পর ১৯৪৮ সালে প্রশান্তকুমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Statistics-এ (পরিসংখ্যান) এম-এসসি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 'পালিত' বৃত্তি লাভ করেন। কিছুকাল পরেই তিনি ন্যাশনেল ফিজিক্যাল লেবরেটরিতে চাকুরিতে নিযুক্ত হন। ১৯৪৯ সালে তিনি ইউনিয়ন রিপাবলিক সার্ভিস কমিশনের আই-এ-এস প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার পর তিনি নৈনীতাল বেড়াইতে যান, সেইখানে অল্প ক'দিন ভুগিয়া তিনি দেহ ত্যাগ করেন। ছোটবেলা হইতে প্রশান্তকুমার বিশেষ মেধাবী ছাত্ররূপে পরিচিত ছিলেন—তাঁহার বক্তৃতাশক্তি এবং বিতর্কশক্তিও ছিল

অসাধারণ। ১৯৩৯ সালে তিনি যখন স্কুলের ছাত্র তখন লক্ষ্ণৌর বেলোনা কলেজে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বক্তৃতা-প্রতিযোগিতায়

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

যোগ দিবার জন্য তাঁহাকে পাঠানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়ী হইয়া বালক প্রশান্তকুমার পুরস্কারলাভ করেন।

কারুশিল্প পরিচয়

"প্রবাসী" বাংলার কারুশিল্প বিষয়ক কাজের পরিচয়দানে পথিকৃৎ। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই নব-জাগৃতির অগ্রদূত। আজ অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা ভারতবর্ষের নানা স্থানে শিল্পাচার্য্যের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন; ভারতীয় চিত্রশিল্পে ও কারুশিল্পে নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। অবনীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিষ্যবর্গের অন্যতম শ্রীঅসিত-কুমার হালদার লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র ও কারুশিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। তাঁহার শিক্ষার গুণে উত্তরপ্রদেশে এই বিদ্যার অনুশীলন নূতন করিয়া আরম্ভ হয়। শ্রীযুতসন্তোষকুমার

মিনার কাজ—আল্পনা

বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের কৃতী বাঙালী ছাত্রদের একজন। ইনি চিত্র ও কারুশিল্পের নানা বিভাগে হাতে কলমে শিক্ষালাভ করেন এবং বিশেষভাবে মিনা করার কৌশল আয়ত্ত করেন। স্বীয় শিল্পগুরুর নির্দ্দেশে তিনি এই শিল্পের প্রসার ও প্রচারের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এই শিল্প বাংলাদেশে নূতন। সন্তোষকুমার এদেশে এ বিষয়ে অগ্রণী। তাঁহার

শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মিনার কাজ—গণেশ

শিল্প-কুশলতার নানা নিদর্শন কাহারও কাহারও বৈঠকখানার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। তাঁর শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় এই সঙ্গে প্রদত্ত চিত্রে পাওয়া যাইবে।

বিষয়-সূচী—পৌষ, ১৩৫৭

গোদরেজ
উদ্ভিজ্জ
হেয়ার টনিক

বিষয়-সূচী—পৌষ, ১৩৫৭

বিষয়-সূচী—পৌষ, ১৩৫৭

রঙীন ছবি

Lipton's
Flowery Orange
Pekoe
LIPTON'S
HIMALAYAN BLEND
CHOICE
DARJEELING
TEA
1 LB NETT
লিপটন
মানে
ভালো চা
LTX-180

মনোজ বসুর
খদ্যোত ২৲
দেবী কিশোরী (২য় সং) ২৲
বনমর্ম্মর (৩য় সং) ২॥০
নরবাঁধ „ ২৲
পৃথিবী কাদের „ ১॥০
দুঃখ নিশার শেষে (৩সং) ২॥০
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
রূপান্তর ২৲
তোমরাই ভরসা ৫৲
অলকা মুখোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস
নিরঞ্জনা ২৲
তোমারেই (২য় সং) ২৲
বনফুলের
দ্বৈরথ (৩য় সং) ৩৲
বনফুলের গল্প ২৲
আরও কয়েকটি ২৲
নঞ-তৎপুরুষ ৩৲
সুবোধ ঘোষের
একটি নমস্কারে ৪৲
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
জীয়ন্ত ৪৲
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (২য় সং) ৭৲
রঞ্জনের
অন্যপূর্বা (২য় সং) ৩॥০
চিন্তামণি ১॥০
তামস তপস্যা (২য় সং) ৪৲
শীতে উপেক্ষিতা (৩য় সং) ৩॥০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আচার্য্য কৃপালনী কলোনী ২৷০
অমরেন্দ্র ঘোষের
পদ্মদীঘির বেদেনী ২৸০
সতীনাথ ভাদুড়ীর
জাগরী (৪র্থ সং) ৪৲
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
দিকশূল (২য় সং) ৪॥০
আশাবরী „ ৪৲
প্রেমেন্দ্র মিত্রের
ভাবীকাল (২য় সং) ৩৲
কুড়িয়ে ছড়িয়ে ২৲
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
আসমান জমিন
২৷০
অমলেন্দু দাশগুপ্তের
বক্সা ক্যাম্প ৩॥০
মহাস্থবিরের
প্রভাত সঙ্গীত ২৲
যোগেশচন্দ্র বাগলের
বিদ্রোহ ও বৈরিতা ২৲
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
শিলালিপি ৬৲
তিমির তীর্থ (২য় সং) ২৸০
বীতংস ২৲ দুঃশাসন ২॥০
শহীদ সন্তোষকুমার মিত্রের
সহকর্মী বিপ্লবী সুবোধকুমার লাহিড়ীর
বিপ্লবের পথে
দাম—২৲
নবেন্দু ঘোষের
এই সীমান্তে ২॥০
ডাক দিয়ে যাই
(৫ম সং) ৩৲
গোপাল হালদারের
অন্যদিন ৪॥০
সরোজকুমার রায়চৌধুরীর
ময়ূরাক্ষী (২য় সং) ২৸০
প্রবোধকুমার সান্যালের
কল্লান্ত (২য় সং) ২৷০
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
রায়চৌধুরী ২৷০
হে মহামরণ ২৲
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বিজয়লক্ষ্মী ২৸০
বিষের ধোঁয়া (৪র্থ সং) ৩৲
ভবানী মুখোপাধ্যায়ের
অগ্নিরথের সারথি ৪৲
একাকিনী নায়িকা ২॥০
সীতা দেবীর
মাটির বাসা
(২য় সং) ৩॥০
সুধীরকুমার চৌধুরীর
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা
দাম—৫॥০
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গোটা মানুষ
(২য় সং) ২॥০
শৈল চক্রবর্ত্তীর
যাদের বিয়ে হ'ল (৩য় সং) ৩॥০
যাদের বিয়ে হবে ৩৲
মেজর নীহার গুপ্তের
যৌবনের পিছল পথে ৩॥০
আর্য্যকুমার সেনের
লীলাসঙ্গিনী ৪৲
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠ গল্প
মনোজ বসুর
বনফুলের
সুবোধ ঘোষের
শ্রেষ্ঠ গল্প
অচিন্ত্যকুমারের
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠ গল্প
শ্রেষ্ঠ গল্প
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যাঁরা দিকপাল—তাঁদের সর্বোত্তম গল্প সঙ্কলিত হয়েছে। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের মনোজ্ঞ ভূমিকা, লেখকের স্বহস্তলিখিত পরিচয়
ছবি ও সংক্ষিপ্ত জীবনকথা বইগুলিকে অসামান্য মর্যাদা দিয়েছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৫ টাকা।
বেঙ্গল পাবলিশার্স :: ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

জননী

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

অন্তিম শয়নে শ্রীঅরবিন্দ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫০শ ভাগ ২য় খণ্ড } পৌষ ১৩৫৭ { ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল

ভারত এখন সমূহ বিপদের প্রায় সম্মুখীন। জগদ্ব্যাপী সমরানল ধূমায়মান, দেশের উত্তর সীমান্তে বিপ্লব ও সংঘর্ষ চলিতেছে। দেশের ভিতরে বিদেশীর পঞ্চমবাহিনী রাষ্ট্রধ্বংসের ষড়যন্ত্র সক্রিয়ভাবে চালাইতেছে। দারুণ অন্নাভাব এবং মুনাফাখোর দুরাচারদিগের অত্যাচারে দেশবাসী দৈন্যক্লিষ্ট ও বিভ্রান্ত। এইরূপ নিদারুণ দুর্য্যোগের মধ্যে আমরা এই দিকপালকে হারাইলাম।

পাকিস্থান গঠনের পর হইতেই ভারতরাষ্ট্র যে সকল বিষম বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয় সে সকল ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত দেশ অতিক্রম করিয়াছিল এই একটি বজ্রকঠোর দৃঢ়চিত্ত পুরুষসিংহের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য সাহসের ফলে। যে দুর্বিপাকের মধ্যে আমাদের ফেলিয়া দিয়া ব্রিটিশ সরকার বিদায় গ্রহণ করে তাহার অন্ত এখনো হয় নাই বলিয়া দেশের লোকে হয়ত সর্দ্দার প্যাটেলের কীর্ত্তি ও পৌরুষের পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করিতে পারে নাই। কিন্তু যখন সুদিনের সুপ্রভাত দেখা দিবে, তখন এই শ্রান্ত-ক্লান্ত দেশ সেই অমর কীর্ত্তিকে চিরস্মরণীয় জ্ঞানে শ্রদ্ধাদান করিবে। সর্দ্দারের নিকট বাংলা বিশেষরূপে ঋণী। সময় আসিবে যখন সে ঋণের সম্যক্ পরিচয় সাধারণকে দেওয়া যাইবে :

১৮৭৫ সালের ৩১ অক্টোবর করমসদ গ্রামে বল্লভভাইয়ের জন্ম হয়। বল্লভভাইয়ের পিতার ৫টি পুত্রসন্তান এবং একটি কন্যা হইয়াছিল। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট পরলোকগত ভি. জে. প্যাটেল ছিলেন এই পাঁচটি পুত্রের মধ্যে একজন। অতি অল্প বয়সেই বল্লভভাই জাবেরবাকে বিবাহ করেন। মণিবেন ১৯০৩ সালে এবং দয়াভাই ১৯০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বহুদিন টিউমারে ভুগিয়া ১৯০৮ সালে বোম্বাই হাসপাতালে জাবেরবার মৃত্যু হয়।

শৈশবে বল্লভভাই নাদিয়াদ শহরে মাতুলালয়ে লালিত-পালিত হন। ১৮৯৭ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯০১ সালে ওকালতী পরীক্ষা পাস করেন। ব্যারিষ্টারী পাশ করিবার জন্য ১৯১০ সালে তিনি ইংলণ্ড যান এবং ১৯১২ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করিয়া তিনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি আমেদাবাদে আইনব্যবসায় আরম্ভ করেন।

আমেদাবাদে আইনজীবী হিসাবে সর্দ্দার প্যাটেল উত্তরোত্তর সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতেছিলেন। এই সময়ে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ ও নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন সম্পর্কে পশ্চিম-ভারতে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। আমেদাবাদকে কেন্দ্র করিয়া তিনি এই প্রচারকার্য্য চালাইতেছিলেন।

গান্ধীজীর আন্দোলন সম্পর্কে প্রথমে প্যাটেল শুধু উদাসীন ছিলেন না, অনেকটা উপেক্ষার ভাবেই ইহাকে দেখিতে-ছিলেন। কেবল অহিংস প্রতিরোধ অস্ত্র লইয়া ভারতে শক্তি-শালী ব্রিটিশরাজের এবং দক্ষিণ আফ্রিকা কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখীন হওয়া যায় তরুণ সর্দ্দার ইহা বিশ্বাস করেন নাই।

কিন্তু ১৯১৭ সালে গান্ধীজী যখন গুজরাট সভায় সভা-পতি হন, সেই সময় হইতেই সর্দ্দার প্যাটেল তাঁহার অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী হইতে আরম্ভ করেন। সর্দ্দারজী এই সভার সদস্য ছিলেন। গান্ধীজী তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহযোগে আসিয়া তাঁহার নিকট একটি কর্ম্মসূচীর বিষয় প্রকাশ করেন। যদিও উচ্চতম নৈতিক আদর্শই ছিল এই কর্ম্মসূচীর ভিত্তি তবুও প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহার সংগ্রামশীলতা এবং কার্য্যকারিতার প্রতি সর্দ্দারজী আকৃষ্ট হন। গুজরাটে এই কর্ম্মসূচী সম্পর্কে কার্য্য পরিচালনা ব্যাপারে সর্দ্দারজী ক্রমেই গান্ধীজীর অধিকতর সান্নিধ্যে আসিতে থাকেন। এই সময়ে তিনি আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির বিশিষ্ট কমিশনারদের অন্যতম ছিলেন। ১৯১৬ সালে সর্দ্দার প্যাটেল গুজরাট সভা কর্ত্তৃক গুজরাট হইতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন।

১৯১৮ সালে কয়রা সত্যাগ্রহ ব্যাপারে বল্লভভাই গান্ধীজীর

সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যোগ দেন। ইহার পূর্ব্বে ১৯১৭ সালে গান্ধীজী চম্পারণ জিলার মতিহারীতে সত্যাগ্রহ করিয়া সাফল্য লাভ করেন। নীলকরগণ কর্তৃক করবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এই আন্দোলন হইয়াছিল। গান্ধীজী এবং গবর্ণমেণ্টের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার ফলে কর হ্রাস পায় এবং রায়তগণের নিকট হইতে যে টাকা আদায় করা হইয়াছিল তাহা তাহারা ফেরত পায়।

যথারীতি শস্যোৎপাদন না হওয়ায় কয়রা জেলায় দুর্ভিক্ষ চলিতেছিল। ইহার ফলে কয়রা জেলার কৃষকবৃন্দ কর আদায় স্থগিত রাখিবার আবেদন জানায়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইহাতে কর্ণপাত না করায় গান্ধীজী তাহাদের সত্যাগ্রহ করিবার পরামর্শ দেন। গান্ধীজী স্বয়ং এই সত্যাগ্রহ পরিচালনভার গ্রহণ করেন এবং জনসাধারণের নিকট সাহায্য ও সহযোগিতার জন্ত আবেদন জানান। বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা এই সময়ে গান্ধীজীর সঙ্গে সহযোগিতা করিবার জন্ত আগাইয়া আসেন সর্দ্দার প্যাটেল তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি নিজের সুপ্রতিষ্ঠিত আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া গান্ধীজীর রাজনীতির মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং কয়রার সত্যাগ্রহে সম্পূর্ণভাবে যোগ দেন।

কয়রা সত্যাগ্রহের অল্প পরেই ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমেদাবাদ মিলসমূহে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হয়। গান্ধীজী শ্রমিকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এখানে সর্দ্দারজী তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। যে সংগঠনশক্তি তাঁহার মধ্যে এতদিন সুপ্ত ছিল, এই আন্দোলনে যোগ দিয়া তাহা বিকাশের সুযোগ পায়। ইহার ফলেই পরবর্ত্তীকালে ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁহার অতুলনীয় স্থান সম্ভব হইয়াছে। কঠোর পরিশ্রমে এই সময়ে বল্লভভাই শৃখলাহীন শ্রমিকগণকে নিয়ম-শৃখলায় আবদ্ধ করেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে তিনি বস্ত্র-শ্রমিক প্রতিষ্ঠান নামে একটি ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করেন। ভারতে এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান ইহাই প্রথম।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এই সময়ে প্রায় সমাপ্তির মুখে, মিত্রপক্ষের চূড়ান্ত জয় প্রায় আসন্ন, এই যুদ্ধজয়ে ভারতের দানের জন্ত তাঁহাকে "দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্টে"র প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। ইহার প্রথম পর্য্যায় হিসাবে ১৯১৮ সালের জুন মাসে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সরকারী কর্ম্মচারী মহল এবং মডারেট দল ইহাকে গ্রহণ করিলেও দেশের জনসাধারণ ইহাতে নিরাশ হন। আগষ্ট মাসে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়। পরলোকগত হাসান ইমাম এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সর্দ্দার প্যাটেলের অগ্রজ পরলোকগত ভি. জে. প্যাটেল অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন। অধিবেশনে শাসন-সংস্কার সংক্রান্ত রিপোর্ট "নৈরাশ্যজনক" বলিয়া ঘোষিত হয়। ১৯১৯ সালের ১লা জানুয়ারী রৌলাট রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্ট অনুযায়ী বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ৬ই ফেব্রুয়ারী আইন সভায় রৌলাট বিল পেশ করা হয়। মার্চ্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এই সংক্রান্ত দ্বিতীয় বিলটি গৃহীত হয়।

এই বিল গৃহীত হইবার পূর্ব্বে ২৪শে ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দেন যে, বিল আইনে পরিণত হইলে তিনি সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবেন। বিল পাস হওয়ায় তিনি ৩০শে মার্চ্চ হরতাল দিবস ধার্য্য করেন। ঐ দিবস সমগ্র ভারতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইবে, তিনি স্থির করেন। বিশেষ কারণে ঐ দিন পরিবর্ত্তন করিয়া পরবর্ত্তী ৬ই এপ্রিল স্থির হয়, কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের তারিখ যথারীতি ঘোষিত না হওয়ায় ভারতের সর্ব্বত্র, বিশেষভাবে পঞ্জাব ও বোম্বাইতে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়া যায়।

রৌলাট এক্ট আন্দোলনে সর্দ্দার প্যাটেল পশ্চিম ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। তিনি গুজরাটে আন্দোলন পরিচালনা করেন। পুলিসের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিহিংসা গ্রহণের ফলে এখানকার আন্দোলন কঠোর আকার ধারণ করে। কিন্তু সর্দ্দার প্যাটেল সুনিয়ন্ত্রিত গান্ধী-পদ্ধতিতে সত্যাগ্রহ-আন্দোলন পরিচালনা করিয়া তাঁহার দক্ষ পরিচালনা-শক্তির পরিচয় দেন। এই আন্দোলন সম্পর্কে আমেদাবাদে যাঁহারা গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন, সর্দ্দার প্যাটেল তাঁহাদের মধ্যে বহু ব্যক্তির পক্ষ সমর্থন করেন। ইহাই ব্যবহারাজীবরূপে আদালতে তাঁহার শেষ উপস্থিতি।

ভারতের পরবর্ত্তী রাজনৈতিক ইতিহাসে অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কিত প্রস্তাব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সর্দ্দার প্যাটেল এই আন্দোলনে ভারতের জাতীয় নেতারূপে পরিচিত হন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই অমৃতসরে কংগ্রেস অধিবেশন হয়। ইহার পর ১৯২০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইল। এই সময় মধ্যে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিবার জন্ত দেশকে প্রস্তুত করিতে থাকেন। কলিকাতায় গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কিত প্রস্তাব সামান্ত সংখ্যাধিক্য ভোটে গৃহীত হয়। কিন্তু ইহার কয়েক মাস পরে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে বিপুল-সংখ্যক সদস্ত গান্ধীজীকে সমর্থন করেন।

গুজরাটে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে আন্দোলন পরিচালনা করার ফলে সর্দ্দার প্যাটেল নবগঠিত বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ইহা ভিন্ন জাতীয় আন্দোলনে তাঁহার অপূর্ব্ব সংগঠনী শক্তি এবং নেতৃত্বের ফলেই ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় কংগ্রেসের ৩৬শ অধিবেশন আমেদাবাদে সম্ভবপর হয়।

১৯২২ সালের জানুয়ারীতে আমেদাবাদ কংগ্রেসের অব্যবহিত পরে বারদৌলী তালুকে বিঠলভাইয়ের নেতৃত্বে যে সম্মেলন হয় উহাতে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করার সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১লা ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী তদানীন্তন বড়লাট লর্ড রেডিংকে সাত দিন সময় দিয়া এক পত্র দেন। এই পত্র অনুযায়ী অসহযোগ আন্দোলনের সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দিলে এবং সংবাদপত্রের উপর হইতে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া লইলে তিনি বারদৌলী সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখিবেন বলেন।

লর্ড রেডিং ইহার প্রতি কর্ণপাত না করায় গান্ধীজী এবং সর্দার প্যাটেল আন্দোলনের জন্ত প্রস্তুত হইতে থাকেন। কিন্তু ইতিমধ্যে চৌরীচৌরা হত্যাকাণ্ড ঘটে এবং গান্ধীজী সমগ্র ভারতে আন্দোলন স্থগিত রাখিবার নির্দেশ দেন।

১৯২২ সালে গয়ায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

গয়া কংগ্রেসের পর দেশবন্ধু শীঘ্রই "স্বরাজ্য দল" গঠন করেন। গান্ধীবাদী কংগ্রেস চাহিয়াছিল বাহির হইতে সরকারের অসহযোগিতা করিতে, কিন্তু স্বরাজ্য দল তাহা চাহিল আইন সভায় প্রবেশ করিয়া।

দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভের পূর্ব্বে নাগপুরের রাজনৈতিক ঘটনাবলী দেশবাসীর নিকট গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে। নাগপুরে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল জাতীয় পতাকা সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯২৩ সালের ১লা মে ১৪৪ ধারা জারী করিয়া শহরের সিভিল লাইনের অভিমুখে জাতীয় পতাকা লইয়া শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহা হইতেই এখানে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের উৎপত্তি।

নাগপুর সত্যাগ্রহ কাহিনীর মত সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। প্যাটেল ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহসিকতা ও ত্যাগের সংবাদে সকলে মুগ্ধ হইয়া গেল। তাঁহাদের দৃঢ় সঙ্কল্প ও আন্দোলন সর্ব্বশেষে জয়ী হইল। ১৯২৩ সালের ১৮ই আগষ্ট ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকা সত্ত্বেও যে কোন রাস্তা দিয়া পতাকা শোভাযাত্রা যাইতে দেওয়া হইল। দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে আন্দোলনের নেতা ও স্বেচ্ছাসেবকদের সাহসিকতা, স্বাদেশিকতা ও ত্যাগের প্রশংসা করা হয় ও তাহাদিগকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

বারদৌলী গুজরাটের একটি তহশীল। এখানে কৃষিজীবীদেরই বাস। ১৯২৮ সালে রাজস্ব বোর্ড ভূমি-ব্যবস্থার সময় রায়তদের খাজনার হার শতকরা ২০৲ টাকা বর্দ্ধিত করিয়া দেয়। পশ্চিম-ভারতের মধ্যে এখানকার কিষাণেরা খুবই আত্মসচেতন। এই তহশীলে গান্ধীজীর পরীক্ষামূলকভাবে আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্কল্প হইতেই বুঝা যায়, এখানকার কৃষকদের মানসিক দৃঢ়তা কিরূপ।

কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত পরামর্শ না করিয়া তাহারা নিজেরাই খাজনা বন্ধের সিদ্ধান্ত করে। তালুকবাসী রায়তদের এক সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সম্মেলনেই রায়তদের আন্দোলনে সাহায্য ও নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য সর্দার প্যাটেলকে আহ্বান জানানো হয়।

সর্দারজীও অবিলম্বে এই আন্দোলনে সাড়া দিলেন। বারদৌলীতে গিয়া তিনি বলিষ্ঠ কিষাণদিগকে লইয়া একনিষ্ঠ সত্যাগ্রহী দল গঠন করিলেন। কিষাণদিগকে লইয়া তিনি খাজনা বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন।

সরকার রায়তদের গবাদি পশু ও তাহাদের সম্পত্তি ক্রোক করিতে লাগিল। নানাভাবে কিষাণদের উপর নির্যাতন চলিতে লাগিল। শত শত কিষাণ বন্দী হইল ও কারাবরণ করিল। শুধু পুরুষদিগকে নয়, নারী-নির্যাতনের সংবাদও শুনা যাইতে লাগিল। কিষাণদিগকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিতে পাঠানদিগকে আমদানী করা হইল। সত্যাগ্রহ দমন করার জন্য যেন শক্তিমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল শক্তি নিয়োজিত করা হইল। বোম্বাইয়ের তদানীন্তন গবর্ণর পুণায় এক বক্তৃতায়ও এই কথাই শাসাইয়া বলিয়াছিলেন।

সকল প্রকার অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে বারদৌলীর সত্যাগ্রহী রায়তগণ মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়।

এই সমগ্র আন্দোলন একজন মাত্র মানুষের—সর্দার প্যাটেলের সৃষ্টি। প্রথম অবস্থায় এই সংগ্রামে কংগ্রেস হস্তক্ষেপ করে নাই অথবা বাহিরের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রায়তদিগকে সাহায্যের জন্য সরাসরি আগাইয়া আসেন নাই।

সর্দার প্যাটেলই জয়ী হইলেন। এই বিরাট সংগ্রামে জয়লাভের পরই তিনি ভারতের দুর্দ্ধর্ব কৃষক, "লৌহমানব" এবং "বারদৌলীর সর্দার" বলিয়া গণ্য হইলেন।

১৯২৯ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর লক্ষ্ণৌয়ে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির বিশেষ অধিবেশন বসিল। সর্দারজী বিশেষ সতর্কতা সহকারে নিজেকে গান্ধীজীর মন হইতে দূরে রাখিয়া কংগ্রেসের ১৯২৯ সালের লাহোর অধিবেশনে জবাহরলালকে সহজে সভাপতি নির্ব্বাচিত করার সুযোগ দিলেন।

৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে গবর্ণমেন্টের নিকট প্রদত্ত চরমপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে নেহরু রিপোর্টও বাতিল হইয়া গিয়াছে বলিয়া লাহোর কংগ্রেসে ঘোষণা করা হয়। এই হেতু কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন; ইহার অর্থ ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ। ইহা ছাড়া প্রতি বৎসর ২৬শে জানুয়ারী সমগ্র জাতি স্বাধীনতা দিবস পালন করিবে বলিয়াও স্থির হয়।

২৬শে জানুয়ারী প্রথমবার সমগ্র ভারতে স্বাধীনতা দিবস বিপুল সাফল্যের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানকল্পে লর্ড আরুইন ও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গান্ধীজী পত্র ব্যবহার করিতে থাকেন। বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীজীর আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হওয়ায় ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি সবরমতীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠক আহ্বান করা হয়। বৈঠকে এক যুগান্তকারী প্রস্তাব গৃহীত হইল। উহাতে গান্ধীজীকে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। গান্ধীজীও কার্য্যারম্ভের জন্য দ্রুত পরিকল্পনা রচনা করিতে থাকেন। তিনি লবণ আইন ভঙ্গ করিয়া আইন অমান্য করিবেন বলিয়া স্থির করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অনুগামীসহ সবরমতী হইতে সমুদ্রতীরবর্ত্তী ডাণ্ডিতে সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিবার জন্য যাত্রা করিবার ব্যবস্থা করেন।

গান্ধীজীর পূর্ব্বগামী পথ-প্রস্তুতকারক হিসাবে সর্দ্দার প্যাটেল স্বেচ্ছায় যে কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তাহার মধ্যে আন্তরিকতা, মহত্ত্ব ও অভিনবত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যীশুর পূর্ব্বগামী জন দি ব্যাপ্টিষ্টের সঙ্গে একমাত্র তাঁহারই তুলনা চলে। পৃথিবীর ত্রাণকর্ত্তার আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুতের অথবা তাঁহাকে গ্রহণের উপযোগী শিক্ষাদানের চেষ্টা ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে জুডার কর্ত্তৃপক্ষ যেরূপ নির্য্যাতন আরম্ভ করে, ভারতের ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষও প্যাটেলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য দ্রুত অনুরূপ দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। গান্ধীজী অভিযান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই ১২ই মার্চ্চ রাস নামক স্থানে বল্লভভাইকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গান্ধীজীর ডাণ্ডী অভিযান ২৪ দিন স্থায়ী হইয়াছিল। এই অভিযানে কর্ত্তৃপক্ষ কোনরূপ বাধা দেন নাই; ইহাতে তিনি ও লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী অবাক হইয়া যান। অভিযানের প্রারম্ভেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহার জনপ্রিয়তা ও প্রভাব এত বেশী ছিল যে, তাঁহাকে গ্রেপ্তার করার অর্থ সমগ্র দেশবাসীকে গ্রেপ্তার করা হইবে বলিয়া লর্ড আরুইন বুঝিতে পারেন।

ইহার পর গোলটেবিল বৈঠক সাফল্যমণ্ডিত না হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার তাহার সকল প্রতিশ্রুতি জলাঞ্জলি দিয়া কঠোর দমননীতি সুরু করিয়া দেয়।

গান্ধীজী ব্রিটিশ বড়লাট লর্ড উইলিংডনের নিকট সরকারের অত্যাচার সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করিয়া এক তার প্রেরণ করেন এবং বড়লাটও সঙ্গে সঙ্গে তারের জবাব দেন, কিন্তু উহাতে প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা তো ছিলই না, অধিকন্তু গান্ধীজীর শান্তির প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করা হয়। গান্ধীজী ও ১৯৩১ সালের কংগ্রেস-সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয়। দিগকে যারবেদা জেলে আটক রাখা হয়। ১৬ মাস পর তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন। গান্ধীজী সর্দ্দার প্যাটেলের সহিত বাস করিবার সুযোগকে 'শ্রেষ্ঠ অধিকার' বলিয়াছেন। গান্ধীজী লিখিয়াছেন, "আমি তাঁহার অপরিসীম বীরত্বের কথা জানি। তিনি যে স্নেহ দিয়া আমাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, তাহা আমার মায়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাঁহার যে মায়ের মত গুণ আছে, তাহা আমি জানিতাম না।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে গান্ধীজী যুদ্ধের বিরোধিতা করিয়া ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন। সর্দ্দার প্যাটেলকে ভারতরক্ষা আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয়। পরে ক্রীপস আলোচনার পূর্ব্বে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধিবেশনে "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গৃহীত হয়। সর্দ্দার প্যাটেল এই উপলক্ষে বলেন, "ব্রিটিশদের অপেক্ষা বরং আমরা ডাকাতদের দ্বারা শাসিত হইব।"

নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের পর মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবর্গকে গ্রেপ্তার করা হয়। সর্দ্দার প্যাটেল ও অন্যান্য নেতৃবর্গকে আমেদাবাদ কোর্টে আটক রাখা হয়। ১৯৪৫ সালে সর্দ্দার প্যাটেল আমেদাবাদ কোর্ট হইতে মুক্তিলাভ করেন।

১৯৪৬ সালে কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনানুযায়ী শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তর করা হইলে শ্রীজবাহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং সর্দ্দার প্যাটেল উক্ত মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত-ব্যবচ্ছেদের পর ভারত স্বাধীন হইলে সর্দ্দার প্যাটেল প্রথম সহকারী প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং তিনি দেশীয় রাজ্য ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার গ্রহণ করেন। সর্দ্দার প্যাটেল ভারতের ইতিহাসে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সম্রাট্ অশোক, সমুদ্র গুপ্ত, আকবর, আওরঙ্গজেব এবং ব্রিটিশ শাসনের আমলে যাহা সম্ভব হয় নাই, সর্দ্দার প্যাটেল তাহাই করিয়াছেন। তিনি প্রায় ছয় শত সামন্ত রাজ্যকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া একশাসনব্যবস্থার অধীনে আনিয়াছেন। তিনি সামন্ত প্রথার বিলোপসাধন করিয়াছেন।

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু যখনই দেশের কোন স্থানে সমস্যা দেখা দেয়, তখনই সেই বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই হেতু তাঁহাকে একের পর আর বহু দূর স্থানে যাইতে হয়। কলিকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানে অন্তর্ঘাতী কার্য্যকলাপের ফলে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে এক বিরাট সমস্যা দেখা দেয়। এইজন্য ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে সর্দ্দারজীকে কলিকাতা আসিতে হয়।

ইহার কিছুকাল পরই পূর্ববঙ্গে ভয়াবহ দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ হয়। এই সময় পূর্ববঙ্গের ব্যাপক অঞ্চলে গোঁড়া ও গুণ্ডাশ্রেণীর মুসলমানগণ সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অবাধে যে নৃশংস অত্যাচার চালাইয়াছে, তাহার কোন তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পূর্ববঙ্গের এই সকল শোচনীয় ঘটনার ফলে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পূর্ববঙ্গ হইতে অবিরাম উদ্বাস্তু আগমনের ফলে কিছুকালের জন্য কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানে অবস্থা বিশেষ গুরুতর আকার ধারণ করে। দিল্লী চুক্তির ফলেও সেই অবস্থা শান্ত হয় নাই। এই হেতু ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ১৯৫০ সালের ১৬ই এপ্রিল পুনরায় কলিকাতা পরিদর্শনে আসিতে হয়। (এই সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা "আনন্দবাজার পত্রিকা" হইতে গৃহীত।)

শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষের বিবৃতি

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের পদত্যাগের পর একটি বিবৃতি দিয়াছেন। বিবৃতিটিকে দুই অংশে ভাগ করা যায়। ডাঃ ঘোষের পদ-ত্যাগপত্রে বলা হইয়াছিল যে, পুনরায় যাহাতে দেশে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গঠিত হয় তাহার জন্যই তিনি কংগ্রেস ছাড়িয়াছেন। বিবৃতির প্রথমার্দ্ধে এই কথার জবাবে শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলিতে-ছেন, "আমরা বিশ্বাস করি না যে ডাঃ ঘোষ কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া কোন নূতন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গঠন করিতে সক্ষম হইবেন।" যে যুক্তিক্রম অবলম্বনে শ্রীঅতুল্য ঘোষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা এই :

"১৯২৩ সালে স্বরাজ্য পার্টি গঠনের পর ইণ্ডিয়ান এসোসি-য়েশন হলে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি নির্ব্বাচনে ডাঃ ঘোষের দল দেশবন্ধুর দলের নিকট পরাজিত হন। তাহার পর বাস্তবিক পক্ষে ডাঃ ঘোষের সহিত কংগ্রেসের বহু বৎসর কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না এবং ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ডাঃ ঘোষ এবং তাঁহার অভয় আশ্রমের সহ-কর্ম্মীরা অভয় আশ্রমের নাম দিয়া বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর জেলায় আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করেন। ১৯৩৪-এর পর যখন কংগ্রেসের উপর হইতে সর্ব্বপ্রকার বিধিনিষেধ উঠিয়া যায়, প্রকৃতপক্ষে তিনি তখন সক্রিয়ভাবে কংগ্রেসের কার্য্যে যোগ-দান করেন। ১৯৩৪ হইতে ১৯৫০-এর সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত আচার্য্য কৃপালনী এবং শ্রীশঙ্কররাও দেও নিখিল-ভারত কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন এবং ১৯৩৪ সাল হইতে ১৯৫০ এর সেপ্টেম্বরে সভাপতি নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত ডাঃ ঘোষ এবং তাঁহার সমর্থকগণের মনোমত ব্যক্তিরাই কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিয়াছেন। মধ্যে অবশ্য সামান্য সময়ের জন্য ইহার ব্যতি-ক্রম ঘটিয়াছিল নেতাজীর নির্ব্বাচনে। ডাঃ ঘোষ নিজেও ১৯৪০ হইতে ১৯৫০-এর সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে ছিলেন। ইহা কাহারও পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব নহে যে, ১৯৫০-এর সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৫০-এর নবেম্বরের মধ্যে কংগ্রেসের পতন হইয়াছে। পতন যদিই হইয়া থাকে, তাহা ধীরে ধীরে বহু বৎসর ধরিয়াই হইয়াছে এবং ডাঃ ঘোষের সমর্থিত ব্যক্তিগণের সভাপতিত্বে এবং সম্পাদনায় সঙ্ঘটিত হইয়াছে, আর এই দশ বৎসর ধরিয়া ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরূপে এই অনাচার বৃদ্ধিতে তাঁহারও অংশ কম নহে। এই অবস্থায় তিনি যে বিবৃতিই প্রকাশ করুন না কেন, কংগ্রেসের অনাচার বৃদ্ধির দায়িত্ব তিনি এড়াইয়া যাইতে পারেন না। যদি তাঁহার বিবৃতি সত্য হয় অর্থাৎ কংগ্রেস সত্যই অনাচারে পূর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি এবং তাঁহার সমর্থিত ব্যক্তিরাই ধীরে ধীরে কংগ্রেস ধ্বংস করিবার জন্য কংগ্রেসে অনাচার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেইজন্যই তাঁহার দ্বারা দেশের মধ্যে সবল ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। সেইজন্যই আমরা বিশ্বাস করি না যে, ডাঃ ঘোষ কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া কোন নূতন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গঠন করিতে সক্ষম হইবেন। আর যদি তাঁহার বিবৃতি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।"

দেশবন্ধুর দলের নিকট পরাজয়ের পর ডাঃ ঘোষের কংগ্রেসের সহিত বহু বৎসর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নহে। ঐ সময় কংগ্রেস 'নো-চেঞ্জার এবং 'প্রো-চেঞ্জার' দলে ভাগ হইয়া যায়। এই সময় দেশবন্ধুর দলে না থাকাটা কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ না রাখার নিদর্শন নয়। ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচনে বাংলাদেশে একমাত্র ডাঃ ঘোষের দলের ৮০ জন তাঁহার বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন। এই সব কাজকে কংগ্রেস ছাড়া বলিলে অত্যুক্তি হয়। ১৯৪০ হইতে ১৯৫০ পর্য্যন্ত ডাঃ ঘোষ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে ছিলেন—এটাও ঠিক নয়। এই সময়ের মধ্যে কিছুকাল শরৎচন্দ্র বসু ওয়ার্কিং কমিটিতে ছিলেন। ডাঃ ঘোষকে সমালোচনা করিবার অনেক কারণ আছে, গত সংখ্যা প্রবাসীতে আমরা তাহা করিয়াছি। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া কোন নূতন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গঠন করিতে পারিবেন না, শ্রীঅতুল্য ঘোষের এই সিদ্ধান্ত আমরা সমর্থন করি; কিন্তু তার জন্য যে যুক্তিক্রম তিনি দিয়াছেন তাহার মধ্যে বহু মারাত্মক ভুল কথা আছে। প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতির পক্ষে কংগ্রেসের অতি আধুনিক ইতিহাস সম্বন্ধে এরূপ অজ্ঞতা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। এই বিবৃতি ইংরেজী কাগজেও কলাও করিয়া সম্পূর্ণ ছাপা হইয়াছে। ভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস কর্ম্মী-দের নিকট বাংলা কংগ্রেসের সভাপতির এই প্রচণ্ড অজ্ঞতা হাস্যকর বলিয়াই মনে হইবে।

বিবৃতিটির দ্বিতীয়াংশে শ্রীঅতুল্য ঘোষ বাংলার কংগ্রেস আন্দোলন সম্বন্ধে যে সব উক্তি করিয়াছেন তাহা শুধু যে ভুল তাহা নহে, নিতান্ত আপত্তিকর এবং বাঙালীর পক্ষে কলঙ্ক-জনক। তিনি বলিতেছেন যে, বাংলাদেশে কংগ্রেসের শক্তি কোন দিনই ছিল না, ডাঃ ঘোষ উহাকে আর বেশী কি শক্তিহীন করিবেন। ঘোষ মহাশয়ের বিবৃতির এই অংশটি এইরূপ :

"এই বাংলাদেশের কলিকাতা মহানগরীতে ১৯২০ সালে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে কংগ্রেস হইতে অসহযোগ

প্রস্তাব গৃহীত হয়। অধিবেশন বাংলায় হইয়াছিল, কিন্তু অধিকাংশ বাঙালী প্রতিনিধি অসহযোগ প্রস্তাবে বিরোধিতা করেন এবং প্রদেশের সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা দেশবন্ধু অসহযোগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করিবার জন্য নাগপুর অধিবেশনে যোগদান করেন। অবশেষে দেশবন্ধু অসহযোগ প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়ায় বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয় এবং তাহাও মাত্র কলিকাতা মহানগরী ও কয়েকটি প্রদেশ, বোম্বাই, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশের সর্ব্বস্তরের গ্রাম ও শহরের জনসাধারণ যে ভাবে সাড়া দেয়, বাংলায় তাহার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ১৯৩০-এর লবণ সত্যাগ্রহে বাংলার ছাত্ররা যোগদান করিতে অস্বীকার করেন এবং দেশপ্রিয় সেনগুপ্তকে কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে (হেদুয়া) বেআইনী পুস্তক পাঠ করিয়া বাংলাদেশে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিতে হয়। মেদিনীপুর এবং আরও দু-একটা ছোটখাট জেলার গ্রামে এ আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকে। ১৯৩২-এর আন্দোলনেও অনুরূপ। ইহা সত্য যে সমগ্রভাবে মেদিনীপুর জেলায় গণজাগরণের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তাহা ৪২-এর বিপ্লবেও অব্যাহত ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের অন্য কোন জেলা সে গৌরব ও মর্য্যাদার অধিকারী হয় নাই। খণ্ড খণ্ড ভাবে কয়েকটা জেলায় সামান্য আন্দোলন হইয়াছিল; কিন্তু জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সমগ্র দেশ তাহাতে সাড়া দেয় নাই। কলিকাতা মহানগরীতে সামান্য দু-একটা ট্রাম ও বাস ধ্বংস করিয়াই এবং কয়েকটা শোভাযাত্রা বাহির করিয়াই আগষ্ট বিপ্লবের অবসান ঘটে। বিশেষ বিচার করিলে বুঝা যায় যে, বাংলাদেশের গণমন কখনও কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দেয় নাই। যদিও ইহা সত্য যে, নির্ব্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থীরা জনসাধারণের সমর্থন লইয়াছেন, কিন্তু সময়-সুযোগমত বাংলার জনসাধারণ ইহাও প্রমাণিত করিয়াছেন যে, নির্ব্বাচনেও বাংলাদেশ কংগ্রেসকে সমর্থন করে না। ১৯৩০ হইতে ১৯৩৪-এর আইন অমান্য আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় শেষ হইবার পর কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্ব্বাচন হয়। সেই নির্ব্বাচনে বাংলাদেশের সব কয়টি আসনে কংগ্রেসপ্রার্থী পরাজিত হন। ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা, ইহা সত্য। বাঙালী ব্যক্তিগত ভাবে বহু ত্যাগস্বীকার করিয়াছে, নির্যাতন বরণ করিয়াছে; কিন্তু সমষ্টিগতভাবে বাঙালী জাতি হিসাবে কংগ্রেস আন্দোলনকে বিশেষভাবে গ্রহণ করে নাই। ১৯৪২-এর আগষ্ট বিপ্লবে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, গুর্জ্জর, মদ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ বিপ্লবের অগ্নিতে নিজেদের আহুতি দিয়াছে। বাঙালী সেই বিপ্লবকে শ্রদ্ধা করিয়াছে, কিন্তু সমগ্রভাবে গ্রহণ করে নাই। এই অবস্থায় বাংলাদেশে কংগ্রেস শক্তিহীন হইতেছে, এই বিবৃতি জনসাধারণকে উদ্‌ভ্রান্ত করিতে পারে, কিন্তু ইহার সহিত সত্যের সম্পর্ক নাই। কেন বাংলাদেশের এই অবস্থা, তাহার আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা আমরা আলোচনা করিতেছি।"

"অসহযোগ আন্দোলনে বোম্বাই, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশের সর্ব্বস্তরের গ্রাম ও শহরের লোক যেভাবে সাড়া দেয় কলিকাতা ছাড়া বাংলাদেশে তাহা হয় নাই"—অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে এই উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। বাংলার প্রায় প্রত্যেক মফস্বল শহরে অসহযোগ আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

"১৯৩০ সালের লবণ সত্যাগ্রহে বাংলার ছাত্রেরা যোগদান করিতে অস্বীকার করেন এবং দেশপ্রিয় সেনগুপ্তকে কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে বেআইনী পুস্তক পাঠ করিয়া বাংলাদেশে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিতে হয়। মেদিনীপুর এবং আরও দু-একটা ছোটখাট জেলার গ্রামে এ আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকে।" এই উক্তি শুধু মিথ্যা নহে, ইহা ক্ষতিকারক। বাংলার তরুণ সমাজ কোন সময়েই গান্ধীবাদে বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগদানের জন্য গান্ধীজীর ডাক আসিবামাত্র তাহারা উহাতে যোগ দিয়াছে। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দ্বারা বিপ্লব আন্দোলনেরও আরম্ভ হয়। বাংলার যুবসমাজ ও ছাত্রসমাজ উভয় আন্দোলনেই ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। বাংলায় লবণ তৈরির সুবিধা সব জায়গায় নাই বলিয়া কতকগুলি স্থানে লবণ সত্যাগ্রহ সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু বেআইনী পুস্তক পাঠ, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ প্রভৃতি অন্যান্য উপায়ে সর্ব্বত্রই আইন অমান্য আন্দোলন চলিয়াছে। দেশপ্রিয় সেনগুপ্তকে বেআইনী পুস্তক পাঠ করিয়া আইন অমান্য আরম্ভ করিতে হয় একথা বলা সম্পূর্ণ সত্য নয়; আইন অমান্য তার আগেই আরম্ভ হইয়াছিল, দেশপ্রিয় স্বয়ং বেআইনী পুস্তক পাঠ করিয়া কলিকাতার আন্দোলনে শক্তি সঞ্চার করেন। বিলাতী পণ্য বর্জ্জন এবং বিলাতী কাপড় পোড়ানো অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনের অঙ্গ ছিল। বাংলাদেশে দুইটিই প্রবলভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়। অতুল্য বাবুর এ সম্বন্ধে কোনই জ্ঞান নাই দেখা যাইতেছে। বাংলার বিলাতী বর্জ্জন আন্দোলন এতো সফল হইয়াছিল যে, খুব কম প্রদেশেই এরূপ হইয়াছে। বাংলার এই বয়কটের পূর্ণ সুযোগ বোম্বাই ও আমেদাবাদের মিল মালিকেরা লাভ করিয়াছিল। বিলাতী কাপড়ের প্রতিযোগিতায় যে সময়ে ইহাদের মিল বন্ধ করিবার উপক্রম হইয়াছে সেই সময়ে বয়কট আন্দোলনে আলোড়িত বাংলা সিকের দামে ইহাদের চট কিনিয়া কত কোটি টাকা ইহাদের পকেটে ঢালিয়াছে তার হিসাব বাহিরের লোক করিবে না সত্য, কিন্তু বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতির পক্ষে এ কথা ভুলিয়া যাওয়া অমার্জ্জনীয় অপরাধ। লবণ সত্যাগ্রহের আন্দোলন সর্ব্বশেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল বাংলার, মেদিনীপুর ও আরামবাগে।

"১৯৪২ সালে খণ্ড খণ্ড ভাবে কয়েকটা জেলায় সামান্য আন্দোলন হইয়াছিল, কিন্তু সমগ্র দেশ তাহাতে সাড়া দেয় নাই; কলিকাতায় সামান্য দু-একটা ট্রাম ও বাস ধ্বংস করিয়া এবং কয়েকটা শোভাযাত্রা বাহির করিয়াই আগষ্ট বিপ্লবের অবসান ঘটে"—অতুল্য বাবুর এই উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। মেদিনীপুরের নাম তিনি উল্লেখমাত্র করিয়াছেন, কিন্তু ঐ জেলার আগষ্ট বিপ্লব আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে বালিয়া বা সাতারা জেলার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বলিয়াছিলেন যে, মেদিনীপুরের একাংশে ব্রিটিশ শাসন বিদ্যমান নাই,

সরকারের সৈন্য ও পুলিস সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। ঘূর্ণীব্যাত্যার সুযোগে ইংরেজ সেখানে এই আন্দোলনের যে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়াছিল তার কথা শ্রীঅতুল্য ঘোষের জানা না থাকিতে পারে কিন্তু উহার বহু সাক্ষী এখনও জীবিত আছেন। কলিকাতা শহরেও আগষ্ট বিপ্লব আন্দোলন প্রবল ভাবে চলিয়াছিল, প্রায় তিন শত লোক পুলিসের গুলিতে নিহত ও আহত হইয়াছিল। যে অবস্থায় এই সময়ে কলিকাতায় শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছে, ভারতবর্ষের আর কোনও শহরে এতখানি বিপদ এবং এত বেশী ঝুঁকি লইয়া অনুরূপ শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছে বলিয়া জানি না। কলিকাতার শান্তিরক্ষার উপর ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট মুসলীম লীগ ও মুসলমান সৈন্য ও পুলিসের সাহায্যে সমগ্র শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়াছিল এবং সেই শক্তি বাঙালী তরুণেরা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল। ১৯৪২ সালে বাংলায় যত যুবক হতাহত, গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে আটক হইয়াছে আর কোন প্রদেশে এত হয় নাই। অতুল্য বাবু অন্যান্য প্রদেশের "সর্ব্বস্তরের গ্রাম ও শহরের জনসাধারণ" আন্দোলনে যোগ দিয়াছে বলিয়া বলিয়াছেন, ইহাও তাঁহার অজ্ঞতার নিদর্শন। এক শ্রেণীর আত্মভোলা লোক চিরদিনই কংগ্রেস আন্দোলন পরিচালিত করিয়াছে। তবে একদল ধনিক ভবিষ্যৎ স্বার্থের লোভে কিছু টাকা দিয়াছে এবং বুদ্ধিমান সুবিধাবাদীরা বাক্স-বিছানা বাঁধিয়া, জেলে ঢুকিয়া "রাজনৈতিক উপবীত" লাভের আশায়, জেল-গেটে ধর্ণা দিয়াছে। কিন্তু স্বদেশী যুগ হইতে স্বাধীনতা লাভ পর্য্যন্ত এই আত্মভোলাদের সংখ্যা ভারতের কোন প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশে কম ছিল না। কংগ্রেস বা বিপ্লব আন্দোলনের আগুনে যাহারা হাত দেয় নাই, কংগ্রেস আপিসের দোর গোড়া পর্য্যন্ত যাহাদের দৌড় ছিল, সেই জাতীয় ভলাণ্টিয়ার কংগ্রেস-সভাপতির আসনে বসিয়া বিদ্যা জাহির করিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু তাহা করিতে দিলে সমগ্র দেশের মুখে চুণকালি পড়ে এইটাই আমাদের বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখা দরকার।

১৯২০, ১৯৩০ ও ১৯৪২ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। সেই সূত্রেই অতুল্যবাবুর বিবৃতির তীব্র সমালোচনা আমরা করিতেছি। ১৯৪২ সালের গণআন্দোলনের সময় বাংলা, বিহার, আসাম ও যুক্তপ্রদেশের বিপ্লবে যাঁহারা চালক ছিলেন তাঁহাদের নেতৃস্থানীয়দিগের অধিকাংশের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। অতুল্যবাবু সে সময় কোথায় গা-ঢাকা দিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু এ কথা সত্য যে তিনি সে সময় এই কয় প্রদেশের আন্দোলনে কোন অংশই গ্রহণ করেন নাই। অসহযোগ আন্দোলনে তাঁহার নামও কেহ জানিত কি না জানি না, লবণ সত্যাগ্রহের সময়ের কথাও তিনি ঠিক জানেন না ইহা আমরা দেখিতেছি।

পরিশেষে শ্রীমান্ প্রফুল্ল সেনকে আমরা বলিব যে, তাঁহার এখনও যদি চোখ না খোলে তবে "পার্ট চেষ্ট"-এ কোটি টাকা আসিলেও তাঁহার জাতও যাইবে পেটও ভরিবে না, সঙ্গদোষের ফলে। বাজারে অযথা ও অকারণ বদনাম অর্জ্জন করাই যদি তাঁহার ঈপ্সিত হয় তবে তথাস্তু।

শ্রীঅতুল্য ঘোষের ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ এতাদৃশ বিবৃতি প্রকাশ করিয়া পশ্চিম বাংলার ইংরেজী ও বাংলা সংবাদপত্রগুলি যে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে তাহাতে আমরা অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করিতেছি।

কম্যুনিজম ও হাইকোর্ট

কলিকাতা হাইকোর্ট কম্যুনিষ্ট বন্দীদের ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, ইঁহাদিগকে আটক রাখা বেআইনী হইয়াছে এবং যে ১৯ জন বন্দী হেবিয়াস কর্পাস দাবি করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে অবিলম্বে মুক্ত করিবার জন্য হাইকোর্ট আদেশ দিয়াছেন। হাইকোর্টের রায়ের প্রকাশ্য সমালোচনা বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ ইহাতে সামান্য সামান্য ব্যাপারে বিরূপ আলোচনার দ্বারা বিচারকার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। কিন্তু হাইকোর্টের রায় সকল সমালোচনার একেবারে ঊর্দ্ধে যাওয়া উচিত নহে ইহাই আমাদের বিশ্বাস এবং যাঁহাদের তাহা করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা ও দায়িত্বজ্ঞান আছে তাঁহারা এরূপ করিলে তাহাতে দেশের অকল্যাণ না হইয়া কল্যাণ হইবারই সম্ভাবনা সমধিক। বিচারের সময় হাইকোর্টের বিচারপতিদের মনে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব বা রাষ্ট্রচালকদিগের প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আক্রোশ যাহাতে না থাকে তাহা বিশেষ ভাবে না দেখিলে ন্যায় বিচারকেও লোকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করে।

ভারতবর্ষে কম্যুনিষ্ট আন্দোলন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, মাদ্রাজে কম্যুনিষ্টরা কতদূর ব্যাপক সশস্ত্র আন্দোলন করিয়াছে তাহার নিদর্শন দিল্লীতে এক কম্যুনিষ্ট অস্ত্র প্রদর্শনীতে দেখানো হইতেছে। বাংলাদেশেও কম্যুনিষ্টদের হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ সুবিদিত। ইহারা যানবাহন চলাচল, খাদ্য সংগ্রহ প্রভৃতি জাতির অত্যাবশ্যক কার্য্যে প্রবলভাবে বাধা দিয়াছে, তার জন্য বোমা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছে। সশস্ত্র ডাকাতিগুলিতে ইহাদের হাত আছে তাহা সন্দেহ করা অন্যায় হইবে না। জাতির শান্তিপূর্ণ জীবন এবং অত্যাবশ্যক কার্য্যকলাপে বাধা দান দেশের প্রতি শত্রুতা ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ইহাদের দেশদ্রোহাত্মক কার্য্যকলাপ বন্ধ করিবার জন্যই বাংলাদেশে কম্যুনিষ্ট দলকে বেআইনী ঘোষণা করা হইয়াছে। এই ঘোষণার পরমুহূর্ত্তে কম্যুনিষ্ট দলের নেতৃবৃন্দ আত্মগোপন করিয়াছেন। ইঁহাদের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে, তার বিরুদ্ধে তাঁরা আদালতে প্রতিকার প্রার্থনা করেন নাই। পুলিস যখন ধরিয়াছে তখনই তাঁহারা আইনের ফাঁক ধরিয়া মুক্তিলাভের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হইয়াছেন।

যে সমস্ত কম্যুনিষ্ট বন্দীকে ধরিয়া রাখা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া আদালত রায় দিয়াছেন তাহাদের মামলা সম্পর্কে কেবল এইটুকু মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে যে, ইহাদিগকে আটকানো বে-আইনী হইয়াছে। ইহার চারটি অর্থ হইতে পারে। হয় আইনে ফাঁক আছে, নয় ভুল লোক ধরা হইয়াছিল, নতুবা ইহাদের বিরুদ্ধে পর্য্যাপ্ত প্রমাণ আদালতে উপস্থিত করা হয় নাই অথবা

বিচারে ভুল আছে। কম্যুনিষ্টদের কার্য্যকলাপ জাতীয় স্বার্থের বিরোধী ইহাতে দ্বিমত নাই, ইঁহাদের অন্যায় কাজ বন্ধ করিবার উপযুক্ত আইন যদি না থাকে, বা আইনে যদি কোন ফাঁক থাকে তবে তাহা মেরামত করিতে লেশমাত্র বিলম্ব হওয়া উচিত নহে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দেশবাসীর অভিমত তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিকাংশের মতের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়। আইন সভার এরূপ যে অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দ্বিধা করিবার কিছু নাই। প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের আইন সভাতেই ইহাদের রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যকলাপ দমন করিবার জন্ম আইন পাস হইয়াছে। যদি সেই সমস্ত আইনে ত্রুটি থাকে, তবে তাহা সংশোধনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। আইনের মর্য্যাদা অবশ্যই পালিত হইবে, কিন্তু দেশের স্বার্থ এবং জনসাধারণের অভিমতের স্থান তাহারও ঊর্দ্ধে। ভারত-সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহের আইন-সচিবদের ইহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রশ্ন, ভুল লোক ধরা এবং পর্য্যাপ্ত প্রমাণ উপস্থিত না করা। এখানে পুলিসের দায়িত্ব আসিয়া পড়িতেছে। ইংরেজ আমলে বিপ্লবীদের কার্য্যকলাপ এবং ষড়যন্ত্রের সংবাদ ও প্রমাণ সংগ্রহের জন্ম যত টাকা ব্যয় হইত এবং যত লোক নিযুক্ত ছিল এখন দুইটিই তার চেয়ে অনেক বাড়িয়াছে। তখন বিপ্লবীদের প্রতি জনসাধারণের পরোক্ষ সহানুভূতি গভীর ছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহও তাই রীতিমত কঠিন ছিল। কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে এখন সে কথা খাটে না। দেশের বৃহত্তম অংশ কম্যুনিষ্টদের ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপ সমর্থন করে না, ইহাদের রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যকলাপ দমনে সংবাদপত্রগুলি গবর্ন্মেণ্টকে সমর্থন করিয়া থাকে। আগে অনেকগুলি বিপ্লবী দল ছিল, তাহাদের খোঁজ খবর লওয়া যত কঠিন ছিল এখন একটি মাত্র দল কম্যুনিষ্ট-পার্টির সংবাদ লওয়া তার চেয়ে অনেক সহজ হওয়া উচিত। আগে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার ন্যায় বিরাট মামলা গোয়েন্দা পুলিস পরিচালিত করিয়াছে এবং বড় বড় কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে এত প্রমাণ আদালতে উপস্থিত করিয়াছে যে, অভিযুক্তেরা দণ্ডিত হইয়াছে। এখন বিনা বিচারে আটক রাখা সহজ হইয়াছে এবং তার জন্ম প্রমাণ সংগ্রহের দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এত কমিয়া গিয়াছে যে, পুলিসের পুরাতন কৃতিত্ব জাহান্নমে গিয়াছে। ফেরারী পরিচিত কম্যুনিষ্টরা পুলিসকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া প্রকাশ্য বিবাহ সভায় পুলিস কর্ত্তাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াও নিরাপদে ফিরিয়া গিয়াছে ইহা তো আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। বড় বড় কম্যুনিষ্ট নেতাদের অধিকাংশই এখনও ফেরার। ইহার একমাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, হয় পুলিস একেবারে অযোগ্য, নতুবা ইহাদের সহিত কম্যুনিষ্টদের যোগাযোগ রহিয়াছে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে দুইটিই সমান বিপজ্জনক। কলিকাতা পুলিসের অপদার্থতা সম্বন্ধে আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম এবং বর্ত্তমানে পুলিস কমিশনারের কার্য্যকলাপের ফল সম্বন্ধে যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম তাহা এখন অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিসে অন্যতম দক্ষ লোক একজন ছিলেন, তিনি ইন্সপেক্টর জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়া অনেক ভাল কাজ করিয়াছেন। কলিকাতা পুলিস যখন কিছুতেই কম্যুনিষ্ট ধরিতে পারিতেছে না তখন ইঁহার উপর কয়েকটি লোককে ধরিবার ভার দেওয়া হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই ইনি তাহাদিগকে কলিকাতা হইতেই ধরিয়া দেন। ইহার পর কলিকাতা পুলিসের অনেকের সহিত কম্যুনিষ্টদের যোগ আছে একথা কে না বলিবে? পুলিস তৎপর হইলে কম্যুনিষ্টদের বিনা বিচারে আটক রাখিবার দরকার হয় না। তাহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মামলা উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকে আদালতে সোপর্দ্দ করিয়া প্রচলিত আইনানুসারেই দণ্ডিত করিতে পারিত। জনসাধারণ যেখানে ষড়যন্ত্রের কথা বোঝে, পুলিস সেখানে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারে না ইহার চেয়ে কলঙ্কের কথা পুলিস বিভাগের পক্ষে আর কিছু হইতে পারে না।

ইন্সপেক্টর জেনারেল সুকুমার গুপ্ত অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছেন। তাঁহার স্থলে যিনি বসিবেন তিনি কতদূর সফল হইবেন আমরা জানি না। তবে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ, বুদ্ধির অভাবে অথবা নীতিজ্ঞানহীনতাবশতঃ কম্যুনিষ্টদের সহিত পুলিসের উচ্চ অধিকারীদিগের মধ্যে কাহারও কোন সংযোগ যদি থাকে তবে তাহা রাষ্ট্রের পক্ষে পরম অনিষ্টের কারণ হইবে।

চতুর্থ প্রশ্ন বিচারে ভুল আছে কিনা। বাংলা সরকারের উচিত এ বিষয়েও উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণে ইহার নিষ্পত্তি করাইয়া লওয়া। জনসাধারণকে বুঝিবার অবসর দেওয়ার প্রয়োজন যে, সত্য সত্যই নিরাপরাধদের উপর অত্যাচার হইয়াছিল বা আইনের কূটচক্রে দোষী নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইল।

আসামের বিপদ

আসামের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের কাছে নাকি চীনা সৈন্যবাহিনীর আবির্ভাব হইয়াছে। দৈনিক পত্রে প্রকাশিত এই সংবাদে আমরা তত ভীত নহি যত ভীত আসামের অন্তর্বিরোধে। কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্ট ও রাজ্যের গবর্ন্মেণ্ট বাঙালী-অসমিয়ার বিবাদ মিটাইতে সক্ষম হন নাই। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে তদানীন্তন প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীদেবেশ্বর শর্ম্মা এক বক্তৃতায় বলেন :

"কতকটা অর্থনৈতিক চাপ হ্রাস করার জন্য পূর্ব্ব পাকিস্থান আসামে সুপরিকল্পিত ভাবে লোক পাঠাইতেছে। ফলে বদরপুর, গোলকগঞ্জ ও সীমান্তের অন্যান্য প্রবেশপথ দিয়া প্রত্যহ পরম উৎসাহী পাকিস্থানী মুসলমান ভয়াবহ সংখ্যায় আসামে আসিয়া ঢুকিতেছে। আমাদের গবর্ন্মেণ্ট শুধু কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের মুখের দিকে চাহিয়া থাকা ছাড়া এই বিপদ প্রতিরোধ করার কোনই চেষ্টা করিতেছেন না। আসামের বর্ত্তমান জটিল ও সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা এই : প্রত্যহ বহুসংখ্যক পাকিস্থানী বদ মতলব লইয়া আসামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে; এই অভিযান রোধ করিতে এখন পর্য্যন্ত কিছুই করা হয় নাই; কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্ট, কি কারণে জানি না, এ বিষয়ে উদাসীন

এবং আমাদের প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট অসহায়ভাবে শুধু তাকাইয়া আছেন।"

তাহার ৬ মাস পরে শ্রীকামিনীকুমার সেন, শ্রীসতীন্দ্র-মোহন দেব, শ্রীবিদ্যাপতি সিংহ, অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র লস্কর ও শ্রীরমেশচন্দ্র দাস, কাছাড় জেলার এই পাঁচ জন কংগ্রেসী এম-এল-এ, যুক্ত স্বাক্ষরিত এক পত্রে প্রধানমন্ত্রী গোপীনাথ বড়দলৈকে লিখেন: "আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের নির্ব্বাচন কেন্দ্রের সংস্পর্শে রহিয়াছি। আমাদের সুনিশ্চিত অভিমত এই যে ভূতপূর্ব্ব মুসলীম লীগওয়ালাদের নেতৃত্বে বহুসংখ্যক রাষ্ট্রবিরোধী লোক গুরুতর গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে এবং কতকগুলি কমিউনিষ্টও তাহাদের সহিত হাত মিলাইয়াছে। আসাম বর্ত্তমানে অত্যন্ত বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। এই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য অবিলম্বে সাহসের সহিত যথাবিহিত ব্যবস্থা করা অতীব প্রয়োজন।"

এই চিঠিতে তাঁহারা আসাম মন্ত্রিসভার মুসলমান মন্ত্রী কাছাড়ের জনাব আবদুল মতলিব মজুমদার সম্পর্কে বলেন: "কাছাড়ে আসিলে মজুমদার সাহেব কোন কংগ্রেস এম-এল-এ কিংবা কংগ্রেস অফিসের খবর করেন না। এমন কি জাশন্যালিষ্ট মুসলমানেরাও তাঁহার সফরের খবর জানিতে পায় না। তিনি তাঁহার চেলা ইব্রাহিম ও আবদুল লতিফকে পরামর্শ দিবার জন্যই কাছাড়ে আসেন। এই ইব্রাহিম এক মুসলমান জনতা লইয়া করিমগঞ্জ রেল ষ্টেশন ও মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে আক্রমণ করিয়াছিল। এখন সিলেটে (পাকিস্থান) পলাইয়া গিয়া সেখান হইতে তাহার এজেন্টদের মারফত রাষ্ট্র-বিরোধী কাজ চালাইতেছে। আবদুর লতিফ ও তাহার কয়েকজন অনুচরকে চোরাই অস্ত্রশস্ত্র আমদানির ও আরও কতকগুলি গুরুতর অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছিল। মজুমদার সাহেব স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিত আদেশ দিয়া পুলিশের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইহাদের খালাস করিয়াছেন। আসামের অন্য কোন মন্ত্রী, এমন কি বিরোধীদলের কোন এম-এল-এ পর্য্যন্ত পাকিস্থানের ভিতর দিয়া যাতায়াত করেন না। শুধু মতলিব সাহেবের পক্ষে পাকিস্থান অত্যন্ত নিরাপদ হইয়াছে, তিনি অবাধে উহার ভিতর দিয়া ভ্রমণ করেন।"

১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসেও এই রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্য-কলাপ যে থামিয়াছে তার প্রমাণ পাই না। তার উপর চীনা সৈন্যবাহিনীর আবির্ভাব পাকিস্থান 'পঞ্চমবাহিনী'কে উৎসাহ দিবে। ভবিষ্যতে যে তারাও নিরাপদে থাকিবে তার ভরসা কম। কিন্তু "আপনার নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ" করিবার লোক পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও অপ্রতুল হয় নাই।

"রাজার পাপে প্রজার কষ্ট"

উক্ত সংস্কারের অনুপ্রেরণায় পুরুলিয়ার "মুক্তি" পত্রিকা সম্প্রতি একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। একটি বালকের অকাল মৃত্যুর জন্য তাহার পিতা শ্রীরামচন্দ্রকে দোষ দিয়াছিলেন, কৃত্তিবাসের রামায়ণে বর্ণিত এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধটি লেখা। কংগ্রেসের মধ্যে যে দুর্নীতি দেখা দিয়াছে তাহার ফলে দেশের লোক কষ্ট পাইতেছে—এই সত্য প্রতিষ্ঠায় জন্য বেশী দূর যাইতে হয় না। আমাদের সহযোগী বিহারের এক জন মন্ত্রীর উক্তি চূড়ান্ত বলিয়া মনে করেন; প্রজাপুঞ্জের মনোভাব এই উক্তির মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধের এই অংশ উদ্ধৃত করিলাম:

"সম্প্রতি পাটনার ইংরেজী দৈনিক 'ইণ্ডিয়ান নেশনের' ৪ঠা নবেম্বর তারিখে প্রকাশিত বিহারের সেচমন্ত্রী শ্রীযুক্ত রামচরিত্র সিংহের এক বক্তৃতার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। মুঙ্গের জিলার বেগুসরাই সাবডিবিজনে তেঘরা থানার রাজ-ওয়ারা গ্রামে কংগ্রেস-কর্ম্মীদের এক সম্মেলনে বিহারের কংগ্রেস-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রামচরিত্র সিং বলেন, 'বিহারের উচ্চ-পদস্থ নেতৃবৃন্দ যেভাবে প্রাদেশিক রাজনীতি ক্ষেত্রে উলঙ্গ ফ্যাসিবাদের খেলা খেলিতেছেন তাহাতে আর চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।' তিনি সাম্প্রতিক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নির্ব্বাচনের উল্লেখ করিয়া ইহাকে নিয়ম-তান্ত্রিক ভণ্ডামী বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'সুধাংশুজী (যিনি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন) কেবলমাত্র প্রভাবশালী মন্ত্রীদের একটি হাতের পুতুল মাত্র এবং তিনি এই উচ্চপদের সম্পূর্ণ অযোগ্য। তিনি জনসাধারণকে পরিস্থিতি উপলব্ধি করিয়া প্রদেশের বর্ত্তমান ফ্যাসিষ্ট শাসকদের উচ্ছেদ করিতে বলেন। * * *' তিনি বলেন, 'আমাদের নেতৃবৃন্দের পাপে জনসাধারণ তাহাদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। নেতৃবৃন্দের দিন শীঘ্রই শেষ হইয়া আসিতেছে।'"

বাঁকুড়া জেলায় চলাচল অব্যবস্থা

বাঁকুড়া শহরে 'নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক প্রচার" বাঁকুড়া রেল-ষ্টেশনের অবস্থার প্রসঙ্গ লইয়া গত ২০শে কার্ত্তিক সংখ্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন:

"আমাদের ইহা দৃঢ় ধারণা যে, আদ্রা-হাওড়া সেক্সনের মধ্যে বাঁকুড়া ষ্টেশন হইতে রেল কোম্পানীর যে আয় হয় সেরূপ আর এই সেক্সনের মধ্যে অন্য কোন ষ্টেশনেই হয় না। কোম্পানীর হিসাবাদি দেখিবার সুযোগ আমাদের না থাকিলেও আমরা ইহা অনুমানের ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারি যে, প্রতি মাসে বাঁকুড়া ষ্টেশন হইতে সর্ব্বরকমে রেল কোম্পানীর প্রায় ছয় লক্ষ টাকা আয় হইয়া থাকে। মাসিক এইরূপ আয় হওয়া কথার কথা নহে। অথচ ষ্টেশনের অবস্থা যাহা তাহা মেদিনীপুর পুরুলিয়া হইতে শত গুণে

নিকৃষ্ট। ষ্টেশনে উচ্চ 'প্ল্যাটফরম' না থাকার জন্ত মহিলা, রুগ্ন, বৃদ্ধ ও শিশুদিগকে লইয়া যাত্রীদিগকে যে কি হয়রানিই হইতে হয় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বিশ্রামাগারটির যখন সংস্কার করা হইল এবং অপর একটি নূতন ছাউনী (শেড) তৈয়ারী করা হইল তখন আশা হইয়াছিল যে এই সঙ্গে ষ্টেশনের প্ল্যাটফরম উচ্চ করা হইবে। কর্তৃপক্ষের এই অসুবিধার প্রতি নজর পড়ে নাই কেন?"

কিন্তু ইহাই শেষ অভিযোগ নয়। জেলার চলাচল ব্যবস্থার উন্নতির পরিকল্পনা যেভাবে ব্যাহত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের সহযোগী যে অভিযোগ করিতেছেন, তাহার জন্ত কেবল জেলার শাসকবর্গ নয়, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা বা তাঁহাদের পরামর্শদাতাগণও দায়ী বলিয়া মনে হয়।

"বাঁকুড়া শহরের সন্নিকটে পাতাকোলার ঘাটে দারকেশ্বর নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণের জন্ত আনুমানিক লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে যে সব মাল-মসলা লোহা-লক্কড় আমদানী করা হইয়াছিল, শুনা যাইতেছে সে সব অন্যত্র সরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে—পাতাকোলার ব্রিজ নির্ম্মিত হইবে না। কেন হইবে না, তাহার কোন কৈফিয়ৎ কাহারও নিকট পাওয়া যাইতেছে না। আমরা বহুবার জেলার অহিতকর এই কর্ম্মের তীব্র সমালোচনা করিয়াছি, এই ব্রিজটির আবশ্যকতা সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মনোভাবের পরিবর্ত্তনসাধন করিতে সক্ষম হই নাই—আমাদের আবেদন-নিবেদন কর্তৃপক্ষের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশই করিতে পারে নাই, এরূপ আশঙ্কা অনায়াসে করা যাইতে পারে।"

দামোদর পরিকল্পনা

এই পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করিয়া অনেক আশা লোকের মনে জমাট বাঁধিয়াছে। তাহা কি ব্যর্থ হইবে? বর্দ্ধমানের "দামোদর" পত্রিকার ১৫ই সংখ্যায় যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে আর কোন ভরসা করা চলে না:

"গত ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে ভারত-সংসদের অধিবেশনে শ্রীবসন্তকুমার দাসের প্রশ্নের উত্তরে পূর্ত্তসচিব শ্রীএন. ভি. গ্যাডগিল বলিয়াছিলেন, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উৎপাদনকেই সেচব্যবস্থা ও বন্যা-প্রতিরোধক ব্যবস্থার পূর্ব্বে স্থান দেওয়া হইবে। ১৯৫০ সালের ২৪শে জুলাই অল-ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ কাটজু অভিভাষণে দামোদর পরিকল্পনার বন্যা-প্রতিরোধ ব্যবস্থা গৃহীত হইবে না বলিয়া প্রকাশ পায়। এই পরিকল্পনায় ইতিমধ্যেই নয় কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং বর্ত্তমান বৎসরেও নয় কোটি টাকা ব্যয় হইবার কথা। একমাত্র বোকারো বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র ও তাহাকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্ত দুইটি জলাধার নির্ম্মাণ করিতেই ইহা অপেক্ষাও বহু অর্থ ব্যয়িত হইবে।"

এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের আগ্রহ ও স্বার্থ বেশী। দামোদর নদকে সংযত করিতে পারিলে, তাহার জলপ্রবাহকে সুনিয়ন্ত্রিত খাল ও বাঁধ দ্বারা পরিচালিত করিতে পারিলে পশ্চিমবঙ্গের অতীত সম্পদ শস্য উৎপাদনের গৌরব ফিরিয়া আসিত। সার উইলিয়ম উইলকক্‌স গঙ্গা-নদীর স্রোত-জলের সদ্ব্যবহারের কথা বলিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগে সেই সংগঠনকর্ত্তার অভাব হইবে কেন বুঝি না। ভারতীয় বুদ্ধি ও কৌশলের বড়াই কি কবিকল্পনা মাত্র!

বীরভূম ও ময়ূরাক্ষী

ময়ূরাক্ষী নদীর বিরাট জল-সরবরাহের ব্যবস্থায় বীরভূম জেলার কোন কোন অঞ্চল উপকৃত হইবে না। রাজনগর, খয়রাসোল, দুবরাজপুর থানা এই বঞ্চিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। জমি তাদের উঁচুনীচু; সেইজন্ত সাধারণ জলসেচন রীতি তৎসম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। শিউড়ী (বীরভূম) হইতে প্রকাশিত 'শিক্ষা ও কৃষি' পত্রিকার ৫ই অগ্রহায়ণ তারিখের সংখ্যায় জনাব মাঃ হুশেন খাঁ, প্রধান শিক্ষক বড়বন বোর্ড বিদ্যালয়, এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং এই প্রাকৃতিক অসুবিধা দূর করিবার জন্ত যাহা প্রয়োজন তাহার নির্দ্দেশও দিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম, কেননা ইহা অন্ত কয়েকটি জেলাতেও প্রযোজ্য:

"জাতীয় সরকার এই অঞ্চলবাসী চাষীদের জমি সেচনের জন্ত ঐ অঞ্চলের মজা পুকুরগুলোর সংস্কার সাধনে যত্নবান হয়েছেন—এ অবশ্যই আশ্বাসের কথা। কিন্তু শুধু মজা পুকুর সংস্কার সাধনেই এ অঞ্চলের সেচনকষ্ট ঘুচবে না। এদের সেচনকষ্ট দূর করে অধিক ফসল-ফলান অভিযান সার্থক করতে হলে আর এক দিকে সরকারকে এগোতে হবে। সেটা হচ্ছে—ঐ অঞ্চল দিয়ে যে সকল ছোট ছোট ঝরণা, জলপ্রবাহ বর্ষাকালে প্রচুর জল বয়ে নিয়ে বড় নদীগুলোকে স্ফীত করছে সেই জলপ্রবাহগুলোর মাঝে মাঝে লোহার কপাট বসানো, পাকা সাঁকো তৈরি করে যথাসময়ে জল আটকাতে পারলে তার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী জমির অনেক পরিমাণে সমৃদ্ধি সাধিত হয়। জমির উর্ব্বরতা শক্তিও ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় অথচ সময়মত জল আটকিয়ে উভয় পার্শ্বস্থ জমি ভাল ভাবেই সেচন করা সম্ভব হয়। ফলে অধিক ফসল ফলান অভিযান এ অঞ্চলবাসীর পক্ষে সার্থকতা লাভ করে। এইরূপ ভাবে জল আটকিয়ে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা থাকলে ধানচাষের পর যেসো জমিতেই অন্যান্য রবিশস্য যথা—খেসারী, বুট, গম, যব, রাই-সরিষা, মটর ইত্যাদি ফলানও অধিকাংশে সম্ভব হয়ে ওঠে, উপরন্তু মাছের প্রাচুর্য্যও ঘটে।"

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলন

ইংরেজ রাজশক্তি প্রত্যাহৃত হইবার পর হইতে প্রায় প্রতি দিন "মালটি-পারপাস সোসাইটি" প্রভৃতি গালভরা নামের সমিতির উদ্ভব হইতেছে। সমাজের নানা প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্য লইয়া সমিতির সংগঠনকারিগণ অগ্রসর হইতেছেন। অধিকাংশ সমিতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বেচাকেনা করিয়া থাকেন। উৎপাদন কেহ বাড়াইয়াছেন বলিয়া সংবাদ খুব কমই পাওয়া যায়। সমবায় বা সমবেত শক্তির প্রয়োগে কত বড় কাজ করা যায় তার কল্পনা করা সহজ, কিন্তু তাহাতে রূপদান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা কঠিন।

"এত ভঙ্গ" পশ্চিমবঙ্গে সমবায় সমিতির সংখ্যা ও সামর্থ্য কম নয়। একটি হিসাবে দেখিয়াছি যে ১৯৪৮-৪৯ সালের শেষে ৬৮টি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে ১৩৬ লক্ষ টাকা মূলধন আছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এই মূলধন ১৮৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সদস্য সংখ্যা তের হাজার হইতে চৌদ্দ হাজার হইয়াছে। অন্তদিকেও সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৩,৩৩,০০০ ও মূলধন ১৪৪ লক্ষ টাকা হইয়াছে। কৃষি সমবায় সমিতি ব্যতীত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৪,১০,০০০ ও মূলধন ৯৩৫ লক্ষ টাকা হইয়াছে।

তিন কোটি নরনারীর শ্রমশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি যথোপযোগী ব্যবহৃত হইলে পশ্চিমবঙ্গে ভাত-কাপড়ের দুঃখ থাকিত না; ৫০ লক্ষ নরনারী পূর্ব্ববঙ্গ হইতে গত তিন বৎসরে এই রাজ্যে আসিয়াছেন। তাঁহাদের একাংশও ক্রিয়াশীল হইলে দেশের চেহারা ফিরিয়া যাইত। উদ্যোগী নেতা নাই বলিয়াই নিরাশার কথা শুনা যায়। সমবায় মন্ত্রী ডাঃ আহমেদ পূর্ব্ববঙ্গের লোক; জাতীয়তার প্রতি তাঁহার অকুণ্ঠ বিশ্বাস সুবিদিত। তিনি আজ প্রায় ৫ মাস হইল এই পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার অনুপ্রেরণায় কি করা সম্ভব হইয়াছে তাহা জানিলে সুখী হইব। অন্যান্য দপ্তরের মত তাঁহার দপ্তরও গতানুগতিকের উপাসক। সেই কথা বুঝিয়াই তাঁহাকে চলিতে হইতেছে, তাহাও আমরা বুঝি। তবুও আশা করিয়া আছি।

"আত্রেয়ী"

এই পত্রিকাখানির প্রথম সংখ্যা পাইয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। দিনাজপুর জেলার এক-তৃতীয়াংশ আয়তন লইয়া ভারতরাষ্ট্রের এই জনপদটি গঠিত হইয়াছে। জেলার নূতন নাম পশ্চিম দিনাজপুর, বালুরঘাট তাহার কেন্দ্র। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের কল্যাণে তাহার এইরূপ সঙ্কুচিত মূর্ত্তি দেখা দিয়াছে; সমগ্র ঠাকুরগাঁ মহকুমা, খানইরহাট, পত্নীতলা, দিনাজপুর সদর প্রভৃতি আরও কয়েকটি থানায় হিন্দুর সংখ্যা বেশী হওয়া সত্ত্বেও ঐ জনপদগুলি পাকিস্থানের কুক্ষিগত হইল! এই সীমানার ঠেলাঠেলি হয়ত একদিন থামিবে, না হইলে ভারত-পাকিস্থানের দুর্গতির সীমা-পরিসীমা থাকিবে না। ভাগ-বাঁটোয়ারায় যে সমস্তাসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার আলোচনা আমরা "আত্রেয়ী"র পৃষ্ঠায় দেখিব, এই ভরসা রাখি। সরকারী কাগজপত্রে আমরা সারা বাংলার অনেক বিবরণ দেখিতে পাই। কিন্তু তাহা কেতাদুরস্ত, প্রাণহীন। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জীবনের সম্যক্ পরিচয় লাভই কাম্য। সেই পরিচয় আত্রেয়ীর প্রথম প্রবন্ধে কিছু কিছু আছে:

"শোনা যায় ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে হিমালয়-সানুদেশ প্রবল বন্যায় স্ফীত হইয়া উঠে; তিস্তা এই উচ্ছ্বাসময়ী দুর্ব্বার বন্যার বিপুল জলরাশি বহন করিতে অসমর্থ হইয়া পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে একটি নামহারা মৃত নদীখাত প্লাবিত করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদে তাহার বিপুল জলসম্ভারের অর্ঘ্য রচনা করে। সেদিন হইতে তিস্তা আর তাহার পুনর্ভবা, আত্রেয়ী, করতোয়ার ত্রিস্রোতে হিমালয়ের স্নিগ্ধ বারি সিঞ্চন করে না। সেদিন হইতে আত্রেয়ী ক্ষীণা হইতে ক্ষীণতরা হইতেছে।...

প্লাবনের দুর্ব্বার জলধারায় বাহিত পলিমৃত্তিকায় আত্রেয়ী বালুরঘাট তথা পশ্চিম দিনাজপুরের বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড উর্ব্বর করিয়া তুলিয়াছে। আমাদিগকে দান করিয়াছে খাদ্য-প্রাণ—অফুরন্ত শক্তির সঞ্চারময় প্রেরণা!

বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানী দৃষ্টি দিনাজপুরবাসীর পূর্ব্ব গৌরব ফিরাইয়া আনুক।"

বর্দ্ধমানের পূর্ত্ত বিদ্যালয়

বর্দ্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ কারিগরি বিদ্যালয়টি পূর্ত্ত-বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হইয়াছে। ইহা যাহাতে কলেজে রূপান্তরিত হয়, তাহার জন্য নাগরিকবর্গ, জেলাবাসী সকলে ব্যগ্র। 'দামোদর' পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদটি এই মনোভাবের পরিচায়ক:

"ইহা যাহাতে ভবিষ্যতে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে উন্নীত হয় তাহার জন্য বিস্তৃত ভূমি ক্রয় করিয়া অর্দ্ধেক মূল্য ১০,০০০৲ টাকা বর্দ্ধমানের নূতনগঞ্জ, আলমগঞ্জ, বাজেপ্রতাপপুর ও সদরঘাট প্রভৃতির ব্যবসায়ীগণ দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

বর্ত্তমান ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলটি বর্দ্ধমান মহারাজের সাধনপুর কুঠিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহারাজা-প্রদত্ত ২০ বিঘা জমির উপর যে ইমারত আছে, তাহার মূল্য ২৷০ লক্ষ টাকা। সরকার উহা মেরামতের জন্য ৫৭ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। নূতন ইমারত ও কারখানা স্থানান্তরিতের জন্য সরকার হইতে ১ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলের নিজস্ব বৈদ্যুতিক যন্ত্র ও আলো, পাখা বাবদ যথাক্রমে ২৭ হাজার ও ১৬ হাজার টাকা সরকার দিবেন। নানাবিধ হস্ত-শিল্পের জন্য ভারত-সরকারও ৭৩,০০০৲ টাকা দিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য আরো ২০ বিঘা জমি দখলের জন্য

২০,০০০৲ টাকার অর্দ্ধেক ১০,০০০৲ টাকা স্থানীয় সাহায্য দিলে, সরকার অবশিষ্ট ১০,০০০৲ টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।"

প্রাথমিক শিক্ষার ভ্রাম্যমাণ শিক্ষণকেন্দ্র

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগ শিক্ষাবিস্তারকল্পে একটি নূতন ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে কি ভাবে বিনা পুস্তকের সাহায্যে কার্য্যের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা সম্ভব তাহা সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে শিখাইবার বা দেখাইবার জন্য নবেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সালের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত কয়েকদল ভ্রাম্যমাণ বুনিয়াদী শিক্ষকদল (Training Squad) প্রতি জেলায় পরিভ্রমণ করিবেন। প্রত্যেক কেন্দ্রে তাঁহারা ছয় দিন ধরিয়া থাকিয়া এই শিক্ষাদান করিবেন—এবং সেই কেন্দ্রে যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক অনায়াসে আসিয়া শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারেন তাঁহাদিগকে যোগদান করিতে হইবে। প্রত্যেক শিক্ষণদলে এই বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত তিন জন করিয়া প্রাথমিক শিক্ষক থাকিবেন। কবে কোথায় বা কোন্ কেন্দ্রে এই শিক্ষণ-শিবির বসিবে এবং কোন্ কোন্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে তথায় যোগদান করিতে হইবে সে সম্বন্ধে স্কুলবোর্ডগুলি সিদ্ধান্ত করিবেন বা শিক্ষকদিগকে জানাইবেন ইহাই আশা করা যায়।

যাহাতে এই সকল ভ্রাম্যমাণ শিক্ষণকেন্দ্রে সকল প্রাথমিক শিক্ষক যোগদান করেন তজ্জন্য ব্যবস্থা করা উচিত।

বিদেশীর চক্ষে বুনিয়াদী শিক্ষা

গত ১৮ই অগ্রহায়ণে প্রকাশিত হরিজন পত্রিকায় নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে :

উনেস্কো (সর্ব্বজাতিক শিক্ষা-বিজ্ঞান-কৃষ্টি সংস্থা) কর্ত্তৃক প্রেরিত মনস্তত্ত্ববিদ্ ডক্টর মারফী ও মিসেস মারফী বর্ত্তমানে ভারত গবর্মেণ্টের পক্ষে সাম্প্রদায়িক রেষারেষির মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। ১লা ও ২রা নবেম্বর তাঁহারা সেবাগ্রামে আসেন। পোষ্টগ্রাজুয়েট শিক্ষক-শিক্ষণের ছাত্রদের সমক্ষে ডক্টর মারফী আলোচনা আরম্ভ করেন। মিসেস মারফী বুনিয়াদী ও উত্তর-বুনিয়াদী ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদিগের প্রতি ভাষণ দেন। তিনি বলেন :

"পল্লী ভারতের জন্য বুনিয়াদী শিক্ষার কার্য্যকারিতা প্রমাণ করিবার এখন আর প্রয়োজন নাই। পল্লীবাসীদের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনের পথে এই শিক্ষার যোগ্যতাও আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এই শিক্ষার যতটুকু সাধন করা গিয়াছে তাহাই জগতের সর্ব্বত্র শিক্ষাবিদ্‌গণের পক্ষে উৎসাহ ও প্রেরণার বিষয়।

"যে সৃজনী প্রতিভার দ্বারা এতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইয়াছে তাহা বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অবিচ্ছিন্ন ধারায় বাহিত হইয়া সহরে শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হউক। এখানে যেমন সাহসের সহিত নূতন চিন্তা ও বিপ্লবাত্মক পরীক্ষা করিয়া চলা হইয়াছে, সহরে শিক্ষায় ও উচ্চ শিক্ষায় তাহাই করা প্রয়োজন। এইরূপ করিলে তবে একঘেয়ে ধারাবাহিক প্রচলিত শিক্ষার ধারাকে বদলানো যাইবে। জগতে সর্ব্বত্র শিক্ষার জড়তা মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। উহার পরিপূরক এমন শিক্ষা চাই যাহাতে তরুণ মনের স্বাভাবিক সৃজনী শক্তি স্ফুরিত হইতে পারে।"

ইংরেজ-রাজ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল; তৎপরিবর্ত্তে কয়েকটি নূতন ঐতিহ্য স্থাপন করিয়া দিয়া গিয়াছে। তার মধ্যে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সাধন করিতে না পারিলে আমাদের স্বাধীনতা সার্থকতা লাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু ইংরেজকৃত অভ্যাস আমাদের মনকে এম্নি অনড় করিয়া ফেলিয়াছে যে বুনিয়াদী শিক্ষা বিষয়ে পরীক্ষা করিবার ধৈর্য্য অনেকের মনে নাই। গান্ধীজী এক নূতন আদর্শের আশায় ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন অভ্যাসের সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন। সেই পরীক্ষায় ভীত হইবার কি আছে? বিদেশীয়েরাও এই সহজ কথাটা বুঝে। আমরা পারি না কেন?

ভাষার বিরোধ

বাংলা "হরিজন" পত্রিকার একটি সংখ্যায় শ্রীকিশোরলাল মশরুওয়ালার একটি প্রবন্ধ অনূদিত হইয়াছে। তিনি মুখবন্ধে বলিতেছেন : "গুজরাটে থানা জেলার চিনচনি গ্রামের লোকেরা থানা জেলা বোর্ডের এক আদেশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছে, কারণ ঐ আদেশে উক্ত থানা এলাকার প্রাথমিক পাঠশালাগুলিতে আবশ্যিকভাবে মারাঠী ভাষা শিক্ষা দিবার কথা বলা হইয়াছে।" এই বিক্ষোভের সংবাদ পাঠ করিয়া মনে হয় যে, এই জেলা দ্বি-ভাষাভাষী। এরূপ অঞ্চলের সমস্যা মিটাইবার জন্য তিনি কয়েকটি সর্ত্ত দিয়াছেন : (১) এইরূপ অঞ্চলের লোকেদের মাতৃভাষার মাধ্যমে সমগ্র শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে (ছাত্রসংখ্যা সম্পর্কীয় সর্ত্তটি স্বীকার করিয়া) এবং (২) তাহাদিগকে স্থানীয় অপর ভাষাও শিক্ষা করিতে হইবে। বোম্বাইয়ের মত বহু ভাষাভাষী শহরে যাহাদের মাতৃভাষা গুজরাটি বা মারাঠীর কোনটিই নয় তাহাদিগের এই সর্ত্ত অনুযায়ী ঐ উভয় ভাষার একটি শিখিলেই চলিবে। তাহা ছাড়া রাষ্ট্রের সাধারণ ভাষা হিসাবে হিন্দী শিক্ষা করিতে হইবে। অর্থাৎ পঞ্চম মানের উপরের শ্রেণীর শিক্ষার্থীর তিনটি ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে।

বাস্তবের ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব কিনা তৎসম্বন্ধে কিশোর-

লালজীর মন্তব্য লক্ষণীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বিহারের মানভূম জেলার কথা বলিয়াছেন। যে কোন রাজ্যের যে কোন দ্বি-ভাষাভাষী অঞ্চল সম্বন্ধে তাহা প্রযোজ্য। "বিহার প্রদেশ যদি মানভূম অঞ্চলকে দ্বি-ভাষাভাষী বলিয়া স্বীকার করে এবং সেখানে প্রত্যেকেরই যদি বাংলা ও হিন্দী উভয় ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যিক হয় এবং সরকারী দপ্তরসমূহে উভয় ভাষাতেই কর্ম্মনির্ব্বাহ হয়, তবে ঐ অঞ্চলে বাঙালী ও বিহারীর মধ্যে যে তিক্ত মনোভাব রহিয়াছে তাহা থাকে না, লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু তাহা হইবে না ; বিহারীরা বাঙালীর উপর জবরদস্তি করিবে এবং কলিকাতার বাঙালীরা তাহার শোধ লইবে। তারপর ইহার ফলে যখন ক্ষতি সাধিত হইবে তখন তাহা সামলাইয়া লইতে সদিচ্ছা-মিশন প্রেরিত হইবে। আমরা এই সকল অন্যায়কে কি আরম্ভেই বন্ধ করিয়া দিতে পারি না ?"

পারি হয়ত, কিন্তু সেইরূপ সহিষ্ণুতার পরিচয় এখনও আমরা দিতে পারিতেছি না। কেন্দ্রীয় পরিষদে একজন হিন্দী ভাষাভাষী সভ্য একজন তামিল ভাষাভাষী সভ্যকে বলিলেন : "আপনারা শীঘ্র রাষ্ট্রের ভাষা শিক্ষা করিয়া ফেলুন।" এদিকে আবার মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, হিন্দী ভাষাভাষী নাগরিকের পক্ষে তামিল ভাষা অবশ্য শিক্ষণীয় করা উচিত। ইহার প্রত্যুত্তরে শ্রীমহাবীর ত্যাগী কি বলিবেন তাহা কল্পনা করা কঠিন নয়।

পৌষ মাসের প্রথম সপ্তাহে দিল্লীতে হিন্দী ও অন্যান্য ভাষাভাষী সাহিত্যিকবৃন্দের সমাবেশ হইবে। সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন ভাষার উন্নতি এবং বিভিন্ন ভাষার প্রচারের উপায় নির্দ্ধারিত করা হইবে এবং সকল ভারতীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যের মধ্যে একটা সংহতি রক্ষার চেষ্টা করা হইবে। এই সংবাদের উপর মন্তব্য করিতে গিয়া "পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস-কর্ম্মিগণের পত্রিকা"—"জনসেবক" বলিতেছেন : "ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রত্যেক প্রদেশে হিন্দীর যথেষ্ট প্রচলন এবং হিন্দীভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা যেমন বাঞ্ছনীয়, তেমনই প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষারও চর্চ্চা এবং প্রচার প্রচেষ্টার পূর্ণ সুযোগ এবং সুবিধা থাকাও দরকার। হিন্দী ব্যতীত ভারতের অন্যান্য ভাষার উন্নতির সুযোগ যদি না থাকে তা হলে সেই সকল প্রদেশবাসীর মধ্যে হিন্দী-বিরাগ দেখা দিতে পারে। বিশেষতঃ বাংলাদেশ সম্বন্ধে একথা বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। একটি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ভাষারূপে বাংলা-ভাষা আজ সু-উচ্চ মর্য্যাদার অধিকারী। ইহার প্রসারের পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকই কার্য্যকরী হইবে না। তাহা ব্যতীত এই সম্মেলনে আলোচ্য সূচী অনুযায়ী বিভিন্ন ভাষায় রচিত সাহিত্যের মধ্যে পারস্পরিক সংহতি রক্ষা করিবার যে পরিকল্পনার কথা বলা হইয়াছে, তাহার ফলে অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল এবং উন্নত প্রাদেশিক ভাষাগুলির প্রভাবে এবং অনুপ্রেরণায় অপেক্ষাকৃত কম অগ্রসর প্রাদেশিক ভাষাগুলির উন্নতি-প্রচেষ্টাও সার্থক হইবে।"

এই মন্তব্যের মধ্যে দুইটি মনোভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম আশঙ্কা একটি যে, হিন্দীর প্রসারে বাংলা ভাষার বিপদ দেখা দিতে পারে ; দ্বিতীয়, আশা যে, বাংলা ভাষার "সু-উচ্চ মর্য্যাদার" যথাযোগ্য সম্মান অদূর ভবিষ্যতে দিতে হইবে। এই আশা ও আশঙ্কা সংযত হইত যদি হিন্দীভাষাভাষী অঞ্চলের নাগরিককে—সরকারী চাকুরীপ্রার্থী নাগরিককে—হিন্দী ছাড়া ভারতবর্ষের চৌদ্দটি শ্রেষ্ঠ ভাষার মধ্যে আইনের বলে অন্ততঃ একটি অবশ্য শিক্ষণীয় করা হইত। কেবলমাত্র একটি ভাষা শিখিয়া হিন্দী-ভাষাভাষী অঞ্চলের লোক রাষ্ট্রের অনেক সুবিধা ভোগ করিবে আর অন্যদের দুইটি শিখিতে হইবে—এই ব্যবস্থা দৃষ্টিকটু ও একটি ভাষার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক। ভাষার বিরোধের বিপদ এখানে। সময় থাকিতে সাবধান হইলে সেই বিপদের মেঘ কাটিয়া যাইবে। নতুবা, তামিল ভাষাভাষী লোকের মনে যে বিক্ষোভ জমা হইতেছে তাহা ভারতাকাশে বিস্তৃত হইবে।

বাংলা না আরবী হরফ ?

পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের কোন রাষ্ট্রীয় অধিকার এখন পর্য্যন্ত স্বীকৃত হয় নাই। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, রাষ্ট্রের বর্ত্তমান অধিকারীবর্গ সহজে তাহা স্বীকার করিবেন না। পৃথিবীর ইতিহাসে যে শক্তির ব্যবহার করিয়া রাষ্ট্রে নিজ নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, পূর্ব্ববঙ্গেও তাহা হইবে। সেদিন কত দূরে জানি না। আমরা দেখিতেছি পূর্ব্ববঙ্গে কেবল ভাষা লইয়া নয়, হরফ লইয়াও বিরোধ চলিতেছে। ঢাকার "সোনার বাংলা" পত্রিকার ২রা অগ্রহায়ণ সংখ্যায় পূর্ব্ববঙ্গের হরফ-যুদ্ধের বিবরণ পাইতেছি। নিম্নোক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রত্যেক বাঙালীর জানিয়া রাখা ভাল :

"আরবী হরফে বাংলা ভাষা শিক্ষা করা সম্ভব কিনা তাহা লইয়া ইতিপূর্ব্বেও বহু আলোচনা হইয়াছে। আরবী হরফে বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের বাসনা পাকিস্থান শিক্ষামন্ত্রীর যতই থাকুক, ইহা সম্ভব কিনা, যুক্তিযুক্ত কি না, বাংলা-ভাষাভাষী পূর্ব্ববঙ্গের চারি কোটির অধিক নরনারীর স্বার্থের অনুপন্থী কিনা, তাহাই সর্ব্বাগ্রে ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। এই বিষয়ে শিক্ষাব্রতী, ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তির মতামতেরই মূল্য দিতে হয়। এই বিষয়ে ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র মত যোগ্য ব্যক্তির অভিমত অবশ্যই সর্ব্বত্র মর্য্যাদা লাভ করিবে। তিনি হবিগঞ্জে এক জনসভায় স্পষ্ট বলিয়াছেন, আরবী হরফে বাংলা ভাষা লেখা সম্ভবই নহে। উহার প্রচলনের দ্বারা পূর্ব্ববঙ্গের জনসাধারণের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইবে। বাংলা ভাষার যে সংস্কার হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে টাইপ-রাইটিং ও লাইনোটাইপ লেখন বাংলা ভাষায় সহজসাধ্য হইবে।"

ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক

গত ১০ই ডিসেম্বর আচার্য্য যদুনাথ সরকার একাশী বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে বঙ্গীয় ইতিহাস-পরিষদ ও এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশের এই দুইটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান দেশের বিদ্বৎসমাজের পক্ষ হইতে আচার্য্য-দেবকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া উদ্যোক্তাগণ নিজেদের কর্ত্তব্যপথে অবিচলিত থাকিবার ব্রতে নূতন করিয়া সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য যদুনাথ নিন্দা ও প্রশংসার উর্দ্ধলোকে বিরাজ করিতেছেন। সেই মনোভাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি তাঁহার অভিভাষণ শেষ করিয়াছেন; তাঁহার "শেষ বাণী" দেশের লোকের জন্য রাখিয়া যাইতেছেন, তাহা এই সংখ্যায় অন্যত্র মুদ্রিত হইল।

"১৮৯১ সাল হইতে ১৯৫০ সাল, এই ষাট বৎসর, এই জ্ঞানযোগী ভারত ইতিহাসের ঘটনাবলীর পশ্চাতে যে মানবমন সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটাইয়াছে, সেই রহস্যের অনুসন্ধানে আত্মভোলা সাধনা করিয়াছেন; আপনি আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন জ্ঞানের পথের নানা বিঘ্ন, নানা প্রলোভন। তাহা জয় করিয়াই তিনি হইয়াছেন বর্ত্তমান ভারতের ব্যাসদেব। তিনি মুঘলের জয়স্কন্ধবারের সঙ্গে সঙ্গে ভারত-পরিক্রমা করিয়াছেন; শক্তির আস্ফালন ও বিলাস-বিভ্রমের অন্তরালে দিন দিন সঞ্চিত দৈন্যের গ্লানি তাঁহার সন্ধানী চক্ষু এড়ায় নাই। মুসলমানকে বাদশাহী ভারতের, হিন্দুকে হিন্দুপাদ-পাদশাহীর অলীক স্বপ্ন হইতে তিনি রূঢ়ভাবে জাগরিত করিয়াছেন। সেই আত্মঘাতী স্বজন-বিরোধ, সীমাহীন লোভ, নির্ম্মম শোষণ ও মূঢ় স্বার্থপরতার ভয়াবহ পটভূমিকায় জাতীয় জীবনের যে চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা ভাবী কালকে মহতী বিনষ্টির হাত হইতে রক্ষা করিবে। নির্ম্মোহ বাণীতে ইতিহাস-বিধাতার অমোঘ ন্যায় নীতি বিঘোষিত।"

বঙ্গীয় ইতিহাস-পরিষদের অভিনন্দনপত্রের এই শব্দগুলি আচার্য্য যদুনাথকে বিশ্বজগতের শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ যুগে যুগে আত্মঘাতী হইয়াছে। এই বিনষ্টির হাত হইতে মুক্তির পথ যিনি প্রদর্শন করিতে পারেন, তিনিই ত জগতের গুরু। ষাট বৎসরের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া যদুনাথ এই পদের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করুন। তাঁহার অমোঘ নীতি আমাদিগকে রক্ষা করুক।

শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়ার নব কলেবর

শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়া সম্প্রতি দেশের নানা সমস্যা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলে কোটি কোটি টাকা উপায় করিয়াছেন, তন্মধ্যে যুদ্ধের মার্কিনী মাল (disposal) বিক্রয় উপলক্ষে অনেক "রূপেয়া" ঘরে তুলিয়াছেন। তারপর কি হইল বুঝিলাম না। শেঠজী প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে আপনার ও আপনার ব্যবসায়ী শ্রেণীর নানা 'কুলের কথা' কহিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এই বিষয়ে কলিকাতার "শিল্প ও সম্পদ" (সাপ্তাহিক) যাহা লিখিয়াছেন তাহা যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য তাহা উদ্ধৃত করিলাম:

"দিল্লীতে বিড়লা ব্রাদার্সের যেমন ঘাঁটি আছে, ডালমিয়া-জৈনেরও সেইরূপ আড্ডা রহিয়াছে। সম্ভবতঃ তথায় শেঠজীর জোরই বেশী। তৎসত্ত্বেও তিনি ভারত-সরকার হইতে তেমন সুবিধা পাইতেছেন না, বিড়লাই সব সুবিধা আদায় করিয়া লইতেছে। এই আক্রোশ ও জিদই বাদানুবাদের সূচনা করে এবং পরিণতি দাঁড়ায় শেঠজীর বৈরাগ্য। ইতিমধ্যে ডালমিয়া-জৈন ভাঙিয়া গিয়াছে, কত যে রকমফের হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। শেষে চারিঘরে ইহা চূড়ান্তভাবে ভাঙিয়া নিষ্পত্তি হইয়াছে। শেঠজী যে ইহাতে বিশেষ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন তাহা বলাই বাহুল্য। কাজেই বিড়লার সহিত যুদ্ধে তাঁহাকে সম্মানজনকভাবে পশ্চাদপসরণ (successful retreat) করিতে হইলে একটা 'বিরাট্ আদর্শে'র বা 'মহৎ উদ্দেশ্যে'র দরকার হয়, উহাই হইল 'বাস্তুহারা সমস্যা'। সেই মুহূর্ত্তে শেঠজী উহা পাইয়া গিয়াছিলেন। আমরা শেঠজীর এই পরিবর্ত্তনে কৌতুক অনুভব করিয়া ঈশপের গল্পের নখদন্তহীন বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের কথা চিন্তা করিতেছি।"

মালিক ও শ্রমিকের বিবাদে শেঠজীর সাহায্য ও পরামর্শ প্রথম পক্ষেরই পাওয়া উচিত। কিন্তু সম্প্রতি তিনি সকলকে তাক লাগাইয়া দিয়াছেন। বোম্বাই কাপড়ের কলের শ্রমিক দুই মাস কাল কর্ম্মে বিরত থাকে। তাহার ক্ষতির পরিমাণ—১০ কোটি টাকা মূল্যের কাপড় তৈয়ার হয় নাই, শ্রমিকেরা প্রায় তিন কোটি টাকার মজুরী হারাইয়াছে। এই উপলক্ষে বোম্বাই রাজ্যের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই এই কর্ম্মবিরতির সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ ডালমিয়ার নাম টানিয়া আনিয়াছেন। আমেদাবাদের কলমালিকদের নামও উঠিয়াছে। বোম্বাইয়ের কাপড়ের কল বন্ধ থাকিলে এবং তাঁহাদের কল চালু থাকিলে কাপড়ের বাজারে তাঁহাদের একচ্ছত্র আধিপত্য থাকিবে, এই ভাবিয়া তাঁহারা এই কর্ম্মবিরতির জন্য টাকা জোগান দিয়াছেন।

এই আলোচনার মূল কথা হইল যে, শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়ার বহুমুখী প্রতিভা আছে, এবং তিনি হাটে খেলিয়া অনেককে কাবু করিতেছেন—রাষ্ট্রকেও, প্রজাকেও। অতি বুদ্ধির আবার বিপদও আছে।

পূর্ব্ব-এশিয়ার আর্থিক উন্নয়ন

পূর্ব্ব-এশিয়ার অধিবাসীবর্গের সামগ্রিক উন্নতিকল্পে দুইটি পরিকল্পনা কাগজপত্রের মধ্যে আবদ্ধ আছে। একটি "ব্রিটিশ" রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর তরফ হইতে প্রস্তুত করা হইয়াছে; অন্যটি রাষ্ট্র-পতি ট্রুম্যানের "প্ল্যান ফোর" (Plan Four) নামে পরিচিত। প্রথমোক্তটির খসরা ১২ই অগ্রহায়ণ ভারতের কেন্দ্রীয় সংসদে পেশ করা হয়।

গত সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ পরামর্শ কমিটির অধিবেশনে যে সকল রাষ্ট্র যোগদান করিয়াছিল তাহাদের অর্থাৎ অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, সিংহল, ভারত, নিউজি-ল্যাণ্ড, পাকিস্থান ও ব্রিটেনের অনুমতিক্রমে এই রিপোর্ট আজ একযোগে প্রকাশ করা হইতেছে।

রিপোর্টে উল্লিখিত পরিকল্পনায় ভারত, পাকিস্থান, সিংহল, মালয় ও ব্রিটিশ বোর্ণিওকে ধরা হইয়াছে। পরিকল্পনায় যোগ দিবার জন্য দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিকে আহ্বান জানান হইয়াছে। এ সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রস্তুত হইলে রিপোর্টের পরিশিষ্ট হিসাবে পরে প্রকাশিত হইবে।

পরিকল্পনাটি ছয় বৎসরব্যাপী উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং এই অঞ্চলের বৈষয়িক উন্নয়ন সাধনই ইহার মূল উদ্দেশ্য। কৃষি, সেচ, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, রেলওয়ে, পথ, বন্দর, পোতাশ্রয় প্রভৃতি উন্নয়নের প্রধান পরিকল্পনাগুলি ইহার মধ্যে রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মত সমাজ-জীবনের মূল বিষয়গুলি উন্নয়নের ব্যবস্থাও ইহাতে থাকিবে। ভারত, পাকিস্থান, সিংহল, মালয় ও ব্রিটিশ বোর্ণিওর জন্য যে পরি-কল্পনা রচনা করা হইয়াছে তাহাতে মোট ব্যয় পড়িবে ১৮৬ কোটি ৮০ লক্ষ ষ্টার্লিং। ইহার মধ্যে ১০৮ কোটি ৪০ লক্ষ ষ্টার্লিং বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হইবে। ব্যয়ের বাকীটা সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারই বহন করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে।

পরিকল্পনাগুলি সাফল্যজনক ভাবে কার্য্যকরী করা হইলে ১৯৫৬-৫৭ সালে নিম্নোক্ত রূপ ফলাফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে:

আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি—১ কোটি ৩০ লক্ষ একর জমি
অধিক খাদ্য উৎপাদন—৬০ লক্ষ টন
অধিক জমিতে সেচের ব্যবস্থা—১ কোটি ৩০ লক্ষ একর
অধিক বিদ্যুৎ শক্তি-উৎপাদন—১১ লক্ষ কিলোওয়াট

ভারত, পাকিস্থান, সিংহল, মালয় ও ব্রিটিশ বোর্ণিওর জন্য যে পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে তার হিসাব এইরূপ:

ভারত—দামোদর, হীরাকুণ্ড ও ভাখরা-নাঙ্গল বাঁধ পরি-কল্পনা, একীভূত শস্য উৎপাদন পরিকল্পনা, যোগাযোগ ও পরি-বহন ব্যবস্থাদির উন্নয়ন। উন্নয়নের মোট ব্যয় ১,৮৩১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা।

পাকিস্থান—গম পরিকল্পনা; তাথালওয়ালা ইরাবতী খাল পরিকল্পনা; রসুল জল-বিদ্যুৎ পরিকল্পনা; দক্ষিণ সিন্ধু বাঁধ; চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয়ন; মালখণ্ড জল-বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ পরি-কল্পনা। উন্নয়নের মোট ব্যয়—২৬০ কোটি টাকা।

সিংহল—কৃষি উন্নয়ন; কলম্বো বন্দর উন্নয়ন; নূতন রাস্তা ও রেলপথ নির্ম্মাণ; মূল-শিল্প প্রতিষ্ঠা; সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান স্থাপন। উন্নয়নের মোট ব্যয়—১০৫ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা।

মালয়, সিঙ্গাপুর, উত্তর-বোর্ণিও ও সরবক—কৃষি উন্নয়ন, যোগাযোগ ও পরিবহন উন্নয়ন, জ্বালানী ও বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন, শিল্প ও জন-মঙ্গল ব্যবস্থার উন্নয়ন; সিঙ্গাপুর বন্দরের উন্নয়ন। মোট ব্যয় প্রায় ২০০ কোটি টাকা।

ইন্দোচীনের সমস্যা

ফরাসী গবর্মেণ্ট এত দিন পরে, অনেক ধার-করা অর্থ ও অনেক লোকক্ষয় করিয়া উক্ত সমস্যার কতকটা সমাধান করিয়াছেন। ১৩ই অগ্রহায়ণ এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। মার্কিনী পত্রিকাগুলি এই ব্যবস্থার প্রশংসা করিতেছে।

'ওয়াশিংটন পোষ্ট' বলেন: "একেবারেই কিছু না করা অপেক্ষা দেরীতে করাও ভাল। সামরিক বিপর্য্যয় এবং মার্কিন রাষ্ট্রের পরামর্শের ফলে ইন্দোচীন, ভিয়েৎনাম, লাওস্ এবং কাম্বোডিয়াকে লইয়া গঠিত মিলিত রাষ্ট্রকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে ফরাসী সরকার এখন সম্মত হইয়াছেন।

"রাজনীতি এবং সমরনীতি—উভয় দিক দিয়াই ব্যবস্থাটি গঠনমূলক হইয়াছে। ইন্দোচীনে নিযুক্ত অধিকাংশ ফরাসী কর্ম্মচারীকেই আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে সরাইয়া লওয়া হইবে এবং কেবল ফরাসী দেশের উপকারার্থে যে সকল ট্যাক্স ইন্দোচীনে আদায় করা হইত সে সমস্তই তুলিয়া দেওয়া হইবে। এই দুইটি কাজের দ্বারা ইন্দোচীনের নবলব্ধ স্বাধীনতার যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যাইবে। সম্মিলিত রাজ্য তিনটিকে ফরাসী ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইলেও বৈদেশিক রাষ্ট্রে নিজ রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি পাঠাইবার মর্য্যাদা এই মিলিত রাষ্ট্রের থাকিবে। ইহা ছাড়াও যে বিষয়টি এশিয়াবাসী জনগণের মনে বেশী রেখাপাত করিবে, তাহা হইতেছে—বাওদাইয়ের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বাধীনে একটি ইন্দোচীন বাহিনীর সংগঠন।

নবগঠিত স্বাধীন ইন্দোচীন মিলিত-রাষ্ট্র এবং ফরাসী সরকারের পারস্পরিক সখ্য সূত্রের আরও পরিচয় ফরাসী সরকার দিবেন; ২৫ হাজার নূতন আমদানি করা ফরাসী সৈন্য আর ৩০ কোটি ডলারের অধিক মূল্যের মার্কিন রাষ্ট্র-প্রেরিত সামরিক সরঞ্জামকে তাঁহারা কমিউনিষ্ট চালিত বিদ্রোহী দমনে নিযুক্ত করিবেন। ফরাসী সরকারের শৈথিল্যে এই ব্যবস্থা বিলম্বিত হইয়া পড়িলেও ইন্দোচীনের জনসাধারণ এখন বুঝিতে পারিবে, কোন্ পথে তাহাদের যাওয়া উচিত।"

'নিউ ইয়র্ক টাইমস্' সেই সুরেই গাহিয়াছেন :

"যথার্থ জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন করিয়াই ইন্দোচীনের ফরাসী নীতি চালিত হইতেছে, আশা করা যায় প্রকৃত স্বদেশ-ভক্ত ইন্দোচীনবাসীরা ইহার সমর্থক হইবেন এবং রাশিয়ার কৃত্রিম সাম্রাজ্য বিরোধিতাকে বর্জ্জন করিবেন।

এই স্বাধীনতা দানে ফরাসী সরকারের ক্রমান্বিত মন্থর গতির কারণ বুঝিতে পারা যায়, যখন দেখা যায় যে, স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বক্ষেত্রে যথার্থ যোগ্যতাসম্পন্ন ভিয়েৎনাম-বাসীর সংখ্যাল্পতা বিদ্যমান রহিয়াছে।"

আগামী দুই-চারি মাসের মধ্যে প্রমাণিত হইবে, এই ব্যবস্থা অতি বিলম্বে করা হইয়াছে কিনা। সোভিয়েট একনায়কত্বের ভয় বা মার্কিন পুঁজিবাদের ভয়—এই দুইটি ছাড়া তৃতীয় শক্তির আগমনের কোন প্রমাণ পাইতেছি না।

বাংলা ও আসাম ব্রাহ্ম সম্মিলনী হীরক জয়ন্তী

হাওড়া জেলায় বাণীবন একটি গ্রাম, সেখানে ব্রাহ্ম সমাজের অনুপ্রেরণায় একটি উচ্চ পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে। বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া সমাজ সকলের অনুকরণীয় পল্লী-সংগঠনের একটি কাঠামো তৈয়ার করিয়াছেন।

সেই গ্রামে প্রায় এক মাস পূর্ব্বে বাংলা ও আসাম ব্রাহ্ম সম্মিলনীর হীরক জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ঢাকার ব্রাহ্মপ্রধান শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন তাহার সভাপতিপদে বৃত হন। তদুপলক্ষে তিনি যে অভিভাষণ প্রদান করেন তাহার মধ্যে ভারতের ধর্ম্ম-জীবনের, সমাজ-জীবনের নানাবিধ সমস্যার আলোচনা আছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের "বিশ্বজনীন" আদর্শ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার মূল্য আজ অত্যধিক যখন খণ্ডবিখণ্ড ভারতের চিন্তাশীল সমাজ নানা ভাবনায় ক্লিষ্ট হইতেছেন।

"রামমোহন তাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের কোন নাম দিয়ে যান নি বটে, কিন্তু তাঁর ধর্ম্ম যে বিশ্বজনীন এ কথাটি তিনি বার বার বলেছেন। "My religion is universal"—একথা বলতে বলতে তাঁর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠত। তিনি দেখেছিলেন যে মানবের ধর্ম্ম যদি সত্য, বিশুদ্ধ জ্ঞান, বিমল ঈশ্বরপ্রীতি ও মানব-সেবার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে সে কল্যাণপ্রদ না হয়ে ভ্রম, কুসংস্কার ও ধর্ম্মান্ধতা সৃষ্টি ক'রে জীবনে ও সমাজে অপরিসীম দুঃখ, অকল্যাণ উৎপন্ন করে। তাই তিনি বিবিধ ধর্ম্মের সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হলেন এবং এমন একটি নব-ধর্ম্মের প্রেরণা দিয়ে গেলেন, যে ধর্ম্মের মধ্যে হিংসায় উন্মত্ত ও যুদ্ধবিগ্রহে জর্জ্জরিত পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের বীজটি নিহিত আছে, যে ধর্ম্মের মধ্যে শতধা বিভক্ত ও পরস্পর বিবদমান দেশ ও জাতি সকলের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী ও ঐক্যের সূত্রটি বর্ত্তমান, যে ধর্ম্মের আদর্শের মধ্যে ভারতের নবযুগের সর্ব্ববিধ কল্যাণ ও উন্নতির বীজটি নিহিত আছে। রামমোহন এই লক্ষণ-যুক্ত ধর্ম্মকেই বিশ্বজনীন বলে অনুভব করেছিলেন।"

রামমোহন রায়ের আদর্শ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইলে, যে সব সমস্যা যে মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে তাহা হইত না। হিন্দু সমাজ নানা শ্রেণী ভেদে দুর্ব্বল হইত না, হিন্দু মুসলমানের রেষারেষিতে দেশ বিভক্ত হইত না। অতীতের জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই। বর্ত্তমানের লোকক্ষয়-কর শিক্ষা ভবিষ্যতের জন্য আমাদের সাবধানী করিলে, ব্রাহ্ম সমাজের জীবন সার্থক হইবে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র

৭২ বৎসর বয়সে এই সমাজসেবাব্রতী চিকিৎসক-প্রধান দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি তাঁর সমাজ-সেবার আগ্রহের মধ্যে অটুট থাকিবে। বঙ্গীয় হিতসাধনী সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া, কলিকাতার খোলার ঘরে কদর্য্য পরিবেশের মধ্যে যাহারা বাস করে তাহাদের সেবা আরম্ভ করেন। তাহাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজের উপার্জ্জন হইতে ব্যয় করিতে কখনও কুণ্ঠিত ছিলেন না। বয়স্ক শিক্ষার প্রসার দ্বিজেন্দ্রনাথকে বাংলার দিকে দিকে লইয়া গিয়াছিল।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও দ্বিজেন্দ্রনাথের গতিবিধি ছিল। সেই আবেগই তাঁহাকে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে লইয়া যায়। আমরা এই বন্ধুর তিরোধানে তাঁহার পুত্র-কন্যার উদ্দেশে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

প্রশান্তকুমার সেন

এই জ্ঞান-বৃদ্ধের দেহত্যাগে আমরা আত্মীয়জন বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছি। তাঁহার পুত্র ও স্ত্রীর প্রতি আমাদের সহানুভূতি জানাইতেছি।

প্রশান্তকুমার নব-বিধান ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে নিজের জীবন গঠন করেন। নির্বিরোধী প্রকৃতির গুণে তিনি সর্ব্ব সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন। বিহারে তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়াছে; সেই প্রদেশের হাইকোর্টে তিনি আইন-ব্যবসা করিতেন; সেখানকার তিনি বিচারক ছিলেন। বিহারের ভোটেই তিনি ভারতীয় বিধান পরিষদের সভ্য মনোনীত হন। এই ঘটনা তাঁহার লোকপ্রিয়তার পরিচায়ক।

আইনশাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান ছিল লক্ষণীয়। তাঁহার লিখিত আইনের একখানি বই কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আদৃত হয়; পাণ্ডিত্যের গুণে তিনি একটি বিশেষ উপাধিলাভ করেন। পরিণত বয়সে তিনি প্রার্থিত লোকে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আত্মা শান্তিলাভ করুক।

দ্রষ্টব্য—সম্প্রতি তিব্বতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করায় ১৩৫৭, বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত পোতালা রাজপ্রাসাদ ও দালাইলামার ছবি বর্ত্তমান সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত করা হইল।

বার্নার্ড শ

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ

বার্নার্ড শ সম্বন্ধে আকস্মিকতার চমক বহু দিন কাটিয়া গিয়াছে। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম আবির্ভাবের সময়ে আমাদের অনভ্যস্ত কর্ণে তিনি যে সমস্ত কথা বলিয়া আমাদের চিরলালিত ধারণার উপর রূঢ় আঘাত করিয়াছিলেন এবং দুঃসাহসের সহিত প্রচলিত সমাজব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করিয়া যে অদ্ভুত বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত এই দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে অনেকটা শান্ত হইয়া গিয়াছে। তাই আজ প্রশান্ত মনে আমরা তাঁহার কথা আলোচনা করিতে পারি।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে বার্নার্ড শ-এর আকস্মিকতা কোন্‌খানে? এই আকস্মিকতা আছে নানা দিক দিয়া—সাহিত্যের বিষয়বস্তু, সাহিত্যের রীতি, আদর্শবাদ প্রভৃতি অনেক দিক দিয়াই তাঁহার অভিনবত্ব আছে।

এত দিন আমরা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি যে, তার্কিকের তর্কযুদ্ধ সাহিত্যের লীলাক্ষেত্র নয়, রাজনীতিকের কলহও তার লীলাক্ষেত্র নয়, ব্যক্তিগত মতবাদের ঢক্কা-নিনাদও নয়। আমরা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি যে, সাহিত্য দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার ঊর্দ্ধে নীড় রচনা করিবে, আলু-পটল-বেগুন, 'তেল-নুন-লকড়ি'র কথা তাহার মধ্যে থাকিবে না। যাহাকে আমরা Utility বলি, সাহিত্যে তাহার প্রসঙ্গ থাকিবে না। সেইজন্যই আমাদের মনে হয় সজিনা ফুল, কুমড়া ফুল, বেগুন ফুল দেখিতে যত ভালই হোক না কেন, তাহাদের সঙ্গে 'ইউটিলিটি'র সম্পর্ক আছে বলিয়া তাহা লইয়া কাব্য-রচনা হয় না, অথচ কচুরীপানার ফুল লইয়াও কাব্য-রচনা হইয়াছে।

কবি রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী'তে দেখিতে পাওয়া যায় বসন্ত-বর্ণনা প্রসঙ্গে বিদূষক বসন্তের সাদা ফুলগুলিকে তাহার প্রিয় মহিষের দুগ্ধের সঙ্গে এবং কলমা ধানের ভাতের সঙ্গে তুলনা করিয়াছিল বলিয়া সখী বিচক্ষণা তাহাকে প্রচুর উপহাস করিয়াছিল। তাহার উপহাস হইতে এইটুকুই বুঝা গিয়াছে যে, যাহা শিল্পকলার জিনিষ তাহার সহিত দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার কোনও স্পর্শ থাকিবে না। কাজেই রাজনীতি, সমাজনীতি, হাট-বাজারের কথা, মিল, কল-কারখানা,—এ সবের কথা সাহিত্যে থাকিবে না। সাহিত্য হইতেছে একটা রসের জিনিস, একটা সখের জিনিস, বিলাসের পরিবেশে পুষ্ট একটা ভাব-পদ্ম মাত্র।

এই ত হইল সাহিত্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আগেকার দিনের ধারণা। এই বিষয়বস্তুকে আবার কি ভাবে উপস্থাপিত করা হইবে, তৎসম্বন্ধেও আমাদের একটা নির্দ্দিষ্ট ধারণা ছিল। কবির স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণের সঙ্গীতের কথা আমরা অনেক শুনিয়াছি। একজন বিখ্যাত ইংরেজ কবি বলিয়াছেন—ফুলগাছের ডগায় ফুলটি যে ভাবে ফুটিয়া উঠে, কবির লেখনীতে কাব্যও সেই ভাবেই ফুটিয়া উঠিবে, তাহার মধ্যে আত্মসচেতনতা কিছুই থাকিবে না।

বার্নার্ড শ-এর পূর্ব্ববর্ত্তী রোম্যান্টিক কাব্যে ছিল হৃদয়ের প্রেরণার অভিব্যক্তি, তাহা আত্মসচেতনতার ফলমাত্র নয়। আত্মসচেতনতা ত সেখানে নাই-ই, বরং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে সাহিত্যিকের ব্যক্তিসত্তার বিলুপ্তিই হইতেছে ইহার শ্রেষ্ঠত্বের একটা বড় মাপকাঠি।

আত্মবিলুপ্তিই যদি সাহিত্যের উৎকর্ষের মাপকাঠি হয়, তাহা হইলে সাহিত্যিক, আত্মপ্রচারই হোক অথবা আত্মতত্ত্ব প্রচারই হোক, কোনটাই করিতে পারিবেন না। কবির বীণা শুধু সঙ্গীতই সৃষ্টি করিবে, সে সঙ্গীতের ইঙ্গিত যতই গভীর হউক, ব্যঞ্জনা যতই সুদূরপ্রসারী হউক, সেটা সোজাসুজি, উদ্দেশ্যমূলক বা প্রচারমূলক ভাবে সাহিত্যিক প্রকাশ করিতে পারিবেন না। প্রচারমূলক কাজ হইতেছে "জর্ণালিজম্"-এর বিষয়; সাহিত্যের নয়।

বার্নার্ড শ-এর বিশেষত্ব হইতেছে—তিনি এই 'জর্ণালিজম্'কেই সাহিত্য—একমাত্র সাহিত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। শুধু তাই নয়, অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণায় যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, বুদ্ধির চেয়ে হৃদয়ের কাজ যে সাহিত্যে বেশী প্রয়োজনীয়, এ সব কথাও তিনি স্বীকার করেন নাই। শুধুই কি তাই, সাহিত্যকে তিনি তার্কিকের মল্লভূমিতে নামাইয়া আনিয়াছেন, সাহিত্যকে সমাজ-সংস্কারের চাবুক হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন, সাহিত্যকে "প্রোপাগাণ্ডা"র বাহন হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন।

প্রথম প্রথম তাঁহার এই অভিনব সাহিত্য-প্রচেষ্টাকে কেহ কেহ সার্কাসের ক্লাউনের ভাঁড়ামি বলিয়া তুচ্ছ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কেহ কেহ প্রগল্‌ভ 'ফাজিলে'র পাকামি বলিয়া উড়াইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, কেহ কেহ বা টেক্‌নিকের বিচারে তাঁহাকে কোণঠাসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় নাই। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী বার্নার্ড শ চিরাচরিত টেক্‌নিককেও

অগ্রাহ্য করিলেন, প্রচলিত বিশ্বাসকেও আঘাত হানিলেন, তথাকথিত আদর্শবাদকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিলেন, বিবাহ ধর্ম্ম সমাজ সম্বন্ধে এমন সব কথা বলিতে লাগিলেন যে, আমরা তখন ক্ষেপিয়া গিয়া তাঁহাকে পাষণ্ড, নাস্তিক, সমাজদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া গালাগালি দিয়াছি। কিন্তু যতই তাঁহাকে গালাগালি দিয়াছি, ততই তাঁহার যুক্তির নিকট হার মানিয়া নিজেদের অজ্ঞাতসারে তাঁহার মতবাদে দীক্ষিত হইয়া উঠিয়াছি।

'জর্ণালিজমে'র ছোটখাটো কাজের মধ্য দিয়াই তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন। কবিতা এবং উপন্যাসও তিনি লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পরিচয় সে দিক দিয়া নহে, তাঁহার পরিচয় বর্ত্তমান যুগের ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে। কিন্তু এই নাটকের স্বরূপ কি?

ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে নাটকের ঐতিহ্যের গৌরব কম নহে। যে এলিজাবেথীয় যুগের নাটক লইয়া ইংলণ্ডের গৌরব, বার্নার্ড শ-এর নাটক সে জাতীয় নহে। এলিজাবেথীয় নাটক ছিল কাব্যধর্ম্মী; কল্পনার বর্ণাঢ্যতায়, শব্দের ঝঙ্কারে, মানবহৃদয়ের মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা ও বিস্ময়কর স্ফুরণের মধ্য দিয়া একটা অতিনাটকীয় পরিবেশে সেই নাটকগুলি যেন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতার ঊর্দ্ধলোকের বস্তু ছিল। জনসনের *Every Man in his Humour* জাতীয় দুই-একখানি নাটকের কথা বাদ দিলে মোটামুটি আমরা বলিতে পারি এলিজাবেথীয় নাটকের আবেদন ছিল হৃদয়গত, কিন্তু বার্নার্ড শ-এর নাটকের আবেদন হইতেছে বুদ্ধিগত। ধারালো সংলাপ, সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কমূলক বাদ প্রতিবাদ, মতবাদের সংঘর্ষ, এইগুলি হইতেছে বার্নার্ড শ-এর নাটকের বিশেষত্ব। এইজন্য তাঁহার নাটকের কুশীলবদের জীবন্ত মানুষ বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার নাটকের মধ্যে কিং লীয়ার, ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, রোজালিণ্ড প্রভৃতির মত চরিত্রের সন্ধান আমরা পাই না। আমরা যাহা পাই, তাহা হইতেছে এক-একটি মতবাদের জীবন্ত বিগ্রহ,—যেন এক-একটি মতবাদ, এক-একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী, সাজ-পোশাক পরিয়া নাট্যকারের নির্দ্দেশমত ষ্টেজের উপর বিতর্ক করিয়া যাইতেছে এবং নাট্যকার সস্মিত বদনে তাহা উপভোগ করিতেছেন।

এই দিক দিয়া বার্নার্ড শ-এর সমস্ত নাটকই সমগোত্রীয়। সবগুলি নাটকই এক-একটি সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে—সামাজিক বৈষম্য, দুর্নীতির প্রভাব, অর্থনৈতিক অব্যবস্থা, ভ্রান্ত আদর্শবাদ প্রভৃতি লইয়া তিনি লেখনী চালাইয়াছেন।

অবশ্য এ দিক দিয়া তিনিই যে পথিকৃৎ তাহা নহে; তাঁহার পূর্ব্বে ডিকেন্স, থ্যাকারে ও মেরিডিথ উপন্যাসের এবং গলস্‌ওয়ার্দ্দি নাটকের মধ্য দিয়া এই কাজ করিয়াছিলেন। তবে বার্নার্ড শ-এর ঋণ এই সমস্ত পূর্ব্বসূরীর নিকট ততটা নহে যতটা কার্ল মার্কস, স্যামুয়েল বাটলার এবং ইব্‌সেন-এর নিকট। ইব্‌সেন-এর *Doll's House* ইংলণ্ডে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত হয়। এই নাটক ইংলণ্ডের সমাজে একটা প্রলয়ঙ্কর ঝটিকা অথবা ভীষণ ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে নাই বটে, তবে তথাকার আত্মসন্তুষ্ট গতানুগতিক চিন্তাধারার মোড় ফিরাইয়া দিতেছিল। ফলে দুধের মধ্যে দম্বল দিলে যেমন ধীরে ধীরে দুধ দইয়ে পরিণত হইতে থাকে, ইংলণ্ডের চিন্তাধারার মধ্যেও সেই রকম পরিবর্ত্তন আসিতেছিল এবং তাহারই পরিণতি দেখিতে পাওয়া গেল ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বার্নার্ড শ-এর *Widower's House*-এ।

এক হিসাবে এই *Widower's House* হইতেই বার্নার্ড শ-এর যাবতীয় রচনার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারা যায়। তীক্ষ্ণ যুক্তিতর্ক ও মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গের ভিতর দিয়া তিনি আমাদের প্রচলিত সংস্কারগুলির অসারতা দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই যে ব্যঙ্গ ইহা জেরিমিয়া প্রভৃতির মত দুঃখ-বেদনা, বা অশ্রুপাতের ভিতর দিয়া করা হয় নাই, সুইফটের মত তিক্ত বাক্যবাণে পরিস্ফুট হয় নাই, কার্লাইলের মত অভিশাপের কশাঘাত-স্বরূপ আমাদের পৃষ্ঠে পতিত হয় নাই। তিনি যেখানে আঘাত করিতে চাহিয়াছেন, আঘাত সেখানে পৌঁছিয়াছে ঠিকই, কিন্তু মজা হইতেছে এই যে, আমরা তাঁহার আঘাতে যতই ব্যথা পাই, ততই আনন্দও উপভোগ করি, তাঁহার আঘাত মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি, কিন্তু মর্ম্মাহত হই না। আমাদের মনে হয়, এই সমস্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আড়ালে আছে একটা সহৃদয় মহৎ প্রাণ, একটা প্রেম-স্নিগ্ধ মধুর হাসি, আর আত্মীয়তার একটা অনিবার্য্য আকর্ষণ। কাজেই তাঁহার বাক্যের অগ্নিবাণ আমাদের পুড়াইয়া মারে না, শুধু নিজের দীপ্তির ঝলকে রংমশালের আলোকের মত আমাদের কুশ্রীতা, দীনতা ও অসঙ্গতিগুলিকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিয়া চলিয়া যায়; তাঁহার তর্কের ফুলঝুরি ফুল কাটে প্রচুর, কিন্তু ঘরে আগুন লাগায় না। সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন, "হিতং মনোহারী চ দুর্লভং বচঃ"; কিন্তু বার্নার্ড শ-এর হিতবাক্য সত্যই মনোহারী, এবং দুর্লভ নয়। সে হিতবাক্য আনন্দের চমক হইয়া আমাদের মনে প্রথমে দোলা দেয়, থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহে আনন্দ উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে আমরা শিক্ষার বীজ সংগ্রহ করিয়া আনি, তার পর ধীরে ধীরে লোকচক্ষুর

অন্তরালে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইতে থাকে, পরে তাহা আমাদের সংস্কারের খনেদী পাকা প্রাচীরের ভিতর দিয়া শিকড় চালাইয়া তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলে।

বস্তুতঃ অতীতের সংস্কারের অচলায়তন যে আজ বহু ক্ষেত্রেই ভাঙিয়া পড়িতেছে, তাহার মূলে বার্নার্ড শ-এর অবদান অনেকখানিই আছে। ভিক্টোরীয় যুগের গোড়ার দিকে আমাদের জীবনের অসঙ্গতি প্রচুরই ছিল, তাহা তিনি সেদিন চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া না দিলে তাহা এত দিনেও আমাদের নজরে পড়িত কিনা সন্দেহ। ভিক্টোরীয় যুগের ডিকেন্সের উপন্যাসের শিশু Nell বা Paul Dombey'র দুঃখে আমরা চোখে জল ফেলিয়াছি প্রচুর, কিন্তু শিশুদের দুঃখ ঘুচাইবার নিমিত্ত যখন কল-কারখানায় শিশু-শ্রমিকদের নিয়োগ বন্ধ করিবার জন্য আন্দোলন করা হইয়াছে, তখন আমরা তাহার বিপক্ষতা করিতেও কসুর করি নাই। সেদিন সবাই জাঁকজমক করিয়া রবিবারের সন্ধ্যায় গীর্জ্জাতে প্রার্থনা করিতে যাইত, আর সোমবার সকালেই গলাকাটা ব্যবসাদারের কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইত। সেদিন অভিজাত রমণীরা পথপ্রান্তে শীর্ণা কুক্কুরীকে দেখিয়া করুণায় মূর্চ্ছা যাইতেন, অথচ তাঁহাদেরই স্বজাতি অন্য নারীকে কল-কারখানায় পরিশ্রমে ও ক্ষুধার তাড়নায় শীর্ণা হইয়া যাইতে দেখিলে বেদনা অনুভব করিতেন না। তখনকার দিনে সাহিত্য-সভায়, পাঁচ জনের মজলিশে, ড্রয়িং রুমে একটা রূপ ফুটিয়া উঠিত, আর কল-কারখানায়, ব্যবসাক্ষেত্রে ফুটিয়া উঠিত অন্য একটি রূপ। সেদিন বাক্যের সঙ্গে কাজের মিল ছিল না, তথাকথিত জীবনাদর্শের সঙ্গে জীবনের মিল ছিল না, সাহিত্যের রোমান্সের সঙ্গে বাস্তব জীবনের কদর্য্যতা, দুর্নীতি ও ভ্রান্তনীতির ছিল ঘোর অমিল। সেদিন বিবাহ সম্বন্ধে, সতীত্ব সম্বন্ধে আমরা বড় বড় কথা বলিয়াছি, যুদ্ধ সম্বন্ধেও বড় বড় আদর্শ ঘোষণা করিয়াছি, আভিজাত্য সম্বন্ধেও গালভরা কথা বলিয়াছি। কিন্তু এই সমস্ত বড় বড় কথার মধ্যে যে প্রচুর ফাঁকি, প্রচুর বঞ্চনা এবং হয়ত আত্মপ্রবঞ্চনাও ছিল, বার্নার্ড শ তাহা আমাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছেন।

মানুষের চিরপোষিত বিশ্বাসকে তিনি এই ভাবে আঘাত করিয়াছেন বলিয়া অনেকেই মনে করেন তিনি প্রকাণ্ড নাস্তিক। তিনি ধর্ম্ম মানেন না, সমাজ মানেন না, আদর্শ মানেন না, নীতি-সংস্কার কিছুই মানেন না।

শরৎ চন্দ্রের শেষ প্রশ্নের 'কমল' আমাদের সমাজের সবকিছুকেই ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং তাহার যাহা কিছু প্রশ্ন, তাহা শুধু "শেষ প্রশ্ন" হইয়াই আমাদের মনের প্রশান্তিকে বিক্ষুব্ধ করিয়াছে; অথচ এই বিক্ষোভের মধ্যে আমাদের বিভ্রান্ত মন যখন একটা নির্ভরযোগ্য অবলম্বন চাহিয়াছে, সেই অবলম্বনটি দিতে পারে নাই; "শেষ প্রশ্নে"র শেষ "উত্তর" দিতে পারে নাই। বার্নার্ড শ এর প্রশ্নগুলি সে জাতীয় নহে; তাঁহার প্রশ্নগুলি যতই অতর্কিত হউক না কেন, যুক্তিগুলি যতই আকস্মিক হউক না কেন, শেষ পর্য্যন্ত এই প্রশ্নগুলিই তাহাদের সমাধানের পথ নির্দ্দেশ করে। প্রাথমিক বৈরিতা যেমন ভক্তি-মার্গে প্রবেশের একটা উপায়, বার্নার্ড শ-এর নাস্তিকতাও তেমনই আস্তিকতার একটা কৌশলী উপায় মাত্র। নীতির লাগাম কষিয়া তিনি আমাদের ক্রিয়াকলাপকে প্রাচীনের পথে জোর করিয়া চালাইতে চাহেন নাই, বরং নীতির রাশ একেবারে আলগা করিয়া দিয়া খুশিমত আমাদের চলিতে দিয়াছেন। এই জীবন-দর্শনের মধ্যেই বার্নার্ড শ-এর প্রাণ-শক্তির একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই প্রাণ-শক্তিই দেখাইয়া দেয়, খেয়ালমত চলিতে চলিতে উচ্ছৃঙ্খলতার বেপরোয়া গতিবেগে আমরা চলার চেয়ে ধাক্কাই খাই বেশী। তখন ঠেকিয়া শিখিয়া আমরা নীতির পথটিকেই বাছিয়া লই। নীতির সংযমটা তখন আমাদের কাছে অভিজ্ঞতালব্ধ এবং সাধনার সিদ্ধির মত বহুকাঙ্ক্ষিত জিনিস হইয়া উঠে, শুষ্ক আচারের বন্ধন মাত্র থাকে না। গ্রীক নাটকে 'Cathersis' জাতীয় একটা জিনিস থাকে, তেমনই একটা জিনিস বার্নার্ড শ-এর নাটকের মধ্যেও অলক্ষিতে কাজ করিয়া যায়।

বার্নার্ড শ এর প্রথম নাটক-ত্রয়ী *Plays Unpleasant*-এর অন্যতম *Philanderer* হইতেই আমরা তাঁহার রচনাশৈলীর একটা পরিচয় পাই। Chateris, Grace, Julia প্রভৃতি নূতন যুগের ('ইব্‌সেন ক্লাবে'র) মানুষ; তাহারা মেয়েলি মেয়ে, অথবা পুরুষভাবাপন্ন পুরুষ হওয়াকে সেকেলে জিনিস বলিয়া মনে করে। কাজেই নরনারীর মিলনের ব্যাপারে সেকেলে রীতি তাহারা পছন্দ করে না; নারী নরকে বিবাহ করিয়া স্বাধিকারপ্রমত্তা হইবে না, প্রিয়-বান্ধব বা প্রিয়-বান্ধবীর আকর্ষণটুকুকেই শুধু তাহারা স্বীকার করিবে, বিবাহের বাড়তি বন্ধনটুকুকে স্বীকার করিবে না, জীবনের চলতি পথে চলিতে চলিতে যখন যাহাকে যে ভাবে পাইবে, নিরুত্তাপ আবেগহীন বন্ধুত্ব দিয়া তাহাকে সেই ভাবে গ্রহণ করিবে, তাহার মধ্যে সেকেলে মান-অভিমান, প্রণয়-কোপ, ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব প্রভৃতি কিছুই থাকিবে না।

কিন্তু নাটক যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই দেখিতে পাওয়া গেল যে, *New Woman*-এর [নূতন কালের

নারী] চিরন্তন নারীত্বের দিকটিই প্রকট হইয়া উঠিতে লাগিল। চেটারিসকে জুলিয়া শুধু প্রিয়-বান্ধব হিসাবে পাইতে চায় না, আরও একটু গভীর ভাবে পাইতে চায়। চেটারিস কিন্তু উগ্র প্রগতিবাদী; প্রেমের নিষ্ঠাকে সে স্বীকার করে না। এই নিষ্ঠার অভাবের জন্যই সে জুলিয়ার সঙ্গে প্রেম করিয়া মাঝপথে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গ্রেস-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে লাগিল। নব্যা নারী হইয়াও জুলিয়া ইহা সহ্য করিতে পারে না। প্রাচীন সাহিত্যের খণ্ডিতা ও বিপ্রলব্ধা নায়িকার মতই অভিমানপুষ্ট কোপে সে একবার বা চেটারিসকে ভৎর্সনা করে, একবার বা প্রতিদ্বন্দ্বী নায়িকাকে অনুনয়-বিনয় করে, তাহার প্রেমাস্পদকে ফিরাইয়া দিবার জন্য। কিন্তু ইহাতে গ্রেস বা চেটারিস বিগলিত হয় না। বরং জুলিয়া যে এ যুগের মেয়ে হইয়াও সেকেলে মেয়েদের মত আচরণ করিতেছে, এজন্য তাহাকে 'ইবসেন ক্লাব' হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। চেটারিস ত জুলিয়ার প্রেমপত্রগুলি আগুনে পুড়াইয়াই ফেলিল; সে দেখাইতে চায় এই সমস্ত হৃদয়গত দুর্ব্বলতা, এই সমস্ত মেয়েলী প্যানপ্যানানি তাহার পছন্দ হয় না, তাই জুলিয়ার সঙ্গে তাহার পুরাতন প্রেমের কোন চিহ্নও অবশিষ্ট রাখিতে চায় না।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল, প্রেমাস্পদাকে লইয়া এই ছিনিমিনি খেলা বেশী দিন চলে না। প্রত্যাখ্যাতা জুলিয়া যখন ডক্টর প্যারামোরের নিকট স্থান পাইল, তখন চেটারিসের মধ্যে চিরন্তন পুরুষের ঈর্ষা জাগিয়া উঠিল, সে জুলিয়াকে গ্রহণ করিতে চাহিল। এইবার জুলিয়ার প্রতিশোধের পালা। সে চেটারিসকে প্রত্যাখ্যান করিল। ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হইল না। যে গ্রেসকে লইয়া চেটারিস জুলিয়াকে অবহেলা করিয়াছিল, সেই গ্রেসও তাহাকে নির্ভরযোগ্য স্বামী বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিল না এবং সেও তাহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিল। চেটারিস তখন তাহার ভুল বুঝিতে পারিল; সে বলিল, "আমি এত দিন শুধু নাগরালি করে এসেছি, প্রেমের নিষ্ঠাকে স্বীকার করিনি, তাই আমার এই পরাজয়; গার্হস্থ্য সুখ আমার মিলবে না, বিবাহ আমাকে কেউ করবে না।" তখন বৃদ্ধের দল বিজয়-গৌরবে বলিলেন, "পবিত্র জিনিসকে নিয়ে ছেলেখেলা করলে এই রকম দুর্দ্দশা হয়। এই তোমাদের প্রগতি! আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের মত বৃদ্ধদের প্রগতির বালাই নেই!"

এই জাতীয় সিদ্ধান্তের মধ্যে একটা আদর্শবাদের সুর ধ্বনিত হয়। বার্নার্ড শ *Plays Unpleasant* গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন, "সাধারণ শিল্পের সম্বন্ধে আমার রুচি নেই, সাধারণ নীতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা নেই, সাধারণ ধর্ম্মবিশ্বাসে আমার আস্থা নেই, এবং সাধারণের মধ্যে প্রচলিত বীরত্বের প্রতিও আমার শ্রদ্ধা নেই।" শিল্প-রীতি বা টেকনিক সম্বন্ধে এ কথা সত্য, কিন্তু নীতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নাই—এই উক্তিটির সম্বন্ধে একটু মন্তব্যের প্রয়োজন। 'নীতির প্রতি শ্রদ্ধা নেই' এই কথাটির অর্থ এই নয় যে, তিনি নীতির প্রয়োজন অনুভব করেন না; গতানুগতিক নীতির যে বন্ধনটি আমাদের যুক্তির পায়ে শিকল পরাইয়া দিয়াছে, সেই নীতিকেই তিনি মানেন না। শেলী *Epipsychidion* কাব্যে বলিয়াছেন:

> "I never was attached to that great sect
> Whose doctrine is that each should select
> Out of the crowd a mistress or a friend
> And all the rest though fair and wise, commend
> To cold oblivion..............and so
> With one chained friend perhaps a jealous foe
> The drearest and longest journey go."

শেলীর এই মতবাদটি 'ইবসেন ক্লাবে'র সভ্যদের মতবাদের চেয়ে কম বৈপ্লবিক নয়। কিন্তু ইহার মধ্যে আদর্শবাদ নাই। অপর পক্ষে বার্নার্ড শ-এর চেটারিসের পরিণতির মধ্যে একটা আদর্শবাদের স্পর্শ আছে। বার্নার্ড শ' সেখানে শেলীর তত্ত্বটিকে লাগাম খুলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তাহার দৌড় কত দূর পর্য্যন্ত তাহাও দেখাইয়া দিয়া শেষ পর্য্যন্ত বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, সংস্কারকে না মানার মধ্যে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশী।

বার্নার্ড শ-এর প্রায় সমস্ত নাটক এই প্রকার উদ্দেশ্য-মূলক বলিয়া মনে হয়। *Arms and the Man* নাটকে তিনি যুদ্ধকে ঠিক আক্রমণ করেন নাই, তবে যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সমস্ত মিথ্যা গৌরব ঘোষণা করা হয়, তাহাকে আক্রমণ করিয়াছেন। *Candida* নাটকে প্রেমকে অস্বীকার করেন নাই, তবে প্রেমের মোহ ও ভ্রান্তিকে অস্বীকার করিয়াছেন; *"You Never Can Tell"* গ্রন্থে তিনি দেখাইয়াছেন, যে 'গ্লোরিয়া' নির্বিকল্প মতবাদ লইয়া প্রেমকে অস্বীকার করিয়াছে, সে-ই প্রেমের অনিবার্য্য প্রভাবে অভিভূত হইল। কাজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে ভাসা ভাসা ভাবে দেখিলে তাঁহাকে যেরূপ প্রচলিত সমাজবিধি ও সংস্কারের বিরোধী বা নাস্তিক বলিয়া মনে হয়, তিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা নহেন।

গভীরভাবে না দেখিলে আরও মনে হয়, বার্নার্ড শ-এর জীবনদর্শন হইতেছে হৃদয়াবেগের মোহকে অস্বীকার করিয়া বুদ্ধিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা। মোহকে তিনি স্বীকার করেন না, বুদ্ধিবাদও তাহার একটা বিশেষত্ব, কিন্তু হৃদয়াবেগকেও

তিনি অস্বীকার করেন না, এইখানেই বার্নার্ড শ-এর সম্বন্ধে আর একটা দুর্জ্ঞেয়তা রহিয়াছে।

এই দুর্জ্ঞেয়তার সমাধান অসাধ্য নহে। মোহকে তিনি স্বীকার করেন না বলিয়াই যুক্তিবাদের সাহায্যে খ্রীষ্টধর্ম, বিবাহ, আভিজাত্য, রোম্যান্টিসিজম প্রভৃতির বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়াছিলেন ; কারণ এইগুলিকে কেন্দ্র করিয়া অনেক মোহের সৃষ্টি হইয়াছিল। অপর পক্ষে যাঁহারা নিছক যুক্তিবাদ মানিয়া চলেন, তাঁহাদের নাস্তিকতাও তিনি স্বীকার করেন না। সেইজন্যই তিনি যুক্তিবাদী হইয়া ডারউইন প্রভৃতির "জীবন সংগ্রাম", "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" ইত্যাদি অসামাজিক নীতি মানেন না। "জীবন সংগ্রাম", "যোগ্যতমের বাঁচিবার অধিকার" প্রভৃতি মতবাদ এই পৃথিবীকে একটি "গ্লাডিয়েটারে"র নিষ্করুণ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করিয়া তুলে। বার্নার্ড শ তাহা চাহিতেন না ; "স্নেহসুধামাখা বাসগৃহতলে" ভালবাসার নীড় রচনা করিয়াই আমরা বাস করিতে চাই, শুধু হানাহানি করিয়া টিঁকিয়া থাকিতে চাহি না। ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদ হইতেছে হানাহানি ও প্রতিযোগিতার দর্শন, কিন্তু বার্নার্ড শ-এর জীবন-দর্শন ছিল হিতবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, ব্যবহারিক নীতি ও মূল্য প্রভৃতির সহিত খানিকটা কল্পনাপ্রবণ ভাবুকতার সমন্বয়। এইখানেই তাঁহার আকস্মিকতা, এইখানেই তাঁহার দুর্জ্ঞেয়ত্ব। শ নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি "implacably anti-ritualistic and anti-materialist", অর্থাৎ একান্তভাবে চিরাচরিত প্রথাবিরোধী এবং জড়বাদবিরোধী। এই দুইটি গুণের একত্র সমাবেশ আমরা সচরাচর দেখিতে পাই না। সেইজন্যই বার্নার্ড শকে ঠিকমত বুঝিয়া উঠা আমাদের পক্ষে কঠিন।

পৃথিবী, তুমি কি বধির হলে ?

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবী, তোমার গিরি-কন্দরে
ও কিসের গর্জ্জন—?
আকাশে বজ্র ফেটে ভেঙে পড়ে
তপ্ত মাটির বুকে
বনস্পতির শাখাপ্রশাখার
জটিল অন্ধকারে
যেন বিদ্যুৎ-কলার বহ্নি
হঠাৎ জলিয়া ওঠে।

পৃথিবী, তোমার অন্তস্তলে
ও কিসের আলোড়ন—?
কোন্ বেদনায় মাটি ফেটে যায়
কাটলে জলোচ্ছ্বাস,
শত মুখে তার বেগবান স্রোত
প্রবল বন্যা আনে,
অকূল পাথারে ভাসে জনপদ
শত সমৃদ্ধ নগর চিহ্নহীন ?
ক্ষেত-খামারের কাটলে কাটলে
সর্ব্বনাশের বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
নূতন ধানের সোঁদাল গন্ধ নাই,
গন্ধক আর যবক্ষারের ক্লেদাক্ত আবিলতা
তৃষ্ণার জলে ঘোলা হয়ে ওঠে শুধু।
ক্ষুধার অন্ন ছিল গোলাভরা ধানে,
তৃষ্ণার জল স্বচ্ছ নদীর বুকে,
মাথার উপরে আশ্রয় ছিল
পর্ণকুটীরে বৃহৎ হর্ম্ম্যতলে
কোথায় ভাসিয়া গেল!
পৃথিবী, তোমার একি কম্পন
মৃত্তিকা হতে আকাশে তাহার গতি,
বৃহদরণ্য নদনদী গিরি
কর্ম্মমুখর শত শত লোকালয়
কাঁপিয়া উঠিল ঘুম থেকে জাগা
দুঃস্বপ্নের ভয়ার্ত্ত বিস্ময়ে।

পৃথিবী, তোমার গিরি-কান্তার
হিমবান হিমালয়
নদ নদী বন সকলই শুভঙ্কর,
ভুবনপালিকা অগ্রগামিনী তুমি,
বিমলানন্দ-বিধায়িনী জগমাতা,
তব করপুটে করিছ ধারণ

ওষধি বনস্পতি,
হিরণ্যপ্রভ হে তুমি তোমারে নমি!
মহৎ আবাস তব পাদমূলে
আপনার মাঝে তুমি যে মহিমময়ী,
তুমি বেগবতী, প্রচণ্ড তব
কম্পন জাগে যুগে কস্মিন্‌কালে,
আত্মতৃপ্ত ভোগসুখী জনে
তাই মাঝে মাঝে দিয়ে যাও তুমি নাড়া,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাপের সংক্রমণ
মুহূর্তে তুমি করে দাও পরাহত।
আজি তাই বুঝি অন্তরদাহে
জ্বলিয়া উঠিলে তুমি
ঘৃণায় তোমার বিরাট ও দেহ
বিদ্যুৎ বেগে করিলে সঙ্কুচিত?

হে পৃথিবী, তব বিরাট আধারে
আদের জীবন মৃত্যু মাঝে,
চন্দ্রসূর্য্য করিছে খেলা
তারকার মালা পরিয়া গলে;
উর্দ্ধে আলোর খর তরঙ্গ
নিয়ে আঁধারে তুফান ওঠে,
ইথারে নিথর বেগবান বায়ু
ঝড়েরে পাঠায় শালের বনে।
পাহাড় ভাঙিয়া উপত্যকায়
নেমে আসে শত জলপ্রপাত,
তারি উচ্ছ্বাসে নদীর মোহনা
সহস্র নদী সৃজন করে
চিরপরিচিত গতিপথ ছাড়ি'
গতিবেগে ছোটে দিগ্‌বিদিকে;
অচল পাহাড় গতি-চঞ্চল
গুহায় গুহায় চঞ্চলতা
কেহ মাথা তোলে গর্ব্বে আকাশে
কেহ লজ্জায় পাতালে ডোবে।

হে পৃথিবী, তব ষড় ঋতু মিলি
কামধেনুসম দিবস রাতি,
দোহনে বিলায় অমৃতকর
ক্ষুধার অন্ন তৃষার বারি,
তব কল্যাণে বুক্ষে রাখিও
আমা সবাকারে ফেলো না দূরে,
তব পশ্চাতে রাখিয়া যেও না
কখনও উর্দ্ধে তুলো না ধরে,
নিয়ে যদি বা নিক্ষেপ কর
তার চেয়ে দিও মৃত্যু সবে।

হে পৃথিবী, তব গভীর হইতে
সম্ভূত যেই গন্ধ লভি'
ওষধি ও বারি সুরভিত হয়
পুষ্করে যাহা ওতপ্রোত,
সুরভিত কর সেই সৌরভে
এই প্রার্থনা তোমার কাছে।
হে ভূমি, তোমারে যত দিন আমি
দেখিব যুক্ত সূর্য্যসাথে,
যেন তত দিন নাহি হয় ক্ষীণ
আমার দৃষ্টি তোমার 'পরে,
নাহি হয় ম্লান পরিশ্রান্ত
উষর উদাস হয় না কভু।
পৃথিবী, তোমারে মধুময় দেখি
জীবনে গোধূলি ঘনায়ে এল,
আজি কি দেখিব ভয়ঙ্কর?
ভূমিশয্যায় পাতিয়া আসন
মুখে ব্যোম ব্যোম তুলিছ ধ্বনি,
ধ্বংসের একি সূচনা তবে?
জীবন হইতে জীবনের ধারা
ঋক্ সূক্তের অমর বাণী
আজি কি তাহলে বিফলে যাবে?
বিফল হইবে মুক্ত আকাশে
নব সূর্য্যের স্বপ্ন দেখা?
স্বর্ণশস্তে জীবনের আয়ু
উষর মরুতে শুকায়ে যাবে?
নূতন ধান্তে হবে নবান্ন
হেথায় খামারে হর্ষ জাগে;
হোথা বিমর্ষ ভুখমিছিলের
নূতন দাবির আওয়াজ ওঠে,—
পৃথিবী তুমি কি বধির হলে?
বধির হইয়া র'বে কতকাল
এদিকে রাত্রি ঘনায়ে এল!

প্লবমান

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

তখন মহারুদ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আকর্ষণ করিয়া মুষ্টিপেষণে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

চূর্ণীকুর্বন্ত ব্রহ্মাণ্ডং পৃথিব্যাপি বিচূর্ণিতা।

দলিতাঞ্জনপুঞ্জসদৃশ মেঘ সকল, ধূম্রবর্ণ, রক্তবর্ণ, শুক্লবর্ণ, নীলবর্ণ রাশি রাশি মেঘ মহাশব্দে স্তম্ভসদৃশ স্থূল ধারাপাত করিতে লাগিল। জল, জল, জল,—একীভূতেষু তোয়েষু সর্বব্যাপিষু সর্বতঃ। সেই সর্বব্যাপী জলের মধ্যে চূর্ণীকৃত পৃথিবী নিমজ্জিত হইল। দিবা ও রাত্র, তম ও জ্যোতি, আকাশ ও পৃথিবী সমান হইয়া গেল।

তারপর? তারপর কল্প অতীত হইল। কল্পান্তে বিষ্ণু বরাহরূপে জলে নিমগ্ন পৃথিবীকে আকর্ষণ করিলেন। মহাবরাহ কর্তৃক আকর্ষিত হইয়া পৃথিবী প্লবম্নাসীৎ নৌরিব, নৌকার মত জলের উপর ভাসিতে লাগিল। যুগ যুগান্ত চলিয়া গেল, সর্বব্যাপী তোয়রাশি সবিতা শোষণ করিয়া লইলেন।

পিণ্ডবৎ পৃথিবী সবিতার দিকে চাহিয়া বলিলেন—ভগবান, আমি নগ্না, সৌরসভায় মুখ দেখাইতে পারিতেছি না, আমাকে আবরণ দাও। আমি বন্ধ্যা, আমাকে সন্তান দাও।

পৃথিবী আবরণ পাইলেন। মহাকায় সাইক্যাড ও কণিফার, ক্যাকটাস ও ফার্ণ, শৈবাল, গুল্ম, ফণীমনসা, তাল ও দেবদারু জাতীয় মহীরুহের নিবিড় অরণ্য ভূপৃষ্ঠ আচ্ছাদিত করিল। নির্বাত, আলোকহীন সে আদিম অরণ্য। সবিতা-দীপ্ত পৃথিবী সেই অরণ্যমধ্যে সন্তান প্রসব করিলেন।

জুরাসিক যুগের পৃথিবী। ফুল, ফল, রং, গন্ধহীন, পাখীর গান ও মানুষের হাসিশূন্য সেই মহাকায় সাইক্যাড, কণিফার ও ক্যাকটাসের জঙ্গলে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল পৃথিবীর সন্তান, অতিকায় সরীসৃপদল। অতিকায় সরীসৃপগোষ্ঠীর ডাইনোসর, টিরেনোসর, ষ্টেগোসর, জাইগ্যান্টোসর, শৃঙ্গধারী ট্রিহেরাটপ বীভৎস উল্লাসে, হিংস্রগর্জ্জনে, পরস্পরের মধ্যে উন্মত্ত সংগ্রামে নিবিড় অরণ্য আলোড়িত, বিপর্যস্ত করিতে লাগিল। যুধ্যমান হইয়া তাহারা পরস্পরের দিকে চাহিয়া থাকিত; তাহাদের হিংস্র দৃষ্টিতে পরস্পরের প্রতি অন্ধ অসূয়া ও উন্মত্ত আক্রোশে যেন স্ফুলিঙ্গ ছুটিত। আক্রমণকারীর সদম্ভ গর্জ্জন ও আক্রান্তের ভয়ার্ত, তীব্র চীৎকার অহোরাত্র পৃথিবীকে পীড়িত করিত।

অতিকায় সরীসৃপ-প্রসবিনী পৃথিবী সন্তানবাৎসল্য ভুলিয়া আর্ত্তবিলাপে বায়ুমণ্ডল বিদীর্ণ করিলেন। সেই আর্ত্তধ্বনিতে ধ্যানমগ্ন সবিতার ধ্যান ভঙ্গ হইল। সবিতা শুনিলেন পৃথিবী বিলাপ করিতেছে—হে হিরণ্যবর্ণ, হে প্রভু, এ কি সন্তান দিয়াছ আমার গর্ভে? ভগবান, অনন্তকাল জলে নিমজ্জিত থাকাও যে আমার ভাল ছিল।

সবিতা আপনমনে মৃদু হাস্য করিয়া দুই চক্ষু নিমীলিত করিলেন।

মেরু হইতে হিমশীতল বায়ুস্রোত বিশাল সাইক্যাড, কণিফার ও ক্যাকটাসের নিবিড় অরণ্যের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিল, চতুর্দ্দিকে মৃত্যু বিকীর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইল তুষার-স্রোত, আরম্ভ হইল ভূপৃষ্ঠের উন্মত্ত আক্ষেপ।

ভাঙ্গিয়া, চুরিয়া, ফাটিয়া, গলিয়া পৃথিবী নূতন রূপ ধরিল। ধীরে ধীরে ভূপৃষ্ঠের আক্ষেপ শান্ত হইল। তারপর ক্রমে শ্যামল বনভূমিতে পৃথিবী আবৃত হইল, লতাশীর্ষে বিচিত্র বর্ণ ও গন্ধ বহন করিয়া আসিল ফুল, বৃক্ষশাখায় আসিল ফল। পাখীর কলকাকলীতে নিস্তব্ধ বনভূমি মুখরিত হইল। সবিতার প্রসন্নহাস্যে দীপ্ত পৃথিবী নূতন সন্তান প্রসব করিলেন—মানুষ।

নবজাত সন্তানের মুখ দেখিয়া বাৎসল্যে পৃথিবীর হৃদয় গলিয়া গেল।

শ্যামল বনভূমিপ্রান্ত আশ্রয় করিয়া মানুষ ঘর বাঁধিল, গৃহস্থালী পাতিল। মাতৃস্নেহে বিগলিতহৃদয় বিমুগ্ধা পৃথিবী নির্নিমেষ নয়নে নবজাত সন্তানের জীবনলীলা দেখিতে লাগিলেন।

১

১৯৪৫-এর পূজার কিছু আগে।

ঠাকুমা পূজায় বসিয়াছেন, কাছে পঞ্চবর্ষীয় পৌত্র বসিয়া পূজা দেখিতেছে ও মাঝে মাঝে ঠাকুমার অনুকরণ করিয়া হাত নাড়িতেছে, ব-ব বম্ শব্দ করিতেছে। কি মনে হওয়ায় সে হস্ত প্রসারণ করিল তামার টাটে বসানো মাটির শিবলিঙ্গটি লইবার জন্য। তাড়াতাড়ি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া ঠাকুমা বলিলেন—ওরে ডাকাত, করিস কি? ঠাকুর রাগ করবেন।

তিনি পুত্রবধূকে ডাকিলেন, অ বৌমা, তোমার ছেলেকে নিয়ে যাও।

দ্বাবিংশ বর্ষীয়া পুত্রবধূ সরমা ঘরের বারান্দায় বঁটি পাতিয়া তরকারি কুটিতেছিল। শাশুড়ীর ডাক শুনিয়া বঁটি কাৎ করিয়া রাখিয়া উঠিল। অতিশয় সুশ্রী মুখ, লাবণ্য গড়াইয়া পড়িতেছে সর্ব্বদেহ হইতে। মুখচোখ চাপা খুশিতে উজ্জ্বল। মাথায় অল্প একটু ঘোমটা তুলিয়া দিয়া সে ঘরে আসিল।

মাকে দেখিয়া পৌত্র তাড়াতাড়ি ঠাকুমাকে জড়াইয়া ধরিল। মাকে বলিল, বৌমা, তুমি ভাত রান্না করগে। কর্তাবাবুর খিদে লেগেছে।

সরমা হাসিয়া বলিল—এসো দুষ্টু, তোমার কান মলে দিচ্ছি।

শাশুড়ীকে বলিল—শুনেছেন মা, আপনার নাতির কথা, কত্তাবাবুর খিদে লেগেছে।

শাশুড়ী হাসিলেন, পৌত্রের মাথায় চুমা খাইলেন। পুত্রবধূর দিকে চাহিয়া বলিলেন—হাঁ বৌমা, নরু কবে আসবে লিখেছে? কর্ত্তা বলছিলেন কাল তার চিঠি এসেছে।

ছেলে বাধা দিয়া বলিল—বৌমা, ভাত নান্না করগে, নরু খাবে।

তাহার কথা শুনিয়া পুত্রবধূ ও শাশুড়ী উভয়ে হাসিলেন। ঠাকুমা বলিলেন, কি চালাক ছেলে তোমার দেখেছ?

সরমা বলিল, লিখেছেন ১৫ই রওনা হবেন।

শাশুড়ী—আজ বুঝি দশুই? তা হলে এখনও পাঁচ দিন দেরি। ষষ্ঠীর দিন পৌঁছবে।

পুত্রবধূ—পঞ্চমীর দিন পৌঁছবেন।

শাশুড়ী—পঞ্চমীর দিন? সেদিন ত সরি আসবে তার শ্বশুর-বাড়ী থেকে। ভূপীন ও সতুর আসবার কথা কবে জান বৌমা?

পুত্রবধূ—ওঁরা আসবেন চতুর্থীতে, লতা ও নতুন জামাই আসবে ষষ্ঠীর দিন।

শাশুড়ী—তা হলে চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, রোজই লোকে পাঠাতে হবে ষ্টেশনে। মেয়ে, জামাই, নাতি, নাতনি, ছেলেতে বাড়ী ভরে উঠবে। কর্ত্তার বড় সাধ, যে যেখানে আছে পুজোর সবাই এসে আমোদ-আহ্লাদ করবে ক'দিন।

নাতি—আমি করব ঠাকুমা।

ঠাকুমা—তুমি আমোদ-আহ্লাদ করবে বই কি দাদু। তোমারই ত পুজো।

নাতি—আমি ঢাক বাজাবো ড্যাং ড্যাং।

ঠাকুমা—বাজাবে বই কি। ঢাক কাঁধে করে নাচতে পারবি ত দাদু যেমন ভোলা ঢাকী নাচে?

নাতি—নরু ঢাক আনবে।

ঠাকুমা—তা হলে নরুকে লিখে দাও আর সব জিনিসের সঙ্গে একটা ঢাকও যেন কিনে আনে।

ছেলে মাতার মুখের দিকে চাহিল। বলিল—বৌমা লিখবে।

মাতা—আমি লিখব না।

ছেলে—আমি কত্তাকে বলে দেব, কত্তা বকবে।

সরমা হাসিয়া হাত বাড়াইয়া ছেলেকে টানিয়া লইল। বলিল, তুমি এখন এসো ত ফাজিল ছেলে। ঠাকুমাকে পুজো করতে দাও।

ছেলেকে কোলে লইয়া সরমা চলিয়া গেল।

নিজের ঘরে আসিয়া সরমা ছেলেকে বিছানায় বসাইয়া দিল। একরাশ খেলনা তাহার সম্মুখে রাখিয়া বলিল, লক্ষ্মী ছেলের মত খেলা কর, আমি কাজ করি।

স্বামীর চিঠি পাইবার পর হইতে সরমার হাসিখুশি বাড়িয়াছে। সে ঘরের টুকিটাকি সাজাইতে লাগিল। দিনে দুই বার তিন বার করিয়া সে এই কাজ করে। ঘর সাজাইতে সাজাইতে সে নিজের মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে লাগিল।

ছেলে মায়ের মুখে গান শুনিয়া চাহিয়া দেখিল। বলিল, বৌমা, আমি গান করি?

মা হাসিল বলিল—করো।

ছেলে গান করিতে লাগিল—তাই তাই তাই, মাসীর বাড়ী যাই।

নরেন ও আর সকলে আসিয়া বাড়ী ভরিয়া ফেলিল। মহা ধুমধামে, আমোদ আহ্লাদে পূজার কয়টা দিন কাটিল।

দশমীর দিন ভাসান শেষ করিয়া ও পাড়ায় ঘুরিয়া একটু রাত করিয়া নরেন বাড়ীতে ফিরিল। আহারাদি শেষ হইবার পর সে যখন শয়ন করিতে আসিল পুত্র তখন এক ঘুম দিয়া উঠিয়া মায়ের সঙ্গে গল্প করিতেছে।

নরেন ঘরে ঢুকিতে সরমা বলিল—গাঁয়ের সকলের সঙ্গে প্রণাম, কোলাকুলি সেরে তবে ঘরে এলে। আমার পালা সকলের শেষে।

সে বিছানা হইতে ছেলেকে নামাইয়া দিয়া বলিল—যা, প্রণাম কর।

পুত্র নামিয়া আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিল। নরেন তাহাকে কোলে তুলিয়া চুমা খাইল।

সরমা বলিল—ওকে নামিয়ে দাও, আমি প্রণাম করি।

ছেলে—আমি নামবো না।

সরমা—তা নামবে কেন? নেমক হারাম ছেলে।

সে গলায় আঁচল দিয়া স্বামীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ছেলে পিতাকে বলিল—বৌমাকে চুমু খাও।

পিতা—তুমি খাও।

ছেলে দুই হাত বাড়াইয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুমা খাইল। তারপর বলিল—নরু, তুমি খাও।

সরমা—চুপ, দুষ্টু ছেলে।

বারান্দা দিয়া ঠাকুমা মেয়ের ঘরের দিকে যাইতেছিলেন। নাতির গলা শুনিয়া বলিলেন—কি দাদু, তোমার ঘুম ভাঙল?

ছেলে বলিল—অ ঠাকুমা, নরু কথা শোনে না। বৌমাকে চুমু—

সরমা তাড়াতাড়ি ছেলের মুখে হাত চাপা দিল। তাহার মুখ লাল হইল। বলিল—কি দুষ্টু ছেলে দেখেছ?

ছেলে মুখ সরাইয়া লইয়া বলিল—অ ঠাকুমা—

ঠাকুমা তখন বড় মেয়ের ঘরের কাছে পৌঁছিয়াছেন, নাতির ডাক শুনিতে পাইলেন না।

পরের দিন সন্ধ্যা। বাহিরের ঘরে কর্তার আসরে গল্প চলিতেছে। নাতি একটি সন্দেশ হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া কর্তা বলিলেন, কি দাদু, ঘুমোও নি?

নাতি সন্দেশটি মুখে পুরিয়া বলিল—আমি গপ্‌পো করব।

সে কয়াসে উঠিয়া দাদুর কোলে গিয়া বসিল।

গল্প চলিতেছিল ৩০শে আশ্বিন রাখীবন্ধনের কথা লইয়া। গল্প করিতেছিলেন রামবাবু। স্বদেশী আমলে ছাত্রাবস্থায় তিনি ছয় মাসের জন্ত জেল খাটিয়াছিলেন। তাঁহাদের গ্রাম কুসুমপুরে প্রথম রাখীবন্ধনের উৎসব কি ভাবে প্রতিপালিত হইয়াছিল সেই গল্প করিতেছিলেন। রাত থাকিতে উঠিয়া—"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নেরে ভাই" গান গাহিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ, সারাদিন উপবাস, রাখীবন্ধনের মন্ত্র—

ভাই ভাই এক ঠাঁই
ভেদ নাই ভেদ নাই,

বলিয়া ছেলেবুড়োর পরস্পরের হাতে রাখী বাঁধা; এই সব পুরাতন কাহিনী তিনি উৎসাহের সঙ্গে বলিতেছিলেন।

কিছুক্ষণ রামবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া গল্প শুনিয়া নাতি বলিয়া উঠিল—দাদু, আমি গপ্‌পো বলি।

দাদু—বল দাদু।

নাতি—(হাত নাড়িয়া) ভেদ নাই, ভেদ নাই। ভেদ কি দাদু?

দাদু পৌত্রকে বুঝাইতে লাগিলেন ভেদ মানে কি। নাতির চোখ ঘুমে ঢুলিতেছিল। সে হাই তুলিল। বলিল—আমি শোব দাদু।

দাদুর কোলে মাথা রাখিয়া সে শুইল ও ঘুমাইয়া পড়িল।

যদুবাবু বলিলেন—সে একদিন গেছে। তার পর ভাঙ্গা বাংলা জোড়া লাগল, লোকে রাখীবন্ধন ভুলে গেল। আবার ভাগ-বিভাগের কথা শোনা যাচ্ছে। কংগ্রেসের সঙ্গে নাকি কথাবার্তা চলছে।

রামবাবু—কংগ্রেস জন্ম থেকে চিরকাল একতার কথা বলছে, দেশ ভাগের প্রস্তাব কি কংগ্রেস কখনো মানতে পারে? দেখো ইংরাজের এ সব চাল ভেস্তে যাবে।

তামাক দিতে চাকর ঘরে আসিল। ঘুমন্ত নাতিকে দেখাইয়া কর্তা বলিলেন—ওকে ঘরে দিয়ে আয়।

নাতি মুখে আঙুল পুরিয়া ঘুমাইতেছিল। চাকর তাহার গায়ে হাত দিতে সে জাগিয়া উঠিল, ঠেলিয়া চাকরের হাত সরাইয়া দিল। বলিল—দাদু, আমি গপ্‌পো বলব।

দাদু—(হাসিয়া) কি গল্প বলবে দাদু?

নাতি—আমি ভালো গপ্‌পো বলব। (হাত নাড়িয়া) —এক ঠাঁই, ভেদ নাই, নাই।

দাদু—বেশ গল্প বলেছ দাদু। এবার যাও ত, বৌমার কাছে পান নিয়ে এসো।

নাতি—বৌমা পান ছেঁচে দেবে দাদু?

দাদু—(হাসিয়া) হাঁ, দাদু, ছেঁচে দেবে। যাও কোলে চড়ে গিয়ে পান আনো।

নাতি চাকরের কোলে উঠিল। উঠিয়া তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া সে আবার ঘুমাইয়া পড়িল। চাকর তাহাকে ঘরে লইয়া গিয়া সন্তর্পণে বিছানায় শোয়াইয়া দিল। শুইয়া একবার চোখ মেলিয়া সে বলিল—পান ছেঁচে দেবে।

তার পর মুখে আঙুল পুরিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া যাইতে সে শুনিল তাহার পিতা-মাতা মৃদুস্বরে কথা বলিতেছেন। সে উঠিয়া বসিল। বলিল—বৌমা, চুপ করো, আমি ভাল গপ্‌পো বলব। (হাত নাড়িয়া) ভেদ নাই, নাই।

মাতা—দস্যি ছেলে, তুমি এর মধ্যে জেগে উঠেছ?

নরেন—ও কি বলছে শুনলে?

সরমা—ওর কথার কোন মাথামুণ্ডু আছে? কি কোথায় শুনেছে তাই বলছে।

নরেন—ও বলছে রাখীবন্ধনের মন্ত্র, রবীন্দ্রনাথের তৈরি। সেই পুরনো দিনের পুরনো ভুলে যাওয়া মন্ত্র—'ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই।' আজকের দিনে এ মন্ত্র ও শুনল কোথায়?

সরমা—বোধ হয় কর্তার বৈঠকখানায় কেউ গল্প করছিলেন তাই শুনেছে। ছেলের এদিকে স্মরণশক্তি খুব। একটা গল্প মনে হ'ল। এবারকার ভাদ্রমাসের বানের সময়কার।

নরেন—ভাদ্র মাসের বান? ও ভাই ত, বাবা লিখেছিলেন বটে বিল ভাসি হয়ে ধান নষ্ট হয়েছে, গরু মহিষ অনেক মরেছে বিলের মধ্যে গাঁগুলোতে, ঘরবাড়ী ভেসে গেছে।

সরমা—দু'জন মানুষও মরেছিল। বিলের জল এসে করালী নদীতে পড়ে নদীতে বান ডাকল। নদীর জল এসে গাঁয়ে ঢুকল, ক্ষেতখামার, বাগান ডুবে গেল। সদর রাস্তায় আধ মানুষ জল হ'ল। জলটা শিগগির নেবে গেল নইলে আমাদের হয়ত দালানের ছাদের ওপর বসে থাকতে হ'ত। আর তাই কি থাকতে পারতেম? কি বিষ্টির বিষ্টি! তিন দিন ধরে একটু বিরাম নেই।

নরেন হাসিয়া বলিল—এক কোঁটা করালী নদীর বানে এত ভয় পেয়েছিলে। যদি উত্তর বঙ্গের বন্যা, দামোদরের

বন্যা চোখে দেখতে। স্কুলে পড়বার সময় আমরা একবার বন্যায় স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করতে গিয়েছিলেম। দেখে মনে হ'ত যেন গোটা দেশ জলে তলিয়ে গিয়েছে। মানুষ ভাসছে, গরু, মহিষ, কুকুর, বেরাল, গাছ, ঘরের চালা ভেসে চলেছে। বাঘ, শেয়াল, বরা পর্য্যন্ত জলে ভেসে চলেছে। সারা সৃষ্টি ভাসমান আর কি। যাক্‌, কি গল্পের কথা বলছিলে।

সরমা—তোমার কথায় আমার ভয় ধরে গেছে, আর গল্প ভাল লাগছে না।

নরেন—(হাসিয়া) আচ্ছা ভীতু মানুষ তুমি, ভয়ের কথা কি হয়েছে?

সরমা—তুমি কয়েলীকে এক কোঁটা বলে ঠাট্টা করলে, তার তখনকার চেহারা যদি দেখতে। গাঁয়ে জল ঢুকতে সবাই ভয় পেয়ে গেলেম। আমার মনে হ'ত, আচ্ছা, আরও জল বাড়লে না হয় ছাদে উঠলেম। যদি ছাদ সমান জল হয় তখন? ভাবতেম খোকনকে পিঠে বেঁধে সাঁতার দেব। কিন্তু সাঁতরে যাবো কোথায়। চারদিকেই ত জল। আর সেই জলে সাপ, ব্যাং সব ভাসছে। কি ভয় হয়েছিল দু'তিন দিন।

ছেলে আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নরেন হাসিয়া স্ত্রীর গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল,—মিছেমিছি ভয় পেলে চলবে কেন সরমা? সংসারে সত্যিকারের ভয়ের জিনিষ কত আছে। সে সব জিনিষের সামনে পড়লে কি করবে?

সরমা রাগ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। বলিল—কুক্ষণে আমি বানের কথা তুলেছিলাম। তুমি কেবলই ভয় পাইয়ে দিচ্ছ। লক্ষ্মী পুজোর পর দিন ত চলে যাবে। এই সব বিশ্রী গল্প করে রাত কাটাবে?

নরেন হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, একটা খুব ভাল গল্প বলছি, শোন। কই, এ দিকে মুখ ফেরাও।

সরমা—কি রকম গল্প আগে শুনি।

নরেন—শোন। অনেক রাত হয়েছে। সানাইওয়ালারা ক্লান্ত হয়ে সবে থেমেছে। ঘরে যারা হল্লোড় করছিল তারা সবাই চলে গেছে। ছেলেটি উঠে বিছানায় বসল। পাশে শাড়ী গহনায় ঢাকা মেয়েটি বালিশে মুখ গুঁজে ঘুমোবার ভান করছিল। তার পিঠে হাত রেখে ছেলেটি বলল—তুমি বড় সুন্দর। বালিশে মুখ গুঁজে রাখলে আমি তোমার মুখখানা দেখব কি করে? একবারটি মুখখানা তোল। মেয়েটি কি বলল জানো?

সরমা হাসিয়া বলিল—বড্ড চালাক তুমি। একটু মুশকিল দেখলেই ঐ ছয় বছরের পুরনো গল্প তুলে বাজিমাৎ কর।

নরেন—হুঁ, মেয়েটিকে তা হলে যেন মনে হচ্ছে? সে কি বলল বল ত।

সরমা হাসিয়া বলিল—বলল, আমি সুন্দর না ছাই।

নরেন—শুনে ছেলেটি বলল—তাই নাকি? দেখি, দেখি ছাই মুখখানা।

ছেলে ঘুমের ঘোরে কি যেন বলিল বুঝা গেল না।

সরমা তাড়াতাড়ি বলিল, এই, চুপ। খোকন জেগে উঠবে। এত রাতে জাগলে বাকী রাত কেবল বায়না করবে।

২

১৯৪৬-এর পুজার কিছু আগে।

সরমা ঘরে ঢুকিয়া বলিল—মা, আর কোন খবর এল কলকাতা থেকে?

শাশুড়ী বলিলেন—না বৌমা, আর কোন খবর ত আসে নি।

সরমার আর সে রূপ নাই, স্নিগ্ধ লাবণ্য নাই, সে শুকাইয়া উঠিয়াছে। মেঝেতে বসিয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—মা, এমন করে আমি যে আর থাকতে পারছি নে। আছেন কি নেই খবরটুকু কেউ দিল না।

শাশুড়ী কাঁদিতে লাগিলেন, পুত্রবধূর কথার কোন জবাব দিলেন না।

সরমা উঠিয়া শ্বশুরের ঘরের দিকে গেল। দরজার কাছে গিয়া গলা শুনিয়া বুঝিল বাহিরের লোক আছে ঘরে। সে আর ঘরে না ঢুকিয়া দরজার পাশে মেঝেতে বসিল কি কথা হয় শুনিবার জন্য।

রামবাবু বলিতেছিলেন—কত রকমের কথা শুনছি লোকের মুখে, খবরের কাগজে। কাল রাত্রে একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিলেম। সারা পৃথিবীর হাওয়ায় যেন বিষ ঢুকেছে। এই হাওয়া লেগে যেমন শেয়াল-কুকুর ক্ষেপে যায়—তেমনি মানুষ ক্ষেপে গেছে। সব জায়গায় কামড়াকামড়ি, খেয়োখেয়ি লেগে গেছে। কামড়াকামড়ি করতে করতে পৃথিবীর সব মানুষ মরে ভূত হয়ে গেল। পৃথিবীতে রইল কেবল জন্তু জানোয়ার।

হরিবাবু—গোটা দেশটার ওপর কোন দেবতার অভিশাপ নেমে এসেছে। তিন বছর আগের কথা মনে কর একবার। অজন্মা নেই, কিছু নেই, যাদুমন্ত্রে চাল কোথায় উড়ে গেল, লাখ লাখ লোক না খেতে পেয়ে শুকিয়ে পথে ঘাটে, যেখানে সেখানে পড়ে মরল। এবারকার কলকাতার কাণ্ডের কথা—

হরিবাবু কথা শেষ না করিয়া থামিলেন।

নরেনের পিতা বৃদ্ধ হরেনবাবু শূন্য দৃষ্টি মেলিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে দাঙ্গার দ্বিতীয় দিনে নরেনের অন্তর্হিত হইবার সংবাদ আসিবার পর হইতে তিনি ভাঙিয়া পড়িয়াছেন। সদানন্দ, মজলিসী মানুষ ছিলেন তিনি, পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত অথর্ব হইয়াছেন। মাঝে মাঝে বিড়-

বিড় করিয়া কি বলেন, কেহ বুঝিতে পারে না। একটা কথা স্পষ্ট বুঝা যায়—মানুষ এমন হয়? বার বার এই কথাটাই যেন কোন অদৃশ্য শ্রোতাকে জিজ্ঞাসা করেন। সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা, রাত্রি, সব সময় কেমন যেন একটা ঘোর ভাব।

গত দুর্ভিক্ষের সময়ে তিনি হিসাব করিয়া নিজের খোরাকী মাত্র হাতে রাখিয়া শত শত মণ ধান অনাহার ক্লিষ্টদের মধ্যে বিলাইয়াছিলেন। অভাবীদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান বলিয়া বিচার করিবার কথা তাঁহার মনে হয় নাই। হঠাৎ এ প্রশ্নটা বড় হইয়া উঠিল কেন? কে বড় করিল? পুত্রের অন্তর্হিত হইবার সংবাদ পাইয়া এই প্রশ্ন কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আপনাকে? কি উত্তর পাইয়াছিলেন নিজের মনের কাছে?

হরিবাবুকে শোকার্ত্ত হরেনবাবুর শূন্যদৃষ্টির অজিজ্ঞাসিত প্রশ্নের সম্মুখে নির্ব্বাক হইয়া থাকিতে দেখিয়া রামবাবু আবেগ-পূর্ণ স্বরে বলিলেন—আমার কি মনে হয় জান হরি? মানুষের পাপের মাত্রা পূর্ণ হয়েছে। নিজেদের মধ্যে বগড়াকাটি, মারা-মারি, কাটাকাটি করে মানুষ শেষ হয়ে যাবে। পৃথিবী নির্ম্মানুষ হবে। তাই হোক। মানুষ পৃথিবীর অলঙ্কার না হয়ে হয়েছে পৃথিবীর ভার। ভগবান যেন সব মানুষ ধ্বংস করে পৃথিবীকে ভাল করে ধুয়ে পুঁছে নূতন সৃষ্টি করেন।

হরেনবাবু শূন্যদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—সেই ভাল, সেই ভাল।

সরমা দরজার আড়ালে বসিয়া শ্বশুরের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। নিজের মনে বলিল—আমার খোকন, আমার খোকনের কি হবে?

সে উঠিয়া তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গেল তাহার ছেলে ঘুমাইতেছে না পিতার মত অন্তর্ধান করিয়াছে দেখিবার জন্ত।

৩

১৯৪৭-এর পূজার কিছু আগে।

স্বপ্নের আসমুদ্র হিমাচল অখণ্ড ভারত খণ্ডিত হইয়াছে। সমুদ্র মন্থনে উঠিয়াছিল অমৃত ও গরল। আর উঠিয়াছিলেন লক্ষ্মী। ভারতমন্থনে কি উঠিয়াছে? কোথায় লক্ষ্মী, কোথায় অমৃত?

কয়ালীতে এবার বান আসে নাই। বিলে বান নাই, কয়ালীতে বান নাই, বান আসিয়াছে বাতাসে। কি প্রবল স্রোত সে বানে! সব ভাসিয়াছে সে বানের জলে। সব নয়, শুধু মানুষ। বৃদ্ধ, যুবক, বালক, শিশু, স্ত্রী, পুরুষ, সমর্থ, অসমর্থ, ধনী, নির্ধন, শহরের মানুষ, গাঁয়ের মানুষ, কারবারী মানুষ, ক্ষেতের মানুষ, সাধু মানুষ, অসাধু মানুষ সকলে ভাসিয়াছে হাওয়ার বানে। লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ বানভাসি। ভাসিতে ভাসিতে কতজন ডুবিবে, কতজন চড়ায়, আঘাটায় আটকাইয়া যাইবে, কতজন হাঙর, কুমীরের পেটে যাইবে কে জানে?

এক হাতে ছেলের হাত অন্য হাতে শাশুড়ীর হাত ধরিয়া সরমা চলিতেছে, আগে চলিতেছেন লাঠি ধরিয়া বৃদ্ধ হরেন বাবু। সেই হরেনবাবু দুর্ভিক্ষের সময় আহার দিয়া শত শত লোককে যিনি বাঁচাইয়াছিলেন। বাড়ীঘর, জিনিসপত্র, ক্ষেত-খামার সব ফেলিয়া এই বৃদ্ধ কোথায় চলিয়াছেন? কেন চলিয়াছেন?

ছেলের হাত শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া সরমা বলিল—মা, আমার খোকনকে কি বাঁচাতে পারব? আমরা কোথায় চলেছি মা?

শাশুড়ী বলিলেন—বাঁচবে বই কি বৌমা। ওকে বাঁচাবার জন্যই আমরা পথে বেরিয়েছি।

সরমা—আমরা কি পৌঁছুতে পারব মা?

শাশুড়ী—পৌঁছুবার ত কোন জায়গা নেই আমাদের বৌমা।

সরমা—খোকনের জন্য বড় ভয় করছে মা।

শাশুড়ী—ভয় কি বৌমা? আমরা দু'জন যদি পথের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে যাই ঐ দেখ আগে পিছনে কত লোক চলেছে। খোকনকে নিয়ে ওদের সঙ্গে তুমি চলে যাবে।

সরমা—ও কথা মুখে আনবেন না, মা। শুনে আমার হাত-পা কাঁপছে।

শাশুড়ী—হাত-পা কাঁপতে দিও না বৌমা, আমাদের খোকনকে বাঁচাতে হবে। যদি কখনও সুদিন আসে সেই আশায় ওকে বাঁচাতে হবে। নরুর ছেলে, আমাদের বংশের প্রদীপ। (নিজের মনে হাসিয়া) আমাদের বংশ! একসঙ্গে বংশের তিন পুরুষ আজ পথে ভেসেছে হাতধরাধরি করে।

সরমা এক হাতে ছেলের হাত অন্য হাতে শাশুড়ীর হাত ধরিয়া চলিতে লাগিল। আগে চলিয়াছেন বৃদ্ধ হরেনবাবু। কুসুমপুরের বনিয়াদী, বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের তিন পুরুষ নীড়চ্যুত হইয়া পথে ভাসিয়াছে। আজ তাহারা বানভাসি।

৪

ধীরে ধীরে গোধূলির ছায়া নামিতে লাগিল চারিদিকে।

যে স্নেহমুগ্ধা জননী পৃথিবী একদিন শ্যামল বনভূমির আঁচল পাতিয়া দিয়াছিলেন তাঁহার নবজাত সন্তানের জন্ত গোধূলির ম্লানায়মান ছায়ার মধ্য দিয়া দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া তিনি দেখিলেন লক্ষ লক্ষ আতঙ্কিত মানুষের লক্ষ্যহীন সকরুণ, দেখিলেন ছিন্নমূল লতার মত ভাসিয়া চলিয়াছে কত সরমা, বৃন্তচ্যুত পুষ্পকোরকের মত কত সরমার দুলাল, উন্মূলিত শুষ্ক তৃণখণ্ডের ন্যায় হরেনবাবুর মত কত বৃদ্ধ, সরমার শাশুড়ীর মত কত বৃদ্ধা। চাহিয়া দেখিয়া তাঁহার মাতৃবক্ষ মথিত করিয়া একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়িল।

তাঁহার মনে পড়িল নবজাত সন্তানের মুখ দেখিয়া কি উজ্জ্বল স্বপ্ন জাগিয়াছিল তাঁহার মনে, কত আশায় তাঁহার বক্ষ পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি সস্নেহে লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাঁহার সন্তান ক্ষুদ্রাকৃতি বটে, কিন্তু তাহার ঐ ক্ষুদ্র বক্ষে কত আশা, ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে কত বুদ্ধি, ক্ষুদ্র বাহুতে কত শক্তি! স্নেহবিগলিত হইয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন বড় হইয়া তাঁহার সন্তান নব নব কীর্ত্তিতে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল করিবে।

উদ্‌গত অশ্রু রোধ করিয়া জননী পৃথিবী আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ত সেদিন মানুষ গৃহস্থালী পাতিয়াছিল, এমন দুষ্কৃতী কে জন্মিল মানুষের মধ্যে যাহার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের সুখের সংসার পুড়িয়া গেল, ছন্নছাড়া হইয়া তাহারা বন্যার স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে? আপনার মনের কাছে উত্তর না পাইয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলিয়া তিনি ঊর্দ্ধে সবিতার দিকে চাহিলেন। চাহিতে বহুদিনের অতীত আত্মজীবনের বিস্মৃত এক অধ্যায়ের কথা মনে পড়িতে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল এক বিস্মৃত চিত্র। দেখিলেন, শ্যামল, বিস্তীর্ণ বনভূমিকে কুক্ষিগত করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে বিরাট সাইক্যাড, কণিকার, ক্যাকটাসের নিবিড় অরণ্য। সেই বিস্তীর্ণ অরণ্যের মধ্যে উন্মত্ত, হিংস্র আক্রোশে বীভৎস গর্জ্জন করিতেছে অতিকায় সরীসৃপযূথ, ডাইনোসর, টিরেনোসর, ষ্টেগোসর, আইগ্যান্টোসর, শৃঙ্গধারী ট্রিছেরোটপ। যুধ্যমান হইয়া হিংস্র দৃষ্টিতে তাহারা পরস্পরের দিকে চাহিতেছে, এই বুঝি লাফাইয়া একটা আর একটার ঘাড়ে পড়িবে।

চিত্র দেখিয়া আত্মবিস্মৃতা, শঙ্কিতা, জননী পৃথিবী ব্যাকুল দৃষ্টিতে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন মানুষ কোথায় গেল। অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান, আদরের দুলাল মানুষ কি আজ আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে উন্মত্ত অতিকায় সরীসৃপে পরিণত হইয়াছে? এই জন্যই কি আজ দুঃখ দুর্দ্দশার সীমা নাই মানুষের সংসারে? এই চিন্তা মনে উদয় হইতে তাঁহার সকল অঙ্গ হিম হইয়া আসিল।

ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে সবিতার দিকে চাহিয়া আত্মবিস্মৃতা পৃথিবী আর্ত্তনাদ করিলেন—হে হিরণ্যবর্ণ, হে সবিতা, হে প্রভু, একি সন্তান দিয়াছ আমার গর্ভে? মানুষরূপী বীভৎস সরীসৃপকে কি আমি বক্ষরক্ত দিয়া পালন করিয়াছি এত দিন? কেন এ ছলনা করিলে দুর্ভাগিনী ধরিত্রীকে? ভগবান, অনন্তকাল জলে নিমজ্জিত থাকাও যে আমার ভাল ছিল।

ভয়ার্ত্তা পৃথিবীর বিলাপে সবিতার ধ্যান আজিও ভাঙ্গিল না। কে শঙ্কিতা জননী পৃথিবীকে সান্ত্বনা দিবে? কে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিবে—জননী, তোমার সন্তান মানুষ অতিকায় সরীসৃপে পরিণত হয় নাই, সে মানুষই রহিয়াছে?

স্বর্গ ও নরক

শ্রীকালিদাস রায়

কাঠের প্রতিমা ভরি' ধরে ঘুন আগুনে তা' পোড়ে,
গলায়ে সোনাটা বেচে সোনার প্রতিমা লয় চোরে।
সীসার প্রতিমা ভেঙে র'য়ে যায় মাটির তলায়,
তাহারে উদ্ধার করি রাখে নর সংগ্রহ-শালায়।
পূজা পেয়ে তিন দিন মাটির প্রতিমা জলে গলে,
খড়ের কাঠামোখানা রয়ে যায় দোচালার তলে।
মাংসের প্রতিমাগুলি কিছু দিন পায় পূজা ভোগ
তাহারে আশ্রয় করে বহু কীট, শোক জরা রোগ,
মিশে শেষে মৃত্তিকায়, ভস্ম হয় অথবা পাবকে,
দুই দিন স্মৃতি থাকে প্রিয়জন-চিত্তের ফলকে।

দারু নয়, শিলা নয়, তবু এই মাংস-প্রতিমায়
দেবতা আশ্রয় লয় যুগে যুগে ভুল নাহি তায়।
পদচিহ্ন রেখে গেছে যারা মহামানব-জীবনে,
যাহাদের করস্পর্শ—বর হয়ে রাজিছে ভুবনে,
অশ্রুজলে করে গেছে প্রতি জলধারারে জাহ্নবী।
নিশ্বাসে করিয়া গেছে এ বিশ্বের পবনে সুরভি।
আত্মার কল্যাণ ধর্ম্মে, জ্ঞান কর্ম্মে, শত অবদানে,
আপন দেবত্বটুকু রেখে গেছে শিল্পে কাব্যে গানে।
বৈশ্বানরে দেহ দগ্ধ, বিশ্বময় চিত্তে পেল ঠাঁই
তাহারা অমর আর, তাই স্বর্গ, স্বর্গান্তর নাই।
লক্ষ লক্ষ ডুবে যারা বিস্মৃতির গভীর অতলে,
তারাই সত্যই মরে, তারা সবে নরকেই চলে।

সূর্য্য

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস

আমাদের সূর্য্য অতি সাধারণ এক তারা, অপেক্ষাকৃত কাছে থাকায় এত বড় দেখায়; আকাশের অন্যান্য অনেক তারকাই এক-একটি মহাসূর্য্য, বহু দূরে অবস্থিত বলিয়া এত ছোট মনে হয়। সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো—এই নবগ্রহ নিরন্তর মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্যের প্রবল আকর্ষণশক্তি গ্রহগণকে নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে চলিতে বাধ্য করিয়াছে। সূর্য্য হইতেই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণের জন্ম। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন, কোনক্রমে সূর্য্যেরই একাংশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে নবগ্রহের সৃষ্টি হয়। সকল গ্রহই সূর্য্যের আলোকে আলোকিত এবং সূর্য্যের তাপে উত্তপ্ত। চন্দ্রের জ্যোৎস্না প্রতিফলিত সূর্য্যালোক ভিন্ন আর কিছুই নয়।

প্রাচীনকালে অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করিত—পৃথিবী স্থির, সূর্য্য ও গ্রহগণ ইহার চতুর্দ্দিকে বিচরণ করে। পোলাণ্ডের অমর জ্যোতির্বিদ নিকোলাস কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) সর্ব্বপ্রথম এই ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় প্রচার করেন, সূর্য্য মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং পৃথিবী ও অন্যান্য সব গ্রহ ইহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তবে বোধ হয়, কোপারনিকাসের পূর্ব্বে প্রাচীন কালের কোন কোন জ্যোতিষীর মনে সূর্য্য স্থির, পৃথিবী সচল—এরূপ একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল, কারণ খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে গ্রীক পণ্ডিত এরিষ্টারকাস বিশ্বাস করিতেন, পৃথিবী প্রত্যহ আপনার চারিদিকে একবার আবর্ত্তিত হয় এবং বৎসরান্তে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। পাইথাগোরাসের অনুরূপ ধারণা ছিল। ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মনীষী আর্য্যভট্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, পৃথিবীর নিজের চতুর্দ্দিকে একটি দৈনিক গতি আছে এবং সূর্য্যের চারিদিকে ইহার আর এক প্রকার বাৎসরিক গতিও বিদ্যমান। পণ্ডিত পৃথুদক দশম শতাব্দীতে আর্য্যভট্টের এই ভূভ্রমণবাদ পুনরায় সমর্থন করেন।

সূর্য্য হইতে আলোক ও উত্তাপ আসে এবং তাহার ফলেই জীবনধারণ সম্ভবপর হয়। সেইজন্য স্বভাবতঃই প্রাচীন কালের লোকেরা প্রথম হইতেই নীল আকাশের এই মহা জ্যোতির্ম্ময় বস্তুটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহারা দেবতা-জ্ঞানে সূর্য্যের পূজা করিত। সূর্য্যোপাসনা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ছিল। বিশেষ করিয়া কৃষিজীবী লোকেরা সূর্য্যপূজা করিত। মিশরে রা নামে, পারস্যে মিত্রাস নামে, গ্রীসে এপোলোরূপে এবং ভারতে বিভিন্ন নামে সূর্য্যদেবের পূজা হইত। জাপান ও মধ্য আমেরিকায় যে এককালে সূর্য্যপূজার প্রচলন ছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

ঋগ্বেদে সূর্য্যের স্তবস্তুতি ও বন্দনাসূচক বহু শ্লোক দেখা যায়। কোনার্কের সূর্য্যমন্দির পূর্ব্ব যুগের সৌরভক্তির নিদর্শন। ভারতীয় ঋষিগণ উচ্ছ্বসিত হইয়া সূর্য্যের অনেকগুলি নামকরণ করিয়া গিয়াছেন, যথা—রবি, ভানু, দিবাকর, প্রভাকর, অহস্কর, ভাস্কর, সবিতা, দিনমণি, অংশুমালী, মার্ত্তণ্ড, মিহির, আদিত্য, অর্ক, বিভাবসু, তপন, অরুণ, মহাদ্যুতি, বিকর্ত্তন, বিবস্বান, তমোহর, মরীচিমালী, গ্রহপতি, কিরণমালী ইত্যাদি।

উপনিষদে সূর্য্যের প্রশস্তিব্যঞ্জক এইরূপ শ্লোক আছে—

> বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং
> পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্।
> সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্ত্তমানঃ
> প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্য্যঃ।

বিশ্বরূপ, রশ্মিমান, জাতপ্রজ্ঞ, অখিল প্রাণাশ্রয়, নিখিলের চক্ষুস্বরূপ, অদ্বিতীয় তাপক্রিয়াকারী সূর্য্যকে (জ্ঞানীরা জানেন)। অনন্ত কিরণশালী (প্রাণিভেদে) শতধা বিদ্যমান, প্রাণিবর্গের প্রাণস্বরূপ এই সূর্য্য উদয় হইতেছেন (স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত অথর্ব্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষৎ)। অন্য স্থলে আবার বলা হইয়াছে—আদিত্যো হ বৈ প্রাণো—সূর্য্যই প্রাণ (প্রশ্নোপনিষৎ)।*

সুদূর অতীতের মানুষের স্বাভাবিক সূর্য্যভক্তিকে সম্পূর্ণ রূপে কুসংস্কার বলা চলে না, ইহার কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পাওয়া যায়; আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত, সূর্য্য আমাদের সমস্ত শক্তির মূল :

"Almost every kind of activity here on the earth can be traced back to the energy that comes to us in the sun's radiation. Power derived from the waterfall, from the wind, and from fuel and food has its origin in the great power plant of the sun."—*Astronomy* by Prof. Robert Baker, Ph.D.

বায়ুপ্রবাহের কারণ সূর্য্যের উত্তাপ। প্রখর সূর্য্যকিরণে

---

* মহাভারতে বনপর্ব্বে আছে—পুরোহিত ধৌম্য যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, সূর্য্যই সর্ব্বভূতের পিতা, প্রাণীদের প্রাণধারণের নিমিত্ত অন্নস্বরূপ।

বায়ু উত্তপ্ত হইয়া উপরে উঠিতে থাকে এবং অন্য দিক হইতে শীতল বায়ু আসিয়া সেই স্থান পূর্ণ করে। এই রূপে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। মেঘবৃষ্টিরও হেতু সূর্য্য-রশ্মি। সূর্য্যতাপে সমুদ্রের জল বাষ্প হইয়া উপরে গিয়া মেঘে পরিণত হয়, তাহাই আবার বৃষ্টিরূপে নীচে ফিরিয়া আসে।

গাছ সূর্য্যকিরণের সাহায্যেই দেহ-গঠন (photo synthesis) করে। গাছের পাতার সবুজ কণা বা chlorophyll সূর্য্যালোকের সহায়তায় বায়ুমধ্যস্থ কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস হইতে কার্বন বা অঙ্গারটুকু আত্মসাৎ করিয়া অক্সিজেন পরিত্যাগ করে। এই কাজ অন্ধকারে সম্ভব নয়, ইহা কেবল দিবালোকে সাধিত হয়। এইরূপে সংগৃহীত অঙ্গার এবং শিকড়ের দ্বারা আনীত জল ও খনিজ লবণ সহযোগে গাছ দিনের আলোতে দেহের পুষ্টি-সাধন করে এবং উদ্বৃত্ত অংশ খাদ্যরূপে সঞ্চয় করিয়া রাখে। মানুষ ও জীবজন্তু গাছের সযত্নে সঞ্চিত এই খাদ্যবস্তু আহার করিয়া জীবনীশক্তি লাভ করে। পৃথিবীর সমস্ত জীবের প্রাণশক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সূর্য্যকিরণের উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদের জীবনীশক্তিকে রূপান্তরিত সূর্য্যশক্তি বলা যাইতে পারে:

"The whole of life upon earth depends entirely upon Solar energy. The sun's energy is the physical source of all life."—*Science of Life* by Wells & Huxley.

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, সূর্য্য হইতেই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের উৎপত্তি। উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর শরীর কতিপয় পার্থিব পদার্থেরই রাসায়নিক সংযোগে গঠিত; সেই হিসাবে জীবদেহ সূর্য্যেরই এক ক্ষুদ্র অংশ মনে করা যাইতে পারে।

কয়লা পোড়াইলে যে তাপ উৎপন্ন হয়, তাহাই যান্ত্রিক শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া কলকারখানা চালায়। তেল বা কয়লা জ্বালিলে যে উত্তাপ হয় উহাও প্রকারান্তরে সূর্য্যশক্তি। যে সব গাছ বহু যুগ পূর্ব্বে সূর্য্যালোকের সাহায্যে কাষ্ঠময় দেহ গঠন করিয়াছিল তাহাই বহু বৎসর-কাল মাটির নীচে থাকিয়া চাপ ও তাপের প্রভাবে কয়লায় পরিণত হইয়াছে। খনিজ তৈলসৃষ্টির আদি কারণও পরোক্ষ ভাবে সূর্য্য। সুতরাং কলকারখানা যে সূর্য্যের বলেই চালিত হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সূর্য্য একটি জ্বলন্ত গ্যাসের গোলক। অত্যুষ্ণ বায়বীয় পদার্থে গঠিত বলিয়া ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব খুব কম—মাত্র ১'৪। সূর্য্যের যে উজ্জ্বল ভাগ সচরাচর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, উহাকে আলোকমণ্ডল (photo sphere) বলে। এই আলোকমণ্ডলেই কৃষ্ণবর্ণের সূর্য্য-কলঙ্ক এবং প্রদীপ্ত ক্যালসিয়ামের অত্যুজ্জ্বল দাগ (flocculi) দেখিতে পাওয়া যায়। আলোকমণ্ডলকে ঘিরিয়া লাল রঙের এক আবরণ আছে, ইহার নাম বর্ণমণ্ডল (chromo-sphere)। পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের সময় এই বর্ণমণ্ডল পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হয়। সেই সময় ঐ স্থান হইতে সুদীর্ঘ রক্তবর্ণের অগ্নিশিখা বহু উচ্চে উঠিতে দেখা যায়। বর্ণমণ্ডলের চারি দিকে মকুটমণ্ডলের (corona) আর এক বেষ্টনী আছে। মকুটমণ্ডলের রজতশুভ্র ছটা পূর্ণগ্রাসের সময়ই সুস্পষ্ট নয়ন-গোচর হয়।

বহুদিন পর্য্যন্ত সূর্য্যের প্রচণ্ড আলোক ও উত্তাপ উৎ-পত্তির কারণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের কোন সঠিক ধারণা ছিল না। এখন জানা গিয়াছে, সূর্য্যের অভ্যন্তরে রেডি-য়ামের মত পদার্থের পরমাণু চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার ফলে তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয়।

চাঁদের কলঙ্কের মত সূর্য্যেও কলঙ্ক আছে। বিজ্ঞানী গ্যালিলিও তাঁহার নির্ম্মিত দূরবীণের দ্বারা ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে সৌর-কলঙ্ক দেখিতে পান। সূর্য্যকলঙ্ক-তপ্ত বাষ্পের ঘূর্ণি সূর্য্যাভ্যন্তরের জ্বলন্ত বাষ্পরাশি আলোকমণ্ডলের স্থানে স্থানে ভেদ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে উপরে উঠিয়া আসে এবং উপরকার উষ্ণ বাষ্প এই আবর্ত্তে নীচে নামিয়া যায়। উপরে আসিয়া হঠাৎ স্ফীত হওয়ার ফলে এই তপ্ত বাষ্প-রাশি শীতল হইয়া কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে, পারিপার্শ্বিক উজ্জ্বল স্থানের তুলনায় তখন উহাকে অপেক্ষাকৃত অন্ধকার ও কৃষ্ণবর্ণের দেখায়। দূরবীণ দিয়া দেখিলে কলঙ্কগুলি সূর্য্যের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছে এরূপ দৃষ্ট হয়। কলঙ্কের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহাই স্থির হইয়াছে যে, পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্যও স্বীয় অক্ষের চারিদিকে আবর্ত্তিত হয়। তবে বায়বীয় বস্তুতে গঠিত বলিয়া সূর্য্যের আবর্ত্তন-কাল সকল স্থানে সমান নয়। উহার মধ্যবর্ত্তী স্থান ২৫ দিনে একবার ঘুরপাক খায়; কিন্তু উহার মেরুপ্রদেশ আবর্ত্তিত হইতে প্রায় ৩৪ দিন সময় লাগে। এই সকল কলঙ্ক কয়েক সপ্তাহ হইতে কয়েক মাস পর্য্যন্ত সূর্য্যগাত্রে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া যায়। সূর্য্যকলঙ্ক সকল সময় সমান থাকে না। এগার বৎসর অন্তর ইহারা আকারে ও সংখ্যায় খুব বাড়িয়া যায়, তাহার পর ক্রমশঃ কমিতে আরম্ভ করে। জার্মান জ্যোতির্ব্বিদ শোয়াব ২০ বছর সৌরকলঙ্ক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ১৮৪৩ সনে এই ব্যাপার আবিষ্কার করেন।

যখন কলঙ্কের সংখ্যাধিক্য ঘটে, সেই সময় পৃথিবীর

উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর রঙীন আলোকদীপ্তি (Aurora Lights) বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং কম্পাস-যন্ত্রেও চাঞ্চল্য দেখা যায়। আসল কথা, সূর্য্যকলঙ্ক অসংখ্য বিদ্যুৎকণার উৎস। কলঙ্কবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অগণিত নেগেটিভ বিদ্যুৎ-কণা আসিয়া পৃথিবীতে ধাক্কা মারে। ইহার ফলে রেডিও, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা সাময়িক ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং কম্পাস-কাঁটাও বিশেষ বিচলিত হয়। এই সকল বিদ্যুৎকণাই পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে জড় হইয়া সেখানকার হাল্‌কা বায়ুরাশিতে রঙীন আলোক সৃষ্টি করে। এরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডগলাস্ দেখাইয়াছেন, সৌরকলঙ্কের এগার বৎসরকালীন হ্রাসবৃদ্ধির সহিত গাছের গুঁড়ির বাৎসরিক চক্রবৃদ্ধির আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বর্ত্তমান। গাছের বার্ষিক চক্রও এগার বৎসর অন্তর বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহাতে অনেকে মনে করেন সৌরকলঙ্কের সহিত পৃথিবীর আবহাওয়ার নিকট সম্বন্ধ আছে।

সূর্য্য সম্পর্কে এখন কতকগুলি বিরাট বিরাট সংখ্যা পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিব। সূর্য্যের আয়তন পৃথিবী অপেক্ষা ১৩০০০০০ গুণ বড়। সূর্য্যের ব্যাস প্রা ৮৬৪০০০ মাইল। পৃথিবী সূর্য্য হইতে গড়ে ৯৩০০০০০০ মাইল দূরে অবস্থান করে। যদি একখানি মেল ট্রেন পৃথিবী হইতে ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে সূর্য্যাভিমুখে যাত্রা করে, তাহা হইলে গন্তব্যস্থলে পৌছিতে উহার ১৭৫ বৎসর সময় লাগিবে। পৃথিবীতে সূর্য্যের আলো পৌছিতেই আট মিনিট সময় লাগিয়া যায়, যদিও আলোকের গতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। জ্যোতির্ব্বিদগণ সূর্য্যের ওজন কত তাহাও হিসাব করিয়া বাহির করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ২-এর পিছনে ২৭টি শূন্য বসাইলে যত বড় সংখ্যা হয়, সূর্য্যের ওজন তত টন। এক টন প্রায় ২৭ মণের সমান। সূর্য্যের বাহ্য উত্তাপ ১২০০০° ডিগ্রী ফারেন-হাইট। সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর আকর্ষণ অপেক্ষা ২৮ গুণ বেশী, অর্থাৎ এখানকার পৌনে দু' মণ ভারী মানুষকে সূর্য্যে লইয়া গেলে তখন উহার ওজন দাঁড়াইবে ৫৪ মণের কাছাকাছি।

আকাশের সমুদয় নক্ষত্রকে আপাতদৃষ্টিতে চিরস্থির মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন তারকাই নিশ্চল নয়, প্রত্যেকের পৃথক গতি আছে। সহস্র সহস্র বৎসর পরে উহাদের স্থানচ্যুতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এডমণ্ড হ্যালী ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখেন—খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমি যে নক্ষত্র-মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া-ছিলেন—লুব্ধক, আর্দ্রা, রোহিণী ও স্বাতী, এই কয়টি তারকা সেই নির্দ্দিষ্ট জায়গা হইতে পূর্ণচন্দ্রের ব্যাস পরিমিত স্থান সরিয়া আসিয়াছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে আমাদের সূর্য্যও অন্যান্য নক্ষত্রের মত গতিশীল। বৈজ্ঞানিকেরা সূক্ষ্ম গণনার দ্বারা স্থির করিয়াছেন, সূর্য্য তাহার গ্রহ পরিবারবর্গসহ মহাবেগে আকাশের হারকিউ-লিস নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে সেকেণ্ডে ১২ মাইল গতিতে ধাবিত হইতেছে।

চাঁদ চলিতে চলিতে কখনও কখনও সূর্য্য ও পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে আসিয়া পড়ে; চাঁদ যখন এইরূপে সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে তখন আমরা সূর্য্যগ্রহণ দেখি। সূর্য্যগ্রহণের সময় পৃথিবীর উপর চন্দ্রের ছায়া পড়ে। প্রথমে সূর্য্যের পশ্চিম প্রান্তে সামান্য একটু খাঁজ দেখা দেয়, তাহার পর চাঁদ ক্রমশঃ সমস্ত সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে। এই সময় চতুর্দ্দিক অস্বাভাবিক পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে। পূর্ণগ্রাসের সময় আকাশ এ রকম অন্ধকার হইয়া আসে যে, সময় সময় কোন কোন উজ্জ্বল গ্রহনক্ষত্র আত্মপ্রকাশ করে। তাপ-রশ্মি অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে বাতাস বেশ ঠাণ্ডা বোধ হয়, এমন কি কখনও কখনও শিশিরবিন্দু উৎপন্ন হয়। দুর্য্যোগের আশঙ্কায় প্রাণীবর্গ বিভ্রান্ত হইয়া বিচরণ করে, পাখীরা নীড়ে প্রত্যাবর্ত্তনে আগ্রহান্বিত হয়। কোন কোন ফুলের পাপড়ি আপনা হইতেই বুজিয়া যায়। এই সময় সূর্য্যের রক্তাভ বর্ণমণ্ডল ও শুভ্র মকুটমণ্ডল সুস্পষ্ট পরিদৃষ্ট হয়। পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ সচরাচর আট মিনিটের বেশী স্থায়ী হয় না। ইহার পর চাঁদ ধীরে ধীরে সূর্য্যের সম্মুখ হইতে সরিয়া যায় এবং তৎকালীন গ্রহণেরও সেই সঙ্গে অপসারিত হয়।

খ্রীষ্টের জন্মের বহু শত বৎসর পূর্ব্বেই বেবিলনবাসী ক্যালডিয়ান জ্যোতির্ব্বিদগণ চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণের পুনরাবির্ভাব সম্পর্কে এক আশ্চর্য্য নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বহু পর্য্যবেক্ষণের পর তাঁহারা দেখেন চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ আঠার বৎসর এগার দিন অন্তর ঠিক পর পর ফিরিয়া আসে। তাঁহারা এই পুনরাবির্ভাব-কালকে Saros বলিতেন।

সূর্য্যালোক যে অবিমিশ্র নয়, উহা যে সপ্তবর্ণের সমষ্টি মাত্র তাহা সপ্তদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানবীর নিউটন প্রথম প্রকাশ করেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখান সূর্য্যের আলো কোন তিন কোণা কাচের ভিতর দিয়া আসিলে উহা সাত রঙে ভাগ হইয়া যায়। এই সাতটি রঙ যথাক্রমে—বেগুনী, গাঢ় নীল, নীল, সবুজ, হলদে, কমলা ও লাল। পরে জানা গিয়াছে, এই বর্ণচ্ছত্রের (spectrum) বেগুনী বর্ণের পরেও অদৃশ্য অতি-বেগুনী রশ্মি (ultra-violet rays) বর্ত্তমান। ইহার অস্তিত্ব কেবল ফোটোগ্রাফির কাচে ধরা পড়ে। অতি-বেগুনী রশ্মির রাসায়নিক ক্রিয়া খুব প্রখর। রক্তবর্ণের অগ্রে অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া

সেইরূপ আমাদের চক্ষুর অগোচর তাপোৎপাদক লোহিত-পূর্ব্ব রশ্মি (infra-red rays) বিদ্যমান।

একখানি উন্নতোদর পরকলার (convex lens) দ্বারা সূর্য্যালোক কেন্দ্রীভূত করিলে সেই সঙ্গে আলোক-মধ্যস্থ লোহিত-পূর্ব্ব তাপরশ্মিও কেন্দ্রীভূত হয় এবং তখন এই কেন্দ্রে কাগজ প্রভৃতি দাহ্যবস্তু ধরিলে তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠে। এই ব্যাপার অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

প্রাকৃতিক কারণেও সূর্য্যের আলোককে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাত রঙে বিশ্লিষ্ট হইতে দেখা যায়। সূর্য্যের আলোক-ধারা জলবিন্দুর ভিতর দিয়া যাইবার কালে সপ্তবর্ণে বিভক্ত হইয়া আকাশে বিচিত্র রামধনু বা ইন্দ্রধনু উৎপন্ন করে। কখনও কখনও পার্ব্বত্য নির্ঝরের উৎক্ষিপ্ত জলকণায় ঐরূপ বর্ণবৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। তেলের পাতলা স্তরে আলোকরশ্মি পড়িলে উহা কিরূপ রঙীন পর্দ্দার সৃষ্টি করে তাহাও অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন।

সূর্য্য হইতে যে কিরণ ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় তাহার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (wave length) নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সূর্য্যালোকের তরঙ্গ সাধারণতঃ '০০০০২ সেণ্টিমিটার হইতে প্রায় '০০১২৮ সেণ্টিমিটার পর্য্যন্ত লম্বা হয়। এই বিপুলাংশের যে ক্ষুদ্র ভাগ দৃশ্যমান আলোক, তাহার তরঙ্গ মাত্র '০০০০৪ সেণ্টি-মিটার হইতে '০০০০৮ সেণ্টিমিটার পর্য্যন্ত দীর্ঘ। সূর্য্যালোকের প্রখর দীপ্তি দীপশক্তির (candle power) হিসাবে নির্ণীত হইয়াছে। সার্ জেম্স জিনসের মতে ৩২৩-এর পাশে ২৫টি শূন্য বসাইলে যত বড় সংখ্যা হয়, সূর্য্যের আলো প্রায় তত দীপশক্তিবিশিষ্ট। শুনিতে অদ্ভুত ঠেকিলেও সূর্য্যালোকের যৎসামান্য ওজন আছে। জিন্স ইহারও এক হিসাব দিয়াছেন—প্রতি মিনিটে এক বর্গমাইল পরিমাণ স্থানে যে সূর্য্যালোক পতিত হয়, তাহার ওজন এক আউন্সের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। এজন্য ধূমকেতুর ধূম্রময় পুচ্ছ সূর্য্যালোকের চাপে পড়িয়া সর্ব্বদা বিপরীত দিকে অবস্থান করে।

সূর্য্যকিরণের জীবাণুনাশের ক্ষমতা আছে, প্রখর রৌদ্রে অধিকাংশ রোগের জীবাণু কিছুক্ষণের মধ্যে বিনষ্ট হয়। সূর্য্যালোকের অতি-বেগুনী রশ্মি প্রধানতঃ ব্যাধিবীজাণুর ধ্বংসসাধন করে। এজন্য বাসগৃহে যাহাতে অবাধে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। সূর্য্যের আলো অনাবৃত গাত্রে পতিত হইলে উহা চর্ম্মমধ্যস্থ ergosterol নামক পদার্থকে ভিটামিন 'D'তে পরিণত করে। ইহাও অদৃশ্য অতি-বেগুনী রশ্মির ক্রিয়া। 'ডি' ভিটামিনের সাহায্যেই শরীরে ক্যাল-সিয়ম বা চূর্ণজাতীয় বস্তু গৃহীত হয়। ভিটামিন 'ডি'র অভাব ঘটিলে রিকেট্স নামক অস্থিরোগ দেখা দেয়। এই রোগে হাড় বাঁকিয়া যায়। এইজন্য রিকেট্স রোগীর পক্ষে সূর্য্যালোকে অবস্থান বিশেষ উপকারী। ইহা ছাড়া সূর্য্যকিরণের সাহায্যে অনেক দুঃসাধ্য ব্যাধি নিরাময় হয়। সুইজারল্যাণ্ডের ডাক্তার রোলিয়ার গত অর্দ্ধশতাব্দী কাল বহু কঠিন রোগের চিকিৎসায় স্বাভাবিক সূর্য্যরশ্মি ব্যবহার করিয়া আশ্চর্য্য সুফল পাইয়াছেন। তাঁহার মতে অস্থি ও গ্রন্থির ক্ষয়রোগ, বাত, বেদনা, ঘা, চর্ম্মক্ষত, প্রভৃতি কতিপয় দুরারোগ্য ব্যাধি শুধু নিয়মিত ভাবে পরিমাণমত রৌদ্র-সেবনে নিরাময় হইতে পারে। তবে সূর্য্যস্নানের সময় ও পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময় সূর্য্যস্নান করিলে দেহের রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতা রীতিমত বর্দ্ধিত হয়। সূর্য্যালোকের বিলক্ষণ উত্তেজক (tonic) ক্রিয়া আছে। এজন্য অন্ধকার মেঘলা দিনে শরীর অস্বাচ্ছন্দ্যময় ও গ্লানিযুক্ত মনে হয়। সূর্য্যকরোজ্জ্বল পরিষ্কার দিনে সকলেরই দেহমন উৎফুল্ল বোধ হয়।

সূর্য্য অশেষ গুণসম্পন্ন হইলে নিদাঘকালীন প্রচণ্ড রৌদ্র অনেক সময় ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। গ্রীষ্মকালে অধিকক্ষণ সূর্য্যের উত্তাপ লাগিলে সর্দ্দিগরমি হইতে পারে। অন্য সময় বেশীক্ষণ প্রখর রৌদ্রে থাকিলে কখনও কখনও এক রকম তাপজ্বর হয়। বলা বাহুল্য, এই উভয় রোগের প্রতিকার ছায়াশীতল স্থানে অবস্থান, শীতল জল পান এবং শীতল বায়ু সেবন। সূর্য্যের দিকে কখনও খালি চোখে বেশীক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা উচিত নয়, কারণ ঐরূপ করিলে অনেক সময় স্থায়ীভাবে অক্ষিপর্দ্দা অনুভূতিশূন্য এবং নেত্রমণি অস্বচ্ছ হইয়া যায়; ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দৃষ্টিশক্তি হ্রাস ও অন্ধত্ব। তীব্র সূর্য্যালোক হইতে চক্ষুকে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া চলাই বিধেয়, গ্রহণের সময়েও সূর্য্যকে ধূম্রকাচের ভিতর দিয়া দেখা উচিত।

সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটা সকলকেই মুগ্ধ করে। প্রকৃতির এই অপরূপ বর্ণশোভার কারণও সূর্য্যালোকের স্বাভাবিক বিভাগ। সকাল সন্ধ্যায় সূর্য্য-কিরণ তির্য্যগ্ভাবে ধরাপৃষ্ঠে পতিত হয়। তাহার ফলে ক্ষীণ নীল আলোকরশ্মি অসংখ্য ধূলিকণা ও জলবাষ্পপূর্ণ বিপুল বায়ুস্তর ভেদ করিয়া আর পৃথিবীতে পৌঁছিতে পারে না—তৎপূর্ব্বেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়, কেবল গাঢ় কমলা ও লাল আলো অক্লেশে বায়ুস্তর বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া আসে, সেইজন্য আমরা এ সময় আকাশকে কমলাভ বা রক্তাভ দেখি।

বাংলাদেশের মন্দির

শ্রীবিমলকুমার দত্ত, এম-এ

ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্যের ইতিহাসে বাংলার দান অবিসম্বাদিত। যুগে যুগে বাংলার স্থাপত্যশিল্প নানা রূপ পরিগ্রহ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; এই প্রকাশের মধ্যে ভারতীয় স্থাপত্যরীতির প্রভাব এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দুই-ই পরিলক্ষিত হয়।

বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান (৫ম খ্রীষ্টাব্দ) ও হিউ-এন-সাঙের (৭ম খ্রীষ্টাব্দ) ভ্রমণ-কাহিনী, গুপ্তযুগের তাম্রলিপিসমূহ এবং তদানীন্তন গ্রন্থাদি হইতে জানা যায় যে, প্রাচীন কালে সারা বাংলাদেশে প্রস্তর ও ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দিরের প্রাচুর্য্য ছিল। বর্ত্তমানে অবশ্য দশম ও একাদশ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত কয়েকটি মন্দির ছাড়া বিশেষ কোন প্রাচীন স্থাপত্য-নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক অবস্থাবিপর্য্যয় ও বিধর্ম্মীদের গোঁড়ামির ফলেই অধিকাংশ প্রাচীন নিদর্শন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন মন্দিরাদি নির্ম্মাণের প্রধান উপাদান ছিল কাঠ ও বাঁশ। ইহার পর ইষ্টক ও প্রস্তর ব্যবহারের প্রচলন হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশই সমতলভূমি, সেই কারণে এদেশে প্রস্তর দ্বারা মন্দির নির্ম্মাণ দুঃসাধ্য ব্যাপার। যে কয়টি প্রস্তর-মন্দির দৃষ্ট হয় তাহাদের অধিকাংশ বাংলা-বিহারের প্রান্তসীমায় অবস্থিত রাজমহল পাহাড়ের প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। দূরবর্ত্তী অঞ্চল হইতে ঐ সকল গুরুভার দ্রব্যাদি আনয়ন করা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ ও আয়াসসাধ্য ছিল, সেই কারণেই বাংলাদেশে ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দিরের এত আধিক্য। প্রস্তর-মন্দির সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প এবং তাহাদের অধিকাংশই এই প্রদেশের পশ্চিম ভাগে—বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় অবস্থিত। একই মন্দিরে যুক্তভাবে ইষ্টক ও প্রস্তর এবং ইষ্টক ও কাষ্ঠ ব্যবহারের প্রচলন ছিল।

প্রাক্-মুসলমান যুগ হইতে সমান্তরাল ভাবে শায়িত বা পাড়া-খিলান (Corbelled arch) ও ঋজুভাবে দণ্ডায়মান বা খাড়া-খিলান (Radiating arch) উভয়ই বাংলার স্থাপত্যে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু তন্মধ্যে প্রথমটির প্রচলন ছিল অধিক। অনেকের ধারণা যে, ঋজুভাবে দণ্ডায়মান বা খাড়া-খিলান মুসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। গুপ্তযুগের স্থাপত্যের নিদর্শন পাহাড়পুরে এবং ২৪-পরগণার অন্তর্গত সুন্দরবন অঞ্চলে বিদ্যমান—বোনশ্যামনগর মন্দিরে উক্তরূপ খিলান পাওয়া গিয়াছে। শেষোক্ত খিলানটি জয়নগর-মজিলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয় সর্ব্বপ্রথম সুধীসমাজের

একক মন্দির
পালপাড়া, চাকদহ

গোচরে আনেন। এই প্রসঙ্গে ভিনসেণ্ট স্মিথের নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র প্রণিধানযোগ্য:

"The Bengali builders being brick-layers rather than stone masons had learnt to use the radiating arch, whenever it was useful for Constructive purpose löng before the Muhamedans came here."

সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতের সর্ব্বত্র দুই দিকে ঢালু চালাবিশিষ্ট কুঁড়েঘর নির্ম্মাণের রেওয়াজ চলিয়া আসিতেছে। এগুলির উপকরণাদি অস্থায়ী। সেজন্য এই কুটীরসমূহ অতি শীঘ্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পঞ্জাবের ওডুমবারা মুদ্রায় এবং মধ্যপ্রদেশের সোহাগুরা তাম্রলিপিতে অঙ্কিত চিত্র হইতে বুঝা যায় যে, প্রথম ও দ্বিতীয় খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে উক্ত

স্থানগুলিতে অনুরূপ কুঁড়েঘর নির্ম্মিত হইত। বংশনির্ম্মিত ঐরূপ ঘরের নিদর্শন আমরা সাঁচী ও ভারহুত স্তূপের গাত্রে

দ্বিতল মন্দির
কাঁচড়াপাড়া

খোদিত দেখিতে পাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ মহাভগ্‌গ ও চুল্লভগ্‌গ (২য় খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের) হইতে সেই যুগের স্থাপত্য-রীতির বিষয় জানিতে পারা যায়। উহাদের মধ্যে একটির নাম অর্দ্ধযোগ। ডাঃ আচার্য্য উক্ত অর্দ্ধযোগ নামক স্থাপত্য-নিদর্শনকে বাংলার কুঁড়েঘর বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন, কিন্তু এই মন্তব্য কত দূর যুক্তিসহ তাহা বিচারসাপেক্ষ।

সুতরাং দেখা যায় যে, উপরোক্ত আকারের গৃহাদি নির্ম্মাণ-পদ্ধতি অতি প্রাচীন। অন্যান্য প্রদেশের স্থপতিগণ ক্রমে ক্রমে গৃহনির্ম্মাণের স্থায়ী উপকরণ—যথা প্রস্তরাদি ও বিভিন্ন গঠন-কৌশলের আবিষ্কার করেন। বাঙালী স্থপতিগণও এ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু স্থানীয় আর্দ্র জলবায়ুর জন্য ইহা সম্ভবপর হয় নাই। তাঁহারা প্রাচীন পদ্ধতি বজায় রাখিতে বাধ্য হন, কারণ দুই দিক ঢালু চালাঘরই এদেশের বর্ষার পক্ষে উপযোগী। বর্ষার জল পড়িবামাত্রই চারি দিক দিয়া জল গড়াইয়া পড়িয়া যায়, সেজন্য ক্ষতির মাত্রা কম হয়। উপরোক্ত কারণেই এ প্রদেশের বাসগৃহ এবং ধর্ম্মমন্দির একই আকারে তৈয়ারি।

বাংলাদেশের মন্দিরগুলি সাধারণতঃ চার হইতে ছয় ফুট উচ্চ একটি ইষ্টক-মঞ্চের উপর নির্ম্মিত হয়। দক্ষিণ-বাংলায় এই মঞ্চের উচ্চতা অপেক্ষাকৃত অধিক। কারণ এই অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ অত্যন্ত বেশী, আর অধিকাংশই জলাভূমি।

বঙ্গের কুঁড়েঘরের মত আকৃতিবিশিষ্ট মন্দিরগুলিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা:—(১) একক মন্দির, (২) দ্বিতল মন্দির, (৩) জোড়বাংলা ও (৪) দ্বাদশ বা বহু মন্দির। প্রথম শ্রেণীর মন্দিরগুলি সাধারণতঃ চালাঘরের আকারে নির্ম্মিত। ইহাদের সম্মুখে পশ্চাতে অথবা চারিদিকে বারান্দা থাকে। বর্দ্ধমানের গারুই মন্দির এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু ইহা প্রস্তরনির্ম্মিত। মুর্শিদাবাদের চরবাংলা মন্দির উপরোক্ত শ্রেণীর একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। প্যালপাড়া, চাকদহের মন্দিরটিও ঐ শ্রেণীর।

একক মন্দিরগুলির উপরে অনুরূপ অথচ ক্ষুদ্রাকৃতি একটি অংশ যোগ করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্দির নির্ম্মিত হইত। কাঁচড়াপাড়ার কৃষ্ণরায়ের মন্দিরটিকে দ্বিতল মন্দির বলা যায়।

বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন হিসাবে বাংলাদেশের গৌরবের বস্তু। প্রথম শ্রেণীর মন্দির দুইটি যুক্ত করিলে যে আকার হয় তাহাই জোড়বাংলা নামে আখ্যাত।

চতুর্থ শ্রেণীর মন্দিরগুলির কোন অভিনবত্ব নাই; ইহারা প্রথম শ্রেণীরই অনুরূপ, তবে সংখ্যা বাড়ানো হয়।

বাংলার কুঁড়েঘরের আকৃতিবিশিষ্ট মন্দিরের অনুরূপ মন্দির উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজে দেখিতে পাওয়া যায়। মহাবল্লীপুরমের (মাদ্রাজ) দ্রৌপদীরথ মন্দিরের আকৃতি কুঁড়েঘরের ন্যায়। বর্দ্ধমানাধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্র তাঁহার মাতার পুরীভ্রমণের স্মারকচিহ্ন হিসাবে মার্কণ্ড-ঘাটের দক্ষিণে অনুরূপ একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের হরিপুরস্থিত রসিকরাজের মন্দিরও উপরোক্ত ধাঁচের। মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জেলার বিলহারী নামক স্থানে বাংলার পঞ্চরত্ন মন্দিরের ন্যায় একটি মন্দির বিদ্যমান। প্রাচীনকালে এই বিলহারী চেদী রাজাদের রাজধানী ছিল। পরবর্ত্তী মোগল স্থাপত্যকেও বাংলার পদ্ধতি বিশেষ প্রভাবিত করিয়াছিল।

বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে বাংলার এই নিজস্ব স্থাপত্যরীতি অনুসৃত হয় না, বরং ইহার পরিবর্ত্তে সমতল ছাদের প্রচলন হইয়াছে। আমাদের দেশে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত বেশী হওয়ার দরুন সমতল ছাদ অত্যন্ত অনুপযোগী। সেইজন্য আমাদের নিজস্ব প্রাচীন স্থাপত্যরীতির পুনঃপ্রবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়।

গবাদি পশুর খুরুয়া বা এঁষো রোগ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পথে গরু, বলদ আমাদের অন্যতম প্রধান সহায়ক; কিন্তু আমাদের দেশে গরু, বলদের হীন অবস্থাকে একটি "জাতীয় গ্লানি" বলা যাইতে পারে। আর এ কথা বলিলেও সত্য ছাড়া মিথ্যা বলা হইবে না যে, আজ পর্য্যন্ত গো-জাতির উন্নতিবিধানে কি সরকার, কি দেশের নেতৃবৃন্দ, যেমন মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, তেমন কোন মনোযোগ দেন নাই। উন্নত জাতীয় গরুর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকার এলো-মেলো ভাবে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু ব্যয়ের তুলনায় স্থায়ী ফল বিশেষ কিছুই হয় নাই। বর্ত্তমানে 'হরিণঘাটা'র দিকে আমরা চাহিয়া আছি। ইহার ফল কি হইবে এখনও সঠিকভাবে বলা যায় না; এই পরিকল্পনা সম্বন্ধেও বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন।

খুরুয়া বা এঁষো রোগ: মারাত্মক অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর ক্ষয়

গরু, বলদের কোন উন্নতি ত হয়ই নাই; ইহাদের রোগ দমনের জন্যও তেমন কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে না। পল্লী অঞ্চলে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ গরু, বলদ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে; লক্ষ লক্ষ বলদ রোগাক্রান্ত অবস্থায় লাঙল ও গাড়ী টানিতেছে, লক্ষ লক্ষ রোগাক্রান্ত গরু দুধ দিতেছে। অথচ এই সকল রোগের মধ্যে অনেক রোগই নিবার্য্য।

গরু, বলদের একটি রোগকে ইংরেজীতে "ফুট এণ্ড মাউথ ডিজিজ" বলে। বাংলায় ইহার নাম খুরুয়া বা এঁষো রোগ। অতি সূক্ষ্ম জীবাণু বা সংক্রামক বিষ (virus) হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। এই রোগ খুবই সংক্রামক। সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ ভাবেই এই রোগের সংক্রমণ হয়। এই রোগের জীবাণু বা

খুরুয়া বা এঁষো রোগ: পায়ের খুর আল্‌গা হইয়া যায় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক পায়ের আঙুলের পিছনে দেখা যায়

বিষ লালার সাহায্যে আক্রান্ত পশু হইতে সুস্থ পশুর দেহে প্রবেশ করে। আবার অনেক সময়ে পরিচর্য্যাকারী, দূষিত খাদ্য, পানীয় জল, ভোজনপাত্র, রাস্তাঘাট, আক্রান্ত পশুর চামড়া, পশম, দুধ প্রভৃতির সাহায্যে এই রোগ বিস্তৃতি লাভ করে। প্রধানতঃ গবাদি পশু (cattle) এই রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। তবে ভেড়া, ছাগল, শূকরের মধ্যেও এই রোগ দেখা যায়। কখন কখন মানুষও এই রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়।

খুরুয়া বা এঁষো রোগ: পালানের ও বোঁটার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক ও ক্ষত হইয়া উহার উপর মামড়ি পড়িয়াছে

এই রোগের প্রধান প্রধান লক্ষণ এই : দাঁতের মাড়ি, জিহ্বা এবং পায়ের খুরের মাঝখানে ফোসকা উঠে ; এই সব ফোসকাতে জল থাকে এবং তাহা কাটিয়া ঘা হয়। রোগাক্রান্ত পশুর মুখ দিয়া লাল পড়িতে থাকে। ইহা মাঝে মাঝে জিহ্বা বাহির করে এবং চক্ চক্ শব্দ করে। ইহার জ্বরও হয়। দুগ্ধবতী গরুর পালানে ও বাঁটে ফোসকা দেখা দেয়।

ভারতবর্ষে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ পশু প্রতি বৎসর এই রোগ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। এই রোগের দ্বারা নানাদিক দিয়া যে ক্ষতি হয় তাহার পরিমাণ খুবই বেশী।

খুরুয়া বা এঁষো রোগ : দন্তমাড়ির উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক ও ক্ষত হইয়াছে। নাসিকার মধ্যেও ক্ষত দেখা যাইতেছে

রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় দেখা গিয়াছে যে, মৃত্যুর হার শতকরা একটি ; বাছুরের মৃত্যুর হার ইহা অপেক্ষা কিছু অধিক। ভারতে প্রতি বৎসর এই রোগে ৪০০০ পশু মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। এক একটি পশুর মূল্য যদি ১০০৲ টাকাও ধরা যায় তাহা হইলে বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় চার লক্ষ টাকা।

এই রোগে আক্রান্ত হইলে পশুদের কার্য্যশক্তি বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। হিসাবে দেখা যায়, ভারতরাষ্ট্রে ৪·৩ কোটি কাজের পশু (working animals) অর্থাৎ ষাঁড়, বলদ এবং পুরুষ-মহিষ আছে ; দুগ্ধবতী গরু এবং স্ত্রী মহিষের সংখ্যা হইতেছে ৪·২ কোটি, এবং ইহাদের বাছুরের সংখ্যা ৩·৮ কোটি। উপরোক্ত প্রত্যেক শ্রেণীর পশুই খুরুয়া বা এঁষো রোগে আক্রান্ত হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর আক্রান্ত পশুর সংখ্যা প্রায় এইরূপ :

ষাঁড়, বলদ, পুরুষ-মহিষ	১২৮,৫০০
দুগ্ধবতী গরু এবং স্ত্রী-মহিষ	১২৫,৫১৪
বাছুর	১১৩,৫৬০

১৯৩৭ সালে রাইট হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের উৎপন্ন শস্যাদির মোট মূল্য যদি ২,০০০ কোটি টাকা ধরা যায় তাহা হইলে গবাদি পশুর শ্রমের মূল্য তিন শত হইতে চার শত কোটি টাকা ধরিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে ইহার মূল্য হয়ত ১,০০০ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক, বর্ত্তমান ভারতরাষ্ট্রের গোসম্পদের মূল্য ৮০০ কোটি টাকা ধরিলে ভুল হইবে না। সুতরাং ৪·৩ কোটি পশুর (ষাঁড়, বলদ, পুরুষ-মহিষ) মধ্যে ১২৮,৫০০ পশু খুরুয়া রোগে আক্রান্ত হইলে এবং উহাদের কর্ম্মশক্তি তিন ভাগের এক ভাগ হ্রাস পাইলেও বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৮০ লক্ষ টাকা।

এই রোগে আক্রান্ত হইলে ষাঁড়ের প্রজননশক্তিও কমিয়া যায়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, ষাঁড় ও গরুর অনুপাত ১:৩। বার্ষিক রোগাক্রান্ত ষাঁড়ের সংখ্যা প্রায় ৪১,৮৩৮ ; প্রতি ষাঁড়ের মূল্য ৩০০৲ টাকা ধরিলে ইহাদের মোট মূল্য ১·৩ কোটি টাকা। আক্রান্ত পশুর প্রজননশক্তি কত পরিমাণ হ্রাস পায় তাহার সঠিক হিসাব নাই ; তবে অনুমান দশ ভাগের এক ভাগ কম হয়। এই হিসাবে ক্ষতির পরিমাণ ১৩ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয়তঃ, এই রোগে আক্রান্ত হইলে কতক দুগ্ধবতী গরুর গর্ভপাত হয়। আক্রান্ত গরুর মধ্যে ইহার হার শতকরা এক ধরিলেও ইহার সংখ্যা দাঁড়ায় ১,২৬০ ; আর প্রত্যেকটির মূল্য ২০০৲ টাকা ধরিলে ক্ষতির পরিমাণ ২·৫ লক্ষ

খুরুয়া বা এঁষো রোগ ; জিহ্বার নীচের দিকে ক্ষত হইয়াছে

খুরুয়া রোগ : জিহ্বার ঝিল্লির নীচে ও জিহ্বার আগায় স্ফোটক হইয়াছে

টাকা। এই সম্পর্কে ইহাও বলা যায় যে, একটি গরুর গর্ভপাত হইলে উহার মূল্য অর্দ্ধেক কমিয়া যায় ; সুতরাং এই হিসাবেও ক্ষতির পরিমাণ ১·২৫ লক্ষ টাকা। প্রজননশক্তির হ্রাস হেতু মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪·২৫ লক্ষ টাকা।

আক্রান্ত পশু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং উহার দেহের মাংসও কমিয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে গড়ে ৩·৫ লক্ষ পশু এই রোগ কর্তৃক আক্রান্ত হয় ; খুব সম্ভব আরোগ্যের পর শতকরা ১০টি পশু জবাইখানায় যায়। গড়ে এইরূপ একটি পশুর মাংস ২০ পাউণ্ড কমিয়া যায় এবং এক পাউণ্ড মাংসের মূল্য চারি আনা —এই হিসাব ধরিলে ক্ষতির পরিমাণ ১·৭৫ লক্ষ টাকা।

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, একই কালে দুগ্ধদায়িনী পশুদের মধ্যে সাড়ে তিন ভাগের এক ভাগ দুগ্ধ দেয় ; আক্রান্ত গরুর দুগ্ধের পরিমাণ খুবই হ্রাস পায় ; কেবল যে সেই সময় দুগ্ধ প্রদানের কালে (lactation period) ইহা হ্রাস পায় তাহা নহে, কোন কোন ক্ষেত্রে পরেও পরিমাণে কম হইয়া থাকে। ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংসদ (Indian Council of Agricultural Research) কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি হইতে জানা যায়, আক্রান্ত পশুর দুগ্ধের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস পায়। ভারতরাষ্ট্রে বার্ষিক দুগ্ধের উৎপাদন ৪,৬২৯·৪২ লক্ষ মণ। এই হিসাবের ভিত্তিতে আক্রান্ত পশুসমূহ ১৩·৮ লক্ষ মণ দুগ্ধ দেয় ; শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস পাইলে এবং দুগ্ধের মূল্য প্রতি সের আট আনা ধরিলে মোট ক্ষতির পরিমাণ ১·৪ কোটি টাকা।

উপরের হিসাব হইতে দেখা যাইবে, খুরুয়া বা এঁষো রোগের জন্য মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২·৪৬ কোটি টাকা। এই হিসাব সম্পূর্ণভাবে সঠিক না হইলেও ইহা হইতে মোটামুটি ভাবে বুঝা যাইবে যে, গবাদি পশুর একটি মাত্র রোগ ভারতরাষ্ট্রের কত বেশী ক্ষতির জন্য দায়ী।

খুরুয়া রোগের চিকিৎসা এইরূপ : পীড়িত পশুকে পরিষ্কার খট্‌খটে এবং ছায়াযুক্ত স্থানে রাখা দরকার। পথ্য হিসাবে ভাতের মাড় দিতে হইবে। লবণমিশ্রিত জলে রোজ ৪।৫ বার মুখ ধুইয়া দেওয়া দরকার। এক সের জলে এক ছটাক লবণ যথেষ্ট। ইহার সহিত এক কাঁচ্চা ফিট্‌কারী মিশাইলে ভাল হয়। পা ধুইবার সময়ে ইহার মাত্রা দ্বিগুণ হইবে। পায়ের চামড়ায় ঘা হইলে তুঁতের জলে উহা ভালভাবে ধুইয়া উহার উপর আলকাতরা লাগাইয়া দিলে মাছি বসিবে না ; পায়ে পোকা জন্মিবে না।

"খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি" পরিকল্পনায় গরুর রোগ দমনের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা থাকা খুবই বাঞ্ছনীয়।*

* *Indian Farming*-এ প্রকাশিত "Economic Importance of Foot and Mouth Disease" নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে।

বাঙালীর ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়

অধ্যাপক শ্রীরঞ্জিতাশ্ব মণ্ডল, এম-এ

বিখ্যাত মনীষী হাণ্টার এই মর্ম্মে লিখেছেন যে, ইংলণ্ডের প্রতি প্রদেশ, প্রতি বিভাগ, এমন কি প্রতি পল্লীর ইতিহাস পাওয়া যায়, আর সুবিশাল ভারতের অতীত কীর্ত্তি ঘোষণা করবার প্রকৃত ইতিহাস নেই। বাংলা সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র এ অভাব গভীরভাবে উপলব্ধি করে বলেছিলেন—"বাঙালীর ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙালী মানুষ হইবে না।" অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় আরও পরিষ্কারভাবে ইতিহাস-উদ্ধারের প্রশ্ন এবং এর আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দাবি তুলে বলেছেন—"রাজা, রাজ্য, রাজধানী, যুদ্ধবিগ্রহ এবং জয়পরাজয় ইহার সকল কথাই ইতিহাসের কথা। তথাপি কেবল ঐ সকল কথা লইয়াই ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না। বাঙালীর ইতিহাসের প্রধান কথা—বাঙালী জনসাধারণের কথা।"

প্রাচীন ইতিবৃত্তে "জনসাধারণ" প্রায় হারিয়ে গিয়েছে বিশেষ স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত একশ্রেণীর লোকের দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে। এ ছাড়া আমাদের সঙ্কীর্ণ মনোভাব এবং জ্ঞান-স্পৃহার অভাব তথ্য আবিষ্কারের পথকে কম কণ্টকিত করে রাখে নি। "গৌড়মালার" ভূমিকায় মৈত্রেয় মহাশয় এই বলে দুঃখ করেছেন—"এখনও আমাদিগের ব্যক্তিগত, জাতিগত বা সম্প্রদায়গত অনুরাগ বিরাগ আমাদিগকে পূর্ব্ব হইতে অনেক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের অনুকূল বা প্রতিকূল করিয়া রাখিয়াছে।" তবুও অতীতের অন্ধকার থেকে বিষয়বস্তু আহরণের অদম্য উৎসাহ, ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা ঐতিহাসিকগণকে রেহাই দেয় নি। তাই ইতিহাস লেখা হয়েছে, এখনও হচ্ছে, পরেও হবে। লুপ্ত তথ্যের সন্ধান, চর্চ্চা ও গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে "আত্মবিস্মৃত বাঙালী"র ইতিহাস তিল তিল করে রচিত হচ্ছে। মানুষের প্রয়াস এবং কর্ম্মনিষ্ঠার কাছে অজানা ও ভুলে-যাওয়া অতীত ধরা দিচ্ছে। স্যার জন মার্শাল তাঁর "মহেঞ্জো-দড়ো ও সিন্ধুসভ্যতা" পুস্তকে বলেছেন—"আর্য্য-সভ্যতার পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মেসোপোটেমিয়া ও মিশরের সভ্যতার সহিত তুলনীয়, এমন কি কোন কোন অংশে শ্রেষ্ঠ সভ্যতা পঞ্জাব ও সিন্ধুতে প্রচলিত ছিল। হরাপ্পা এবং মহেঞ্জো-দড়োর আবিষ্কারের পরে ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে।" সেরূপ পাহাড়পুরের স্তূপ ও মহাস্থানগড় (পৌণ্ড্রবর্দ্ধন) খননের ফলে বাংলার ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠা উজ্জ্বল হয়েছে। বাংলার গৌড় লেখমালা, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, ঢাকার ইতিহাস, বিক্রমপুরের ইতিহাস, তমলুকের ইতিহাস, বরেন্দ্রের কাহিনী, বাংলার ইতিহাস, বাঙালীর ইতিহাস ইত্যাদি গ্রন্থ ইহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য।

পালযুগের (৭৫০-১১৩০ খ্রীঃ) অন্তর্বর্ত্তী একটা অধ্যায় "মিলিতানন্তসামন্তচক্র" বা "কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ" (১০৭৫-১১০০ খ্রীঃ) আজও তেমন আলোচিত হয় নি। নির্ভরযোগ্য উপাদান ও মালমশলার অভাব এর আংশিক কারণ হতে পারে। কিন্তু তা বলে এ যুগের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী ঘটনাপুঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে উপর্যুক্ত তথ্যসংগ্রহ দ্বারা এ অর্দ্ধাবলুপ্ত অধ্যায় উদ্ধারের প্রয়াস কেন হবে না? সমসাময়িক তাম্রশাসন, শিলালিপি, পুথি এবং বিশেষ করে "রামচরিত" এ বিষয়ে খুব সহায়ক ও তথ্যনির্দ্দেশক। অতএব পাল রাজশক্তির প্রবাহে কৈবর্ত্তবিদ্রোহ-কৃত ছেদকে অগ্রাহ্য করা চলে না।

"পালরাজত্বকাল বাঙলাদেশের ও বাঙালীর ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের যুগ। এই সময়ে কলাবিদ্যার চর্চ্চায় বাঙালী উত্তরাপথে বরেণ্য আসন লাভ করিয়াছিল।" "পালবংশকে বাঙালী ভাল বাসিয়াছিল।" পালরাজাদের সুষ্ঠু রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আমরা অসীম তৃপ্তি ও গৌরববোধ করে থাকি। আবার তাঁদের কয়েকজনের অব্যবস্থাপ্রসূত প্রজাপীড়ন ও নিষ্ঠুরতায় আমরা মর্ম্মাহত না হয়ে পারি না। দ্বিতীয় মহীপালের রাজ্যশাসনে অযোগ্যতার প্রমাণ পাল-রাজকবি সন্ধ্যাকর নন্দী দিয়েছেন। তিনি অরাজকতার তীব্র সমালোচনা করেছেন—"রামচরিতে"র শ্লোকে (১।৩১-৩৮) রাষ্ট্রবিপ্লবের বর্ণনা আছে। মহীপাল রাজ্যভার গ্রহণ করে সন্দেহবশে নূতন মন্ত্রীবৃন্দের কুপরামর্শে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় শূরপাল ও রামপালকে কারাগারের লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন। তিনি ছিলেন "অনীতিকারম্ভরত" অর্থাৎ নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যে রত; এবং "ভূতময়ত্রাণমুক্ত" অর্থাৎ সত্য ও নীতির মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী। তাঁর আমলে সার্ব্বজনীন সুখ ও কল্যাণের অপহ্নব পরিলক্ষিত হয়েছিল। তাঁর অকর্ম্মণ্যতা ও দুর্ব্বলতা প্রজাবৃন্দকে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য করেছিল। উপরন্তু সেদিন আত্মশক্তিতে বাঙালীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস শিথিল হয় নি। পালযুগের শ্রেষ্ঠত্বের মোহ তাঁদের বুদ্ধিবিচারকে পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট ও কলুষিত করে নি। ১৩৪২ সালে যদুনাথ সরকার এইরূপ অনুরোধ করেছিলেন:—"সাড়ে আট শ' বছরের ধুলা-বালু-ঘাস-জঙ্গল খুঁড়িয়া কাটিয়া এই রাজবংশের (দিব্যাদির) কীর্ত্তিচিহ্নগুলি বাহির করিতে হইবে।...বরেন্দ্রীর নিজস্ব রাজার গৌরব প্রকাশ করা সকল বরেন্দ্রী সন্তানেরই কর্ত্তব্য। কুমার শরৎকুমার রায় এবং স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্র নিজ হাতে এই কাজ আরম্ভ

করেন। সে বৃত্তান্ত কি আমরা লোপ পাইতে দিব? সাহিত্যে দিব্য বা ভীমের স্মৃতি রক্ষা পায় নাই; কোন পণ্ডিতই সংস্কৃত কাব্য লিখিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তি বর্ণনা করেন নাই। গ্রাম্য কবিরা তাঁহাদের নামে যে সব গীত গাহিত তাহাও এই আটশ' নবশ' বৎসরে আমরা একেবারে ভুলিয়াছি। সুতরাং মাটি খুঁড়িয়া পাথুরে ইতিহাস বাহির করাই এখন আমাদের একমাত্র সম্বল।"

বর্ত্তমান রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা, রাজসাহী ও মালদহ এই ক'টি জেলা নিয়ে ছিল বরেন্দ্রভূমি। ভীমের জাঙ্গাল, কোদাল ধোওয়া, ভীমের পান্টি, ভীম সাগর, দিবর দীঘি, দিব্যক স্তম্ভ, বিরাটের রাজবাড়ীর বিপুল ধ্বংসস্তূপ আজও বিদ্যমান। অতীতের স্মৃতিবিজড়িত কীর্ত্তিমুখর এ স্থানগুলির মধ্যে ইতিহাস মুক্তির জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রতীক্ষমাণ।

এ প্রজা-বিদ্রোহের ব্যাপকতার মূলীভূত কারণ তৎকালীন রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতিতে প্রচুর পাওয়া যায়। সামন্ত-রাজগণের অধীনে দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রে বিভক্ত ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এর বহু নিদর্শন মেলে। প্রজাসাধারণের বিপৎকালে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি "প্রধান" বা "রাজার" নেতৃত্বে মিলিত হ'ত। দেশে মাৎস্যন্যায়ের (অরাজকতা) প্রাদুর্ভাবে প্রজাগণ ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে গোপালকে রাজপদে নির্ব্বাচিত করে পালবংশের পত্তন করেছিলেন। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত একরাষ্ট্রীয় সংহতিকে "প্রথম সামাজিক সমীকরণ" আখ্যা দিয়েছেন (*The Modern Review*, July-Sept., 1937)। এরূপ সম্মিলিততন্ত্রের অধীন ছোট ছোট রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ বিরাজ করত। বর্ত্তমান গ্রাম্য পঞ্চায়েতের আদর্শ এখানে নিহিত ছিল। দেশের সুশাসনের নিমিত্ত প্রজাশক্তি সম্পূর্ণ সজাগ ও সচেতন ছিল। তারা স্ব স্ব অধিকার ও দায়িত্ব বুঝতে পারত। মেগাস্থিনিস বলেন, "প্রত্যেক ভারতবাসী মুক্ত, তাঁদের মধ্যে একজনও গোলাম (দাস) ছিল না।" এরূপ অনুকূল পটভূমিকা ও পরিস্থিতিতে একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সবল প্রজাশক্তির পক্ষে অরাজকতার অবসানকল্পে দিব্যকে রাজপদে বরণ করা খুব স্বাভাবিক। "আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে" ভদ্র নামক একজন শূদ্রকে রাজা করার কথা লেখা আছে। "ময়নামতীর গাথা" সাক্ষ্য দেয় যে, রাজার পীড়নে "প্রজারা ধর্ম্মঠাকুরকে প্রসন্ন করিয়া রাজার মৃত্যুর জন্য অভিচার অনুষ্ঠান করিয়াছিল।" গ্রীয়ারসন সাহেব গাথাটিকে একাদশ শতাব্দীর বলে উল্লেখ করেছেন। সাধারণের স্বার্থ-রক্ষার্থে দিব্যকে রাজা নির্ব্বাচন এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের "বাঙালীর ইতিহাস"-এর পরিচয় পত্রে লেখা হয়েছে, "ইহার মহিমাই বিচারের বস্তু, গ্রহণের বস্তু, ছিদ্রগুলি নয়।" কিন্তু ইতিহাসের সত্যের আলোকে প্রকাশিত ত্রুটিবিচ্যুতির সংশোধনের অবকাশ আছে। পাল যুগের উল্লিখিত অধ্যায়ের প্রতি লেখকের ঔদাসীন্য পাঠকের মনে পীড়া দেয়। তিনি বিস্তৃত বিবরণ না দিয়ে এ অধ্যায়কে যবনিকার অন্তরালে ঢেকে রেখেছেন। গ্রন্থখানির এই অধ্যায় সম্বন্ধে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উক্তির উল্লেখ এখানে

দিব্যোর জয়স্তম্ভ

অপ্রাসঙ্গিক হবে না। "আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি যে পালবংশকে দুর্ব্বল করে তুলেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ, বরেন্দ্রীতে কৈবর্ত্তাধিপত্য (১০৭৫-১১০০ খ্রীঃ), দিব্যোর ভূমিকা, কৌণীন্যায়ক ভীমের চরিত্র ও কীর্ত্তি সম্বন্ধে তাই অনেক কিছু জানার রয়েছে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষীয় ঐতিহাসিকেরা দিব্য ও ভীম সম্পর্কে উদাসীন ও বিরুদ্ধভাব দোষের বলে যদি নীহাররঞ্জন তাদের বিষয়ে আমাদের ঔৎসুক্য পূরণ না করেন তো বাস্তবিকই দুঃখ হয়। তথ্যকে বিকৃত না করে তদানীন্তন সমাজবিক্ষোভের আলেখ্য তিনি নিশ্চয়ই দেবার চেষ্টা করতে পারতেন।" (সাহিত্যপত্র, শ্রাবণ, ১৩৫৭।)

সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিতে"র মীমাংসা গ্রাহ্য হয় নি। অপব্যাখ্যার মূলসূত্র গ্রন্থটির ৩৮ শ্লোকে নিহিত। দিব্যকে "দস্যু", "মাংসভুজা" ও "উপধিব্রতিনা" বলা হয়েছে। রামায়ণের কাহিনীর উপমা-মাধ্যমে পাল-নরপতি রামপাল ও তাঁর বংশধরগণের ইতিহাস বর্ণনা ইহার বিষয়বস্তু। রমাপ্রসাদ চন্দের মতে উক্ত কাব্যের শ্লোকগুলির দুই প্রকার অর্থ আছে। রাবণের পক্ষে "মাংসাশী"র অর্থ মাংসাশী রাক্ষস; দিব্যোর পক্ষে লক্ষ্মীর অর্থাৎ রাজলক্ষ্মীর অংশভাগী। দিব্য গৌড়রাজলক্ষ্মীর অংশভাগী অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী বা সেনাপতি ছিলেন। "উপধিব্রতিনা"র দ্বারা দিব্যোর রাজদ্রোহিতা সূচিত হয়। 'উপধি' শব্দের অর্থ কপট। রাবণের পক্ষে 'উপধিব্রতী' মানে "ভণ্ডতপস্বী"—কারণ সে তপস্বীর বেশে সীতাকে হরণ করেছিল। দিব্যোর পক্ষে উক্ত শব্দের অর্থ "ভণ্ড-বিদ্রোহী" বলা যেতে পারা যায়। ভণ্ডতপস্বী হওয়া দোষের কথা, কিন্তু ভণ্ডবিদ্রোহী অর্থাৎ যে কপটতার সপক্ষে বিদ্রোহ করে না অথচ কর্ত্তব্যের অনুরোধে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদ্রোহ

করে, সে মহৎ ব্যক্তি। উক্ত শ্লোকের টীকায় আছে—"অবন্ত কর্ত্তব্যতয়া আরব্ধং কর্ম্মব্রতং ছদ্মনি ব্রতী।" "এই বিদ্রোহ কোন জাতিবিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। ইহা সর্ব্বজনীন বিদ্রোহ বা রাষ্ট্রবিপ্লব।" "আরও উল্লেখযোগ্য যে, যৌবনে দিব্য পাল-রাজার পক্ষে দেশের শত্রু কর্ণাটাধিপতি জাতবর্ম্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিলেন। জনস্বার্থপুষ্টি ও কর্ত্তব্যের অনুরোধে দিব্যের এ ভূমিকা নিতে হয়েছিল। তাঁকে 'দস্যু' বলে অভিহিত করলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

বিপক্ষীয় রাজকবির উক্তির এরূপ ব্যাখ্যা করাই সঙ্গত। পক্ষান্তরে সরকার মহাশয়ের সিদ্ধান্তও প্রণিধানযোগ্য। "রামপালের বংশের খোষামুদে কবি নিজ কাব্যে দিব্যকে রাবণ বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহা মানিব কেন? দুইজনার কাজ দেখিয়া মহীপালকে রাবণ এবং দিব্যকে দৈত্য-নাশকারী অবতার বলিলে সত্য কথা বলা হইত।···বীর অথচ ধর্ম্মপরায়ণ দিব্য বিদ্রোহীদলে যোগ দিয়া কলির দুষ্ট রাবণকে বধ করে বরেন্দ্র মাতাস্বরূপা সীতাকে উদ্ধার করেন।" অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল বলেন, "যদি দিব্যের পক্ষভুক্ত কোনও কবি স্বহস্তে তুলিকা ধারণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি মহীপালের কবল হইতে বরেন্দ্রীর উদ্ধারকর্ত্তা দিব্য ও ভীমকে কংসের অত্যাচার হইতে রক্ষাকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণরূপে চিত্রিত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।" তিনি আরও লিখেছেন, "ইংলণ্ডের ইতিহাসেও এইরূপ পক্ষপাতদোষের অভাব নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রধান নায়ক অলিভার ক্রমওয়েল প্রতিপক্ষ ষ্টুয়ার্ট রাজবংশের আশ্রিত ঐতিহাসিকগণের নিকট "ভণ্ড" ও "দুষ্ট" আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।" শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও "রামচরিতে"র প্রমাণের বলে ইতিহাসের এ অধ্যায় সম্বন্ধীয় পূর্ব্বধারণা ও মন্তব্যের সংশোধন দাবি সমর্থন করেছিলেন।

তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে বিরাট নামক স্থানের সামন্তরাজ ছিলেন দিব্য। তাঁর বাহুবলে পরাজিত হয়ে চেদীপতি কর্ণ বিগ্রহপালকে স্বীয় যৌবনশ্রী নাম্নী কন্যা সমর্পণ করে মিত্রতাস্থাপন করেছিলেন। পরে দিব্য পালরাজ্যের "মহাবলাধ্যক্ষ" বা প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হন। তাঁর হয়, হস্তী, পদাতিক সৈন্ত সর্ব্বদা সজ্জিত থাকত। রাজ্যমধ্যে "নাবতাক্ষেণী" বা পোত-নির্ম্মাণস্থান ছিল। দিব্যের বিশাল ভুজদ্বয় শত্রুপক্ষের ভীতিস্বরূপ ও বিরাট বক্ষ গুণীজনের আশ্রয়স্থল ছিল। তিনি ধর্ম্ম বিষয়ে উদার ও প্রজারঞ্জক ছিলেন। গ্রাম্য শাসন সুন্দরভাবে চলত। যুবক দিব্য জাতবর্ম্মার সঙ্গে সহসা কয়েকটি অতর্কিত খণ্ড স্থল ও জল যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দুর্গ, সৈন্তশ্রেণী ও রণপোতসমূহের অভিনব সংস্কার করেছিলেন। (তাম্রশাসন)

বিগ্রহপালের পর দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে প্রজাপীড়ন ও অত্যাচার সমানে চলল। তুচ্ছ কারণে বা বিনা দোষে তিনি প্রবীণ মন্ত্রিবর্গকে তিরস্কৃত ও বিতাড়িত করতে পশ্চাৎপদ হন নি। রাজকুমারদ্বয় শূরপাল ও রামপালকে সন্দেহের বশে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন দুর্গে তিনি আবদ্ধ রাখেন এবং বহু সামন্তকে অপমানিত ও রাজ্যচ্যুত করেন। নবনিযুক্ত মন্ত্রীবৃন্দের কুপরামর্শে করভার বর্দ্ধিত ও গুপ্তচর নিযুক্ত হয়। তখন সর্ব্বত্র জনগণের হাহাকার ও বিপদ প্রকটিত। ফলে "অনন্ত সামন্তচক্র" ও বরেন্দ্রের "প্রজাপুঞ্জ" অত্যাচারী রাজশক্তির অমার্জ্জনীয় উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ন্ত্রণে বদ্ধপরিকর হলেন। বিরাটপতি দিব্য, পদীরাজ ভীম, রাজনগরীর গোবর্দ্ধন, কণির অধিপতি হরি, দেদ্পুররাজ, দেবীকোটপতি, সর্ব্বখির নগরীর মহাবীর প্রভৃতি বিপদে একত্রিত হলেন। বহু সৈন্ত সজ্জিত হ'ল। এ 'ধর্ম্মযুদ্ধে' সম্রাটসৈন্ত "ভয়ভীত-রিক্তমুক্তকুণ্ডল" হয়ে পলায়ন করায় ঐক্যবদ্ধ প্রজাশক্তির জয় হ'ল। "আত্মশক্তিতে বিশ্বাসপরায়ণ বাঙালী প্রধানগণ ধর্ম্মযুদ্ধের অবসানে কারাগারের লৌহকপাট উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন যে শূরপাল বা রামপাল তথায় নাই। সুতরাং কাহার শিরে রাজমুকুট স্থাপিত হইবে? পুনরায় সামন্তবর্গ সম্মিলিত হইলেন—প্রজাবর্গও আহূত হইল—স্থির হইল বরেন্দ্রীর রাষ্ট্রনীতিবিশারদ সামন্তপ্রধান নেতা শ্লাঘ্যজন দিব্য হিমাচল মুকুটিত গঙ্গাকরতোয়া হার আভরণ বিশাল গৌড়বঙ্গের অগণিত প্রজাপুঞ্জ ও সামন্তচক্রের মহিমান্বিত প্রতিনিধি-স্বরূপ রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।" ("মহারাজ দিব্য" —শ্রীঅযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ)

মহারাজ দিব্যের পর তাঁর অনুজ রুদক অল্পদিনের জন্য রাজত্ব করেন। পরে তাঁর সর্ব্বগুণান্বিত পুত্র ভীম রাজা হন। পরবর্ত্তীকালে তাঁর "মহামারক" শত্রু রামপালের কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী মুক্তকণ্ঠে রামচরিতে ভীমের প্রশংসা করেছেন (২।২১-২৭)। ভীম রক্ষণীয়দিগের রক্ষক ছিলেন। তিনি সরস্বতী ও লক্ষ্মীর আবাসস্থল ছিলেন, তাঁকে প্রাপ্ত হয়ে পৃথিবী অতিশয় সম্পদ লাভ করে। তাঁর প্রকৃতি কল্পদ্রুমস্বরূপ ছিল। সর্ব্বপ্রকার অধর্ম্ম হতে মুক্ত থাকায় লোভ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। তাঁর হৃদয়ে দেবাদিদেব মহাদেব মহেশ্বরী ভবানীসহ সদা বিরাজমান থাকতেন। স্বীয় চরিত্রগুণে প্রতিপক্ষের আশ্রিত কবির এরূপ অকুণ্ঠ ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কোন আদর্শ ও পুণ্যশ্লোক নরপতি ব্যতীত লাভ করতে পারেন না।

'ভীমের রাজ্যের আশেপাশে রামপালের পৈত্রিক করদ রাজ্য ও কুটুম্বদের দেশ ছিল (ঢাকা ও ময়মনসিংহ হতে পাটনা পর্য্যন্ত)। কারামুক্ত রামপাল এ সমস্ত জেলায় সৈন্তসংগ্রহে রত ছিলেন। তাঁর মামাতো ভাই শিবরাজ গৌড়ে খণ্ড আক্রমণ ও অতর্কিত লুঠ করতে আরম্ভ করে-

ছিলেন। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর উপহার ও ঘুষ দিয়ে দেশবিদেশের বহু রাজা ও মণ্ডলদের হাত করে অগণিত সৈন্য নিয়ে রামপাল বরেন্দ্রী আক্রমণ করেন। ভীম যুদ্ধে বন্দী হলেও তাঁর সেনানায়ক হরি ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের আবার একত্রিত করে যুদ্ধ করেন; কিন্তু তিনিও পরাজিত হন। পরে বন্দী ভীম ও হরিকে বধ করা হয়। এভাবে প্রজাশক্তির প্রতিষ্ঠায় শেষ উদ্যম ব্যর্থ হ'ল। দিনাজপুর জেলার পত্নীতলা থানার দিবর গ্রামে প্রজাশক্তির এ অভ্যুত্থান ও জাগরণের "জয়স্তম্ভ" বা "দিব্যের জয়স্তম্ভ" আজও বিদ্যমান আছে।

বাংলার ইতিহাসের এই অধ্যায়কে অধিকাংশ ঐতিহাসিক গৌরবময় আখ্যা দিয়েছেন এবং একে বিপদে বাঙালীর ঐক্য, আত্মনির্ভরতা ও আত্মমর্য্যাদার জলন্ত নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন। যদুনাথ সরকার লিখেছেন, "বাঙালীরা দুর্ব্বল, কাপুরুষ চিরপরাধীন বলিয়া যে নিন্দা শুনা যায়, সেই অপবাদ খণ্ডন করিবার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ দিব্য ও ভীমরাজাদের সত্য জীবন-কাহিনী। তাঁরা সমস্ত বঙ্গদেশের সমগ্র বাঙালী জাতির গৌরব।" রমাপ্রসাদ চন্দ বলেন—"যে দু'জন মহাপুরুষ বিশেষ বিপদকালে এদেশে অনন্তসামন্তচক্রের মঙ্গলময় ঐক্যের সুমতি উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, তাঁদের চরিত-কথা আমাদের স্মরণীয়, মননীয় এবং কীর্ত্তনীয়।" ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের কথায়—"ইহা বরেন্দ্রের সমস্ত জাতির ও সমস্ত প্রজাপুঞ্জের বিদ্রোহ, সমস্ত সামন্তচক্রের বিদ্রোহ, অত্যাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের বিদ্রোহ।" দুর্গাদাস লাহিড়ী তাঁর "পৃথিবীর ইতিহাসে"র ৮ম খণ্ডে ৩৩৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন —"মহীপালের অত্যাচারণে প্রজাশক্তি জাগরিত হইয়া উঠে। প্রজাগণের সঙ্ঘশক্তির নিকট রাজশক্তি যে তিষ্টিতে পারে না কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত মনে করি। প্রজাশক্তির নিকট রাজশক্তি বিপর্য্যস্ত হইল। জগৎ দেখিল, স্বাধীন বঙ্গের প্রজাশক্তি কত ক্ষমতাশালী। আর তাহার নিকট রাজশক্তি কত দীন। জগৎ আরও দেখিল, যে প্রজাশক্তি একদিন মহীপালের পূর্ব্বপুরুষকে সিংহাসনে বসাইয়াছিল, সেই প্রজাশক্তি আবার তাঁহার বংশধরগণকে সিংহাসনচ্যুত করিল।" ভীম ও হরির পরাজয় সম্বন্ধে মৈত্রেয় মহাশয় লিখেছেন, "রামপালের বিপুল বাহিনী কর্ত্তৃক ভীম ও হরির পরাজয় কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের পরাজয় নহে। ইহা একটি মহাব্রতের অবসানকাহিনী। দিব্যক কর্ত্তৃক এই মহাব্রত আরব্ধ হইয়াছিল।" (মানসী ১৩২২—চৈত্র) বাঙালীর ইতিহাসের এ অধ্যায় ফ্রান্সের ষোড়শ লুই ও ইংলণ্ডের প্রথম চার্লসের নিহত হওয়ার পরবর্ত্তীকালীন অবস্থার সহিত তুলনীয় নয় কি?

হারানো স্মৃতি

শ্রীকরুণাময় বসু

আকাশ সীমন্তে জাগে শুক্তিশুভ্র পূর্ণিমার চাঁদ,
পুষ্পের মঞ্জরী ছুঁয়ে উড়ে যায় উদ্‌ভ্রান্ত বাতাস
বন হ'তে বনান্তরে; নদীপ্রান্তে জাগে স্তব্ধ রাত
মূর্ত্তিমতী বিরহিণী; মনে লাগে বেদনা-আভাস।

পূর্ণিমার রাত্রি যেন ছায়াশুভ্র স্বপ্নসরোবর,
হারানো স্মৃতির সিঁড়ি নেমে যায় পাতালপুরীতে;
সোনার প্রদীপ জ্বলে, ফেলে আসা সেই খেলাঘর
আবার উজ্জ্বল হ'ল, কতো মুখ দেখিনু নিভৃতে।

কৈশোরের স্মৃতিগুলি মুকুলিত অবোধ বাসনা
কখন শুকায়েছিল দিবসের আতপ্ত ধূলায়,—
সহসা মেলিল বুঝি শতদল চিত্রিতা কামনা
পূর্ণতার প্রাণস্পর্শে; স্পর্শমণি বুঝি ছুঁয়ে যায়।

একটি কোমল মুখ দেখেছিনু বহুদিন আগে,
তখন শরৎকাল, পথ ছিল শিউলিতে ঢাকা,
বাতাসে গানের কলি; প্রেমের বিচিত্র স্বপ্ন-রাগে
ললিত লাবণ্যস্মৃতি মোর মর্ম্মে রক্তে হ'ল আঁকা।

তার পর ভুলে যাই দৈনন্দিন সংঘাত-জীবনে
আমারে ভুলেছি মোরা, সেই মতো ভুলেছিনু তারে,
ভেবেছিনু প্রেম মিথ্যা, তার বাণী নির্ব্বোধেরা শোনে,
স্বপ্ন দেখে, হায় মূঢ় সূর্য্য কি ঢাকিবে আঁধারে?

সহসা দেখিনু ঊর্দ্ধে কোজাগরী শরৎ-পূর্ণিমা,
স্মৃতির জোয়ার-জলে ভেসে আসে অতীত অধ্যায়;
মুখখানি মনে পড়ে, প্রেম তার বিস্তারিল সীমা
মর্ত্ত্য হ'তে স্বর্গপ্রান্তে আজি এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়।

বাঁধ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

১৯

আরও কয়েক মাস গত হইয়াছে। মঞ্জুষার প্রতিষ্ঠানের কাজ-কর্ম্ম দেখাশুনা আজকাল রাধু বোষ্টম করে। বড়ি আর পাঁপড়ের কাজ সে সুরুতেই বন্ধ করিয়াছে। সেলাই ফোঁড়াই এবং বহুবিধ মাটির মূর্ত্তি সেখানে তৈরি হইতেছে। কিন্তু তাদের উত্তম প্রধানতঃ অন্য কাজে ব্যয়িত হইতেছে। মঞ্জুষার উৎসাহ সেইদিকেই বেশী। রাধুর ত কথাই নাই। এমন কি জীবানন্দ পর্য্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি বলেন, এতদিনে তোমরা ঠিক রাস্তায় চলতে সুরু করেছ। আজকের দিনে দেশের ও দশের জন্যে এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। মঞ্জুষার কাজের দিকে ছিল তাঁর সজাগ দৃষ্টি। শহরের উপকণ্ঠে তাঁহার কয়েক বিঘা জমিতে আজ সোনা ফলিতেছে, এ কথা তিনি ভাল করিয়াই জানেন।

মঞ্জুষাদের শ্রম সার্থক হইয়াছে। জীবানন্দ আজকাল প্রায়ই মেয়ের সহিত কাজকর্ম্ম দেখিতে আসিয়া থাকেন। সময় সময় নানা উপদেশও দেন।

মঞ্জুষা এবং রাধুর চেষ্টায় অভাবগ্রস্ত বহু পরিবারের অন্নসংস্থান হইয়াছে। যাহারা অকারণে ভিড় করিয়াছিল তাহারা বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। রাধু বোষ্টম তাহাদের চলিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছে। উহারা কাজের চেয়ে অকাজই বেশী করিতেছিল।

মঞ্জুষা উহাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া বলিয়াছিল, কোথায় যাবে ওরা বোষ্টমদা, থাক না যে ক'দিন একটা ব্যবস্থা করে নিতে না পারে। বিপদে পড়েছে যখন—

বাধা দিয়া রাধু জবাব দিয়াছিল, পরের পয়সায় দয়া দেখাবার লোভ যখন আমি সম্বরণ করেছি তখনই তোমার বোঝা উচিত যে, ওরা নিতান্তই অপাত্র। আমি শুধু আগাছা সাফ করছি। ওরা নিজেরা অভাবগ্রস্ত নয়, অথচ যাদের সত্যিকারের প্রয়োজন তাদের পথ আটকে দাঁড়িয়ে ছিল। শুধুই কি তাই—এখানকার স্বাভাবিক আবহাওয়াটাকেই যেন বিষাক্ত করে তুলেছিল। কিন্তু অপাত্রে কৃপা দেখানও পাপ দিদি। তুমি কি মনে কর যাদের আমি বিদায় করে দিয়েছি তারা সত্যিই বিপদে পড়ে এসেছিল? তা নয়, বরং বিপন্নদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবার জন্যই সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

ইহার কোন জবাব মঞ্জুষা খুঁজিয়া পায় নাই। রাধু মুহূর্ত্তের জন্য কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল—মঞ্জুদিদি কি ভাবিল কে জানে। তবে এ কথাও ঠিক যে, রাধু তার নিজের জন্য একটা কথাও বলে নাই।

কিছুদিন যাবৎ কোনকিছুতেই মঞ্জুষার তেমন উৎসাহ দেখা যাইতেছে না। যতই সে প্রতিষ্ঠানের নানা কাজের খুঁটিনাটি তলাইয়া দেখিতেছে ততই মানুষের মনের একটা অতি কদর্য্য নোংরা দিক তার কাছে প্রকাশ পাইতেছে। অথচ একথা বলিবে সে কাহাকে। তাহার চোখে পৃথিবীর চেহারাটাই যেন বদলাইয়া যায়—মানুষের উদগ্র লোভ, উৎকট স্বার্থপরতা তার মনকে বেদনায় পরিপূর্ণ করিয়া তোলে। রাধু বলে, তোমার প্রতিষ্ঠান ত তাদেরই জন্যে দিদি যারা কতকগুলো অত্যাচারীর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে চায়।

মঞ্জুষা বলিল, কিন্তু দেখে শুনে যে নিজের উপরই আস্থা হারিয়ে ফেলছি বোষ্টমদা। এ সব কি দেখছি—

রাধু খুব একচোট হাসিল। বলিল, নূতন কিছুই নয়। পাপ চিরদিন এমনি ভাবে ছিদ্রপথ দিয়েই প্রবেশ করবার চেষ্টা করে। তোমার চোখে এই ঘটনাগুলো অভিনব বলেই তুমি বেদনা পাচ্ছ। তা ছাড়া সমাজের অতি ক্ষুদ্র অংশেরই এ সব কাজে সায় আছে, কিন্তু আসল কথা হ'ল এটা যাতে না বাড়তে পারে সে চেষ্টা করা।

মঞ্জুষা কহিল, কিন্তু যেদিকে তাকাই আশার আলো ত কোথাও চোখে পড়ে না বোষ্টমদা। এত নীচাশয়তা হীনতার মধ্যেই মুষ্টিমেয় ক'জন তোমরা কতক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে।

রাধু শান্ত কণ্ঠে বলিল, তুমি ব্যাপারটাকে অত্যন্ত বাড়িয়ে দেখছ দিদি। ভুলে যেও না যে, এই মন্দ লোকগুলোও এক দিক দিয়ে সমাজের উপকার করে। এরা মানুষকে নীচেই টেনে আনবার চেষ্টা করে সত্য, কিন্তু এদের অত্যাচার উৎপীড়নে অনেকে আবার আত্মনির্ভরশীলও হয়ে ওঠে। আজ যে ক'টি মেয়ে তোমার আশ্রয়-কেন্দ্রে স্থান পেয়েছে তারা নিজেদের সম্বন্ধে চিন্তা করতে শিখবে—জীবনযাত্রার একটা সুষ্ঠু পথও নিজেরাই বেছে নেবে এ তুমি দেখে নিও।

মঞ্জুষা কহিল, তোমার এসব কথা আমি মেনে নিতে পারছি না।

রাধু বলিল, সেটা তোমার দোষ নয়—দোষ আমার। আমি হয়ত ঠিকমত বুঝিয়ে বলতে পারি নি, কিন্তু চোরের উপর রাগ করে ঘরের দরজা খুলে রাখার যুক্তিকেও মেনে নেওয়া যায় না দিদি।

মঞ্জুষা হাসিল, বলিল, রাগ অভিমানের কথা এটা নয়, তা ছাড়া তুমি জান যে, আমার আজকের এই প্রতিষ্ঠানের

জন্ম শুধু সাময়িক প্রয়োজনে নয়, সেকথা তোমরা এখন বিশ্বাস করবে না, কিন্তু মিনুদা জানে আমার মনের কথা। কত স্বপ্নই না দেখছি···মঞ্জুষা একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

রাধু বলিল, অথচ আজ যখন তোমার সেই স্বপ্ন সার্থক হয়ে উঠতে চলেছে তখনই তুমি পিছিয়ে পড়বে দিদি!—

মঞ্জুষা নীরব।

রাধু একটু থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, আজকের দিনে সাহায্যের প্রয়োজন যাদের সবচেয়ে বেশী তাদের তুমি প্রতিপালন করছ। যারা এদের এমন ক'রে সর্ব্বহারা করেছে, তাদের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

মঞ্জুষা ধীরে ধীরে বলিল, পিছিয়ে পড়া ঠিক নয় বোষ্টমদা। তোমার কথা যে ঠিক বুঝতে পারছি না তাও নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় কোনকিছুতেই যেন আমার প্রয়োজন নেই। মনটা অবসাদে ভেঙে পড়ে। কোন প্রশ্ন করো না, আমি জবাব দিতে পারব না বোষ্টমদা।

রাধু একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, প্রশ্ন করে সব কথা জানতে হবে কেন মঞ্জুদিদি, কিন্তু থেমে গেলে ত তোমার চলবে না। ওদের চলার পথ থেকেই পাথেয় সংগ্রহ করে নিয়ে আমাদেরও যে চলতে হবে।

মঞ্জুষা ডাকিল, বোষ্টমদা—

রাধু সাড়া দিল, কি দিদি—

মঞ্জুষা মৃদুকণ্ঠে বলিল, কিন্তু পাথেয় নিয়ে মন যে ভরে উঠছে না বোষ্টমদা, বরং অন্তরের শূন্যতা দিন দিন আরও অতলস্পর্শ হয়ে উঠছে যে।

রাধু চুপ করিয়া রহিল—কথা কহিল না। মঞ্জুষা বলিতে লাগিল মন যখন পরিপূর্ণ ছিল, তখন মনে কত পরিকল্পনা করেছি, সবকিছুকেই সুন্দর বলে মনে হয়েছে. কিন্তু আজ আর কিছুই মনকে আকর্ষণ করতে পারছে না। বরং মনে হচ্ছে সবই যেন নিতান্ত পণ্ডশ্রম।

আরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাধু যখন মুখ তুলিল তখন নিজের অজ্ঞাতেই তার একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। সে মৃদুকণ্ঠে কহিল, অথচ তুমিই তাকে দিলে ফিরিয়ে। মুখের উপর দরজাটা চিরদিনের জন্ত দিলে বন্ধ করে। এর কি সত্যিই কোন্ প্রয়োজন ছিল? কি বলব তোমায় দিদি—তোমাদের মত লেখাপড়াও শিখি নি, তেমন করে ভাবতেও জানি না, তবুও মনে হয় জেনে শুনে কাজটা তুমি ভাল কর নি। তাকেও ঠকালে নিজেও ঠকলে।

মঞ্জুষা তেমনি শান্ত কণ্ঠেই জবাব দিল, ঠকা জেতার কথা এটা নয় বোষ্টমদা। কিন্তু এ ছাড়া আমার যে আর কোন পথ ছিল না।

রাধু বলিল, এটা তোমার অহঙ্কারের কথা।

কোথা দিয়া কি হইল বোঝা গেল না, কিন্তু মঞ্জুষা সহসা বারুদের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, কেনই-বা থাকবে না আমার অহঙ্কার। আমি কি তার কাছে কৃপাপ্রার্থী হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, তবু কেন সে অমন করে আমায় এড়িয়ে চলে গেল। এর পর যদি তার ফিরে আসার পথ আমি বন্ধই করে দিয়ে থাকি সেটা কি অন্যায় করেছি! না, আমার অপরাধ হয়েছে।

তার এই আকস্মিক উষ্মায় প্রথমটা রাধু একটু বিস্মিত হইলেও সঙ্গে সঙ্গেই সে ভাব কাটাইয়া উঠিয়া স্বাভাবিক সুরে কহিল, অপরাধ করেছ এমন অনুযোগ তো তোমায় কেউ দেয় নি দিদি, শুধু তোমার মনের কথাটাই আমি বলবার চেষ্টা করেছিলাম।

এ কথার মানে বোষ্টমদা? মঞ্জুষা বলিল।

রাধু তেমনি মৃদু শান্তকণ্ঠে বলিল, সে কথাও কি আমাকেই বলে দিতে হবে।

তোমার নিজের অন্তরের কাছে নিজেরই আচরণের সায় নেই বলে আজ ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নটা তোমার মনে দেখা দিয়েছে। মিছিমিছি আমারই উপর না হয় রাগ করলে, কিন্তু তাতে সত্য কখনও চাপা পড়বে না।

মঞ্জুষা ডাকিল, বোষ্টমদা—

রাধু বোষ্টম সাড়া দিয়া বলিল, আমি তোমায় মিথ্যে বলছি না দিদি—

মঞ্জুষা যেন একটু অন্যমনস্ক ভাবে বলিতে লাগিল, তোমাকে মাঝে মাঝে বড় অদ্ভুত মনে হয় আমার। মনে হয় তোমার জীবনে কি যেন একটা গভীর রহস্য রয়ে গেছে যার কোন খবরই আমরা জানি না।

রাধু জোরে হাসিয়া উঠিল। বলিল, হঠাৎ এত দিন পরে একথা তোমার মনে উঠল কেন দিদি?

মঞ্জু কহিল, তা তো জানি না বোষ্টমদা—মনে প্রশ্ন জাগে তাই বললাম। যে রাধু বোষ্টম ভিক্ষে করে দিন কাটাত, দিনরাত গান গেয়ে জগৎসংসার ভুলে থাকত তাকে যেন আর খুঁজে পাচ্ছি না।

রাধুর চোখে মুখে যেন একটা চাপা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। প্রকাশ্যে বলিল, কাজের সময় তো বোষ্টম কোন দিন অকাজে মন দেয় নি দিদি। তা ছাড়া গানটা ছিল তখন পেশা নেশা দুই-ই।

হয় তো তাই হবে। মঞ্জুষা মৃদু হাসিয়া বলিল, কিন্তু আমার মন বলে এ কখনও সত্য হতে পারে না। তুমি যেন মুখোস পরে তোমার আসল রূপটাকে লুকিয়ে রেখেছ।

রাধু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, তা হলে নিশ্চয় কোন পলাতক খুনী আসামী।

মঞ্জুষা বলিল, তুমি হাসছ। রহস্য করে নিজেকে খুনী আসামীও বলছ, অশিক্ষিত বলে প্রমাণ করবার চেষ্টাও কিছু

কম কর নি, কিন্তু তোমার নিজের আচরণই তোমার উক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

রাধু তেমনি হাসিমুখেই জবাব দিল, সঙ্গগুণে অনেক-কিছুই সম্ভব হয় দিদি। এত দিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থেকেও যদি দুটো চারটে ভাল ভাল কথা শিখতে না পারি তা হলে আর হ'ল কি! পরশপাথরের ছোঁয়া পেলে লোহাও যে সোনা হয়ে ওঠে!

মঞ্জুষা কহিল, ওটা গল্প মাত্র—কোন প্রমাণ নেই। কোন ক্ষেত্রে এরূপ হয়েছে বলে অন্ততঃ আমার ত জানা নেই।

রাধু হাসিয়া ফেলিল, বলিল, যত অপরাধ বুঝি রাধু-বোষ্টমের। তার বেলায় কোন প্রমাণের দরকার হয় না?

মঞ্জুষা কহিল, তার প্রমাণ ত তুমি নিজেই বোষ্টমদা। দেখতেও পাচ্ছি শুনতেও পাচ্ছি। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সে পুনশ্চ বলিতে লাগিল—তোমাকে বিব্রত করবার উদ্দেশ্যে এ কথা আমি জিজ্ঞেস করিনি বোষ্টমদা। কথাটা প্রায়ই আমি ভাবি, আজ হঠাৎ প্রকাশ করে ফেলেছি—সত্য মিথ্যা যাচাই করবার জন্যে নয়। মঞ্জুষা থামিল। রাধু কোন জবাব না দিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। এমনি ভাবে বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর এক সময় রাধু মুখ তুলিয়া চাহিল। মৃদু কণ্ঠে বলিল, আমার একটা কথার জবাব দেবে দিদি?

মঞ্জুষা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল।

রাধু বলিতে লাগিল, একটা কথা জিজ্ঞেস করি আমার মধ্যে যে একটা রহস্য আছে, এ সন্দেহ তোমার মনে জাগল কেন?

মঞ্জুষা কহিল, এ কৌতূহল আজকের নয়—বহু দিনের। তোমার নানা কাজ দেখে এবং কথা শুনেই মনে হয়েছে তুমি যে রূপে আমাদের কাছে পরিচিত তার চেয়ে তুমি সম্পূর্ণ আলাদা। তুমি নিজেকে গোপন করে রেখেছ।

রাধু বলিল, সন্দেহ নিছক সন্দেহই দিদি।

অনেক ক্ষেত্রে আবার তা সত্যও হয়—মঞ্জুষা বলিল, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। রাধু বোষ্টমের আসল পরিচয়টা কি তা জানবার জন্যে মনে একটা কৌতূহল ছিল এইমাত্র। সে কৌতূহল চরিতার্থ না হলেও কোন আপশোষ থাকবে না।

মঞ্জুষা থামিল।

আবার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। মনে হইল রাধু কিছু ভাবিতেছে। হঠাৎ দেয়াল-ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া এগারটা বাজিল। মঞ্জুষা চমকাইয়া উঠিল। ইস! অনেক বেলা হয়ে গেল যে। বলিয়া মঞ্জুষা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং রাধুকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিল, এ নিয়ে তোমাকে আর ভাবতে হবে না। কিন্তু ওকি তুমিও উঠছ যে? এতখানি বেলায় তোমাকে না খাইয়ে তো ছাড়া হবে না বোষ্টমদা।

রাধু বিব্রত হইয়া বলিল, সে কেমন করে হয় দিদি? ঘরের লোক যে আবার আমার জন্যে না খেয়ে বসে থাকবে।

মঞ্জুষা হাসিয়া বলিল, তা থাকলেই বা খানিক বসে। তার চোখে মুখে হাসি দেখা দিল। বলিল, মেয়েদের ওতে কষ্ট হয় না। আর বল তো না হয় নিতাইকে দিয়ে একটা খবর পাঠিয়ে দিই।

রাধু একটু কুণ্ঠিত ভাবে কহিল, আমি বলছিলাম—কি দরকার খামোকা হাঙ্গামায়।

জীবানন্দের আহ্বানে মঞ্জুষা উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, সে ভাবনা তোমার নয় বোষ্টমদা। নিতাইকে আমি এক্ষুণি তোমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মঞ্জুষা দ্রুত প্রস্থান করিল।

২০

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাধু বোষ্টমকে মঞ্জুষার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হইতে প্রায় একটা বাজিল। রাধু বলিল, এমন খাওয়া ভুলেই গিয়েছিলাম। আর এত যে খেতে পারি তাই কি ছাই আগে জানতাম।

মঞ্জুষা মৃদু হাসিয়া বলিল, জানলে তবেই কিন্তু তোমার ভোলার প্রশ্ন আসে বোষ্টমদা।

রাধু প্রথমে একটু বিস্মিত হইলেও পরমুহূর্তেই হাসিমুখে কহিল, তা ঠিক যদি নাই জানলাম তবে ভুলব কেমন করে? কিন্তু কথাটা আর একটু খুলেই বল দিদিমণি।

মঞ্জুষা বলিল, এমন কিছু দুরূহ কথা আমি বলিনি বোষ্টম-দা, যে না বোঝার ভান করছ।

একটু থামিয়া পুনরায় সে বলিল, আচ্ছা বোষ্টমদা, তোমার মা বাবার কথা মনে পড়ে।

রাধু বোষ্টমের চেহারা অকস্মাৎ যেন বদলাইয়া গেল। তার চোখের দৃষ্টি গভীর হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সে চোখ বুজিল, তার সমস্ত সত্তা যেন কোন গভীর অতলে ডুবিয়া গেছে। মঞ্জুষা বিস্ময়ভরা চোখে তাহার পানে চাহিয়া রহিল, কোন কথা কহিতে পারিল না। কিন্তু রাধু চোখ চাহিতেই মঞ্জুষার মুখ হইতে আপনিই বাহির হইয়া আসিল, তোমার হ'ল কি বোষ্টমদা?

রাধুর মুখখানি স্নিগ্ধ হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে মৃদু কণ্ঠে বলিল, পড়ে বৈকি দিদি।

মঞ্জুষা কহিল, কিন্তু ভুলেও ত তাদের কথা কোন দিন তুমি বল না।

রাধু একটুখানি হাসিল, বলিল, এমন আগ্রহের সঙ্গেও মতে কোন দিন চাও নি বলেই হয়ত বলি নি দিদি।

আমার মাতৃ-পিতৃ-পরিচয়ের দুটো দিক আছে। তা একদিকে যেমন গর্ব্বের অন্যদিকে তেমনি লজ্জার। আমার বাপ মা দু'জনেই ছিলেন খাঁটি মানুষ, কিন্তু এমনি আমার

অদৃষ্ট যে এমন পিতামাতার সন্তান হয়েও সংসারে নিজের সত্য পরিচয় দিতে পারলাম না। এইটে আমার মায়ের অমোঘ আদেশ। ফলে না হতে পারলাম একান্তভাবে মায়ের, না পেলাম বাবাকে। অথচ বিচার করে দেখতে গেলে তাঁরা কেউই কারুর চেয়ে ছোট নন। কিন্তু আমি ভুলতে পারি নে যে, আমি মা এবং বাবা উভয়েরই সন্তান। না না, চমকে উঠো না দিদি—আমি তোমায় মিথ্যে বলছি না।

রাধু মুহূর্তের জন্ত থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, মায়ের কাছে তথাকথিত ধর্মের অনুশাসন এবং সমাজই হয়ে উঠল বড়। সমাজকে উপেক্ষা করে পারলেন না তিনি বাবাকে মেনে নিতে—এইখানেই জটিলতার সৃষ্টি হ'ল। আমার বয়েস তখন কতই বা হবে। শুনেছি বছর ছয়-সাত। মা আমার বাবাকে মেনে নিতে না পারলেও আমাকে ছাড়তে পারলেন না। মায়ের সঙ্গে বাবার হ'ল চিরবিচ্ছেদ—বাবাকে রিক্ত হাতেই ফিরে যেতে হ'ল।

তারপর কত দিন, কত বছর চলে গিয়েছে, কিন্তু আমার আজও সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে। বাবার মুখে সর্বস্ব হারানোর যে ছবি ফুটে উঠেছিল আমার পরবর্তী জীবনে তা একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল।

রাধু থামিল। তার মুখখানি যেন বেদনায় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। হয়তো অতীত জীবনের কথা নূতন করিয়া ভাবিতে গিয়া তার এই অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে। মঞ্জুষা তাহার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, না বুঝিয়া সে রাধু বোষ্টমকে না জানি কত বড় আঘাত করিয়া বসিয়াছে।

মঞ্জুষা স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকিল, বোষ্টমদা—

রাধু বোষ্টম সাড়া দিল। তার কণ্ঠস্বর আবেগে গাঢ় হইয়া উঠিল। মঞ্জুষা পুনরায় বলিল, থাক বোষ্টমদা। ওসব শুনে আমার দরকার নেই।

রাধু শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, কিন্তু আমার প্রয়োজন আছে দিদি। সবটুকু না শুনলে হয়তো আমার মা বাবার উপর অবিচার করে বসবে। কিন্তু আগে তোমার নিতাইকে এক গ্লাস জল দিতে বল দিদি। বড় তেষ্টা পেয়েছে।

মঞ্জুষা ডাকিতেই নিতাই এক গ্লাস জল দিয়া গেল। রাধু এক নিঃশ্বাসে তাহা নিঃশেষ করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, জ্ঞান হওয়া অবধি দেখে এসেছি যে, আমরা মামার বাড়ীতে আছি। মামাদের অবস্থা ছিল খুবই ভাল। তাঁদের পয়সায় এবং তত্ত্বাবধানে আমার পড়াশুনো চলতে লাগল। মা সারাদিন তাঁর পাথরের বিগ্রহ গোবিন্দকে নিয়েই থাকেন। আমার মা ছিলেন সম্পূর্ণ অন্ত ধাতুতে গড়া। কত জননীকেই দেখেছি, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমার মায়ের একতিল মিলও খুঁজে পাই নি। আমার কাঙাল মন মায়ের দুটো মিষ্টি কথা শুনবার জন্ত সব সময় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। সময় পেলেই তাঁর ঠাকুরঘরের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম। বেশ মনে পড়ে, এক দিন ধরা পড়ে গেলাম। যেন একটা অন্যায় কাজ করেছি এমনি কুণ্ঠিতভাবে মায়ের মুখের পানে তাকিয়েছিলাম। মা আমায় কাছে ডেকে নিয়ে তাঁর বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন। তার পর সে কি কান্না তাঁর! বিস্মিত হয়েছিলাম, তখন বুঝি নি, কিন্তু এখন বুঝি জীবনের কত বড় ব্যর্থতা নিয়ে তিনি ঐ ঠাকুরঘরে দিন-রাত পড়ে থাকতেন। আজীবন মা শুধু পাথরের মধ্যেই সত্যের সন্ধান করে গেলেন, আসল সত্যকে আর পেলেন না।...

রাধু একটু থামিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিল, কিন্তু কিসে যেন কি হয়ে গেল, ক্রমে আমার বাবা মায়ের কাছে থাকবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন। তাঁর শিক্ষা, তাঁর ভদ্র মন, ব্যক্তিত্ব এসবকে কেউ উপযুক্ত মর্য্যাদা দিলে না। জ্ঞান হয়ে কতবার মাকে বাবার বিষয় প্রশ্ন করেছি, কিন্তু কোন উত্তর পাই নি। তিনি শুধু অসহায় দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চেয়ে চোখের জল ফেলেছেন আর আমি দিনের পর দিন অধীর আগ্রহে পাগলের মত হয়ে উঠেছি। দাদুকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছি তিনি বাবার সম্বন্ধে গোটাকয়েক অসম্মান-সূচক উক্তি করে আমায় বিদায় করে দিয়েছেন।

রাধু থামিল, মঞ্জুষার মুখ দেখিলে মনে হয় সে স্বপ্ন দেখিতেছে। মুখে তার কথা নাই, শুধু দুই চোখে রাজ্যের বিস্ময় পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

রাধু পুনরায় বলিতে লাগিল, মনে রূঢ় আঘাত পেয়ে সত্য-মিথ্যার মীমাংসা করতে মায়ের কাছে গেলাম। দাদু বাবার সম্বন্ধে যে সকল অপমানকর কথা বলেছেন সেগুলোর উল্লেখ করলাম। মা আমার প্রশ্নের জবাবে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, তোমার বাবাকে ওঁরা জানেন না বলেই তাঁর সম্বন্ধে এত বড় অসম্মান-সূচক কথা বলতে পেরেছেন। তোমার বাবা নিন্দা-সুখ্যাতির অনেক উপরে সাধু। এর পরে পারতপক্ষে আমি আর মায় কাছে বাবার কথা তুলি নি। আমি লক্ষ্য করেছি বাবার প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়তেন। তাই তো আজও মাঝে মাঝে ভাবি যে, এত বড় শ্রদ্ধা, এতখানি গভীর ভালবাসা বুকের মধ্যে পুষে রেখেও কেমন ক'রে বাবাকে মা বিদায় করে দিতে পেরেছিলেন। এ প্রশ্নের উত্তর আজও আমি পেলাম না।...

রাধু কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল, কিন্তু মুহূর্তেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, আমার বাবা আমার ঠাকুরদাদার ঔরসজাত হলেও তাঁর জন্মবৃত্তান্ত অত্যন্ত রহস্যময়। মোটের উপর ঠাকুরদাদার বিবাহিতা স্ত্রী বাবাকে লালনপালন করেছিলেন মায়ের ভূমিকা নিয়ে। সত্য বৃত্তান্ত জানতেন আমার ঠাকুরদাদা, তাঁর স্ত্রী আর বাবার গর্ভধারিণী। দাদু আর যাই হোন, একথা সত্য

যে, তাঁর বিচার-বিবেচনা ছিল। তিনি বাবাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন তাঁকে রীতিমত উচ্চ শিক্ষা দিয়ে। কিন্তু গোল বাধল দাদুর সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে। ঠাকুরমার স্বার্থবুদ্ধি আমাদের চরম সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করে দিলে। বাবার জন্মবৃত্তান্তটা প্রকাশিত হয়ে পড়ল, সমস্ত বিশ্ব-সংসারের কাছে তিনি ঘৃণা ও কৃপার পাত্র হয়ে দাঁড়ালেন।

মঞ্জুষা সহসা মৌন ভঙ্গ করিয়া প্রশ্ন করিল, কিন্তু তোমার মা আর দশ জনের মত বিমুখ হয়ে সরে দাঁড়ালেন কোন যুক্তিতে বোষ্টমদা।

রাধু শান্তকণ্ঠে বলিল, এর উত্তর তিনিই দিতে পারতেন দিদি। কথাটা জানবার সুযোগ আমার কোন দিন হয় নি। তাই আজও এটা একটা জটিল প্রশ্ন হয়েই আমার মনে জেগে আছে। তবে মনে হয়, পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে অথবা অন্ধ সংস্কারের মোহে তার আসল সত্তার অপমৃত্যু ঘটেছিল। এর জন্যে দায়ী আমার দাদামশাই আর আমার বড়মানুষ মামারা। কথাটা যেদিন বুঝতে পারলাম তার পর আর একটি দিনও আমি সেখানে থাকি নি। মাকে প্রণাম করে বললাম, এবারে আমাকেও বিদায় দিতে হবে মা। আমার আসল পরিচয় যাকে নিয়ে তাঁর যেখানে স্থান হ'ল না, আমারও সেখানে থাকবার অধিকার নেই। কাজেই আমার যথাযোগ্য স্থান আমায় খুঁজে নিতে হবে। মা ভাবলেশহীন চক্ষে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন, কোন কথা বলতে পারলেন না, কিন্তু পরমুহূর্তেই ছুটে গেলেন ঠাকুরঘরে। আমি নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। বহুক্ষণ মা নিস্পন্দভাবে পড়ে রইলেন পাষাণ-বিগ্রহের পদতলে—তার পরে নির্মাল্য হাতে উঠে এলেন। আমার মাথায় ঠেকিয়ে পুনরায় গিয়ে ঠাকুরঘরে ঢুকলেন। একটি কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল না, শুধু মনে হ'ল যেন কিছু বলতে গিয়েও তিনি থেমে গেলেন। আমি মায়ের মৌন আশিস সম্বল করে বেরিয়ে পড়লাম।

আবেগে রাধুর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। মুখের ভাব কেমন করুণ বিমর্ষ। মঞ্জুষাও নির্ব্বাক বিস্ময়ে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া আছে।

রাধু সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল। অস্থির পদক্ষেপে একবার গিয়া খোলা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল। মাথার ভিতরটা তার যেন একেবারে শূন্য হইয়া গিয়াছে। বাহিরে রাস্তা জনবিরল। একটা চকচকে মোটরগাড়ী হাওয়ার বেগে ছুটিয়া গেল। পরমুহূর্তেই শব্দ হইল ঠং ঠং। রাস্তার মোড়ে একটা রিক্সা গাড়ী দেখা দিয়াছে।

রাধু পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া স্থির হইয়া বসিল। মঞ্জুষার মুখের পানে খানিক চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় আরম্ভ করিল, দাদামশাই অনেক কথাই বললেন। আমাকে চুপ করে থাকতে হ'ল মায়ের কথা ভেবে।

কিন্তু শেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন বাবার সাক্ষাৎ পেলাম তখন বিস্ময় আমার সীমা ছাড়িয়ে গেল। তিনিও আমায় নিজের কাছে রাখতে রাজী হলেন না। কাছে বসিয়ে পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন, "তুমি এখন বড় হয়েছ, তোমার বুদ্ধিবিবেচনা হয়েছে। হয়তো সব কথা শুনেও থাকবে, তাই বলছিলাম তুমি তোমার মায়ের কাছেই ফিরে যাও সাধু।" আমি সোজা হয়ে বসে তাঁর মুখের পানে তাকালাম। কি গভীর তাঁর দুই চোখের দৃষ্টি। কিন্তু সেখানে কারুর বিরুদ্ধে তিলমাত্র অভিযোগ নেই। আমি যা বলতে উদ্যত হয়েছিলাম তা আর বলা হ'ল না। তিনি একটু হেসে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন, কিছু বলতে চাইছ সাধু? স্পষ্ট এবং সত্য কথা শুনতে আমি খুব ভালবাসি। আমি বললাম, আমি তো ফিরে যাবার জন্যে আসি নি বাবা! তা ছাড়া যেখানে আমার বাবাকে অপমান করা হয়েছিল, যেখানে তাঁর কথা নিয়ে এখনও চলে ব্যঙ্গবিদ্রূপ সেখানে আমার থাকা সম্ভব নয়।

বাবার মুখে প্রশান্ত হাসি ফুটে উঠল। তিনি স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, কিন্তু অন্যের উপর রাগ করে তুমি নিজের মাকে এত বড় শাস্তি দিতে চাইছ কোন বুদ্ধিতে সাধু। তোমার মায়ের বুক একেবারে খালি হয়ে যাবে যে। নইলে আমারই কি ইচ্ছে করে না আমার ছেলেকে নিজের কাছে রাখি। এর পরে বাবা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথাই জিজ্ঞেস করলেন। অবশেষে তিনি বললেন যে, যদি মা রাজী হন তো আমরা কলকাতায় আলাদা ভাবেই থাকতে পারি। খরচপত্র তিনিই চালাতে পারবেন। তিনি আরও বললেন, তুমি মানুষ হয়ে ওঠ। মনুষ্যত্বকে মর্য্যাদা দিতে শেখ। সাময়িক উত্তেজনাবশে কোনকিছুর উপর অকারণে বিরূপ হয়ে উঠ না—যদি হও, তা হলে সে হবে মস্ত বড় ভুল।

আমি জবাব দিয়েছিলাম, "একথা কেন বাবা? আমার আন্তরিকতায় কি আপনার বিশ্বাস নেই?" তিনি বেশ স্পষ্ট ভাষায়ই বললেন, "সম্পূর্ণ আস্থা আছে, এমন কথাও বলতে পারি নে সাধু। তুমি দুঃখ পেতে পার কিন্তু..." এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি চুপ করিয়া গেলেন।

ফিরে এসে দেখি মামার বাড়ীর দরজাও আমার কাছে রুদ্ধ হয়ে গেছে। এতে আমার দুঃখ নেই, কিন্তু মায়ের সঙ্গে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে যে দেখা করা প্রয়োজন। অথচ তা যে সহজসাধ্য নয়, একথা ভেবে চিন্তিত হলাম।

রাধু বোষ্টম থামিল, সে উত্তেজনায় হাঁপাইতেছিল, খানিক দম লইয়া সে পুনরায় বলিতে সুরু করিল, প্রথমে কথা-কাটাকাটি, তার পরে রীতিমত উচ্চকণ্ঠে চেঁচামেচি সুরু করে দিলাম। সম্ভবতঃ আমার কণ্ঠস্বর শুনেই মা ব্যস্তভাবে ছুটে বাইরের মহলে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি নিঃশব্দে কাঠের

পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থেকে দাদামশায়ের বক্তব্য শুনলেন, তার পরে একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, তোমাদের জন্তে একে একে সকলকে আমি হারাতে পারি না বাবা? আমার ছেলের যদি এ বাড়ীতে স্থান না হয় তা হলে আমাকেও তুমি বিদায় দাও।

দাদামশাই চিৎকার করে উঠলেন, তবু তোর ছেলের অন্যায়টা চোখে পড়ল না নারায়ণী?

মা তেমনি শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন, তায় অন্যায়ের কথা এখানে না তোলাই ভাল বাবা, তা হলে আমার নিজের কাজের বিচার সবার আগে হওয়া উচিত। সামু আমার চেয়ে বেশী অন্যায় করে নি। তিনি ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে এলেন। বুঝলে মঞ্জুদিদি এই হ'ল আমার মা—

রাধু চোখ বুজিল, সম্ভবতঃ সে তার মাকে মনে মনে স্মরণ করিল। মঞ্জুষা আগ্রহভরে রাধুর মুখের পানে একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া রাধু পুনরায় বেদনার্ত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, কিন্তু দিদি মানুষ ভাবে এক হয় আর। আমার স্বপ্ন, আমার কল্পনা সব দিক দিয়ে ব্যর্থ হয়ে গেল। এই সঙ্কট-সময়ে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত বাবার আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদে মুহ্যমান হয়ে পড়লাম।

অজ্ঞাতেই মঞ্জুষার কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিল, তিনি মারা গেলেন।...

রাধু বোষ্টম শান্ত সুরে জবাব দিল, হ্যাঁ মারা গেলেন, কিন্তু এইখানেই সব শেষ হ'ল না। মা কেমন আশ্চর্য্যরকম বদলে গেলেন। সেই যে লালপেড়ে শাড়ী আর মাথাভরা সিন্দুর নিয়ে তিনি ঢুকলেন ঠাকুরঘরে আর বেরুলেন না। মা জীবন দিয়ে হয়তো তাঁর আজীবনের সাধ মিটিয়ে গেলেন, কিন্তু আমি বাঁচি কি করে—কোথায় যাই—রাজ্যের যত প্রশ্ন মনের মধ্যে ভিড় করে এসে আমাকে বিহ্বল করে ফেললে। কর্তব্য হিসেবে খবরটা দাদামশাইকে চিঠিতে জানালাম।

রাধু থামিল। মঞ্জুষা বলিল, তার পর বোষ্টমদা?

রাধু জ্বালাময় কণ্ঠে জবাব দিল, জীবনে দেখা দিলে বিপর্য্যয়। আশ্রয়হীন, সহায়-সম্পদহীন আমি—কোথায় যাই, কি করি। মঞ্জুষা বলিল, তোমার দাদামশাই কোন খবর নেন নি?

রাধু একটুখানি হাসিল। বলিল, না তা নেন নি, কিন্তু তিনি আমাকে নিতে চাইলেও আমি রাজী হতাম না দিদি। যেখানে এত বড় আদর্শগত পার্থক্য সেখানে গিয়ে মানুষের মত বাঁচা সম্ভব নয়। একবার মায়ের পাষাণ-বিগ্রহের পানে চেয়ে দেখলাম। মা আমার সারাজীবন ঐ পাথরের দেবতাকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। কি শান্তি পেয়েছেন তিনি ওঁর দোর-গোড়ায় দিনরাত পড়ে থেকে! আমি ত পাঁচ মিনিটও চোখ বুঁজে ঐ বিগ্রহের সামনে বসে থাকতে পারি না। অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার ভগবানকে ঐ পাথরের মধ্যে খুঁজে পাই নি। মন বলেছে, ভগবান ওখানে নেই...আছেন মানুষের মধ্যে। যুগে যুগে ভগবান তো মানুষের মধ্যেই দেখা দিয়েছেন। তাই বুঝি মা আমার শুধু খুঁজেই গেলেন—তাঁর পাওয়া আর হ'ল না।

রাধু কিছুক্ষণের জন্ত থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে বাবার রেখে যাওয়া কিছু টাকা আমার হাতে এল। বাইরে বেরিয়ে পড়বার জন্তে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। মনটা খুশী হয়ে উঠল। একটা মস্ত বড় দুশ্চিন্তার হাত থেকে আপাততঃ নিস্তার পেলাম। অন্ততঃ একটা সান্ত্বনা যে, সেই মুহূর্ত্তে আমি কপর্দকশূন্য নই। অকস্মাৎ মনে পড়ল বাবাকে আর মনে পড়ল আমাদের সেই শেষ সাক্ষাতের মূল্যবান মুহূর্ত্তগুলির কথা। মনে পড়ল তাঁর উপদেশ। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত কোথাও যাওয়া আমার হ'ল না। আমার সাময়িক বৈরাগ্য কেটে যেতে দেরি হ'ল না। সত্যিই তো যেখানেই যাই না কেন নিজের কাছ থেকে কোথায় পালিয়ে যাব। কিন্তু শহরের কোলাহলের মধ্যেও আমার মন হাঁপিয়ে উঠেছিল। এখানকার সমাজে আমার সহজ প্রবেশাধিকার থাকবে না অথচ—

এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাধু থামিল। ঈষৎ দ্বিধা এবং সঙ্কোচের আভাস তার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্ত, পরমুহূর্ত্তেই সোজা হইয়া বসিয়া সে পুনরায় বলিতে লাগিল, মানুষ এমনি করে কত দিন বাঁচতে পারে দিদি? একটা আশ্রয় যে তার চাই-ই। অবশেষে আমার জীবনে দেখা দিলে সেই পরম ক্ষণ। আমার চলার পথে নারীর আবির্ভাব ঘটল, তাকে অবলম্বন করে আমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠতে চাইলে। মনে পড়ল বাবার কথা, মনে পড়ল মায়ের কথা। জীবনের ঋণ কি ভাবে তাঁরা পরিশোধ করেছেন সে তো নিজের চোখেই দেখেছি। কিন্তু আমার ভিতরকার মানুষটি কোন যুক্তি মানলে না। কতই বা তখন আমার বয়স—তবুও সব কথা তাকে আমি খুলে বললাম। সে জবাব দিলে, যে আসল মানুষটিকেই সে চিনেছে। এ ছাড়া কোন পরিচয় সে জানতে চায় না—এর বেশী সে কোন কিছু ভাবতে পারে না। ঠিক আমারই মনের কথাটি সে বলেছে। হাতে আমি স্বর্গ পেলাম। আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।

মঞ্জুষার অজ্ঞাতেই তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, বিয়ে হয়ে গেল!

রাধু বলিতে লাগিল, গেল বৈ কি—কিন্তু ফলে সে হারাল বাপের আশ্রয় আর আমি ধীরে ধীরে খোয়াতে লাগলাম সহজলব্ধ পিতৃবিত্ত। আর সেই সঙ্গে স্বপ্নের মাদকতাও টুটে যেতে লাগল, কিন্তু হেরে গেলে আমার

চলবে না—আমাকে বাঁচতে হবে। স্ত্রীকে বললাম, দুঃখকষ্ট সইতে পারবে তো?

তিনি হাসলেন, কিন্তু সে হাসিতে খানিকটা বিরক্তি প্রকাশ পেল। মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। ভাবলাম, এরই নাম কি স্বর্গ? তার পরেই তোমাদের গ্রামে গিয়ে ঘর বাঁধলাম। ভেবেছিলাম হয় তো গ্রাম্য পরিবেশে স্ত্রীর মনটা স্থির হবে; কিন্তু চঞ্চলা নারী তার স্বভাবধর্মকে ভুলতে পারলে না। একদিন এক দুর্যোগের রাত্রে আমার কুঁড়ে ঘর-খানির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকেও হারালাম।...

রাধু একটু থামিল, ঈষৎ হাসিবার চেষ্টা করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, বড় আঘাত পেলাম। সে আঘাত আমার জীবনের ধারাকে আগাগোড়া বদলে দিলে। মায়ের সেই পাষাণ-দেবতার কাছে আবার গিয়ে দাঁড়ালাম। এর পরেই গ্রামবাসীদের সঙ্গে ধীরে ধীরে নিবিড় পরিচয় ঘটতে লাগল রাধু বোষ্টমের। সাধু চিরদিনের জন্য মরে গেল।

রাধু বোষ্টম স্তব্ধ হইয়া গেল। মঞ্জুষা ডাকিল, বোষ্টমদা।

রাধু সাড়া দিল, কি দিদি?

মঞ্জুষা বলিল, এ কথা এত দিন বল নি কেন ভাই।

রাধু বলিল, রাধু বোষ্টমের সুখদুঃখের কথা এতদিন এমন করে ত কেউ জানতে চায় নি দিদি? তা ছাড়া আমার এই দুর্ভাগ্যের কথা কি বলবার মত।...

বহুক্ষণ উভয়ে চুপ করিয়া থাকিবার পর মঞ্জুষা প্রশ্ন করিল, তোমার সেই স্ত্রীর আর কোন খবর পাও নি বোষ্টমদা?

রাধুর মুখে পুনরায় বড় মধুর একটু হাসি দেখা দিল। সে বলিল, পেয়েছি কিন্তু বড় দেরিতে। তার জন্যে অবশ্য কারুর বিরুদ্ধে আমার নালিশ নেই। ভুল করে সে-ই কি দীর্ঘকাল কম কষ্ট পেয়েছে। ফিরে পেয়ে তাই আর নূতন করে তাকে অপমান করতে পারলাম না।

মঞ্জুষা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, তুমি মহৎ...তুমি প্রণম্য বোষ্টমদা।

রাধু শান্ত হাসিয়া বলিল, এই ভয়েতে তোমাকেও এড়িয়ে যেতে চেয়েছি। আমি আর কোন দিন সাধু হতে চাই না ভাই। আমার মাতৃপিতৃ-পরিচয়ও আজ অতীতের কথা। আমার বোষ্টম-জীবন সার্থক হয়েছে। মানুষকে সেবা করবার যে অধিকার আমি পেয়েছি তা আর কোন দুর্লভ বস্তুর পরিবর্তে কিছুতেই আমি ছেড়ে দিতে রাজী নই। কিন্তু আজ আর নয় দিদি, আমাকে এবারে বিদায় দাও।

বলিয়া আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিবার অবকাশ না দিয়া রাধু দ্রুত ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মঞ্জুষা কিন্তু বহুক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেখানে বসিয়া রহিল। রাধুর কাহিনী যেন জীবন্ত হইয়া তাহার চোখের সম্মুখে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। মঞ্জুষা যেন জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে।

নিতাইয়ের আহ্বানে সে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল। নিতাই বলিল, চা আর জলখাবার দেওয়া হয়ে গেছে। বড়বাবু আপনার জন্যে বসে আছেন। মঞ্জুষা উঠিল এবং তার বাবার ঘরে প্রবেশ করিতেই তিনি হাসিয়া বলিলেন, রাধু চলে গেল বুঝি?

মঞ্জুষার একটি নিঃশ্বাস পড়িল। সে বলিল, হ্যাঁ চলে গেছে। কিন্তু জান বাবা আসলে রাধু বোষ্টম নয়। ওর কথাবার্তায় মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হলেও এতটা কোনদিন ভাবতে পারি নি।

জীবানন্দ মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসিলেন, বলিলেন, আমি জানি মঞ্জু মা।

মঞ্জুষার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল। অবাক হইয়া তাহার বাবার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

জীবানন্দ বলিলেন, জমিদারি চালাতে গেলে অনেক খবর রাখতে হয় মা। রাধুর সব খবরই আমি রাখতাম।

বাধা দিয়া মঞ্জুষা কহিল, সে কথা ত একদিনের জন্য আমায় বল নি বাবা।

জীবানন্দ কহিলেন, সব কথা কি সব সময় বলা চলে মঞ্জু? তাতে হয় তো রাধু চলার পথে বাধা পেত। ওর বাবাকে ব্যক্তিগত ভাবে আমি জানতাম। অমন অমায়িক, চরিত্রবান, সদাশয় লোক বড় একটা দেখা যায় না। বিনয় বাগচীর কথা তোমাকে বোধ হয় গল্পচ্ছলে বহু বার আমি বলেছি।

মঞ্জুষা অপলকনেত্রে চাহিয়া রহিল। কথাটা সে মনে করিতে পারিতেছিল না।

জীবানন্দ বলিলেন, একটা চরের মামলা ওঁরই হাতে ছিল। আমার বিরুদ্ধ পক্ষ থেকে মোটা টাকা পাঠান হ'ল। তিনি কি জবাব দিয়েছিলেন জান মা? বলেছিলেন, টাকা দিয়ে সবাইকে কেনা যায় না।

মঞ্জুষা কহিল, এত খবর তুমি কোথায় পেলে বাবা?

জীবানন্দ হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, জমিদারিটাও একটা ছোটখাট রাজত্ব মা। চোখ বুজে বসে থাকলে রাজত্ব থাকে না। আমার কথাটা বুঝেছ মঞ্জু?

মঞ্জুষা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে বুঝিয়াছে—

জীবানন্দ পুনশ্চ বলিলেন, খবরটা পেলাম আমার কোন অনুচরের মুখে। বিনয় বাগচী সম্বন্ধে মনে একটা কৌতূহল জন্মাল। ফলে দিনের পর দিন আরও অনেক নূতন খবর পেতে লাগলাম। তাতে মন আমার শ্রদ্ধায় ভরে উঠল। একটা সত্যিকারের মানুষের পরিচয় পেলাম।

মঞ্জুষা মৃদু কণ্ঠে বলিল, অথচ এদের আমরা চিরদিন ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রাখি।

জীবানন্দ বলিলেন, সব সময় সেটা সম্ভব হয় না মঞ্জু মা। তাতে শৃঙ্খলা রক্ষা হয় না। স্বেচ্ছাচারিতা বেড়েই চলে।

বিনয় বাগচী অথবা রাধুর মত লোকের সাক্ষাৎ সচরাচর মেলে না। কিন্তু এদের সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করলেও একেবারে বর্জ্জন করতেও আমরা পারি নি মঞ্জু। নইলে রাধুকে কি আজ আমার বাড়ীতে বসিয়ে এমন করে আদর-আপ্যায়ন করতে পারতে? আমিই হয়ত সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতাম। মোদ্দা কথা আমাদের মনকে তৈরি হবার জন্যে কিছু সময় দিতে হবে বৈকি মা। এ যত দিন না হবে তত দিন কিছুতেই এ প্রশ্নের মীমাংসা হবে না।

কথাটা মঞ্জুষার মনের কোন দুর্ব্বল স্থানে গিয়া আঘাত দিল। তার বাবা সত্য কথাই বলিয়াছেন। মঞ্জুষা অন্তঃ হইয়া পড়িল। জীবানন্দ তাহার মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, মন যেদিন তৈরি হবে মঞ্জু সেদিন কোন বাধাই সেদিন পথরোধ করে দাঁড়াবে না। চা যে এতক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কখন আর দেবে মা?

মঞ্জুষা একটু লজ্জিত হইল।

জীবানন্দ হাসিমুখে কহিলেন, তোমাকে আর বলব কি মঞ্জু—কথা পেলে আমারই কি কাণ্ডজ্ঞান থাকে। কিন্তু তোমার কোকোটা ঢেলে দিলে না? একটু থামিয়া তিনি পুনশ্চ কহিলেন, ভাবছি চা আমিও ছেড়ে দেব।

মঞ্জুষা প্রশ্ন করিল, হঠাৎ এ কথা কেন বাবা?

জীবানন্দ জবাব দিলেন, হঠাৎ না মা, কথাটা অনেক দিন ধরেই ভাবছি।

মঞ্জুষার মুখে মুহূর্ত্তের জন্য একটু হাসি দেখা দিয়াই পুনরায় মিলাইয়া গেল। সে কহিল, বেশ তো বাবা চায়ের চেয়ে যদি কোকোটাই তোমার পছন্দ হয়, না-হয় সেই ব্যবস্থাই কাল থেকে হবে, কিন্তু আজকের চা-টা নষ্ট করো না।

জীবানন্দ চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলেন।

ক্রমশঃ

শৈবাচার্য মাণিক্কবাচকর

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

দক্ষিণ-ভারতের আধ্যাত্মিক ভূমিতে ভক্তিমার্গকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দুধর্ম্মের দুইটি বিশিষ্ট শাখা জন্মলাভ করে। বিষ্ণু এবং শিব প্রতীক—পৌরাণিক যুগের এই মহতী কল্পনার অবলম্বনে শৈব এবং বৈষ্ণব ধর্ম বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

শৈব সাধকগণ 'নায়নার' নামে বিখ্যাত। এই নায়নারগণের মধ্যে জ্ঞান-সম্বন্ধর, আপ্পার (অপ্পর-স্বামী), সুন্দরর ও মাণিক্কবাচকর সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করেন। আরাধ্য দেবতা দেবাদিদেব মহাদেবের উদ্দেশে স্তুতি-নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া ইঁহারা ভক্তিরসাত্মক ছন্দোবদ্ধ গীতিস্তোত্র রচনা করেন। চোল-সম্রাট্ রাজরাজের রাজত্বকালে জনৈক তামিল কবি কর্তৃক উক্ত শৈব ভক্তগণের প্রথম তিন জনের স্তোত্রসমূহ 'তেবারম্' (দেবহার) নামক গ্রন্থে নিবদ্ধ হয়। মাণিক্কবাচকরের স্তোত্র-গাথাগুলি পৃথক আকারে 'তিরুবাচকম্' (শোভন-উক্তি) নামক পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। 'তিরুবাচকম্' ৫১টি 'পদিকম্-' এর সমষ্টি। ইহাতে তিন হাজারেরও অধিক পংক্তি আছে। এই সকল সন্ন্যাসীর আধ্যাত্মিক প্রভাব মহাবলীপুরম্ ও কাঞ্চীর অপরূপ স্থাপত্যশিল্পকলাপূর্ণ মঠ-মন্দিরে রূপায়িত হইয়া আজও বিগত মধ্যযুগের সাধনার ধারাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে।

খ্রীষ্টীয় নবম শতকের প্রথম দিকে মাণিক্কবাচকর আবির্ভূত হন। তৎপ্রণীত 'কুবাই' ধর্মগ্রন্থে পাণ্ড্যরাজ বরগুণের কথা আছে। খ্রীষ্টীয় নবম শতকের শেষভাগে তিনি সিংহলীদের শৈবধর্মে দীক্ষিত করেন। সিংহলের 'রাজরত্নাকরী' পুস্তকেও এই ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শৈব সাধক এবং 'তেবারম্' স্তোত্র-গাথার অন্যতম কবি সুন্দররের রচিত স্তব-কুসুমাঞ্জলির মধ্যে বিভিন্ন শৈব সন্ন্যাসীদের নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু কোথাও তিনি মাণিক্কবাচকরের নামোল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, 'তিরুবিলৈয়াডল্ পুরাণম্' নামক গ্রন্থে মাণিক্কবাচকরের জীবন-আলেখ্য চিত্রিত হইয়াছে।

মাণিক্কবাচকরের আবির্ভাবকালে দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চের, চোল, পল্লব, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সময় বৌদ্ধ জৈন ও ব্রাহ্মণ্য—এই তিন ধর্মই দক্ষিণ দেশে প্রচলিত হয়। কিন্তু কোন ধর্মমতই জনগণের উপর বিশেষ প্রাধান্য বিস্তারে সমর্থ হয় নাই। অবশেষে তামিল সাধকগণের শিব-বিষ্ণুভক্তিবাদ প্রচারের ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রবল হইয়া উঠে।

পাণ্ড্য রাজধানী মদুরা শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সে যুগে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। ইহার অনতিদূরে বাদবুর্ নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে মাণিক্কবাচকর জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব আশ্রমে মাণিক্কবাচকর তিরুবাদবুরর্ নামে পরিচিত ছিলেন। তিরুবাদবুরর্ নামের অর্থ—তিরুবাদবুর্-জনপদের অধিবাসী। অতি অল্প বয়সেই তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি স্বীয় বুদ্ধিকৌশল দ্বারা পাণ্ড্যরাজ

অরিমর্দনের স্নেহলাভে সমর্থ হন। ষোল বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি রাজসরকারে কার্য গ্রহণ করেন। ক্রমশঃ স্বীয় কার্যাবলী দ্বারা মহারাজাধিরাজ অরিমর্দনের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তিনি প্রধান সচিবের পদলাভ করেন। সম্ভবতঃ পাণ্ড্যরাজ বরগুণ এবং অরিমর্দন একই ব্যক্তি।

ক্রমশঃ পাণ্ড্যরাজ তিরুবাদবুরেরের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইলেন। মহারাজ তাঁহার পার্থিব ভোগৈশ্বর্যের সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এই সময় তিরুবাদবুরেরের উপাধি হইল—'তেন্নবর ব্রহ্মরায়র্' (পাণ্ড্যের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী) সাম্রাজ্যের সর্বপ্রকার দায়িত্বপূর্ণ কার্য তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল। তিরু-বাদবুরর্ সুপুরুষ এবং ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন। কিন্তু প্রচলিত কোন ধর্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল না। ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকাকালে মাঝে মাঝে তিনি এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাব অনুভব করিতেন। সমস্ত বিলাসব্যসন তাঁহার নিকট মিথ্যা বলিয়া অনুভূত হইত। দিব্যভাবের দ্বারা তাঁহার অবচেতন মন ভগবানের সান্নিধ্যলাভের জন্য একান্ত উন্মুখ হইয়া উঠিত। তিরুবাদবুরেরের এই অশান্ত মানসিক ভাব উত্তরকালে 'তিরুবাচকম্' পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে।

ইতিমধ্যে রাজধানীতে সংবাদ আসিল, তিরুপ্ পেরুন্দুরৈ বন্দরে আরব দেশের বহু অশ্বের আমদানি হইয়াছে। আরবের অশ্ব প্রসিদ্ধ। মহারাজাধিরাজ কতিপয় সুন্দর তেজস্বী অশ্ব ক্রয় করিতে মনস্থ করিলেন। তদনুসারে প্রধান মন্ত্রী তেন্নবর ব্রহ্মরায়র্ প্রভূত অর্থ এবং শরীররক্ষীদলসহ তথায় প্রেরিত হইলেন। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে বহু দিন লাগিল। বহু অরণ্য এবং পাহাড়-পর্বতের মধ্য দিয়া যাত্রীদল অগ্রসর হইতে লাগিল। বাহকগণ অতিকষ্টে বন্ধুর পথে মন্ত্রীর শিবিকা বহন করিয়া যাইতেছিল। বন্দরের সন্নিকট এক অরণ্যবীথিকা অতিক্রমকালে অপূর্ব সঙ্গীতধ্বনি শ্রুত হইল। সঙ্গীতের ভাবমাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়া তিনি বাহকগণকে শিবিকা থামাইতে আদেশ করিলেন। শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া সঙ্গীত-লক্ষ্যে তিনি অরণ্যবীথিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। শাখাপ্রশাখাবিলম্বিত এক প্রকাণ্ড কুরুন্দ বৃক্ষমূলে তিনি জনৈক শৈব সাধুকে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মস্তকে জটাজুট, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা এবং সর্বাঙ্গে বিভূতি মাখা। তাঁহার চতুর্দিকে শিষ্য-প্রশিষ্যগণ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহারা ভক্তিসহকারে সমস্ত অন্তর দিয়া শৈব আগম গাহিতেছেন। সন্ন্যাসীর ধ্যানগম্ভীর মূর্তি এবং তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত শৈব ধর্মের ব্যাখ্যা শ্রবণে তেন্নবর ব্রহ্মরায়র্ একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করিলেন, সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমের মূর্ত প্রতীক হইলেন দেবাদিদেব মহেশ্বর। মনের সংশয় অপ-নোদনের নিমিত্ত তিনি সন্ন্যাসীকে পারমার্থিক জ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। যোগীবর স্মিতমুখে তাঁহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন। আত্মদর্শনের পথপ্রদর্শক ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসীর পদতলে পতিত হইয়া ব্রহ্মরায়র্ স্বীয় ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। তিনি শৈবধর্মে দীক্ষিত হইলেন।

ভগবানের ঐশী শক্তির নিকট আত্মনিবেদন করিয়া তিনি এক অভিনব অনুভূতি লাভ করিলেন। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর সমস্তই মিথ্যা বলিয়া তিনি প্রকাশ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি মাণিক্কবাচকর নামে সাধারণ্যে পরিচিত হন। তাঁহার দীক্ষা-গুরু আর কেহই নহেন, স্বয়ং হৃদয়েশ্বী ভগবান শিব (সুন্দরেশ)। একটি শিব-মন্দির নির্মাণের জন্য মাণিক্কবাচকর রাজদত্ত অর্থ গুরুদেবকে প্রদান করিলেন। উদ্বৃত্ত অর্থ দরিদ্রের কল্যাণে ব্যয়িত হইল। রাজ-অনুচরবর্গ প্রধানমন্ত্রীর ঈদৃশ পরিবর্তনে সবিশেষ মর্মাহত হইল; বিশেষতঃ রাজকোষের অর্থের অপব্যয় হইতে দেখিয়া তাহারা ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহারা মনে করিল, মহামন্ত্রীর এই উন্মত্ততা শীঘ্রই দূরীভূত হইবে। প্রকৃতিস্থ হইলে তাহারা তাঁহাকে কর্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। এজন্য তাহারা কিছুকাল তথায় অবস্থান করিল। কিন্তু মন্ত্রীর মধ্যে কিছুমাত্র পরিবর্তন দেখা গেল না। অনন্যোপায় হইয়া তাহারা মাণিক্কবাচকরকে রাজকার্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। সংসারের প্রতি তাঁহার কোন আকর্ষণ ছিল না; তখন তিনি সকল বন্ধনের অতীত। তিনি তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। অগত্যা তাহারা ক্ষুণ্ণমনে ভয়কম্পিত হৃদয়ে তথা হইতে মদুরার উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

অনুচরবর্গের মুখে সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া মহারাজাধিরাজ প্রথমে উক্ত ঘটনা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার বিশ্বস্ত মন্ত্রী এরূপ কার্য করিবেন—তাহা যে স্বপ্নেরও অগোচর। কিন্তু যখন তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার নির্দেশমত অশ্ব ক্রয় করা হয় নাই তখন তিনি অনুচরবর্গের সংবাদে কতকটা আস্থা স্থাপন করিলেন। মাণিক্কবাচকরের নিকট সন্দেশবহ প্রেরিত হইল। 'অগৌণে তিরুবাদবুরর্ যেন রাজসকাশে উপনীত হন'—এই বার্তা বহন করিয়া রাজ-দূতগণ মাণিক্কবাচকরের নিকট হাজির হইল। রাজাদেশ শ্রবণে নবীন সন্ন্যাসী তাচ্ছিল্যভরে উত্তর করিলেন—

"একমাত্র ভগবান সুন্দরেশই আমার রাজা; আমি অন্য কোন রাজার কথা জানি না। তথাকথিত এই সমস্ত রাজা আমার কি ক্ষতি করিতে পারে? এমন কি যে যমরাজের ভয়ে সমস্ত চরাচর থরহরি কম্পমান, তিনি পর্যন্ত প্রভুর নিকট শক্তিহীন।"

রাজদূতেরা তাঁহার নির্ভীক উত্তরে বুঝিতে পারিল বিপদ

আসন্ন। অগত্যা তাঁহারা মাণিক্কবাচকরের গুরুদেবের শরণাপন্ন হইল। গুরুদেব শিশুকে রাজসকাশে উপনীত হইবার জন্য আজ্ঞা দিলেন। বিদায়ের পূর্বে তিনি শিশুকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন :

"বৎস, নির্ভীক হৃদয়ে রাজসন্দর্শনে গমন কর। ভয়ের কোন কারণ নাই। আমার শুভাশীষ বর্মের ন্যায় সমস্ত আপদ-বিপদে তোমাকে রক্ষা করিবে। মহারাজকে বলিবে, বর্তমান মাসের উনিশে তারিখ তিনি তাঁর ঈপ্সিত ঘোড়াগুলি অবশ্য পাইবেন।"

মাণিক্কবাচকর গুরুদেবের নির্দেশমত রাজসকাশে সমস্ত বিষয় বিবৃত করিলেন। ইহা ভণ্ডামি মনে করিয়া মহারাজ তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে নির্দিষ্ট দিবস উপস্থিত হইল। প্রাতঃকালে মহারাজ এবং রাজপ্রাসাদের সকলে বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে দেখিতে পাইলেন, একজন যোদ্ধা কতিপয় সুশ্রী এবং তেজস্বী অশ্বসহ দরবার-কক্ষের দিকে আগমন করিতেছেন। মাণিক্কবাচকরের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইল। অশ্বগুলি দেখিয়া মহারাজ অত্যন্ত প্রীত হইলেন। যোদ্ধা আর কেহই নহেন, স্বয়ং ভূতেশ্বর শিব। ভক্তের গৌরববর্ধনের নিমিত্ত ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছেন। গুরুদেবের অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়া মাণিক্কবাচকরের দুই নয়নে অবিরলধারায় প্রেমাশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল। মহারাজ স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন।

দিবাবসান হইল। রজনীর অন্ধকারে সমস্ত চরাচর আচ্ছন্ন। রজনীর শেষ যামে বিকট চীৎকারধ্বনিতে সমস্ত নগরী চকিত হইয়া উঠিল। সবাই শুনিতে পাইল, শব্দ রাজবাটীর অশ্বশালা হইতে আসিতেছে। রহস্যোদ্ঘাটনের জন্য প্রাতঃকালে লোকসকল অশ্বশালার দ্বারদেশে আসিয়া ভিড় জমাইতে সুরু করিল। তাহারা দেখিল, কোন এক যাদুমন্ত্র-বলে পূর্বদিনের ক্রীত অশ্বগুলি অদৃশ্য হইয়াছে। তৎস্থলাভিষিক্ত শিবাকুল তারস্বরে ঐকতানে রত হইয়াছে এবং যদৃচ্ছাক্রমে পুরাতন অশ্বগুলিকে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাঘাতে বিদীর্ণ করিতেছে। এই বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া রাজাধিরাজ ক্রোধে-ক্ষোভে জ্ঞানহারা হইলেন। ভণ্ড তপস্বী মাণিক্কবাচকরকে ভীষণ শাস্তি দিতে অনুচরবর্গকে আদেশ দিলেন। রাজাদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল। তাহারা দ্বিপ্রহরে মাণিক্কবাচকরকে উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর দণ্ডায়মান করাইয়া এক বিরাট প্রস্তরখণ্ড তাঁহার স্কন্ধদেশে চাপাইয়া দিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া মাণিক্কবাচকর অগতির গতি আশুতোষকে স্মরণ-মনন করিতে লাগিলেন। ভক্তের কাতর আহ্বানে ভগবানের আসন টলিল। লীলাময়ের লীলা অপূর্ব! শীর্ণকায়া বৈগৈ নদীর জল ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ চঞ্চল উচ্ছ্বসিত জলরাশি বর্ধিত আকারে সমস্ত নগরী গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। সমস্ত জনপদবাসী মৃত্যুভয়ভীত হইয়া পড়িল। মহারাজাধিরাজ এই অভূতপূর্ব বন্যার আবির্ভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইহার কারণ নির্ধারণে সচেষ্ট হইলেন। অবশেষে তিনি বুঝিতে পারিলেন, মাণিক্কবাচকরের প্রতি অন্যায় ব্যবহারের শাস্তি-স্বরূপ সংহারের রুদ্রমূর্তিতে বন্যা দেখা দিয়াছে। কালবিলম্ব

মাণিক্কবাচকর, আপ্পার, জ্ঞানসম্বন্ধর, সুন্দরমূর্তি

না করিয়া মহারাজ শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত মাণিক্কবাচকরকে মুক্তি দিলেন এবং দেবরোষ হইতে জনপদরক্ষার নিমিত্ত অনুরোধ জানাইলেন। বন্যা প্রতিরোধকল্পে প্রাচীর নির্মাণের ব্যবস্থা হইল। ভগবান সুন্দরেশ যুবকের ছদ্মবেশে এই কার্যে যোগদান করিয়া নগরীকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

মহারাজাধিরাজ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, তদীয় প্রাক্তন মন্ত্রী সাধারণ ব্যক্তি নহেন। ঐশী শক্তিতে তিনি বীর্যবান্। স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তিনি অনুতপ্ত হইলেন। পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি মদুরারাজ্য তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। মাণিক্কবাচকর স্মিতহাস্যে মহারাজের দান প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ তিনি যে 'অরূপ রতনে'র সন্ধান পাইয়াছেন, তাহার তুলনায় পার্থিব ধন-দৌলত অতীব তুচ্ছ। অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ইন্দ্রত্বও তিনি কামনা করেন না। তিনি মহারাজের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক মুক্তি-তীর্থ তিরুপ্পেরুন্দুরৈ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মাণিক্কবাচকর গুরু-ভ্রাতাদের সহিত গুরুদেবের মধুর সান্নিধ্যে ধর্মশাস্ত্রাদির আলোচনায় দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। একদিন গুরুদেব তাঁহাকে নিভৃতে বলিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু আসন্ন। তিনি তাঁহার উপর শৈবধর্ম প্রচারের সম্পূর্ণ ভার দিয়া অল্পকাল পরে ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। গুরুদেবের সান্নিধ্যলাভে চিরতরে বঞ্চিত হইয়া মাণিক্কবাচকর গভীর শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই মানসিক অবস্থার বিষয় তৎপ্রণীত 'নীত্তল্ বিন্নপ্পম্' (সন্ন্যাসীর বিজ্ঞপ্তি) নামক স্তোত্রে পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর কিছুকাল অতিবাহিত হইল। মাণিক্কবাচকরের গুরুভ্রাতাগণও একে একে মহাসমাধিলাভ করিলেন। তিরুপ-পেরুন্দুরৈ তাঁহার নিকট মরু-সদৃশ প্রতিভাত হইল। এখানে তাঁহার কিছুমাত্র আকর্ষণ রহিল না। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ-ভারতের শিব-মন্দিরগুলি পরিদর্শন করিয়া অবশেষে চিদম্বরম্ নামক দেব-দেউলে উপনীত

নটরাজ

হইলেন। ইহা শৈব তীর্থগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান এবং ভূ-কৈলাস নামে অভিহিত। ইহা শৈব ভক্তগণের নিকট বারাণসী। মন্দিরে নটরাজের মূর্তি অবস্থিত। শৈব সাধকগণের সমাগমে ইহা সর্বদা কলকোলাহলে মুখরিত থাকে। পুরাকালে চিদম্বরম্ 'তিল্লৈ' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। পূর্বে সেখানে নাকি তিল্লৈ নামক বৃক্ষের এক বিস্তৃত অরণ্যানী ছিল। এই হেতু ইহা তিল্লৈ নামে সাধারণ্যে পরিচিতিলাভ করে। উক্ত স্থানের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং মন্দিরে স্থিত নটরাজের রসঘন বিগ্রহ মাণিক্কবাচকরের উপর প্রভাব বিস্তার করিল। তিনি তথায় বসবাস করিতে মনস্থ করিলেন। মাণিক্কবাচকরের অমর স্তোত্র-গাথার অধিকাংশ 'পদিকম্' সেখানে রচিত হয়। উক্ত 'পদিকম্'গুলি আধ্যাত্মিক ভাব-মাধুর্যে পূর্ণ। এ সম্বন্ধে অনেক মনীষী বলিয়াছেন—

এই সময় বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনমানসে সিংহলের বৌদ্ধরাজ চিদম্বরম্ সেখানে আগমন করেন। ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সিংহলরাজ এবং মাণিক্কবাচকরের মধ্যে তর্কযুদ্ধ হইল। শৈব ধর্মের অন্তর্গূঢ় ভাব-ঐশ্বর্যে বৌদ্ধরাজ মুগ্ধ এবং বিস্মিত হইলেন। তিনি সানুচর শৈবধর্মে দীক্ষিত হইলেন। এইরূপে মাণিক্কবাচকর গুরুদেবের অন্তিমকালীন নির্দেশ পালন করিয়া স্বীয় জীবনের আরব্ধ ব্রত সম্পন্ন করিলেন। এইবার তিনি পারমার্থিক মহামিলনের জন্য ব্যাকুলচিত্তে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

মহাশৈব মাণিক্কবাচকরের তিরোভাব অতীব বিস্ময়জনক। একদিন স্বীয় নির্জন কুটীরে বসিয়া তিনি দেবাদিদেব সুন্দরেশের উদ্দেশ্যে নিবেদিত স্বরচিত 'পাডল্' (গান) গুন গুন স্বরে গাহিতেছিলেন এমন সময় এক জন সৌম্যকান্তি সন্ন্যাসী সেখানে উপনীত হইলেন। তিনি মাণিক্কবাচকরের 'তিরু-বাচকম্' ও 'তিরুকোবৈয়ার' স্তোত্র-গাথাগুলি লিপিবদ্ধ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। সাধক মাণিক্কবাচকরের শ্রীমুখ-বিনিঃসৃত শৈব আগমগুলি সন্ন্যাসী তালপত্রে লিপিবদ্ধ করিলেন। অতঃপর তিনি তথা হইতে বিদায় লইলেন। এক দিন প্রাতঃকালে নটরাজের দেব-দেউলে অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ঘটিল। মন্দিরের পুরোহিতগণ নটরাজের অর্চনা করিতে আসিয়া বিস্মিত চিত্তে দেখিলেন, মাণিক্কবাচকরের পাণ্ডুলিপি দেবতার বেদীমূলে রক্ষিত আছে। উহাতে তিরুচিত্রম্বলম্ নামক লেখকের নাম স্বাক্ষরিত রহিয়াছে। রহস্যোদ্ঘাটনে অসমর্থ হইয়া তাঁহারা অবিলম্বে মাণিক্ক-বাচকরের সমীপে উপনীত হইলেন এবং উক্ত পাণ্ডুলিপির 'পদিকম্'গুলির ব্যাখ্যা করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। প্রত্যুত্তরে পরম শৈব মাণিক্কবাচকর একটি কথাও বলিলেন না। পুরোহিতবর্গ সমভিব্যাহারে তিনি চিদম্বরম্ মন্দিরের গর্ভগৃহে গমন করিলেন। বিগ্রহের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অঙ্গুলি নির্দেশে নটরাজের মূর্তি দেখাইয়া বলিলেন যে, এই মহান্ দেবতার মধ্যেই সমস্ত স্তোত্রগাথার তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। সাধনার দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিও। অতঃপর মাণিক্কবাচকর তিমিরান্তক নটরাজের মূর্তির সহিত মিশিয়া গিয়া অগাধ শান্তি—চিরমুক্তি লাভ করিলেন।

মাণিক্কবাচকরের কবিত্ব ও ধীশক্তি ছিল যথেষ্ট। তাঁহার প্রথম রচনা 'শিবপুরাণম্' নামে খ্যাত। রচনাটি আরাধ্য দেবতার প্রতি ভক্ত-হৃদয়ের আকুল আবেদন। ইহা ছন্দোবদ্ধ প্রার্থনাসঙ্গীত—ভাব-মাধুর্যে পরিপূর্ণ। 'নমঃ শিবায়'—এই পবিত্র মন্ত্রে রচনাটির নান্দীপাঠ করা হইয়াছে। তাঁহার 'পাডল্'গুলি আত্মদর্শনের ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ—স্বর্গীয় ভাবধারায় রসমণ্ডিত। তৎপ্রণীত 'তিরুচটকম্' একটি প্রার্থনাসঙ্গীত। ইহা 'মেয়্যুনর্দল্' (প্রকৃত জ্ঞানোন্মেষ), 'অরিবুরুত্তল্' (উপদেশ), 'শুটরুত্তল্' (ভেদাভেদ বর্জন), 'আত্মশুদ্ধি', 'কৈম্মারুকোডুত্তল্' (প্রতিদান), 'অনুভোগ শুদ্ধি', 'কারুণ্যত্তিরঙ্গল্' (ভগবানের করুণালাভের জন্য ব্রহ্মপদে আত্মসমর্পণ), 'আনন্দত্তাঘুন্দল্' (আনন্দসাগরে নিমগ্ন হওয়া), 'আনন্দপরবশম্' এবং 'আনন্দত্তায়'

নামক দশটি অংশে বিভক্ত। এই কবিতায় একশতটি স্তবক স্থান পাইয়াছে। ভক্ত-কবিশ্রেষ্ঠ মাণিক্কবাচকরের রচনাশৈলী শব্দের ঝঙ্কারে এবং ছন্দের মাধুর্যে প্রাণবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার রচিত স্তোত্র-গাথাগুলি আধ্যাত্মিকতাপূত-মন্দাকিনীধারায় পরিপ্লুত। আজও তামিল জাতি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে এগুলি গাহিয়া থাকে।

ভ্রমণ

শ্রীপরেশ চক্রবর্ত্তী

সপ্তমী পূজার দিন 'যাত্রা হ'ল সুরু'। গাড়ী 'জনতা' এক্সপ্রেস্। ইংরেজী 'ক্রাউড' শব্দের বাংলা তর্জমায় আমরা 'জনতা' শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। সুতরাং এ শব্দটার সঙ্গে উচ্ছৃংখলতা, প্রভৃতি কতকগুলি শব্দও বিশেষভাবে জড়িত। কিন্তু রাষ্ট্র-ভাষায় 'জনতা'র মানে জনসাধারণ। শেষটায় কিন্তু একই জায়গায় আসতে হয়।

জনতা এক্সপ্রেসে একটি মাত্র শ্রেণী—রেলের নিম্নতম। কিন্তু সবটাই রয়ে-সয়ে করতে হয়, অন্ততঃ অহিংস উপায়ে করতে হলে। তাই জনতা এক্সপ্রেসেও একটু বিশেষ শ্রেণীর আভাস রাখা হয়েছে—সে হচ্ছে 'সুরক্ষিত' আসনগুলি। প্রচলিত সমাজনীতির সাবেক বিধানে আমরা মধ্যবিত্ত (ইণ্টার) শ্রেণীতে পড়ি। কিন্তু অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমরা যে ক্রমশঃ 'সবার পিছে, সবার নীচে সবহারাদের মাঝে' গিয়ে পড়ছি তার খবর ক'জন রাখেন? তাই আমরা অন্ততঃ রেলের ব্যাপারে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করাটাই সুবিধাজনক বলে মনে করি। সেখানে কিন্তু শ্রেণী-সম্মানে বাধে না। সরকার বহু গবেষণা করে রেলের মধ্যম শ্রেণীটি তুলে দিয়েছিলেন, তা ভালই করেছিলেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন, সত্যই মধ্যবিত্ত বলে কোন শ্রেণী সমাজে নেই। তাই রেলের ইণ্টার ক্লাস নামটা একটু বেখাপ্পা শুনাত। দেখে শুনে মনে হয় সমাজে মাত্র দুটি শ্রেণী আছে; শোষক ও শোষিত। আর এ দুটি মিলে যে এক নূতন শ্রেণী হতে পারে তা অবিশ্বাস্য। কারণ এমন সমাজের কল্পনা করতে পারেন যেখানে শোষিত আছে কিন্তু শোষক নেই, অথবা শোষক আছে, শোষিত নেই?

রাত ন'টায় হাওড়া ষ্টেশনে পৌছলাম। পথে দু-একটি 'ঠাকুর' দেখে নিলাম বাস থেকে। পূজার সময় হাওড়া ষ্টেশনের অবস্থাটা যাঁরা নিজের চোখে দেখেন নি বা সশরীরে উপস্থিত হয়ে উপভোগ করেন নি, তাঁদের বুঝানো শক্ত। গাড়ী প্ল্যাটফরমে আসতেই কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বেধে গেল। আমরা সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নিজেদের 'সুরক্ষিত' আসনে গ্যাঁট হয়ে বসে পড়লাম। আসন-মাহাত্ম্যেই বোধ করি মনে দার্শনিক চিন্তার উদ্রেক হ'ল। মনে যে চিন্তার স্রোত বয়ে চলল তার মোদ্দা কথাটা এই যে, শ্রেণীহীন সমাজ তৈরি করলে সুখ বা আরাম বস্তুটি মর্ত্ত্যলোক থেকে অন্তর্হিত হবে। কোটি কোটি মানুষের দুঃখের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যদি একজন ভাগ্যবান্ সুখভোগ না করল তবে সে সুখের কি মূল্য আছে? শিল্পে, সাহিত্যে আপনারা কন্‌ট্রাষ্ট বা বৈষম্য পছন্দ করেন কিন্তু এ ক্ষেত্রে নয় কেন? সাম্যবাদ চায় সকলকে সুখী করতে; কিন্তু সকলকে একই অবস্থায় ফেললে দেখা যাবে সুখের অনুভূতিটাই মানুষ হারিয়ে ফেলেছে।

রেলওয়ে-কর্ত্তৃপক্ষ সুরক্ষিত আসনগুলি দেখাশুনা করবার জন্য কয়েকজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেছেন। তাঁরা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে টিকিট দেখে একটি একটি করে যাত্রীকে ভিতরে তুলে দিচ্ছেন। এত সতর্কতার মধ্যেও কিভাবে যেন দুটি অবাঞ্ছিত লোক উঠে পড়েছিলেন। তাঁরা উভয়েই বৃদ্ধ। নামবেন বর্দ্ধমানে। কিন্তু ইন্সপেকশনের বেলায় একজনকে নামিয়ে দেওয়া হ'ল। অপর জন কোন রকমে রয়ে গেলেন। বৃদ্ধটি বেশ মিশুক ও সজ্জন। আমাদের স্বেচ্ছায় ভ্রমণ সম্বন্ধে রকমারি উপদেশ দিলেন। 'তাজ'কে একবার দিনের আলোয় দেখা উচিত, আবার 'মুনলাইটে'; দু'বারই অপূর্ব্ব ঠেকবে; মনে হবে যেন দুটি আলাদা জিনিষ; ত্রিবেণী সঙ্গমে কচ্ছপের ভয় আছে, ইত্যাদি। অবশ্য আমরা তাঁকে বসবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলাম। বর্দ্ধমান ষ্টেশন আসতেই তিনি বাক্যব্যয় না করে নেমে গেলেন। রাতটা বেশ কাটল। শারদীয়া সংখ্যা কতকগুলি মাসিক, সাপ্তাহিক ছিল সঙ্গে। আকারে ছোট দেখে একখানি মাসিকপত্র তুলে নিলাম।

পরদিন সকালবেলা। পাটনা ষ্টেশনে গাড়ী থামল। ভাবলাম একটু চা খেয়ে নিই। দরজা খুলতেই কয়েকজন পাঞ্জাবী স্ত্রী পুরুষ গট গট করে ঢুকে পড়তে লাগল। প্রথমে রিজার্ভ কামরার দোহাই দিলাম, তারপর দরজাও ভেজাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সবই বৃথা। 'জনসংহরণ' বিভাগের উপর মনটা ভারী চটে গেল। কামরায় ঢুকে তাদের সে কি তেজ! পরের ষ্টেশনে বীরপুঙ্গব ও বীরাঙ্গনারা নেমে গেলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। বড়দিনের ছুটিতে পুরী যাওয়াটা

এখানেই বাতিল হয়ে গেল। কারণ স্থির হ'ল মা তখনও কাশীতেই থাকবেন। ট্রেন মোগলসরাই পৌঁছল বেলা প্রায় দেড়টায়। এখানে গাড়ী বদল করে বেনারসের গাড়ীতে উঠতে হবে। মোগলসরাইয়ের কুলিরা দেখলাম বেশ সেবাপরায়ণ। আপনাকে তারা সুস্থির থাকতে দেবে না; শুধুই 'সেবা' করবার আগ্রহ জানাবে—সেবাধর্ম্মের যদি ব্যাঘাত হয় পাছে! 'সেবা' করবার আগ্রহটা সমাজের উঁচু তলাতেও বর্ত্তমান। 'দেশের সেবা' করবার জন্য অনেককে জমিজমা বন্ধক দিয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, লোকাল বোর্ডের মেম্বর, সর্ব্বশেষে স্বাধীন ভারতের নেতা হতে চেষ্টা করতেও দেখেছি।

কাশী আর কলকাতায় আকাশপাতাল পার্থক্য। প্রমাণ দিচ্ছি: ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশন থেকে পাঁড়ে হাউলি প্রায় তিন মাইল রাস্তা। রিক্সা ভাড়া নিলে শুধু ছ'আনা করে। তাতেও কি 'কম্‌পিটিশান'। কিন্তু কলকাতায় তারাই এলে হাঁকবে 'দেড় রুপিয়া'। মনে আছে একবার এস্‌প্ল্যানেড থেকে ডালহৌসি নিয়ে যেতে এক রিক্সাওয়ালা 'পান্ সিকি' হেঁকেছিল। পূজার ছুটির আসল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত লোককে কয়েক দিনের জন্য কলকাতা ছাড়বার সুযোগ দেওয়া। এখানে কেবল শোষণ আর শোষণ। ব্যবসায়ী মহাজন, দুধওয়ালা, মাছওয়ালী, কর্পোরেশন, সবকিছু মিলে এক মহা পাপচক্রের সৃষ্টি করেছে কলকাতায়।

ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত কাশীতেই কাটালাম। অনেক বাঙালী বাস করে সেখানে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশখানা 'ঠাকুর'। একটা জিনিষ লক্ষ্য করবার—এখানকার ঠাকুর এখনও সেই সাবেক আমলের, যার চিহ্ন আমরা পটে বা ছবিতে এখন দেখতে পাই। সব মূর্ত্তিকে একত্র করে একই চালচিত্রের মধ্যে রাখা হয়েছে। বাংলাদেশে আমরা স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে একটু বেশী ওয়াকিবহাল বলে দেবদেবীদের বোধ করি একটা স্বল্প পরিসর জায়গায় ঘেঁষাঘেঁষি ভাবে রাখতে পারি নে। আর দেবী ও তাঁর ছেলেমেয়েরা পর্ব্বতে থেকে অভ্যস্ত বলে এখানেও সত্যিকারের পাহাড় না হলেও কৃত্রিম পাহাড়ে রাখাটাই আমাদের মতে যুক্তিযুক্ত। আর কলকাতার অন্ধকার সরু গলিতে অনভ্যস্ততার দরুন দর্শকদের অসুবিধে হতে পারে বিবেচনা করে আমরা মায়ের পিছনে সতত-আবর্ত্তমান অগ্নিগোলকের ব্যবস্থা করেছি, কিন্তু এখানে আজও চলছে মান্ধাতার আমলের রীতি। তবে এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, আমাদের দেবীকে দেখে মনে হয় তিনি যেন কয়েক দিন হাড় জুড়াবার জন্যেই ছেলেপুলে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে এসেছেন। অসুর মারাটা যেন গৌণ। অসুরের দিকে তিনি এমনভাবে তাকিয়ে থাকেন যে তাতে অন্তরের তেজ কিছুমাত্র প্রকাশিত হয় না। কিন্তু এখানকার মায়ের মূর্ত্তি কি তেজোদৃপ্ত, কি রোষকষায়িত চাহনি! আবার সব মিলিয়ে কি অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত! এ যে "চিত্তে স্থপা সমরনিষ্ঠু রতা চ দৃষ্টা"র নিখুঁত প্রাণবন্ত রূপায়ন!

এখানেও বাঙালীরা বেশ সভাসমিতি ক্লাব করেছেন। পূজায় সময় আমোদফূর্ত্তির ব্যবস্থাও প্রচুর হয়। অষ্টমী রাতে 'হরিহর সমিতি' কর্ত্তৃক অভিনীত 'দুই পুরুষ' দেখেছিলাম। পরের রাতে হয়েছিল 'কর্ণার্জ্জুন'। অভিনয় খুব নিখুঁত না হলেও তারা যে নিজস্ব সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এতে বেশ আনন্দ পেলাম। বিহারে বাঙালীদের অনেককে দেখেছি বাংলা ভাষাটা ব্যবহার না করলেই যেন তাদের সুবিধে হয়। বাঙালী যদি বেঁচে থাকতে চায় তবে তার একটা প্রধান করণীয় হবে প্রবাসী বাঙালীদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করা। রাষ্ট্রভাষার প্রতি আমাদের একটা তীব্র বিতৃষ্ণা আছে। কিন্তু মাতৃভাষার প্রতিই-বা আমাদের শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা কতখানি?

রামকৃষ্ণ আশ্রমের মত যে সব সঙ্ঘ সেবাধর্ম্ম উদ্‌যাপন করছে তাদের মধ্যে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ পুরোভাগে। এখানেও সঙ্ঘ দুর্গাপূজায় বেশ জাঁকজমক করে থাকেন।

বাড়ী বাড়ী স্বামীজী ও স্থানীয় গণ্যমান্যদের বক্তৃতা, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা এবং বিজয়া সম্মিলনীর ব্যবস্থা দ্বারা তারা আসর জমিয়ে বসেছেন। শহরের এক পাশে হাসপাতাল ইত্যাদি নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন মন্দির—কিন্তু যেন অপেক্ষাকৃত নীরব। সেখানেও মায়ের আরাধনা হয়ে থাকে। নবমীর অপরাহ্নে ভারত সেবাশ্রমে গিয়েছিলাম। বক্তৃতার বিষয় ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব। বিষয়টি অতি পরিষ্কার, বক্তা, শ্রোতা, বিচারক সবাই এক পক্ষের; সুতরাং সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে বেগ পেতে হয় নি। তবু বক্তাদের হুমকির অন্ত নেই, যেন কেউ তাদের কথায় প্রতিবাদ করছে। সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা অল্পই হয়েছিল, প্রায় সবটাই ছিল অপরের, বিশেষ করে নাস্তিকদের প্রতি বিষোদ্গীরণ—কংগ্রেসী সরকারও বাদ পড়ে নি। সভাপতি ছিলেন একজন গোঁড়া কংগ্রেসী। ভারতীয় সংস্কৃতির গুণগানে তাঁর বিন্দুমাত্র অরুচি নেই, কিন্তু সরকারের প্রতি খোঁচাটা তিনি সইতে পারলেন না; এর প্রতিবাদ করলেন তীব্রভাবে। অপরপক্ষ থেকে এল পাল্টা প্রতিবাদ। এ ভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলল। কোথায় ভারতীয় সংস্কৃতি, বা তার শ্রেষ্ঠত্বের কথা! সভা শেষ হ'ল এক সম্পূর্ণ অবান্তর আলোচনা দিয়ে।

বারানসী থেকে আবার যাত্রা সুরু করলাম। এবার এলাহাবাদ, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন। প্রথমে এলাহাবাদ। বেশ পরিষ্কার শহর, রাস্তাগুলি বেশ চওড়া এবং ভিড়ও খুব, বাঙালীও অনেক চোখে পড়ল। এখানে বাঙালীরা দোকানও করেছে দেখলাম। তবে খাবারের দোকান, হোটেল-

রেস্তোরাঁ ও বন্দরনীয় দোকান সবই স্থানীয় লোকের। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রয়াগ আশ্রম শহরের শেষপ্রান্তে, প্রায় ত্রিবেণীসঙ্গমের কাছে। সেদিনই ত্রিবেণীতে তীর্থস্নান করে নিলাম, মা মস্তক মুণ্ডন করলেন। নদীর ধার হতে সঙ্গম একটু দূরে। নৌকা করে যেতে হয়। স্নান সেরে এলাহাবাদ কোর্টে দর্শনীয় সবকিছু দেখে নিলাম। বিকেলবেলা টাঙ্গা করে শহরটা ঘুরে দেখা হ'ল—আনন্দভবন, স্বরাজভবন, কমলা নেহরু হাসপাতাল কিছুই বাদ গেল না। এলাহাবাদের রাস্তাগুলি দেখলাম নেহরু-পরিবারের ছাপমারা। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু রোড, কমলা নেহরু রোড, এমনি অনেক রাস্তা শহরকে বেষ্টন করে আছে। কমলা নেহরু রোডে দেখলাম একটা বিরাট অট্টালিকা তৈরি হচ্ছে, অনেকটা কলিকাতার হিন্দ্ সিনেমার মত। টাঙ্গাওয়ালা আমার কৌতূহল চরিতার্থ করলে—এটাও একটা সিনেমা। এর মালিকের পুষ্যি মাত্র দুটি, তার স্ত্রী এবং তিনি নিজে। ভাবলাম, সেই জন্যই ত তাঁদের একটা সিনেমা চাই—ভরণপোষণের-জন্য। কিন্তু তিনি কি শুধু এই সিনেমারই মালিক?

সেদিনই রাতের গাড়ীতে আগ্রা রওনা হলাম। আগ্রায় পৌঁছুতেই কয়েকজন বাঙালী আমাদের ঘিরে ফেললি। তারা হোটেলের লোক, হাতে নিজ নিজ হোটেলের কার্ড। হোটেলে উঠবার ইচ্ছাই আমাদের ছিল। কিন্তু তখন আগ্রায় খুব ভিড়। পূর্ণিমা রাত্রে তাজ দেখবার জন্য আমাদের মত অনেকে জড়ো হয়েছে সেখানে। আমাদের সুবিধামত ঘর হোটেলে পাওয়া গেল না। অগত্যা আমাদের উঠতে হ'ল এক মাড়োয়ারী ধর্মশালায়। এমন নোংরা বাড়ী আর জীবনে দেখি নি। তবু এর মধ্যেই থাকতে হবে। অবশ্য প্রাইভেট ঘর পাওয়া যেত, কিন্তু আমাদের সেখানে থাকতে ভরসা হ'ল না। তার চেয়ে ধর্মশালাই নিরাপদ। বিকেলবেলা আগ্রা কোর্টে গেলাম। মনে কত উৎসাহ উদ্দীপনা, এতদিন যা ছিল কল্পনা আজ তা প্রত্যক্ষ করতে পাব! সঙ্গে একজন গাইড নেওয়া হ'ল। লোকের যা ভিড়, তাতে আবার গাইডপুঙ্গবটি দর্শনার্থীর কৌতূহলনিবৃত্তির দিকে লক্ষ্য না দিয়ে নিজের ট্যাকের দিকেই নজর দিলে বেশী। এত বড় জায়গাটা কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমাদের দেখিয়ে দিলে। আগ্রা কোর্টে সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহ্‌জাহানের কীর্তির নিদর্শন রয়েছে। তবে বিশেষ করে শাহ্‌জাহানের নির্মিত অংশগুলিই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশী। দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, শিশ্ মহল, মমতাজের আঙিনা—জাহানারা ও রোশ্‌নারার কক্ষ ইত্যাদিও বেশ দর্শনীয়। সবচেয়ে দ্রষ্টব্য সেই জায়গাটা যেখান থেকে সম্রাট শাহ্‌জাহান বন্দীজীবনে তাজমহল দেখতেন। একটি কাচ এমনিভাবে বসানো হয়েছে যে তার মধ্য দিয়ে গোটা তাজকে বেশ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। মৃত্যুর আগে নাকি শাহ্‌জাহানকে এখানে আনা হয়েছিল এবং তাজ দেখতে দেখতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস এখানেই ত্যাগ করেন। কথাটা শুনে নদীর ওপারে তাজের দিকে তাকালাম। দেখলাম ধ্যানমগ্ন তাজ দাঁড়িয়ে আছে অপূর্ব্ব প্রশান্তির মধ্যে।

রাত ন'টায় তাজ দেখতে বেরুলাম। ট্যাক্সি, টাঙ্গার কি দর সেদিন। বেশ কিছু দক্ষিণা দিয়ে আমরা একটা টাঙ্গা ভাড়া করলাম। রাত প্রায় পৌনে দশটায় পৌঁছানো গেল তাজের পাদদেশে। লোকে লোকারণ্য। চাঁদনীরাতে তাজকে অপরূপ দেখায় বটে, কিন্তু সে সৌন্দর্য্য কি উপভোগ করবার জো আছে? শান্তচিত্তে কি তাজকে দেখবার জো আছে? কেবল লোক আর লোক, আর তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও হট্টগোল। এতে সমাধি-মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট হয় বলে আমার বিশ্বাস। মা, মামীমা, দাদা সবাই খুঁটে খুঁটে দেখতে লাগলেন। আমি যেন পালাতে পারলে বাঁচি। মেঘমুক্ত শারদাকাশ থেকে পূর্ণিমার চাঁদ নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছে তার নির্ম্মল রশ্মিজাল তাজের উপরে, নীচে ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে যমুনা। সবটা মিলিয়ে কি এক অপূর্ব্ব পরিবেশের সৃষ্টি! আর বিকৃতরুচি কতকগুলি লোক কি নির্ম্মমভাবে এই সৌন্দর্য্যলোকে কুশ্রীতার সৃষ্টি করছে! মনে হ'ল যেন শাহ্‌জাহান-মমতাজের আত্মা আকুলভাবে আবেদন জানাচ্ছে—"তোমরা চলে যাও, আমাদের শান্তিতে ঘুমুতে দাও।" কে শুনবে তাঁদের কাতর আবেদন?

রাত প্রায় একটায় ফিরে এলাম ধর্মশালায়।

পরদিন সকালবেলা মথুরার গাড়ীতে চড়লাম। রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতায় আছে প্রথমে তিনি শ্রীধামে (বৃন্দাবনে) নেমেছিলেন পরে দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পিছনে যত পাণ্ডা লেগে তাঁর প্রাণটাকে নিমেষে কণ্ঠাগত করেছিল। কিন্তু আমাদের পাণ্ডাগণ দয়া করে মথুরাতেই এগিয়ে এসেছেন। কোন্ জেলায় বাড়ী? কোন্ মহকুমায়? ইত্যাদি হরেক রকম প্রশ্ন করে একদল পাণ্ডা আমাদের হেঁকে ধরল। আমি কুতূহলী হয়ে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম—"তা আপনি চিনবেন কি করে?" যেই বলা আর যায় কোথায়? "বলুন না একবার, জানি কিনা পরে হবে।" বেশ নির্ভুল বাংলায় উত্তর এল। আমি পরীক্ষামূলকভাবে বললাম, ধরুন, ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমায়।

সুরু হ'ল সে মহকুমার যত রাজ্যের গ্রাম এবং প্রত্যেক গ্রামের কর্তাব্যক্তিদের নামের বিরাট ফর্দ। আমার কাছে সে সব অনাবশ্যক, কারণ আমি কিছুই জানি না। বাংলা হতে হাজার বার শ' মাইল দূর থেকেও তিনি আমার জন্মভূমির এত জায়গার নাম জেনে রেখেছেন, বোধ হয় গিয়েছেনও, আর আমি নিজের দেশে যাই নি। খুব লজ্জা হ'ল।

যমুনাতে স্নান করা গেল। ঘাটটা সত্যি মনমুগ্ধকর, চারদিকে কচ্ছপ, মানুষ দেখে এতটুকুও ভয় নেই। আশ্চর্য্য ঠেকল, হৃষীকেশ হরিদ্বারেও দেখেছিলাম বড় বড় মাছ এমনি অকুতোভয়ে ভেসে চলেছে।

সেদিনই শ্রীধাম বৃন্দাবনে রওনা হলাম। সেখানেও সেবাশ্রম সঙ্ঘের আশ্রমেই উঠলাম। সে রাত্রে বেশী দেখা হ'ল না। পরদিন প্রথমে 'যমুনাজী'তে স্নান। তারপর মন্দির-দর্শন। বৃন্দাবনে মন্দিরের সংখ্যা অগণ্য। প্রতি বাড়ীই মন্দির। শেষ রাত্র থেকে সুরু হয় 'জয় রাধে' 'রাধেকৃষ্ণ' রব; আর চলে প্রায় রাত বারটা অবধি। বাঙালী ভক্তের সংখ্যাও কম নয়। অনেকে বেশ বড় বড় মন্দিরের মালিক। কাশীতে দেখেছি বাঙালী বিধবারা দশাশ্বমেধ ঘাট, বিশ্বনাথ মন্দির, অন্নপূর্ণা মন্দির প্রভৃতি স্থানে আঁচল বিছিয়ে বসে থাকে ভিক্ষার আশায় আর এখানে 'রাধা-কৃষ্ণ' 'জয়-রাধে' করলেই তাদের অন্ন জোটে। অনেক অতিথিশালা আছে সেখানে অন্ন জোটাবার একমাত্র উপায় ঘণ্টাখানেক 'রাধেকৃষ্ণ' চীৎকার করা। খুব সহজপন্থা সন্দেহ নেই। আমাদের সমাজ বিধবাদের জন্যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে কিন্তু কি সুষ্ঠুভাবে তার সমাধানেরও পথ করে রেখেছে! বুদ্ধির তারিফ করতে হয়।

শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরি গোবর্দ্ধন, কুঞ্জবন, নিধুবন, গোবিন্দজীর মন্দির, শেঠজীর মন্দির, মদনমোহনের মন্দির, আরও অনেক দর্শনীয় বস্তু এখানে আছে। কোন কোন মন্দিরের কারুকার্য্য দেখলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতে হয়। কতক-গুলি মন্দির খুব প্রাচীন; মোগল আমলেরও আগেকার। বিভিন্ন যুগের স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন শ্রীধামে প্রত্যক্ষ করা যায়। কুঞ্জবন, নিধুবনের কর্তাদের রুচিবোধ সত্যই প্রশংসনীয়।

সব দেখে শুনে আমরা আবার যাত্রা করলাম পোড়ামাটির দেশে।

ছোট্ট ট্রটের বড়দিন

শ্রীপূর্ণা সিংহ

আজ বড়দিন—ছোট্ট ট্রটের ঘুম তখনো ভাল করে ভাঙে নি। এমন সময়ে কে যেন কানের কাছে ফিসফিস করে বলে গেল—আজ বড়দিন। ছোট্ট ট্রট এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। কাল রাত্রে অনেকক্ষণ সে জেগে জেগে বিছানায় শুয়ে ছিল, আর ভাবছিল, কালকের দিনটা কিছুতেই বুঝি আর এসে পৌঁছবে না। এক দৌড়ে ট্রট চুল্লীর ধারে যেখানে সে তার ছোট্ট হলদে রঙের চটিজোড়া কাল রাত্রে রেখে দিয়েছিল, সেখানে হাজির হ'ল। বিস্মিত আনন্দে সে চেঁচিয়ে উঠল। একটা ঢাক, একটা তলোয়ার, দুটো ছবির বই, এক বাক্স চকোলেট আরও কত কি টুকিটাকি জিনিষে তার চটি-জোড়া উপচে উঠে চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। সবকিছু ট্রটের জন্যে—সব। ট্রট ঘাড় ফেরাতেই দেখলে, তার মা হাসি-মুখে দরজার কাছে তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ট্রট ছুটে গিয়ে মাকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলে।

—ছোট্ট যিশু তোমাকে এই সব উপহার দিয়েছেন, তাঁর কথা তুমি ভুলে যাও নি তো সোনামণি?—মা তাকে আদর করে বললেন।

না:, ট্রট যিশুকে ভোলে নি। সে ছোট্ট যিশুর ছবি অনেক দেখেছে, তাঁকে সে ভাল করেই চেনে। ওই এতটুকু যিশু কি করে যে এত সব ভারী ভারী খেলনার বোঝা নিয়ে উঁচু উঁচু সব চিমনি বেয়ে নেমে বাড়ী বাড়ী খোকাখুকুদের বড়দিনের উপহার দিয়ে বেড়ান ট্রট তা ভেবেই পায় না। তাঁর ছবি দেখে তো কৈ কিছু বোঝা যায় না? দিব্যি টুকটুকে গোলাপী গায়ের রং, ফুটফুটে মুখ ছোট্ট খোকা। এত কাজ করে একটুও তো হাঁপাচ্ছেন না। ট্রটের কি রকম যেন আশ্চর্য্য লাগে। সে কৃতজ্ঞভাবে ছোট্ট যিশুকে ধন্যবাদ জানালে।

ট্রটের নার্স জেন এসে জানলার খড়খড়ি খুলে দিলে—চমৎকার এক ঝলক আলো এসে পড়ল ঘরের ভিতর। উজ্জ্বল নীল সমুদ্র দেখা গেল। ট্রটের মনে হল বাতাস যেন হাসি আর আনন্দে ভরা—খুশির চোটে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হাতমুখ ধোয়া আর পোশাক পরা একরকম অসম্ভব হয়ে উঠল ট্রটের পক্ষে—কেবলই তার লাফাতে ইচ্ছে করতে লাগল। খাবার বাসনা পর্য্যন্ত তার হ'ল না একটুও; অনেক বার বলে তাকে সকালের খাবার খাওয়াতে হ'ল। কোন রকমে খাওয়াদাওয়া শেষ করে সে মায়ের চেয়ারের পায়ার কাছে মাটিতে নতুন পাওয়া খেলনাগুলো নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসল। খেলনাগুলো ট্রট নানারকম ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। এটা এইভাবে দেখতে বেশ সুন্দর! আচ্ছা এবার আরও সুন্দর—বা:!

হঠাৎ ট্রটের বাবার কথা মনে পড়ল। বাবা চলে গেছেন মস্ত বড় একটা নৌকায় চড়ে অনেক দূরে পৃথিবীর একেবারে অন্ত প্রান্তে।

পোতালা রাজপ্রাসাদ, লাসানগরী

দালাইলামা ও তাঁহার রিজেন্ট বা প্রতিনিধি

আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকার

মন্দির-অভ্যন্তরে পদ্মসম্ভবের পীঠ

—বাবা যদি এখন এখানে থাকতেন বেশ মজা হ'ত। ট্রট বলে উঠল।

মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন—ট্রট শুনতে পেলে।

বাইরের দরজার ঘণ্টা বাজবার আওয়াজ শোনা গেল, তার পরেই জেন একটা মস্ত ফুলের তোড়া আর প্রকাণ্ড একটা পুতুল নিয়ে ঘরে ঢুকল। মাকে তোড়াটা আর ট্রটকে পুতুলটা দিয়ে জেন বললে, মঁসিয়ে আর্ঁ পাঠিয়েছেন। মায়ের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল আর লাল হয়ে উঠল। তিনি তোড়াটাতে মুখ লুকিয়ে ফেললেন। ট্রটের কিন্তু মোটেই পছন্দ হ'ল না ব্যাপারটা। মঁসিয়ে আর্ঁকে তার একটুও ভাল লাগে না। যদিও ট্রট জানে তিনি খুব বড়লোক আর তাঁর চেহারা বেশ সুন্দর। ট্রটকে তিনি অনেক মিষ্টি খেতে দেন, মাঝে মাঝে তাঁর গাড়ীতে করে বেড়াতে নিয়ে যান। কিন্তু হলে কি হয়—ট্রট তাঁকে পছন্দ করে না, একেবারেই নয়। ট্রটের কাছ থেকে মাকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়াই হচ্ছে আর্ঁর কাজ। কত বারই না ট্রট বেড়িয়ে ফিরে এসে দেখতে পায় আর্ঁ মায়ের পাশে বসে গল্প করছেন। ট্রট ঠিক জানে তক্ষুনি জেন আসবে আর তাকে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি অন্যত্র নিয়ে যাবে।

মা বললেন—বাঃ ট্রট, মঁসিয়ে আর্ঁ তোমাকে কি সুন্দর পুতুলটা দিয়েছেন—

ট্রট ঘাড় গুঁজে বললে ছাই, বিচ্ছিরি পুতুল।

মা একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। অনেকক্ষণ ধরে ট্রটকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, পুতুলটা বেশ সুন্দর—একেবারে চমৎকার। ট্রট শেষকালে বলে ফেললে—এর নাকটা ঠিক মঁসিয়ে আর্ঁর মত, বাঁকা—বিচ্ছিরি দেখতে।

মা খুব হাসতে লাগলেন ট্রটের কথা শুনে। ট্রট রেগে গিয়ে নাকটা দেয়ালের দিকে করে পুতুলটাকে ঘরের এক কোণে বসিয়ে রাখলে, আর মাঝে মাঝে কটমট করে চেয়ে ভয় দেখাতে লাগল তাকে।

ঘড়িতে এগারোটা বাজল। ট্রট তার নতুন ভেলভেটের কলার দেওয়া জামা, হলদে রঙের দস্তানা আর রেশমের ফিতে বাঁধা টুপি পরে মায়ের সঙ্গে গির্জায় চলল। ঢুকবার পথে আর্ঁর সঙ্গে তাদের দেখা হ'ল। মা আর্ঁকে ধন্যবাদ জানালেন সুন্দর উপহার পাঠানোর জন্যে। ট্রট কিন্তু মুখ বুঁজে রইল—আর্ঁর সঙ্গে একটা কথাও বলতে রাজী নয় সে। ট্রটের অশোভন আচরণে আর্ঁ যাতে কিছু মনে না করেন সেইজন্যে মা তাকে বিকেলে চা খাবার নিমন্ত্রণ করলেন। আর খুশি হয়ে মুখের কাছে হাত তুলে খুব নীচু গলায় কি বললেন ট্রট শুনতে পেলে না—তবে মা যে হাসলেন আর সেই সঙ্গে তাঁর মুখখানি লাল হয়ে উঠল তা ভাল করেই ট্রটের নজরে পড়ল।

গির্জায় গিয়ে ট্রট মায়ের পাশে বসল। গান হ'ল, তার পর যাজক উঠলেন বক্তৃতা দিতে। তিনি বললেন, যিশুর জন্মের কথা—সেই আস্তাবলের ভিতর যেখানে গরু আর গাধাদের রাখা হ'ত সেখানে তিনি জন্মেছিলেন। আর বললেন, তাঁর মৃত্যুর কথা।—শেষকালে তিনি উপদেশ দিলেন যে, প্রত্যেক মানুষের উচিত অন্যকে খুশি করা, অন্যকে আনন্দ দেওয়া।

ট্রট খুব মন দিয়ে যাজকের কথাগুলো শুনল—আহা সে যদি কাউকে আনন্দদান করতে পারত তা হলে ছোট্ট যিশু নিশ্চয়ই তার উপর খুশি হতেন। কিন্তু কি করে সে অন্যকে আনন্দ দেবে? ট্রট যে বড্ড ছেলেমানুষ!—তাকেই সবাই জিনিষপত্র উপহার দেয়, সে তো কাউকে কিছু দিতে পারে না—কেউ তার কাছ থেকে কিছু নেয় না।

বাড়ী ফিরে এসে ট্রট গম্ভীরভাবে ভাবতে লাগল কি করে অন্যকে আনন্দ দেওয়া যায়। মা কি সব বললেন ট্রটের কানে তা পৌঁছলই না। সে তখন ভেবে দেখছে এমন কে আছে যে খুব গরীব; খুব দীনহীন, যাকে ছোট্ট ট্রটও একটু আনন্দ দিতে পারে।

চি চি হাঁ হাঁ হাঁ—হঠাৎ বাইরে একটা বিকট আওয়াজে ট্রট চমকে উঠল। জীন-বাঁধা গাধাটাকে নিয়ে সেই মেয়েটা এসেছে। ঐ গাধার চড়ে ট্রট মাঝে মাঝে বেড়িয়ে আসে। হঠাৎ ট্রটের একটা কথা মনে হ'ল:—

আঃ! এই তো, এই গাধাটাই তো রয়েছে, যাকে বড়দিনে একটুও খুশী বলে মনে হচ্ছে না। নিশ্চয়ই যিশু নিজেই একে ট্রটের কাছে নিয়ে এসেছেন, যদি ট্রট একে একটু আনন্দ দিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে। আজ ট্রট শুনে এসেছে ছোট্ট যিশুর যেদিন জন্ম হয়েছিল সেদিন তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল একটা গাধা। এই গাধাটাই হয় তো যিশুর সেই বন্ধু—কে জানে? আর সে কিনা এতদিন এর পিঠে চড়েছে—ছিঃ ছিঃ ট্রটের দস্তুরমত লজ্জা করতে লাগল।

দুপুরের খাওয়া শেষ হলে মা চলে গেলেন মঁসিয়ে আর্ঁকে চা খাওয়াবার জন্যে সব গোছগাছ করতে। ট্রট এক দৌড়ে হাজির হ'ল সেই ছোট মেয়ে আর তার গাধাটার কাছে। খেতে বসে ভেবে ভেবে সে ঠিক করেছে গাধাটাকে নিজের খাবার থেকে কিছু ফল খেতে দিয়ে খুশী করবে।

ট্রট খুব সাবধানে আস্তে আস্তে খাবারঘরের কাছে এনে দাঁড় করাল গাধাটাকে—তার পরে ফল আনতে গেল। হায় হায়! কি হবে, লুইজা ঝি খাবার টেবিল পরিষ্কার করে ফেলেছে। একটা ফলের টুকরোও সেখানে পড়ে নেই। ট্রট জানলা দিয়ে তাকাতে গাধাটা তাকে দেখতে পেয়ে খিদে খিদে মুখ করে আরও এগিয়ে এল। চি হাঁ—ছোট্ট একটা আওয়াজ বেরোল তার মুখ দিয়ে—ট্রটের মনে হ'ল গাধাটা বলছে—

ছিঃ আমার মত ছঃখীকে মিথ্যে আশা দিয়ে ডেকে আনলে ?

ছঃখে ক্ষোভে ট্রটের চোখে জল এসে পড়ল। হঠাৎ তার চোখ পড়ল সকালবেলা মঁসিয়ে আর্ঁর দেওয়া ফুলগুলো যে ফুলদানীতে সাজান রয়েছে তার উপর।

—ঠিক, ঠিক হয়েছে ওই ছুষ্টু ইহুদীটার ফুলগুলোই সে খেতে দেবে ছোট্ট যিশুর বন্ধুকে।

ট্রট ফুলগুলো এনে রাখল গাধাটার সামনে। গাধাটা সেগুলো একবার শুঁকে দেখল, তার পর চটপট খেয়ে নিতে সুরু করলে। আনন্দে ট্রটের বুকের ভিতরে ঢিপ ঢিপ করে শব্দ হতে লাগল।

ট্রট, ট্রট, কি করছ ? তুমি কি করছ ওখানে ?

মায়ের গলার স্বরে ট্রট বুঝতে পারল একটা কিছু গণ্ডগোল হয়েছে।

শীগ্‌গির ভেতরে এস, আমার ফুলগুলো নিয়ে।

ফুলের তোড়ার অবশিষ্ট ডাঁটাগুলো নিয়ে ট্রট আস্তে আস্তে মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ইস্—মা চেঁচিয়ে উঠলেন—ছুষ্টু পাজী ছেলে, কেন মঁসিয়ে আর্ঁর দেওয়া ফুলগুলো নষ্ট করলে ?

আজকে গীর্জায় যে বললেন অন্যকে আনন্দ দেওয়া প্রত্যেক মানুষের উচিত। তা—তাই আমি গাধাটাকে আনন্দ দিচ্ছিলাম। আমি বুঝতে পারি নি যে তুমি রাগ করবে। মঁসিয়ে আর্ঁকে তুমি এত ভালবাস তা আমি জানতাম না।—আমতা আমতা করে ট্রট বললে।

মা কিন্তু কিছু বুঝতে চাইলেন না, বরং শেষ কথাটাতে ট্রটের উপর আরও রেগে গিয়ে বললেন—

মঁসিয়ে আর্ঁকে আমি মোটেই ভালবাসি না, তবে তিনি এক জন ভদ্রলোক, ভালমানুষ। ভদ্রতা করে তিনি উপহার পাঠালেন, তুমি অসভ্য ছেলে তা নষ্ট করলে কেন ?—তার পর আরও অনেক কথা বলে মা ট্রটকে বেজায় বকতে লাগলেন।

ট্রটের চোখ দিয়ে দর দর করে জল পড়তে লাগল। মা তা দেখেও থামলেন না। শেষে তিনি ট্রটকে বসবার ঘরের এক কোণায় নিয়ে গিয়ে সেখানে চুপ করে বসে থাকতে বললেন।...

ওঃ,—মা কক্ষনো ট্রটকে এ রকম করে বকেন নি। এমন কি চলে যাবার সময় বাবার দেওয়া সেই সুন্দর লকেটটা যখন ট্রট ভেঙে ফেলেছিল তখনও না। ট্রট হাতে মুখ ঢেকে অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগল। অনেকক্ষণ কাঁদবার পর চোখ মুছে সে উঠে বসল।—নাঃ পৃথিবীতে ভাল যে কি আর মন্দ যে কোন্‌টা তা বোঝবার জো নেই। ট্রট উদাস ভাবে ভাবতে লাগল।—ছোট্ট যিশু ট্রটকে ঠকিয়েছেন, গাধাটা ট্রটকে ঠকিয়েছে...

—ট্রট !

ট্রট চুপ করে শুনল।

ট্রট খোকনমণি !

ট্রট আস্তে আস্তে ঘাড় একটুখানি ফিরিয়ে দেখে মা হাসি-মুখে তার দিকে চেয়ে আছেন। আঃ ! মা তা হলে আর তার উপর রাগ করে নেই—

—ট্রট সোনামণি আমার কাছে এস—

ট্রট ঝাঁপিয়ে মায়ের কাছে গেল। মা তাকে কোলে তুলে নিলেন। ছই হাতে মার গলা জড়িয়ে ছোট্ট ট্রট চোখ বুজল। নাঃ, আর কক্ষনো ট্রট মায়ের জিনিষ নষ্ট করে তাঁর মনে কষ্ট দেবে না। কক্ষনো নয়।

ফুলের ডাঁটাগুলো দেখিয়ে মা হেসে বললেন—'বাঃ বেশ হয়েছে। এইটুকুই বা আর থাকে কেন, যাও তোমার গাধাটাকে এটুকুও খেতে দাও গিয়ে।' লাফাতে লাফাতে ডাঁটাগুলো নিয়ে ট্রট গাধার কাছে চলল।...

'আর শোন গাধাকে খাওয়ানো শেষ হলে, দৌড়ে গিয়ে আমার চিঠি লেখার কাগজ আর কলমটা নিয়ে এসে আমাকে দিও। মঁসিয়ে আর্ঁকে আজকে চা খেতে আসতে বারণ করে একখানা চিঠি লিখে দেব—আমার ভারি মাথা ধরেছে। তুমি তোমার গাধার পিঠে চড়ে চিঠিটা মঁসিয়ে আর্ঁকে দিয়ে আসবে।'

* * *

সেদিন রাত্রে ট্রট শুতে যাবার সময় রোজকার মত মা তার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন। ট্রট অভ্যাসমত প্রার্থনা আরম্ভ করলে। প্রার্থনার শেষের দিকে সে যখন বলতেলাগল, 'আমাদের প্রলোভনের মোহ থেকে মুক্ত কর, হে প্রভু ! বিপথ থেকে আমাদের তোমার মঙ্গলময় পথে নিয়ে যাও...' তখন তার কপালে এক ফোঁটা গরম কি যেন পড়েছিল।—ছোট্ট ট্রট কিন্তু তা জানতে পারে নি। প্রার্থনা শেষ না হতেই তার চোখ ছুটি জড়িয়ে এসেছিল গভীর নিদ্রায়।*

---

* আঁদ্রে লিখ্যাঁবেরজের 'ট্রটস্ ক্রিস্‌মাস্' অবলম্বনে।

রাজনৈতিক পটভূমিকায় তিব্বত

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

তিব্বতের সংস্কৃতি, ধর্ম এবং আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থার মর্মকথা বুঝিতে হইলে চারিদিকের দেশগুলির সহিত উহার সম্বন্ধ কিরূপ তাহা জানা থাকা দরকার। তিব্বতের ধর্ম ও শিক্ষাগুরু আসিয়াছিল ভারত হইতে। রাজনীতি আমদানি হইয়াছিল বিশেষ করিয়া চীন হইতে। মোঙ্গোলিয়ার সহিতও রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রচার উপলক্ষ্যে রুশিয়ার সহিতও রাজনৈতিক বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। তিব্বতের বিষয় বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে চীনের নবজন্ম,
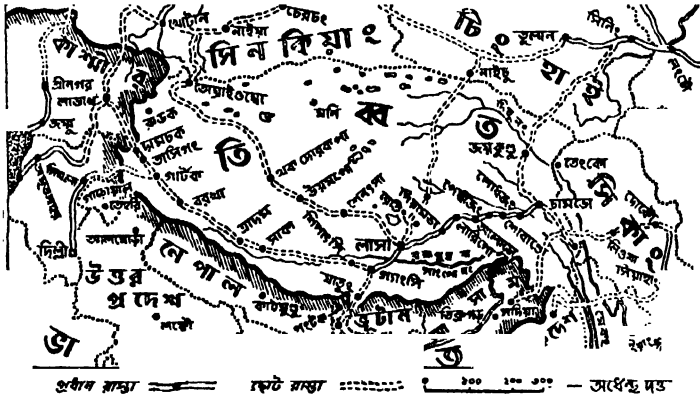
এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার লইয়া রুশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে টক্কর, ভারতের স্বাধীনতা লাভ, পাকিস্থানের জন্মের মর্মকথা, অমীমাংসিত কাশ্মীরসমস্যা, ব্রহ্মের উত্তরে ও আসাম আবর পাহাড় এবং চীন ও তিব্বতের মধ্যস্থলের অঞ্চলগুলির অধিকার লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা। আসামের পেট্রলও ভুলিলে চলিবে না। আর মনে রাখিতে হইবে ইংরেজ ও আমেরিকার পর্দার আড়াল হইতে রাজনৈতিক দাবা খেলা।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে তিব্বতের কোনও খাঁটি ইতিহাস জানা যায় না। তখনকার তিব্বতীয়গণ ছিল হিংস্র মেষপালক।

সে যুগের তিব্বত ছিল বহু খণ্ডে বিভক্ত রাজ্য। সপ্তম শতাব্দীতে রাজা সোং-ৎসেন্-গাম্পো এক অখণ্ড তিব্বত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার জন্ম হয় ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে।* তের বৎসর বয়সে তিনি রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাকে লোকে 'অবলোকিতেশ্বরে'র অবতার মনে করিত। তিনি লাসাতে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। তিনি তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যের সাহায্যে উত্তর ব্রহ্মের অরণ্যময় অঞ্চল জয় করিয়া চীনেরও কতক অংশ দখলে আনিলেন। তিব্বত-ইতিহাসে আছে যে, তিনি বঙ্গদেশও জয় করিয়া বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। বঙ্গোপসাগরকে তিব্বত উপসাগর বলা হইত। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে এরূপ কোনও তথ্যের উল্লেখ নাই। তবে আধুনিক নৃতত্ত্ব ও ভাষার গবেষণার সাক্ষি প্রমাণ হয় বঙ্গের উপর তিব্বতের প্রভাব। এই রাজা প্রথমে বিবাহ করেন নেপাল-রাজকন্যাকে। তারপর বিবাহ করেন চীন সম্রাট্‌কন্যা মিয়ংশ্যাংকে। দুই রাণীই ছিলেন বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাসী এবং উচ্চশিক্ষিতা। তাঁহাদের, বিশেষ করিয়া চীনা রাণীর প্রভাবে রাজা বৌদ্ধধর্ম্মে গভীর বিশ্বাসী হইলেন, এবং তিব্বতীয়গণ অসভ্য তিব্বতীয় জীবনযাত্রা প্রণালী ত্যাগ করিয়া সভ্য চীনের রীতিনীতি গ্রহণ করিতে লাগিল। রাজা নিজে সংস্কৃত, নেওয়ারী ও চীনভাষা জানিতেন। তিনিই ভারত হইতে গ্রহণ করিয়া তিব্বতী বর্ণমালা সৃষ্টি করেন। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য ভারত, হইতে পণ্ডিতকুমার এবং শঙ্কর ব্রাহ্মণকে, নেপাল হইতে পণ্ডিত শীলমঞ্জু ও চীন হইতেও পণ্ডিত আনাইয়া বৌদ্ধ গ্রন্থাদি তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করান। অসংখ্য বৌদ্ধমঠও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারত হইতে তিনি বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত ও ধর্ম্মগুরু আনাইয়া তিব্বতে শিক্ষা ও সভ্যতার আলো ছড়াইয়া ছিলেন। প্রথম হইতেই ভারত ও চীন উভয় দেশের প্রভাব তিব্বতের উপর রহিয়াছে। চীনাগণ বলেন যে, বর্ত্তমান তিব্বত প্রথম হইতে কেবলমাত্র চীনের প্রভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা সত্য নহে। এই রাজার আমলেই তিব্বতে সর্ব্বপ্রকার উন্নতি হয়।

সোং-ৎসেন্-গাম্পোর প্রপৌত্র রাজা ঠি-সোঙ্-ডেত্-স্যান্-এর রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্মের শান্তিপূর্ণ আওতায় আসিয়া পশ্চিম তিব্বতের হিংস্র তিব্বতীয়গণ শান্ত ও সভ্য হইয়া উঠিল। ইনিই ভারতের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধক 'পদ্মসম্ভব'কে ও সাধক "শান্তরক্ষিত"কে ভারতের উদ্যান হইতে তিব্বতে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পদ্মসম্ভব 'ভিঙ-মা-পা' সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্প্রদায়কে এখন 'লাল টুপি'র (Red hats) সম্প্রদায় বলে। ইহাই মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের এক বিশিষ্ট শাখা লামাধর্ম্ম নামে পরিচিত। তিনি সেম্যেতে প্রথম বৃহদাকার বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত করেন; এবং বহু বৌদ্ধ

---

* তিব্বতীয় ঐতিহাসিকগণ জন্ম সন সম্বন্ধে একমত নহেন। ৬০০ হইতে ৬১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল সে সম্বন্ধে দ্বিমত নাই।

ও তন্ত্র গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনূদিত করাইয়া দেন। এই রাজার আমলেই ভারত হইতে পণ্ডিত কমলশীল লাসায় গিয়া চীনে হসানমহাঘানের বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃত ব্যাখ্যা বন্ধ করেন। পদ্মসম্ভবকে মন্দিরে মন্দিরে দ্বিতীয় বুদ্ধদেব হিসাবে পূজিত হইতে দেখিয়াছি।

গায়ে তেল মাখিয়া যোড়ায় চড়িয়া কুস্তি

সোং-ৎসেনের এক পুত্র 'মুনি-ৎসানপো' রাজা হইয়া ধনী-দরিদ্রের বিভেদ বন্ধ করিবার মানসে ধনীর ধন গরিবকে বিলাইয়া দিয়া ধনসাম্য প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন। তিন তিন বার চেষ্টা বিফল হয়। ফলে কর্ম্মঠ দরিদ্র প্রচুর ধন পাইয়া হইল অলস। দেশের হইল ক্ষতি। এই দেখিয়া রাজমাতা বিষ প্রয়োগে পুত্রকে বধ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্রকে সিংহাসনে বসাইলেন।

আর একজন রাজা খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে তিব্বতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও শিক্ষার বিস্তার করেন। তিনি ছিলেন, র্যাল্পা চ্যান্। পূর্ব্বপুরুষদিগের সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া তিনি পুনরায় মগধ, উজ্জয়িনী, নেপাল ও চীন হইতে পুঁথি আনাইয়া অনুবাদ করাইলেন। অনুবাদের কাজের জন্য আনিলেন ভারতবর্ষ হইতে অধ্যাপক জীন মিত্র, সুরেন্দ্র বোধী, শীলেন্দ্র বোধী, দানশীল. এবং বোধি মিত্রকে। তাঁহাদিগকে সাহায্য করিলেন তিব্বতী পণ্ডিত রত্ন রক্ষিত, মঞ্জুশ্রী বর্ম্ম, ধর্ম্ম রক্ষিত, জীন সেন, রত্নেন্দ্র শীল, জয় রক্ষিত, কওয়াপলৎ সেগ্। বহু অসমাপ্ত গ্রন্থ সমাপ্ত হইল এবং নূতন পুস্তক অনূদিত হইল। এই রাজার আমলে তিব্বত ও চীনের মধ্যে বিরোধ বাধায় র্যাল্পা-চ্যান্ এক ভীষণ যুদ্ধে চীনকে হারাইয়া স্বরাজ্য বিস্তার করিলেন। উভয়পক্ষে এত লোকক্ষয় হইয়া-ছিল যে, চীন ও তিব্বতের বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের মধ্যস্থতায় রাজা যুদ্ধে ক্ষান্ত হন, এবং চীন ও তিব্বতের সীমানা পাকাপাকি ভাবে চিহ্নিত হয়।

ক্রমশঃ বৌদ্ধ বিরোধী দল প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহারাই র্যাল্পা-চ্যান্কে হত্যা করিল। তিব্বত সাম্রাজ্যও খণ্ডিত হইয়া গেল। পুনরায় স্ব স্ব দুর্গ ও সৈন্যসহ ছোট ছোট রাজ্য গড়িয়া উঠিল।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরুত্থান হইল ১০১৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময়ে মগধ হইতে আসিলেন পণ্ডিত ধর্ম্মপাল এবং তাঁহার তিন জন ছাত্র (তাঁহাদের উপাধি ছিল 'পাল')। তাহার পর অতীশ আসিলেন গয়া হইতে তিব্বতের ঙারিতে ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দে। তখন তাঁহার বয়স ৫৯। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মকে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন প্রধান লামা। একাদশ শতাব্দীতে পদ্মসম্ভব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত লামাধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। লামাগণই রাজনৈতিক ও পার্থিব বিষয়ে মাথা দিয়া কোনও কোনও ছোট রাজাকে পরাভূত করিয়া নিজেরাই রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। পশ্চিম-তিব্বতের শাক্য বিহারে প্রথম লামারাজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন ইউরোপ এশিয়ায় সুপ্রসিদ্ধ চেঙ্গিজ খাঁর প্রতাপ। তিনি তিব্বত জয় করিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে। মোঙ্গোলগণ এই প্রথম তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্পর্শে আসিল। ইহার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে কুবলাই খাঁ যখন চীনের সম্রাট্ তখন তিনি শাক্য মন্দিরের লামা, কাগ্পা—লোদই গ্যারাল্ট্‌সনকে (বয়স ১৯ বৎসর) ডাকাইয়া পিকিং-এ আনাইয়া নিজের ধর্ম্মগুরুরূপে গ্রহণ করিলেন। ইহার পরিবর্ত্তে শাক্য বিহারের লামারাজকেই সমগ্র তিব্বতের অধিপতি এবং বৌদ্ধ জগতের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগুরু বলিয়া চীন সম্রাট্ স্বীকার করিয়া লইলেন। তিব্বতে লামা রাজত্ব চলিল প্রায় ৭৫ বৎসর যাবৎ (১২৭০ হইতে ১৩৪৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত)। এই শাক্য লামা-দিগের রাজত্বকালেই তাঁহারা মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম অথবা লামা-ধর্ম্ম মোঙ্গোলিয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

বহুদিন পরে শাক্য-লামার শাসনের অধোগতি আরম্ভ হইল। পরস্পর কলহ চলিতেই লাগিল। লামা ধর্ম্মের মধ্যেও অনাচার প্রবেশ করিল। তখন তিব্বতে ধর্ম্মসংস্কারের চেষ্টা সুরু হইয়াছে। এই সময়টা খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষাশেষি। উত্তর-পূর্ব্ব তিব্বত হইতে সোঙ্-কাপা নামক এক ব্যক্তি ভারতীয় ধর্ম্মগুরু অতীশের শিষ্য ব্রমটনের সাহায্যে অতীশের প্রতিষ্ঠিত "কদম্-পা" সম্প্রদায়টিকে সংস্কৃত করিয়া উহার নাম দিলেন "গেলুক্-পা"। এই সম্প্রদায়ের লামাগণ বিবাহ করিতে পারেন না, মদ্যপান বা ধূমপানও করিতে পারেন না। কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া থাকিতে হয়। পদ্মসম্ভব-প্রতিষ্ঠিত ঞিঙ-মা-পা সম্প্রদায়ের লামাগণ বিবাহ করিতে পারেন। তাঁহাদের জীবনযাত্রার খুব বজ্র আঁটুনি

নাই। এই সম্প্রদায়ের সাধারণ নাম "ডুক্ পা"। পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়ের পোশাক হরিদ্রাবর্ণের, আর ডুক্পা সম্প্রদায়ের পোশাক লাল। সোঙ্-কাপা গ্যান্ডেন ও শেরাতে বিরাট গোম্ফা বা বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠা করেন।

গেলুক্পা সম্প্রদায় শাক্য বিহারের ডুক্পাদিগের চেয়ে বেশী সংযমী ও সঙ্ঘবদ্ধ ছিল। কাজেই পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইঁহাদের হাতে রাজ্যের ক্ষমতা আসিয়া পড়িল। পারমার্থিক ক্ষমতার দুইটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল, একটি লাসায়, অপরটি তাশিল্যুন্পোতে।

এই সময়ে তিব্বতের এক দরিদ্র মেষপালকের পুত্র ভাগ্যচক্রে ও সাধনার ফলে বড় বৌদ্ধ সাধক হইয়া উঠেন। তিনিই শেষে গেলুক্পা সম্প্রদায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লামা হন। তিনি ড্রেপুং-এর বিহার নির্ম্মাণ করান। ড্রেপুং, শেরা ও গ্যান্ডেনের বিহারগুলির লামাগণই আজ পর্য্যন্তও শক্তিশালী এবং দেশশাসনে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন। তিব্বতের লোক বিশ্বাস করে এই গেলুক্পা সম্প্রদায়ের প্রধান লামা, গ্যন্-ডুন্-ট্রুপ্পা তাঁহার জীবদ্দশাতেই বোধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দেহরক্ষার দুই বৎসর পরে তিব্বতবাসীরা বিশ্বাস করিল যে, একটি শিশু হইয়া তিনি পুনরায় জন্ম লইয়াছেন। এই শিশুই পুনরায় প্রধান লামা হইলেন। বোধিলাভ করিয়া পুনরায় জন্ম লইবার ধারা তিব্বতী বৌদ্ধ সমাজে এই প্রথম ঢুকিল এবং আজ পর্য্যন্তও চলিতেছে। এইরূপ ভাবে জন্ম লইয়া যিনি তৃতীয় লামা হইলেন—তাঁহার নাম সোনাম্ গ্যায়াট্‌সো। তিনি মোঙ্গোলিয়ার কয়েকজন রাজকুমার ও জনসাধারণের মধ্যে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া তাঁহাদিগকে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লন। ইহার ফলে তখনকার মোঙ্গোলিয়ার শাসক, আল্তান্ খাঁ সোনাম্ গ্যায়াট্‌সোকে "দলাইলামা বজ্রধর" উপাধি দিলেন। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত দলাইলামার ধারা ঐ প্রণালীতে চলিয়া আসিতেছে। এইজন্য দলাইলামাকে সজীব বুদ্ধ বলা হয়। অর্থাৎ তিনি বোধিসত্ত্বপদ্মপাণি এবং অমিতাভের পুনরাবির্ভাব এবং ৎসোঙ্কাপার সর্ব্বশক্তির উত্তরাধিকারী। পঞ্চম দলাইলামা ছিলেন লোব্‌জাঙ্ গ্যায়াট্‌সো। তিনি মোঙ্গোলদিগের সাহায্যে সমগ্র তিব্বতের সম্রাট্ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করিলেন, তিনিই তিব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 'চেন্-রে-সি'র অবতার। তিনি জ্ঞানী ও শক্তিশালী রাজা ছিলেন। পিকিং-এ গেলে চীন সম্রাট্ তাঁহাকে তিব্বতের স্বাধীন অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন।

পঞ্চম দলাইলামা লোব্‌জাঙের বৃদ্ধ শিক্ষকও দ্বিতীয় অবতার বা দ্বিতীয় সজীববুদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া ট্যাশিলম্পুর মন্দিরে প্রধান লামার পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইঁহাকে পঞ্চেন্ রিম্‌পোচে বা পঞ্চেন্ লামা বা টাশিলামা বলা হয়।

কয়েক বৎসর পরেই অবতারবাদে বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তিব্বতের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ সুরু হয়; এবং অনেকেই

তিব্বতী দম্পতি। মেয়েদের পরিচ্ছদ, গহনা, চুলবাঁধার প্রণালী, শিরস্ত্রাণ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য

দলাইলামা হইবার জন্য সচেষ্ট হন। দেশের আভ্যন্তরিক বিদ্রোহের সুযোগ লইয়া তাতার দেশীয় মুসলমানগণ লাসা দখল করিয়া বিহার ও মন্দির সব লুঠ করে। তিব্বতীয়গণ হতাশ হইয়া চীন সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি তিব্বত জয় করিয়া পুনরায় দলাইলামাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু এইবার দলাইলামা হইলেন কেবল পারমার্থিক গুরু। পার্থিব বিষয়ে ক্ষমতা গেল দুই জন চীন আম্বান্ বা রাজপ্রতিনিধির হাতে। তাঁহারাই হইলেন লাসায় সর্ব্বেসর্ব্বা। তিব্বত হইয়া পড়িল চীনের আশ্রিত রাজ্য। চীনের নীতি হইল যেন-তেন-প্রকারেন তিব্বতকে হাতের মুঠায় রাখা। ক্ষমতাশালী চীনসম্রাটের প্রতিনিধি পর পর নাবালক দলাইলামাকে সাবালক হইবার পূর্ব্বেই হত্যা করিয়া দেশ-শাসনের ক্ষমতা আমবানের হাতে রাখিতে লাগিলেন।

কিছুদিন যাইতে না যাইতেই তিব্বতে চীনের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব জাগিয়া উঠিল। সেই হইতে চীন ও তিব্বতের মধ্যে চলিয়াছে দমকষাকষি, এবং প্রভুত্বের জন্য নানারকম চালবাজি।

উনবিংশ শতাব্দীতে চীনের ক্ষমতা যখন কমিয়া আসিতেছিল তখন মোঙ্গোল ও তিব্বতীয়েরা মাথা চাড়া দিয়া উঠিল।

মোঙ্গোলরা কতকটা রুশ-ঘেঁষা হইয়া পড়িল। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন জাপানের কাছে পরাভূত হইল। বক্সার বিদ্রোহও মিটিয়া গেল। এই সুযোগে তিব্বত চীনকে অগ্রাহ্য করিয়া কার্য্যতঃ স্বাধীন হইয়া পড়িল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে

কারিজং-এর পথে

ত্রয়োদশ দলাইলামা স্বাধীনভাবে তিব্বতের শাসন চালাইতে লাগিলেন।* চীনের আধিপত্য নামেমাত্র রহিল।

এদিকে দক্ষিণে ভারতবর্ষ হইতে নূতন বিপদের মেঘ ঘনাইয়া উঠিল। ব্রিটিশ ভারত-সাম্রাজ্য নিরাপদ রাখিবার জন্য দার্জ্জিলিং, কালিম্পোং তাঁবে আনিয়া সিকিম ও ভুটান রাজ্যে প্রভাব বিস্তারের পর ভাবিতেছিল তিব্বতেও প্রভাব বিস্তার করা যায় কিনা। কারণ তিব্বতের সহিত সীমানা লইয়া প্রায়ই ইংরেজের মতান্তর হইতেছিল। কিন্তু তিব্বত সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান না থাকায় শরৎচন্দ্র দাস প্রভৃতি কয়েকজন ভারতীয়কে সর্ব্ববিধ সংবাদ সংগ্রহের জন্য ছদ্মবেশে তিব্বতে পাঠান হয়। চীন চায় না যে ইংরেজ তিব্বতের মিত্র হয় বা ওথায় আসে। চীন তিব্বতকে বুদ্ধি দিল যে ইংরেজ তিব্বত দখল করিবার মতলবে আছে। ইহাতে উপস্থিত হইল আতঙ্ক। ঠিক এই সময়ে ডর্জীক্ নামে একজন তিব্বত-প্রবাসী রুশদেশীয় বৌদ্ধছাত্র দলাইলামাকে বুঝাইল, রুশের মত শক্তিশালী দেশ পৃথিবীতে আর নাই এবং বহু রুশদেশীয় লোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইতেছে। রুশ তিব্বতের খাঁটি মিত্র। এই ছাত্রটি ছিল রুশসম্রাটের একজন চর। তিব্বতের ব্যাপারে রুশ হস্তক্ষেপ করায় ইংরেজের পক্ষেও নিষ্ক্রিয় থাকা সম্ভবপর হইল না। তাই লর্ড কার্জ্জন ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কর্ণেল ইয়ং হাজ্‌ব্যাণ্ডের অধিনায়কত্বে তিব্বত অভিযান পাঠাইলেন। ইংরেজের সৈন্য লাসায় পৌঁছিয়া দেখিল যে দলাইলামা মোঙ্গোলিয়াতে পলাইয়া গিয়াছেন। এই সময়ে চীন গোপনে পঞ্চেন লামাকে তিব্বতের শাসনতক্তে বসাইয়া দুইয়ের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া তিব্বতকে দুর্ব্বল করিতে চেষ্টা করিল। পঞ্চেনলামা স্বীকৃত হইলেন না। কারণ তিব্বতে চীনের প্রভাব হ্রাস পাইতেছিল এবং তিব্বতীয়গণ চীনবিদ্বেষী হইয়া উঠিতেছিল।* যাহা হউক, তিব্বত ও ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে এইরূপ চুক্তি হইল—(১) গ্যাংচি, ইয়াটুং ও গার্টকে বাণিজ্য কেন্দ্র খোলা, (২) ক্ষতিপূরণ দেওয়া, (৩) ভারত ও তিব্বতের মধ্যে বাণিজ্যশুল্ক বন্ধ করা, (৪) ইংরেজের অনুমতি ছাড়া তিব্বতে কোনও ভূমি বিদেশী রাষ্ট্রকে লিজ বা অন্যভাবে না দেওয়া। আজ ইয়াটুং ও গ্যাংচিতে এক একটি করিয়া সরকারী ভারতীয় ট্রেড এজেন্ট ও ডাকঘর এবং মাঝপথে ফারিজং-এ একটি ডাকঘর আছে। গার্টকে সাময়িকভাবে ভারতীয় বাণিজ্যদূত বাস করেন।

দলাইলামা মোঙ্গোলদেশে উর্গাতে আসিলে পিকিংস্থ রুশদেশীয় দূত মিঃ পোকোটিলফ্ উর্গাতে আসিয়া রুশসম্রাটের উপঢৌকন প্রদান করিয়া দলাইলামাকে আশ্বাস দিলেন যে রুশের বন্ধুত্বে ও সাহায্যে তিব্বত নির্ভর করিতে পারে। দলাইলামা খুশী হইয়া রুশের সাহায্য চাহিয়া দেশে ফিরিয়া চলিলেন। চীন তাঁহার তিব্বত যাওয়ায় বাধা দিল। যখন তিনি জানিলেন যে, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ইংরেজ-রুশ চুক্তি অনুসারে রুশ আর তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারে না তখন হতাশ হইয়া দলাইলামা ইংরেজের শরণাপন্ন হইলেন। জয় হইল ইংরেজের চালবাজির। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে দলাইলামাকে দেশে ফিরিবার অনুমতি দিয়া সুচতুর চীন দ্রুত তিব্বত আক্রমণ পূর্ব্বক পূর্ব্বতিব্বত দখল করিয়া লাসাতে দলাইলামাকে বন্দী করিবার জন্য ব্যগ্র হইল। সেই খবর পাইয়া দলাইলামা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ভারত আশ্রয়ে পলাইয়া আসিলেন। এইবারও (১৯১০ খ্রীঃ) চীন দলাইলামাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পঞ্চেনলামাকে সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করিল। এবারও তিনি

* এখন সংবাদপত্রে এক পঞ্চেনলামার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তিনি যথার্থ পঞ্চেনলামা নহেন। পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চেনলামা দেহরক্ষা করার পর কোথায় তিনি পুনর্জ্জন্ম লন তাহা তিব্বতের লামাগণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। চীন নিজের পছন্দমত এক নাবালককেই পঞ্চেন লামা বলিয়া চালাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। তিব্বত হইতে কতবার চীনকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে, বালককে তিব্বতে পাঠান হউক, যথারীতি পরীক্ষিত হইয়া স্থির হউক যে, পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চেনলামা এই বালকের ভিতর পুনর্জ্জন্ম লইয়াছেন কিনা। কিন্তু চীন তাহাতে রাজী না হইয়া নিজেরাই ঐ বালককে পঞ্চেনলামা বলিয়া অভিষিক্ত করিয়া লইয়াছে। তাঁহাকে তিব্বতে আসিতেও দেয় নাই। ইহা হইল রাজনৈতিক চালবাজি।

রাজী হইলেন না। তাহার ফলে চীন পূর্ব্বসীমান্ত হইতে পশ্চিমে লাডাকের কাছাকাছি গার্টক পর্য্যন্ত তিব্বত দখল করিল। দলাইলামা নেপালের মহারাজা, ইংরেজ ও রুশসম্রাট জারের নিকট সাহায্যের জন্ত অনুরোধ করিয়াও বিফলমনোরথ

কুলীদিগের চায়ের মজলিশ

হইলেন। অবশেষে দলাইলামা তিব্বতে তাঁহার কয়েকজন চর পাঠাইলেন। তাঁহারা চীনের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহের জন্ত জমিন তৈয়ারী করিল। এত বড় চীনসাম্রাজ্যকে পর-রাজ্যে বসিয়া পরাভূত করা কি স্বপ্নস্বরূপ নহে? কিন্তু অঘটন ঘটিল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ সান্-ইয়াট্ সেনের নায়কত্বে চীন-সম্রাটের বিরুদ্ধে চীনের জনগণের বিদ্রোহ ঘোষিত হইল। সুযোগ বুঝিয়া তিব্বতের চীন কর্ম্মচারীদিগকে যুদ্ধে হারাইয়া তিব্বতের জনগণ পুনরায় স্বাধীন হইল। দলাইলামা ভারত হইতে ফিরিয়া আসিলেন লাসায়।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে তিব্বত স্বাধীন দেশ বলিয়াই স্বরাজ ভোগ করিতেছে। চীন ও লাসার মধ্যে অনেকটা বন্ধুত্বভাব জমিয়া উঠিয়াছিল। তিব্বতে চীন গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ দেখিবার জন্ত কয়েকজন নিরস্ত্র কর্ম্মচারীসহ একজন চীন অফিসার লাসায় আছেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সন্ধিসূত্রে নেপাল রাজের প্রতিনিধি তিব্বতে আছেন। ব্রিটিশের এবং তৎপরে ভারতের প্রতিনিধিও তথায় আছেন ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে। ১৯৩৬ সন হইতে লাসাতে একটি ব্রিটিশ মিশনও আছেন। ভারত স্বাধীন হইবার পর উহাই হইয়াছে তিব্বতে ভারতীয় মিশন। আমাদের জাতীয় পতাকা এখন ঐ মিশনের এলাকায় উড়িতেছে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে তিব্বত ও ভারতের বন্ধুত্বও জমিয়া উঠিয়াছে।

এক দিকে যেমন তিব্বত হইতেছিল সংহত ও স্বাধীন, অপর দিকে চীনে মাঞ্চু সাম্রাজ্য ভাঙিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। তিব্বত মনে করিল মাঞ্চুসাম্রাজ্যের পতনের পর চীন ও তিব্বতের মধ্যে পূর্ব্ব রাজনৈতিক সম্বন্ধও আর রহিল না। কিন্তু চীন আদর্শে গণতন্ত্রী হইয়া কাজে সাম্রাজ্য-বাদী রহিল। পূর্ব্ব-তিব্বতের দুই-একটি করিয়া দেশ দখল করিতে লাগিল। এইবার দলাইলামা ইংরেজের পরামর্শ লইয়া চালবাজির খেলা খেলিতে সুরু করিলেন, কিন্তু সুবিধা হইল না। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম চীনের স্থানীয় নেতাগণ তিব্বতীয়দিগকে যুদ্ধে হারাইয়া পূর্ব্ব তিব্বতের বহু দেশ নিজেদের দখলে আনিলেন। চীনগণতন্ত্র তিব্বতের এই সব দেশকে দিয়া দুইটি প্রদেশ গড়িয়া তুলিলেন—(১) চিংঘাই (উত্তর-পশ্চিমে); (২) খাম্ বা সিকাঙ্গ (দক্ষিণ-পশ্চিমে)। চিংঘাই-এ চীনা মুসলমানের বসতিই বেশী। মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণের ফলে এবং তুর্কীদিগের সহিত বিবাহ করিয়া চীনা-মুসলমান সম্প্রদায় সিংকিয়াং-এর মুসলমান তুর্কী এবং চীনের বৌদ্ধ চীনাগণ হইতে বিভিন্ন প্রকারের হইয়াছিল। তাহারা বসবাস করিল তিব্বত-মোঙ্গোল বাণিজ্যপথের পাশাপাশি। ফলে দুই দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বাধা সৃষ্টি হইল। এই চীনা মুসলমানের ভিতর শ্রেষ্ঠ সৈন্ত গড়িয়া

চুম্বি উপত্যকায় আমোচু নদী

উঠিল। ক্রমশঃ তিব্বত, মোঙ্গোল ও সিংকিয়াং এবং তুর্কী-দিগের মত ইহাদেরও স্বাধীনতালিপ্সা জাগিয়া উঠিল। তিব্বতের পশ্চিমে কাশ্মীরে, উত্তরে সিংকিয়াং এবং পূর্ব্বে চিংঘাই প্রদেশগুলিতে মুসলমানের আধিক্য। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে লাসাতে এক চীনা মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মিশনের সঙ্গে রহিল বেতার ষ্টেশন, ছাপাখানা, চীনা স্কুল ও সশস্ত্র রক্ষী ইত্যাদি। অবস্থা বুঝিয়া একটি ব্রিটিশ ভারতীয় (আজ যাহা ভারতীয়) মিশনও লাসায় বসিল।

এদিকে চীনে মার্কসবাদ শিকড় গাড়িতেছে দেখিয়া তিব্বতের হইল আতঙ্ক। তাহারা চীনের অধীনতার নাগপাশ হইতেও ইহাকে অধিকতর বিপদের বিষয় মনে করিল।

ইয়াটুং-এ বন্যা-বিধ্বস্ত পল্লীর অবশিষ্ট কয়েকটি ঘর

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিল। ত্রয়োদশ দলাইলামা দেহরক্ষা করিলেন। তিব্বতের নূতন দলাইলামা কে হইবেন তাঁহাকেও চীনের এলাকাধীন পূর্ব্ব-তিব্বতে খুঁজিয়া পাওয়া গেল। তাঁহার অভিষেক হইল ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া দখল করিয়া ব্রহ্মদেশও জয় করিল। চীন-ব্রহ্মদেশ পথটি দিয়া চীনে আর কিছু পাঠানো সম্ভব হইল না। চীন কোণঠাসা হইয়া গেল। এই যুদ্ধে চীনের মিত্রগণ উহাকে সাহায্য করিবার জন্য নানা ফন্দি-ফিকির খুঁজিতে লাগিলেন। পশ্চিমে রুশিয়া জার্ম্মানীর সহিত যুঝিতে ব্যস্ত। চীন-তুর্কীস্থানের ভিতর দিয়া চীনকে সাহায্য করা রুশিয়ার পক্ষেও সম্ভব হইল না। চীনকে সাহায্যের একমাত্র পথ রহিল ভারত-তিব্বতের মধ্য দিয়া। আমেরিকা লাসায় এক মিশন পাঠাইল। তাঁহারা ভারত-তিব্বত-পশ্চিমচীনের ভিতর দিয়া চীনকে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলেন। আমেরিকানরা বুঝিতে পারিল তিব্বত সুশাসিত স্বাধীন দেশ; এবং ভবিষ্যতে ইহাই হইবে আকাশ-যানের একটি বড় ঘাঁটি। তিব্বত সম্বন্ধে তাহাদিগের এই মনোভাব চিয়াং-কাইশেকের ভাল লাগিল না।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কিংবা উহার কাছাকাছি সময়ে চীনের কম্যুনিষ্ট সৈন্যগণ চীনের জাতীয় সেনাদলের সহিত মিশিয়া গেল। ইহার ফলে জাপান-অধিকৃত চীনের অংশে কম্যুনিষ্ট প্রভাব বাড়িল।

যুদ্ধের সময়ে রুশিয়া যখন জার্ম্মানীর কাছে হারিতেছিল তখন চিয়াং-কাইশেক চীনা তুর্কীস্থানে (সিংকিয়াং) রুশিয়ার প্রভাব নষ্ট করিয়া দিয়া নিজের ইচ্ছামত গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন। রুশিয়ার তখন উপায়ান্তর ছিল না। তাই সে কাজাক বিদ্রোহ সৃষ্টি করিয়া উত্তর সিংকিয়াঙের তিনটি জেলা নিজ তাঁবে আনিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চীনাতুর্কীর জাতীয়তা-বোধকে চীনা-বিদ্বেষের কাজেও লাগান হইল।

ইহার পরেই চিয়াং-কাইশেক তিব্বত অধিকারে আনিবার জন্য পুনরায় মন দিলেন। পশ্চিমচীনের চিংঘাই ও সিকাঙ প্রদেশের গবর্ণর দুই জনকে তিব্বত আক্রমণের আদেশ দিলেন। সিকাঙের প্রদেশপাল ত আদেশ পালনে অস্বীকারই করিলেন। আমেরিকা হইতে যে সকল যুদ্ধোপকরণ অনেক কষ্টে চিয়াং-কাইশেককে দেওয়া হইয়াছিল জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার জন্য, তিনি উহারই কতক অংশ পাঠাইলেন চিংঘাইতে তিব্বত

কম্যুনিষ্ট যখন চিংঘাই প্রদেশ আক্রমণ করিল তখন তিব্বত কলহ ভুলিয়া চীনকে সাহায্য করিল। কম্যুনিষ্টদিগের এই অভিযানে ক্ষতিও হইল যথেষ্ট, এবং অবশেষে হটিতেও হইল।

ইতিমধ্যে চীনের সহিত জাপানের বিরোধ বাধিয়া উঠিল। জাপান অন্তর্মোঙ্গোলিয়া দখল করিয়া তথায় চীনবিদ্বেষী প্রদেশপালের অধীনে গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিল। ইহার দক্ষিণে পড়িল চীনা কম্যুনিষ্টগণ। ফলে তাহারা সোভিয়েট রুশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। সোভিয়েট রুশিয়াও তাহাদিগকে সাহায্য করার আশা ছাড়িয়া দিল। তাহারা নিজ শক্তির বলেই বাঁচিয়া রহিল। সোভিয়েট রুশিয়ার তিব্বতে প্রবেশের আশাও আর রাখিল না। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বন্ধুত্বের চুক্তি করিয়া সোভিয়েট মোঙ্গোলিয়াতেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। সেখানকার জনগণ স্বাধীনতালাভ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিল সোভিয়েট রুশিয়ার হুকুমদার গবর্ণমেণ্ট। ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্মেও ভাটা পড়িল।

পশ্চিমে সিংকিয়াঙে সোভিয়েট রুশিয়া নিজেদের ইচ্ছামত গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজেদের সৈন্য মোতায়েন রাখিয়া সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিল। ব্রিটিশ-ভারত প্রমাদ গণিয়া কাশগড়ের মুসলমানদিগের সাহায্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করাইল। তিব্বত মনে করিল এত বড় কুয়েন্‌লুন্ পর্ব্বতমালা যখন পথ আগলাইয়া আছে তখন ঐ পথে সোভিয়েট তিব্বতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

জাপান ক্রমশঃ চীনের বহু দেশ দখল করিতে লাগিল। চিয়াং-কাইশেক মনে করিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিলেই তাঁহার হইবে কিস্তিমাত। মধ্য এশিয়ায় ও তিব্বতে তিনি ক্ষমতা বিস্তার করিবেন।

আক্রমণ করিতে। চিংঘাই-গবর্ণর জয়কুণ্ডের (চীন-তিব্বত সীমান্তে) কাছে একটা নামমাত্র আক্রমণ করিয়া থামিয়া গেলেন। তিব্বতের রিজেন্ট ও জাতীয় পরিষদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া বোধ হয় চীন-প্রদেশপালের চেষ্টা থামিয়া গেল। চীনের তিব্বত-জয়ের সুযোগও নষ্ট হইয়া গেল।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান যখন হারিয়া গেল তখন সোভিয়েট রুশিয়া মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া চীনের কম্যুনিষ্ট-দিগের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্রমশঃ চীনে কম্যুনিষ্টগণ বাহুবলে দেশ-শাসনের ভার লইলেন। চিয়াং-কাইশেকের পতন হইল।

এদিকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত স্বাধীন হইল। ইংরেজ ভারত ত্যাগ করিল। স্বাধীনতালাভের পর খণ্ডিত ভারতের কতকটা দুর্ব্বলতা আসিবেই। একে একে ব্রহ্মদেশ, লঙ্কাদ্বীপও স্বাধীনতালাভ করিল। তিব্বতের ভেকিয়া লিঙকাতে ব্রিটিশ-ভারতীয় মিশন থাকিত। এখন মধ্য-এশিয়া ও হিমালয়ে অবস্থিত জাতিগুলির রক্ষার ভার পড়িল ভারতের উপর। তিব্বত এতকাল শক্তিশালী ব্রিটিশ-ভারতের নিকট যে সাহায্য নানাভাবে পাইয়া আসিতে-ছিল স্বাধীন ভারতের নিকট ঠিক সেই সাহায্য আশা করিতে পারে কি? তিব্বতের সমস্যা—খণ্ডিত দুর্ব্বল ভারতের সঙ্গে যোগ রাখিয়া ভবিষ্যতে তাহার সাহায্যের উপর নির্ভর করিবে, না তাহার স্বাধীনতা পৃথিবীর বড় বড় শক্তিশালী জাতিগুলির দ্বারা স্বীকৃত করাইয়া লইবে?

তিব্বতের বর্ত্তমান কর্ণধারগণের মধ্যে এই বিষয়ে দুইটি দল আছে। এক দলের আশা—নেহরু গবর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ-ভারতের নীতিই পালন করিবেন; চীন ও কম্যুনিজম্ হইতে তিব্বতকে রক্ষা করিতে পারিবেন। অপর পক্ষ মনে করেন, খণ্ডিত দুর্ব্বল ভারতের নিজেরই বা ভবিষ্যৎ কি তাহা কে জানে? বর্ত্তমান ভারতের সাহায্যের উপর নির্ভর করা সমীচীন হইবে না। তিব্বতীয় সেনাকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া নিজেদের পায়ে দাঁড়াইয়া শক্তিশালী হওয়া দরকার। পৃথিবীর বড় বড় জাতিগুলির সহিত যোগ রাখিয়া ইউনাইটেড নেশ্যানস্-এর সদস্যশ্রেণীভুক্ত থাকাই ভাল।

তিব্বত যদি আকাশযানের ঘাঁটি হয়, তাহা হইলে পাকিস্থান, চীন, রুশিয়া, নেপাল, সিকিম, ভূটান, আবর ও মিশমি পাহাড়, আসাম, কাশ্মীর কোন অঞ্চলই বেশী দূরে হইবে না। এই প্রকার দেশ যে শক্তিশালী জাতির তাঁবে থাকিবে তাহার পক্ষে সমগ্র এশিয়ার প্রভাব বিস্তার করা সহজ হইবে। সুতরাং সমগ্র এশিয়ার উপর নজর রাখিয়া সোভিয়েট রুশিয়া যদি চীনা তুর্কীস্থানে এবং কম্যুনিষ্ট চীন যদি তিব্বতে পা বাড়ায় তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে কূট-নীতি হিসাবে উহা ভুল হইবে কি?

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে চীনের তিব্বত আক্রমণের উদ্দেশ্য বুঝা সহজ হইবে। এই প্রসঙ্গে পূর্ব্ব-তিব্বত ও পশ্চিমচীনের সীমানা সম্বন্ধেও মোটামুটি ধারণা থাকা দরকার। মানচিত্রে দেখিতে পাইবেন আসামের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে তিব্বতের চংরেঙ মঠ। ইয়াংৎসি নদীর প্রায় ৫০ মাইল পশ্চিমে তিব্বতের চামডো শহর। এ স্থানটি লাসা হইতে চীনের চিয়েনলু পর্য্যন্ত বাণিজ্যপথের ধারে অবস্থিত। এখানে তিব্বতীয় সৈন্যের একটি ঘাঁটি আছে। ১৯৪৭ হইতে চামডোর শহরতলীতে একটি বেতার ষ্টেশনও খোলা হইয়াছে। নদীর অপর পারে চীন অধিকৃত পূর্ব্বতিব্বতস্থ বাটাং শহরে চীনা সৈন্যের ঘাঁটি আছে। চামডোর উত্তরে ৎসাঙমে গিরিবর্ত্ম দিয়া কোকোনর হ্রদ হইয়া মোঙোলিয়ায় যাওয়া যায়। এই পথের মাঝে জয়কুণ্ডু শহর। এখানে আছে জেনারেল মা-পু-ফাং-এর দুর্দ্ধর্ষ চীনা মুসলমান সৈন্যের সমাবেশ। এই সেনানী লক্ষ্য করিয়া তিব্বত গবর্ণমেণ্ট নাগচুকাতে সৈন্য বসাইয়াছেন। চংরেঙ মঠ হইতে আসামে আসিতে হইলে পথে পড়ে জঙ্গলময় প্রদেশ (যাহা পণ্ডিত নেহেরু পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন উহা ভারতের, কিন্তু চীনা গবর্ণমেণ্ট নিজেদের ম্যাপে দেখায় তাহাদের বলিয়া, আর এতকাল তিব্বত করিত জোর করিয়া খাজনা আদায়), তাহার পরেই আবর ও মিশমি পাহাড়। খাস আসামে আছে পেট্রল। কাজেই উত্তর-পূর্ব্ব সীমানায় ভারতকে যথেষ্ট সজাগ থাকিতে হইবে। নেপাল, কাশ্মীর ও ভুটানের ত চিন্তা আছেই।

যে উদ্দেশ্যেই চীন তিব্বত আক্রমণ করুক, স্বাধীন ভারতের গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দ্রুত কাজ করিবার সময় আসিয়াছে। এখন আমাদের সমাজ-সংহতি, নৈতিক উচ্চমান, স্বদেশীয় সংস্কৃতিপ্রীতি ও স্ব-ধর্ম্মমতের দৃঢ়তা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলায় ঐতিহাসিক গবেষণার সমস্যা

শ্রীযদুনাথ সরকার

ভারতের ইতিহাসে গবেষণা করিবার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আমার মনে প্রথম জেগে উঠে, বি-এ পরীক্ষা দিবার পরই, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। আর আজ সে দিন হইতে ষাট বৎসর পরে এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমাদের দেশে ঐতিহাসিক গবেষণার কি প্রগতি হয়েছে তা বিচার করিবার অবসর পেয়েছি। এই ষাট বৎসরে বাংলা দেশে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে তাহা তুলনা করিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাই। আমাদের দেশের প্রবীণ লেখক ও নবীন গবেষক ছাত্র ইতিহাস-চর্চ্চার প্রণালীতে এবং রচিত ইতিহাসের উৎকর্ষে আশ্চর্য্য উন্নতি সাধন করেছেন এবং সে উন্নতি এ পর্য্যন্ত ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এই সব কর্ম্মী বছর বছর উচ্চ হইতে উচ্চতর, কঠিন হইতে কঠিনতর স্তরে উঠেছেন।

দু' একটা দৃষ্টান্ত দিলেই এই সত্যটি পরিষ্কার বুঝান যাবে। বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের আদি যুগের কর্ম্মী কৃষ্ণবিহারী সেন অথবা রামদাস সেনের লেখার পাশে আজকার দিনের বেণীমাধব বড়ুয়া অথবা প্রবোধচন্দ্র বাগচীর রচনা রাখা যাউক। অথবা ব্রিটিশ-যুগের ইতিহাসে রজনী গুপ্ত এবং অক্ষয় মৈত্রেয়র গ্রন্থ ও প্রবন্ধের পাশে আমাদের সমসাময়িক ব্রজেন বন্দ্যো ও অন্যান্য নবীন গবেষকের শ্রমফল বসাইয়া বিচার করা যাউক। প্রাচীন হিন্দু-যুগের গবেষণায় সেই সেকালে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদিত বৃহদ্দেবতা ও ললিতবিস্তরের সঙ্গে ত্রিশ বত্রিশ বৎসর পরে অধ্যাপক ম্যাকডনেল-সম্পাদিত বৃহদ্দেবতা এবং লিউমান-সম্পাদিত ললিতবিস্তর তুলনা করা যাউক।

অথচ ইংরেজী শিক্ষার সেই প্রথম যুগের ভারতীয় গবেষকগণ প্রত্যেকে অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন এবং যথাসাধ্য শ্রমও করেছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের শ্রমফল জগতের পণ্ডিত-সভায় খাঁটি জিনিষ বলিয়া স্থান অধিকার করিতে পারে নাই, পরবর্ত্তী কর্ম্মীদের রচনা তাহা বাতিল করিয়া দিয়াছে।

এই পার্থক্যের কারণ দুটি। প্রথমতঃ বর্ত্তমানের কর্ম্মীরা এক ভিন্ন প্রণালী মেনে চলে, এবং দ্বিতীয়তঃ এখন আমাদের হাতে যে ঐতিহাসিক উপাদান এসে জমা হয়েছে তাহা রামদাস সেন বা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের যুগ থেকে অনেক বেশী, ফলে তাঁহারা ও আমরা যেন দুটি ভিন্ন দেশের, ভিন্ন যুগের লোক। এখন আর সিয়ার-উল-মুতাখরীনের হাজী মুস্তাফাকৃত ইংরেজী অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া আলীবর্দী ও সিরাজ, মিরজাফর ও নবাব কাসিম আলীর ইতিহাস লেখা চলে না।

গবেষণার এই নবীন প্রণালীর দুইটি ধারা—প্রথমটি এই যে, গবেষককে একেবারে আদিতম ঐতিহাসিক উপাদান অর্থাৎ দলিলে পৌঁছিতে হবে। সর্ব্বপ্রথম সাক্ষীর এজাহার যত দূর সম্ভব বাহির করিতে হইবে এবং তাহা আদি ও অবিকৃত আকারে, অর্থাৎ সাক্ষীর নিজের কথাগুলি পড়িতে হইবে, তাহার অনুবাদ বা পরবর্ত্তী কালের অন্য লেখকের গ্রন্থে দেওয়া সংক্ষিপ্তসার পড়িলে চরম সত্যে পৌঁছান যায় না। আমাদের মধ্যে প্রথম যুগে বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চা আরম্ভ হয়, বির্নুফ যে সংস্কৃত হইতে ফরাসী অনুবাদ এবং সংকলন প্রকাশ করেন অথবা কাউএল ও রিজ্‌ডাভিডস্ পালি গ্রন্থের যে ইংরেজী অনুবাদ ছাপাইয়াছেন তাহার উপর নির্ভর করিয়া। সে প্রণালী এখন অচল হয়েছে। আমাদের হালের গবেষকগণ আদি পালি এবং নেপাল ও মধ্য-এশিয়ায় পাওয়া সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য না পড়িয়া এক কথাও লিখিতে পারেন না।

তেমনি মুঘল ইতিহাসের ক্ষেত্রেও। খাফি খাঁ তাঁহার ইতিহাস হায়দরাবাদে বসিয়া ১৭৩৪ সালে সমাপ্ত করেন। শাহজহান (রাজত্ব শেষ ১৬৫৮ সালে) এবং আওরংজীব (মৃত্যু ১৭০৭ সালে) এই দুই বাদশা সম্বন্ধে খাফি খাঁ প্রত্যক্ষদর্শী নহেন; অথচ যেহেতু খাফি খাঁর পার্সী ইতিহাসের এই অংশটা এলিয়ট ও ডসন ইংরেজীতে অনুবাদ করে ছেপেছেন, অতএব আমাদের সেকালের কর্ম্মীদের এই অনুবাদের উপর নির্ভর করা ভিন্ন পন্থা ছিল না। কিন্তু ইহাতে মৌলিক গবেষণা হইতে পারে না। ঐ দুই বাদশার হুকুমে লিখিত পার্সী ইতিহাসই আদি উপাদান। অবশ্য তাহার মধ্যে খোশামোদ ও অতিরঞ্জনের সম্ভাবনা পদে পদে বিচার করিয়া, কষ্টিপাথরে ঘষিয়া তবে খাঁটি সত্য লাভ করিতে হইবে। কিন্তু ঐ বাদশাহের সরকারী ইতিহাস, অর্থাৎ পার্সী বাদশানামা, আলমগীরনামা ইত্যাদি পর্য্যন্ত আদিতম উপাদান নহে; এগুলি পরে রচিত গ্রন্থ। তাদের ভিত্তি অপর এক শ্রেণীর পার্সী দলিল, যাহার নাম আখ্‌বারাৎ অর্থাৎ হাতে লেখা সংবাদপত্র, এবং ডেস্‌প্যাচ্ অর্থাৎ কর্ম্মচারীদের পক্ষ হইতে পাঠানো রিপোর্ট বা চিঠি। এগুলি বাদশাহী দপ্তরখানায় জমা রাখা হইত, এবং ইহা পড়িয়া ঐসব 'নামা' বা সরকারী ইতিহাসের লেখক তাঁহাদের গ্রন্থের তথ্য সংগ্রহ করিতেন, যেমন আজকাল সব দেশে সরকারের পক্ষ হতে গত দুই বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস সংকলন করা হচ্ছে। আমি আওরংজীবের রাজ্যকালের এবং অষ্টাদশ শতাব্দী ধরিয়া, মারাঠা আবদালী শিখ রাজপুতদের দিল্লীর তখ্‌ৎ ঘিরিয়া সন্ধি-বিগ্রহের সহস্র সহস্র আখ্‌বারাৎ ও পত্র সংগ্রহ করিয়া কাজে লাগাইয়াছি।

এই হ'ল ইতিহাস-রূপিণী ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে অক্লান্ত যাত্রা। তার পর, নবীন প্রণালীর দ্বিতীয় ধারা হচ্ছে এই যে, সবগুলি সাক্ষীকে একত্র করতে হবে। যত বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন স্থানে, আমার নির্বাচিত বিষয়ের উপাদানগুলি আছে তাহা সংগ্রহ করে পড়তে হয়, ভিন্ন ভিন্ন দলের সাক্ষীর জবানবন্দীর ঘাতপ্রতিঘাত সন্দেহের চোখে নিরপেক্ষভাবে বিচার করে তবে প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করা যায়। যেমন, ভাওয়াল-সন্ন্যাসীর মোকদ্দমায় সবজজের সামনে কুমারের পক্ষে এক হাজার এবং রাণীর পক্ষে ১৯৯ জন সাক্ষী—অথবা ঐমত—ডাকা হয়। যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত একতরফা বিচারের রায় মাত্র তাহা স্থায়ীভাবে গৃহীত হতে পারে না।

এইরূপে সব দেশ থেকে সব ভাষায় লেখা ঐতিহাসিক মালমসলা সংগ্রহ করবার সুযোগ আজকাল যেমন হয়েছে তাহার দশ ভাগের এক ভাগও ষাট বৎসর আগে ছিল না। এর কারণ এখন একরকম খুব শস্তা ফটোগ্রাফ হয়েছে যাহাতে বিলাতের দুষ্প্রাপ্য বই বা হস্তলিপির অবিকল ছবি আমরা এদেশে বসে আনাতে পারি, এগুলিতে হাতে নকল করার ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা ও বিরাট ব্যয় নাই। আর জগতে যত বিখ্যাত গ্রন্থাগার আছে তাহাদের মুদ্রিত গ্রন্থ ও হস্তলিপি, শিলালিপি, মুদ্রা প্রভৃতির অতি বিস্তৃত বর্ণনাপূর্ণ তালিকা ছাপা হয়েছে। এই সব *Catalogue raisonne*গুলি পর্যন্ত আশ্চর্য শিক্ষাপ্রদ।

বিগত ষাট বছরে আমাদের মধ্যে মৌলিক গবেষণার এত উন্নতি হয়েছে, তাহা যে ইউরোপীয়দের শিক্ষা, দৃষ্টান্ত ও সংঘর্ষের ফলে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। ভারত স্বাধীন হওয়ার ফলে এই ইউরোপীয় শিক্ষা ও সংঘর্ষ বন্ধ হইয়াছে। এই রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে আমাদের মধ্যে ঐতিহাসিক গবেষণার উৎকর্ষ যাহাতে দিন দিন নিকৃষ্ট এবং অবশেষে বিনষ্ট হইয়া না যায়, সেদিকে আমাদের শিক্ষক ও চিন্তারাজ্যের নেতাদের সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ গবেষণার জীবনমন্ত্র হচ্ছে ক্রমোন্নতি, eternal progression; এই রাজ্যে কোথায়ও পৌঁছিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বসিয়া থাকিবার, ঘুমাইবার সাধ্য নাই; থামিলেই অবনতি, এবং পশ্চাদ্‌গমনেই মৃত্যু। সেইজন্য আমাদের দেশে মৌলিক গবেষণাকে স্থায়ী এবং প্রাণবন্ত করিতে হইলে দুটি জিনিষ চাই—গুরুপরম্পরা ও গ্রন্থভাণ্ডার। অর্থাৎ যতটুকু জ্ঞান আজ পর্যন্ত লাভ করিয়াছি তাহা চালাইবার, বাড়াইবার জন্য আমাদের পুত্রপৌত্রদের মধ্য হইতে ক্রমাগত নেতা সৃষ্টি করিতে হইবে। জ্ঞানের প্রদীপ একবার নিবিলে আবার জ্বালান কঠিন।

এই সব গুরু ও তাঁহাদের শিষ্যগণ মাতৃভাষা ও বিশ্বভাষা (অর্থাৎ ইংরেজী) ছাড়া আবশ্যকমত আর কোন কোন ভাষা শিখিতে বাধ্য। মরাঠি ও পার্সী ভাষা না জানিলে মহারাষ্ট্রের এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর দিল্লী-সাম্রাজ্যের ইতিহাসে গবেষণা মৌলিক হইতে পারে না, সত্যকলপ্রদ হইতে পারে না। এক শিবাজীর জীবনী রচনা করিতে গিয়া আমাকে ভাল করিয়া পার্সী ও মরাঠি ভাষা, এবং কাজ চলার মত পোর্তুগীজ ও ফরাসী ভাষা শিখিতে হয়, তা ছাড়া ইংরেজী, সংস্কৃত ও রাজস্থানী ডিঙ্গল ভাষা ত আছেই।

দ্বিতীয় সমস্যা, উপকরণের পুঁজী, অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর এবং পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরী এদেশে আমাদের হাতের কাছে রাখিতে, গড়িতে হইবে। এই সব গবেষণার লাইব্রেরীতে হস্তলিপি ও দলিলের ত কথাই নাই, ছাপান প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, পণ্ডিত-সমিতির পত্রিকার ধারাবাহিক সেট, প্রামাণিক এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বা বিশ্বকোষ, যেমন *Encyclopædia of Islam* ৪ ভলুমে সম্পূর্ণ—যাহা এখন আড়াই হাজার টাকায়ও পাওয়া যায় না, এলিয়ট ও ডসন ৮ ভলুম—যাহার দাম এখন এক হাজারে পৌঁছিয়াছে অথচ দু-তিন বৎসর পরেও এক সেট বাজারে দেখা দেয় না—এবং বিস্তৃত ম্যাপ সংগ্রহ, ও জগতের সব বিখ্যাত লাইব্রেরীগুলির হস্তলিপির ও মুদ্রার কেটেলগ, এ সমস্ত জুটাইয়া পূর্ণাঙ্গ করিতে হইবে। গবেষণার কাজে এরূপ পূর্ণাঙ্গ reference libraryর যে কত মূল্য তাহা অনেকে জানেন না। সেই ভুক্তভোগী গবেষক ছাত্র যে কাজ করিতে করিতে একখানা দুষ্প্রাপ্য হস্তলিপি বা পুরাতন মুদ্রিত পুস্তকের অভাবে হঠাৎ বাধা পাইয়াছে, এবং কোন কূলকিনারা দেখিতে পাইতেছে না, সেই জানে।

পুণার মহারাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয় দু'বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। এখানে প্রধানতঃ হিন্দু-যুগের ইতিহাস ও সাহিত্যে গবেষণা হইবে। সুতরাং তাঁহারা অধ্যাপক দেবদত্ত ভাণ্ডারকরের ব্যক্তিগত গ্রন্থ ও পত্রিকা-সংগ্রহ বত্রিশ হাজার টাকায় কিনিয়া কলিকাতা হইতে পুণায় লইয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ এই ক্ষেত্রে কাজ আরম্ভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আমেরিকার সিরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয় জগদ্বিখ্যাত জর্মান ঐতিহাসিক রাঙ্কের সমস্ত লাইব্রেরী—পুস্তক, হস্তলিখিত পুঁথি, তাঁর নিজ হাতে লেখা নোট, তর্জমা ও সংক্ষিপ্তসার, এমন কি খণ্ড খণ্ড কাগজ পর্যন্ত কিনিয়া বার্লিন হইতে মার্কিন দেশে লইয়া গিয়া, তাহা সাজাইয়া তালিকা বাহির করিতেছে, গবেষকগণ ঐ শহরে ছুটিয়া যাইবে। আর ভারতের কি দশা, তাহা আমিই জানি, যখন আমার নিজস্ব লাইব্রেরীর সাহায্য লইবার জন্য ব্যাকুল অসহায় গবেষকগণ আমাকে চিঠি লেখে। আমার লাইব্রেরী কোন কোন বিভাগে ভারতবর্ষে অতুলনীয় হইলেও এটা একজন মধ্যবিত্ত লোকের গড়ে তোলা, একটা ব্যক্তিগত নিজস্ব সম্পত্তি। আমরা চাই কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠানে সর্বসাধারণের জন্য এরূপ সংগ্রহ রাখা।

১৯১১ সালে রবীন্দ্রনাথ একবার কাশীতে যান।

সেখানকার বঙ্গসাহিত্য সভার অভ্যর্থনার উত্তরে তিনি একটি মর্মান্তিক দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন—"আমরা কি চিরদিনই ইউরোপের কাছে ঋণী থাকব? চিরকালই কি তাদের কাছে ভিক্ষা চাইব? আমাদের সৃষ্টি-করা কিছুই কি বিশ্বজগৎকে দিতে পারব না? আমাদের দেশে অনেক উচ্চ-শিক্ষিত এলোপাথিক ডাক্তার আছেন, যাঁদের মধ্যে প্রত্যেকে লক্ষ টাকার বেশী উপার্জন করেছেন, অথচ তাঁহারা কেহই একটি নূতন ঔষধ বাহির করিতে পারেন নাই, ক্ষ্যাপা কুকুরে কাটার অব্যর্থ ঔষধ, ডিপথেরিয়ার ঔষধ, ইত্যাদি সব সাহেবেরা গবেষণা করে বাহির করেছেন, জগৎকে দিয়াছেন। আমরা কোন ব্যারামেরই বিশ্বমানবের গৃহীত ঔষধ আবিষ্কার করিতে পারি নাই। আবার, ভারতে এত ছোট ছোট উপভাষা আছে, তাহার ব্যাকরণ ও শব্দকোষ সাহেব মিশনরীরা চর্চা করে প্রকাশ করিতেছেন; অসংখ্য ছোট অসভ্য জাতি আছে, তাহাদের ধর্ম, রীতিনীতি জনশ্রুতি ও ছড়া, এসবই সাহেবেরা লিপিবদ্ধ করছেন। বঙ্গের বাহিরে অসংখ্য শিক্ষিত অবস্থাপন্ন বাঙালী আছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই কাজগুলি করবার প্রচুর সুবিধা আছে, অথচ তাঁহাদের কেহই এদিকে দৃষ্টি দেন না। ভারতের এই দৈন্য কিসে ঘুচবে?"

গবেষণার প্রণালী ও উপকরণ সম্বন্ধে যে এত কথা বলিলাম, তাহা আমাদের সমস্তার অন্তরের কথা নহে। চৈতন্যচরিতামৃতে ভক্তির নানা ভাবের ব্যাখ্যা করিবার পর রামানন্দ বলিতেছেন, "এহ বাহ্য"—এটা বাহিরের কথা, ভক্তিশাস্ত্রের মূল তত্ত্ব নহে। সেইরূপ যদি আমাদের দেশে মৌলিক গবেষণাকে সজীব সবল রাখিতে হয় তবে আমাদের কর্মীদের চাই চিত্তশুদ্ধি। অর্থাৎ ঐতিহাসিক গবেষণার সত্য-সন্ধানী নিষ্কাম সাধককে দেশ-কাল-সমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরে যাইতে হইবে, স্বদেশী লোকের সস্তা বাহবা পাইবার লোভ সম্বরণ করিতে হইবে। হোগলকুড়িয়া বিশ্ববিতালয় আমাকে এই রচনার জন্য ডাক্তার উপাধি দিবেন, অথবা ছছুখানসামা লেনের সাহিত্যসভা আমার এই গ্রন্থ পুরস্কৃত করবেন—এইরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকৃত গবেষকের আদর্শ হইতে পারে না। বাহিরের বিশ্বসভায়—যাহাকে republic of letters বলা হয় সেই সর্বজনীন পণ্ডিতসমাজে—যতক্ষণ পর্যন্ত আমার গবেষণা স্বীকৃত হয় নাই ততক্ষণ আমি নিজ শ্রমফলে সন্তুষ্ট থাকতে পারি না,—এই কঠোর ব্রত বুক পেতে নিতে হবে। এই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে, আমাদের মধ্যে কম কর্মীই নিজ সাধনার সিদ্ধিতে পৌঁছিতে পারে। কিন্তু এই মন্ত্র ভুলিলে আমরা নিশ্চয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইব।

ইহাই আমার শেষ বাণী।

বঙ্গীয় ইতিহাস-পরিষদ্ কর্তৃক অর্ঘ্যদান উপলক্ষে আচার্যের অভিভাষণ।

ভগ্নপোত

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস

মনের গভীরে একটা কামনা অনেক কাল
সাতটা রাজার মাণিকের মতো জ্বলতেছিল,—
সে ছিল আমার গোপন বুকের লাল প্রবাল,
বহুবাঞ্ছিত স্বপ্নের দ্বীপ গড়তেছিল।

হঠাৎ সাগর-গর্ভে জাগল আন্দোলন,
ফেনিয়ে উঠল ঘন-সঞ্চিত লাভার স্রোত,
দৃষ্টি হারাল জীবন-নাবিক বিচক্ষণ,
ঢেউয়ের ধকলে বিপন্ন হ'ল পলকা পোত।

জলতলে ঠেকে খান্ খান্ হ'ল যে তরী,
প্রবালের দ্বীপ দিঠি-দিগন্তে রইল প'ড়ে,
আমরা হতাশ নাবার দল পিউরে মরি,
সাগরের বুকে শবতাম যেন নৃত্য করে!

কামনা বাচায়ে জীবন বাঁচাতে চেষ্টা আজ,—
মাটি যদি পাই, স্বপ্ন-প্রবাল ফেলব ছুঁড়ে,
মণি-মাণিক্যে তুষ্ট থাকুক রাজাধিরাজ,
আজ মুমূর্ষু বাঁচার চেষ্টা জগৎ জুড়ে।

হেরেছে নাবিক, ভেঙেছে তরণী, ছিঁড়েছে পাল,
আকাশে-সাগরে ধ্বংস-রভসে আলিঙ্গন,
কামনা টুটেছে, চক্ষে হেরেছে অশ্রুজাল,
তবু এস, করি বাঁচার চেষ্টা জীবনপণ।

ভেসে যাই ভাঙা হালে ভর দিয়ে তীরের খোঁজে,
যদি বাঁচি ফের গড়ব প্রবাল চোখের জলে,
সুপ্ত কামনা সুপ্ত ত নয়—কেবা তা জানে,—
বাঁশী নিয়ে ফের বসতে ত পারি বটের মূলে।

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

১৮৭২ সালের ১৫ই আগষ্ট যে দিব্যজ্যোতি মানবদেহ ধারণ করিয়া এক বাঙালী হিন্দু পরিবারে আবির্ভূত হয়, তাহা ১৯৫০ সালের ৫ঠা ডিসেম্বর মরধাম হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ, মাতা স্বর্ণলতা; রাজনারায়ণ বসু ছিলেন তাঁহার মাতামহ। তিনি পরবর্ত্তী-যুগে ভারতীয় জাতীয়তার মাতামহ বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছিলেন।

"ইয়ং বেঙ্গল"

এই বাঙালী-পরিবারের জীবন-ধারা বিস্ময়কর বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া সার্থকতালাভ করিয়াছে। পরিবারের কর্ত্তা কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন "ইয়ং বেঙ্গল"—নবীন বাঙালী শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণী ছিলেন ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষার পরমভক্ত, ইংরেজী রীতি-নীতির অন্ধ অনুকরণ-প্রয়াসী। ডিরোজিও, রিচার্ডসন ছিলেন তাঁদের শিক্ষাগুরু; তাঁদের পাঠ ছিল নব্যবঙ্গের জীবনবেদ। হিন্দু ও ভারতীয় রীতি-নীতি, সভ্যতা-সাধনা ছিল বিচারে নগণ্য, বেন্থাম-মিল ছিলেন তাঁদের মনু-যাজ্ঞবল্ক্য।

দেশের শিক্ষিত-সমাজের মন একান্তভাবে বিজাতীয় আদর্শে আচ্ছন্ন ছিল প্রায় ত্রিশ বৎসর—উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক পর্য্যন্ত। এই সময়ের মধ্যেই কিন্তু "পুনরাবর্ত্তনের" যুগ আরম্ভ হইয়াছে। বিজাতীয় শিক্ষার বহু দোষ ছিল; কিন্তু তার একটি গুণে সকল দোষ নিরাকৃত হইবার উপায় হইল। এই শিক্ষার কল্যাণে আমরা বুঝিতে আরম্ভ করিলাম যে, বিশ্ব-মানবের চিন্তা ও ভাবের ক্ষেত্রে আমাদের ভিখারীর মত হাত পাতিয়া দাঁড়াইবার প্রয়োজন নাই; ভারতবর্ষের মুনি-ঋষি, সাধু-সন্ত জগতের গুরু হইবার অধিকারী।

"সংস্কৃতের আবিষ্কার"

এই বোধ "নবীন বাঙালীর" মনে জাগিয়া উঠে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসুর চিন্তা ও কর্ম্মসাধনায়। তাঁহারাই প্রথম বুঝিতে পারেন যে, "কূর্মনীতি" সমাজ ও রাষ্ট্রের জীবনে সব সময়ে কল্যাণকর নয়। সেই কথাই রাজনারায়ণ বসু তাঁহার "বৃদ্ধ হিন্দুর আশা" (*Old Hindu's Hope*) নামক পুস্তকে অলন্ত ভাষায় বিবৃত করেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট এই জাগৃতির জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তাঁহাদের গবেষণার ফল "সংস্কৃতের আবিষ্কার" (Discovery of Sanskrit) বলিয়া ইংরেজী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই আবিষ্ক্রিয়ার ফলে আমরা আমাদের পূর্ব্বগামীদের কীর্ত্তি-কথার—জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁহাদের কৃতিসমূহের পরিচয়লাভ করি; এই পরিচয় আমাদের মনে আত্মপ্রত্যয় ফিরাইয়া আনিল।

শ্রীঅরবিন্দের জন্মক্ষণ এই বোধের উষাকাল। তাঁহার জীবনাদর্শে দেখিতে পাই প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয়, দুই সংস্কৃতি-ধারার মিলন। এই মিলনের তত্ত্ব ভুলিয়া গেলে শ্রীঅরবিন্দের জীবনকথার অর্থ আমরা অনুভব করিলেও বুঝিতে পারিব না। তিনি "স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্ত্তি" ছিলেন। কিন্তু সেই "বাণীমূর্ত্তি" প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পুষ্ট বলিয়াই বেদের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার উপর নূতন আলোক নিক্ষেপ করিতে পারিয়াছিলেন। সেই আলোক ভারতের অধ্যাত্মতত্ত্ব ও বর্ত্তমান বিজ্ঞানের মিলিত রশ্মির সমষ্টি।

শ্রীঅরবিন্দ বর্ত্তমান যুগের মানুষ; তাঁহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রত্যয়সমূহ বর্ত্তমান যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানলব্ধ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই সত্যও প্রজ্ঞার কষ্টি-পাথরে যাচাই করা হইবে। এই পরীক্ষার হাত হইতে মুক্তি পাইবার উপায় নাই। আমি নিজে শ্রীঅরবিন্দের জ্ঞান-ভাণ্ডারের ব্যাপারী নহি। কিন্তু প্রথম যৌবনে সাংবাদিকের ব্রত যখন স্বীকার করিয়া লই, তখন সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছিলাম। তখন আকাশে-বাতাসে যে-সব সত্য ভাসিয়া বেড়াইতেছিল তাহা শ্বাস-প্রশ্বাসে আমরা গ্রহণ করিয়াছি। জনতার কোলাহলের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের ধ্যানী মূর্ত্তি দেখিয়াছি; বন্ধুগোষ্ঠীতে হাসি-ঠাট্টার মধ্যে তাঁহার নির্লিপ্ত যোগদান লক্ষ্য করিয়াছি, এখনও তাঁহার হাসির 'নূপুর-ধ্বনি' কানে বাজিতেছে।

সেই অভিজ্ঞতা হইতে ইহা বুঝি যে, শ্রীঅরবিন্দ সনাতন সত্যের ঋষি এবং সাধক হইলেও তখন তিনি তাঁহার সাধনালব্ধ সত্যকে চূড়ান্ত বলিয়া হয় ত প্রচার করিতে পারেন না। তাঁহার মন ছিল সদাজাগ্রত, সতত অনুসন্ধানী। ১৯১০ সালের পর আর শ্রীঅরবিন্দের দর্শনলাভের সৌভাগ্য ঘটে নাই; তাঁহার প্রচারিত "দিব্য-জীবনের" কথা বুঝিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে পারি নাই। কিন্তু প্রথম জীবনে তাঁহার সম্বন্ধে যে ধারণা মনে মনে পোষণ করিতাম তাহা হইতে বিচ্যুত হইতে পারি নাই। বিচ্যুত হইলে নিজেকে দুর্ভাগা মনে করিব। সত্যদ্রষ্টা, সত্যলোকের সাধক তিনি

আমাদের জীবনে যে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিলেন, ঋজু-কুটিল পথে ভ্রমণ করা সত্ত্বেও তাহা আমাদের জীবনকে নানাভাবে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। সেই যুগের আমাদের মধ্যে যে অল্প কয়েকজন এখনও বাঁচিয়া আছেন তাঁহারা মনে করেন যে, বাঁচিয়া থাকা সার্থক হইয়াছে, জীবন হইয়াছে ধন্য।

নব-জাগৃতির ব্যাখ্যাতা

শ্রীঅরবিন্দ ভারতের নবজাগৃতির ব্যাখ্যাতা। কিন্তু এই কথা বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত-সমাজ জানেন না, বুঝিবার চেষ্টাও করেন না। তাঁহারা ফলভোগ করিয়াই সন্তুষ্ট। আর শ্রীঅরবিন্দের আধুনিক ভক্তবৃন্দের মধ্যে এই জাগৃতির রাজনীতিক অধ্যায় মুছিয়া ফেলিবার প্রবৃত্তি প্রবল বলিয়া মনে হয়। শ্রীঅরবিন্দ সশস্ত্র ও রক্তাক্ত বিপ্লবের তন্ত্রধারক ছিলেন—সেই স্মৃতি ম্লান করিয়া দিবার প্রেরণা কোথা হইতে তাঁহারা পাইলেন তাহা বুঝিতে পারি না। যুগের সাক্ষী আমাদের নিকট এই মনোভাব নিন্দনীয় বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য শ্রীঅরবিন্দের লেখার মধ্যে যেখানে কোন ব্যাপক ব্যাখ্যানের পরিচয় পাই, তাহা পাঠ করিবার জন্ম মন ব্যগ্র হয়। সেই ব্যাখ্যানসমূহের অনেকগুলি এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৯৩ সালের কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক চিন্তা ও ভাবের পরিচয় পাই। এইগুলি বোম্বাই নগরীর "ইন্দুপ্রকাশ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী কে. জি. দেশপাণ্ডে।

রাজনৈতিক চিন্তা

তখন সবেমাত্র শ্রীঅরবিন্দ বরোদার মহারাজার অধীনে চাকুরী লইয়া আসিয়াছেন। ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ১৪ বৎসর বিলাতে কাটাইয়া তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন। ১০ বৎসর বয়সে বিলাতে গিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি কেবল পাণ্ডিত্যের বোঝা লইয়াই আসেন নাই, আসিয়াছিলেন দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্ম সুস্পষ্ট চিন্তা ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টার পরিকল্পনা লইয়া। "ইন্দুপ্রকাশ" পত্রিকায় সেই পরিকল্পনার ইঙ্গিত মাত্র করিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধাবলী আজ পর্য্যন্ত পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত। সেই প্রবন্ধের চুম্বক—যাহা শ্রী কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের শ্রীঅরবিন্দ-চরিতে দেখিয়াছি, পাঠ করিলে তদানীন্তন কংগ্রেস-নীতির ব্যর্থতার বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। আবেদন-নিবেদন লইয়া ইংরেজের দরবারে হাজির হইলে ফললাভ হইবে না, এই সম্বন্ধে এই বাঙালী যুবকের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। এই সন্দেহ প্রকাশে শ্রীঅরবিন্দ একক ছিলেন না; বঙ্কিমচন্দ্রের "লোকরহস্য" নামক প্রবন্ধাবলীতেও তার পরিচয় পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের গানে ও প্রবন্ধে। "বঙ্গবাসী" পত্রিকা তখন বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। ইহার প্রবন্ধে "কঙ্গরস" বলিয়া কংগ্রেসী আন্দোলনকে ব্যঙ্গ করা হইত। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধাবলীর মধ্যে তাহা বিশেষভাবে পরিস্ফুট দেখিতে পাই।

বঙ্কিমচন্দ্র-মধুসূদন

শ্রীঅরবিন্দ ঠিক সময়েই রাজনীতির ক্ষেত্রে বিদ্রোহের সুর তুলেন। মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে প্রভৃতি কংগ্রেসের নেতৃবর্গ এই সুরে অতিষ্ঠ হইলেন। তাঁহাদের চাপে পড়িয়া "ইন্দুপ্রকাশের" কর্ত্তৃপক্ষ নয়টি প্রবন্ধের পর তাহা প্রকাশ করিতে বিরত থাকেন। কিন্তু সেই বিদ্রোহের সুর অন্য ভাবে প্রকাশ পাইল। শ্রীঅরবিন্দ বাংলার নব-জাগৃতির পরিচয় প্রদান আরম্ভ করিলেন অবাঙালীর নিকট। বঙ্কিমচন্দ্র ও তৎকালীন বাঙালী সমাজের চিন্তাজগতে যে বিপ্লব ঘটিয়াছে, তার ব্যাখ্যা করিলেন এবং ভারতের সামগ্রিক জীবনে বিপ্লব যে ভাবে দানা বাঁধিতেছে তার সম্ভাব্য পরিণতির প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। সাতটি প্রবন্ধে তিনি এই আলোচনা শেষ করেন। ১৮৯৪ সালের ১৬ই জুলাই প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়; এবং ২৭শে আগষ্ট তাহা শেষ হয়। এই প্রবন্ধাবলীও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই; টাইপ করা অবস্থায় মাত্র তাহা আমি দেখিয়াছি।

যে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন প্রথমে তার বর্ণনার মধ্যে এইরূপ উল্লেখ পাই:

"সেই যুগ নূতন চিন্তার অনুপ্রাণিত ও নূতন ভাবের আবেগে আবিষ্ট (loaded)।...দেশে ক্ষুদ্র একটি নব-জাগরণের বন্যা নামিয়াছে...দুই ভিন্নদেশী সংস্কৃতির ও সভ্যতার মিলনে এইরূপ ঘটিয়া থাকে—একটা নূতন সংস্কৃতির ও সভ্যতার সৃষ্টি হয়। অপরের প্রভাব হইতে দূরে থাকা, অপরের প্রভাবকে দূরে রাখাই মৌলিকত্বের (originality) লক্ষণ নয়। অপরের প্রভাবকে নিজের মনোমত, প্রয়োজনীয় ছাঁচে ঢালিয়া সাজানোই মানব-প্রকৃতির মাহাত্ম্য ও শক্তির পরিচায়ক। বাংলাদেশে তাহাই ঘটিতেছে। ভারতে নব-জাগৃতির (renaissance) স্ফুরণ বিরাট (gigantic) আকারে দেখা দিয়াছে এবং তার তন্ত্রধারক বিরাট পুরুষগণ আত্ম-প্রতিভার দীপ্তি পাইতেছেন। রামমোহন রায় আসিলেন এক নূতন ধর্ম্ম হাতে করিয়া; তাঁর মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিলেন দুই ব্যক্তি যাঁরা, আমার মনে হয়, রামমোহন হইতে শক্তিশালী ছিলেন; তাঁদের নাম রাজনারায়ণ বসু ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'দত্ত' উপাধিধারী দুই জন—অক্ষয়কুমার ও মধুসূদন—আরম্ভ করিলেন নূতন গদ্য ও নূতন পদ্য রচনা। বিদ্যাসাগর মহামানব (Titan)—পণ্ডিত, জ্ঞানী, সংস্কৃতির রাজ্যে সর্ব্বাধিনায়ক (dictator)। তিনি সৃষ্টি করিলেন নূতন বাংলা ভাষা, গোড়াপত্তন করিলেন নূতন সমাজের। বিদ্যায় ও জ্ঞানের বৈশিষ্ট্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তুলনা পাওয়া কঠিন। এই সব বিরাট পুরুষকে কেন্দ্র করিয়া গান ও শিল্পকলায় কৃতী, সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ লোকোত্তর মানব-গোষ্ঠীর আবির্ভাব হইয়াছে বাংলা দেশে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতি

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর প্রকাশভঙ্গি (style) সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন :

"এই সম্বন্ধে আমি উচ্ছ্বাসবর্জ্জিত ভাষায় আমার মতামত প্রকাশ করিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। ইহার লালিত্য, ইহার প্রকাশ-মাধুর্য্য, ইহার শক্তি সম্বন্ধে লেখনী আমায় কোথায় লইয়া যাইবে তাহা জানি না। তাঁহার সৌন্দর্য্যানুভূতি অতুলনীয়; ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ইহাই হইয়াছে আমাদের লাভ। রাবণের দশ-মুণ্ডের ও রামের বানর-সেনার বর্ণনায় আর আমরা ফিরিয়া যাইতে পারিব না। 'কপালকুণ্ডলা' ও বিষবৃক্ষে'র কল্পনার মধ্যে যে মাধুর্য্য দেখিতে পাই, তাহা 'শকুন্তলা' নাটকের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়।"

অরবিন্দ ও বাংলা ভাষা

এই সমালোচনা-পাঠের পর একথা মানিয়া লওয়া কঠিন যে, শ্রীঅরবিন্দ তৎকালে বাংলা ভাষা জানিতেন না, তার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না, তার মাধুর্য্য ও মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারিতেন না। সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাস ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে তাহা জানি না। মধুসূদনের কোনও বাংলা কাব্য তখন ইংরেজী ভাষায় রূপান্তরিত হয় নাই। অথচ দেখিতে পাই শ্রীঅরবিন্দ মধুসূদনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ :

"মধুসূদন একটি অবলা কথ্য ভাষাকে জগতের আদিম দেবগণের ভাষায় উন্নীত করিয়াছেন। সেই ভাষার মধ্যে সমুদ্র-গর্জ্জনের ধ্বনি শোনা যায়; তাঁহার বর্ণিত নায়কবৃন্দের মুখে কবি আনিয়াছেন ঐ ঝঙ্কার। মানব-হৃদয়ের উদ্দাম ভাবসমূহ পাইয়াছে নূতন প্রকাশ—'বিরাটে'র প্রকাশ। মিলটনের বর্ণিত শয়তানের আক্রোশ যেন আমাদের কাণে নূতন করিয়া বাজিতেছে।"

বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-মধুসূদন

বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-মধুসূদন, এই ত্রয়ীর আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাংলা সাহিত্যের বিবর্ত্তন সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। তিনি বলিয়াছেন তৎপূর্ব্বে বঙ্গ-ভারতীর হাতে একটি একতারা ছিল; এই সাহিত্যসাধকেরা তাহাতে অনেকগুলি তার যোজনা করিয়া দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র মানব-হৃদয়ের রুদ্র-কোমল বৃত্তি প্রকাশের যন্ত্র তুলিয়া দিলেন আমাদের হাতে। বঙ্কিম, মধুসূদন পৃথিবীকে তিনটি শ্রেষ্ঠ দ্রব্য দান করিয়াছেন :

"তাঁরা এমন বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন যার রাজোচিত (princelier) নিদর্শনের সঙ্গে ইউরোপের যে-কোন সাহিত্য-সৃষ্টির তুলনা করা যাইতে পারে।" "তাঁহারা বাংলা ভাষা দিয়াছেন; ইহা আর গ্রাম্য বা প্রাদেশিক সাহিত্য মাত্র নয়; ইহা আজ দেবগণের ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে।... (বঙ্কিম) একটি জাতিকে দিয়াছেন ভাষা; দিয়াছেন সাহিত্য, সৃষ্টি করিয়াছেন একটি জাগ্রত জাতি (ন্যাশন)।"

শ্রীঅরবিন্দের সমালোচনার আলোকে সারা ভারতের সংস্কৃতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে; এই সমালোচনার কষ্টি-পাথরে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের যাচাই করা যাইতে পারে এবং তার ইতিহাস হইবে তখন সর্ব্বভারতীয় নবজাগৃতির ইতিহাস, বিশ্বমানবের বিবর্ত্তনের ইতিহাস। ইহা যে সত্য তাহা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর জীবনে প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতের মানব-প্রকৃতির মধ্যে যে অসাধারণ উন্নতির বীজ উপ্ত আছে, এই দুই মহাপুরুষ তার সাক্ষ্য ও স্বীকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। সেই সম্ভাবনার উদ্দেশ্যেই মানবের যাত্রাপথ চিহ্নিত হইয়াছে, এবং সেই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াই যুগে যুগে মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুর্গম পথ অতিক্রম করিতেছে। সেই যাত্রার আদিও নাই, অন্তও নাই। "চরৈবেতি, চরৈবেতি"—ইহাই তার সার্থকতা।

শ্রীঅরবিন্দের এই সাতটি প্রবন্ধ নবভারতের জাতীয়-তার সাফল্যের ইঙ্গিতে পূর্ণ। বাংলা সাহিত্য অন্যান্য ভাষা-সাহিত্যের সহযাত্রী। সমাজ যখন জাগিয়া উঠে, তখন শরীর মনের অনুপ্রেরণায় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে সে আত্মশক্তির পরিচয় দিতে আগ্রহান্বিত হয়। কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সেই জাগরণের অগ্রদূত হইতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাঙালীর অদৃষ্টে সেই বিঘ্নসঙ্কুল পদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। রাজনীতি ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। শ্রীঅরবিন্দের জীবন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ইংলণ্ডে প্রবাস

১৮৯৩ সালে যে যুবক কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন, তিনি দশ বৎসর বয়সে মাতৃক্রোড় বিচ্যুত হইয়া বিদেশে গিয়াছিলেন; বিদেশের নূতন আবহাওয়ায় ও মানসিক পরিবেশের মধ্যে বৰ্দ্ধিত হইয়া তিনি সেখানকার জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা

লাভ করেন। নিজের জন্মভূমি তাঁহার কাছে ছিল অপরিচিত। প্রবাস-কালে জানি না, এই কিশোরের মনে কি আবেগ জমিয়া উঠিত, বিদেশে পারিবারিক স্নেহ হইতে বঞ্চিত তাঁহার বুকে কি আশা-আকাঙ্ক্ষা গুমরিয়া মরিত। নিজের সমাজ স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের যে শিক্ষাদান করে, তার ভয়-ভাবনা রীতি-নীতি যে শিক্ষা দেয়, তাহা ছিল তাঁহার নিকট অপ্রাপ্য। ইংরেজ সহপাঠীর সাহচর্য্যে তিনি বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে যে জ্ঞান অর্জ্জন করিতেন তাহা বর্ত্তমান যুগের বাস্তব জ্ঞান। নিজের দেশ তাঁহার নিকট ছিল "স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা" কল্পলোকের বেশী কিছু নয়।

ভবিষ্যৎ জীবনের কল্পনা

একথা সত্য যে "সংস্কৃতের আবিষ্কারে"র ফলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক তথ্য বিলাতের সুধীবর্গের অধিগত হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ তাহা হইতে নিজের দেশের সভ্যতা, সাধনা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি মাতৃভূমিতে ফিরিয়া আসেন। শ্রীঅরবিন্দের সেই সময়কার মনোভাব সম্বন্ধে তাঁহার জীবনচরিত-লেখক "অব্যক্ত" (unutterable)—এই বিশেষণটি ব্যবহার করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। তিনি আবার বলিয়াছেন যে, এই পণ্ডিত-যুবকের মনে রাজনীতিকের ও কবির ভাস্বর (glamorous) জীবনের কল্পনাও খেলা করিতেছিল। প্রমাণ-স্বরূপ তিনি শ্রীঅরবিন্দের দুইটি কবিতার উল্লেখ করিয়াছেন—'*Hic JaCet*' (হিক জেসেট) ও 'Charles Stewart Parnell' (চার্লস ষ্টুয়ার্ট পার্নেল) এই দুইটি কবিতার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার রাজনৈতিক অনুভূতিসমূহ (political sensibilities)। শ্রীঅরবিন্দ কৈশোর ও প্রথম যৌবন বিলাতে কাটাইয়াছিলেন। সেই সময়ে, প্রায় ১৮৮১ সাল হইতে, পার্নেলের নেতৃত্বে আইরিশজাতির মুক্তিসংগ্রাম আবার নূতন রূপে আরম্ভ হয়। আইনানুগ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হয় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (passive resistance), সমাজ-বর্জ্জন (boycott) ও বোমা রিভলবারের ব্যবহার। এই পদ্ধতি আইরিশ জাতির ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে "নিউ ডিপারচার" (new departure) নামে; মাইকেল ডেভিটের নাম এই উপলক্ষে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

রাজনৈতিক অনুপ্রেরণা

শ্রীঅরবিন্দের বর্ত্তমানের শিষ্যবৃন্দ বলেন যে, তিনি পার্নেল-প্রবর্ত্তিত রাজনৈতিক বিদ্রোহের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন নাই। এই যুক্তি মানিয়া লইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, সেযুগে অরবিন্দের রাজনৈতিক মন ছিল অনড়। আয়ারল্যাণ্ড সম্বন্ধে কবিতাকয়টি ভাববিলাসমাত্র! গত ১৫ই আগষ্টের বোম্বাইয়ের "মাদার ইণ্ডিয়া" (ভারতমাতা) নামক পত্রিকায় পার্নেলের প্রভাবের সম্পর্কে ইঙ্গিত করিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে সম্পাদক মহাশয় একটি ক্ষুদ্র পাদটীকায় এই প্রভাবের কথা নস্যাৎ করিবার চেষ্টা করেন।

"বন্দেমাতরম" (দৈনিক) পত্রিকার স্তম্ভে শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৭ সালে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন, ইহাতে তিনি পার্নেলের রাজনৈতিক মনীষার (genius) উল্লেখ করেন। পার্নেল সম্বন্ধে কবিতার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এইরূপ আরও প্রমাণ আছে নিশ্চয়ই। ১৮৯৩ সালে লিখিত রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলী "নিউ ল্যাম্প্‌স্‌ ফর ওলড" (New Lamps for Old)—পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে এই বিষয়ে সংশয়ভঞ্জন হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে জোরগলায় বলা যায়, শিক্ষার্থী অরবিন্দ তখন সক্রিয় ও সজাগ মন লইয়া দেশবিদেশের জ্ঞান অর্জ্জন করিতেছিলেন। ইউরোপে নবজাগৃতির (Renaissance) ইতিহাস ছিল তাঁহার নখাগ্রে। ফরাসী বিপ্লব, ইটালীর নবসংগঠন (resorgimento), জার্ম্মান রাজ্যসমূহের রাজনৈতিক মিলন, রুশিয়ার গণজাগরণের প্রচেষ্টা, আয়ারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন—এ সমুদয়ের অনুপ্রেরণা ও আদর্শ শ্রীঅরবিন্দের হৃদয়কে উদ্বেলিত করে নাই—একথা অবিশ্বাস্য।

বাক্য ও রচনা দ্বারা যিনি আমাদের জীবনে যুগান্তর আনয়ন করেন, তিনি অপর দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নির্ব্বিকার ছিলেন, এই কথা বিশ্বাস করিতে বলিলে শ্রীঅরবিন্দের জীবনের কোন অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। তিনি প্রথম যৌবনে কেবল কবি ছিলেন না। "ইন্দুপ্রকাশে" প্রকাশিত রাজনৈতিক ও সাহিত্য-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী তাহার প্রমাণ। রাজনৈতিক মতামত প্রকাশে তিনি বাধা পান নিজের দেশের রাজনৈতিক নেতৃবর্গের নিকট হইতে। কিন্তু মানবের বুদ্ধি কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমেই স্বচ্ছ হয় না। মানবের মন সত্যসন্ধ ও নির্ভীক হয় জাতির পুরাতন গৌরবের অনুচিন্তনে, নিজের পারিপার্শ্বিকের আলোড়নে। মনস্তত্ত্বের এই অনুভূতি ছিল বলিয়াই শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবাদর্শ অবলম্বন করিয়া ভারতের নবজাগৃতির পরিচয় দিলেন অ-বাঙালীকে; বাংলার নব-জাগৃতির বার্ত্তা প্রচার করিয়া সর্ব্বভারতীয় জাগৃতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। পরাধীন জাতির মনে ফিরাইয়া আনিলেন আত্মজ্ঞান, আত্মপ্রত্যয়, আত্মবিশ্বাস—যার কল্যাণে মানুষ হয় স্বরাট্‌।

উপরোক্ত সাতটি প্রবন্ধ পাঠ করিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না জাতীয় জীবনের উন্মেষসাধনের মধ্যে কবি ও সাহিত্যিকের কি বিরাট স্থান রহিয়াছে; তদ্বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের মনোভাব ছিল পরিষ্কার। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে অরবিন্দ "আর্য্য" (Arya) মাসিকের পৃষ্ঠায় "দি ফিউচার পোয়েট্রি" (ভবিষ্যতের কবিতা) শীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে আমরা কবি-মানসের বিবর্ত্তনের একটি বর্ণনা পাই। তিনি বলিতেছেন:

"কবির আত্মা আত্মকেন্দ্রিক বা নক্ষত্রের মত দূরে অবস্থিত থাকিতে পারে; তাঁহার আত্মা জাতীয় মনের সংকীর্ণ পরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পারে; তার ব্যতিক্রম ত নিশ্চয়ই। কিন্তু তবুও বলিতে হইবে যে তাঁহার ব্যক্তিত্বের, তাঁহার সমগ্র সত্তার শিকড় প্রোথিত হইয়া আছে জাতীয় মনের বীজক্ষেত্রে, কবির ব্যতিক্রম ও বিদ্রোহ প্রমাণিত করে যে, জাতীয় সত্তার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা সুপ্তভাবে বিরাজ করিতেছে বা বাহ্যিক ঘটনার চাপে মাথা তুলিতে পারিতেছে না অথবা যাহা দেশের হৃদয়, জাতির নিগূঢ়, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আত্মাকে জাতির বাস্তব জীবনের নানা প্রকাশের মধ্যে উচ্চ করিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।"

স্বাজাত্যবোধ ও কবিতা

এই প্রবন্ধের নাম 'নেশন্তাল ইভোলিউসন অব পোয়েট্রি' বা কবিতার স্বাজাতিক বিবর্ত্তন। এই প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয় তখন শ্রীঅরবিন্দের অজ্ঞাতবাসের চার পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, পণ্ডিচেরী নগরীতে তাঁহার অবস্থানের কথা আর গোপন ছিল না। বাহ্যতঃ তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সক্রিয়ভাবে তিনি বিপ্লব আন্দোলন চালাইতেছিলেন কিনা এই বিষয়ে মতভেদ আছে; তৎসম্বন্ধে গোপনীয়তা এখন পর্য্যন্ত রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু ভারতের নব-জাগৃতির তন্ত্রধারক একজন নিজের জাতির ভালমন্দ সম্বন্ধে নির্ব্বিকার হইয়া গিয়াছেন, এই কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

ভারতের ও জগতের প্রতি সঙ্কটের সময়ে শ্রীঅরবিন্দ নিজের মতামত প্রকাশ করিয়া জাতিকে কর্ত্তব্যপথের সন্ধান দিয়াছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তাহা করিয়াছিলেন; "সুরাসুরের" সংগ্রাম বলিয়া তাহার বর্ণনাও করিয়াছিলেন। গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁহাকে বাংলায় কংগ্রেসের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—জাতির মুক্তির, তাহার সামগ্রিক মুক্তির সাধনায় তিনি নিমগ্ন আছেন; যখন তাঁহার সেবার প্রয়োজন হইবে ভগবানের নির্দ্দেশে তখনই তিনি পণ্ডিচেরী হইতে বাহির হইয়া আসিবেন; তিনি সেই আহ্বানের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েও তিনি জার্ম্মানী ও জাপানের বিরোধী শক্তিবর্গের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে এই যুদ্ধ পরস্পরবিরোধী নেশ্যন বা গবর্ণমেণ্টের মধ্যে নয়, সৎ জাতির অসৎ জাতির মধ্যে নয়।

শ্রীঅরবিন্দ

"দুই শক্তির মধ্যে, দেব ও অসুর শক্তির মধ্যে।...মিত্র-শক্তি গোষ্ঠীর (Allies) জয় জগতের ভাবী বিবর্ত্তনের পথ মুক্ত রাখিবে; অপর পক্ষের জয় মানব-জাতিকে পেছনে টানিয়া আনিবে, ঘৃণ্যভাবে তাকে অবনমিত করিবে এবং তাকে চূড়ান্ত বিনাশ ও বিলয়ের পথে লইয়া যাইবে। অতীতে নানা জাতি বিনষ্ট হইয়াছিল বিবর্ত্তনের পথে ভাগবত বিধান অনুসারে চলিবার অসামর্থ্যের জন্য।"

দিব্য-জীবন

আজ যখন আবার বিশ্বযুদ্ধের মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে তখনই এই "জগদ্ধিতায়" নিবেদিত-প্রাণ যোগী-প্রবর বিশ্ব-সৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেলেন। শোক আমরা করিব না, বিশ্বাস রাখিব যে, এই পরিনির্ব্বাণ বিশ্ববিধাতার অমোঘ বিধান। কোন দুর্জ্ঞেয় শক্তির প্রেরণায় শ্রীঅরবিন্দ ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন তাহা

বলিতে পারি না, কিন্তু ১৯২১ সালেও তিনি আমাদের ভরসা দিয়াছিলেন: "যে যোগ আমি শিক্ষা দিতে চেষ্টা করি ইহা কেবল আমাদের জন্য নয়; ইহা মানব-জাতির জন্য। ইহার উদ্দেশ্য ব্যষ্টির মুক্তি নয়.... ইহার উদ্দেশ্য মানবসমষ্টির, সমগ্র মানবের মুক্তি।" সেই সমষ্টি ও সমগ্রের প্রতি নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইতে পারে "কোটিকে গোটিক" মাত্র। সেইজন্যই আমরা ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্ত্ত প্রদীপের নির্ব্বাণে দিশাহারা হইয়াছি; ভারতের নবজাগৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ তন্ত্রধারকের তিরোধানে নিজেদের অসহায় বোধ করিতেছি। শ্রীঅরবিন্দ "দিব্য-জীবনে" সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; সমগ্র মানবজাতির দিব্য-জীবন লাভের প্রচেষ্টার পরিণতি দেখিবার পূর্ব্বেই চলিয়া গেলেন। জাতির স্রষ্টা মহামানবগণের তপস্যার ফলে আমরা যে মুক্তিলাভ করিয়াছি শ্রীঅরবিন্দ-প্রদর্শিত "দিব্য-জীবন" লাভের পথে তাহা পরিপূর্ণ ভাবে সার্থক হইবে।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার দাবি

ইহার প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গরূপে তিনি আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন। সেই ক্ষুরধার পথে তিনি ছিলেন জাতির পথিকৃৎ। আমাদের যুগে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন মুক্তি-পথের আলোকের কেন্দ্রস্বরূপ।

এই আলোক অনির্ব্বাণ না রাখিতে পারিলে স্বাধীনতার প্রকৃত রূপ জাতির জীবনে উদ্ভাসিত হইবে না। তাহা রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। জীবনের সমগ্র প্রকাশের মধ্যে তার জ্যোতি বিচ্ছুরিত হওয়া চাই। সেই জন্যই শ্রীঅরবিন্দ আমাদের শুনাইয়াছিলেন প্রথম পাঠরূপে বাংলার নব-জাগৃতির ইতিহাস। এই ইতিহাসের মর্ম্মকথা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিলে জাতি দুর্গম পথে চলিবার সাহস ফিরিয়া পায়, অন্ধকারের পথে একলা চলিতে সক্ষম হয়। মনের এই প্রস্তুতি স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম ও অপরিহার্য্য অস্ত্র।

জনসাধারণ ও জাতীয়তা

প্রথম যৌবনে শ্রীঅরবিন্দ শিক্ষিত ভারতীয়ের নব-জাগৃতির ইতিহাস বর্ণনা করিতে গিয়া প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন। সেই সময়েও তিনি জানিতেন যে, "ইয়ং-বেঙ্গল", "ইয়ং-বোম্বাই" পরানুকরণকারী, আত্মবিশ্বাসহীন, অস্বাভাবিক; তাঁহারা চাহিতেন ভারতবর্ষকে ইউরোপে রূপান্তরিত করিতে। তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন গীতার উপদেশ—স্বধর্ম্মে নিধন পরধর্ম্মের বাহ্যিক সাফল্যের অপেক্ষা শ্লাঘ্যতর। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে এই পরানুকৃতির বিরুদ্ধে আমাদের জাতীয় মনের বিদ্রোহ দানা বাঁধিতে আরম্ভ করে; শ্রীঅরবিন্দ কৈশোর ও যৌবন অতিক্রম করিয়া নব অনুভূতির মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেই সময়েই তিনি বুঝিতে পারেন যে, ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় জাতীয় জীবনে ব্যাপক জাগৃতির স্রোত বহাইতে পারিবে না। এই অনুভূতির প্রেরণায় তিনি বলেন:

"তবুও স্বীকার করিতে হয় যে, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জীবন বিনষ্ট হইল না; এই মৃত্যুর হাত হইতে জাতি মুক্তিলাভ করিল অপ্রত্যাশিত উপায়ে (miraculously)...তার কারণের অনুসন্ধানে অধিক দূর যাইতে হইবে না। ভারতবর্ষের গ্রামীণ জীবন বরাবরই ভারতীয় সংস্কৃতিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল; কোন প্রলোভনে তাহা বর্জ্জন করিতে স্বীকার করে নাই (remained inveterately Indian)। দয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ এবং রাণাডের মতন ব্যক্তি বিজাতীয়তার স্রোতে বাধা দিয়াছেন নানা ভাবে—ভাব-রাজ্যে।...ইহা এক যুক্তি-তর্কের অতীত ব্যাপার' (irrational phenomenon) যাহা ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।"

এই অনুভূতি ও সিদ্ধান্তের প্রকাশ দেখিতে পাই শ্রীঅরবিন্দের একটি বক্তৃতায়:

"ভগবান জানিতেন তিনি কি করিতেছেন। তিনি এই লোকটিকে বাংলায় পাঠাইলেন, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিলেন তাঁহাকে। উত্তর-দক্ষিণ হইতে, পূর্ব্ব-পশ্চিম হইতে, শিক্ষিত লোকসকলের সমাগম হইতে লাগিল সেই মন্দিরে। তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের রত্ন; তাঁহারা ইউরোপীয় বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন। তাঁহারা কিন্তু আসিলেন এই সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে; তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন তাঁহারা। ভারতের মুক্তি আরম্ভ হইল; ভারতের উদ্বোধন ও উত্থানের সূচনা হইল।"

শ্রীঅরবিন্দের এই অনুভূতি বিশ্বাসে পরিণত হইল। তিনি সত্যদ্রষ্টার ভরসা লইয়া, প্রদীপ্ত বুদ্ধি লইয়া গাহিলেন অবতারতত্ত্বের কথা:

"যিনি মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করিবেন দেবলোককে
তাঁহাকে অবতরণ করিতে হইবে কাদার মধ্যে;
তাঁহাকে পৃথিবীর ধূলায় শরীরের বোঝা বহিতে হইবে;
দুঃখকণ্টককণ্টকিত পথে তাঁহাকে চলিতে হইবে।"

ভারতের অধোগতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন: জন্ম-মৃত্যুর ঘটনাকে "মায়া" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া ও সেই বিশ্বাসের বশে চলিয়া ভারতবাসী নিজের স্বরাজ্য হারাইয়াছিল। এই বিপর্য্যয় এক দিনে ঘটে নাই। নানা সময়ে নানা ঘটনার উপলক্ষে ভারতের অধঃপতন আসিয়াছিল।

"প্রথমে আবির্ভাব হইল সন্ন্যাসের অস্বীকৃতি, সন্ন্যাসীর (ascetic) বিশ্বাস, পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ হইতে তাঁহার মানস-চক্ষু অপসারিত হইল, কোটি পদ্মের মতন প্রকৃতির জগতে যে ঐশ্বর্য্যের বিকাশ দেখিতে পাই তার প্রতি ভ্রুকুটি নিক্ষেপ করিলেন তিনি।...তারপর পড়িল মানসিক শক্তির উৎস-মুখে বাধা...ঘুমাইয়া পড়িল বৈজ্ঞানিক ও বিশ্লেষণকারী মন, হারাইয়া ফেলিল এই মনের সহজ অনুভবের শক্তি;...ন্যায়ের কূট তর্ক আসর জমাইয়া বসিল...। সর্ব্বাপেক্ষা বড় সর্ব্বনাশ হইল যখন আধ্যাত্মিকতা জীবনের সাধনা না হইয়া হইল ঘটনা...জাতীয় জীবনের সর্ব্বস্তরে পরিব্যাপ্ত না হইয়া এই শক্তির ছায়ায় নির্ব্বিরোধী মনোভাবের প্রাবল্য দেখা দিল; কেবল বাঁচিয়া থাকার উপায়রূপে আধ্যাত্মিকতার খোলস টিকিয়া রহিল সমাজের ব্যবহার ও রীতি-নীতির মধ্যে...।"

শ্রীঅরবিন্দের সাধনা

এখন আমার এই আলোচনা শেষ করিতে হইবে। রাজনীতির কথা আমি বেশী বলি নাই। শ্রীঅরবিন্দের কর্ম্ম-জীবনের প্রেরণার পরিবেশ বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীণ দুর্গতির কারণসমূহের ব্যাখ্যা করিয়াই তিনি কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। মানব-প্রকৃতির পরিবর্ত্তনকল্পে সাময়িক এবং চিরন্তন উপায়েরও নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তাঁহার দেশবাসীর জীবনে যে তামসিকতা বাসা বাঁধিয়া বসিয়া আছে, যে কৃপণস্বভাব ক্লৈব্য তাহাদের জাতীয় চরিত্রের সহস্র গুণকে দোষে পরিণত করিয়াছে, সেই তামসিকতা ও ক্লৈব্য দূর করিবার জন্য ভাবের রাজ্যে আনিয়াছিলেন তিনি রাজসিকতা, কর্ম্মের রাজ্যে আনিয়াছিলেন ক্ষত্রিয়ের সাধনা। ১৮৯৩ সালে ভারতবর্ষের রাজনীতি হৃদয়-দৌর্ব্বল্যে ছিল ক্লিষ্ট; দেশের শিক্ষিত মনও ক্লিষ্ট হইতেছিল। "ইন্দুপ্রকাশের" প্রবন্ধাবলী তার বহিঃপ্রকাশ। ১৮৯৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যে প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয় তাহাতে বর্ণিত নব-জাগৃতির ব্যাখ্যা দেখিতে পাই—আত্ম-প্রত্যয়ের সুর; নিখিল ভারতের প্রস্তুতির আহ্বান। তার পর ১৯০২ সালে শ্রীঅরবিন্দ নামিয়া আসিলেন কর্ম্মজগতে, বিপ্লবের রক্তমাখা পথে। বাংলায় ও পঞ্জাবে মাত্র সেই পথে চলার প্রবৃত্তি ও শক্তি বহু দিন অটুট ছিল। ১৯১৯ সালের রাউলাট রিপোর্টে তার স্বীকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। তারপরেও বাংলা ও পঞ্জাবের বিপ্লবী হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকে নাই। আত্মনিবেদনের মানসিক প্রস্তুতি ছিল এই দুই প্রদেশবাসীর। শ্রীঅরবিন্দ সেই প্রস্তুতির তন্ত্রধারক ছিলেন, অগ্রগামী ছিলেন এই যাত্রাপথে।

সেই প্রস্তুতি চিরন্তন করিবার প্রয়াস তাঁহাকে লইয়া যায় যোগ-সাধনায়, "দিব্য-জীবনের" অন্বেষণে। তিনি এই যাত্রাপথে কত মানস-মুকুল পদদলিত করিয়াছিলেন! মৃণালিনী দেবীর নিকট পত্রে তার আকুল প্রকাশ দেখিতে পাই। এই তরুণীকে সহধর্ম্মিণী করিয়াছিলেন তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে। কিন্তু তাঁহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন বিবাহের পরে; বিশেষ করিয়া আলীপুর বোমার মামলা হইতে মুক্তিলাভের পরে। বোমার মামলার বিচারের সময় তিনি সর্ব্বভূতে "নারায়ণ" দর্শনের বার্ত্তা প্রচার করেন। এই অভিজ্ঞতার পর তিনি নিজের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতির ইঙ্গিতমাত্র করিলেন। "কারাকাহিনী" পুস্তকে সেই ঘোষণা দেখিতে পাই:

"আবার যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিব তখন সেই পুরাতন অরবিন্দ ঘোষ প্রবেশ করিবে না। একটি নূতন মানুষ, নূতন চরিত্র, নূতন বুদ্ধি, নূতন প্রাণ, নূতন মন লইয়া, নূতন কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া আলিপুরস্থ আশ্রম হইতে বাহির হইবে।"

পণ্ডিচেরী নগরীতে শ্রীঅরবিন্দ "নূতন মানুষ" হইবার সাধনা করিয়াছিলেন চল্লিশ বৎসর। সেই সাধনার পথে তিনি "দিব্য-জীবন" লাভের অন্বেষণে বাহির হন। তাহাতে তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

বাস্তহারা

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

ওরা কাঁদে আর অভিশাপ দেয় মিছা।
জনতা-জটিল রাজপথে করে ভিড়।
আঁধারের শিশু আঁধারেই ঘুরে মরে;
ভাগ্যচক্রে হয়েছে ভগ্ন-নীড়।
আলোর ক্ষুধার করুণ আর্ত্তনাদ
ওদের বক্ষে আছাড় খাইয়া মরে।
ধমনীতে নাহি বাজে ডম্বরু-ধ্বনি।
উপবাসী চোখে শুধু বিক্ষোভ ঝরে।
ব্যথা-কিংশুকে দিগন্ত হয় লাল।
নিয়তির ডাকে রাজপথ ভরে যায়।
জমা হয় যত জীবনের জঞ্জাল
বঞ্চিত মন করে উঠে হায় হায়।
শবের ঝঙ্কারে আসিবে শিবের ধ্বনি
সেই আশাতেই অনাগত দিন গণি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী

বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ অবিস্মরণীয় স্রষ্টা। তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর সৌভাগ্য জীবনে কয়েকবার এসেছে—কখনও আনুষ্ঠানিক আয়োজনে, কখনও মুগ্ধ প্রাণের সমারোহে। মানপত্র লিখেছি, বক্তৃতা দিয়েছি, তাঁর জন্মদিনের অভিনন্দনে কত না শ্রদ্ধা ও প্রীতি-উপচার সাজিয়েছি।

যখনই বাড়ীতে এসেছেন, বাগানের ফুল তুলে তোড়া বেঁধে দিয়েছি হাতে, বাংলার পল্লীকবি ঘাসে ঝরে পড়া দুটি শিউলি ফুলও পেয়ে কত না উচ্ছ্বসিত হয়েছেন! সৌন্দর্য্যের উপাসক ভাবুক মানুষ তিনি, বাংলার মাঠ-ঘাট বন ফুল পাতার গল্প করতে করতে কখনও তন্ময়, কখনও আনমনা হয়ে গিয়েছেন।

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি তাঁর প্রতিভাদীপ্ত, ভাবমুগ্ধ দুটি চোখের দিকে, ভেবেছি বিভূতিভূষণ তুমি সার্থক শিল্পী এই জন্যে যে তোমার প্রতিভা ও চরিত্র এক হয়ে মিশেছে একটি স্রোতের অববাহিকায়। যেখানেই চরিত্র ও প্রতিভার সমন্বয় ঘটে সেখানেই স্রষ্টা সার্থক, তাঁর সৃষ্টিও সার্থক।

তিনি সমগ্র অনুভূতি দিয়ে ভালোবেসেছিলেন প্রকৃতির অতুলনীয় সৌন্দর্য্যকে, পল্লীর মানুষের সুখ-দুঃখকে গভীর বেদনার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজের এই উপলব্ধিকেই তিনি স্বকীয় রচনার মধ্যে নিপুণ তুলিকায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

আমি দেখেছি বালক 'অপু'র সঙ্গে শিশুর মতই সরল অনাড়ম্বর বিভূতিভূষণের কোনই পার্থক্য নেই—দেখেছি "আরণ্যকের" রাজু পাঁড়ের সঙ্গে বিভূতিভূষণ একাত্ম। চরিত্রের এই অকৃত্রিমতাই তাঁকে করেছে অমায়িক নিরহঙ্কার, নিস্পৃহ; তাঁর সৃষ্টিকে করেছে বাংলা-সাহিত্য-ভাণ্ডারের অপূর্ব সম্পদ।

একবার কলিকাতার এক বিশিষ্ট অভিজাত সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির গৃহে সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকগণের এক মজলিশে আমন্ত্রিত হয়ে আমাকে যেতে হয়েছিল, বিভূতিভূষণও তাতে যোগ দিয়েছিলেন। প্রত্যেকেই দেখলাম ফিটফাট কেতাদুরস্ত—হাতে সিগ্রেট, বর্মা চুরুট। সবাই ধনী পরিবারের সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করতে তৎপর। কিন্তু বিভূতিভূষণ যেন নির্বিকার নির্লিপ্ত, এ সকল আড়ম্বরে যেন তাঁর লেশমাত্র আগ্রহ নেই। সেদিন ঘাটশিলায় যাবেন, সঙ্গে একটা স্যুটকেশ রয়েছে, উস্কখুস্ক চুল, ময়লা জামা কাপড়, কপালের ঘাম যখন গড়িয়ে গাল বেয়ে নামছে তখন চকিত হয়ে আধময়লা রুমালে মুছে ফেলছেন।

মার্জিত রুচিসম্পন্ন গৃহকর্ত্তা কিন্তু তাঁর সুসজ্জিত ড্রয়িং-রুমে আগত এই খাপছাড়া মানুষটির অভ্যর্থনার ভার স্বয়ং গ্রহণ করেছিলেন। প্রকাণ্ড হলঘরে অনেক মানুষ—বয়, বেয়ারারাই অতিথিদের অভ্যর্থনার ভার গ্রহণ করেছে, কিন্তু গৃহকর্ত্তা বার বার এগিয়ে এসে বিভূতিভূষণের হাতে সিগ্রেট তুলে দিচ্ছিলেন। সেইদিন আমি উপলব্ধি করেছিলাম জীবনে যে জিনিষকে তিনি প্রয়োজন বলে মনে করেন নি, কৃত্রিমতার সঙ্গে তাকে তিনি গ্রহণ করতেও পারেন নি। তাই ধনী নির্ধন সাধারণ অসাধারণ নির্ব্বিশেষে সকলের মনকে তাঁর সৃষ্টি স্পর্শ করতে পেরেছে।

প্রতিভার সঙ্গে তাঁর চরিত্রে আন্তরিকতা ও অকৃত্রিমতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল বলেই গণ-সাহিত্য রচনাকে তিনি কোনও দিন স্বীকার করেন নি। তিনি বলতেন, স্রষ্টা এবং শিল্পী যে সমাজ থেকে আসবেন তাঁরা সেই সমাজেরই কথা বলবেন।

আমি প্রশ্ন করে বসতাম "অজ্ঞতার কালো অন্ধকার-গহ্বরে যারা পশুর মত জীবন যাপন করছে, তাদের কি জাগাতে হবে না?" তিনি বলতেন—"জাগাতে হবে বৈকি, কিন্তু যারা জাগাবে, তারা আসবে সেই সমাজ থেকে।"

বিভূতিভূষণের সঙ্গে আমার সকল ক্ষেত্রে মতের মিল না হলেও তিনি যে নিজেকে ফাঁকি দেন নি এ কথা ভেবে আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে উঠতাম। একথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলাম যে, যশের প্রলুব্ধকারী হাতছানি তাঁকে মরীচিকার পথে টেনে নিয়ে যায় নি, আধুনিক সভ্যতার মধ্যে যেখানেই তিনি কৃত্রিমতা দেখেছেন, তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁর অভাববোধ তেমন তীব্র ছিল না, তাই জীবনধারণ করতে যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে অধিক আহরণের মোহে তিনি বিভ্রান্ত হতেন না।

এক দিন যশোহর সাহিত্য-সঙ্ঘের একটি সভা থেকে বিভূতিভূষণের সঙ্গে ফিরছিলাম। ট্রেনের কামরায় নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি আধুনিক সভ্যতার কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলার পর হঠাৎ বললেন, "আচ্ছা মেয়েরা ওই ঠোঁটে গালে কেন রং মাখেন

বলুন তো? আপনি মেয়ে এবং তাই এ বিষয়টার ঠিক উত্তর দিতে পারবেন।"

আমি বললাম—"আপনি আমায় জটিল প্রশ্ন করলেন, আমি আশৈশব ওই প্রসাধন থেকে একেবারেই বঞ্চিত, তাই ছোটবেলায় আমাকে সকলে ছেলে বলত।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—"না না ছেলে মেয়ের প্রশ্ন নয়—কি ছেলে, কি মেয়ে প্রত্যেকের মধ্যে কতকটা সাত্ত্বিকতা থাকা প্রয়োজন, রং মাখলেই কি মানুষ সুন্দর হয়?"

আমি বললাম—"ওটা মেয়েদের কতকটা সহজাত প্রবৃত্তি, কতকটা সময় কাটাবারও একটা অবলম্বন।"

"না-না" তিনি একটু উত্তেজিত ভাবেই বলে উঠলেন —"সময় কাটানোর জন্যে অনেক কাজ রয়েছে—এখনকার মেয়েরা তো অধ্যাত্মবাদ, ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা এ সব মোটেই করেন না…।" আর এক দিন সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "আজকাল সব ফিল্মের গানে আর কান পাতা যায় না—আপনি আমাকে একটা শ্যামাসঙ্গীত শোনান।"

বিভূতিভূষণের সঙ্গে আমার যত ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, ততই উপলব্ধি করেছি, তাঁর জীবন-দর্শন অধ্যাত্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত—তাই তিনি অতীন্দ্রিয় রহস্যসন্ধানীর মত বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরে ঘুরে প্রকৃতি ও জীবনের রহস্যের সন্ধান করেছেন; তিনি ছিলেন আসলে কবি, প্রকৃতির একনিষ্ঠ উপাসক। সেই কবি-কণ্ঠের কাকলি হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে থেমে গেল।

মনের দুকূল ছাপিয়ে বিভূতিভূষণের কত কথাই না স্মৃতিতে জাগছে! তাঁর সঙ্গে একবার নদীপথে একটি সাহিত্য-সভার আমন্ত্রণে খুলনা গিয়েছিলাম। ছই-ঢাকা নৌকা হরিহরের বুকে পাল তুলে এগিয়ে চলে। কোথাও শান্ত তরঙ্গগুলি অস্তসূর্য্যের রঙিন আলোয় ঝলমল করে, কোথাও নদী অশ্রান্ত কলরোলে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। ধারে ধারে সুবিন্যস্ত কত বন উপবন, তরুলতা, বেতস-কুঞ্জ অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। হোগলা কেয়া আর কচুরীবন গায়ে গায়ে জড়িয়ে চলেছে। উজান বেয়ে নৌকা এগিয়ে চলল। বিচিত্রপক্ষ বিহগের সান্ধ্য কূজনে ঘননিবদ্ধ ঝাঁকবন আর বাঁশঝাড় মুখরিত। "আরণ্যকে"র মুগ্ধ কবি বিভূতিভূষণ সমগ্র সত্তা দিয়ে যেন বনলক্ষ্মীর ওই অতুলনীয় সম্পদকে আত্মবিস্মৃত হয়ে অনুভব করছিলেন। নদীর কলতান বোধ করি তাঁর প্রাণের তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলেছিল। মধ্যে মধ্যে তিনি আত্মগত ভাবে বলে উঠছিলেন—"বাঃ বাঃ, চমৎকার, গ্র্যাণ্ড।" আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম—তাঁর সৃজনী প্রতিভা কেন এমন প্রাণ-প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ—প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এবং সমৃদ্ধিকে তিনি সমগ্র হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন।

শেফালিকুঞ্জে বিভূতিভূষণ

আমার অজানা কত বন্য ফুল পাতা লতা নদীর কিনারে কিনারে ফুটেছিল, মাঝে মাঝে দু' একটি ফুল জলে ঝরে পড়েছিল। আমি বিভূতিভূষণের কাছে সেগুলোর নাম জেনে নিয়ে নোট বুকে লিখে নিলাম। কয়েকটি ফেজেণ্ট ক্রো এবং কুকো নীড় অভিমুখে উড়ে গেল। এই পাখীগুলির সৌন্দর্য্যের প্রশংসায় তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

এক দিন সাহিত্যসেবীর পরম তীর্থ 'পথের পাঁচালী'র স্রষ্টার পল্লীগ্রামের বাসভবনে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেবার বনগ্রামে বিভূতি-সম্বর্দ্ধনা সমিতির পক্ষ থেকে তাঁকে তাঁর ৪৮তম জন্মদিনে 'অভিনন্দন জানানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। আমাকে করা হয়েছিল অভ্যর্থনা-সমিতির সভানেত্রী। তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে তাঁর পল্লীনীড়ে গিয়েছিলুম। পল্লীর নিরালা নির্জন শান্ত পরিবেশে কবির ছোট্ট বাড়ীখানি। চতুর্দিকে বড় বড় গাছপালা, আশে-পাশে বন্য ফুলপাতার বিপুল সমারোহ—আগাছাই না কত চারপাশে গজিয়েছে। দূরে বয়ে চলেছে ইছামতী। বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে বসেছিলেন বিভূতিভূষণ, সম্মুখে জলচৌকীর উপর তাঁর রচনার সরঞ্জামাদি রয়েছে—শারদীয়া সংখ্যার জন্য গল্প লিখছিলেন। আমাদের দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললেন, "এত রাস্তা হেঁটে এলেন? আমি

ভাবছিলুম বর্ষা শেষ হলে আপনাকে গাড়ী করে এখানে নিয়ে আসব, এখন কাদায় চাকা বসে যায়।" এর পর তিনি কত না উৎসাহের সঙ্গে যে মাটির গহনতলের উৎস থেকে অপূর প্রাণসত্তা উৎসারিত হয়েছে, "দুর্গার" স্বল্পস্থায়ী জীবন বিকশিত হয়েছে, সেই সব স্থান আমাদের ঘুরে ঘুরে দেখালেন। অনভ্যস্ত পদে আগাছাগুলির উপর দিয়ে চলতে মাঝে মাঝে বিব্রত বোধ করছিলাম। তাই দেখে তিনি বললেন, "অনেকে বলে এই জঙ্গলগুলি নির্মূল করে দিতে, কিন্তু সত্যি বলছি আপনাকে, এইগুলি কেটে ফেলতে আমার বড় কষ্ট হয়।" আমি অনুভব করলাম বলতে বলতে তাঁর গলার স্বর আর্দ্র হয়ে এল। বারান্দায় একখানা লাল সিমেন্ট-মাটির আসন পাতা ছিল, সেই আসনখানির নিকটে নিয়ে গিয়ে তিনি আমাকে বললেন, "খুব ভোরে সূর্য্যোদয়ের সময়ে এসে এই আসনে বসবেন, মনের মধ্যে এক অদ্ভুত অনুভূতি আপনার হবে, যেন মনে হবে আপনার মধ্যে একটি নূতন আত্মা অধিষ্ঠিত হয়েছে, আপনি স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করবেন।" তিনি আরও বললেন, উড়িষ্যার কবি ও সাহিত্যিক পাণিগ্রাহীকে তিনি এই আসনে এনে বসিয়েছিলেন। এর পর মুখর কণ্ঠে কত কথা বললেন, কত গল্প করলেন। কল্যাণী দেবীকে বললেন, "দাওগো এঁদের গরম গরম তালের বড়া।"

আমরা কবির নিজে হাতে তুলে দেওয়া তালের বড়া পরম পরিতোষের সঙ্গে আহার করে বিদায় গ্রহণ করলাম। ফেরবার সময় তিনি আমার হাতে একখানা মাসিক পত্রিকা দিয়ে বললেন, "এতে আনাতোল ফ্রাঁসের একটা গল্প আছে পড়বেন। আমি প্রথম জীবনে কত যে ইংরেজী সাহিত্য পড়েছি তার হিসাব নেই।"

আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সদর পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে এসেছিলেন। সেদিন পূর্ণিমার চাঁদ ছিল আকাশে—মুগ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, "কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে আকাশে, এক দিন পূর্ণিমা তিথিতে আসবেন, আমরা ইছামতী নদী দিয়ে অনেক—অনেক দূরে চড়ুইভাতি করতে যাব। ওই বালু কপিক্ষেতে পিকনিক্ আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারি না।" আমি জিজ্ঞেস করলাম—"আপনি এবার কি বই লিখবেন ?"

"এইবার আমি 'ইছামতী' উপন্যাস লিখব। এ পরিকল্পনা আমার কবেকার জানেন ?

"কবেকার ?"

"এই ইছামতী আমার প্রথম উপন্যাসের পরিকল্পনা।" আজ আমার মনে হচ্ছে এই প্রথম পরিকল্পিত উপন্যাসই তাঁর প্রতিভার শেষ স্বাক্ষররূপে বাংলা-সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিভূতিভূষণের কথা বলতে গিয়ে বড় বেদনার সঙ্গে এই কথাটাই মনে পড়ছে, এত শীঘ্র যে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে হবে তা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। রাঁচীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ট্যাক্সিতে বিখ্যাত হুডরু জলপ্রপাত দেখতে গিয়ে মর্মবিদারক সংবাদ পেলাম। বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কেটে গেল। শোকে অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম উচ্ছলিত জলপ্রপাতের ধারে।

ব্যথিত কণ্ঠে ডাক্তার বললেন, "আমার কানে আজও বেজে উঠছে তাঁর সেই ডাক—"ডাক্তারবাবু আছেন নাকি ?"

বিভূতিভূষণের প্রসঙ্গ শেষে করবার আগে আজ বার বার করে তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের ও শেষ দেখার কথাটাই মনে জাগছে। আমরা বৎসর তিনেক বনগাঁয়ে ছিলাম, কত সময় তিনি এসেছেন, কত গল্প শুনিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা আমার দেখা হয়েছিল ১৯৪৮ সনে এপ্রিল মাসে। রাত্রি ১১টার সময় এসেছেন—ডাক শুনে আমরা দরজা খুলে দিলাম। এত রাত্রে ব্যারাকপুর যাওয়া সম্ভব নয়। আমরা খুশি হয়ে তাঁর থাকবার ব্যবস্থাদি করে দিলাম। রাত্রি দুটো পর্যন্ত তিনি বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের গল্প করলেন। শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলেন—সে পরিবারের মধুর আপ্যায়নের গল্পে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বললেন, শিবদাসবাবু ধনীমানুষ হয়েও গুণীর মর্যাদা দিতে ভোলেন নি। কথাপ্রসঙ্গে বললেন, "কৃষ্ণা হাতিসিং-এর সঙ্গে আমার এক দিন আলাপ হয়েছিল—ভদ্র মহিলার ব্যবহার খুব মার্জিত, কিন্তু বড় বেশী সাহেবীভাবাপন্ন। তিনি বললেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম তাঁকে 'আপনার *The Regret* বইখানি চমৎকার। আপনি নিজের ভাষায় লেখেন না কেন ?' কৃষ্ণা হাতিসিং জবাব দিলেন, 'I cannot do this, I dream in English'। ইংরেজী চালচলন বিভূতিভূষণ মোটেই পছন্দ করতেন না—এ বিষয়ে নানা আলোচনা করতে লাগলেন। আমি বললাম—"তবু দেখুন ওঁরা গুণী মেয়ে, ওঁদের দোষ, গুণের আড়ালে চাপা থাকে। কিন্তু যারা সময়ের প্রাচুর্য থাকায় অকারণে সাহেবী আদবকায়দা আয়ত্ত করেন—তাঁদের কি শাস্তি দেওয়া যায় বলুন তো ?"

"বিশেষ কিছু না"—বিভূতিভূষণ বললেন,"ওদের কিছুদিন ঢেঁকির পাড়ে দাঁড় করিয়ে ধান ভানতে দিন, ক্ষারে কাপড় সিদ্ধ করিয়ে ঘাটে পাঠিয়ে দিন শায়েস্তা হয়ে যাবে।"

হুডরু প্রপাতের কাছে দাঁড়িয়ে—এই সব কথাই

ভাবছিলাম। এই গর্জনমুখর প্রপাত পাহাড় পর্বত বন-বনান্ত কাঁপিয়ে দুর্বার আবেগে ছুটে চলেছে—সমতলে গিয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে সুবর্ণরেখা নদীতে। গ্রাম-গ্রামান্তর পার হয়ে সুবর্ণরেখা বয়ে চলেছে অবিরাম গতিতে। আমরা ভাবছিলাম—এতক্ষণে বিভূতিভূষণের নশ্বর দেহ চিতাভস্মে বিলীন হয়ে গেল, এই সুবর্ণরেখা ধুয়ে নিয়ে গেল তাঁর শেষ চিহ্ন ভস্মরাশি, এই গিরিনদীর তীরে তীরে মিশে রইল বিভূতিভূষণের শেষ নিঃশ্বাস।

হুডরুর অশ্রান্ত গর্জন ছাপিয়ে আমার মনের মধ্যে স্মৃতির সায়র উদ্বেলিত হয়ে উঠল। বিভূতিভূষণের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের সেই স্মরণীয় দিনটির কথা মনে পড়ল। বৎসর পাঁচেক আগে তখন সবে আমরা বনগাঁ বদলি হয়ে এসেছি। একদিন খবর পেলাম, এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। আমি ঘরে এসে ঢুকতেই মৃদু হেসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি অন্নপূর্ণা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

তিনি বললেন—"আমি আপনার লেখার একজন Admirer, আপনি বনগ্রামে এসেছেন জেনে দেখা করতে এলুম—"

আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি, বনগ্রাম আসা অবধি অনেকেই দেখা করতে এসেছেন, কিন্তু যেন মনে হচ্ছিল তিনি সাধারণের মধ্যে অসাধারণ, তবু পরিচয় জিজ্ঞেস করতে কুণ্ঠা বোধ করছিলাম।

তিনি বলতে লাগলেন—"আপনি সুন্দর ছোট গল্প লেখেন। আপনার বই কবে প্রকাশিত হচ্ছে?"

এবার আমি সঙ্কোচ কাটিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—"আপনার নামটা যদি জানতে পারি—কিছু মনে করবেন না—"

তিনি বললেন—"বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়"

"বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়" বিস্ময়ের সঙ্গে আমি জিজ্ঞেস করলাম—"পথের পাঁচালীর অমরস্রষ্টা বিভূতিভূষণ?"

স্নিগ্ধ অথচ গম্ভীর হেসে তিনি উত্তর দিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

আমি আনন্দপ্রকাশ করে জানালাম—কি সৌভাগ্য আমার, আপনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার মত নগণ্যা লেখিকার বাড়ী এসেছেন? কোথায় আমি যাব আপনার বাড়ীতে? এর পর আমি তাঁকে তার সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতে লাগলাম। অপুর কথা, দুর্গার কথা সদ্যপ্রকাশিত 'দেবযানে'র কথা।...

আমরা যতদিন বনগ্রামে ছিলাম আমার সাহিত্য-চর্চায় কত উৎসাহ, কত অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। কেবলই বলেছেন—"থেমে যাবেন না, দাঁড়িয়ে পড়বেন না, আপনার মধ্যে শক্তি রয়েছে, সাংস্কৃতিক জীবনকে আপনি সর্বাঙ্গীণ ভাবে বিকশিত করে তুলুন। নিজের চেষ্টাই মানুষকে বড় করে।" আরও বলেছেন, "আমি যদি ভাগলপুরে থাকতাম আমার 'পথের পাঁচালী' বনে ফুটে বনেই তার সৌরভ বিকীর্ণ করে ঝরে পড়তো। উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর কাছে প্রেরণা পেয়ে আমি কলকাতা এসেছিলাম। সাহিত্য-জীবনে তাঁর কাছে পাওয়া এই উৎসাহ, এই প্রেরণা কত যে দুর্লভ তাই শুধু আমি ভাবছি।" আজ বার বার শুধু এই কথাই মনে হচ্ছে, এমনি শিশুর মত সরল, নিরহঙ্কার অমায়িক ছিলেন বলেই তাঁর সার্থক সৃষ্টি 'পথের পাঁচালী'র অপু ও দুর্গা বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে রইল। এই অমর সাহিত্য-স্রষ্টার উদ্দেশে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

দাবাখেলা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

দাবাখেলার জন্মস্থান ভারতবর্ষ। ইহা বহু প্রাচীন যুগের খেলা। ত্রেতাযুগে নাকি রাবণ মন্দোদরীর সহিত দাবা খেলিতেন, দ্বাপরে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত দাবা খেলিয়া সৈন্যসমাবেশের কৌশলাদি বুঝাইতেন। সংস্কৃতে এই খেলার নাম চতুরঙ্গ খেলা। সংস্কৃত "চতুরঙ্গ" হইতে আরবি "শতরঞ্জ" শব্দের উৎপত্তি অনেকের ধারণা যে, মুসলমান আমলে বাংলায় এই খেলাকে 'শতরঞ্চি' খেলাবলা হইত। বহু পুরনো পুস্তকেও এই খেলার উল্লেখ দেখা যায়; কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় কিংবা অপর কোন ভারতীয় ভাষায় শুধু দাবাখেলার বর্ণনামূলক গ্রন্থের সন্ধান বেশী পাওয়া যায় নাই। কেবল-মাত্র নিছক দাবাখেলা সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকের সংখ্যা নগণ্য। ১১৩৬ সালে দাবাখেলার বিশদ বর্ণনামূলক পুস্তক "চতুরঙ্গ

দীপিকা" আবিষ্কৃত হইয়াছে। কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির এক অধিবেশনে অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় দাবাখেলা সম্পর্কিত আরও তিনটি সংস্কৃত পুস্তকের সন্ধান দেন। সেগুলির নাম—(১) বিলাসমণি মঞ্জরী—রচয়িতা ত্রিবেঙ্ক আচার্য্য; তিনি পেশোয়া বাজীরাওয়ের আদেশে এই গ্রন্থ রচনা করেন; (২) চতুরঙ্গ রচনা—শিবের পৌত্র ও শঙ্করের পুত্র জ্যোতির্ব্বিদ গিরিধর এই গ্রন্থের রচয়িতা; (৩) শতরঞ্জ কুতূহলম্ বা বুদ্ধিবলম্—লেখকের নাম জানা যায় না; শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে এই খেলার বিষয় বুঝাইতেছেন এই ভাবে দাবাখেলার বর্ণনা করা হইয়াছে। চিন্তাহরণ বাবু এই শেষোক্ত পুস্তকখানি সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন এবং উহার ভূমিকায় দাবাখেলা সম্বন্ধীয় আরও কয়েকখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা:—গৌড়দেশীয় স্মার্ত্তপ্রবর শূলপাণি কৃত বলিয়া অনুমিত চতুরঙ্গ-দীপিকা, পূর্ব্বোক্ত ত্রিবেঙ্ক উপাচার্য্য প্রণীত বুদ্ধিবলসপ্তকং, নেপালের চতুরঙ্গ পদ্ধতি (এই গ্রন্থের উল্লেখ চতুরঙ্গ দীপিকায় আছে); দিব্যমালিকা নামক গ্রন্থ—ইহারও উল্লেখ চতুরঙ্গ-দীপিকায় দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ আরও কত গ্রন্থ আছে কে জানে? এগুলির সন্ধান হওয়া আবশ্যক। চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত "সতরঞ্জকুতূহলম" পুস্তকে অন্যান্য অনেক বিষয়ের অবতারণা করিলেও দাবাখেলার পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন নাই।

বর্ত্তমান কালে দাবার ছক্ ছাপানো কাগজের হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ইহা বস্ত্রখণ্ড সেলাই করিয়া তৈয়ারি হইত। লেখক তাঁহার অতিবৃদ্ধ পিতামহীর স্বহস্তে প্রস্তুত, বনাতের উপর নানা বর্ণের ছিট দিয়া ঘর-করা দাবার ছক্ দেখিয়াছেন। চেপ্‌টা মাটির সরার উপর প্রতিমার গায়ে যে রকম রং দেওয়া হয় সেইরূপ রং দেওয়া দাবার ছকও দেখিবার সুযোগ তাঁহার হইয়াছে। পূর্ব্বে যে বস্ত্রনির্ম্মিত ছকের প্রচলন ছিল তাহা 'সতরঞ্জকুতূহলমে'র নিয়োদ্ধৃত শ্লোক হইতে বুঝা যায়:

সন্নামরে বস্ত্রখণ্ডে বিশালে
চতুঃ কোণযুক্তে সমন্তাৎ সমানে।
চতুঃষষ্ঠি কোষ্ঠানি কৌষেয়সূত্রৈ-
র্বিধায়াদিকোণাদিকোষ্ঠাদি-ভাজাঃ।

বর্ত্তমানে বাংলায় প্রচলিত সাধারণ দাবাখেলার "বলের" (ঘুটি) নাম ও স্থান যথাক্রমে নিম্নে দেওয়া হইল:

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বোড়ে	বোড়ে	বোড়ে	বোড়ে	বোড়ে	বোড়ে	বোড়ে	বোড়ে
নৌকা	ঘোড়া	গজ	রাজা	মন্ত্রী	গজ	ঘোড়া	নৌকা

উপরোক্ত গ্রন্থে কিন্তু এইরূপ দেওয়া আছে:

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
পত্তি	পত্তি	পত্তি	পত্তি	পত্তি	পত্তি	পত্তি	পত্তি
হস্তী	হয়	উষ্ট্র	সেনাপতি	সার্ব্বভৌম	উষ্ট্র	অশ্ব	নাগ

নৌকার কোন উল্লেখ নাই—উষ্ট্র একটি নূতন 'বল'। সাধারণতঃ মন্ত্রী (যে নামেই এই 'বল' অভিহিত হউক না কেন) রাজার ডাহিনে থাকে; এই পুস্তিকার বর্ণনা অনুসারে মন্ত্রী (সেনাপতি) রাজার (সার্ব্বভৌমের) বাঁ দিকে বসেন্। ইহা একটি বৈশিষ্ট্য। বলের গতি সম্বন্ধে বর্ত্তমানে প্রচলিত খেলার সঙ্গে উক্ত পুস্তকের বর্ণনার বিশেষ পার্থক্য নাই। "হস্তী"র সাধারণ নৌকার ন্যায় গতি। "হয়" ঘোড়ার ন্যায় আড়াই ঘর যায়। "উষ্ট্র" সাধারণতঃ গজের ন্যায় কোণাকুণি চলে।

মহাভারতের যুদ্ধের সময় চতুরঙ্গের 'বল' বলিতে রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক বুঝাইত। যুদ্ধে উষ্ট্রের ব্যবহার কদাচিৎ হইত। রাজপুতানার মরুপ্রান্তরে উষ্ট্রসাদী সৈন্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের অনুমান লেখক রাজপুতানা অঞ্চলের লোক। বাংলার নৌ-বলের কথা আমরা কালিদাসের রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে পাই। বার ভুঁইয়ার নৌ-বল ইতিহাসপ্রসিদ্ধ—ইঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য মোগল বাদশাহেরা 'নৌয়ারা' প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার দাবাখেলায় চতুরঙ্গ 'বলে'র মধ্যে নৌকার স্থান হওয়া বিচিত্র নহে। এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান এবং অধিকতর তথ্যসংগ্রহ করা আবশ্যক।

"সতরঞ্জ-কুতূহলম"-এর মতে খেলার নাম 'শতরঞ্জ' হইয়াছে, কেননা ইহা শত (বহু) লোকের মনোরঞ্জন করে।

নরশতাঙ্করঞ্জপ্রতি ধ্রুবং
তদুদিতং শতরঞ্জমতোঽর্থতঃ।

আরও একটি কারণে এই খেলার নাম "শতরঞ্জ" হইতে পারে। আজকালকার ন্যায় আগেকার দিনেও কাপড়ের ছক্ একরঙা বস্ত্রের উপর ছিটের কাপড় সেলাই করিয়া তৈরি হইত। সে কারণ ৩২টি ঘর কাপড়ের যে রং সেই রঙের হইত; কিন্তু বাহারের জন্য বাকি ৩২টি ঘর নানা বিচিত্র বর্ণের ছিটের কাপড় দিয়া তৈরি করা হইত। এইরূপ ছক বহুবর্ণবিশিষ্ট শতরঞ্জের ন্যায় বলিয়া এই ছকের উপর যে খেলা হয় তাহার নাম শতরঞ্জ খেলা হইয়াছে, এইরূপ অনুমিত হয়।

ঘোড়ার চৌষট্টি ঘর ভ্রমণের সঙ্কেতবিষয়ক বাংলা ভাষায় ছাপা পুস্তকও দেখিয়াছি। এ বিষয়ে হস্তলিখিত বা মুদ্রিত বাংলা পুস্তক সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান হওয়া উচিত। তাহা হইলে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

আপতাবে মৌসিকী ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ

শ্রীওঁকারনাথ চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীত-সম্রাট্ ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেব বিগত ৫ই নভেম্বর বরোদায় পরলোকগমন করিয়াছেন। ইং ১৮৮১ সালে রমজানের সময় আগ্রায় এই কলাবিৎ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মিঞা রঙ্গীলের পৌত্র; মিঞা রঙ্গীলে সহস্র রঙ্‌দার গান রচনা করিয়া রঙ্গীলে নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের মাতৃকুলও খ্যাতনামা গায়ক-বংশ—তাঁহার মাতামহ গোলাম আব্বাস খাঁ ওরফে খোদাবক্‌স্ অতি প্রসিদ্ধ কলাবিৎ ছিলেন; খোদাবক্‌সের কণ্ঠস্বর ছিল গুরুগম্ভীর। 'মলুহা কেদার', 'মিয়া মল্লার' 'দরবারী কানড়া' প্রভৃতি গম্ভীর প্রকৃতির রাগ তাঁহার কণ্ঠে মূর্ত্ত হইয়া উঠিত।

খোদাবক্‌সের গম্ভীর সুরাল আওয়াজ ফৈয়াজ খাঁ উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন। খাঁ সাহেব যখন মাতৃগর্ভে, তখন তাঁহার পিতা সব্দর হোসেন খাঁর মৃত্যু হয়। গোলাম আব্বাস খাঁ এই পিতৃহীন বালককে শৈশবকাল হইতে লালন-পালন করেন। গোলাম আব্বাস খাঁ আগ্রায় বাস করিতেন। ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের পিতৃকুল মাতৃকুল উভয় দিকেই ধ্রুপদ ধামারের ঘরওয়ানা, এই জন্ত খাঁ সাহেব প্রথম ধ্রুপদ ধামারের শিক্ষাই পাইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ বেজ বোওয়া তাঁহার 'সঙ্গীতকলা প্রবেশ' নামক পুস্তকের ১ম ভাগে গোলাম আব্বাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"আমি…নত্‌থন খাঁর সঙ্গে আগ্রায় গিয়াছিলাম। সেখানে জহুরা বাঈ-এর বাড়ীতে এক জলসায় গোলাম আব্বাস খাঁর গান শুনিবার সুযোগ মিলিয়াছিল; আব্বাস খাঁ দুটি রাগ গাহিয়াছিলেন, মিয়াঁকী তোড়ী ও আশাবরী। এরূপ বিলম্ব পদ গায়ক খুব কমই দেখা যায়; প্রথমত: বিলম্ব পদ বা বিলম্বপৎ গাওয়া সহজসাধ্য নহে, তাহার উপর তোড়ী ও আশাবরী রাগের রূপসৃষ্টি অত্যন্ত কঠিন। এই সকল রাগ তানবাজীর রাগ নহে, তান-সুলভ রাগ ভিন্ন প্রকৃতির; সব রাগে তানবাজী কি ভাল? ফৈয়াজ খাঁ সাহেব বিলম্বিত গায়্‌কীতে পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি তোড়ী, আশাবরী, রামকেলি প্রভৃতি রাগে অসামান্ত কুশলতার পরিচয় দিতেন। এই কুশলতার কিছু নমুনা, 'গরবা মৈর সংগ লাগী', এই গ্রামোফোন রেকর্ডে তিনি রাখিয়া গিয়াছেন; ইহা তাঁহার উৎকৃষ্ট রেকর্ড। ইহার স্থায়ী, অন্তরা, আলাপ ও তোড়ীর বিশিষ্ট গাম্ভার এবং বোলতানের তুলনা নাই। বরোদার চাকরী লওয়ার কিছু পূর্ব্বে ফৈয়াজ খাঁ সাহেব মহীশূরে ১৯১১ সালে আপতাবে মৌসিকী উপাধি পাইয়াছিলেন। ঐ সময় সয়াজী রাও মহারাজের এক পর্ব্ব উপলক্ষে বরোদায় গিয়াছিলেন; খাঁ সাহেবের গানে মহারাজ মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দরবার-গায়ক নিযুক্ত করেন। বরোদা-সরকার খাঁ সাহেবকে 'জ্ঞান-রত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন।

ফৈয়াজ খাঁ

খাঁ সাহেব অনেক শিষ্যকে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকার (অধ্যক্ষ, মরিস কলেজ, লক্ষ্ণৌ), দিলীপচাঁদ বেদী (তাস্কর বুয়ার প্রাক্তন শিষ্য), প্রসিদ্ধা মানকাজান (আগ্রাওয়ালী), সরাফৎ হোসেন, শ্রাম জোশী, মোহন সিংহ, সব্বীর মহম্মদ খাঁ (মৃত), আতা হোসেন, স্বামী বল্লভদাস, অজমত হোসেন, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও পরলোকগত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী ইত্যাদি।"

ইন্দোরের মহারাজ তুকাজীরাও প্রসিদ্ধ সঙ্গীতরসিক। তিনি ১৯৩৫ সালে হোলি উৎসবে খাঁ সাহেবকে দশ হাজার টাকার রত্নহার, পাঁচ হাজার টাকার বস্ত্র ও নগদ দশ হাজার টাকা উপহার দিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেন। ফৈয়াজ খাঁ সাহেব 'প্রেম প্রিয়া' এই নামে গান রচনা করিতেন। তাঁহার স্ব-রচিত কয়েকটি গানের উল্লেখ নিম্নে করা হইল:—'মোরে মন্দর অবলো' (জয়-জয়ন্তী), 'আঁখিয়া উন সোঁ লাগ রহি' (ঝিঁঝিট), 'এ মরি ছোড়' (সুখরাই), 'সগরী উমরিয়া সোরি' (বৃন্দাবনী সারঙ্গ), আলি হটো যাও সৈঁয়া (সোহিনী), কৈ সে কর রাখু জিয়া (শ্রাম কল্যাণ), তন মন ধন সরবার (গারা কানড়া)। ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের গায়্‌কী সম্বন্ধে, পরলোকগত প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য রামকৃষ্ণ বেজ বোওয়ার এই উক্তি প্রণিধানযোগ্য —"বিগত দিনের ইন্দ্র, চন্দ্র, সাদৃশ গায়কসমূহ, যথা—ভূপবর্দ্ধ

রহিমত খাঁ (হর্দু খাঁ সাহেবের পুত্র), প্রখ্যাত নত্থন খাঁ ও তাস্বর বোওয়া প্রভৃতির অস্থায়ী অন্তরা গাহিবার অপূর্ব্ব ঢং,

বাম দিক হইতে : সরাফৎ হোসেন, গোলাম রসুল, ফৈয়াজ খাঁ ও আতা হোসেন

সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য, রাগশুদ্ধ তথা তাল শুদ্ধ গায়কী এই ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের গানেই অবশিষ্ট আছে।" খাঁ সাহেবের গায়কীর আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি গানের মধ্যে সময় সময় কৌতুকাবহ রীতিতে রঙ্ সৃষ্টি করিতেন। ইহা যেন মনে হয়, দুরূহ স্বরসংযোজনা, কঠিন 'লয়' ও রাগদারীর সংযম-প্রসূত কঠোরতা, পাছে শ্রোতাদের মনকে ক্লিষ্ট বা ক্লান্ত করে সেইজন্য উক্তরূপ রঙ্গভঙ্গী আনিয়া তাদের মনকে হাল্‌কা করিয়া দিতেন যাহার ফলে বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার গান শুনিবার পরও মনে কোন অবসাদ আসিত না। শ্রাব্য সৌন্দর্য্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও রসসৃষ্টি করিবার অতুলনীয় দক্ষতা ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের ছিল। তিনি গানের ভাব ও ভাষাকে মূর্ত্ত করিয়া শ্রোতাদের মনে এমন ভাবে চিত্রিত করিতেন যে তাহা একটি কাব্য অথবা নাটকের রূপ ধারণ করিত। এই অনুপম কলা কি ভাবে প্রদর্শিত হইত, তাহা নিয়ে তাঁহার একটি গান উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছি।

(নট—বেহাগ)

"ঝন্ ঝন্ ঝন্ পায়োলিয়া বাজে,
জাগে মোরি শাষ ননদীয়া, ঔরে দেওরনীয়া।"

ভাষার দিক দিয়া, এই শব্দগুলির এমন কিছুই মহিমা নাই, কিন্তু বৈচিত্র্যপূর্ণ সুর ও ছন্দের মাধ্যমে যখন এই পদগুলি অভিব্যক্ত হইত, তখন "ঝন্ ঝন্ ঝন্" শব্দ কণ্ঠে ধ্বনিত হইলেও মনে হইত উহা যেন প্রকৃতই নূপুরের একটি মধুর ছন্দ! পরে শঙ্কা-শিহরিত ভঙ্গীতে "জাগে মোরি শাষ ননদীয়া" পদটি গীত হইবার সময়, শ্রোতাদের মনে এইরূপ একটি চিত্র ভাসিয়া উঠিত :—প্রেমাস্পদের সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষায়, গভীর নিশীথে নীরব ও নিদ্রিত পুরী হইতে গোপনে বাহির হইবার কালে, অভিসারিকা এই ভাবিয়া শঙ্কাকুলা যে, অধীর-চরণে বদ্ধ নূপুরের রুনুঝুনু আওয়াজ ননদী দেওরাণী (দেবরের স্ত্রী) প্রভৃতিকে জাগাইয়া তুলিলে, অথবা তাহারা জাগিয়া থাকিলে আর রক্ষা নাই! লগ্নভ্রষ্ট হইয়া সকলই বিফল হইবে—এই আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত অভিসারিকার হাবভাব ও মনের উৎকণ্ঠা-দ্যোতক উক্ত গানের পদগুলি ভাবানুকূল ধ্বনি ও ছন্দে লীলায়িত হইয়া শ্রোতাদের মানস-পটে একটি গতিশীল চিত্রের আকার ধারণ করিত এবং তাহা ধীরে ধীরে মনকে আচ্ছন্ন করিয়া এক অভিসার-নাটকের রঙ্গমঞ্চে টানিয়া লইয়া যাইত। গান শেষ হইলে, স্বপ্নোত্থিতের মত শ্রোতাদের মনে হইত—নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই যেন নাটকের অবসান হইল। এইরূপ মায়ালোক রচনা করার শক্তিকেই সঙ্গীতকলার সাধনার চরম সিদ্ধি বলা যাইতে পারে।

এখন প্রকৃতির লীলা এবং শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকলাবিদের রূপ ও রসসৃষ্টির মধ্যে কিরূপ ঐক্য আছে তাহারই আলোচনা করিব।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের প্রখর রৌদ্রের পরে, আষাঢ় শ্রাবণের ধারায় ধরা সিক্ত-শ্যামল হইয়া উঠে। আবার মেঘমুক্ত আকাশে মধুর হাসিয়া শরতের চন্দ্র উদিত হয়, সেইরূপ কলাবিদের গুরুগম্ভীর কণ্ঠের গমক ও তানের ঘন-ঘটায় যে রুদ্ররূপ প্রকাশ পায়, তাহাই বিয়োগান্ত শৃঙ্গারের বিগলিত করুণায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক নব বসন্তের সূচনা করে। এই ভাবে রৌদ্র, শৃঙ্গার, বিয়োগান্ত শৃঙ্গার, হাস্য-কৌতুক প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী রসের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাবেশে যে কি অপূর্ব্ব অখণ্ড রসের সৃষ্টি হয়, তাহা ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের গায়কীর মর্ম্মকথায় বোদ্ধামাত্রেই অবগত আছেন।

ফৈয়াজ খাঁ সাহেব কখনই একথা বিস্মৃত হইতেন না যে, গানের আসরে লয়, মান, রাগ ঠিক ঠিক অনুধাবন করিবার মত মুষ্টিমেয় কয়েকজন রসজ্ঞ শ্রোতা ব্যতীতও যে বহু জন শুধু মাধুরীর জন্য লালায়িত, রসাস্বাদের জন্য তৃষ্ণার্ত্ত, তাহাদের বিমুখ করা চলে না। সেইজন্য তিনি ঠুংরী, গজল, লাউনী, দাদরা প্রভৃতি লঘু চালের গানও গাহিতেন। গত বৎসর কলিকাতায় নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে খাঁ সাহেব, এই অনুষ্ঠানের শেষ রজনীতে, রাত্রির অন্তিম প্রহর হইতে প্রভাত অবধি, ভৈরবী, দাদরায়—"বাতিয়াঁ বনাও"—গানটি গাহিয়া শ্রোতাদের মনে অপূর্ব্ব আনন্দ দান করিয়াছিলেন।

মুঘল বাদশাহী আমলের জাঁকজমকপূর্ণ চমৎকার গায়কীর রঙীন বিকাশের রশ্মি ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেব যে ভাবে বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার স্মৃতিকে বরণীয় করিয়া রাখিবে।*

* এই প্রবন্ধের ছবি দু'খানি শ্রীআশারাম চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে।

মোগলযুগে ভারতীয় জীবন

ডক্টর শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত

মানুষের চিন্তাশক্তির চিরনূতনত্বের জন্য যুগে যুগে প্রত্যেক বিষয়ের আলোচনার ধারা পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। এক সময়ে ঐতিহাসিকগণ রাজনৈতিক বিষয় নিয়েই ইতিহাসের আলোচনা করতেন; কিন্তু আজকাল এ মতবাদের পরিবর্ত্তন হয়েছে। এখন অনেক ঐতিহাসিক সামাজিক ইতিহাসের উপর বিশেষ জোর দিচ্ছেন। তাঁরা বলতে চান যে, সামাজিক ইতিহাস বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়—কারণ এই আলোচনার দ্বারা আমরা জনসাধারণের ইতিহাস জানতে পারি। জানতে পারি তাদের সুখদুঃখের কথা, তাদের আশা-নিরাশার কাহিনী।

ভারতবর্ষের ইতিহাস নিয়ে আজ প্রায় দুই শতাব্দী হ'ল ভারতীয় ও অভারতীয় পণ্ডিতদের গবেষণা চলছে। এর ফলে আমরা অনেককিছু জানতে পেরেছি। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে প্রধানত: তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা, প্রাচীন বা হিন্দু যুগ, মুসলমান যুগ এবং বর্ত্তমান বা ইংরেজ আমল। মধ্যযুগের সবচেয়ে গৌরবময় কাল হচ্ছে মোগলযুগ। মোগল-যুগ আরম্ভ হয় ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে, যখন বাবর ভারতে এসে এক নূতন রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং শেষ হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন হৃতসর্ব্বস্ব মোগলবাদশা বাহাদুর শাহ ইংরেজের হাতে বন্দী হন। মোগল-রাজত্বের গৌরবময় যুগে বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাজাহান ও আওরঙ্গজেব ভারতবর্ষকে শ্রেষ্ঠ রাজ্যে পরিণত করেন। মোগলসাম্রাজ্যের গৌরব-রবি ধীরে ধীরে অস্তমিত হয়ে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে চিরতরে বিলীন হয়ে যায়।

এ যুগের ভারতীয় জীবনের ইতিহাস আমরা সমসাময়িক ফরাসী ও ভারতীয় ভাষাসমূহে লিখিত গ্রন্থ, সমসাময়িক ইউরোপীয় পর্য্যটকদের রচনা এবং ইউরোপীয় বাণিজ্যদপ্তরের বিবরণ থেকে প্রাপ্ত হই।

তখনকার দিনে এদেশেও সম্রাট্ ছিলেন সবার উপরে। তাঁর পরই ছিলেন তাঁর প্রসাদভোগী ধনী ব্যক্তিগণ। তাঁরা এমন সম্মান ও প্রতিপত্তি ভোগ করতেন যা অন্যান্য শ্রেণীর লোকের আয়ত্তের বাইরে ছিল। মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকেরা সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। ভারতের পশ্চিমপ্রান্তস্থিত প্রদেশের সওদাগরেরা বিলাস-ব্যসনে মগ্ন থাকতেন। নিম্নশ্রেণীর লোকেদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। তাদের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অন্নবস্ত্র জুটত না; কিন্তু তাদের চাহিদাও বেশী ছিল না। মিতাচার সমাজের প্রধান বিশেষত্ব ছিল।

যে সব সামাজিক প্রথা প্রচলিত ছিল তন্মধ্যে সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলিন্যপ্রথা ও বিবাহে যৌতুকদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান যুগে এদের কোনও কোনওটি একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছে। সেযুগেও এসব প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা গিয়েছে। যাতে বাল্যবিবাহ ও যৌতুকপ্রথা লোপ পায় তার জন্য আকবর চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু তাঁর চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। বিধবা-বিবাহ মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণেতর জাতি এবং পঞ্জাব ও যমুনা-উপত্যকার জাঠজাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। অন্যান্য প্রদেশে ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিধবা-বিবাহের প্রচলন ছিল না।

সেযুগেও চাল, ডাল, মাছ, মাংস, চিনি, নুন, ঘি, গুড় প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী দ্বারা আহার্য্য প্রস্তুত হ'ত। তবে কিভাবে এ সব খাদ্যসামগ্রী রন্ধন করা হ'ত সে সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। জন ডলেট নামক একজন ওলন্দাজ লেখক বলেছেন যে, চাল-ডাল মিশ্রিত খিচুড়ি একটি প্রধান খাদ্য ছিল। কিছু মাখন মিশিয়ে রাত্রিতে সাধারণ লোকেরা ঐ খিচুড়ি খেত। জনসাধারণ দিনে একবারই পেট ভরে খেত।

ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ; সেজন্য এদেশে কখনও বেশী কাপড়-জামা পরার রেওয়াজ ছিল না। মোগলযুগেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। সমাজের বিভিন্ন স্তরের নরনারীর জন্য বিভিন্ন প্রকারের বেশভূষা প্রচলিত ছিল। সম্রাট্ আকবরের পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা হতে আমরা শ্রেষ্ঠ সম-সাময়িক অভিজাতসম্প্রদায়ের পোশাক-পরিচ্ছদের আভাস পাই। আকবর পায়জামা, আলখেল্লা ও পাগড়ী পরিধান করতেন এবং পাদুকা পরতেন। মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ের ব্যক্তি-গণ এর চেয়ে কিছু নিম্নস্তরের পোশাক পরিধান করতেন। নিম্নস্তরের ব্যক্তিগণের পোশাক-পরিচ্ছদের কোনরূপ বাহুল্য ছিল না।

মোগলযুগে কয়েক প্রকার ঘরের ও বাইরের ক্রীড়া প্রচলিত ছিল। মোগল-সম্রাটগণ মৃগয়া করতে ও অন্যান্য বাইরের ক্রীড়াতে যোগদান করতে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁরা পশুতে পশুতে লড়াই, মানুষে মানুষে যুদ্ধ এবং পশু ও মানুষের মধ্যে যুদ্ধ দেখতে ভালবাসতেন। যে সব বাইরের ক্রীড়া মোগলসম্রাটগণ ভালবাসতেন তার মধ্যে কুস্তি, পায়রা-উড়ানো প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সে যুগের ঘরের ক্রীড়ার মধ্যে দাবা, দশ-পঁচিশ ও তাসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

হিন্দুদের ভেতরে তীর্থযাত্রার খুব প্রচলন ছিল; মুসল-

যানদের মধ্যে মক্কাতে তীর্থযাত্রা করার প্রথাও বিদ্যমান ছিল। এজন্য জাহাজ রাখা হ'ত। ইটালীর পর্য্যটক নিকোলো কণ্টি ও ইংরেজ পর্য্যটক এডওয়ার্ড টেরীর বিবরণ থেকে আমরা এর বর্ণনা পেয়ে থাকি। খুব বড় বড় জাহাজ যাত্রীদের মক্কাতে নিয়ে যেত।

সেযুগে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রচলন ছিল, সম্রাট ও ধনী ব্যক্তিগণ শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

তখন স্ত্রীশিক্ষা কিছু পরিমাণে ছিল। সম্রাট-পরিবারের ও অভিজাত-পরিবারের নারীগণকে গৃহেই শিক্ষা দেওয়া হ'ত। মোগলযুগে কয়েকজন উচ্চশিক্ষিতা রমণীর কথা জানতে পারি; যথা—গুলবদন বেগম, সালিমা সুলতানা, নূরজাহান, মমতাজ, জাহানারা বেগম ও জেবুন্নিসা।

মোগল যুগে ভারতীয় জীবনে নূতন ভাবের সংমিশ্রণ হয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমানের অনেক সময় সংঘাত হয়েছে বটে, কিন্তু তা সত্বেও বহু সম্রাটের সুযোগ্য রাজ্য-শাসন-ব্যবস্থার ফলে হিন্দু-মুসলমানের জীবন সুখময়ই হয়েছিল।

* অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর সাহিত্য-বাসরে পঠিত এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

আমন্ত্রণ

শ্রীঅমরকুমার দত্ত

ঝড়-ঝঞ্ঝার দাপট চলেছে চারিধার মোর ঘিরে
তার মাঝে একা চলিয়াছি আমি প্রান্তর-পর্ব্বতে।
মোর সাথে সাথে চলিবে কি কেহ? ঊর্দ্ধ গিরির শিরে?
তুষারের পথে, পথ করি লয়ে উজান খরস্রোতে?

বসতি আমার শহরের এই পরিধিতে নহে কভু,
বদ্ধ দুয়ার প্রাচীরেতে ঘেরা ক্ষুদ্র ঘরের মাঝে;
আমার উপরে সুনীল স্বর্গে শোভিছে জগৎ-প্রভু,
মত্ত তুফান আঘাতিয়া মোরে বিদ্রোহ তুলিয়াছে।

খেলা করি আমি হেথায় বসিয়া এই বিজনতা লয়ে,
বিপদ হয়েছে বন্ধু আমার দুঃসাহসের সাথী।
মহান্ জীবন কে লভিবে আজ? কে রবে মুক্ত হয়ে?
বাত্যা-তাড়িত উচ্চ অচলে উঠ তবে ধরি বাতি।

স্বামী আমি আজ মত্ত ঝড়ের, গিরিনাথ আমি আজ,
প্রেরণা যে আমি মহামুক্তির, মহাভাতি মহিমার,
বিপদ-দোসর হবে সেই জন, প্রলয়ের নটরাজ,
সাথে যে চলিবে, হবে যে আমার রাজ্যের ভাগীদার।*

* আলিপুর জেলে রচিত শ্রীঅরবিন্দের 'Invitation'' নামক কবিতার মর্ম্মানুবাদ।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী অরুণা সেনগুপ্তা এই বৎসর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় ইংরেজীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। প্রথম ভাগে (অর্থাৎ part I এ) তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন এবং কেবলমাত্র তিনিই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। বহু বৎসর যাবৎ ইংরেজী এম-এ. পরীক্ষায় পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেহ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন নাই। দ্বিতীয় ভাগে শ্রীমতী অরুণা দ্বিতীয় শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এবারেও কেহই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন নাই।

শ্রীমতী অরুণা বিহারের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্স লেঃ কর্ণেল এস, এক. গুপ্ত, আই-এম-এস-এর কন্যা।

শ্রীঅরুণা সেনগুপ্তা

আলোচনা

"আসামের আদিম জাতি"

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

গত ভাদ্র মাসের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গের উপরোক্ত নিবন্ধে আপনারা লিখিয়াছেন যে, "অহোমিয়া" ভাষাকে আসামের রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা হইতেছে ও "আহোম" ভাষা-ভাষী লোকের সংখ্যা জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। আপনাদের এই উক্তি যথাযথ নহে। আসামে অহোমিয়া ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার কোন চেষ্টা হয় নাই, অসমীয়া (Assamese) ভাষাকেই রাজ্য-ভাষা করার চেষ্টা হইতেছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, "অসমীয়া" বাংলা ভাষার মতই মাগধী প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত একটি "নব্য-ভারতীয় আর্য্য-ভাষা"। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পর্য্যন্ত এই ভাষায় পঠন-পাঠন ও পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা আছে। ভারতবর্ষের নূতন রাষ্ট্র বিধির ৮ম তপ্‌শীলে ভারতে প্রচলিত ১৪টি ভাষার মধ্যে এই প্রগতিশীল ভাষাটিও গৃহীত হইয়াছে।

বাংলাদেশে যেমন "ব্রাহ্ম", ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি হিন্দু সমাজের এক একটা সম্প্রদায়, আসামে আহোমেরাও তেমনি একটি সম্প্রদায়, "আহোম" মাত্রই "অসমীয়া" কিন্তু অসমীয়া মাত্রই "আহোম" নহেন···যেমন বাঙ্গালী মাত্রই "ব্রাহ্মণ", "ব্রাহ্ম" অথবা "বৈদ্য" বা কায়স্থ নহেন। মানব-জাতির ভোট-মোঙ্গোল শাখার অন্তর্ভুক্ত এই "আহোমেরা" খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আসামে প্রবেশ করেন ও বাহুবলে এই দেশের বিস্তীর্ণ ভূভাগ অধিকার করিয়া তদবধি এই দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। কালে ইঁহারা হিন্দুধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বহুলাংশে আর্য্য-সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়াছেন। আহোমদের নিজস্ব ভাষা ও লিখনরীতি আছে তবে উহার ব্যবহার খুব সীমাবদ্ধ, অহোমিয়া ভাষাকে রাজ্যভাষা করার কোন আন্দোলনের অস্তিত্ব আসামে নাই, সুতরাং আপনাদের উল্লিখিত "অহোমিয়া" চক্রান্তও আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক বিষয়। বাংলাদেশে অসমীয়া ও আহোম বা অহোমিয়া কথাগুলি সমার্থক ভাবে ব্যবহৃত হওয়ায় বহু ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বাংলাদেশের অনেক সংবাদপত্রে ভিন্ন প্রদেশের ভাষা ও অধিবাসীদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ মন্তব্যাদি প্রকাশিত হয়, ইহার ফলে প্রবাসী বাঙালীদের প্রবাসের দুঃখ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় মাত্র। প্রদেশে প্রদেশে শ্রদ্ধা ও প্রীতির বন্ধন যাহাতে দৃঢ়তর হয় বর্ত্তমানে সেইরূপ চেষ্টারই প্রয়োজন।

প্রবাসী-সম্পাদকের মন্তব্য

পত্রলেখক যে ভুল দেখাইয়া দিয়াছেন তাহার জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকার বাসিন্দা। অতীত যুগে যেমন অনেক বাঙালী আসামে গিয়াছিলেন, এবং কালক্রমে আসামের সমাজে মিশিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আজ সম্ভব হইতেছে না কেন? পত্রলেখক বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশিত আসাম সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করিতে পারেন। গত একশত বৎসরে অনেক বাঙালী আসামে গিয়াছেন, তাঁহারা পরস্পরের সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান-বিস্তার করিয়া দুই সমাজের মধ্যে যোগসূত্ররূপে কাজ করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা হয় নাই। এবং সেইজন্য ভারতবর্ষের নানা সংস্কৃতির লোকেরা রেষারেষি করিয়া নিজেরাও মজিতেছেন, রাষ্ট্রকেও বিপন্ন করিতেছেন। সংবাদ-পত্রের মন্তব্যাদি তাঁহার জন্য দায়ী নয়। আমরা অনেকেই প্রতিবেশী-সমাজের মন বুঝিতে চেষ্টা করি না, তাহাদের স্বার্থের কথা ভাবি না। এই মনোভাবই বিরোধের সৃষ্টি করে।

উপরোক্ত পত্রে "আহোম" ও "অসমীয়া" এই দুইটি কথার পার্থক্যের কথা বলা হইয়াছে। লেখক এই বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিতে পারেন।

কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৬৭। পৃঃ।০+২২৩+১৬০। মূল্য ৪৲ টাকা।

জয়দেব বাংলাদেশের বাঙালী কবি। তাঁহার অপূর্ব্ব সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ গীতগোবিন্দ কেবলমাত্র বৈষ্ণবদিগের নহে, সকল শিক্ষিত বাঙালীর গৌরবের জিনিস। বাংলার বাহিরেও এই গ্রন্থের সমাদর ও প্রভাব যে কত বিস্তৃত এবং গভীর ছিল, তাহার সাক্ষ্য দিতেছে ইহার বার-তেরোটি অনুকরণ ও প্রায় চল্লিশটি বিভিন্ন প্রদেশে রচিত টীকাগ্রন্থ। বাংলার বাহিরে রাজস্থানের রাণা কুম্ভ ও মিথিলার শঙ্কর মিশ্রের টীকাসম্বলিত দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা একটি সংস্করণ প্রচলিত আছে, কিন্তু ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বাংলাদেশে বাঙালীর টীকাসমেত কোনও বিশুদ্ধ সংস্করণ সম্পাদিত হয় নাই। সেইজন্য যখন ১৩৩৬ সালে চৈতন্য-সম্প্রদায়ের চৈতন্যদাস (পূজারী গোস্বামী) রচিত বালবোধিনী টীকা-সমেত বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন বর্ত্তমান সমালোচক ভারতবর্ষ পত্রিকায় (আশ্বিন, ১৩৩৯) বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া তাহার সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সেখানে কবি ও কাব্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আজ দীর্ঘ একুশ বৎসর পরে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল; এরূপ গ্রন্থের এত বিলম্বিত সমাদর বোধ হয় এক বাংলাদেশেই সম্ভব!

দ্বিতীয় সংস্করণের আকার অনেক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, এবং প্রথম সংস্করণের যাহা কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল, সম্পাদক তাহা বিশেষ যত্নের সহিত সংশোধিত করিয়াছেন। তাহা ছাড়া অনেক নূতন তথ্য এবং তত্ত্বের সমাবেশে ইহার মূল্য ও সমৃদ্ধি যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে।

বাংলাদেশে হয়ত রসপিপাসু পাঠকের অভাব নাই, কিন্তু তথ্য ও তত্ত্বের কথা শুনিলে অনেকে সম্ভবতঃ শিহরিয়া উঠিবেন। কিন্তু কাব্য-আলোচনায় কবির দেশ-কাল ও পারিপার্শ্বিকের তথ্য অপ্রাসঙ্গিক নয়। কিংবদন্তী, আখ্যায়িকা, ঐতিহাসিক উপকরণ ও কাব্যের মধ্যে কবির পরিচয়—এ সমস্তই সম্পাদক যথাযথ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে গুজরাতের শার্ঙ্গদেব বাঘেলার সময়ে উৎকীর্ণ (সংবৎ ১৩৪৮ =ইং ১২৯১) শিলালিপির ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের উল্লেখ দেখিলাম না। এই শিলালিপিতে জয়দেবের দশাবতার-স্তুতি শ্লোক (বেদানুদ্ধরতে ১।১৬) মঙ্গলশ্লোকরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

কাব্য হিসাবে জয়দেবের রচনা উপভোগ্য হইলেও বৈষ্ণব-সাধকদের নিকট গীতগোবিন্দ শুধু কাব্যগ্রন্থ নয়, তাঁহাদের ভক্তিরসশাস্ত্রে বর্ণিত উজ্জ্বল রসের উৎকৃষ্ট নিদর্শনস্বরূপ ধর্মগ্রন্থ, যাহা স্বয়ং চৈতন্যদেবের আস্বাদনে প্রমাণীকৃত। এদিক হইতেও সম্পাদক নানা তত্ত্বের বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন। রচনায় ভাবা ও সঙ্গীত, পাঠভেদ, পুরাণাদির সহিত ইহার সম্বন্ধ, ইহার প্রথম শ্লোকের রহস্য, অন্যত্র উদ্ধৃত শ্লোক বা পদাবলীর উল্লেখ প্রভৃতি কোনও প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ সম্পাদক বাদ দেন নাই। কিন্তু সম্পাদক শুধু পণ্ডিত নহেন, রসিকও বটে। তাই তাঁর ভূমিকায় সংবাদের সঙ্গে রসবিচারেও সমন্বয় হইয়াছে। মূলের বঙ্গানুবাদও সুপাঠ্য। বহু যত্ন ও পরিশ্রমের দ্বারা সম্পাদিত, বঙ্গবাণীর আদি জয়কেতু জয়দেবের এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থের আমরা বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীসুশীলকুমার দে

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা—শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। পৃ. ১৮/০+১২০। মূল্য দুই টাকা।

বঙ্কিমচন্দ্রের লিপিকুশলতা ও ভাষাবৈশিষ্ট্য লইয়া বহু আলোচনা হইয়াছে। অজয়চন্দ্র গল্প বলার সরস ভঙ্গিতে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার ক্রমবিকাশ দেখাইয়া সেই আলোচনায় নূতন প্রাণসঞ্চার করিলেন। প্রধানতঃ রূপচিত্রাঙ্কন অবলম্বনে এই আলোচনা করা হইলেও অজয়চন্দ্র বাংলাভাষা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিগুলি উদ্ধৃত করিয়া বইখানিকে মূল্যবান করিয়াছেন। পিতৃভক্তিবশতঃ বইখানি একটু 'সাধারণী'-ঘেঁষা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা দোষের হয় নাই, সমসাময়িক পরিবেশ-সৃষ্টিতে সুখপাঠ্যই হইয়াছে। গোড়ায় ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকা কিন্তু অকারণ দুরূহতার সৃষ্টি করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে জটিলতা ও দুর্বোধ্যতা হইতে ভাষাকে উদ্ধার করিতে চাহিয়াছিলেন, এই "ভূমিকা" তদ্দ্বারা গুরুতরভাবে পীড়িত; "যৌনবুভুক্ষার কেন্দ্রিকতা," "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নৈর্ব্যক্তিকতার অন্তরাল," "সার্বভৌমতার বৃহত্তর সত্তা"র ঘা খাইলে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র শিহরিয়া উঠিতেন। আর একটি কথা, আমরা মনস্বী ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ বা মনঃসমীক্ষণের কথাই জানি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু অধ্যাপক মহোদয় "ফ্রড-প্রতিষ্ঠিত যৌনবিজ্ঞানে"র পাঠ লইলেন কোথায়?

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমিধ—শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী। "নমামি" প্রকাশ মন্দির, ৮।২, গোপ লেন, ইণ্টালী, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১০৩। মূল্য দেড় টাকা।

বিপ্লব-যুগের বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে লেখকের "নমামি" নামক পুস্তক যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলাম। তাঁহার বর্ত্তমান পুস্তকখানি ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়া অভিনব। "অনুশীলন সমিতি"র নেতৃবর্গ এবং কর্ম্মিবৃন্দের কীর্ত্তিকথা অবলম্বন করিয়া জিতেশবাবু যে যুগের চিত্র আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া অনেকে সেই গৌরবময় যুগের শেষ হইয়াছে মনে করিয়া অতীতের জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিবেন।

দুর্গম পথের অভিযাত্রী ঐ সব বাঙালী-যুবকের প্রাণে যে রস ছিল, যখন তখন যে হাসি তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হইত তার পরিচয় পাই এই পুস্তকের দশ-এগারো পৃষ্ঠায়। এই পুস্তকের প্রত্যেকটি আখ্যানে দেখিতে পাই বাঙালী পুরুষ-রমণীর "মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনা"র নিষ্ঠা। এই নিষ্ঠা দিকে দিকে বিস্তৃত হইয়াই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনিয়াছে। তার পরিচয়-প্রদানের দায় বাঙালী লেখক-সমাজের। হিন্দী ভাষায় অভিজ্ঞ কোন বাঙালী-লেখক সেই দায় স্বীকার করিলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকিব। তবেই অ-বাঙালী সমাজ বাঙালী বিপ্লবীর প্রকৃত পরিচয় পাইবেন, বাঙালী-সমাজও বর্ত্তমানের নিরাশার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

বাপু-দর্শন—শ্রীকাকা কালেলকর। অনুবাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ। সুপ্রকাশন, ৩, সার্কাস রেঞ্জ, কলিকাতা-১৯। ১১৭ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই টাকা।

শ্রীকাকা কালেলকর গান্ধীজীর অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের অন্যতম। তৎপূর্ব্বে তিনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন। শিক্ষকরূপে এবং এই সেবার মাধ্যমে তিনি রবীন্দ্রনাথের ভাব ও কর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছেন। এই পুস্তকে তাঁহার সেই সময়কার নানা অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

কাকা তাহা লিপিবদ্ধ করান মধ্যপ্রদেশের সিউনী জেলে, এবং ১৯৪৮ সালে তাহা প্রকাশিত হয়। সেই হিন্দি পুস্তকের নাম 'বাপুকী ঝাঁকিয়া'। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ তাহা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন।

কাকা কালেলকর প্রায় চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এই ক্রম উক্ত বর্ণনায় অনুসৃত হয় নাই। আলোচনাকালে "প্রসঙ্গক্রমে যে ঘটনার কথা মনে আসিত" তাহাই তিনি "সেই দুপুরে" লিখাইয়া লইতেন। বর্ণনার আন্তরিকতায় তাহা আমাদের নিকট অপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত হইয়াছে। বীরেনবাবুর অনুবাদের মধ্যেও সেই গুণ আছে। তিনি অতিশয় সাবধানী লেখক; বাংলা ও অন্যান্য ভাষা হইতে অনুদিত তাঁহার নানা লেখার মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়—গান্ধী-"দর্শন" (পরিচয়) সম্বলিত এই পুস্তকেও তার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই নাই। মাঝে মাঝে হিন্দী ভাষার বর্ণনারীতি তিনি অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা বাঙালীর কানে নূতন ঠেকিবে। কাকা কালেলকরের ভাবধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে গেলে তাহা ছাড়া উপায় নাই। অনুবাদকের পক্ষে ইহা একটা মস্ত গুণ। বাঙালী পাঠক গান্ধী-জীবনের অনেক কথা এই পুস্তকে জানিতে পারিবেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

ছন্দ পতন—শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়। ডি এম লাইব্রেরি। ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲ টাকা।

কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। সাহিত্য-জগতে লেখক নবাগত। কাহিনীর সম্পূর্ণতা বিচার না করিলেও একটি জিনিস গল্পগুলিতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—তা মানুষের প্রতি লেখকের অকৃত্রিম কল্যাণ-কামনা; দেশকে ও মানুষকে ভালবাসার সুর প্রায় প্রত্যেকটি লেখার মধ্যে আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তরুণ-মনে স্বদেশ বা মানব-হিতৈষণাজনিত ভাবালুতা, সার্থক গল্প-রচনার পথে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় এবং প্রায়ই দেখা যায়—হৃদয়ের আবেগ গল্পের প্রয়োগ-মাত্রা-বিচ্যুত হইয়া দীর্ঘ বক্তৃতাতে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অভিজ্ঞতা, অধ্যবসায় ও সাহিত্য-প্রীতি লেখকের সর্ব্বোত্তম সম্বল—গল্প বলার কৌশলের সঙ্গে এইগুলি যথাযথ প্রযুক্ত হইলে রচনা সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির পর্য্যায়ে উন্নীত হয়।

একদম বাঁধকে জানানা—শ্রীপ্রভাত বসু। কমলা বুক ডিপো। ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২।০ টাকা।

সাহিত্যে, সমাজ-জীবনে ও রাজনীতি-ক্ষেত্রে যে-সব সমস্যা আজ জটিল আবর্তের সৃষ্টি করিয়াছে—তাহার কিছু অংশ বর্ত্তমান পুস্তকে গল্প, নাটিকা প্রভৃতি রসরচনায় রূপায়িত হইয়াছে। কয়েকটি গল্প ও নক্সা বেশ উৎরাইয়াছে। ব্যঙ্গ-কৌতুকের মোড়কে মোড়া থাকিলেও সেগুলি শুধু হাসির বস্তু হয় নাই—হাসির পিছনে অশ্রু এবং তাহারও গভীরে চিন্তার সম্পদ বহন করিয়া সেগুলি হইয়াছে সার্থক চিত্র। এই চিত্র পরিস্ফুটনে রেখার সহযোগিতাও উল্লেখযোগ্য। প্রথম গল্পটিতে এবং নাটিকা দু'খানিতে সস্তা হাস্যরস জমাইবার প্রয়াস দেখা যায়। অন্যান্য রচনার তুলনায় এগুলি অপেক্ষাকৃত ম্লান হইয়াছে।

বিখ্যাত বিচার-কাহিনী—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৷৹ টাকা।

বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকের মধ্যে এই দেশে কয়েকটি চাঞ্চল্যকর বিচার-কাহিনীর কথা সংবাদপত্রের মারফত আমরা জানিতে পারিয়াছি। সেগুলি যে-কোন মনঃকল্পিত গোয়েন্দাকাহিনীর চেয়েও চাঞ্চল্যকর এবং উপভোগ্য। বিখ্যাত বাওলা-হত্যাকাণ্ড—যাহার সঙ্গে ইন্দোরের মহারাজা ও নর্তকী মমতাজ বেগম জড়িত, প্লেগ-বীজাণুঘটিত পাকুড় ষড়যন্ত্রের মামলা, লাহোরের পঞ্চদশবর্ষীয়া বাঈজী সামসেদ বাঈয়ের রহস্যজনক মৃত্যু, উড়িষ্যার বারো বছরের অপরূপ লাবণ্যবতী কুমারী কনকের অন্তর্দ্ধান-রহস্য, কলিকাতার বিখ্যাত খোকা গুণ্ডার প্রাণদণ্ড, মীরাটের ক্লার্ক-জুলাম হত্যার কথা প্রভৃতি ঘটনাবলী এককালে প্রতিদিনের আলোচনার বস্তু ছিল। এগুলি আজ সময়ের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, আমাদের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। লেখক এই বিখ্যাত বিচার-কাহিনীগুলিকে একত্রে সংগ্রথিত করিয়াছেন—কাহিনী-গ্রন্থনে তাঁহার শ্রম ও যত্ন পরিস্ফুট। সমসাময়িক সংবাদপত্র, দলিল, সাক্ষীদের জবানবন্দী, কৌঁসুলি ও বিচারপতিদের সওয়াল ও মন্তব্য প্রভৃতি হইতে উপকরণ সংগৃহীত হইয়া এক একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী রচিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি কাহিনীর মূলে আছে মানব-মনের অদম্য ভোগস্পৃহা ও লালসা যাহা ইন্দ্রিয়ের তাড়নায়, বিষয়তৃষ্ণায়, জন্মগত পাপ-প্রবণতায় মানুষকে পশুর স্তরে নামাইয়া দেয়—সমাজের আবহাওয়া বিষাক্ত করিয়া তুলে।

কাহিনীর অনুসরণ করিতে করিতে তমোগুণাশ্রিত বেগবান বৃত্তিগুলি ঘটনারাজির আবর্তে কোন্ পরিণাম-ভয়ঙ্কর লক্ষ্যে মানুষকে টানিয়া লইয়া যায় তাহা জানিবার কৌতূহলে মন ভরিয়া উঠে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

মহামায়া—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। প্রবর্তক পাবলিশার্স। ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দেড় টাকা।

চণ্ডীর তত্ত্ব নিরূপণ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যের আখ্যায়িকা বর্ণন আলোচ্য গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গক্রমে বাংলা শাক্ত সাহিত্য, বৌদ্ধধর্মে শক্তিবাদ ও বেদান্তে শক্তিবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রন্থকারের কতকগুলি প্রবন্ধ এক একটি পরিচ্ছেদ হিসাবে গ্রন্থ-মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দেবীমাহাত্ম্যে অনুল্লিখিত অথচ প্রাসঙ্গিক কতকগুলি বিবরণ অন্যান্য পুরাণ হইতে সংকলন করিয়া গ্রন্থকার উপাখ্যানাংশটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করিয়াছেন। সাধারণ পাঠক এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া চণ্ডী সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য জানিতে পারিবেন। তবে আশঙ্কা হয় তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠককে ইহা সকল ক্ষেত্রে পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে না।

গ্রন্থের রচনা সাধারণতঃ পল্লবিত—স্থানে স্থানে পুনরুক্তি দোষদুষ্ট। মুদ্রাকরপ্রমাদ ও বর্ণাশুদ্ধির বাহুল্য পীড়াদায়ক। আকরনির্দ্দেশ বা বিস্তৃত বিবরণের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে অনেক কথার তাৎপর্য্য বা যুক্তি ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। এই প্রসঙ্গে 'চণ্ডীর ভূমিকা' পরিচ্ছেদের ঐতিহাসিক আলোচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'বাংলা শাক্তসাহিত্য' পরিচ্ছেদের বক্তব্য বিষয়গুলি বিক্ষিপ্ত ও অসংবদ্ধ।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

ব্যালান্স শীট—শ্রীরাখালদাস সোম। এস্. কে. লাহিড়ী এণ্ড কোং লিঃ। ৫৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ মূল্য ৩৷৹।

কল্পনা এবং অনুভূতি থাকিলে যে সকল বিষয়কেই সাহিত্যের এলাকায় লইয়া যাওয়া যায়, তাহারই নিদর্শন বইখানিতে পাইলাম। লেখক গণনাবিদ্—চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট, বইয়ের নামকরণ করিয়াছেন 'ব্যালান্স শীট'। প্রবন্ধগুলির নাম—'সেপারেট রিপোর্ট', 'ট্রেডিং একাউন্ট', 'প্রফিট এণ্ড লস্ একাউন্ট', 'এলোকেশন একাউন্ট', 'ব্রাঞ্চ একাউন্ট', 'ব্যালান্স শীট'। আসলে, এখানি সংখ্যাশাস্ত্রের বা ধনবিজ্ঞানের বই নয়। 'আসল ও মেকী, সত্য ও ছল, পুণ্য ও পাপের জমা-খরচ করিয়া লেখক সংসারের বাস্তব রূপটি দেখাইয়াছেন। আয়করের অসঙ্গতি, ডাকমাশুলের উঠানামা, বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতিনীতি, চোরাবাজারীর কূট-কৌশল কিছুই তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়ায় নাই এবং বিদ্রূপবাণ হইতে অব্যাহতি পায় নাই। এ গ্রন্থ পারিভাষিক শব্দের আবরণে উপভোগ্য সমসাময়িক-'সংসার'-চিত্র।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

স্বপনী—শ্রীরবি গুপ্ত। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। ২৪, প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা।

এখানি কবিতা-পুস্তক। চুয়াল্লিশটি কবিতার সমষ্টি। বিবিধ ছন্দে রচিত এই গীতিকবিতাগুলির মধ্যে একটি ভক্তিপূত আত্মনিবেদনের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

"হে অসীম। তব সুদূরপথের অতল-অন্ত দিশার পানে
দিয়েছি খুলিয়া মোর জীবনের নির্ভাবনার তরণীখানি।"

প্রথম কবিতাটিতেই লেখক বলিতেছেন,

"নিশীথ ধরার উদয়ালোকের স্বপনী আমি,
নামে অমরার অরুণ বিথার—দীপ্ত যামি।"

'সন্ধানী'তে পাই,

"অনুভূতি মোর প্রতি অক্ষরে—
তোমারে ধরে।"

কবিতাগুলির মধ্যে একটি স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য আছে। "পদ্মবনের গন্ধ দিয়ে আমার সে-গান গড়া।"

"ও শেফলি, শেফালিকা
কার মরমের শুভ্র-শিখা—
দীপের মত উঠল জ্বলে আমার অচিন-গহনে।"

"প্রস্ফুট" কবিতায় আছে,

"মর্ম্ম আমার চূর্ণ ক'রে রুদ্ধ প্রাচীর সদা
মন্দ্রে লভে অভ্রভেদী তুঙ্গ-শিখর-তল।"

"উৎসে" পাই,

"নেহারি' তোমায় জ্যোতি-নির্ঝর যুগ-প্রভাতের অভ্যুদয়,
তব মর্ম্মের চিরগভীর শান্তি-সাগর জাগে।"

কবিতাগুলি গতানুগতিক নয়। ছন্দ সাবলীল। শব্দ সুনির্ব্বাচিত। রচনার মধ্যে তরুণ লেখকের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাই।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

লক্ষবর্ষ পরে—শ্রীপ্রবোধ সরকার। এইচ, ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং। ২৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

ছোটদের জন্য বই লিখিয়া যাঁহারা খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, শ্রীপ্রবোধ সরকার তাঁহাদের অন্যতম। হাস্যরসের পরিপ্রেক্ষিতে নূতন আঙ্গিকে রচিত এই উপন্যাসখানি ছোটদের মনকে কল্পনার বিচিত্র লীলায় আবিষ্ট এবং মুগ্ধ করিবে সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া কাহিনীর অভিনবত্ব তাহাদের মনকে শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইবে।

সার্ব্বজনীন লোকসভা—শ্রীসুশীলচন্দ্র দাস। প্রাপ্তিস্থান - ৪-ডি, নাসিরুদ্দিন রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

"সার্ব্বজনীন লোকসভা" নির্ম্মল কৌতুক-নাট্য, ইংরেজীতে যাকে বলে comedy of situation—বইখানি কয়েকবার সাফল্যের সঙ্গে ঢাকা বেতারকেন্দ্রে অভিনীত হইয়াছে। কৌতুক-নাটিকা হিসাবে বইখানি যে রসোত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের ছা-পোষা কেরাণীকুলের যে চিত্র লেখক আমাদের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন তা সত্যচিত্রই হইয়াছে। নাট্যকারের সিচুয়েশ্যন সৃষ্টির বাহাদুরি আছে এবং তাহার ফলে সামান্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তিনি একখানি উৎকৃষ্ট হাসির নাটক রচনা করিতে পারিয়াছেন। সংলাপ খুব স্বাভাবিক অথচ জোরালো।

বাংলা-সাহিত্যে উচ্চাঙ্গের কৌতুক-নাট্য খুব কমই আছে। সেজন্য এই নবীন নাট্যকারের এই প্রয়াস প্রশংসনীয়।

নেতাজীর জয়যাত্রা—শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। নিউ বুক ষ্টল। ৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চৌদ্দ আনা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের 'আজাদ হিন্দ ফৌজের কীর্ত্তিকলাপ সম্পর্কে ছোটদের জন্য রচিত একখানি উচ্ছাসপূর্ণ নাটক। বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত।

ভাঙন-কূল—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়। প্রাপ্তিস্থান—২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

একখানি সামাজিক নাটক। "আধুনিক যুগে প্রত্যেক দেশহিতৈষী ব্যক্তির মনে গ্রামোন্নতির পরিকল্পনার যে আদর্শ জাগিয়া আছে ও যে যে কারণে এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার প্রচেষ্টা ব্যাহত হইতেছে তাহাই নাটকের আলোচ্য বিষয়...।"

বিষয়বস্তু পুরাতন সন্দেহ নাই, কিন্তু ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণের মুন্সীয়ানার গুণে নাটকখানি পাঠকের মনে আবেগ সৃষ্টি করে—রসিকচিত্তে আবেগ সৃষ্টি করাই শ্রেষ্ঠ নাটকের একটি প্রধান লক্ষণ। সংলাপ-রচনায়ও নাট্যকার নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। তবে দীর্ঘ সঙ্গীত যোজনা করায় নাটকীয় গতি ব্যাহত হইয়াছে। গানগুলি যতই সুরচিত হউক না কেন, তাহা নাটকের 'টেম্পো' নষ্ট করিয়াছে। পরবর্ত্তী সংস্করণে এই ত্রুটি বর্জ্জন করিলে 'ভাঙন-কূল' একখানি ভাল নাটকের পর্য্যায়ে উন্নীত হইবে।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

জিজ্ঞাসা—শ্রীতরুণ রায়। ভবানীপুর বুক ব্যুরো। ১বি, রসা রোড, কলিকাতা। দাম আড়াই টাকা।

পূর্ব্বপাকিস্তান হইতে জাহাজে উদ্বাস্তদের আনিতে গিয়া লেখক যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন তাহাকেই ভিত্তি করিয়া এই কাহিনীটি রচনা করিয়াছেন।

লেখক উদ্বাস্তদের কাহিনী লিখিয়াছেন বুকের দরদ দিয়া। স্থানে স্থানে বর্ণনা এত মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে যে পড়িতে পড়িতে অশ্রুসংবরণ করিতে পারা যায় না। যে ধর্ষিতা মেয়েটি উদ্বাস্ত-শিবিরে অবাঞ্ছিত সন্তানের জন্মদান করিয়াছিল তার বেদনাকরুণ মুখচ্ছবি পাঠকের চিত্তপটে যেন চিরতরে আঁকা হইয়া যায়। যে সন্তানের মৃত্যুকামনা সে একান্ত মনে করিয়াছিল, নিদারুণ অসুখের সময় যাহাকে সে ঔষধ পর্য্যন্ত খাওয়ায় নাই, অদৃষ্টের চরম অভিশাপের প্রতীক্ সেই সন্তানের মৃত্যুসংবাদ যখন তাহার কানে পৌছিল তখন তাহার মায়ের প্রাণ ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, তাহার আহারনিদ্রা ঘুচিয়া গেল। বেদনাবিদীর্ণ মাতৃহৃদয়ের এ অপরিমেয় শোক এতই মর্ম্মান্তিক এবং তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব এমনি জটিল যে, পাঠককে তাহা যুগপৎ অভিভূত ও বিভ্রান্ত করিয়া ফেলে।

আর একটি কাহিনীও মনের মধ্যে গাঁথা হইয়া যায়। ষ্টীমার চলিয়াছে হাজার হাজার উদ্বাস্তকে লইয়া। দুর্য্যোগ-রাত্রি। কালবৈশাখীর ঝড় উঠিয়াছে। ষ্টীমারের জেটিতে দাঁড়াইয়া লেখক দেখিতেছেন একটি মেয়ে হাতে একটা কাপড়ের পোঁটলা লইয়া সন্তর্পণে আসিল নদীর ধারে। হঠাৎ সেই পোঁটলার ভিতর হইতে সদ্যোজাত শিশুর কান্না শুনিয়া লেখক চমকাইয়া উঠেন। পুলিশের জেরায় প্রকাশ পায়, মেয়েটি এই নবজাতককে নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দিতে আসিয়াছিল, কেননা সদ্যভূমিষ্ঠ শিশু আর প্রসূতিকে উদ্বাস্ত-জাহাজে যাইতে দেওয়া হয় না। কিন্তু দুটি অসহায় প্রাণীর মুখ চাহিয়া পরিবারের আর সকলে ষ্টেশনের নীচেকার সাময়িক আশ্রয়-স্থলে এবং ষ্টীমার-কোম্পানীর ঘরে পড়িয়া থাকিতে রাজী নয়। তাই প্রসূতিকে না জানাইয়া তার এই আত্মীয়া আসিয়াছিল শিশুটিকে সলিল-সমাধি দিবার উদ্দেশ্যে। প্রতিকূল অদৃষ্ট যে উদ্বাস্তদের কোন্ স্তরে আনিয়া দাঁড় করায়, মানুষের সুকুমারবৃত্তি ধীরে ধীরে কেমন করিয়া লোপ পাইয়া যায় তাহার বর্ণনা পড়িয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। এই কাহিনীর উপসংহারে লেখক বলিতেছেন—"কেন জানি না ছবি ফুটে উঠল—কুন্তী এক শিশুকে জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে—নদীর তীরে কর্ণ কুন্তীকে ভর্ৎসনা করছে—কে জানে কলিযুগের কর্ণরা আবার বেড়ে উঠছে কিনা—অধিরথদের ঘরে।"

বইখানিতে এমনি ধরণের অনেকগুলি কাহিনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—লেখক যেন প্রাণের সবটুকু দরদ ঢালিয়া দিয়া একখানি বেদনার মালা গাঁথিয়া পাঠকদের উপহার দিয়াছেন। এ উপহার অশ্রু উপহার। বিশু, সলিল, পণ্ডিতমশাই, হাবিলদার, ডাক্তার প্রভৃতি চরিত্রগুলি ভালই ফুটিয়াছে। আর এই কাহিনীর সূত্রে মধ্যমণির মত বিরাজ করিতেছে ত্যাগে অনুপম, সেবায় নিরলস, তিতিক্ষায় মহীয়সী বাসনাদির চরিত্র।

অবশ্য কাহিনীটি নিখুঁত এমন কথা বলিতেছি না—স্থানে স্থানে অসঙ্গতি আছে, জায়গায় জায়গায় অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে, বিশেষতঃ উপসংহারটি হইয়াছে বড়ই কাঁচা। এসব ত্রুটি সত্ত্বেও কিন্তু রচনার মধ্যে এমনি একটা আন্তরিকতা আছে যে, ত্রুটিগুলি মার্জ্জনীয় বলিয়া মনে হয়।

বইখানি শেষ করিবার পর উদ্বাস্তদের বহুবিধ সমস্যার কথা ভাবিয়া চিত্ত বেদনার ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। চোখের সামনে দিয়া যেন জিজ্ঞাসার মিছিল চলিতে থাকে। মনের মধ্যে এই প্রশ্নটাই বড় হইয়া উঠে যে, এক

রাষ্ট্র হইতে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া যাহারা আর এক রাষ্ট্রে আসিল, তাহাদের আসল দুঃখের লাঘব কতটুকু হইল—আশ্রয়-শিবির স্থাপন, রিলিফওয়ার্ক, বার দিল্লীচুক্তি সবই হইল, কিন্তু 'ততঃ কিম্'।

কৃষাণ—শ্রীমন্মথ রায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে গ্রন্থকারের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। পৌরাণিক কাহিনী এবং ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে নাটক-রচনায় অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া একজন প্রথম শ্রেণীর নাট্যকাররূপে তিনি বিপুল খ্যাতির অধিকারী হইয়াছেন। বর্ত্তমান চিত্রনাট্যখানি রচনা করিয়াছেন তিনি বাস্তব-জীবন হইতে উপকরণ আহরণ করিয়া।

মহাজনের শোষণে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বাংলার কৃষাণ-পরিবার কি ভাবে তিল তিল করিয়া ধ্বংসের পথে আগাইয়া যায় তাহারই আলেখ্য বর্ত্তমান পুস্তকখানিতে ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস লেখক পাইয়াছেন এবং এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার কি তাহারও নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

কৃষক অর্জ্জুনের পুত্র লক্ষ্মণ দশ বৎসর কলিকাতায় 'নতুন দাদুর' স্নেহ-চ্ছায়াতলে কাটাইয়া 'মানুষ' হইয়া যেদিন নিজের জন্মপল্লী কল্যাণপুরে ফিরিয়া আসিল সেদিন গাঁয়ের কৃষকদিগকে সমবায়-সমিতির সভ্য করিয়া এই কথাই সে বুঝাইল যে, সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠার মধ্যেই কল্যাণপুরের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত। সমালোচ্য পুস্তকখানি উদ্দেশ্যমূলক তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু পুস্তকখানিতে প্রচার কতকটা প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, তদুপরি সাহিত্যরসের মিশাল থাকায় ইহা বাংলা চিত্রনাট্যের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যের দাবি করিতে পারে।

গ্রন্থকারের উচ্চাঙ্গের রসসৃষ্টি-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় চাষী অর্জ্জুন মণ্ডল আর তাঁর স্ত্রীর খড়ম ও শাঁখা কেনার ব্যাপারের বর্ণনায়। গরীব স্বামীস্ত্রী পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসে। গ্রামের মেলায় গিয়া দুর্গার এক জোড়া খড়ম ভারি পছন্দ হইল। তাহার ইচ্ছা অর্জ্জুনের জন্য খড়ম-জোড়া কিনিয়া লয়। কিন্তু দেড় টাকা দাম শুনিয়া অর্জ্জুন স্ত্রীকে লইয়া দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করে।

শেষে সুরু হয় স্বামীস্ত্রীর মধ্যে লুকোচুরি। দুর্গা দূরে সরিয়া যায় এবং নিজের হাতেকাটা সূতা বেচিয়া দেড় টাকা দিয়াই সেই খড়মজোড়া ক্রয় করে। বাড়ী আসিয়া খড়মজোড়া বাহির করিয়া দুর্গা বলে, "মণ্ডল মশাই, একবার পায়ে দিন তো"—কিন্তু "মণ্ডল মশাই" যে "দেখি তোমার হাতখানা" বলিয়া মেলায় পছন্দকরা শাঁখাজোড়া বাহির করিয়া তাহার হাতে পরাইয়া দিতে উদ্যত হইবে কৃষাণগিন্নীর বোধ করি তাহা ধারণারও অতীত ছিল। অত্যন্ত হাল্‌কা তুলির টানে দীনদরিদ্র সরল কৃষক-দম্পতির গভীর প্রেম ও মধুর ছলনার এই যে মনোরম চিত্রটি গ্রন্থকার আঁকিয়াছেন সেজন্য তাঁহাকে মনে মনে সাধুবাদ জানাই। এই বর্ণনায় তিনি যে লিপিসংযমের পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়।

অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে দীর্ঘ বিচ্ছেদের অবসানে, লোকচক্ষুর অন্তরালে রাত্রির অন্ধকারে দুর্গার সঙ্গে পুনর্ম্মিলনের সঙ্গে সঙ্গেই অর্জ্জুন যখন চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিতে চাহিল, তখন দুর্গার—"কিন্তু তুমি তো কিছুই পেলে না জীবনে...আমি কি শুধুই লক্ষ্মণের মা। আমি তোমার স্ত্রী, অনেক দুঃখের পর ফিরে পেয়েছি তোমাকে। আর তোমাকে হারাতে পারব না।" এই মর্ম্মস্পর্শী কথাগুলির ভিতর দিয়া ভাগ্যবিড়ম্বিতা, কৃষক-রমণীর অন্তর্গূঢ় বেদনা যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

জন্মভিটার জন্য পরাণের আকুল আকূতি, অর্জ্জুন, দুর্গা ও লক্ষ্মণের জন্য প্রতিবেশিনী রুক্মিণীর স্নেহের আকস্মিক প্রকাশ পাঠকচিত্তে রেখা-পাত করে। কৃষকদের জন্মগত দাবির কথা ইদানীং আমরা নূতনভাবে ভাবিতে সুরু করিয়াছি। স্বাধীন ভারতে আজ কৃষাণমজদুরপ্রজা-রাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে অনেকেই মশগুল। এমতাবস্থায় বর্ত্তমান পুস্তকখানির প্রকাশ বেশ সময়োপযোগী হইয়াছে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

ছড়া ছবিতে অ আ ক খ—শ্রীসুনির্ম্মল বসু লিখিত এবং শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত চিত্রিত। শিশু সাহিত্য সংসদ, ৩২-এ, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

বাংলাভাষায় বর্ণপরিচয়ের বই অনেক আছে। আমরা ছেলেবেলায় যে সচিত্র বাল্যশিক্ষা পড়িয়াছি তাহার মত এখন আর দেখি না। 'অজগরটি আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে' হইতে আরম্ভ করিয়া 'নীতি এই যথা তথা বল সদা সৎ কথা' পর্য্যন্ত সেই বাল্যশিক্ষাখানিতেই পাঠ করিয়াছিলাম। পরে বহু বর্ণপরিচয় দেখিয়াছি, কিন্তু তেমনটি কচিৎ দৃষ্ট হইয়াছে। ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর ছেলেদের জন্য রচিত সচিত্র বই দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। শিশুদের শিক্ষার প্রতি ইংরেজ সাহিত্যরসিক, সাহিত্যিক ও জনসাধারণের কত দরদ, কত ভাবনা। মনে প্রশ্ন জাগিত, আমরা কি ঐরূপ করিতে পারি না?

ইদানীং এই প্রশ্নের জবাব মিলিয়াছে। শিশু সাহিত্য সংসদ কিছুকাল যাবৎ বাঙালী বালক-বালিকাদের জন্য সচিত্র প্রাথমিক পাঠোপযোগী পুস্তকাদি প্রকাশ করিয়া শিশুশিক্ষার একটি নূতন পথ প্রদর্শন করিতেছেন। অ আ ক খ শিখিতে ছেলেমেয়েদের কতই না কষ্ট। তাহারা যদি সুপরিচিত চিত্রের সহযোগে সেগুলির রূপের সঙ্গে পরিচিত হয় তাহা হইলে অনায়াসে এবং অজ্ঞাতসারেই সকল অক্ষর আয়ত্ত করিয়া ফেলিতে পারে। আলোচ্য পুস্তকখানি অ আ ক খ বর্ণ-পরিচয়। কিন্তু চিত্রসৌষ্ঠবে এবং অক্ষর ও রচনাসজ্জার পারিপাট্যে ইহা প্রচলিত বর্ণপরি-চয়গুলিকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। বাঙালী ছেলেমেয়ের দেখা ও জানা জীব-জন্তু, তরু-লতা, ফুল-ফল, খাল-বিল, নদ-নদী, চন্দ্র-সূর্য্য, তারকাদির চিত্রে অক্ষরগুলি যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের শিক্ষণীয় বিষয় মানুষকে বাদ দিয়া চলে না। আবার শিশুশিক্ষার পুস্তকাদিতে শিশুই নায়ক। শিশুকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন ধরণের ও বয়সের নরনারীর চিত্র বইখানিকে চিত্তাকর্ষক করিয়াছে। অক্ষর-কেন্দ্রিক ছড়াগুলি মুখস্থ করিয়াও শিশুরা আনন্দ পাইবে। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার জাতির পক্ষে আশার সঞ্চার করে।

ছেলেভুলানো ছড়া—শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী। পাঠভবন পুস্তকপ্রকাশ সমিতি, শান্তিনিকেতন, বীরভূম। মূল্য এক টাকা।

আমরা কৈশোরে বৃদ্ধবৃদ্ধাদের মুখে অনেক ছড়া, হেঁয়ালি প্রভৃতি শুনিয়াছি। এখনও যে দুই-একটা মনে নাই তাহা নহে। তুলনা করিতে করিতে 'দুধ' শেষ পর্যন্ত 'কাঁচি'র মত হইয়া যাইত। কোন কোন ছড়া কিঞ্চিৎ 'vulgar' বা গ্রাম্যতা-দোষে দুষ্ট হইলেও তাহার মধ্যে বেশ একটা সহজ প্রকাশভঙ্গী লক্ষ্য করিয়াছি। আলোচ্য পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার এইরূপ উনষাটটি ছড়া সংগ্রহ করিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। এখানি পাঠ করিলেই প্রতীতি হইবে—বাংলার সংস্কৃতি বঙ্গদেশের সর্বত্রই কিরূপ ব্যাপকতালাভ করিয়াছিল। বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান বিস্তর, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কয়েকটি শব্দ বা বাক্যাংশ কিঞ্চিৎ অদলবদল হইয়া একই ভাবে ছড়াগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চলিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম—বঙ্গের সর্ব্বত্রই যে ভারতীয় সংস্কৃতি একটি বিশিষ্ট রূপে ধরা দিয়াছে, গ্রাম্য ছড়া ও হেঁয়ালিগুলি দৃষ্টে তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও এই ছড়াসমূহের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া নিজে অনেকগুলি ছড়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এ সম্পর্কে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "লঘুকায় বন্ধনহীন মেঘ আপন লঘুত্ব এবং বন্ধনহীনতা গুণেই জগদ্ব্যাপী হিতসাধনে স্বভাবতই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে এবং ছড়াগুলিও ভারহীনতা, অর্থ-বন্ধনশূন্যতা এবং চিত্রবৈচিত্র্য বশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে—শিশুমনোবিজ্ঞানের কোন সূত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত হয় নাই।"

নূতন নূতন ভাব-সংঘাতে আমাদের পুরাতন অনেক কিছুই ঝরিয়া পড়িতেছে। তাহার সঙ্গে ভাল জিনিষগুলিও যাহাতে বিলুপ্ত না হয় বাঙালী মাত্রেরই সেদিকে দায়িত্ব রহিয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানিতে ছড়াগুলি একত্র গ্রথিত পাইয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। শিল্পাচার্য্য শ্রীযুত নন্দলাল বসু পরিকল্পিত প্রচ্ছদপটটি বিষয়ানুগ এবং শিল্প-সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব।

হিং টিং ছট্—শ্রীদেড়কড়ি শর্ম্মা। এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স, ১৪নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

পুস্তক ও গ্রন্থকার উভয় নাম হইতেই বুঝা যাইবে, পুস্তকখানি ব্যঙ্গ-রসাত্মক। বাস্তবিকই ছন্দে ও চিত্রে শিশুচিত্তের উপযোগী তেরটি বিদ্রূপাত্মক হাসির কবিতা ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীযুত সজনী-কান্ত দাসের 'পরিচয়'টিও বেশ উপভোগ্য। পুস্তকখানি পুনরায় পাঠ করিয়া বেশ খানিকটা হাসিয়া লওয়া গেল। একারণ বলা যায়, শুধু শিশুগণই ইহা পাঠে আনন্দ পাইবে না, বয়স্কেরাও বেশ উপভোগ করিতে পারিবেন। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি ছেলেমেয়েরা কবিতাগুলি পাঠ করিয়া বা শুনিয়া শুনিয়া একেবারে মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ যে এত শীঘ্র বাহির হইয়াছে, এতাদৃশ জনপ্রিয়তাই ইহার কারণ। প্রত্যেকটি কবিতার সঙ্গে তদুপযোগী ব্যঙ্গচিত্রও সন্নিবেশিত হইয়াছে। হাসির খোরাকে এখানি ভরপুর।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

আলোচ্য পুস্তকখানি 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র অন্তর্গত ৮০ সংখ্যক গ্রন্থ। গ্রন্থকার বাংলা সাহিত্যের সেবকদের কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল যাবৎ আলোচনা দ্বারা ইহার ইতিহাসের একটি কাঠামো খাড়া করিতে যত্নপর হইয়াছেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের গবেষকদের ইহা যে বিশেষ কাজে লাগিতেছে, ইতিমধ্যেই তাহা বুঝা যাইতেছে। দ্বারকানাথ গঙ্গো-পাধ্যায় একজন সমাজ, ধর্ম্ম ও রাজনীতি বিষয়ক কর্ম্মী বলিয়াই সাধারণের নিকট পরিচিত। তিনি যে বাংলা-সাহিত্যের একজন অকৃত্রিম সেবকও ছিলেন, পুস্তকখানি পাঠে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, দ্বারকানাথের অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগই তাঁহাকে মাতৃভাষার চর্চ্চাতেও প্রেরণা দেয়। মাতৃভাষার মাধ্যমেই তিনি স্বদেশীয়দের যাবতীয় বিষয় শিক্ষা-দানে উদ্যোগী হন। 'অবলাবান্ধব' পত্রিকা তাঁহার একটি প্রধান কীর্ত্তি।

দ্বারকানাথ ১৮৭০ সনের মধ্যভাগে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় বেথুন স্কুল সংলগ্ন সরকারী মহিলা নর্ম্যাল স্কুলের জন্য তিনি ছাত্রী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীন-তার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। আর ইহা লইয়া নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে যুঝিতেও ক্ষান্ত হন নাই। কুমারী এনেট এক্রয়েডের হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের তিনি বাংলা পণ্ডিত ছিলেন। তবে ইহার প্রতিষ্ঠায় দ্বারকানাথের অনেকখানি হাত থাকিলেও বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় স্থাপনের মূলেই তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান উদ্যোগী। আর ইহা যে তখন বাঙালী বালিকাদের উচ্চশিক্ষার আদর্শ বিদ্যাপীঠে পরিণত হয় তাহাও তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টায়, বলা যায়। ১৮৯০ সনের নবেম্বর মাসে মাত্র ছয়টি বালিকা লইয়া যে ব্রাহ্ম বালিকা বোর্ডিং বিদ্যালয় ("Brahmo Girls' Boarding Institution") প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাই ১৮৯১-৯২ সনে "ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়" নামে একটি বেসরকারী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। দ্বারকানাথ ১৮৯৫ সন হইতে ইহার পরিচালনাভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করেন। পত্নী ডাঃ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রথমে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে এবং পরে ব্রিটেনে উচ্চতর চিকিৎসাবিজ্ঞান আয়ত্ত করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। নারীজাতীর চিরকল্যাণকামী 'অবলাবান্ধব' সাহিত্যিসেবী দ্বারকানাথের জীবনকথা স্বল্পপরিসরে আলোচিত হইলেও বড়ই সুখপাঠ্য হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথ একটি সত্যকার অভাব দূর করিয়া পাঠকমাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় স্থান পাইয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

হায়দ্রাবাদ-প্রবাসী বাঙালীদের বিজয়া-সম্মেলন

বিগত ২০শে অক্টোবর হায়দ্রাবাদ-প্রবাসী বাঙালী সমিতির উদ্যোগে হায়দ্রাবাদের নারাণগুডা ইয়ং মেন্‌স্‌ ক্রিশ্চিয়ান এসোসিয়েশনের সভাগৃহে বিজয়া উপলক্ষে শ্রীশচীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে একটি বিরাট উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। জাতিবর্ণধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকল সম্প্রদায়ের প্রবাসী বাঙালীরাই যোগদান করিয়া উৎসবটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিয়াছিলেন।

বিজয়া-সম্মেলন

নৃত্যগীত, আবৃত্তি, হাস্যকৌতুকাদির অভিনয়ে সভাগৃহ আনন্দমুখর হইয়াছিল। কুমারী লীলা শীলের পূজারিণী নৃত্য এবং নন্দা সুধীরা জিতেনের ময়ূরনৃত্য সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের "বশীকরণ" নাটিকাখানি বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। শ্রীপুষ্পরেণু দাশ রচিত ও পরিচালিত "গ্রাম্য পাঠশালা" নামক হাস্যরসাত্মক নাটকের অভিনয়ে বালক-বালিকারা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে এবং সভাগৃহে অনাবিল হাস্যরসের সৃষ্টি হয়।

"জনগণমন অধিনায়ক" গানটির দ্বারা সভার পরিসমাপ্তি হয়।

নরসিংদাস বাংলা পুরস্কার, ১৯৪৯

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, 'কলিকাতা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস'-এর ডিরেক্টর শ্রীনরসিংহ দাস আগরওয়ালার প্রদত্ত অর্থ হইতে "কলিকাতা, প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে"র মারফত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাংলা পুস্তকের জন্য 'নরসিংহ দাস বাংলা পুরস্কার' নামে একটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। এই পুরস্কারের পরিমাণ দশ হাজার টাকা।

প্রথমে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, সাহিত্য এবং বিজ্ঞান এই উভয় বিষয়ক গ্রন্থের জন্য পর্য্যায়ক্রমে উক্ত পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। ১৯৪৯-এর পুরস্কার প্রথমে বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থের জন্য ঘোষণা করা হয়। কিন্তু যথাসময়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় কোন পুস্তক না পাওয়াতে, পুরস্কারটি সাহিত্যবিষয়ক পুস্তকের জন্য প্রদত্ত হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। যে বৎসরের পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে সেই বৎসরে প্রকাশিত পুস্তকসমূহের মধ্যে যে পুস্তকখানি নির্ব্বাচক কমিটি কর্ত্তৃক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহার প্রণেতাকে উক্ত পুরস্কার প্রদান করা হইবে।

কমিটি বাংলা সাহিত্যবিষয়ক পুস্তকের লেখক, প্রকাশক, এবং বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকদের এই অনুরোধ

জানাইতেছেন যে তাঁহারা ১৯৪৯-এর ৩০শে জুনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী দুই বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত পুস্তকসমূহের প্রত্যেকটির চারখানি করিয়া কপি ১৯৫০-এর ৩০শে ডিসেম্বরের পূর্ব্বে কমিটির বিবেচনার্থ প্রেরণ করেন। পুস্তকাবলী দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার টি. পি. এস. আয়ারের নিকট প্রেরিতব্য।

হেমচন্দ্র বসু

মুঙ্গের-প্রবাসী এই বাঙালী-প্রধান পরিণত বয়সে মরজগত ত্যাগ করিলেন। এক জন সমাজ-নেতার তিরোধান বিহারের বাঙালী-সমাজকে দুর্ব্বল করিয়া দিল।

হেমচন্দ্র আইন-ব্যবসায়ে বিহারে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। সমাজের সকল শ্রেণীর লোক তাঁহার গুণ-মুগ্ধ ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকসমূহে গুরুপ্রসাদ সেন প্রমুখ বাঙালী-প্রধান বিহারে, লোক-সেবার যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেন হেমচন্দ্র মনে হয় তার শেষ ধারক ও সাক্ষী বলিয়া পরিগণিত হইবেন। সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে; বিহারে বাঙালীর স্থান সঙ্কুচিত হইতেছে। এই নূতন পরিবেশে হেমচন্দ্রের মতন লোকের নেতৃত্ব জনসাধারণের মনে সাহস দিত। তাঁহার অভাব আজ বিহারের বাঙালীকে ব্যথিত করিবে। হেমচন্দ্রের পরিবার-পরিজনের উদ্দেশে আমাদের সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯২৬ সালের মে মাসে এলাহাবাদে প্রশান্তকুমারের জন্ম হয়। তিন বৎসর পূর্ণ হইতেই তাঁহাকে স্থানীয় সেণ্ট মেরিজ কনভেণ্টে ভর্ত্তি করানো হয়। ১৯৪০ সালে মাত্র ১৩ বৎসর ১০ মাস বয়সে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইণ্টারমিডিয়েট কলেজিয়েট স্কুল হইতে বালক প্রশান্তকুমার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পদার্থ বিদ্যায় এম-এসসি পাশ করিবার পর ১৯৪৮ সালে প্রশান্তকুমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Statistics-এ (পরিসংখ্যান) এম-এসসি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 'পালিত' বৃত্তি লাভ করেন। কিছুকাল পরেই তিনি ন্যাশনেল ফিজিক্যাল লেবরেটরিতে চাকুরিতে নিযুক্ত হন। ১৯৪৯ সালে তিনি ইউনিয়ন রিপাবলিক সার্ভিস কমিশনের আই-এ-এস প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার পর তিনি নৈনীতাল বেড়াইতে যান, সেইখানে অল্প ক'দিন ভুগিয়া তিনি দেহ ত্যাগ করেন। ছোটবেলা হইতে প্রশান্তকুমার বিশেষ মেধাবী ছাত্ররূপে পরিচিত ছিলেন—তাঁহার বক্তৃতাশক্তি এবং বিতর্কশক্তিও ছিল

বেলোনা কলেজে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বক্তৃতা-প্রতিযোগিতায়

প্রশান্তকুমার চটোপাধ্যায়

যোগ দিবার জন্য তাঁহাকে পাঠানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়ী হইয়া বালক প্রশান্তকুমার পুরস্কারলাভ করেন।

কারুশিল্প পরিচয়

"প্রবাসী" বাংলার কারুশিল্প বিষয়ক কাজের পরিচয়দানে পথিকৃৎ। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই নব-জাগৃতির অগ্রদূত। আজ অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা ভারতবর্ষের নানা স্থানে শিল্পাচার্য্যের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন; ভারতীয় চিত্রশিল্পে ও কারুশিল্পে নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। অবনীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিষ্যবর্গের অন্যতম শ্রীঅসিতকুমার হালদার লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র ও কারুশিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। তাঁহার শিক্ষার গুণে উত্তরপ্রদেশে এই বিদ্যার অনুশীলন নূতন করিয়া আরম্ভ হয়। শ্রীযুতসন্তোষকুমার

মিনার কাজ—আল্পনা

বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের কৃতী বাঙালী ছাত্রদের একজন। ইনি চিত্র ও কারুশিল্পের নানা বিভাগে হাতে কলমে শিক্ষালাভ করেন এবং বিশেষভাবে মিনা করার কৌশল আয়ত্ত করেন। স্বীয় শিল্পগুরুর নির্দেশে তিনি এই শিল্পের প্রসার ও নূতন। সন্তোষকুমার এদেশে এ বিষয়ে অগ্রণী। তাঁ

শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মিনার কাজ—গণেশ

শিল্প-কুশলতার নানা নিদর্শন কাহারও কাহারও বৈঠকখানার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। তাঁর শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় এই সঙ্গে প্রদত্ত চিত্রে পাওয়া যাইবে।

বিষয়-সূচী—মাঘ, ১৩৫৭

বিষয়-সূচী—মাঘ, ১৩৫৭

রঙীন ছবি

প্রিয়জনকে উপহার দিতে প্রথমেই মনে পড়ে

বিভোরা (সেণ্ট) হিমাংশু স্নো ক্যান্থারাইডিন

কেশতৈল

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোম্পানী লিঃ
কলিকাতা
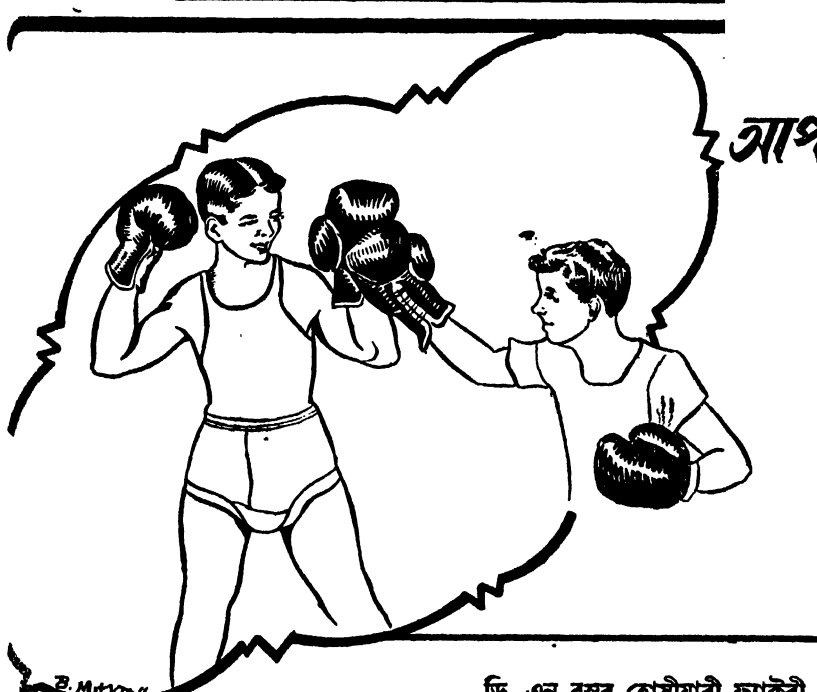
আপনার পছন্দ মত..

আনন্দমেলা
কমলাপ্রসন্ন
নন্দিতা
চয়নিকা
হিমানী
সুপার ফাইন স্পেসাল
ইনটেকস্লক
শীতলবায়
ঘরে বাইরে

ডি, এন বসুর হোসীয়ারী ফ্যাক্টরী
৩৬।১এ, সরকার লেন, কলিকাতা. ৭ ফোন, বি বি ৬০৫৬

উৎকন্ঠিত
মা'য়েদের
জন্য
সুসংবাদ
OSTERMILK
অস্টারমিল্কের
নিয়মিত যোগান
পাওয়া যায়
OSTERMILK
শিশুদের জন্য দুগ্ধজাত খাদ্য।
গ্ল্যাক্সো ল্যাবরেটরিস্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ, বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ।
Copyright
Stronachs

গ্রাম : খেলাঘর — ফোন : বি, বি, ৫৩০৭

ব্যাডমিণ্টন ব্যাট্ :

বিলাতি প্লাইউডের প্রতিখানা
১২৲ ১০৲ ৮৲ ও ৬৲
ঐ মধ্যম : ৫৷০, ৫৲, ৪৷০ ও ৪৲
সাধারণ : ৩৷০ ও ৩৲

সাটল কক প্রতি ডজন :

১২৲, ১০৷০, ৯৲ ও ৭৷০
সাধারণ : ৬৲, ৫৷০, ৪৷০ ও ৩৷৵০

ব্যাডমিণ্টন নেট প্রতিটি :

উৎকৃষ্ট : ৮৲, ৬৲, ৫৲ ও ৪৷০
সাধারণ প্রমাণ সাইজ : ১৷০ ও ১৲
ঐ ছোট সাইজ : ৸০ ও ৷০

ভলিবল : ১৮৲, ১৬৲ ও ১৪৲
ঐ সাধারণ ১২৲ ১০৲ ও ৮৲
ঐ নেট : ৭৷০, ৬৷০ ও ৫৲
বলের সঙ্গে একটি নিয়মাবলী ফ্রি দেওয়া হয়।

ঘোষ এণ্ড কোং
৯বি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৯

—নূতন উপন্যাস—

দুর্গম গিরিশিরে	শ্রীঅশ্বিনী পাল	৩৲
হে ক্ষণিকের অতিথি	শ্রীঅজয় রায়	২৷০
এ যুগেও কতো প্রেম	শ্রীমৃণালকান্তি	১৷৷০
সবার উপরে মানুষ সত্য	শ্রীবামাপদ	২৲

—শিশু-সাহিত্যের সেরা বই—

সাগরের দান—৩৲ মালয় বোম্বেটে—২৲
বিমানঘাটির দুর্বিপাক—১৲ দস্যু টাইগার—১৲
জাহাজ চুরী—১৲ ডিটেকটিভ তপনকুমার—১৲
কালাপাহাড়—১৲ ডানপিটে দীপু—১৲
পার্ব্বত্য মুষিক—১৲ বাঘসিংহের লড়াই—১৷০
চার অতিথি—১৷০ বাংলার দামাল ছেলে—১৷০
বিদ্রোহী—১৷০ আলপস্ অভিযানে নারী—১৷০

সেনগুপ্ত এণ্ড কোং
৩৷১এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বধিরের শ্রবণশক্তি !
চিরতরে আরোগ্য—পুনরাক্রমণের ভয় নাই

বধিরতা—অতি সহজ উপায়ে আশ্চর্য্যরূপে পুনরায় শ্রবণশক্তি ফিরাইয়া আনা হয়। শ্রবণযন্ত্রে যে কোন প্রকার বৈকল্য ঘটুক না কেন চিন্তার কারণ নাই। গ্যারান্টিযুক্ত এবং প্রসিদ্ধ **"এমারেল্ড পিলস এণ্ড র‍্যাপিড আউরাল ড্রপ"** (রেজিষ্ট্রিকৃত) (একত্রে ব্যবহার্য্য) পূর্ণমাত্রা ৩৷৵০ আনা, পরীক্ষামূলক চিকিৎসা—১২৵০ আনা।

শ্বেতী বা ধবল—শরীরের সাদা দাগ কেবলমাত্র ঔষধ সেবন দ্বারা অভূতপূর্ব্ব উপায়ে আরোগ্য করিবার এই ঔষধটি আধুনিকতম উপাদানে প্রস্তুত হইয়াছে। দৈব ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানসম্মত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় পরীক্ষিত "লিউকোডারমাইন" (রেজেষ্ট্রিকৃত) প্রতি বোতল—২৷৵০ আনা মাত্র। ইতিমধ্যেই ইহার খ্যাতি দেশ হইতে দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বংশানুক্রমিক অথবা যে কোনপ্রকার ধবল হউক না কেন, এই ঔষধ সেবনে আরোগ্যের গ্যারান্টি আমরা স্পর্দ্ধা সহকারে দিয়া থাকি।

অ্যাজমা কিউর—আপনি চিরদিনের মত হাঁপানির হাত হইতে মুক্তি চান? আপনি অনেক ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে রোগ সাময়িকভাবে প্রশমিত হইয়াছে মাত্র। আমি আপনাকে স্থায়ীভাবে আরোগ্য করিব। আর পুনরাক্রমণ হইবে না। যত দিনের পুরাতন যে কোন প্রকার হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস্, শূলবেদনা, অর্শ, কিশচুলা—সাফল্যের সহিত আরোগ্য করা হয়। সপ্তাহ ১২৵০ আনা।

ছানি (বিনা অস্ত্রে)—কাঁচা হউক, পাকা হউক কিছু যায় আসে না। রোগীর বয়স যত বেশীই হোক কোন চিন্তার কারণ নাই। সুনিশ্চিতভাবে আরোগ্য হইবে। রোগশয্যায় বা হাসপাতালে পড়িয়া থাকিতে হইবে না। আপনার রোগের পূর্ণ বিবরণসহ পত্র লিখুন :— **ডাঃ শ্যারম্যান,** এম সি এস, (ইউ-এস-এ) ২৮, রামধন মিত্র লেন, পোঃ বক্স ২৩৩৯ কলিঃ।

বিফল প্রমাণে ১০০৲ একশত টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে
"ডেফনেস কিউর"

বধিরতা, ঘর্ঘর শব্দ ইত্যাদি যাবতীয় কর্ণরোগে অদ্বিতীয়। কাণ ব্যথা, পুঁজ পড়া এবং শব্দগ্রহণের প্রতিবন্ধক সব দূর করিয়া বধিরতা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে। মূল্য ২৷০ আড়াই টাকা।

হোয়াইট লিপ্রসি এবং লিউকোডারমা

দিনকতক এই ঔষধ ব্যবহার করিলে শ্বেতকুষ্ঠ এবং লিউকোডারমা সমূলে বিনষ্ট হয়। শত শত হাকিম, ডাক্তার, কবিরাজ এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের দ্বারা বিফলমনোরথ না হইয়া এই অব্যর্থ ঔষধ ব্যবহারে ভীষণ রোগের হাত হইতে মুক্তিলাভ করুন। দুই সপ্তাহের ব্যবহারোপযোগীর মূল্য ২৷০ আড়াই টাকা।

গ্রে হেয়ার

কোনপ্রকার রং ব্যবহার করিবেন না। আমাদের সুগন্ধি আয়ুর্ব্বেদীয় তৈল ব্যবহারে পক্ব কেশ দীর্ঘ ৬০ বৎসর স্থায়ী কৃষ্ণ কেশে পরিণত করুন। দৃষ্টিশক্তি বাড়িবে এবং মাথাধরা চিরতরে দূর হইবে। যদি সামান্য চুল পাকিয়া থাকে তবে ২৷০ টাকা মূল্যের, বেশী পরিমাণের স্থলে ৩৷০ টাকা মূল্যের এবং সব পাকিয়া থাকিলে ৫৲ টাকা মূল্যের যথাক্রমে এক শিশি ক্রয় করুন। বিফলতায় দ্বিগুণ মূল্য ফেরৎ পাবেন।

বৈদ্যরাজ অখিলকিশোর রায়
নং ৩, পোঃ ঝুরিয়া (হাজারিবাগ)

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

সীতা ও ত্রিজটা

শ্রীরামকৃষ্ণ শর্ম্মা

বৌদ্ধ তিব্বতের আদি নৃপতি সোং-ৎসেন-গাম্পো (৬০০ ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ)

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫০শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩৫৭

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

আগামী বৎসর

ইংরেজী নূতন বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। স্বাধীনতার যুগে তাহার হয়ত বিশেষ কোনও সার্থকতা নাই। কিন্তু দুই কারণে আমাদের এ বিষয়ে এখনও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, আজও সরকারী হিসাব-নিকাশের কৈফিয়ৎ টানা এবং আগামী বৎসরের খরচের ব্যবস্থা এখনও ইংরেজী বৎসরেরই প্রথম-চতুর্থাংশে হইতেছে, দ্বিতীয়তঃ ইংরেজী ১৯৫১ সালেরই শেষে স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচন হইবার কথা আছে। ইহা ছাড়াও বহু ছোটখাট ব্যাপার আছে যাহার সঙ্গে ইংরেজী সালের সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রধান একটি কারণ যে, এমন কোনও দেশী সাল, সন বা সম্বৎ নাই যাহা সমগ্র ভারতে সমানে চল্‌তি আছে। বাংলা সনের সঙ্গে হিন্দী সম্বতের সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে, আবার দক্ষিণের দ্রাবিড় অঞ্চলের পঞ্জিকার সঙ্গে উত্তর-ভারতের সম্বন্ধ আরও কম।

সে যাহাই হউক, আমাদের এখন প্রধান বিবেচ্য বিষয় আগামী বৎসরের আয়-ব্যয়ের বিচার। ভারত স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তিত তথা বিভক্ত বাংলার পরিচালনার ভার যাঁহারা লইয়াছিলেন তাঁহাদের অভিজ্ঞতার অভাবে পশ্চিম বাংলা তাহার প্রাপ্যগণ্ডা হইতে অনেক ভাবে বঞ্চিত হইয়াছে, বিশেষতঃ পাট রপ্তানী শুল্কের অংশ এবং আয়করের অংশ হইতে। ইহার ফলে পশ্চিম বাংলার তহবিলে ঘাট্‌তি লাগিয়াই আছে। সুতরাং জাতির পোষণে ও গঠনে অনেক কিছুই গলদ ও অব্যবস্থা চলিতেছে।

উপরন্তু ইহার সঙ্গে আসিয়াছে পূর্ব্ব বাংলা হইতে উদ্বাস্তুর প্লাবন এবং সেই সঙ্গে বাস্তুঘুঘুর অভিযান। বাংলা তো ১৯০৫ সালের স্বদেশী যুগের পর হইতেই বিভিন্ন প্রদেশের লোকের কাছে লুট ও অবহেলার বস্তু হইয়া আছেই, সুতরাং পশ্চিম বাংলার বিপদে কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করার চেষ্টাও করেন নাই, করিয়াছেন শুধু গোলমালের সৃষ্টি। এদিকে দেশে অভাব-অভিযোগ তো ছিলই, তাহা শতগুণ বাড়িয়াছে চোরাকার-বারীর অত্যাচারে। ফলে দেশে অশান্তির আগুন ধিকি-ধিকি জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, রাষ্ট্র যাহাতে হয়ত ক্রমে বিপন্ন হইয়া পড়িবে। কেননা বাংলায় "ঘরের শত্রু"র অভাব নাই।

এই পরিবেশের মধ্যে প্রাদেশিক সরকারকে রাষ্ট্রচালনার আর্থিক ব্যবস্থা করিতে হইবে। "টাকা নাই" একথা বলা সোজা এবং সেকথা বলিতে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের বিভাগ খুবই পটু। কিন্তু এখন আমাদের সময় আসিয়াছে স্পষ্ট কথা বলার। এত দিন সকল বিষয়েই আমরা শুনিয়া আসিয়াছি "একটু ধৈর্য্য ধরুন", "সবুরে মেওয়া ফলে" ইত্যাদি সুমিষ্ট কিন্তু একেবারে অকেজো স্তোকবাক্য। তিন বৎসরের বাজেট একের পর এক আমরা দেখিয়াছি এবং ক্রমাগত নিজেকে এবং দেশবাসীকে প্রবোধ দিয়াছি, "আগামী বৎসরে দেখিতে পাইব দেশবাসীর দুর্দ্দশা মোচনের ব্যবস্থা।" তিন বার আমরা হতাশ হইয়াছি বাজেটের আকার-প্রকার দেখিয়া এবং উপরন্তু তাহার খরচের ভাবগতিক বুঝিয়া। এইবার শেষবার জানিয়া আমাদের বুঝিতে হইবে পশ্চিম বাংলার বাঙালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পশ্চিম বাংলার বর্ত্তমান কর্ণধারদিগের ক্ষমতাই বা কি এবং অভিপ্রায়ও বা কি।

আমরা বলিতে চাহি না যে দেশের অবনতি চরমে নামিয়াছে। কিন্তু আমরা বলিতে বাধ্য যে, পশ্চিম বাংলার বাঙালীর দুর্দ্দশা এই তিন বৎসরে বাড়িয়াছে। পশ্চিম বাংলা সরকার সে বিষয়ে মনোযোগের অভাব যথেষ্ট দেখাইয়াছেন এবং এই অভাগা দেশের প্রধান সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানগুলি সে বিষয়ে একেবারে মূক-বধির!

মানুষের সহ্যশক্তির সীমা আছে। পশ্চিম বাংলার অধিবাসিগণ মনুষ্যশ্রেণীতে পড়ে না এ কথা ভিন্ন প্রদেশীয়ের এবং পূর্ব্বাঞ্চলের অধিবাসিগণের অনেকেরই ধারণা। সে ধারণা সত্য কি-না তাহার পরীক্ষা এই ইংরেজী ১৯৫১ সালেই হওয়া সম্ভব। ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত বা দলগত স্বার্থের বশে যাহারা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীকে পদে পদে বঞ্চিত ও প্রতারিত করিতেছে তাহাদের হিসাব-নিকাশ সেই সময়ই হইবে।

বিমান দুর্ঘটনা

গত ১৭ই ডিসেম্বর এয়ারওয়েজ ইণ্ডিয়ার একটি ডাকোটা প্লেন টাঙ্গাইলের নিকটে নামিয়া পড়িতে বাধ্য হয়। লাগেজের মধ্যে একটি পার্শেল হইতে ধোঁয়া বাহির হইয়া সমগ্র প্লেনটি এমন ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে যে, নামিয়া পড়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। গ্যাসের ক্রিয়ায় চারিজনের মৃত্যু ঘটে। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ফার্ষ্ট অফিসার কাননকুমার মুখোপাধ্যায়ের পিতা ডাঃ ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমরা ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। এয়ারওয়েজ ইণ্ডিয়ার ন্যায় একটি সুপরিচিত বিমান কোম্পানীর পরিচালক-বর্গ যে কত দূর দায়িত্ব ও কাণ্ডজ্ঞান বর্জ্জিত এই ঘটনা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ঘটনার দিন প্লেনটি যখন ৭০০০ ফুট উপর দিয়া যাইতেছিল যাত্রীরা অকস্মাৎ উৎকট গন্ধ পান। এয়ার হোষ্টেস প্লেনের পিছন দিকে লাগেজ-ঘরে ধোঁয়া দেখিয়া ক্যাপ্টেনকে খবর দিতে ছুটিয়া যান কিন্তু মাঝপথে বুক চাপিয়া বসিয়া পড়েন। তাঁহার চীৎকার শুনিয়া ক্যাপ্টেন লাগেজ-ঘরের দিকে যান এবং যেখান হইতে ধোঁয়া আসিতেছিল তার উপর অগ্নি-নির্ব্বাপক গ্যাস প্রয়োগ করেন। ততক্ষণে সমস্ত প্লেন গ্যাসে ভরিয়া গিয়াছে। দুই-একটি জানালা ভাঙ্গিয়া বাতাস ঢুকাইবার ব্যবস্থা করিতে বলিয়া ক্যাপ্টেন তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মপুত্রের চরে প্লেন নামাইয়া ফেলেন। ইহাতে কোন যাত্রী আহত হন নাই, এমন কি বেতার-যন্ত্রটি পর্য্যন্ত জখম হয় নাই। আরোহীরা সকলে বাহিরে আসিলেন। লাগেজ সরাইবার সময় দেখা গেল একটি কাঠের বাক্স জ্বলিতেছে, দেখিলেই বুঝা যায় উহা এসিডে পুড়িয়াছে। আবার অগ্নি-নির্ব্বাপক গ্যাস দেওয়া হইল কিন্তু কোন ফল হইল না। বাক্সটা তখন বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া হইল। সকাল প্রায় সাড়ে নয়টার সময় এই ঘটনা ঘটে।

ক্যাপ্টেন অতঃপর কলিকাতার আপিসকে এবং ঢাকায় বিমান-কর্ত্তৃপক্ষকে বেতার যন্ত্রে সমস্ত সংবাদ দিলেন। ফার্ষ্ট অফিসার মুখার্জ্জি প্লেন হইতে বাহির হইয়া প্রথমে শুইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু মুক্ত বাতাসে একটু সুস্থ বোধ করিয়াই তিনি প্লেনটি বাঁচাইবার চেষ্টা করিবার জন্য প্লেনে আবার গেলেন। রেডিও অফিসার সেন তখনও প্লেনের ভিতরে উহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বেলা দেড়টায় মুখার্জ্জি প্লেন হইতে শেষবার বাহির হন এবং বলেন যে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করিতেছেন, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হইতেছে। কয়েকটি যাত্রীও অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করিতে থাকেন। প্রায় সাড়ে তিনটার সময় ক্যাপ্টেন ব্লেক এবং রেডিও অফিসার সেন ছাড়া আর সকলে নিকটবর্ত্তী গ্রামে প্রাথমিক চিকিৎসা লাভের সুযোগ খুঁজিবার জন্য নদী পার হইতে যান। ডি এন হিম্মৎসিংকাও তখন অতিশয় অসুস্থ বোধ করিতেছেন। নদী পার হইয়া এবং আড়াই মাইল হাঁটিয়া প্রায় পাঁচটার সময় তাঁহারা পোড়াবাড়ী নামক গ্রামে উপস্থিত হন এবং শ্রীযুক্ত হীরালাল সাহার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ইঁহারা নদী পার হওয়ার জন্য যখন নৌকায় উঠিয়াছেন সেই সময় দেখা গেল ঘটনাস্থলে একটি সী-প্লেন আসিয়া নামিয়াছে। কিন্তু কেহই আসিয়া আরোহীদের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিল না। ডাঃ মুখার্জ্জি বলিতেছেন যে, সী-প্লেনে ঢাকা হইতে একজন ডাক্তার এবং এয়ার পোর্ট ম্যানেজার আসিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ গবর্মেণ্ট ডাক্তার পাঠানো সত্ত্বেও ডাক্তারটি আরোহীদের দেখা তো দূরের কথা তাহাদের সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত না বলিয়া কেন চলিয়া গেলেন তাহা বুঝা দুষ্কর। অথচ তখন দুই জনের অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া উঠিয়াছে। নৌকার পাটাতন দিয়া ষ্ট্রেচার তৈরি করিয়া তাঁহাদের দুই জনকে গ্রামে লইয়া যাওয়া হইতেছিল।

শ্রীযুক্ত সাহার বাড়ীতে গ্রামের ডাক্তার সকলকে দেখেন। সন্ধ্যা ৬টার সময় ক্যাপ্টেন ব্লেক এবং রেডিও অফিসার সেন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। হিম্মৎসিংকার অবস্থা তখন দ্রুত খারাপ হইতেছে। সাতটায় তিনি মারা যান। মুখার্জ্জির অবস্থাও খারাপ। টাঙ্গাইলের মহকুমা হাকিমের জীপগাড়ীতে করিয়া ক্যাপ্টেন ব্লেক তখনই তাঁহাকে ৬ মাইল দূরে টাঙ্গাইল হাসপাতালে লইয়া যান। তখন রাত দশটা। রাত্রি বারোটায় হার্টফেল করিয়া মুখার্জ্জি মারা যান। পরদিন সকালে অন্যদেরও হাসপাতালে আনা হয়। পরদিন বেলা দশটায় রেডিও অফিসার সেন এবং বিকালের দিকে যাত্রী এইচ পি চন্দও মারা যান। ময়মনসিংহের সিভিল সার্জ্জনের মতে গ্যাসের বিষক্রিয়ায় ফুসফুস প্রদাহ হইয়াছে এবং হার্টফেল করিয়া ইঁহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে। ক্যাপ্টেন ব্লেক এবং এয়ার হোষ্টেস কয়েকদিন ভুগিয়া বাঁচিয়া যান। কয়েকজনকে কলিকাতা আসিয়া নার্সিং হোমে ভর্ত্তি হইতে হয়।

ঘটনার দিন বিকাল চারিটার সময় এয়ারওয়েজ ইণ্ডিয়ার অপারেশনাল ম্যানেজার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং আকাশ হইতে নীচে ক্যাপ্টেন ব্লেকের সঙ্গে রেডিও টেলিফোনে কথা বলিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করেন। বাক্সে কি ছিল, গ্যাসটা কিসের ক্যাপ্টেন তাহা জানিতে চাহেন, কারণ উহা জানা গেলে চিকিৎসা সহজ হইতে পারে। অপারেশনাল ম্যানেজার তাঁহাদের শীঘ্র উদ্ধার করিবার আশ্বাস দিয়া চলিয়া যান। ইতিপূর্ব্বে হেড-অফিস হইতে ক্যাপ্টেনকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি যেন গ্যাসে আক্রান্ত রোগীদের স্মেলিং সল্ট শোঁকান এবং অ্যালকালি সলিউসন দেন। অপারেশনাল ম্যানেজার সাড়ে পাঁচটা কিংবা ছয়টার মধ্যে কলিকাতায় নিশ্চয়ই ফিরিয়াছিলেন। ইহার আগে আরোহী কিংবা প্লেন-চালকগণের আত্মীয়স্বজনকে কোনও খবরই দেওয়া হয় নাই,

যদিও তাঁহাদের ভিতর অনেকেই কলিকাতা নিবাসী এবং অনেকেরই বাড়ীতে টেলিফোন আছে। ইঁহাদের ভিতর অনেকে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষদিগের নিকট বিশেষ পরিচিত। অপারেশনাল ম্যানেজার ফিরিয়া আসিয়াও ইঁহাদের আত্মীয়-স্বজনকে খবর দিলে তখনও চার্টার-প্লেন লইয়া গিয়া তাঁহারা প্রাণ বাঁচাইবার শেষ চেষ্টা করিতে পারিতেন। তাহা তো করা হয়ই নাই, পরদিন বেলা বারটা পর্য্যন্ত সকলকে বলা হইয়াছে যে, সকলেই ভাল আছে এবং তাহারা সন্ধ্যার মধ্যে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবে। তার আগে তিন তিন জন মারা গিয়াছেন।

যে কাঠের বাক্স হইতে ধোঁয়া বাহির হইয়াছে তাহাতে "ফটোগ্রাফিক এবং ব্লক তৈয়ারীর জিনিষ" বলিয়া লেবেল দেওয়া ছিল। বাক্সের মাঝখানে করাতগুঁড়ার মধ্যে পাতলা কাঁচের আধারে প্রায় দুই গ্যালন তীব্র নাইট্রিক এসিড ছিল এবং এসিডের দুই পাশে কাগজের বাক্সে সাদা কেমিকেল ছিল। পার্লামেন্টে এক প্রশ্নের উত্তরে ডেপুটি মিনিষ্টার খুরশেদ-লাল বলিয়াছেন যে, প্যাকিং বাক্সের গ্যাসের সহিত অগ্নি-নির্ব্বাপক গ্যাস মিশিয়া বিষাক্ত কোনও গ্যাস উৎপন্ন* হইয়াছে এবং তাহাতেই সকলের শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট ঘটিয়াছে। ভারতীয় এয়ার-ক্রাফ্ট রুল (১৯৩৭) অনুসারে বিমানপথে বিপজ্জনক রাসায়নিক বস্তু বা দাহ্য পদার্থ চালান দেওয়া নিষিদ্ধ। আনন্দ-বাজার পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, পার্শেলটি গৌহাটির আসাম ট্রিবিউনের নিকট যাইতেছিল।

প্লেনটি বেলা সাড়ে নয়টার সময় নামিয়া পড়ে। ফার্ষ্ট অফিসার মুখার্জ্জির পিতার টেলিফোন নম্বর কোম্পানীর খাতায় ছিল। তথাপি তাঁহাকে কোন সংবাদ দেওয়া হয় নাই। অনেক চেষ্টার পর পরদিন বেলা ১১টার সময় তিনি কোম্পানীর অফিসের লোকদের সঙ্গে কথা বলিতে পারেন। তখনও তাহারা বলিতেছে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নাই। বেলা বারোটার সময় ডাঃ মুখার্জ্জির জামাতা ক্যাপ্টেন ডি. এন. গাঙ্গুলী নিজে কোম্পানীর আফিসে সংবাদ লইতে গেলে তাঁহাকেও বলা হয় যে, কোন ভয় নাই। ইহার পৌনে দুই ঘণ্টা পরে বেলা ১-৪৫ মিনিটে কোম্পানী টেলিফোন করে যে ফার্ষ্ট অফিসার মুখার্জ্জি মারা গিয়াছেন। ডাঃ মুখার্জ্জি তখন হাসপাতালে, বাড়ীতে ছিলেন তাঁহার পত্নী ও পুত্রবধূ। বেলা বারোটা পর্য্যন্ত মিথ্যা আশ্বাস দিয়া আসিবার পর বাড়ীতে পুরুষদের অনুপস্থিতিতে মুখার্জ্জির মাতা ও বধূকে এই মর্ম্মান্তিক সংবাদ দেওয়া হয়। রেডিও অফিসার সেনের বাড়ীতেও এইরূপ করা হয়। ১৭ই বিকালে এক পত্রে তাঁর বাড়ীর লোকদের জানানো হয় যে, তাঁহার বাড়ী ফিরিতে দেরী হইবে; দুর্ঘটনা সম্বন্ধে একটি কথাও ঐ পত্রে ছিল না। অথচ নিহত ব্যক্তিদের কয়েকজনের বাড়ীতে টেলিফোন ছিল, দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অনায়াসে সংবাদ দেওয়া যাইত এবং সংবাদ পাইলে চার্টার্ড প্লেন লইয়া তিন ঘণ্টার মধ্যে ইঁহাদিগকে কলিকাতায় আনা যাইত। কলিকাতায় আনিতে পারিলে চিকিৎসা হইত। সমস্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেবল কতকগুলি দায়িত্ববিহীন কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত অপদার্থ লোকের ঔদাসীন্যে সময়মত খবর না পাওয়ার জন্য ইঁহাদের প্রাণরক্ষার কোনও চেষ্টা করা গেল না—ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ফার্ষ্ট অফিসার মুখার্জ্জি এবং রেডিও অফিসার সেন যে অসামান্য কর্ত্তব্যজ্ঞান দেখাইয়াছেন এবং জীবন তুচ্ছ করিয়া সহযাত্রীদের রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়াছেন তাহা আদর্শস্থানীয়। ইঁহারা প্লেনের জানালা ভাঙিয়া প্লেনের ভিতরে বাতাস আনিবার চেষ্টা করিয়া নিজেরা আরও বেশী করিয়া গ্যাসের মধ্যে পড়িয়াছেন, সেই অবস্থায় বদ্ধ দরজা এমনি খুলিতে না পারিয়া বলপ্রয়োগে উহা খুলিয়া সকলকে বাহিরে আনিয়াছেন। সেন সকলের শেষে বাহিরে আসিয়াছেন। মুখার্জ্জি বাহিরে আসিয়া মুক্ত বায়ুতে একটুখানি সুস্থ বোধ করিয়াই আবার প্লেনের ভিতরে গিয়াছেন এবং তিনি, সেন এবং ক্যাপ্টেন ব্লেক তিন জনে প্লেনটিকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। আগুন হইতে প্লেনটিকে রক্ষা করিয়া তাঁহারা বাহিরে আসিয়াছেন, কিন্তু কোম্পানীর ম্যানেজার আকাশ হইতে নামিয়া আসিবার প্রয়োজনও অনুভব করেন নাই। ক্যাপ্টেন ব্লেক দুর্ঘটনার আধ ঘণ্টার মধ্যে কোম্পানীকে বেতারে গ্যাসে শ্বাসকষ্টের সংবাদ দিয়াছিলেন, এবং প্রাথমিক চিকিৎসার বিশদ বিবরণ চাহিয়াছিলেন। অপারেশন্যাল ম্যানেজার বেলা চারিটার সময় গৌহাটি হইতে ফিরিবার পথে আসিয়াছিলেন। তিনি ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলিয়া গিয়াছিলেন এবং কলিকাতা হইতে অন্ততঃ কয়েকটি অক্সিজেন সিলিণ্ডার অবিলম্বে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন।

কোম্পানী এই ব্যাপারে কেবল হৃদয়হীনতা নহে, কাণ্ডজ্ঞান ও দায়িত্ববোধের যে অভাব দেখাইয়াছেন তাহার তুলনা নাই। তাঁহারা দুর্ঘটনার সংবাদ প্রথম হইতে চাপিয়া দিয়াছেন। বেলা দশটার মধ্যে তাঁহাদের অফিসে সংবাদ পৌঁছিয়াছে, ফার্ষ্ট অফিসার মুখার্জ্জির বাড়ীতে টেলিফোন আছে, টেলিফোন নম্বর অফিসের খাতায় আছে, তবু কোন খবর দেওয়া হয় নাই। সেনের বাড়ীতে বিকাল পাঁচটার সময় চিঠি পাঠানো হইয়াছে, তাহাতেও দুর্ঘটনার উল্লেখমাত্র নাই। কেবলমাত্র এইটুকু লেখা হইয়াছে যে তিনি দেরীতে বাড়ী ফিরিবেন তাঁর বাড়ীর লোক রাত্রে খবর লইয়াছেন, তখনও দুর্ঘটনা

* অগ্নিনির্ব্বাপক Carbon tetrachloride নাইট্রিক এসিডের প্রভাবে Phosgene নামক মারাত্মক গ্যাস উৎপাদন করে।

সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নাই। এই খবর চাপার কারণ কি তাহা অনুসন্ধান হওয়া দরকার। কলিকাতায় নিহতদের আত্মীয়স্বজন সময়মত খবরটা পাইলে তাঁহাদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে তো পারিতেনই, হয়ত সকলেই বাঁচিয়া যাইতেন। মুখার্জ্জি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শক্ত ছিলেন, সেন রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত ভাল ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে অনায়াসে ইঁহাদিগকে কলিকাতায় আনা যাইত। চন্দ আরও পরে কাবু হইয়া পড়িয়াছেন। কেবলমাত্র হিম্মৎসিংকা সকলের আগে ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকেও সময়মত সংবাদ পাইলে আনা যাইত। আমরা মনে করি সময়মত সংবাদদানে কোম্পানীর অবহেলা ইঁহাদের মৃত্যুর প্রধান কারণ।

টাঙ্গাইলের হাকিমের কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রশংসনীয়, কিন্তু পাকিস্থান বিমান কর্তৃপক্ষের ব্যবহার বিচিত্র। ঢাকা হইতে সী-প্লেনে ডাক্তার এবং এয়ার ম্যানেজার গেলেন অথচ কাহাকেও না দেখিয়াই তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন। ইহা শোচনীয় কর্ত্তব্যচ্যুতির পরিচায়ক এবং কঠোর ভাষায় নিন্দনীয়। এই যদি দুর্ঘটনায় পতিত প্লেনের প্রতি পাকিস্থান সরকারের মনোভাব হয়, তবে পাকিস্থানের উপর দিয়া লাইন রাখা উচিত কিনা এবং পাকিস্থানী বিমান ভারতের উপর দিয়া যাইতে দেওয়া সঙ্গত কি-না তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

সর্ব্বোপরি কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। এত বড় দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল, অথচ গবর্ণ্মেণ্ট একটা প্রেস নোট দিলেন না, কোম্পানীও একটা বিবৃতি দিল না। নিহত ফার্ষ্ট অফিসার মুখার্জ্জির বাড়ীতে কোম্পানীর তরফ হইতে আজ পর্য্যন্ত ঘটনার বিবরণ জানানো হয় নাই। যে দুইটি অফিসার কোম্পানীর বিমান-পোত রক্ষার জন্য প্রাণ দিলেন তাঁহাদের প্রতি কোম্পানী শোচনীয় অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু গবর্ণ্মেণ্ট চুপ করিয়া থাকিতেছেন কিসের জন্য? আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, ইতিপূর্ব্বেই এই কোম্পানীকে লুকাইয়া বিপজ্জনক রাসায়নিক বস্তু চালান দেওয়ার জন্য সতর্ক করা হইয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও এই চোরা চালান করায় এতগুলি জীবন নষ্ট হইল।

যে গ্যাসে ইঁহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহা কিরূপে জন্মিল নিষিদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ কে পাঠাইল, কে উহা প্লেনে তুলিল তার কোন অনুসন্ধান আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ পি. সি. সর্ব্বাধিকারীর ন্যায় একজন বিশিষ্ট যাত্রী ঐ প্লেনে ছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে একটি বিবৃতিও গবর্ণ্মেণ্ট লওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই। গবর্ণ্মেণ্টের উচিত ছিল দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে যে কোম্পানী যাত্রীদের জীবন বিপন্ন করিয়া নিষিদ্ধ মাল চালান দেয় তাহার লাইসেন্স সাময়িক ভাবে বাতিল করা এবং এই এসিড বুক করিবার জন্য যাহারা দায়ী তাহাদের খাতাপত্র দখল করা। কিন্তু কিছুই আজ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। অপরাধের সর্ব্ব প্রধান প্রমাণকারীর বাক্স এবং এসিডের বোতল রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য দখলে লওয়া হইয়াছে বলিয়া ডেপুটি মন্ত্রী খুরসেদলাল বলিয়াছেন। কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষার রিপোর্ট এখনও জানা যায় নাই। যাহাদের দোষে এই কয়টি অমূল্য জীবন নষ্ট হইল তাহাদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা গবর্ণ্মেণ্ট যদি না করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও এই অপরাধের অংশীদার হইতে হইবে।

অন্যান্য স্বাধীন দেশে অনুরূপ অবস্থায় কি করা হয় কানাডার একটি সংবাদে তাহা দেখা গিয়াছে। বরফে ঢাকা পাহাড়ে ধাক্কা খাইয়া প্লেন ভাঙিয়াছে, পাইলট নিহত হইয়াছেন, যাত্রীরা বাঁচিয়া গিয়াছে। আর একটি প্লেন উড়িয়া যাওয়ার সময় আগুনের বিপদ-সঙ্কেত সিগনাল দেখিতে পায়, তৎক্ষণাৎ ৪৫ জন প্যারাশুট দিয়া নামিয়া আসে। প্লেনটি একটু দূরে ফাঁকা জায়গায় নামে। সেখান হইতে অন্যেরা বরফের উপর দিয়া হাঁটিয়া পাহাড়ে উঠিয়া দুর্ঘটনায় ভাঙ্গা প্লেনের যাত্রীদের সাহায্য করিতে আসে। আর আমাদের দেশে? কলিকাতা হইতে এক ঘণ্টার রাস্তা দূরে চৌদ্দ ঘণ্টা হইতে চব্বিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বিনা চিকিৎসায় লড়িয়া ইঁহারা মারা গেলেন। দমদমের কাছে বালিগঞ্জের ফীল্ড এম্বুলেন্স ঘাঁটি হইতে সুশিক্ষিত প্যারা-ট্রুপার লইয়া তাহাদের সাহায্যে ডাক্তার, ঔষধ, অক্সিজেন সিলিণ্ডার যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সবকিছু নামাইয়া দেওয়া যাইত।

এই ব্যাপারে গবর্ণ্মেণ্ট কি করিয়াছেন এবং কি করিতে চাহেন তাহা তাঁহাদের স্পষ্ট ভাষায় বলিতে হইবে। আমরা ইহার জন্য অপেক্ষা করিব।

চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্দ্ধমানের ফ্রেজার হাসপাতালের ২৫০টির মধ্যে ১০০টি বেড তুলিয়া দিয়াছেন। অত বড় জনাকীর্ণ শহরের জন্যই হাসপাতালটি ছোট বিবেচিত হইতেছিল, পার্শ্ব-বর্ত্তী গ্রামাঞ্চলের লোকেরা সেখানে বিশেষ কোন সুবিধা পাইতেছিল না। অতিরিক্ত ৮০টি বেড বাড়াইয়াও সুরাহা হইতেছিল না। এই অবস্থায় ১০০টি বেড তুলিয়া দেওয়ার আদেশ কেন দেওয়া হইল, কাহাদের উদ্যোগে বা স্বার্থে এই অন্যায় কাজ করা হইল তাহা বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয়। বাঁকুড়া হাসপাতাল সম্বন্ধে আমাদের যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা গত বৎসর হইয়াছিল তাহাও গবর্ণ্মেণ্টের কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে।

মফস্বলের মেডিক্যাল স্কুলগুলি তুলিয়া দিয়া কলিকাতায় চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত করা আমরা পছন্দ করি নাই। মফস্বলে মেডিক্যাল স্কুল থাকিলে সেখানে ভাল ডাক্তার থাকেন, খুব কঠিন রোগ ছাড়া সাধারণতঃ গ্রামাঞ্চলের লোকের কলিকাতা আসার দরকার হয় না। আমাদের

মতে জেলার মেডিক্যাল স্কুল এবং হাসপাতালগুলিতে এক্স-রে, অপারেশন, চক্ষু কর্ণ নাসিকা গলা পরীক্ষার উন্নত আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া দিলে কলিকাতা শহরে চিকিৎসার জন্য অনেককেই আসিতে হইবে না। ইহাতে কলিকাতার হাসপাতালগুলির উপর চাপও অনেক কমিয়া যাইবে। গবর্মেণ্ট মেডিক্যাল স্কুল তুলিয়া দেওয়ার ফল হইয়াছে এই যে, গবর্মেণ্ট সেখানে যে সমস্ত অভিজ্ঞ এবং ভাল ডাক্তারকে শিক্ষকরূপে পাঠাইতেন তাঁহাদের যাওয়া বন্ধ হওয়ায় মফস্বলের লোকের পক্ষে ভাল চিকিৎসক পাওয়া অসম্ভব হইয়াছে। ডাঃ বিধান রায় যদি বাংলাদেশ বলিতে কলিকাতা বুঝেন এবং গ্রামাঞ্চলকে উপেক্ষা করেন তবে তার ফল উভয়ত্রই খারাপ হইবে; কলিকাতার ভীড় বাড়াইয়া এখানকার সমস্যার সমাধান হইবে না, মফস্বল উপেক্ষিত ও বঞ্চিত হইয়া অসন্তুষ্ট হইবে। হইয়াছেও তাই।

মেডিক্যাল ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের বরাদ্দ গত সাড়ে তিন বৎসরে অনেক বাড়িয়াছে। অবিভক্ত বঙ্গে ১৯৪৫-৪৬ সালে এই দুই বিভাগের মোট বরাদ্দ ছিল ১,৯৪,৭৪,০০০ টাকা। গত বাজেটে বরাদ্দ হইয়াছে ৩,৮০,৭২,০০০ টাকা; পূর্ব্ব বরাদ্দের দ্বিগুণ। বাংলাদেশ এক-তৃতীয়াংশ হইয়াছে, সেই হিসাবে খরচ দ্বিগুণ হইলে লোকের চিকিৎসাপ্রাপ্তির সুযোগ অন্ততঃ ৬ গুণ বাড়া উচিত ছিল। কিন্তু তৎস্থলে হাসপাতালগুলিকে ক্রমেই সঙ্কুচিত হইতে দেখিলে এই খরচ সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে অত্যন্ত বিরূপ ধারণা জন্মিতে বাধ্য। মফস্বলে তো ঐ অবস্থা, কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বড় বড় ওয়ার্ড খালি পড়িয়া আছে ইহা আমরা নিজেরা দেখিয়াছি।

বাজেট এবং সিভিল লিষ্ট একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, খরচ বাড়িয়াছে কেবল উপরের দিকে, খবরদারীতে; আসল কাজ উপেক্ষা করিয়া সুপারভিসনের খরচ বাড়াইয়া চলিলে কাজের বেলায় টাকা পাওয়া কঠিন হইবে ইহা ত স্বাভাবিক। কিন্তু হাসপাতালগুলি কমাইতে কমাইতে একেবারে তুলিয়া দিয়া কেবল রাইটার্স বিল্ডিঙে চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যবিভাগের আপিস লইয়া বসিয়া থাকিলেই কি দেশের লোকের রোগ দূর হইবে? অথচ তিন বৎসরাধিককাল যাবৎ এই ধারা চলিতেছে। চিকিৎসা বিভাগের প্রাক্তন ডিরেক্টর কর্ণেল চ্যাটার্জ্জির উপর অপর অনেকের ন্যায় আমরাও অনেকটা ভরসা করিয়াছিলাম ইহা বলিতে দ্বিধা নাই, কিন্তু তিনি আমাদের হতাশ করিয়াছেন। ইঁহার অবসর গ্রহণের পর নবাগত ডিরেক্টর ডাঃ দাশগুপ্ত আমাদের আরও হতাশ করিয়াছেন। ইঁহারই আদেশে বর্দ্ধমান হাসপাতালের বেড কমিয়াছে। অথচ আমরা দেখিতেছি রামকৃষ্ণ শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের ন্যায় একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নিজেদের চেষ্টায় হাসপাতাল বাড়াইয়াছেন এবং ১০০ নূতন বেড খুলিয়াছেন। একটি বেসরকারী হাসপাতাল যাহা করিল, গবর্মেণ্ট প্রায় ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ লইয়া তার উল্টা করিলেন।

নীচে আমরা চিকিৎসা এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের গত তিন বৎসরের বিবরণ দিলাম। অবিভক্ত বঙ্গের ২৭টি জেলার তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ বঙ্গের ১২টি জেলার জন্য কি পরিমাণ খরচ উপরের দিকে বাড়ানো হইয়াছে উহা হইতে তার পরিচয় পাওয়া যাইবে। এটা কেবলমাত্র দপ্তরখানার খরচ:

চিকিৎসা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ

	১৯৪৫-৪৬	১৯৪৯-৫০	১৯৫০-৫১
সার্জ্জন জেনারেল	১	১	১
ডেপুটি সার্জ্জন জেনারেল	২	১০	১২
কেরাণী	৪০	৪৩	৫৩
চাপরাসী	১৪	১৫	২৫
মোট খরচ	১,৪৫,১০০৲	৩,৫৫,১০০৲	৪,৯৭,৫৮০৲

পরিবর্ত্তনের মধ্যে এইটুকু যে সার্জ্জন জেনারেলের নাম বদলাইয়া ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেস রাখা হইয়াছে।

জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ

	১৯৪৫-৪৬	১৯৪৯-৫০	১৯৫০-৫১
ডিরেক্টর এবং ডেপুটি ডিরেক্টর	৯	৬	৬
গেজেটেড অফিসার	১৪	৫১	৫৫
কর্ম্মচারী	৩৯	৪১	৪৩
কেরাণী	৫০	৩০	৩৬
চাপরাসী	৩০	৬৯	৫৪
মোট খরচ	৫,১৫,২০০৲	৮,২৪,০০০৲	৯,১২,৭০০৲

ম্যালেরিয়া বাঙালীর সবচেয়ে বড় শত্রু। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য বাজেট বরাদ্দ যথেষ্ট পরিমাণেই করা হইয়া থাকে। পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিঙে ১০ জন ডেপুটি ডিরেক্টর ও গেজেটেড অফিসার, ১৩ জন কর্ম্মচারী, ২৬ জন কেরাণী এবং ১৬ জন চাপরাসীর জন্য ২,৯৬,৩০০ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। ১১৬০ টাকা বেতনে এক জন ম্যালেরিয়া অফিসার আছেন, ৫৬০ + ১২০ স্পেশাল পে প্রাপ্ত এক জন মশক-বিশেষজ্ঞ আছেন, ২৩০ টাকা বেতনে ২ জন মশামারা অফিসার আছেন, ৫০০ টাকায় এক জন ম্যালেরিয়া ইঞ্জিনিয়ার আছেন —এঁরা প্রতি বৎসর কি কাজ করিয়া থাকেন; কোন্ বৎসরে কতগুলি গ্রামের ম্যালেরিয়া ইঁহারা দূর করিয়াছেন তার হিসাব এবং রিপোর্ট এখন প্রকাশিত হওয়া উচিত। ডিডিটি আবিষ্কারের পর ম্যালেরিয়া বিতাড়ন অনেক সহজ হইয়াছে, অবশ্য ডিডিটির নামে বিল করিয়া জল ঢালিলে কাজ হইবে না। গ্রীসে আমাদের দেশের মতই ম্যালেরিয়া ছিল, তাহা ডিডিটি প্রয়োগে একরূপ সম্পূর্ণভাবে দূর হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বাজেট অধিবেশন আসন্ন। এই অধিবেশনের আগেই জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়া উচিত। কোন্ কোন্ গ্রামে হেলথ সেণ্টার খোলা হইয়াছে এবং তাহারা কি কাজ করিতেছে তার বিবরণ ঐ স্থানের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিকে পরিষদে দাঁড়াইয়া বলিতে হইবে। তাহা করিলেই কাজ হইয়াছে কি-না, হইলে কতটা হইয়াছে তাহা জানা যাইবে।

বাঁকুড়ার চিকিৎসা বিদ্যালয়

বাঁকুড়ার "প্রচার" পত্রিকার ১০ই পৌষ তারিখে নিম্নলিখিত মন্তব্য ও আবেদন প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা উভয়েরই সমর্থন করি। শিক্ষার সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থাকে কলিকাতায় টানিয়া আনার মধ্যে কোনও সার্থকতা আমরা আদৌ দেখিতে পাই না :

"সরকারী নিষেধাজ্ঞায় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুলে ছাত্র ভর্ত্তি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় জেলার যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে সে বিষয়ে কাহারও দ্বিমত থাকিতে পারে না। কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি করাইয়া পড়াইবার খরচ সংগ্রহ করিবার সামর্থ্য বাঁকুড়া জেলার কতিপয় ভাগ্যবানেরই আছে মাত্র, সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে তাহা আদৌ সম্ভবপর নহে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়া আশ্বস্ত হইলাম যে, বাঁকুড়া সম্মিলনী আগামী ১৯৫২ সাল হইতে বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুলটিকে মেডিক্যাল কলেজে পরিণত করিয়া ছাত্র ভর্ত্তি করিবার আয়োজন করিতেছেন। ইহার জন্য আবশ্যক কার্য্যাদি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে, আবশ্যক যন্ত্রপাতি কিনিবারও বন্দোবস্ত করা হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে অর্থাদি সংগ্রহেরও চেষ্টা হইতেছে। সম্মিলনীর কর্ম্মীবৃন্দ শীঘ্রই বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে যাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। আশা করি জেলাবাসী জেলার এইরূপ একটি হিতকর প্রতিষ্ঠানের জন্য মুক্তহস্তে নিজের নিজের সাধ্যমত সাহায্য করিতে কার্পণ্য করিবেন না।"

গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য কমিটি

গত ১০ই পৌষ শোলাপুর (বোম্বাই) নগরে নিখিল-ভারত চিকিৎসক সম্মেলনের ২৭তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পাটনা মেডিক্যাল কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডাঃ টি. এন. বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই অধিবেশনের সভাপতিরূপে যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহা তথ্যপূর্ণ ছিল।

বর্ত্তমান যুগোপযোগী চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের দেশ কত অনগ্রসর তাহা তাঁহার বক্তৃতায় পরিস্ফুট হয়।

দেশে উপযুক্ত ধাত্রীর সংখ্যা এতই কম যে, উহা অন্ততঃপক্ষে পাঁচ শত গুণ বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন। দেশে মাত্র ৬ হাজার সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত ধাত্রী আছেন; ইঁহাদের সংখ্যাও অন্ততঃ ১৫ গুণ বৃদ্ধি না করিলে দেশের শিশুমৃত্যুর হার কমাইতে পারা যাইবে না।

সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ১৯৫১-৫২ সালের জন্য যে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিতেছেন তাহাতে দেখিতে পাই যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া অঞ্চলের জন্য ১৬১টি শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হইবে, তাহার জন্য ব্যয় হইবে দশ লক্ষ টাকার উপর। স্থানীয় গবর্ন্মেণ্টের সুপারিশে এই সব শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হইবে। এই প্রতিষ্ঠানের দিল্লী শাখা এই ঘোষণা করিয়াছেন। গত বৎসর ৭১-টি বৃত্তি দেওয়া হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ভারতবর্ষের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল ৩১টি; থাইল্যাণ্ড ১৬টি; সিংহল ১৫টি, ব্রহ্মদেশ ও আফগানিস্থান ৩টি করিয়া।

এই ব্যবস্থার মধ্যে আমাদের পরনির্ভরতা আরও প্রমাণিত হইয়াছে। তাহা দূর করিতে হইলে প্রতি গ্রামে স্বাস্থ্য-বিষয়ে আরও তৎপর হওয়ার প্রয়োজন আছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেইজন্য প্রস্তাব করিয়াছেন যে, গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য কমিটি গঠন করিতে হইবে। গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ সুসংগঠিত হইলে তাহা সম্ভব হইবে। পল্লীবাসী এখন এই বিষয়ে নিশ্চেষ্ট।

খাদ্যসমস্যা

এ বৎসর খাদ্যসমস্যা রীতিমত কঠিন আকার ধারণ করিবে ইহা বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ ঘটিতেছে। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে অনেক শস্য হানি হইয়াছে। বিদেশ হইতে আমদানীর যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে, অনেক ফসল পাওয়াও গিয়াছে। কিন্তু জাহাজে স্থানাভাবে আমদানী সম্পূর্ণ হইবার কোন আশাই নাই। ক্রীত খাদ্যের ছয়-আনি আসিলেই আমরা যথেষ্ট মনে করিব, দশ-আনির বেশী আসিবার তো কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। কাজেই দেশে যাহা জন্মিয়াছে তাহার দ্বারাই সম্বৎসরের খোরাকী তুলিতে হইবে। আগামী তিন-চার মাস কিছু বুঝা যাইবে না, কিন্তু তারপর হইতেই বিপদ দেখা দিবে। গবর্মেণ্টও ইহাই বলিতেছেন। কিন্তু ভাবী বিপদ সম্বন্ধে জনসাধারণকে যতটা সতর্ক করা আবশ্যক তাহা করা হইতেছে না। বিপদ আসিবে ইহা যদি গবর্মেণ্টের বিশ্বাস হইয়া থাকে—শ্রীযুক্ত মুন্সীর কথায় মনে হয় সে বিশ্বাস তাঁহাদের জন্মিয়াছে—তবে খোলাখুলিভাবে এবং এখনই জনসাধারণকে তাহা জানাইয়া দেওয়া দরকার যাহাতে সময় থাকিতে লোকে সাবধান হইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে ঘাটতি পড়িবে বলিয়া আমরা মনে করি না, যদি সময়ে সতর্ক হওয়া যায়। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মালদহ প্রভৃতি জেলা হইতে যে বিপুল পরিমাণ খাদ্য বিহারে চালান যাইতেছে তাহা যেমন বন্ধ হওয়া দরকার, তেমনি যে চাষী এখন দিনে এক সের পাঁচ

পায়া চাউলের ভাত খাইতেছে তাহারও খোরাক একটু টানিয়া চলা আবশ্যক। রেশনে বিশৃঙ্খলা এখনই দেখা দিয়াছে। এখানে ধান একটু দেরীতে উঠে, কাজেই মাসখানেকের মধ্যে হয়ত বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলা দূর হইবে কিন্তু বৈশাখ হইতে রেশন কতটা চালু থাকিবে সে বিষয়ে যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। এই বৎসরেই উহার ব্যারাজ অংশ শেষ হইবে এবং আগামী বৎসর উহার পূর্ণ সুযোগ চাষীরা লইতে পারিবে। এ বৎসরটা বিশেষভাবে সাবধান থাকিয়া কাটাইয়া দিতে পারিলে আগামী বৎসরে আমাদের অবস্থা আরও ভাল হইবে। এবার কিছু ধান অসময়ে বৃষ্টিতে নষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্তু অনেক জায়গায় ভাল ধান জন্মিয়াছে; হরে-দরে মোটামুটি খারাপ হয় নাই। একটা বৎসর স্বাবলম্বী হইয়া কাটাইয়া দেওয়ার সুযোগ আমরা পাইয়াছি। সেই সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য আমাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করা দরকার। চাষীকে নাচাইয়া ফসল উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটাইলে তাহা যেমন দেশের শত্রুতা হইবে, তেমনি সরকারের চাউল সংগ্রহকারী এজেন্টদের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া চাষী চাষ কমাইয়া দিলে তাহাও সমান অনিষ্টকর হইবে। দুই পক্ষেই দোষ আছে এবং তার জন্য ফসল কমিতেছে। সুন্দরবন একটি খুব বড় বাড়্তি এলাকা, সেখানকার বাঁধগুলির প্রতি সময়মত উপযুক্ত দৃষ্টি না দেওয়ায় অনেক ফসল নষ্ট হয়, দুই-তিন বৎসরের জন্য জমি অকেজো হইয়া যায়। এইরূপ প্রায় প্রতি বৎসর ঘটিতেছে, গবর্ণমেন্ট এ দিকে জমিদারকে কিছু সাহায্য ও সতর্কীকরণ করার ব্যবস্থা রাখিলে ভাল হয়।

জনসাধারণের সক্রিয় সহায়তা ভিন্ন খাদ্য সমস্যার সমাধান খুব কঠিন। গবর্ণমেন্টকে এ বিষয়ে অতিশয় মনোযোগী হইতে হইবে এবং খাদ্যের প্রকৃত অবস্থা সকলকে জানাইতে হইবে। রবি শস্যের ব্যাপারে চাষীকে আরও অবহিত করা উচিত ছিল। এখনও সময় একেবারে যায় নাই। বোরো ধান সম্বন্ধে প্রচার আরও সক্রিয় ভাবে হওয়া উচিত। পশ্চিম বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগ এ বিষয়ে বিশেষ কিছু করিতেছে না। লোভী চোরাকারবারী, নির্ব্বোধ চাষী এবং অসাধু চোরাচালানদাতা এই তিন পক্ষ সাবধান না হইলে জোর করিয়া দুর্ভিক্ষ ডাকিয়া আনা হইবে। ইহারা নিজেরা সাবধান হইবে বা লোভ সম্বরণ করিবে এতটা আশা করা কঠিন, কাজেই ইহাদের বিবেক জাগ্রত করিবার জন্য গবর্ণমেন্টকেই অগ্রসর হইতে হইবে। জনসাধারণকে সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া তাহাদের বিশ্বাস অর্জ্জন করিলে একাজ কঠিন হইবে না।

পশ্চিমবঙ্গে বোরোধানের চাষ

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন একটি বেতার-বক্তৃতায় আমাদের রাজ্যে এই ধানের চাষ সম্বন্ধে কিছু তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। "খাদ্য উৎপাদন" পাক্ষিক পত্রিকার ১লা পৌষ সংখ্যায় তার মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহা তুলিয়া দিলাম:

"বিন্নি ধানের খই দেবো" চলতি ঘুমপাড়ানিয়া গানটি শোনা যায় পশ্চিম বাংলার প্রায় ঘরে ঘরেই, যখন মায়েরা ঘুমপাড়ায় দুরন্ত ছেলেকে। কিন্তু "বিন্নি" ধান যে কোথায় হয় এবং কি, অনেকেই খেয়াল করে তা জানতে চায় না। এই বিন্নি ধানের চাষই বাংলায় বোরো ধানের চাষ নামে খ্যাত। বোরোধানের চাষ অবিভক্ত বাংলায় অনেকটাই ছিল। বর্ত্তমানে পশ্চিম বাংলাতেও মোটামুটি কম নয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে বোরোধান চাষ হয়েছে মোট প্রায় ১ লক্ষ বিঘা, গত বৎসর ১৯৪৯-৫০ সালে হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার বিঘার কিছু উপরে এবং ফলন হয়েছে ৪,৫৪,৫৭৪ মণ চাল। গত বৎসর পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলাতে কত পরিমাণ চাষ হয়েছিল তার একটি মোটামুটি বিবরণ দিচ্ছি:

১।	মালদহ	—৭১ হাজার বিঘা
২।	মুর্শিদাবাদ	—১৩ হাজার বিঘা
৩।	হুগলী	— ৯ হাজার বিঘা
৪।	পশ্চিম দিনাজপুর	— ৮ হাজার বিঘা
৫।	বর্দ্ধমান	— ৭ হাজার বিঘা
৬।	হাওড়া	— ৬ হাজার বিঘা
৭।	মেদিনীপুর	— ৪ হাজার বিঘা

এ ছাড়াও ২৪ পরগণা ও অন্যান্য জেলাতে কিছু কিছু চাষ হয়েছে। মেদিনীপুর জেলাতে বোরোধানের চাষ, বিশেষ করে ঘাটাল মহকুমাতে, সাধারণতঃ ভালভাবেই হয়। শিলাবতী নদীতে বাঁধ দেওয়া যায় নি বলে গত বৎসর বোরোধানের চাষ ঘাটাল মহকুমাতে কিছু কমই হয়েছিল। সুবিধামত ব্যবস্থা করতে পারলে শিলাবতী নদীর ধারে বোরোধানের চাষ প্রচুর করা যায়। এ ছাড়াও মুর্শিদাবাদ, মালদহ, হুগলী ও বর্দ্ধমান অঞ্চলে বিল ও ঝিলের সংস্কার করে বোরোধানের চাষ অনেক বাড়ানো যায়। এ ধরণের বহু বিল ও ঝিল আছে।

আমাদের বাংলাদেশেতে ধানের চাষ বাড়াতে হলে বোরোধানের চাষ বাড়াতে হবে; এর ফলে অনেক পতিত ও জলা জমিরও সংস্কার হবে এবং তাই করে দেশের খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়ে যাবে। এ সব নীচু জমি উর্ব্বর থাকায় বোরোধানের চাষ করলে ফলনও বেশী হবে। বোরোধানের চাষ এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। আমন ধানের চাষ যে ভাবে করা হয় বোরোধানের চাষও ঠিক তেমনি ভাবে করা হয়। প্রথম বীজ থেকে চারা তৈরী করে জমিতে রোপণ

করতে হয়। আমন ধান থেকে এ ধানের চাষের সময় আলাদা এই যা তফাৎ। বোরোধান সাধারণতঃ বোনা হয় কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে, রোপা হয় পৌষ মাসে ও কাটা হয় চৈত্র-বৈশাখ মাসে; এ থেকে এটা পরিষ্কারই বোঝা যায় যে, বোরোধানের চাষে সেচের ব্যবস্থা ভালভাবে করা দরকার। সেইজন্যই বলেছি বিল ও ঝিলের সংস্কার করে ও খাল এবং নালার ধারে সেচের ব্যবস্থা করে বোরোধানের চাষ যত দূর সম্ভব আমাদের বাড়াতে হবে। সম্প্রতি দামোদর উপত্যকা পুনর্গঠন প্রতিষ্ঠান এবং প্রাদেশিক কৃষি বিভাগের পরিচালনায় বর্দ্ধমান জেলায় তিনটি বোরোধান চাষের কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। এ জায়গাগুলোতে আমন ধান তোলার পরে দ্বিতীয় ফসল হিসাবে বোরোধানের চাষ হতে পারে কিনা পরীক্ষা করে দেখা হবে। এ ছাড়াও এ বছর আমরা হুগলী জেলার আরামবাগ, খানাকুল ও মেদিনীপুর জেলার ময়না অঞ্চলে বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় বোরোধানের চাষের বিশেষ বন্দোবস্ত করেছি; সেখানে বাঁধ নির্ম্মাণের জন্য সরকার অর্থ মঞ্জুর করেছেন।...

বোরোধানের চাষ প্রসার করার আর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য যে, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ধানের অনটন সুরু হয়, অতএব এ সময়ে এ ধানটা বেশী পরিমাণে পেলে দেশের সাধারণ লোকের খাওয়ার সুরাহা হবে ও মজুরেরাও এ সময়ে কাজের সুবিধা পাবে।

বোরোধানের ফলন সাধারণতঃ বিঘে প্রতি ৪.৫ মণ হয় ও বুনবার জন্যে বীজ দরকার হয় ৫ সের প্রতি বিঘেতে এবং সেচ সাধারণতঃ ৪.৫ বার দিলেই ভাল ফসল পাওয়া যায়।"

মুর্শিদাবাদ জেলায় খাদ্যশস্যের অবস্থা

প্রতি জেলার প্রাকৃতিক নানাকারণে খাদ্যশস্যের উৎপন্ন ও বণ্টনের তারতম্য দেখা যায়। সেইজন্য সরকারী ব্যবস্থায় তাহার নানা সমস্যা ও প্রতিকার প্রতি জেলার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া পৃথক পৃথক ভাবে করিতে হইবে। সরকার বাহাদুর যখন আমাদের ভাত-কাপড়ের জোগানদার হইয়াছেন, তখন তাঁহাদের এই সম্বন্ধে নানা জেলার নানা বৈষম্য সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। মুর্শিদাবাদ জেলার "সমাচার" পত্রিকার ১০ই পৌষ সংখ্যায় এইরূপ একটা তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ আছে। তাহার একাংশ আমরা উদ্ধৃত করিলাম:

"এই জেলার সমগ্র কাঁদি সাবডিভিসন এবং লালবাগের নবগ্রাম থানা ও জঙ্গীপুরের সাগরদীঘি থানায় যথেষ্ট পরিমাণে ধান্য উৎপাদন হইয়া থাকে। কিন্তু সদর সাব-ডিভিসন এবং লালবাগ ও জঙ্গীপুর সাব-ডিভিসনের অন্যান্য থানায় যে ধান্য জন্মে তাহা ঐ সকল অঞ্চলের প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অপ্রচুর। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত পরিসংখ্যানে দেখা যায় সমগ্র জেলার ৪২৯ হাজার একর জমিতে আমন, ৩৫০ হাজার একর জমিতে আউস ও ৪ হাজার ৬ শত একর জমিতে বোরোধানের আবাদ হইয়া থাকে। মোট ধানী জমির পরিমাণ ৭৮৩ হাজার একর। এই পরিসংখ্যানে থানা হিসাবে কোন সংখ্যা দেখান হয় নাই। ১৯৩২ সালের সার্ভে ও সেটেল্‌মেণ্ট বিবরণীতে উহা প্রদত্ত হইয়াছে। উহাতে আমনের জমী ৪২৫ হাজার একর, আউসের ২৮৭ হাজার একর ও বোরো-ধানের ৩ হাজার একর—মোট ৭১৫ হাজার একর দেওয়া হইয়াছে।

নবগ্রাম, সাগরদীঘি থানা ও কাঁদি সাব-ডিভিসনে আমনের জমি ২ লক্ষ ৬৭ হাজার, আউসের ২৫ হাজার ও বোরোর ২ হাজার ৩ শত একর। উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ আমন ৩১ লক্ষ ৫০ হাজার মণ, আউস ২ লক্ষ ৪৫ হাজার মণ ও বোরো ৩২ হাজার মণ—মোট ৩৪ লক্ষ ২৮ হাজার মণ। (এই হিসাবে একরপ্রতি আমন ১১'৬, আউস ৯'৮ ও বোরো ১০ মণ চাউল ধরা হইয়াছে।) সদর, জঙ্গীপুর ও লালবাগ সাবডিভিসনে (সাগর-দীঘি ও নবগ্রাম থানা বাদ দিলে) ১ লক্ষ ৫৮ হাজার একর জমিতে আমন, ২ লক্ষ ৬২ হাজার একর জমীতে আউস ও সাড়ে আট শত একর জমিতে বোরোধানের আবাদ হইয়া থাকে। উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ আমন ১৮ লক্ষ ৩৬ হাজার মণ, আউস ২৫ লক্ষ ৬৭ হাজার মণ ও বোরো ৯ হাজার মণ, মোট ৪৪ লক্ষ ৯ হাজার মণ। ১৯৪১ সালের সেন্‌সাস্ অনু-যায়ী কাঁদি সাব-ডিভিসন, নবগ্রাম ও সাগরদীঘি থানার জন-সংখ্যা ৪ লক্ষ ৬০ হাজার, সদর সাবডিভিসন ও লালবাগ এবং জঙ্গীপুরের অবশিষ্টাংশের লোকসংখ্যা ১১ লক্ষ ৮০ হাজার। এই লোকসংখ্যা আরও বাড়িয়াছে।

১৯০১ হইতে ১৯৪১ পর্য্যন্ত বৃদ্ধির হার গড়ে শতকরা ৬'০৭। এই হিসাবে নবগ্রাম ও সাগরদীঘি থানা সমেত কাঁদি সাব-ডিবিসনের লোকসংখ্যা হয় প্রায় ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার এবং জেলার বাকী অংশের ১২ লক্ষ ৫ হাজার। জনপ্রতি বৎসরে সাড়ে চারি মণ চাউল হিসাবে পশ্চিমাঞ্চলের প্রয়োজন ২১ লক্ষ ৯৬ হাজার মণ ও পুর্ব্বাঞ্চলের ৫৬,২৫,০০০ মণ। ঘাটতি পড়ে ১২ লক্ষ ১৬ হাজার মণ ও পশ্চিমে উদ্বৃত্ত হয় ১২ লক্ষ ৩২ হাজার মণ। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি আছে। সর্ব্বত্র ফসল সমান হয় না, অপচয়ও কিছু আছে। নিঃসংশয়ে বলা যায় যে মুর্শিদাবাদ জেলা একটি ঘাটতি অঞ্চল। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তদের ধরিলে এই ঘাটতির পরিমাণ সাড়ে চার লক্ষ মণেরও অধিক হয়। এই জেলা হইতে খাদ্যশস্য সংহরণ করিয়া জেলার বাহিরে প্রেরণ করার যৌক্তিকতা আদৌ থাকিতে পারে না।

খাল-বিল সংস্কার

পশ্চিমবঙ্গের পল্লীবাসী সর্ব্ববিষয়ে যে গবর্মেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া নাই তাহার প্রমাণ পাইলে আমরা আনন্দিত হই। গত ১৪ই অগ্রহায়ণ তারিখের "নির্ণয়" পত্রিকা হইতে এরূপ একটা উদাহরণ তুলিয়া দিলাম। আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসের অধিকারী এই গ্রামবাসীদের আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি। ক্ষুদ্র হইলেও তাহাদের উদ্যোগ অনুকরণের যোগ্য :

"খুব সম্প্রতি হুগলী জেলার সিঙ্গুর অঞ্চলে একটা ছোট সেচ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হয়েছে। ঠুঁটাখালী ও চুলকানী পরিকল্পনা নামে এর পরিচয়। ঠুঁটাখালী ও চুলকানী দুটো ডুবো মাঠ—হাজা, মজা জমির স্তূপ। মাঠের খাল ও ইতিহাসবিশ্রুত সেই সরস্বতী নদী, এদের মিলনস্থলটি পলি পড়ে বুজে গেছে। জলনিকাশ হয় না। সরস্বতীর বুকও মজে গেছে। প্রতি বছর প্রায় ৪৫০ বিঘে জমি জলে ডুবে থাকে, আদৌ ফসল হয় না। প্রায় ৬০০ বিঘে জমিতে জলের চাপের জন্য ফসল কম হয়। বাকী প্রায় ৩০০ বিঘেতে—উঁচু সরু ধানের জমিতে গড়ে ৭ মণ হয়। এ বছরেরই ফেব্রুয়ারী মাস বরাবর এ মাঠ দুটো সংস্কারের এক পরিকল্পনা করা হ'ল। এ অঞ্চলের কংগ্রেস কর্ম্মীরাই উদ্যোগী। স্থির হ'ল, খাল কাটতে হবে। হিসেবে দেখা গেল হাজার কুড়ি টাকা খরচ পড়বে। যেখানে দশে মাথা দেয়, সেখানে আর ভাবনা কি? আন্দোলন গড়ে উঠল। জেলা কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় কর্ম্মীরা এলেন। জোর প্রচার চলল। পত্তন হ'ল 'ঠুঁটাখালী-চুলকানী মাঠ সংস্কার সমিতির'। ভাল ফলনের জমিতে বিঘা প্রতি ৩৲ টাকা, মাঝারি ফলনের জমিতে বিঘা প্রতি ৬৲ টাকা ও ডুবো জমিতে বিঘা প্রতি ১৫৲ টাকা চাঁদা ধার্য্য হ'ল। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এগিয়ে এলেন। ঋণ পেল সমিতি। হাতে কোদাল উঠল গ্রামে গ্রামে মদ্দ জোয়ানদের হাতে—খাল কাটা হয়ে গেল। এবার মজামাঠে ফসলও ফলল প্রচুর। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব, বুঝি পাকা ফসল গ্রামবাসীরা তেমন আনন্দের সঙ্গে তুলতে পারবে না। দৈবের মার, খা খেতেই হবে। কিন্তু এই যে খাল কাটা হ'ল, এ ত রয়েই গেল। আগামী বছর তার ফল পাওয়ার ত বাধা নেই। কৃষকের চোখেমুখে ভবিষ্যতের আশা।"

পশ্চিমবঙ্গে মাছের অভাব

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলী ডেনমার্ক হইতে দুইখানি সমুদ্রযাত্রী মাছ-ধরার জাহাজ কিনিয়া আনিয়াছেন; তার সঙ্গে ঐ দেশীয় কয়েকজন কৌশলী আসিয়াছেন যাঁহারা সমুদ্রের অতল জলে মাছ-ধরা কাজে হাত পাকাইয়াছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার্থীকে এই বিদ্যাটি শিখাইয়া দিবেন। আমরা এই পরীক্ষার সাফল্য কামনা করি।

এই বিষয়ে "আনন্দবাজার পত্রিকা"র বাণিজ্য-সম্পাদক গত ৪ঠা পৌষ তারিখের সংখ্যায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার নানা দেশে মাছ-ধরা সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহা হইতে দু'একটি উদ্ধৃত করিতেছি :

"যুদ্ধের পূর্ব্বে এই অঞ্চলে ধৃত মাছের পরিমাণ ছিল ৮০ লক্ষ টন অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীর উৎপাদনের তুলনায় শতকরা ৮৫ ভাগ।

যুদ্ধের পর ইহা প্রায় অর্দ্ধেক হইয়াছে, কারণ যুদ্ধে মাছ ধরার সরঞ্জাম, ষ্টীমার প্রভৃতির বহু ক্ষতি হইয়াছে।...

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি আর মৎস্য উৎপাদনের নিয়মিত হ্রাস লক্ষ্য করিয়া সহজেই বলা যায় মানুষের প্রয়োজনের সমস্ত মাছ আগামী বহু বৎসর সংগ্রহ করা দুরূহ হইবে। পূর্ব্বে যে পরিমাণ মাছ এই সকল দেশ হইতে রপ্তানি হইত, তাহারও সম্ভাবনা চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"

কিন্তু প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, যে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার এই অঞ্চলের "মৎস্য-সম্ভাবনা প্রচুর"। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থাও তিনি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :

"ভারতবর্ষে মাছের দারুন অভাব হইয়াছে; বিশেষতঃ পাকিস্থান হইতে মাছ আমদানী বন্ধ হইয়া পশ্চিমবঙ্গে যে অভাব ছিল, তাহা আরও গুরুতর হইয়াছে। আগে পল্লীগ্রামের পুকুরে যত মাছ উঠিত এখন আর তত উঠে না। তাহার কারণ নানাভাবে অনুসন্ধান করা হইতেছে, ফল আশানুরূপ হয় নাই। প্রধান দুইটি কারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। মালিকের দারিদ্র্য অথবা বহু সরিক মালিক হওয়ায় পুকুরের আর সংস্কারসাধন করা হয় না, সুতরাং বহু পুষ্করিণী এবং বড় বড় দীঘি মৎস্য উৎপাদন ত করেই না, উপরন্তু অস্বাস্থ্যকর হইয়া দেশে জলাভাব সৃষ্টি এবং রোগ বিস্তারের সহায়তা করিতেছে।

পুকুরে মাছ বৃদ্ধির চেষ্টা যাহাই হউক, গবর্মেণ্ট হইতে সামুদ্রিক মাছ ধরিবার ব্যবস্থা হইতেছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে যে মাছ ধরা পড়ে তাহার দুই-তৃতীয়াংশ সামুদ্রিক মাছ। নদী ও পুষ্করিণীর মৎস্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টার সঙ্গে সমুদ্রের মাছ ধরিয়া দেশের অভাব মিটাইবার চেষ্টা হইতেছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই উদ্দেশ্যে দুইখানি সমুদ্রগামী মৎস্যশিকারী ট্রলার (জলপোত) ক্রয় করিয়াছেন। ইহার ফলাফল জানিবার জন্য পশ্চিমবাংলা, তথা সারা ভারতবর্ষ উৎসুক হইয়া থাকিবে। ভারত-গবর্মেণ্ট আশা করেন, বর্ত্তমানে যত মাছ ধরা পড়িতেছে, কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহার পরিমাণ অন্ততঃ দশগুণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। ভারত-সরকার এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পঞ্চাশটি পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে ব্যস্ত। আশা, ১৯৫১ সালে মৎস্য-শিকারের পরিমাণ এক বৎসরে অন্ততঃ কুড়ি লক্ষ মণ বৃদ্ধি পাইবে।"

পশ্চিমবঙ্গে বুনিয়াদি শিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক ও বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষা-বিভাগ তাঁহাদের খেয়ালমত একটা পরীক্ষা চালাইতেছেন। শুনিয়াছি, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে তাঁহাদের পরীক্ষা নাকি ঠিকভাবে চলিতেছে না। এই অভাবের নানা কারণ থাকিতে পারে। একটি দেখিতে পাই হাওড়া জেলার প্রাথমিক শিক্ষা-সমিতির ৭ম নম্বর প্রস্তাবের মধ্যে। গত ১৫ই পৌষ এই সভার অধিবেশন হয়।

"পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদেশক্রমে কেবল ম্যাট্রিক ও ম্যাট্রিক ট্রেনিংরাই বুনিয়াদী শিক্ষণ-কেন্দ্রে শিক্ষা লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন। এই সভা ইহার প্রতিবাদ জানাইতেছে। কেননা ম্যাট্রিক ও ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষকগণ একই কেটেগরির শিক্ষক হইতেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে ম্যাট্রিক শিক্ষকগণের অনুযায়ী ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষকগণও উক্ত সুযোগ পাইবার ন্যায্য অধিকারী তাহা ছাড়া 'গ' শ্রেণীর শিক্ষকগণের মধ্যে এরূপ শিক্ষক আছেন যাঁহারা বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণের আদৌ অনুপ-যুক্ত নহেন, অতএব 'গ' শ্রেণীর শিক্ষকগণের মধ্যে তুলনামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া উপযুক্ত শিক্ষকগণকে বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিতে এই সভা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।"

৮ম নম্বর প্রস্তাবে জেলা স্কুল বোর্ডসমূহের সহানুভূতিশূন্য আচরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। আমরা এই দুইটি প্রস্তাব সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগকে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

"বর্তমান বৎসরের গত ঝড়ে বহু স্কুল গৃহ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলির দরখাস্তসহ বিবরণী বহুপূর্ব্বে জেলা স্কুলবোর্ডে প্রেরিত হই-য়াছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, বোর্ড এ পর্য্যন্ত সেগুলির কোন সুবিবেচনা করেন নাই। উক্ত দরখাস্তগুলি যাহাতে পুনর্ব্বিবেচিত হয় সেজন্য এই সভা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।"

প্রাদেশিক ও জেলা শিক্ষাবিভাগের দোষ-ত্রুটি দেখাইয়া আমাদের সকলের কর্তব্য শেষ হইবে না। শিক্ষকবর্গের সমষ্টিগত কর্তব্য আছে। অন্যান্য দেশে তাঁহারা তাহা করিতে ছেন। মেক্সিকো রাজ্যের শিক্ষকবর্গ রাজ্যের উন্নতির জন্য কি পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহার একটি বিবরণ সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম নিম্নে দিলাম :

কেবলমাত্র ছাত্র পড়াইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া মেক্সিকোর ৮,০০০ শিক্ষক রাজ্যের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। শিক্ষক-সম্মেলনের ৫ম বার্ষিক সভায় এই সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়। একটি ক্ষুদ্র পরিচালক সমিতির তত্ত্বাবধানে তাঁহাদের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে ; ৫ জন সমাজনেতা ও শিক্ষাবিদ্ তাহার সভ্য তাঁহাদের মধ্যে আছেন প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার জিসাস্ রোবলস মার্টিনেজ এবং অর্থনীতিক কর্লোস বোরজেস্।

শিক্ষকবর্গ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ ও সাহায্য লইতেছেন ও তাহা লাভ করিয়াছেন। মেক্সিকো রাজ্যের ব্যাঙ্ক কৃষিবিষয়ক তথ্যাদি প্রদান করিতেছেন ; জমির উন্নতির জন্য, নষ্ট শক্তি উদ্ধারের জন্য নানাবিধ উপায়ের নির্দ্দেশ করিতেছেন। শস্যক্ষেত্রকে পশুশালায় ও দুগ্ধ-উৎপাদন কেন্দ্রে রূপান্তরিত করিলে সমাজের উপকার হইবে, কি-না পরীক্ষিত হইতেছে। সাবান প্রস্তুতকারিগণ, ঔষধ প্রস্তুতকারিগণ, কৃমি-কীট ধ্বংস করিবার নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুতকারিগণ তাহাদের ঔষধ দিয়া সাহায্য করিতেছেন ; সাবানের প্রস্তুতকারী সাবান দান করিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবার উপায় সহজ করিয়া দিতেছেন।

কৃষকশ্রেণী নানাসময়ে অভাবের তাড়নায় অল্পমূল্যে নিজেদের শস্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় বা ভবিষ্যতের আশায় আপাত অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনিয়া বসে। এই প্রথা বন্ধ করিবার চেষ্টা হইতেছে।

ভারতরাষ্ট্রে শিক্ষকবর্গ এরূপ সামাজিক কর্তব্যবুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন জানিলে আশান্বিত হইব।

আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী

২২শে পৌষ হইতে ২৮শে পৌষ পর্য্যন্ত এক সপ্তাহকাল ভারতরাষ্ট্রের আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী কর্তৃক নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছে। উদ্বোধন-দিবসে কলিকাতা নগরীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমণ করা হয়। কেন্দ্রীয় দেশরক্ষা বিভাগ এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"আঞ্চলিক বাহিনী সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে অধিকতর আগ্রহ সঞ্চার এবং শীঘ্রই এই বাহিনীর জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যসংগ্রহের উদ্দেশ্যে সপ্তাহব্যাপী ভারতের সর্ব্বত্র আঞ্চলিক বাহিনী কর্তৃক সামরিক ক্রিয়াকৌশল প্রদর্শন এবং সম্মিলিত কুচকাওয়াজের মহড়া দেওয়া হইবে।"

১৯৪৮ সালে আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী আইন পাস হয়, এবং ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে এই বাহিনীর উদ্বোধন করা হয়। দেশরক্ষা বিভাগের সহকারী মন্ত্রী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছেন যে এই দুই বৎসরে এই বাহিনীতে মাত্র ৭.৮ হাজার নাগরিক যোগদান করিয়াছেন। এই সংবাদে আমাদের সকলের মস্তক লজ্জায় হেঁট হইবে নিশ্চয়ই। প্রতিবেশী পাকিস্থান রাষ্ট্রের পূর্ব্ববঙ্গে "আনসার বাহিনী"র সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ।

এই বাহিনীর রংরুট নীতি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, অনিপুণ শ্রমিক, কৃষক, বা উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন যন্ত্রশিল্পী হউন—

১৮ হইতে ৩৫ বৎসর বয়স্ক সকল কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিই এই নূতন বাহিনীতে প্রবেশ করিতে পারিবে। এই বাহিনীর মধ্যে সৈন্যবাহিনীর সকল শাখাই থাকিবে। পদাতিক, গোলন্দাজ, নাবিক ও বিমান বিভাগের কোন কোন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে হইবে।

এই বাহিনী সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নে দেওয়া হইল :

সৈন্যবাহিনীর সকল শাখা ভারতীয় আঞ্চলিক বাহিনীর মধ্যে রাখা অতীতের রীতির ব্যতিক্রম। এই ব্যবস্থায় আঞ্চলিক বাহিনী অনেকটা স্থায়ী বাহিনীর পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইবে এবং ইহার কার্য্যোপযোগিতা বৃদ্ধি পাইবে। যদিও পদাতিক বাহিনীকেই এইরূপ প্রতিষ্ঠানের মেরুদণ্ড বলা যাইতে পারে, তথাপি কারিগরী বিভাগ ব্যতীত ইহার পূর্ণ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। প্রয়োজনের সময় এই কারিগরী ইউনিট দ্বারা স্থায়ী বাহিনীর অভাবও পূর্ণ হইতে পারে।

আঞ্চলিক বাহিনীর দুইটি প্রধান বিভাগ আছে,—(১) প্রাদেশিক ইউনিট এবং (২) শহরাঞ্চলের ইউনিট। প্রাদেশিক ইউনিটে গ্রামাঞ্চল হইতে এবং দ্বিতীয় ইউনিটে শহরাঞ্চল হইতে লোক সংগ্রহ করা হইবে। শিক্ষাদানের সুবিধার জন্য এইরূপ বিভাগ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, ঐ দুই বিভাগের মধ্যে অন্য কোনরূপ পার্থক্য নাই।

১নং ইউনিটে ৩০ দিন রিক্রুট ট্রেনিং দেওয়া হয় এবং ২নং ইউনিটে শিক্ষার্থীদিগকে ১২৮ ঘণ্টা রিক্রুট ড্রিল করিতে হয়। সপ্তাহান্তে সন্ধ্যাকালে শিক্ষাদান করা হয়।

রিক্রুট ট্রেনিঙের পর প্রাদেশিক ইউনিটগুলিকে বৎসরে দুই মাস করিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। ২নং ইউনিটগুলিকে বৎসরে অন্ততঃ ১২০ ঘণ্টা করিয়া ড্রিল করিতে হয়। তাহারা বৎসরে অনূর্দ্ধ ২৪০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ড্রিল করিতে পারে। এই সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদিগকে অন্ততঃ চারিদিন শিবিরে বাস করিতে হয়।

বেসামরিক সরকারী কর্ম্মচারী এবং বেসরকারী নাগরিকগণ সাধারণতঃ জুনিয়ার কমিশনড্ অফিসার হিসাবে প্রত্যক্ষ কমিশন পান না। তাঁহাদিগকে প্রথম আঞ্চলিক বাহিনী ইউনিটে নাম রেজেষ্ট্রী করিতে হয়, তারপর কম্যাণ্ডিং অফিসার তাঁহাদের নাম সুপারিশ করেন।

তালিকাভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাত বৎসরের জন্য সক্রিয় সৈন্যবাহিনীতে এবং আট বৎসরের জন্য রিজার্ভ ফোর্সে রাখা হয়। সৈন্যবাহিনীর চাকুরির মেয়াদ এক একবারে দুই বৎসর করিয়া বাড়ানো যায় অথবা ১৫ বৎসর পূর্ণ করিবার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করা হয় তদনুযায়ী বাড়ানো যায়।

আঞ্চলিক বাহিনীকে দেশরক্ষা সম্পর্কে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়া হইতেছে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, দেশরক্ষা কার্য্যে এই বাহিনীকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। সরকারী বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, আঞ্চলিক বাহিনী দ্বিতীয় প্রতিরক্ষাব্যূহ হইবে। বিপৎকালে এই বাহিনী স্থায়ী বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করিবে। যুদ্ধের সময় এবং সঙ্কটকালে আঞ্চলিক বাহিনী আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা করিয়া স্থায়ী বাহিনীর দায়িত্বও হ্রাস করিবে। এই বাহিনী শত্রুর বিমান ধ্বংস ও দেশের উপকূল রক্ষার জন্য দায়ী থাকিবে এবং স্থায়ী বাহিনীকে যুদ্ধের সময় যন্ত্রশিল্পী সরবরাহ করিবে। কাজেই দেখা যাইতেছে, আঞ্চলিক বাহিনীর কার্য্য স্থায়ী বাহিনীর ন্যায় সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং বিপৎকালে কোন কোন বিশেষ কাজ স্থায়ী বাহিনীর পরিবর্ত্তে আঞ্চলিক বাহিনীকেই সম্পন্ন করিতে হইবে। এই সব দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের শিক্ষা পরিচালনা করা হইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গে সীমান্ত রক্ষা

পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে। "অসামরিক জাতি" বলিয়া যে কলঙ্কের ছাপ ইংরেজ বাঙালী জাতির কপালে মারিয়া দিয়াছিল, তাহা মোচন করিতে হইবে। না করিতে পারিলে স্বাধীনতার কোন অর্থ থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, পশ্চিমবঙ্গ ভারতরাষ্ট্রের পূর্ব্ব সীমান্তের সাত শত মাইল স্থান ব্যাপিয়া আছে। তাহা রক্ষা করিবার জন্য ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীকে সদাসর্ব্বদা জাগ্রত থাকিতে হইবে। গত এক মাসের মধ্যে নদীয়া জেলার সীমান্ত অঞ্চলে যাহা ঘটিতেছে, তাহার বিপদ হৃদয়ঙ্গম না করিলে আমরা ধনেপ্রাণে ও মানে মারা যাইব।

সেই কথাই "আনন্দবাজার পত্রিকা"র ভ্রাম্যমাণ সংবাদদাতা নদীয়ার সীমান্তবর্ত্তী গ্রামাঞ্চল ভ্রমণ করিয়া দুইটি প্রবন্ধে আমাদের শুনাইয়াছেন। ২০শে পৌষ ও ২২শে পৌষের সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে :

"ইহার পর সীমান্তের পথ। ভাটুপাড়াই সীমান্ত গ্রাম—তথাপি ইহারই পার্শ্বে চাষের জমিতে কল্পিত সীমান্তরেখা আছে, প্রাণ বিপন্ন করিয়া ভরত তাহা জানিয়া আসিয়াছে। এই ঝোপের আড়ালে দাঁড়াইয়া সাবধানে এই তালগাছ দেখুন। ঐখানে আমাদেরই কাটা পরিখা আছে। পাকিস্থানী প্রহরীরা রাতের অন্ধকারে ঐখানে প্রহরা গুণে। আমাদের ঠিক সীমান্তরেখা অবধি আমাদের লোক বা প্রহরীর যাওয়া নিষেধ। হয় তো যাওয়ার বিপদ এই যে, যাইবার চেষ্টা করিলে যে কোন ছলে সংঘর্ষ বাধিতে পারে। সুতরাং সীমান্ত-রেখা হইতে আমাদের বহু দূরে ব্যবধান রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। রাইফেলের আওতা ১৷৹ মাইল।"

এই সীমান্ত অঞ্চলের সমস্যা সম্বন্ধেও তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন। নিম্নে তার মধ্য হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিলাম :

"ভাটুপাড়ার এই সীমান্তে যে কথাটি প্রথমে মনে জাগিল তাহা এই যে, সমগ্র বঙ্গের এক-তৃতীয়াংশ পশ্চিম বাংলাকে পাকিস্থানীরা পরিকল্পনা মত আরও সঙ্কুচিত করিয়া তুলিতেছে এবং ঘাটতি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের ঘাটতি জেলা নদীয়ার উৎপাদন আরও হ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। সমগ্র নদীয়া জেলার সীমান্ত ১২০ মাইল; সঠিক সীমান্ত রেখাকে ছাড়িয়া যদি কেবল "নিরাপত্তার" অজুহাতে আরও দুই মাইল ভিতরে সরিয়া আসিতে হয়, তবে জবরদস্তি বন্ধ করিয়া রাখা জমির পরিমাণ কত হইবে রাষ্ট্রনায়কগণের তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। অপর রাষ্ট্রের অধিবাসীদের আবদার সারা বৎসর যদি মাথার উপর খাঁড়ার মত ঝুলিতে থাকে তবে চাষ অসম্ভব। চাষীর গায়ে লোহার বর্ম্ম পরাইয়া দিলেও কতদিন এইভাবে তাহার মনোবল অটুট থাকিবে বলা কঠিন। অবাধ সীমাহীন জমির উপর কল্পনার সীমারেখা টানা চাষীদের পক্ষে, চাষের পক্ষে, দেশের উৎপাদনের পক্ষে নিরর্থক। এই বিরাট ভূখণ্ড জমিকে লোকসানের খাতায়ই চাপিয়া রাখিতে হইবে। সুতরাং পশ্চিম-বঙ্গের পুঁথিতে লেখা জমির পরিমাণ যাহাই থাকুক, হলের লেখায় পশ্চিমবঙ্গ আরও অনেক, অনেক ছোট হইবে···।

"যেখানে মাথাভাঙা বহিয়া গিয়াছে, নদীয়া জেলার সেই সীমান্তের মাধুগারি মৌজায় সকল সীমান্ত-সমস্যা যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। মাথাভাঙার ওপারে রামকৃষ্ণপুর—মাধুগারি মৌজার অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহা পাকিস্থানীরা দখল করিয়া আছে। ওপারে মাথাভাঙার তীরে তীরে যতদূর দৃষ্টি যায় সুদীর্ঘ ঘন জনবসতি। এপারে পশ্চিমবঙ্গবাসীর কোন বসতি নাই; দুই-একটি গৃহ চোখে পড়ে বটে; কিন্তু সেখানে কোন মানুষ নাই। নদীর পারে সরস উর্ব্বর জমি। ফসল ভাল হয়। এপারের চাষীরাও ইহা চাষ না করিয়া পারে না। কিন্তু চাষ মানেই পাহারা। পাহারার জন্য গ্রামবাসীরা স্বেচ্ছা-সৈন্যদল গড়িয়াছে। অহোরাত্র পর্য্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু পাকিস্থানীদের গ্রাম নদীতীরেই, এপারের গ্রাম কোথায়? নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তি বলিলেন, দিনরাত্রি জাগিয়া পাহারা দিব সঙ্কল্প করিয়াছি। তাঁহারা সীমান্তনগর স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করিয়াছেন।

"সীমান্তবাসীদের সীমান্তরক্ষার সঙ্কল্প সত্যিই সুলক্ষণ। কিন্তু সীমান্তবাসীদের রক্ষার আয়োজন করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কেবল মনের সাহস, লাঠি বা তীর ধনুক যথেষ্ট নয়। নির্ভর-যোগ্য নাগরিকদের আগ্নেয়াস্ত্রও দেওয়া দরকার। একমাত্র এই উপায়েই পাকিস্থানীদের হানা নিবারণ করা যাইতে পারে।

পাকিস্থানীরা সজাগ। মাথাভাঙা নদীতীরে আমাদের জীপটি দাঁড়াইতেই ওপারের উৎসুক গ্রামবাসীরা অল্পক্ষণের মধ্যেই নদীতীর বরাবর দাঁড়াইয়া গেল। উহাদের রাষ্ট্রচেতনা কি আমাদের চাইতে বেশী?"

এই বিপদের মধ্যেও মানব-মন গঠনের কাজে ব্যস্ত। তাহাই ভরসার কথা। সংবাদদাতা তারও পরিচয় দিতে ভুলেন নাই।

বাঙালী জাতির অধোগতির কারণ

ঊনবিংশ শতাব্দীর ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশে বিরাট পুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা সমগ্র ভারতবর্ষের নবযুগের প্রবর্ত্তক, স্রষ্টা। এই বিষয়ে মতভেদ নাই। সেই বিরাট পুরুষগণের চিন্তাধারা ও কর্ম্মধারা অব্যাহত রাখিবার লোক আজ আর বড় দেখা যায় না। এই বিষয় লইয়া দুঃখের কথা শুনিতে শুনিতে অনেক সময় বিরক্তি আসে। বাঙালী বলেন যখনই সুযোগ পান; অ-বাঙালী বলেন আকারে-ইঙ্গিতে। কিন্তু এই সমস্যার কোন সমাধান কেহই করিতে পারিতেছেন না।

বাঙালী সমাজের সকল স্তরে, শিক্ষিত শ্রেণী ও অশিক্ষিত শ্রেণী উভয়ের মধ্যেই পরাজিতের এই মনোভাব জাগ্রত দেখিতে পাই। সর্ব্বভারতীয় জীবনে বাঙালী পূর্ব্বের সেই কৃতিত্বের দাবি করিতে পারিতেছে না—এই বোধ অনেককে পীড়া দিতেছে। অর্থনৈতিক জীবনে আমরা হটিয়া যাইতেছি কলিকাতা নগরীতে পর্য্যন্ত—ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইতেছে। এই রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি অনেক মতামত প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু তার নিরাময় সম্বন্ধে কেহই অব্যর্থ ঔষধের সন্ধান দিতে পারিতেছেন না।

এই অবস্থায় বাঙ্গালোর (মহীশূর) নগরের সদ্য অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৮শ অধিবেশনে বাঙালী জাতির অধোগতি সম্বন্ধে আলোচনার কথা শুনিয়া আশান্বিত হইয়াছিলাম। নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব শাখার সভাপতিরূপে বাঙালী বৈজ্ঞানিক ডাঃ এস. সি. সরকার মহাশয়ের বক্তৃতার মধ্যে নিদানের কোন ইঙ্গিত পাইব এই আশায় দৈনিক সংবাদপত্রে তার চুম্বক পাঠ করিলাম। কিন্তু তাহা পাঠ করিয়া নিরাশ হইয়াছি। হয়ত তাঁহার পূর্ণ বক্তৃতায় তাহা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহার চুম্বকের মধ্যে পাইলাম এই কথা মাত্র: "আধুনিক বাংলা ঊনবিংশ শতাব্দীর ধারা-বাহিকতা রক্ষা করিতে পারে নাই। কেন এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করিতে পারা গেল না, তার কারণ ব্যাখ্যা করা দুষ্কর।"

এই বাঙালী পণ্ডিত পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক কার্ল পার্সনের মত উদ্ধৃত করিয়া বাঙালী সমাজ দেহে রোগের নিদান সম্বন্ধে শেষ কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কার্ল পার্সন বলিয়াছেন: "যোগ্যতর ব্যক্তিদের বংশ বৃদ্ধির উপরই জাতির উন্নতি নির্ভর করে।" এই কথাই যদি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের শেষ কথা হয় তবে তার মধ্যে এমন কোন সত্য দেখিলাম না যাহা মনু-পরাশর, বাঙালী হিন্দু সমাজে কৌলীন্য

প্রথার প্রবর্ত্তক রাজা বল্লাল সেন বা স্মার্ত্ত পণ্ডিত জানিতেন না। ডাঃ সরকার তাঁহার বক্তৃতায় এই ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন; বাঙালীর "কৌলিক" প্রথার আলোচনা করিয়াছেন। তার বিস্তৃত বিবরণ আমরা পাই নাই।

তাঁহার সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিত দ্বারা সমর্থিত। "যোগ্যতর ব্যক্তিদের বংশবৃদ্ধির উপরে জাতির উন্নতি নির্ভর করে।" এখানে প্রশ্ন উঠিবে—কে এই যোগ্যতর ব্যক্তিদের গুণাগুণের বিচার করিয়া তাঁহাদের বংশবৃদ্ধির রীতি অব্যাহত রাখিবে? সমাজ করিতে পারে, রাষ্ট্র করিতে পারে। আজ এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে সমাজের সে শক্তি আছে কি? রাষ্ট্র করিতে পারে। আজ সর্ব্বাত্মক (Totalitarian) রাষ্ট্রের যুগ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে তার নানা বিধান পিষ্ট করিতেছে। অযোগ্য স্ত্রী-পুরুষের প্রজনন-শক্তি নষ্ট করিতেছে। হয়ত এইরূপ রাষ্ট্রের অধীনে কালে কালে "যোগ্যতর" স্ত্রী-পুরুষের গুণাগুণের একটা মান স্থির হইবে। কিন্তু কত দিন কয় পুরুষ এই মান অটুট থাকিবে? বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকের নিকট বাঙালী হিন্দু সমাজে কৌলীন্য-প্রথার চেষ্টা কি এই বিষয়ে এবং সমগ্র সমাজ-জীবনে কল্যাণপ্রদ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে?

মানব-সমাজের স্বাস্থ্য ও রোগ, উন্নতি ও অবনতি, এই ঘটনা বিশ্ববিধানের উত্থান পতনের অঙ্গ। ইহাই একমাত্র সত্য। এই ঘটনার "কারণ ব্যাখ্যা করা দুষ্কর"। ইহাই কি "শেষ কথা" বলিয়া স্বীকৃত হইবে?

চিনির মূল্য বৃদ্ধি

২৩শে পৌষ হইতে রেশন এলাকাভুক্ত কলিকাতা শিল্পাঞ্চলসমূহে চিনির সের প্রতি মূল্য ৮/৯ পাইয়ের স্থলে বৃদ্ধি পাইয়া ৮৶৬ পাই হইবে।

এই সংবাদে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। যখন শুনি বিলাতে চিনির দাম মণ প্রতি ১৭৲ টাকা তখন হিংসা হয়। ভারতরাষ্ট্রের পরিচালকবর্গ কি ধাতুতে গঠিত তার প্রমাণ গত তিন বৎসরে তাঁহারাই দিয়াছেন। শিল্পপতিগণ কিভাবে চলিতেছেন তার পরিচয় পাওয়া যায় নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির দপ্তর হইতে যে পাক্ষিক অর্থনৈতিক সমালোচনা প্রকাশিত হইয়া থাকে তার মধ্যে। ২২শে পৌষের সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। একটি সংবাদপত্র এই সংবাদের শিরোনামা দিয়াছেন এইরূপ: "অর্থনৈতিক সঙ্কট সমাধানে সরকারের সহিত শিল্পপতিদের অসহযোগ"। বড় বড় অক্ষরে তাহা ছাপা হইয়াছে। এই প্রবন্ধটির চুম্বক যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তার মধ্যে ক্ষোভের প্রকাশ দেখিতে পাই:

"...অর্থনৈতিক সঙ্কটমোচনে সরকারের প্রচেষ্টা সম্পর্কে শিল্পপতিদের ভূমিকা নিতান্ত বেদনাদায়ক।

"স্বাধীনতা লাভের তিন বৎসরকালের মধ্যে শিল্পপতিরা নানারূপ অসুবিধার কথা বলিতেছেন। প্রথমে তাঁহারা শিল্প জাতীয়করণ, উচ্চহারে করধার্য্য ও যানবাহনের অসুবিধার কথা তারস্বরে বলিতে সুরু করেন, কিন্তু কয়েক বৎসর হইল তাঁহাদের যুক্তির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন শিল্প জাতীয়করণ কার্য্যত: স্থগিত রাখায় এবং যানবাহনের অসুবিধা আর না থাকায় তাঁহারা কর হ্রাস, সমাজকল্যাণমূলক কার্য্য হ্রাস করার ও নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার জন্য দাবি করিতেছেন। তাঁহারা নূতন নূতন দাবি উত্থাপিত করিতেছেন ও পুরাপুরি সরকারী নিরপেক্ষতার নীতি প্রবর্ত্তনের দাবি করিতেছেন। এই নীতি সম্পর্কে শ্রীজবাহরলাল নেহরুর উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বলা চলে যে, আধুনিক পৃথিবীতে আর এই নীতি প্রবর্ত্তন সম্ভব নহে। ইহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি বাঞ্ছনীয়, কিন্তু ভারতে উভয় রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অর্থনৈতিক নির্ভরতার উপর জোর দিয়া যে সকল কথা বলা হয় তাহাতে প্রত্যেকটি বৈঠকে ভারতকে দুর্ব্বল করার চেষ্টা চলে।"

এই ত গেল ভারতীয় শিল্পপতিদের কথা। তাঁহাদের কর্ম্মফল তাঁহারা ভোগ করিবেন। গান্ধীজীর জীবিতকালে চিনি ও কাপড় লইয়া খেলা করিতে যাঁহাদের আটকায় নাই, তাঁহাদের কে রক্ষা করিবে! এখন পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সরবরাহ বিভাগের চিনি লইয়া কৌতুকের কথা একটু বলি। চিনির মূল্য ৮/১৫ আনা হইতে ৸৶১০ আনায় ধার্য্য হইয়াছে। রেশনের বিধানে সাধারণত: /।০ পোয়া চিনি জন-প্রতি পাওয়া যাইত; ৮/১৫ আনা যখন প্রতি সের চিনির মূল্য ছিল তখন তার চার ভাগের এক ভাগ আনা ও গণ্ডায় ভাগ করা সম্ভব নয় বলিয়া প্রতি /।০ পোয়ায় আধ পয়সা বেশী দিতে হইত; এখনও ৸৶১০ আনার বেলায় তাহা হইবে। প্রতি পোয়ায় আধ পয়সা রেশনের দোকানদার পান। এই আধ পয়সার কোন ভাগ আর কারও ভাগে পড়ে কিনা জানিতে কৌতূহল হয়; ৸/০, ৸৶০, এমন কি ৸৵০ আনা করিলে কেহ যখন আপত্তি করিবার নাই।

আসাম রাজ্যের ভাষা লইয়া চাতুরী

আসামের মন্ত্রিমণ্ডলী অসমীয়া ভাষাকে রাজ্যের ভাষা করিবার জন্য নানাবিধ চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। করিমগঞ্জের "যুগশক্তি" পত্রিকার ৬ই পৌষের সংখ্যায় করিমগঞ্জের একজন কংগ্রেস নেতার একটি বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের পাঠকবর্গ তাহা পাঠ করিলে এই চাতুরীর পরিচয় পাইবেন। অসমীয়া ভাষাভাষী লোকসমষ্টি আসাম রাজ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। তাঁহাদের প্রতিনিধি ঘটনাক্রমে মন্ত্রিত্বের গদি দখল করিতে পারিয়াছেন এবং তাঁহার ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছেন। ভাষা সম্বন্ধে চাতুরী তার অন্যতম। দেশের লোকের এই বিবৃতি জানিয়া রাখা ভাল। সেইজন্য তাহা উদ্ধৃত করিলাম:

"সম্প্রতি আসাম সরকার আসাম সিভিল সার্ভিসে লোক নিযুক্ত করার ও অন্যান্য চাকুরীতে নিয়োগের বেলায় যুক্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার নিয়মের খসড়া প্রকাশ করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে তাহা ভাল মনে হইলেও ইহাতে স্পষ্ট মনে হইতেছে যে প্রদেশের এক শ্রেণীর লোকদের বিশেষ সুবিধাদানের জন্যই এরূপ ব্যবস্থা করা হইতেছে। নিয়মের খসড়ায় দেখা যায় যে, পরীক্ষার্থীকে ইংরেজী, হিন্দী ও অসমীয়া এই তিনটি অবশ্য শিক্ষণীয় ভাষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। শেষোক্ত ভাষাকে রাজ্যের রিজিওন্যাল ভাষারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। অসমীয়া পরীক্ষার্থীদের নূতন একটি ভাষা শিক্ষা করিলেই চলিবে, কিন্তু বাঙালীদের অসমীয়া ও হিন্দী দুইটি ভাষা আয়ত্ত করিতে হইবে। কাজেই তাহাদের পক্ষে আসামের অসমীয়া পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া চলা কঠিন হইবে। নিয়মের টীকায় এই কথাও বলা হইয়াছে যে, কাছাড় জেলায় এক বৎসরের জন্য ও ট্রাইব্যাল এলাকায় দুই বৎসরের জন্য এই নিয়ম কার্য্যকরী হইবে না। কিন্তু তাহা শুধু লোক-দেখানো মাত্র। আসামে অসমীয়া ভাষাকে রাজ্যের ভাষা করার উদ্দেশ্য লইয়াই নিয়মকানুনের খসড়া রচিত হইয়াছে।

"ভারতের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দীভাষার স্থান দেওয়ার ব্যাপারে পনর বৎসর সময় দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আসাম সরকার ধৈর্য্য হারাইয়া এখনই অসমীয়াকে রাজ্যের রাষ্ট্রভাষা করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। তাঁহাদের হাতে যে শাসন-ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাহার জোরেই তাঁহারা তাহা করিতে চাহিতেছেন। আমার বিশ্বাস এই কার্য্যের ফলে অসন্তোষের বীজ বপন করা হইবে এবং তাহার ফল ভবিষ্যতে অকল্যাণকর না হইয়া যাইবে না। আসাম সরকারের কাছে আমার আবেদন—তাঁহারা যেন রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে পরস্পর পৃথকীকরণের নীতি ত্যাগ করেন।"

ভারতে ভূতত্ত্ব-বিদ্যার গবেষণা

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারেও ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে ভূতত্ত্ব লইয়া আলোচনা হইয়াছে। ভারতের ভূমির নিম্নে যে সম্পদ লুক্কায়িত আছে, তার সন্ধান লওয়া ও নাগরিক জীবনের উন্নতির জন্য সেই জ্ঞান নিয়োজিত করাই হইল এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। পণ্ডিতেরা যখন জ্ঞান বিতরণ করেন তখনই রাষ্ট্রের কর্ণধারবর্গ এই জ্ঞান কি করিয়া রাষ্ট্রের এবং প্রজাপুঞ্জের প্রয়োজনে নিয়োজিত হইতে পারে তার চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাহার পরিচয় পাই ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের একটি বিবৃতির মধ্যে :

"ভারতের ভূতাত্ত্বিকগণকে কৃত্রিম পেট্রল প্রস্তুতের উপযোগী কয়লা যথোপযুক্তভাবে পাওয়া সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলা হইয়াছিল। পরীক্ষা কার্য্যের পর তাঁহারা এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পূর্ব্ব রাণীগঞ্জের অণ্ডাল অঞ্চলে সাফল্যজনক ভাবেই কৃত্রিম পেট্রল প্রস্তুতের একটি কারখানা স্থাপন করা যাইতে পারে। তাঁহারা হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পেট্রল প্রস্তুতের উপযোগী ৬০ কোটি টন কয়লা পাওয়া সম্ভব।

"জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া কৃত্রিম পেট্রল প্রস্তুতের উপযোগী কয়লা সম্পর্কিত প্রাথমিক রিপোর্ট নাম দিয়া একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। পেট্রলের জন্য যাহাতে বিদেশের উপর বেশী নির্ভর করিতে না হয় তাহার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে ভারত-সরকার নিম্নস্তরের কয়লা হইতে পেট্রল প্রস্তুত সম্ভব কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নির্দ্দেশ দেন। এই নির্দ্দেশ অনুসারে ভূতাত্ত্বিকগণ যে পরীক্ষা চালান তাহার বিবরণই এখানে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

"ভূতাত্ত্বিকগণ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের চারটি কয়লা খনি অঞ্চল—পূর্ব্ব রাণীগঞ্জ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বোকারো, রামগড় ও দক্ষিণ কারণপুরা—তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন। ইতিপূর্ব্বে জিওলজিক্যাল সার্ভের এই বিষয়ে কিছু তথ্য জানা থাকিলেও এই পরীক্ষা-কার্য্যের ফলে অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারা গিয়াছে। এই পুস্তিকায় পরীক্ষা-কার্য্যের যে ফলাফল প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, এখানে কৃত্রিম পেট্রল প্রস্তুতের উপযোগী যথেষ্ট কয়লা পাওয়া যাইবে। তবে কারখানা স্থাপনের পূর্ব্বে তাহার উপযুক্ত অবস্থান নির্ব্বাচনের জন্য আরও বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা চালাইবার প্রয়োজন আছে।

"কি ধরণের এবং কি পরিমাণ উপযুক্ত কয়লা পাওয়া সম্ভব পুস্তিকায় তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে। শতকরা ১২ হইতে ২৫ ভাগ অব্যবহার্য্য দ্রব্যসমন্বিত মোট ৬০ কোটি টন কয়লা পাওয়া যাইতে পারে। ভূতাত্ত্বিকগণ বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ব রাণীগঞ্জের অণ্ডাল অঞ্চলে কৃত্রিম পেট্রল প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করার বাস্তব সম্ভাবনা রহিয়াছে। ব্যাপক ভাবে পরীক্ষা করিয়া বোকারো, রামগড় ও কারণপুরায় একটি কেন্দ্রীয় কারখানা বা খুব ছোট ছোট কতকগুলি কারখানা স্থাপন করা যাইতে পারে। কয়লা-খনি অঞ্চলগুলির বিস্তারিত তথ্য-সমন্বিত ৭টি রঙীন মানচিত্রও পুস্তিকায় সন্নিবেশিত হইয়াছে।"

ভারতের ঐতিহাসিক দলিল

গত ৯ই পৌষ মধ্যপ্রদেশের রাজধানী নাগপুর নগরীতে ভারতীয় দলিল-কমিশনের ২৭তম অধিবেশন বসে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ প্রদান করেন তাহার মধ্যে আমাদের দেশের গত ৫ শত বৎসরের ইতিহাসের অনেক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেন :

"আমাদের জাতীয় দলিলাগারে বহু পরিমাণ নজির সংগৃহীত আছে। ১৬৭২ সাল হইতে ১৯৪৯ সাল পর্য্যন্ত সময়ের দলিলাদি সুসংবদ্ধভাবে ঐ আগারে সংরক্ষিত আছে। ভারত-ইতিহাসের অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও গুরুত্বপূর্ণ এই ৩০০ বৎসরের ইতিবৃত্ত ঐ দলিলাদি হইতে পাওয়া যাইবে। যদি মোগল-যুগের বিক্ষিপ্ত নজিরগুলি উহাদের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের দলিলাদির মধ্যে যে পঞ্চদশ শতাব্দীর নজির আছে, একথা বলিতে পারা যাইবে। এত প্রাচীন নজির খুব কম দেশেই আছে। পরিমাণের দিক দিয়া বিচার করিলেও আমাদের দলিলাগার শুধু এশিয়ারই নহে; সমগ্র বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সংগ্রহশালা। এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভারতে এমন একটিও ভবন নাই যেখানে সমস্ত নজিরের একত্র সমাবেশ করা যাইতে পারে।"

এই দলিলাদির সাহায্যে অনেক ভ্রম নিরসন করা সহজ। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সম্বন্ধে মৌলানা সাহেব বলিয়াছেন:

"১৮৫৭ সালে অনুষ্ঠিত তথাকথিত ভারতীয় বিদ্রোহ সম্পর্কিত সরকারী দলিলগুলি ১৯০৭ সালে জনসাধারণকে পাঠের সুযোগ দেওয়া হয়। এই সকল দলিলের উপর ভিত্তি করিয়া ভারত-সরকার বিদ্রোহ সম্পর্কে তিন খণ্ডে বিভক্ত ইতিহাস রচনা করেন। ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ঐ ইতিহাস রচনা করা হইয়াছিল। কাজেই বিদ্রোহে যোগদানকারী ভারতীয়গণের প্রতি ঐ ইতিহাসে যথার্থ মন্তব্য করা হয় নাই। ফলে ঐ সকল দলিল পুনরায় পরীক্ষা করিয়া যতটা সম্ভব বস্তুনিষ্ঠভাবে বিদ্রোহ-যুগের ইতিবৃত্ত রচনা করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। এমন কি তখনও সরকারী ইতিহাসখানি হইতে বহু অজ্ঞাতপূর্ব্ব তথ্য জানা গিয়াছিল, ফলে বিদ্রোহে যোগদানকারী বিভিন্ন লোকের সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূর হইয়াছিল।"

গত বৎসর কটক নগরীতে এই কমিশনের বাৎসরিক অধিবেশন বসিয়াছিল। দুই খণ্ডে তাহার বিবরণ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পাইয়াছে কয়েকটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ। তাহার মধ্যে মোগল-যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধাবলীর পরিচয় চুম্বকরূপে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে:

"এইগুলিতে মোগল-যুগ, ভারতে ইউরোপীয়দের উপনিবেশ স্থাপন, ইন্দোনেশিয়ার সহিত ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সম্পর্ক, উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় সংবাদপত্রের পরিচয় প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। পাটনা কলেজের অধ্যাপক সৈয়দ হাসান আস্কারী 'বিহারের সুফী পীরের প্রাচীন পরিবারের দলিলপত্রাদি' নামে যে প্রবন্ধটি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে আকবর ও জাহাঙ্গীর সম্পর্কে অনেক প্রাচীন তথ্যের সন্ধান মিলিবে। ওলন্দাজ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মোগল সম্রাটের নিকট হইতে দক্ষিণ-ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্য যে সকল পরোয়ানা লাভ করেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া পাটনার ডাঃ কে কে দত্ত একটি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। অপর প্রবন্ধগুলির মধ্যে ডাঃ হরিরঞ্জন ঘোষালের ১৭৮৩-৮৪ সালের দুর্ভিক্ষ ও কোম্পানীর প্রতিকার ব্যবস্থা এবং শ্রীতপনকুমার রায়চৌধুরীর বিহারের এষ্টেট বিভাগের প্রাচীন রীতি শীর্ষক প্রবন্ধ দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"

ভারত-মিশর সম্পর্ক

ভারতবর্ষ ও মিশর দেশের মধ্যে প্রীতি বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্য লইয়া আমাদের দেশ হইতে এক দল সাংবাদিক গমন করিয়াছেন। প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে মিশর হইতে এক দল মিশরীয় সাংবাদিক আমাদের দেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দেশে ফিরিয়া ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইয়াছিলেন এবং আমাদের দেশ হইতে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি পাশ্চাত্যদেশসমূহের পথে মিশর যাইবার সময় লক্ষ্য করিয়াছেন যে মিশরীয় জনসাধারণ পাকিস্থানী প্রচারের প্রভাবে পড়িয়াছে।

সম্প্রতি পাকিস্থানী সংবাদপত্রে মিশরের প্রধান প্রধান সংবাদপত্র সম্পাদকগণের এক বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। মন্ত্রিপক্ষের দৈনিক "আল-মিশর", নির্দ্দলীয় "আল-আহরাম", সাদিষ্ট দলের মুখপত্র "আল আসসাস", উদারনৈতিক দলের "আল সিয়াসা", কোটলা দলের মুখপাত্র "আল মোকাট্টম", রাজা ফুয়াডের দলের "আল জিমান" ও সন্ত্রাসবাদী মুসলিম ভ্রাতৃসঙ্ঘের "আল মুবাইস"—এই সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদক নাকি এই প্রচার-বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

"আল মিশর" পত্রিকার সম্পাদকের মন্তব্য "পাকিস্থান নিউজ" পত্রিকায় দেখিতে পাই না। অন্যান্য পত্রিকার সম্পাদক কাশ্মীরের গণভোট লইয়া খুব মাতামাতি করিয়াছেন। অথচ তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে ভারতরাষ্ট্রের পক্ষ হইতেই সর্ব্বপ্রথমে গণভোটের নীতি স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, সেই সময়ই পাকিস্থান কাশ্মীরের পশ্চিম অঞ্চলে বর্ব্বরের মত আচরণ করিতেছিল, কাশ্মীরের অধিবাসীকে গণভোটের অধিকার বা অবসর দেয় নাই।

"আল সিয়াসা"র সম্পাদক জনাব হাফিজ মোহম্মদের মুখে শুনিতে পাই যে, এই বিরোধ সম্বন্ধে মিশরের মত স্পষ্ট; ভারতের বিরুদ্ধে তাহার মন তিক্ত (bitter)। "আল মুবাইসে"র সম্পাদক শেখ শালে আসমাবী গণভোটের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করেন না, কারণ কাশ্মীরবাসীর মাতৃভূমি পাকিস্থান। তিনি ভারতরাষ্ট্রের "সাম্রাজ্যবাদী লোভে"র অবসান ঘটাইতে চান সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের সাহায্যে।

আমরা জানি না ভারতীয় সাংবাদিকমণ্ডলী এই মনোভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন কিনা। তাঁহাদের ভ্রমণের যে বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে তাহার মধ্যে কাশ্মীর সমস্যার কোন উল্লেখ দেখিলাম না, তাঁহারা মিশরের পুরাকীর্ত্তি দেখিয়া, খানাপিনা করিয়া ভদ্রোচিত আচরণ করিতেছেন, ভারতবর্ষ ও মিশরের মধ্যে প্রীতিবর্দ্ধনের কথা বলিতেছেন। আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না যে উপরোক্ত মিশরী সম্পাদকগণের মধ্যে কেহই কাশ্মীর সম্বন্ধে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও তাঁহার সতীর্থদের কোন প্রশ্ন করেন নাই। সেই প্রশ্নের কথা আমরা কিছুই জানিতেছি না। খানাপিনা ও মিষ্ট কথার সংবাদ মাত্র পাইতেছি। ভারতবর্ষের লোককে এইরূপে অন্ধকারে রাখিতে চেষ্টা করিলে কাহারও মঙ্গল হইবে না।

পাকিস্থানে মিশরের পক্ষে যিনি রাষ্ট্রদূত আছেন তাঁহার নাম—আবদুল ওয়াহেব আজম। তিনি ত প্রকাশ্যে কাশ্মীর সম্বন্ধে পাকিস্থানী দাবির সমর্থন করেন। তাঁহার বিরুদ্ধে ভারতের রাষ্ট্রদূত জনাব আসগর আলী ফৈজি মিশরের গবর্ণমেণ্টের দরবারে নালিশ করিয়াছেন। রাষ্ট্রদূতের এরূপ বিলাস সাজে না। মিশরের এই কথা মনে রাখা প্রয়োজন।

বাঙালী ব্রাহ্মণ সমাজের একাংশ

ভারতবর্ষের জীবনে বরাবরই সমাজকে রাষ্ট্রের উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আমাদের সমাজ-বিন্যাসের ইতিহাস এখনও শিক্ষার্থীর পঠনীয় হয় নাই। এই অভাব সম্বন্ধে অবহিত হইবার সময় আসিয়াছে। কারণ অদূর ভবিষ্যতে সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবান্বিত করিবে। সেইজন্য বাংলার কুলীন ব্রাহ্মণ মেল বা শ্রেণীর একাংশের সম্বন্ধে 'মন্দির' পত্রিকার ৯ম বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করিলাম :

"আদিশূরের সময়, কান্যকুব্জ হইতে বীতরাগ, ক্ষিতীশ, সুধানিধি, সৌভরী ও মেধাতিথি এই সাগ্নিক পঞ্চ ব্রাহ্মণ গৌড়দেশে আগমন করেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ হইতেই বাংলা-দেশের রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। তাঁহাদের মধ্যে বীতরাগ কাশ্যপ গোত্রীয় ছিলেন। ইঁহার পুত্র দক্ষ হইতে রাঢ়ীয় এবং কৃপানিধি হইতে বারেন্দ্র শ্রেণীর বঙ্গীয় কাশ্যপ গোত্রের উৎপত্তি হয়। ক্ষিতিশের দুই পুত্র। ক্ষিতীশ শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ছিলেন। ইঁহার একপুত্র ভট্টনারায়ণ হইতে রাঢ়ীয় শাণ্ডিল্য গোত্রের উৎপত্তি, এবং অপর পুত্র দামোদর হইতে বারেন্দ্র শাণ্ডিল্য গোত্রের উৎপত্তি। সুধানিধি বাৎস্য গোত্র ছিলেন। তাঁহার পুত্র ছান্দড় হইতে রাঢ়ীয় বাৎস্য গোত্র, এবং অপর পুত্র ধরাধর হইতে বারেন্দ্র বাৎস্য গোত্রের উৎপত্তি। সৌভরী সাবর্ণ গোত্রজ ছিলেন। ইঁহার এক পুত্র বেদগর্ভ হইতে রাঢ়ীয় সাবর্ণী এবং অপর পুত্র রত্নগর্ভ হইতে বারেন্দ্র সাবর্ণ গোত্রের উৎপত্তি। মেধাতিথি ভরদ্বাজ গোত্রজ ছিলেন। ইঁহার এক পুত্র শ্রীহর্ষ হইতে রাঢ়ীয় ভরদ্বাজ গোত্র এবং অপর পুত্র গৌতম হইতে বারেন্দ্র ভরদ্বাজ গোত্রের উৎপত্তি।

আজ রাঢ়ী এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের মধ্যে বাস্তব পক্ষে কোন প্রভেদ থাকা উচিত নয়। কারণ তাঁহারা একই পিতার সন্তান। সেই হিসাবে কান্যকুব্জ এবং রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সমাজের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকা উচিত নহে। মূলতঃ ধরিতে গেলে বর্ত্তমানে বঙ্গদেশীয় কান্যকুব্জ সমাজ এবং রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্র সমাজস্থ ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষেরা সকলেই এক কান্যকুব্জ হইতে আগমন করিয়াছিলেন। মন্ত্রকৃৎ ঋষিগণকেই ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ বলা হইত। কশ্যপ ঋষির পাঁচ পুত্র মন্ত্রকৃৎ ঋষি ছিলেন। ইঁহাদের হইতেই কাশ্যপ গোত্রের উৎপত্তি। এই কাশ্যপ গোত্রে মহাসাধক কৃষ্ণ মিশ্র জন্মগ্রহণ করেন। তৎ-পুত্র তমিশ্র, তাঁহার পুত্র ওঁকার, তাঁহার পুত্র স্বর্ণক এবং স্বর্ণকের পুত্র জয়, জয়ের পুত্র বীতরাগই গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন। বীতরাগের চারি পুত্রের মধ্যে দক্ষর ষোল জন পুত্র। তন্মধ্যে সুলোচন হইতে চট্টকুলের উৎপত্তি। আদিশূর আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানগণ বিভিন্ন ছাপান্ন গ্রামে বাস করিতেন। তাহা হইতেই ব্রাহ্মণদের ছাপান্ন গাঞি-এর উৎপত্তি হয়।

চট্টকুলের প্রবর্ত্তক সুলোচন বর্দ্ধমান জেলায় চাটুতি গ্রামে বাস করিতেন। এই গ্রামের বর্ত্তমান নাম চাটুতি। ইহা বর্দ্ধমান জেলার খানা জংসন ষ্টেশনের তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। সুলোচনের পুত্র বাসুদেব। বাসুদেবের চারি পুত্র, তন্মধ্যে মহাদেব চারি পুত্র লাভ করেন। মহাদেবের পুত্র চলহ—এবং চলহের তিন পুত্রের মধ্যে লৌকিকের পুত্র অরবিন্দ। অরবিন্দরাও তিন ভ্রাতা ছিলেন। বল্লালসেনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের দুইটি ভাগ ছিল। কুলাচল এবং স্বচ্ছোত্রীয়। বল্লালসেন বাইশ কুলোদ্ভব কুলাচলদিগকে বাছিয়া আটটি গাঞিকে মুখ্য কুলীন এবং চোদ্দটি গাঞিকে গৌণ কুলীন করেন। যথার্থ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরাই এই মর্য্যাদা লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। সকলে নহে। আটটি গাঞি-এর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীনদের মধ্যে কাশ্যপ গোত্রের চাটুতি গাঞের বা চট্টবংশীয় যে পাঁচ জনকে লওয়া হইয়াছিল, তাঁহাদের নাম—বহুরূপ, সুচ, অরবিন্দ, অলায়ুধ ও বাঙাল।

...বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত শ্রেষ্ঠ কুলীন কাশ্যপ গোত্রীয় অরবিন্দ, অরবিন্দের পুত্র আহিৎ, তৎপুত্র দ্যাকর, দ্যাকরের পুত্র ধন, ধনের পুত্র গণপতি, গণপতির পুত্র ব্যাস, ব্যাসের পুত্র থানাই, থানাইয়ের পুত্র শ্রীনাথ, শ্রীনাথের পুত্র গঙ্গাদাস এবং গঙ্গাদাসের পুত্র ভুবন। এই ভুবনই খড়দহ মেল প্রাপ্ত হন। ভুবনের পুত্র রতিনাথ, রতিনাথের পুত্র রামচন্দ্র। চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বাসস্থান, বিখ্যাত খড়দহ গ্রামে যোগেশ্বর পালিতের বাস থাকায় খড়দহ মেলের নাম হইয়াছিল।..."

অন্যান্য বর্ণের ও সমাজের শ্রেণী বিরোধ, রেষারেষির প্রকৃত রহস্য তাদের সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে আছে। তাহা না জানিলে ও না বুঝিলে বাংলার ভবিষ্যৎ সমাজ-সংগঠন সহজ হইবে না।

বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়ে রুদ্র।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

[বারটি প্রকরণে বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়ের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে আটটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্ট চারিটিও প্রকাশের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অর্থকষ্টহেতু পরিষৎ-পত্রিকার পত্র-সংখ্যা হ্রাস করিতে হইয়াছে। এই কারণে এতদিন সে চারিটি প্রকরণ প্রকাশ করিতে পারা যায় নাই। এক্ষণে 'প্রবাসী'-সম্পাদকের অনুগ্রহে আমার সঙ্কল্পসিদ্ধির সুযোগ হইয়াছে। রুদ্র-প্রকরণ নবম প্রকরণ। ধ্রুবতারা দশম, ইন্দ্র একাদশ, অশ্বিদ্বয় দ্বাদশ। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে।]

সরস্বতী প্রবন্ধে ও তৎপূর্বের দুই-এক প্রবন্ধে রুদ্রদেবের নাম ও কর্মের উল্লেখ করিতে হইয়াছে। কালপুরুষ নক্ষত্র তাঁহার প্রতিমা, তাহাও স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই ঐক্য কিছু কিছু প্রমাণিতও হইয়াছে। এক্ষণে রুদ্রদেবের রূপ, গুণ, কর্ম ও যজ্ঞকাল সাবশেষ আলোচিত হইতেছে।

ঋগ্বেদের দেবতা বুঝিতে হইলে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, সকল দেবতাই স্বর্গে থাকেন, কেহ অন্তরীক্ষে কিম্বা পৃথিবীতে থাকেন না। বস্তুতঃ, যাঁহার দীপ্তি নাই, যিনি দিব্যলোকে থাকেন না, তিনি দেব নহেন। দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ, ভূলোক, তিন লোকই দেবতাদের কর্মক্ষেত্র। কাহারও কর্ম স্বর্গে, কাহারও অন্তরীক্ষে, কাহারও মর্ত্যে প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহাদের কর্ম বুঝিবার নিমিত্ত আমাদের দেশের প্রাচীন বেদ-ব্যাখ্যাতৃগণ কর্মক্ষেত্র ধরিয়া দেবগণকে তিন ভাগ করিয়াছিলেন। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ দ্বারা যাহা উৎপাদন করিতে পারি, জল-নিক্ষেপ দ্বারা যাহা বিনাশ করিতে পারি, যে মনুষ্যের আয়ত্ত, সে অগ্নি দেবতা নহে, হইতে পারে না। আর্যেরা এই উৎপত্তি-বিনাশশীল অগ্নির পূজা করিতেন না। অগ্নিতে যে শক্তি আছে, তাঁহারা সেই শক্তির উপাসনা করিতেন। এই কাষ্ঠ-দাহোৎপন্ন অগ্নির শক্তি বিশ্বভুবনের শক্তির প্রতিনিধি। ইন্দ্রের উদ্দেশে যে হব্য-কব্য অগ্নিতে অর্পিত হয়, অগ্নি তাহা ইন্দ্রের নিকট এই রূপে বহন করেন। এই রূপ অন্য দেবতার। শক্তির রূপ নাই, কিন্তু অধিষ্ঠান আছে। কর্ম দেখিয়া শক্তির ভাগ করিতে হইয়াছে। নিরাশ্রয় শক্তির ধ্যান ও উপাসনা এক হইতে পারে না।

শীত গ্রীষ্ম বর্ষা হইতেছে, কারণ কি? বৃষ্টি হইতেছে, বৃষ্টির সহিত বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইতেছে, বজ্রাঘাত হইতেছে, কারণ কি? অনাবৃষ্টি চলিতেছে, মনুষ্য পশুপক্ষী বৃক্ষলতাদি তাপক্লিষ্ট হইতেছে। কেন বৃষ্টি হইতেছে না? প্রত্যহ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন রহিয়াছে, বৃষ্টি প্রচুর হইতেছে, কারণ কি? সংক্রামক রোগ হইতেছে, মনুষ্য ও পশু রোগ ভোগ করিতেছে, মরিতেছে, কারণ কি? এইরূপ শত শত প্রশ্ন চিন্তাশীল মানবের চিত্তে উদিত হয়।

ভূপৃষ্ঠ, নদী, গিরি, বন, জলস্থল যেমন ছিল, তেমনই আছে। বায়ু যেমন বহে, তেমনই বহিতেছে। কোথাও পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে না। কিন্তু আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখি, সূর্য প্রত্যহ এক স্থানে উদিত হইতেছে না। চন্দ্রের ক্ষয়-বৃদ্ধি দেখিতেছি। দেখিতেছি দশ-পনর দিন পূর্বে উষার পূর্বে কিম্বা সূর্যাস্তের পরে যে নক্ষত্রের উদয় হইত, অদ্য তাহা হইতেছে না। দেখিতেছি, চন্দ্র ঋতুর কর্তা নহেন, সকল ঋতুতেই ক্ষয়বৃদ্ধি হয়। কিন্তু সূর্য পূর্ব দিক্‌চক্রের কখনও দক্ষিণে, কখনও উত্তরে উদিত হয়, তখন শীত ও গ্রীষ্ম পড়ে। অতএব সূর্য ঋতুর কর্তা। দেখিতেছি, উষার পূর্বে অমুক নক্ষত্রের উদয় হয়, বর্ষাকালও পড়ে। অতএব সে নক্ষত্র বর্ষাঋতুর এক কারণ। কার্যের অব্যবহিত পূর্বে ও তৎকালে যাহা নিয়ত দৃষ্ট হয়, তাহা সে কার্যের কারণ। অমুক নক্ষত্রের উদয়ের পর জ্বর ও সংক্রামক রোগ হয়। নিশ্চয়ই সে নক্ষত্রে কোন অদৃশ্য শক্তিমান্ পুরুষ অধিষ্ঠিত আছেন, যিনি রোগের কারণ। তাঁহার স্তুতি করিলে, তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ করিলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া রোগ নিবারণ করিতে পারেন।

এইরূপ কার্য-কারণ অনুসন্ধানের ফলে ফল-জ্যোতিষের উৎপত্তি হইয়াছে। ঋগ্বেদের দেবতা বুঝিবার সময় এইরূপ কার্য-কারণ-সম্বন্ধ স্মরণ করিতে হইবে। সকল দেবতাই নৈসর্গিক শক্তির রূপক নয়। নক্ষত্র বহু দেবতার এবং সূর্য অল্প কয়েক দেবতার অধিষ্ঠান-ভূমি। কোন কোন নক্ষত্রের তারা-সন্নিবেশ দেখিয়া দেবতার রূপ কল্পিত হইয়াছিল। রুদ্র এক বিশেষ দৃষ্টান্ত।

প্রথমে কালপুরুষ নক্ষত্রের চিত্র প্রদর্শিত হইল। (চিত্র ১)। ইহার ইংরেজী নাম Orion. দক্ষিণ দিকে মুখ রাখিয়া চিত্র দেখিলে চিত্রের বাম পার্শ্ব পূর্ব ও দক্ষিণ পার্শ্ব পশ্চিম হইবে। মস্তকে তিনটি তারা ত্রিকোণাকারে অবস্থিত। কালপুরুষ নক্ষত্রকে মৃগ কল্পনা করিয়া মস্তকটি মৃগশীর্ষ বা মৃগশিরা। অগ্রহায়ণ মাসের সন্ধ্যার পরে শীর্ষসমন্বিত মৃগের অর্থাৎ কালপুরুষ নক্ষত্রের উদয় হয়। সে সময়ে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে মাসের নাম মার্গশীর্ষ বা মার্গ। বঙ্গদেশে মাসের নাম অগ্রহায়ণ। হায়নের (বৎসরের) অগ্রমাস

(প্রথম মাস)। এই হেতু নাম অগ্রহায়ণ; এককালে অগ্রহায়ণ বৎসরের প্রথম মাস গণ্য হইত। এই হেতু

১। 1—কালপুরুষ, 2—ধনুঃ, 3—রোহিণী, 4—স্বর্গঙ্গা
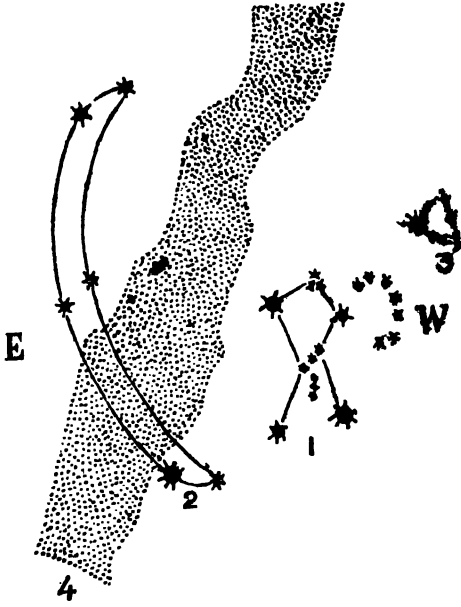
ভগবদ্‌গীতায়, "মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম্‌" অর্থাৎ আমি বৎসরের প্রথম মাস। জ্যোতিষে চন্দ্র মৃগশিরা-নক্ষত্রের অধিপতি, অর্থাৎ মৃগশিরা নক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয় দেখিয়া চন্দ্র মৃগশিরার অধিপতি কল্পিত হইয়াছেন। শীর্ষের দক্ষিণ দিকে পশ্চিমে ও পূর্বে দুইটি তারা আছে। পূর্বেরটি অতিশয় উজ্জ্বল ও তাম্রবর্ণ। ইহার ঔজ্জ্বল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। তারাটি স্বর-গঙ্গার সন্নিকটে। এই হেতু জ্যোতিষে নাম আর্দ্রা। যজু-র্বেদে নাম 'বাহু', কালপুরুষের বাহু। এই তারার অধি-পতি রুদ্র। এই দুই পার্শ্বের এই দুই তারার দক্ষিণে তির্যক্‌ রেখায় তিনটি তারা আছে। এই তিন তারার নাম, ইন্বলা, ইন্বকা, ইন্বকা বা ইল্বল। এই ইন্বকার কিছু দক্ষিণে এক লম্ব রেখায় তিন-চারিটি তারা দৃষ্ট হয়। ইহা বৈদিক গ্রন্থে রুদ্রের হেতি (অস্ত্র), শৈবদিগের জ্যোতির্লিঙ্গ। মধ্যেরটি শুভ্র মেঘবৎ দেখায়, ইহা একটি নীহারিকা। এই হেতির দক্ষিণে দুই পার্শ্বে দুইটি তারা আছে। এই দুই তারা কালপুরুষের দুই পদ। এই তেরটি তারায় কালপুরুষ নক্ষত্র। এই তেরটি তারা লইয়া নানাবিধ রূপ কল্পিত হইয়াছিল। কালপুরুষের দক্ষিণে কয়েকটি তারায় মৃষিক। পূর্বদিকে ধনুর আকারে দুইটি দুইটি করিয়া ছয়টি তারা আছে। মৃগনক্ষত্রে কোন কোন রূপ কল্পনায় এই ছয়টির প্রয়োজন হইত। মৃগের পূর্বে স্বরগঙ্গা তির্যক প্রবাহিত। মৃগের দক্ষিণ-পূর্বে এক অতিশয় উজ্জ্বল তারা আছে। ইহা উক্ত ছয়টি তারার দক্ষিণের একটি। এত উজ্জ্বল তারা আর একটিও নাই। জ্যোতিষে সে তারার নাম মৃগ-ব্যাধ বা লুব্ধক, ইংরেজী নাম Sirius. যজুর্বেদে ও অথর্ববেদে নাম শ্বন্‌। ঋগ্‌বেদেও এক স্থানে নাম শ্বন্‌। শ্বন্‌ কুক্কুর। এই তারা ও মৃগ লইয়া বহুবিধ উপাখ্যান রচিত হইয়াছিল। শ্বন্‌ তারার দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি তারা আছে। এইরূপ, ইহাদের উত্তরে স্বরগঙ্গার পূর্বে দুইটি তারা আছে। বালগঙ্গাধর টিলক উজ্জ্বলটির নাম প্রশ্বন্‌ রাখিয়াছিলেন। ইহার ইংরেজী নাম Procyon. এই দুই তারার উত্তরে এইরূপ আর দুই তারা আছে। জ্যোতিষে নাম পুনর্বসু, মিথুনরাশির নর ও নারীর মস্তক। এই ছয় তারা ধরিয়া মিথুন রাশি কল্পিত হইয়াছিল। প্রাচীন জ্যোতিষে এই ছয় তারায় পুনর্বসু গণ্য হইত। ঋগ্‌বেদে নাম অদিতি।

ঋগ্‌বেদে রুদ্রের যে রূপ বর্ণিত আছে, তাহা স্মরণ করিয়া দ্বিতীয় চিত্র লিখিত হইয়াছে। (চিত্র ২।) যথা,—রুদ্র কপর্দী, বীরনাশী, দীপ্তিমান্‌ উজ্জ্বল রূপধারী যুবা, অরুণ-

২। পিনাকপাণি রুদ্র
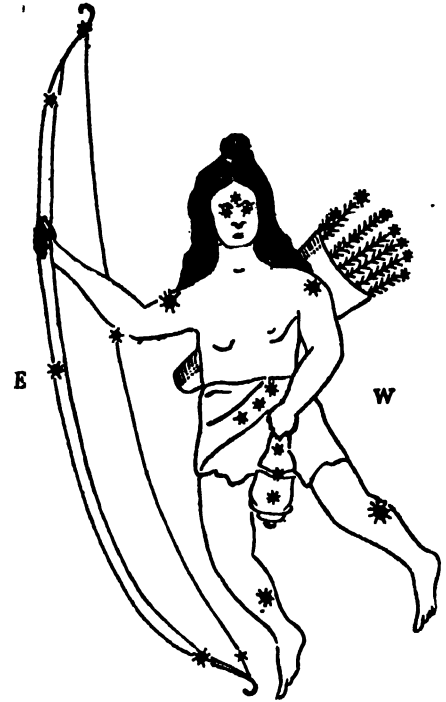
বর্ণ (১।১১৪)। রুদ্র বজ্রবাহু, কোমলোদর, বভ্রুবর্ণ, সুনাসিক, দৃঢ়াঙ্গ, বহুরূপ, উগ্র, নানা বর্ণ-রূপ-বিশিষ্ট, নিষ্ক-ধারণকারী, হিরণ্ময় অলঙ্কারে শোভিত (২।৩৩)। ধনুর্বাণ-ধারী, স্থিরকার্মুকধারী, শীঘ্রগামী বাণবিশিষ্ট (৭।৪৬)।

রুদ্র দীপ্তিমান্ অসুর (৫।৪২।১১)। রুদ্র সপ্তরত্নধারী, দীপ্ত-ধনুর্ধারী, তীক্ষ্ণ শরযুক্ত (৬।৭৪)।

রুদ্র কপর্দী অর্থাৎ জটাধারী। তিনি সুনাসিক। এই দুই বিশেষণ ঋষিগণের কল্পিত, তারা দ্বারা প্রদর্শিত হইতে পারে না। তিনি ধনুর্ধারী, চিত্রে স্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি বীর, দৃঢ়াঙ্গ, উগ্র, দীপ্তিমান্ যুবা। তিনি বহুরূপ, কারণ অনেক তারা লইয়া আকাশে দীর্ঘস্থান ব্যাপিয়া তাঁহার বপুঃ। উদয়কালে এই নক্ষত্রকে যেমন আকারের দেখায়, মধ্যাকাশে তেমন দেখায় না, পশ্চিমাকাশেও তেমন দেখায় না। একটি তারা হইলে তিনি "বহুরূপ" হইতে পারিতেন না। রুদ্র ত্র্যম্বক (৭।৫৯।১২)। ত্র্যম্বক, এই শব্দের মূলার্থ, তিন মাতৃ-বিশিষ্ট। কিন্তু রুদ্রের মাতা পিতা কেহই নাই। অতএব, এই অর্থ হইতে পারে না। শরৎ, বসন্ত, গ্রীষ্ম, এই তিন ঋতুতে তাঁহার পূজা হইত। বোধ হয়, ইহা হইতে তিন মাতৃ-কল্পনা। বোধ হয়, মস্তকের তিনটি তারার জন্য তিনি পুরাণে ত্র্যম্বক (ত্রিলোচন) হইয়াছেন। তিনি অরুণবর্ণ, বভ্রুবর্ণ (তাম্রবর্ণ)। আর্দ্রা তারার এই বর্ণ। তাঁহার হিরণ্ময় অলঙ্কার আছে। তিনি নিষ্ক (সুবর্ণমুদ্রা) ধারণ করিয়াছেন, তিনটি ইল্বকা তারা। সপ্তরত্নধারী, দুই বাহুতে দুইটি, দুই পদে দুইটি ও কটিতে ইল্বকা তিনটি। এই সপ্তরত্ন। সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান্, হিরণ্যের ন্যায় উজ্জ্বল। তিনি এক বাহু দ্বারা গদা ধারণ করিয়াছেন। পরবর্তীকালে গ্রীষ্মঋতুতে তাঁহার কর্ম প্রকাশিত হইলে তিনি বজ্রবাহু হইয়াছিলেন। তিনি বাম বাহুদ্বারা হেতি, গদা, কিম্বা বজ্র, এবং দক্ষিণ বাহুদ্বারা জ্যামুক্ত ধনুঃ ধারণ করিয়াছেন। এই ধনুঃ পিনাক।

তিনি উগ্র (২।৩৩।৯, ১১) 'ভীমমৃগ' অর্থাৎ ভীষণ আরণ্যক তুল্য ধ্বংসকারী। তিনি স্বর্গের অরুণবর্ণ বরাহ (১।১১৪।৫)। তিনি বৃষভ (২।৩৩।৭, ৮, ১৫)। তিনি বলবান্ (২।৩৩।৩) বীর, এই হেতু তিনি অসুর। তিনি এই ভুবনের ঈশান (অধিপতি) (২।৩৩.৯)। তিনি প্রকৃষ্ট-জ্ঞান-বিশিষ্ট (১।৪৩।১)। তিনি মেধাবী (১।১১৪।৪)। তিনি অভীষ্টবর্ষী (২।৩৩।৭)। তিনি বহু ধনধাতা। তিনি শিব. (১০।৯২।৯)। ঋগ্বেদের ঋষিগণ দেবতাদিগের নিকটে কাম্য অন্ন, ধন ও অশ্ব প্রভৃতি পশু প্রার্থনা করিতেন। রুদ্রের নিকটেও অন্ন ও সুখ প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের এক. বিশেষ প্রার্থনা ছিল,—

"মহৎ কপর্দী বীরনাশী রুদ্রকে আমরা এই মহনীয় স্তুতিসমূহ অর্পণ করিতেছি, যেন দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণ সুস্থ থাকে, যেন আমাদের গ্রামে সকলে পুষ্ট ও রোগশূন্য হইয়া থাকে। হে রুদ্র! সন্তান-জননীকে বধ করিও না। আমাদের প্রিয় শরীরে আঘাত করিও না। হে রুদ্র! আমাদিগের পুত্রকে হিংসা করিও না। আমাদিগের গো-অশ্ব হিংসা করিও না (১।১১৪)। হে রুদ্র, আমরা যেন তোমার দত্ত সুখকর ভেষজ দ্বারা শত হিম. (শীত ঋতু হইতে বৎসর গণিত হইত) জীবিত থাকিতে পারি। তুমি আমাদিগের শত্রুগণকে বিনষ্ট কর। তোমার সেনা আমাদিগের শত্রুগণকে বিনষ্ট করুক। সর্বপাপ বিদূরিত কর এবং শরীরের ব্যাধিপুঞ্জকে বিদূরিত কর। তুমি আমাদের পুত্রগণকে ভেষজদ্বারা পরিপুষ্ট কর। তুমি ভিষক্-গণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। রুদ্রের হেতি (অস্ত্র) আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাউক। তাঁহার মহতী দুর্মতিও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাউক। হে রুদ্র! তোমার ধনুর জ্যা শিথিল কর (২।৩৩)।

এইরূপ, ঋষিগণ রুদ্রের নিকটে আরোগ্য প্রার্থনা করিতেন। সংক্রামক ব্যাধিদ্বারা মনুষ্য ও গবাদি পশু আক্রান্ত হইত। ঋষিগণ মনে করিতেন, রুদ্র মড়কের কর্তা। তিনি প্রসন্ন থাকিলে ভয় থাকে না। তাঁহার নিকট সুখকর ভেষজ আছে।

রুদ্রের মূর্তি উগ্র, ভয়ঙ্কর। রুদ্র শব্দ রুদ ধাতু রোদনে হইতে আসিয়াছে। রোদয়তি (মনুষ্যান্) ইতি। মনুষ্য, গো, অশ্ব, মেষ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইত, দৈবক্রমে সে সময়ে রুদ্রেরও উদয় হইত। রুদ্র যজ্ঞ-সাধক, তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ হইত। তাঁহাকে স্তুতি ও হব্য অর্পিত হইত। কিন্তু কোন্ ঋতুতে যজ্ঞ হইত, ঋগ্বেদের বর্ণনা হইতে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কোন দেবতারই উদ্দেশে অনুষ্ঠিত যজ্ঞকাল লিখিত হয় নাই। নৈসর্গিক লক্ষণ ও দেবগণের পরস্পর সম্বন্ধ দেখিয়া আবাহনের ঋতু অনুমান করিতে হইয়াছে।

রুদ্রদেবের বিশেষ লক্ষণ, মারাত্মক সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব-কালে তাঁহার উদয় হইত। সে সময় শুধু মনুষ্য নয়, গো, অশ্ব, মেষাদি পশুও মৃত্যুমুখে পতিত হইত। এমন কাল দুইটি, বসন্ত ও শরৎ। দুই-ই যমদংষ্ট্রা নামে খ্যাত। অর্যমা বসন্ত ঋতুর আদিত্য। অর্যমা শব্দের অর্থ সখা। যেমন মিত্রদেব কৃষকের মিত্র, তেমন অর্যমা মনুষ্যের সখা। অর্যমার পরে মিত্র গ্রীষ্ম ঋতুর আদিত্য, এবং মিত্রের পরে বরুণ বর্ষা ঋতুর আদিত্য। রুদ্রের প্রতিমা কল্পনায় অদিতি তাঁহার জ্যা-মুক্ত ধনুঃ। এই সকল কথা স্মরণ করিলে রুদ্রকে অদিতির সহিত যুক্ত করিতে হইবে। ১৪৩ সূক্তে এক ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন "যেন অদিতি আমাদের জন্য, পশুর জন্য, মনুষ্যের জন্য, এবং আমাদিগের অপত্যের জন্য রুদ্রীয় ভেষজ প্রদান করেন।

যেন রুদ্র, মিত্র ও বরুণ আমাদিগকে অনুগ্রহ করেন। যে রুদ্র সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ ও হিরণ্যের ন্যায় উজ্জ্বল, তিনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি আমাদিগের অশ্ব, মেষ, মেষী, পুরুষ, স্ত্রী ও গো-জাতিকে সুখ প্রদান করেন। হে সোম, আমাদিগকে ধন ও অন্ন দান কর। হে সোম, তুমি শিরঃ-স্থানীয় হইয়া যজ্ঞগৃহে তোমার প্রজাদিগকে কামনা কর।" এখানে অর্যমা-স্থানে অদিতি ও রুদ্র আসিয়াছেন। সোম চন্দ্র ; সূক্তে ইন্দু শব্দই আছে।

আর এক ঋষি বলিতেছেন, 'অদিতি, মিত্র, বরুণ, সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ, আমাদের এই প্রার্থনা পূজিত করুন (১।১১৪।১১)। এই সূক্তে অর্যমা নাই। অদিতি রুদ্রের ধনুঃ, এই ধনুঃ দ্বারাই রুদ্র সূচিত হইতেছেন। সিন্ধু দিব্য-সরস্বতী. অদিতির পূর্ব দিকে অবস্থিত। এখানে পৃথিবীর উল্লেখ আছে। অতএব বুঝিতে হইবে, রুদ্রের উদয় হইতেছে। মন্ত্রে আছে, উদয়কালে চন্দ্র তাঁহার শিরঃ-স্থানীয় ছিলেন। রুদ্রের উদয় কখন হইত? সূর্যোদয়ের পূর্বে, না সূর্যাস্তের পরে, সূর্যোদয়ের পূর্বে হইলে চন্দ্র অমাবস্যার পূর্বদিনের কলাচন্দ্র। সূর্যাস্তের পরে হইলে চন্দ্র পূর্ণচন্দ্র। কিন্তু সূর্যাস্তের পরে হইলে মিত্র ও বরুণের নাম আসিত না। অতএব সূর্যোদয়ের পূর্বের ঘটনা। তখন কলাচন্দ্র দৃষ্ট হইত। এই কারণে বুঝিতেছি, এককালে বসন্ত ঋতুতে রুদ্র-যজ্ঞ হইত। কিন্তু পরবর্তীকালে শরৎ-আরম্ভে হইত।

আমাদের বর্তমান কালের গণনায় বসন্তঋতু দুই মাস। দুই মাসের মধ্যস্থলে মহাবিষুব। কতকাল পূর্বে কালপুরুষ নক্ষত্রে মহাবিষুব হইত? রুদ্রের ধনুঃ রাখিয়া তাঁহার শুধু মূর্তিটি দেখিলে আর্দ্রা তারা দক্ষিণ বাহুতে অবস্থিত। বর্তমানকালে আর্দ্রা তারা মহাবিষুব হইতে পূর্বদিকে ৯০° অংশ (ডিগ্রী) দূরে আছে। ১° অংশ পিছাইতে ৭৩ বৎসর লাগে। অতএব ৯০ × ৭৩ = ৬৫৭০ বৎসর পূর্বে আর্দ্রাতে মহাবিষুব হইত। বর্তমান ইংরেজী সন ১৯৫০। অতএব ইহা (খ্রী-পূ ৬৫৭০ − ১৯৫০ =) ৪৬২০ অব্দের ঘটনা। অদিতিকে ধরিলে খ্রী-পূ ৬০০০ অব্দে যাইতে হইবে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ কি বিষুব-দিন চিনিতেন? ইহার উত্তর,—যাঁহারা দীর্ঘ দিবা, দীর্ঘ রাত্রি বুঝিতে পারিতেন, দিবারাত্রি সমান কিনা, তাঁহাদের পক্ষে এই জ্ঞান অসম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ, যাঁহারা দক্ষিণায়নাদি বিন্দু ও উত্তরায়ণাদি বিন্দু নিরূপণ করিতেন, তাঁহাদের পক্ষে মধ্যবিন্দু নিরূপণ করাও কঠিন হইত না। অবশ্য দুই-পাঁচ দিনের ভুল হইত। কিন্তু শীত ও বর্ষার মধ্যভাগ বুঝিতে অধিক বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। উত্তরায়ণাদি হইতে দক্ষিণায়নাদি ছয় অমাবস্যা। তৃতীয় অমাবস্যা গতে উত্তরায়ণের মধ্য ভাগ।

দিক্‌চক্রে রবির উদয় দেখিয়াও অনুমিত হইতে পারিত। বিষুব দিনে দিবারাত্রি সমান হয়, তৎকালে ইহাও লক্ষ্য করা অসম্ভব ছিল না। প্রথমে রুদ্র নাম ছিল না। তখন তাঁহার নাম দক্ষ ছিল। দক্ষ নিপুণ। যিনি দিবারাত্রি সমান করেন, তিনি দক্ষ হইতে পারেন। পুরাণে দক্ষের অজমুখ, অকস্মাৎ এই কল্পনা আসিতে পারিত না।

ঋগ্‌বেদে এক হেঁয়ালী আছে, অদিতি হইতে দক্ষ এবং দক্ষ হইতে অদিতি উৎপন্ন হইলেন (১০।৭২।৪, ৫)। ইহার পর দেবগণের জন্ম হইল। এখানে দেবগণ আদিত্য। প্রথম আদিত্য দক্ষ। অতএব অদিতি হইতে দক্ষ। দক্ষ হইতে অদিতি। ইহার অর্থ, দক্ষের পর অপর আদিত্য। অর্থাৎ, ইহার পূর্বে সূর্যের বিভিন্ন ঋতুর শক্তির আদিত্যের কল্পনা হয় নাই। যখন অর্যমা, মিত্র, বরুণাদি আদিত্য-কল্পনা স্থির হইয়া গেল, তখন দক্ষ আর আদিত্য রহিলেন না। কিন্তু রুদ্র-যজ্ঞ শরৎ-আরম্ভে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল।

মহাবিষুব দিনে যে নক্ষত্র উষা পাঁচটার সময় উদিত হয়, পাঁচ মাস পরে সে নক্ষত্র সন্ধ্যার পর সাতটার সময় পূর্ব দিকে উদিত হয়। পাঁচ মাস পরে শরৎ ঋতুর আরম্ভ।

শরৎ হইতে এক বৎসর-গণনা প্রচলিত হইল। পূর্বে পাইয়াছি, ইহার পূর্বে হিম. (শীত) ঋতু হইতে বৎসর গণিত হইত। এখন হইতে হিম. ও শরৎ, দুই বৎসরের দুই নাম হইয়াছিল। কিন্তু শরৎ ঋতু আর এক যমদ্রংষ্ট্রা। পরে দেখিতেছি, যজুর্বেদে ও অথর্ববেদে রুদ্রের হিংসাবৃত্তি বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ঋগ্‌বেদেও এই কর্ম উক্ত হইয়াছে। তাহা শরৎ ঋতুতে অদ্যাপি প্রত্যক্ষ হইতেছে। রুদ্র ও সোম ৬।৭৪ সূক্তের দেবতা। সোম চন্দ্র। ঋষি বলিতেছেন, "হে সোম ও রুদ্র, যজ্ঞসকল প্রতি গৃহে তোমা-দিগকে পর্যাপ্ত রূপে ব্যাপ্ত করুক। তোমরা সপ্ত রত্ন ধারণ করিয়াছ। দ্বিপদের ও চতুষ্পদের সুখকর হও। যে রোগ আমাদের দেহে প্রবেশ করিয়াছে, সে সংক্রামক রোগ বিয়োজিত কর। তোমরা আমাদিগের শরীরের জন্য এই সকল ভেষজ ধারণ কর। তোমাদের দীপ্ত ধনুঃ ও তীক্ষ্ণ শর আছে। তোমরা আমাদিগকে রক্ষা কর।" এখানে রুদ্র ও সোমের উদ্দেশে যজ্ঞ ব্যাপ্ত করিতে বলা হইয়াছে। জ্যোতিষে সোম মৃগশিরা নক্ষত্রের অধিপতি। মৃগশিরা নক্ষত্রে পূর্ণিমা হইলে সে মাসের নাম মার্গশীর্ষ। সে কোন্ সময়ের কথা মোটামুটি বলিতে পারা যায়। বর্তমানে

মৃগশিরা নক্ষত্র মহাবিষুব বিন্দু হইতে প্রায় ৮৩° অংশ দূরে আছে। অতএব, ৮৩×৭৩=৬০৫৯ বৎসর পূর্বের অর্থাৎ খ্রী-পূ (৬০৫৯—১৯৫০=) ৪১০৯ অব্দের কথা।

বসন্ত গতে গ্রীষ্ম ঋতু আসিল। তখন কালপুরুষ নক্ষত্র সূর্যোদয়ের পূর্বে আর দেখা যাইত না। সে সময় বজ্র, বিদ্যুৎ, বাত্যা ও বৃষ্টি হইত। এই প্রাকৃতিক ব্যাপারের এক গণদেবতা মরুৎগণ নামে কল্পিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অধিষ্ঠান কালপুরুষ নক্ষত্র। ঋগ্‌বেদে রুদ্রের যে রূপ, যে গুণ, যে আয়ুধ, মরুৎগণেরও তাহাই। প্রভেদের মধ্যে পৃশ্নী (চিত্রল গাভী) তাঁহাদের মাতা। গাভী যেমন দুগ্ধ দান করে, মরুৎগণও তেমন বৃষ্টি দান করেন; পৃষতী (চিত্রল হরিণ) তাঁহাদের রথের বাহন। হরিণ যেমন দৌড়াইতে দৌড়াইতে থামে, আবার দৌড়ায়, ঝড়ও তেমন বহিতে বহিতে থামে, আবার বহে। ইহা হইতে এই উপমা আসিয়াছে। কালপুরুষ নক্ষত্রের তারা-সন্নিবেশে পৃশ্নী ও পৃষতী, দুই-ই কল্পিত হইত। ঋগ্‌বেদের সমুদয় সূক্ত এক ঋষির নয়; ভিন্ন ভিন্ন ঋষি ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা করিয়াছিলেন। মরুৎগণের হস্তে বজ্র এবং কদাচিৎ বাসি (ছুতারের বাইস) থাকে, কারণ ঝড়ের সময় বৃক্ষাদি উৎপাটিত হয়। ঋগবেদে আছে, মরুৎগণ ভয়ঙ্কর দেবত। তাঁহারা 'রুদ্র', 'রুদ্রিয়' (রুদ্রের পুত্র), তাঁহাদের হস্তে রুদ্রীয় সুখকর ভেষজ আছে। সে সময়ে বসন্ত যমদ্রংষ্ট্রা ছিল না, মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিও হইত। রুদ্রদেব তখন ঋগ্‌বেদের শিব. (মঙ্গলময়) হইলেন।

যে সময়ের কথা হইতেছে, সে সময়ে মহাবিষুব দিন পিছাইতে পিছাইতে রোহিণী নক্ষত্রে আসিতেছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইহা স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে (৩।৩৩।৯)। যথা, —পুরাকালে প্রজাপতি আপন কন্যার উদ্দেশে ধ্যান করিয়াছিলেন। প্রজাপতি ঋশ্য রূপ ধারণ করিয়া রোহিতরূপিণী সেই কন্যার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন। দেবগণ দেখিয়া বলিলেন, যাহা কেহ করেন নাই, প্রজাপতি তাহাই করিতেছেন। প্রজাপতিকে আর্তি (শাস্তি) দিতে পারিবে, আপনাদের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহাদের যে ঘোরতম অত্যুগ্র শরীর ছিল, তাহা মিলিত হইয়া এক দেবের উৎপত্তি হইল। তাঁহার নাম ভূতবান্‌। দেবগণ ভূতবান্‌কে বলিলেন, ইঁহাকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ কর, তুমি পশুমান্‌ হইবে। তখন তিনি প্রজাপতিকে লক্ষ্য করিয়া বাণদ্বারা বিদ্ধ করিলেন। বিদ্ধ হইয়া তিনি ঊর্ধ্বে উৎপতিত হইলেন। তাঁহাকে লোকে মৃগ বলিয়া থাকে। যিনি মৃগ বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি মৃগব্যাধ। আর, যিনি রোহিতরূপিণী, তিনি আকাশ রোহিণী। ত্রিকাণ্ডযুক্ত বাণ আকাশে ত্রিকাণ্ডবাণ হইয়াছে। (চিত্র ৩)।
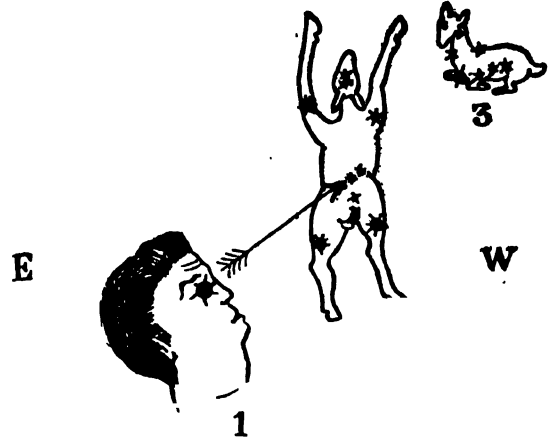
৩। 1—রুদ্র, 2—ঋশ্য, 3—রোহিত মৃগ

মৃগব্যাধ অতিশয় উজ্জ্বল। মৃগনক্ষত্র ঋশ্য নামক ছাগ। ইষকা ত্রিকাণ্ডবাণ। রোহিণী তারা লোহিত বর্ণ। ইহাদের অবস্থান দেখিয়া কবি এই উপাখ্যান চিরদিন রচনা করিতে পারিতেন। শিবমহিম্ন স্তোত্রে এই নিত্য ব্যাপার উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

ঋগ্‌বেদেও বর্ণিত আছে (১।৭১।৫), "অগ্নিরূপ রুদ্র দীপ্তিমান্‌ বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় দুহিতায় স্বীয় দীপ্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।" কিন্তু তাৎপর্য কি? পূর্বাপর চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়, প্রজাপতি মৃগনক্ষত্রে ছিলেন, তিনি রোহিণী নক্ষত্রে গমন করিলেন। যখন প্রজাপতি মৃগনক্ষত্রে ছিলেন তখন যজ্ঞের যে যে কাল ছিল, এখন আর সে সে কাল রহিল না। ভাবিতে গেলে বিপ্লবের কথা। খ্রী-পূ ৩২৫০ অব্দে রোহিণী তারায় মহাবিষুবপাত হইত। দুই-তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া যে বিধি চলিয়া আসিতেছিল, তাহা আর রহিল না। প্রত্যক্ষ অনুভব দ্বারা পূর্বপ্রচলিত যজ্ঞকাল পরিবর্তিত করিতে হইল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, প্রজাপতির রোহিতরূপিণী দুহিতায় সিক্ত রেতঃ হইতে মানুষ হইল, আদিত্য (প্রথম আদিত্য অর্যমা), ভৃগু (ভার্গব, শুক্র), বৃহস্পতি হইলেন, আদিত্যগণ হইলেন। অঙ্গিরাগণ হইলেন এবং নানাবিধ অরুণবর্ণ পশু হইল। অর্থাৎ, নূতন সৃষ্টি হইল, যেমন বহু পূর্বে প্রজাপতি মৃগনক্ষত্রে থাকিবার সময় হইয়াছিল। পুরাণে শ্বেত বরাহ বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন। এখন রোহিণী নক্ষত্রে প্রজাপতির আবির্ভাব হইল।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, "প্রজাপতির রেতঃ স্রোতোরূপে ধাবিত হইল। তাহা এক সরোবর হইল।" ঋগ্‌বেদ বলিতেছেন, "সুকৃতের আধারস্বরূপ এক উন্নত স্থানে সে শুক্রের সেক হইল (১০।৬১।৬)।" ব্রহ্মসৃষ্টি,

সরোবর, সুকৃতের আধারস্বরূপ উন্নত স্থান ইত্যাদির অর্থ অবশ্য ছিল। এই স্রোতঃ বা সরোবর দিব্য-সরস্বতী ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। আমাদের জ্যোতিষ-গ্রন্থে ব্রহ্মা রোহিণী নক্ষত্রের অধিপতি। অর্থাৎ, রোহিণীতে নূতন সৃষ্টি হইয়াছিল। সূর্যসিদ্ধান্তে চন্দ্রের সাতাইশ আঠাইশ নক্ষত্র ব্যতীত নক্ষত্রচক্র-বহির্ভূত পাঁচটি উজ্জল নক্ষত্রের নাম আছে। যথা,—অগ্নি (beta Tauri), প্রজাপতি (beta Aurigae), ব্রহ্মহৃদয় (Alpha Aurigae) মৃগব্যাধ (Sirius), অগস্ত্য (Canopus)। কি প্রয়োজনে এই সকল নক্ষত্রের নাম আসিয়াছিল, তাহা অদ্যাপি অজ্ঞাত ছিল। এক্ষণে ঋগ্‌বেদ হইতে প্রয়োজন স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাই-

৪। 1—আর্দ্রা, 2—মৃগশিরা, 3—অগ্নি, 4—প্রজাপতি, 5—ব্রহ্মহৃদয়, 6—রোহিণী, 7—সুরগঙ্গা, 8—রবিপথ
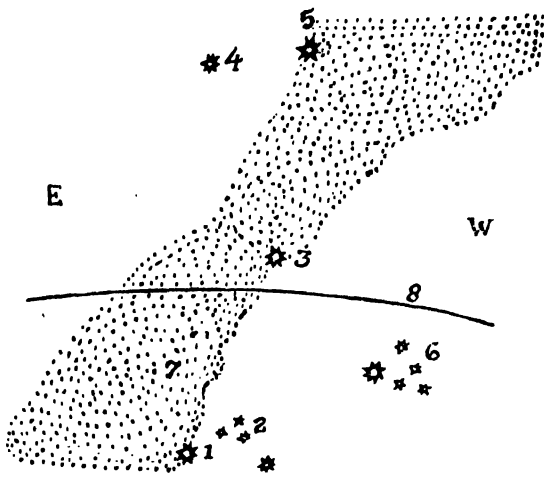
তেছে। (চিত্র ৪)। মৃগশীর্ষের উত্তরে সরস্বতীতে এক উজ্জ্বল তারা আছে, তাহার নাম অগ্নি। অগ্নির উত্তরে সরস্বতীর পার্শ্বে দুইটি উজ্জ্বল তারা আছে। পূর্বেরটির নাম প্রজাপতি, পশ্চিমেরটির নাম ব্রহ্মহৃদয়। খ্রী-পূ ৪০০০ অব্দে প্রজাপতি অগ্নি ও মৃগশিরা তারা রাত্রিকালে একই সময়ে মধ্য রেখায় দেখা যাইত। এইরূপ, খ্রী-পূ প্রায় ৩২৫০ অব্দে ব্রহ্মহৃদয় ও রোহিণী তারা একদা মধ্যরেখায় দেখা যাইত। সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষে এই এই ঐক্য দর্শনের প্রয়োজন হইত না। তৎকালে ঐক্যও হইত না। কারণ, উল্লিখিত কালের পূর্বে কিম্বা পরে এই ঐক্য আর কভু ঘটে নাই। তারা তিনটির নামও চিন্তনীয়। প্রজাপতি নামেই অর্থ প্রকাশিত হইতেছে। অগ্নি, অর্থাৎ যে তারা ও মৃগশিরা একদা মধ্যরেখায় দৃষ্ট হইলে যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্বালিত হইত। তখন প্রজাপতি নূতন বৎসর আরম্ভ করিতেন। ব্রহ্মহৃদয় নামটি ঋগ্‌বেদের ব্রহ্ম হইতে আসিয়াছিল। অবশ্য ব্রহ্ম শব্দ দ্বারা ব্রহ্মা বুঝায় না। ব্রহ্ম মন্ত্র। বৈদিক কৃষ্টির কালনির্ণয়ে এই প্রমাণ অতিশয় মূল্যবান্। বর্তমানে রোহিণী তারা রাত্রে মধ্যরেখায় আসিবার প্রায় ৪০ মিনিট পরে ব্রহ্মহৃদয় তারা সে রেখায় আসে। আমরা আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জ্যোতির্গণিত সাহায্যে গণিয়া দেখিতেছি, খ্রী-পূ ৩২৫০ অব্দে এই দুই তারা সমসূত্রে অবস্থিত ছিল। ব্রহ্ম-হৃদয় পঞ্জাবের প্রায় মাথার উপরে দেখা যাইত। তাহাকেই ঋগ্‌বেদ উচ্চস্থান বলিয়াছেন। এক্ষণে মাথার বহু উত্তরে দৃষ্ট হয়; সে স্থান উন্নত বলিতে পারা যায় না। কিন্তু আমাদের জ্যোতির্বিদেরা এত প্রাচীন কালের স্থিতি গণিতে পারিতেন না। অতএব ঋগ্‌বেদের কাল হইতে স্মৃতি-পরম্পরা-ক্রমে তারার নামগুলি চলিয়া আসিতেছে। কেন আসিতেছে, কেহ জানিত না।

যজুর্বেদে ও অথর্ববেদে রুদ্রের মহিমা বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি মহাদেবও হইয়াছিলেন। শুক্লযজুর্বেদে (৪।৫) রুদ্রাধ্যায়ে শত রুদ্রীয় হোমের মন্ত্রে তাঁহার বহু নাম আসিয়াছে। "তিনি কপর্দী, নীল-গ্রীব, নীল-লোহিত, প্রথম দৈব ভিষক্, সহস্রাক্ষ, তাম্র-অরুণ বভ্রুবর্ণ। তাঁহাকে বিসর্পিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি সর্প-ব্যাঘ্র-রাক্ষস বিনাশকারী কৃত্তিবাস। তিনি ভব (সৃষ্টিকর্তা), শর্ব (সংহার-কর্তা), পিনাক-পাণি, পশুপতি, গিরিশ। মুজবান্ পর্বতের সেদিকে তাঁহার বাস (৬।৭৪)। তাঁহার অসংখ্য লীলা-বিগ্রহ আছে। তিনি সেনাপতি, দিক্‌পতি, বাস্তোস্পতি, বৃক্ষপতি, পশুপতি, ক্ষেত্রপতি, সভাপতি, মন্ত্রী ও বণিক। তিনি গুপ্তচোরপতি, তস্করপতি, বঞ্চক, পরিবঞ্চক, ব্রাত, ব্রাতপতি, গণ, গণপতি। বিশ্বভুবনে যত কিছু আছে, তিনি সব। তিনি বিশ্বরূপ, সহস্র সহস্র রুদ্র। তিনি সর্বত্র সঞ্চরণ করেন; শান্ত না করিলে তিনি উপদ্রব করেন। "মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ"—পুরুষ (মনুষ্য), জগৎ (অশ্ব-গবাদি পশু) হিংসা করিও না। তুমি ঘোর রূপ ত্যাগ করিয়া শিবা তনু ধারণ করিয়া আইস।"

কৃষ্ণ যজুর্বেদেও (৪।৫।১) শতরুদ্রীয় অধ্যায়ে রুদ্রের শত নাম কীর্তিত হইয়াছে।

অথর্ববেদে (১১) উৎপাত-শান্তি নিমিত্ত শতরুদ্রীয়ের বিনিয়োগ হইত। "হে রুদ্র, আমাদিগকে হিংসা করিও না। পুরুষ, গো, ছাগ ও মেষ আকাঙ্ক্ষা করিও না। হিংসক প্রজাদিগকে বধ কর। জ্বর-কাসি-উপদ্রবকারী রুদ্রকে নমস্কার করিতেছি। তুমি আরণ্য পশু গ্রহণ কর, গ্রাম্য পশু করিও না। জ্বরাদি রোগ দ্বারা, আয়ুধ দ্বারা, বিষদ্বারা, বিদ্যুৎদ্বারা, অগ্নিদ্বারা গ্রহণ করিও না। আমাদের

বৃদ্ধ, শিশু, যুবা, পিতা, মাতা ও শরীর হিংসা করিও না। রুদ্রের গণ-দিগকে নমস্কার করিতেছি। কিরাতবেশী দেবের বৃহৎ মুখ-বিবর-বিশিষ্ট কুক্কুরকে নমস্কার করিতেছি। তোমার সেনাদিগকে নমস্কার করিতেছি। 'স্বস্তি নো অভয়ঞ্চ নঃ' তোমার প্রসাদে আমাদের স্বস্তি হউক, অভয় হউক।"

ঋগ্‌বেদে রুদ্রাণী নাই। শুক্ল-যজুর্বেদে রুদ্রের এক নাম ত্র্যম্বক। এই বেদে ৩।৫৭ আছে, "হে রুদ্র, তোমার ভগিনী অম্বিকার সহিত এই পুরোডাশভাগ সেবন কর। এই পুরোডাশটিও তোমার পশু আখুকে (মূষিককে) সমর্পিত হইল।" এখানে অম্বিকা রুদ্রের ভগিনী। উক্ত বেদের শতপথ ব্রাহ্মণে (২।৫।৩) এইরূপ উক্তি আছে। সেখানে কিন্তু অম্বিকা রুদ্রের পত্নী। সেখানে আছে, "যেহেতু স্ত্রীর সহিত ইঁহার ভাগ, সেইজন্য এই পুরোডাশ ত্র্যম্বক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।"

কৃষ্ণ যজুর্বেদে (১।৮।৬) শরৎ অম্বিকা হইয়াছেন। এইরূপ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১।৬।১০) অম্বিকা শরৎ ঋতুরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। সেখানে আছে, শরৎই রুদ্রের অম্বিকা (ভগিনী)। তাঁহারই দ্বারা রুদ্র হিংসা করেন। সায়ন লিখিয়াছেন, শরৎকালে পীনস-জ্বর উৎপাদন হেতু রুদ্র হিংসক। অম্বিকা হিংসিকা। শুক্ল-যজুর্বেদের মন্ত্রের ভাষ্যে মহীধর লিখিয়াছেন, অম্বিকা শরৎরূপ ধারণ করিয়া জ্বরাদি উৎপাদন করেন।*

দেখা যাইতেছে, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদের কালে রুদ্রযজ্ঞ শরৎকালেই প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। শরৎ ঋতুতে সন্ধ্যারাত্রে পূর্ণচন্দ্রের সহিত মৃগনক্ষত্র দৃষ্ট হইলে মৃগের বিপরীত দিকে

* বোধ হয়, সে সময়ে মনুষ্যের মেলেরিয়া এবং গবাদি পশুর গুটিরোগ হইত। অদ্যাপি পঞ্জাবের দক্ষিণ দিকে গবাদি পশুর গুটিরোগ হয়, বঙ্গদেশেও হয়। পঞ্জাবে মেলেরিয়া রোগ আছে, বঙ্গদেশেও এই সময় মেলেরিয়া আরম্ভ হয়।

মুঞ্জবান্ পর্বত মুঞ্জতৃণাচ্ছাদিত পর্বত। মুঞ্জতৃণ শর-গাছের তুল্য। যাঁহারা কৈলাসদর্শন করিতে যান, তাঁহারা প্রথমে হিমালয়ে মুঞ্জতৃণের অরণ্য দেখিতে পান। আরও উত্তরে গেলে বৃহৎকায় মূষিক, বৃহৎ-মুখ হিংস্র কুক্কুর ও তদধিক হিংস্র দস্যুর সম্মুখীন হন। বোধ হয় যজুর্বেদের কালের কোন কোন ঋষি কৈলাস দর্শন করিতেন এবং সেখানে যাহা দেখিতেন তাহা মন্ত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। মর্ত্যে মুঞ্জবান্ পর্বত হিমালয়, স্বর্গে দিব্য-সরস্বতী। দিব্য-সরস্বতীর পার্শ্বেই রুদ্রের অধিষ্ঠান, এই হেতু তিনি গিরিশ। চিত্র ৫।

চতুর্দশ নক্ষত্রে, মূলা নক্ষত্রে সূর্য থাকিত। মূলা বৃশ্চিকের পুচ্ছ। ঋগ্‌বেদে মূলার নাম নির্ঋতি। নির্ঋতি শব্দের অর্থ মৃত্যু। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন, ব্যাধির নিদান। ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ নির্ঋতিকে অত্যন্ত ভয় করিতেন।
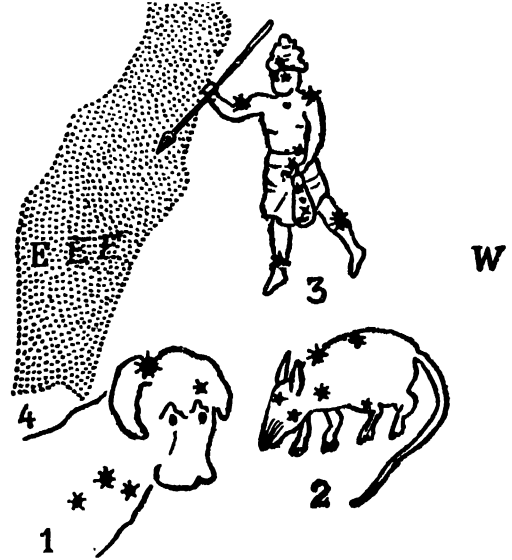
৫। 1—শ্বন্, 2—মূষিক, 3—কিরাতরূপী রুদ্র, 4—মুঞ্জবান্ পর্বত

কারণ, সে সময়ে মূলা দেখা যাইত না, সে সময়ে রোগের প্রাদুর্ভাব হইত। এক মাস পরে যখন দেখা যাইত, তখন রোগের হ্রাস হইত। পরে যজুর্বেদ ও অথর্ববেদের কালে (খ্রী পূ ২৫০০ অব্দে) কৃত্তিকাযুক্ত পূর্ণিমায় শারদবিষুব হইত, সূর্য বিশাখায় থাকিত। তখন মূলার রোগ-নিদানত্ব দোষ কাটিয়া গেল, বৃশ্চিকের পুচ্ছের দুইটি তারা লইয়া 'বিচৃতৌ' নামে নক্ষত্র হইল। এই নামের অর্থ মোচন-কর্তা, রোগ-পাশ-মোক্ষক। অথর্ববেদে (২।৮, ৩।৭) 'ক্ষেত্রিয়' নামে এক রোগের চিকিৎসা ও শান্তির বিধান আছে। সায়ন 'ক্ষেত্রিয়' শব্দে বুঝিয়াছেন, ক্ষয়-কুষ্ঠাপস্মারাদি পিতামাতা হইতে পুত্রকন্যায় সঞ্চারী রোগ। ইহাই প্রসিদ্ধ অর্থ। ঋষিগণ এই রোগের চিকিৎসা করিতেন, যখন 'বিচৃতৌ' (দ্বিবচনান্ত) পূর্বদিকে প্রথম উদিত হইত। তখন শুভকাল "সুভগে ভগবতী বিচৃতৌ।" গণিতদ্বারা জানিতেছি খ্রী-পূ ৪০০০ অব্দে বিচৃতৌ অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের আরম্ভ, এবং খ্রী-পূ ২৫০০ অব্দে ১৫ দিন পরে প্রথম উঠিতে দেখা যাইত। ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ যে ব্যাধির প্রকোপে কাতর

হইয়া রুদ্রের নিকটে ভেষজ প্রার্থনা করিতেন, তাহা 'ক্ষেত্রিয়' মনে হয় না। দেহান্তর-সঞ্চারী ব্যাধির কালাকাল নাই।

এই প্রকরণে অজ্ঞাতপূর্ব তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (১) নক্ষত্রে কোন কোন দেবতার অধিষ্ঠান ও নক্ষত্রের তারা-সন্নিবেশ দেখিয়া দেবতার রূপ কল্পিত হইয়াছিল। (২) নক্ষত্রের অধিপতি কল্পনা অমূলক নয়। যজুর্বেদে নক্ষত্র-চক্রের সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের ও তাহাদের দেবতার নাম আছে। যজুর্বেদের কাল খ্রী-পূ ২৫০০ অব্দ। কয়েকটি নক্ষত্রের অধিপতি এই সময়ে কল্পিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু অধিকাংশ নক্ষত্রের দেবতাকল্পনা পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল। এই দুই তত্ত্ব ধরিয়া ঋগ্বেদের অনেক দেবতা চিনিতে পারা যায়। পরবর্তী প্রকরণে এই দুই তত্ত্বের প্রয়োগ পাওয়া যাইবে।

মন্তব্য।

পাশ্চাত্য বেদবিদ্বানেরা রুদ্রের বেদোক্ত রূপ, গুণ, কর্ম বিবেচনা করিয়াও কেন যে তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, ইহা এক পরম আশ্চর্য কথা। কেহ রুদ্রকে অগ্নি মনে করিয়াছেন, কেহ ঝড়-বৃষ্টির দেবতা মনে করিয়াছেন ইত্যাদি।

গ্রীকপুরাণে আমাদের কালপুরুষের নাম Orion. সেখানেও তিনি এক সুদর্শন ব্যাধ। তাঁহারও মেখলা আছে, হস্তে গদা ও তরবারি, পরিধানে সিংহচর্ম আছে। ইয়োরোপ ও গ্রীস দেশে সিংহ অজ্ঞাত। Orion সিংহ-চর্ম কোথায় পাইলেন? গ্রীকপুরাণে Orionএর তিন প্রকার পরস্পর অসংলগ্ন কর্ম বর্ণিত হইয়াছে। পড়িলে মনে হয় প্রাচীন গ্রীকেরা কোন বিদেশীর নিকট হইতে Orion সম্বন্ধে অল্পস্বল্প শুনিয়াছিলেন। আর সে বিদেশী ভারতীয় আর্য ব্যতীত অপর কেহ হইতে পারে না। খ্রী-পূ ১৪শ শতাব্দে বৈদিক আর্যজাতির এক শাখা এসিয়া মাইনরে কিছুকাল প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ এক সন্ধি-পত্রে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে নাসত্য (অশ্বিদ্বয়), ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র এই পাঁচ বৈদিক দেবতার উল্লেখ আছে। ইহা হইতে অনুমান হয়, সেই সময়ে গ্রীক যবনেরা আর্যদের নিকট হইতে Orion পাইয়াছিলেন। শুধু Orion নয়, বেদের শ্বন্ তাঁহাদের কুকুর (Sirius or Dog Star), বেদের মূষিক তাঁহাদের শশক (Lepus) হইয়াছে। এই-রূপ ঐক্য আরও আছে। ঋগ্বেদের ঋক্ষ, বৃত্র, অজ, এক-পাদ, অহির্বুধ্ন্য, কৃশানু, শ্যেন প্রভৃতিও গ্রীক তারা-চিত্রে আছে। এই ঐক্য কিরূপে হইল?

স্বপন-পিয়াসী

শ্রীসুবলসখা বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বপন-পিয়াসী আঁখিপল্লবে কাজলের রেখা টানি,
স্বপন সেথায় করে নাকি কানাকানি?
দুরগ পাখীর ডানা-কাঁপা কোন বনে আর উপবনে—
বিছায়ে রাখিতে চেয়েছি আমার মন এ।
যেথায় পাহাড়ী ঝর্ণা নেমেছে রঙের খুশীতে মেতে
সে রূপসায়রে কেন চাই ডুবে যেতে?
পথ ভুলে গেছে দখিনা কোথায় মহুয়া ফুলের ঘ্রাণে,
সেই পথ আমি খুঁজে মরি অকারণে।
তমালকুঞ্জে কত মধুরাত হ'য়ে এলো জানি ভোর—
বেঁধেছি তবু তো ঝুলনের রাঙা ডোর।
বিজন পথের গ্রাম-বধূয়ার খোঁপার পিয়াল ফুলে
অঞ্জলি মোর ভরিতে চেয়েছি ভুলে
হঠাৎ কোথায় গোধূলিতে দূর মেঠো পথ হ'ল কালো,
শেষ উৎসব লেগেছে নয়নে ভালো।

ফুলে আর ভুলে ধূপছায়া ভরা পৃথিবীর প্রাঙ্গণে—
রঙে-রসে জাল বুনে যাই আনমনে।
স্বপনের নুড়ি কুড়ানো আমার বেভুল মনের নেশা,
মধুকর আমি মাধুকরী মোর পেশা।
কোন্ পথে যেতে কোন্ পথে যাই জানি না আপন-পর,
আমি শুধু এক ঘরছাড়া যাযাবর।
ভুবনের হাটে লাভক্ষতি নিয়ে করি না তো টানাটানি—
সুরে বা বেসুরে কভু বাঁধি বীণাখানি।
পিপাসা আমার মিটিল না আজো আঁখিতে স্বপ্নসাধ
পেতে চায় কার নয়নের পরসাদ।
ভীরু কামনার শত শতদল আজো মেলে নীলপাখা—
জাগর রাতের নয়নাঞ্জন আঁকা।
কতটুকু চাই কতটুকু পাই হিসাব রাখি না কিছু,
মরীচিকা—তবু ছুটে যাই পিছু পিছু।

মনে কি দ্বিধা?

শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার

১

প্রিয়রঞ্জন খুঁজেপেতে যবের ছাতু কিনে এনে স্ত্রীকে দিলেন—এই নাও রমা, অল্প একটু দুধ দিয়ে আর গুড় দিয়ে মাখ দেখি। বিকেলে ছেলেমেয়েকে কি দেবে ভেবে পাও না, দেখো চমৎকার খাবার হবে। রাত্রে আমায় যে এক ডিশ দুধ দাও, সেটা একেবারে বাড়তি, আজ থেকে আর দিও না।

বিছানার মাথার কাছে পুরনো নীল শাড়ীঢাকা ট্রাঙ্কটার ওপর প্রিয়রঞ্জন গায়ের শার্টটা খুলে সেটিকে যথাসম্ভব সযত্নে রেখে দিলেন। দু' ভাঁজ করে কোঁচাটা গুঁজে কাপড় আঁট করে মার্কিনের ফতুয়া গায়ে ডাকলেন, আরতি, দীপু…

এ ডাকের অর্থ ওদের কাছে পরিষ্কার। ছোট দু'টো বালতি নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে করতে নেমে এল তালের গুঁড়িবাঁধানো ঘাটে বাবার পেছনে পেছনে। একটা বালতি ছেঁদা, তাই ঝগড়া। প্রিয়রঞ্জন বললেন, আরতি কাল ঐ বালতিতে জল নিয়ে যখন বাগানে পৌঁছল, তখন এই এতটা কম। আজ দেখা যাক দীপু দিদির চেয়ে চটপটে কি না।

বাড়ীর সামনের জমিটায় মানুষের সখ ও সামঞ্জস্য-চেষ্টার সঙ্গে অবাঞ্ছিত আগাছাদের একটা রেষারেষি সহজেই চোখে পড়ে। চোরকাঁটা ঝালরঘাস লতানে ঘাস ক্ষীরুইঘাসের জমিতে উৎকীর্ণ একখানি আঁকাবাঁকা রঙচঙে লিপির মত প্রিয়রঞ্জনের এই বাগান। শীতের দিনে তার মধ্যে ফুটেছে চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, দু'চার রকমের মরসুমী ফুল। ধারে ধারে গাঁদার উচ্ছ্বাসকেও অবহেলা করা হয় নি। ঘাট থেকে বাগান পর্য্যন্ত সিঁথির মত যে পথটা পায়ে-দলা ঘাসের দুর্দ্দকে নিভিয়ে এনেছে মাটির রঙের কাছাকাছি, তারই দু'পাশে হাঁটু পর্য্যন্ত উঁচু বুনোগাছের ক্ষীণ সারি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে—বোধ হয় সেই ছেঁদা বালতির দাক্ষিণ্যে। যেন এই পথ ধরে কবে ঢুকতে পারবে বাগানে—সেই আশায় আছে।

বাড়ীর সামনের দাওয়া থেকে নেমেই অল্পপরিসর একটু খোলা জায়গা। এইখানে একটা হাল্কা লোহার চেয়ার নামিয়ে নিয়ে বসেন প্রিয়রঞ্জন। সামনে থাকে একটা নীচু চৌকি। ভাইবোন তর্কে ব্যস্ত—কার পোঁতা গাছে ভাল ফুল ফুটেছে। মা ডাকলেন, খাবি আয়। চামচসমেত একটি কাচের বাটি এসে নামল প্রিয়রঞ্জনের সামনের চৌকিতে। একগ্লাস জল।

অন্তদিন খাবার খেয়ে প্রিয়রঞ্জন চুপ করে বসে থাকেন খানিকক্ষণ। আজ চলে এলেন বাড়ীর ভেতর, কি রে, কেমন লাগল বল—

—বেশ বাবা, চমৎকার খেতে। রোজ যদি পাই তো খাই।

কৈ, তোমার জন্তে রেখেছ রমা? না না, আমি বলছি, খেয়ে দেখ একটু। কই খাও, হ্যাঁ, এখনি খাও…কি, কেমন?

ভালোই। তোমাদের ভালো লাগলেই হ'ল।

না, তুমি স্বীকার করবে না। বুদ্ধিটা আমার কি না। কিন্তু সত্যি ভেবে দেখ, যারা এই দুর্দ্দিনে দোকান বাজার থেকে সন্দেশ পান্তুয়া চপ কাটলেট খেয়ে মরছে, তারা কি বোকা। টাকা খরচ করছে দ্বিগুণ, জিভের সত্যিকারের তৃপ্তি কাকে বলে তাও জানছে না, মাঝ থেকে চিরকালের জন্তে স্বাস্থ্যটি জখম।

রমাকে রান্নাঘরে বিশেষ ব্যস্ত দেখে প্রিয়রঞ্জনের বক্তৃতা আর চলল না, কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে একটা স্মিত আত্মপ্রসাদের গুঞ্জন থেকেই গেল। বাইরে যেতে যেতে কয়েকবার আপন মনে বললেন, আশ্চর্য্য!—বোধ হয় যারা এখনও যবের ছাতুর এই তৃপ্তিদায়ক স্বাদটি আবিষ্কার করে নি তাদেরই লক্ষ্য করে।

শার্টের পকেট থেকে একটা পকেট-বই ও ছোট পেন্সিল বার করে নিয়ে প্রিয়রঞ্জন আবার লোহার চেয়ারে গিয়ে বসলেন। তারপর কষতে লাগলেন টাকা আনা পয়সার একটা যোগবিয়োগের অঙ্ক। অঙ্কের শেষ ফল গাণিতিক হিসাবের সঙ্গে এবং বোধ হয় তাঁর আর্থিক ক্ষমতার সঙ্গেও মিলল। প্রসন্ন মুখে কি যেন ভাবতে লাগলেন।

গ্লাস বাটি নিয়ে যেতে এল রমা।

বসো না একটু। আহা, রান্নাবান্না তো আছেই, বসো একটু, কথা আছে।…রমা, গেল বছর পুজোর সময় কলকাতা যাওয়ার হুজ্জতে সেই যে ধার হয়েছিল নব্বুই টাকা, এই মাসে শোধ হ'ল। অবশ্য মাঝে মাঝে একটু জায়গা বদল হওয়া ভালো, নিজের ঘরবাড়ী নিরালা জীবনের স্বাদটা ওতে আরও ভাল করে পাওয়া যায়, কিন্তু মনে আছে তো সে কি বঞ্ঝাট? ছেলেপুলে নিয়ে তুমি তো একেবারে সেই ছোট্ট ঘর আর উঠানের মধ্যে বন্দী—রান্নাবান্না, খাওয়া, শোয়া এ ছাড়া কাজ নেই। সুরেশবাবু এক ধরণের মানুষ, ঘোরে নিজের ফন্দীফিকিরে কোথায় টাকা পাওয়া যায়, বাড়ীর প্রয়োজন শুধু একপেট মুখরোচক আহার আর নাক ডাকিয়ে ঘুমোবার জন্তে। এদিকে অসুখ বিসুখ অশান্তি লেগেই আছে বাড়ীতে, তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। আমার বিয়ের সময় কে

যেন বলেছিল যে পাত্রীর দিদি বেশ ভাল ঘরে পড়েছে। কালীঘাটে নিজের বাড়ী আছে, স্বামী কনট্র্যাক্টরি করে, টাকাপয়সার অভাব নেই। আচ্ছা, তুমি যদি ঐ রকম ঘরে পড়তে কি হ'ত বল ত?

সন্ধ্যার ঠাণ্ডায় রমার শরীর জুড়িয়ে এল। হাসিমুখে বললে, মা বাপু, তার চেয়ে এ বেশ ভালোই আছি। হাত পা ছড়িয়ে অন্ততঃ মানুষের মত বেঁচে আছি। জিনিষপত্র কাপড়-চোপড় আসবাবের ছড়াছড়ি না থাকলেও দু' বেলা দু' মুঠো তো সময়মত জুটছে। কিছু না থাক, শান্তি আছে।

রমার ভাষার ঐশ্বর্য্য নেই—প্রিয়রঞ্জন তা জানেন। তার ভাব যতটা, ভাষা তার চেয়ে অনেক কম। এক এক সময়ে এই অসঙ্গতির জন্যে যেন তাকে ছেলেমানুষের মত অসহায় মনে হয়। 'কিছু না থাক, শান্তি আছে—' এই কি তাদের অপ্রগল্ভ কিন্তু মধুর জীবনের একটা উপযুক্ত বর্ণনা হ'ল! প্রিয়রঞ্জন নাড়া দিয়ে ওর প্রকাশশক্তিকে জাগাবার চেষ্টা করেন, 'কিছু থাকা' কাকে বলে রমা? বাড়ীতে যদি মুদী-ময়রার দোকান বসিয়ে দিই, তাতেই কি সুখ বাড়বে? জিনিষের জঞ্জালে আর কথা কাটাকাটির গোলমালে যদি মনটাই চাপা পড়ে, তবে সুখভোগ করবে কে? এই যে আমি বাগানটা করেছি, মাথার ওপর লতার ঢাকনি দেওয়া একটু বসবার জায়গা, এর সুখ শহরের ক'টা লাখোপতি পায়? এই যে তুমি, যা হোক ভেবে চিন্তে একটু খাবারের রকমারি ধরছ ছেলেমেয়ের মুখে, দোকানে অর্ডার দেওয়া খাবারে এ তৃপ্তি আছে? সুখকে রচনা করতে হয়। দীপুর ঐ গলাবন্ধ কোটটায় ওকে যেমন মানায়, দর্জ্জিকে দিয়ে ফ্যাশান-দোরস্ত জামা বানিয়ে আনলে ওর সেই হাবাগোবা হাসিখুশি ভাবটাই চাপা পড়ত। মনে হ'ত যেন মিলের তৈরি একটা ছেলে, টেঁকিছাঁটা নয়···

নিজের অদ্ভুত কল্পনায় প্রিয়রঞ্জন হেসে ফেললেন। রমাও হাসল প্রিয়রঞ্জনের দিকে চেয়ে। বললে, তোমার কথাই আলাদা, তুমি হচ্ছ কবি।

কিন্তু ফাঁকা কবিত্ব নয় একথাও বলো। কষ্টিপাথরে যাচাই করা! কলকাতার চাকরি গ্রহণ না করে যে দেশে মাষ্টারি নিয়ে এসে বসেছি এবং অনুতাপ করি নি, তাই হচ্ছে সেরা প্রমাণ যে এ শুধু কবিত্ব নয়।

এমন সময় কি একটা নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে করতে আরতি আর দীপু বাইরের দালানে এল। লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল দীপুর মুখ আঁকাবাঁকা বৃত্ত রচনা করছে, অথচ কান্নার কোন আওয়াজ নেই। আওয়াজটা হঠাৎ সশব্দেই বেরোবে এই আশঙ্কায় রমা বকে উঠল, কি নিয়েছিস আরতি, দিয়ে দে না—

দীপু দিদির হাত থেকে জিনিষটা পেয়ে দৌড়ে এসে বাবাকে দিলে, বাবা, এই নাও, সত্যি সত্যি চিঠি···

প্রিয়রঞ্জন হেসে উঠলেন দীপুর মুখ দেখে। রমা বকাবকি করতে লাগল আরতিকে, যত ধাড়ী হচ্ছ, তত বুদ্ধি বাড়ছে বুঝি? এই শীতের রাতে ওর মুখে হেঁসেলের কালিঝুলি মাখাতে গেলি?

প্রিয়রঞ্জন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, একি, এ যে সত্যি সত্যি চিঠি দেখছি। কখন এলো?···সেই আবার চিঠি যেখানে-সেখানে রেখে ভুলে বসে রয়েছ তো?

তোমার বইয়ের তাকের ওপরই তো রেখেছি। ভুলব কেন, এখনি নিশ্চয় মনে পড়ত।

দায়িত্বজ্ঞান নেই তোমাদের একেবারে, বলে প্রিয়রঞ্জন লণ্ঠনের কাছে গিয়ে চিঠি পড়তে লাগলেন।

একি, এ যে সুরেশবাবুর চিঠি!

রমা রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়েছিল, ফিরে এসে দাঁড়াল।

প্রিয়রঞ্জনের মুখ গম্ভীর: তোমার দিদি ছেলেপুলে নিয়ে এখানে আসছেন কাল। শরীর খারাপ, পেটের গোলমাল চলেছে, ডাক্তার বলেছে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে কিছুদিন থাকতে। সুরেশবাবু নিজেই আসছেন।

হঠাৎ রমা ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল, একি জ্বালা বলো তো? আমরা আছি একপাশে পড়ে, লোকজন এড়িয়ে কোনক্রমে সংসার চালাচ্ছি, তার মধ্যে একি ঝঞ্ঝাট! তাও দু'একদিনের জন্যে নয়। কে যোগাবে বল তো ওদের হাজার রকমের ফরমাস? ভাল তেল, সাবান, মাজন, খাবারের রকমারি—এসব পাট তো আমাদের নেই, যে তিন বেলা ঠাকুরসেবা করব। এমন জানলে কখনো যেতুম না ওদের বাড়ী।

প্রিয়রঞ্জন কিন্তু সহজ গলায় বললেন, ভাবছ কেন রমা? আসুক না ওরা। চিরকাল এক ধরণের জীবনই দেখেছে ওরা, এখানে দু'দিন এসে দেখুক যে অন্তরকমও আছে।

প্রিয়রঞ্জন হাসতে লাগলেন। রমা উঠে গেল রান্নাঘরে, মনে হ'ল প্রিয়রঞ্জনের হাসিতে তার মনের আশঙ্কাও অনেকটা হাল্কা হয়ে গেছে।

তাঁর নোটবইয়ের সস্ত-কষা অঙ্কটাও আবার বদলাতে হবে। 'কিন্তু তা হোক', প্রিয়রঞ্জন ভাবলেন, 'আসুক তাঁর তৈরি আবহাওয়ার মধ্যে অন্ত ধরণের আবহাওয়া। সেই দ্বন্দ্বেই তাঁর রচনার যেটুকু খাঁটি তা ফুটে উঠবে।'

২

রমার দিদি পূর্ণিমা এল তার দুই ছেলেকে নিয়ে; বড় ছেলেটি রইল কলকাতায়, স্কুল কামাই হবে। এক হিসেবে প্রিয়রঞ্জনের আশঙ্কা দেখা গেল অমূলক, তাঁর আয়ব্যয়ের অঙ্ক

এক রকম অক্ষতই রইল। পূর্ণিমা আসার মুহূর্ত্ত থেকেই তাঁর আয়না-খচিত চামড়ার ব্যাগটা বার বার খুলতে বুজতে থাকল। নিজের সমস্ত স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়ে ব্যাগটা কখনো রইল রান্নাঘরের জানলায়, কখনো শোবার ঘরের খাটের ওপর, কখনো বা উঠানের মাঝখানে সিমেন্টবাঁধানো তুলসীবেদীর ওপর। পূর্ণিমা নিজেও সব সময়ে হাত দেয়না ওটাতে, হুকুম করে নিজের বা রমার ছেলেমেয়েদের ব্যাগ থেকে টাকা বার করে দিতে।

রমার আপত্তি যথোচিত প্রবলই ছিল এ বিষয়ে। কিন্তু যে টাকাপয়সার ওপর প্রভুর কড়ানজর নেই, তারা সচল হবার সুযোগ পায়-ই। কখনো বা ওঠে খুচরোর খোঁজ, অতএব পূর্ণিমার ব্যাগ এগিয়ে আসে। কখনো রমা গেছে নাইতে, আর পূর্ণিমার ব্যাগ আছে সপ্রতিভভাবে হাতের কাছে। রমার আপত্তিটা বলবৎ রইলই, কিন্তু শুধু যেন কয়েকটা বিশেষ অবস্থায় ব্যাগটা কাজে লাগতে লাগল। প্রিয়রঞ্জনও লক্ষ্য করলেন না এমন নয়। কিন্তু তর্ক বা জেদাজেদি তাঁর ধাতে নেই। দু'এক বার মৃদুগম্ভীর আপত্তি করে চুপ করে গেলেন।

পূর্ণিমার যে অসুস্থতার সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল তার অনেক ব্যাখ্যান শোনা গেল বটে, কিন্তু বিশেষ কোন লক্ষণ রমা বা প্রিয়রঞ্জনের চোখে পড়ল না। ওদের বাড়ীতে একটি মাত্র বুড়ী ঝি ঠিকে কাজ করে দেয়, তার ভরসা না রেখে পাড়াপড়শীর ঝি-চাকরকে বাধ্য করে পূর্ণিমা বাজার-হাটের সঙ্গে এই নিরালা বাড়ীর একটা সক্রিয় যোগ স্থাপন করে নিয়েছে।

প্রিয়রঞ্জন এমন একটা সমস্যার কথা কখনো ভাবতেও পারেন নি। এ তো শুধু এসে থাকা নয়, এ যেন সামরিক পরিভাষায় 'অকুপেশন'। কর্ত্তা হিসাবে তাঁর মান ক্রমেই বাড়ছে, তাঁর বৈকালিক জলখাবারই যেন একটা অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তিনিই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছেন।

সৌভাগ্যক্রমে প্রিয়রঞ্জনের চরিত্র একমুখী পথের মত নয়। যা হবেই তাকে মেনে নেবার, অন্ততঃ মনে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা তাঁর আছে। মনের এজলাসে তিনি নজীর তলব করলেন নিজের অতীত ছাত্রজীবন থেকে। তিনি বরাবরই আহারে বিহারে আচরণে বাহুল্যকে বর্জ্জন করে এসেছেন। এমন কি কিশোরকালেই তিনি স্কুলের রচনায় অনাবশ্যক স্ফীতিকে এড়াতে শিখেছিলেন। কিন্তু কয়েকজন বন্ধুর উদ্দাম সান্নিধ্যে তাঁর থার্ড ইয়ারটা কেটেছিল একেবারে অন্যরকম ভাবে। সেই সময় জেনেছিলেন ঊর্দ্ধশ্বাস জীবন কাকে বলে, কেমন করে বুভুক্ষার অসংখ্য শেকড়-সুতো মেলে স্রোতে ভেসে যাওয়া যায় জলজ গাছের মত। সেই অভিজ্ঞতায় ক্ষতি নয়, বরং লাভই হয়েছে। সেই যে নানা রকম মাথার তেল, সাবান, টুথপেষ্ট ইত্যাদির সঙ্গে প্রথম পরিচয়, সেই সিনেমায় হোটেলে সহজ বিচরণের অধিকার, সেই রাশি রাশি বাজে কথা ও অর্থহীন আলাপে নৈপুণ্য—*এ সবেরই প্রয়োজন ছিল। ঐ এক বছরের সঞ্চারীটি ছিল বলেই জীবনের সহজ অস্থায়ীতে* স্থিতি পেয়েছেন। তাঁর সংসারে শ্যালিকার এই অর্থনৈতিক আক্রমণ—তাঁর কাছে একটা সাময়িক বিরক্তিকর ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়। দ্বিতীয় বার যদি কখনও এর পুনরাগমন ঘটে, তিনি আর এই পালার পুনরভিনয় হতে দেবেন না এ কথা নিশ্চয়। তবে রমা ও ছেলেমেয়েদের কাছে এর গুরুত্ব আছে। এ অভিজ্ঞতা ওদের কাজে লাগবে।

রমাকে লক্ষ্য করে প্রিয়রঞ্জন মৃদু মৃদু হাসেন। বিকালে জলখাবারের প্রস্তাব চিরকাল সে হেসে উড়িয়েছে, আজকাল দিদির জেদে তাকে খেতে হচ্ছে লুচি তরকারি এবং তাও খুব অল্প পরিমাণে নয়। দীপু কখনও যা করত না তাই করছে। সকালে বিকালে ভরাপেট জলখাবার খেয়ে আবার উসখুস করে মুখরোচক কিছু খাবার জন্যে। সেদিন স্কুলে বেরিয়ে যেতে যেতে শুনলেন, আরতি মাকে কাঁদছে, মা সাবান ফুরিয়েছে, নাইতে যাবো কি করে ? রমাও একদিন বেশ এক মজা করলে। ইদানীং প্রিয়রঞ্জনের সঙ্গে কথাবার্ত্তার সুযোগই যেন ঘটছিল না। হঠাৎ রবিবার দুপুরে ঘরে এল এবং অন্তরঙ্গতার মধ্যে ধরা না দিয়ে মিটিং-এ প্রস্তাব আনার মত সুরে কতকগুলো কথা বলে গেল, যথা—সকালে এক এক দিন দুধ ফুরিয়ে যায়, একটা টিনের দুধ এনে রাখলে হয়। জুতোঝাড়া বুরুশ নেই, ছেলেদের জুতো সব আঁস্তাকুড় হয়ে রয়েছে। আর রকের দেয়ালে একটা পেগ খাটিয়ে দিলে হয়। গামছাগুলো সব দড়িতে ঝুলছে। আর বেশী পয়সা লাগবে না বলেই বলছি, মাটির সরা খুরি করে ধুপধুনো দেওয়া হচ্ছে পেতলের এক রকম পাওয়া যায়, যদি চোখে পড়ে তো এনো।

প্রথমটা প্রিয়রঞ্জন ছিলেন নির্লিপ্ত দর্শক। চরিত্র নিজের জোরে দাঁড়াক ঘটনাকে হারিয়ে দিয়ে—এমনি যেন তাঁর ভাবটা।...আমি তো পারিই এদের মনমেজাজকে উঁচু করে তুলে ধরতে, লুটিয়ে-পড়া লতার ডালকে মালী যেমন তুলে বাঁধে। কিন্তু জোরটা ওদের ভেতর থেকেই আসা চাই। এখন শুধু অপেক্ষা করা দরকার। এক সময় না এক সময় তফাৎটা রমার নজরে পড়বেই, হঠাৎ চমক ভেঙে সে কি দেখবে না বাইরের উদ্যোগ উত্তেজনা যে পরিমাণে বেড়েছে, ভেতরের সুখশান্তি সেই পরিমাণে কিকে হয়ে এসেছে ?

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই ধৈর্য্য রক্ষা করা সম্ভব হ'ল না। এর প্রধান কারণ পূর্ণিমার ছেলে হাবলু। তার শ্রীহীন মুখের অকালপক্বতা, সব কাজে কথায় মুরুব্বিয়ানা সহ্য করা শক্ত। তার রকমসকম দেখলেই একটা প্রচণ্ড ধমক প্রিয়রঞ্জনের মনে ঘুরপাক খেতে থাকে। সব চেয়ে অসহ্য এই যে, তার অভব্য

ভাবভঙ্গীর ঘষটানি লেগে দীপুর স্বভাবও যেন তার লাবণ্য হারাচ্ছে। ফুটো কতুয়া বা গেঞ্জি পর পর গায় দিয়ে অল্প শীতকে চমৎকার ঠেকানো যায় এই ফন্দী তিনিই শিখিয়েছেন ছেলেমেয়েদের। তাই নিয়ে ঠাট্টা করে হাবলু দীপুর মনে ঢুকিয়েছে একটা অস্বাভাবিক সঙ্কোচ। ফুটো বালতিটা আজকাল আর ওরা ব্যবহারই করতে চায় না। হাবলুর ঠাট্টায় সেই ফুটোর কৌতুকটা সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে, আছে শুধু ফুটোটাই। এমন কি প্রিয়রঞ্জনের প্ল্যান অনুযায়ী দীপুর স্কুলে বই নিয়ে যাওয়ার যে থলিটি তৈরি করেছিল রমা, হাবলুর বিদ্রূপে দীপুর চোখে তার এমন রূপহানি ঘটেছে যে সে কিছুতেই আর সেটা নিয়ে স্কুলে যেতে রাজী নয়।

প্রিয়রঞ্জন নির্লিপ্ত সাক্ষীর ভূমিকা ত্যাগ করলেন। মনে মনে বিচার করলেন যারা একেবারে নাবালক, এমন পরীক্ষার সামনে তাদের বিনা সাহায্যে কি করে ছেড়ে দেওয়া যায়? আর তিনি নিজের জীবনযাত্রাকেই বা বিব্রত হতে দেবেন কেন শুধু চক্ষুলজ্জায়? হোক না তা মাত্র দুই-এক মাসের জন্যে।

অতএব তিনি নিজের আহারে ব্যবহারে পুরনো ব্যবস্থাগুলির পুনঃপ্রবর্ত্তন ঘটিয়েছেন, পূর্ণিমার অনুরোধ হেসে উড়িয়েছেন। রমাকে বলে দিয়েছেন, তোমরা যেমন করছ কর, আমার আগে যেমন ব্যবস্থা ছিল ঠিক তাই হবে। দীপু আরতিকে মাঝে মাঝে আড়ালে ডেকে বোঝান, ধমক দেন।

এক দিন ঘটল একটা অশুভিকর ঘটনা ঐ হাবলুকে নিয়েই।

স্কুল থেকে বাড়ীতে পা দিয়েই প্রিয়রঞ্জন দেখেন তিনি নিজে নানা রকমের ছবি জোগাড় করে আটা দিয়ে এঁটে দীপু-আরতির জন্যে যে বাঁধানো ছবির বই তৈরি করে দিয়েছিলেন সেটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সামনের উঠানে। ডাক দিলেন, দীপু, এ বই এখানে কেন?

ঐটে ব্যাট করে হেবলোদা বল খেলছিল।

হাবলু নিজে এসেই দাঁড়িয়ে ছিল। বললে, ওতো একটা বাজে ছবির বই। আমি দীপুকে একটা চমৎকার ছবির বই পাঠিয়ে দেব এখন। তাতে সে যা সব—

প্রিয়রঞ্জন দীপুর গালে এক চড় দিলেন—ও না হয় জানে না, তুমি জান না?

দীপুর মাসি এসে পড়ল, আহা মারছেন কেন?

হাবলু বললে, বলছি এর চেয়ে ঢের ভালো বই দোব। আর ও বই ত লেই দিয়ে ছবি জুড়ে জুড়ে তৈরি, এক পয়সাও দাম নয়।

প্রিয়রঞ্জনের বহুদিনের আটকানো সেই ধমকটা বেরিয়ে গেল—'চুপ'! সেই বিস্ফোরণের উগ্রতায় হাবলু দীপু পূর্ণিমা রমা যতটা চমৎকৃত হ'ল তিনি নিজে হলেন তার চেয়ে বেশী।

এর পর থেকে বাড়ীর আবহাওয়ায় একটা কৌতুকজনক পরিবর্ত্তন দেখা গেল। পূর্ণিমা হাবলুকে থেকে থেকে সাবধান করতে লাগল, এই এটা করিস নি, ওদিকে যাস নি।—রমা প্রিয়রঞ্জনের পছন্দ-অপছন্দ সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সতর্কতা দেখাতে লাগল এবং প্রিয়রঞ্জনের অনুপস্থিতিতে দিদির কাছে নিজের ভাগ্যের আলোচনা তুলল। প্রিয়রঞ্জন মাঝে মাঝে প্রস্তাব করতে লাগলেন, কৈ, বিকেলে একটু ভাল খাবার-দাবার হচ্ছিল বন্ধ হয়ে গেল কেন? পূর্ণিমাকে বললেন, এই শুনি কড়াইশুঁটির কচুরি তৈরি করায় আপনার নামডাক, সে কি শুধু কানে শোনাই থাকবে?

অবশেষে এক দিন পূর্ণিমারা চলে গেল কলকাতায়।

৩

রমা ভেবেছিল পূর্ণিমারা চলে যাবার পরই একটা আলোচনার সূত্রপাত হবে। দু' তিনি দিন কেটে গেল, তেমন কিছুই হ'ল না। রমা নিজেই কয়েকবার 'আঃ, বাঁচা গেছে', 'কানমাথা জুড়িয়েছে' একটু ইত্যাদি মন্তব্য করে প্রিয়রঞ্জনকে আলোচনা আরম্ভ করবার সুযোগ দেয়, প্রিয়রঞ্জন কিন্তু কোন কথা উত্থাপন করেন না। ছেলেমেয়েরাও কি একটা প্রত্যাশায় ছিল যেন, আস্তে আস্তে বাবাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু সেখান থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

প্রিয়রঞ্জনের অন্যমনস্কতার একটা কারণ স্কুলের কাজের চাপ। একজন শিক্ষক ছুটি নিয়েছেন, কিছুদিনের জন্যে তাঁর ক্লাসগুলোও প্রিয়রঞ্জনকে নিতে হচ্ছে। নতুন করে, সূক্ষ্ম করে ভাববার কিছু নেই, অথচ অবিশ্রাম মাথা খাটানো, এ যেন বুদ্ধির এক ধরণের দিনমজুরি খাটা। সেদিন ছুটির পর বাইরে এসে প্রিয়রঞ্জন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন—বাইরের জগতে অন্ততঃ কারও ভুল সংশোধনের দায়িত্ব তাঁর নেই। তখনি মনে হ'ল কিন্তু তাঁর নিজের সংসার?

বাড়ী ফিরতেই একটা অপ্রত্যাশিত শান্তির আবহাওয়া তাঁকে যেন দুই হাত বাড়িয়ে ডেকে নিলে। আরতি দীপু ঠিক আগেকার মতই ফুলগাছে জল দিচ্ছে, তাদের কলকল কথায়, তুচ্ছ ঝগড়ায় সেই পুরনো স্নিগ্ধ জীবনটি আবার যেন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছে।

মুখ হাত ধুয়ে অভ্যাসমত বাইরের চেয়ারে এসে বসলেন। খাবার, চা খেয়ে নিস্তব্ধ হয়ে অনুভব করতে লাগলেন তাঁদের সংসার-জীবনের সেই রূপটিকে যা এই বাড়ীঘর বাগানে এই ক'টি মানুষের হৃদয়ের দানে দিনে দিনে গড়ে উঠেছে। ক' মাসের গোলমালে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, আবার বেরিয়ে এসেছে। নিজের আশঙ্কার কথা ভেবে প্রিয়রঞ্জনের কৌতুক বোধ হ'ল।

রমা এসে বসল সেখানে। আঃ, কি হৈ চৈ গেল এ দু'মাস। দুপুরে খানিকটা চুপচাপ শুয়ে থেকে বাঁচলাম।

প্রিয়রঞ্জন বললেন, তারও লেগেছে নিশ্চয়। একলা পড়ে

থাক, খাওয়াদাওয়াও চিরকাল এক রকম। এ তবু একটু রকমারি হ'ল ত ?

—দরকার নেই অমন রকমারির। শুধু দিদি হ'ত সে এক রকম। যা ছেলেপুলে তৈরি করেছে দিদি—বাবাঃ, আমি বলে তাই। অন্য কেউ হলে···। আরতি দীপুকে বিগড়ে দিয়েছে ওরা।

এ সম্বন্ধে আর আলোচনা হ'ল না।

কিন্তু পূর্ণিমার প্রভাব মাঝে মাঝে দেখা দিতে লাগল স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের চালচলনে। পূর্ণিমার দেওয়া জামা-কাপড় সময় সময় ওদের গায়ে ওঠে, সেও প্রিয়রঞ্জনের খারাপ লাগে, যদিও তিনি বোঝেন যে সেগুলো ফেলে দেওয়া যায় না। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে যেন ওরা নতুন অধিকার পেয়ে গেছে। আরতির সাবান তেল, দীপুর বিস্কুট টফি—এসব আগে আসত কখনও-সখনও, ওদের মনে জাগাত একটা খুশির উচ্ছ্বাস। এখন ওগুলো যেন ওদের দাবির মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে।

রমাও এখন অসঙ্কোচে এসে বলে, মাথার চুল উঠে উঠে শেষ হয়ে যাচ্ছে, একটা কোন ভাল তেল আনলে হয়। কিংবা, টেবিলটা যা হয়ে থাকে, খানিকটা একরঙা কাপড় এনে দিলে কভার করে দিই। দৈনিক বাজারের ফর্দে অনায়াসে লেখে ফুলকপি ছটো, কড়াইশুঁটি এক সের ইত্যাদি। প্রিয়রঞ্জনকে শোনায়, মাছটা বাপু প্রতিদিন আনাই ভাল। মাছের ঝোল না হলে ছেলেমেয়ের খাওয়াই পুরো হয় না। মাসকাবারের ফর্দেও দেখা গেল হাতের অক্ষর রমার, কিন্তু রুচি ও নজর পূর্ণিমার।

প্রিয়রঞ্জন আহত হলেন, কিন্তু প্রতিবাদ করলেন না। ভাবলেন সুযোগমত বুঝিয়ে বলবেন। বলবেন অপর এক পরিবারের রুচির খাতিরে যা হতে দিয়েছেন তা কিছুকাল হয়েছে বলেই যে পাকাপাকিভাবে চলতে থাকবে এমন কোন কথা নেই। বলবেন, টাকা খরচের অঙ্ক বাড়ালেই জিনিষের আমদানি বাড়ে, সুবিধাও খানিকটা বাড়ে নিশ্চয়, কিন্তু সুবিধা আর সুখ এক কথা নয়। কিন্তু কেমন একটা অভিমানে একথার অবতারণার সময় কেবলই পিছিয়ে যেতে লাগল। আবার ধার নিতে হ'ল স্কুলের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে।

ইতিমধ্যে খানিকটা সন্তোষের কথা এই যে দীপু আর আরতি আবার তাদের অল্পকালের বিভ্রান্ত দৃষ্টি মিলিয়ে নিয়েছে বাপের দৃষ্টির সঙ্গে। শিশুমনের আশ্চর্য্য সহজ সহানুভূতির দ্বারা ওরা পুরনো রীতি আর অনুভূতিগুলিকে সম্পূর্ণ উদ্ধার করেছে।

সেদিন সকালে উঠেই প্রিয়রঞ্জন দেখেন রমা বালতি করে পুকুর থেকে রান্নার জল আনছে। এর মধ্যেই তার স্নান হয়ে গেছে। গুন্ গুন্ করে কি একটা গান গাইছিল আপন মনে, প্রিয়রঞ্জনকে দেখেই হেসে ফেলল। প্রিয়রঞ্জনের মন হঠাৎ যেন নিজের ভুল বুঝতে পারলে। এই রমার ওপর অভিমান ক'রে থাকার কোন মানে হয় ? সেও যে অনেকটা দীপু আরতিরই মত। কোথায় তিনি তাকে সস্নেহে নিজের মনের সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন, না রাগ করে বসে আছেন। তাঁর আর্থিক ক্ষমতার খবর ও জানবে কি করে ? কি করে বুঝবে তার প্রসারক্ষমতা ঠিক কতটা। সারাদিন একটা প্রফুল্ল প্রত্যাশা জেগে রইল প্রিয়রঞ্জনের মনে। আর নয়, আজই স্কুল থেকে ফিরে ঘুচিয়ে দেবেন এই আড়ষ্টতাটুকু।

সম্প্রতি বাগানের পুবদিকের বড় আমগাছটার ডাল থেকে পাটের দড়ি ঝুলিয়ে তাতে একটা পিঁড়ি বেঁধে প্রিয়রঞ্জন দোলা খাটিয়ে দিয়েছেন। ভাইবোনের উৎসাহ আর ধরে না। স্কুল থেকে এসেই প্রিয়রঞ্জন একবার ওদের বাহাদুরি দেখতে দাঁড়িয়ে যান। আজ দেখেন দোলনার কাছে ওরা নেই। ভেতরে দালানে দাঁড়িয়ে খুঁত খুঁত করছে, খাবার পায় নি এখনো। জিজ্ঞাসা করতে রান্নাঘর থেকে রমা উত্তর দিলে, মুড়ি আছে খাক্ না···

ছেলেমেয়ে কান্নার সুরে বললে, শুধু মুড়ি খাওয়া যায় ?

রমা ঝাঁঝিয়ে উঠল, তোমাদের জন্যে সিঙ্গাড়া পান্তুয়া আসবে কোন্ চুলো থেকে ?

প্রিয়রঞ্জন হাসিমুখে বললেন, তুমি কি গিন্নিপনা সব ভুলে গেলে রমা ? ঘরে লাল আলু নেই ? তাই কয়েকটা ভেজে দাও না।

এ প্রস্তাবে আরতি দীপুর মুখে হাসি ফুটল। কিন্তু রমা উত্তর দিলে, বেশ, তাই বলে দিও কোন্‌দিন খাসপাতা দিয়ে কি তৈরি করে রাখতে হবে। দু'দিন সব একটু ছিরি ফিরেছিল, আবার যে দেশের ছেলেমেয়ে সেই রকমই হোক।

তাঁদের বারো বছরের বিবাহিত জীবনের মধ্যে আজ প্রথম প্রিয়রঞ্জনের মনে হ'ল রমার কথা অস্পষ্ট নয় এবং তাতে জোরেরও অভাব নেই। এই কথার মধ্যে দিয়ে তার বক্তব্য তো সম্পূর্ণ প্রকাশ হয়েছেই, এমন কি তার স্বভাব ও রুচির যে অংশ ছিল প্রিয়রঞ্জনের ধারণার অতীত, তাও প্রকাশ পেয়েছে বিদ্যুৎ-চমকে। এক মুহূর্তে প্রিয়রঞ্জন বুঝলেন রমা পূর্ণিমারই বোন—তাই ছিল এবং এই বারো বছর স্বামীর ঘর করবার পরও তাই আছে।

বাইরে এসে বসলেন টিনের চেয়ারে। যথাসময়ে এল মুড়ি ও লাল আলু ভাজা। পাছে কথার সৃষ্টি হয় তাই আস্তে আস্তে সেই খাবার খেলেন। তাঁর এতদিনের সংসার-রচনার চেষ্টাকে মনে হ'ল একটা নিষ্ঠুর প্রহসনের মত। আজ স্পষ্ট দেখতে পেলেন তাঁর এই চেষ্টা রমা নিয়েছে আগ্রহের

সঙ্গে নয়, কিন্তু শিষ্টতা বজায় রেখে। মুখে সে হাসি ফুটিয়েছে, কিন্তু তার মনে ফুটেছে নীরব টিপ্পনী।

একটা নিঃসহায় ভাব যেন প্রিয়রঞ্জনের জীবনের ভিত্তি আল্‌গা করে তুলল।

এইবার ভেতরে এস, বুঝলে? ঠাণ্ডা লাগবে···

ঘরের ভেতরকার মৃদু আলোয় রমার মুখের রেখাগুলি চিকমিক করে উঠল। রমার চেহারায় একটা মোলায়েম পুষ্টির লাবণ্য এসেছে। সন্দেহ নেই এই কয় মাসের ব্যয়বাহুল্যের সঙ্গে এই কমনীয়তার সম্বন্ধ আছে। আরতি দীপুর চেহারায়ও কিছু বদল হয়েছে মনে হ'ল প্রিয়রঞ্জনের। একটা নতুন দিক থেকে হঠাৎ দেখলেন সমস্ত ব্যাপারটাকে। হয়তো ওদের বয়স, ওদের শরীর মনের প্রকৃতির পক্ষে তাঁর প্রেসৃক্রিপশনমত জীবনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নয়।···আমার শরীর দিয়ে আমি ওদের শরীরের চাহিদা কি জানি, আমার মন দিয়ে ওদের মন? মনে মনে বলতে লাগলেন প্রিয়রঞ্জন।

শীতের রাতের তারার আলোয়, প্রিয়রঞ্জন দেখলেন, তাঁর বাড়ী-বাগান যেন অন্ত কি রকম দেখাচ্ছে। যেন অচেনা, যেন আর কারও বাড়ী, তাঁর নিজের নয়।

দূর-গত বিভূতিভূষণ

শ্রীমহাদেব রায়

দিব্যদীপ সহসা স্তিমিত,
দেবযানে গত মহাপ্রাণ,
নীরবে কাঁদিল ব্যথাহত
গৃহে গৃহে শত শত প্রাণ।
এনেছিলে রসের সন্ধানী,
যে নূতন রস-দৃষ্টি তব,
তারই বলে, হে রূপ-বিজ্ঞানী,
'তুচ্ছে' দিলে রস-রূপ নব।
মহীরুহ হ'তে গুল্মবন
ধরা দিল অপরূপ রূপে,
ভুলাইল তোমার নয়ন
নব বৃন্দাবনের স্বরূপে।
পরশমণির স্পর্শ দিয়া
লোহে যত করিলে কাঞ্চন,
ক্ষুদ্রে হেরি বিরাটের হিয়া
ধন্য হ'ল রস-লুব্ধ মন।
নব ভাব-রসের কিশোর,
বহি বক্ষে দূরের পিপাসা,
'পাঁচালী'র সৌন্দর্যে বিভোর
কারে যেন করিছ জিজ্ঞাসা—
'কতদূরে সুন্দরের দেশ,
যার তরে লুব্ধ এ নয়ন?'
'দৃষ্টি'র 'প্রদীপে' নির্নিমেষ
করেছ তাহারই অন্বেষণ।
যাযাবর হে অরণ্যচারী,
অরণ্যের মর্মভাষাজ্ঞানী,
কাব্যে প্রাণ দিয়াছ সঞ্চারি
জাগাইয়া সুপ্ত বন-বাণী।

সেথা তুমি নব কালিদাস
প্রকৃতির নবরূপ-ধ্যানী,
জড়ে দিব্য রস-অবভাস
আবিষ্কার করিলে সন্ধানী।
স্বর্গ-মর্ত্যে সোপান রচনে
হতাশ্বাস কবি কৃত্তিবাস,
মর্ত্যে সেই অসাধ্য-সাধনে
জাগাইলে তুমিই বিশ্বাস।
যে দূরের অনন্ত-তৃষায়
আ-শৈশব অভিযান নব,
মিলিয়াছে সার্থক-যাত্রায়
'দেবযানে' তৃষাহর তব।
তবু কোন 'মাধ্যম'-মাধ্যমে
জানি তুমি আসিবে না ফিরে,
শত প্রাণ তাই ক্ষুব্ধমনে
কাঁদে শুধু স্মৃতিটুকু ঘিরে।
ভাব-রাজ্যে যে ঐশ্বর্য-বলে
পার্থিব সম্পদে গেলে দলি,
সে ভুলাবে তোমায় সবলে
এ ধরার সম্পর্ক সকলই।
মর্ত্যযান হ'তে দেবযানে
ব্যবধান তাই আজিকার,
বক্ষে তীব্র শেলাঘাত হানে,
হারাইনু সে সঙ্গ তোমার।
দূরের পথিক বন্ধুবর,
হয়েছিলে একান্ত আপন,
লহ নতি হে কবি অমর,
দূর-গত বিভূতিভূষণ।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

বুদ্ধ এবং বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্মের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় —বাল্যকালে রবীন্দ্র-সাহিত্যে। যেদিন রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা কবিতায় প্রথম পড়লাম—

প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি
ওগো পুরবাসী কে রয়েছ জাগি
অনাথপিণ্ডদ কহিলা অম্বুদ-
নিনাদে।
সদ্য মেলিতেছে তরুণ তপন
আলস্যে অরুণ সহাস্য লোচন
শ্রাবস্তীপুরীর গগন লগন
প্রাসাদে।

সেদিন মনের মধ্যে যে কি এক অপূর্ব ভাবের উদয় হয় তা বলবার নয়।

বুদ্ধ—অনাথপিণ্ডদ এবং শ্রাবস্তী, বৌদ্ধধর্মের সূত্রে সূত্রে এই নামগুলি গাঁথা আছে। কোন একটি বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের পাতা উল্টান দেখবেন—এবং ময়া শ্রুতং তস্মিন্ সময়ে ভগবান্ শ্রাবস্ত্যাং বিহরতি স্ম, জেতবনে অনাথপিণ্ডদস্য আবাসে—অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধ তখন শ্রাবস্তীতে জেতবনে অনাথপিণ্ডদের উপবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই বুদ্ধ —শ্রাবস্তী এবং অনাথপিণ্ডদের কথা পেলাম কৈশোরের প্রারম্ভে—রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'তে :

কৈলাসশিখর হতে দূরাগত
ভৈরবের মহাসঙ্গীতের মত
সে বাণী মন্দ্রিল সুখতন্দ্রারত
ভবনে।

আমাদের শিশুমনের সুখতন্দ্রারত ভবনেও রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি দূরাগত মহাসঙ্গীতের মত প্রবেশ করেছিল। শিশুমনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আঘাত করে এ এক অপরূপ সুরজাল রচনা করেছিল।

রাজা জাগি ভাবে বৃথা রাজ্যধন
গৃহী ভাবে মিছা তুচ্ছ আয়োজন
অশ্রু অকারণে করে বিসর্জন
বালিকা।

এই সুললিত ভাষা, বিচিত্র ছন্দ এবং রহস্যময় ভাবের আস্বাদ পেয়ে আমাদেরও কি চোখের কোণে অশ্রু জমে নি!

ফেলি দিল পথে বণিক ধনিকা
মুঠি মুঠি তুলি রতন কণিকা
কেহ কণ্ঠহার মাথার মণিকা
কেহ গো।
ধনী স্বর্ণ আনে থালি পুরে পুরে
সাধু নাহি চাহে পড়ে থাকে দূরে
ভিক্ষু কহে—"ভিক্ষা আমার প্রভুরে
দেহ গো।"

শিশুমনের সে কি বিস্ময়! সে কি অপূর্ব কৌতূহল! এ কেমন ভিক্ষুক! কেমন বা তার প্রভু। স্বর্ণ মণি-মাণিক্য —যা সর্বজনকাম্য, সর্বশ্রেষ্ঠ ধন তা অগ্রাহ্য করে চলে যায়!

তারপর যখন রাজা, শেঠ, বণিক, ধনিক সকলেই মাথা হেঁট করে ফিরে গেল, যখন সেই স্বর্ণ-মণিমাণিক্যে পূর্ণ বিশাল শ্রাবস্তী নগরীর পথ অতিক্রম করে অনাথপিণ্ডদ পুরপ্রান্তে কাননে প্রবেশ করলেন তখন—

দীন নারী এক ভূতল শয়ন
না ছিল তাহার অশন ভূষণ
সে আসি নমিল সাধুর চরণ-
কমলে।
অরণ্য আড়ালে রহি কোনমতে
একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে
ভূতলে।
ভিক্ষু ঊর্ধ্বভুজে করে জয়নাদ
কহে ধন্য মাতঃ, করি আশীর্বাদ
মহা ভিক্ষুকের পুরাইলে সাধ
পলকে।
চলিলা সন্ন্যাসী ত্যজিয়া নগর
ছিন্ন চীরখানি লয়ে শিরোপর
সঁপিতে বুদ্ধের চরণ-নখর
আলোকে।

আশ্চর্য! অদ্ভুত! যেমন মহাভিক্ষুক তেমনই তাঁর শিষ্য! ঐ ছিন্নবস্ত্রখানায় কার কি লাভ হ'ল। তার চেয়ে ঐ স্বর্ণ ও মণিমাণিক্য সংগ্রহ করলেই তো লোকের যথার্থ উপকার হ'ত!

শিশুর কাছে এই কবিতার ভাব কি স্পষ্ট হয়েছিল? সে কি এর অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝেছিল? সম্ভব নয়! কিন্তু তাই বলে সে কি এতে কম আনন্দ পেয়েছিল? এই কিছু বোঝা, কিছু না-বোঝার রহস্যই তাকে গভীর আনন্দ দিয়েছিল। বসন্তে সূর্যপ্রদীপিত রৌদ্রঝলকিত পৃথিবীর সুস্পষ্ট রূপের চেয়ে শ্রাবণে ঘনঘোর ঘটাচ্ছন্ন অস্পষ্ট রূপ কি কম আনন্দ দেয়?

সেই ধনধান্যে ভরা শ্রেষ্ঠী বণিকের আবাসভূমি শ্রাবস্তীপুরীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে। দুর্ভিক্ষের প্রতিকারের জন্য বুদ্ধ সকলের নিকট আবেদন করলেন। এবারও রাজা, শেঠ, বণিক সকলেই পিছিয়ে পড়লেন। এগিয়ে এলেন আবার সেই অনাথপিণ্ডদের এক কন্যা।

রহে সবে মুখে মুখে চাহি
কাহারো উত্তর কিছু নাহি

নির্বাক সে সভাঘরে ব্যথিত নগরী পরে
বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যাতারাসম রহে ফুটি।

যখন ব্যথিত জনগণের দুঃখে মহাকারুণিকের করুণ আঁখি দুটি সমবেত সকলের মুখের পানে সন্ধ্যাতারার ন্যায় চেয়ে রইল,

তখন উঠিল ধীরে ধীরে
রক্তভাল লাজনম্রশিরে
অনাথপিণ্ডদসুতা বেদনায় অশ্রুপ্লুতা
বুদ্ধের চরণরেণু লয়ে'
মধুকণ্ঠে কহিল বিনয়ে :—
"ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া
তব আজ্ঞা লইল বহিয়া
কাঁদে যাঁরা অন্নহারা আমার সন্তান তারা
নগরীর অন্ন বিলাবার
আমি আজি লইলাম ভার।"

'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা'র ন্যায় এবারও দেখা গেল ধনিকের চেয়ে এক অভাজনের শক্তি বেশী। এই 'কথা ও কাহিনী'তেই বৌদ্ধধর্মের আর এক অপূর্ব শিক্ষা লাভ করলাম "মস্তক বিক্রয়" কবিতাটিতে।

দীনের রক্ষক, দুর্বলের প্রতিপালক কোশল-নৃপতির যশোগান শুনে ঈর্ষা-জর্জরিত কাশীরাজ কোশলরাজ্য আক্রমণ করলেন। কোশল-নৃপতির রণে পরাজয় ঘটল। তিনি রাজ্যহীন হয়ে বনে গেলেন।

এদিকে কাশীর রাজা ঘোষণা করলেন—যে কোশল-রাজকে ধরে এনে দেবে, তাকে এক শত মোহর পুরস্কার দেওয়া হবে।

রাজ্যহীন রাজা গহনে ফিরে
মলিন চীর দীন বেশে
পথিক একজন অশ্রুনীরে
একদা শুধাইল এসে
"কোথা গো বনবাসী বনের শেষ
কোশলে যাব কোন্ মুখে?"
শুনিয়া রাজা কহে—"অভাগা দেশ
সেথায় যাবে কোন্ দুখে?"

সেই পথিক ছিলেন এক বণিক, বহু ধনের মালিক। কিন্তু তাঁর বাণিজ্যতরী ডুবে যাওয়ায় তিনি সর্বস্বান্ত হন। কোশলরাজের নাম এবং তাঁর দানধ্যানের কথা তাঁর শোনা ছিল, তাই বহু আশা করে তিনি কোশলরাজ্যে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এদিকে যে কোশলরাজ্যে অঘটন ঘটেছে, সে সংবাদ তিনি জানতেন না। বণিক যখন তাঁর দুঃখের কাহিনী বললেন তখন

শুনিয়া নৃপসুত ঈষৎ হেসে
রুধিলা নয়নের বারি
নীরবে ক্ষণকাল ভাবিয়া শেষে
কহিলা নিশ্বাস ছাড়ি'—

"পান্থ, যেথা তব বাসনা পুরে
দেখায়ে দিব তারি পথ
এসেছ বহু দুখে অনেক দূরে
সিদ্ধ হবে মনোরথ।"

অতঃপর এই পান্থের মনোরথ পূরণের জন্য কোশল-রাজ কাশীরাজের নিকট আত্মসমর্পণ করবেন স্থির করলেন। এই আত্মসমর্পণের অবশ্যম্ভাবী ফল মৃত্যু। তথাপি সমস্ত জেনে শুনেই তিনি এই সিদ্ধান্ত করলেন। উদ্দেশ্য বণিকের উপকার করা!

পাত্রমিত্র-পরিবৃত কাশীরাজ সিংহাসনে বিরাজ করছেন। অকস্মাৎ সম্মুখে এক জটাজুটধারীর আগমন। রাজসভায় অপরূপ বেশধারী এক ব্যক্তিকে উপস্থিত হতে দেখে রাজা বিদ্রূপের হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—"কোন্ কাজে হেথায় আগমন হয়েছে?"

"কোশলরাজ আমি বনভবন"
কহিলা বনবাসী ধীরে
"আমার ধরা পেলে যা দিবে পণ
দেহ তা মোর সাথীটিরে।"
উঠিল চমকিয়া সভার লোকে
নীরব হোলো গৃহতল
বর্ম-আবরিত দ্বারীর চোখে
অশ্রু করে ছলছল।

যে কেহ এই কাহিনী পাঠ করে, তারই চোখ ছলছল করে উঠে! রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে এই এক অপরূপ রাজ্যের সন্ধান পেয়েছিলাম আমরা শৈশবেই!

ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠে আরও অগ্রসর হলাম। এই অপূর্ব রাজ্যের বীথিতে বীথিতে অলিতে-গলিতে অনেক নয়নলোভন চিত্ত-বিমোহন বস্তুর সন্ধান পেলাম :

বহে মাঘ মাসে শীতের বাতাস
স্বচ্ছসলিলা বরুণা
পুরী হতে দূরে গ্রামে নির্জনে
শিলাময় ঘাট চম্পকবনে
স্নানে চলেছেন শত সখী সনে
কাশীর মহিষী করুণা।

এই অপরিচিতা কাশীরাজ-মহিষীর শত সখীর সঙ্গে সঙ্গে মাঘ মাসের শীতের বাতাসে নগর হতে দূরে, এক নির্জন গ্রামে, স্বচ্ছসলিলা বরুণা নদীর সুগন্ধি সুবর্ণকান্তি চম্পকবন পরিবেষ্টিত শিলাময় ঘাটে আমাদের শিশুচিত্তও স্নানে চলল!

আজি উতরোল উত্তর বায়ে
উতলা হয়েছে তটিনী
সোনার আলোক পড়িয়াছে জলে
পুলকে উছলি ঢেউ ছলে ছলে
লক্ষ মাণিক ঝলকি আঁচলে
নেচে চলে যেন নটিনী!

স্বচ্ছসলিলা বরুণারই মত স্বচ্ছন্দ গতিতে রবীন্দ্রনাথের ছন্দের তটিনী প্রবাহিত হয়ে চলল :

ঘনঘোর ধূম ঘুরিয়া ঘুরিয়া
ফুলিয়া ফুলিয়া উড়িল।
দেখিতে দেখিতে ধূম্রবিদারী
ঝলকে ঝলকে উল্কা উগারি
শত শত লোল জিহ্বা প্রসারি
বহ্নি আকাশ জুড়িল।
পাতাল ফুঁড়িয়া উঠিল যেন রে
জ্বালাময়ী যত নাগিনী
ফণা নাচাইয়া অম্বরপানে
মাতিয়া উঠিল গর্জনগানে
প্রলয়মত্ত রমণীর কানে
বাজিল দীপক রাগিণী।

রাজমহিষীর ক্ষণকালের শীত নিবারণের জন্য একখানি গ্রামের সব ক'টি কুটির ভস্মীভূত হ'ল।

রাজদ্বারে ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের অভিযোগে চিরকাল ধনীরাই একতরফা ডিক্রী পান। এখানে ঘটল বিপরীত। বুদ্ধপ্রচারিত ধর্মের সবই ভিন্নরূপ। দরিদ্র প্রজার অভিযোগে রাজা রাণীকে দারুণ দণ্ড দিলেন :

রাজার আদেশে কিঙ্করী আসি
ভূষণ ফেলিল খুলিয়া
অরুণ বরণ অম্বরখানি
নির্মম করে খুলে দিল টানি
ভিখারী নারীর চীরবাস আনি
দিল নারীদেহে তুলিয়া।
পথে লয়ে তারে কহিলেন রাজা
"মাগিবে দুয়ারে দুয়ারে
এক প্রহরের লীলায় তোমার
যে-কটি কুটীর হোলো ছারখার
যত দিনে পার সে-কটি আবার
গড়ি দিতে হবে তোমারে।"

গ্রামে মানুষ। জন্মে অবধি তেত্রিশ কোটি দেবতাকে ভক্তি করতে শিখেছি, নানা দেবদেবীর মূর্তি দেখেছি। রবীন্দ্র-সাহিত্যে সর্বপ্রথম নরদেবতার মূর্তি দেখলাম। সেই দেবতা :

বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে
নিরঞ্জন আনন্দ মুরতি,
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে স্ফুরিছে অধর 'পরে
করুণার সুধাহাস্য জ্যোতিঃ।

দেবতার দুয়ারে গিয়ে গৃহস্থ ধন, মান, পুত্র-পরিবার কত কি কামনা করে। কিন্তু এই 'দেবতা'র অপরূপ রূপ দেখে সব ভুলে গিয়ে নিনিমেষ নয়নে সে তাঁর মুখের দিকেই চেয়ে থাকে।

সুদাস রহিল চাহি নয়নে নিমেষ নাহি
মুখে তার বাক্য নাহি সরে
সহসা ভূতলে পড়ি পদ্মটি রাখিল ধরি
প্রভুর চরণ-পদ্ম 'পরে।
বরষি অমৃতরাশি বুদ্ধ শুধালেন হাসি
কহ বৎস, কী তব প্রার্থনা
ব্যাকুল সুদাস কহে, প্রভু আর কিছু নহে
চরণের ধুলি এক কণা।

এই নরদেবতা বুদ্ধকে চর্মচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নি, কিন্তু তাঁর প্রতিরূপ কি আমরা দেখি নি! বুদ্ধের ন্যায় আর একজনের—সেই

"নিরঞ্জন আনন্দ মুরতি
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে স্ফুরিছে অধর 'পরে
করুণার সুধাহাস্যজ্যোতিঃ।"

আমরা কি দেখি নাই?

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের "শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা", "মস্তক বিক্রয়", "সামান্য ক্ষতি", "মূল্যপ্রাপ্তি", "অভিসার", "পূজারিণী"র মধ্য দিয়ে, আমি বুদ্ধের মৈত্রী করুণার, সেবা ও ন্যায়ধর্মের আস্বাদ পেয়েছি।

তারপর যখন বড় হয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশের অধিকার লাভ করলাম, তখন দেখলাম, বুদ্ধ এবং বুদ্ধধর্মপ্রসঙ্গে তাঁর বহু শ্রেষ্ঠ রচনাই রয়ে গেছে।

বুদ্ধকে এবং বুদ্ধপ্রবর্তিত ধর্মকে অভিনব আলোকে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কবিতায়, গানে, নাটকে, প্রবন্ধে, কত রূপে, কত প্রসঙ্গেই না তিনি বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্মের কথা প্রকাশ করেছেন।

বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁর কি অসীম অনুরাগ! কি অপরিমেয় শ্রদ্ধা! 'বুদ্ধদেব' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

"আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে, আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি। এ কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের উপকরণগত অলংকার নয়, একান্তে, নিভৃতে যা তাঁকে বার বার সমর্পণ করেছি—সেই অর্ঘ্যই আজ এখানে উৎসর্গ করি।

একদিন বুদ্ধগয়াতে গিয়েছিলাম মন্দিরদর্শনে, সেইদিন এই কথা আমার মনে জেগেছিল—যাঁর চরণস্পর্শে বসুন্ধরা একদিন পবিত্র হয়েছিল তিনি যেদিন সশরীরে এই গয়াতে ভ্রমণ করেছিলেন, সেদিন কেন আমি জন্মাই নি, সমস্ত শরীর মন দিয়ে প্রত্যক্ষ তাঁর পুণ্য প্রভাব অনুভব করি নি!…

ভগবান বুদ্ধ একদিন রাজসম্পদ ত্যাগ করে তপস্যা করতে বসেছিলেন। সে তপস্যা সকল মানুষের দুঃখমোচনের সঙ্কল্প নিয়ে। এই তপস্যার মধ্যে কি অধিকারভেদ ছিল? কেউ ছিল কি ম্লেচ্ছ, কেউ ছিল কি আর্য? তিনি তাঁর সব কিছু ত্যাগ করেছিলেন দীনতম মূর্খতম মানুষেরও জন্যে। তাঁর সেই তপস্যার মধ্যে ছিল নির্বিচারে সকল দেশের সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা। তাঁর সেই এত বড় তপস্যা আজ কি ভারতবর্ষ থেকে বিলীন হবে?…

পাশবতার সাহায্যে মানুষের সিদ্ধিলাভের দুরাশাকে যিনি নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন, যিনি বলেছিলেন 'অক্রোধেন জিনেৎ ক্রোধং' আজ সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করে, মনুষ্যত্বের জগদ্ব্যাপী এই অপমানের যুগে, বলবার দিন এল—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।" তাঁরই শরণ নেব যিনি আপনার মধ্যে মানুষকে প্রকাশ করেছেন। যিনি সেই মুক্তির কথা বলেছেন, যে-মুক্তি নঞর্থক নয়, সদর্থক। যে-মুক্তি কর্মত্যাগে নয়, সাধুকর্মের মধ্যে আত্ম-

ত্যাগে। যে-মুক্তি রাগদ্বেষ বর্জনে নয়, সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রী-সাধনায়। আজ স্বার্থক্ষুধাক্ত বৈশ্যবৃত্তির নির্মম নিঃসীম লুব্ধতার দিনে, সেই বুদ্ধের শরণ কামনা করি, যিনি আপনার মধ্যে বিশ্বমানবের সত্যরূপ প্রকাশ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন।"

—"বুদ্ধদেব" (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪২)

বৌদ্ধশাস্ত্র যে আমাদের অজ্ঞাত অবজ্ঞাত তার জন্য তাঁর কি বেদনা, "প্রাচীন সাহিত্যে"র 'ধম্মপদ' প্রবন্ধে সেকথা তিনি বলেছেন :

"এই (ভারতবর্ষের) ইতিহাসের বহুতরো উপকরণ যে বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে বহুদিন অনাদৃত এই বৌদ্ধশাস্ত্র, য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের পদানুসরণ করিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। ইহাই আমাদের দেশের পক্ষে দারুণতম লজ্জার কারণ।...

"সমস্ত দেশে পাঁচজন লোকও কি বৌদ্ধশাস্ত্র উদ্ধার করাকে চিরজীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেন না? এই বৌদ্ধশাস্ত্রের পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কানা হইয়া আছে।—একথা মনে করিয়াও কি দেশের জনকয়েক তরুণ যুবার উৎসাহ এই পথে ধাবিত হইবে না।...

"ভারতবর্ষ বৌদ্ধরাজাদের অধীনে বিদেশে আপন ধর্ম প্রেরণ করিয়াছে—আপন স্বার্থ বিস্তার করে নাই।"

—"অত্যুক্তি", ভারতবর্ষ

সর্বজীবের প্রতি মৈত্রী এবং করুণা বৌদ্ধধর্মের প্রাণ-স্বরূপ। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই মর্মে বলা হয়েছে, "করুণা যেখানে, সমস্ত বুদ্ধধর্মই সেখানে।" করুণা কি—না "আর্তে সুত ইব পিতুঃ প্রেম জগতি"—আর্ত পুত্রের প্রতি পিতার যেরূপ স্নেহ—সমস্ত প্রাণিজগতের প্রতি সেইরূপ স্নেহের নাম করুণা। মহাকারুণিক বুদ্ধের এই করুণা সম্বন্ধে কবি তাঁর "ধর্ম" গ্রন্থে 'উৎসবের দিন' নামক প্রবন্ধে বলেছেন :

"তাহা (করুণা) জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায়, আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে, আপনাকে নির্বিশেষে, সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে। ইহাই পরিপূর্ণতার চিত্র—ইহাই ঐশ্বর্য। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন :—'মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের (একমাত্র) পুত্রকে রক্ষা করেন, এইরূপ সমস্ত প্রাণীর প্রতি অপরিমেয় দয়া ভাব জন্মাইবে ঊর্ধ্বদিকে, অধোদিকে, চতুর্দিকে, সমস্ত জগতের প্রতি, বাধাশূন্য, হিংসাশূন্য, শত্রুতাশূন্য মানসে, অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কি দাঁড়াইতে, কি চলিতে, কি বসিতে, কি শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে, এই মিত্র ভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে। ইহাকেই "ব্রহ্মবিহার" বলে।' "

(সুত্তনিপাত ১।৮।৭)

"এত বড় উপদেশ মানুষকেই দেওয়া চলে। কেননা, মানুষের মধ্যে গভীর হয়ে আছে সোহহং তত্ত্ব। সে কথা বুদ্ধদেব নিজের মধ্য থেকেই জেনেছেন। তাই বলেছেন—অপরিমাণ প্রেমেই আপনার অন্তরের অপরিমেয় সত্যকে মানুষ প্রকাশ করে।"

—"মানুষের ধর্ম"।

"শান্তিনিকেতন" গ্রন্থের 'আদেশ' প্রবন্ধে, কবি বুদ্ধ-প্রবর্তিত ধর্মের মর্ম এই ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

"বুদ্ধদেব যখন বেদনাপূর্ণ চিত্তে, ধ্যানের দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন যে, মানুষের বন্ধন, বিকার, বিকাশ কেন, দুঃখ, জরা, মৃত্যু কেন, তখন তিনি কোন্ উত্তর পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন? তখন তিনি এই উত্তরই পেয়েছিলেন যে—মানুষ আত্মাকে উপলব্ধি করলেই, আত্মাকে প্রকাশ করলেই মুক্তিলাভ করবে। সেই প্রকাশের বাধাতেই তার দুঃখ—সেইখানেই তার পাপ।

"এই জন্য তিনি প্রথমে কতকগুলি নিষেধ স্বীকার করিয়ে মানুষকে শীল গ্রহণ করতে আদেশ করেন। তাকে বললেন—'তুমি লোভ করো না, হিংসা করো না, বিলাসে আসক্ত হ'য়ো না।' যে-সমস্ত আবরণ তাকে বেষ্টন করে' ধরেছে, সেইগুলি প্রতিদিনের নিয়ত অভ্যাসে মোচন করে' ফেল্‌বার জন্যে তাকে উপদেশ দিলেন। সেই আবরণগুলি মোচন হ'লেই আত্মা আপনার বিশুদ্ধ স্বরূপটি লাভ করবে।

"সেই স্বরূপটি কি? শূন্যতা নয়, নৈষ্কর্ম্য নয়। সে হচ্ছে, মৈত্রী, করুণা, নিখিলের প্রতি প্রেম। বুদ্ধ কেবল বাসনা ত্যাগ করতে বলেন নি, তিনি প্রেমকে বিস্তার করতে বলেছেন। কারণ এই প্রেমকে বিস্তারের দ্বারাই, আত্মা আপন স্বরূপকে পায়; সূর্য যেমন আলোককে বিকীর্ণ করার দ্বারাই আপনার স্বভাবকে পায়।

বুদ্ধ সমস্ত মানবের হয়ে নিজের জীবনে এই পরিপূর্ণ প্রকাশের প্রার্থনাই করেছিলেন—এ ছাড়া মানুষের আর দ্বিতীয় কোনো প্রার্থনা নেই।"

"ব্রহ্মবিহারের এই সাধনার পথে বুদ্ধদেব মানুষকে প্রবর্তিত করবার জন্যে বিশেষরূপে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি জানতেন, কোনো পাবার যোগ্য জিনিষ ফাঁকি দিয়ে পাওয়া যায় না। সেইজন্যে তিনি বেশি কথা না বলে একেবারে ভিত থেকে আরম্ভ করে দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন—শীল গ্রহণ করাই মুক্তিপথের পাথেয় গ্রহণ করা।... প্রত্যহ শীলসাধনার দ্বারা তিনি আত্মাকে মোহমুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং মৈত্রীভাবনার দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পথ দেখিয়েছেন।...অর্থাৎ এক দিকে বাধা কাটছে, আর এক দিকে স্বরূপ লাভ হচ্ছে।"

"ব্রহ্মবিহার"—শান্তিনিকেতন

"শান্তিনিকেতন" গ্রন্থের 'ভূমা' প্রবন্ধে কবি বলেছেন :

"বুদ্ধদেব যে দুঃখনিবৃত্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সে-পথের একটা সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ কী। সে এই যে, অত্যন্ত দুঃখস্বীকার ক'রে এই পথে অগ্রসর হতে হয়। এই দুঃখস্বীকারের দ্বারা মানুষ আপনাকে বড়ো করে জানে। খুব বড়ো রকম করে ত্যাগ, খুব বড়ো রকমের ক'রে ব্রত-পালনের মাহাত্ম্য, মানুষের শক্তিকে বড়ো ক'রে দেখায় ব'লে, মানুষের মন তাতে ধাবিত হয়।"

ভারতবর্ষে আর্য ও অনার্যের সংঘাতে, যে অনিবার্য বর্ণসঙ্কর ও ধর্মসঙ্কর উৎপন্ন হয়, তার সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ্যধর্ম কি নীতি অবলম্বন করেছিল এবং বৌদ্ধধর্মই বা তা কি ভাবে নিয়েছিল "পরিচয়" গ্রন্থে 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে কবি সেকথা আলোচনা করে বলেছেন :

"এইরূপে যতই বর্ণসংকর ও ধর্মসংকর উৎপন্ন হইতে লাগিল, ততই সমাজের আত্মরক্ষণী শক্তি বারংবার সীমা নির্ণয় করিয়া আপনাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছে। যাহাকে ত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহাকে গ্রহণ করিয়া বাঁধ বাঁধিয়া দিয়াছে।

মনুতে বর্ণসংকরের বিরুদ্ধে যে চেষ্টা আছে এবং তাহাতে মূর্তিপূজা-ব্যবসায়ী দেবল ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায়, রক্তে ও ধর্মে অনার্যদের মিশ্রণকে গ্রহণ করিয়াও, তাহাকে বাধা দিবার প্রয়াস কোনোদিন নিরস্ত হয় নাই। এইরূপে প্রসারণের পরমুহূর্তে সংকোচন আপনাকে বারংবার অত্যন্ত কঠোর করিয়া তুলিয়াছে।

একদিন ইহারই এক প্রবল প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষের দুই ক্ষত্রিয় রাজ-

সন্ন্যাসীকে আশ্রয় করিয়া প্রবল শক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। ধর্মনীতি যে একটা সত্য পদার্থ, তাহা যে সামাজিক নিয়মমাত্র নহে—সেই ধর্মনীতিকে আশ্রয় করিয়াই যে মানুষ মুক্তি পায়, কোনো ভেদকে চিরন্তন সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না, ক্ষত্রিয় তাপস বুদ্ধ ও মহাবীর সেই মুক্তির বার্তাই ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছিলেন। আশ্চর্য এই যে, তাহা দেখিতে দেখিতে জাতির চিরন্তন সংস্কার ও বাধা অতিক্রম করিয়া সমস্ত দেশকে অধিকার করিয়া লইল।"

বৌদ্ধধর্মের এই বিশেষত্বের কথাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর "জাভাযাত্রীর পত্রে" (বোরোবুদর মন্দির দেখে) লিখেছেন:

"এই মন্দিরে দেখতে পাই—সর্বজনকে। রাজা থেকে আরম্ভ করে' ভিখারি পর্যন্ত। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রবল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এর মধ্যে শুদ্ধ মানুষের নয়, অন্য জীবেরও যথেষ্ট স্থান আছে।

জাতককাহিনীর মধ্যে খুব একটা মস্ত কথা আছে। তাতে বলেছে—যুগ যুগ ধরে, বুদ্ধ সর্বসাধারণের মধ্য দিয়েই ক্রমশঃ প্রকাশিত। প্রাণী-জগতে নিত্যকাল যে ভালোমন্দর দ্বন্দ্ব চলেছে, সেই দ্বন্দ্বের প্রবাহ ধরেই, ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, বুদ্ধের মধ্যে অভিব্যক্ত।"

'দয়া করো', 'ক্ষমা করো', 'ধর্মপথে চলো', এ সকল উপদেশ কে না শুনেছে! পূর্বে এরূপ উপদেশ নিতান্ত নীরস শুষ্ক বলেই আমাদের মনে হয়েছে। কিন্তু যখন একদিন আমরা কাব্যে, সুমধুর ভাষায়, বিচিত্র ছন্দে, পাঠ করলাম—নিদারুণ মারীগুটিকায় আক্রান্তা, পরিত্যক্তা, অস্পৃশ্যা, অশুচি এক গণিকার প্রাণ কামিনীকাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসী উপগুপ্ত রক্ষা করছেন, যখন দেখলাম, মালিনী তাঁর সমধর্মী, সহকর্মী, পরমপ্রিয় সুপ্রিয়ের হত্যার দৃশ্য চক্ষের সম্মুখে দেখেও, সেই সময়ে হত্যাকারীকে ক্ষমা করবার জন্য, রাজাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছেন, তখন ঐ উপদেশগুলি আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করল!

ধর্মপথে চলার অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখলাম "নটীর পূজায়।" দেবজনভোগ্য শতদলপদ্মের উৎপত্তি হলো পঙ্কে। রাজ-মহিষী রাজদুহিতা, শত শত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় গৃহপতির ভার্যা এবং কন্যা থাকতে বুদ্ধের ধর্মকে অন্তরে বরণ করে নিলে কিনা এক নটী।

ক্ষত্রিয়কন্যার আভিজাত্যের গর্বে পতিতার এ ধর্মভাব সহ্য হ'ল না। তার এই স্পর্ধাকে দণ্ড দেবার জন্য, তাদের উর্বর মস্তিষ্কের কুটিল বুদ্ধি এক কুৎসিত উপায় উদ্ভাবন করল। নটী সে, সারাজীবন সে তার নৃত্যের দ্বারা বিলাসী পুরুষের লালসা জাগিয়েছে। আজ তাকে তার আরাধ্য দেবতার বেদীর সম্মুখে নৃত্য করাতে হবে। সেই হবে তার উপযুক্ত দণ্ড!

শেষ পর্যন্ত তাই হ'ল। নটী তার আরাধ্য দেবতার বেদীর সম্মুখেই নৃত্য করল! কিন্তু সে কি নৃত্য! সমস্ত চিত্ত যখন ভক্তিভাবে ভরপুর—সমস্ত অস্তিত্ব যখন ইষ্টদেবতার আরাধনার জন্য ব্যগ্র, যখন দেহের প্রতি অণু-পরমাণু এক অলৌকিক ভাবাবেগে ব্যাকুল—তখন সে তার চরম নৃত্যের তালে তালে মুখর হয়ে বলে উঠে:

আমার তনু তনুতে বাঁধনহারা
হৃদয় ঢালে অধরা ধারা
তোমার চরণে হোক তা সারা
পূজার পুণ্য কাজে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ
সঙ্গীতে বিরাজে।
আমার সকল দেহের আকুল রবে
মন্ত্রহারা তোমার স্তবে
ডাহিনে বামে ছন্দ নামে
নবজনমের মাঝে
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ
সঙ্গীতে বিরাজে।

এই তার জীবনের শেষ নৃত্য! এ নৃত্যের অবসান হ'ল মৃত্যুতে অথবা মুক্তিতে!

বুদ্ধের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার আর অন্ত ছিল না। বুদ্ধপ্রচারিত ধর্মকে জানবার—বোঝবার, তাঁর কি আগ্রহ। তখনকার দিনেও একান্ত আগ্রহের সঙ্গে তিনি বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন।

কত অজ্ঞাত, অখ্যাত 'অবদান' হতে তিনি তাঁর কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। কে তাদের কথা জানত?*

* শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতিথি-উপলক্ষে অনুষ্ঠিত "রবীন্দ্র-সপ্তাহে"র দ্বিতীয় দিনে সভাপতির অভিভাষণ।
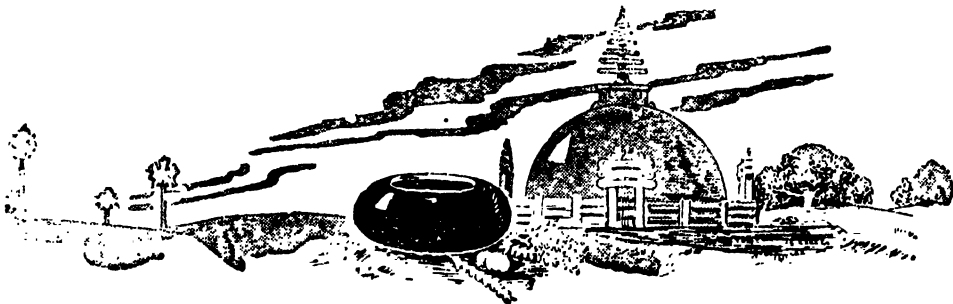
স্কটলণ্ডের কৃষক ও কৃষি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

আমাদের পূর্ব্বকালের কৃষির বর্ণনা আমরা পড়ি এবং শুনি; কিন্তু সেই বর্ণনার সহিত বর্ত্তমানের কৃষির উল্লেখযোগ্য কোন সামঞ্জস্য নাই বলিলেই চলে। পূর্ব্বকালের কৃষির তুলনায় বর্ত্তমানের কৃষির যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছে; অথচ বর্ত্তমানের তুলনায় পূর্ব্বকালের কৃষির উন্নতিকল্পে এত ব্যয়বহুল 'সরকারী' ব্যবস্থা ছিল না। কৃষির অবনতি কেন ঘটিল, সে সম্বন্ধে বহু বিশেষজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন; আলোচনার ফলে যদি কৃষির উন্নতি সম্ভবপর হইত তাহা হইলে আমাদের দেশের কৃষির উন্নতিসাধনও হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই।

ক্ষুদ্র শিংওয়ালা বকনা গাভী

আয়ার সায়ার দুগ্ধবতী গাভী

কৃষির উন্নতিসাধন উদ্দেশ্যে অধুনা বহু অর্থ ব্যয়িত হইতেছে; পরিকল্পনারও অন্ত নাই। অথচ আজ তিন চারি বৎসরের মধ্যেও আমরা শতকরা ১০।১৫ ভাগ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হই নাই। কবে যে এই ঘাটতি পূরণ হইবে তাহাও নিশ্চয়রূপে কেহ বলিতে পারেন না। সরকারী মহলের হিসাব-নিকাশও অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে না। ইহার কেবলই পরিবর্ত্তন দেখা যায়। অবশ্য পরিবর্ত্তনের যে কোন কারণ নাই, তাহা নহে; কারণ আছে। কিন্তু জনসাধারণের মতে এইরূপ কারণ পূর্ব্বেও ছিল, বর্ত্তমানে আছে, এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। সুতরাং এরূপ কারণ সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্নেই অবহিত হইতে হইবে এবং তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

কৃষির উন্নতি, বিশেষতঃ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যেন একটা নিরাশার ভাব দেখা দিয়াছে। সকলেই অতি দৃঢ়তাবে এই মত প্রকাশ করেন যে, খাদ্য-সামগ্রীর বর্ত্তমান মূল্য আর বিশেষ নামিবে না; মোটামুটি এই স্তরেই থাকিবে। বাস্তবিকই এই মত যদি বাস্তবে পরিণত হয়, এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আয়ের পরিমাণ যদি না বাড়ে (বাড়িবার সম্ভাবনাও খুব কম) তাহা হইলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইবে।
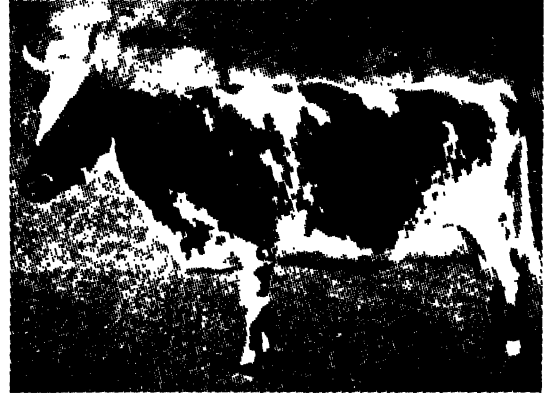
পূর্ব্বে শুনিতাম, পাটের মূল্যই অবিভক্ত বাংলার জীবন-যাত্রামানের মাপকাঠি। ইহা নিজের অভিজ্ঞতা হইতেও সমর্থন করিতে পারি। পূর্ব্ববঙ্গে যখন ছিলাম তখন দেখিয়াছি যে, পাটের মূল্যের উপরেই ঘর নির্ম্মাণের জন্য টিনের চাহিদা, জমির ক্রয়-বিক্রয়, নানাবিধ সামগ্রীর চাহিদা প্রভৃতি নির্ভর করিত। এক জন জেলা জজ বলিয়াছিলেন, পাটের মূল্য বাড়িলে মামলা-মোকদ্দমাও বাড়ে। বাস্তবিক প্রত্যেক স্তরের ব্যক্তিবর্গের আয়ের পরিমাণ পাটের মূল্যদ্বারা প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত হইত। এখন শুনিতেছি পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য-সামগ্রীর, বিশেষতঃ চাউলের মূল্যই জীবনযাত্রার মানের মাপকাঠি এবং ইহার মূল্যের উপর অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য প্রধানতঃ নির্ভর করে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, চাউলের মূল্য কমিলেই অন্যান্য জিনিষের মূল্য হ্রাস পাইবে। এই মতই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কৃষির উন্নতি, বিশেষতঃ চাউল ও অন্যান্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিই ধ্বংসোন্মুখ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একমাত্র পথ। আর নিরাশা ত্যাগ করিয়া সকলকে সমবেতভাবে এই পথেই নামিতে হইবে; সকলকেই 'চাষা' হইতে হইবে, মুখে নয়, কাজে। নিরাশার কোন কারণ নাই; এই পথে তেমন আর কোন বাধা নাই, প্রধান বাধা নিজেদের জড়তা আর উপযুক্ত পরিকল্পনা ও নেতৃত্বের (leadership) অভাব। অন্যান্য দেশের কৃষির উন্নতি সাধন করিতে সুদীর্ঘ কালের প্রয়োজন

হয় নাই। আমাদের দেশে হইবে কেন? শুনি, সব বিষয়েই বাঙালী কৃতিত্ব দেখাইয়াছে এবং দেখাইতেও পারে; সুতরাং কৃষির উন্নতিসাধনে বাঙালী এত পশ্চাৎপদ কেন?

লর্ড বয়েড ওর্ স্কটলণ্ডের কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমাদের বিশেষ ভাবে প্রণিধান করা আবশ্যক। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংলণ্ডের কৃষির তুলনায় স্কটলণ্ডের কৃষি খুবই পশ্চাতে পড়িয়া ছিল; মধ্যযুগের সময় হইতে ইহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। গড়ে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বীজের পরিমাণের তিন গুণ হইত। অর্থাৎ, যে পরিমাণ বীজ বোনা হইত, উৎপন্ন শস্যের দানার পরিমাণ তাহার তিন গুণ হইত। ইহার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ পরবর্ত্তী ফসলের বীজের জন্য রাখিতে হইত, এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য রাখিতে হইত; এবং অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ জমির খাজনা, অন্যান্য খরচ ইত্যাদির জন্য রাখা হইত। গরু, বলদের অবস্থাও অতিশয় শোচনীয় ছিল; আফ্রিকার গরু,

আয়ার সায়ার ষাঁড়

বলদের মতও 'উত্তম' ছিল না। গ্রীষ্মকালে গবাদি পশু আগাছা ও কাঁটায় পূর্ণ গোচারণ ভূমিতে চরিয়া বেড়াইত; এবং শীতের সময় তাহাদের খাদ্য এত নিকৃষ্ট রকমের ছিল যে, বসন্তকালে তাহারা বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িত, এত দুর্ব্বল হইত যে মাঠে যাইতে পারিত না; কৃষকেরা পরস্পরের সাহায্যে তাহাদের উঠাইয়া দাঁড় করাইয়া দিত। কিন্তু উক্ত শতাব্দীর শেষভাগেই এমন এক "কৃষি বিপ্লব" ঘটিল, যাহা স্কটলণ্ডের কৃষিকে ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থানে ঠেলিয়া তুলিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই স্কটলণ্ডের কৃষির উন্নতির সূচনা হইল। বহু উন্নত কৃষি প্রণালীর প্রচলন দেখা গেল। ভূমির স্বত্বাধিকারিগণ এই সকল উন্নত প্রণালীর জন্য প্রধানতঃ দায়ী। তাঁহারা ইতিপূর্ব্বেই ইংলণ্ড এবং ইউরোপের পাশ্চাত্য দেশসমূহ ভ্রমণ করিয়া সে সকল দেশের উন্নত প্রণালী নিজেদের জমিতে প্রচলন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রধানতঃ স্থানীয় অধিবাসিগণের জড়তা ও অনুভোগ-বশতঃ উহাদের বিস্তৃতি আদৌ হয় নাই, এমন কি পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণ ঐ সকল উন্নত প্রণালীর প্রচলন ও বিস্তৃতির পথে বহু বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল।

সেটল্যাণ্ড গাভী

স্কটলণ্ডের কৃষির উন্নতির মূলে ছিলেন তথাকার পল্লী-যাজকগণ। তাঁহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্যে বা 'বিরোধে' অধিক সময় অতিবাহিত না করিয়া তাঁহাদের আবাসের সংলগ্ন যে অল্প পরিমাণ জমি ছিল তাহার উন্নতিসাধনে এবং যাজকপল্লীর অধিবাসিগণের জমিতে উন্নত প্রণালীর প্রচলন উদ্দেশ্যে অধিকতর মনোযোগ ও সময় দিতে লাগিলেন। ইহার ফল খুবই সন্তোষজনক হইয়াছিল; এবং অল্পকালের মধ্যেই উন্নত প্রণালীসমূহের বিস্তার ঘটিয়াছিল।

অপর একটি প্রধান কারণ ছিল অল্পকালের পরিবর্ত্তে দীর্ঘ-কালের জন্য জমি পত্তনি বা ইজারা দেওয়া। ইহার ফলে উৎসাহী কৃষকগণ জমিতে উন্নত প্রণালী প্রচলনের প্রতি খুবই আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ দীর্ঘ-মেয়াদী ব্যবস্থার ফলে জমির চারিদিকে বেড়া এবং প্রয়োজন অনুসারে নালা বা বাঁধ নির্ম্মাণ করিতে কৃষকেরা উৎসাহিত হইয়াছিল; পতিত জমি সংস্কার করিয়া, জমি হইতে আবদ্ধ জল নিষ্কাশন করিয়া উহা আবাদের উপযুক্ত করিবার দিকে সকলেরই চেষ্টা ও আগ্রহ দেখা গিয়াছিল। অনেক ক্ষেত্রেই কৃষকেরা বন্ধুদের সাহায্যে নিজেরাই নিজহস্তে জমির উপর ঘর-বাড়ী, শস্যাগার প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

এইরূপে জমি সংস্কার করিয়া এবং উহার চারিধারে বেড়া দিয়া উহাতে উন্নত শ্রেণীর বীজ অতি আগ্রহের সহিত বপন করা হইল। চূণ প্রয়োগ করিয়া এবং অন্যান্য প্রণালীর সাহায্যে জমি উর্ব্বরা করা হইল। ইংলণ্ড এবং হল্যাণ্ড হইতে উন্নত জাতের গবাদি পশু, ভেড়া প্রভৃতি আমদানী

করিয়া স্থানীয় এই সকল প্রাণীর উন্নতিসাধনে সকলেই তৎপর হইল।

কৃষির উন্নতি এত দ্রুতগতিতে ঘটিয়াছিল যে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্বেই ইংলণ্ডের জমির মালিকগণ স্কটলণ্ডের কৃষির বহু প্রণালী নিজেদের জমিতে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে—শস্য পর্য্যায়, গভীর কর্ষণ, কাস্তের সাহায্যে শস্য কাটা, গোশালায় রাখিয়া গবাদি পশুদিগকে খাদ্য খাওয়ানো ইত্যাদি।

ইংলণ্ডে কৃষির উন্নতির সূচনা হইয়াছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। ইহার মূলে ছিল কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির প্রতিভা ও নেতৃত্ব; কিন্তু স্কটলণ্ডের কৃষির উন্নতির মূলে রহিয়াছে তথাকার কৃষকগণের উৎসাহ,

ক্ষুদ্র শিংওয়ালা ষাঁড়

নেতৃত্ব এবং কঠোর পরিশ্রম। দীর্ঘ-মেয়াদী জমি বিলির ব্যবস্থার ফলে, সেখানকার কৃষকেরা নিজেদের 'স্বাধীন' মনে করিয়াছিল এবং কৃষকগণ নিজেরা, তাহাদের পত্নীগণ ও পরিবারবর্গ 'ওয়েষ্ট ইণ্ডিসের' বৃক্ষ-রোপিত স্থানে (plantation) ক্রীতদাসেরা যেমন সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ করিত, ঠিক সেই রকমই কাজে নিযুক্ত থাকিত। এখনও এইভাবে স্কটলণ্ডের কৃষকেরা, বিশেষত: "ছোট ছোট" কৃষকেরা, নিত্য নিয়মিতভাবে পরিশ্রম করে। লর্ড বয়েড ওর বলেন যে, যুদ্ধের সময় দক্ষিণ-পশ্চিম স্কটলণ্ডের এক ছোট কৃষকের নিকট তাঁহার এক ধনী কৃষকবন্ধুকে যাইতে হইয়াছিল। তিনি জানিতেন যে, তথাকার কৃষকেরা অতি প্রত্যুষেই মাঠে চলিয়া যায়, সেইজন্য তিনি সকাল ছয়টার সময় তাহার বাড়ীতে গিয়াছিলেন; কিন্তু গিয়া তাহার (কৃষকের) পত্নীর নিকট শুনিলেন যে, তাহার স্বামী তৎপূর্ব্বেই মাঠে চলিয়া গিয়াছে। পত্নী তখন গোশালা পরিষ্কার করিতেছিল। কৃষিক্ষেত্রের শ্রমিকেরাও তাহাদের নৈপুণ্যে ও কার্য্যশক্তিতে অসাধারণ। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই একটা কর্ত্তব্যবোধের ও স্বাধীনভাবের পরিচয় পাওয়া যায়; সেখানকার গো-পালক ও মেষ-পালকদের সম্বন্ধে এই একই কথা খাটে। লর্ড বয়েড ওরের মতে কৃষিকার্য্যে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রচলনের ফলে এইরূপ কঠোর পরিশ্রম-

সেটল্যাণ্ড মেষ

পরায়ণ এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশ: হ্রাস পাইতেছে; ইহা খুবই দুর্ভাগ্যের কথা। শহরবাসীদের মধ্যে এইরূপ কঠোর শ্রমশীল লোকের সংখ্যা খুবই কম।

এই সম্পর্কে বয়েড ওর আরও বলেন যে, আমাদের ধর্ম্ম পুস্তকের আদেশ অনুসারে আমরা যখন আমাদের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের এবং আমাদের জন্মদাতা পিতাদের প্রশংসা করি, ইংলণ্ডের কৃষকগণ তাহাদের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবে, কিন্তু স্কটলণ্ডের কৃষককুল তাহাদের জন্মদাতা পিতার কথাই স্মরণ করিবে। যে সকল ব্যক্তি স্কটলণ্ডের কৃষিকে এইরূপ উচ্চ স্তরে লইয়া গিয়াছিল তাহাদের বংশধরগণ সেই আদর্শ ও মানই রক্ষা করিয়া আসিতেছে। দুই-একটি উদাহরণ দিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে। স্কটলণ্ডে গড়ে (১৯৪০-৪৮) গমের ফলন ২২'৪ হন্দর; ইংলণ্ডের ফলন ১৯'১ হন্দর। শীতের আবহাওয়ার জন্য বীজ-আলু উৎপাদনে স্কটলণ্ড খুবই উপযুক্ত; ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশে ইহা প্রচুর রপ্তানী হয়। ১৮৯০ সালে এই ব্যবসা সুরু হয়; বর্ত্তমানে বহু নূতন শ্রেণীর আলু উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহারা অধিকতর ফলন ও রোগ প্রতিরোধের জন্য বিখ্যাত। বীজের জন্য আলু উৎপাদন খুবই পটুতার কাজ; এবং স্কটলণ্ডের কৃষকেরা এই বিষয়ে সিদ্ধহস্ত। ১৯১৮ সালে তথাকার কৃষিবিভাগ যুক্তরাজ্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এইরূপ পরিকল্পনা প্রস্তুত করে যাহাতে ক্ষেত্রের শস্য পরীক্ষা করিয়া উহার বিশুদ্ধতা এবং নীরোগ অবস্থা সম্বন্ধে 'সার্টিফিকেট' প্রদানের ব্যবস্থা হয়।

যুদ্ধের পূর্ব্বে স্কটলণ্ডের কৃষকদের আয়ের প্রধান পথ ছিল

গো-পালন; আয়ারসায়ার, সর্টহর্ণ গরু প্রভৃতি পৃথিবীব্যাপী প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ইহাদের রপ্তানী খুবই বেশী; ১৯৪৭ সালে এক হাজারের উপর গরু বিভিন্ন দেশের গরুর উন্নতি-সাধনের জন্য রপ্তানী করা হইয়াছিল। ইহাতে দেশের আয় হইয়াছিল ২০৪,০০০ পাউণ্ড।

দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন খুবই পরিশ্রম ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাজ। এই সম্পর্কেও স্কটলণ্ড প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে সেখানে শতকরা ৩৬টি গবাদি-পশু যক্ষ্মারোগমুক্ত; ইংলণ্ডে ১৩টি; স্কটলণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলেই শহরবাসীদের জন্য প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ উৎপন্ন হয়; এ অঞ্চলে রোগমুক্ত প্রাণীর সংখ্যা শতকরা ৯০টি। বিক্রয়ের জন্য যে সকল রোগ-মুক্ত গরু হইতে দুধ গ্রহণ করা হয় তাহাদের সংখ্যা শতকরা ৭১টি; ইংলণ্ডের হিসাব শতকরা ৯টি।

আমাদের দেশের বহু যুবক নিজেদের কিংবা সরকারের ব্যয়ে পাশ্চাত্য দেশের কৃষি-পদ্ধতি, গো-পালন প্রভৃতি শিক্ষা লাভ করিবার জন্য বিদেশে গমন করিয়াছেন। বহু সরকারী কর্ম্মচারীকে এই উদ্দেশ্যেই সরকারী ব্যয়ে বিদেশে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। কিন্তু ইহার ফলে দেশের কৃষি বা গো-পালনের বিশেষ কিছুই উন্নতি হয় নাই। অথচ স্কটলণ্ড প্রধানত: অন্যান্য দেশের প্রণালী অনুসরণ করিয়া নিজের দেশের কৃষি ও গো-পালনের উন্নতি করিয়াছে। সুতরাং এই পথে আমাদের দেশের বাধা বা গলদ কোথায় তাহাই সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কার করা দরকার।*

* *Farmers Digest*-এ প্রকাশিত "The Scottish Farmer" নামক প্রবন্ধ হইতে তথ্যাদি গৃহীত।

বাঁধ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

২১

আজ অনেক রাত পর্য্যন্ত মঞ্জুষার চোখে ঘুম আসিল না। ঘুরিয়া ফিরিয়া তার বাবার কথাটাই মনের মধ্যে আনাগোনা করিতে লাগিল। সত্য কথাই তিনি বলিয়াছেন। মনকে তৈরি করাই হইল সকলের চেয়ে বড় কথা। কিন্তু হঠাৎ তিনি আজ একথা বলিতে গেলেন কিসের জন্য। রাধুকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি কি মঞ্জুষাকে তার নিজের কথাটাই ভাবিয়া দেখিবার নির্দ্দেশ দিলেন? যদি দিয়াই থাকেন তবে নিতান্ত অকারণে নয়। মন তার অকস্মাৎ এতগুলি অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের সম্মুখীন হইবার জন্য তৈরি ছিল না বলিয়াই সে নিরন্তর অন্ধের মত একটার পর আর একটাকে আঁকড়াইয়া ধরিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। নির্দ্দিষ্ট কোনকিছুকে স্থির চিত্তে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না।

আকাশে অসংখ্য তারা দেখা যাইতেছে। পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘ বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মঞ্জুষা নির্নিমেষ নেত্রে সেই-দিকে চাহিয়া আছে। আজকাল সময় তাহার যেন কাটিতে চাহে না। রাধু বোষ্টমের সজীর ক্ষেতে সারাদিন কাটাইবার মত ধৈর্য্য তাহার নাই। মাটির পুতুল গড়া দেখিতে গেলে সে ক্লান্তি বোধ করে। সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজে কোন আকর্ষণ নাই। সবই কেমন যেন একঘেয়ে হইয়া গিয়াছে।

রাধুর উৎসাহের অন্ত নাই। সে বলে, কাজের আবার ভাবনা। এই সব আশ্রিত ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা ছোটখাটো স্কুল গড়ে তোলো।

মঞ্জুষা একটুখানি হাসিল, কোন জবাব দিল না। এই কয় বছরে সে নিজেকে ভাল করিয়াই চিনিয়াছে। যে মূল বস্তুটিকে আশ্রয় করিয়া তার বহুবিধ কল্পনা ডালপালা মেলিয়া-ছিল, তার আজ অস্তিত্ব নাই। তারপরে কতকিছুকেই সে দুই হাত বাড়াইয়া নাগাল পাইবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সবই রহিয়া গিয়াছে তার আয়ত্তের বাহিরে। সে যেমন একলা তেমনি একলাই আছে।

নিজের মনকে সে বার বার প্রশ্ন করিয়াছে—কি সে চায়? কোন্ পথে চলিলে তার সত্যকার কল্যাণ হইবে? উত্তর সে পায় নাই।

চলিতে হইবে তাই সে চলিতেছে। দুই পা অগ্রসর হইলে তিন পা পিছাইয়া আসে। ফলে একটা অপরিসীম ক্লান্তিতে সে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।

মঞ্জুষা জানে না মৃন্ময় আজ কোথায় আছে এবং কেমন আছে, তার জীবনের গতিকে কোন্ পথে মোড় ফিরাইয়াছে।

এক ঝলক দমকা হাওয়া বহিয়া গেল। খোলা জানালাটা সশব্দে বন্ধ হইয়া যাইতেই মঞ্জুষা চমকাইয়া উঠিল। বন্ধ জানালা পুনরায় সে খুলিয়া দিল। আকাশে খণ্ড চাঁদ উঠিয়াছে। শুক্লপক্ষ। কিছুদিনের ব্যবধানে পুনরায় কৃষ্ণ-পক্ষের আবির্ভাব হইবে। মঞ্জুষা ভাবে—প্রকৃতির পরিবর্ত্তনটা নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ, কিন্তু তার জীবনের কৃষ্ণপক্ষের অবসান কি কোনদিনই ঘটিবে না!

মৃদু বাতাসে ভর করিয়া ভারি মিষ্ট একটা গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। মঞ্জুষার ফুলের বাগানে ফুল ফুটিয়াছে—তারই সুবাস। তার মনের বনে কিন্তু সুগন্ধি ফুল ফোটে নাই, ফুটিয়াছে রক্তরাঙা পলাশ। দেবতার অর্ঘ্যে কোনদিন লাগিবে না, শুধু তার চলার পথকেই যেন বেদনার রঙে রাঙাইয়া দিল।

বহুদিন পরে মঞ্জুষা ট্রাঙ্ক খুলিয়া অনেক দিন আগে লেখা মৃন্ময়ের খানকয়েক চিঠি বাহির করিল। এতদিন সে

এগুলিকে সযত্নে সংগোপনে রাখিয়া দিয়াছিল। আজ তাহার কি মতি হইল কে জানে, সহসা দিয়াশলাই জ্বালাইয়া একটির পর একটি করিয়া চিঠিগুলি পোড়াইয়া ফেলিতে সুরু করিল। অকারণে এই মিথ্যার বোঝা বহিয়া বেড়াইবার কিসের প্রয়োজন তাহার! চিঠিগুলি একের পর এক পুড়িয়া কালো হইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া যাইতেছে। তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে মঞ্জুষার একটি নিঃশ্বাস পড়িল। পুনরায় এক ঝলক দমকা হাওয়া আসিয়া দগ্ধ চিঠির ছাই ঘরময় ছড়াইয়া দিল।

এই চিঠি কয়খানির উপর মঞ্জুষার মমতার অন্ত ছিল না। কতদিন কত ছলে চিঠিগুলি বাহির করিয়া সে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখিয়াছে। প্রতিটি পংক্তি তার কণ্ঠস্থ। মঞ্জুষা সহসা চমকাইয়া উঠিল। কয়খানি চিঠি পোড়াইয়া ফেলিয়াই কি সে মৃন্ময়ের সকল স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে সক্ষম হইয়াছে। সে পাগলের মত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিঠিগুলির ভস্মাবশেষ সংগ্রহ করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল—স্পর্শমাত্রেই তাহা গুঁড়া হইয়া গেল।

নিজের এই আকস্মিক পাগলামিতে মঞ্জুষা নিজেই বিস্মিত এবং বিরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু চিন্তার হাত হইতে সে যে কিছুতেই অব্যাহতি পাইতেছে না। তার বাবা ঠিকই বলিয়াছেন। মনকে তৈরি করাই হইল সব চেয়ে বড় কথা। এই উক্তি যে কত সত্য তাহার প্রমাণ সে নিজেই। নহিলে এই রাত বারটা পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিয়া দুশ্চিন্তা করিবার প্রয়োজন হইত না। অথচ মৃন্ময় কেমন নিঃশব্দে চলিয়া গেল, এমন কি মঞ্জুষার বাবা পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলিতেছেন। রাধু বোষ্টম তার জীবনের এত বড় একটা শোচনীয় অধ্যায়কে অগ্রাহ্য করিয়া নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়াছে! নাঙ্গুর কথা আলাদা। জীবনকে সে অন্যভাবে দেখিয়াছে, অন্যভাবে বুঝিয়াছে।

মঞ্জুষা দরজা খুলিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। চতুর্দ্দিক সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন, একটা নিশাচর পাখী মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। মঞ্জুষা চমকাইয়া উঠিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। চোখে পড়িল অদূরে এক বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে দুটি তরুণ-তরুণী। উহাদের সে চেনে। কিছু দিন পূর্ব্বে বিবাহ হইয়াছে।

মঞ্জুষাও বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে হইল ওখানকার চাঁদের আলোর রূপ আলাদা। সে পুনরায় ঘরে ফিরিয়া আসিল।

দগ্ধাবশিষ্ট চিঠির টুকরাগুলি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে। মঞ্জুষা কিছুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সহসা বসিয়া পড়িল। পোড়া কাগজের টুকরাগুলি সযত্নে তুলিয়া বাক্সের মধ্যে রাখিল। এগুলি যে তার অতীত স্মৃতির চিতাভস্ম! মঞ্জুষা চমকাইয়া উঠিল। তাহার ঘরের দরজার পাশ হইতে কেহ যেন সন্তর্পণে সরিয়া গেল। একটা খস খস শব্দ তার কানে আসিল। সে দ্রুত অগ্রসর হইয়া পর্দা সরাইয়া বাহিরে আসিল। কোথাও কিছু চোখে পড়িল না। শুধু তার বাবার ঘরের আলোটা তার চোখের সম্মুখেই নিভিয়া গেল। মঞ্জুষা আরও কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পুনরায় ঘরে ফিরিয়া আসিল। একবার ভাবিল তাহার বাবাকে গিয়া বলে যে, এমনি করিয়া অষ্ট-প্রহর তাহাকে চোখে চোখে রাখিলেই কি তার দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে। কিন্তু তখনকার মত সে তার ইচ্ছাকে দমন করিল।

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে বসিয়া মঞ্জুষা কথাটা তুলিল। জীবানন্দ যেন কিছুই বুঝিতে পারেন নাই এমনি ভাবে চাহিয়া রহিলেন।

মঞ্জুষা মুখে একটুখানি হাসি টানিয়া আনিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, তোমার একাজকে আমি কোন যুক্তি দিয়েই সমর্থন করতে পারি না। এতে শুধু নিজেকেই তুমি দুঃখ দিচ্ছ বাবা।

জীবানন্দ গভীর স্নেহে মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া বার বার মাথা নাড়িতে লাগিলেন। মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, যুক্তি-বিচার দিয়ে সমর্থন পাবে না সে আমি জানি মঞ্জু, কিন্তু এ পথে যেও না। তা হলে তুমি নিজেও ভুল করবে, আমাকেও ভুল বুঝবে। হেসে কথা বলি—গল্প করি, কত বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। কিন্তু ভুলে যাস নে যে, এই জগতে যা-কিছু চোখে দেখা যায় সেইটেই শেষ নয়···চোখের আড়ালেও অনেক কিছুই থেকে যায়।

মঞ্জুষা কথা কহিল না। জীবানন্দ বলিতে লাগিলেন, তোমরা হয়তো বলবে এ সব বাড়াবাড়ি, কিন্তু যারা ভুক্তভোগী তারা বুঝবে এর কতটুকু মূল্য। কিসের আশায় এমন করে ব্যাকুল হয়ে উঠি। সব কথা তুমি বুঝবে না—বোঝা তোমার পক্ষে সম্ভবও নয় মঞ্জু। কেমন করে আমার সব স্বপ্ন নিদারুণ ভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে তা ত আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না।

জীবানন্দ ক্ষণকাল নির্ব্বাক থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, তোমার দাদা করলে আমার সঙ্গে বেইমানী। আমার সকল আশা, আমার স্বপ্ন সে চূর্ণ করে দিলে। সে আঘাতকেও আমি ভুলবার চেষ্টা করেছি শুধু তোমার মুখের পানে চেয়ে। ভাবতাম আমি অপুত্রক। মঞ্জুই আমার পুত্র, আমার কন্যা। তাকে নিয়েই আমার শেষ জীবনটা কাটিয়ে দেব—আমার ভাঙ্গা হাট আবার ভরে উঠবে। কিন্তু তা হ'ল কি? পেলাম কতটুকু!

মঞ্জুষা এতক্ষণে কথা কহিল, শান্ত ভাবে বলিতে লাগিল, আমি কোনকিছুকেই ছোট করে দেখতে চাই নি বাবা। কোন

দিন দেখিও নি। কিন্তু দুশ্চিন্তা করে যখন কোন লাভই হচ্ছে না তখন—কথাটা মঞ্জুষা শেষ করিল না। ইহার পরে তার বাবা যদি পাল্টা একই প্রশ্ন করিয়া বসেন তাহা হইলে কি জবাব সে দিবে।

জীবানন্দ বলিলেন, সবই বুঝি মঞ্জু, কিন্তু স্নেহ-ভালবাসা ত সব সময় হিসেব করে চলে না মা, তার পথ আলাদা। একথা বোধ করি তুমিও স্বীকার করবে।

মঞ্জুষা মস্তক নত করিল। জীবানন্দ তার লজ্জাবনত মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, অথচ দেখ মঞ্জু, সব জেনে শুনে বুঝেও আমরা কত অসহায়। জান মা, এই ধরণের দুর্ব্বলতা সব সময় শুধু দুঃখই দেয় না, সময়-বিশেষে মনে সান্ত্বনার প্রলেপও বুলিয়ে দেয়।

মঞ্জুষা নীরব। জীবানন্দ বলিতে লাগিলেন, আমার কথা আমি ভাবি না। কতদিন আর বাঁচব কিন্তু তোমার মুখের দিকে চাইলেই আমার সব গোলমাল হয়ে যায়। মনে হয় মরেও বোধ হয় আমি শান্তি পাব না।

মঞ্জুষা আবেগপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিল, বাবা—

জীবানন্দ সাড়া দিলেন, কি মা—

মঞ্জুষা বলিল, আমার কথা নিয়ে ভাবতে তোমায় না আমি বারণ করে দিয়েছি বাবা। কেন তুমি ভাবতে পার না যে আমি তোমার ছেলে, আমার জন্যে দুশ্চিন্তা করবার কোন কারণ নেই।

জীবানন্দ বড় অদ্ভুতভাবে একটু হাসিলেন। কহিলেন, তা যদি সম্ভব হ'ত তবে আর দুঃখ ছিল কি মা। নিশ্চিন্ত আরামে বাকী দিন ক'টা কাটিয়ে দিতে পারতাম। তবে তোর বাপ কি এতই বোকা যে, সে দেখেও কিছু বুঝতে পারে না? কিন্তু এমনি করে ত আর চলছে না মা। একটা কিছু সমাধান আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

মঞ্জুষা একটু যেন সচকিত হইয়া উঠিল। তার হৃদযন্ত্রটা হঠাৎ যেন অতি দ্রুত চলিতে সুরু করিয়াছে। কিন্তু সে একটি কথাও কহিল না। শুধু নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া রহিল। তাহার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া তার বাবার মনে এই যে ঝড় দেখা দিয়াছে ইহাকে যেমন করিয়া হোক শান্ত করিতে হইবে। এমন জানিলে সে গত রাত্রের কথা তুলিত না। সে ভাবিয়াছিল বেশী রাত জাগার জন্য বাবাকে অনুযোগ করিবে। কিন্তু সব কেমন গোলমাল হইয়া গেল।

জীবানন্দ পুনরায় বলিলেন, সংসারে কিসের আশায় আমি বেঁচে থাকব মঞ্জু?

মঞ্জুষা মৃদু কণ্ঠে কহিল, মানুষের সব আশা ত সকল সময় পূর্ণ হয় না বাবা।

জীবানন্দ বলিলেন, সে ত নিজের চোখেই দেখে আসছি, তুমি আর নূতন করে কি বলছ মা। কিন্তু কথাটা তা নয়; আমি ভাবি কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভগবান আমায় দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন! তাঁর বিধান মেনে না নিয়ে উপায় নেই, কিন্তু প্রতিদিন নিজের মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে মানুষ আর কত দিন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। ভাবনা শুধু কি আমার একটা—

মঞ্জুষার চোখে জল আসিয়া পড়িল এবং তাহাই গোপন করিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহা জীবানন্দর দৃষ্টি এড়াইল না, কিন্তু না দেখার ভান করিয়া তিনিও অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। মঞ্জুষা ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

২২

কিছুদিন হইতে লিলির চলাফেরায়, তার কথা বলায় এবং ছোট-বড় নানা কাজের ভিতর দিয়া যে জিনিষটি নিরন্তর আত্ম-প্রকাশ করিতেছে তাহাতে মৃন্ময় রীতিমত শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। অথচ ইহা লইয়া খোলাখুলি আলোচনা করাও যেমন সম্ভবপর নয়, এখান হইতে নিঃশব্দে সরিয়া পড়াও তেমনি অনাকাঙ্ক্ষিত। কোথায় যেন তাহার আটকাইতেছে। ঐ যে মেয়েটি তার সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দর প্রতি সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া স্নেহে সেবায় তাহাকে সারাক্ষণ ঘিরিয়া রাখিয়াছে তাহার উপযুক্ত মূল্য দিবার ক্ষমতা না থাকিলেও তাহাকে অবহেলা করিবে সে কোন্ অধিকারে। লিলির জন্য সে বেদনা বোধ করে। তাই সে দেখিয়াও কিছু দেখে না, বুঝিয়াও না-বোঝার ভান করে। ইহা ছাড়া আর কোন সহজ পথই আপাতত তাহার চোখে পড়িতেছে না।

ইদানীং নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া সে বড় একটা বাড়ীতে থাকে না। রাজাবাবুর গ্রন্থাগারে পাঠানুশীলন করিতে এবং মহীপালের সহিত শিকারে যাওয়াতেই তাহার আগ্রহ বেশী। তা ছাড়া প্রত্যহ বিকালে বেড়াইতে বাহির হওয়াও তার একটা নিয়মিত কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহীপাল রোজই তার সঙ্গে থাকে। কোন কোন দিন লিলিও তাহাদের সঙ্গে যায়। মোটের উপর বাহ্যিক আচরণে মৃন্ময়ের মনের কথা বুঝিবার উপায় নাই। শুধু মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তার একটা কালো ছায়া তার মুখের উপর দেখা যায়। কিন্তু তাহাও মুহূর্ত্তের জন্য। লিলি সব কথা অনুমান করিতে না পারিলেও কোথাও যে একটা কিছু ঘটিয়াছে ইহা যেন সহজাত সংস্কার-বশেই টের পায়, কিন্তু প্রকৃত সত্যকে উদ্ঘাটিত করিতে সে ভয় পায়। ভিতরে ভিতরে সে অনেকখানি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। লিলি নিজেকে ধিক্কার দেয়। এই অসহায় অবস্থার জন্য লিলি নিজেকেই সর্ব্বতোভাবে দায়ী করিতে চায়, কিন্তু তার মন রুখিয়া দাঁড়ায়—বলে, জীবনের যে কয়টা বছর সে পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে তার কোন মূল্য নাই—একটা মিথ্যা দুঃস্বপ্ন মাত্র। কিন্তু মজা এমনি যে মিথ্যা দুঃস্বপ্নের বোঝা-ই সে আজও বহিয়া চলিয়াছে—প্রকৃত সত্যকে হাতের

মুঠার মধ্যে পাইলেও বোধ করি গ্রহণ করিতে পারিবে না। জীবনে ইহার চেয়ে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস আর কি থাকিতে পারে।

কিছুদিন হইতেই মৃন্ময় যেন ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাইতেছে। হাসিমুখে কথাও বলে, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে লিলিকে পূর্ব্বের ন্যায় জ্বালাতনও করে, কিন্তু তার মধ্যে যেন প্রাণের যোগ নাই, নিতান্তই যেন অভ্যাসের বশে করিয়া যাইতেছে। গল্প করিতে বসিলে আজকাল মৃন্ময় উৎসাহের সঙ্গে শিকার-কাহিনী বলিতে থাকে, নতুবা কেমন করিয়া সে ধীরে ধীরে এখানকার সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতে সক্ষম হইয়াছে এই সব নিতান্ত বাজে কথায় সময় কাটাইয়া দেয়। অথবা এমন সব দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া আলোচনা সুরু করিয়া দেয় যে, শেষ পর্য্যন্ত লিলিকেই বাধ্য হইয়া আলোচনা বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

লিলি বলে, তোমার এই গুরুগম্ভীর আলোচনা থামাও মিনুদা। এসব শুনতে আমার ভাল লাগে না।

মৃন্ময় নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে, লাগে না বুঝি? বেশ আর বলব না। কিন্তু শিকার-কাহিনী আবার তত্ত্বকথা হ'ল কবে থেকে?

লিলি জবাব দিল, তা নয় মানি, কিন্তু ওসব শুনতেও আমার ভাল লাগে না। সে মুহূর্ত্তকাল থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, তোমার এই এক স্বভাব। যখন যেটা মাথায় ঢুকল তাই নিয়ে এমন ডুবে থাকবে যে আশপাশের আর সবকিছুই একেবারে মুছে যায়।

মৃন্ময় লিলির আসল কথার ধার দিয়েও গেল না। হাসিয়া কহিল, যায় বুঝি, কিন্তু এটা দোষ নয়—একাগ্রতা। এ না থাকলে কোন কাজই সফল হয়ে ওঠে না।

লিলি চড়া গলায় কহিল, তুমি থাম মিনুদা। এগুলো যদি তোমার কাজ হয় তা হলে অকাজ আবার কাকে বলে?

লিলির রাগ দেখিয়া মৃন্ময় কৌতুক বোধ করিল। হাসিয়া বলিল, কেন তোমার রান্না করাকে, আর মিনুদাকে যত্ন করে কাছে বসে খাওয়ানোকে।

লিলি গম্ভীর হইয়া উঠিল। মৃন্ময়ের চোখে মুখে তখনও হাসি লাগিয়া আছে। লিলি কহিল, তুমি ঠাট্টা করছ বটে, কিন্তু মেয়েদের কাছে এর চেয়ে বড় কাজ আর নেই।

মৃন্ময় মৃদু হাসিয়া বলিল, তুমি তো বি-এ পাস করেছ লিলি।

লিলি পুনশ্চ উত্তেজিত হইয়া বলিল, তুমি বলতে চাও কি? লেখাপড়া শিখলেই বুঝি মেয়েরা তাদের স্বভাব-ধর্ম্মকে ভুলে যাবে! মেয়েদের কাজ শুধু সৃষ্টি করাই নয় মিনুদা, সে সৃষ্টিকে লালন এবং পালন করবার দায়িত্ব ত তাদেরই।

মৃন্ময় আজ যেন কিছুতেই গম্ভীর হইতে পারিতেছে না। পুনরায় সে মুচকি হাসিয়া বলিল, ঠিক হচ্ছে না লিলি। এও সেই বড় বড় তত্ত্ব কথায়ই এসে যাচ্ছে, তার চেয়ে বরং সহজ ভাষায় বল যে, মেয়েরা সব সময়ই মেয়ে, তার চেয়ে একটুও বেশী নয়, একটুও কম নয়। পুরুষ খেতে ভালবাসে আর মেয়েরা খাওয়াতে ভালবাসে। তাই তোমার মিনুদাকে তুমি রান্না করে খাওয়াও আর সে প্রাণ ভরে খায়। এ সত্যকে আমায় মানতেই হবে লিলি। তাইতো বাইরের শত আকর্ষণও কোথাও আমায় আটকে রাখতে পারে না, ঠিক সময়টিতে এসে হাজির হই। আর মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তুমি না থাকলে আমার কি দুর্দ্দশাই না হ'ত।

মৃন্ময় থামিল। এতক্ষণের আলোচনার লঘু পরিবেশ সহসা ধাক্কা খাইয়া যেন ভিন্ন রূপ ধারণ করিল। মৃন্ময়ের কণ্ঠস্বরে একটা গভীর আন্তরিকতার সুর বাজিয়া উঠিল। সে পুনরায় বলিতে লাগিল, আমি বড়লোকের ছেলে নই লিলি। অর্থের চেয়ে স্নেহ-ভালবাসাটাই বেশী করে চেয়েছি, আর জ্ঞান হবার পর থেকেই তা এত বেশী পরিমাণে পেয়েছি যে, হঠাৎ এক দিন তার একান্ত দুষ্প্রাপ্যতায় আমি পাগল হয়ে উঠেছিলাম। আমি দ্বারে দ্বারে গিয়ে হাত পেতেছি, কিন্তু হাত আমার শূন্যই রয়ে গেছে, কেউ এক কণা দিয়ে তা পূর্ণ করে দেয় নি।

মৃন্ময় একটু থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, আমার সেদিনের সে বিরাট শূন্যতাকে সাধ্যমত ভরে দিতে তুমি এগিয়ে এলে। আমার একটা দিক পূর্ণ হয়ে উঠল।...

লিলির চোখমুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মৃন্ময়ের তাহা নজরে পড়িল না। সে বলিয়া চলিল, কিন্তু আর একটা দিকের শূন্যতা আমার দিন দিন বেড়েই চলল। রাজাবাবুর বিরাট গ্রন্থাগারের রাশি রাশি গ্রন্থও আমার সে অভাব পূরণ করতে পারে নি—শুধু মনের উপর সাময়িক একটা সান্ত্বনার প্রলেপ দিতেই সক্ষম হ'ল। কথাটা সেদিনই অত্যন্ত গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি যেদিন নাঙ্গুর ডাক এসে আমার কাছে পৌছল।

লিলির মুখখানি পুনরায় নিষ্প্রভ হইয়া গেল। ইহা চোখে পড়িলেও সে থামিতে পারিল না, বলিয়া চলিল, সে ডাকে সাড়া দিলে আমার দেহের প্রত্যেকটি রক্তবিন্দু—

তাহাকে কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই লিলি বলিল, তবুও তুমি মঞ্জুকে গ্রহণ করতে পারলে না মিনুদা? কিন্তু মেয়েরা এক্ষেত্রে সব ছেড়েছুড়ে যাকে একান্ত মনে কামনা করে তার হাত ধরে বেরিয়ে আসত।

মৃন্ময় কহিল, কথাটা কি আমিও ভেবে দেখি নি মনে করছ লিলি। তাইতো আজও আমার মন বলে যে, মানুষ আগাগোড়াই এক একটি সামাজিক সংস্কারে আচ্ছন্ন কাঠের পুতুল।

লিলি বলিল, কাঠের পুতুল হতে যাবে কেন মিনুদা। তোমাদের মাত্রাতিরিক্ত স্বার্থপরতাই সব কিছুর অন্তরায় হয়ে

দাঁড়ায়। তোমরা নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে এত বেশী সজাগ অথচ অপরের বেলায় তোমাদের সঙ্কীর্ণতার অন্ত নেই।

মৃন্ময় বলিল, হয়তো ঠিক কথাই তুমি বলেছ।···

বাধা দিয়া লিলি বলিল, হয়তো নয় একেবারে খাঁটি সত্য কথা বলেছি। চিন্তাধারা তোমাদের একটা দিক মাত্র লক্ষ্য করেই চলে, অপর একটা দিকও যে থাকতে পারে এ কথা তোমরা স্বীকার করো না। তোমাদের চলার পথে কেউ যদি নিষ্পিষ্ট হয়েও যায় তাতেও তোমরা ভ্রূক্ষেপ করো না।

মৃন্ময় বলিল, লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুতে গেলে এর প্রয়োজন আছে লিলি—

লিলি বলিল, আছে বৈকি—যাক না তাতে আর কারুর অস্তিত্বই লোপ পেয়ে। এই কথাই তুমি বলতে চাইছ তো ?

মৃন্ময় বলিল, বলতে আমি কোন কথাই চাই না লিলি। কথাটা তুমি বললে বলেই একটা জবাব দেবার চেষ্টা করছি।

লিলি বলিল, তুমি লক্ষ্যস্থল বলতে কি বোঝাতে চাইছ মিনুদা ? কোন্‌টা তোমার লক্ষ্যস্থল ছিল ? সে কি তোমার মঞ্জুকে দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করা, না তাকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে নিঃশব্দে সরে পড়া ! মুখেই শুধু তোমরা বড় বড় কথা বলতে জান, আসলে তোমাদের কোন নীতি নেই— আন্তরিকতা কোথাও নেই।

আন্তরিকতা নেই—কথাটা মনে মনে মৃন্ময় একবার আবৃত্তি করিয়া বলিল, যে জিনিষ একটা লোককে আগাগোড়া বদলে দিলে তাকে তুমি কি বলতে চাও লিলি ?

লিলি মৃদুকণ্ঠে বলিল, বদলে যদি সত্যিই তোমায় দিতে পারত মিনুদা তা হলে এ কথা আমার বলবার কোন প্রয়োজনই হ'ত না।

মৃন্ময় বিস্মিত হইয়া বলিল, তোমার কথা আমি সব সময় বুঝতে পারি না লিলি।

লিলি কহিল, তার কারণ হয় তুমি কোনদিন বুঝবার চেষ্টা করো নি অথবা আমি তোমায় ঠিকমত বোঝাতে পারি নি।

লিলি থামিল, মৃন্ময় নীরব।

কিছুক্ষণ মৃন্ময়ের মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া লিলি পুনরায় বলিল, তোমার মনের কথা আমি ঠিক জানি না, কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় তা নিছক পাথরে তৈরি নয়। রক্তমাংসের মানুষ তুমি—তোমার মনটাও তাই সজীব। সে মনে ঢেউ আছে, গতি আছে আর আছে সূক্ষ্ম অনুভূতি। কিন্তু এইটেই আমার সবচেয়ে আশ্চর্য্য লাগে মিনুদা যে, যার চোখে সূক্ষ্মতম বস্তুও কত সহজে ধরা পড়ছে তারই দৃষ্টিতে অতিস্থূল বস্তুও ধরা পড়ে না কেন ?

মৃন্ময় মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিল, একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, এর উত্তরও আমি আগেই দিয়েছি। লক্ষ্যবস্তু যেখানে অতি সূক্ষ্ম, স্থূল বস্তু সেখানে স্বভাবতঃই পরিত্যাজ্য— নইলে সূক্ষ্মবস্তু যে চোখেই পড়বে না লিলি।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। লিলি পুনরায় বলিতে লাগিল, যখন কোন কিছুই তোমার মনকে স্থির হবার সুযোগ দিলে না তখন এমন কিছু করো যাতে তোমার সত্যিকারের মনের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হতে পারে। বুকের মধ্যে এমনি একটা হাহাকার নিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে লাভ কি মিনুদা ?

কোন্ কথায় কি প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল। মৃন্ময় সহসা লিলিকে বাধা দিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, লাভ-লোকসানের হিসেব আজও আমি করে দেখি নি লিলি, কিন্তু আমার যতদূর মনে হয় তোমার কোথাও মারাত্মক ভুল হচ্ছে। আমার মনের আসল রূপটা তোমার চোখে পড়ে নি। তা হলে আজ এ কথা তুমি বলতে না। মাঝে মাঝে তুমি দুর্জ্ঞেয় হয়ে ওঠো। হয়তো এর প্রয়োজন আছে বলেই তোমায় এই পথে চলতে হচ্ছে, কিন্তু আমি যে লিলিকে জানি সে স্বচ্ছ, তার মধ্যে কোথাও অস্পষ্টতা নেই। দুর্জ্ঞেয় লিলি আমার কাছে দুর্বোধ্যই থাক, তার মনের গহনে প্রবেশাধিকার আমার নেই—আর সে অধিকার আমি কোন দিনই চাই নি। আমাকে নিজের মত করে চলতে দাও লিলি।

লিলি অভিভূতের মত মৃন্ময়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। মৃন্ময় থামিল। আরও কিছুক্ষণ এমনি কাটিতে লিলি মৃদু কণ্ঠে ডাকিল; মিনুদা ?···

মৃন্ময় স্নিগ্ধ কণ্ঠে সাড়া দিল—আমাকে কিছু বলবে লিলি ?

লিলি আরও কিছুক্ষণ নতমস্তকে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। মৃদুকণ্ঠে বলিল, ভুল সত্যই আমার হয়েছে। চলার পথে দৃষ্টি তোমার ঠিকই আছে, আমিই শুধু বোকার মত বিচার করেছি, কিন্তু বিশ্বাস করো, তোমাকে আমি একদিনের জন্যও ঠকাই নি—ঠকেছি আমি নিজে।

মৃন্ময় একটুখানি হাসিল। সে হাসি লিলিকে লজ্জা দিল। মৃন্ময় স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, তোমার আজ কি হয়েছে আমি জানি না। আমার লজ্জা এবং বেদনার কথা কাউকে বলবার নয়, ওটা একান্তই আমার নিজস্ব—কিন্তু তোমার ত এতটা বিচলিত হওয়া শোভা পায় না লিলি।··· আর সত্য সত্যই যখন এর কোন সঙ্গত কারণ নেই।···

লিলি বলিল, মানুষের মন নিয়ে যেখানে কথা সেখানে সঙ্গত-অসঙ্গতের প্রশ্ন না তোলাই ভাল মিনুদা। তবুও কথাটা যখন তুললে তখন এর একটা জবাবও শুনে রাখ। ভুল তুমিও যেমন একদিক থেকে করেছ, আমিও তেমনি করেছি। জান মিনুদা, অল্পবয়সে ঠাকুরমাকে যখন শিবপূজো করতে দেখেছি তখন ভাবতাম এ অনুষ্ঠানের কিসের প্রয়োজন।

ঠাকুর ত কোনদিন কথা কইবেন না—আজ কিন্তু মনে হচ্ছে এর কোন কিছুই মিথ্যে নয়। অন্ততঃ যে ঐকান্তিক নিষ্ঠা আর ভক্তি নিয়ে পুজো করে তার পক্ষে ত নয়ই। কিন্তু এ সব আলোচনা এখন থাক—তোমার মহীপাল আসছে। আমি বরং তোমাদের জন্যে চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

লিলি দ্রুত প্রস্থান করিল। সেইদিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে মৃন্ময়ের একটি নিঃশ্বাস পড়িল।

মহীপাল ততক্ষণে আসিয়া মৃন্ময়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে।

মৃন্ময় বলিল, বসো মহীপাল।

২৩

আজ বহুদিন পরে পুনরায় নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল। মৃন্ময় মহীপালের সহিত বাহির হইল না। শরীর খারাপ এই ওজুহাতে তাহাকে ফিরাইয়া দিল। এই মুহূর্ত্তে তাহার একলা থাকিবার প্রয়োজন আছে। মনে হইতেছে লিলি সম্বন্ধে তাহার এতটা উদাসীন থাকা উচিত হয় নাই। নিজের মনোভাবকে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত প্রচ্ছন্ন রাখিবার সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও সব সময় সে সফলকাম হয় নাই—সময়-সময় মনের কথাটি ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু মৃন্ময় গ্রাহ্য করে নাই। কিন্তু তাহার বুঝা উচিত ছিল যে, মানুষ সব সময়ই দোষেগুণে মানুষ—পাথরের দেবতা নয়, তার প্রাণ আছে, অনুভূতি আছে। সে বোবা নয়—তার আত্মপ্রকাশের ভাষা আছে। মৃন্ময়ের সত্যই লিলির জন্য দুঃখ হয়। উহাকে কাছে টানিয়া লইতেও সে পারিতেছে না, দূরে সরাইয়া দিবার কথা ভাবিতে গেলেও হৃদয়ে বেদনা অনুভব করে। এই এক ধরণের দুর্ব্বলতা।

মৃন্ময় অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করিতেছে। জানালাটা খুলিয়া দিয়া সে হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে আকাশে পূর্ণচন্দ্র প্রকাশ পাইয়াছে। আজ পূর্ণিমা। আকাশে মেঘের লেশমাত্র নাই। জ্যোৎস্না অজস্র ধারায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে—গাছের মাথায় মাথায়, পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়। জানালার কাছেই সে আলো মৃন্ময়ের শয্যার উপরেও আসিয়া পড়িয়াছে। তারি চমৎকার মিষ্টি হাওয়া দিয়াছে। মৃন্ময় বাহিরে দৃষ্টি ফিরাইল। ভাল লাগে না।

লছমিয়া ঘরে ঢুকিল চা আর কিছু জলখাবার লইয়া। মৃন্ময় জানাইল, চায়ের তার প্রয়োজন নাই।

লছমিয়ার চলিয়া যাইবার অনতিকাল মধ্যেই লিলি আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, চা-জলখাবার ফিরিয়ে দিলে কেন?

মৃন্ময় জবাব দিল, শরীরটা ভাল ঠেকছে না—

লিলি খানিক কি চিন্তা করিয়া মৃন্ময়ের শয্যার একধারে বসিল, মৃদুকণ্ঠে বলিল, রাত্রে খাবে তো?

মৃন্ময় খানিকক্ষণ লিলির মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করছ কেন লিলি?

লিলি তেমনি স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, বলছিলাম এই জন্যে যে, তা হলে আর অযথা আমাকে পণ্ডশ্রম করতে হবে না। সে একটু থামিয়া যেন আত্মগতভাবেই বলিতে লাগিল, বিকেলে চা, জলখাবার খাওয়া ত অনেক দিনই ছেড়ে দিয়েছ। মহীপাল চলে যেতে ভাবলাম, আজ যখন বাড়ীতেই রয়েছ তখন হয়তো—লিলি কথাটা শেষ না করিয়াই সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল।

মৃন্ময় বাধা দিল, যেও না লিলি—

লিলি পুনরায় বসিল। মৃন্ময় বলিল, আমার চা জলখাবার না খেতে চাওয়াটাকে এত বড় করে দেখো না তুমি। আমার অন্যান্য কাজের কথা অবশ্য আলাদা, তা নিতান্ত অকারণে আমি করি নি লিলি, আমার এ কথাটা একটু চিন্তা করলেই তুমিও বুঝবে। তোমাকেও আমি বুঝি আবার নিজেকেও আমি চিনি। সব দিকে একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলবার চেষ্টাই আমি বরাবর করে আসছি, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আমার সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে।

লিলি সহসা রীতিমত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কহিল, এ কথা মনে করবার কোন কারণ নেই মিনুদা। অন্ততঃ তুমি একথা কোনমতেই বলতে পার না—কিছুতেই না।

মৃন্ময় লিলির কথাটাকে একপ্রকার স্বীকার করিয়া লইয়া কহিল, ভুল করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষটাকেই আমি সর্ব্বপ্রথম দেখেছিলাম—তাকে ছোট করেও দেখিনি, বড় করেও নয়। কিন্তু তুমি এত রাগ করছ কেন? উত্তেজিত হয়েই বা উঠছ কিসের জন্য লিলি।

মৃন্ময়ের অনুতপ্ত হৃদয়ের এই অনুযোগে লিলি লজ্জা পাইল। সে মাথা নত করিল। মৃন্ময় তেমনি শান্তভাবে বলিতে লাগিল, তা বলে তোমার লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই লিলি। মানুষ কখনই তার স্বভাব-ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে···সহসা সে কথার মাঝখানে থামিল। দরজার সম্মুখে লছমিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, হাতে তার একখানি চিঠি। লছমিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া চিঠিখানি মৃন্ময়ের হাতে দিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল। মৃন্ময় চিঠিখানি বিছানার একপাশে রাখিয়া দিয়া পূর্ব্বকথার সূত্র ধরিয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল, হাঁ, একথা একটুও মিথ্যে নয় লিলি—সত্যই সে পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না।

মৃন্ময় চোখ বুজিয়া কি যেন চিন্তা করিতে লাগিল। লিলি একটু নড়িয়া চড়িয়া পুনরায় স্থির হইয়া বসিল। চোখ-মুখের ভাব তার ক্ষণে ক্ষণে বদলাইতেছে। কিছুক্ষণ পরে মৃন্ময় চোখ খুলিল। লিলির মুখের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, [illegible]

গোপনতার বাহ্যিক আবরণ না থাকাই বাঞ্ছনীয়—তুমি কি বল লিলি!

লিলি কোন জবাব দিল না। তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল। মৃন্ময় বলিতে লাগিল, বহুদিন তোমার উক্তি এবং আচরণের মধ্যে, অকুণ্ঠ সেবার মধ্যে সে আভাস আমি বহু বার পেয়েছি। তুমি অস্বীকার করতে পার—তর্ক করতেও পার, কিন্তু আমি যা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছি সে ত মিথ্যে হতে পারে না। এ তুমি কি করলে লিলি? আমার এত বড় একটা আশ্রয়স্থলে, এত বড় একটা ভরসার ক্ষেত্রেও আজ আর আমি নিশ্চিন্ত নই—সুখী নই···

লিলি এতক্ষণে মুখ তুলিয়া চাহিল, সে মুখে রক্তের লেশ-মাত্র নাই। সে কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া উদ্বেগব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, তুমি যত ইচ্ছা অনুযোগই আমায় দাও না কেন তার কোন জবাব, আমি দেব না, কিন্তু মনে রেখো মিনুদা ভুল করেও কোন দিন কোন কারণে তোমার চলার পথে আমি বাধার সৃষ্টি করি নি।

মৃন্ময় বলিল, সেই খানেই তো আমার আরও বেশী ভয়—মনে হয় বোঝা আমার দিন দিন শুধু ভারী হয়েই উঠছে। তোমাকে মিথ্যে বলব না—মাঝে মাঝে আমার মনে হয় কেন আবার এখানে ফিরে এলাম। নান্টুর মত অদৃষ্টের উপর ভরসা করে আমারও পথেই বেরিয়ে পড়া উচিত ছিল। তাতে অন্ততঃ আমায় এমন করে দোটানায় পড়তে হ'ত না। আমার জীবনে আবার নূতন করে জট পাকিয়ে উঠত না।

মৃন্ময় থামিল। সহসা একখণ্ড কাল মেঘ ভাসিয়া আসিয়া চাঁদকে আড়াল করিল। হয়তো বাতাসের বেগে পুনরায় তাহা সরিয়া যাইবে—আবার জ্যোৎস্না হাসিয়া উঠিবে। লিলির একটি নিঃশ্বাস পড়িল, সে কোন কথা কহিল না। মৃন্ময় তার আনত মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, অনেক দিন ধরেই প্রশ্নটা আমার মনে দেখা দিয়েছে—এখন কি করি? এখান থেকে চলে যেতেই চেয়েছিলাম, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা সম্ভব হয় নি, কিন্তু এখন ভাবছি সেইটেই আমার উচিত ছিল।

লিলি সহসা সোজা হইয়া বসিল। স্থির অকম্পিত কণ্ঠে ডাকিল, মিনুদা—

মৃন্ময় বলিল, আমায় কিছু বলবে লিলি?

লিলি শান্তভাবে কহিল, বলতে আর তুমি দিচ্ছ কোথায়। শুধু নিজের কথাই এতক্ষণ ধরে বলে যাচ্ছ। অনেক কিছুই তুমি বলেছ—হয়তো তোমার কথাই ঠিক। আমারই অন্যায় হয়ে গেছে, কিন্তু একে অন্যায় বলেই যদি গোড়া থেকে তুমি জেনেছিলে তা হলে প্রশ্রয় দিয়েছিলে কিসের জন্ত। আমি না হয় ভুল করে অপরাধ করেছি, কিন্তু সে ভুলকে জেনে শুনে প্রশ্রয় দিয়ে তুমি অন্যায় করেছ।

মৃন্ময় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ঈষৎ উত্তপ্ত কণ্ঠে ডাকিল, লিলি—

লিলি তেমনি উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিল, আমাকে বলতে দাও মিনুদা, কি মনে কর তুমি আমাকে?···কিছু বুঝি না আমি? গোড়াতেই যদি এখান থেকে চলে যেতে চেয়েছিলে কেন গেলে না জানতে পারি কি? আমি তোমায় ডেকেও আনি নি, থাকবার জন্তে সাধাসাধিও করি নি। তবু তোমার মধ্যে এ দুর্ব্বলতা কেন দেখা দিয়েছিল। না সেটাও আমার ভুল—আমার অন্যায়।

একসঙ্গে এতগুলি কথা বলিয়া লিলি হাঁপাইতে লাগিল। মৃন্ময়ের মুখে ভারী স্নিগ্ধ একটু হাসি দেখা দিল। সে সস্নেহে কহিল, তুমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছ। এ সময় কোন কথা তোমায় না বলাই আমার উচিত ছিল, কিন্তু তবুও আমায় বলতে হবে, নইলে এর পরে আর হয়তো কোন দিন সুযোগই পাব না।

লিলি ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে মৃন্ময়ের মুখের পানে চাহিল। মৃন্ময় বলিয়া চলিল, তুমি যে অভিযোগ আজ করলে, এর জন্তে আমি প্রস্তুত ছিলাম না, তাই বলে একে অস্বীকার করবার উপায়ও আমার নেই। তবুও আমার মনে হচ্ছে এ তো লিলির সত্যিকার মনের কথা নয়। সে কি তার মিনুদাকে এক দিনের জন্তও চিনতে পারে নি। তার জীবনের কোন কথাই যে লিলির অজানা নয়। কিন্তু যাক এসব কথা। অভিযোগ সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক তা সব সময় মনকে পীড়া দেয়। তাই ভাবছি এখানে ত আর কোনক্রমেই আমার থাকা চলবে না।

আকাশে সেই যে কালো মেঘ জমা হইয়াছিল তাহা এখনও সরিয়া যায় নাই। ঈষৎ আর্দ্র বাতাস বহিতে সুরু হইয়াছে। হয়তো এখনই বৃষ্টি আরম্ভ হইবে।···

লিলির চোখেও জল দেখা দিয়াছে। সে তাহাই গোপন করিতে অপর দিকে মুখ ফিরাইল। মৃন্ময় সেইদিকে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, যদি পার তবে এসব ভুল-ভ্রান্তি এবং অভিযোগ থেকে দূরে সরে থেকো। তোমার জীবনের এই অধ্যায়কে বরং একেবারে ভুলে যেতে চেষ্টা করো। তোমার মিনুদা আর কোন দিন কোন কারণে তোমার সামনে আসবে না। জীবনে সে অনেক ভুল করেছে। আর একটা না হয় তার সঙ্গে যোগ হ'ল, কিন্তু একটা কথা আমার তুমি বিশ্বাস করো যে, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তোমার এখানে আমি আসি নি, কিন্তু থাক্ সে সব কথা। মৃন্ময় থামিল।

লিলি এতক্ষণে সামলাইয়া লইয়াছে। সে শান্তকণ্ঠে ডাকিল, মিনুদা—

মৃন্ময় সাড়া দিল। লিলির দুই চোখের কোল বাহিয়া

অশ্রুর ধারা নামিয়া আসিয়াছে। সে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, তুমি কি সত্যিই চলে যাবে ?

মৃন্ময় কহিল, এ ছাড়া অন্য কোন পথই চোখে পড়ছে না যে—

লিলি কহিল, আর কোনদিন কোন ছলে আমার সামনে আসবে না ?…

মৃন্ময় মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে জানাইল, না আসাই তো উচিত—

লিলি সহসা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল, মৃন্ময়ের একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আমি তোমায় যেতে না দিলেও তুমি এখান থেকে চলে যেতে পার, মনে করো ?

মৃন্ময় বাধা দিল না—হাতখানি মুক্ত করিয়াও লইল না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এমনি ভাবে আরও কিছুক্ষণ কাটিল। লিলি ইতিমধ্যে নিজের দুর্দমনীয় আবেগকে সামলাইয়া লইয়াছে। মৃন্ময়ের হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া সে একটু সরিয়া বসিল।

মৃন্ময় চেষ্টা করিয়া খানিকটা স্বাভাবিক ভাব ফিরাইয়া আনিয়া বলিল, তুমি যেতে দেবে না কিসের জন্যে। আমার চলে যাওয়া প্রয়োজন তো শুধু আমার একলার জন্যেই নয় লিলি, আমাদের উভয়ের মঙ্গলের জন্যে এ ছাড়া আর পথ নেই।

লিলি যেন আপন মনেই বলিয়া চলিল, তা বটে—আমার কল্যাণের জন্যেই তোমাকে আমার সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল, আবার আমার মঙ্গলের জন্যেই তোমাকে চিরদিনের জন্য আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করে চলে যেতে হবে। বেশ কথা, তোমার কাজে বাধা দেবার আমি কে—কতখানি অধিকার আমার আছে! কিন্তু এক দিন হয়তো বুঝবে যে, কত সামান্য কারণে কত বড় নিষ্ঠুর শাস্তি তুমি আমায় দিলে।

লিলি উঠিয়া দাঁড়াইল—একটুখানি ইতস্ততঃ করিল, পরমুহূর্তেই মুক্ত দ্বারপথে অদৃশ্য হইয়া গেল। একবার ফিরিয়াও তাকাইল না। তার চলার পথের পানে চাহিয়া চাহিয়া মৃন্ময়ের একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। কিন্তু সে চলিয়া যাইতেই সহসা মৃন্ময়ের মনে হইল যে, কাজটা হয় তো ভাল হইল না। তাহা ছাড়া যে কথা লিলি বলিয়া গেল যুক্তি-বিচারের দিক দিয়া তাহা এক কথায় উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

বাহিরে তুমুল ঝড় উঠিয়াছে—সেই সঙ্গে বৃষ্টি। মৃন্ময় উঠিয়া জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিল। ফিরিয়া আসিতেই তার চোখে পড়িল টেবিলের উপর সযত্নে রক্ষিত একখানি চিঠি। আশ্চর্য্য, এতক্ষণ চিঠিখানির কথা একেবারে ভুলিয়াই ছিল। মৃন্ময় সাগ্রহে চিঠিখানি খুলিয়া ফেলিল। লিখিয়াছে নান্টু—

মৃন্ময়,

এত শিগ্‌গীর যে আবার তোমায় চিঠি লিখতে পারব তা আমার নিজেরই ধারণা ছিল না। পথের পাশ থেকে আবার আমাকে গৃহকোণে আশ্রয় নিতে হয়েছে। না নিয়ে আমার উপায় ছিল না। মুখে যত বড়াই করি না কেন এটা সত্য যে মাঝে মাঝে আমার মত ভবঘুরেও স্থির হয়ে বসতে চায়। এমন সময় আসে যখন একটু আরাম আর নিরুপদ্রব জীবনযাপন করাটা নেহাত অপছন্দও করি না। তাইতো আবার ফিরে আসতে হ'ল। নিজের কথা ছেড়ে দিলেও অন্ততঃ আর একটি মেয়ের জন্যে আমাকে মত বদলাতে হয়েছে, কিন্তু সেই থেকে ভাবছি যে এই মেয়েজাতটাকে আজও আমি চিনতে পারলাম না। ওরা কখন যে কি বলে আর কখন যে কি করে তার অন্ত পাওয়া ভার। ওরা মনে মুখে সম্পূর্ণ আলাদা। অন্ততঃ আমার জীবনপথে যে কয়টির আবির্ভাব ঘটেছে তাদের সম্বন্ধে একথা আমি বলতে পারি। বুঝতেই পেরেছ বোধ হয় যে, লীলা রাওয়ের হাত থেকে আজও আমি মুক্তি পাই নি। বিদায়বেলার সেই দুটি জ্বলন্ত চোখের আড়ালে যে এত জল লুকানো থাকতে পারে তা কেমন করে জানব ভাই। আমার সকল অহঙ্কার, সকল দম্ভ ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

মাত্র সাতটি দিন—এরই ব্যবধানে কি পরিবর্তন! ওকে আর চিনবার উপায় ছিল না। ষ্টুডিওতে যাওয়া বন্ধ করে শুধু নাকি দিনরাত গাড়ী নিয়ে আমায় খুঁজে ফিরেছে।

নিরালা পথ ধরে চলেছিলাম। পাশে এসে দামী গাড়ীটা ব্রেক কষলে। গাড়ীর সে জৌলুস নেই। ধুলায় আচ্ছন্ন, কিন্তু তার চেয়েও শোচনীয় অবস্থা মনে হ'ল গাড়ীর মালিকের। অবাক বিস্ময়ে তার মুখের পানে চাইতেই সে একটু লজ্জিতভাবে হেসে বলে উঠল, কোন কথা নয়—ভেতরে এসো।

বললাম, কিন্তু…

লীলা ব্যাকুল কণ্ঠে বললে, রাস্তার মাঝে এত লোকের সামনে পায়ে ধরতে বসছ নাকি—

বিচলিত হলাম। ওকে ঠিক ধাতস্থ মনে হ'ল না। বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ীর মধ্যে উঠে এলাম। লীলা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমার একখানা হাত নিয়ে ছেলেমানুষের মত খেলা করতে লাগল। বাধা দিলাম না। মনে হচ্ছিল, লীলার পক্ষে এর প্রয়োজন আছে। একটি সুগভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সহসা লীলা বলে উঠল, কি করে যে এই সাতটি রাত আর সাতটি দিন আমার কেটেছে সে তুমি বুঝবে না নান্টু। তুমি যে কি তা আজও আমি বুঝলাম না।

হেসে জবাব দিলাম, সম্ভবতঃ ইস্পাত—

ছেলেমানুষের মত মাথা নেড়ে নেড়ে লীলা জবাব দিলে, উহুঁ—আঘাতে সেও বেঁকে যায়। কিন্তু তোমার তুলনা শুধু তুমি।

লীলার মুখের পানে চোখ তুলে চাইলাম। ওর দু'চোখে জল টল টল করছে। মুখে কিন্তু চমৎকার একটু হাসি লেগে

রয়েছে। অনেক দিন পরে আবার আমি সেই লীলাকে ফিরে পেলাম যাকে আর একদিন পেয়েছিলাম ওয়ালটেয়ারে; যে স্নেহ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে আমাকে আগাগোড়া বদলে দিয়েছিল। ডাকলাম, লীলা—

ও সাড়া দিলে, উম্। লীলা চোখ বুজে একান্ত নির্ভরতায় আমার কাঁধের উপর মাথা রেখে বসে ছিল।

বললাম, তুমি পাগল লীলা।...লীলার মুখে পুনরায় তেমনি মিঠে হাসি দেখা দিলে। ওর হাতের মধ্যে আবদ্ধ আমার হাতখানায় একটু চাপ অনুভব করলাম। একটু নড়ে চড়ে আরও ঘন হয়ে বসে লীলা সাড়া দিলে, হুঁ—মুখের হাসিটি কিন্তু তখনও তেমনি অম্লান। আমি মানুষ ত বটে। আমার অহঙ্কার এমনি করেই চূর্ণ হ'ল। আমি হেরে গেলাম, কিন্তু এ পরাজয়ে আনন্দ আছে. অনির্ব্বচনীয় সে আনন্দ।...

চিত্রাভিনয় লীলা আর করবে না। বলে, ওতে নাকি প্রাণের খোরাক মেলে না। প্রাচুর্য্য আছে, কিন্তু বাইরের মিথ্যা জৌলুসে আসল জিনিষটাকেই খুঁজে পাওয়া যায় না, এবং এই মিথ্যার জন্যে সে নাকি সত্যকে বিসর্জ্জন দিতে পারবে না।

জিজ্ঞেস করি, সত্য তুমি কাকে বলছ লীলা? তার সন্ধান ত এখনও পেলাম না।

লীলা ফিস ফিস করে বললে, তা কি তুমি জান না নান্টু? চোখে যা দেখা যায় না তাকে বুঝি অনুভব করা যায় না!

জবাব দিলাম, সব সময় কি তা যায় লীলা?

লীলা ছেলেমানুষের মত ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলে উঠল, মিথ্যে বল নি নান্টু। আমি নিজেই কি এমন করে এর আগে অনুভব করতে পেরেছিলাম। কি ছাই ঐশ্বর্য্য, কিসের আবার মর্য্যাদা-প্রতিপত্তি। এর মোহ থেকেই যদি নিজেকে না মুক্ত রাখতে পারলাম তবে...কথাটা শেষ না করেই লীলা আমার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল।...

ভাবছিলাম লীলা কি সত্যিই বদলে গেছে আজ। এতখানি আবেগ, নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করবার এমন আকুল আগ্রহ এর আগে কোন দিন তার দেখি নি। কিন্তু আমি বাধা দিতেও পারি নি। আমার রক্তের মধ্যে একটা সঙ্গীতের ঝঙ্কার জেগে উঠল। ধীরে ধীরে ওর মাথায় হাত বুলাতে লাগলাম। দু'হাতে ওর মুখখানাকে তুলে ধরে দেখতে গেলাম। চোখে চোখ পড়তেই লীলা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। বড় অপূর্ব্ব সুন্দর লাগল তাকে। লীলা আরও গভীরভাবে আমায় বেষ্টন করে রইল। মুখ সে কিছুতেই দেখাবে না।

ধীরে ধীরে মুখ নীচু করে বললাম, এবারে ওঠ লীলা। বাড়ী এসে পড়েছে যে। লীলা উঠে বসল। মনে হ'ল ওর এতক্ষণের স্বপ্নের ঘোর কেটে গেছে। দ্রুত সে তার অবিন্যস্ত চুলগুলিকে যথাসম্ভব ঠিক করে নিলে। বিস্মিত হলাম—লীলার চোখে জল!

বড় আশ্চর্য্য লাগল। এর আগেও এমনি ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু এত চাঞ্চল্য কোন দিন লীলার মধ্যে দেখি নি। কথাটা তাকে বললাম। ওর মুখে হাসি ফুটে উঠল। বললে, এ প্রশ্ন আমার মনেও দেখা দিয়েছে নান্টু, তার উত্তরও আমি পেয়েছি, কিন্তু কথাটা আমার মুখ থেকে নাই-বা শুনলে। দ্বিতীয় বার তাকে আর আমি প্রশ্ন করি নি।

বাড়ীতে পা দিয়েই লীলা বললে, চেহারা ত এ ক'দিনে খুবই চমৎকার হয়েছে। এবারে দয়া করে স্নানের ঘরে চলে যাও দেখি সুবোধ ছেলেটির মত।...

সেই থেকেই আমি ভাবছি জীবনের ধারা এ আবার কোন নূতন খাতে বইতে সুরু হ'ল। লীলা আজ আর অস্পষ্ট নয়। খোলাখুলি সে জানিয়ে দিয়েছে যে, আমাকে তার চাই। একান্ত দৃঢ়তার সহিত সে তার দাবি জানিয়েছে—এর নড়চড় হলে নাকি খণ্ডপ্রলয় দেখা দেবে।

হেসে বলি, মন্দ কি জীবনের আর একটা নূতন দিকের সন্ধান পাওয়া যাবে।

লীলা জ্বলে ওঠে। আমি বলি, আমি পথের মানুষ—আমাকে ঘরে বাঁধবার চেষ্টা করো না।

লীলা জবাব দেয়, বেশ ত ঘরের চেয়ে পথই যদি তোমার কাম্য হয় ত সেখানেই নূতন করে ঘর বাঁধব।

হেসে বলি, পথের বৈশিষ্ট্য তা হলে রইল কোথায়। এ যে নিছক বাড়ীবদল করা লীলা।

লীলা এবারে আর রাগ করে না, বলে, অতশত আমি বুঝি নে নান্টু—

আমি বলি, কিন্তু বোঝা তোমার উচিত ছিল, তুমি কি মনে কর এমনি আরাম আর আয়েসের মধ্যে থাকলেই পোষ মানব। আমাদের স্বভাবই যে আলাদা। সুযোগ পেলে সট্ করে চলে যেতেও পারি—

লীলা অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দেয়, তুমি কি মনে কর আমি তা পারি না। না এই সম্পদের লোভে পিছনে পড়ে থাকব। যে ভুল একবার করেছি কোনকিছুর বিনিময়ে তা আর দ্বিতীয় বার করব না।

হেসে বলি, উত্তরটা কিন্তু ঠিক হ'ল না লীলা। তুমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছ মনে হচ্ছে। শুধু নিজের কথাটাই বলে যাচ্ছ।

লীলা আমার একথায়ও কান দিলে না। সহসা সে আমার সামনে এসে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল—কাঁধের উপর দুখানা হাত রেখে গভীর আবেগের সঙ্গে বলতে লাগল, তাকাও তো আমার মুখের পানে নান্টু। হ্যাঁ এইবার বল পারবে আমায় ফাঁকি দিতে।

আমি জবাব দিতে পারি না, চুপ করে থাকি। লীলার নিজের যুক্তির উপর নিজেরই আস্থা নেই, তাই এমনি করে সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

লীলা আবার বললে, তুমি হাসছ নান্টু। তুমি কি ভেবেছ আমার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে তুমি আমায় শাস্তি দিতে পারবে? এত ছোট তুমি কিছুতেই হতে পার না।

কি যে আমি পারি, আর কি যে পারি না এই মুহূর্তে সেইটেই বড় প্রশ্ন নয়—বড় হয়ে উঠেছে আর একটি দুর্লভ বস্তু। লীলার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে একটু চাপ দিয়ে জবাব দিয়েছি, মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক।

লীলা খুশিতে চঞ্চল হয়ে ওঠে। বলে, তুমি আমায় বাঁচালে নান্টু—আজ আমি নিশ্চিন্ত। ও যে কি করবে, কি বলবে তা যেন ঠিক করে উঠতে পারছে না। এক বার বললে, আজ আমায় নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াবে, পরমুহূর্তে বলে, একটা গান শুনবে নান্টু যে গান তুমি আমায় ওয়ালটেয়ারে শিখিয়েছিলে?

আমার জীবনপথে লীলা প্লাবন নিয়ে এসেছে। জানি না এর প্রচণ্ড বেগ সব ভেঙে চুরে আবার কোথায় আমায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যেখানেই নিয়ে যাক্ আর আমি বাধার সৃষ্টি করব না। দেখাই যাক শেষ পর্য্যন্ত কি হয়। ভাল আছি। ইতি—নান্টু।

পুনশ্চ—দিনকয়েকের জন্ত কোথাও যাব ঠিক করেছি। লীলা বলছে তোমাদের ওখানে যাবে এবং দু'এক দিনের মধ্যেই রওনা হবে। ওর সবকিছুতেই অনাবশ্যক তাড়াহুড়ো।

এই মাত্র আর একটা খবর পেলাম মঞ্জুষা নাকি অত্যন্ত অসুস্থ। অবস্থাটা খুবই জটিল বলেই সংবাদ পেলাম। যাবার পথে একবার সঠিক খবরটা নিয়ে যেতে হবে। যাবার পূর্ব্বে তোমাকে তার পাঠাব। ষ্টেশনে থেকো। নান্টু

চিঠিখানি শেষ করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিল লিলি নিঃশব্দে অদূরে দাঁড়াইয়া আছে।

লিলি বলিল, রাত্রে কি খাবে তাই জানতে এলাম।

মৃন্ময় অন্তমনস্কভাবে উত্তর দিল, সেটা তুমিই ঠিক করে নিও।

লিলি আর দাঁড়াইল না।

ক্রমশঃ

নবদিগন্তে

শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত

আমাও এ সভ্যতার কীর্ত্তিদম্ভ বিঘোষিত জয়!
শহর নগর এত গড়া হলো মনের মতন,
তবুও মানুষ আজো হৃদয়ের পেল না আশ্রয়,
চারিদিকে হিংস্র হিম অন্ধকার অরণ্য গহন!
বারুদ বোমার স্তূপে আগুনের বিপুল সঞ্চয়,
ফুটেছে কি তার হাতে একটিও কুঁড়ির জীবন?
এত পথ কাটা হলো, খোঁড়া হলো খনির হৃদয়,
কোথায় সে পথ বলো—এক মন হ'তে অন্ত মন?

আরেক দিগন্তে তাই সভ্যতার হোক অভিযান,
হৃদয়-কোটানো প্রেম মিলনের উৎস আবিষ্কারে;
জীবন শুনুক সত্য পথ-সেতু বাঁধিবার ডাক;
অরণ্য-পর্ব্বের শেষ; রাহুমুক্ত দীপ্ত সূর্য্য-গান
উঠুক জীবন ঘিরে; স্বপনের মোহনার দ্বারে
গড়ুক উজ্জ্বল পৃথ্বী কুসুমিত সবার সোহাগ।

প্রতীক্ষায়

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

তোমার একান্তে পাওয়া বিরহ লিপিকা
ফিরে ফিরে পড়ি আজো নিশীথ স্বপনে।
নিবিড় নিঃসঙ্গ কোন ছায়াপথ বহি
নেমে এসো অভিসারে অর্দ্ধ জাগরণে।

আমার ভুবনে তব রূপের মূরতি
লভেছে শাশ্বত রূপ রসের আখরে।
ক্ষণিকের মিলনের মধুস্মৃতি দিয়া
বিচ্ছেদের শূন্তপাত্র রাখিয়াছি ভরে।

দৈব-রচা ব্যবধান কবে হবে দূর?
আঁখির আকাশে কবে উদিবে চন্দ্রমা?
মিলনের মহোৎসব না জানি সে কবে
দূর করি দিবে দীর্ঘ বিরহের অমা!

মৌন মুখে আজো তাই কাটাই জীবন।
অপেক্ষায় আছি আসে বসন্ত কখন?

তিব্বতের ধনসম্পদ ও বাণিজ্য

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

উত্তরে মধ্য-এশিয়ার মরুভূমি হইতে তিব্বতকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে কুয়েনলুন্ পর্ব্বতমালা। দক্ষিণে ভারতের নিম্নভূমি ও তিব্বতের মধ্যে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে হিমালয়। এই দুইটির মধ্যে সু-উচ্চ মালভূমি তিব্বত। তিব্বতের পশ্চিমে সিন্ধু, শতদ্রু প্রভৃতি কয়েকটি নদী পশ্চিমপথে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। তাহা ছাড়া তিব্বতের ছোট বড় বহু নদী পূর্ব্ববাহিনী হইয়া হয় দক্ষিণে নয় পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণের দিকে গিয়াছে।

তিব্বত পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু দেশ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। উত্তরের দিকে বেশীর ভাগ অংশই ১৫০০০ হইতে ১৭০০০ হাজার ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ। উপত্যকাও ১১০০০ হাজার ফুট। তিব্বতের বড় নদী, সাঙ্পো বা ব্রহ্মপুত্র ১৩,৭০০ ফুট উচ্চে বহিয়া যাইতেছে। ইহার দুই পাশের উপত্যকাতে গোম্ফা, বিহার, লোকের বসবাস, কৃষি ইত্যাদি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই নদীতে নৌকা চলে। তিব্বতে ১৯।২০ হাজার ফুট উচ্চ গিরিবর্ত্ম দিয়া মানুষ ও খচ্চর প্রভৃতি দৈনিক যাতায়াত করিতেছে।

তিব্বতের সকল অংশই যে বসবাস ও কৃষি শিল্পের পক্ষে সমান উপযোগী তাহা নহে। এই উদ্দেশ্যে তিব্বতকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগ উত্তরের দিকে ১৬,০০০ হাজার ফুট উচ্চে মরুভূমিসদৃশ দেশ—চ্যাঙ্‌ট্যাঙ্। এই অঞ্চল কৃষি ও বসবাসের পক্ষে একেবারেই উপযুক্ত নহে। এই দিকের অগম্য পাহাড়ের অভ্যন্তর ভাগের সকল খবর এখনও ভাল ভাবে জানা যায় নাই।

দ্বিতীয় অংশকে দক্ষিণের স্তর বলা যাইতে পারে। এই স্তরে পড়ে সিন্ধু, শতদ্রু, ব্রহ্মপুত্র নদনদীর উপরের দিকের উপত্যকাসমূহ এবং ঐ সকল নদীর শাখা-প্রশাখা দ্বারা বিধৌত দেশসকল। সিন্ধু, শতদ্রু তিব্বতের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে গিয়াছে। এই দুই নদীর উপত্যকাতে কতকগুলি প্রসিদ্ধ শহর গড়িয়া উঠিয়াছে। সেইগুলি স্থানীয় ব্যবসাকেন্দ্র। ব্রহ্মপুত্র পশ্চিম হইতে তিব্বতের বুকের উপর দিয়া পূর্ব্বে যাইয়া পরে মোড় ফিরিয়া দক্ষিণে আসামে ঢুকিয়াছে। সাঙ্পো বা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাকেই তিব্বতের প্রাণ বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মপুত্র ও উহার শাখা-প্রশাখার দুই তীরেই গড়িয়া উঠিয়াছে তিব্বতের রাজধানী লাসা, বড় বড় শহর, অসংখ্য পল্লী, বিহার, গোম্ফা, কৃষি ও শিল্পকেন্দ্র, বাণিজ্যপথ। তিব্বতের যাহা কিছু সমৃদ্ধি তাহা এই নদীগুলির দৌলতে। ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দিয়া চামড়ার নৌকায় পারাপার চলে বলিয়া নদীতীরবর্ত্তী শহর ও পল্লীগুলির মধ্যে কেবলমাত্র বাণিজ্য সম্বন্ধই গড়িয়া উঠে নাই, চিন্তার আদান-প্রদানও হইয়াছে। কাজেই তিব্বতীয় সভ্যতার উপর কেবল যে পাহাড়ের প্রভাবই বর্ত্তমান তাহা নহে, নদীর প্রভাবও আছে যথেষ্ট। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—পূর্ব্বের দিকে খাম প্রদেশ এবং
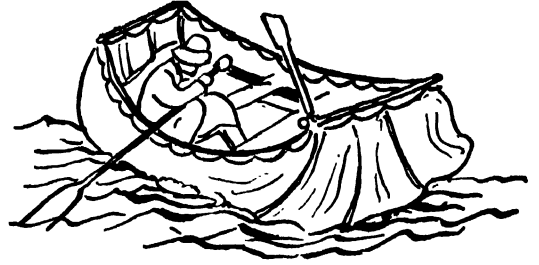
তিব্বতী চামড়ার নৌকা

উপত্যকার মধ্যভাগে উৎসাঙ প্রদেশ। তিব্বতীয়গণ এই উৎসাঙ্ প্রদেশকেই আসল তিব্বত বলেন। উত্তরের প্রথম স্তর হইল প্রায় অনুর্ব্বর আর দ্বিতীয় দক্ষিণ স্তর হইল ঠিক উহার বিপরীত—সম্পূর্ণ উর্ব্বরাভূমি। এই অঞ্চলটাই কৃষির বড় কেন্দ্র।

তৃতীয় স্তর হইতেছে পূর্ব্ব-তিব্বত। এই অংশে আছে বিস্তৃত বন, এবড়ো-খেবড়ো, রুক্ষ পাহাড় ও অনুর্ব্বর প্রান্তর। এই স্থানে কতকগুলি ছোট ছোট নদী আছে। উহারা চীন, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশের বড় বড় নদীর প্রথম উপনদী। এই অঞ্চলে আছে অসভ্য, ভবঘুরে কতকগুলি উপজাতি এবং ছোট ছোট অর্দ্ধস্বাধীন কয়েকটি রাজ্য। এই ভবঘুরে উপজাতিগুলির প্রধান পেশা ঘোড়া ও চমরীগরু পালন করা। ইহারা দুর্দ্ধর্ষ ডাকাতের দল, চীন বা তিব্বত—কোন গবর্ণমেণ্টকেই মানিতে চায় না। আশ্চর্য্য যে এই অঞ্চলেই তিব্বতের আর্ট ও শিল্প দ্রব্যের কেন্দ্র। সোনা, রূপা, তামা, সীসা, লোহা, পারা কোনও কোনও মণি, লবণ ও সোহাগা পূর্ব্ব-তিব্বতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ব-তিব্বতকে বাদ দিয়া ভবিষ্যতের শিল্পবাণিজ্যনীতি গড়া যায় না। আমি যেভাবে তিব্বতকে ভাগ করিলাম তিব্বতীয়গণ কিন্তু সেইভাবে ভাগ করেন না। তাঁহারা সমস্ত দেশটাকে ট্যাঙ্, দ্রোক্, রোঙ্., গ্যাঙ্. এই কয় ভাগে ভাগ করিয়া দেখান। ট্যাঙ্ বলিলে মালভূমি অথবা অনুর্ব্বর প্রান্তর বুঝায়, যথা—উত্তরের চ্যাঙ-ট্যাঙ। গোচারণের উচ্চভূমিকে দ্রোক্ বলে। দ্রোকের বিশেষত্ব যে উহা স্যাঁৎসেঁতে কাল মাটির বাদা জমি। জলপ্রণালীও উহাতে থাকে। দক্ষিণ-

তিব্বতে ড্রোক্ আছে। ড্রোক্ স্থানে থাকে গভীর সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট, গিরিপথ এবং বড় বড় নদীর উপশাখা বা শাখা। এই সবই বসবাস ও কৃষির উপযুক্ত স্থান। গোম্ফা পল্লী প্রভৃতি এই জনস্থানেই গড়িয়া উঠে। শিগাট্‌সে ও ইয়ামড্রোক্ হ্রদের মধ্যবর্ত্তী স্থান একটি প্রধান রোঙ্গস্থল। গ্যঙ্ প্রদেশে থাকে বনপূর্ণ পাহাড়, ঘাসে ভরা উপত্যকা, লতা, ফুলফলের প্রাচুর্য্য। পূর্ব্ব-তিব্বতে খাম্ প্রদেশ একটি গ্যঙ্গ।

শিরস্ত্রাণ

কৃষি

চাষযোগ্য প্রচুর জমিই অনাবাদী পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার কারণ দুইটি, দেশবাসীর খাদ্যশস্যের চাহিদা খুব বেশী নাই। লামা হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল থাকায় কৃষি ও শ্রম-শিল্পের কাজে লোক আসে কম। সুফলা উপত্যকাগুলিতে খাদ্যশস্য বাড়তি থাকে। চালানি খরচ বেশী বলিয়া এই বাড়তি শস্য রপ্তানি হয় না। গবর্ণমেণ্টের শস্যাগারে প্রচুর খাদ্যশস্য দীর্ঘদিন মজুত থাকে; কারণ খাজনা আদায় হয় শস্যে। বরফের দেশে উহা শীঘ্র নষ্টও হয় না। উঁচু পাহাড়ে চাষ-আবাদ বড় সহজ নহে। এই সব স্থানে খাদ্য-শস্যের ঘাটতি হয়। তিব্বতের উত্তরে চ্যাঙট্যাঙ-এর দক্ষিণে টেংগ্রি ও ড্যংগ্র হ্রদের কাছাকাছি জায়গায় সামান্য আবাদ হয়। পশ্চিমে উঁচু পাহাড় থাকায় এবং জমি ভাল উর্ব্বর নহে বলিয়া চাষ খুব কমই হয়। আরও পশ্চিমে গেলে কর্ণাল নদীর তীরে তাক্‌লাকোট্ জেলায় যব, মটর, সরিষার আবাদ হয়, শতদ্রু নদীর ধারে ধারেও কৃষকের আবাসস্থল। এই সব অঞ্চলে খাদ্য-শস্য বাড়তি থাকে। প্রায় চল্লিশ বৎসর আগের কথা জানি, এই বাড়তি শস্যের সহিত পঞ্জাবের সৈন্ধব লবণের বিনিময় হইত। সিন্ধু নদীর উপত্যকায় চাষ-আবাদ খুব বেশী হয় না। পূর্ব্ব-তিব্বতের উঁচু খাড়া পাহাড়গুলির গভীর খাত চাষের যোগ্য নহে। এই দিকে চাষ হয় পাহাড়ের গা ছাদের মত কাটিয়া। দার্জ্জিলিং অঞ্চলে যেমন হয়। কৃষির বড় জায়গা ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা। উৎস্তজ প্রদেশ, গ্যাংচি হইতে লাসা পর্য্যন্ত দেশগুলি ভারতের মৌসুমি বায়ুর প্রভাব কতকটা পায়। ব্রহ্মপুত্র ছাড়া ছোট নদীও আছে কয়েকটা। লাসার উপরে ক্যিচু (চু অর্থে নদী), এবং গ্যাংচির পাশ দিয়া ন্যঙ-চু। এই সব কারণেই লাসার আশেপাশে তিব্বতের উপযোগী সকলপ্রকার শস্য ও সব্জী জন্মে। যদি শিগাট্‌সে হইতে ন্যঙ-চু নদী ধরিয়া গ্যাংচি হইয়া পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে চলা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে দুই তীরে বহু দূর বিস্তৃত শস্য ক্ষেত্র। আরও দক্ষিণে আসিয়া রলং নদী নাম ধরিয়া যখন পূর্ব্বে কারোলার দিকে চলিল তখনো দুই তীরে চাষ-আবাদের প্রাচুর্য্য। বেশীর ভাগই যব ও মটরের চাষ।

দুই প্রকার যবের আবাদ হয়,—(১) মোটা খোসা ও (২) পাতলা খোসা, সুঙহীন যব। প্রথমটি পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়টি মানুষে খায়। যবের ছাতু ও চ্যঙ্গ (যব হইতে প্রস্তুত দেশী মদ—বীয়ার তুল্য) এই দ্বিতীয় প্রকার যব হইতে তৈয়ারী হয়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বোনা হয়, এবং ভাদ্র-আশ্বিনে কাটা হয়। তিব্বতে কাঁচি দিয়া খুব গোড়া ঘেঁষিয়া যব গাছ কাটা হয়। অগ্রহায়ণ পৌষে ঐ কাটা যবের মলন দেওয়া হয়। কারিজঙ্গ ১৪,৩০০ ফুট উঁচু। এখানে যব পাকে না। তথাপি পশুর খাদ্যের জন্য যবের আবাদ হয়। শীতের আরম্ভেই এখানে যব কাটে।

যে স্থলে সম্ভব গমের আবাদও হয়। এগার হাজার ফুটের উপরে গম পাকে না। ধনিগণই গম খায়। ভুট্টা, জনার, সরিষার আবাদও হয়। তিব্বতে চাল প্রায় হয় না। আসাম, সিকিম, নেপাল, ভারত হইতে চাল আমদানি হয়।

মূলা, শালগম, ওলকপির চাষও হয়। তিব্বতীরা মূলা খুব পছন্দ করে। পাতা কাটিয়া সুতায় বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখে। শুকাইয়া গেলে তরকারী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আলুও জন্মে। আলু দুই প্রকার। সাদা রং-এর নাম সোকো। লাল্‌চে, মিষ্টি ও ছোট আকারের আলুকে বলে তোম। চীন সীমান্তেই আলুর আবাদ বেশী। পেঁয়াজ, মটর, বাঁধাকফিও জন্মে।

খামপ্রদেশে ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব তিব্বতে সরিষার চাষ বেশী হয়। সরিষার গুঁড়া চমরী গরুকে খাওয়ান হয়। রৌদ্রে সরিষা শুকাইয়া কাঠের পাত্রে হাতে ঘষিয়া তেল বাহির করা হয়। মেয়েরা মাথায় সরিষার তেল ব্যবহার করে। সাধারণ গৃহস্থঘরে বাতিও জ্বলে সরিষার তেলে; ছেলে-মেয়েদের গায়ে মাখান হয়।

পূর্ব্ব-তিব্বতে এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বিভিন্ন প্রকারের ফল জন্মে; যথা—আখরোট, পীচ, খুবানী ইত্যাদি। বেশীর ভাগ জন্মে পূর্ব্বাঞ্চলের নীচু জমিতে। বিদেশীদিগের সংস্পর্শে আসিয়া তিব্বতের বাগানে অনেক রকম বিদেশী ফুলের আমদানীও হইয়াছে।

চাষের প্রণালী আমাদের দেশের মত। হালের গড়নও

বাংলার হালের মতই। দুই-এক জায়গায় লোহার বদলে কাঠের ফাল দেখিয়াছি। নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলি ক্ষেত চাষে ব্যবহৃত হয়:

মই (রিবু), দন্তবিশিষ্ট যন্ত্র, বিদে (আদসী), কোদালি (কেম্ অথবা যামা), নিড়ানি (টোক্-ৎসে), কাস্তে (সো-রা), গ্যা-সী (শস্যাদি উত্তোলন বা তৃণাদি নিক্ষেপ করিবার কৃষি-যন্ত্রবিশেষ, ইংরেজী পিচ্ ফর্ক বলিলে যে যন্ত্র বুঝায় উহারই মত)। কোদালি বা যামার ফালটা অনেকটা চোখা।

ঘোড়া, খচ্চর, গাধা, চমরিগরু ক্ষেতের কাছাকাছি থাকে বলিয়া সারের বড় অভাব হয় না। চাষের প্রায় এক মাস আগে জমিতে সার দেওয়া হয়। মানুষের মলও সার হিসাবে ব্যবহার হয়। বন্ধ করিয়া দেওয়া পুরাতন কুয়াপায়খানার মাটি সার হিসাবে মণ প্রতি এক আনা, দুই আনা হিসাবে বিক্রয়ও হয়।

তিব্বতে বৃষ্টিপাত কম। যদি বৃষ্টি না হয় অথবা শিলাবৃষ্টি বেশী হয় কিংবা তুষার বেশী পড়ে তাহা হইলে ওঝার সাহায্য লওয়া হয়। এক শ্রেণীর লামা আছেন যাঁহারা বৃষ্টি নামাইতে পারেন, অথবা শিলাবৃষ্টি ও তুষারপাত বন্ধ করিতে পারেন বলিয়া তিব্বতীয়গণ বিশ্বাস করে।

প্রাচীনকাল হইতেই জলসিঞ্চনের ব্যবস্থা আছে। অতীশ তিব্বতে আসিয়া লাসার কাছাকাছি 'তোল' স্থানে একটি বাঁধ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অতীশের তিব্বতী ভাষায় লিখিত জীবনচরিতে ইহার উল্লেখ আছে।

তিব্বতে চাষ-আবাদ নষ্ট হয় খরা, তুষারপাত, বন্যা, শিলাবৃষ্টি এবং কীটপতঙ্গ ও ইন্দুরের অত্যাচারে। তিব্বতে হালের কাজটা পুরুষে করে, কিন্তু অন্যান্য কাজে মেয়েরা সাহায্য করে।

আবাদের সময় কৃষকের খাদ্য ও পানীয় সকালে, দুপুরে ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে মেয়েরা মাঠেই লইয়া যায়। বাড়ী হইতে বেশী দূরে হইলে মেয়েরা মাঠেই রান্না করিয়া দেয় এবং অবসর সময়ে ক্ষেতের কাজে সাহায্য করে।

পশুসম্পদ

গৃহপালিত পশুসম্পদের মধ্যে চমরী গরু প্রধান। ইহার দুধ ও মাখন ব্যবহার করা হয়। মাংসও টুকরা করিয়া আগুনে শুকাইয়া সযত্নে রাখিয়া দেওয়া হয় প্রয়োজনমত ব্যবহারের জন্য। চর্ব্বিও সিদ্ধ করিয়া খায়। হালের কাজে ও মাল বহিতে এই গরুর সাহায্য লওয়া হয়। ১২,০০০ ফুটের নীচে চমরী গরু টিকিতে পারে না। উহার নীচে 'জো' নামে গরুর দ্বারা হালের কাজ করা হয়। উহা চমরী ও গৃহ-পালিত গরুর সংমিশ্রণের ফল।

তিব্বতের টাট্টু ঘোড়া কষ্টসহিষ্ণু ও শক্ত। ভুটানের ঘোড়াও তিব্বতে বিক্রয় হয়।

মধ্যতিব্বতে গাধাও মাল বহিবার কাজে লাগে। সবচেয়ে বেশী কাজে লাগে খচ্চর।

দারুশিল্পের নমুনা
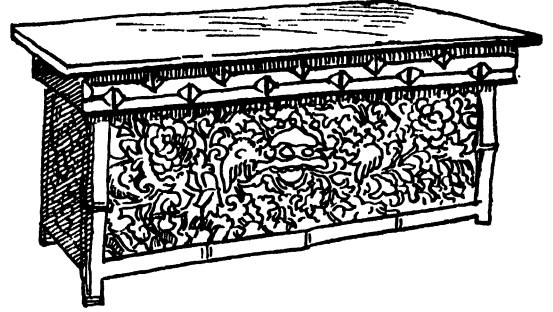
ভারতের ভেড়ার চেয়ে তিব্বতী ভেড়া বড় ও শক্তিশালী। ইহাদের পশমও নাকি ভাল। ইহা ভার বহনের কাজেও লাগে।

তিব্বতী ছাগল "চেংরা"র মাংস সকলে পছন্দ করে না। আমার নিকট সুস্বাদু ও নরম মনে হইয়াছে। একখানা পা লইয়া সাত দিনের পথ চলিয়াছি; বরফের জন্য বোধ হয় পচে নাই।

শূকরের চেহারা ভারতীয় শূকরের মতই।

শিল্প

গৃহস্থ ঘরে, মন্দিরে, বিহারে সোনার ব্যবহার খুব বেশী। ত্রয়োদশ লামার সমাধি মন্দিরে বহু সোনার তাল ব্যবহৃত হইয়াছে। তিব্বতে সোনা পাওয়াও যায় যথেষ্ট—পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে প্রায় সকল নদীতেই। সোনার খনিও আছে—পশ্চিমে জিলিং হ্রদের কাছাকাছি স্থানে। গার্টক্ হইতে উত্তর-পূর্ব্বে থক্জলুং-এর সোনার খনিই প্রধান। ইহার চারিদিকে আরও কয়েকটি ছোট ছোট সোনার খনি আছে। ভুটানের উত্তরে এবং ইয়ামড্রোক্ হ্রদের দক্ষিণ-পূর্ব্বে আসামের সুবর্ণশ্রী নদীর উৎসমুখেও সোনা পাওয়া যায়। খাম প্রদেশেও স্বর্ণখনি আছে। এই দিকের সোনা চীনে চালান হয়।

খুব সম্ভব তিব্বতে বিভিন্ন ধাতুর খনি যথেষ্ট আছে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে অনুসন্ধান এখনও হয় নাই। খনির খবর পাইলেও পল্লীবাসী সংবাদ দিতে চাহে না, পাছে তাহাদিগকে বেগার খাটিতে হয়। তিব্বতে গবর্ণমেণ্টের কাজে দেশবাসী-দিগকে বেগার খাটিতে হয় ও বিনা ভাড়ায় ঘোড়া, খচ্চর ইত্যাদি যোগাইতে হয়।

অনেক নদী ও হ্রদের তীরের বালির সহিত মিশ্রিতভাবে সোহাগা পাওয়া যায়। ইহা রপ্তানি হয়।

পাহাড়ে, নদী ও হ্রদের ধারে লবণ পাওয়া যায়। পূর্ব্ব-তিব্বতে ৩০।৪০টি লবণের গহ্বর আছে। উহা হইতে লবণ তৈয়ারী করিয়া লইতে হয়। পঞ্জাবের লবণের চেয়ে

তিব্বতের লবণ কতকটা পরিষ্কার। উহা ভারতে আসে।

তিব্বতী চা-পাত্র (ধাতুশিল্পের নমুনা)

কস্তুরী প্রচুর পাওয়া যায়। উহাও ভারতে রপ্তানি হয়।

পূর্ব্ব-তিব্বতে রেউচিনিলতা প্রচুর জন্মে। উহা সাধারণতঃ ১০০০ হাজার ফুটের উচ্চে পাওয়া যায়। চীনে এবং সাংহাই পর্য্যন্ত উহা ঔষধের জন্য রপ্তানী হয়। তিব্বতের আরও কয়েক প্রকার ঔষধের গাছ-গাছড়া ইউরোপ ও আমেরিকায় চালান হয়।

পূর্ব্ব-তিব্বতের বনে ভাল ভাল কাঠ আছে; কিন্তু উহা রক্ষা ও বিক্রয়ের সুব্যবস্থা নাই। তথায় লোহা, তামা ও রূপার খনি আছে।

জয়ুল প্রদেশের একেবারে দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তে মিশমি পাহাড়ের কাছাকাছি এ্যাগেট্ মণি পাওয়া যায়। তথায় ধানের আবাদ আছে। পশ্চিমে সিন্ধু উপত্যকায়, এবং পূর্ব্ব-তিব্বতে সীসা ও পারদ পাওয়া যায়। শুনা যায়, তিব্বতে গন্ধকের খনি আছে। কিন্তু উহা লাডাকের পথে তিব্বতে আমদানি হয়।

সিন্ধু উপত্যকায় যবক্ষার পাওয়া যায় প্রচুর। মোটা থলিতে মাটি ভরিয়া উহার উপর জল ঢালিতে থাকে। থলির নীচে রাখে মাটির পাত্র। জলে গলিয়া যবক্ষার মাটির পাত্রে পড়ে। পরে ঐ পাত্রের জল আগুনে শুকাইয়া দানাদার যবক্ষার পাওয়া যায়। উহার পরিমাণ বেশী নহে। ভারতে বা অন্যত্র রপ্তানি হয় না।

চমরী গরুর চামড়া ও লেজ যথেষ্ট রপ্তানি হয়। ভারতে ঐ লেজে চামর তৈয়ারী হয়। কাশ্মীর প্রান্তে জামা তৈয়ারীর জন্য ভেড়ার চামড়াও রৌদ্রে শুকাইয়া রপ্তানি করা হইয়া থাকে।

তিব্বতের ছাগলের পশমের দাম আছে। উহা পঞ্জাবে ও কাশ্মীরে রপ্তানি হয়। কাশ্মীরের শাল ও রামপুরীয়া চাদর ঐ পশমেই তৈয়ারী হয়।

কাঁচা উলের যোগান অফুরন্ত। কালিম্পঙের বাজারে প্রতি বৎসর প্রায় ১০০,০০০ মণ কাঁচা উল আমদানি হয়। উহার প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ যায় আমেরিকায়। এই উলের দাম তিব্বতী সওদাগরদিগকে দেওয়া হয় ভারতীয় টাকায়। আর আমেরিকা হইতে প্রাপ্ত মূল্য ডলার জমা হয় ভারত-গবর্ণমেণ্টের ডলার তহবিলে। পাঠকবর্গ কিছুদিন আগে খবরের কাগজে দেখিয়াছেন যে, তিব্বত ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, তিব্বতী উল আর ভারতের সাহায্যে বিদেশে না পাঠাইয়া তিব্বত সরাসরি রপ্তানি করিবে। এই অনুরোধ রক্ষিত হইলে এত বড় একটা রপ্তানি-বাণিজ্যের দরুণ ভারতবাসী যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেছিল তাহার অনেক অংশ তো যাইবেই, সঙ্গে সঙ্গে ভারত গবর্ণ-মেণ্টের ক্রমবর্দ্ধমান ডলার তহবিলও শীর্ণ হইয়া আসিবে। কারণ উল রপ্তানির মূল্য বাবদ ডলার তখন জমা হইবে তিব্বত গবর্ণমেণ্টের হিসাবের খাতে।

তিব্বতে বন্দুক ও বারুদের কারখানাও আছে। উহা নগণ্য বলিলেও চলে।

তামার ও অন্যান্য ধাতু পাত্রাদি নির্ম্মিত হয় ডের্গেডে। লোহার জিনিস ও ভাল কাপড়ের আড়ত জয়কুণ্ডু প্রভৃতি পূর্ব্ব তিব্বতের শহরে।

ভাল মাটির পাত্র পূর্ব্ব তিব্বতেই হয়। বই ছাপা ও ছবি আঁকা প্রভৃতি লাসা এবং সকল বড় বড় মন্দিরেই হয়; কিন্তু প্রধান আড্ডা পূর্ব্বাঞ্চলেই।

চকুতু (গায়ে দিবার সুদৃঢ় কোমল কম্বল) ও সাধারণ কম্বল তিব্বতে প্রচুর হয়।

গালিচা তিব্বতের একটি প্রধান শিল্প। উহা বিদেশে রপ্তানি হয়। চোখের সামনে কোনও নক্সা না রাখিয়া কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যই-না ফুটাইয়া তোলা হয় এই সব কার্পেটে। গালিচা বুনা শিখিতে গিয়া বাহ্যিক অসুন্দর ও নোংরা তিব্বতী মাষ্টারের সৌন্দর্য্যোজ্জ্বল মনের পরিচয় পাইয়া মাথা নত করিয়াছি।

দারুশিল্প এবং বাস্তুশিল্পও তিব্বতী শিল্পীর সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচায়ক।

নৌশিল্পের বৈশিষ্ট্যও আছে। কাঠের ফ্রেমের সহিত চমরী-গরুর চামড়া দিয়া নৌকা তৈয়ারী হয়। বড় খেয়া-নৌকাতে কাঠ ব্যবহার হয় বেশী।

গত ত্রিশ বৎসরে তিব্বতে বিজলী বাতি, দুইখানা মোটর গাড়ী, বেতারযন্ত্র, রেডিও, গ্রামোফোন, ফটো সরঞ্জাম, বড় পুলের যন্ত্রপাতি আমদানি হইয়াছে। ভারতের অনুকরণে দুই-একটি বড় লোহার পুল তৈয়ারীও হইতেছে। এই সকলের প্রভাবে যন্ত্র-শিল্পের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িবে। আমার মনে

হয় অদূর ভবিষ্যতে তিব্বতে দুই-চারিটি ছোট ছোট কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। যথা, কলের তাঁত, মোমবাতির ও দুধ জমাইবার কারখানা ইত্যাদি। তিব্বতে এখনও দুধ জমানো হয়। দার্জ্জিলিঙে ভুটিয়া দোকানে দেখিতে পাওয়া যায়—ময়লা হলদে রঙের কি এক জিনিষের চৌকো টুকরার মালা ঝুলিতে থাকে। উহাই তিব্বতের কন্‌ডেন্‌স্‌ড্‌ মিল্ক বা জমান দুধ। কৌটা লাগে না, গলায় ঝুলাইয়া বা পকেটে লইয়া যাওয়া যায়। তিব্বতী সমাজের প্রাচীন আর্থিক গঠনের অদৃশ্য ভাঙ্গন সুরু হইয়াছে। পরিবর্ত্তনের বেশী দেরী নাই।

বাণিজ্য

তিব্বতের অভ্যন্তরে লাসা ও পিগ্যাটসীতে বড় বাজার। পূর্ব্ব-তিব্বতের বড় বন্দর হইল চ্যম্‌ডো, জয়কুণ্ডু দের্গী এবং ট্যাচি এন্‌লুতে।

চীনের সহিত তিব্বতের বাণিজ্য হয় প্রধানতঃ লাসা-তা-ৎসিয়েন্‌-লু পথে। তা-ৎসিয়েন্‌-লুতে পৌঁছান যায় চিয়ামডোর পথে, অথবা জয়কুণ্ডু হইয়া। লাসা-সিলিঙ্গ পথেও বাণিজ্য হয়। সিলিঙ্গ চীনের কান্‌সু প্রদেশে। তিব্বতের পূর্ব্বে চাঙট্যাঙ দক্ষিণ-পূর্ব্বে জয়ইভাম্‌ হইয়া যাইতে হয়। তিব্বত হইতে চীনে রপ্তানী হয় কস্তুরী, স্বর্ণরেণু, উল, ঔষধ, ভেড়ার চামড়া, ক্ষার, হরিণের শিং, সোরা। চীন হইতে প্রধান আমদানী চা (ইটের টুকরার মত কাঁচা চা), সিল্ক, তামাক (ইহার দ্বারা তিব্বতে নস্য তৈয়ারী হয়), তুলা। আমদানীর বাৎসরিক পরিমাণ প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ টাকার এবং রপ্তানী প্রায় সতর লক্ষ তেইশ হাজার টাকার। চীনাগণ বাতাঙের পথে তিব্বতে মাল পাঠানো তেমন পছন্দ করে না। বেশীর ভাগ চীনা জিনিষ যায় কলিকাতা-কালিম্পং পথে।

নেপালের সহিত তিব্বতের বাণিজ্য হয় শিগাট্‌সে, ডিংগ্রি এবং কিরোঙ্গ-এর পথে। ইহার মধ্যে কিরোঙ্গের পথটিই কতকটা ভাল। কিরোঙ্গ ছাড়া বাবুকেও বেসাতি কেনাবেচা হয়। নেপালীরা ক্রয় করে লবণ, উল, সোরা এবং তিব্বতীয়দিগের নিকট বিক্রয় করে তামাক, চাল, তামার পাত্র প্রভৃতি।

ভুটানের সহিত তিব্বতের বাণিজ্য তেমন বেশী নহে। তিব্বত ভুটানে রপ্তানী করে চা (ব্রিক্‌ টি), মোটা কাপড়, শুকনা মাছ, লবণ, সোডা এবং আমদানী করে চাল, গালা, গুড়, তুলা, কাপড়, কাঠ, বেত ও চেরা বাঁশ।

মোঙ্গোলিয়ার সহিত বাণিজ্য অতি নগণ্য। সৌখিন দুই-চারিটি দ্রব্য তিব্বতে আসে। এই পথে বাণিজ্যের পরিমাণের কোনও ধারণা আমার নাই।

কাশ্মীরের সহিত ব্যবসা হয় লাসা-লে পথে। লে লাডাকে অবস্থিত। এই পথ শিগাট্‌সে, গ্যাট্‌সে, মিরিয়াম গিরিবর্ত্ম, মানসসরোবর ও রুদোক হইয়া গিয়াছে। এই পথে বৎসরে প্রায় দেড় লক্ষ টাকার বাণিজ্য হয়। তিব্বতের রপ্তানীর পরিমাণ আমদানী অপেক্ষা বেশী।

তিব্বতের বাস্তুশিল্প
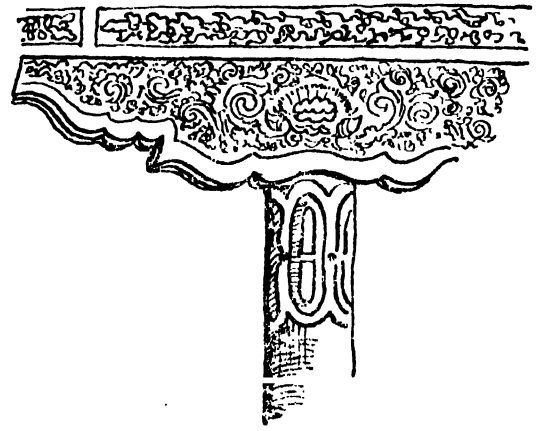
ভারতের সহিত তিব্বতের বাণিজ্য হয় প্রধানতঃ লাসা-কালিম্পং এবং লাসা-ওদলগুড়ি (আসাম) পথে। পশ্চিম-তিব্বতের সহিত ভারতের উত্তরপ্রদেশের বাণিজ্য হয় গার্টক-গাড়োয়ালের পথে। প্রধান আমদানী খাদ্য ও কাপড়। পশ্চিম-তিব্বতকে এই আমদানীর উপর একান্তভাবে নির্ভর করিতে হয়। লাসা-কালিম্পং পথ আসিয়াছে খাম্বা গিরিবর্ত্ম, রালুং, ফারিজং, চুম্বী-উপত্যকা, জেলাপ্‌ গিরিবর্ত্ম হইয়া সিকিমের ভিতর দিয়া কালিম্পং পর্য্যন্ত। নাথুলা গিরিসঙ্কট পার হইয়াও আসা যায়। অধিকাংশ সওদাগর আসে জেলাপের পথে। তিব্বতের সহিত ভারতের বাণিজ্য আজ নূতন নহে, বহু শত বৎসর যাবৎ উহা চলিতেছে। তিব্বতী সওদাগরগণ বেসাতি লইয়া কালিম্পঙে আসেন এবং এখান হইতেই ক্রীত দ্রব্যাদি লইয়া বাণিজ্য পথ ধরিয়া তিব্বত চলিয়া যান। তিব্বত হইতে ভারতে আসে চামর, চামড়া, খচ্চর, ঘোড়া, কাঁচা উল, মৃগনাভি, কার্পেট, স্বর্ণরেণু ইত্যাদি। তিব্বত হইতে আমদানী মালের মধ্যে উলের স্থানই প্রধান। কালিম্পঙে বাজারে প্রতি বৎসর প্রায় ১০০,০০০ মণ কাঁচা উল আমদানী হয়। ভারত হইতে এই পথে তিব্বতে চালান দেওয়া হয় তুলা, পশমজাত দ্রব্যাদি, সুতি কাপড়, চাল, খাদ্য-দ্রব্য, চিনি, বিস্কুট, শুষ্কফল, তামাক, নস্য, সীসা, ফটোর সরঞ্জাম, এনামেলের বাসন, তেল, দামী পাথর, রূপা, চীনা ও জাপানী সওদা।

লাসা-ওদলগুড়ি পথের ভারতীয় মাথা

ওদলগুড়ি আসামে তেজপুরের উত্তর-পশ্চিমে। ওদলগুড়ি হইতে রওনা হইলে পথে পড়ে তকলুং, ধীরং (এখানে তিব্বতী সৈন্য আছে)। তারপর টওয়াঙ্‌ ও ৎসোনা। এই

দুই স্থানেই বড় বাজার। ইহার পরেই সেরেসা (এখানে আছে উষ্ণ প্রস্রবণ) চুক্যা মন্দির। তাহার পর চেথ্যঙ্গ শহর। উহা বড় বন্দর। চেথ্যঙ্গের পর সেমো। সেমোতেই অতি প্রাচীন বড় বৌদ্ধ-মন্দির ও বিহার। ইহার পর লাসা। এই পথে প্রধানতঃ তিব্বতে যায় চাল এবং ভারতে আসে পূর্ব্ব-তিব্বতের অল্প মূল্যের দ্রব্যাদি।

আরও দুইটি পথ আসাম হইতে পূর্ব্ব-তিব্বতে আসে—একটি পালিঘাট হইতে আবরদেশের ভিতর দিয়া ডিহাং নদীর উপত্যকা ধরিয়া, দ্বিতীয়টি সদিয়া হইতে মিশমিদেশের ভিতর দিয়া লোহিত ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা অবলম্বন করিয়া। দ্বিতীয়টি পূর্ব্ব-তিব্বতের উর্ব্বর জয়ুল্ জেলা ও চীনের য়ুন-নাস্ প্রদেশের সহিত যোগ রাখিতে পারে। দুইটিই ছোট রাস্তা। এই দুই পথে বাণিজ্য চালাইতে হইলে আবর ও মিশমিদিগের সহযোগিতা দরকার।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তি অনুযায়ী ভারত-তিব্বত বাণিজ্যের সকলপ্রকার বাধাবিঘ্ন দূর হইয়াছে। আমদানী রপ্তানীর উপর শুল্ক ধার্য্য হয় না। এই সব সত্ত্বেও তিব্বতের সহিত ভারতের বাণিজ্য আশানুরূপ বাড়ে নাই। বাংলাদেশের উপর দিয়াই শুল্ক দিয়া তিব্বতের উল বিদেশে যায় এবং উহাদ্বারা তৈয়ারী ব্যবহার্য্য জামা-কাপড় পুনরায় শুল্ক দিয়া ভারতে আমদানী হইয়া বিক্রয় হয়। অথচ বিনাশুল্কে প্রাপ্ত এই কাঁচা মালকে কাজে লাগাইয়া সস্তায় উলের জামাকাপড় যোগাইবার জন্য বাংলায় কোনও উলের কারখানা নাই। ভারত-তিব্বত বাণিজ্যের মোট পরিমাণ প্রতি বৎসরই কিছু কিছু বাড়িয়া চলিয়াছে।

বর্ত্তমানে চীন তিব্বত আক্রমণ করিয়াছে। যদি চীনের চেষ্টা সফল হয়, তাহা হইলে লাসা-গ্যাংচি-কালিম্পং পথে যে বাণিজ্য চলিতেছে উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া চীনের পথেও যাইতে পারে। যদি আমেরিকার সহিত চীনের বাণিজ্যের সম্ভাবনা কোন দিন বাড়ে, তাহা হইলে ভারতের পথে তিব্বতের বাণিজ্য কমিয়া যাইবার ভয় বেশী।

ধর্ম্মপ্রাণ তিব্বতের সমাজে ধর্ম্মগুরু লামার প্রভাবই বেশী। সমাজের ভাঙ্গন ও গড়নের যে গতি দেখিতেছি তাহাতে মনে হয় ভবিষ্যতে সওদাগরের প্রভাবই তিব্বতী সমাজে বাড়িবে।

ঋণায়ত্তা বসুন্ধরা

শ্রীঅমলেন্দু সেন

দেনাপাওনার সমস্যা লইয়া আজ পৃথিবীর দেশগুলি হাবুডুবু খাইতেছে। অধমর্ণ প্রধানতঃ পূর্ব্ব-গোলার্দ্ধের দেশসমূহ, উত্তমর্ণ মুখ্যতঃ আমেরিকা ও কানাডা। যাহাদের ঘাড়ে দেনা, তাহাদের ত চক্ষে অন্ধকার দেখিবারই কথা, কিন্তু সমস্যাটি পাওনাদারদেরও শিরঃপীড়ার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ পৃথিবীর দেশগুলি এরূপভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত যে, দেনদারেরা ডুবিলে মহাজনেরাও আর বেশী দিন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিবেন না, একথা নিশ্চিত।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে এই দেনাপাওনার উৎপত্তি। সুতরাং গোড়ায়ই দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে মাল চলাচলের অবস্থা এবং পরিমাণ সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য বলিয়া লওয়া দরকার।

বিগত মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ববৎসরে অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে পৃথিবীর সমস্ত দেশ একত্রে যত মূল্যের মোট পণ্য রপ্তানী করে, তাহার মধ্যে আমেরিকা এবং কানাডার যুক্ত অংশ ছিল শতকরা ১৮ ভাগ। অথচ যুদ্ধশেষে ১৯৪৬ সালে ইহা আসিয়া দাঁড়ায় ৩৬ ভাগে, অর্থাৎ সমগ্র জগতের এক-তৃতীয়াংশের অধিক পণ্য রপ্তানী হয় আমেরিকা ও কানাডা হইতে। এই দুই বৎসরের অঙ্ক তুলনা করিলে ইহাও দেখা যায় যে, ইউরোপের অংশ ৫০ হইতে ৩২ ভাগে এবং নিকট-প্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্য দেশগুলির একত্রিত অংশ ১৬ হইতে ১০ ভাগে নামিয়া আসিয়াছে।

পশ্চিম অতলান্তিক পারের দেশগুলির এই বাণিজ্যিক অভ্যুত্থানের কারণ সুস্পষ্ট। মহাসমরের ফলে ইউরোপের ও প্রাচ্যের দেশসমূহ অল্পাধিক বিধ্বস্ত হওয়ায় তাহাদের পণ্য-উৎপাদন-শক্তি ব্যাহত হইয়াছে, অথচ পশ্চিম গোলার্দ্ধের এই দুইটি দেশ সে বিপদ হইতে মুক্ত থাকিয়া নানা উপায়ে নিজেদের পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধিকরতঃ বাণিজ্যের প্রসার করিয়া লইয়াছে। অধিক উৎপাদন যে করে, রপ্তানি করিবার মত উদ্বৃত্ত পণ্য তাহারই হাতে থাকে। আর নিজের উৎপাদন দিয়া যে নিজের অভাব মিটাইতে পারে না, সে ঐ পণ্য বাহির হইতে আমদানী করে। ফলে দেনার উদ্ভব, এবং এক পক্ষে দেনা শোধের ও অপর পক্ষে পাওনা আদায়ের চিন্তা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

এই দেনার পরিমাণ বড় সামান্য নয়। ১৯৪৭ সালের শেষে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, দুনিয়ার বাজারে এক আমেরিকার পাওনার পরিমাণই ১১৩০ কোটি ডলার। তাহার

দেনদার যাহারা, সেই সব দেশেরও পরস্পরের কাছে খুচরা পাওনা যথেষ্ট। যেমন ইউরোপের দেশগুলির মোট পাওনা ছিল ৬১০ কোটি এবং মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের পাওনা ছিল মোট ১২০ কোটি ডলার।

আন্তর্জাতিক ঋণ-পরিশোধের দুই সূত্র। প্রথমতঃ, ফেল কড়ি, মাখ তেল। টাকাটা নগদ ফেলিয়া দিলেই হাঙ্গামা চুকিয়া যায়। কিন্তু টাকা কোথায়? বিদেশের পাওনাদারেরা দেনদার-দেশের কাগজ অথবা চাঁদি স্পর্শ করেন না, সোনা চাহেন। এদিকে পৃথিবীর যত সোনাও সব গিয়া জমিয়াছে ঐ পাওনাদার আমেরিকারই হাতে। আন্তর্জাতিক লেনদেনের কাজে লাগানো যাইতে পারে এমন সোনার মধ্যে ১৯৪৭ সালে এক আমেরিকার হাতেই ছিল প্রায় ২৪০০ কোটি ডলার দামের সোনা। অথচ পৃথিবীর আর সব দেশের (রাশিয়া বাদে) খুদকুঁড়া একত্র করিলে দাঁড়ায় মোটে ১০৩০ কোটি ডলার মূল্যের সোনা। আর আমেরিকার পাওনা ১১৩০ কোটি ডলার।

অতএব দেনাটা নগদে মিটিবার নয়। অপর কি পন্থা আছে দেখা যাক। পাওনাদারকে টাকা না দিয়া মাল গছাইতে পারিলে দেনাপাওনার কাটাকাটি করা যায়। অর্থাৎ আমদানী পণ্যের সমমূল্যের পণ্য রপ্তানি করা দেনাশোধের আর এক উপায়। সুতরাং কি করিয়া পাওনাদারকে নিজের উৎপন্ন দ্রব্য অধিক পরিমাণে লওয়ান যায়, সেই প্রচেষ্টায় সকলকে অবহিত হইতে হইয়াছে।

বাহিরে মাল পাঠাইবার প্রথম কথাই হইল নিজের দেশের ঘরোয়া চাহিদা মিটাইয়া বাড়তি কিছু নিজের তৈয়ারী মাল হাতে থাকা। এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে প্রথমেই নিজ-দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ অধিক করা প্রয়োজন। নচেৎ রপ্তানির জন্য উদ্বৃত্ত পণ্য আসিবে কোথা হইতে?

কিন্তু রণবিধ্বস্ত দেশগুলির পক্ষে উৎপাদনবৃদ্ধির পথে অন্তরায় অনেক। পণ্য-উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি এমন কি নিপুণ কর্ম্মী যত নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা পুনরায় তৈরি করিয়া লওয়া অসম্ভব না হইলেও সময়সাপেক্ষ। শুধু সময়েরই কথা নয়, এই সকল উপাদান সংগ্রহ করিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অর্থেরও একান্ত অভাব। অনেক ক্ষেত্রেই বাহির হইতে সাহায্য না পাইলে দেশীয় শিল্পগুলির সম্প্রসারণ করা দূরে থাকুক, পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই অসম্ভব।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ফলে অবশ্য এই সাহায্য কিছু কিছু পাওয়া যাইতেছে। অর্থ, যন্ত্র, কর্ম্মী এমন কি শিল্প-উপদেষ্টা পাঠাইয়া এক দেশ অপর দেশকে সাহায্য করিতেছে, প্রধানতঃ আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষ এই ভাবে দুই দফায় রেলপথ প্রসারের জন্য ৩ কোটি ৪০ লক্ষ এবং কৃষিযন্ত্র কিনিবার জন্য ১ কোটি ডলার ঋণ পাইয়াছে। কিন্তু এখানেও সেই পুরাতন সমস্যা, কারণ এই সাহায্যও আসিতেছে বেশীর ভাগ সেই আমেরিকা হইতেই। ইহাও ত পরিশোধনীয় ঋণ। অর্থাৎ, এক দেনা শোধের ব্যবস্থা হইতেছে সেই একই মহাজনের কাছে আরও দেনা করিয়া।

সঙ্কটের দুই উপায়—আয়বৃদ্ধি কিংবা ব্যয়সঙ্কোচ। আর একই সঙ্গে দুই উপায়ই অবলম্বন করিতে পারিলে ত সোনায় সোহাগা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ব্যাপারেও ঐ একই নিয়ম। রপ্তানির জন্য পণ্য উদ্বৃত্ত করিতে চাও ত উৎপাদন বাড়াও এবং নিজে তাহার যতটা কম ভোগ করিতে পার তাহা কর। ঘরোয়া চাহিদা কমাইতেই হইবে। কারণ উৎপাদন বাড়াইতে সময় লাগে এবং দেনা বাড়ে। অতএব তাহার একটা মোটা অংশ যাহাতে দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতেই খরচ হইয়া না যায়, সে চেষ্টাও করা দরকার। অথচ প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা কমিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার দিকেই তাহার ঝোঁক দেখা যাইতেছে।

ইহারও কারণ প্রধানতঃ দুইটি। প্রথমতঃ, যুদ্ধের ছয় বৎসর অধিকাংশ দেশেরই শিল্প-প্রচেষ্টা প্রধানতঃ যুদ্ধোপকরণ উৎপাদনে নিযুক্ত থাকায় লোকেরা ইচ্ছামত জিনিষপত্র পায় নাই, যুদ্ধ শেষ হইতেই সেই অতৃপ্ত ভোগলিপ্সা প্রকট হইয়াছে। তাহাতেও তত ক্ষতি হইত না, যদি ইহার সঙ্গে আর একটি কারণও বিদ্যমান না থাকিত। লোকের ক্রয়ক্ষমতা না থাকিলে এই বাসনা কার্য্যকরী হইত না—'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে'। কিন্তু ব্যাপারটি ঠিক তাহার বিপরীত।

যুদ্ধের ফলে দেশে দেশে মুদ্রাস্ফীতি হয়, অর্থাৎ টাকার পরিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সমর-প্রস্তুতির জন্য শ্রমের মূল্য ও দ্রব্যের মূল্য হিসাবে গবর্ণমেণ্ট যে বিপুল অর্থব্যয় করেন তাহা তো দেশের লোকের হাতেই আসিয়া পড়ে। আমাদের এদেশে যুদ্ধের আগে মোট প্রায় ১৮০ কোটি টাকার নোট প্রচলিত ছিল, যুদ্ধের পরে উহা দাঁড়ায় ১২৫০ কোটিতে। সুতরাং মানুষের আকাঙ্ক্ষার উৎসমুখ খুলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহা পরিতৃপ্ত করিবার ক্ষমতাও হাতে আসে। 'একে মা মনসা, তাতে ধুনার গন্ধ'।

দেখা যাইতেছে যে, মুদ্রাস্ফীতির দরুন দেশের লোকের ক্রয়ক্ষমতা এবং চাহিদা বাড়ে, তাহার ফলে রপ্তানীযোগ্য পণ্যের ঘাটতি হইবার কারণ উপস্থিত হয়। অর্থস্ফীতি বিদেশের ঋণশোধের আর এক অন্তরায়। ইহা কমাইবার চেষ্টা হইতেছে নানাভাবে। মানুষের হাত হইতে টাকাগুলি সরাইয়া লওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্ট ঋণস্বরূপ তাহা গ্রহণ করিতেছেন, যথা, ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট, অথবা ধনীর

আয়কর বৃদ্ধি, অতিরিক্ত লাভের উপর কর ধার্য্য, মূলধনের মূল্যবৃদ্ধি হইতে তাহার অংশগ্রহণ, ইত্যাদি উপায়ে ধনবান্‌দিগের অর্থহ্রাসের চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ ফললাভ হইতেছে না।

ঋণপরিশোধে বিঘ্ন উৎপাদন করা তো পরের কথা, ঋণ সৃষ্টির মূলেও কতকটা রসদ জোগায় এই মুদ্রাস্ফীতি। টাকা থাকিলে বিদেশ হইতেও মাল আনাইয়া ভোগ করা হয়, বৈদেশিক ঋণের উৎপত্তির মূল সেখানেই। আমদানী কমাইলেই দেনাশোধের প্রয়োজনীয়তাও কমিয়া যায়। ঋণব্যাধির চিকিৎসা যদি হয় রপ্তানীবৃদ্ধি, তবে আমদানীহ্রাস এই ব্যাধির প্রতিষেধক। সুতরাং আমদানী কমাইতে হইবে।

আমদানী কমাইবার শ্রেষ্ঠ পন্থা অবশ্য সংযম। বিদেশী-বর্জ্জন ইহার প্রধান অঙ্গ। স্বদেশকে ঋণমুক্ত করিয়া তাহার স্থায়ী উন্নতির ভিত্তিস্থাপন করিবার অটুট সঙ্কল্প ও ত্যাগস্বীকারের শুভবুদ্ধির প্রয়োজন। কিন্তু স্বদেশে পণ্য উৎপাদন করিব অথচ ভোগ করিব না, এবং বিদেশ হইতেও নিতান্ত প্রয়োজনীয় পণ্য ভিন্ন আর কিছু আনিব না, এ কথা কে মানিয়া লইবে? সুতরাং আমদানী কমাইবার জন্য অন্য কতকগুলি কৃত্রিম পন্থার শরণ লইতে হয়।

প্রথম উপায় মুদ্রাস্ফীতি ব্যাধির প্রশমন। তাহা করিতে হইলে যে পথ অবলম্বন করা সবচেয়ে শ্রেয়ঃ,—ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই একই কথায় আসিতেছি,—সে পথ হইল উৎপাদন বৃদ্ধি। দেশের মধ্যে এত পণ্য উৎপাদন কর, যাহা দিয়া মুদ্রাস্ফীতিজনিত চাহিদা মিটাইয়াও রপ্তানীর জন্য যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে। সকল রোগের জন্যই ঐ এক মকরধ্বজ। কিন্তু তাহার তো ব্যবস্থা করা চট করিয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আমদানী কমাইবার অন্য ব্যবস্থা করিতে হয়। এই দ্বিতীয় ব্যবস্থা, আমদানী মালের উপর শুল্ক ধার্য্যকরা। ট্যাক্স বাড়াইয়া দিলেই ঐ মালের দাম বাড়িয়া যাইবে, সুতরাং কাটতি কমিবে, আমদানীকারী কম মাল আমদানী করিবে। দেনা আর বাড়িবার সুযোগ পাইবে না।

আমদানী কমাইবার তৃতীয় উপায় আমদানী নিয়ন্ত্রণ, অর্থাৎ বিদেশ হইতে কোন শ্রেণীর কত পরিমাণ পণ্য স্বদেশে আনা হইবে তাহা বাঁধিয়া দেওয়া। সরকারের লাইসেন্স অর্থাৎ অনুমতি ভিন্ন মাল আমদানী করা তখন আর চলে না।

ইহা ছাড়া আর একটি উৎকট উপায়ে আমদানী কমানো যাইতে পারে। স্বদেশের অর্থের বিনিময়-মূল্য হ্রাস করা সেই উপায়। ধরা যাক, ভারতে যে কাপড়খানা তৈয়ারী হইয়া তিন টাকায় বিক্রয় করা হয়, আমেরিকায় ঠিক তাহাই তৈয়ারী হইলে এক ডলারে বিক্রীত হইতে পারে। সুতরাং এক ডলার তিন টাকার সমান। দুই দেশের মুদ্রার এই সম্বন্ধকে বলে বিনিময়-মূল্য। টাকার বিনিময়মূল্য ডলারের, তিন ভাগের এক ভাগ, আর ডলারের বিনিময়-মূল্য তিন টাকা। ঐ কাপড়খানা আমেরিকা হইতে আনাইতে হইলে উহার মূল্য বাবদ যে এক ডলার দিতে হইবে, তাহা তিন টাকা দিয়া সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু যদি টাকার বিনিময়-মূল্য কমাইয়া দেওয়া হয়, অর্থাৎ যদি এদেশের কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন যে এক ডলার আর তিন টাকায় পাওয়া যাইবে না, প্রতি ডলারের জন্য পাঁচ টাকা হিসাবে দিতে হইবে, তাহা হইলেই আমদানীকারীর বিপদ। নিজের টাকা দিয়া আমেরিকায় মাল কেনা সম্ভব হইলে কথা ছিল না, কিন্তু তাহারা তো ডলার না পাইলে মাল ছাড়িবে না। অথচ এখন সেই একটি ডলারই পাঁচ টাকা দিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে। আমদানীর খরচ বাড়িল, সুতরাং আমদানী কমাইতে হইবে।

ঘরোয়া চাহিদা বাড়িলে যেমন আমদানী-রপ্তানি দুই দিক দিয়াই দেনাশোধের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়, দেশের মুদ্রার বিনিময়-মূল্য কমাইলে তেমনই দুই দিকেরই সুবিধা হয়। এক দিকে আমদানী মালের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় নূতন দেনা কম সৃষ্টি হয়, অপর দিকে একই কারণে নিজের মাল বিদেশীদের কাছে বেচিবার সুবিধা হওয়ায় রপ্তানিবৃদ্ধির ফলে পুরাতন দেনা-শোধের ব্যবস্থা হয়। কারণ উপরের দৃষ্টান্ত অনুসারে ভারতে যে কাপড়খানা তিন টাকায় কিনিতে আমেরিকার একটি ডলার লাগিত, এখন তাহার জন্য তাহাকে আর পুরা এক ডলার দিতে হইবে না, ৩/৫ ডলার দিলেই চলিবে। সস্তায় পাইলেই লোকে বেশী জিনিষ কেনে, সুতরাং টাকার বিনিময়-মূল্য কমিয়া যাওয়ার ফলে ভারত হইতে আমেরিকায় রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে।

দেনায় ডুবুডুবু পৃথিবী এই সব উপায়কে অবলম্বন করিয়াই ভাসিবার চেষ্টা করিতেছে। ফলও যে তাহাতে না ফলিয়াছে এমন নয়। ১৯৪৮ সনের শেষের দিকে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, অধমর্ণ দেশগুলির ঋণের পরিমাণ কতকাংশে হ্রাস পাইয়াছে। আমেরিকার পাওনা ১১৩০ কোটি ডলার (১৯৪৭) হইতে উক্ত বৎসরে ৬৭০ কোটিতে আসিয়া দাঁড়ায়। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা তাহার মোট রপ্তানীর মূল্য এই বৎসরে প্রায় ২৭০ কোটি ডলার কম হয়। আমেরিকা ও কানাডার রপ্তানি-পণ্যের মূল্য সমগ্র পৃথিবীর রপ্তানি-পণ্যের মূল্যের শতকরা ৩৬ ভাগ (১৯৪৭) হইতে ৩০ ভাগে নামিয়া আসে। অপর পক্ষে ইউরোপের রপ্তানির অংশ বৃদ্ধি পাইয়া ৩২ হইতে ৩৭ ভাগ হয়, এবং নিকটপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্য দেশগুলির অংশ ১০ হইতে ১৩ ভাগে উঠে।

তবু একথা বলা চলে না যে, পৃথিবীর বাণিজ্যগত পণ্যের পরিমাণ বর্ত্তমানে যুদ্ধের পূর্ব্ব-অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। এমন কি, পণ্যমূল্য বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর মোট পণ্যমূল্য ১৯৪৮ সনেও ১৯৩৭ সনের অপেক্ষা কমই আছে। ১৯৪৬
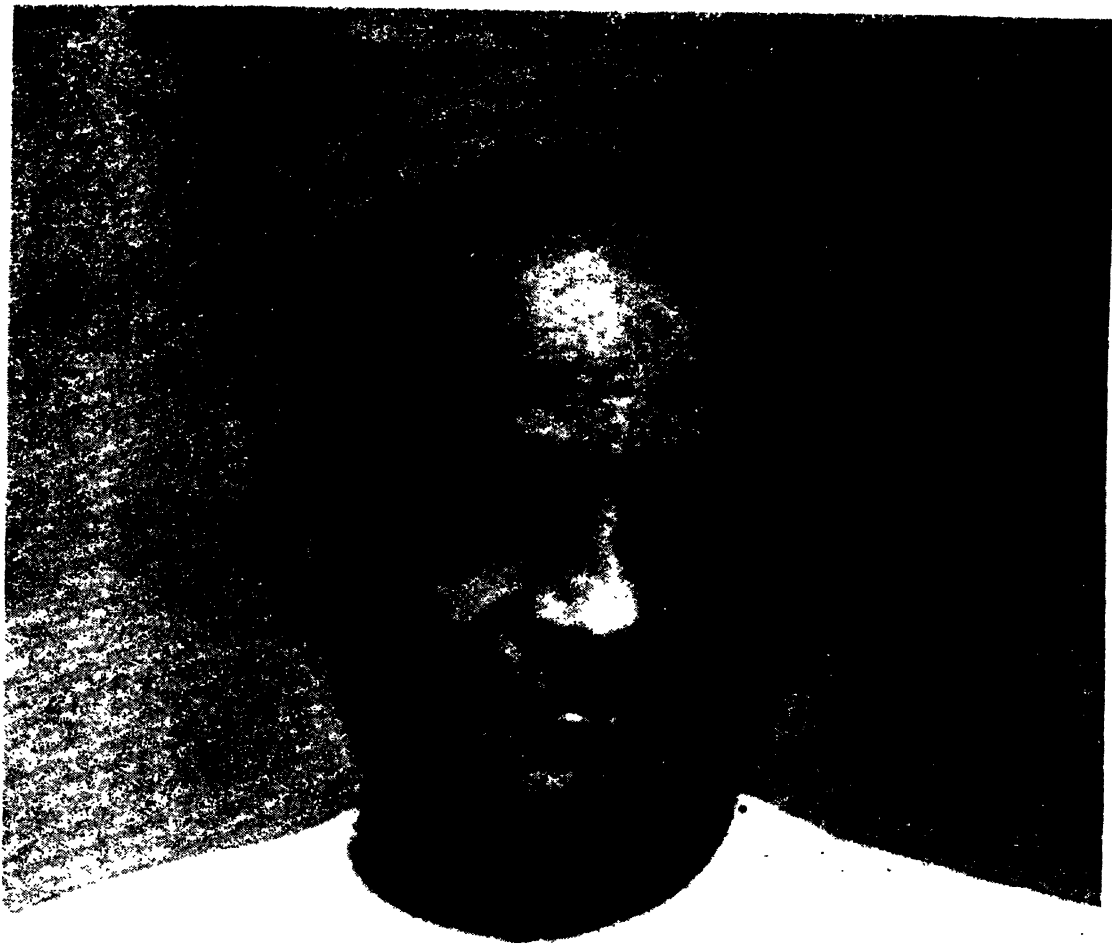
জন্ম : ৩১শে অক্টোবর, ১৮৭৫ সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল মৃত্যু : ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫০

আন্দামানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

হইতে ১৯৪৮ পর্য্যন্ত তিন বৎসরের হিসাবে অবশ্য দেখা যায় যে, ১৯৪৮ সালে পৃথিবীর মোট রপ্তানি-বাণিজ্যের মূল্য (পরিমাণ নহে) ১৯৪৭ সালের উপরে শতকরা ১২ ভাগ এবং ১৯৪৬ সালের উপরে শতকরা ৬০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, জার্ম্মানী ও জাপান বার বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীকে যে প্রভূত পরিমাণে পণ্য সরবরাহ করিত, এখন আর তাহা পারিতেছে না। অল্প কিছুকালের মধ্যে তাহারা যুদ্ধের বিষম ধাক্কাটা সামলাইয়া উঠিতে পারিলে পৃথিবীর আমদানী-রপ্তানি ব্যবসা বহুল পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। পৃথিবীর পক্ষে তাহা লাভজনক এবং কাম্য।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি পরিবর্ত্তন এবং আমেরিকার ঋণপরিশোধের জন্য তাহার প্রধান খাতক গ্রেট ব্রিটেন অল্পকাল পূর্ব্বে এক বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছে। ১৯৪৯ সনের ১৮ই সেপ্টেম্বর ইংরেজী মুদ্রা পাউণ্ড-ষ্টার্লিং-এর মূল্য ৪ ডলার ৩ সেণ্ট হইতে কমাইয়া একেবারে ২ ডলার ৮০ সেণ্ট-এ (অর্থাৎ প্রায় পৌনে তিন ডলারে) নামাইয়া দিবার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে অনেক দেশই এই পন্থা গ্রহণ করে, ভারতও করিয়াছে। তাহাতে ভারতের রপ্তানি-কারবারের উন্নতি হইয়াছে। গত জানুয়ারী মাসে (১৯৫০) ভারতে আমদানী অপেক্ষা ভারত হইতে রপ্তানি বেশী হইয়াছে প্রায় নয় কোটি টাকার। ইউরোপেরও রপ্তানি-বাণিজ্য কিছু বাড়িয়াছে, একথা ঠিক, কিন্তু এখনও তেমন আশানুরূপ হয় নাই; কারণ বহু পণ্যের উৎপাদনই চাহিদা থাকাসত্ত্বেও হঠাৎ বাড়ানো যায় না, কাজেই রপ্তানির সুযোগ থাকিলেও মাল নাই।

সুতরাং আবার সেই কথাই উঠিতেছে,—উৎপাদন বৃদ্ধি কর, রপ্তানি বেশী কর, তবে দেনা শোধ হইবে। মুদ্রাস্ফীতি কমাইবার চেষ্টাই কর, আর মুদ্রামূল্য হ্রাসের ব্যবস্থাই কর, উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া গত্যন্তর নাই। তাই পৃথিবী জুড়িয়া রব পড়িয়া গিয়াছে, উৎপাদন বৃদ্ধি কর,—তা সে 'অধিক শস্য ফলাও' আন্দোলনই হউক, কিংবা রপ্তানি বাড়াইয়া দেনা শোধের জন্যই হউক।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। পণ্য না হয় উৎপাদন করা গেল, কিন্তু আমেরিকা তাহা কিনিবে কি? সে নিজেও তো প্রচুর সামগ্রী উৎপন্ন করিতেছে, আমদানীর উপর শুল্ক বসাইয়াছে, সে বাহির হইতেও যাহাই পাইবে তাহাই কিনিবে, এমন নিশ্চয়তা কোথায়? তাহার চাহিদারও তো একটা সীমা আছে। কিন্তু তাহা এত দূরে যে, তাহার মধ্যে দেনদার দেশগুলির বর্ত্তমান ক্ষমতার চতুর্গুণ উৎপাদনও স্থান করিয়া লইতে পারে। এইখানেই তাহাদের আশা। ১৯৩৮ সনে আমেরিকা বাহির হইতে মোট ৫০০ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য আমদানী করে। যুদ্ধের ফলে তাহার ক্রয়ক্ষমতা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, ১৯৪৬ সনে আমেরিকার আমদানী-পণ্যের মূল্য হয় ১২০০ কোটি এবং ১৯৪৮ সনে উহা হয় ১৮০০ কোটি ডলার। ইহার মধ্যে ইউরোপ মোটে ২৮৮ কোটি এবং নিকট ও দূরপ্রাচ্যের দেশগুলি মোট ১৬২ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য যোগাইয়াছিল। আমেরিকার ডলারের এই অবস্থার মধ্যেই খাতকদের মাথা গলাইতে হইবে। আমেরিকা যাহাদের নিকট হইতে পণ্য আমদানী করে, তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হইবে। আমেরিকায় কি কি মাল কি দামে কাটতি হইতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং নূতন ধরণের মাল পাঠাইয়া সেখানে অভিনব চাহিদার সৃষ্টি করা যায় কিনা তাহারও চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে। আমেরিকাতে এইরূপে মাল রপ্তানি বাড়াইবার সুযোগ করিয়া লওয়া কঠিন হইলেও অসম্ভব মোটেই নয়।

পাওনা টাকা প্রাপ্তিতে আমেরিকার যে নিজেরও স্বার্থ আছে, একথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং আমেরিকা নানারূপে নিজের চাহিদা বাড়াইয়া এবং খাতক দেশগুলির পণ্য উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিয়া তাহাদের দেনাশোধের উপায় করিয়া দিলে লাভবানই হইবে।

এই কাজ আমেরিকা যে না করিতেছে এমন নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই সাহায্য দেওয়া হইতেছে। বাণিজ্য ও মুদ্রা-ঘটিত ব্যাপারে আরও কতকগুলি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান (যথা—আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বিধান করিতেছে। ইহারা সকলেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পরিষদের অন্তর্ভুক্ত।

বিপত্নীকের বউ

শ্রীসুরুচি সেনগুপ্তা

বিপত্নীকের বউ হতে চলেছে নিরীতি। বিয়ের আগে থেকেই মা, মাসীমা, পিসীমা, কাকীমা, বড় বৌদি, মেজ বৌদি সকলেই তাকে সমবেত ভাবে উপদেশ দিতে সুরু করেছেন যে এক মৃতা নারীর স্থলাভিষিক্ত হতে চলেছে সে ; বিপত্নীক স্বামীর যোগ্যা সহধর্ম্মিণী আর মাতৃহীনা শিশুকন্যা টুকুর মায়ের স্থান পরিপূরণ করাই হবে তার জীবনের আদর্শ।

নিরীতি ছেলেমানুষ নয়, একটু অল্প বয়সে বিয়ে হলে সপত্নীর মেয়ের মত মেয়ে তারও হতে পারত। পুতুলখেলার বয়সেই মেয়েরা সন্তানকামনা করে, নিরীতির অন্তরের গহনেও মাতৃত্বের তৃষ্ণা জেগেছিল, তাই অজানা এক মাতৃহীনা শিশু মেয়ের মলিন মুখ কল্পনা করে তার অন্তরে অপত্য-স্নেহের সঞ্চার হ'ল। অপরিচিত কোন্ এক বিপত্নীকের সঙ্গী-হারা জীবনের বেদনাও যেন সে নিজের বুকে অনুভব করলে। স্নেহপ্রেম উজাড় করে দিয়ে তার অন্তরের বেদনা নিঃশেষে মুছে দেবে বলে সে সঙ্কল্প করলে। কিন্তু মনে মনে স্থির করলে যে, স্বামীর অন্তর থেকে সপত্নীর স্মৃতিকে সে মুছে যেতে দেবে না। প্রথম যৌবনে যে নারীকে তিনি জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেছিলেন, একটি সন্তান উপঢৌকন পেয়েছিলেন যার কাছ থেকে, অন্য নারীর সাহচর্য্যে সেই স্ত্রীকে যদি তিনি ভুলে যান, তবে সেই অকৃতজ্ঞ স্বামীর হৃদয়ে তার আসনও তো স্থায়ী হবে না। তার কুমারী-জীবনের সাধ-আশা তবে রূপ পরিগ্রহ করবে কাকে আশ্রয় করে? স্বামীর জীবনের শূন্যতা দূর করলেও দু'জনে তারা একত্র হয়ে স্বর্গ-তাকে শ্রদ্ধা প্রীতি দিয়ে প্রতিদিন স্মরণ করবে।

বিয়ের আগেই টুকু এসে খানিকক্ষণ ছিল নিরীতির কাছে। তিন বছরের সুন্দর মেয়েটি। তাকে নিরীতির বড় ভালো লেগেছিল। মা অথবা বাপ, মেয়েটি কার মত কে জানে? পদ্মের কোরকের মত দুটি চোখ, পাতলা ঠোঁট দুখানি সে কার কাছ থেকে পেয়েছে? মেয়ের সৌন্দর্য্য দেখেই নিরীতি কল্পনায় তার মা-বাপের মূর্ত্তি গড়ে তুলেছিল।

বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ী এসেই সে টুকুকে কোলে তুলে নিলে। সকলেই টুকুকে বলে তার মা ফিরে এসেছে। মাকে টুকু একেবারে ভুলে যায় নি, তবু শিশুমনের অসংলগ্ন স্মৃতি দিয়ে মনের মধ্যে মাকে সে সম্পূর্ণভাবে ধরে রাখতে পারে না। সেই ঝাপসা স্মৃতির সঙ্গে সে নিরীতিকে জড়িয়ে ফেলে, নিরীতির স্নেহের বন্ধনে ধরা দেয় সে। মা-হারা টুকুর প্রতি গভীর স্নেহে নিরীতির মন ভরে ওঠে। এই মেয়েকে ভাল-বাসবার জন্য সকলে তাকে এত উপদেশ দিয়েছিল কেন সে বুঝতে পারে না। সপত্নীর সন্তানকে সৎমা মমতা করতে পারে না, এই-ই হয় তো জগতের রীতি, কিন্তু তার অন্তরে অনায়াসেই এর ব্যতিক্রম ঘটল।

ফুলশয্যার রাত্রিতেই সে তার স্বামীর মুখে শুনলে যে, তাঁর মা-হারা মেয়ের মায়ের অভাব পূর্ণ করবার জন্যই তাকে ঘরে আনা হয়েছে, এটাই হ'ল মুখ্য কারণ। টুকু যেদিন তাকে পেয়ে মায়ের অভাব ভুলে যাবে সেদিনই নিরীতিকে ঘরে আনা সার্থক হবে। টুকুকে আপন করে নিতে না পারলে স্বামীর হৃদয়-জয় করা সহজ হবে না, অল্প সময়ের মধ্যেই নিরীতি এ কথা বুঝতে পেরেছিল ; তাই টুকুর প্রতি স্বাভাবিক মমত্ববোধ ছাড়াও স্বামীর হৃদয়-জয়ের সূক্ষ্ম এবং প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যও তাকে প্রলুব্ধ করেছিল। টুকুর বিষয়ে স্বামীকে পরিপূর্ণ আশ্বাস দিয়েছিল সে।

কিন্তু মায়ের অভাব পূরণের জন্য স্বামী তাঁর মাতৃহীনা কন্যাকেই নিরীতির হাতে সমর্পণ করলেন, নিজের নিঃসঙ্গ জীবনের কথা উত্থাপন পর্য্যন্ত করেন না। জীবনের শূন্যতা পরিপূর্ণ করবার জন্য নিরীতিকে অন্তরে গ্রহণ করা দূরে থাকুক, হৃদয়-বেদনার সংক্ষিপ্ত কাহিনীও তিনি নিরীতির কাছে প্রকাশে অনিচ্ছুক।

শয়নগৃহে সপত্নীর বৃহৎ তৈলচিত্রখানার দিকে চেয়ে নিরীতি বোঝে যে টুকু দেখতে তার মায়ের মতই হয়েছে। টুকুর সৌন্দর্য্য দেখে কল্পনায় সপত্নীর যে মূর্ত্তি সে রচনা করে-ছিল, সে মূর্ত্তির সঙ্গে এ মূর্ত্তির যেন কোন পার্থক্য নেই। এই লাবণ্যময়ী পরলোকবাসিনীর আনন্দ-বেদনাময় স্মৃতিই যে স্বামীর অন্তর অধিকার করে আছে, আর থাকাই যে স্বাভাবিক ও সঙ্গত একথা বুঝে লোকান্তরিতা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এই অবিচলিত অনুরাগকে সে শ্রদ্ধা করে।

কিন্তু যে মন্ত্র উচ্চারণ করে তিনি প্রথমা পত্নীকে গ্রহণ করেছিলেন, দ্বিতীয় বারেও কি তিনি সেই মন্ত্র উচ্চারণ করেন নি? তাকে এনেছেন কি শুধু তাঁর সন্তানের মায়ের স্থান পূরণের জন্য? যার কাছে তিনি তাঁর সন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহ দাবি করেন, তাকে স্ত্রীর উপযুক্ত আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর এত কুণ্ঠা কেন?

মনের সমস্ত অভিযোগ সংযত করে নিরীতি রোজ নিজে হাতে ফুলের মালা গেঁথে স্বর্গতার প্রতিচ্ছবির গলায় পরিয়ে দেয়, সন্ধ্যায় ধূপের গন্ধ ছড়িয়ে দেয় সেখানে। ঘরে ঢুকে তার এই দীন সেবার আয়োজনটুকুকে অবহেলায় এড়িয়ে যান স্বামী, চোখের দৃষ্টিতে প্রসন্নতার পরিবর্তে ফুটে ওঠে বিরক্তি,

এ যেন নিরীতির অনধিকারচর্চ্চা; স্বামীর অন্তের হৃদয়-দুর্গে প্রবেশের এ এক কৌশল মাত্র।

স্বামী মাঝে মাঝে বলেন, আমাকে তুমি ক্ষমা করো নিরীতি, তোমাকে তো বলেছি যে আমার নিজের প্রয়োজনে নয়, টুকুর জন্যই তোমাকে আনার দরকার হয়েছিল। আমার সে আশা তুমি পূর্ণ করেছ, ওর মায়ের স্থান অধিকার করেছ তুমি। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমাকে পাও নি বলে তুমি অসন্তুষ্ট নও তো?

নিরীতির মনে হ'ল স্ত্রীকে এত বড় অপমান বুঝি ইতিপূর্ব্বে কোন স্বামী করে নি। কিন্তু এই অপমানের একটি কণাকেও নিরীতি বাইরে প্রকাশ হতে দেয় না; অকম্পিত স্বরে সংক্ষেপে বলে "না"। খুশী হয়ে স্বামী বললেন—"বাঁচলাম; লোকে মিছিমিছি এমন ভয় দেখাতে পারে। আমার ভালবাসা না পেলে তুমি নাকি টুকুকে ভালবাসতে পারবে না এই তাদের বিশ্বাস।"

"তুমি তো আর ছেলেমানুষ নও যে, কেউ জুজুর ভয় দেখালেই ভয়ে আঁৎকে উঠবে,"—নিরীতি জবাব দেয়।

স্বামী কাতর-স্বরে বলেন, "তুমি তো জান নিরীতি, টুকুর আর কেউ নেই। ওর শিক্ষা, স্বাস্থ্য আর ভবিষ্যতের সমস্ত শুভাশুভই তোমার উপরে নির্ভর করে। তাই ভয় হয়, তুমি মনে দুঃখ পেলে হয়তো ওর জীবন-গঠন ঠিকমত হবে না। তুমি ওকে একেবারে আপন করে নাও, আমি চিরদিন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।"

এই দুঃসহ কৃতজ্ঞতার বোঝা নিরীতি আর কতদিন বহন করবে? সে কি শুধু মা হবার জন্যই সৃষ্ট হয়েছিল? প্রিয়া হবার যোগ্যতা কি তার নেই? শুষ্ক একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে স্বামী চান তাকে তাঁর সন্তানের মায়ের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে? এই অস্বাভাবিকত্বের পীড়ন থেকে সে মুক্তি পাবে কেমন করে? সুপেয় পূর্ণ পাত্র সরিয়ে নিয়ে কে যেন লবণাক্ত উষ্ণবারি এনে তার অধরের সামনে ধরেছে। স্বামীকে সে পায় নি, পেয়েছে স্বামীর সন্তানকে। যে সন্তান স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেমের সেতু গড়ে তুলতে পারে না, সে অবাঞ্ছিত সন্তানের ভার কিসের প্রয়োজন? এ কঠিন দায়িত্ব সে কেন স্বীকার করবে? শুধু একটুখানি কৃতজ্ঞতার জন্য?

কিন্তু স্বামীকে বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে। সে প্রতিশ্রুতি তো সে ভাঙতে পারবে না। কাঙালের মত স্বামীর কাছে গিয়ে হাত পাতবার আগে যেন তার মৃত্যু হয়।

স্বামীর সমস্ত অবিচার অবহেলা উপেক্ষা করেও সে টুকুকে ভালবাসবে। বিপত্নীক স্বামীর স্ত্রীর যথাযোগ্য আসন সে অধিকার করতে পারে নি, কিন্তু মাতৃহীনা কন্যার মাতৃত্বের আসনকে সে স্নেহে মমতায় গৌরবমণ্ডিত করে তুলবে।

বিপত্নীকের বউ নয়, সে শুধু টুকুর মা।

জার্ম্মান রসায়নী কেকিউলী

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়

য সকল বৈজ্ঞানিকের সাধনায় পাশ্চাত্ত্য দেশ আজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে তাঁহারা চির-স্মরণীয়। তাঁহাদের জীবনী পাঠ করিলে বিস্ময়ে আত্মহারা হইতে হয়। নিরলস সাধনা, ঐকান্তিকতা, সত্যনিষ্ঠা ও নির্ভীকতা যে উন্নতির প্রধান সহায় ইঁহাদের জীবন তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

একাগ্র নিষ্ঠা ইঁহাদিগকে জয়মাল্য দান করিয়াছে। বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া ইঁহারা জীবন-পথে অগ্রসর হইয়াছেন। প্রথম জীবনের অপমান, অবহেলা তাঁহারা মাথার মুকুট-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কেহ আর্থিক দুরবস্থা বা নগণ্য জীবিকাকে উন্নতির সোপান বলিয়া বরণ করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ পিতামাতার নির্দ্ধারিত জীবন-পথকে সাধনার পরিপন্থী মনে করিয়া স্বকীয় পথ বাছিয়া লইতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। জার্ম্মান রসায়নী মহাত্মা কেকিউলী এরূপ একজন বিজ্ঞান-সাধক ছিলেন। ইনি আমাদের দেশে বিশেষ পরিচিত নন। ফ্রেডারিক আগষ্ট কেকিউলী ডার্মষ্টাড নামক গ্রামে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আগষ্টের পিতা ছিলেন সরকারী কর্ম্মচারী। তিনি ছেলেকে একজন সৌধশিল্পী করিতে মনস্থ করেন এবং তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এদিকে কেকিউলী তদানীন্তন বিশ্ববিখ্যাত জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক লিবিগের বক্তৃতা শুনিয়া রসায়নশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। পিতা প্রথমে ছেলের অবাধ্যতায় বিরক্ত হইলেও ক্রমশঃ তাঁহার ঐকান্তিকতায় মুগ্ধ হন। পিতার অনুমতি পাইয়া কেকিউলী সত্বর লিবিগের ছাত্ররূপে তাঁহার গবেষণাগারে প্রবিষ্ট হন। প্রকৃতপক্ষে এখানেই তাহার জীবনের সাধনার পথ উন্মুক্ত হয়। কেকিউলী নিজে এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"প্রথম হইতেই আমি প্রাণপণে গুরুদেবের আদেশ পালন করিতাম। গুরুদেব বলিতেন,

'তোমরা যদি যথার্থ রসায়নী হইতে চাও তো স্বাস্থ্যকেও ভুলিয়া যাইতে হইবে। কেবল শরীর লইয়া ব্যস্ত থাকিলে চলিবে না। আজকাল রসায়ন পড়িতে যাইয়া যাহার স্বাস্থ্যে আঘাত না লাগে সে রসায়নে উন্নতি করিতে পারে না। ..' আমি ঐকান্তিকতার সহিত তাহার উপদেশ পালন করিতাম, বহু বৎসর আমি রাত্রিতে ৩।৪ ঘণ্টার বেশী নিদ্রা যাই নাই। এক রাত্রি পুস্তকের মধ্যে কাটাইয়া তৃপ্তি হইত না। ২।৩ রাত্রি ঐ ভাবে গেলে তবে মনে করিতাম—যে কিছু কাজ করিয়াছি।

এই একাগ্র সাধনার পুরস্কার তিনি অতি শীঘ্র পাইয়াছিলেন। নব্য রসায়নের জনক লিবিগ কেকিউলীকে তাঁহার সহকর্ম্মীরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কেকিউলীর জ্ঞানলিপ্সা ছিল অপরিসীম। তখনই ওখানে ভর্ত্তি হওয়া তাঁহার মনঃপূত হইল না, কিছুদিনের জন্য তিনি জ্ঞানান্বেষণে বহির্গত হইলেন। প্রথমতঃ তিনি ফ্রান্সের তদানীন্তন বিখ্যাত রাসায়নিক ডুমাসের নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহার শিষ্যরূপে এক বৎসর জ্ঞান আহরণ করেন। ফ্রান্সে ওয়ার্জ প্রভৃতি যশস্বী রসায়নীর সাহচর্য্যলাভ করিয়া তিনি ধন্য হন। তৎপর ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জার্ম্মানীতে ফিরিয়া আসেন এবং কিয়ৎকাল অধ্যয়নের পর গিসেন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টর' উপাধিলাভ করিয়া আবার দেশভ্রমণে বহির্গত হন।

এবার লণ্ডন তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র হয়। এই লণ্ডনে বসিয়াই তিনি তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত স্বপ্নটি দেখেন। যে সাধক জীবনভোর একই সাধনায় মগ্ন থাকেন, তাঁহার পক্ষে স্বপ্নে অভীপ্সিত ফললাভ করা মোটেই অসম্ভব নয়। সে ঘটনার গূঢ় মর্ম্ম এখানে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তবে ঐকান্তিকতার ফলে যে ছবি তাঁহার মানসপটে প্রতিভাত হইয়াছিল তাহার দ্বারা রসায়ন-শাস্ত্রের একটি রহস্যদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নেই তিনি জৈববস্তুর গঠন-কৌশল আবিষ্কার করেন। স্বপ্নে অভীষ্টলাভ করিয়া তিনি হাইডেলবার্গে চলিয়া যান এবং সেখানে গভীর গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। তৎপর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বিখ্যাত সূত্র দুইটি প্রচার করেন। তিনি বলেন, অঙ্গার-পরমাণুর চারিটি করিয়া হাত বা বন্ধন আছে এবং উহাদের দ্বারা অঙ্গার-পরমাণুগুলি অপর পরমাণুর সঙ্গে যোগস্থাপন করা ব্যতীত নিজেদের মধ্যে শৃঙ্খল সৃষ্টিও করিতে পারে।

তদানীন্তন বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী কেকিউলীর আবিষ্কারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ঘেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অতি সমাদরে তাঁহাকে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানের প্রধান রাসায়নিক অধ্যাপক রূপে গ্রহণ করেন। এ সময় হইতে কেকিউলীর কর্ম্মধারা সম্প্রসারিত হয়। এই ঘেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে বসিয়া তিনি আবার স্বপ্নযোগে একটি জটিল বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধানের হদিস পান। এইটি হইল বেঞ্জিন নামক অমূল্য পদার্থটির গঠনরহস্য নির্দ্ধারণ করা। কেকিউলীর মত কল্পনা-রাজ্যে বিচরণকারী বৈজ্ঞানিক বিরল। ঐকান্তিক সাধনা বৈজ্ঞানিককে কিরূপে ভাবরাজ্যে আনিয়া ফেলে বিজ্ঞানী কেকিউলী তাহার প্রমাণ। আজ যদি অঙ্গার-পরমাণুর যোগ-সূত্র অপরিজ্ঞাত থাকিত এবং বেঞ্জিনের গঠনরহস্য পরিস্ফুট না হইত তাহা হইলে রসায়নের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে মনুষ্যসমাজ বঞ্চিত থাকিত। জৈব-রসায়নে কেকিউলীর দান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি স্বপ্নযোগে যে গোপন সম্পদ আবিষ্কার করিয়াছেন আজ বিজ্ঞানজগৎ নানা ভাবে তাহার বিশুদ্ধতার প্রমাণ পাইতেছে। জৈবপদার্থের গঠন-কাঠামো বর্ত্তমানে এক্স-রে দ্বারা পরিস্ফুট হইয়াছে। 'রামন এফেক্ট'ও এদিকে আলোদান করিয়াছে। এক্স-রে ও রামন এফেক্ট উভয়ই কেকিউলীর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। প্রত্যেক রাসায়নিক পদার্থে বিভিন্ন পরমাণু কিভাবে সন্নিবেশিত আছে ইহার কতকটা সন্ধান পাইয়া বর্ত্তমান রসায়নীগণ গবেষণাগারে ডুবিয়া আছেন এবং নব নব আবিষ্কারের দ্বারা জগতের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিতেছেন। কেকিউলীর দৌলতে আজ অতি জটিল পদার্থেরও আভ্যন্তরীণ গঠন-প্রণালী অবগত হওয়া যায়। এজন্য কুইনাইন, নীল, ক্লোরোফিল, মঞ্জিষ্ঠা, প্রোটিন প্রভৃতি পদার্থের ভিতরকার রহস্য আজ আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত। আবার এজন্যই প্লাসটিক্, ক্যাপিলস্, পেনিসেলিন, ক্লোরোমাইসিন প্রভৃতি অমূল্য পদার্থ প্রস্তুত হওয়া সম্ভব হইয়াছে।

জীবনের শেষ অধ্যায়ে কেকিউলী বন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন (১৮৬৭ খ্রীঃ), কিন্তু এ সময় তাঁহার প্রতিভায় ভাটা পড়ে। এই সময় তিনি ছাত্র তৈয়ারীতে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার জনৈক ছাত্র বলেন, "আচার্য্যের শিক্ষা-ব্যবস্থা অতি চমৎকার ছিল। তিনি ছেলেদের মধ্যে সর্ব্বদা একটা স্বাধীন চিন্তার ভাব ফুটাইতে চেষ্টা করিতেন। কোন ছাত্র যদি কখনও স্বাধীন চিন্তা লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত তিনি তাহাকে উৎসাহ দিতেন এবং তাহার সঙ্গে বহুক্ষণ আলোচনা করিতেন। তাঁহার বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইত। ইহাতে বুদ্ধি-বৃত্তি ও কল্পনাশক্তি উভয়ই উদ্বুদ্ধ হইত। রসায়ন তাঁহার নিকট সারা জীবনই সাধনার জিনিষ ছিল। ইহাকে তিনি কেবলমাত্র জীবনধারণের উপায় মনে করিতেন না। তিনি এক সময় বলিয়াছিলেন, "বন্ধুগণ, আমাদের স্বপ্নরাজ্যে ডুবিয়া যাইতে হইবে। ইহাতে মাঝে মাঝে সত্য প্রতিভাত হয়। কিন্তু সাবধান, প্রকৃত জীবনক্ষেত্রে স্বপ্নের ফলাফলকে যাচাই না করিয়া কখনও তাহা লিপিবদ্ধ করিও না।" কেকিউলী তাঁহার শেষ প্রবন্ধ লেখেন ১৮৯০ সালে। ১৮৯৬ সালের জুলাই মাসে এই শ্রেষ্ঠ রসায়নী দেহত্যাগ করেন।

উচ্চভূমিতে তেত্রিশ জনের শপথগ্রহণ

ইণ্টারলেকেনে 'উইলিয়াম টেলে'র অভিনয়

শ্রীআদিনাথ সেন

ইউরোপের ক্রীড়াভূমি বলিয়া অভিহিত সুইজারলণ্ডের পাহাড়-বেষ্টিত থুন ও ব্রীয়েঞ্জার হ্রদের মাঝখানে অবস্থিত ইণ্টারলেকেন একটি প্রসিদ্ধ শহর। আল্পস্ পর্ব্বতমালার অনায়াসে অতিক্রম্য সুন্দর শিখরশ্রেণী, অগণিত গ্লেসিয়ার, বহু জলপ্রপাত ও হ্রদের সমন্বয়ে শহরটি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত। চৌদ্দটি মনোরম সুবৃহৎ হ্রদ, শতাধিক কেলিপোত, অনেকগুলি বৈদ্যুতিক 'রেলপথ ও সুপ্রশস্ত মোটর-রোড ইত্যাদি এই অঞ্চলের বিশেষত্ব। ইউরোপের চারিটি বিখ্যাত নদীর উৎপত্তি-স্থান ইহার কাছাকাছি, কিন্তু সেগুলির গতিপথ বহুদূরপ্রসারী। হ্রাইন্ নদী জার্ম্মানীর মধ্য দিয়া উত্তর দিকে উত্তর সাগরে, হ্রোন্ নদী ফ্রান্সের মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরে, ডানিউব পূর্ব্ব-দিকে রাশিয়ার মধ্য দিয়া কৃষ্ণসাগরে এবং ইটালীর মধ্য দিয়া পো নদী দক্ষিণ-পূর্ব্বে আড্রিয়াটিক সাগরে পতিত হইয়াছে। আল্পস্ পর্ব্বতের যথাক্রমে ১০ ও ১২ মাইল দীর্ঘ দুইটি সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া রেলের রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। পশুপালন এখানকার অধিকাংশ লোকের উপজীবিকা হইলেও, ঘড়িনির্ম্মাণ এবং নানা প্রকার কারুশিল্পে ইহাদের অপরিসীম দক্ষতা আছে। প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন, গিরি আরোহণ, বরফের উপর ভ্রমণ ব্যপদেশে নানা দেশ হইতে বহু নরনারী সুইজারলণ্ডের ইণ্টারলেকেনে আসেন। এখানে প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক সপ্তাহে মুক্ত আকাশের নীচে, পাহাড়ের কোলে, স্থানীয় লোকেরা উইলিয়াম টেলের কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটকের অভিনয় করে। এই অভিনয়ে ন্যূনকল্পে সাড়ে তিন শত জন অভিনেতার প্রয়োজন হয়।

প্রাচীনকালের গৃহ, দুর্গ, গির্জ্জা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে এবং বহু লোকজন, সাজসজ্জার সমাবেশে এই অভিনয় বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়। ইহার উদ্দেশ্য দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটি গৌরবময় অধ্যায় সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণকে সচেতন করিয়া তোলা। বহু দেশে, বিভিন্ন ভাষায়, উইলিয়াম টেলের কাহিনী প্রচারিত হইয়াছে। ছেলের মাথায় আপেল রাখিয়া টেলের
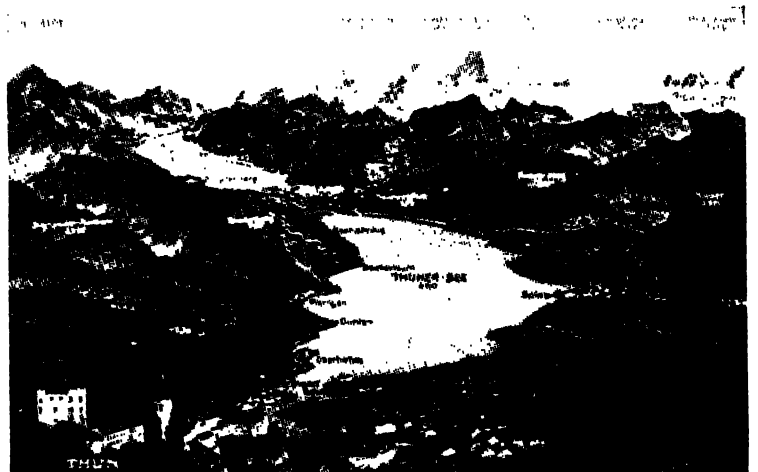
হ্রদবেষ্টিত ইণ্টারলেকেন

তাহা বিদ্ধ করার গল্প কত জনের মনে যে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করিয়াছে তাহার আর অন্ত নাই।

রোন্ গ্লেসিয়ার
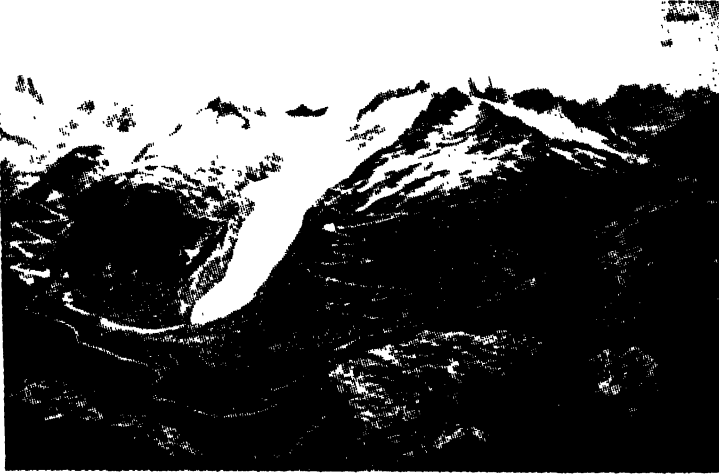
চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সুইজারলণ্ড অনেকগুলি রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া অষ্ট্রিয়ার অধীনে আসে। বিদেশী শাসনকর্তারা প্রজাদের উপর নির্মমভাবে উৎপীড়ন করিতেন। এমনি এক দুর্দ্দান্ত শাসনকর্ত্তা ছিলেন গেস্‌লার। তাঁহার অত্যাচারে প্রজাদের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। চৌরাস্তায় একটি লাঠির উপর নিজের টুপী রাখিয়া তিনি এই আদেশ জারি করিলেন যে, প্রত্যেককেই উহার নিকট নতজানু হইয়া মাথা নোয়াইতে হইবে। ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী নির্ভীক উইলিয়াম টেল এই আদেশ না মানায় স্বীয় পুত্রের সহিত গ্রেপ্তার হইয়া, গবর্ণর গেস্‌লারের নিকট নীত হন। টেলের উপর গেস্‌লারের ভীষণ বিদ্বেষ ছিল, কারণ এক সময়ে কোন নির্জ্জন গিরিপথে যাইবার কালে, পাছে টেল তাহাকে আক্রমণ করিয়া বসেন সেই ভয়েই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন—একথা জানাজানি হইলে পর গেস্‌লার নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত মনে করেন। এবার টেলকে বাগে পাইয়া গেস্‌লার তাঁহাকে সমুচিত শিক্ষা দিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমার অব্যর্থ লক্ষ্যের বিষয়ে অনেক লম্বাচওড়া কথা শুনিয়াছি, এবার দেখি তোমার কিরূপ বাহাদুরি। তোমার ছেলের মাথার উপর একটি আপেল রাখিয়া তীরদ্বারা বিদ্ধ করিতে পারিলে তুমি মুক্তি পাইবে।" টেল আপত্তি করা সত্ত্বেও গেস্‌লার তাঁহার পুত্রকে বাঁধিয়া তাহার মাথার উপরে একটি আপেল রাখিলেন এবং টেলকে লক্ষ্যভেদের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। টেল দেখিলেন গেস্‌লার নাছোড়বান্দা—তাঁহাকে দিয়া লক্ষ্যভেদ না করাইয়া ছাড়িবে

সপরিবারে টেল

পুত্রের সহিত টেলের যাত্রা

অভিনয়ের একটি দৃশ্য—গৃহপ্রাঙ্গণে ষ্টাফাচার ও তাঁহার স্ত্রী

না। তখন তিনি তূণ হইতে একটি বাণ বাহির করিয়া কোমরবন্ধে গুঁজিলেন এবং দ্বিতীয় বাণটিকে সন্তর্পণে নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্যভেদ করিলেন। গবর্ণর প্রথম বাণটির বিষয়ে প্রশ্ন করিলে টেল উত্তর করিলেন, "উহা তোমার জন্য রাখিয়াছিলাম, যদি পুত্রের মস্তকে স্থাপিত আপেলে নিক্ষিপ্ত বাণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইত তাহা হইলে তোমার উপর প্রথমটির ধার পরখ করিতাম।" এই জবাবে গেস্‌লারের মেজাজ সপ্তমে চড়িয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে লইয়া গিয়া কারাগারে বন্দী করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

টেল কিন্তু সহসা হ্রদমধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন এবং সকলের চক্ষে ধুলা দিয়া কি ভাবে যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন তাহার কোন্ হদিস পাওয়া গেল না।

এই ঘটনার সমকালেই তিনটি রাষ্ট্র মিলিত হয় এবং অষ্ট্রিয়ার প্রবল সৈন্যবাহিনীকে পরাস্ত করিয়া দেশের স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপন করে। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ এই রাষ্ট্রত্রয়ের সহিত যোগ দিতে আরম্ভ করে—অবশেষে ২২টি রাষ্ট্র লইয়া নবরাষ্ট্র গঠিত হয়।

প্রসিদ্ধ জার্ম্মান কবি ও নাট্যকার শিলার এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাহিনীকে নাট্যরূপ দান করেন।

এই নাটকের অভিনয় হয় প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে। সুস্পষ্ট হ্রদের শিলাময় তটভূমি, গির্জ্জা, ধনী ফুর্ষ্টের প্রস্তর-নির্ম্মিত মধ্যযুগের গৃহ, নীচে জলের উৎসের পশ্চাতে দরিদ্র জেলেদের কুটীর, উপরে উইলিয়াম টেলের বাসগৃহ ও উচ্চভূমি, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যের পটভূমিকারূপে ব্যবহৃত হয়। বিদেশী শাসনকর্ত্তাদের অত্যাচারের তিনটি দৃশ্যের অবতারণা দ্বারা অভিনয় আরম্ভ হয়। প্রথমটিতে দেখা যায়—হ্রদের পার্শ্বস্থ গ্রাম্য পরিবেশে গৃহপালিত পশুযূথ ইতস্ততঃ বিচরণশীল—হঠাৎ গবর্ণরকে হত্যা করিয়া পলাতক বংগাটেন সেখানে আসিয়া উপস্থিত ; রাজদণ্ডের ভয়ে জেলেরা তাহাকে হ্রদের ওপারে লইয়া যাইতে অস্বীকার করিল। এই জটিল পরিস্থিতি হইতে উইলিয়াম টেল তাহাকে উদ্ধার করিলেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে—স্থানীয় লোকেরা বাড়ী তৈয়ারি করিতে পারিবেন না—গবর্ণরের এই আদেশ প্রচার। এমনি ভাবে একটির পর আর একটি দৃশ্য চোখের সামনে অভিনীত হইতে থাকে, উইলিয়াম টেলের জীবন ও সুইজারলণ্ডের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস যেন মনশ্চক্ষে মূর্ত্ত হইয়া উঠে।
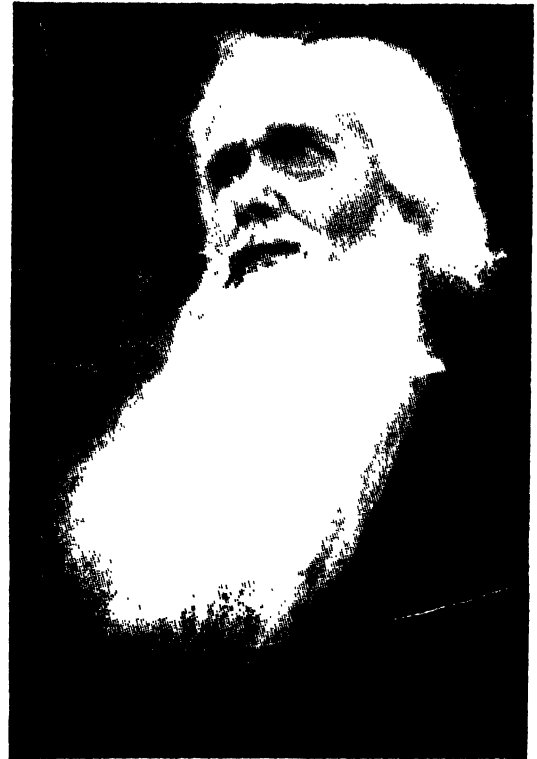
লর্ড আর্টিংষসেনের ভূমিকায়

টেলের আপেল বিদ্ধ করার দৃশ্যটি দর্শকমণ্ডলীকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে। অবশেষে জঙ্গলের পথে অশ্বারোহী গেস্‌লারকে বাণ নিক্ষেপে হত্যা করিয়া টেল যখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন দর্শকমণ্ডলী যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে।

অবলম্বন

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু

[আমেরিকার একটি হোটেল। সমুদ্রকে সুমুখ করে উন্নত শিরে দাঁড়িয়ে আছে।

হোটেলটি দোতলা। দোতলায় থাকেন স্বামী-স্ত্রী। ছেলেপুলে হয় নি এঁদের। বিয়ে হয়েছে অনেক দিন।

হোটেলটির দক্ষিণ পাশ ঘেঁষে একটি পার্ক।...জনসাধারণের বেড়াবার, হাওয়া-বাতাস উপভোগ করবার একটি মনোরম স্থান। এখানে আছে হরেকরকমের সুন্দর সুন্দর গাছ-পালা আর সবুজ রঙের বেঞ্চ। চকচকে-ঝকঝকে, যেন রঙীন কাচের টুকরো। রাত্রিবেলা পরিষ্কার আলো। ভারি ভাল লাগে।

হঠাৎ বৃষ্টি সুরু হয় ঝম্‌ঝম্ করে। সমুদ্র উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে, তরঙ্গে তরঙ্গে করছে নৃত্য। বৃষ্টির ফোঁটা সমুদ্রের জলে পড়ছে। তাতে একটা ভারি শ্রুতিসুখকর শব্দ হচ্ছে—শুনে বেশ আমেজ লাগে।

স্ত্রীর নাম গ্রেটা। স্বামীর নাম জন্‌সন।

জন্‌সন বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে বই পড়ছেন মন দিয়ে। দুধের মত শাদা ধবধবে পরিষ্কার বিছানা। দামী খাটের ওপর বিছানো। মাত্র দুটি লোক এতে পাশাপাশি শুতে পারে আরামে স্বচ্ছন্দে। বিছানার ওপর গোটাচারেক সালুর ওয়াড়ঢাকা বালিশ। একটায় মাথা রেখেছেন জন্‌সন। দুটি বালিশ রেখেছেন পায়ের দিকে। পা দুটি তুলে দিয়েছেন বালিশগুলোর ওপরে। এমনি ভাবে আড় হয়ে শুয়ে তিনি বই পড়ছেন।

ওদিকে গ্রেটা ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছেন নিঃশব্দে। দৃষ্টি তাঁর অদূরে, সমুদ্রে নিবদ্ধ। কিন্তু পথের লোকচলাচলের দৃশ্যটাও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে না।

গ্রেটা দেখতে পান, স্ফটিকের মত ধবধবে শাদা একটি বিড়ালের বাচ্চা তাঁদেরই হোটেলের নীচের তলার দেয়াল ঘেঁষে একেবারে গুটিসুঁটি হয়ে বৃষ্টির হাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। বেচারা বিড়াল-শিশুর শরীর বৃষ্টিধারায় অর্দ্ধেকটা সিক্ত হয়ে উঠেছে। বাকী অর্দ্ধেকটা যাতে আর না ভেজে বোধ করি সেইজন্য এই চেষ্টা।

গ্রেটা স্বামীর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলেন, আমি নীচে যাচ্ছি নেমে। বেড়ালের বাচ্চাটাকে নিয়ে আসি। আহা! বেচারা জলে ভিজছে। বোধ হয় ঠাণ্ডায় মরেই যাবে। আমি যাই।

জন্‌সন বই থেকে মুখ না তুলেই বলেন, বেড়ালবাচ্চা?

গ্রেটা একটু বিরক্তির সঙ্গে বলে ওঠেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেড়ালবাচ্চা।

জন্‌সন এবার যেন কথাটা একটু মন দিয়ে শুনেছেন। বই থেকে মুখ তুলে চাইলেন স্ত্রীর দিকে। বললেন, বেড়ালবাচ্চা নিয়ে করবে কি তুমি?

ওটাকে উপরে নিয়ে আসব।

কিন্তু আমিও ত যেতে পারি বাচ্চাটাকে আনতে। তুমি থাক। নীচে আমিই যাই।

স্ত্রী বাধা দিলেন। বললেন, না, তুমি শুয়ে শুয়ে বই পড়। বাইরে যা বৃষ্টি, ভিজেটিজে শেষে অসুখে পড়বে। দরকার নেই। আমিই যাচ্ছি।

বলতে বলতে গ্রেটা এগিয়ে গেলেন সিঁড়ির দিকে।

জন্‌সন এতক্ষণ বিছানা থেকে মাথা ঈষৎ উঁচু করে ছিলেন। এখন পুনরায় পূর্ব্বের মতই শুয়ে পড়লেন। ঘরের ভিতর থেকে গলার স্বরটা একটু উঁচু করে বললেন, যাচ্ছ যাও। কিন্তু বৃষ্টিতে যেন ভিজে এস না।

কথাটা গ্রেটার কানে গেল না। তিনি ততক্ষণে একতলায় নেমে এসেছেন তর্ তর্ করে।

একতলায় থাকেন হোটেলের মালিক মিঃ হ্যাচিসন। এঁর বয়স কাঁচা। খাসা চেহারা। গ্রেটার সঙ্গে মুখোমুখি হতেই মাথার টুপীটা খুলে তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন।

গ্রেটা ফিক্ করে একটু হাসলেন। ভারি সুন্দর দেখাল তাঁকে। হ্যাচিসনও মৃদু হাসলেন। বললেন, কি বিশ্রী বৃষ্টি সুরু হয়েছে বলুন ত? ভেরী ব্যাড্ ওয়েদার। কিন্তু...কিন্তু আপনি যাচ্ছেন কোথায়?

গ্রেটা হ্যাচিসনের সুন্দর মুখের দিকে ক্ষণকাল একদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নিলেন। বললেন, বাইরে একটু কাজ আছে।

—এই বৃষ্টিতে? দাঁড়ান, একটা ছাতা দি আপনার সঙ্গে।

—কিছু দরকার নেই মিঃ হ্যাচিসন। গ্রেটা বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

তখনও বেশ বৃষ্টি পড়ছে। গ্রেটা পথে যেমনি পা বাড়িয়েছেন, পিছন থেকে একটা মিষ্ট স্বর তাঁর কানে এল—দাঁড়ান।

পিছন ফিরে তাকালেন গ্রেটা। দেখলেন, একটা ছাতি হাতে করে এগিয়ে আসছেন তাঁরই দিকে মিঃ হ্যাচিসন।

—এ কি? আপনি আবার কষ্ট করে ছাতি নিয়ে এলেন কেন?

হ্যাচিসন আবার মৃদু হাসলেন। বললেন, কষ্ট? না কষ্ট আবার কি, মিসেস্ গ্রেটা? সামান্য ছাতাটা আপনার মাথায় ধরে আর যেতে পারব না? বলতে বলতে তিনি ছাতিটা খুলে গ্রেটার পাশে এসে তাঁর মাথায় ধরলেন।

বিড়ালবাচ্চাটাকে নিয়ে গ্রেটা খুব ব্যস্ত আজকাল। ওকে খাওয়ানো, নাওয়ানো—সব কাজই নিজের হাতে করেন।

ওকে আদর করে বেশ তৃপ্তি পান, শান্তি পান। বিড়াল-শিশুটির নামকরণ হয়েছে—লিলি।

রাত্রে গ্রেটা লিলিকে বুকে করে নিদ্রা যান।

ওদিকে স্বামী কিন্তু মনে মনে চটতে থাকেন। একই বিছানায় শুয়ে ঐ বিড়ালছানাকে তিনি সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু প্রকাশ্যে বলেন না কিছুই। এমনি করেই দিন যায়। একদিন…

জন্‌সন তাঁর পুস্তকের সেল্‌ফ থেকে কি একখানা বই পাড়তে গিয়ে দেখেন—খানকয়েক বইয়ের মলাট এবং পাতা ছিঁড়ে মাটিতে পড়েছে। প্রাণ-অপেক্ষা প্রিয় এই বই-গুলির এমনি শোচনীয় পরিণতি দেখে তাঁর পায়ের নখ থেকে মাথার চুলগুলি পর্য্যন্ত ক্রোধে, ক্ষোভে আর দুঃখে জ্বালা করে উঠল। উনি কি করবেন ভাবছেন, এমন সময়ে সেল্‌ফের একেবারে ওপরের তাকের এককোণ থেকে লিলি ডেকে উঠল—মিঁ-উ-উ…

জন্‌সন লাফ দিয়ে লিলির গলাটা বাঁ-হাত দিয়ে চেপে ধরে ওকে ছুঁড়ে ফেললেন মাটিতে, তার পর একটা ছড়ি দিয়ে ঘাকতক বসিয়ে দিলেন।

লিলি যাতনায় কাঁদতে কাঁদতে ছুটে পালাল নীচে। গ্রেটা তখন বাড়ী ছিলেন না। পাশাপাশি কোথাও বোধ করি গিয়েছিলেন।

কিন্তু ফিরে যখন এলেন তখন এক কাণ্ড বেধে গেল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে।

স্ত্রী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলেন—আমার লিলিকে তুমিই তাড়িয়েছ। লিলি আমার মেয়ের মত। সে আমার কোল-জোড়া হয়ে ছিল। তুমি এমনি নিষ্ঠুর যে তাকে মেরে তাড়িয়েছ এখান থেকে। কেন, তার আগে আমাকে তুমি তাড়ালে না কেন?

স্বামী বললেন—কি আশ্চর্য্য! একটা বিড়ালছানা হ'ল তোমার মেয়ে? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? কেন, তোমার সন্তানের জননী হওয়ার বয়স কি পার হয়ে গেছে নাকি?

স্ত্রী সেইভাবে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—না, এ সব কথা আমি শুনতে চাই না। বইয়ের সঙ্গেই তোমার সম্পর্ক! আমার দুঃখ তুমি বুঝবে না। তুমি পথ ছাড়, আমি যাই। আমার লিলিকে আগে খুঁজে নিয়ে আসি। তার পর তাকে নিয়ে চলে যাব যেদিকে দু' চক্ষু যায়।

জন্‌সন অনেকখানি নরম হয়েছেন এখন। স্ত্রীকে শান্ত করলেন কোন মতে। বললেন, তুমি স্থির হও। আমি দেখছি কোথায় গেল। আর কোথায়ই বা যাবে বল? এই কাছাকাছি কোথাও বোধ করি লুকিয়ে-টুকিয়ে আছে।

জন্‌সন সত্যই লিলিকে খুঁজে আনতে বেরিয়ে পড়েন।

ওদিকে গ্রেটার মনের ভিতর যেন সমুদ্রের তরঙ্গমালার আলোড়ন জাগে। ঘরময় ঘুরে বেড়ান তিনি অস্থিরতায়।

একটা বড় আরশির সুমুখে হঠাৎ ফিরে দাঁড়ান গ্রেটা। নিজের চেহারা চোখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকেন। যতই দেখেন ততই তাঁর নিজেকে ভারি ভাল লাগে। নিজেকে দেখে আজ তাঁর আর আশা মিটতে চায় না, আরশির প্রতিফলিত নিজের প্রতিচ্ছায়ার লালটুকটুকে ক্ষীণ ওষ্ঠে চুম্বনরেখা অঙ্কিত করে দেবার এক প্রবল বাসনা ওঁর মনে জাগে। হঠাৎ নিজের প্রতিচ্ছবির পিছনে এক দীর্ঘাকৃতি সুপুরুষের ছায়া দেখে গ্রেটা সচকিতে ঘুরে দাঁড়ালেন আরশির দিকে পিছন করে।

—মিসেস গ্রেটা, এটা কি আপনার? সহাস্যে বললেন হ্যাচিসন।

গ্রেটা ওঁর কোলে লিলিকে দেখে পুলকিত হয়ে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এতো আমারই লিলি! কোথায় পেলেন ওকে?

হ্যাচিসন হাসতে হাসতে লিলিকে গ্রেটার কোলে তুলে দিয়ে বললেন, ওতো আমার বিছানার একপাশে শুয়ে ছিল। কখন এসেছে জানতেই পারি নি।

মাতৃস্নেহে পরম আদরে লিলির গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে গ্রেটা বললেন, আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ।

—না না, এতে ধন্যবাদ দেওয়ার কি এমন আছে? আপনার জিনিষ, আপনাকে ফেরত দেওয়াই ত আমার কর্ত্তব্য। এতে ধন্যবাদ পাবার কিছু নেই—আচ্ছা…

—একি! চললেন যে? কোকো খাবেন না? কোকো ত আপনার ভারি প্রিয় জিনিষ!

এই বলে গ্রেটা পরিষ্কার ছোট ছোট দাঁত বের করে হাসতে লাগলেন। হ্যাচিসন সে হাসিতে যোগ দিলেন না। বললেন, কোকো ত আমি অনেক দিন হ'ল খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

গ্রেটা বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, কিন্তু কেন?

হ্যাচিসন বাইরের দিকে মুখ করে বললেন, আপনি খান না বলে।

কোন কথা শোনবার প্রতীক্ষায় রইলেন না তিনি। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

ঘণ্টাখানেক খোঁজাখুঁজি করে জন্‌সন আপন মনে গজ্‌গজ্ করতে করতে ফিরে এলেন—না কোথাও পেলাম না বাপু! কোথায় যে গেল হতচ্ছাড়া বাচ্চাটা! খুঁজে খুঁজেই সারা হলাম। একটা বেড়ালের জন্য আমার কি নাকাল…

থমকে দাঁড়ালেন জন্‌সন। বিছানার দিকে তাঁর নজর পড়ল, স্ত্রী পাশ ফিরে শুয়ে বিড়ালছানাটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর-সোহাগ করছেন।

---

* একটি বিদেশী গল্পের ভাব অবলম্বনে।

বীরভদ্র

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

রুদ্রের সব বীরভদ্রের
জয়গান করি আমি,
তাহাদের যাহা বিফলতা—তাহা
সফলতা চেয়ে দামী।
বৃহৎ মহৎ আসে নরসিংহ
জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ,
ধরাকে দেয় না হতে কুৎসিত
অবসাদে অধোগামী।

সপ্তসিন্ধু সজোরে আলোড়ি'
মন্থন সুধা তোলে,
উদ্দাম তারা শুধু হলাহল
পান ক'রে যায় চলে।
বাসুকীরে ঠেলে, সূর্য্যকে দেয় শান,
যেন গ্রহতারা উপাড়িতে আগুয়ান,
ভুজবীর্য্যেতে বিশ্বনাথের
রুদ্ধ দেউল খোলে।

দক্ষযজ্ঞ নাশ করে তারা,
হরে দিক্‌পাল জ্যোতি,
ঘটায় দুষ্ট রক্তবীজের
বংশের দুর্গতি।
লক্ষ বলিই দেয় যে চামুণ্ডাকে,
প্রলয়ের মাঝে জীবনমন্ত্র হাঁকে,
তারাই ডোবায় যদুবংশের
দুর্জ্জয় দ্বারাবতী।

আকাশস্পর্শী স্পর্দ্ধা যাদের
যারা ঘোর জড়বাদী
লুণ্ঠিত ধনে নিরূঢ় সজ্জে
সেজে থাকে বনিয়াদী।
তাহাদের কেশ করিয়া আকর্ষণ,
জাগায় বক্ষে বিবেকের স্পন্দন,
যায় তাহাদের ধ্বংসের বীজ,
বপন-বজ্র সাধি'।

ভীম আবর্ত্ত, মুক্ত স্রোত
আনে দীন পল্বলে,
জাগায় ভয়াল ঘূর্ণী ঝঞ্ঝা
আকাশে জলে স্থলে।
যুগের পুঞ্জ আবিলতা করে দূর,
ভাঙি দম্ভের পাহাড় করে সে চুর,
দহি' স্বার্থের খাণ্ডব বন
মিশায় ভস্মতলে।

বলদৃপ্তকে সংযত করে,
অসতকে করে সৎ,
শঙ্কিত করে অতিশক্তিতে
ছিল যারা নিরাপদ।
নাস্তিকও লয় ভগবানে আশ্রয়,
পাপীর মনেও জাগে ধর্ম্মের ভয়,
শিহরে দর্পী বর্ত্তমান যে
ভাবিয়া ভবিষ্যৎ।

অভেদ্য গিরি বিদীর্ণ করি
ক'রে দেয় তারা পথ,
অর্দ্ধেক পথে আসি থেমে যায়
তাহাদের জয়রথ।
ফেরে অপূর্ণ সাধনা তাদের বুঝি,
গঙ্গার অবতরণের পথ খুঁজি,
তাদেরি পুঁজিতে ধনী হয় কোনো
অনাগত ভগীরথ।

হয় বিদগ্ধ মুমূর্ষু ধরা
ভেজে রসে পরিপুর,
উন্মাদনায় বক্ষ নাচায়,
কণ্ঠেতে দেয় সুর।
হোক হানিবল, হোক্ তারা হিট্‌লার,
শত্রু নহেক মিত্র এ বসুধার,
ভুবনে তাদের প্রাণশক্তির
দান যে সুপ্রচুর।

ছাড়ে পঙ্কিল রিক্ত জীবনে
রুই কাত্‌লার পোনা,
ধূলিমুষ্টিতে রেখে দিয়ে যায়
মুঠি মুঠি খাঁটি সোনা।
দুর'ন্তের পাকা ধানে দেয় মই,
সলিল-প্রাসাদ করে তার জলসই।
নিষ্ফলতায় ঢেকে রেখে যায়
বিরাট সম্ভাবনা।

ফাঁসিকাষ্ঠেতে ঝুলাও তাদিকে
পাঠাও নির্ব্বাসনে,
হোক লাঞ্ছিত আসন পাতে যে
তারা মানবের মনে।
যায় তারা শুধু রেখাপাত করি বটে,
কাল তা শোভিত করে মর্ম্মর-মঠে,
নিঃস্ব তাহারা—ধনী হয়ে ওঠে
বিশ্ব তাদেরি ধনে।

ভগবানচন্দ্র বসু

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

বর্ত্তমানে ভগবানচন্দ্র বসুর কথা আমরা এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছি। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি উৎকৃষ্ট ছাত্ররূপে, কর্ম্ম-জীবনে সাধারণ জনগণের উপকারী বন্ধুরূপে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ভগবানচন্দ্র আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর পিতা এবং স্বনামধন্য আনন্দমোহন বসুর শ্বশুর। তিনি ছিলেন এই দুই বাঙালী-প্রধানের আদর্শস্থানীয়, উভয়েরই জীবনকর্ম্ম নিয়ন্ত্রণে তাঁহার কৃতিত্ব অসামান্য। এরূপ কৃতী পুরুষের জীবনকথা আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।
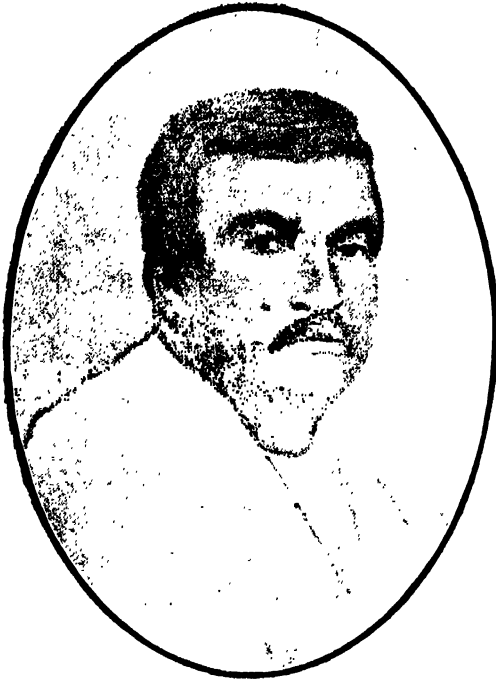
ভগবানচন্দ্র বসু

কিন্তু দুঃখের বিষয়, জীবনী বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার উপকরণ যথেষ্ট পাওয়া যায় নাই। শিক্ষাবিষয়ক বার্ষিক বিবরণীতে ও অন্যান্য সরকারী নথিপত্রে এবং সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় তাঁহার সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। এই সকল হইতেই আমরা তাঁহার কৃতিত্ব সম্বন্ধে কতকটা আঁচ করিয়া লইতে পারি।

ভগবানচন্দ্র ১৮৯২ সনের ২রা আগষ্ট কলিকাতায় পরলোক-গমন করেন। তখন তাঁহার বয়স অনুমান ৬৩ বৎসর হইয়া-ছিল। ইহা হইতে ধরিয়া লওয়া যায়, তিনি ১৮২৯ সন নাগাদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈত্রিক নিবাস ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার রাড়িখাল গ্রামে। বিক্রমপুর মধ্যযুগে শিক্ষা-সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট পীঠস্থান ছিল। এই অঞ্চলে বিখ্যাত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং বৈদ্য-কায়স্থ পরিবারসমূহের বাস। মুসলমান আমলের শেষ এবং ইংরেজ আমলের প্রারম্ভে মাৎস্যন্যায় হেতু এখানকার সমাজেও নানারূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় বটে, কিন্তু পূর্ব্বকালের শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারা কখনও বিলুপ্ত হয় নাই, বরং বরাবর ইহার জের টানিয়া আনাই হইয়াছিল। গত শতাব্দীতে শুধুমাত্র বিক্রমপুর অঞ্চল

পত্নী বামাসুন্দরী

হইতে যত কৃতী পুরুষের উদ্ভব হইয়াছিল এমনটি আর কোন একক অঞ্চলে খুব কমই দৃষ্ট হয়। ভগবানচন্দ্রের মধ্যেও পূর্ব্বকালের উদার হিন্দু শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষিত হইত।

২

ভগবানচন্দ্রের শৈশবকালীন শিক্ষার বিষয় আমরা বিশেষ কিছু অবগত নহি। ঢাকা কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি পাঠে যে বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিলেন, শিক্ষা-সমাজের (Council of Education) বাৎসরিক বিবরণসমূহ হইতে তাহা জানিয়া লওয়া সম্ভব। ভগবানচন্দ্র ১৮৪৮-৪৯ সন পর্য্যন্ত একাদিক্রমে তিন-চারি বৎসর ঢাকা কলেজে জুনিয়র

স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন। শেষ বৎসরের পরীক্ষায় তিনি নম্বর পান ২৪৮'৫।১ এই সময়ে তিনি রামলোচন ঘোষ বৃত্তিও লাভ করিয়াছিলেন। পর পর কয়েক বৎসর এই বৃত্তি পাইয়া ১৮৪৯-৫০ সনে তিনি সিনিয়র বিভাগে উন্নীত হন। প্রায় তিন বৎসরকাল ভগবানচন্দ্র সিনিয়র বিভাগে অধ্যয়ন করেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার পাঠোৎ-কর্ষের বিষয়ও বিশেষরূপে জানা যাইতেছে। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম বৎসর, ১৮৪৯-৫০ সনের সিনিয়র পরীক্ষায় তিনি ৩৫০ নম্বরের মধ্যে ২০৫'২৫ নম্বর প্রাপ্ত হন।২ তখনকার দিনে ইহা খুব উচ্চ নম্বর বলিয়া বিবেচিত হইত। ঢাকা কলেজে ঐ সময় কতকগুলি বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষানুরাগী ইংরেজ ও বাঙালীদের প্রদত্ত অর্থের সুদ হইতে প্রতি বৎসর উৎকৃষ্ট ছাত্রদের এই সকল পুরস্কার দেওয়া হইত। ভগবানচন্দ্র বিশুদ্ধ ও মিশ্র গণিত এবং ইতিহাসের পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য ১৮৪৯-৫০ সনে যথাক্রমে নগদ এক শত টাকা ও পঞ্চাশ টাকা মূল্যের পুস্তক পারিতোষিক পাইয়াছিলেন।৩

দ্বিতীয় বৎসরের (১৮৫০-৫১) পরীক্ষাতেও তিনি অনুরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হন।৪ তখনকার দিনে বিভিন্ন কলেজে 'লাইব্রেরী মেডাল' নামে একটি স্বর্ণ-পদক দিবার ব্যবস্থা ছিল। প্রতি বৎসর কলেজের গ্রন্থাগারের পুস্তকাদির উপর প্রশ্ন করিয়া এই পরীক্ষা লওয়া হইত। কলিকাতার হিন্দু কলেজ, হুগলী কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজ হইতেও প্রখ্যাতনামা ছাত্রগণ এ ধরণের পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাইয়া 'লাইব্রেরী পদক' লাভ করিতেন। ১৮৫০-৫১ সনে ঢাকা কলেজ হইতে ভগবানচন্দ্র বসু এই পদক লাভ করেন। সেযুগে এবম্বিধ পদক লাভ করা বিশেষ গৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত। এবারে মাত্র দুই জন ছাত্র ঢাকা কলেজ হইতে এই পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ভগবানচন্দ্রের উত্তর যে অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছিল পরীক্ষকগণের এই মন্তব্য হইতে তাহা জানা যায়:

"The answers of Mr. C. J. Stephen were very creditable, but those of Bhugwan Chunder Bose were deemed by the examiners superior to them, and to entitle their writer to the gold medal." 5

অর্থাৎ, 'ষ্টিফেনের উত্তরগুলি খুব উঁচুদরের হইয়াছিল, কিন্তু ভগবানচন্দ্রের উত্তরগুলি এ সমুদয়কেও ছাড়াইয়া গিয়াছে, সুতরাং স্বর্ণ পদক তাঁহারই প্রাপ্য।'

তৎকালীন পরীক্ষাসমূহে এতাদৃশ কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় ভগবানচন্দ্র ঢাকা কলেজের "Head Student" বা প্রধান ছাত্র বলিয়া অভিহিত হইলেন। বড়লাটের আইন-সচিব জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন শিক্ষা-সমাজেরও সভাপতি ছিলেন। এই পদাধিকার বলে তিনি কলিকাতায় ও মফস্বলে বিভিন্ন কলেজের পারিতোষিক প্রদান উৎসবে পৌরোহিত্য করিতেন। এই সময় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক সারগর্ভ বক্তৃতা দিতেও ত্রুটি করিতেন না। বেথুনের দুইটি বিষয় বড়ই প্রিয় ছিল। আর এ বিষয়ে ছাত্রদের প্রায়ই উপদেশ দিতেন। বাঙালী ছেলেরা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া বাংলা সাহিত্যের অনুশীলনে যাহাতে প্রবৃত্ত হয় সে সম্বন্ধে তাঁহার প্রায় প্রত্যেক বক্তৃতায়ই কিছু-না-কিছু উপদেশ থাকিত। তাঁহার আর একটি প্রিয় বিষয় ছিল—এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার। তিনি এ উদ্দেশ্যে কলিকাতায় ইতিপূর্ব্বে একটি বালিকা বিদ্যালয় (বর্ত্তমান বেথুন স্কুল ও কলেজ) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৮৫১ সনের প্রথমে ঢাকা কলেজের পারিতোষিক প্রদানকল্পে বেথুন তথায় গমন করেন। তিনি এবারকার বক্তৃতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিলেন। ভগবানচন্দ্র বসু ঢাকা কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্র। শিক্ষা-সমাজের সেক্রেটারী ডাঃ মোঅট স্বভাবতঃই বেথুন সাহেবের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। বেথুনের সঙ্গে পরিচয়কালে ভগবানচন্দ্রের কিরূপ মনোভাব হইয়াছিল, তাহার বিষয় তদীয় তৃতীয়া কন্যা লাবণ্যপ্রভা প্রমুখাৎ আমরা এইরূপ জানিতে পারি:

"এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া পিতৃদেব বলিয়াছেন—মহৎ লোকের কি অদ্ভুত শক্তি। বেথুনের আনন্দদীপ্ত মুখের দিকে যখন চাহিলাম, তাঁহার কণ্ঠে যখন উৎসাহবাক্য শুনিলাম, সাদর করমর্দ্দনে তিনি যখন আমায় সম্বর্দ্ধনা করিলেন, তখন জানি না কেন, বিদ্যুতের মত এই সঙ্কল্প আমার মনে সহসা স্ফুরিত হইল—'আমি আমার কন্যাদিগকে উচ্চ শিক্ষাদান করিব।'"৬

৩

ভগবানচন্দ্র ১৮৫২ সনের প্রারম্ভেই কলেজ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার কৃতিত্বের কথা শিক্ষা-সমাজ ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহারা অনতিবিলম্বে, ১৮৫২ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারী মাসিক ষাট টাকা বেতনে ভগবানচন্দ্রকে কুমিল্লা সরকারী স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন।৭ কুমিল্লা স্কুলের লোক্যাল কমিটি ভগবানচন্দ্রকে "the most distinguished scholar

---

1 *General report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1848-49.* P. 127.
2 *Ibid.*, for 1949-50. P. 33.
3 *Ibid.*, P. 144.
4 *Ibid.*, for 1850-51. Appendix D. P. clvii.
বিষয়ানুসারে পরীক্ষায় নম্বর এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে:
Literature—44.8; Mental Philosophy—44; History—62.5; Pure Mathematics—59; Mixed Mathematics—64; English Essay—30; Vernacular Essay—22. Total 326.3.
5 *Ibid.*, p. 102.

৬ বামাবোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫: 'পরলোকগতা স্বর্ণপ্রভা বসু"।

7 *General Report on Public Instruction*, etc. for 1851-52. P. 101.

of the Dacca College of the past year,"[৮] অর্থাৎ, 'ঢাকা কলেজের গত বৎসরের সর্ব্বাপেক্ষা কৃতী ছাত্র' বলিয়া আখ্যাত করেন। কলেজের অধ্যক্ষ জি. ল্যুইস্ ১৮৫১-৫২ সনে প্রদত্ত কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের বিবরণে ভগবানচন্দ্র সম্বন্ধে লেখেন : "Bhugwan Chandra Bose is spoken of in high terms at Commillah."[৯] ইহা হইতে বুঝা যায়, কুমিল্লায় তাঁহার খ্যাতি অল্প দিনের মধ্যেই বেশ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বৎসরে ঢাকা কলেজের আরও দুই জন ছাত্র পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন—১৮৪৯ সনে আর একজন ভগবানচন্দ্র বসু এবং ১৮৫০ সনে রামশঙ্কর সেন। উভয়েই প্রথমে সরকারী শিক্ষাবিভাগে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

ভগবানচন্দ্র প্রায় দেড় বৎসরকাল কুমিল্লায় শিক্ষকতা-কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। এই স্কুলে তাঁহার স্থলে আর একজন দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন ১৩-৬-৫৩ তারিখে।[১০] ১৮৫৩ সনের অক্টোবর মাসের ঘোষণাবলে মফস্বল জেলা শহরগুলিতে পর পর কতকগুলি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। কোথাও পুরাতন স্কুলকে এই মর্য্যাদা দান করা হয়, কোথাও বা নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ময়মনসিংহ স্কুল ১৮৫৩, ৫ই নবেম্বর জেলা স্কুলে পরিণত হইল। এরূপ আয়োজন আগে হইতেই চলিতেছিল, কারণ ভগবানচন্দ্র মাসিক দেড় শত টাকা বেতনে ইহার হেডমাষ্টার বা প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন ১৮৫৩ সনের ৩রা অক্টোবর তারিখে।[১১] এই পদে তিনি পুরা পাঁচ বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃতিত্বগুণে বিদ্যালয়টির উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে লাগিল। ময়মনসিংহ স্কুলে ভগবানচন্দ্রের কৃতিত্ব বিষয়ে লোক্যাল কমিটি ১৮৫৭-৫৮ সনে এইরূপ মন্তব্য করেন :

"The Head Master Baboo Bhugwan Chunder Bose is a most valuable man to the department and evinces a great zeal and ability in the discharge of his laborious duties. He is endeavouring to introduce important reforms into the manner of teaching, and the committee have little doubt that the progress of the students in English and other branches will be much benefited thereby during the current and in future years." 12

ইহা হইতে জানা যাইতেছে, স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে সবিশেষ আগ্রহ ও দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া ভগবানচন্দ্র এই বিভাগের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শিক্ষা-প্রণালীর নূতন ধারা প্রবর্ত্তনেও তিনি প্রয়াসী হইলেন। তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেই ১৮৫৮ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।[১৩] ইহার পূর্ব্ববৎসর মাত্র নবপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার সূত্রপাত হইয়াছিল। ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে কর্ম্ম করিতে করিতেই ভগবানচন্দ্র ১৮৫৮, ২৩ সেপ্টেম্বর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর নিযুক্ত হইয়া ঐ স্থলেই স্থিত হইলেন। তিনি বিদ্যালয়ের এতখানি শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন যে, ইহার পরবর্ত্তী প্রধান শিক্ষক উমাচরণ দাস সম্পর্কে বলিতে গিয়া ১৮৫৯-৬০ সনে লোক্যাল কমিটি প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকের গুণকীর্ত্তনেও পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহারা আশা করেন যে, উমাচরণও ভগবানচন্দ্রের যোগ্য পদাধিকারী হইয়া কার্য্য করিবেন। ভগবানচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহারা বরাবর উচ্চ ধারণাই পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন।

("—will prove a worthy successor to Baboo Bhugwan Chunder Bose, of whose services they have all along entertained a high opinion.") 14

৪

ভগবানচন্দ্র ডেপুটি কলেক্টর ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে পঁচিশ বৎসরকাল নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার এই সময়কার কার্য্যের বিবরণ সরকারী গেজেটেড্ কর্ম্মচারীদের ইতিহাস-পুস্তক হইতে এখানে প্রদান করিতেছি :

কর্ম্মস্থল	পদ	নিয়োগের তারিখ
ময়মনসিংহ	ডেপুটি কলেক্টর	২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮
("Lower Standard" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ—১৯ মে ১৮৫৯)		
ফরিদপুর	ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেঃ কলেক্টর	২৬ মে ১৮৬০
"	এসেসর ও ডেঃ কলেক্টর	১০ নবেম্বর ১৮৬০
("Higher Standard" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ—১০ ডিসেম্বর ১৮৬১)		
ফরিদপুর	ডেঃ ম্যাজিঃ ও ডেঃ কলেঃ ৪র্থ গ্রেড	৪ এপ্রিল ১৮৬৫
(ছুটি : ৩০ এপ্রিল ১৮৬৭ হইতে তিন মাস)		
যশোহর	ডেঃ ম্যাঃ ও ডেঃ কলেঃ	২৯ ডিসেম্বর ১৮৬৮
(ছুটি : ২৯ ডিসেম্বর ১৮৬৮ হইতে এক মাস)		
বর্দ্ধমান	ডেঃ ম্যাঃ ও ডেঃ কলেঃ	২৫ জানুয়ারী ১৮৬৯
"	কমিঃ পার্সন্যাল এসিঃ (অস্থায়ী)	১০ ফেব্রুয়ারী ১৮৬৯
"	ডেঃ ম্যাঃ ও ডেঃ কলেঃ ৩য় গ্রেড (পুরাতন)	১ এপ্রিল ১৮৬৯
"	জ্বর রোগের রিলিফের কার্য্যে নিযুক্ত	১৭ জানুয়ারী ১৮৭২
"	কমিঃ পার্সঃ এসিঃ	২৯শে এপ্রিল, ১৮৭২
কাটোয়া	ডেঃ ম্যাঃ ও ডেঃ কলেঃ	২২ এপ্রিল ১৮৭৩
"	ঐ ৩য় গ্রেড	১৫ জানুয়ারী ১৮৭৬

8 *Ibid.*, for 1851-52. P. 102.
9 *Ibid.*, P. 72.
10 *Comilla Zila School. Old Boy's Register.* (1837-1937).
11 *Ibid.*, from 30th September, 1852 to 27th June, 1855. P. 235
12 *Ibid.*, for 1857-58. P. 340.

13 *Ibid.*, App. B. P. 65.
14 *Ibid.*, for 1859-60. P. 370.

(ছুটি : ২০ নবেম্বর ১৮৭৭ হইতে এক মাস)

জাহানাবাদ ডেঃ ম্যাঃ ও ডেঃ কলেঃ ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮

(ছুটি : ১০ নবেম্বর ১৮৭৮ হইতে দুই বৎসর)

হাওড়া ডেঃ ম্যাঃ ও ডে কলেঃ ১৪ ডিসেম্বর ১৮৮০

(ছুটি: ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩ হইতে দুই মাস)

পাবনা ডেঃ ম্যাঃ ও ডেঃ কলেঃ ২০ মার্চ্চ ১৮৮৩।১৫

৫

ইহার পর ১৮৮৪ সনের জুন মাসে ভগবানচন্দ্র সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কার্য্যোপলক্ষে তিনি যখনই যেখানে যাইতেন তখনই সেখানে জনসাধারণের উপকারার্থ বিশেষ উদ্যোগী হইতেন। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে তিনি ফরিদপুরে একাদিক্রমে আট বৎসর এবং বর্দ্ধমানে ও কাটোয়ায় দশ বৎসর স্থিত ছিলেন। এই দুই অঞ্চলেই ভগবানচন্দ্রের কর্ম্ম-দক্ষতা বিশেষভাবে প্রকটিত হয়। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের শৈশব পিতার সঙ্গে ফরিদপুরে কাটিয়াছে। তাঁহার জীবনীকার বলেন, এক ভীষণ ডাকাতকে কারামুক্তির পর ভগবানচন্দ্র নিজ গৃহে শিশু জগদীশচন্দ্রের তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত করেন। জগদীশচন্দ্র এই ডাকাত-ভৃত্য প্রমুখাৎ যে সকল অসমসাহসিক কার্য্যের গল্প শুনিতেন তাহাদ্বারা তাঁহার জীবন কম প্রভাবিত হয় নাই। একজন ডাকাতকে পুত্রের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের মধ্যে ভগবানচন্দ্রের উদার দৃষ্টি এবং অনুপম মানবপ্রীতি সূচিত হইতেছে নিঃসন্দেহ। সরকারী কার্য্যে নৈপুণ্য ও উপস্থিতবুদ্ধি প্রকাশের বহু দৃষ্টান্ত উক্ত জীবনীকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।১৬

কিন্তু ফরিদপুরে অবস্থানকালে ভগবানচন্দ্রের প্রধান কীর্ত্তি—একটি 'জাতীয়' মেলা বা প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠা। এখানে 'জাতীয়' বলিতেছি এইজন্য যে, মেলায় ঐ অঞ্চলেরই কৃষি-শিল্পের নিদর্শনসমূহ প্রদর্শিত হইবার ব্যবস্থা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন কুস্তী, ব্যায়াম এবং যাত্রা ও জারী গানেরও আয়োজন হইয়াছিল। ভগবানচন্দ্র বিশ্বাস করিতেন, জাতীয় উন্নতির মূলে দেশজ কৃষি-শিল্প, শিক্ষা-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন, উন্নতি ও সংস্কারসাধন। এইজন্য তিনি তৎকাল প্রচলিত যাত্রা, কথকতা, তরজা ও জারীগানকে লোকশিক্ষার উপায়-স্বরূপ গ্রহণ করিতে দ্বিধা করেন নাই।১৭ তিনি কৃষি-শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের কথা কত গভীরভাবে চিন্তা করিতেন এবং নিজের সর্ব্বস্ব পণ করিয়াও এই সকল বিষয়ে কিরূপ উদ্যোগী হইয়াছিলেন আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের উক্তি হইতেই একটু পরে আমরা তাহা জানিতে পারিব। কলিকাতায় নবগোপাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলার সঙ্গে ফরিদপুরের এই প্রদর্শনীর সাক্ষাৎ যোগ না থাকিলেও জাতীয় উন্নতিকল্পেই যে ইহা অনুষ্ঠিত হয় সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

ভগবানচন্দ্র ১৮৬৯ সনের প্রারম্ভেই বর্দ্ধমানে বদলী হইলেন। এই সময় এখানে ভীষণ জ্বররোগ দেখা দিয়াছিল। যে বর্দ্ধমান এক সময়ে স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান বলিয়া গণ্য হইত এবং শ্বেতাঙ্গেরাও স্বাস্থ্যলাভের আশায় বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যেখানে গমন করিত তাহা এই মহামারীর প্রকোপে ক্রমে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হয়। এই রোগ প্রশমনকল্পে ভগবানচন্দ্র স্বয়ং উদ্যোগী হইলেন। রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের ঔষধপথ্য প্রদানের জন্য বেসরকারী সাহায্য-ভাণ্ডার খুলিবার উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশে আবেদনপত্রও প্রচার করেন। ১৬ই ডিসেম্বর ১৮৬৯ তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় এই আবেদনপত্র প্রকাশিত হইল। বর্দ্ধমান, কলিকাতা, ঢাকা ও ফরিদপুরে বেসরকারী সাহায্য-গ্রহণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বর্দ্ধমান-কেন্দ্রের ভার লইলেন ভগবানচন্দ্র নিজে। তিনি রোগীদের অর্থ-সাহায্য ও ঔষধ-পথ্য যোগাইবার ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, নিজে সেখানে একটি 'ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল' বা শিল্প-বিদ্যালয়ও স্থাপন করিলেন। ১৮৭০, ১০ই মার্চ্চ তারিখে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে নিম্নরূপ লেখেন :

"আমাদের পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয় অনেকে অবগত আছেন, যে বর্দ্ধমানের রুগ্ন দরিদ্র ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থে ভগবানবাবু বিস্তর যত্ন করিয়াছেন, এমন কি ভগবানবাবু যত্ন না করিলে বর্দ্ধমানের যে সর্ব্বনাশ হইতেছিল, ইহা বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের ও সাধারণের কর্ণগোচর হইত না, ভগবানবাবু বর্দ্ধমানে যে বিদ্যালয় করিয়াছেন, তাহা ঐ রুগ্ন দরিদ্রদের সাহায্যার্থে। ভগবানবাবুর প্রস্তাবের উদ্দেশ্য একেবারে বিদ্যা ও অন্ন দান।

"তাঁহার বিদ্যালয়ে সঙ্গীত হইতে ছুতারের ব্যবসায় পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, আমরা শুনিলাম যে এই নিমিত্ত একটি হারমোনিয়ম ক্রয় করা হইয়াছে, গোরা মিস্ত্রী একজন নিযুক্ত করা হইয়াছে।

"ভগবানবাবু যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া না হওয়া অর্থসাপেক্ষ। আপাততঃ এই স্কুলের ব্যয়ের ভার তিনি স্বয়ং লইয়াছেন, তিনি ভরসা করেন, কিছুকাল এই স্কুল চালাইতে পারিলে উহার ব্যয়ের ভার আর কাহাকেও লইতে হইবে না, ছাত্র ও শিক্ষকদিগের প্রস্তুত সামগ্রী বিক্রয় করিলেই হইবে। আমরা ভরসা করি যে সদাশয় ব্যক্তিগণ ও গবর্ণমেণ্ট ভগবানবাবুকে সাহায্য করিবেন।"

15 *History of Services of Gazetted officers employed under the Government of Belgal, June 1884.*
"Deputy Magistrates and Deputy Collectors (first three grades). From first appointment to 31st May 1884." P. 100.

16 *The Life and work of Sir Jagadis C. Bose.* By Patrick Geddes. 1920. Pp. 4—8.

17 *Ibid.*, P. 8.

সরকারী কর্মচারী হইয়াও নিজ দায়িত্বে বেসরকারী ভাবে জ্বর-মহামারী দূরীকরণে ভগবানচন্দ্র বিশেষ তৎপর হইয়াছিলেন। সরকার ১৮৭২ সনের জানুয়ারী মাসে তাঁহাকে এই রোগের স্পেশিয়াল কমিশনার পদে নিযুক্ত করিতে অগ্রসর হইলেন। ১৮৭৩-৭৪ সনে সমগ্র পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে এবং বিহারে যে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ হয় সে সময়েও সরকারী কর্মের অঙ্গরূপে তিনি ইহার প্রশমনে বিশেষভাবে লিপ্ত হইয়াছিলেন। আহার-নিদ্রা ভুলিয়া তিনি একাধিক বৎসর ক্ষুধার্তদের সাহায্যের নিমিত্ত কর্মতৎপর ছিলেন। এই দুর্ভিক্ষে অন্নাভাবে যে প্রাণহানি ঘটে নাই তাহার মূলে রহিয়াছে ভগবানচন্দ্র বসুর মত সরকারী কর্মীর নিপুণ ও অবিরাম প্রয়াস।১৮

৬

দীর্ঘকাল অবিশ্রাম সরকারী কার্যে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। তিনি ১৮৭৮ সনের মে মাসে একক্রমে দুই বৎসরের ছুটি লইলেন। এই ছুটির মধ্যেও তিনি নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকেন নাই। সাধারণ হিতকর কার্যেও তিনি তৎপর ছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' (২য় সং, পৃ. ৩১৬) পাঠে জানা যায়, ভগবানচন্দ্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির নির্মাণে বিশেষ ভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। কৃষি-শিল্পের উন্নতির দিকে তাঁহার মনোযোগের কথা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। তিনি নিজেও চা-শিল্প ও বস্ত্র-শিল্পের উন্নতির জন্য বঙ্গদেশে এবং বোম্বাইয়ে বিস্তর টাকা ঢালিয়াছিলেন। নেপাল-তরাইয়ে চাষ-আবাদের জন্য ভগবানচন্দ্র বিস্তর ভূমি ক্রয় করেন। জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া চাষের কার্যেও লাগিয়া যান। জমিতে কিছু কিছু উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইলেও, বিক্রয়ের কোন সুব্যবস্থা করা তখনকার দিনে সম্ভবপর ছিল না। ঐ অঞ্চল অস্বাস্থ্যকরও ছিল। এ সকল কারণে তাঁহাকে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

চা-শিল্পের জন্য আসামে তিনি কয়েক হাজার বিঘা জমি কিনিলেন। এ স্থানকে চা-উৎপাদনের উপযোগী করিতেও তাঁহাকে চড়া সুদে টাকা ধার করিয়া ঋণজালে জড়াইয়া পড়িতে হইল। পরে এই শিল্প খুব লাভজনক হয় বটে, কিন্তু জীবদ্দশায় তিনি ইহা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। বোম্বাইয়ে একটি স্বদেশী কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রচুর টাকা দেন বটে, কিন্তু স্থানীয় কর্মকর্তাদের অসাধুতার জন্য সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়।১৯ এ কারণ ১৮৮৪ সনে সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণকালে তিনি একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়েন। এদিকে জগদীশচন্দ্র তখনও বিলাতে অধ্যয়নরত, নানারূপ অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যেও ভগবানচন্দ্র নিজ কর্তব্য পালনে কখনও পশ্চাৎপদ নাই। তিনি পরাজয় কাহাকে বলে জানিতেন না। নানা অসুবিধার মধ্যেও পুত্রের অধ্যয়ন পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাকে স্বদেশে ফিরাইয়া আনেন নাই। এ সকল বিষয়ে সহধর্মিণী বামাসুন্দরীর অনুপ্রেরণা তাঁহার মনে বিশেষ শক্তি প্রদান করিয়াছিল।

পিতার এই অসাফল্য এবং তজ্জনিত বৃদ্ধবয়সে দুঃখভোগ যুবক জগদীশচন্দ্রের প্রাণে খুবই লাগিয়াছিল। তবে তিনি ইহাতে হতোদ্যম না হইয়া ইহার ভিতরই নিজের জীবনাদর্শ লাভ করিলেন। জগদীশচন্দ্র পিতার যাবতীয় ঋণ পরিশোধের ভার নিজ স্কন্ধে লইলেন। ১৮৮৫ সনের ৭ই জানুয়ারী কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হওয়া অবধি কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি পিতৃ-ঋণ অনেকটা শোধ করিয়া ফেলিলেন। কৃষি-শিল্পে পিতার বিফলতাকে জগদীশচন্দ্র একটি 'আদর্শ ও মহৎ বিফলতা' বলিয়া ব্যক্ত করিতেন। ভগবানচন্দ্র-প্রবর্তিত ফরিদপুর প্রদর্শনীর পঞ্চাশৎ-বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে জগদীশচন্দ্র তথায় গিয়াছিলেন। পিতৃদেবের ব্যর্থতাকে তিনি বক্তৃতায় নিম্নলিখিত ভাবে উল্লেখ করেন (৪ঠা জানুয়ারি, ১৯১৬):

"A failure? Yes, but not ignoble nor altogether futile. And through witnessing this struggle, the son learned to look on success or failure as one, and to realise that some defeat may be greater than victory. To me his life has been one of blessing, and daily thanksgiving. Nevertheless everyone had said that he had wrecked his life, which was meant for greater things. Few realise that out of the skeletons of myriad lives have been built vast continents. And it is on the wreck of a life like his, and of many such lives, that will be built the greater India yet to be. We do not know why it should be so; but we do know that the Earth-Mother is always calling for sacrifice." 20

'বিপদি ধৈর্য্যম্'—ইহাই ছিল ভগবানচন্দ্রের জীবনের শিক্ষা। জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের গবেষণাকালে কত ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হইয়াছেন, কত বিষম পরীক্ষার মধ্যেই তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে, কিন্তু পিতার এই শিক্ষা সর্বদা তাঁহার জীবনপথের পাথেয় হইয়া ছিল। ১৯১৭ সনের ৩০শে নবেম্বর কলিকাতা বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠাকালে প্রদত্ত বক্তৃতায় এই কথার সঙ্গে সঙ্গে উপরের উক্তিরই প্রতিধ্বনি পাই। তিনি বলেন:

"পরীক্ষার আরম্ভ, পিতৃদেব স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র বসুকে লইয়া, তাহা অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্বের কথা। তাঁহারই নিকট আমার শিক্ষা ও দীক্ষা। তিনি শিখাইয়াছিলেন, অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার অপেক্ষা নিজের জীবন শাসন বহুগুণে শ্রেয়স্কর। জনহিতকর নানাকার্যে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি তাঁহার সকল চেষ্টা ও সর্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে-সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। সুখসম্পদের

১৮ ঐ পৃ. ৯-১০। সন-তারিখের ভুল-ভ্রান্তি থাকিলেও, ভগবানচন্দ্রের এই সময়কার কার্যকলাপ উক্ত জীবনীকার উল্লেখ করিয়াছেন।

১৯ ঐ, পৃ. ১০।

২০ ঐ, পৃ, ৩৩।

কোমল শয্যা হইতে তাঁহাকে দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সকলেই বলিত, তিনি তাঁহার জীবন ব্যর্থ করিয়াছেন। এই ঘটনা হইতেই সফলতা কত ক্ষুদ্র এবং কোন কোন বিফলতা কত বৃহৎ, তাহা শিখিতে পারিয়াছিলাম। পরীক্ষার প্রথম অধ্যায় এই সময় লিখিত হইয়াছিল।"২১

৭

স্ত্রীশিক্ষার প্রতি ভগবানচন্দ্রের অনুরাগের আভাস আমরা পাইয়াছি। ছাত্র-জীবনে যে সংকল্প করিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে তাহা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য সকল বিষয়ের ন্যায় এ কার্য্যেও তিনি পত্নী বামাসুন্দরীর বিশেষ সমর্থন ও সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বামাসুন্দরী সত্যসত্যই রত্নগর্ভা। পুত্র জগদীশচন্দ্রের কৃতি ও কীর্ত্তি আজ সমগ্র ভারতবর্ষের, শুধু ভারতবর্ষের কেন, সমগ্র প্রাচ্যের মুখোজ্জ্বল করিয়াছে। তাঁহাদের পাঁচ কন্যার প্রত্যেকটিকেই তৎকাল-প্রচলিত উচ্চশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠা স্বর্ণপ্রভা বাংলা সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী হইয়া উঠেন। সে যুগের যাবতীয় বাংলা বই পড়া শেষ হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে ইংরেজীর চর্চ্চা করিতে পরামর্শ দেন, তিনি পরে ইংরেজী ভাষাও বিশেষরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। স্বামী আনন্দমোহন বসুর সকল জনহিতকর কার্য্যেই তিনি প্রধান সহায় ছিলেন। ১৮৭৬ সনের জুন মাসে যখন আগেকার হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় 'বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়' নামে পুনরুজ্জীবিত হয় তখন এই কার্য্যে তিনিও সবিশেষ উদ্যোগী হন। ইহা ব্যতীত 'নারীদিগের মধ্যে ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, গৃহকার্য্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার জন্য তিনি বঙ্গমহিলা সমাজ নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন। এই সমাজ ব্রাহ্মসমাজের রমণীদিগের বহু কল্যাণসাধন করিয়াছিল।'২২ বঙ্গমহিলা সমাজ ১৮৭৯ সনের ১লা আগষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বর্ণপ্রভা আরও বহু জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকিয়া স্বদেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

২১ প্রবাসী, পৌষ ১৩২৪ : "নিবেদন"—শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু।

২২ বামাবোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ : "পরলোকগতা স্বর্ণপ্রভা বসু।"

ভগবানচন্দ্রের দ্বিতীয়া কন্যা সুবর্ণপ্রভা বেথুন স্কুল হইতে ১৮৮০ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। অন্য তিন কন্যা লাবণ্যপ্রভা, হেমপ্রভা ও চারুপ্রভাও উচ্চশিক্ষা লাভ করেন এবং নানা জনহিতকর কার্য্যে লিপ্ত হন। হেমপ্রভা ১৮৯৪ সনে বি-এ এবং ১৮৯৮ সনে এম-এ পরীক্ষা পাস করেন। তিনি দীর্ঘকাল বেথুন স্কুল ও কলেজে শিক্ষাব্রতীর কাজ করিয়াছিলেন। লাবণ্যপ্রভা বসুও বিশেষভাবে শিক্ষা লাভ করেন। লেখিকা হিসাবেও তাঁহার বেশ খ্যাতি ছিল।

৮

ভগবানচন্দ্রের অবসর-জীবন অসচ্ছলতার মধ্যে কাটিলেও তাঁহার সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইতে দেখিয়া গিয়াছিলেন। পুত্র জগদীশচন্দ্রের ভবনে ভগবানচন্দ্রের পরলোকগমনের পর ১৮১৪ শক, ১৬ই ভাদ্র সংখ্যা 'তত্ত্বকৌমুদী' তদীয় শ্রাদ্ধের সংবাদ প্রসঙ্গে লেখেন :

"বিগত ১৫ই ভাদ্র মঙ্গলবার আদ্য শ্রাদ্ধক্রিয়া শ্রদ্ধাস্পদ আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। উপাসনার পর ভগবান বাবুর তৃতীয়া কন্যা কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু মহাশয়া তাঁহার পিতার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত পাঠ করেন। তাহাতে জানা যায় যে, ভগবান বাবু কার্য্যোপলক্ষে যখন যেখানে গিয়াছেন সেইখানেই তাঁহার হৃদয় পরদুঃখে কাঁদিয়াছে এবং তিনি সর্ব্বত্রই দেশের উন্নতিসাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তবিক তিনি অতিশয় সদাশয় ও পরদুঃখকাতর ব্যক্তি ছিলেন।"

ভগবানচন্দ্রের মত জাতির উন্নতিকল্পে উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিদের জীবনকথা আলোচনা করিয়া আমরা নিজেদের ধন্য বোধ করি।
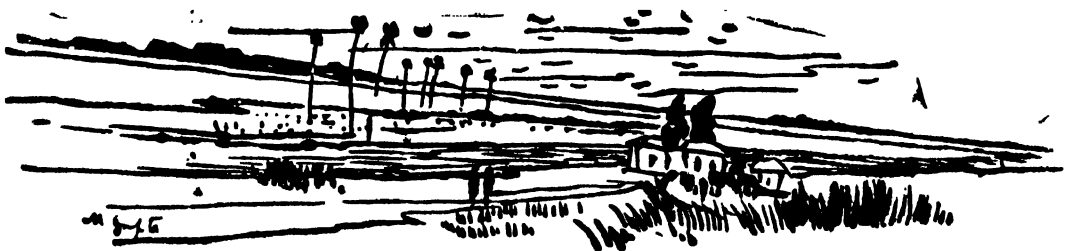
নেতাজীর পিতৃভূমি কোদালিয়া

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

নেতাজীর পিতৃভূমি কোদালিয়া গ্রাম এক দিন পণ্ডিতগণের আবাসস্থল ছিল। এই অঞ্চলকে লোকে দ্বিতীয় নবদ্বীপ বলিত। এই স্থানে বহু স্বনামধন্য পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। এখানে বসিয়া ধার্ম্মিক তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিকল্প ব্যক্তিগণ, সমাজহিতৈষিগণ স্বদেশের নানারূপ কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন—ইহা শুনিয়া আমরা বিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকি।

বর্ত্তমানে কোদালিয়া গ্রামের পশ্চিম-দক্ষিণ সীমানায় যে মজা খাত দেখিতে পাওয়া যায়, এক দিন পুণ্যসলিলা ভাগীরথী এইখানে প্রবাহিত ছিল। গত শতাব্দীর মধ্যভাগেও ঐ মজা গঙ্গায় নৌকাযোগে যাতায়াত করা সম্ভবপর ছিল। এই গ্রামের গোঘাটা হইতে বহুলোক নৌকা করিয়া জয়নগর, মজিলপুর, সুন্দরবন অঞ্চলে ও কলিকাতায় যাতায়াত করিত। তখন কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত রেলপথ হয় নাই। বিবিধ পণ্যদ্রব্য এই জলপথে বহুস্থানে লইয়া যাওয়া হইত। এ অঞ্চলের মধ্যে গোঘাটা ও গড়িয়া মাল আমদানী ও রপ্তানির একটি কেন্দ্র ছিল। শুনা যায়, একদা সুদূর মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে নৌকাসমূহ এই পথে যাতায়াত করিত। দীনবন্ধু মিত্র এই গ্রামের পরিচয় দিবার সময় লিখিয়াছেন: "ঘোষের বোসের গঙ্গা, গঙ্গা ঘরে ঘরে।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, এক দিন গ্রামের আজিকার মত অবস্থা ছিল না। ভাগীরথীর এইরূপ দশা হইল কিরূপে? ইহার উত্তর দিতে হইলে এ অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিতে হয়। ক্যাপ্টেন রেনেল-কৃত ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গদেশের মানচিত্রে দেখা যায়, কালীঘাট হইতে বোড়াল, বারুইপুর, সূর্য্যপুর ও দক্ষিণ বিষ্ণুপুর প্রভৃতি গ্রাম দিয়া তখনও পর্য্যন্ত নদী প্রবাহিত হইত। যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের জমিদারী বর্ত্তমান খুলনা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ অঞ্চলও তাঁহার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। মোগলশক্তি হীনবীর্য্য হইয়া পড়িলে পর্ত্তুগীজ বণিকগণ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর বাঙালীর রাষ্ট্রীয় শৈথিল্যের সুযোগ লইয়া তাহারা খুলনা ও চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ অঞ্চলে লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয়। বহু লোককে ধরিয়া লইয়া গিয়া দাসরূপে বিক্রয় করে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় যশোহর ও খুলনার ইতিহাসে এ সকল বিষয় বিবৃত করিয়াছেন।

হুগলী ছিল তখনকার দিনে বাংলার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। দেশবিদেশের বাণিজ্যতরণীসমূহ এই গ্রামের পার্শ্ব দিয়া কলিকাতায় যাতায়াত করিত। পর্ত্তুগীজ দস্যুরা সুন্দরবন অঞ্চল হইতে আসিয়া বাণিজ্যতরী লুণ্ঠন করিত। রেভারেণ্ড লং সাহেব মাতলার অনতিদূরে টার্ড নামক একটি পর্ত্তুগীজ বন্দরের ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছিলেন। ভাগীরথীর প্রবাহ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে লাগিল। ত্রিবেণী হইতে সরস্বতী নদী বেগবতী হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছিল, ক্রমে সেই পথে বঙ্গদেশের শিল্প ও পণ্যসম্ভার দূর দেশে নীত হইতে লাগিল। ভাগীরথীর একটি ক্ষুদ্র স্রোত কলিকাতার দুর্গের সন্নিকট হইতে শাখরোল নামক স্থানে সরস্বতীর সহিত সংযুক্ত হয়। ঐ ক্ষুদ্র খাল ক্রমশঃ প্রশস্ততর হয়। সরফরাজ খাঁর রাজত্বকালে ইংরেজ ও ওলন্দাজ বণিকগণ বাণিজ্যের সুবিধার জন্য খাল খনন করিলে গঙ্গার মূল প্রবাহ ঐ পথে শাখরোলের নিকট সরস্বতীর সহিত মিশিয়া যায়। অপরদিকে কালীঘাটের নিম্নবর্ত্তী প্রাচীন খাত বা আদি গঙ্গা টালী সাহেবের খনিত টালীর নালায় পরিণত হইয়া মজিয়া যায়।

গঙ্গার বর্ত্তমান অবস্থার সহিত কোদালিয়া গ্রামের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। গঙ্গা মজিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের অনেক প্রাচীন সমৃদ্ধি অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। এ অঞ্চল ক্রমে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে এক মহাপুরুষের কথা আমার মনে পড়িতেছে, তিনি এই অঞ্চলের পর্ত্তুগীজ দস্যুদের বিতাড়িত করিয়া ইহাকে মনুষ্যবাসের উপযোগী করেন। তাঁহার নাম কালুরায় বা দক্ষিণরায়। তিনি আজও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় প্রতি বৎসর ১লা মাঘ "দক্ষিণদার" রূপে পূজিত হইতেছেন। আমাদের দেশের লোকেরা বীরপূজা মানে। তাহারা তাহাদের এই ত্রাণকর্ত্তার পূজা করিয়া বিগত দিনের কথা স্মরণ করিতেছে।

চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত মদনমল্ল পরগণার (বর্ত্তমানে বরিদহাটি) মধ্যে কোদালিয়া অবস্থিত। প্রাচীন নবদ্বীপ রাজ্য দ্বাদশটি দ্বীপে বিভক্ত ছিল। এই গ্রাম গঙ্গার পলি হইতে উৎপন্ন প্রবালদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজদ্দৌলার পতনের পর ইংরেজের আশ্রিত মীরজাফরের রাজত্বের প্রারম্ভে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি চব্বিশটি পরগণার জমিদারি প্রাপ্ত হয়। ইংরেজেরা প্রথমেই এইরূপ বিস্তৃত ভূভাগে শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়া রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত করে। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে মদন রায়চৌধুরী নামে কায়স্থজাতীয় "এক প্রধান ব্যক্তি শত্রুভয় নিবারণার্থ রাজপুর গ্রামের ঈশান কোণস্থ বৃহৎ এক ভূমিখণ্ডে গড়খাত করিয়া তাহার মধ্যে বাটী নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতেন। মদনবাবু

অতি বলবান বীরপুরুষ ছিলেন বলিয়া মল্ল উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎকালে বঙ্গদেশের শাসনকর্তা মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর প্রধান বীরপুরুষ বলিয়া ঐ মদন মল্লের প্রতি এতদঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করেন; তদনুসারে মদন কর আদায় করিয়া নবাব-সরকারের নিকট প্রেরণ করিতেন। ঐ ব্যক্তির নামানুসারে এই পরগণার নাম মদনমল্ল হইয়াছে। একণে রাজপুরের ঈশান কোণে ঐ চৌধুরী মহাশয়দিগের ভগ্নাবশিষ্ট বাটী আছে এবং ঐ বংশের প্রধান ব্যক্তিগণ চব্বিশ পরগণার দক্ষিণে বারুইপুর গ্রামে সম্পত্তি সংগ্রহ করিয়া অবস্থিত করিতেছেন।" যদিও বর্ত্তমানে ঐ গ্রাম বসিরহাট পরগণার অন্তর্ভুক্ত তথাপি এই অঞ্চলের লোক ২৪-পরগণার অন্য অঞ্চলে মদনমল্লের লোক বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে।

এই গ্রামের একটা সামাজিক বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু বৈদেশিক শাসনে দেশীয় কুটিরশিল্পগুলি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হওয়ায় বর্ত্তমানে সেই বৈশিষ্ট্য লোপ পাইয়াছে। হিন্দু জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর বাস ছিল এই গ্রামে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণী, কামার, কুমার প্রভৃতি নবশাখ, গোয়ালা, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি জল-আচরণীয়, কাওরা, তেয়র প্রভৃতি প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের এক একটি পাড়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। কামার, কুমার, তাকরা, বেনিয়া, শাখারী, যোগী শুধু 'পাড়া' সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা নিজেদের কুটিরজাত দ্রব্যের দ্বারা এই গ্রামকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াও তুলিয়াছিল। যোগীপাড়ায় তাঁত চলিত। গ্রামের বস্ত্রের চাহিদা মিটাইয়া তাহারা কলিকাতার বাজারে, বারুইপুর প্রভৃতি অঞ্চলে কাপড়, গামছা বিক্রয় করিত। আমি যে কালের কথা বলিতেছি তখনকার দিনে গ্রামবাসীরা "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ে"ই তৃপ্তি পাইত। কুমারপাড়া হাঁড়ি পেটার চটপট শব্দে দিবারাত্র মুখরিত থাকিত। সন্ধ্যার পূর্ব্বে দলে দলে বলিষ্ঠ কুমার-যুবক মাঠ হইতে কোদাল ও ঝুড়িতে করিয়া মাটি লইয়া সারিবদ্ধভাবে বাটিতে ফিরিত। নানা স্থানের ব্যবসায়ীরা হাঁড়ির জন্ত এই গ্রামে আসিত। নটুক পালের "বৌ-পাগলা" হাঁড়ি পাইবার জন্য অনেক 'বৌ' পাগল হইয়া উঠিত। নটুক পাল প্রথম স্বদেশী প্রদর্শনীতে পদক পাইয়া এই গ্রামকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন।

মুসলমান আমলে এই গ্রামে বহু দরিদ্র মুসলমানের বাস ছিল। তাহারা কোদালির কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। মনে হয়, তাহাদের নাম হইতে এই গ্রামের নাম কোদালিয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে বেলিয়া পুষ্করিণী গ্রামের মধ্যে আছে তাহা শিরোমণির, ভট্টাচার্য্যের এবং হাটুর বেলিয়া নামে তাহা সাধারণের নিকট পরিচিত। এই পুষ্করিণী পূর্ব্বে একটিই ছিল এবং মুসলমানেরা কারবালা রূপে উহা ব্যবহার করিত। শুনা যায়, শিরোমণি মহাশয়দের বাগান কর্ষণের সময় বহু মৃত ব্যক্তির হাড় পাওয়া গিয়াছিল। ইহা হইতে এই অনুমান হয় যে, ঐ স্থান কবরভূমি রূপে ব্যবহৃত হইত।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভূমি-বিলির উৎকৃষ্ট পন্থারূপে গৃহীত হয় তখন এই গ্রাম হুগলীর বাঁশবেড়িয়া বা বংশবাটীর জমিদার রাজা নৃসিংহদেব বাহাদুরের জমিদারীভুক্ত হয়। তিনি এই গ্রামে বহু নিষ্কর জমি দানকরতঃ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর লোকদিগকে নূতন করিয়া বসবাস করান। তাহাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নবশাখ ও অন্তান্ত শ্রেণীর লোকেরা তাহাদের প্রয়োজনের জন্ত একে একে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। যাঁহারা নিষ্কর জমি ভোগ করিতেছেন গত সেটেলমেণ্টের সময় তাঁহারা লং সাহেবের পুরাতন ছাড়ের কপি দেখাইয়া নিজেদের ভূ-সম্পত্তির নিষ্কর-স্বত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। এই সব ছাড়ে রাজা নৃসিংহদেবের নামের উল্লেখ আছে।

এই গ্রামের উত্তরে যে চাংড়িপোতা গ্রাম বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহা ঐ ছাড়ে বংশীধরপুর নামে পরিচিত। চাংড়িপোতার প্রাচীন বংশ "দে" গোষ্ঠীর বাটীতে নৃসিংহদেবের ছাড়ের নকল পাওয়া যাইতে পারে। আলিপুর কালেক্টরীতে পুরাতন দলিল পত্রে নৃসিংহদেবের নাম পাওয়া যায়। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা প্রথমে গঙ্গার তীরবর্ত্তী স্থানে বসবাস করিয়াছিলেন। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা গ্রামের পূর্ব্বভাগে তাঁহাদের বসতি বিস্তার করেন। তখন তাঁহারা মুসলমান-সম্প্রদায় ও অস্পৃশ্য-হিন্দুগণের বসবাসের স্থান গ্রামের প্রান্তভাগে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। তখন বহু নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান বর্ত্তমান পাঁচঘরা ও পেটুয়া প্রভৃতি গ্রামে চলিয়া যায়। বর্ত্তমানে তাহাদের বংশধরেরা উক্ত গ্রামে বসবাস করিতেছে। বসু ও চক্রবর্ত্তীরা এই গ্রামের আদি বাসিন্দা। বসু-বংশ অর্থাৎ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ মাহিনগর হইতে এবং চক্রবর্ত্তীগণ—বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা নরেন্দ্রনাথ রায়ের মাতুলবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ, বিত্যাধরীর উপকূলবর্ত্তী (বর্ত্তমানে সুন্দরবন তালুকভুক্ত) হোমড়া গ্রাম হইতে উঠিয়া কোদালিয়া গ্রামে চলিয়া আসেন। প্রাচ্যবিত্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু 'বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাসে' ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকাণ্ডে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন।

কোদালিয়া গ্রামের আলোচনা-প্রসঙ্গে দুই-একটি প্রাচীন কাহিনীর অবতারণা করিতেছি। এই গ্রামে শুধু যে হিন্দু ও মুসলমানের বাস তাহা নহে। বহু বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী প্রচ্ছন্নভাবে এখানে বাস করিতেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বেও চব্বিশ পরগণার নানাস্থানে বৌদ্ধ বিহার ছিল। এখনও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে বেদান্ত মহাশয়ের দীঘির উত্তর-পূর্ব্ব

কোণে ধর্ম্মতলা নামক স্থানে প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় যে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা হইয়া থাকে তাহা বৌদ্ধপূজার নামান্তর মাত্র। ঐ দিনটি বুদ্ধদেবের জন্মতিথি। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা ঐ দিনে বিশেষভাবে তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। যোগীরা এই ধর্ম্ম-ঠাকুরের পূজা করিয়া থাকেন। রাজপুর বাজারের নিকট যে ধর্ম্মস্থান আছে সেখানেও যোগীদের দ্বারা ঐ দেবতা পূজিত হইয়া থাকেন। আমাদের গ্রামের যোগীরাই মনে হয়, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইহাদের আচার-ব্যবহার এই গ্রামের হিন্দুদের আচার-ব্যবহার হইতে পৃথক বলিয়া বোধ হইত। যোগীজাতির কোন ব্রাহ্মণ গুরু বা পুরোহিত ছিল না। তাহাদের মৃতদেহ পূর্ব্বে অগ্নিদগ্ধ না করিয়া যোগাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় পুঁতিয়া রাখিত (*The Yogis of Bengal* by Radhagovinda Nath)। এই গ্রামের চড়কপূজাকে "দেল উঠা" বা দেউলপূজা বলা হয়। উহা বৌদ্ধ উৎসবের নামান্তর মাত্র। গাজনে পূর্ব্বে যোগীরা বিশেষভাবে যোগদান করিত। সেদিন গ্রামের "নিম্ন"শ্রেণীর লোকেরা "সন্ন্যাসীর" বেশ পরিধান করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইত না। বর্ত্তমানে এই উৎসবে আর সেই উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় না। কেবল ধর্ম্মতলায় পুরমহিলাদের নীলের পূজা বিগত দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

ধর্ম্মতলা ছাড়িয়া গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্ত অভিমুখে কিছুদূর অগ্রসর হইলেই একটি মুসলমানপাড়া দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে গাজী সাহেবের একটি দরগা আছে। স্থানীয় মুসলমানেরা বলিয়া থাকেন যে, এখানে একজন পীরের সমাধি আছে। তাঁহার নাম বর্‌খান গাজী। বর্‌খান গাজী যে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বর্‌খান বা বড়গাজী হুসেন শাহের সাহায্যে হিজলী হইতে চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ অঞ্চল পর্য্যন্ত মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করেন। সোনারপুর অঞ্চল হইতে বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি মুকুট রায়ের সেনাপতি দক্ষিণরায়কে পরাজিত করেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বহু স্থানে বর্‌খান গাজীর দরগা দেখিতে পাওয়া যায়। বাসন্তার মোবারক গাজী সুন্দরবনের একাংশে ব্যাঘ্রভীতি নিবারণ করিয়া এ প্রদেশের সকলের স্মরণীয় হইয়া আছেন।

কিন্তু বর্‌খান গাজীর কার্য্য ছিল ধর্ম্মপ্রচার। তিনি যাহাদিগকে ধর্ম্মান্তরিত করিয়াছিলেন তাহারাই স্থানে স্থানে তাঁহার দরগা নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে পীররূপে সম্মানিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। আজও এই স্থানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় গাজীর সিন্নী দিয়া থাকে। প্রতি বৎসর পৌষ মাসের শেষে গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীর গৃহিণীরা বাড়ী বাড়ী "মাঙন" করিয়া এই বর্‌খান গাজীতলায় সিন্নী দেন এবং বাটীর বাহিরে কোন স্থানে সকলে মিলিয়া বনভোজন-পর্ব্ব শেষ করেন। সন্ধ্যা সমাগমে বাড়ীর বহির্দ্বারে প্রদীপ জ্বালিয়া দিলে, গৃহিণী বাড়ীতে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করেন—"দোরে কেনরে আলো?" দরজার পার্শ্বস্থিত নারী উত্তর দেন—"গিন্নী গেছেন বনভোজনে সবাই আছে ভাল।" এই উৎসবের সহিত কোন ঐতিহাসিক স্মৃতি জড়িত আছে কিনা তাহা বলিতে পারি না।

এই গ্রামটিকে তদানীন্তন লোকেরা তীর্থস্থান-স্বরূপ মনে করিতেন এবং পুণ্যতীর্থ কাশীর সহিত ইহার তুলনা করিয়া এই শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন :

"কোদালিয়াপুরী কাশী গোঘাটা মণিকর্ণিকা।
তর্কপঞ্চাননো ব্যাসো ভবানী কালভৈরবঃ।"

বর্ত্তমান যুগে নেতাজীর এই গৌরবময় পিতৃভূমি ভারতবাসীদিগকে দেশাত্মবোধে নূতন করিয়া উদ্বুদ্ধ করুক।

ঘুমপাড়ানির সুর

শ্রীসুনীলকুমার লাহিড়ী

পেরিয়ে এসে কাশের বনে ধানের ক্ষেতের ধারে,
পঙ্কজেরই গন্ধে উছল পদ্ম-দীঘির পারে
এলেম শেষে—স্বপনপরীর লীলাভূমির মাঝে
দেখি তারা খেলছে সেথায় নানান্ রঙীন সাজে,
খোকনমণি সেথান হ'তে তোমার তরেই আনি
শিশির-ধোওয়া সুধায় মাখা ছোট্ট স্বপনখানি।

বন্ধ ক'রে চোখটা মাণিক দেখ স্বপনপুরে
জোনাক জ্বলে নিমগাছের ওই ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে
আফিম ফুলের বুকের থেকে ঘুমের পরাগ হরি
কাজল এঁকে দিলেম চোখে স্বপনে উঠুক ভরি।

সুপ্তি-পথের পারে খোকন যাচ্ছে স্বপন-দেশে
বিদায়বেলায় সোণামুখের ছোট্ট হাসি হেসে।
স্বপ্নাকাশের বুকে খোকন জ্বলছে তারা সুখে
ঝিকিমিকিয়ে সোণালি রঙ্ ঢালছে তোমার মুখে,
তালে তালে সোহাগ ভরে চক্ষে তোমার হানি
সুধায় মাখা ছোট্ট স্বপন গেলেম খোকন দানি।

[সরোজিনী নাইডুর 'Cradle Song' কবিতার ভাবানুবাদ]

পশ্চিমবঙ্গে ধান-চাষের গতিক

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত

পশ্চিমবঙ্গে ধান-চাষের গতিক ভাল নয়। উৎপাদন বছরে বছরেই কমিতেছে। গত বৎসর যাহা হইয়াছিল এ বৎসর তাহা হইবে না। আগামী বৎসর আরও কমিবে। তৎপর বৎসর আরও। মজুরদের হাতে জমি গেলেও উৎপাদন-বৃদ্ধি হইবে না।

আমার জমি আছে। চাষ করাইয়া থাকি। আমি নিজেকে কৃষক মনে করি। লোকে আমাকে কৃষক বলে না। বলে—মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। কৃষক বলিতে লোকে বুঝে, যাহারা চাষে খাটে অর্থাৎ মজুরেরা। যাহারা খাটে, খাটায় তাহারাও কৃষক; লোকে তাহাদিগকে বলে চাষা। আমি কৃষক হইতে পারি। চাষা কেমন করিয়া হইব?

আমি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক নহি। আমি গরীব ভদ্রসন্তান। আমার দুই হালে চাষের মত জমি। ভাগচাষী এক হালে সারে। এক হালের চাষে ঋণ। দুই হালের চাষে আত্ম-পোষণ মাত্র। যিনি মধ্যবিত্ত তাঁহার অন্ততঃপক্ষে পাঁচ হালে চাষের মত জমি থাকিবে অর্থাৎ কমপক্ষে পঞ্চাশ বিঘা।

বর্ত্তমানে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরই পঞ্চাশ বিঘা জমি নাই। সকলেরই প্রায় আমার মত অবস্থা। আমি দুইরূপে চাষ করাইয়াছি। এক—হাল গরু রাখিয়া, মজুর খাটাইয়া। অন্য—ভাগে চাষ দিয়া। নিজ-চাষে ঋণ হইয়াছে। ভাগ-চাষে জমি পতিত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সংখ্যা কম নয়। সকলেরই জমি পতিত অবস্থায় রহিয়াছে। চাষ হইলেও সিকি ফসল হয় না। সকলেরই ভাগে চাষ। এখনই ভাগচাষী মিলিতেছে না। দু'এক বৎসর পরে একেবারেই মিলিবে না।

আমার জমি কাড়িয়া চাষীকে দেওয়া হইতে পারে। চাষীর ছেলে চাকুরি পাইতে পারে। মজুরদের বেতন চতুর্গুণ বাড়িতে পারে। উৎপাদন বাড়িবে না। ভদ্রলোকের ছেলে হাল ধরিবে না, কোদাল পাড়িবে না, ধান কাটিবে না।

আমার জমিতে আমিই অধিক খাদ্য উৎপাদন করিতে পারি, যদি আমার পঞ্চাশ বিঘা জমি থাকে, যদি আমার প্রচুর অর্থ থাকে—যদি আমি ভাগচাষী পাই এবং যদি চাষের মজুর পাই। পাঁচ-হালের চাষ নিজে রাখিয়া চালাইবে কে? কোন্ সে চাষী? কোন্ সে চাষের মজুর?

আমি বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করাইতে পারি না। আমার তিন রকমের জমি। শুনা, বাইদ, শোল। বাগান, কূপ, পুকুরের লাগাও শুনাজমিতে গরু চরে, শূয়ার চরিয়া বেড়ায়। ভাগ-চাষী শুনাচাষ করিতে চায় না। পুকুরে মাছ ফেলিলে লোকে চুরি করিয়া খায়। বাইদ জমি সংস্কার অভাবে ভিটাইয়া গিয়াছে, উঁচু নীচু হইয়া গিয়াছে, তাহাতে জল থাকে না। ভাগ-চাষী জল সংরক্ষণ করে না। কোনও রকমে ধান পুঁতিয়া দেয় মাত্র। জমির মাথায় পুকুর আছে, জল পাওয়া যায় না। সারের অভাবে জমি নিস্তেজ হইয়াছে, উৎপাদন হয় না। শোল-জমিতেও তেজ নাই। কোন বছর সিকি, কোনও বছর অর্দ্ধেক ফসল হয়।

আমি পল্লীবাসী। বাসবাটি পল্লীবাসের উপযোগী নয়। বাস্তু আছে—উদ্বাস্তু নই। যেখানে গোয়াল থাকিবার কথা, সেখানে রান্নাঘর। যেখানে সার ফেলিবার কথা, সেখানে কূপ। যেখানে খামার করিবার কথা, সেখানে পায়খানা। খিড়্‌কি আছে—খিড়্‌কির পুকুর নাই। ঘরে বসিয়াও চাকুরি করি। সমস্ত কিনিয়া খাই।

বর্ত্তমানে অধিকাংশ ভদ্রলোকই বিদেশে থাকেন। তাঁহাদের পল্লীর বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে। যাঁহাদের আছে তাঁহাদের বাড়ীঘর পল্লীবাসের উপযোগী নয়। কেহ পল্লীতে ফিরিতে পারেন না। অনেকে শহরের নিকটবর্ত্তী পল্লীতে বাস করেন। তাঁহারাও চাষে মনোযোগ দিতে পারেন না। সম্পূর্ণ মনোযোগ না থাকিলে চাষ হয় না। চাষের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করাও চলে না। যতক্ষণ অর্থ উপার্জ্জনের অন্য পথ থাকে, ততক্ষণ কেহ চাষ করে না—চাষীও না, মজুরও নয়।

ধানের চাষে বৃষ্টির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয়। বৃষ্টি প্রতি বৎসর একই নিয়মে হয় না। বৃষ্টিজ্ঞান পঞ্জিকা দেখিয়া, জ্যোতিষশাস্ত্র পড়িয়া, ডাকের বচন শুনিয়া হয় না। ইংরেজী পুস্তকে মেঘলক্ষণ পড়িয়াও হয় না। বহু বৎসর পল্লী-বাস করিয়া চাষে লিপ্ত থাকিলে হয়।

গোজাতির হিতসাধন-ক্ষমতা ক্ষেত্র ও কালনির্ণয়ে পারদর্শিতা, বীজ নির্ব্বাচনে তৎপরতা ইত্যাদি যোগ্য কৃষকের লক্ষণ। আমাকে গরু রাখিতে হইলে গোয়াল চাই, সার ফেলিবার জায়গা চাই, বাগাল চাই, কামিন চাই, মুনিষ চাই। আমার শহুরে-গৃহিণী গোয়াল কাড়িবেন না। পুত্রবধূ বিবর্ণ হইবেন। কন্যাদের চোখে জল আসিবে। ছেলেদের নিকট গরু চরাই-বার কথা মুখে আনা চলে না।

আষাঢ়ের পনর দিন হইতে শ্রাবণের পনর দিন পর্য্যন্ত ধান পুঁতিবার শ্রেষ্ঠ সময়। বাইদ জমিতে আষাঢ়ে আবাদ না হইলে চারপোয়া ধান হয় না। শোলজমিতে শ্রাবণের পনর দিনের মধ্যে ধান পুঁতিলে ভাল ধান হয়। মাঠে জল-

ক্ষেত্রের পুকুরগুলি কেবল উৎপন্ন ধান বাঁচাইবার জন্য নয়, সময়ে ভাল বর্ষা না নামিলে ছিঁচ্ করিয়া ধান পুঁতিবার জন্যও। জ্যৈষ্ঠের পনর দিনের মধ্যে বীজ যেমন করিয়া হোক ফেলিতেই হইবে। "বৃষ্টি হইবে, 'বতর' পাইব তবে বীজ ফেলিব" বলিয়া বসিয়া থাকিলে সময়ে আবাদ করা যায় না। মাঘ হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত বৃষ্টি একেবারে হয় না, তেমন নয়। ধান পুঁতিয়া দিয়া ঘরে বসিয়া থাকিলেও আবার ধান হয় না। প্রতিদিন দুই বেলা মাঠে ঘুরিতে হয়।

এক হালে পাঁচ বিঘা শোল, পাঁচ বিঘা বাইদ, পাঁচ বিঘা ডুনার বেশী রাখা চলে না। চার চাষে ধান ভাল হয়—উগাল, সামাল, পাখ্না, কাদা। মাঘ ফাল্গুনে বৃষ্টি পাইলে জমি উপালিয়া রাখিতে হয়। চৈত্র মাসে জমিতে সার নামাইতে হয়। প্রতি বৎসর জমির ভিটা তুলাইতে হয়। ভাগ-চাষী চার চাষে ধান পুঁতে না। ভরা বর্ষা না পাইলে চাষে নামে না। আ'ল দেয় না, ছাঁচ বুজে না। ধান পুঁতিয়া দিয়া আর জমির দিকে লক্ষ্য করে না। বছর বছর জমির মালিক জমি কাটাইয়া দিলেও না, সার দিলেও নয়। আজকাল ভাগ-চাষী বলিতে তো তাহারা যাহাদের একজোড়া করিয়া গরু বা কাড়া আছে। অর্থাৎ গাড়োয়ানরা।

চাষী-মজুরেরা কায়িক পরিশ্রমদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিবে। প্রয়োজন হইলে তাহারা লুটিয়া খাইবে। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা কায়িক পরিশ্রম করিতে পারেন না। সঙ্গতি থাকিলে তাঁহারাই চাষে মনোযোগ দিতে পারেন। চাষ—সখের, জীবিকার নয়। চাষেও ধর্ম্মবুদ্ধি চাই। আমার চাষে আমার প্রয়োজনীয় খাত্ত উৎপাদন হইলেই হইল—ইহা ভাবিলে চলে না। যে আপনার জন্য অন্নপাক করে, সে পাপান্ন ভোজন করে—ইহা শাস্ত্রবাক্য।

আজীবন পল্লীবাস করিয়া চাষের গতিক লক্ষ্য করিলাম। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদিগের অবস্থা যতই খারাপ হইতেছে, চাষের গতিক ততই খারাপের দিকে যাইতেছে। বর্ত্তমানে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদিগের দুরবস্থা চরমে উঠিয়াছে। চাষের দুর্গতিরও সীমা নাই।

পল্লীসংস্কারের নামে গরীব পল্লীবাসীদের গাছপালাগুলি কাটিয়া ফেলিতেই দেখিলাম। যেসব মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক পেটের দায়ে বিদেশে বাস করিতেছেন তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিয়া বাড়ীতে বসাইবার চেষ্টা ত দেখিলাম না। এখনও সরকারী চাকুরিয়াদের নিজ জেলায় থাকিতে নাই। ভদ্রলোকের ছেলেকে চাকুরি দিবার নামে এখনও দেশের কর্ণধারগণের উষ্মা বাড়ে। কৃষিকর্ম্মচারী যে কেমন তাহা ত চক্ষে দেখিলাম না। মাঠের পুকুরে জল কাটাইবার সময় লাঠালাঠিই দেখিলাম, কোনও সেচ-কর্ম্মচারীকে দেখিলাম না। জমি উন্নয়ন, পুষ্করিণী সংস্কার, এসব বিভাগের কথা কাগজেই পড়িলাম। কোনও ধানের জমি, কোনও মাঠের পুকুরের উন্নতি হইতে দেখিলাম না। কৃষিঋণ কাহাদের ভাগ্যে জুটিল জানিতেই পারিলাম না।

পল্লীবাস করিয়া আজীবন ম্যালেরিয়ায় ভুগিলাম। শিশু পুত্র কন্যা হাঁকাইয়া মরিল দেখিলাম। যৌবনোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে কত স্নেহের পাত্রপাত্রী চিতায় উঠিল তাহাও দেখিতে হইল। কিন্তু কোনও সরকারী ডাক্তারের দর্শনলাভ করিবার সৌভাগ্য হইল না। এখনও পল্লীবাস করিতেছি। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক আমি—এখনও বাঁচিয়া থাকিয়া চাষের কথা চিন্তা করিতেছি। 'খাত্তোৎপাদন' 'খাত্তোৎপাদন' করিয়া যাঁহারা চিৎকার করিতেছেন তাঁহারা কোথায়? কোন্ সম্প্রদায়ের তাঁহারা? স্বাধীন দেশের মন্ত্রিগণ কোন্ সম্প্রদায়ের? মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যে ডুবিস! জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিল! খাত্তোৎপাদন করিবে কে?

মধ্যবিত্ত ভদ্রসম্প্রদায় ডুবিলে দেশের ব্যবসায়ীরা কাহার গলায় ছুরি দিবে? চাষীমজুরেরা কাহার নিকট বেশী বেতন আদায় করিবে? শহরবাস আজকাল নরকবাসের তুল্য হইয়াছে। খাত্ত-সঙ্কট যেখানে তীব্র সেখানে ম্যালেরিয়া তুচ্ছ। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের চিত্ত আজ পল্লীর দিকে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। স্বাধীন দেশমাত্রেই বৃদ্ধ বয়সের পেন্‌সন আছে। ইঁহাদেরও বৃদ্ধ বয়সের পেন্‌সনের ব্যবস্থা হইলে, ইঁহাদের শিক্ষিত ছেলেদের চাকুরির ব্যবস্থা হইলে ইঁহারা আপনা হইতেই আসিয়া পল্লীতে বসিবেন। চাষে মনোযোগ দিবেন। বঙ্গজননী আবার শস্য-শ্যামলা হইয়া উঠিবেন।

কবীর ও সুফীমত

শ্রীজগদীশচন্দ্র দে

সাধু ফকিরেরা কবীরের দোঁহাগুলি তারযন্ত্রযোগে গাহিয়া থাকেন। এজন্য লোকে কবীরের রচনাবলীকে সাধারণ গান বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ তাহা নয়। তাঁহার অধিকাংশ রচনাই উচ্চ দার্শনিক ভাবে সমৃদ্ধ। "সাধারণের পক্ষে ঐগুলির মর্ম্ম গ্রহণ করা আর শিশুর পক্ষে মাংসাহার করা এক কথা।" ('সাধারণ সমঝনেবালোঁকী বুদ্ধিকে লিএ বহ উতনা হী অগ্রাহ্য হৈ জিতনা কি শিশুওঁকে লিএ মাংসাহার"'—ডাঃ রামকুমার বর্ম্মা।)

কবীর ছিলেন রহস্যবাদী। রহস্যবাদের চরম লক্ষ্য হইতেছে আত্মা ও পরমাত্মার মিলন। এই মতই হইল সুফীমত।

আত্মার পবিত্রতাই আত্মা ও পরমাত্মার মিলনের সেতু। পরমাত্মার সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা যত তীব্রই হোক না কেন, আত্মার পবিত্রতা না থাকিলে কিছুতেই সে মিলন হইবার নয়। বাসনা, ছলনা, কুরুচি, ও অন্তের এই চারিটি হইল আত্মার পবিত্রতা সাধনের পথে পরিপন্থী। ঐগুলির অন্ত হইলেই আত্মা শুদ্ধ ও পবিত্র হইয়া যায় এবং পরমাত্মার সহিত মিলনের যোগ্য হয়। বাহিরের শুচিতা নয়, অন্তরের শুচিতাই আবশ্যক। এ সম্বন্ধে কবীর বলিয়াছেন :

কহা ভয়ো রচি স্বাংগ বনায়ো,
অংতরজামী নিকট ন আয়ো।
কহা ভয়ো তিলক গরেঁ জপমালা,
মরম ন জানেঁ মিলন গোপালা।
স্বাংগ সেত করনী মণি কালী,
কহা ভয়ো গণি মালা খালী।
বিন হী প্রেম কহা ভয়ো রোএ,
ভীতরি মৈলি বাহরি কহা ধোএ।

বেশভূষায় সং সাজিয়া কি হইবে? অন্তর্যামী নিকটে আসিবেন না। পরমাত্মার মিলনের কথা না জানিয়া কেবল তিলক কাটিলে বা জপমালা ধারণ করিলে কি হইবে? তোমার বাহিরের সাজসজ্জা সাধুর মত হইল, গলায় মালা পরিলে, কিন্তু মনের কালিমা রহিয়া গেল। অন্তরে প্রেম নাই, অথচ রোদন কর, সে রোদনে কি ভিতরের মলিনতা ধুইয়া যাইবে?

বাসনাগুলিকে একে একে দূর করিতে পারিলে হৃদয় মন আত্মা পরিশুদ্ধ হইয়া উঠিবে; পরমাত্মার সহিত মিলনের পথ তাহাই। আত্মা পরমাত্মার সমীপস্থ হইলে দিব্য সংযোগের দ্বারা আত্মা পরমাত্মার রূপ পরিগ্রহ করে। সুফীমতের অন্যতম ধারক জালালুদ্দীন রুমী বলেন—লহর সমুদ্রে পৌঁছিলে সমুদ্রই হইয়া যায়। বীজ যখন ক্ষেত্রে পৌঁছায় তখন উহা শস্য হইয়া যায়।

কবীর এই লহর ও সমুদ্রের দৃষ্টান্তকে আরও পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন :

জৈসে জলহি তরঙ্গ তরঙ্গিণী.
ঐসে হম দিখলাবহিঁগে।

আমরা দেখিব তরঙ্গিণীর তরঙ্গের মত। তরঙ্গ তরঙ্গিণী হইতে উৎপন্ন হইয়া তরঙ্গিণীতেই মিলাইয়া যায়। বিদ্যাপতি বলেন—

তোহে জনমি পুন তোহে সমায়ত,
সাগর লহর সমানা।

রুমী বলেন—লহর যখন সাগরে পৌঁছায়, তখনই উহা সাগরে মিশিয়া যায়। লহরকে সাগরের অংশরূপে তিনি কল্পনা করেন নাই। কবীর বলেন, তরঙ্গ সর্ব্বদা তরঙ্গিণীতেই বর্ত্তমান। তরঙ্গিণী হইতেই তাহার উদ্ভব, আবার তরঙ্গিণীতেই তাহার বিলয়। আত্মারূপ তরঙ্গ পরমাত্মারূপ তরঙ্গিণীরই অংশ। পরমাত্মার সন্নিকটবর্ত্তী হইলে আত্মা তাঁহারই স্বরূপ গ্রহণ করে। তখন তাহাতে এমনই শক্তি আসে যে, সে বিশ্বের বৃহত্তর পরিধিতে বিচরণ করে, ক্ষুদ্রতা নিঃশেষে ঘুচিয়া যায়।

আত্মা যতই পবিত্র ও উদার হইতে থাকে, তাহার ব্যাকুলতা যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, পরমাত্মাও ততই তাহার সহিত মিলিত হইতে উৎসুক হইয়া উঠেন; আত্মার ব্যাকুলতা কবীর এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন :

নিস দিন হরি বিন নীঁদ ন আবৈ,
দরস পিয়াসী রাম ক্যোঁ সচুপাবৈ।
কহৈ কবীর অব বিলংব ন কীজৈ,
অপনো জানি মোহি দরসন দীজৈ।
... ...
অজহুঁ বীচ কৈসে দরসন তোরা,
বিন দরসন মন মানেঁ ক্যোঁ মেরা।
... ...
কহৈ কবীর হরি দরস দিখাও,
হমহি বুলাবো তুম্হ চলি আও।

আমাকে দর্শন দাও, তোমায় আমায় মিলন হোক। তুমি আমাকে ডাকিয়া লও, নিজেও আমার দিকে অগ্রসর হও।

অবশেষে মিলনের সেই শুভক্ষণ আসে। আত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ সাধিত হয়। এই অবস্থায় সে বলিয়া উঠে :

হম সব মাহী সকল হম মাহী,
হম হৈ ঔর দুসরা নাহীঁ।
তীন লোকমেঁ হমারা পসারা,
আবাগমন সব খেল হমারা।

আমি সকলের মধ্যে আছি, সকলেই আমার মধ্যে আছে। আমিই কেবল আছি, আর কেহ নাই। ত্রিলোকে যাহা কিছু আছে, তাহা আমারই প্রকাশ। আসা আর যাওয়া, সৃষ্টি আর প্রলয়, আমারই খেলা।

পরমাত্মা ঘোষণা করেন :

মুঝকো কহাঁ ঢুঢ়ে বংদে,
মৈঁ তো তেরে পাস মেঁ।

আমাকে তুই কোথায় খুঁজিতেছিলি? আমি তো তোরই পাশে আছি। এই দেখ—"আমি তুমি, তুমি আমি।"

নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত চিঠিপত্র

[নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্তের অন্তরঙ্গ সুহৃদ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহকর্ম্মী ও সহযোগী। অক্ষয়কুমার 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদকতা হইতে অবসর গ্রহণ করিলে নবীনকৃষ্ণ প্রায় ৬ বৎসর কাল (১৮৫৫ খ্রীঃ হইতে ১৮৬০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত) উহার সম্পাদনে সাহায্য করিয়াছিলেন। "বিবিধার্থ সংগ্রহে"র সম্পাদনায় তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "সংবাদ প্রভাকর" ও "সংবাদ সাধুরঞ্জনে" তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ সে-যুগের বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার পত্রবিনিময় হইত। নবীনকৃষ্ণের নিকট লিখিত ইঁহাদের কতকগুলি পত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীবরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়]

১

মসুরি পর্ব্বত

সবিনয়-নমস্কার নিবেদন,

এইক্ষণে নানাপ্রকার ব্যয়ের প্রয়োজন হইয়া তোমার যে উৎকণ্ঠা হইয়াছে, তাহার কথঞ্চিৎ লাঘব হইবে মনে করিয়া, দুইশত টাকার "চেক্" এই পত্র মধ্যে পাঠাইলাম, গ্রহণ করিবে।

ভাদ্র মাসের "তত্ত্ববোধিনীর" প্রস্তাবসকল শ্রীযুক্ত বেদান্তবাগীশকে দিয়া, বোধ হয় ইতিমধ্যে তুমি বাটী যাইতে পারিবে।

তোমারই

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

২

সবিনয়-নমস্কার নিবেদনমিদং,

তোমার পত্র পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি মধ্যে ডুমুরদহে যাইয়া আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্মের কিছু উন্নতি দেখিয়া আমাকে যে সংবাদ লিখিয়াছ, তাহাতে আমি আপ্যায়িত হইলাম।

আমার মনের ভাব তুমি যদি গ্রহণ করিতে পার, তবে কি সম্পদে, কি বিপদে, কি স্বদেশে, কি বিদেশে সর্ব্বদাই ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারে উৎসাহী থাকিবে। কিন্তু সংসারের টান এমত যে, মন সংসার ছাড়িয়া ধর্ম্মপ্রচারের জন্য সতত উড়িতে পারে না, ইহা আমি জানি। স্বাধীনতা বিনষ্টকারী দরিদ্রতা বিপুল মতি ও উৎসাহ ভঙ্গ করে।

তোমার এবারকার বাণিজ্যে কিছু লাভ হইয়াছে, শুনিলে আমি আহ্লাদযুক্ত হইব।

তোমারই

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

৩

কলিকাতা

৩১ ভাদ্র, ১৭৭০ শক

সবিনয়-নমস্কার নিবেদনমিদং,

তোমার মনের অসুস্থতার জন্য আমি দুঃখিত হইলাম। কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, বিপদ হইতেও মঙ্গল উৎপন্ন হয়। বিপদ যদিও অতি নির্দ্দয় গুরু, তথাপি তাহার উপদেশ বহুমূল্য। এমত উপদেশ আর কুত্রাপি পাওয়া যায় না। অতএব বিপদে পতিত হইয়া নিতান্ত বিক্ষিপ্তচিত্ত হইবে না। এই সময়ই তিতিক্ষার সময়, এই সময়ই দীনবন্ধুর মহিমায় প্রতীতির সময়।

আমি তোমার সে সাধুগুণসকল কখনই বিস্মৃত হইব না। তোমার যখন যাহা উপস্থিত হইবে, আমাকে জানাইবে। তোমার সুখদুঃখের প্রতি আমার দৃষ্টি আছে। তুমি যদি সংসারে বিশেষ উন্নতি কর, তাহা হইলে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইব জানিবে।

তোমারই

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

৪

গৌরহাটি

১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৭৭৯ শকাব্দ

সবিনয়-নমস্কার নিবেদনমিদং,

তুমি ইহা যথার্থ অনুভব করিয়াছ যে, তোমার সুখেতে আমার অবশ্যই সুখ-সঞ্চার হয় এবং তোমার শ্রীবৃদ্ধি হইলে, আমার মনের সাধ মেটে। কিন্তু আমার এক্ষণে এমত ক্ষমতা নাই যে, তোমার কোন উন্নতিসাধন করি। সেজন্য আমি ক্ষুব্ধ আছি।

"কা অস্মো পরিত্রানে এখ দাবদুষ্মন্তং অক্কন্দ।"

কিন্তু আমার আরও আক্ষেপের বিষয় এই হইয়াছে যে, তোমাকে সুখী করা দূরে থাক্, তোমাকে কতপ্রকার দুঃখ দিয়াছি। আমি যদিও কাহাকে সুখী করিতে না পারি, তথাপি যেন দুঃখ না দিই, এই আমার একান্ত অভিপ্রায়। এইরূপ মনের ইচ্ছা তোমার সম্বন্ধে রক্ষা করিতে পারি নাই; এজন্য আমি অপরাধী আছি।

যাহা হউক, দুই তিন দিনের মধ্যে একবার আসিলে বড়ই সুখী হইব।

ইতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

৫

কুমারখালি
১৯ আষাঢ়

সবিনয়-নমস্কার নিবেদন,

তোমার ৬ আষাঢ়ের পত্র পাইয়াছি। তোমার অনুবাদ গ্রাহ্য হইয়াছে, শুনিয়া সুখী হইলাম। দেখ দেখি, কুমারখালি আইলে তোমার তো এরূপ সুবিধা হইত না। আমি তোমায় না আনিয়া ভাল করিয়াছি, বোধ হইতেছে। "ফলেন পরিচীয়তে"!

ভাই, সকল সুখ পৃথিবীতে একত্র পাওয়া যায় না। এখানে যাহা সুখ, তাহা দুঃখ-মিশ্রিত। আমি এখানে বাটীর মত সুখে আছি। বরং, তাহা হইতেও অধিক সুখে সময় কাটাইতেছি। তোমার তরজামা আর সংশোধন করিতে হয় না। তুমি বাটী যাইয়া এবার কেমন ছিলে? তোমার স্বদেশ তো বিদেশ হয় নাই, নিবাস তো প্রবাস হয় নাই।

তোমারই
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

পুনশ্চ—তোমার পরামর্শমতে "শকুন্তলা"খানি না আনিয়া ভাল করি নাই। কিন্তু মহাভারতে যে "শকুন্তলা উপাখ্যান" আছে তাহা পাঠ করিয়াছি। কিন্তু কালিদাসের নিকটে তাহা কি?

৬

মসুরি পর্বত

সবিনয়-নমস্কার নিবেদন,

তোমার ছোট পুত্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। পূর্বকালের ঋষিদিগের এই উপদেশ "প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসী।" প্রজাসূত্রকে ছেদন করিও না। তোমার যখন আর একটি বৈ পুত্র নাই, তখন তাহার বিবাহ দিয়া প্রজাসূত্র রক্ষা করা অতীব কর্ত্তব্য। এইক্ষণে আমি আনন্দের সহিত বর-কন্যার যৌতুকস্বরূপ দুইশত টাকার আদেশ কলিকাতায় পাঠাইতেছি। লইলে আপ্যায়িত হইব।

তোমার কোমরের জন্য তুমি অতিশয় কষ্ট পাইতেছ। আমারও ঐ বেদনা আছে। এজন্য আমি যে ঔষধ ব্যবহার করি তাহা লিখিতেছি। অল্প চিনি দিয়া প্রতিদিন পান করিলে তোমার বেদনার উপশম হইবে ও আর শয্যায় পড়িয়া থাকিতে হইবে না। আমি রোগী হইয়া এখন ওঝা হইয়াছি।

"জরাতে দুঃখ বিপুল, আধিব্যাধি সমাকুল"।

সে সময় আর গজলে সানায় না।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

৭

আলাহাবাদ
১৭ আশ্বিন, ১৭৭৬ শক

অতীব প্রিয় বান্ধবেষু

নমস্কার-নিবেদনমিদং,

কাশী পহুঁছিয়া তোমার পত্র পাইলাম। তাহার পরদিবসে আলাহাবাদ যাত্রা করিলাম। কল্য রাত্রিতে আলাহাবাদের পরপারে আসিয়া পহুঁছিলাম। রাত্রিজন্য গঙ্গা পার হইয়া আলাহাবাদে যাইবার সুবিধা হইল না। গাড়ী, পারের নৌকায় চড়াইয়া সমস্ত রাত্রি সেই গাড়ীর উপরেই শয়ন করিলাম।

কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই পারের লোক চলিতে আরম্ভ করিল। সেই গঙ্গার স্রোতের এ প্রকার প্রাদুর্ভাব যে সেইটুকু পার হইয়া আসিতে প্রায় দুই প্রহর লাগিল। অদ্য দুই প্রহরের সময় আলাহাবাদ পহুঁছিয়া ডাকবাঙ্গালায় আছি এবং এইক্ষণে আহার সমাপন করিয়া বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া তোমাকে এই পত্রখানি লিখিতেছি। আমার আসিবার পূর্ব্বে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, এজন্য যে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছ তাহা আমার হৃদয়ে লাগিয়াছে। তোমার আত্মীয়দের মধ্যে মামলামোকদ্দামা তোমার গভীর অশান্তির কারণ হইয়াছে। ঘটনাসূত্রকে কে অতিক্রম করিতে পারে? ঘটনাসকল যে কি আশ্চর্য্যরূপে ঘটিতেছে তাহা কিছুই বলা যায় না।

এসকল দেশে এখন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারিত হইবে, ইহা মনেও করিবে না। যদি কুমারখালি, ডুমুরদহ প্রভৃতি স্থানে এই 'ধর্ম প্রচার' অসাধ্য, জান, তখন, পৌত্তলিকদিগের প্রধান স্থান কাশী, গয়া, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে সে ধর্ম প্রচারিত হইবে, তাহা কখন স্বপ্নেও ভাবিও না।

প্রয়াগের পাণ্ডারা আমাকে ধরিয়াছিল। ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদের জেরা করিয়াছিলাম। তীর্থযাত্রীদিগের ভ্রম দেখিয়া দয়া ও দুঃখের উদয় হয় এবং পাণ্ডাদের নির্দ্দয়তা ও অত্যাচার দেখিয়া ক্রোধের উদ্রেক হইয়া পড়ে। কবে আমাদের দেশীয়গণ ধর্মের যথার্থ মর্ম জানিবে?

তোমার জীবিকানির্ব্বাহের বিশেষ কোন একটা অবলম্বন হইল না, ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত আছি। তোমাদের সুখেই আমার সুখ।

তোমারই
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

৮

অমৃতসহর

৫ বৈশাখ, ১৭৭৯

প্রিয়তম সখা,

সবিনয়-নিবেদনমিদং,

তোমার ২৮ চৈত্রের পত্র প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদিত হইলাম। আমি আলয় হইতে তোমাকে যে এক পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহা বোধ হয় পাইয়া থাকিবে। তোমার ২৮ চৈত্র তারিখের পত্র পাইয়া প্রতীতি জন্মিল যে, তোমার রচনাশক্তির বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এই সঙ্গে তোমার বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি যদি সমধিক এবং সন্তোষজনক হইত, তবে আমি আরও অধিক আনন্দিত হইতাম।

তুমি যখন সেই অমৃতরসের আস্বাদ একবার পাইয়াছ, তখন তোমার আর কোন ভয় নাই।

"স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"

শ্রীযুক্ত রাজা কালীকুমার কি অদ্যাপি ঈশ্বর-প্রসঙ্গ লইয়া পূর্ব্ববৎ আমোদ করেন? তাঁহার নিকট হইতে বহুদিন কোন পত্রাদি প্রাপ্ত হই নাই।

"Sorrow is the wholesome spur that should impel us, and that, sooner or later, will impel us to union with the object of our Love and to Blessedness there-in."
Fichte.

"সরগ্রাম লাগ্ ভব জল-তরণকে।
জনম বৃথা যাত রঙ্গ-মরাকে॥"
নানকপন্থিদিগের গ্রন্থ।

এখানকার বায়ু অদ্যাপি শীতল আছে। এবং আমার শরীরও ভাল আছে। যখন তুমি আমাকে স্মরণ করিবে, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানিবে যে, আমিও তোমাকে স্মরণ করিতেছি।

তোমারই
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

৯

মসুরি পর্ব্বত

৩ জ্যৈষ্ঠ, শকাব্দ ৭৩ [?]

সাদর নমস্কারা বহবঃ সন্তু,

তোমার ২ বৈশাখের বিষাদময় পত্র পাইয়া বিষণ্ণ হইলাম। তোমার জীবনের শেষাবস্থায় তোমাকে একেবারে বিষাদের তম-রাশি ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। Cowper কবির "নিশীথের * * *" তুল্য ছন্দও তোমার হৃদয় অভিভূত করিয়াছে। তোমার বৃদ্ধাবস্থায় নিদারুণ রোগশোকাদি তোমাকে একেবারে জর্জরিত করিয়া দলিয়া গেল।

"Farewell! a long farewell, to all my greatness,
This is the state of man: to-day he puts forth
The tender leaves of hopes; to-morrow blossoms,
And bears his blushing honours thick upon him;
The third day comes a frost, a killing frost;
And, when he thinks, good easy man, full surely
His greatness is a—ripening, nips his root,
And then he falls, as I do. I have ventured,
Like little wanton boys that swim on bladders,
This many summers in a sea of glory,
But far beyond my depth: my high-blown pride,
At length broke under me, and now has left me,
Weary and old with service, to the mercy
Of a rude stream, that must for ever hide me
Vain pomp and glory of this world, I hate Ye."

সেক্সপিয়ার মহাকবির এই মহৎ বাণী* তোমার অবস্থার উপযোগী।

তুমি যে লিখিয়াছ "আমি এখন কোথায় যাই, কি করি" এই কথা কয়টি আমার হৃদয়ে বড়ই লাগিল। সৎ-সঙ্গ-জনিত যে "স্বত্ব" তাহা কখনও তামাদি হয় না। তাহা পুরাতন হইলেও তাহার অপলাপ নাই। আবার তোমার এক একটি কথায় পুরাতন কাহিনীও নূতন হইয়া উঠে। তুমি যে এত জীর্ণশীর্ণ হইয়াছ তথাপি, আশ্চর্য্য যে তোমার হৃদয় তেমনি তাজা ও মোলায়েম আছে।

আমার আহারের বন্দোবস্ত এখন অতি স্বল্প হইয়াছে। আমি আর তেমন চলিতে বলিতে পারি না, সহজে লিখিতে পড়িতেও সক্ষম নহি; এ জন্য আমি তোমার পত্রের উত্তর যথাসময়ে দিতে পারি নাই। আশা করি, সে ত্রুটি ক্ষমা করিবে।

তোমারই
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

নমস্কারাসন্তু,

তোমার গত ৩১ চৈত্রের পত্র পাইলাম। তুমি সাংসারিক বিষম বিপত্তিতে পতিত হইয়াছ। তজ্জন্য এত বিষণ্ণ হইবে না। তুমি জ্ঞাত আছই যে সংসারের সুখদুঃখ স্থায়ী নহে।

"সুখই হউক, দুঃখই হউক, প্রিয়ই হউক, বা অপ্রিয়ই হউক, যাহা কিছু ঘটিবে, অপরাজিত চিত্তে তাহার সেবা করিবেক।" এই আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ। পরমেশ্বরের যে সৌন্দর্য্যস্বরূপ তাহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হইলে উপরি উক্ত আদেশ পালন অনায়াসেই হইতে পারে। মঙ্গলসঙ্কল্প পরমেশ্বর মঙ্গলই করিবেন, তুমি তাঁহার নিয়োগানুসারে আপনার কর্ত্তব্য সমাধান কর।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

[কটক ১৬ বৈশাখ, ১৭৭৩]

---

* উদ্ধৃতাংশ সেক্সপিয়ারের *Henry the Eighth* হইতে Cardinal Wolsey-এর বিলাপোক্তি।

১১

সোদরপ্রতিমেষু,

আপনার ২০ বৈশাখের পত্র ও আপনার প্রণীত "নেচুরেল থিয়লজির" অনুষ্ঠান-পত্র প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইলাম।

যে অবধি আমি মেদিনীপুরে আসিয়াছি, সে অবধি অনেক বন্ধুর অনেক পুস্তক লইতে এখানকার লোকদিগকে অনুরোধ করায়, এক্ষণে কাহারো পুস্তক ক্রয় করিতে বড় অনুরোধ করিতে পারি না। ইঁহাদিগের পুস্তক-পাঠে বড় অভিরুচি নাই। অতএব তাঁহাদের নিকট বেশী আশা নাই। তথাপি, তাঁহাদের নিকট আপনার প্রেরিত অনুষ্ঠান-পত্র প্রচার করিতে আমি ক্রটি করিবো না। আপনার পুস্তকের বিক্রয়াধিক্য হইবে, এইরূপ ভরসা আছে। আপনার পুস্তক প্রকাশিত হইলেই শ্রীযুক্ত রোয়র সাহেবের অনুমতি লইয়া স্কুলের বালকদিগের পাঠজন্য আনাইবো।

আপনি মেদিনীপুরে আসিতে পারিলে যথার্থই সুখী হই।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবু কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে সে কথাটা পাড়িবেন, ভুলিবেন না।

শ্রীমান বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত আপনার মধ্যে মধ্যে অবশ্যই সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাকে বলিবেন যে, তাঁহার নবোৎসাহ-সমুদ্ভূত প্রস্তাব সকল মধ্যে মধ্যে "বিবিধার্থ-সংগ্রহে" দেখিতে পাইয়া আমি পরম প্রীত হই। তিনি যে ভবিষ্যতে একজন গণ্য লেখক হইবেন, তাহার আভাস এই সকল প্রবন্ধে যথেষ্ট পাইতেছি। বন্ধুবর দেবেন্দ্রনাথ বাবু সু-পুত্রলাভে কি পর্য্যন্ত না সুখী?

আমরা সকলে ভাল আছি। আপনার শারীরিক কুশল-সমাচার লিখিয়া নিরুদ্বেগ করিবেন।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু

মেদিনীপুর, ৬ জ্যৈষ্ঠ।

বসন্ত-শ্রী

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

১

ফাল্গুন আগত ওই, কোথায় ফাল্গুনী?
স্বর্গ হতে আহরিতে হবে যে মন্দার,
দাও তবে দাও তব গাণ্ডীবে টঙ্কার,
পৃথিবী নবীন কর নব যুগে গুণী!
ঊর্দ্ধপানে উৎসারিয়া তোল সুরধুনী।
পুষ্পহীন মর্ত্যে আনো পুষ্পের সম্ভার,
ঊষরের প্রাণে কর রসের সঞ্চার,
ধরার অন্তরে বুঝি কলোচ্ছ্বাস শুনি।

জীবন বেদনা-বিদ্ধ, তৃষার্ত্ত মানব,
রুদ্ধ করুণার স্রোত মুক্ত কর বীর!
বসন্তের আবির্ভাবে মানি' পরাভব,
দূর হোক জীর্ণতার গ্লানি ধরণীর।
সৃষ্টি জয়ী, ওঠে নিত্য নূতনের স্তব,
বসন্ত সঙ্গীতে পূর্ণ মানব-মন্দির।

২

শক্তি আর সৌন্দর্য্যের সার্থক মিলন,
নব-সম্ভাবনাপূর্ণ সে-ই নবীনতা,
সে-ই আনে মনে বনে আনন্দ-বারতা,
গুঞ্জরিয়া ওঠে গানে উন্মুখ জীবন।
সুষমা বসন্ত-শ্রীর—সে-ই ত যৌবন,
তাহারি বন্দনা করি—সুন্দর দেবতা,
সৃষ্টির প্রেরণা সেথা নিয়ত জাগ্রতা,
সেথা শুনি চিরন্তন প্রাণের স্পন্দন।

যে অস্ত্র বিনাশ করে সে-ই সৃষ্টি করে।
থামে না থামে না কোথা সময়ের রথ,
জীবন আবেগময় কে তাহারে ধরে?
অতীত পড়িয়া থাকে ডাকে ভবিষ্যৎ।
ফাল্গুনের স্পর্শে স্পর্শে শিহরি' অন্তরে
প্রাচীন ভারত হোক্ নবীন ভারত।

সমবায় আন্দোলনে বাংলা

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র পুরকায়স্থ

চল্লিশ বৎসরের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধকাল যাবৎ ভারতে সমবায় আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। এতদিনের সমবায়-ব্যবস্থার ফলে আমাদের কতটুকু উপকার হইয়াছে, তাহা আজ বিচার করার সময় আসিয়াছে। ভারত-সরকার ইদানীং ১৯০৬-৭ সাল হইতে ১৯৪৫-৪৬ সাল পর্য্যন্ত সমবায় সংক্রান্ত সংখ্যাদি সমন্বিত এক-খানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধটি উক্ত সংখ্যাদির উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তিকায় যে সংখ্যাদি আছে, তাহা অবিভক্ত ভারত ও বাংলা সম্পর্কে হইলেও তৎসম্পর্কিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ, বিভক্ত ভারত তথা বাংলার সমবায় আন্দোলনের উপর অনেকখানি আলোকসম্পাত করিবে।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। অধিবাসীদের শতকরা ৭২ জন কৃষিজীবী, ৮ জন শিল্পবাণিজ্যে নিযুক্ত এবং আনুমানিক ২ জন চাকুরিজীবী। দেশের ৯০ জন গ্রামে বাস করে। ভারতের সত্যকারের উন্নতি মানে গ্রামের উন্নতি। সমবায়-নীতি আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার অতি অনুকূল। সমবায়কে আমাদের দেশের উপযোগী করিয়া, আমরা গ্রামবাসীদের আর্থিক মানের অনেকটা উন্নয়ন করিতে পারি। ইংরেজ কর্ত্তৃক আইনবদ্ধ ভাবে প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে, আমাদের দেশে সমবায়-প্রথা ছিল না মনে করিলে ভুল হইবে। গ্রামাঞ্চলে কোন কোন স্থানে এখনও এমন ব্যবস্থা আছে যে, কাহারও বাড়ীর উৎসব-সংক্রান্ত দুধের প্রয়োজন হইলে প্রতিবেশীরা নিজ নিজ বাড়ীর দুধের দ্বারা তাহা মিটাইয়া থাকে, তজ্জন্য দাম দিতে হয় না। কাহারও বাড়ীর বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি উৎসবে প্রতিবেশীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কায়িক ও প্রয়োজনবোধে আর্থিক সাহায্য করিয়া থাকে। আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে দেখা যায়, যখন কাহারও ফসল কাটার সময় হয়, তখন প্রতিবেশীরা সমবেত ভাবে তাহা কাটিয়া দেয়। এইরূপে সমবেত ভাবে গ্রামের সকলের ফসল কাটা হয়, তজ্জন্য কাহাকেও পয়সা দিতে হয় না। বর্ত্তমান সমবায় আইন ও তৎসম্পর্কিত পরিচালনা-প্রণালীকে আমাদের ভারতীয় অবস্থার উপযোগী করিয়া লওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সর্ব্বভারতীয় সমবায়-প্রচেষ্টার খতিয়ান

(১৯৪৫-৪৬ সালের হিসাব অনুযায়ী)

ভারতের সর্ব্বমোট সমবায় সমিতির সংখ্যা—১৭২,১৬৬ ; ইহার মধ্যে ১,৪৭,২৪৭টি কৃষিসংক্রান্ত এবং বাকী ২৩,৮৫৫টি শিল্প ও বিবিধ বিষয় সংক্রান্ত। ভারতের জনসংখ্যা ৩১ কোটির কিছু উপর। এই হিসাব অনুসারে আমাদের প্রতি এক লক্ষ লোকের জন্য ৪৬'৫টি সমিতি আছে। সমগ্র ভারতের সমিতিগুলির মোট সভ্য-সংখ্যা ৯১,৬৩,৩৪৪ ; তন্মধ্যে ৫৬,৪২,৬৭১ জন কৃষি-সমিতির সভ্য এবং অবশিষ্ট ৩৫,২০,৬৭৩ জন বিবিধ সমিতির সভ্য। এই হিসাবমতে ভারতের প্রতি হাজার লোকের মধ্যে ২৪'৭ জন সমবায় সমিতির সভ্য।

এইবার ভারতের সমিতিগুলির মূলধন ও লাভ-ক্ষতির হিসাবের আলোচনা করা যাইতেছে। সমিতিসমূহের (১) আদায়ীকৃত মূলধন –২২,২০,৬০,০০০৲ টাকা। (২) কার্য্যকরী তহবিল ১৬৪,০০,০১,০০০৲ টাকা এবং (৩) সঞ্চিত তহবিল —২৫,০০,৬৬,০০০৲ টাকা। এই সময়ে সমিতিগুলির লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে :

(১) সেণ্ট্রাল ও প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক—	৩৮,১৬,৯১৯৲ টাকা।
(২) কৃষি সমিতি—	৯৩,১২,৩৬০৲ „
(৩) জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক—	৪,৯০,৮৪৫৲ „
(৪) বিবিধ সমিতি—	২,৩১,৭৫,২৩৮৲ „
মোট—	৩,৬৮,৫৫,৪৪২৲ টাকা

এই হিসাব বিশ্লেষণ করিয়া আমরা দেখি (১) মূলধনের উপরে ৫½% হারে লাভ হইয়াছে এবং (২) সঞ্চিত তহবিলে মূলধন অপেক্ষা প্রায় তিন কোটি বেশী আছে। ভারতের জন-সংখ্যা ৩১ কোটি দিয়া মূলধন-সংখ্যা ২২⅕ কোটিকে ভাগ করিলে আমাদের মাথাপিছু মূলধন দাঁড়ায় ॥/৭ (নয় আনা সাত পাই)। আর লাভের অঙ্ক ৪ কোটিকে জনসংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে, জনপ্রতি আয় দাঁড়ায় /৯ (এক আনা নয় পাই) মাত্র। এতদিন সমবায় আন্দোলন পরিচালনা দ্বারা আমাদের যে বিশেষ উপকার হয় নাই, তাহা এই হিসাব হইতে বুঝা যায়। তবে সমিতির ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যা মনে আশার সঞ্চার করে। ১৯০৬-৭ হইতে প্রথম চারি বৎসর আমাদের সমবায় সমিতির সংখ্যার বার্ষিক গড় ছিল, ১৯২৬ ; দ্বিতীয় পাঁচ বৎসরের গড় ১১,৭৮৬ ; তৃতীয় পাঁচ বৎসরের গড় ২৮,৪৭৭ ; চতুর্থ পাঁচ বৎসরের গড় ৫৭,৭০৭ ; এই ভাবে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া ১৯৪৫-৪৬ সালে সমিতি-সংখ্যা দাঁড়ায়, ১,৭২,১১৬টি।

বাংলার অবস্থা

এইবার বাংলার অবস্থা আলোচনা করা যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই প্রবন্ধে "বাংলা" কথাটি অবিভক্ত বাংলাকে বুঝাইবে।

বাংলার সমবায় সমিতি

বাংলার মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা—৪৩,৩২০ ; ইহার

মধ্যে কৃষি-সমিতির সংখ্যা—৩৯,৮৯৩ এবং অন্যান্য সমবায় সমিতির সংখ্যা—৩,৩০৭, বাংলার লোকসংখ্যা ৬ কোটি ২৩ লক্ষ। প্রতি এক লক্ষ লোকের জন্য ৬৯·৫টি সমিতি আছে। বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের সঙ্গে সেই সেই প্রদেশের যে আনুপাতিক হিসাব আছে, তদনুসারে বাংলার স্থান ষষ্ঠ। আনুপাতিক গুরুত্ব অনুসারে (১) কুর্গ (১৬৯·০) প্রথম, (২) আজমীড়-মাড়োয়ার (১৩৬·৭) দ্বিতীয়, (৩) পঞ্জাব (৯০·৩) তৃতীয়, (৪) কাশ্মীর (৮৮·৩) চতুর্থ, (৫) গোয়ালিয়র (৮৭·৪) পঞ্চম এবং (৬) বাংলা (৬৯·৫) ষষ্ঠ।

বাংলার সভ্য-সংখ্যা

বাংলার ৪৩,৩২০টি সমিতির মোট সভ্য-সংখ্যা—১৬,৭৩,২৮৭ জন; অর্থাৎ গড়পড়তা প্রতি সমিতিতে ৩৮·৬ জন সভ্য আছে। বোম্বাইয়ের প্রতি সমিতিতে ১৪৮ জন সভ্য আছে। ১০০০ অধিবাসীকে পরিমাপক সংখ্যা ধরিলে বিভিন্ন প্রদেশের প্রাথমিক সভ্যদের সংখ্যানুপাত দাঁড়ায়:—(১) কুর্গ (১৭৮·৮) প্রথম, (২) বোম্বাই (৪৯·১) দ্বিতীয়, (৩) আজমীড়-মাড়োয়ার (৪০·০) তৃতীয়, (৪) পঞ্জাব (৩৭·৮) চতুর্থ, (৫) মাদ্রাজ (৩৬·০) পঞ্চম এবং (৬) বাংলা (২৬·৯) ষষ্ঠ। বাংলার স্থান উল্লেখযোগ্য নয়।

বাংলার প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহের অবস্থা

বাংলার প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহের সংখ্যা ১২০। ব্যাঙ্কসমূহের মূলধন ২১,৫১,৬৭৫ টাকা (২) সংরক্ষিত তহবিল—১০,৫৫,২৭৬ টাকা, (৩) কার্য্যকরী তহবিল—৩,১৬,৯৪২৬২ টাকা, এবং (৪) লাভ—১,৭৪,৫৮৬ টাকা। বাংলার জনসংখ্যার অনুপাতে মাথাপিছু মূলধন দাঁড়ায়—৫½ পাই, কার্য্যকরী তহবিল—।।০ এবং লাভ ½ পাই মাত্র। কার্য্যকরী তহবিলের হিসাবে (১) বোম্বাই—(৬,৯৪,৪৯,৭৮৫ টাকা) প্রথম, (২) মাদ্রাজ (৪,০৩,১০,৬২৯ টাকা) দ্বিতীয়, (৩) পঞ্জাব (৩,৭৩,৯০,৬১৩ টাকা) তৃতীয় এবং (৪) বাংলা (৩,১৬,৯৪,২৬২) চতুর্থ। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহ প্রয়োজনমত সমিতিগুলিকে টাকা ধার দিয়া থাকে। জনপ্রতি ।।০ আট আনা কার্য্যকরী তহবিল দিয়া সমবায়-প্রচেষ্টাকে কতটুকু অগ্রসর করা যাইতে পারে, তাহা বিশেষ বিবেচ্য। বাংলার (১) কুমিল্লা ইউনিয়ন, (২) কুমিল্লা ব্যাংকিং এবং (৩) বেঙ্গল সেণ্ট্রাল—এই তিনটি ব্যাঙ্কের যে-কোনটির কার্য্যকরী তহবিল সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের মোট তহবিল হইতে অনেক গুণ বেশী।

বাংলার সমুদয় সমিতির মূলধন ইত্যাদি

পূর্ব্বে শুধু সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের হিসাব আলোচনা করা হইয়াছে। এইবার বাংলার যাবতীয় সমবায় সমিতির টাকা-কড়ির হিসাব দেওয়া গেল:

(১) আদায়ীকৃত মূলধন—	৩,২৯,৮৮,০০০৲
(২) সভ্যদের আমানত—	২,৭৫,৯৭,০০০৲
(৩) বিভিন্ন সমিতি হইতে হাওলাত—	১৪,৮৬,০০০৲
(৪) ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ—	৪,২৭,৮৯,০০০৲
(৫) গবর্ণমেণ্ট হইতে জমা—	৫,৬৪,০০০৲
(৬) জনসাধারণের জমা—	৬,২৬,৫২,০০০৲
মোট—	১৭,৬০,৭৬,০০০৲

এই হিসাব হইতে দেখা যায়, সমিতিসমূহের আদায়ীকৃত মূলধন প্রায় ৩¼ কোটি টাকা। যাহারা সমিতির সভ্য নয়, তাহাদের জমার পরিমাণ প্রায় ৬¼ কোটি টাকা। আর গবর্ণমেণ্ট সমিতিদিগকে দিয়াছেন ৫½ লক্ষ টাকা। তুলনামূলক বিচারে দেখা যায়, জনসাধারণ সমিতিসমূহের মূলধনের দ্বিগুণ টাকা জমা দিয়াছে। আর সরকার যত টাকা দিয়াছেন, জনসাধারণ দিয়াছে তাহার ১১৪½ গুণ বেশী। সমবায় আন্দোলনকে সম্প্রসারিত করার কতটুকু সদিচ্ছা পূর্ব্ববর্ত্তী সরকারের ছিল, তাহা এই হিসাব হইতেই বুঝা যায়।

এখন অন্যান্য প্রদেশের কার্য্যকরী তহবিলের হিসাব দেখা যাক্। সংখ্যাগুলি মোটামুটি দেওয়া যাইতেছে:—(১) মাদ্রাজ ৩৮¼ কোটি, (২) বোম্বাই ৩৫½ কোটি, (৩) পঞ্জাব ২৪ কোটি। জনসংখ্যার অনুপাতে কোন্ প্রদেশের কার্য্যকরী তহবিল কত আনা (টাকা নয়) তাহার হিসাব দেওয়া গেল:—(১) কুর্গ (২৭৫·৪ আনা) প্রথম, (২) বোম্বাই (২৫৮·৬ আনা) দ্বিতীয়, (৩) আজমীড়-মাড়োয়ার —(১৬২·৯ আনা) তৃতীয়, (৪) সিন্ধু (১৪৯·৮ আনা) চতুর্থ, (৫) পঞ্জাব (১২৯·১ আনা) পঞ্চম এবং (৬) বাংলা (৫৯.২ আনা) ষষ্ঠ।

কৃষি ও অ-কৃষি সমিতির তুলনামূলক অবস্থা

বাংলার মোট ৪৩,৩২০টি সমিতির মধ্যে ৩৯,৮৯৩টি কৃষি-সংক্রান্ত এবং বাকি ৩,৩০৭টি অ-কৃষি সংক্রান্ত। বাংলার কৃষি-সমিতিগুলির (১) আদায়ীকৃত মূলধন ৮৪,২৯,৯৬২ টাকা, (২) কার্য্যকরী মূলধন ৫,৭৫,৯০,৩৫২ টাকা, (৩) সংরক্ষিত তহবিল ২,০৫,৩৬,৮১৯ টাকা এবং (৪) ক্ষতি ২,৪১,৩৯৯ টাকা।

অপরপক্ষে অ-কৃষি সমিতিগুলির অবস্থা এইরূপ:—(১) মূলধন ১,৬৪,৭৭,৫১৬ টাকা, (২) কার্য্যকরী তহবিল ৮,১৩,০৭,৩১৬ টাকা, (৩) সংরক্ষিত তহবিল ৭৪,৪৯,৯৭৩ টাকা এবং (৪) লাভ ১৮,০০,৮৭২ টাকা। মূলধন, কার্য্যকরী তহবিল ও লাভক্ষতির হিসাবে দেখা যায় যে, অ-কৃষি সমিতিগুলি অধিকতর অগ্রসর। কৃষি-সমিতিগুলির ক্ষতি হইয়াছে প্রায় ২½ লক্ষ টাকা; অন্য-পক্ষে অ-কৃষি-সমিতিগুলির মোটামুটি লাভ লইয়াছে ১৮ লক্ষ টাকা; কিন্তু সংরক্ষিত

তহবিলের বেলায় দেখা যায়, অ-কৃষি সমিতির তুলনায় কৃষি-সমিতির তহবিল প্রায় তিনগুণ বেশী।

নিম্নে কতকগুলি প্রদেশের কার্য্যকরী তহবিলের হিসাব দেওয়া গেল :

	কৃষি-সমিতি	অ-কৃষিসমিতি
মাদ্রাজ	৬,৩৮,৫০,৬৮৬	১১,৪৯,১৮,৫৪৯
বোম্বাই	৪,৩৮,৫৮,১৮৪	১৬,৩১,৮৮,৮২০
পঞ্জাব	৫,৮১,৬২,১৬৮	২,৪৭,৪১,৮৯০
বাংলা	৫,৭৫,৯০,৩৫২	৮,১৩,০৭,৩১৬

এই হিসাবে দেখা যায়, মাদ্রাজে কৃষি-সমিতির তহবিল, অ-কৃষি সমিতির প্রায় অর্দ্ধেক, বোম্বাইয়ে এক-চতুর্থাংশ এবং বাংলায় প্রায় ¾ অংশ। পঞ্জাবে কৃষি-সমিতির তহবিল অ-কৃষি সমিতির তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। ইহা হইতে বুঝা যায়, একমাত্র পঞ্জাব ছাড়া আর সর্ব্বত্র কৃষি-সমিতি—অ-কৃষি সমিতির তুলনায় অনগ্রসর।

জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক

বাংলায় কোন কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক নাই। বাংলার প্রাথমিক ব্যাঙ্কসমূহের সংখ্যা ৯টি, সভ্যসংখ্যা ৩,১০৩, আদায়ীকৃত মূলধন ৮১,৬৪৪ টাকা, কার্য্যকরী তহবিল ৮,২৮,৩০৬ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ১১,১৭৯ টাকা, বিবিধ তহবিল ২৯,১৫৫ টাকা এবং লাভ ১৮,৩২০ টাকা। এই জাতীয় ব্যাঙ্কের তেমন কোন কার্য্যতৎপরতা নাই।

জীবন-বীমা কোম্পানী

বাংলায় সমবায় আইন অনুসারে গঠিত জীবন-বীমা কোম্পানীর সংখ্যা মোট ৬টি। ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ :

(১) অংশীদারদের সংখ্যা—১৭,৫১২ টাকা, (২) বীমার পরিমাণ—১,৪২,৪৫,৩২৯ টাকা, (৩) আদায়ীকৃত চাঁদা—৫,৭৯,২৪৪ টাকা, (৪) বীমাকারীর সংখ্যা—৪৭৬৭ জন, (৫) নগদ তহবিল—২১,০৭,৬৫৭ টাকা এবং (৬) মিটানো দাবির পরিমাণ—১,২৭,৮৫৯টাকা। জীবন-বীমার এই জন-প্রিয়তার দিনে এইরূপ অবস্থা যে অকিঞ্চিৎকর, তাহা বলাই বাহুল্য।

উপরে ১৯৪৫-৪৬ সাল পর্য্যন্ত অবিভক্ত বাংলার সমবায়-প্রচেষ্টার কথা মোটামুটি বর্ণনা করা হইল। ইহা পরাধীন অবস্থার চিত্র। আজ স্বাধীন দেশে এদিক দিয়া আমাদের প্রয়োজন ও দায়িত্ব দুই-ই অনেক বেশী। জনসাধারণের আর্থিক দুরবস্থার কথা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। জাতিকে সুস্থ, সবল ও কর্ম্মনিষ্ঠ করিয়া তুলিতে হইলে, শতকরা ৯০ জন গ্রামবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন আশু কর্ত্তব্য। কেবল বড় বড় মিল মেসিনারী দ্বারা, গ্রামবাসীর অবস্থার উন্নতি করা সম্ভবপর হইবে না। গ্রাম্য জীবন যাহাতে উন্নত হয়, তজ্জন্য গ্রামীণ কৃষি ও কুটীরশিল্পের উন্নতি বিধান করিতে হইবে। জাতীয় প্রয়োজনে সহরে বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করা হোক, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু গ্রামের পুরাতন কুটীর-শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে এবং গ্রামে নূতন নূতন কুটীরশিল্পের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। যাহাতে বৃহত্তর শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও গ্রাম্য শিল্পের মধ্যে প্রতিযোগিতার পরিবর্ত্তে সহযোগিতা হয়, তদনুসারে আমাদের জাতীয় শিল্প-নীতিকে পরিচালনা করিতে হইবে। কৃষি-উন্নয়নের জন্য আমাদের উন্নত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। গ্রাম্য কৃষক প্রথমতঃ সমবেতভাবে চাষ করিতে রাজী নাও হইতে পারে। কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া সার, উত্তম বীজ ও কলের লাঙ্গলের সাহায্যে কৃষকের চাষের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। জমি কৃষকের থাকিবে। সমিতি শুধু কৃষককে সাহায্য করিবে। সমবায়-প্রথায় সর্ব্ববিধ সাহায্য প্রদান করিয়া গ্রামের কৃষি ও কুটীরশিল্পকে সজীব ও সম্প্রসারিত করিতে হইবে। সরকারী আর্থিক সাহায্য ও সমবায়-ব্যবস্থা—এই দুইয়ের যোগস্থাপন দ্বারা গ্রামাঞ্চলকে উন্নত করা সম্ভবপর। প্রয়োজনবোধে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা কঠিন হইবে না। আশা করি সরকার ও দেশের জননায়কগণ এই বিষয়ে অবহিত হইবেন। স্বাধীনতা যাহাদের জন্য, তাহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত স্বাধীনতার কোন অর্থ হয় না।

ভারত-সভ্যতায় বাঙালী মৎস্যেন্দ্রনাথের দান

শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার

ডক্টর শহীদুল্লাহ্ বলেন—"পূর্ব্ববাংলার বিশেষ গৌরব এই যে, এই দেশ থেকেই বাংলা সাহিত্য ও নাথপন্থের উৎপত্তি হয়েছে। মৎস্যেন্দ্রনাথ যেমন বাংলার আদিম লেখক তেমনি তিনি নাথপন্থের প্রবর্ত্তক। তাঁর নিবাস ছিল ক্ষীরোদসাগরের তীরে চন্দ্রদ্বীপে, বর্ত্তমানে সম্ভবতঃ যাকে সন্দ্বীপ বলে।"

তিনি আরও বলেন—"মীননাথ বাঙালী। তাঁর নামান্তর মীনপদ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, মচ্ছিন্দ্রনাথ, মৎস্যেন্দ্র পাদ, মচ্ছেন্দ্র পাদ। নাথপন্থার আদি প্রচারক এই মীননাথ। বাঙালীর এটা একটা গৌরবের বিষয় যে একজন বাঙালী (মীননাথ) গোটা ভারত-বর্ষকে একটা ধর্ম্মমত দিয়েছিলেন।"

ঐতিহাসিক কোর্ডিয়ার তাঁহার প্রকাশিত তন্ত্রের তালিকায় মৎস্যেন্দ্রনাথকে বাঙালী বলিয়াছেন। উইলসন বলেন, মৎস্যেন্দ্র-নাথ বঙ্গের উত্তর বা পূর্ব্ব অংশের লোক। তিনি মৎস্যদেশের সিদ্ধপুরুষ বলিয়া মৎস্যেন্দ্রনাথ নামে খ্যাত হইয়াছেন। বগুড়া জেলার উত্তরাংশ হইতে দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ স্থান মৎস্যদেশ নামে খ্যাত ছিল (বগুড়ার ইতিহাস—ভূমিকা, ৫৬ পৃঃ)। ভারতের বাহিরে তিনি লোকেশ্বর, অবলোকিতেশ্বর, লোকনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ (Inscription from Nepal in *Indian Antiquary*, vol. IX), এবং কানসাইন (*J. R A. S.*, vol. XV., p. 333. 1883) নামে পরিচিত ও পূজিত হইতেছেন। হডসন সাহেব বলেন, নেপালীরা মৎস্যেন্দ্রনাথ ও আর্য্যাবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি বোধিসত্ত্বকে অভিন্ন বলিয়া বিশ্বাস করে (*Hodgson's Essays*, vol. II, p. 41)।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন—"নেপালীরা মৎস্যেন্দ্রনাথকে অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া তাঁহার পূজা করে"—(বৌদ্ধ গান ও দোঁহা"—ভূমিকা, ১৬ পৃঃ)। নিত্যাহ্নিকতিলকে (লিপিকাল—১৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দ) লেখা আছে, মৎস্যেন্দ্রনাথের "বরণা বঙ্গিদেশে" জন্ম। কৌলজ্ঞান নির্ণয়ে তাঁহাকে "চন্দ্রদ্বীপবিনির্গত" বলা হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনুমান—কৌলজ্ঞান নির্ণয় ৯ম খ্রীঃ অব্দের মধ্যভাগের লেখা। কিন্তু অধ্যাপক ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী অনু-মান করেন ইহা ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। তবে মনে হয়, এই অনুমান ঠিক নহে। মৎস্যেন্দ্রনাথের সময় নিঃসন্দেহে স্থির করা হইয়াছে—৫২২ খ্রীষ্টাব্দ (প্রবাসী—চৈত্র, ১৩৫৫) তাহা হইলে ইঁহাকে ৬ষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দের লেখা বলিয়া ধরিয়া লওয়াই যুক্তিসঙ্গত হইবে। চন্দ্রদ্বীপ বাখরগঞ্জ জেলার প্রাচীন নাম। চন্দ্রবংশীয় রাজারা চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। ইঁহাদের নামান্তে 'চন্দ্র' পদ ছিল বলিয়া স্থানের নাম চন্দ্রদ্বীপ হয়—(*Indian Historical Quarterly*, vol. XVI No 3)। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ত্রিপুরা শাখার ৫ম বার্ষিক অধি-বেশনের সভাপতির অভিভাষণে একটি ছড়ার উল্লেখ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, ইহা যদি সত্য হয় তবে মীননাথও ময়নামতীর লোক। কিন্তু নাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ চন্দ্রদ্বীপের লোক বলিয়া লিখিত হইয়াছে। নাথসিদ্ধাদের কর্ম্মক্ষেত্র ময়নামতীর পাহাড়ে ছিল। এখানে নাথসিদ্ধা জালন্দর বা হাড়িপা নাথ রাজা গোপীচাঁদকে দীক্ষা দিয়াছিলেন।

ধর্ম্মজগতে মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথের স্থান অতি উচ্চে ছিল। বাঙালী নাথসিদ্ধা মীননাথ আজও নেপাল তিব্বত প্রভৃতি স্থানে মঙ্গলদেবতার আসনে অধিষ্ঠিত আছেন। নেপালের মৎস্যেন্দ্রনাথের বা বাঙ্গমতী অবলোকিতেশ্বরের মন্দির প্রসিদ্ধ। ৭৯২ নেপালাব্দে (১৬৭২ খ্রীঃ) শ্রীপঞ্চমী তিথিতে নেপালরাজ শ্রীনিবাস কর্ত্তৃক লোকনাথের মন্দিরের তোরণসহ স্বর্ণদ্বার স্থাপিত হয়। ইহার শিলালিপিতে আছে :

> "শ্রীলোকেশ্বরায় নমঃ—
> মৎস্যেন্দ্রং যোগিনাং মুখ্যাঃ শাক্তাঃশক্তিবদন্তিযং।
> বৌদ্ধাঃ লোকেশ্বরং তস্মৈনমোঃ ব্রহ্মস্বরূপিণে॥
> নেপালাব্দে লোচনাচ্ছিদ্রসপ্তে
> শ্রীপঞ্চম্যাং শ্রীনিবাসেন রাজ্ঞে
> স্বর্ণদ্বারং স্থাপিতং তোরণেন
> স্বার্দ্ধং শ্রীলোকনাথস্ত গেহে।"

(Inscription from Nepal in *Indian Antiquary*—vol. IX)।

অর্থাৎ, যোগিশ্রেষ্ঠগণ যাঁহাকে মৎস্যেন্দ্র বলেন, শাক্ত-গণ যাঁহাকে শক্তি কহেন এবং বৌদ্ধগণ যাঁহাকে লোকেশ্বর বলেন সেই ব্রহ্মস্বরূপ লোকেশ্বরকে প্রণাম করি।

চীন-পর্য্যটক হুয়েন সাঙ্ বলেন, মৎস্যেন্দ্রনাথ নেপাল ও তিব্বতের জাতীয় দেবতা। লাসা নগরীর কথিত কাঞ্চনির্ম্মিত মৎস্যেন্দ্রনাথের মূর্ত্তি আজও দর্শকের যুগপৎ ভক্তি ও বিস্ময় উৎপাদন করে। যদি কেহ মৎস্যেন্দ্রনাথকে দর্শন করিবার মানসে যথারীতি উপবাস করিয়া একমনে তাঁহাকে ডাকে তবে মৎস্যেন্দ্রনাথ নাকি প্রতিমা হইতে জ্যোতির্ম্ময় রূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। হুয়েন সাঙ্ আরও বলেন—তিনি যখন ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন সে সময় তিনি ভারত-ভূমি ব্যাপিয়া মৎস্যেন্দ্রনাথের পূজা হইতে দেখিয়াছেন। চীন-সাম্রাজ্যের চুসান দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত পুটোদ্বীপের মৎস্যেন্দ্রনাথের মন্দির প্রসিদ্ধ। ইঁহার মূর্ত্তি ভুটান, বালি ও যবদ্বীপেও দৃষ্ট হয়।

হড্‌সন সাহেব বলেন, রাজা নরেন্দ্রদেব বাঘপত্তনের রাজা হন। তিনি বন্ধুদত্ত আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। স্বীয় রাজ্যের দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য আর্য্যাবলোকিতেশ্বরকে তিনি আসামের পুতলক পর্ব্বত হইতে আমন্ত্রণ করিয়া নেপালের ললিতপত্তনে আনয়ন করেন। পাদটীকায় তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, এই অবলোকিতেশ্বরই কি মৎস্যেন্দ্রনাথ, খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে যাঁর নেপালে আগমনবার্ত্তা বিখ্যাত স্মৃতিকলকের শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছিল (*R.A.S.J. series*, VII, part I, page 137)। ঐ অবলোকিতেশ্বরই যে মৎস্যেন্দ্রনাথ তাহা বিখ্যাত চীন-পর্য্যটক হুয়েন সাঙ্‌ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, অবলোকিতেশ্বরের মন্দিরকে লোকে মৎস্যেন্দ্রনাথের মন্দিরও বলিয়া থাকে—(*Indian Antiquary* vol. IX, page 169)। হড্‌সন সাহেবের *Language, Literature and Religion of Nepal and Tibet* গ্রন্থেও এ সম্বন্ধীয় বিবরণ আছে। হুয়েন সাঙ্‌ প্রণীত এবং রেভারেণ্ড বিল সাহেব অনূদিত সি-য়ু-কী গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৩৯, ৪১, ৬০, ১২৮, ১৬০, ২১২ পৃঃ এবং ২য় খণ্ডের ১০৩, ১১৬, ১২৯, ১৭২, ১৭৩, ২১৪, ২২৫ ও ২৩৩ পৃষ্ঠায় নাথধর্ম্ম ও মৎস্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় অনেক বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

নাথযোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত নাথধর্ম্মের সংমিশ্রণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে হড্‌সন বলেন, "Mytsyendranath is the introducer of Nathism into Buddhism," অর্থাৎ মৎস্যেন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্ম্মে নাথধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। মনীষী টুচি বলেন, "Nath Siddhas tried to harmonise Buddhism and Hinduism", অর্থাৎ, নাথসিদ্ধারা বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন।

মৎস্যেন্দ্রনাথ বৃহত্তর ভারতের হিন্দুসমাজের অন্যতম ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন। শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র "সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীকের" চতুর্বিংশতি অধ্যায়ে দেখা যায়, বুদ্ধদেব অবলোকিতেশ্বর বা মৎস্যেন্দ্রনাথের গুণগান করিয়া বলিতেছেন—"ইনি অর্থাৎ মৎস্যেন্দ্রনাথ সর্ব্বজীবের পরিত্রাণের জন্য বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এইজন্যই তিনি কখনও বুদ্ধ, কখনও বিষ্ণু, কখনও ব্রহ্মা আবার কখনও শিবের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন।" সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীকের পরবর্ত্তী বৌদ্ধশাস্ত্র "কায় ও ব্যূহে" বুদ্ধ বলিতেছেন, "যে ব্যক্তি যে ধর্ম্ম পালন করেন মৎস্যেন্দ্রনাথ তাঁহাকে সে ধর্ম্ম শিক্ষা দেন। তিনি বুদ্ধ হইয়া বৌদ্ধদিগকে এবং শিব হইয়া হিন্দুদিগকে শিক্ষা দেন।" বৌদ্ধশাস্ত্রে মৎস্যেন্দ্রনাথকে বুদ্ধ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব বলা হইয়াছে। লোকেশ্বর শিলালিপিতে মৎস্যেন্দ্রনাথকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া প্রণাম করিতেও নেপালরাজকে দেখা গিয়াছে।

প্রবন্ধের আরম্ভেই বলিয়াছি যে, ডাঃ শহীদুল্লাহ্‌ মীননাথকে বাংলা ভাষার আদি লেখক বলিয়া মনে করেন। মীননাথের লেখা চারি ছত্রের একটি শ্লোক বৌদ্ধগানের টীকায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সে শ্লোকটি এই—

> "কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
> কর্ম্ম কুরঙ্গ সমাধিক পাট।
> কমল বিকশিল কহিহন ভমরা
> কমল মধু পিবিবি ধোকেন ভমরা।"

ডাঃ শহীদুল্লাহ্‌ বলেন, "এই শ্লোকে 'পরমার্থের,' 'বিকশিল' আধুনিক বাংলা রূপের সমান। শব্দ ও ব্যাকরণ বিচারে আমরা একে প্রাচীন বাংলাই বলব"। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতেও, "এইটি সত্যই মীননাথের লেখা * * * খাস বাংলা, এখনও বুঝিতে কষ্ট হয় না।"

পণ্ডিতদের অভিমত এই যে, বাংলা ভাষা কবিতাকারে সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। মীননাথের লেখা কবিতা হইতে প্রমাণিত হয় তিনি শুধু বাংলা ভাষার আদি লেখক নহেন, তিনি বাংলার আদিকবিও বটেন।

হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২নং বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৩০। মূল্য—আট আনা।

এই পুস্তিকাখানি রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত "বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ" নামক পুস্তকাবলীর অন্তর্ভুক্ত। জ্ঞান-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী এই পুস্তকাবলীর লেখক, এবং বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষও এই পুস্তকাবলী প্রকাশপূর্ব্বক জ্ঞান-বিস্তারে সাহায্য করিয়া বাঙালী পাঠকসাধারণকে অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন।

মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসে যে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের চেষ্টা হইয়াছিল, পণ্ডিতপ্রবর ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় সেই পথে আমাদের দিশারী। দাদু, কবীর, রজ্জব প্রভৃতি নব ভাব-প্রবর্ত্তকগণের সাধনার পরিচয়-দান সেন মহাশয় জীবনে অন্যতম ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মুসলমান সাধক ও ব্যবসায়ীদের সাধনা ও কর্ম্মের ভিতর দিয়া ইসলামের আদর্শ ভারতের দ্বারপ্রান্তে প্রবহমাণ হয়, তার পর তাহারা আসে রাজদণ্ড হাতে। ফলে দেখা দেয় সজ্ঘর্ষ।

সব সজ্ঘর্ষেরই অবসান সমন্বয়-চেষ্টায়। সে যুগের সজ্ঘর্ষেও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। সেই তথ্যই লেখক বিভিন্ন হিন্দু-মুসলমান সাধকের নানা কথা উদ্ধৃত করিয়া আমাদের শুনাইয়াছেন। কিন্তু এই পুস্তিকা পাঠকালে একটা প্রশ্ন সর্ব্বক্ষণ মনে জাগিয়াছে। এত সাধু-সন্তের সাধনা হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের জীবনে ব্যর্থ হইল কেন তার সন্ধান এই পুস্তকে পাইলাম না। রোগের নিদান নির্দ্দেশ করিতে হইলে অনেক সময় অপ্রিয় সত্য বলিতে হয়। এই সত্য সহ্য করিতে না পারিলে ভারত ও পাকিস্থান এই দুই রাষ্ট্রের কোনটিরই মঙ্গল নাই।

পুস্তিকার ২৩ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই দাদুর একটি দোঁহা: "হিন্দু মুসলমান দুই হাত।" "দুই হাত একত্র না হইলে কেমন করিয়া অমৃতের অঞ্জলি রচিত হইবে?"...তিন শত বৎসর পরে আলীগড়ের সৈয়দ আহম্মদের মুখে শুনিতে পাই, "হিন্দু ও মুসলিম ভারতমাতার দুই চক্ষু।" অথচ আশ্চর্য্য যে এই সৈয়দ আহম্মদের সময়েই রাজনীতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ তীব্রতর হইয়া দ্বি-জাতিতত্ত্বের গোড়াপত্তন হয়। কেন এমন করিয়া ভাব-সমন্বয় ও রীতি-নীতির সমন্বয়ের আদর্শ ব্যর্থ হইল তাহাই হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্মুখে সমস্যা-রূপে দাঁড়াইয়া আছে। এই প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া প্রাকৃত জন আমরা অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছি।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

বিপ্লবী বিবেকানন্দ—বিজয়গোপাল। প্রকাশক—শ্রীঅতুল চন্দ্র বিশ্বাস, ১৪ অনাথ দেব লেন, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দের কীর্ত্তিকথা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে। এই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী শুধু বাণীর দ্বারা নহে—কর্ম্মের দ্বারাও ভারতবর্ষকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইয়াছেন। তাঁহার রচনায় পরাধীন দেশ—জাতি ও তমোগুণাশ্রয়ী মানুষের স্বরূপটি উদ্ঘাটিত হইয়াছে এবং সর্ব্ববিধ বন্ধনমোচন ও জড়ত্ব-পরিহারের মন্ত্রটিও হইয়াছে উচ্চারিত। ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন হইলেও সম্মুখে তার বহু সমস্যা—পথ-ভ্রান্তির সম্ভাবনা পদে পদে। স্বামীজীর বাণী পড়িতে পড়িতে মনে হয়—সেবাধর্ম্ম, সহযোগিতা, বীর্য্যবত্তা, সত্যাশ্রয় প্রভৃতি সদ্গুণরাজি আমাদের জীবনদর্শনে ও জীবনগঠনে সর্ব্বোত্তম সহায়। ভাবজগতে বিপ্লবসৃষ্টিকারী বিবেকানন্দের বহু মূল্যবান বাণী সুচিন্তিত মন্তব্যের সঙ্গে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া লেখক নিঃসন্দেহে জনসমাজের কল্যাণসাধন করিয়াছেন।

আরব্য উপন্যাস—শ্রীঅশোক গুহ অনূদিত। এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম চার টাকা।

সকল বয়সের মানুষই গল্প শুনিতে ভালবাসে এবং পৃথিবীর সব জাতির মধ্যেই গল্প শুনাইবার লোকেরও অভাব নাই। যে জাতির সভ্যতা যত প্রাচীন তাহার কথা-সাহিত্য সেই পরিমাণে সমৃদ্ধ। বিশ্বসাহিত্যে আরব্য-রজনীর কাহিনীগুলিও যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। পৃথিবীর এক একটি ভাষায় অন্ততঃ একবার করিয়াও ইহার অনুবাদ হইয়াছে; বাংলা ভাষাতেও ইহার কয়েকটি ভাল অনুবাদ আছে। আলোচ্য অনুবাদটিও—লেখকের সাবলীল ভাষা, গল্পগুলিকে মিষ্ট করিয়া গুছাইয়া বলার ভঙ্গী এবং যে গল্পগুলি বেশীর ভাগ পাঠকের মনকে আকর্ষণ করে সেগুলিকে বাছিয়া লওয়ার দক্ষতা প্রভৃতি কয়েকটি কারণে উল্লেখযোগ্য হইয়াছে। এই ভাবে সুনির্ব্বাচিত গল্পের সংখ্যা পঁচিশ—এবং তাহার সঙ্গে সুন্দর ছবির সমাবেশও অজস্র। প্রচ্ছদপটের ছবিতেও সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পগুলি ইংরেজী হইতে অনূদিত হইলেও গল্পের রস গ্রহণে বিন্দুমাত্র বাধা জন্মায় না মূল ভাষার ভাবানুসরণে ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিয়াছে কিনা এ প্রশ্ন মনে জাগে না, কেননা কিশোরদের জন্য লিখিত হইলেও গল্পগুলি সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকের মনোরঞ্জন করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শেষ মিনতি—শ্রীসন্তোষকুমার বিশ্বাস। বিশ্বাস ভবন, ২৭বি প্যারীমোহন সুর লেন, কলিকাতা। মূল্য ৩৷৹ আনা।

গল্প উপন্যাস মোটামুটি কয়েকটি কারণে পাঠক-চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। ঘটনাবিন্যাসের কৌশল, পুরাতন জিনিষকে মনোজ্ঞ করিয়া বলার ভঙ্গি বা বিষয়বস্তুতে নূতন বিপ্লবী চিন্তার সমাবেশ এইগুলি সার্থক রচনার লক্ষণ। অবশ্য এই সমস্তের সঙ্গে লেখকের বাস্তব অনুভূতি ও জীবনদর্শনের রূপটি নিহিত থাকে এবং বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনা-সংস্থাপনার মধ্য দিয়া কাহিনীটি পরিস্ফুট হয়। আলোচ্য উপন্যাসখানিতে এইগুলির অভাব পরিলক্ষিত হইল। বহুব্যবহৃত উপকরণ লইয়া গতানুগতিক কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে এবং চরিত্রগুলি বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই বলিয়া পাঠকের মনে রেখাপাত করে না। এই ধরণের রচনার সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন—শ্রীনীহাররঞ্জন রায়। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

গ্রন্থকারের বিস্তৃত 'বাঙালীর ইতিহাসে' আলোচিত একটি বিশেষ বিষয় স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল গ্রন্থ সংগ্রহ ও আলোচনা করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তাই গ্রন্থের যে অংশ বিশেষ করিয়া সাধারণের উপযোগী ও কৌতুহলোদ্দীপক তাহা পৃথক ভাবে প্রচারিত হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়। তাহা ছাড়া, ইহা হইতেই মূল গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা জন্মিবে। লেখকের লেখার ভঙ্গী সুন্দর—গল্পের মত করিয়া তিনি প্রাচীনকালের বাঙালীর আহার-বিহার, যান-বাহন, ঘর-বাড়ি, তৈজসপত্র, বসন-ভূষণ প্রভৃতি বিষয় যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সত্যসত্যই চিত্ত আকৃষ্ট করে। মনে হয়, গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধির আশঙ্কায় গ্রন্থকার সকল স্থলে তাঁহার উক্তির প্রমাণ যথাযথ ভাবে নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। ফলে জিজ্ঞাসু পাঠককে অনেক সময় হতাশ হইতে হয়। যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ হওয়া অসম্ভব নহে। তবে অনেক স্থলে গ্রন্থকারকৃত সংস্কৃত শ্লোকের অর্থ ঠিক সমীচীন হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। বিধবাদের সিন্দুরত্যাগের যে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে (পৃঃ ২৪) তাহাতে সিন্দুর-শোভিত কেশকলাপের একটি অপরূপ বর্ণনাই পাওয়া যায়। সিন্দুর ত্যাগের কোনও ইঙ্গিত তাহার মধ্যে দেখা যায় না। গ্রন্থমধ্যে—বিশেষ করিয়া ইহার সংস্কৃত অংশে অনেক বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে। 'সন্ধোক্ত', 'ব্যাদিত মুখ জুতা' প্রভৃতি প্রয়োগের যৌক্তিকতা বিচার্য্য।

ভাষাগীতা—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ। মহাজাতি প্রকাশক ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য এক টাকা আট আনা।

আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু সমাজে, হিন্দুর বিচিত্র শাস্ত্রগ্রন্থরাজির মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাই বোধ হয় সর্ব্বাধিক সম্মানিত ও সমাদৃত। তাই ইহাকে সর্ব্বসাধারণের সুখবোধ্য ও সুপরিচিত করিবার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করা হইয়াছে ও হইতেছে। বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদসহ ইহার বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে—নানা ভাষায় ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা, টীকা-টিপ্পনী ও আলোচনা প্রচারিত হইয়াছে। তবে বেশীর ভাগ লোক শ্রদ্ধা ও ভক্তি-প্রণোদিত হইয়াই এই গ্রন্থ অনুশীলন করেন—অল্প লোকই বুদ্ধির সাহায্যে ইহার দুরূহ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করেন বা করিতে পারেন। সেইজন্য যথাসম্ভব সরলভাবে ইহার সারমর্ম্ম বুঝাইবার প্রয়াস পাইতে হয়। এই কারণে আলোচ্য গ্রন্থে মূল সংস্কৃত বাদ দিয়া কেবল বাংলা অনুবাদ সঙ্কলিত হইয়াছে—অর্থ পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে অনুবাদ আক্ষরিক না করিয়া ভাবানুগ করা হইয়াছে। ফলে অনেক স্থলে ইহা বেশ সুখপাঠ্য হইয়াছে। গ্রন্থকারের আশা—অল্পবয়স্ক পাঠকেরাও ইহার সাহায্যে গীতার মর্ম্ম মোটামুটি ভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে। এই আশা কতটা সফল হইবে বলিতে পারি না। বস্তুতঃ গীতা বা তজ্জাতীয় গ্রন্থ অপরিণত-বুদ্ধি শিশুর জন্য রচিত হয় নাই। তবে সকল গ্রন্থেরই শিশু-

সংস্করণ প্রকাশ করা বর্ত্তমানে একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার ফলে শিশুরা না হউক তাহাদের পিতামাতারা যে কতকটা উপকৃত হইতে পারেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

মহর্ষি রমণ—শ্রীবিভূপদ কীর্ত্তি। রমণ আশ্রম—তিরুভেন্ন-মালাই, মান্দ্রাজ। পৃ ১৭২। মূল্য তিন টাকা।

এই সুলিখিত সচিত্র জীবনীটি ভারতের বর্ত্তমান কালের এক মহাপুরুষের পরিচয় বহন করিতেছে। লেখকের সাহিত্য-বুদ্ধি জীবনীটিকে চিত্তাকর্ষক করিয়া মহর্ষি রমণ সম্পর্কে আমাদের আরও বিশদভাবে জানিবার আগ্রহ জাগাইয়াছে। ইঁহার শিক্ষা ও উপদেশ পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সমারসেট মমের মত বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক এবং পল ব্রাণ্টনের মত সাধক নানা ভাবে ইঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। গত ১৪ই এপ্রিল ১৯৫০ রাত্রিতে এই মহাপুরুষ দেহরক্ষা করিয়াছেন। জীবিতকালে ইনি সুকৌশল প্রচারের দ্বারা চমকের সৃষ্টি করেন নাই—নিভৃত সাধনা এবং সাধনলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা মানুষকে উন্নত করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার জীবনী ও উপদেশ আলোচনার যোগ্য।

ব.

রবীন্দ্রনাথ : প্রথম পর্ব্ব—শ্রীঅশোক সেন। এইচ. সরকার এণ্ড সন্স, ৩এ, লাইব্রেরী রোড, কালীঘাট, কলিকাতা ২৬। মূল্য ৩৲

রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনায় অনেক স্থলে অবান্তর বাগ্‌বিন্যাস, অথবা মূল কবিতার গদ্যে রূপান্তর মাত্র দেখিতে পাই। সুখের বিষয়, বর্ত্তমান গ্রন্থের আলোচনা এরূপ গতানুগতিক নহে। জোর করিয়া সহজ কবিতার কোনও জটিল অর্থ বাহির করিবার চেষ্টা কিংবা অযথা পাণ্ডিত্য প্রকাশের প্রয়াস নাই। শ্রদ্ধা সহকারে লেখক রবীন্দ্রকাব্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বুঝাইতে যত্ন করিয়াছেন এবং তাহাতে সফলকাম হইয়াছেন। বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করিবার জন্য যেখান হইতে যতটুকু উদ্ধৃতির প্রয়োজন, ততটুকুই মাত্র তিনি তুলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টি ও প্রকাশের স্বচ্ছতা প্রীতিকর। 'সৌন্দর্য্যের পূজারী', 'গতিবেগ' এবং 'পূরবী'—গ্রন্থের এই তিনটি বিভাগ। বস্তুতঃ রবীন্দ্রকাব্যের বিকাশধারার বিশিষ্ট পরিচয় এই বিভাগত্রয়ে পরিস্ফুট। গ্রন্থারম্ভে সংশ্লিষ্ট শ্রীক্ষিতিমোহন সেনের সুদীর্ঘ পত্রখানি নানা মূল্যবান্ তথ্যে পরিপূর্ণ এবং রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনায় সহায়ক। দেশী ও বিদেশী সাহিত্যের সহিত লেখকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং সহজ কাব্য-রসবোধ আছে—এ গ্রন্থে রসিক পাঠক তাহার প্রমাণ পাইবেন।

ছোটদের বার্ণার্ড শ'—শ্রীমণি বাগচি। কমলা বুক ডিপো, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ২৲।

এমন সুন্দর সরস চিত্তাকর্ষক জীবনী গ্রন্থকারের বিশেষ ক্ষমতার পরিচায়ক। সাহিত্যিকের জীবনী প্রায়ই নানা কারণে কঠিন ও জটিল হইয়া উঠে। কিন্তু লেখক চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে শ'য়ের জীবন-কথা লিখিয়াছেন এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বকেও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। প্রধানতঃ ছোটদের জন্য লিখিত হইলেও বয়স্কেরাও এ গ্রন্থ পড়িয়া আনন্দ পাইবেন এবং উপকৃত হইবেন।

যুগশঙ্খ—শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী। খাগড়া বিমলারঞ্জন পাব্লিশিং হাউস, মুর্শিদাবাদ। মূল্য ১৲।

দেশের তরুণ শক্তির জয়গান। আধুনিক গদ্যছন্দে লেখা কয়েকটি কবিতা। ভাষা জোরালো, মাঝে মাঝে তাহাতে বিদ্রূপের চমক লাগিয়াছে। মনে হয়, কবি-কণ্ঠ ছাপাইয়া বক্তার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইতেছে।

স্বর্ণরেখা—শ্রীপ্রশান্তনাথ রায়। ভারতী ভবন, ২০৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম দেড় টাকা।

কল্পনার স্বচ্ছন্দ লীলা, ভাষার সহজ প্রবাহ, কবিত্বের স্নিগ্ধ স্পর্শ বড়ই তৃপ্তিকর বোধ হইল। ভাবের ও প্রকাশভঙ্গীর স্বাভাবিকতা আজ বিরল হইয়া উঠিয়াছে, তাই এই কবিতাগুলির সুন্দর সাবলীল গতি বিশেষ করিয়া ভাল লাগিল।

"যদি কোন্ মায়াবী আলোক
দুরান্তের স্বপ্ন বহি' আজ চোখে রচে মায়ালোক"

তবেই কাব্য-পিপাসুদের আনন্দ হইবার কথা; ধূম-কালিমার আকাশের স্বর্ণরেখা আজিও ঢাকা পড়ে নাই জানিয়া তাঁহারা আশ্বস্ত হইবেন।

ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষের জীবন-কথা—শ্রীপ্রভাত বসু। মূল্য দুই টাকা।

বিদ্যাসাগর কলেজের খ্যাতনামা অধ্যক্ষ পরলোকগত বিমলচন্দ্র ঘোষের নাম এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট সুপরিচিত। তাঁহার বহুমুখী অনুসন্ধিৎসা এবং স্বাভাবিক কর্ম্মপ্রবণতা ও ধর্ম্মানুরাগ সকলের মনে শ্রদ্ধা জাগাইত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে যে আদর্শবাদ ও কর্ম্মপ্রেরণার সঞ্চার করিয়াছিল, তাহার আংশিক পরিচয় এই শিক্ষাব্রতীর জীবন-কথায় মিলিবে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দুষ্ক্রিয়ের সন্ধানে—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস। প্রাপ্তিস্থান—৫৫বি বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২৭। মূল্য ।০ আনা।

ইংরেজী "ক্রাইম" অর্থে লেখক "দুষ্ক্রিয়া" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। যুক্তিদ্বারা দেখাইয়াছেন যে, অনেক সময় প্রচলিত ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রের বিচারে যাহা দুষ্ক্রিয়া বলিয়া নিন্দিত তাহা দ্বারা অনেক সময় অতি উচ্চাঙ্গের মহৎ কার্য্যও হইতে পারে। যথা, পরাধীন দেশের স্বদেশসেবা। শাসকগণের নিকট ইহা দুষ্ক্রিয়া 'ক্রাইম' বা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইলেও দশ এবং ন্যায়ের বিচারে স্বদেশ-সেবার কার্য্য প্রশংসনীয় ও সকলের অনুকরণীয়; সেইজন্য এক্ষেত্রে "আইনে" এবং "নীতিতে" বিরোধ লাগিয়াই আছে। ইতিহাস বলে—সক্রেটিস, খ্রীষ্ট অপরাধী বলিয়া শাস্তি পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল মহাপুরুষের"দুষ্ক্রিয়া"বা অপরাধ মানবের নৈতিক আদর্শের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। ধর্ম্মের দিক দিয়াও লেখক এই বিষয়টি সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, এক ধর্ম্মাবলম্বীর সৎকার্য্য অপর ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট হীন বা পাপকার্য্য বলিয়া নিন্দিত হয়, এজন্য যে দেশে যত দিন ধর্ম্ম রাষ্ট্রের আইন নিয়ন্ত্রিত করে, তত দিন সেখানে বিচারও এই নিরিখেই হয়। এইজন্যই লেখক বলেন, "দুষ্ক্রিয়ের পথ খুব সুগম নয়। মানুষ যাকে দুষ্ক্রিয়া বলে মনে করে, দুষ্ক্রিয়াতত্ত্ববিদের কাছে তা সুক্রিয়াও হতে পারে।...সাধারণ মানুষ ভাবপ্রবণ, ধর্ম্মভীরু এবং সমাজপ্রিয়। দুষ্ক্রিয়াতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিক। ভাবপ্রবণতার স্থান তাঁর কাছে নেই।" পাঠকগণ এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় চিন্তার খোরাক পাইবেন।

চর্ম্ম ও চর্ম্মশিল্প—শ্রীসনৎকুমার রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৪১। মূল্য এক টাকা।

পুস্তকখানি শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত। যাহাতে যুবকগণ বিবিধ শিল্প-শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করিয়া দেশের শিল্পসম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা করে এবং সেই সঙ্গে অন্ন-সংস্থানের নূতন নূতন পথ খুলিয়া যায় এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া বহু প্রতিষ্ঠান ইদানীং কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। শিক্ষিত লোকের হাতেই অবজ্ঞাত শিল্প ও ব্যবসায়গুলি নবজীবন লাভ করিবে। আমাদের 'চর্ম্ম' শিল্পেরও ভবিষ্যতে বিপুল উন্নতির সম্ভাবনা আছে। পূর্ব্বে বহু কাঁচা চামড়া বিদেশে রং করিয়া পাকা হইবার জন্য রপ্তানী হইত। ঐ কাঁচা মালই আবার বহু মূল্যবান হইয়া এ দেশে আমদানী হইত। দেশে চর্ম্ম যথেষ্ট পরিমাণে পাকা করিতে পারিলে শিল্পোন্নতি ও শ্রমিকদের কর্ম্মে নিয়োগ দুই সমস্যারই কতকটা সমাধান হওয়া সম্ভব। এই কার্য্যে দেশ যতই অগ্রসর হইবে ততই মঙ্গল। যাঁহারা চর্ম্ম ও চর্ম্মশিল্প সম্বন্ধে জানিতে চান এবং যাঁহারা এই শিল্প শিক্ষাভিলাষী অথবা যাঁহারা বর্ত্তমানে এই বিভাগে কাজ করিতেছেন তাঁহারা সকলেই এই পুস্তক পড়িয়া উপকৃত হইবেন।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

বিপ্লবের তপস্যা—শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী। বিমলারঞ্জন প্রকাশন, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ। মূল্য—২৲।

বৈপ্লবিক আন্দোলনের পটভূমিকায় লিখিত উপন্যাস। ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রকে পুরোভাগে রাখিয়া পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। একুশে ফেব্রুয়ারীর ভারতব্যাপী বিপ্লবের আয়োজন পণ্ড হইয়া যাইবার পরবর্ত্তী সময় হইতে উপন্যাসের কাহিনীর আরম্ভ।

বিপ্লব তপস্যার বস্তু—ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা বিপ্লবপন্থীদের কাছে তুচ্ছ—জীবন ইহাদের কাছে দুই দিনের, একজন চিরতরে চলিয়া যাইবে পরমুহূর্ত্তেই শূন্য স্থান নূতনের দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠিবে। কথাগুলির মধ্যে যে অতিরঞ্জন নাই তাহা ডাঃ যাদুগোপাল প্রমুখ বিপ্লবী নেতা ও তাঁহাদের সহকর্ম্মীদের কার্য্যকলাপ প্রমাণ করিয়াছে।

বিপ্লবযুগের বাস্তব ঘটনাগুলি জিতেশ বাবুর লেখনী স্পর্শে সুন্দর ও শক্তিময় রূপ পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে। লেখকের সহজ সাবলীল রচনাভঙ্গী মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।

আউট্ স্কেচেস্—শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত। ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

সমালোচ্য পুস্তকখানিতে খাঁটিতে ভেজাল, ট্র্যাজিক্, ছোঁয়াচে রোগ, প্রভৃতি দশটি গল্প স্থান পাইয়াছে। গল্পগুলি আকৃতিতে ছোট—প্রকৃতিতে চিত্রধর্ম্মী। কয়েকটি গল্প উপভোগ্য হইয়াছে।

স্থানে স্থানে লেখকের শিল্পী মনের অনুভূতি বড় সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ভাষায় এবং প্রকাশ ভঙ্গীতেও জড়তা নাই।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

বরাহমিহির—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী। ক্যালকাটা বুক এজেন্সী, ৭নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য তিন টাকা।

লেখক ইতিপূর্ব্বে 'গ্রহরত্ন বিজ্ঞান' এবং 'লঘু-পারাশরী রহস্য' নামক জ্যোতির্বিদ্যা-বিষয়ক দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়া জ্যোতিষ-শাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি এবং মৌলিক গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমান পুস্তকখানিতে তিনি প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ বরাহমিহিরাচার্য্য সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বইখানি পূর্ব্ব ভাগ এবং উত্তর ভাগ এই দুইটি অংশে বিভক্ত।

বরাহ, মিহির এবং খনা এই তিন জনকে লইয়া অনেক ঐতিহ্য-বিরুদ্ধ গালগল্প প্রচলিত আছে। সেগুলিকে অবলম্বন করিয়া বাংলা ভাষায় কয়েকখানি পুস্তকও রচিত হইয়াছে, কিন্তু লেখক পূর্ব্বভাগে চারিটি অধ্যায়ে নানা বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করিয়া এই সমস্ত কাহিনী যে অনৈতিহাসিক তাহা প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং উত্তরভাগে চারিটি অধ্যায়ে বরাহ মিহির সম্বন্ধে স্বীয় গবেষণালব্ধ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লেখকের প্রতিপাদ্য এই যে, বরাহমিহির একই ব্যক্তি। অনেক জ্যোতিষীই বরাহমিহিরকে বরাহ ও মিহির এই দুই নামে বিভক্ত করিয়া অনেক গল্প-কথার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, মিহির বরাহের

পুত্র। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে সংগ্রহ-জ্যোতিষের প্রবর্তক, বৃহজ্জাতক ইত্যাদি জ্যোতিষিক পুস্তক-রচয়িতার নাম বরাহমিহির—তাঁহার সহিত খনা মিহিরের কোন সম্বন্ধ নাই। লেখক এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, খনা ও মিহির ছিলেন বঙ্গদেশের লোক এবং এই দুজনের মধ্যে স্বামীস্ত্রী সম্বন্ধ থাকাও অসম্ভব নহে। কিন্তু বরাহমিহির সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। "তাঁহার জন্ম মগধে হওয়াই সম্ভব এবং শেষে উজ্জয়িনীতে অবস্থান করিতেন।"

গ্রন্থকার পুস্তকের পরিশিষ্টে বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের কর্মসচিবের নিকট লেখা পত্রখানি সন্নিবিষ্ট না করিলেই ভাল করিতেন। ইহা নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

আত্মসমর্পণ যোগ বা সরল যোগপন্থা—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন। ৫৫নং সুবারবন স্কুল রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ৸৵+২১৩ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই টাকা।

'মানুষ চায় সুখ দুঃখ আসে কেন?' হইতে আরম্ভ করিয়া 'আত্মসমর্পণ ও পরমাত্মলাভ' পর্যন্ত চৌদ্দটি অধ্যায়ে প্রথম খণ্ড এবং 'প্রাণতত্ত্ব ও প্রাণের স্বরূপ' হইতে 'গীতার কৃষ্ণ ও চণ্ডীর মহামায়া অভেদ' পর্যন্ত দশটি অধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ড—এই দুই খণ্ডে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ।

পুস্তকখানিতে সাধন-রহস্য এবং দুরধিগম্য শাস্ত্রমর্ম এমন সরলভাবে স্তরে স্তরে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, নিতান্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও গ্রন্থপাঠে সাধনপথ অবলম্বনের একটা সহজ, স্বাভাবিক এবং স্পষ্ট নির্দেশ পাইবেন। গ্রন্থকারের অভিমত একদেশদর্শিতাবর্জিত এবং প্রাচীন শাস্ত্রীয় মত হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক সিদ্ধ মহাপুরুষদের বাক্যাবলীর আলোচনায় সমৃদ্ধ। সকল সাধন-পথেরই পরিসমাপ্তি যোগে বা মিলনে। পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ ছাড়া তাহা সম্ভব হয় না। অহঙ্কারে মত্ত নিত্যসংশয়ী জীবের পক্ষে এই আত্মসমর্পণ যে কত দুরূহ তা ভাবিয়া উঠা যায় না। সাধননিষ্ঠ গ্রন্থকারের যুক্তিসহ বর্ণনায় এই জটিল তত্ত্ব সহজ সরল ও হৃদয়গ্রাহী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আঁধারে আলো—আলোকদাতা 'ভাই'। ১২।১ কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন, কলিকাতা—২৬ হইতে শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। ৬+১০৬ পৃষ্ঠা. মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে আলোকদাতা 'ভাই' নামে কোনও প্রচ্ছন্ন সাধু-পুরুষের তেইশটি বাণী—যাহা তাঁহার ভক্তগণের উদ্দেশে রূপনারায়ণপুর আবাসে এবং ঝামাপুকুর ভবনে প্রদত্ত হইয়াছিল, সঙ্কলিত হইয়াছে।

জীবের জ্যোতির্ময় সত্তার অনুভূতি জাগাইবার উপদেশ বিশেষভাবে গ্রন্থমধ্যস্থ বাণীগুলির ভিতর সুস্পষ্ট। 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে', তাই জীব অভাব অশান্তি দুঃখদৈন্যের জ্বালায় অস্থির। যদি নিত্যমুক্ত স্বভাববান্ আত্ম-পরিচয় লাভের সৌভাগ্য তার ঘটে তবেই চিরশান্তি বা ভূমানন্দের বিমল জ্যোতিঃরাশিতে তাহার ভিতর বাহির সমুদ্ভাসিত হইবে। 'আত্মানং বিদ্ধি' মন্ত্রের সাধনায় আগ্রহ যাঁহাদের আছে, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠে আধ্যাত্মিক আলোক লাভ করিবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

জেলের খাতা—বিপিনচন্দ্র পাল। যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড, ২২০ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য দুই টাকা।

মনস্বী বিপিনচন্দ্র পালকে অরবিন্দ ঘোষ ১৯০৯ সনে "One of the mightiest prophets of Nationalism" অর্থাৎ স্বাদেশিকতার অন্যতম শক্তিমান্ ঋষি বলিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনকালে বিপিনচন্দ্রের লেখনী ও বক্তৃতা সমভাবে বাঙালী-চিত্তে শক্তি সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ১৯০৭ সনে অরবিন্দের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানে অস্বীকার করায় তিনি সরকার কর্তৃক ছয় মাসের জন্ম কারারুদ্ধ হন। বিপিনচন্দ্র এই ক'মাস বক্সার জেলে কাটান। সেখানে বসিয়া তাঁহার যে-সকল আত্মোপলব্ধি হয়, তাহাই প্রথম চিন্তা, দ্বিতীয় চিন্তা, তৃতীয় চিন্তা ও চতুর্থ চিন্তা—এই চারিটি অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছিল। ১৯১০ সনে সুসাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত হইয়া এখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় ১৯০৯ সনেই বিপিনচন্দ্রের এই প্রকার অনুভূতি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :

"He (Bipin Chandra) spoke of his realization in jail of god within us all, of the Lord within the nation, and in his subsequent speeches also he spoke of a greater than ordinary force in the movement and greater than ordinary purpose before it."

জেলের খাতায় বিভিন্ন অধ্যায়ে এই অনুভূতি এবং উপলব্ধিরই পরিচয় আমরা পাই। বিপিনচন্দ্রকে সম্যক্ বুঝিতে হইলে এই পুস্তকখানি অবশ্যই পাঠ করিতে হইবে।

সরল যোগ-ব্যায়াম—শ্রীনীরদকুমার সরকার। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

গ্রন্থকার শারীর-চর্চা বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করিয়া 'আয়রনম্যান' আখ্যা পাইয়াছেন। তিনি কৃতী ব্যায়াম শিক্ষক, তবে তাঁহার শিক্ষা-প্রণালী শুধু ছাত্রদের ভিতর নিবদ্ধ না রাখিয়া জনসাধারণের মধ্যেও প্রচারার্থ পুস্তকে এসমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। আলোচ্য পুস্তকখানিও এই পর্য্যায়ের একখানি বই। যৌগিক ব্যায়ামের বিভিন্ন প্রণালী চিত্র সহযোগে ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন। এইরূপ ব্যায়াম দ্বারা দুর্ব্বল ব্যক্তিও সবল হইয়া উঠিতে পারে। ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকেরই সবল সুস্থ হওয়া আবশ্যক। উক্ত পদ্ধতিতে এ উদ্দেশ্য প্রকৃষ্ট রূপে সিদ্ধ হইতে পারে। স্বাস্থ্য-রক্ষার কয়েকটি সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়ও পুস্তকখানির শেষ দিকে আলোচিত হইয়াছে। আধি-ব্যাধির প্রকোপে বাঙালীর শারীরিক শক্তি দিন দিন ক্ষয়ের দিকে। এই সময় এতাদৃশ পুস্তকের বহুল প্রচার জাতির পক্ষে মঙ্গলকর না হইয়া যায় না। এমন কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান কি বঙ্গদেশে নাই যাহা জনসাধারণের মধ্যে এই ধরণের হিতকর গ্রন্থাদি প্রচারের ভার লইতে পারে?

চিত্র-চিত্রণ—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, গ্রাম—কুলগাছিয়া, পোঃ—মহিষরেখা, জেলা হাওড়া, মূল্য ছয় টাকা আট আনা।

গ্রন্থকার 'প্র-না বি' এই সংক্ষিপ্ত নামে বাংলা সাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। জাতির উন্নতির পক্ষে নানা রকম প্রচেষ্টারই প্রয়োজন আছে; তাহার মধ্যে একটি বিশেষ প্রয়োজন হইল, সাহিত্যের মাধ্যমে জাতিকে তাহার দোষত্রুটিগুলিও চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া। 'প্র না-বি'র এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্য্যভার সত্ত্বেও, অন্য দিকে বাংলা সাহিত্যের সেবায় যে তিনি তৎপর হইয়াছেন, আলোচ্য পুস্তকখানিতে তাহারই আমরা আভাস পাইতেছি। ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলাদেশের পক্ষেও বিশেষ গৌরবের—বাঙালী এক দিকে যেমন বিভিন্ন দেশের নব নব ভাবধারা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে, অন্য দিকে তেমনি তাহার অতীতকেও নূতন রূপে জানিতে ও দেখিতে শিখিয়াছে। 'ভগীরথ' গঙ্গাকে আনয়ন করিয়া ভারতবর্ষকে শস্যশালিনী করিয়াছিলেন। গত শতাব্দীতে একাধিক 'ভগীরথ' জাতির বিভিন্ন দিকের উৎকর্ষসাধনে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। পরাধীনতার নাগপাশহেতু আমাদের আত্মপ্রকাশ ত্বরান্বিত হইতে পারে নাই বটে, কিন্তু ইহা একেবারে ব্যাহতও হয় নাই। স্রোতস্বিনীর সম্মুখে যতই বাধা আসে ততই ইহা বেগবতী হইয়া মুক্ত হইতে প্রয়াস পায়। মানবগোষ্ঠীর পক্ষেও এই কথা খাটে। শেষ পর্য্যন্ত নানা দিক হইতে শক্তি-সঞ্চয়পূর্ব্বক এই বাধাগুলিকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া আমরা স্বাধীনতা-লাভে সমর্থ হইয়াছি। এই শক্তির মূলাধার ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ও বাঙালী। লেখক ঊনচল্লিশ জন কৃতী পুরুষের জীবন-চিত্র ইহাতে প্রদান করিয়াছেন। কয়েকজন ইংরেজও ইহাতে স্থান পাইয়াছেন কারণ তাঁহারাও ছিলেন বাংলার জন্ম উৎসর্গীকৃতপ্রাণ। প্রত্যেকটি চরিত্রের মনোরম চিত্রও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। জীবনীগুলি কালানুক্রমিক বা বিষয়ানুক্রমিক ভাবে সাজানো হইলে এবং আর একটু তথ্যপূর্ণ হইলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে অধিকতর উপাদেয় ও সহজবোধ্য হইত। গ্রন্থের ভূমিকায় আলোচিত সকল বিষয়ের সঙ্গে একমত না হইলেও গত শতকের মূলধারা বুঝিবার পক্ষে যে উপযোগী হইয়াছে একথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। মুদ্রণ ও চিত্রণ-পারিপাট্য প্রশংসনীয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

নিরুপমা দেবী

যশস্বিনী লেখিকা নিরুপমা দেবী দীর্ঘকাল রোগভোগান্তে সম্প্রতি বৃন্দাবনধামে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৪ বৎসর হইয়াছিল।

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে নিরুপমা দেবীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা নফরচন্দ্র ভট্ট ভাগলপুরের সবজজ ছিলেন। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন ইঁহাদের প্রতিবেশীরূপে পিতার সহিত খঞ্জরপুর মহল্লায় বাস করিতেন। সাহিত্যসাধনার সূত্রে নিরুপমা ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিভূতিভূষণ ভট্টের সহিত শরৎ চন্দ্রের বিশেষ অন্তরঙ্গতা হয়। তখন শরৎ চন্দ্রকে সভাপতি করিয়া ভাগলপুরে তাঁহার বাল্যসঙ্গীরা একটি সাহিত্য-সভা স্থাপিত করেন। ঐ সভার মুখপত্র ছিল 'ছায়া' নামে একখানি হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা। সভার বৈঠকে মাঝে মাঝে নিরুপমার কবিতা অপরকর্তৃক পঠিত হইত, পরে তাহা 'ছায়া'য় প্রকাশিত হইত। এইরূপ অনুকূল পারিপার্শ্বিকে অল্প বয়সেই নিরুপমার সাহিত্য-প্রতিভার উন্মেষ হয়। শরৎ চন্দ্র তাঁহার রচনা-শক্তির তারিফ করিতেন এবং যাহাতে তাঁহার রচনার উৎকর্ষসাধন হয় সেজন্য নানারূপ নির্দেশ দিতেন। তিনি নিরুপমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং 'বুড়ি' এই ডাক নামে তাঁহাকে সম্বোধন করিতেন। অনুরূপা দেবীর সঙ্গেও নিরুপমার বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। ইঁহারা দু'জনে 'গঙ্গাজল' পাতাইয়াছিলেন।

নিরুপমার প্রথম উপন্যাস "অন্নপূর্ণার মন্দির" 'ভারতী'তে মুদ্রিত হয়। 'প্রবাসী'তে "দিদি" (১৩১৯-২০) প্রকাশিত হইবার পর তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ক্রমে

তিনি একজন বিশিষ্ট লেখিকারূপে বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিতা হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জগত্তারিণী স্বর্ণপদক প্রদান করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন।

নিরুপমা দেবী অল্পবয়সে বৈধব্য-দশা প্রাপ্ত হন। তাঁহার জীবনের বহুকাল কাটিয়াছে বহরমপুরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ ভট্টের গৃহে। বহরমপুরে নারীজাতির কল্যাণ-প্রচেষ্টায়ও তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা মহিলা ছিলেন। ধর্মের প্রতি প্রবল আসক্তি হওয়ায় তিনি বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে নিরুপমা ছিলেন সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবনের অনুরাগিণী এবং আত্মপ্রচারের মোহ হইতে মুক্ত। দীর্ঘকাল একাগ্র নিষ্ঠায় তিনি সাহিত্যসাধনা করিয়া গিয়াছেন।

গোকুলচন্দ্র লাহা

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ লাহা-পরিবারের গোকুলচন্দ্র লাহা গত ২রা পৌষ ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। নানা প্রকার ফুলের চাষে তাঁহার অপরিসীম আগ্রহ ছিল। কলিকাতা মানসিক-ব্যাধি-চিকিৎসা হাসপাতাল, রাজকৃষ্ণ সোসাইটি, অনাথ ভাণ্ডার, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, কটকের উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তিনি অনেক অর্থ দান করিয়াছেন। স্বীয় জমিদারীর অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেও তিনি মাসহারা দিতেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় তিনি বিভিন্ন কেন্দ্রে 'লঙ্গরখানা' খুলিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলায় যথাশক্তি সাহায্য করেন। 'জি-সি-ল এণ্ড কোং'এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বেঙ্গল বণ্ডেড ওয়েরার হাউসের ডিরেক্টর, ইণ্ডিয়ান ইকুইটেবেল ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ-এর চেয়ারম্যান, কলিকাতা মেণ্টাল হস্পিটালের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট এবং রয়াল হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।

রমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

ভারতীয় কৃষি-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ৺রাজেশ্বর দাশগুপ্তের জ্যেষ্ঠপুত্র রমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত গত ১৯শে ডিসেম্বর কলিকাতায় মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় রমেশচন্দ্র চিকিৎসা-শাস্ত্র পাঠ অসমাপ্ত করিয়া কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। তিনি কৃষি-বিজ্ঞানের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার কৃষি-বিজ্ঞান গো-পালন, *Cattle Wealth of India* প্রভৃতি পুস্তক ও রচনাবলী সংশোধন ও পরিমার্জনপূর্বক পূর্ণাঙ্গ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কতকগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত এবং পোষ্ট-গ্রাজুয়েটের পাঠ্য-তালিকায় স্থান পাইয়াছে। শিল্প-রসিক এবং জনশিক্ষাসেবী হিসাবে বন্ধুমহলে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল। খেলাধুলা এবং সঙ্গীতেও তাঁহার অনুরাগ ছিল, রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত দলের তিনি একজন সদস্য ছিলেন। উচ্চাঙ্গের কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত এই দুয়েতেই তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। রমেশচন্দ্র অত্যন্ত সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরে দুর্গতদের দুঃখমোচনে তিনি যথাশক্তি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

সিনক্লেয়ার লিউইস

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথিতযশা সাহিত্যিক সিনক্লেয়ার লিউইস ৬৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

"মেইন ষ্ট্রীট" ও "বেবিট" নামক দুইখানি উপন্যাস লিখিয়া তিনি আমেরিকার সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করেন এবং ১৯৩০ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। এই দুইখানি পুস্তকে বর্তমান বৈশ্য-যুগের নানাপ্রকার বিকৃতির প্রতি বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিয়া, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শহরে ব্যবসায়ীশ্রেণী গত দুই শত বৎসর হইতে মানবের সংস্কৃতির যে ব্যর্থ অনুকরণের প্রয়াস করিতেছেন তাহার বর্ণনা আছে।

সিনক্লেয়ার লিউইস অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধেও তাঁহার লেখনী চালনা করেন। স্যাকো ও ভেনাসিটি নামক দুই ইটালিয়ান শ্রমিক কয়লার খনিতে কাজ করিতেন। স্থানীয় পুলিস তাঁহাদের কম্যুনিষ্ট বলিয়া অভিযুক্ত করে এবং মিথ্যা সাক্ষ্য সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের প্রতি প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করে। সিনক্লেয়ার নানা প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া পুলিসকে নরঘাতক বলিয়া প্রমাণ করেন, যেমন করিয়াছিলেন ফরাসী-লেখক এমেলি জোলা ইহুদি ড্রাইফুসের মোকদ্দমা সম্বন্ধে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্মৃতিরক্ষা

বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মস্থান কৃষ্ণনগরে স্থানীয় সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান সাহিত্য-সঙ্গীতি দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতিরক্ষা কার্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই তাঁহারা দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মভূমির এলাকার মধ্যে একখণ্ড ভূমি এই উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, দ্বিজেন্দ্রলালের পৈতৃক গৃহের প্রবেশদ্বারের যে ধ্বংসাবশেষ ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের অধিকৃত ভূমির মধ্যে কৃষ্ণনগর ষ্টেশন এলাকায় রেল-রাস্তার পাশেই রহিয়াছে তাহার সংরক্ষণের ব্যবস্থার জন্য তাঁহারা রেলকর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিবেন, স্থির করিয়াছেন। সাধারণ ভাবে সংস্কার করিয়া এখানে একটি ফলক সংযোজিত হইলে তাহা সহজেই জনসাধারণের, বিশেষ করিয়া অগণিত রেলযাত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। রেলকর্তৃপক্ষের অবিলম্বে এই ব্যাপারে তৎপর হওয়া সমীচীন।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

স্কুল
শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

শ্রমের জয়

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

৫০শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৫৭

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠনের পর হইতে এক যুগ ধরিয়া বাঙালীর উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া চলিয়াছে তাহাতে একটুখানি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বাঙালী মাত্রেই চিন্তিত হইয়াছেন। আমরা ইহা লইয়া প্রায় প্রতি মাসেই কিছু না কিছু আলোচনা করিয়াছি। স্বাধীনতার পূর্ব্বে বাঙালীর প্রতি অন্যান্য প্রদেশের এবং নিখিল-ভারতীয় নেতৃবর্গের যে মনোভাব আমরা দেখিয়াছি এবং এখন আরও বেশী পরিমাণে দেখিতেছি তাহাতে রীতিমত শঙ্কিত হওয়ার কারণ ঘটিয়াছে। তাড়াতাড়ি দিল্লীর মসনদ দখলের জন্য যাঁহারা বাঙালীর উপর প্রচণ্ডতম আঘাত হানিতে কুণ্ঠিত হন নাই, "বাঙালী ধ্বংস হইলে কি ক্ষতি হইবে" এই কথা যাঁহারা কংগ্রেসে প্রকাশ্যে বলিয়াছেন তাঁহাদের বাঙালী-বিরোধী মনোভাব আরও বাড়িয়াছে এ কথা মনে করিবার যথেষ্ট অবসর পাওয়া যাইতেছে। ভারতীয় মন্ত্রীসভায় দুই জন বাঙালী থাকায় যেটুকু ভরসা আমাদের ছিল তাহাও এখন আর নাই। কেবিনেট-মন্ত্রীর মর্য্যাদাসম্পন্ন কোন বাঙালী এখন ভারতীয় মন্ত্রীসভায় নাই। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে শরৎ চন্দ্র বসুর পর আর কোন শক্ত বাঙালী যান নাই; এখন যিনি আছেন তিনি বাঙালীকে চেনেন না, বাঙালীর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পর্য্যন্ত জানেন না। ওয়ার্কিং কমিটিতে বাংলার কথা মুখ তুলিয়া বলিবার সাহস বা যোগ্যতা কোনটাই তাঁহার নাই। পার্লামেন্টে বাঙালী যে সমস্ত প্রতিনিধি পাঠাইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি, লাইসেন্স, পারমিট টেলিফোন প্রভৃতির দালালীতে এত বেশী নাম করিয়াছেন যে পার্লামেন্টের অধিবেশনে বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের নিকট মাথা উঁচু করিয়া একটি কথাও ইঁহাদের বলিবার মুখ নাই। সরকারী বিজ্ঞাপনে এবং অন্যান্য অনুগ্রহে সংবাদপত্রগুলি স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। শুভেচ্ছা মিশনের নামে দেশ-বিদেশে সরকারের পয়সায় ভ্রমণ এবং বিদেশীর ঘরে চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়ে আপ্যায়ন ইহাদের মুখ বন্ধ করিবার আর এক অস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঘরে যখন আগুন লাগিয়াছে, ভবিষ্যদ্বংশীয়দের যখন সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে, দেশের ও জাতির চরম দুঃসময়ে বাঙালী জাতিকে বাঁচাইবার জন্য যখন সকল চিন্তাশীল, বিত্তশালী এবং প্রতিপত্তিশালী বাঙালীর একত্র হইয়া বাঙালীকে বাঁচাইবার জন্য সর্ব্বক্ষমতা নিয়োগ করা প্রয়োজন, সেই সময়ে ব্যক্তি বা দলগত স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা এবং নিশ্চিন্ত প্রমোদবিহারের লোভে বাংলাদেশ সম্বন্ধে বিদেশে ও ভিন্ন প্রদেশে ভুল ধারণার সৃষ্টি করা আমরা কেবল অন্যায় নহে, দণ্ডনীয় দুরাচার বলিয়া মনে করি। অথচ আজ পশ্চিমবঙ্গের শাসনতন্ত্র অধিকার এবং সমাজের নেতৃত্বের জন্য যাঁহারা লালায়িত হইয়া কুটোকুটি করিতেছেন তাঁহারা ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থই সার বুঝেন দেখিতেছি।

ডেমোক্রাসিতে সমালোচনার ক্ষেত্র আছে, চিরদিন থাকিবে, কিন্তু এই সমালোচনা কেবল দলগত স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্রমাত্রে পর্য্যবসিত হইলে তাহাতে দেশের সমূহ অনিষ্ট ঘটে। দেশের লোকের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি দলীয় কূটনীতির বিষয়বস্তু হইয়া উঠিলে এক একটি বৎসরে যে অনিষ্ট হয়, এক যুগেও তাহা পূরণ হয় না। ইংরেজ এবং মুসলিম লীগ গবর্ণমেণ্ট বাঙালীর জাতীয় জীবনে অনেক কলুষ, অনেক পাপ প্রবেশ করাইয়া দিয়া গিয়াছে। স্বাধীনতার পর আমরা তাহা দূর করিবার চেষ্টা না করিয়া উহা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছি। গত সাড়ে তিন বৎসরে বাঙালীর কোন একটি সমস্যারও মীমাংসা হয় নাই। বরং প্রত্যেকটি সমস্যা আরও অবনতির দিকেই দ্রুত ধাবিত হইতেছে। ইংরেজ এবং মুসলীম লীগ আমলে বাঙালী এত বেশী মার খাইয়াছে, বাঙালীর নৈতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবন এই মারের চোটে এত নীচে নামিয়া গিয়াছে যে, তাহার প্রতিকার কোনও গবর্ণমেণ্টের একার সাধ্যায়ত্ত নহে, হইতেও পারে না। শিক্ষিত এবং প্রভাবশালী বাঙালী মাত্রেই অপর সকল

চিন্তা বর্জন করিয়া গবর্মেণ্টের অপেক্ষা না রাখিয়া জাতিগঠনে আত্মনিয়োগ না করিলে বাঙালী জাতিকে বাঁচাইবার কোন উপায় থাকিবে না। "বাঙালী বিধাতার সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জাতি, তার ধ্বংস নাই"—এই কথা বলিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে অথবা জাতির ভার ভগবানের হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিজেরা স্বার্থসাধনে এবং বিলাসব্যসনে মত্ত হইলে বাঙালীর ধ্বংস দ্রুত ও সুনিশ্চিত হইবেই। উদ্যোগী পুরুষ বা উদ্যোগী জাতির ভার ভগবান গ্রহণ করেন, অলস এবং স্বার্থপরের ভার তিনি ছাড়িয়া দেন ভূত প্রেত শয়তানের হাতে, একথা ভুলিলে চলিবে না।

আমরা এই কথাই বলিব যে, বাঙালীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বাঙালীমাত্রকেই নিজেকে প্রশ্ন করিতে হইবে যে, জাতির জন্য আমি কতটুকু করিয়াছি, কতটুকু করিতে পারিতাম কিন্তু করি নাই এবং এখন কতটুকু করিতে পারি। অতীতে কিছু না কিছু করিতে পারিতাম কিন্তু করি নাই এই অক্ষমতার লজ্জা যদি আজ সকলকে বেশী করিয়া কাজ করিতে উদ্বুদ্ধ করে তবেই এই আত্মচিন্তা এবং মর্ম্মানুসন্ধান সার্থক হইবে। যা করে গবর্মেণ্টই করুক, আমাদের কিছু দায়িত্ব নাই এই কথা ভাবিয়া বর্ত্তমান জটিলতাকে যে লোক কমাইবার চেষ্টা না করিয়া উহা আরও বাড়াইতে চাহিবে আমরা বিনা দ্বিধায় তাহাকে জাতির পয়লা নম্বর শত্রু বলিয়া অভিহিত করিব। এরূপ লোক গবর্মেণ্টের ভিতরে বা বাহিরে যেখানেই থাকুক তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া, সমাজে তাহাদিগকে চিহ্নিত করিয়া দিয়া বিষবৎ বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইবে।

স্বাধীন দেশের গবর্মেণ্টের যেমন দায়িত্ব রহিয়াছে, নাগরিকদেরও ঠিক তেমনি দায়িত্ব আছে। স্বাধীন দেশের নাগরিকের অধিকার ভোগ করিতে হইলে প্রত্যেককে তার কর্ত্তব্য আগে পালন করিতে হইবে। পাশ্চাত্য প্রথা অনুসারে আগে অধিকার, পরে কর্ত্তব্য এই কথা বলিতে পারা যায়, কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্য ইহা নহে। আমাদের দেশে আগে কর্ত্তব্য, পরে অধিকার। কর্ত্তব্য পালন করিয়া তবে অধিকার অর্জ্জন করিতে হয়। ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য পালনের সঙ্গে সামাজিক কর্ত্তব্যের কথা মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিয়া গেলে চলে না, তাহাতে জাতি ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। জাতি ধ্বংস হইলে ব্যক্তি যত শক্তিশালীই হউক না কেন, সে বাঁচিতে পারে না। বাঙালী স্বাধীনরাষ্ট্রের সমাজ-বিজ্ঞানের এই মূলসূত্র ভুলিতে বসিয়াছে বলিয়াই আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা।

বাঙালীর দায়িত্ব

বাঙালীর সামাজিক বিবেকবুদ্ধি কোন্ স্তরে নামিয়া আসিয়াছে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ উদ্বাস্তু সমস্যা। বাঙালীকে জাহান্নামে ঠেলিয়া দিয়া নিজেদের সুখ-সুবিধা গুছাইয়া লইতে যাহারা আগ্রহশীল তাহাদের চক্রান্তে ৫০।৬০ লাখ হিন্দু ভিটা ছাড়া হইয়াছে, পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা জন কয়েক লোকের বিপর্য্যয় নয়, সমগ্র বাঙালী জাতির বিপদ। বাঙালীর এই পরম সঙ্কটকালে পূর্ব্ববঙ্গের বুদ্ধিজীবী এবং বিত্তশালী বাঙালীরা কি করিলেন? সকলের আগে পলাইয়া আসিয়া তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গের যেখানে পারিলেন জমি কিনিলেন এবং পঞ্চাশ টাকার জমি হাজার টাকায় বিক্রী করিলেন। ঘরছাড়া ভিটাচ্যুত সর্ব্বস্বান্ত মানুষদের উপর এই মুনাফাবাজী করিতে তাঁহাদের হাত কাঁপিল না, বিবেক টলিল না। গবর্মেণ্ট উদ্বাস্তুদের ঋণ এবং খয়রাতী সাহায্যের ব্যবস্থা করিলেন। টাকা বিলির ভার পড়িল প্রধানতঃ পূর্ব্ববঙ্গেরই লোকদের হাতে, ইঁহারাও ঐ একই পথে পা বাড়াইলেন। যাহারা ইঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিল, "ধরিতে" পারিল, টাকা তাহারাই পাইল, যাহারা তাহা পারিল না তাহারা কোন সাহায্য পাইল না। কয়েকদিন আগে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে যে, ঋণপ্রাপ্ত বহু লোক টাকা লইয়া যান নাই, তাঁহাদের কোন হদিস পাওয়া যাইতেছে না, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া দেখা দেন। এর চেয়ে আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত ব্যাপার কি হইতে পারে আমরা বুঝিতে অক্ষম। ১০ হাজার ১৫ হাজার টাকা ঋণ যাহারা চাহিয়াছে, এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য গড়িয়া তুলিবার জন্য আগ্রহশীল বলিয়া যাহারা পরিচয় দিয়াছে, ব্যবসা আরম্ভের প্রাথমিক কার্য্যাবলী সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া যাহারা অঙ্গীকারপত্র সহি করিয়াছে, জামিনদের নাম দিয়াছে, তাহাদের ঋণ মঞ্জুর হওয়ার পর কোন সন্ধান নাই! এক জন দুই জন নয়, বহু লোক এরূপ করিয়াছে, কয়েক লক্ষ টাকা এই ভাবে মঞ্জুর হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। অথচ এই টাকাটা পাইলে হয়ত প্রকৃত দুঃস্থ অনেকের উপকার হইত। বাড়ী তৈরি করিয়া দেওয়ার নামে কণ্ট্রাক্টারদের বেনামীতে যে কি পরিমাণ টাকা বাহির হইয়া যাইতেছে তাহারও ইয়ত্তা নাই। ইহাতে কত টাকা খরচ হইয়াছে তাহা জানিলে এবং কোন্ কোন্ লোকও কণ্ট্রাক্টরের ইহাতে পকেট ভরিয়াছে তাহা জানা দরকার। উদ্বাস্তুদের নামে কোথায় কয়টা কি আকারের বাড়ীঘর তৈরি হইয়াছে এবং তাহাতে কত টাকা খরচ হইয়াছে, কাহারা ঐ টাকা মঞ্জুর করিয়াছে এই সমস্ত তথ্যও প্রকাশ হওয়া দরকার। ভারত বিভাগের পর যেখানে সারাটা বাংলাদেশের বাঙালী মাত্রেরই অগ্রসর হইয়া উদ্বাস্তু পুনর্ব্বসতিতে সাহায্য করা উচিত ছিল, সরকারী টাকার একটি পয়সা যাহাতে অপব্যয় না হয়, চুরি না হয় তাহা দেখা কর্ত্তব্য ছিল, সকলে মিলিয়া গবর্মেণ্টকে সঙ্গে লইয়া এই সমস্যা সমাধানে হাত মেলান উচিত ছিল, সেখানে আমরা কি দেখিলাম? একদিকে হীন স্বার্থপরতা, আপনার জনদের প্রতি নিষ্ঠুর উদাসীনতা, সর্ব্বস্বান্তের শেষ কড়িটি নিজের পকেটে তুলিয়া লইবার কদর্য্য লোভ এবং

সরকারের খয়রাতের বরাদ্দ টাকা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত ক'রিয়া উহা আত্মসাৎ করিবার নীচতা, অন্যদিকে চলিতেছে এই বঞ্চিত দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকেদের উস্কাইয়া নিজের দলগত রাষ্ট্রনৈতিক সুবিধার চেষ্টা ও বাস্তুহারার নামে বাস্তুঘুঘুর অভিযানের সমর্থন। এই চরিত্র যদি আমরা পরিবর্ত্তন করিতে না পারি, তবে আমরা বাঙালীকে বাঁচাইব কিরূপে?

দেশের ভবিষ্যৎ, জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া স্বার্থ পরতার এই যে খেলা চলিতেছে ইহাতে বাঙালীকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে কত দ্রুত টানিয়া লওয়া হইতেছে—আজও তাহা যদি আমরা না বুঝি তবে শেষ রক্ষা করা বিষম কঠিন হইবে। অন্ন, বস্ত্র, যানবাহন, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা কোনটিরই সমাধান আমরা করিতে পারিলাম না। দেশে খাদ্যাভাব রহিয়াছে কিন্তু এই অভাব মোচনের জন্য আমরা কি করিতেছি? তিন বৎসর অতীত হইয়াছে, আমরা সামান্য মাত্রও ফসল বাড়াইতে পারিলাম না। বড় বড় স্কীমে সময় লাগিবে, বহু টাকা লাগিবে, অসংখ্য বাধাও আসিবে। দামোদর স্কীমে তাহাই ঘটিতেছে। এই স্কীম বন্ধ রাখিয়া উহার বরাদ্দ অন্যান্য প্রদেশের স্কীমগুলিতে বণ্টন করিয়া দিলেও আমরা আশ্চর্য্য হইব না। দামোদর স্কীম লইয়া এযাবৎ যৎটুকু তথ্যাদি প্রকাশ পাইয়াছে তাহার মধ্যে এইরূপ মনোভাব স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে। বাংলার উন্নতি বিহার চাহে না, যে সমস্ত স্কীমে বাঙালী উপকৃত হইবে তার কোন অংশ বিহারে অবস্থিত হউক, বিহার ইহাতে সন্তুষ্ট হয় না।

ময়ূর স্কীমে কত বাধা পড়িয়াছে, কতদিন উহাকে বিহার আটকাইয়া রাখিয়াছে তাহা এখন কিছু কিছু জানা যায়। বাঙালীর কোন বড় কাজ করিবার যোগ্যতা নাই একথা বলা ভুল। ময়ূর স্কীমের এক অংশ সম্পূর্ণ হইয়াছে, এই বৎসর হইতেই উহার সুফল আমরা পাইব। এই স্কীম যাঁহারা কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন তাঁহাদের উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই বাঙালী। খুঁজিয়া এবং বাছিয়া লইতে পারিলে এখনও উপযুক্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং বিবেকবান বাঙালী যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যাইবে। বাঙালীর জাতীয় জীবনের অন্ধকার গহনারণ্যে আলোকবর্ত্তিকা নাই ইহা আমরা বলি না; তাহা মনে করিলে বাঙালী মরিয়াছে এই কথা বলিয়াই আমরা শেষ করিতাম, বাঁচিবার জন্য বাঙালীকে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিতাম না। বড় স্কীমগুলির উপর যেমন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে তেমনি ছোট ছোট স্কীমগুলিও কার্য্যে পরিণত হইলে কম ফলপ্রদ হইবে না। এইগুলির দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হইবে। ছোট স্কীমগুলি কোথায় কোথায় হইয়াছে, তার জন্য কত টাকা মঞ্জুর হইয়াছে এবং কাহাদের উপর উহা কার্য্যে পরিণত করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে প্রেস নোটে তাহা সবিস্তারে প্রকাশ করা এবং প্রতি মাসে কোথায় কোনটি কতটা অগ্রসর হইয়াছে আর সাধারণের সাহায্য উদ্যোগ ও সহকারিতা কোথায় বাঞ্ছনীয় গবর্ন্মেণ্ট তাহা জানাইতে পারেন। ইহাতে সকলের পক্ষে ঐ কাজে সহায়তা করা সম্ভব হইবে এবং এইরূপ করিলে ফসল বৃদ্ধিতে প্রকৃত সাহায্য হইবে।

যানবাহনের উন্নতি দেশের কৃষি-শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির একটি বড় উপায়। বাংলাদেশে রাস্তা বলিতে আছে মাত্র একটি—গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। ভারত সরকার উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। এখন তাঁহারা অদ্ভুত আব্দার করিতেছেন যে, যে সমস্ত মিউনিসিপালিটির ভিতর দিয়া রাস্তা যাইবে রাস্তার ঐ অংশের খবরদারী তাহাদিগকে করিতে হইবে। রাস্তা নির্ম্মাণের টাকা তোলার জন্য পেট্রলের উপর মোটা ট্যাক্স আছে। বাংলাদেশ তাহার অধিকাংশই পায় না। একটিমাত্র রাস্তা, তার রক্ষণাবেক্ষণের ভারটাও কেন্দ্রীয় সরকার দরিদ্র বাংলার উপর চাপাইয়া দিতে চাহিতেছেন। রেলেরও একই অবস্থা। আসানসোল হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত রেলপথটির উপর চাপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং ইহাতে সমগ্র উত্তর ভারত উপকৃত। অথচ রেলের উন্নতির টাকা বাংলাকে খুব কম দেওয়া হয়। এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যবান প্রদেশ মাদ্রাজ। মাদ্রাজের রেলপথগুলির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। বড় বড় স্কীম প্রভৃতি বিষয়ে মাদ্রাজের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাতিত্ব সুস্পষ্ট। অথচ এই একটি প্রদেশ সমগ্রভাবে ভারতবর্ষের কোনরূপ সাহায্য করে না। এরা খাদ্য সম্বন্ধে ঘাট্‌তি অন্য প্রদেশ হইতে নেয়, দেয় না। কাপড়, চিনি বা অন্য কোন জিনিষ উৎপাদনেও ইহারা অন্যান্য প্রদেশকে সাহায্য করে না। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারগুলিকে উচ্চ নীচ অসংখ্য পদে ইহারা অধিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সুযোগে ইহারা প্রাদেশিক স্বার্থসিদ্ধি করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে।

বাঙালীর আর্থিক দুর্দ্দশা

বাঙালীর আর্থিক দুর্দ্দশাও চরমে উঠিতেছে। ভিন্ন প্রান্তীয়েরা বিদেশী শোষকদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে, যে সব ক্ষেত্র হইতে ইংরেজরা সরিয়া গিয়াছে তাহারা সেগুলি দখল করিয়াছে। ব্যবসায়ে অসাধুতা এবং অন্যায় প্রতিযোগিতার দ্বারা ইহারা বাঙালী ব্যবসায়ীদের কোণঠাসা করিয়া এমন এক অবস্থায় আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে যে, এই অবস্থা আর বেশী দিন চলিলে একটিও বাঙালীকে ব্যবসা করিতে হইবে না। সরকারী কর্ম্মচারীদের একটি শ্রেণীর সহিত ইহারা এমন যোগস্থাপন করিয়াছে যে, ট্যাক্স বিষয়ে ইহারা অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করিতেছে, যাহা কোন বাঙালী ব্যবসায়ী পায় না। ব্যবসাক্ষেত্রে এইরূপ তারতম্যের ফল অতি মারাত্মক হইতে বাধ্য, হইতেছেও তাহাই। বাংলাদেশের বড় বড় কলকার-

খানা বড় বড় বিলাতী দোকান ইহারা একে একে কিনিয়া লইতেছে। ইহারা বাংলাদেশে বসিয়া ব্যবসা করে বটে, কিন্তু তাহাতে বাংলার কোন লাভ নাই। ইহাদের পরিচালিত কলকারখানায় বাঙালী মজুর এরা সহজে রাখে না, যাহারা আছে তাহাদেরও ধীরে ধীরে তাড়াইয়া দিতেছে। কাপড়ের ব্যবসা ইহাদের একচেটিয়া এবং তাহার পরিণাম কি হইয়াছে তাহা তো চোখের উপর দেখিতেছি। বাঙালী হ্যাণ্ডলিং এজেণ্ট কিছু কিছু হইতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদেরও প্রায় সকলেই টাকার জন্ম ইহাদের উপর নির্ভরশীল। সরিষার তেল, ঘি প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসাও অবাঙালীর করায়ত্ত এবং খাদ্যে ভেজাল দিয়া মুনাফা বৃদ্ধি ইহাদের মজ্জাগত অভ্যাস। স্বদেশী যুগের পর বাঙালীকে জব্দ করিবার জন্ত ইংরেজ যাহাদিগকে কলিকাতায় আনিয়া পাটের ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, ইংরেজের সেই উদ্দেশ্ত তাহারা ঐতিহ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং অতিশয় দক্ষতার সহিত তাহা পালন করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় কথা এই যে, এইরূপ অবস্থাতেও বাঙালী ব্যবসায়ী বা জনসাধারণ সংগঠিত ভাবে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত কোন চেষ্টা করিতেছেন না। উঁহারা ইংরাজের সহযোগে এখন শোষণের আর এক পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে। পাকিস্থানে গিয়া "পাকিস্থান লিমিটেড" কোম্পানী গঠনে ইহারা মনোনিবেশ করিয়াছে। পাকিস্থানে আয়করের পরিমাণ কম, গবর্মেণ্ট এখনও যথেষ্ট সুগঠিত নহে, সুতরাং ফাঁকি দেওয়ার সুবিধা এখানকার চেয়ে বেশী। পাকিস্থানের নিজের জন্ত ডিভ্যালুয়েশনের গোলযোগ আর কয়েক বৎসর বজায় থাকিলে তাহাতেও ইহাদেরই লাভ হইবে বেশী। এখনই ইহারা ১ টাকা দিয়া ভারতে বসিয়া পাকিস্থানী ৮৷০ টাকা কেনে, ঐ টাকা করাচী পাঠাইয়া সেখানে ৮৷০ টাকায় ষ্টার্লিং কেনে, ষ্টার্লিং ভারতে আনিয়া ১৩৷০ টাকায় ভাঙ্গাইয়া প্রতি ৮৷০ টাকায় ৫ টাকা লাভ করে। পাকিস্থান লিমিটেড কোম্পানী ভারতের টাকায় গঠিত হইবে, ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে এবং এই ভাবেই ভারতকে দোহন করিয়া লাভবান হইবে। ইহাতে বাংলার অনিষ্ট হইবে খুব বেশী। এই ত দেশের অবস্থা। বাঙালী নিজের সামনে এতবড় বিপদ দেখিয়াও এখনও সতর্ক হইতে শেখে নাই। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর অর্থনৈতিক দাসত্ব মোচনের কথা কেহই চিন্তা করে না বরং তার বিপরীত ব্যবস্থাই চলে। বাংলা সরকারেরও এ বিষয়ে কোনও মাথাব্যথা দেখি না।

এখন আর রাজনীতিসর্ব্বস্ব হইলে চলিবে না। গবর্মেণ্টকেও স্বাধীন দেশের গণতান্ত্রিক গবর্মেণ্টের ধারা অনুসারে দেশবাসীর আপদ-বিপদের কথা তাহাদের সম্মুখে খুলিয়া বলিতে হইবে। গবর্মেণ্টের মধ্যে যে সমস্ত লোক দেশের বৃহত্তর স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করিবে নির্ম্মম হস্তে তাহাদিগকে উৎপাটিত করিয়া দূরে সরাইয়া দিতে হইবে। কোনরূপ দয়ার পাত্র ইহারা হইতে পারে না। তেমনি জনসাধারণকেও পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া কাজ করিতে হইবে। গবর্মেণ্টের কার্য্যকলাপের তীব্র সমালোচনার ক্ষেত্র আছে, সব সময়েই থাকিবে, কিন্তু সমালোচনাটাই বড় হইয়া উঠিলে চলিবে না। সমালোচনা যাঁহারা করিবেন কাজও তাঁহাদিগকেই করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে দেশ-শাসনের দায়িত্ব তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে, তখন তাঁহারা নিজে কি করিবেন ইহা ভাবিয়া তবেই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। জাতির মধ্যে নিছক ভেদ বা বিশৃঙ্খলা যাহারা আনিতে চাহিবে তাহাদেরই দেশের সবচেয়ে বড় শত্রু বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি অদ্ভুত সার্কুলার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজস্ব (ফিনান্স) বিভাগের হিসাব পরীক্ষা (অডিট)-শাখা গত ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখের ৩৮৪৭ এক্ সংখ্যক সার্কুলার পূর্ব্ববঙ্গাগত বাস্তুত্যাগীদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাকুরীতে নিয়োগ সম্পর্কে নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে সমস্ত চাকুরীতে নিয়োগের সময় অপর সমস্ত বিষয়ে সমান হইলেও পূর্ব্ববঙ্গাগত বাস্তুত্যাগীদিগকেই নিযুক্ত করা হইবে:

"All other conditions being equal and without in any way relaxing the rules of recruitment or any other relevant rules, refugees from East Bengal should be given preference over others in all appointments under the Government of West Bengal."

ভারত-শাসনতন্ত্রের ১৬শ ধারার ১ম ও ২য় উপধারা অনুসারে এই সার্কুলারটি শাসনতন্ত্র বিরোধী ও আইন বহির্ভূত হইয়াছে। উক্ত উপধারার নির্দ্দেশ এই যে, সর্ব্বভারতীয় বা প্রাদেশিক কোন কার্য্য বা পদে নিয়োগের ব্যাপারে মাত্র ধর্ম্ম, জাতি, বর্ণ, স্ত্রীপুরুষভেদ, বংশগত কোন বৈশিষ্ট্য, জন্মস্থান বা বাসস্থানের জন্ত রাষ্ট্রীয় কোন অধিবাসীর বিরুদ্ধে কোনরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হইবে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উল্লিখিত সার্কুলারের নির্দ্দেশ অনুযায়ী সর্ব্ববিধ চাকুরিতে নিয়োগের ব্যাপারেই পশ্চিমবঙ্গবাসীর বিরুদ্ধে, পশ্চিমবঙ্গবাসী বলিয়াই, বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। আমরা ভাবিয়াছিলাম এরূপ আইন বহির্ভূত নির্দ্দেশ সরকার বাহাদুরের কাগজপত্রেই থাকিবে; সেই আশায় আমরা এ সম্বন্ধে কিছু বলি নাই। কিন্তু এখন কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত নূতন নিয়োগের ক্ষেত্রে এই নির্দ্দেশই কার্য্যে পরিণত হইতেছে। এ সম্পর্কে আমরা পশ্চিমবঙ্গীয় জনসাধারণের ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর প্রতি বিষম শত্রুভাবমূলক এই সার্কুলার অবিলম্বে নাকচ হওয়া প্রয়োজন।

পাকিস্থানী মূল-নীতি নির্দ্ধারণ কমিটি

পাকিস্থানী রাষ্ট্রের মূলনীতি নির্দ্ধারণ কমিটির প্রস্তাবাবলী গণমতের বিরুদ্ধ আন্দোলনে ধামাচাপা পড়িল। প্রধানতঃ পূর্ব্ববঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায়ের আপত্তিই শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হইয়াছে মনে করিলে অন্যায় হইবে না। এই তর্কাতর্কির মূল কারণ কি ছিল তাহা লইয়া এখন আলোচনা করিব না। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীনপন্থী যাঁহারা তাঁহাদের মনোভাব ও মতামতের বহিঃপ্রকাশ যাহা দেখিতেছি তাহা লোকগোচরে আনিতে চাই।

পূর্ব্ববঙ্গের পাবনা শহর হইতে প্রায় এক বৎসর যাবৎ একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে, তাহার নাম—"তর্জ্জুমানুল হাদিছ"। কোরাণ ও অন্যান্য মুসলিম শাস্ত্র-গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া তাহার মাহাত্ম্য প্রচারই হইল এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। গত কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের একখানি সংখ্যা আমাদের পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পাকিস্থানী মূলনীতি নির্দ্ধারণ কমিটির প্রস্তাবসমূহ অবলম্বন করিয়া যে আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এই প্রাচীনপন্থী পত্রিকার মতামত জানিয়া রাখা ভাল।

পাকিস্থানরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর কোন কোন বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া তর্জ্জুমানুল হাদিছ বলিতেছেন: "পাক-প্রধানমন্ত্রী প্রতিবাদকারীদের নিকট বিকল্প প্রস্তাবাবলীর খসড়া তলব করিয়াছেন।...তিনি প্রতিবাদকারীদিগকে তিনটি দলে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, প্রথম নির্ব্বোধের দল, যাহারা সুপারিশ-গুলির মাহাত্ম্য অনুধাবন করিতে না পারিয়াই মিছামিছি চেচামেচি জুড়িয়া দিয়াছে। দ্বিতীয়, শত্রুর দল যাহারা শুধু নষ্টামির জন্যই ভিত্তিহীন অপব্যাখ্যার সাহায্যে জনমণ্ডলীকে বিভ্রান্ত করিতে চাহিতেছে। তৃতীয়, যাহারা সততার সহিত উদ্দেশ্য-প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে শাসনতন্ত্র রচনা করার পক্ষ-পাতী। আমরা...সমালোচকদিগকেও নিরেট বেওকুফ বা পাকিস্থানের শত্রু বলিয়া মনে করি না। যে বা যাহারা কর্ত্তৃপক্ষ ও নেতাদের উক্তি ও আচরণের বিরুদ্ধে মুখ খুলিবে, অমনি তাহার মস্তকোপরি রাজদ্রোহিতার খড়্গ উত্তোলন করিতে হইবে, এই নীতিকে আমরা পাকিস্থানের পক্ষে অনিষ্ট-কর বলিয়া বিশ্বাস করি।...

"সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার ব্যাপার এই যে, যাঁহারা ইসলামি সংবিধান রচনা করিবার পবিত্র ব্রত লইয়া পাকিস্থানী গণ-পরিষদে বিরাজমান রহিয়াছেন এবং খসড়া সুপারিশগুলিতে যাঁহারা পূর্ণসম্মতি প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই, আজ প্রধানমন্ত্রীর সুর পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইসলামী শাসন-তন্ত্রের জটিলতা হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় জন্য ইসলামী নীতি ও বিধিগুলিকে যুগোপযোগী করিয়া সংবিধানের (Constitution) আকার করার পথে যত প্রকার অসুবিধার কথা আছে, তাহারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। একদল আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, বিগত চৌদ্দ শত বৎসরের মধ্যে দুনিয়ায় যতগুলি রাষ্ট্র মুসলমানরা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে তার কোনটাই ইসলামী রাষ্ট্র ছিল না, কোন রাষ্ট্রেই কোরাণ ও সুন্নতের মৌলিক বিধান অনুসরণ করা হয় নাই... তাঁহারা নাকি ইতিহাসের মধ্য দিয়া কোন সুবিন্যস্ত ইসলামী শাসন-বিধানের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।... ইসলামী সংবিধানের রচনাকার্য্যে কতিপয় উলেমার সমবায়ে 'তালীমাতে ইছলামীয়া' নামে যে বোর্ড গঠিত হইয়াছিল তাহার রিপোর্ট পর্য্যন্ত পরম নিশ্চিন্ততার সহিত ধামাচাপা দিয়া শুধু আলিম সমাজের অকর্ম্মণ্যতার জন্য বিলাপ করা হইতেছে।..."

মৌলানা সব্বির আহাম্মদের নেতৃত্বে একটি সংবিধান কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি। তাঁহার দেহ-ত্যাগের পর তাঁহার সহকর্ম্মীদের মধ্যে কেহ কেহ পাকিস্থান রাষ্ট্রে বর্ত্তমান শাসকবর্গ কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইয়া আছেন তাহাও শুনিয়াছি। আমাদের পাবনার সহযোগী এই সংবিধান সম্বন্ধে "ইছলামী শাসনতন্ত্রের প্রধান প্রধান সূত্রগুলির বিশ্লেষণ করিয়া একখানি পুস্তিকা" সঙ্কলিত ও মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখি নাই। মুসলমান "সন্দেহবাদীর দল" নাকি তাহা "উপেক্ষা ও অবজ্ঞা" করিয়াছে। উলামাবর্গের মতা-মতের দমন ও উপেক্ষা—এই দুই নীতি প্রাচীনপন্থী মুসলমান শ্রেণীকে বলিয়া দিতেছে যে, ইসলামের নূতন শাসকবর্গ অতীতে ফিরিয়া যাইতে চান না; তাঁহারা বর্ত্তমান যুগোপযোগী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পক্ষপাতী। ভারতরাষ্ট্রেও এই সমস্যা আছে।

আমাদের সহযোগী আর একটা তথ্যের উপর জোর দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, "উমাভি সাম্রাজ্যবাদ খিলাফতে রাশিদার কবরের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল"; তাহা "ইসলামী গণতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়াছিল"; "আব্বাছিরাও তার পুন-রুদ্ধারের কোন চেষ্টা করেন নাই।" উভয়েই কিন্তু নিজেদের "মুসলিম প্রজাপুঞ্জের প্রতিনিধি" (খলিফাতুল মুসলিমীন) বলিয়া পরিচয় দেওয়াকেই "গৌরবজনক" মনে করিতেন। এইখানেই ত মুসলিম রাষ্ট্রের "কাফের" প্রজাপুঞ্জের বিপদ। ইসলামী রিয়াসতে প্রভুত্ব (রাষ্ট্রের) ও মীমাংসার চরম অধিকার সকল সময়ে আল্লাহ্ ও তদীয় রসুলের হস্তে সমর্পণ করা হইয়া থাকে বলিয়া মুসলিম শাসকবর্গ মুখে মুখে প্রচার করেন। কিন্তু এই রাষ্ট্রের শাসকবর্গ ও উলেমা শ্রেণী ত মানুষ। তাঁহারা কি করিয়া সর্ব্বশক্তিমান "আল্লাহের" নামে তাঁহার বিধানের ব্যাখ্যা করার স্পর্দ্ধা করেন তাহা বর্ত্তমান যুগের মানুষের পক্ষে বুঝা কঠিন। এই শাসকবর্গ ও উলেমা

শ্রেণীই ত "২৪ বৎসরের" মধ্যে ইসলামী "গণতন্ত্রের" কবর দিয়া তার উপর সাম্রাজ্যবাদ স্থাপন করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। তার পর "কাফের" প্রজাপুঞ্জের কথা। তারা ত "জিম্মি" মাত্র, আশ্রিত লোকসমষ্টি মাত্র; উহাদের মুসলিম রাষ্ট্রের পূর্ণ নাগরিক হইবার অধিকার কি ইসলামী ইতিহাসের মধ্যে আছে? এই সব কথার মীমাংসা না হইলে ইসলামী রাষ্ট্রে উলেমা-মৌলবী কল্পিত রাষ্ট্র বর্ত্তমান যুগে টিকিতে পারে না। এতৎ সম্পর্কে করাচী হইতে গত ১৮ই মাঘে প্রেরিত নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রণিধানযোগ্য:

"পাকিস্থানের ৩৫ জন বিশিষ্ট উলেমা সম্প্রতি করাচীতে সমবেত হইয়া 'ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতিসমূহ' নির্দ্ধারণ এবং সেই ভিত্তিতে একটি খসড়া প্রণয়ন করেন।

"খসড়াটি গণপরিষদের দপ্তরে পেশ করা হইয়াছে। তাহাতে পরিষ্কার ভাবেই বলা হইয়াছে যে 'মূলনীতি নির্দ্ধারণ কমিটি ও মৌলিক অধিকার নির্দ্ধারণ কমিটি' যে সকল সুপারিশ করিয়াছেন সেইগুলি ইসলামের নীতিসম্মত নহে।"

ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যেই এই সম্মেলন 'আহুত' হইয়াছিল; কিন্তু গণপরিষদের প্রেসিডেন্ট গণপরিষদের তালিমৎ-ই-ইসলামিক বোর্ডের সুপারিশগুলি ইঁহাদিগকে দিতে অস্বীকার করায় সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই।

সম্মেলনে যে সকল মূলনীতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে তন্মধ্যে কতকগুলি নিম্নে দেওয়া হইল:

(১) পাকিস্থানের আইন হইবে কোরাণ ও সুন্নাসম্মত।

(২) ভৌগোলিক, জাতিগত, ভাষাগত বা অন্য কোন বস্তুবাদী ধারণা অনুযায়ী রাষ্ট্র গঠিত হইবে না; ইসলামী জীবনধারার নীতি ও লক্ষ্য অনুযায়ী রাষ্ট্র গঠিত হইবে।

(৩) কোরাণ ও সুন্নার নির্দ্দেশ অনুযায়ী রাষ্ট্রকে সত্যের পালন ও অন্যায়ের দমন করিতে হইবে।

(৪) জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে যে সকল নাগরিক সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে বেকার থাকিবে, অথবা ব্যাধি বা অন্য কোন কারণে জীবিকার্জ্জনে অক্ষম হইবে তাহাদিগকে বাঁচিবার মত সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে।

(৫) ইসলামী বিধান অনুযায়ী যে সকল অধিকার দেওয়া হইবে নাগরিকগণ তাহা সমস্তই ভোগ করিতে পারিবে।

(৬) এই বিধানের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া রাষ্ট্রের অমুসলমান নাগরিকবৃন্দ ধর্ম্মাচরণ, পূজার্চ্চনা, জীবনযাত্রা প্রণালী, সংস্কৃতি ও ধর্ম্মশিক্ষা ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিবে।

(৭) শরিয়ৎ অনুযায়ী অমুসলমান নাগরিকবৃন্দের প্রতি রাষ্ট্রের যে সকল দায়িত্ব বর্ত্তাইবে সেইগুলি পুরাপুরিভাবে পালন করিতে হইবে।

(৮) আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ না দিয়া আদালতে বিচার না করিয়া কোন অভিযোগে কোন নাগরিককে শাস্তি দেওয়া চলিবে না।

(৯) রাষ্ট্রপতি একজন পুরুষ মুসলিম হইবেন এবং এমন ব্যক্তিকে করিতে হইবে যাঁহার ধর্ম্মপরায়ণতা, দক্ষতা ও বিচার বিচক্ষণতায় জনসাধারণ বা তাঁহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের আস্থা থাকিবে।

(১০) যাঁহারা রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন করিবেন, অধিকাংশের ভোটে তাঁহাদের রাষ্ট্রপতিকে সরাইবার ক্ষমতাও থাকিবে।

(১১) শাসনতন্ত্রের এমন কোন ব্যাখ্যা করা চলিবে না যাহা কোরাণ বা সুন্নাবিরোধী।"

শান্তি ও স্বস্তি মিশন

শ্রীসতীন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে একটি শান্তি ও স্বস্তি মিশন আগমন করিয়াছিল। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এই মিশনে আগমন করেন:

(১) মুন্সি আবদুল মজিদ, (২) আমিরুল ইসলাম, (৩) জগবন্ধু মণ্ডল, (৪) ললিতকুমার বল, (৫) মৌঃ ওবায়েদুল হক, (৬) মৌঃ বি. ডি. হবিবুল্লাহ, (৭) উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, (৮) মৌঃ সমসের আলী, (৯) শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত, (১০) শ্রীসতীন্দ্রনাথ সেন।

ইঁহারা পশ্চিমবঙ্গ গবর্ন্মেণ্টের অতিথি ছিলেন এবং বরিশাল হইতে অনেক উদ্বাস্তু শিবির ঘুরিয়া উদ্বাস্তুদের মনোভাব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কলিকাতার সংবাদপত্রে ইঁহাদের গতিবিধির কিছু কিছু বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তার মূল্য কতটুকু এখনও তাহা বলা কঠিন। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায়ের মনোভাবের উপর তাহা বহুলাংশে নির্ভর করে। এই শান্তি ও স্বস্তি মিশনের ইতিহাস সম্বন্ধে "বরিশাল হিতৈষী"র ৩রা মাঘ সংখ্যায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমাদের জানিয়া রাখা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল:

"বরিশাল বার এসোসিয়েশনে বসিয়া মৌলবী সমশের আলি এই মিশনের পরিকল্পনা করেন এবং তথাকার এক সভায় বার এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে এই মিশন যাইবে স্থির করা হয় এবং ইহাদের যাতায়াত ব্যয় বাবদ ২০০৲ টাকা বার এসোসিয়েশন দিতে স্বীকৃত হন। তখনই একটি কমিটি গঠন করা হয়, তাহাতে মৌঃ শমশের আলি, মৌঃ হবিবুল্লা, মৌঃ ওবায়েদুল হক ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মেম্বর হন। তদবধি সমস্ত আয়োজন চলিতে থাকে।

"তারপর শ্রীশরচ্চন্দ্র গুহের বাসার সভায় শ্রীসতীন্দ্রনাথ সেন বলেন, তাঁহার অজ্ঞাতে এবং অসম্মতিতে তাঁহার নাম প্রদত্ত হইয়াছিল। পরে যাইবার জন্য তিনি কয়েকটি সর্ত্ত দেন। তিনি বলেন, মিশন যাওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই, কারণ

যাহারা গিয়াছে তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার পূর্ব্বে যাহারা এখনও এখানে আছে তাহাদের মনে নিরাপত্তার বিশ্বাস জন্মান হউক এবং তাহা করিতে হইলে কি করণীয় তাহার একটি তালিকা দেন। তাহা করিবার মালিক হইলেন কর্ত্তৃপক্ষ। তিনি বলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নাকি বলিয়াছেন যে, টাকা দিবার অধিকার গবর্ণমেণ্টের, তাঁহারা টাকা মঞ্জুর করিলেই তিনি ব্যয় করিতে পারেন ; না দিলে পারেন না। কাজেই শুভেচ্ছা মিশন সম্বন্ধে তাঁহার কিছু বক্তব্য বা করণীয় নাই। আপনারা ঢাকায় পত্র লিখুন।

"তদনুসারে ঢাকায় পত্র লেখা হয়। তারপর কলিকাতায় পত্র লেখা হয়। সতীনবাবু বলেন, এই সময় তিনি কুমিল্লায় ছিলেন। বরিশাল হইতে তাঁহাকে টেলিগ্রাম করা হয়, তিনি কলিকাতায় যান। পরে তথায় টেলিগ্রাম যায় যে, মিশনের যাত্রা স্থগিত করা হইল। তিনি ফিরিয়া আসিয়া মৌঃ সমসের আলির নিকট সমস্ত কথা শুনেন। তারপর দিন এই মিশন সম্বন্ধে মৌঃ সমসের আলি যত পত্র ও তার প্রেরণ করিয়াছেন তাহা দেখিতে চাহেন। সতীনবাবু বলেন যে, পত্রাদি পড়িয়া তিনি অবাক হইয়াছেন, কোথায় কলিকাতা হইতে বাস্তুত্যাগী-দিগকে ফিরাইয়া তাহাদিগের পুনর্ব্বাসনে সাহায্য করা, সে সব বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রীর নিকট ৪ঠা ডিসেম্বর পত্র লেখা হইয়াছে; তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে লেখা হইয়াছে—

"We do not commit our Government to any financial obligations.'—'আমাদের গবর্ণমেণ্টকে আমরা কোনও আর্থিক দায়িত্বের মধ্যে ফেলিতে চাই না।' আমরা চাই শুধু blessings—আশীর্ব্বাদ, আর আপনারা পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণমেণ্টের কাছে পত্র লিখুন যাহাতে তাঁহারা আমাদিগকে আহার বাসস্থান, উৎপীড়িত স্থান ও ক্যাম্পগুলি দেখিবার সুবিধা করিয়া দেন। প্রধানমন্ত্রী এ পত্রের উত্তর দেন না। তারপর ১৭ই তারিখ তার করা হয় - ১৯শে তারিখ পত্র আসে যে, আমরা বাস্তুত্যাগীদের জন্য যাহা করিতেছি তাহাই করিব। আর পশ্চিমবঙ্গকে আমরা ঐরূপ কোনও অনুরোধ করিতে পারিব না। আপনারা নিজেরা তাহাদিগকে পত্র লিখুন। তদ্রূপ পত্র লেখা হয় মিঃ সি. সি. বিশ্বাস মহাশয়কে। তিনি লেখেন, আমার গবর্ণমেণ্ট কি করিতেছেন না করিতে-ছেন সে বিষয় আপনাদের কিছুই করিবার, বলিবার বা জানিবার অধিকার নাই—তবে আপনারা আসিলে আপনা-দিগের থাকিবার, খাইবার বন্দোবস্ত করা হইবে এবং দু-একটি ক্যাম্পও দেখান যাইবে—তবে সতীন বাবুকে যেন সঙ্গে আনেন।

"অতঃপর শ্রীশরৎ চন্দ্র গুহ, শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এই পত্রাবলী সম্বন্ধে কি জানেন তাহা বলিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে সুরেশবাবু বলেন এই পত্রাদি তাঁহাকে দেখানও হয় নাই, অতএব তিনি এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। তবে তিনি যাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

"অতঃপর মৌঃ আমিরুল ইসলাম উকিল বলেন যে বার লাইব্রেরী হইতে মিশন যাইবে মন্তব্য গ্রহণ করা হইয়াছে অথচ প্রবীণ মেম্বর মৌঃ হাসেমালি খাঁ, আবদুল ওয়াহব খাঁ, মফজ্জল হক, আজিজখী প্রভৃতিকে কিছুই জানান হয় নাই।

"শ্রীজগবন্ধু মণ্ডল বলেন যখন বার এসোসিয়েসন মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন তখন সুরেশবাবু প্রভৃতি বাহিরের লোকের মেম্বর হওয়ার অধিকার নাই।

"অতঃপর শরৎবাবু বলেন কাজটা অত্যন্ত ছেবলামি হইয়াছে কিন্তু এখন বিদেশীর নিকট লজ্জা পাওয়া উচিত নহে। সতীন্দ্রবাবুও এই মত সমর্থন করেন।"

কোরিয়ার যুদ্ধ

গত সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে যখন ইমচন বন্দরে অবতরণ করিয়া জেনারেল ম্যাকআর্থার উত্তর কোরিয়া বাহিনীকে মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে ইয়ালু নদী তীর পর্য্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া গেলেন, তখন "ধন্য ধন্য" রব উঠিয়াছিল। তাহার পর দুই মাস কম্যুনিষ্ট বাহিনী পদে পদে হটিয়া যাইতে লাগিল ; শেষের দিকে তাহারা উত্তর কোরিয়ার পাহাড় পর্ব্বতে, বনজঙ্গলে এমনি করিয়া গা-ঢাকা দিল যে মার্কিনী বিমান বা মার্কিনী অনুসন্ধানকারী খবরাখবর সংগ্রহকারী দল তাহাদের কোন পাত্তাই পাইল না। মার্কিনী সমরনায়কগণ মনে করিলেন যে কম্যুনিষ্ট বাহিনী নিঃশেষ হইয়াছে, এবং তাঁহারা কোরিয়া যুদ্ধ শেষ করিবার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করিলেন যে, খ্রীষ্টমাসের সময়ে মার্কিনী সৈন্যসামন্তকে তাঁহারা দেশে লইয়া গিয়া খ্রীষ্টমাস উৎসবে যোগদান করিতে সক্ষম হইবেন। গত ২৩শে নবেম্বর তাঁহারা এতদর্থে নূতন করিয়া আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ২৭শে নভেম্বর কম্যুনিষ্ট বাহিনী কোথা হইতে যে বাহির হইয়া আসিল তাহা আজ পর্য্যন্তও কেহ বলিতে পারিতেছেন না। তাহাদের আক্রমণে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের সৈন্যবাহিনী হটিয়া যাইতে বাধ্য হইল। পরের দুই মাসের মধ্যে কম্যুনিষ্ট বাহিনী আগাইয়া চলিল, দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সেওল পুনরধিকার করিল, এবং জেনারেল ম্যাকআর্থারের অধীনস্থ সেনাপতিবৃন্দ পর্য্যন্ত বলিতে লাগিলেন যে সংবাদ সংগ্রহ ব্যাপারে কম্যুনিষ্টরা মার্কিনীদের ঠকাইয়া দিয়াছে ; নানাবিধ কৌশলে তাহাদের বিভ্রান্ত করিয়াছে। তাহার পর আবার চাকা ঘুরিল। এবার সম্মিলিত জাতীয়-বাহিনীর যুদ্ধযন্ত্রের প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষণের চোটে চীনা ও উত্তর-কোরিয়ার সেনাদল হটিতে লাগিল। এখন সেওল-ইমচন পুনর্ব্বার মার্কিণ সমরনায়কদিগের অধিকৃত

হইবার মুখে আসিয়াছে। এইরূপে যুদ্ধে জোয়ার-ভাটা চলিতেছে, শেষ কোথায় জানা যায় না। এখন শান্তির পথে চলার আয়োজন কি হয় তাহাই দ্রষ্টব্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এশিয়া-নীতি

যত দিন যাইতেছে ততই দুনিয়ার চিন্তাশীল নর-নারীর মনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এশিয়া-নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। "ওয়ারল্‌ড ইন্‌টারপ্রেটার" নামক মার্কিনী পত্রিকায় ২২শে ডিসেম্বর সংখ্যায় এইরূপ বিরূপ ভাবের সৃষ্টি ও বৃদ্ধির কারণ সম্বন্ধে একটি আলোচনা আছে। সম্পাদকদ্বয় ডেভিয়ার এলেন ও ম্যারি এলেন কর্তৃক তাহা লিখিত। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রেই এই পত্রিকার সংবাদদাতা আছেন; তাঁরা সেই-সেই রাষ্ট্রের "ভিতরের কথা" সম্পাদককে জানান এবং তিনি তাহা অনুবাদ করিয়া নিজের মতামত পাঠকবর্গের নিকট পরিবেশন করেন।

এই সংখ্যায় মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবর্গের মনোভাব বিবৃত হইয়াছে এবং সেই মনোভাব অত্যন্ত বিরূপ। এই পরিণতির কারণ বুঝা কঠিন নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "দানবীয়" শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের বিকাশ পৃথিবীর লোককে সন্ত্রস্ত করিয়াছে। কোন অবোধ্য কারণে মার্কিনী সদিচ্ছার উপর কেহই ভরসা করিয়া থাকিতে পারিতেছে না। এশিয়া খণ্ড সম্বন্ধে মার্কিনী রাষ্ট্র পরিচালকবর্গ অকুণ্ঠ ভাষায় তাঁদের নীতি বিবৃত করিয়াছেন। ওয়ালটার লিপম্যানের মত বিখ্যাত ব্যাখ্যাতা সেই নীতির গুহ্য ভাব বর্ণনা করিয়াছেন "ওয়াশিংটন পোষ্ট" পত্রিকায়। তার চুম্বক পাঠ করিলে তাহা বুঝা সহজ হয়:

"চীনে রাশিয়া যে সাম্রাজ্যবাদীসুলভ নীতি অনুসরণ করিতেছে তাহা নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করিয়া এবং করমোসা বা অন্য কোথাও মার্কিন সামরিক সাহায্য পাঠাইতে অস্বীকার করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়া সম্পর্কে তাহার অনুসৃত নীতির সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়াছে।

"মার্কিন রাষ্ট্রসচিব ডীন এচেসন সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে এশিয়া-নীতি সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সূক্ষ্মরাজনীতি জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, এশিয়ায় বর্ত্তমানে যে বিরাট বিরাট বিপ্লবের অভ্যুত্থান হইতেছে সে সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিও এরূপ সূক্ষ্মভাবেই বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। তিনি বলেন, এই জাতীয় বিপ্লব হইতেই স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে জন্ম লইয়াছে ভারতবর্ষ, পাকিস্থান এবং ইন্দোনেশিয়া; ইহারই ফলে এশিয়া হইতে অপসারিত হইয়াছে ব্রিটিশ, ওলন্দাজ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল।

"মিঃ এচেসন প্রমুখ ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টের অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে ষ্টালিনপন্থী কম্যুনিজম সেই মধ্যযুগীয় রুশ সাম্রাজ্যবাদের রূপান্তর মাত্র। এমন অনেকে আছেন যাঁহারা মনে করেন যে বর্ত্তমানের রুশ সাম্রাজ্যটি বুঝি আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনকে শক্তিশালী করিবার জন্যই রহিয়াছে। তাঁহারা এখানে মস্ত বড় ভুল করেন। টিটোর ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে তাহা ত আর তাঁহাদের অবিদিত নাই। মাও সে-তুংও অদূর ভবিষ্যতে সেই পথেরই যাত্রী হইবেন; তিনিও বুঝিতে পারিবেন কমিনফর্ম্ম কখনও রুশভালুককে বিরক্ত করে না। দানিয়ুব উপত্যকায়, বলকানরাষ্ট্রসমূহে, তুর্কী, ইরাণ, মাঞ্চুরিয়া এবং বহিঃ ও অন্তর্মঙ্গোলিয়ায় রাশিয়া যে নীতি অনুসরণ করিয়াছে কার্ল মার্কসের কোন লেখায় তাহা অনুমোদন করে না নিশ্চয়ই।"

মার্কিণের ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্রদূত ডাঃ ফিলিপ জেসাপ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই নীতি সম্বন্ধে মার্কিণ কর্তৃপক্ষের মতামত বিবৃত করেন ৫ই মাঘ তারিখে:

"যদিও ইতিপূর্ব্বে বহুবার সরকারীভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এশিয়া এবং দূর-প্রাচ্যনীতি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তবুও ইহার পুনরুক্তি কিছু দোষের নহে। সংক্ষেপে এগুলিকে নিম্নোক্তরূপে বিশ্লেষণ করা যায়:

প্রথম—বলপ্রয়োগ বা নাশকতামূলক কর্ম্মসূচীর দ্বারা কোন গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদসাধনের যে নীতি রাশিয়া কর্তৃক অবলম্বিত হয়, আমরা তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। আমরা ভবিষ্যতেও এই নীতির বিরোধিতা করিব।

দ্বিতীয়—আমরা সর্ব্বপ্রকারের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব বা সেইরূপ কার্য্যের বিরোধী। সাম্রাজ্যবাদ যে-কোন রূপ লইয়াই আসুক না কেন আমরা কখনই তাহা সমর্থন করি নাই, ভবিষ্যতেও করিব না।

"যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করে যে, যে-কোন দেশের জনসাধারণই সেখানকার রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃত নিয়ামক; কোন বিদেশী শক্তির তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই। কোন দেশের বর্ত্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের সময় তাহাতে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বা বলপ্রয়োগ সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ কাজ বলিয়া আমরা মনে করি। দেশের জনসাধারণের ইচ্ছায় দ্বারা এইরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়া উচিত।

"যুক্তরাষ্ট্র চিরদিনই চীনের স্বাধীনতা কামনা করে। চীনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হউক, ইহাই আমরা সকল সময় চাই। বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় থাকিলে তাহা বিশ্বশান্তি রক্ষার বিশেষ সহায়ক হয়।

"এশিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বজায় থাকুক, যুক্তরাষ্ট্র আন্তরিকভাবেই তাহা কামনা করে। গত দেড় শত বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহা অতি স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যায়। আমরা ভবিষ্যতেও এশিয়াবাসীদের স্বাধীনতা সমর্থন করিব, কারণ আমরা জানি যে ইহা কেবল তাহাদের

নয়, ইহা আমাদের তথা সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়।

"একজন বেসরকারী নেতা, কংগ্রেস অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অর্গানাইজেশনস-এর অন্তর্ভুক্ত ইউনাইটেড অটো ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ওয়াশিংটন শাখার অধ্যক্ষ ডোনাল্ড মণ্টগমারি প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের 'চতুর্থ-দফা সাহায্য পরিকল্পনা' সম্পর্কে বিবৃতিদান প্রসঙ্গে ইহাকে প্রকৃত শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত একটি সুনিশ্চিত কর্মপন্থা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের ফরেন এফেয়ার্স কমিটিতে 'চতুর্থ দফা প্রস্তাব' সম্পর্কে যে শুনানী চলিতেছে মিঃ মণ্টগমারি তাহাতেই তাঁহাদের সংগঠনের মত ব্যক্ত করেন।

"এই কর্ম্মসূচী গৃহীত হইলে জগতের লক্ষ লক্ষ নর-নারী প্রকৃত গণতন্ত্রের শক্তি এবং তাহার মূল্য সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারিবেন। এই সমস্ত নরনারী ইতিপূর্ব্বে কখনও প্রকৃত গণতন্ত্র কি তাহা জানিবার বা বুঝিবার সুযোগ পান নাই।

"প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত অনগ্রসর এলাকায় নরনারীর দারিদ্র্য কেবল তাঁহাদের নয়, সমগ্র জগতের পক্ষেই বিপজ্জনক। আমরা প্রেসিডেণ্টের এই উক্তিকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়াই মনে করি। জগতের যে সমস্ত এলাকায় এখনও স্বাধীনতা বর্ত্তমান তাহাদের আশু কর্ত্তব্য, জগতের সমস্ত নর-নারীর সেবার জন্য জগতের ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার একত্রিত করিয়া সমান ভাবে তাহা বণ্টন করা। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়াছেন এবং এইজন্যই আমরা ইহাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

"অনগ্রসর দেশের শ্রমিক শ্রেণীকে উন্নত দেশসমূহের শ্রমিক শ্রেণী কর্ত্তৃক অনুসৃত যৌথ আলোচনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সমস্ত দেশে প্রকৃত শিল্পোন্নয়ন করিতে হইলে তথাকার শ্রমিকদিগকে এই যৌথ আলোচনার প্রয়োগ এবং তাহার সুফল সম্বন্ধে ভালভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য ইহা একটি অত্যাবশ্যক উপকরণ, এ কথা আমাদিগকে সব সময়েই মনে রাখিতে হইবে।"

এত সব সদিচ্ছা প্রকাশ, এত সব ব্যাখ্যার পরও দুনিয়ার চিন্তাশীল নর-নারীর মন হইতে মার্কিনী নীতি সম্বন্ধে ভয় ও সন্দেহ কেন দূর হইতেছে না, তার কারণ বুঝিবার চেষ্টা করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তা-নায়কবৃন্দের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। তাহা না হইলে কুবেরের ভাণ্ডার উজাড় করিয়া দিলেও সব ভস্মে ঘি ঢালার সমান হইবে। চীনের দৃষ্টান্ত তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

ভারত-মার্কিনী চুক্তি

গত ১২ পৌষ দিল্লী নগরীতে ভারতরাষ্ট্র ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। সংবাদপত্রে তার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোন কোন অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক চৌদফা সাহায্য প্রদান পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। চুক্তিপত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে নয়াদিল্লীস্থ মার্কিন দূত মিঃ লয় হেণ্ডারসন এবং ভারতের পক্ষে পররাষ্ট্র বিভাগের প্রধান সচিব শ্রী জি. এস. বাজপেয়ী স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই চুক্তি অনুযায়ী ভারতের বড় বড় পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে যে সমস্ত কারুবিদের প্রয়োজন হইবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহা দিয়া ভারতের সহযোগিতা করিবে। বিশেষ বিশেষ পরিকল্পনার জন্য আমেরিকার বিশেষজ্ঞগণ সাহায্য করিবেন এবং সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয়গণকে আমেরিকায় শিক্ষালাভের সুবিধা দিবেন।

ভারত আমেরিকার নিকট হইতে ইহাই প্রথম সাহায্য পাইতেছে। এই সাহায্যের জন্য বার লক্ষ ডলার ব্যয় হইবে।

এই চুক্তিতে চারিটি দফা আছে ; যথা—(১) সাহায্য ও সহযোগিতা, (২) তথ্য জ্ঞাপন ও প্রচারকার্য্য, (৩) কার্য্যক্রম ও পরিকল্পনা এবং (৪) সাহায্যদাতা ব্যক্তিবর্গ। এই চৌদফা চুক্তি অবিলম্বে বলবৎ হইবে।

ভারত-সরকার আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে কৃষি-পরিকল্পনার জন্য কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে পাইয়াছেন। কৃষি, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অন্যান্য বহুমুখী পরিকল্পনার জন্য ভারত-সরকার শীঘ্রই মার্কিন বিশেষজ্ঞদের সাহায্য এবং ভারতীয়দিগকে ঐ সমস্ত কার্য্যে শিক্ষাদানের সুবিধা দিবার জন্য অনুরোধ জানাইবেন।

এই চুক্তি সম্পর্কে একটি প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, এই চুক্তি একটা ভিত্তিস্বরূপ। এই চুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই ভবিষ্যতে যখন যখন যে পরিকল্পনার জন্য চুক্তি করা প্রয়োজন হইবে, তখন তখন তাহা করা হইবে।

ভারতের বিষয়-সম্পদের সমাহরণ এবং সুস্থিতি বিধানের জন্য প্ল্যানিং কমিশন যে সমস্ত পরিকল্পনায় রত আছেন, সে সমস্ত পরিকল্পনায় উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে তত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান ও কর্ম্মকুশলতার বিনিময়ের ব্যবস্থা এই চুক্তিতে করা হইয়াছে। এই চুক্তিতে আরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে এই সহযোগিতার কার্য্য সমবেত ও সংহতভাবে করার চেষ্টা করা হইবে। এই সমবেত ও সংহত করা ভারত-সরকারের অর্থবিভাগের বৈষয়িক দপ্তরের মধ্য দিয়া চলিবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যাঁহাদিগকে এই কার্য্য সম্পর্কে ভারতে নিযুক্ত করা হইবে তাঁহারা করপ্রদান ও বাণিজ্যশুল্ক হইতে রেহাই পাইবেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের অধীনে বিশেষজ্ঞদের যে

প্রতিষ্ঠান আছে, সেই প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ এইরূপ সুবিধা পাইয়া থাকেন।

এই পদ্ধতি অনুসারে যে সাহায্য পাওয়া যাইবে তাহা সাধারণতঃ বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য সুদক্ষ লোকের সাহায্য এবং ভারতীয়দের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেই সমস্ত কার্য্যে শিক্ষালাভের সুযোগ। এজন্য যে খরচ হইবে, তাহার কতটা কে দিবে, তাহা স্থির হইবে উভয় দেশের মধ্যে পরামর্শক্রমে। সাধারণতঃ বিশেষজ্ঞদের বেতন ও থাকার খরচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহন করিবে। স্থানীয় খরচ—যেমন অফিসের জায়গা, জমি, কর্ম্মচারীদের খরচ এবং যানবাহনের খরচ দিবে ভারত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সমস্ত ভারতীয় শিক্ষালাভের জন্য যাইবে তাহাদিগকে শিক্ষার খরচ এবং ভারত হইতে যাইবার খরচ মার্কিন সরকার দিবেন। আমেরিকায় থাকা-কালীন তাহাদের অন্যান্য যে সমস্ত খরচ হইবে এবং তাহাদিগকে যে বেতন দেওয়া হইবে, তাহা দিবেন ভারত-সরকার। কারু কৌশল দেখাইবার জন্য আনুষঙ্গিক যে সমস্ত খরচ হইবে তাহা মার্কিন সরকার দিবেন।

কৃষি পরিকল্পনার জন্য ভারত-সরকার আগেই মার্কিন সরকারের নিকট হইতে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ পাইয়াছেন। তন্মধ্যে একজন আছেন সেণ্ট্রাল ট্রাক্টর অর্গেনাইজেশনের জন্য, একজন আছেন কৃষি-বিশেষজ্ঞ এবং আর একজন আছেন বৃক্ষ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। কৃষির প্রসারের উপায় শিক্ষার জন্য আমেরিকায় ভারত-সরকারের প্রেরিত দুই জন লোক আছেন। মার্কিন সরকার তাঁহাদিগকে শিক্ষালাভের সুযোগ দিতে সম্মত হইয়াছেন। কিরূপ বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন এবং ভারতীয়দিগকে কিরূপ শিক্ষা দিবার প্রয়োজন তাহার একটা তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ তালিকা শীঘ্রই মার্কিন সরকারের নিকট প্রেরিত হইবে। ভারতে যে সমস্ত পরিকল্পনার কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, যেগুলির সুযোগ ভারতে নাই, সে সমস্ত কার্য্যে এবং কৃষি, বহুমুখী পরিকল্পনা, রাস্তাঘাট, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরিকল্পনা সম্বন্ধে ভারতীয়দিগকে শিক্ষা-লাভের সুবিধা দিবার জন্য অনুরোধ করা হইবে।

শ্রীজবাহরলাল নেহরু তাড়াতাড়ি ভারতবর্ষে জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে চান। সেই উদ্দেশ্যেই বিদেশ হইতে এরূপ ঋণ ও বিশেষজ্ঞ আমদানীর আয়োজন চলিতেছে। দেশের রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন কিছু লোকের মনে কিন্তু এরূপ ঋণ সম্বন্ধে একটা সন্দেহ ও ভীতি আছে। সাম্যবাদীগণের মনোভাব এইরূপ, মার্কিনী অর্থ যাহা পাওয়া যাইবে তাহা ভারতীয় পুঁজিবাদীদের হাতে যাইবে, এবং তার বলে তাঁরা ভারতীয় শ্রমিকদের উপর অত্যাচার চালাইবে। এই যুক্তি নূতন চুক্তির বিরুদ্ধে প্রযোজ্য নয়। ভারতরাষ্ট্রের পরিচালনায় উন্নতির পরিকল্পনাসমূহের রূপদান করা হইবে, শ্রমিক-জীবনে যে নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের ব্যবস্থা হইবে তাহা সাম্যবাদের ব্যবস্থা অনুযায়ী হইবে। তবে সন্দেহ ও ভীতির অবসর থাকিবে বরাবরই যত দিন আমরা অর্থসঙ্গতি সম্বন্ধে স্বাধীন না হইতে পারি। আমাদের রাষ্ট্রের পরিচালকবর্গের দৃঢ়তা ও কৌশল থাকিলে এই বিপদ কাটিয়া যাইবে। অন্যান্য দেশেও তাহা হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃবর্গ মেক্সিকোর অভিজ্ঞতা হইতে সাবধান হইবেন, আশা করি।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে "দাস" মজুর

তিন চারি বৎসর হইতে পাশ্চাত্য জগতে এই কথাটা প্রচারিত হইতেছে যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রে যুদ্ধের বন্দীদের প্রতি দাসবৎ আচরণ করা হয় এবং অনেক সোভিয়েট নাগরিককেও এইরূপ ভাবে খাটাইয়া দেশের কৃষি ও শিল্পাদি কার্য্যের উন্নতি করা হইতেছে। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট এই সব কথা শত্রুর প্রচার বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এই বিষয়ে তর্কবিতর্ক থামিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

সম্প্রতি ফরাসী দেশে ইহা আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে। ডেভিট রাউসেট নামক একজন প্রসিদ্ধ লেখক অনেক দিন হইতে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনিতেছেন, এবং প্যারী নগরীর একখানি কম্যুনিষ্ট সাপ্তাহিক, লা লেটার্স ফ্রান্সেস, তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে তিনি সোভিয়েট রাষ্ট্রের শত্রু এবং প্রচার চালাইবার জন্য নানারূপ তথ্য ও প্রমাণাদি জাল করিয়াছেন। ঐ সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ক্লড মরগান ও মানহানিকর প্রবন্ধের লেখক পিয়ে ডেইক্সের বিরুদ্ধে লেখক মানহানির মামলা আনয়ন করেন।

কয়েক সপ্তাহ মামলার পর জজ আসামীদের দণ্ডিত করিয়াছেন; তাহারা অর্থদণ্ড দিয়া রেহাই পাইয়াছে। এই মোকদ্দমা উপলক্ষে কম্যুনিষ্ট সুলভ গালাগালি আদালতগৃহে ধ্বনিত হইয়াছে।

আমরা বুঝিতে পারিতেছি না সোভিয়েট রাষ্ট্র একটা আন্তর্জাতিক অনুসন্ধানের সুযোগ দিয়া এই বিষয়ের চূড়ান্ত সত্যাসত্যের নির্ণয়ে সাহায্য করেন না কেন। যখন "দাস" শিবিরে বাস করিয়াছে এরূপ সহস্র সহস্র লোকের নানাবিধ সাক্ষ্য আছে এবং পাশ্চাত্য জগতে তাহা প্রচারিত হইতেছে।

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের সম্পর্ক

সম্প্রতি ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুন নগরীতে ব্রহ্ম-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের ৫ম অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী কুলপতি (ভাইস-চ্যান্সেলার) ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতি ছিলেন। তদুপলক্ষে অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতি শ্রীপ্রফুল্লকান্ত বসুর বক্তৃতার মধ্যে ভারতবর্ষ

ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে প্রাচীন সম্বন্ধের একটা পরিচয় পাই। তাহার কোন কোন অংশ তুলিয়া দিলাম :

"বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তাপুসা ও বালুকা নামক দুই জন উৎকলবাসী বণিক ভগবান বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁহারা তথাগতের মস্তকের আটটি কেশ লাভ করেন এবং কেশগুলি স্বদেশে আনিয়া তাহার উপর একটি বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। বর্ম্মীগণের বিশ্বাস, বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লিখিত উৎকল ভারতের অন্তর্গত নহে, দক্ষিণ ব্রহ্মের অংশ এবং যে বৌদ্ধ মন্দিরের কথা বলা হইয়াছে তাহা রেঙ্গুনের সোয়েডাগন প্যাগোডা। কারণ উৎকলের (উড়িষ্যা) বহু অধিবাসী দক্ষিণ-ব্রহ্মে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা ভারতের উড়িষ্যায় এমন কোন প্রসিদ্ধ মন্দিরের কথা জানি না যাহার নীচে ভগবান বুদ্ধের কেশ প্রোথিত আছে বলিয়া কথিত। উপরোক্ত বিশ্বাস অমূলক, কোন ঐতিহাসিক তাহা বলেন নাই। বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে আমরা ইহাও জানিতে পারি যে, ভারতের স্বনামধন্য বৌদ্ধ সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য উত্তরা ও সোনা নামক দুই জন ধর্ম্মপ্রচারককে সুবর্ণভূমিতে পাঠাইয়াছিলেন।...

"বর্ম্মীদের মূল উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে। কেহ কেহ তাহাদিগকে তিব্বতী চীনা ও কেহ কেহ তিব্বতী-দ্রাবিড় বলিয়া মনে করেন। তবে এই উভয় দলই এ বিষয়ে একমত যে, তাহারা ব্রহ্মে আসিবার পূর্ব্বে দীর্ঘকাল ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বাস করে এবং উত্তরবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গেরও কতকাংশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বর্ম্মী ও শানদের সংস্কৃতিতে কোন চীনা প্রভাবের সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের সমস্ত সংস্কৃতি হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি। সুতরাং বাঙালীরা জাতিগত, সংস্কৃতিগত ও ভৌগোলিক দিক দিয়া বর্ম্মীদের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ত্তমানে এই দুই জাতির মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ নাই এবং এ বিষয়ে কোন প্রামাণ্য পুস্তকও নাই।

"বর্ত্তমান ব্রহ্মেও আমরা অতীত সম্পর্কের চিহ্ন দেখিতে পাই। ইহা সুবিদিত যে, বর্ম্মী ভাষার বর্ণমালা ভারতীয় বর্ণমালারই সামান্য রূপান্তর। ভাষাবিদ্‌গণ বাংলা ভাষা ও বর্ম্মী ভাষার মধ্যে একটি সাদৃশ্যও দেখাইয়াছেন।"

অতীতে যেমন বর্ত্তমানে তেমনি পরদেশীকে কেহই সহজে সহ্য করিতে পারে না। সম্বন্ধের দৃঢ়তা হইতে সময় লাগে। বর্ত্তমানে এই দুই দেশের অধিবাসীর মধ্যে যে তিক্ততা দেখা যায়, তাহার আসল কারণ অর্থনৈতিক। ইংরেজের পক্ষপুটের আশ্রয়ে থাকিয়া আমরা রাজকার্য্যে, ব্যবসায়ে ও শিল্প-সংগঠনের ক্ষেত্রে বর্ম্মীদিগকে কতটা কোণঠাসা করিয়াছিলাম। তাহার প্রতিক্রিয়ার ফলে হয়ত বর্ত্তমানের তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছে। এখন স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে দুই দেশের লোকের মধ্যে নূতন সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে হইবে। রামকৃষ্ণ মিশন, আর্য্য সমাজ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সংস্কৃতির সাহায্যে এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক।

চা-রপ্তানি

শত বর্ষ পূর্ব্বে

সাল				টাকা
১৮৪৮-৪৯	...	...	...	৩,৫৫,২৫০
১৮৪৯-৫০	...	...	...	২,৭২,৩১০

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে

সাল		হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা
১৮৯৮-৯৯	...	১৫,৯৮,০৬	৮,১৪,৪৮
১৮৯৯-১৯০০	...	১৭,৬৩,৮৭	৯,০৯,২১

গত তিন বৎসরে

সাল		পাউণ্ড হাজার	টাকা হাজার
১৯৪৭-৪৮	...	৩৮,৩৯,৮৫	৫৪,৯০,১৫
১৯৪৮-৪৯	...	৪০,৩৯,০৭	৬৩,৬৯,৩২
১৯৪৯-৫০	...	৪৩,৯৬,০৫	৭২,০৫,৭৩

চায়ের পাঁচটি প্রধান ক্রেতা

নাম		পাউণ্ড হাজার	টাকা হাজার
ইংলণ্ড	...	২৭,৫৩,৯৭	৪২,১১,১৪
আমেরিকা	...	৩,৭০,৩৭	৬,৭০,৭২
কানাডা	...	২,৬৫,১২	৪,৬২,৫৭
ইরাণ	...	১,২০,২৫	২,৯৮,৭৭
অষ্ট্রেলিয়া	...	১,৬৬,৭৮	২,৭৮,৪৮

এই তথ্যগুলি জানিয়া রাখার প্রয়োজন আছে। চায়ের উৎপাদন ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। প্রথমতঃ যদি আমাদের দেশের লোক চায়ের ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়, তবে এই একটি শিল্পের কল্যাণে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকা উপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত হইবে। দ্বিতীয়তঃ দেখা যায় যে ইংলণ্ড এখনও আমাদের চায়ের ব্যাপার বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া আছে। এই বাণিজ্যের লাভ লোকসান এমন কি অস্তিত্বও তাহার ইচ্ছাধীন।

ম্যালেরিয়া বিতাড়ন

"প্রচার" (বাঁকুড়া) পত্রিকার গত অগ্রহায়ণ মাসের এক সংখ্যায় নিম্নলিখিত মন্তব্যটি পাঠ করিয়া আশান্বিত হইলাম। বাঁকুড়ার উদাহরণ দিকে দিকে অনুসৃত হউক :

"দেশের পল্লীগুলির উন্নয়ন করিতে হইবে—কারণ পল্লীই

দেশের প্রাণ—সরকারী বেসরকারী, কংগ্রেসী অ-কংগ্রেসী সকলেই এই একই কথা বলিয়া আসিতেছেন এবং ক্ষেত্র-বিশেষে চেষ্টাও কিছু কিছু হইতেছে। এ বৎসর বাঁকুড়া জেলার শহরে ও পল্লী অঞ্চলে ম্যালেরিয়া বিতাড়নের চেষ্টা করা হইয়াছে, ফলে ম্যালেরিয়া এ বৎসর আদৌ নাই বলিলেই হয়। ইহাতে পল্লীগুলির যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। পল্লীর জনগণও সরকারের এইরূপ পল্লী-মঙ্গল-কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। ইহার মূলে একটি ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসটি এই যে এই কার্য্যে যে কয়জন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্থায়ী কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা জনগণের প্রতিনিধি-স্থানীয় লোকজনের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ করেন। যাঁহারা ডি-ডি-টি স্প্রে কার্য্যে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা জেলার পল্লী-অঞ্চলেরই ছেলে৷ তাঁহারা মনে প্রাণে ইহা বুঝিয়াছে যে, তাঁহারা যদি কর্ত্তব্য কর্ম্মে ফাঁকি দেন তাহা হইলে তাঁহাদেরই জীবন বিপন্ন হইবে, তাঁহাদের গ্রামগুলি ম্যালেরিয়া আক্রমণে বিধ্বস্ত হইবে।"

মেদিনীপুরে ভাল তুলার চাষ

এক সংবাদে প্রকাশ, ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর বাঁকুড়া ও বহরমপুরে ভাল কাপড় প্রস্তুতের জন্য লম্বা আঁশযুক্ত তুলাচাষের এক পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনানুযায়ী ভারতীয় কেন্দ্রীয় তুলা কমিটি ৩,৮০,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, যেসব জমি সাধারণতঃ পতিত পড়িয়া থাকে, সেগুলি কাজে লাগাইলেই এইরূপ উচ্চগুণসম্পন্ন তুলার চাষ সম্ভব হইবে, ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও আর্থিক উভয়েরই যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইবে।

তমলুকের "প্রদীপ" পত্রিকায় উপরোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে। এদিকে শুনিতে পাই বিদেশ হইতে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা না আসিলে দু'তিন মাসের মধ্যেই অনেকগুলি ভারতীয় কাপড়ের কল বন্ধ হইয়া যাইবে।

পাকিস্থান হওয়ার পরে ভারতবর্ষ হইয়াছে এই বিষয়ে আরও পরনির্ভরশীল ; ভাল তুলা ভারতবর্ষে যাহা হয়, তাহার বেশীর ভাগ জন্মাইত সিন্ধু ও পঞ্জাব। আজ পাকিস্থানের সঙ্গে বাণিজ্যক্ষেত্রেও বিবাদ ; পাকিস্থানের তুলা, গম, পাট, ধান আমরা পাইতেছি না, যেমন তাহারা পাইতেছে না আমাদের কয়লা প্রভৃতি দ্রব্য ; তাহার রেল-জাহাজ প্রায়ই বন্ধ হইয়া যাইতেছে।

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যই খাদ্যশস্যের উপযোগী লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি তুলা ও পাট উৎপাদনে নিযুক্ত হইয়াছে এবং আমাদের খাদ্য-সমস্যা আরও বিপজ্জনকভাবে বাড়িতেছে। খাদ্যশস্য, পাট, তুলা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বস্তুর উৎপাদন বাড়াইতে হইলে আমাদের আরও পরিশ্রমী ও কৌশলী হইতে হইবে। সেই পথে অগ্রণী হইবে কাহারা, তাহাই ভারত-রাষ্ট্রের সর্ব্বাপেক্ষা বিরাট প্রশ্ন।

শিক্ষা ও কৃষি উন্নয়নে যুব-সঙ্ঘ

নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার অন্তর্গত কুষ্টিয়া গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহখানি বহুদিন যাবৎ সংস্কার অভাবে জীর্ণাবস্থায় পড়িয়াছিল। সম্প্রতি স্থানীয় যুব-সঙ্ঘের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। সঙ্ঘের সভ্যগণ গৃহখানির আমূল সংস্কারের জন্য গ্রামবাসীগণের অনেকেরই সাহায্য ও সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইয়াছেন এবং তাঁহার গৃহসংস্কার কার্য্যে আমাদিগকে সাহায্য করিতেছেন।

সঙ্ঘের সভ্যগণ উদ্যোগী হইয়া গ্রামের মাঠের সমস্ত পতিত জমি চাষ করাইয়া অধিক খাদ্য উৎপাদন করাইবার জন্য কৃষক-দিগকে উৎসাহিত করিতেছেন এবং তদুদ্দেশ্যে "মডেলফার্ম্ম" কোম্পানীর কয়েকখানি 'ট্রাক্টার' আনাইয়া সম্প্রতি পতিত জমিগুলি আবাদের ব্যবস্থা আরম্ভ করিয়াছেন।

শিউড়ীর (বীরভূম) "শিক্ষা ও কৃষি" পত্রিকার সংবাদ-দাতা এই সংবাদটি প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা স্থানীয় যুবকবৃন্দের কাজের বিস্তার আকাঙ্ক্ষা করি। এইরূপ গঠন-মূলক কাজই পশ্চিমবঙ্গকে রূপান্তরিত করিবে ; তাহার অজ্ঞতা, রোগ ও খাদ্যাভাব দূর করিবে।

"গ্রামের ডাক", "গ্রাম-সেবা"

প্রথম পত্রিকাখানি আজ দু'তিন মাস হইতে পাইতেছি। নাম "গ্রামের ডাক" হইলেও কেন্দ্রস্থান কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চলে। এই পত্রিকার মুখ্য কাজ হইল শিক্ষা-বিস্তার ; এতদুদ্দেশ্যে প্রথম সংখ্যায় একটি গ্রন্থাগার "প্রচার সমিতি" প্রতিষ্ঠানের বিবৃতি দেখিলাম। আমরা এই কর্ম্ম-প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি :

"বাংলায় ও বাংলার বাহিরে প্রত্যেক পল্লীতে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রন্থাগারের মাধ্যমে পুস্তক, সংবাদপত্র, রেডিও, গ্রামোফোন ও আলোকচিত্র প্রভৃতি লোকশিক্ষাদায়ক আমোদ-প্রমোদ ও খেলাধুলার মধ্য দিয়া দেশের মধ্যে লোকশিক্ষার বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ।

"যুবকদের মন হইতে দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা ও অলসতা প্রভৃতি দূর করিয়া তাহাদের সুপ্ত ইচ্ছাশক্তিকে জাগরিত করিয়া কর্ম্ম-ক্ষম ও স্বাবলম্বী করিয়া তোলা, যাহাতে তাহারা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক উন্নতি বিধানের দ্বারা জনহিতকর ও গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারে, যাহার ফলে পরস্পর দৃষ্টিভঙ্গির বক্রতা দূর করিয়া শান্তি সমৃদ্ধি ও প্রগতিপূর্ণ বাংলাকে গড়িয়া তুলিতে যথেষ্ট সময় ও শক্তি নিয়োগ করিতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করা। গ্রন্থাগার মারফত পল্লীর মাতৃ-

জাতির এবং যে সকল স্ত্রী, পুরুষ ও বালকবালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাহাদের ও বাংলার নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলনে যাহারা সদ্য সাক্ষরযুক্ত হইতেছে, তাহারা যাহাতে পুনরায় নিরক্ষরতার পঙ্কিল গর্তে পতিত না হয় এবং স্কুলের ধরাবাঁধা শিক্ষার বাহিরে মাতৃভাষার সাহায্যে সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার বিস্তার করে।"

দ্বিতীয় পত্রিকাখানি মেদিনীপুরের অনন্তপুর খাদি-কেন্দ্র হইতে প্রকাশিত "সর্ব্বোদয় সংখ্যা"। উক্ত পত্রিকার পরিচালকবৃন্দ নিজেদের কর্ম্মের প্রকৃতি স্থির করিয়াছেন গান্ধীজীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকার ৪ঠা মে (১৯২১) তারিখে সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ক্ষত এই উক্তির মধ্যে পাওয়া যায়। এই ছুৎমার্গের পায়ে গান্ধীজী জীবন বলি দিয়াছেন। আমাদের অনন্তপুরের বন্ধুগণ এই মহৎ আদর্শ সকলের জীবনে রূপায়িত করিতে সক্ষম হউন। গান্ধীজী নিজের জীবন দান করিয়া সমাজ-জীবনকে পরিশুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই উক্তি সর্ব্বদা স্মরণীয়:

"আমি পুনর্জ্জন্মলাভ করিতে চাহি না। কিন্তু যদি পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তবে আমি অস্পৃশ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে চাহি, কারণ তাহা হইলে তাহাদের দুঃখ দুর্ভোগ এবং তাহাদের প্রতি উদ্যত আঘাতের বেদনার অংশভাগী হইয়া নিজেকে ও তাহাদিগকে অসহনীয় অবস্থা হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে পারিব। সুতরাং আমি প্রার্থনা করিয়া থাকি, যদি আমাকে পুনর্জন্ম লাভ করিতে হয়, তবে যেন আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ না করিয়া বরং অতি শূদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করি।"

পশ্চিম-বাংলায় কুষ্ঠরোগী

"সংহতি" পত্রিকায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তার একাংশ আমরা উদ্ধৃত করিলাম:

"পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত কুষ্ঠরোগীদের বিবরণী পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বীরভূম, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, নদীয়া, হুগলী, হাওড়া, মালদহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং, চব্বিশপরগণা, রাজধানী কলিকাতা সর্ব্বত্রই এই রোগ বিদ্যমান রহিয়াছে। ৩৫,০০০ হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম সংখ্যা হইতেছে ৩,০০০ হাজার। কলিকাতা রাজধানীতে মোট কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ২০,০০০ হাজার, তাহার মধ্যে সংক্রামক রোগীর সংখ্যা ৫,০০০-এর কাছাকাছি। কলিকাতা সহরের পথে ঘাটে, অলিতে গলিতে সর্ব্বত্র কুষ্ঠরোগী দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক জেলার কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা গণনার দ্বারা দেখা যাইতেছে, তাহাদের সংখ্যা ২,০০,০০০ দুই লক্ষ। ইহার মধ্যে ৫০,০০০ হইতেছে সংক্রামক রোগী। ইহাদের দ্বারা সহজেই নীরোগ ব্যক্তির দেহেও এই দুষ্ট ব্যাধি সংক্রামিত হইতে পারে। কলিকাতার প্রকাশ্য রাজপথে গলি ঘুঁজিতে সর্ব্বত্রই কুষ্ঠরোগী অবাধে বিচরণ করে। ইহার প্রতিকার-কল্পে কি মিউনিসিপ্যালিটি, কি গবর্ণমেণ্ট কেহই আশানুরূপ প্রতিকার ব্যবস্থা কিংবা রোগীদের সহর হইতে দূরে থাকার কোন ব্যবস্থা করেন না। এইভাবে বাংলার প্রত্যেক জেলার যে গড়পড়তা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং আসানসোল খনিজ ক্ষেত্রে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা অত্যধিক। নিম্নলিখিত তালিকা হইতেই তাহা বোধগম্য হইবে।

আসানসোল খনিজ বস্তী ৫২৩ বর্গমাইল, জনসংখ্যা ৬,০৫,৬৮৯, কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ৫,০০০, প্রতি হাজারে ৮২ জন কুষ্ঠরোগী। বীরভূমে ২০,০০০, হাজারকরা ১৯ জন, বাঁকুড়ায় কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ৩৫,০০০, হাজারকরা ২৮ জন, মেদিনীপুরে ৪০,০০০, হাজারকরা ১২.৫; এইভাবে বাংলা দেশের কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিতে পাই তাহা মোটেই আশাপ্রদ নহে।"

বিহারে তরকারীর বুকিং বন্ধ

বিহার হইতে টাটকা তরীতরকারীর বুকিং বন্ধ করিয়া দিয়া সরকার যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা আমরা সমর্থন করিতে পারিতেছি না। ইহার মধ্যে এতদঞ্চলে কপি, আলু, টমাটো, পেঁয়াজ প্রভৃতির দর বাড়িয়াছে। হয়ত আরও বাড়িবে। বিহারে শোচনীয় খাদ্যাভাব একথা আমরা স্বীকার করি। চাউল, গম, বাজরা, জোয়ার প্রভৃতির রপ্তানী বন্ধ করিয়া সে সমস্যার হয়ত কিছু সুরাহা হইত।

আসানসোলের "বঙ্গবাণী" পত্রিকায় উপরোক্ত সংবাদ ও মন্তব্যটি প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ অঞ্চল সম্বন্ধে, বিহার রাজ্যের সন্নিহিত অঞ্চলে, এইরূপ মূল্য বৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু কলিকাতার বাজারে এ বৎসর অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা তরকারী ইত্যাদির মূল্য কম।

বিহার রাজ্যের এইরূপ নিষেধ-প্রয়োগ সম্বন্ধে একটা নীতিগত প্রশ্ন আপনা হইতে মনে উদয় হয়। বিহার রাজ্য যদি নিজের খেয়ালে বা প্রয়োজনে তার উৎপন্ন দ্রব্যাদির রপ্তানি বন্ধ করিয়া দিতে পারে, তবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বা উড়িষ্যা রাজ্য বা উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কি বিহার রাজ্য হইতে অভাবগ্রস্ত নরনারীর আগমন বন্ধ করিতে পারে না এই যুক্তিতে যে বিহারের এই সব নর-নারী নূতন করিয়া তাহাদের খাদ্য-শস্যে ভাগ বসাইয়া অভাবের সৃষ্টি করিতেছে?

বিহার রাজ্যের সঙ্কীর্ণ নীতি ভারতরাষ্ট্রের সংহতির পরিপোষক নয়। রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদকে এই কথাটি ভাবিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

শিক্ষা ও ধর্ম্ম

ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগীয় উপদেষ্টা বোর্ডের চতুর্দ্দশ অধিবেশন দিল্লীনগরীতে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার সিদ্ধান্ত লোক-সমক্ষে প্রকাশিত হয় নাই। এই সভায় সভাপতিত্ব করিতে গিয়া শিক্ষা-মন্ত্রী মৌলানা আজাদ এমন কয়েকটি মন্তব্য করিয়াছেন যাহা ব্যাপকভাবে আলোচিত হওয়া উচিত। "বনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনার আলোচনাকালে ধর্ম্ম-শিক্ষার প্রশ্ন উঠিয়াছে, এবং এই সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভবপর হয় নাই।...আমার মনে হয় ধর্ম্ম-শিক্ষা ব্যতীত জাতীয় শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।...ভারতীয়েরা তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের কোন অবস্থাতেই ধর্ম্মনিরপেক্ষ শিক্ষা গ্রহণ করিতে দিবে না। জাতীয় গবর্মেণ্টের এই বিষয়ে দায়িত্ব আছে। জাতীয় মনোভাবকে ঠিক পথে চালিত করা তার প্রাথমিক দায়িত্ব।"

মৌলানা আজাদের এই মত একটা পুরাতন বিতণ্ডা জীয়াইয়া তুলিল। ধর্ম্মের সংজ্ঞা লইয়া নাগরিক জীবনে ধর্ম্মের স্থান কোথায়, এই বিষয়ে তর্ক উঠিবে। ব্যষ্টির জীবনকে ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান নানাভাবে প্রভাবিত করে। কিন্তু ব্যষ্টির এই বিশ্বাস যখন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে টানিয়া আনা যায়, তখন তাহা কখনও মঙ্গলজনক হয় না। ইতিহাস হইতে এই বিষয়ে অনেক সাক্ষ্য সংগ্রহ করা যায়। "পাকিস্থানে"র প্রতিষ্ঠা ত ইহার জাজ্বল্য প্রমাণ।

বর্ত্তমান যুগে ব্যষ্টির ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনের মধ্যে কোথাও একটা দাঁড়ি টানিয়া দিতে হইয়াছে। কোন রাষ্ট্রই একটি মাত্র ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এরূপ চেষ্টা করিতে গেলে সেই ধর্ম্ম-বিশ্বাসের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। "পাকিস্থানে" সে চেষ্টাই চলিতেছে। ভারতবর্ষ ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষিত হইতেছে। মৌলানা আজাদের মত এই ঘোষণার বিপরীতধর্ম্মী। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের শিক্ষা-বিভাগীয় উপদেষ্টা বোর্ড তার সভাপতির মত গ্রহণ করিতে পারে না।

একটা তর্ক তুলিতে পারা যায় যে, কোন একটা বিশ্বাসকে ভিত্তি করিয়াই মানুষের সমস্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টা যুগযুগান্ত ধরিয়া অব্যাহত ভাবে চলিতে সক্ষম হইয়াছে। মার্কসবাদও একটা বিশ্বাস। তার প্রতিষ্ঠার জন্ত দুনিয়ায় কম হানাহানি চলিতেছে না। তখন ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিতে যাই কেন। অর্থাৎ, এক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অন্ত বিশ্বাসের যুদ্ধ ইতিহাসের অঙ্গ। এবং এই অঙ্গটা কাটিয়া ফেলা যাইবে না। সত্য হইলে শান্তির জন্ত মানুষের আকুতি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে, ইহাই বিধি-বিধান।

কিন্তু যে মানুষ ধর্ম্ম-বিশ্বাস লইয়া ঝগড়া করে, সে সম্প্রীতির জন্তও ব্যাকুল। এই দুই বিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার সমন্বয় হইবে কোথায়? গান্ধীজী এই সম্বন্ধে একটি পথ দেখাইয়া দিতেছেন, ধর্ম্ম-বিশ্বাস পৃথক হউক, আচার-আচরণ পৃথক হউক, কিন্তু এই পার্থক্যের জন্ত মন বিদ্বিষ্ট হইতে দিবে না। ধর্ম্ম-বিশ্বাস অপরের উপর চাপাইয়া দিও না। ধর্ম্ম-বিশ্বাস লইয়া আলোচনা কর। ধর্ম্ম-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার জন্ত, মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্ত, বল-প্রয়োগ করিও না, রক্তপাত করিও না। ধর্ম্ম-বিশ্বাসীর সংখ্যা বাড়াইবার প্রলোভন নিবৃত্ত কর।

এই আদর্শ বিশ্বের জনগণ অনুসরণ করিতে পারিতেছে কি?

সূত্রাঞ্জলি

সর্ব্বোদয় সমাজের মন্ত্রী নিম্নলিখিতরূপ আবেদন করিয়াছেন:

"মহাত্মাজীর দেহাবশেষ ভস্ম যে সকল স্থানে পবিত্র নদীর ধারায় ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই সকল স্থানে সর্ব্বোদয় সমাজের নির্দ্দেশে গত বৎসর হইতে ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সর্ব্বোদয় মেলা বসিতেছে। মধ্যপ্রদেশে ওয়ার্দ্ধা জেলায় পৌনার গ্রামে মেলা হয়। কোনও পূজায় বা উৎসবে দেবতার নামে ফুলপত্র যেমন উৎসর্গ করা হয়, অথবা পূর্ব্ব-পুরুষদের স্মরণে শ্রদ্ধার সঙ্গে তিলাঞ্জলি বা তিল-তর্পণ করা হয়, মহাত্মাজীর এই পুণ্য-স্মৃতি উৎসবে অনুরূপ কোন্ বিধি উচিত হইবে?

মহাত্মাজীর চরখার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল গভীর; নিজের জন্ম-দিনকেও তিনি বলিতেন 'চরখাজয়ন্তী'। ফুলের হারের বদলে সুতার হার পরিবার বা পরাইবার রীতি তিনিই দেশে প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার স্মরণে নিজের হাতে কাটা সুতার একখণ্ডে ৪ ফুটে ১ তার, ১৬০ তারে ১ লট, ৪ লটতে অর্থাৎ ৬৪০ তারে ১ গুণ্ডি দিয়া তর্পণ করাই তো উচিত হইবে। ইহা পুষ্পাঞ্জলি বা তিলাঞ্জলি না হইয়া হইবে সূত্রাঞ্জলি বা সুতাঞ্জলি।

ইহাতে লাভ হইবে—পয়সার স্থানে চলিবে কায়িক পরিশ্রম; যে মর্য্যাদা আমরা পয়সাকে দিই, সেই মর্য্যাদা পরিশ্রমকে দেওয়া হইবে। খুব ছোট ছেলেও নিজের মেহনতে কিছু দিবার সুযোগ পাইবে। নিজের কায়িক পরিশ্রমে উৎপন্ন বস্তুই অর্পণযোগ্য, সমাজে এই বিচারধারা চলিয়া যাইবে। আর এরূপ হইলে সর্ব্বোদয় সমাজের এক অঙ্গ—বস্ত্র-স্বাবলম্বন—তাহারও প্রচার হইবে। এইরূপ কয়েকটি কারণে গত বৎসর সুতাঞ্জলি দিয়া তর্পণ করিবার প্রথা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু গত বৎসরে সময়াভাবে ইহার যথাযোগ্য প্রচার হইতে পারে নাই। তাহা হইলেও গত বৎসর এক পৌনার গ্রামে প্রায় এক হাজার গুণ্ডি অর্পণ করা হইয়াছিল। এ বৎসর জিনিসটি আরও বেশী প্রচার করিবার ইচ্ছা, যেখানে এক হাজার গুণ্ডি, সেখানে এক লক্ষ গুণ্ডি দেওয়ার ইচ্ছা।

"প্রত্যেককে এক গুণ্ডি মাত্র অর্পণ করিতে হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা। এভাবে এক গুণ্ডির মর্য্যাদা রাখিতে গিয়া সম্মান ভক্তি দেখানো হইবে। গুণ্ডির সঙ্গে নিজের নাম, গ্রাম, পাড়া, পোষ্টাপিস ও জেলা—পুরা ঠিকানা দেওয়া চাই। নিজের হাতে কাটা সুতা হওয়া চাই। ইহাই প্রধান কথা। তূলা ধুনাই সব কাজ নিজে করিলে তো ভালই, তাহা সম্ভব না হইলেও অন্ততঃ সুতাকাটা নিজের হাতে হওয়া চাই—অন্যের হইলে চলিবে না। সুতা যেন ভাল হয়, কাপড় বুনিবার মত হয়। যাঁহারা এই পরিকল্পনা পছন্দ করেন ও এবিষয়ে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত, তাঁহারা সর্ব্বোদয় সমাজ, গোপুরী, পোঃ নালবাড়ী, ওয়ার্দ্ধা—অনুগ্রহ করিয়া এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।"

এই প্রচারপত্র গত অক্টোবর মাসের শেষভাগে প্রচারিত হইয়াছে এবং গোপুরীতে সর্ব্বোদয় সমাজের এক বৈঠকে আগামী সূত্রাঞ্জলির উদ্যোগ-আয়োজনও হইয়া গিয়াছে। বাংলায় মহাত্মাজীর চিতাভস্ম কোথায় পবিত্র জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার বিষয় যদি পাঠকগণ সম্পাদক মহাশয়কে লিখিয়া জানান তবে ঐরূপ মেলা সংগঠিত করিবার চেষ্টা চলিতে পারে।

গান্ধী জ্ঞান মন্দির, ওয়ার্দ্ধা

রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ গত ১৭ই মাঘ এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। তদুপলক্ষে তিনি এই কেন্দ্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন:

"গান্ধীজীর ভাবধারা সম্বন্ধে এবং গঠনমূলক কাজ সম্বন্ধে এখানে পুস্তকাদি থাকিবে এবং গভীর ভাবে ঐগুলি অধ্যয়ন ও গবেষণার সুযোগ থাকিবে ইহা আনন্দের বিষয়। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ ভাবধারার অধ্যয়ন শুধু মস্তিষ্কের ব্যায়ামের জন্য নহে, উহা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ওতঃপ্রোত হওয়া চাই। এদেশে বহুসংখ্যক এইরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। ওয়ার্দ্ধায় গান্ধীজীর প্রবর্ত্তিত গঠনমূলক কর্ম্মে নিযুক্ত বিবিধ সংস্থা আছে। তৎসহযোগে এই কেন্দ্রীয় মন্দির হইতে প্রান্তিক প্রতিষ্ঠানগুলি অনুপ্রেরণা ও পথনির্দ্দেশ পাইতে পারিবে। ওয়ার্দ্ধায় এই কেন্দ্রীয় মন্দির আলোকবর্ত্তিকা জ্বালিয়া রাখিবে আশা করা যায়। উহার আলো দেশের সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইবে। আজ চতুর্দ্দিকে খানিক অন্ধকার পরিলক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু যতদিন একটি প্রদীপ জ্বলিতে থাকিবে, ততদিন তাহা হইতে অনেক প্রদীপ জ্বালিয়া পৃথিবীকে আলোকিত করা চলিবে। গান্ধীজী ও যমুনালালজী বাস করিতেন বলিয়া এখানে ইহার স্থান নির্ণয় করা হয় নাই। বর্ত্তমান সমাজ ও অর্থনীতিকে গান্ধীজী কি নবরূপ দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা প্রমাণ করিবার মত কয়েকটি সংস্থা এখানে চলিতেছে বলিয়া ওয়ার্দ্ধায় এই মন্দির স্থাপনা করা হইয়াছে।"

গান্ধীজীর আদর্শ প্রচার নয়, তাঁহার আচরিত জীবন ও কর্ম্ম পদ্ধতির "প্রয়োগ ক্ষেত্র"ও ইহা হইবে। এবং বর্ত্তমানে আমাদের জাতীয় জীবনে গান্ধীজীর আদর্শ ও আচরণ হইতে যে বিচ্যুতি ঘটিতেছে, তৎসম্বন্ধে রাজেন্দ্রবাবু যে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং যে আশার বাণী উচ্চারণ করেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য। "আজ দেশে যাহা যাহা ঘটিতেছে সে সকলের দিকে চাহিলে আমাদের মনে হতাশা দেখা দিতে চায়। যীশু শিষ্যদের বলিয়াছিলেন, 'রাত পোহাইয়া পাখীর রব উঠিবার পূর্ব্বেই তোমরা আমাকে তিন বার অস্বীকার করিবে।' গান্ধীজীর সম্পর্কেও অনুরূপ মনোভাব আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে। মনে হইতেছে, আমরা যাহারা তাঁহার অনুগামী বলিয়া পরিচয় দিই, একে একে তাঁহার পথ পরিত্যাগ করিতেছি। আমাদের জীবিত কালের মধ্যে তাঁহার ভাবধারা আমরা গ্রহণ করিব কি না, তদ্বিষয়ে আমরা সংশয় বোধ করিতে সুরু করিয়াছি। যীশুখ্রীষ্টের জীবনকালে তাঁহার শিষ্যেরা যাহাই করিয়া থাকুন না কেন, পরে খ্রীষ্টধর্ম্মের পুনর্জ্জন্ম হয়। সেইরূপ আমার খুবই আশা আছে যে, বর্ত্তমানে আমরা যাহাই করি না কেন, গান্ধীজীর ভাবধারা সারা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইবে। উহার মধ্যে সত্যের এমন শক্তি নিহিত আছে যে, আমরা কি করি না করি তাহার উপর উহা নির্ভরশীল নহে। সকল পরিবর্ত্তন অতিক্রম করিয়া তাঁহার চিন্তারাজি বাঁচিয়া থাকিবে এবং আর্ত্ত জগৎকে চিরকাল ধরিয়া জীবন দান করিবে।" এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ওয়ার্দ্ধায় সম্ভব হইয়াছে কলিকাতার লক্ষপতি শ্রীজানকীপ্রসাদ পোদ্দারের এক লক্ষ টাকা দানে; তাঁহার পিতা রাধাকৃষ্ণ পোদ্দারের স্মৃতি রক্ষা কল্পে এই টাকা প্রদত্ত হয় এবং মধ্য প্রদেশ রাজ্যের গবর্ণমেণ্ট ২১ বিঘা জমি এতদর্থে প্রদান করায় এই পরিকল্পনা রূপ পরিগ্রহ করিতে যাইতেছে। এই উপলক্ষে আমরা 'সর্ব্বোদয়' সমাজের কর্ম্মসচিবের বিবৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। তিনি বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষের সকল নদনদীর স্রোতে গান্ধীজীর অস্থি ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল বিশেষ বিশেষ স্থানে। তথায় এইরূপ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া গান্ধীজীর বাণী জীবনে আচরিত করিবার ব্যবস্থা করিলে মহদুপকার করা হইবে। লোকে তাঁহার আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাত্রার বাস্তব চিত্র দেখিয়া তার প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত হইবে।

যতীন্দ্রমোহন রায়

গত ৪ঠা মাঘ কলিকাতা ট্রপিক্যাল হাসপাতালে উত্তরবঙ্গের বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্রমোহন রায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর জেলার বোয়ালিয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

১৯০৭ সালে যতীন্দ্রমোহন রাজসাহী কলেজ হইতে বি, এ পাস করেন। বি-এ পাস করিবার অব্যবহিত পরই তিনি রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। তাঁহার অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বহুসংখ্যক ছাত্র ও যুবক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ সমস্ত ছাত্র ও যুবক দেশের জন্য তাঁহার আদেশে যে-কোন ত্যাগ করিতে

প্রস্তুত ছিল। তাঁহার ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তায় কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন এবং অনতিবিলম্বে তাঁহাকে দিনাজপুরে বদলী করার আদেশ জারী করা হয়। বিপিনচন্দ্র পালের নির্দ্দেশে যতীন্দ্রমোহন অবশ্য তাঁহার শিক্ষকতা পদ ত্যাগ করেন এবং তাঁহার রাজনৈতিক কর্ম্মকেন্দ্র রূপে রাজসাহীতেই অবস্থান করিতে থাকেন।

একটি অপ্রীতিকর ঘটনার দরুন তাঁহাকে রাজসাহী ত্যাগ করিতে হয়। স্কুলের সহিত সংযুক্ত ছাত্রাবাসে তিনি একটি অচ্ছুৎ 'মালো' বালককে ভর্ত্তি করিয়াছিলেন। রক্ষণশীলরা ইহাকে তাঁহাদের উপর আক্রমণ বলিয়া মনে করিলেন এবং উহার নিন্দা করিলেন। সামাজিক দিক দিয়া যতীন্দ্রমোহনকে এক রকম বর্জ্জন করা হইল। তখন যতীন্দ্রমোহন পাবনা ন্যাশনাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণের জন্য রাজসাহী ত্যাগ করিলেন।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছুদিন পরেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া চট্টগ্রাম জেলার মহেশখালি গ্রামে আটক রাখা হয়। তথা হইতে তাঁহাকে ২৪ পরগণার দেগঙ্গা নামক একটি গ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়। দেগঙ্গায় অবস্থানকালে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়ে।

১৯২১ সালে যখন অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইল তখন যতীন্দ্রমোহন মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিয়া আন্দোলনে যোগদান করিলেন। ১৯৩০ সালের "আইন অমান্য" আন্দোলনের পর তিনি "গণ-মঙ্গল" সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। মুসলমান সমাজের ক্রমবর্দ্ধমান বিরোধিতায় উত্তরবঙ্গে তাঁহার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ভারত বিভাগের বীভৎসতা তিনি দেখিয়া গেলেন। এই কথা ভাবিয়া আমরা মনে ব্যথা পাইতেছি।

আনন্দীবাঈ কার্ভে

শ্রীধোন্দ কেশব (আন্না সাহেব) কার্ভের পত্নী শ্রীমতী আনন্দীবাঈ কার্ভে অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিয়াশি বৎসর হইয়াছিল। তিনি স্বামীর চেয়ে ছয়-সাত বৎসরের ছোট ছিলেন।

আন্না সাহেব কার্ভে সমাজসংস্কারক মহাকর্ম্মী রূপে ভারতে সুপরিচিত। নারী-উন্নয়ন তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। পুণা নগরীর মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রূপে আন্না সাহেব বিখ্যাত হইয়াছেন। কিন্তু যে শক্তি পিছনে থাকিয়া নীরবে তাঁহাকে এই কঠিন কার্য্য করিতে সক্ষম করিয়াছে তাহা আজ লোকচক্ষুর অন্তরালে, দূতন লোকে চলিয়া গেল। স্ত্রী-শিক্ষা-ব্রতে ব্রতী এই পরিবারের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

আনন্দীবাঈয়ের জীবন-কথায় মহাত্মা কীর্ত্তন করিয়া আচার্য্য বিনোবা ভাবে যাহা বলিয়াছেন তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার করি :

"আন্না সাহেব ও আনন্দীবাঈয়ের দাম্পত্য জীবন মহারাষ্ট্রের মহা ঋষি একনাথ ও তদীয় সরীয়সী সহধর্ম্মিণী গিরিজা-বাঈয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। উঁহারা উভয়ে প্রসাদ, করুণা, সাম্য ও অন্যান্য গুণ অনুশীলনে পরস্পরের সহায় ছিলেন। এমন মানুষদের পবিত্র স্মৃতি পোষণ করিয়া এই পৃথিবীতে আমাদের ক্ষণস্থায়ী নশ্বর জীবন ধন্য হয়।"

অমৃতলাল ঠক্কর

৮২ বৎসর বয়সে, গত ৫ই মাঘ, নিজ জন্মস্থানে ঠক্কর "বাপা" শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অমর আত্মার প্রতি আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

অমৃতলাল ঠক্কর ১৮৬৯ সালে ভবনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯০ সালে পুণার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে পাঠ সমাপ্ত করিয়া বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটি ও পূর্ব্ব আফ্রিকার নানা স্থানের পূর্ত্তবিভাগে কার্য্য করেন। ১৯১৪ সালে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন এবং উদারনৈতিক রাজনীতিকশ্রেষ্ঠ গোপাল কৃষ্ণ গোখ্‌লে কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাসঙ্ঘ (Servan of India Society) নামক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। লোকসেবাই এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

সেই সময় হইতে আজীবন অমৃতলাল তাহাই করিয়া গিয়াছেন—এবং তাহারই গুণে তিনি দেশের "বাপা" পিতা এই উপাধি লাভ করিয়াছেন। ১৯২২ সাল হইতে তিনি গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত নানা সেবা প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে সংযুক্ত হইয়া পড়েন। রাষ্ট্রীয় মতবাদের সহিত ইঁহার কোন যোগ ছিল না। আপামর দেশবাসীর সেবাই অমৃতলালের ব্রত হইয়া পড়িল। বিশেষ ভাবে ভারতবর্ষের আদিমজাতিসমূহের উন্নতিকল্পে তিনি যাহা করিয়া গেলেন তাহার ফলে তাঁহার নাম ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

'স্বদেশী' যুগের একজন নেতা—যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ৮৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের লোকে যোগেশচন্দ্রের মাহাত্ম্যকথা জানেন না। তিনি যেমন আইনশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন সেইরূপ দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে নিজের জ্ঞান-বিশ্বাস মতে নানাকার্য্যে সহযোগিতা করিয়াছেন।

তাঁহার পরিবার পাবনার হরিপুরের জমিদার বংশীয়। আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী প্রসন্নময়ী দেবীর আত্মজীবন-চরিতে এই পরিবারের ও ঐ সময়ের মনোরম চিত্র পাওয়া যায়।

যোগেশচন্দ্র স্বদেশী যুগের একজন স্রষ্টা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি ভাববিলাসী ছিলেন না, সংগঠক ছিলেন। সেইজন্য ইণ্ডিয়ান ষ্টোরস নামক বিপণি প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বদেশীর সম্ভাবনার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন।

তিনি কয়েক বৎসর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। *Calcutta Weekly Notes* নামক আইন সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকার সম্পাদকরূপে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

বৈদিক কৃষ্টির কালনির্ণয়ে ধ্রুবতারা।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

মৈত্রায়ণি উপনিষদে ধ্রুব।

জ্যোতিষিক প্রমাণের গুণ এই, আবশ্যক উপকরণ পাইলে কাল-নির্ণয়ে সন্দেহ থাকে না, কামনা দ্বারা সিদ্ধান্ত দুষ্ট হইতে পারে না। ঋষিগণ যজ্ঞ করিতেন, যজ্ঞের কাল নির্দিষ্ট ছিল। এই কারণে যজ্ঞকর্মের বিবরণে জ্যোতিষিক প্রমাণ পাওয়া যায়।

উপনিষদাদি জ্ঞানকাণ্ডের গ্রন্থে জ্যোতিষিক প্রমাণ থাকিবার কথা নয়। দৈবাৎ এক উপনিষদে, মৈত্রায়ণি উপনিষদে, দৃষ্টান্তস্বরূপ ধ্রুবতারার বিচলনের কথা আছে, প্রোফেসর যাকোবি আবিষ্কার করিয়াছিলেন।*

কে আত্মা, এই প্রশ্নের উত্তরে এক উপাখ্যান বলা হইয়াছে।—বৃহদ্রথ নামে এক রাজা শরীর অনিত্য বুঝিয়া বৈরাগ্য প্রাপ্ত হন। বিরাজ্যে পুত্রকে স্থাপন করিয়া অরণ্য গমন করেন। তথায় দুষ্কর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ঊর্ধ্ব-বাহু হইয়া সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। সহস্র বর্ষ অতীত হইলে আত্মবিৎ ভগবান্ শাকায়ন্য ঋষি সেখানে আসিয়া রাজাকে বলিলেন, "উঠ, উঠ, বর প্রার্থনা কর।" রাজা প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ভগবন্, আমরা শুনিয়াছি, আপনি আত্মতত্ত্ববিৎ, আপনি আত্মতত্ত্ব উপদেশ করুন।" শাকায়ন্য বলিলেন, "পূর্বকালে ঋষিগণ আত্মতত্ত্ব চিন্তা করিয়াছেন; কিন্তু এক্ষণে ইহা দুঃশক্য। তুমি অন্য কাম প্রার্থনা কর।" অতঃপর ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা শাকায়ন্যের পাদস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "ভগবন্, এই অস্থি-চর্ম-বাত-পিত্ত-কফ-সংঘাত দুর্গন্ধ নিঃসার শরীরে কি কাম উপভোগ হইতে পারে? ক্ষুৎ-পিপাসা-জরা-মৃত্যু-শোকাদি-অভিহত এই শরীরে কি কাম উপভোগ হইতে পারে? যেমন দংশ-মশকাদি ও তৃণ-বনস্পতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তেমন এই শরীরও ক্ষয়িষ্ণু। অপর কথা কি, মহাধনুর্ধর চক্রবর্তী সুদ্যুম্ন, ইন্দ্রদ্যুম্ন, হরিশ্চন্দ্র, যযাতি প্রভৃতি, মরুত্ত, ভরত প্রভৃতি মহতী শ্রী পরিত্যাগপূর্বক এই লোক হইতে পরলোকে গমন করিয়াছেন। অপর কথা কি, গন্ধর্ব, অসুর, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতির বিনাশ দেখিতেছি। অপর কথা কি, 'মহার্ণবানাং শোষণং শিখরীণাং প্রপতনং ধ্রুবস্য প্রচলনং বাতরজ্জুনাং ব্রশ্চনং (ছেদনং) পৃথিব্যাঃ নিমজ্জনং সুরাণাং স্থানাদপসরণম্" দেখিতেছি। এতদ্বিধ এই সংসারে কাম উপভোগে কি প্রয়োজন? ভগবন্, আমরা অন্ধকূপস্থ ভেকের ন্যায় এই সংসারে বাস করিতেছি। আপনি আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারেন, আপনি আমাদের গতি।" তখন ভগবান্ শাকায়ন্য প্রীত হইয়া রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ ইক্ষ্বাকু-বংশধ্বজ বৃহদ্রথ, তুমি 'শীঘ্র' আত্মজ্ঞ ও কৃতকৃত্য হইয়াছ। তুমি মরুৎ নামে বিশ্রুত হইলে।" ইত্যাদি।

এক্ষণে শেষের দৃষ্টান্তগুলি বুঝা যাউক। তিনি দেখিয়াছিলেন, মহার্ণবের শোষণ অর্থাৎ কোনও স্থানে সাগর শুষ্ক হইয়া মৃত্তিকা দেখা গিয়াছিল, কোন স্থানে পর্বতের শিখর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। নিশ্চল ধ্রুবের প্রচলন হইয়াছিল। ধ্রুবের সহিত বাত-রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইয়া যাবতীয় জ্যোতিষ্ক স্ব স্ব পথে ভ্রমণ করে। কিন্তু কোন-কোনটি স্বীয় পথ ত্যাগ করিয়াছিল, যেমন ধূমকেতু। কোন স্থানের ভূমি সমুদ্রগত হইয়াছিল। সুরগণ (বৈদিক দেবতা) অপসৃত হইয়াছিলেন। ইহাদের একটিও কল্পিত নয়, সবই প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, এখনও হইতেছে।

ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজা বৃহদ্রথ কোন্ সময়ে ছিলেন? বিষ্ণুপুরাণে ইক্ষ্বাকু-বংশের রাজাদের নাম আছে। কিন্তু বৃহদ্রথের নাম নাই। বায়ুপুরাণে বৃহদ্রথ নাম আছে, তিনি অযোধ্যা নগরের রাজা ছিলেন। তাঁহার অপর নাম বৃহদ্বল। বিষ্ণুপুরাণে বৃহদ্বল নামে রাজা আছেন। মহাভারতে এই বৃহদ্বল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। কিন্তু উপনিষদের বৃহদ্রথ সংসার অনিত্য দেখিয়া দুষ্কর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অতএব তিনি মহাভারতের বৃহদ্বল হইতে পারেন না। বিষ্ণুপুরাণে ইক্ষ্বাকুবংশে শীঘ্র নামে এক রাজা আছেন। উপনিষদেও

---

* বহুকাল পূর্বে প্রোফেসর ম্যাক্সমুলর এই উপনিষদের মূল ও ইংরেজী অনুবাদ "Sacred Books of the East" Seriesএর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি বইখানি আমার কাছে নাই। ১২নং হরীতকী বাগান, শাস্ত্র-প্রকাশ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত উপনিষদাবলী গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে মৈত্রী উপনিষদ, মৈত্রেয়ী উপনিষদ ও মৈত্রায়ণি উপনিষদ, এই তিনখানি উপনিষদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। দেখিতেছি, ম্যাক্সমুলরের মৈত্রায়ণি উপনিষদের দৃষ্টান্তগুলি মৈত্রী উপনিষদে আছে। মৈত্রায়ণি উপনিষদে সংক্ষেপে আছে। আমার আবশ্যক উপকরণ মৈত্রী উপনিষদ্ হইতে লইতেছি।

শীত্র শব্দ আছে। তাহারই ব্যাখ্যায় রাজার নাম মরুৎ হইয়াছিল। রাজা 'শীত্র' হইতে গণিলে রাজা বৃহদ্বল অধস্তন অষ্টম পুরুষ। খ্রী-পূ ১৪৫০ অব্দের নিকটবর্তীকালে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। আট পুরুষে দুই শত বৎসর, অতএব রাজা শীত্র খ্রী-পূ ১৬৫০ অব্দে ছিলেন। সে সময়ে দেখা গিয়াছিল, পূর্বকালে যে তারা নিশ্চল ছিল, সে তারা তখন নিশ্চল ছিল না, অপরাপর তারার ন্যায় বৃত্তপথে ভ্রমণ করিতেছিল। অর্থাৎ তৎকালের লোকে ধ্রুবতারা চিনিত, কিন্তু নিশ্চল দেখিতে পায় নাই।

সে কোন্ তারা? কতকাল পূর্বে নিশ্চল ছিল? পৃথিবীর অক্ষরেখা ঊর্ধ্ব দিকে বর্ধিত করিলে দিব্যলোকে উপস্থিত হয়। এই রেখার অগ্র বিন্দু মেরু। এই বিন্দু স্থির নয়, প্রায় ২৬০০০ বৎসরে এক ছোট বৃত্তে ভ্রমণ করে। সে পথে যদি কোন তারা পড়ে, সে তারা নিশ্চল দেখায়, ধ্রুব নামে পরিচিত হয়। খ্রীষ্টের জন্ম হইতে তিন-চারি-পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব পর্যন্ত অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, কেবল একটি তারা মেরুর পথে পড়িয়াছিল, মেরু আর কোনও তারার এত সন্নিকটে আসে নাই। পাশ্চাত্য জ্যোতিষে সে তারার নাম Alpha Draconis. বিষ্ণুপুরাণে নাম ধর্ম (২।১২)। প্রাচীন মিশরবাসী 'থুবন' বলিত এবং ইহা দ্বারা উত্তর দিক নির্ণয় করিয়া পুরাতন 'পিরামিড' গড়িয়াছিল। প্রায় খ্রী-পূ ৩০০০ অব্দে এই যোগ ঘটিয়াছিল। তখন তারাটি ধ্রুব নামে আখ্যাত হইতে পারিত। ইহার ৫০০ বৎসর পূর্বে ও ৫০০ বৎসর পরেও মেরুর এত নিকটে ছিল যে, সহজে ইহার বৃত্তগতি লক্ষিত হইতে পারিত না। তারাটি সার্ধ তৃতীয় প্রভার। তারাটি তত উজ্জ্বল নয় বটে, কিন্তু চিনিবার দুইটি উপায় ছিল। তারাটি শিশুমারের মুখে অবস্থিত। (চিত্র ১)। বেদের ঋষিগণ শিশুমার চিনিতেন। ঋগ্‌বেদে নাম শিংশুমার, যজুর্বেদে শিশুমার, জ্যোতিষে নাম ধ্রুব মৎস্য। (শিশুমারের বা' নাম শিশুক, গঙ্গা ও সিন্ধুতে দেখিতে পাওয়া যায়।) উক্ত তারার প্রায় ২° অংশ দূরে সার্ধ চতুর্থ প্রভার একটি ছোট তারা আছে। সেটি ধ্রুবতারা প্রদক্ষিণ করিত। এককালে লোকে ধ্রুবতারা চিনিত ও দেখিত।

ইহার অন্য প্রমাণ গৃহ্যসূত্রে পাওয়া যায়। বিবাহের পর বরকন্যা ধ্রুবদর্শন করিতেন। অভিপ্রায়, পতিপত্নীও যেন এই তারাদ্বয়ের ন্যায় একত্র অবস্থিতি করেন এবং পত্নী যেন পতিকে অনুবর্তন করেন। অদ্যাপি ওড়িষ্যায় ব্রাহ্মণদিগের বিবাহের পর ধ্রুবদর্শন বিহিত আছে, যদিও ধ্রুব কোথায়, কেহ জানে না। প্রাতঃকালে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া উত্তর আকাশে দৃষ্টিপাত করিলেই ধ্রুব দর্শন হইয়া যায়। বঙ্গদেশেও ধ্রুবদর্শন বিহিত ছিল। বঙ্গদেশীয় ভবদেব ভট্টের বিবাহ-পদ্ধতিতে আছে, বিবাহের পর জামাতা ও বধূ বাহিরে গিয়া জামাতা বধূকে বলেন, "আমি ধ্রুব, তুমি পতিকুলে ধ্রুবা হও।" বহুকাল পরে যখন কোন তারা আর নিশ্চল রহিল না, তখন তাহার
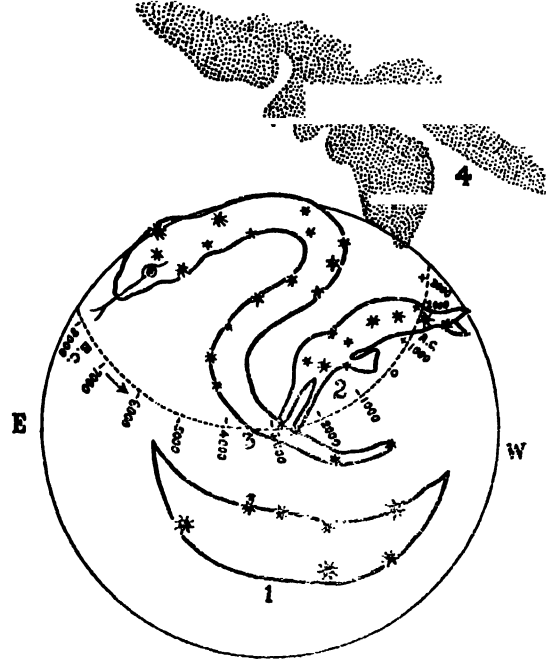
চিত্র ১। 1 - দিব্য নৌ, 2—শিশুমার. ৪—অজগর, 4—সরস্বতী
লাহোর পঞ্জাবের মধ্যস্থল মনে করিয়া খ্রী-পূ ৩০০০ অব্দের গো-লোক প্রদর্শিত হইয়াছে। বিন্দুময় বৃত্ত, মেরুভ্রমণ পথ। কোন্ কালে মেরু আকাশে কোথায় ছিল, তাহা অঙ্কাঙ্ক দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে।

স্থানে অরুন্ধতী-দর্শন বিহিত হইয়াছিল। ভবদেব ভট্ট ধ্রুব- ও অরুন্ধতী-দর্শন দুই-ই বিহিত করিয়াছেন। অদ্যাপি বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণদের বিবাহের সময়ে বর-কন্যাকে অরুন্ধতী-দর্শন করিতে হয়, যদিও অরুন্ধতী কোথায়, কেহ জানে না। অরুন্ধতী বশিষ্ঠের পত্নী। সপ্তর্ষির মধ্যে বশিষ্ঠ নামে একটি তারা আছে। তারাটি দ্বিতীয় প্রভার। তাহার সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র তারা আছে, সেটি অরুন্ধতী। অরুন্ধতী বশিষ্ঠকে ত্যাগ করিয়া যায় না, বশিষ্ঠের পার্শ্বে থাকিয়া বশিষ্ঠের সহিত ভ্রমণ করে। এই হেতু অরুন্ধতী সতীত্বের দৃষ্টান্ত হইয়াছে। ধ্রুবতারা-দর্শনে যে ভাব, অরুন্ধতী-দর্শনেও প্রায় সেই ভাব ব্যক্ত হয়। পুরাণে এ বিষয়ে অনেক উপাখ্যান আছে।

উপনিষদের রাজা যখনই থাকুন, উপনিষদ্‌খানি কোন্ সময়ে রচিত? আমাদের সৌভাগ্যক্রমে উপনিষদেই

কালের সীমা বর্ণিত আছে (৬।১৪)। কথাটা এই রূপে আসিয়াছে,—"অন্নই প্রাণীসমূহের কারণ, কাল অন্নের কারণ, সূর্য কালের কারণ।" কালের স্বরূপ কি? নিমেষাদিসম্ভূত দ্বাদশাত্মক (দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত) বৎসর। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত, অর্ধ আগ্নেয়, অপরার্ধ বারুণ (অর্থাৎ, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন)। মঘার আদ্য হইতে শ্রবিষ্ঠার (ধনিষ্ঠার) অর্ধ পর্যন্ত সূর্য দক্ষিণগামী এবং শ্রবিষ্ঠার অর্ধ হইতে অশ্লেষার অন্ত পর্যন্ত উত্তরগামী হন। বৎসরের দ্বাদশ ভাগের প্রত্যেক ভাগে নবাংশ (অর্থাৎ প্রত্যেক ভাগে নয় নক্ষত্র-পাদ)। কাল অতিশয় সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়ের অগোচর। সূর্যের অয়নাদি দ্বারা কালের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।"

এখানে আমাদের পঞ্জিকার বহুমূল্য ইতিহাস আছে। (১) দেখা যাইতেছে, তৎকালে রবিপথ দ্বাদশভাগে বিভক্ত হইত। ইহা কিছু নূতন কথা নয়, বৎসরে ছয় ঋতু, প্রত্যেক ঋতুর দুই ভাগ। যজুর্বেদে মধু, মাধব, শুক্র, শুচি প্রভৃতি দ্বাদশ আর্তব মাসের নাম আছে। এই বেদের কালে চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি নাম হয় নাই। (২) রবিপথ সাতাইশ সমান ভাগে বিভক্ত হইত, এক এক ভাগের নাম নক্ষত্র। প্রত্যেক নক্ষত্র চারিপাদে বিভক্ত হইত। এই কারণে দ্বাদশ ভাগের প্রত্যেক ভাগে নয় নক্ষত্র-পাদ। এই নক্ষত্র ভাগও যজুর্বেদের কাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। (৩) উপনিষদ্ বলিতেছেন, মঘা-নক্ষত্রের আদ্যে এবং ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের মধ্যভাগে অয়ন-নিবৃত্তি হয়। মঘা হইতে গণিয়া গেলে ধনিষ্ঠা চতুর্দশ নক্ষত্র। যেহেতু নক্ষত্র সাতাইশটি, ধনিষ্ঠার অর্ধভাগে উত্তরায়ণ হইতেই হইবে। ধনিষ্ঠার অর্ধ হইতে গণিয়া গেলে অশ্লেষার অন্ত সাড়ে তের নক্ষত্র হইবে। মৈত্রায়ণি উপনিষদে, মঘাদ্যং শ্রবিষ্ঠার্ধমাগ্নেয়ং ক্রমেণোৎক্রমেণ সার্পাদ্যং শ্রবিষ্ঠার্ধান্তং সৌম্যম্। এখানে অশ্লেষা ও মঘার যোগস্থান আদি ধরিয়া দুই দিকের নক্ষত্র গণিত হইয়াছে। অশ্লেষা নক্ষত্রের নাম সর্প বা সার্প।

এখানে মঘা ও ধনিষ্ঠা নাম দুই তারা-ময় নক্ষত্রের নাম নয়, দুইটিই দুই নক্ষত্রভাগের নাম। ধনিষ্ঠার অর্ধ বলাতে নক্ষত্রভাগই বুঝাইতেছে। মঘা তারা হইতে মঘা নক্ষত্র-ভাগের আদিবিন্দু কত দূরে ছিল, আমরা জানি না। এই কারণে মঘা তারা ধরিয়া কালনির্ণয়ের উপায় নাই।

কিন্তু অন্য উপায় আছে। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে অশ্লেষার অর্ধে দক্ষিণায়নাদি হইত। উপনিষদে মঘার আদ্যে হইত। অতএব উপনিষদের কাল হইতে অয়নাদি বিন্দু বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের কালে অর্ধ নক্ষত্র পিছাইয়া আসিয়াছিল। অর্ধ নক্ষত্র পিছাইতে প্রায় ৪৮৩ বৎসর লাগে। আমি **The First Point of Asvini** পুস্তিকায় দেখাইয়াছি, বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে খ্রী-পূ ১৩৭২ অব্দের পাঞ্জি [illegible]। অতএব খ্রী-পূ (১৩৭২ + ৪৮৩) = ১৮৫৫ অ[illegible] অয়ন হইত।* অতএব উপনিষদ্খানিতে খ্রী-পূ [illegible] খ্রী-পূ ১৩৭২ অব্দের মধ্যে কোন সময়ের ঘটনা[illegible] আছে। খ্রী পূ ১৫০০ অব্দ ধরিলে ভুল হইবে না। ম্যাক্স-মূলর লিখিয়াছেন, মৈত্রায়ণি উপনিষদের সন্ধি দেখিলে ইহাকে প্রাচীন ও খাঁটি বলিতে হইবে। দেখাও যাইতেছে, প্রাচীন বটে।

পাশ্চাত্ত্য বিদ্বান্গণের মত।

প্রোফেসর যাকোবি উপনিষদ্ হইতে ধ্রুবের বিচলন ও গৃহ্যসূত্র হইতে ধ্রুবদর্শন বিধি উল্লেখ করিয়া বৈদিক কৃষ্টির প্রাচীনতার যথেষ্ট প্রমাণ মনে করিয়াছিলেন। প্রোফেসর হুইট্‌নি উপনিষদের বাক্য উপেক্ষা ও গৃহ্যসূত্রের বিধি উপহাস করিয়াছিলেন। ইহা একটা লৌকিক আচার (folk-lore), প্রমাণ গণ্য হইতে পারে কি? ডক্‌টর থিব্‌ নিরুত্তর ছিলেন। কিন্তু প্রোফেসর কিথ্ নির্বাক থাকিতে পারেন নাই। কারণ, ধ্রুবতারা স্বীকার করিলে খ্রী-পূ তিন সহস্র বৎসর পূর্বে যাইতে হয়। তাঁহার মতে, বৈদিক-কৃষ্টি এত প্রাচীন হইতে পারে না। সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। তিনি খ-গোল চিত্র হইতে একটা তারার নাম তুলিয়া মনে করিয়াছিলেন, চূড়ান্ত উত্তর হইয়াছে। তিনি দেখেন নাই, সে তারা হইতে মেরু বহু দূরে ছিল, নিকটে থাকিলে খ্রী-পূ দশম শতাব্দে ধ্রুবতারা হইতে পারিত। প্রোফেসর উইন্‌টার্নিৎস্ দিশা না পাইয়া তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ্যার প্রোফেসরকে ধরিয়াছিলেন। আর, বোধ হয়, বলিয়াছিলেন, দেখুন ত, খ্রী-পূ দশম কি একাদশ শতাব্দে মেরু কোন তারার নিকটস্থ হইয়াছিল কি না। প্রোফেসরও তদনুযায়ী হইয়া দুইটা তারার নাম করিয়াছিলেন। কিন্তু দুইটাই পঞ্চম কিম্বা ষষ্ঠ প্রভার, সহজে চর্মচক্ষুর গোচর হইবে না। এই সকল হাস্যকর প্রয়াস দেখিলে মনে হয়, পণ্ডিতেরা প্রমাণটি সম্যক্ বুঝিতে পারেন নাই। এমন তারা চাই, যাহা নিশ্চল, যাহা আকাশে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে এবং যাহার নিকটে একটি ছোট তারা আছে।

---

* বায়ুপুরাণে ও বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, কৃত্তিকা-নক্ষত্র-ভাগের প্রথম পাদান্তে মহাবিষুব সংক্রান্তি হইত। তখন মেষান্ত। গুপ্তাব্দ মুখে অর্থাৎ ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে মেষাদ্যে হইত। এক মাসে প্রায় ২১৬০ বৎসর। অতএব খ্রী-পূ (২১৬০ − ৩১৯ =)১৮৪১ অব্দে মেষাদ্যে অয়ন হইত।

পুরাণে ধ্রুবতারা।

বৈদিক কালের ধ্রুবতারা আশ্রয় করিয়া পুরাণে ধ্রুবোপাখ্যান রচিত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণে (১।১১) আছে, উত্তানপাদ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সুরুচি নাম্নী মহিষীর গর্ভে উত্তম এবং সুনীতি নাম্নী মহিষীর গর্ভে ধ্রুব নামে পুত্র হয়। ধ্রুব পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়া পরম-পদ-লাভেচ্ছায় এক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তিনি সাত ঋষি (সপ্তর্ষির সাত ঋষি) দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা ধ্রুবকে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে বলিলেন। ধ্রুবের তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান্ এই বর দিলেন, "হে ধ্রুব, তুমি আমার প্রসাদে ত্রৈলোক্য অপেক্ষাও উন্নত স্থানে সমুদয় গ্রহ-নক্ষত্রের আশ্রয়স্থল হইবে। তোমার মাতা সুনীতিও নির্মল তারকা হইয়া তোমার সহিত অবস্থিতি করিবেন।" দেবাসুরাচার্য শুক্র ধ্রুবের মান ও মহিমা দেখিয়া কহিলেন,—"অহো! ধ্রুবের কি তপস্যার ফল। দেখ, সপ্তর্ষিগণ ইঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, ধ্রুবের জননীও ধ্রুবের সম্মুখে আছেন।"

বেদের কাল হইতে প্রাচীনেরা মেরুকে সর্বোচ্চ স্থান মনে করিতেন। পূর্বোক্ত ধ্রুবতারা ব্যতীত আর কোন তারা মেরুর সন্নিকটে ছিল না। সে তারা সপ্তর্ষির সম্মুখেও বটে। তাহার নিকটস্থ ছোট তারাটি উপাখ্যানের সুনীতি। শিশুমারই উত্তানপাদ। যখন মেরুতে ধ্রুবতারা ছিল, তখন গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক বাত-রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিত। (বিষ্ণুপুরাণ।) সে কি রকম? যেমন, খামারে ধান মাড়িবার সময় এক মেধি-কাঠে (মেইকাঠে) দোড়ি বাঁধিয়া সেই দোড়িতে পাশে পাশে গোরু বদ্ধ হইয়া মেধিকে প্রদক্ষিণ করে। তখন ধ্রুবতারা মেধীভূত। পরে যখন ধ্রুবতারাকেও চলিতে দেখা গেল, তখন দৃষ্টান্ত পরিবর্তন করিতে হইল। তখন বলা হইত, ধ্রুব নিজে ভ্রমণ করে, গ্রহ-নক্ষত্রকেও ভ্রমণ করায়। সে কি রকম? যেমন, তৈল-পীড়ক যন্ত্রে (ঘানিতে) যষ্টির অগ্র ঘুরে, গোরুও ঘুরে। বায়ুপুরাণে এই ব্যাখ্যা আছে। এই ব্যাখ্যার নিমিত্ত প্রাচীন ধ্রুবতারা পরিত্যক্ত হইয়া মেরুর নিকটবর্তী অন্য এক তারা ধ্রুব কল্পিত হইয়াছিল। কিন্তু ধ্রুব নাম রহিয়া গেল।

পাশ্চাত্ত্য বেদ-বিদ্বানেরা মনে করিয়াছেন, পুরাণ বেদ-বাহ্য; বেদে কৃষ্টির যে প্রবাহ চলিতেছিল, তাহা অকস্মাৎ ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। যেন, পুরাণকারেরা আর্য ছিলেন না, বৈদিককালের মনুষ্যদিগের সন্তান ছিলেন না! বিদ্বান্-দিগের মনোভাব এইরূপ না হইলে তাঁহারা পুরাণের প্রমাণ অগ্রাহ্য করিতেন না।

বৈবস্বত মনু।

গৃহ্য-সূত্রে বিবাহের পর ধ্রুব দর্শন বিহিত হইয়াছিল। বেদ-সংহিতায় ধ্রুবতারার উল্লেখ না থাকিলে গৃহ্য-সূত্রে থাকিত না। দ্বিতীয়তঃ, আমার বিবেচনায়, খ্রী-পূ ৩৫০০ হইতে ২৫০০ পর্যন্ত ঋগ্বেদের অন্তিমকাল। একটা তারা সে সময় ধ্রুব হইয়াছিল, ঋগ্বেদের ঋষিগণ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। বাস্তবিক, ঋগ্বেদে এই তারা বৈবস্বত মনু নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

মনু অনেক ছিলেন। কিন্তু যে মনু আদি মানব, যাঁহা হইতে মানব জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তিনি বিবস্বানের পুত্র। দক্ষিণায়ন দিনের প্রত্যক্ষ সূর্যের নাম বিবস্বান্। ঋগ্বেদে (১০।১৭।১,২) এই মনুর জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ত্বষ্টার এক কন্যা তাঁহার মাতা। পরবর্তী ইন্দ্র-প্রকরণে ত্বষ্টা পাইব। ইহা হইতেও বুঝিতেছি, বিবস্বান্ দক্ষিণায়ন আরম্ভ দিনের প্রত্যক্ষ সূর্য। এই মনুই আদি মানব, ইনিই প্রথমে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া যজ্ঞকর্ম প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। যম তাঁহার যমজ ভ্রাতা। যম প্রথম মৃত মানব। মনু জীবিত মানবের এবং যম মৃত মানবের রাজা। এইরূপ, মনু ও যম কল্পিত দেবতা। কিন্তু একতারায় উভয়ের অধিষ্ঠান। সে তারা পুরাতন ধ্রুবতারা।

মনুর অধিষ্ঠান যে পূর্বোক্ত ধ্রুবতারায় ছিল, তাহা শত-পথ ব্রাহ্মণে (১।৮।১) জলপ্লাবনের কাহিনী পড়িলে বুঝিতে পারা যায়। অথর্ববেদেও (১৯।৩৯।৮) সে কাহিনীর উল্লেখ আছে। "একদিন প্রাতঃকালে মনু হাত ধুইতে-ছিলেন। তিনি জলের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র মৎস্য দেখিতে পাইলেন। মৎস্য বলিলেন, 'আপনি আমাকে ধারণ করুন, জলপ্রবাহ সমুদয় প্রজাকে বহিয়া লইয়া যাইবে, আমি তাহা হইতে আপনাকে উদ্ধার করিব। আপনি প্রথমে আমাকে এক কুণ্ডীর মধ্যে রাখিবেন, বড় হইলে নদীতে, আরও বড় হইলে সমুদ্রে ছাড়িয়া দিবেন।' তিনি শীঘ্র মহামৎস্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, 'যে বৎসর প্রবাহ উপস্থিত হইবে, আপনি যে বৎসর নৌকা নির্মাণ করিয়া তাঁহার (মৎস্যের) উপাসনা করিবেন এবং প্রবাহ উত্থিত হইলে নৌকা আশ্রয় করিবেন, আমি আপনাকে উদ্ধার করিব।' মৎস্য যে বৎসর নির্দেশ করিয়াছিলেন, মনু সে বৎসর নৌকা নির্মাণ করিয়া তাঁহার উপাসনা করিয়াছিলেন এবং প্রবাহ উত্থিত হইলে নৌকা আশ্রয় করিয়াছিলেন। সেই মৎস্য তাঁহার নিকট ভাসিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার শৃঙ্গে নৌকার রজ্জু বন্ধন করিলেন এবং তাঁহার দ্বারা উত্তরগিরির উপরে গমন করিলেন। মৎস্য বলিলেন, 'আপনি বৃক্ষে নৌকা বন্ধন করুন, জল যত নীচে নামিয়া যাইতে থাকিবে,

আপনিও তত নীচে নামিতে থাকিবেন।' প্রবাহ সমস্ত প্রজাকে বহিয়া লইয়া গিয়াছিল, কেবল মনু অবশিষ্ট ছিলেন। মনু প্রজা কামনা করিয়াছিলেন। তাঁহার এক দুহিতা হইয়াছিল। তাঁহা হইতে নূতন সৃষ্টি হইয়াছিল।"

এই উপাখ্যানের মৎস্য স্বর্গের শিশুমার, অন্য কল্পনায় এক অশ্বত্থ বৃক্ষ; ধ্রুবতারা সে বৃক্ষের মূল। (চিত্র ২, চিত্র ৩)। দিব্য নৌকা সপ্তর্ষির দ্বারা গঠিত। অত্যুচ্চ স্থানের নাম গিরি। শৃঙ্গ মৎস্যের মুখের দীর্ঘ লোম। অন্য কল্পনায়, ধ্রুবতারাই মনু, নিকটস্থ তারা তাঁহার দুহিতা। ঋগ্‌বেদে অশ্বিদ্বয়ের গমনাগমনের রথ ব্যতীত এক নৌকা ছিল, শস্য বহিবার এক শকটও ছিল। সপ্তর্ষি নক্ষত্রের আকার দেখিয়া সে দিব্য নৌকাও শকট কল্পিত হইয়াছিল।

যে জলপ্লাবনের কথা পাইলাম, সে জল পার্থিব নয়, তাহা মহার্ণবের সলিল, বিশ্বকারণ অপ্। ঋগ্‌বেদে (১০।৭২।২,৩) আছে, "দেবতাদেরও সৃষ্টির পূর্বে এই 'সলিল' দ্বারা বিশ্বভুবন ব্যাপ্ত ছিল। তখন অসৎ হইতে সৎ হইল, উত্তানপদ্ হইতে দিক্ সকল জন্মগ্রহণ করিল, পৃথিবী জন্মিল।" উত্তানপদ্ যাঁহার পদ বহির্দিকে বিস্তৃত। শিশুমারই উত্তানপদ্। উত্তানপদেরই মস্তকে ধ্রুবতারা সর্বোচ্চস্থানে থাকাতে পদদ্বয় বহির্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। শিশুমার উত্তরদিকে, অতএব তদ্দ্বারা দিক্-নির্ণয় হইত। পৃথিবী, দেবতা, সূর্য প্রভৃতির সৃষ্টির পূর্বে উত্তানপদ্ জন্মিয়াছিলেন।*

ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ৮১ ও ৮২ সূক্ত ধরিয়া পুরাণের সৃষ্টি-প্রকরণের উৎপত্তি হইয়াছে। যখন নিখিল বিশ্ব-ভুবন সলিলে মগ্ন ছিল, যখন কিছুই, কোনও সত্তা ছিল না, তখন এক প্রভু সে সলিলে (নারে) বটপত্রে শয়ান ছিলেন। এইহেতু পুরাণে তিনি নারায়ণ (নার+অয়ন); এইখানে বিষ্ণুর 'পরমপদ' যোগীর ধ্যান-গম্য। মৎস্যই বটপত্র। মৎস্যই শ্বেতদ্বীপ, যেখানে নারদ নর ও নারায়ণ দেখিয়াছিলেন। মহাভারতে (শান্তিপর্ব। ৩৩৬) সে উপাখ্যান আছে।

চিত্র ২। উত্তানপদ্। ১—মনুতারা।
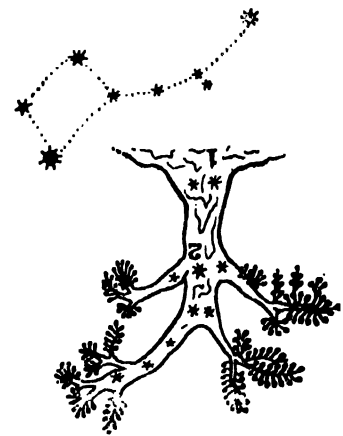
চিত্র ৩। ঊর্ধ্বমূল অশ্বত্থ।
১—মনুতারা সর্বোচ্চ মনে করিতে হইবে।

মৎস্য-অবতারের বৈবস্বত মনু নূতন সৃষ্টি করেন পূর্বে। রুদ্র-প্রকরণে এই প্রকার সৃষ্টিই দেখিয়াছি। নূতন নক্ষত্র সৃষ্টি হইল, আদিত্য হইল, ইত্যাদি। এই সময় হইতে এক নূতন অব্দ-গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। সেই অব্দকাল পুরাণে মন্বন্তর, অর্থাৎ মনু-কাল। গণিত দ্বারা জানা যায়, খ্রী-পূ ৩২৫৬ অব্দে শারদ-বিষুব দিনে পূর্ণিমা হইয়াছিল। সেটি মার্গশীর্ষ পূর্ণিমা। সে বৎসরে জ্যৈষ্ঠ শুক্ল-নবমী দশমীতে রোহিণীতারার ধ্রুবসূত্রে বাসন্ত-বিষুব সংক্রান্তি হইয়াছিল।

* প্রায় খ্রী-পূ ১৬০০ অব্দ শতপথ-ব্রাহ্মণের কাল। ইহার পূর্বের অথর্ববেদেও (১৯।৩৯) জল-প্লাবনের উল্লেখ আছে। অথর্ববেদ অন্ততঃ খ্রী-পূ ২০০০ অব্দে প্রণীত হইয়াছিল। বাইবেলের জল-প্লাবনের উপাখ্যান বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্বের বিকৃত সংস্করণ। কাল্দীয় জাতি বৈদিক কৃষ্টি মেসোপটেমিয়ায় লইয়া গিয়াছিল, আর্যকৃষ্টির সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া এইরূপ মনে হয়। ইউফ্রেটিস্ নদীর বাম পার্শ্বে উর্ নামক স্থানে মৃৎ-খনন দ্বারা এক বিস্তীর্ণ জল-প্লাবনের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। তাহার কাল প্রায় খ্রী-পূ ৩০০০ অব্দ। কিন্তু সেটি স্থানীয় জল-প্লাবন, বেদের কিম্বা বাইবেলের জল-প্লাবন নয়। বেদের জল-প্লাবন অবলম্বন করিয়া মহাভারতে এক পার্থিব জল-প্লাবনের উল্লেখ আছে। সেখানে, হিমালয় গিরির এক শৃঙ্গে মনু নৌ-বন্ধন করিয়াছিলেন। হিমালয়েরই আর এক স্থানে মনু অবতরণ করিয়াছিলেন। লোকে হিমালয়ের শৃঙ্গকেই সর্বোচ্চ মনে করিয়া দুই স্থানের দুই নাম রাখিয়াছে।

আমরা সেদিন দশহরা নামে স্মরণ করিতেছি। সেদিন এক সম্বৎসর আরম্ভ হইত, রঘুনন্দন দশহরা-বর্ণনায় উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা সে অব্দ একেবারে বিস্মৃত হইয়াছি। আমার মনে হয়, এই খ্রী-পূ ৩২৫৬ অব্দ হইতেই পুরাণের মন্বকাল গণিত হইয়াছে (পরে পশ্চ)। যেটি বৈবস্বত মন্বুর আরম্ভ ছিল, সেটি স্বায়ম্ভুব নাম পাইয়াছে। কিন্তু আদি সৃষ্টি ইহার ২০০০ বৎসর পূর্বে প্রজাপতি দক্ষের কালে হইয়াছিল। সে সময়ে বিশ্ব-ভুবন সলিলে মগ্ন ছিল, শ্বেতবরাহ (রুদ্র) উত্তোলন করিয়াছিলেন। তিনিই কশ্যপ (কচ্ছপ) নামে প্রজাপতি; শুক্ল যজুর্বেদে (১৩,৩১৷৯) এবং অথর্ববেদে (১৯,৫৩৷১০) উক্ত হইয়াছেন। রুদ্রই স্বয়ম্ভু, তিনিই কূর্ম-অবতার হইয়াছিলেন। কূর্মও স্বয়ম্ভু। কি কারণে, বলিতে পারা যায় না, সেই সময়ের স্বায়ম্ভুব মন্বু-গণনা পরিত্যক্ত হইয়া খ্রী-পূ ৩২৫৬ অব্দ হইতে পুনর্বার স্বায়ম্ভুব মন্বুকাল গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। স্বায়ম্ভুব মন্বু হইতে বৈবস্বত মন্বু সপ্তম। সাত মন্বুতে ২০০০ বৎসর। এই মতে খ্রী-পূ ৩২৫৬ অব্দ হইতে স্বায়ম্ভুবাদি সপ্ত মন্বুর কাল গণিত হইয়া খ্রী-পূ ১২৫৬ অব্দে বৈবস্বত মন্বুর কাল শেষ হইয়াছিল। মহাভারতে উক্ত আছে, বৈবস্বত মন্বুর কালেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল।

(পাঁজিতে যে মন্বু ও যুগের পরিমাণ লিখিত হয়, তাহা দৈব; মানুষের ব্যবহার্য নয়। মানুষের ব্যবহার্য মন্বু ও যুগ-গণনা এইরূপ ছিল,—সাত মন্বুতে ২০০০ মানুষ বৎসর, অতএব একমন্বু = ২৮৫$\frac{5}{7}$ বৎসর। চারি বৎসরে এক যুগ, অতএব এক মন্বুতে ৭১$\frac{3}{7}$ যুগ। এইরূপে, বৈবস্বত মন্বুর অষ্টাবিংশতি দ্বাপর ও কলির সন্ধি-সময়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। কলি-বৎসরে যুদ্ধ সমাপ্ত হইয়াছিল, এবং সেই বৎসর হইতে দ্বাদশ শত মানুষ-বৎসরের এক কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছিল (বিষ্ণু-পুরাণ)। কলিযুগ পরিমাণ ১০০০ বৎসর। ইহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ ২০০ বৎসর। উভয়ে মিলিয়া ১২০০ মানুষ বৎসর। ইহাকে দৈব ধরিলে, ১২০০ × ৩৬০ = ৪,৩২,০০০ বৎসর, পাঁজিতে কলিযুগের পরিমাণ)।

নক্ষত্র-চক্র-নির্মাণ।

কোন্ কালে চন্দ্র-পথের সাতাইশ তারাময় নক্ষত্র চিহ্নিত হইয়াছিল? যজুর্বেদ ও অথর্ববেদের পূর্বে হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, যজুর্বেদে নক্ষত্রগুলির নাম আছে এবং নক্ষত্রের অধিপতি দেবতার নামও আছে। যজুর্বেদের কাল খ্রী-পূ ২৫০০ অব্দ। পূর্বে "যজুর্বেদের কাল-নির্ণয়" প্রবন্ধে ইহা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যাঁহারা অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় যজ্ঞ করিতেন, চন্দ্রগতি তাঁহাদের অবশ্য লক্ষ্য হইয়াছিল। তাঁহারা নক্ষত্রের উদয় দেখিয়া অয়ন-পরিবর্তন এবং কোন কোন ঋতুর আরম্ভ অবগত হইতেন। এই কারণে ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ প্রধান প্রধান নক্ষত্র চিনিতে শিখিয়াছিলেন।

এক ঋষি বলিতেছেন, সোমকে নক্ষত্রের ক্রোড়ে রাখা হইয়াছে (১০।৮৫।২)। ইহার অর্থ, চন্দ্র রাত্রির পর রাত্রি এক এক নক্ষত্র ভোগ করেন। নক্ষত্র-চক্র নির্মাণের মূল এইখানে। পুরাণেও আছে, চন্দ্র সাতাইশটি নক্ষত্র নাম্নী কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। অদ্য সন্ধ্যার সময় চন্দ্রকে এক নক্ষত্রের নিকটে দেখিলাম, কল্য সে সময় আর এক নক্ষত্রের নিকটে দেখা যাইবে। এইরূপ, সাতাইশ রাত্রি গতে প্রথম নক্ষত্রের নিকটে দেখা যাইবে। অর্থাৎ চন্দ্রই নিজের পথের সাতাইশ নক্ষত্র দেখাইয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু সাতাইশটি নক্ষত্র চন্দ্রপথের সন্নিকটে পাওয়া যায় না। কোনটা পথের উত্তরে, কোনটা দক্ষিণে অবস্থিত। ধ্রুবতারা আবিষ্কারের পর দূরস্থিত নক্ষত্র-নির্দেশ সুগম হইয়াছিল। সূত্রদ্বারা ধ্রুবতারা ও চন্দ্র যোগ করিয়া, কোথাও বা চন্দ্রের দক্ষিণে বর্ধিত করিয়া সে সূত্রে যে নক্ষত্র দেখা যাইত, সে নক্ষত্র চন্দ্র-নক্ষত্র হইয়াছিল। এই যোগ প্রত্যহ মধ্যরাত্রে ঘটে। কোন নক্ষত্রে একটি তারা, কোন নক্ষত্রে দুইটি, কৃত্তিকায় ছয়টি, ইহার অধিক তারায় কোন নক্ষত্র নাই। যে নক্ষত্রে যে তারা বড়, সে তারা দিয়া ধ্রুব-সূত্র প্রসারিত করাই স্বাভাবিক। গণিতদ্বারা ইহা সমর্থিত হয়। খ্রী-পূ ৪৫০০, ৩৫০০, ২৫০০ অব্দের ধ্রুবসূত্রস্থ তারা-স্থান গণিলে দেখা যায়, খ্রী-পূ ৩২০০ অব্দের তারাস্থান আশ্চর্য-রূপে মিলিয়া যায়। এই ঐক্য আকস্মিক হইতে পারে না। অতএব এই সময়ে বর্তমানের সাতাইশটি নক্ষত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে। সে সময়ে রোহিণী-নক্ষত্রে বাসন্ত-বিষুব এবং জ্যেষ্ঠা-নক্ষত্রে শারদ-বিষুব হইত। মূলা ও জ্যেষ্ঠা নাম হইবার কারণ এই। এই নক্ষত্র হইতে চক্র আরম্ভ হইয়াছিল। যে কারণে এক মাসের নাম অগ্রহায়ণ, সেই কারণে আর এক মাসের নাম জ্যৈষ্ঠ। ইহার পূর্বে ধ্রুব-তারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাহা পূর্বোক্ত আলোচনায় প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহার আর এক প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। এই কালের পূর্বে অভিজিৎ ও শ্রবণার ধ্রুব-সূত্রের মধ্যে অন্তর অধিক ছিল। কিন্তু দুই সূত্র ক্রমে ক্রমে নিকটস্থ হইয়া মাত্র ৪° অংশ হইয়াছিল। এইহেতু একটিকে ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অভিজিৎ চন্দ্রপথ হইতে বহু উত্তরে বলিয়া সে তারা নক্ষত্র-চক্র হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা মহাভারত-বনপর্বে (১২৮) উল্লিখিত

হইয়াছে। সেখানে আছে, রোহিণীর জ্যেষ্ঠত্বহেতু অভিজিৎ বনে গমন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ রোহিণীকালেই অভিজিৎ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এক বৎসরে কিম্বা দশ বৎসরে নক্ষত্র-চক্র-নির্মাণ অসম্ভব ছিল। বহু বৎসরের পরিদর্শনের ফলে নক্ষত্র-চক্র বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। বোধ হয়, প্রতি মাসে দুইটি নক্ষত্র ধরিয়া প্রথমে চব্বিশটি নক্ষত্র গণ্য হইত। ফল্গুনী, আষাঢ়া ও ভদ্রপদা বিভক্ত হইয়া পরে আঠাইশটি হইয়াছিল। যজুর্বেদের কালে সাতাইশটি গণ্য হইয়াছিল। সে সময়ে তারাময় কৃত্তিকা-নক্ষত্র নক্ষত্র-চক্রের আদি নির্ধারিত হইয়াছিল। কারণ, কৃত্তিকা-নক্ষত্র ভাগের প্রথমে পাদান্তে বাসন্ত বিষুব হইত।

বহুকাল পূর্বে জর্মান প্রোফেসর বেবর তারাময় স্পষ্ট কৃত্তিকা-নক্ষত্রে বাসন্ত-বিষুব স্বীকার করিয়াছিলেন। খ্রী-পূ ২২০০ অব্দে ইহা ঘটিয়াছিল। কাজেই, বেবর সাহেব যজুর্বেদের এইকাল মানিয়াছিলেন। ডকটর থিব. সাহেব অবলীলাক্রমে বলিলেন, এই ব্যাখ্যা ভুল। কারণ, তাঁহার বিবেচনায় 'নক্ষত্র-দর্শক' ঋষিগণ বসন্ত ঋতু হইতে বৎসর গণিতেন না, বাসন্ত-বিষুবও জানিতেন না! তাঁহার কল্পনায় বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের সময়ে যজুর্বেদ প্রণীত হইয়াছিল, তাহাও খ্রী-পূ ৮০০ অব্দে! ইহা এক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার! প্রোফেসর কিথ্ অকূলে কূল পাইলেন। ইহা এক পরম কৌতুকের কথা। কিন্তু আরও এক বিপদ রহিয়া গিয়াছে। আর্যেরা কোন্ জাতির নিকট হইতে নক্ষত্র-চক্র পাইয়াছেন? তাঁহাদের কল্পনায়, আর্যেরা কদাপি নক্ষত্র-চক্র স্থির করিতে পারিতেন না। নিশ্চয় অপর কোন জাতির নিকট পাইয়াছিলেন। সে কোন্ জাতি, বিদ্বানেরা স্থির করিতে পারেন নাই। অথচ অন্য কোন জাতির নক্ষত্র-চক্রের চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে না। তাঁহারা ভাবিলেন না, চন্দ্র-নক্ষত্র দ্বারা ৩৬৬ দিনে বৎসর পরিমিত হইতে পারে না, অধিক মাস গণিতেও পারা যায় না, অয়ন-পরিবর্তনের দিনও নির্দিষ্ট হইতে পারে না। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের অনেক উচ্চশিক্ষিত বিদ্বান উক্ত পণ্ডিতদিগের মতের হেতু বিচার করেন না। মাসের নাম জ্যৈষ্ঠ কেন হইল, কেন অগ্রহায়ণ হইল, ইহার উত্তর চিন্তা করিলে বৈদিক কৃষ্টির প্রাচীনতা প্রতীত হইবে। যজুর্বেদের কালে, অর্থাৎ খ্রী-পূ ২৫০০ অব্দে বৈশাখী পূর্ণিমায় বাসন্ত-বিষুব ও কার্তিকী পূর্ণিমায় শারদ-বিষুব দিন হইত। ইহার পূর্বে প্রায় দুই সহস্র বৎসর জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় ও মার্গী পূর্ণিমায় হইত। রুদ্র-প্রকরণে খ্রী-পূ ৪৫০০ অব্দের প্রমাণ পাইয়াছি। এই প্রকরণ হইতে ৩২৫০ অব্দেরও পাইলাম।

রোহিণী-নক্ষত্রকালে কল্যব্দের আদি নিরূপিত হইয়াছিল। মধ্যরাত্রে ধ্রুবতারা ও সপ্তর্ষির বসিষ্ঠ-তারা যে বৎসর মধ্য-রেখায় দেখা যাইত, সে বৎসরই কলিমুখ। গণিত করিলে দেখা যাইবে, খ্রী-পূ ৩১০১ অব্দে এইরূপ ঘটিয়াছিল, সে বৎসরই কলিমুখ। কলি-দ্বাপর-ত্রেতা-কৃত, এই চারি নাম চারি বৎসরের ছিল, চারি যুগের নয়। খ্রী-পূ ৩২৫৬ অব্দ হইতে খ্রী-পূ ৩১০১ অব্দ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে এই চারি বৎসর গণিয়া আসিলে খ্রী-পূ ৩১০১ অব্দে কলি-বৎসর পড়িয়াছিল। সে নাম হইতে বৃহৎ কলিযুগের নাম হইয়াছে। সপ্তর্ষির সাতটি তারার মধ্যে বসিষ্ঠ-তারাই ধ্রুবের নিকটস্থ, উভয়ের অন্তর মাত্র ১১° অংশ; ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। কেমন করিয়া কলি-মুখ নির্ধারিত হইয়াছিল, পণ্ডিতেরা তাহা নিরূপণ করিতে দিশাহারা হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ আর্যভট ও অন্যান্য জ্যোতির্বিদেরা লিখিয়াছেন, কলিমুখে রবিচন্দ্রাদি গ্রহগণ একস্থানে ছিলেন। ইহা দেখিয়া পণ্ডিতেরা মনে করিলেন, কলিমুখ একটা কল্পিত বৎসর। কারণ, কলিমুখে রবি-শশী ভিন্ন অন্য গ্রহ নিকটে নিকটে ছিলেন না। ইহা গণিত-দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। তথাপি তাঁহারা মনে করিলেন, গ্রহগণের পশ্চাদ্‌গতি গণিয়া কলিমুখ স্থিরীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু সে ব্যাখ্যার মূলে কল্পনা ব্যতীত কোন প্রমাণই নাই। জ্যোতির্বিদেরা একটা ত্রি-সহস্র বৎসরের পুরাতন অব্দ পাইয়াছিলেন। তাহাকেই তাঁহাদের গণনার আরম্ভ ধরিয়াছিলেন। তাঁহারা নিজে গণিতদ্বারা পান নাই। আমাদের জ্যোতিষের কোনও অব্দমুখ কল্পিত নয়। কল্যব্দমুখ, সপ্তর্ষি-অব্দমুখ (যেটা কাশ্মীরে অদ্যাপি লৌকিকাব্দ নামে প্রচলিত আছে), যুধিষ্ঠিরাব্দ-মুখ, বিক্রম-সংবৎ, শকমুখ, গুপ্তাব্দমুখ, ইহাদের একটাও কল্পিত নয়। প্রত্যেকেরই মূল জ্যোতিষিক। ইহাদের কোনটার মূলে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনাও নাই।

দ্রষ্টব্য—পূর্ববর্তী রুদ্রপ্রকরণে শেষের দিকে 'অজ, একপাদ' হইবে অজ-একপাদ, 'শ্যেত্র' হইবে শ্যেন।

প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য

শ্রীশান্তা দেবী

যেদিন থেকে মানুষ কথা বলতে শিখেছে সেদিন থেকেই বোধ হয় প্রাচীন আর নবীন বলে দুটি নামের অবতারণা করা হয়েছে। প্রাচীন আর নবীন বলতে অনেকেই দুটি বিরোধী দল বুঝেন। কিন্তু তাদের মধ্যে যে চিরকালই শুধু দ্বন্দ্ব আছে তা নয়; ব্যক্তি হিসাবে প্রাচীন আর নবীনের মধ্যে সর্ব্বকালে শ্রদ্ধাপ্রীতির সম্পর্কও একটা চলে আসছে। পিতৃতর্পণ, পূর্ব্বপুরুষ পূজা প্রভৃতি এই শ্রদ্ধারই একটি রূপ।

ব্যাপকতর ক্ষেত্রে কে যে প্রাচীন আর কে যে নবীন সেটা বলা অনেক ক্ষেত্রে শক্ত। যদি প্রাগৈতিহাসিক যুগের সঙ্গে তুলনা করি তা হলে আমাদের মহাভারত রামায়ণের যুগও নবীনের যুগ। আবার যদি এটম বোমার যুগের সঙ্গে তুলনা করি তা হলে কামান বন্দুকের যুগই প্রাচীন, তীর-ধনুক তলোয়ার ত অতি প্রাচীন। মানুষ যত আধুনিক হচ্ছে তত তার প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা হয়ত কমে আসছে। কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে নিত্য নূতন আবিষ্কার তার মনে এই কথাই জাগায় যে যত দিন যাবে তত তার উদ্ভাবনী-শক্তি বাড়বে এবং ততই প্রাচীনের ভ্রম ও খুঁৎ সে সংশোধন করতে পারবে।

বিজ্ঞানের যখন এতটা উন্নতি হয় নি, তখন কিন্তু মানুষের আস্থা প্রাচীনের উপরই বেশী ছিল। যা শাস্ত্রে আছে, যা বেদ-বেদান্ত উপনিষদে আছে, যা বাইবেল বা কোরাণ বলেছেন তাকে মানুষ যতখানি ভক্তির সঙ্গে শুনত এবং তাকে অভ্রান্ত মনে করে তার উপর যতখানি নির্ভর করত, নবীনতর কোন প্রাজ্ঞজনের বাক্যে কখনও মানুষ ততটা আস্থা দেখায় নি।

অবশ্য তার একটা কারণ এই যে, এই শাস্ত্রগুলির অধিকাংশকেই অনেক মানুষ মানব-রচিত মনে করে না, এগুলি দেবতার বাণী বলে পরিচিত। কিছু বা ঋষিবাক্য। কিন্তু এখনকার যুক্তিবাদী যুগে আর কোন ধর্ম্মের লোক না হউক খ্রীষ্টধর্ম্মীরা তাঁদের শাস্ত্রগুলিকে মানুষের রচনা বলেই মানেন, এবং সেই শাস্ত্রকার মানুষদেরও দেবতার অবতার ভাবেন না। তবু আধুনিক কোন মহাপুরুষের কথার চেয়ে বাই-বেলের প্রতি তাঁদেরও ভক্তি বেশী। প্রাচীনতাই বাইবেলের গুরুত্ব ও পবিত্রতাকে আরও মহিমামণ্ডিত করে রেখেছে। অবশ্য প্রাচীনতা এক রকম পরশপাথরও বলা যেতে পারে। প্রাচীনতার দীর্ঘ স্রোত বেয়ে যে এতদিন বেঁচে আছে এবং এতকাল পরেও মানুষের মনকে ভক্তিনত করতে পারে তার মূল্যের পরীক্ষা ত হয়েই গিয়েছে। বিজ্ঞান ছিল না বলেই হয়ত তখনকার মানুষের অন্তর্দৃষ্টি বা তৃতীয় নেত্রের শক্তি ছিল গভীর। ক্রমে মানুষ তা হারিয়ে ফেলেছে; এবং নবীনে বিশ্বাসী যে যতই হউক কেউ সহজে মনে করে না যে বেদ উপনিষদের মত স্থায়ী আজকালকার কোন সাহিত্য হবে।

যদিও মানুষের জীবনে প্রাচীনে নবীনে ঝগড়ার উদা-হরণের অন্ত নেই, যদিও শাশুড়ী-বৌ-এর ঝগড়া, পিতা-পুত্রের বিরোধ, গুরু-শিষ্যের দ্বন্দ্ব আমরা সর্ব্বদাই দেখতে পাই, ইতিহাসেও পড়েছি পিতার শোণিতে কলঙ্কিত কত পুত্রের সিংহাসনের কথা, তবু সবগুলিকে ঠিক প্রাচীন-নবীনের দ্বন্দ্ব বলা যায় না। বাস্তবিক অনেক স্থলে সেগুলি মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থের ঘাতপ্রতিঘাত মাত্র। শাশুড়ীও মানুষ, তিনি সংসারে তাঁর প্রতিষ্ঠা ছেড়ে দিতে পারেন না; বধূও মানুষ, তিনি তাঁর নবলব্ধ দাবির ধারালো অস্ত্রে পথ কেটে পরিষ্কার করতে চান। পিতা-পুত্র এবং গুরু-শিষ্যের মধ্যে স্বার্থের সম্পর্ক কম, একেবারেই নেই বলা যায় না। সচরাচর পিতা নিজের মঙ্গলের চেয়ে পুত্রের মঙ্গলই বেশী কামনা করেন ধরা যেতে পারে। তৎসত্ত্বেও যখন বিরোধ বাধে তখন তাকে তবু প্রাচীন ও নবীনের বিরোধের পর্য্যায়ে ফেলা যায়।

এগুলি গেল কতকটা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিরোধের পরিচয়। কিন্তু দলগত কতকগুলি বিরোধের কথাই কাগজে-কলমে মানুষ বেশী আলোচনা করে। যেমন সাহিত্যের কথা। ইংরেজী সাহিত্যে এলিজাবেথের যুগ, ভিক্টোরিয়ার যুগ আছে, আবার Modern writers, Modern poetry এসব আখ্যাও চলিত আছে। আমাদের সাহিত্যেও তার ছোঁয়াচ লেগেছে। প্রাচীন সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্য নামকরণ রবীন্দ্রনাথের সময় থেকেই হয়ে-ছিল; রবীন্দ্রনাথের পর আরও নূতন এক দল সাহিত্যিক দেখা দিলেন। এক দলকে বলা হ'ত রবীন্দ্র-যুগের আর এক দলকে অনেকে প্রগতিবাদী বলতেন। আমি সামান্য মানুষ হলেও এক সময় এই প্রগতিবাদীদের বিষয় লিখতে গিয়ে এঁদের সাহিত্যের নামকরণ করেছিলাম, 'অতি আধুনিক সাহিত্য।' নামটা দেখলাম অনেকেই গ্রহণ করলেন, খুব চলে গেল।

সে যাই হউক, কথাটা হচ্ছে প্রাচীনে নবীনে বিরোধ নিয়ে। বাস্তবিক কি বিরোধটা খুব বড়? বাস্তবিক কি প্রতি পুরুষের (generation) প্রাচীন ও নবীনের সাহিত্য-রচনায় প্রচুর প্রভেদ? প্রত্যেক প্রাচীন দলই এক সময় নবীন ছিলেন এবং কেউ কেউ অল্প, কেউ বা বিস্তর বিদ্রোহ করেছিলেন তাঁদের অগ্রবর্ত্তীদের বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রাচীনই হউক আর নবীনই হউক সাহিত্যের ক্ষেত্রটা কিসের উপর বিস্তৃত হয়ে আছে?

আমরা ধানই চাষ করি আর গমই চাষ করি, মা ধরিত্রীর বুকের উপর ছাড়া আমাদের স্থান নেই এবং কর্ষণ বপন ছাড়া গতি নেই। তেমনি আমরা শকুন্তলাই লিখি, বিষবৃক্ষই লিখি কি চোখের বালি বা চরিত্রহীনই লিখি— মানবজীবনকে ভিত্তি করেই আমাদের লিখতে হবে। শুধু তাই নয়, মানবজীবনের যৌবনকালের নবোদ্গত প্রেমই সকল যুগের কাব্যে বড় একটা স্থান জুড়ে আছে। সে প্রেম তপোবনেই হউক, কি রাজার ঘরেই হউক অথবা দরিদ্র গৃহস্থের কুটীরেই হউক, তার আনন্দ ও বেদনার হিল্লোলের মধ্যে যুগে যুগে খুব যে একটা তফাৎ আছে তা নয়। কাল-প্রবাহে যেটুকু পরিবর্ত্তন হয় তাকে বিরোধ বলা যায় না, তা সাময়িক পরিবর্ত্তন মাত্র। আমরা রামায়ণ মহাভারতের যুগে বড় বড় রাজবংশের কাহিনী নিয়ে কাব্য সাহিত্য রচনা করেছি, বঙ্কিমের যুগে গৃহস্থের ঘরের কথা বলেছি, এখন কয়লাখনি বা বস্তির কাহিনী বলি। এ রচনার ধারা নদীর স্রোতের ধারার মত একই স্রোতস্বিনীর বিভিন্ন অংশ। রামায়ণ মহাভারতের যুগেও আমরা সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর প্রেমের কথার সঙ্গে অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তীর কথাও বলেছি, আবার এযুগেও ভ্রমর রোহিণী, কমলা, বিনোদিনী বা চরিত্রহীনের সাবিত্রীর কথা বলি।

প্রাচীনে নবীনে কোনই বিরোধ বা প্রভেদ নেই বলা চলে না। কিন্তু এক একটা যুগ অর্থাৎ ২৫।৩০ বা ৪০ বৎসরে এমন কিছু বিপর্য্যয় হয় না যে তাকে বড় একটা বিপ্লব আখ্যা দিতে হবে। ডারউইনের থিওরি অনুসারে বাঁদর থেকে মানুষ হতে যে দীর্ঘ সময় লেগেছিল, সাহিত্যক্ষেত্রের ঐ রকম পরিবর্ত্তনে ততখানি দীর্ঘ সময় অবশ্য লাগে না, কিন্তু তবুও এক যুগের সাহিত্য থেকে পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্যে ৩০,৩৫ বৎসরে যে পরিবর্ত্তন দেখা যায় সেটাও মূলগত ভাবে খুবই সামান্য এবং খুবই ধীরগতি। আমাদের দেশের প্রগতিবাদীরা এবং তৎপূর্ব্বেও অনেকে পূর্ব্বতন সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও রচনা-পদ্ধতিকে আমূল পরিবর্ত্তন করেছেন বলে দাবি করেন। কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? যে পরকীয়া প্রেম বা যে অন্ত্যজ প্রেমের ছবি অথবা যে দৈহিক কামনার চিত্র প্রগতিবাদীরা তাঁদের বিদ্রোহের পরিচয়রূপে সাহিত্যে স্থান দিয়েছিলেন সে কি প্রাচীন এবং অতি প্রাচীন সাহিত্যে ছিল না? নানা যুগের প্রাচীন সাহিত্যেই, রামায়ণ মহাভারত থেকে কুমারসম্ভব প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যে এবং বাংলায় ভারত-চন্দ্র বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসেও আমরা তার পরিচয় পেয়েছি, তবে সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গী ধীরে ধীরে এবং বারে বারে ঘড়ির দোলকের মত এদিক থেকে ওদিকে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। কখন কামনাকে শুধু কামনা বলেই সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন, তাকে ভালও বলেন নি, মন্দও বলেন নি। কখন বা তার রূপক ব্যাখ্যা করে ভক্তিতত্ত্বের সঙ্গে তাকে জড়িত করেছেন, কখন বা সুরুচির খাতিরে সাহিত্যে তাকে অপাংক্তেয় করতে চেয়েছেন, যদিও সম্পূর্ণ-রূপে কোনও সময়েই তা হয় নি। আবার কখন বা নবীন সাহিত্যিক উন্মত্ত আবেগে এই দৈহিক কামনা নিয়ে মাতা-মাতি করেছেন, কিন্তু এই সকল সময়েই মানব-মনের যে হৃদয়াবেগগুলি তা তার চিরন্তন ধারায়ই চলেছে এবং সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। অবশ্য মানব-সভ্যতার শাসনে এবং মানবজীবনের জটিলতার বৃদ্ধিতে তা কালে কালে ধীর গতিতে কিছু পরিবর্ত্তিত, কিছু আবৃত, কিছু স্তিমিত, অথবা অধিক শাসনে কিছু উন্মত্তরূপে দেখা দেয়। জীবনের এই পরিবর্ত্তন সাহিত্যের পটেও ফুটে ওঠে।

মানুষ যে যুগে আদর্শবাদী সে যুগের সাহিত্যও আদর্শ-বাদ মেনে চলে, মানুষ যে যুগে যুদ্ধ বা আর কোন আকস্মিক কারণে উন্মত্ত ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে সে যুগে সাহিত্যও তার ভদ্রতার আবরণ ছুঁড়ে ফেলে দেয়। জীবন-যাত্রার ধারা যদি কোনও প্রচণ্ড আঘাতে পরিবর্ত্তিত হয়ে যায় তবে সাহিত্যের গায়েও সে আঘাত সজোরেই লাগে। নবীনের বিদ্রোহ তার কারণ নয়, নবীনের পারিপার্শ্বিকের হঠাৎ পরিবর্ত্তনই তার কারণ। আঘাতটা পৃথিবীর যে অংশে প্রথম লাগে পরিবর্ত্তনও সেইখান হতেই সুরু হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপীয় সাহিত্যে বিদ্রোহ বা উচ্ছৃঙ্খলতার যে প্রকাশ দেখা দিয়েছিল তা কেন ইউ-রোপেই প্রথম দেখা দেয়? কারণ যুদ্ধদানবের নিষ্ঠুর পেষণে সেখানকার মানুষ সভ্য জগতের শালীনতাকে অনেকখানিই ভুলে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

আমাদের ভারতবর্ষে, তথা এসিয়ায় সাহিত্যের এই বিদ্রোহ-ভাব পরের কাছে ধার করে ক্রমে নিজের করে নিতে হয়েছিল। কারণ যুদ্ধের যে মার ইউরোপ খেয়েছিল আমাদের সেবারে তা খেতে হয় নি। যদিও সাহিত্যে আমরা তখন থেকেই স্থানে অস্থানে অসম ও অগম্য প্রেমের

ছড়াছড়ি লাগিয়েছিলাম এবং বাহবাও প্রচুর পেয়েছিলাম, তবু সেই পূর্ব্বতন কালের মতনই সোনা-রূপা ওজন করে আর জাতকুলবর্ণ বাঁচিয়ে কনে আনার পদ্ধতি সাহিত্যিকরা স্বয়ংও বদলাতে পারলেন না। অস্ত্যজ, পতিত, বিদেশী বা বিধর্ম্মীকে হৃদয়পদ্মে বসিয়ে যতই কবিতা লিখি না কেন তার আওয়াজটা মেকি টাকার ধ্বনির মত শূন্যগর্ভ শোনাবে, *যদি না* তা আমাদের জীবনের সত্যকার ছবি হয়। আমাদের জীবনধারায় অত বড় বিপ্লব কি হয়েছে যে সাহিত্যে বড় বড় বিপ্লবী দেখা দেবে? কাব্যে ও সাহিত্যে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস থেকে বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যা লিখে গিয়েছেন তাকে আমরা বিদ্রোহ বলব না, বলব অগ্রগতি। নূতন কোন বিদ্রোহী তাঁদের সৃষ্টিকে পাল্টে দিতে পারেন নি এখন পর্য্যন্ত। কারণ জীবনের যে বিপ্লবের ছায়া সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হবে সে বিপ্লবই দেখা দিতে সাহস করছে না, ভীরু পায়ে একটু উঁকি মারছে মাত্র।

গৃহের ভিত্তি যেমন মাটির নীচে, গাছের মূল শিকড়ও তেমনি মাটির নীচে। সাহিত্যের প্রাচীন সৃষ্টি এই গৃহের ভিত্তি বা গাছের শিকড়ের মত। এখানে দোতলার উপর তিন তলা হয়, শাখার উপর প্রশাখা পাতা মেলে, কিন্তু ভিত্তি বা মূলকে অস্বীকার করে অথবা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কেউ বড় হয় না, তা হলে ধ্বংসই হয়। ঝড়ে ঝঞ্ঝায় বিরাট মহীরুহের ডালপালা যদি ভেঙে পড়ে বা কেউ ছেঁটে দেয়, তা হলেও সেই ছাঁটা ডালের রসেই পুষ্ট হয়ে নূতন পাতা তারই গায়ে আবার দেখা দেয়। পাতা নূতন বটে, কিন্তু রঙে রেখায় সেই পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি। তেমনি সাহিত্যেও আমরা যতই প্রাচীনকে দূরে ঠেলে বলি—আমরা আধুনিক, আমরা নূতন—দেখা যায় আমরা সেই প্রাচীনেরই রসপুষ্ট নবীন আবির্ভাব।

সেই উপনিষদ, সেই রামায়ণ, সেই মহাভারত, সেই বৈষ্ণব সাহিত্য, সেই বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ যুগের পর যুগে আমাদের সম্বল ছিল এবং থাকবে। এই যাঁদের সংখ্যা যুগে যুগে বেড়ে চলেছে এঁদের অনুভূতিকেই আমরা আমাদের হৃদয় দিয়ে অনুভব করি, আমাদের বাণীতে প্রকাশ করি। নূতন নূতন পাত্রে নূতন নূতন পরিবেশে তার কিছু পরিবর্ত্তন হয়; তা কখনও বেশী কখনও কম। কিন্তু মানুষের হৃদয়াবেগের প্রকাশ সম্পূর্ণ নূতন পথে আজও চলে নি, কবে চলবে জানি না। এক গাছের কলম আর এক গাছে লাগানোর মত দুটি বিভিন্ন জিনিষের সংমিশ্রণে আর একটু নূতনত্বও দেখা দেয় মাঝে মাঝে, কিন্তু তাও পুরাতনেরই রসসৃষ্ট। অবশ্য আমি বলছি না যে নূতন কিছুই নেই, সবই পুরাতন। তা যদি হ'ত তবে পুরাতন সম্পদের ভাণ্ডার এত বড় হ'ত না। কালে কালের সঞ্চয়েই পুরাতনের ভাণ্ডার বেড়েছে। কিন্তু এই বাড়া বিপ্লবের সাহায্যে নয়, বিকাশের সাহায্যে।

রচনা-পদ্ধতির বিপ্লব বিষয়েও তাই বলা যায়। ধরা যাক্, চলিত কথা ও সাধু ভাষার দ্বন্দ্ব কি করে সুরু হ'ল? কেউ বলবেন 'সবুজপত্রে'র যুগে এর সূচনা, কেউ বলবেন আরও আধুনিক লেখকেরা এর আরও রূপান্তর ঘটিয়েছেন। কিন্তু সে সব কোনটাই ত আকস্মিক বিপ্লব নয়। ধীরে ধীরেই এগুলিও ঘটেছে। অতি প্রাচীন সংস্কৃতের নিদর্শন আমি দিতে পারব না। কিন্তু কালিদাসের যুগে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলমে' দেখি মেয়েদের মুখের কথা কথিত ভাষাতেই লিখিত। তাঁরা 'আর্য্যপুত্র'কে বলছেন 'অজ্জউত্ত', প্রিয় সখিকে বলছেন 'পিয় সহি' ইত্যাদি। এইরূপ প্রাকৃত ভাষা, পালি ভাষা ইত্যাদি কথিত ভাষারই লিখিত রূপ। বাংলাতেও দেখি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' কথিত ও সাধুর মিশ্রণ:

> "যে লাজ পেয়েছি হাটে কৈতে লাজ পায়।
> এ টাকা মাসীরে কেন মাসী তোর পায়।"

ইত্যাদি।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়:

> 'প্রাণে, ভোলতে গেলেই বোলতে হয়
> পোড়া দেশের লোকের আচার দেখে চোলতে
> পথে করি ভয়।'

দীনবন্ধু মিত্রের নাটক কথিত ভাষাতেই রচিত। নাটকে উপন্যাসে মানুষের মুখের কথা বহু দিনই কথিত ভাষায় লেখা চলে, ক্রমে তা সকল ক্ষেত্রেই ছড়িয়ে পড়ল। সেই সময়ই দুই ভাষার দ্বন্দ্ব সুরু হয়। কিন্তু যাকে আমরা বিপ্লব বলি তার ফলেও সম্পূর্ণ কথিত ভাষা সাহিত্যে চলে নি। ক্রিয়াপদকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে বটে, কিন্তু আমরা যে ভাষা কথায় ব্যবহার করি সেই অলঙ্কারহীন সাদাসিধা ভাষা লেখায় চালাতে ক'জনের ইচ্ছা বা সাহস হয়? সকলেই তাঁদের পুঁজিতে যত অলঙ্কার আছে মানসকন্যার সর্ব্বাঙ্গে চাপিয়ে তবে তাকে পাঁচ জনের সামনে বার করতে সাহস করেন। না হলে যে তিনি বিদ্যা-ধনে ধনী প্রমাণিত হবেন না। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় ক্রিয়াপদের কথিত রূপগুলি সাহিত্যের সর্ব্বক্ষেত্রে চালাতে চেষ্টা করেছেন এবং সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটা সফল হয়েছিলেন। কিন্তু সাহিত্যের ভাষার যে একটা আলঙ্কারিক রূপ আছে সেটা বদলে দিতে পারেন নি। তা ছাড়া কথিত ভাষা চালাবার চেষ্টায় বাংলা ভাষার বানান নিয়ে যে সমস্যা দাঁড়িয়েছে তা যে কি প্রকারে এবং কত দিনে মিটবে জানি না। আকস্মিক বিপ্লবে পাকা কাজ হয় না বলেই আজ বাংলায়

ওকার দেওয়া বানান, উকার দেওয়া বানান, একার দেওয়া বানান যার যা খুশী চালাচ্ছেন। হোলুম, হলেম, হলাম, হোলাম, যার যা ইচ্ছা লিখতে পারেন। কিন্তু বিপ্লবের পর ধীরে ধীরে যখন উচ্ছ্বাসটা সম্পূর্ণ থিতিয়ে পড়বে তখন হয় ত ক্রমে একটা সার্ব্বজনীন বানানের রূপ দাঁড়াবে। সেই রকম ইংরেজী, ফরাসী, ফার্সী নানা শব্দ এবং গ্রাম্য বহু কথাও একটু অতিরিক্ত আগ্রহে চালানো সুরু এক এক সময় হয়েছে। তার বহু কথাই ঝরে যাবে, কিছু থাকবে।

সহজ ভাষার একটা রূপ 'প্রবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক তাঁর বিবিধ প্রসঙ্গে চালিয়েছিলেন। যদিও তার ক্রিয়াপদ সচরাচর সাধুভাষার মতই লিখিত হ'ত, তবু অলঙ্কারবর্জ্জিত সহজ ও মার্জ্জিত তার যা চেহারা ছিল তার চেয়ে অনেক কথিত ভাষার রূপ যথেষ্ট কৃত্রিম। কিন্তু এটাতেও বিপ্লবের কোনো চিহ্ন ছিল না এবং ভাষার সংস্কার বিষয়ে তিনি কোনো দাবি করেন নি।

একই ভাষাকে অবলম্বন করে নানা মানুষ নানা ভাবে তাদের মনের কথা বলে, তাতে পার্থক্য থাকবেই, নূতনত্বও কিছু কিছু থাকবে যদি মানুষটি শক্তিশালী হন। তবে কেউ-বা যুগপ্রবর্ত্তক হন চিন্তা ও কল্পনাশক্তির প্রাচুর্য্যে এবং রূপ-সৃষ্টির নৈপুণ্যে আবার কেউবা যুগপ্রবর্ত্তক হ'তে দাবি করেও কালের স্রোতে কোথায় ভেসে চলে যান। আমাদের যুগে আমরা বলতে পারব কি এ যুগের সাহিত্যে ক'জন চিরস্থায়ী দাবি রেখে যেতে পারবেন? কালই তা প্রমাণ করবে, আমরা অবশ্য জানব না।

ভগীরথের তপস্যা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

অস্থি, রক্ত, মজ্জায় মোর এই আকাঙ্ক্ষা বহে,
মোর তপস্যা কেবল আমার জাতির জন্ম নহে।
শুধু স্বকুলের মুক্তি চাহি না—চাহি না মা উদ্ধার,
সকল যুগের সকল প্রাণীর খোল মা স্বর্গদ্বার।
আজিকার নহে, কালিকার নহে, নহে ক্ষণিকের দান,
অনন্তকাল যেন তব কৃপা হয়ে থাকে অম্লান।
বিতর শক্তি, বিতর মুক্তি শ্রীহরি পাদোদ্ভবা,
এসো মা সুহুর্লভা।

২

স্বল্প, শীর্ণ, সংকীর্ণ যা, নহে বর্দ্ধনশীল,—
নাহি অভিরুচি তাহাতে তৃপ্তি নাহি মোর একতিল।
কর নির্ম্মল, অপাপবিদ্ধ, কর মা মহত্তর,
মানবজাতিকে কর বলিষ্ঠ, রূপান্তরিত কর।
তোমার পুণ্য পরশে জননি! জগতের নারী-নরে,
কর প্রোজ্জ্বল, সর্ব্বংসহ, তোল উচ্চস্তরে।
দাও তাহাদিকে নব দেহ-প্রাণ সর্ব্বারিষ্ট জয়ী
গঙ্গে পুণ্যময়ি!

৩

বিষ্ণুতেজের আবরণ দাও তুমি সবাকার গায়,
রোষবহ্নিতে যেন নাহি পোড়ে আর পতঙ্গপ্রায়।
সৃজি কালাগ্নি জীবগণে করে মৃত ও উত্তেজিত—
যে জ্ঞানদেত্র—হোক তা অন্ধ, হোক তা নির্ব্বাপিত।
কর অগ্নির অগ্নিমান্দ্য—জীবকে অগ্নিসহ,
হিংসাগ্নি না হইয়া অগ্নি হয়ে র'ক হুতবহ।
জ্যোতির্ব্বর্ষে ফিরাইয়া দাও তুমি মানবের মতি,
রোধ কর অধোগতি।

৪

আমার কামনা, আমার সাধনা, করো না মা নিষ্ফল,
সব যুগ সব জাতি যেন লভে আমার তপঃফল।
মোদের দুঃখ সবার দুঃখ করে যেন নিবারণ,
আমাদের ক্ষতি, গোটা বসুধার হয়ে রয় মূলধন।
সকল ভস্ম বিভূতি হউক, বিশুদ্ধ হোক লোক,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে করে দাও তুমি অমৃতের সংযোগ।
আরম্ভ হোক নূতন কল্প, নূতন শতক্রতু—
নারায়ণ প্রসীদতু।

বাঁধ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

২৪

মৃন্ময় খাইতে বসিয়াই বার বার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল। লিলি তাহা লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চিঠিতে কোন খারাপ খবর নেই তো? এই প্রশ্নে মৃন্ময় চমকাইয়া উঠিল এবং কোন কিছু না ভাবিয়াই জবাব দিল, না—

তেমনি মৃদু কণ্ঠেই লিলি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, কবে যাবে ঠিক করলে মিনুদা?

মৃন্ময় মুখ তুলিয়া চাহিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও যে লিলিকে উপলক্ষ্য করিয়া এত কথা হইয়া গিয়াছে তাহার মুখ দেখিয়া তাহা বুঝিবার উপায় নাই। মৃন্ময় একটু বিস্মিত হইল, কিন্তু সেই ভাব যথাসম্ভব গোপন করিয়া বলিল, সেটা এখনও ঠিক করি নি। বাধ্য হয়ে হয়তো আরও দিনকয়েক থেকে যেতে হবে।

লিলির মুখে একটুখানি হাসি দেখা গেল। বলিল, এত কথার পরেও তুমি কোন ভরসায় আরো কিছুদিন থাকতে চাও মিনুদা? তোমার সাহস তো কম নয়।

কথাটা গায়ে না মাখিয়াই মৃন্ময় পুনরায় বলিল, নান্টু লিখেছে যে লীলা রাওকে নিয়ে এখানে আসছে। ভাবছি যদি এখনও সে রওনা না হয়ে থাকে তা হলে একটা তার করে তাদের এখানে আসতে বারণ করে দেব—

লিলি চমকাইয়া উঠিল। বলিল, এ কথা আমার এতক্ষণ বল নি কেন তুমি। তা ছাড়া বারণ করলেই বা তোমায় আমি দেব কেন। তোমার কি সত্যিই মাথা খারাপ হয়েছে মিনুদা। একথা তুমি ভাবতে পারলে কি ক'রে···ছিঃ ছিঃ ···

লিলির এ যেন আর এক নূতন রূপ। মৃন্ময় বলিল, তুমি যদি ভরসা দাও তা হলে আমি কালও বেরিয়ে পড়তে পারি। ওরা এলে ওদের সকল ভার যদি তুমি নাও—

শুনিতে শুনিতে লিলির ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, বাধা দিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল—মানুষের নির্লজ্জতার একটা সীমা থাকা উচিত মিনুদা।

মৃন্ময়ের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "পদে পদেই হয় তো আমার দোষ-ত্রুটি হচ্ছে, কিন্তু তার বিচার পরে করো লিলি।"

মৃন্ময়ের কণ্ঠস্বরের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে লিলি বিস্মিত হইল।

ক্ষণকাল নীরবে কাটিলে মৃন্ময় আবার বলিতে লাগিল, মঞ্জুর নাকি খুবই শক্ত অসুখ তাই···

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই লিলি উৎকণ্ঠিত-ভাবে বলিল, নান্টুবাবু লিখেছেন বুঝি? দেখি কি লিখেছেন।

মৃন্ময় জবাব দিল, চিঠি তো আমি সঙ্গে করে আনি নি। তাই বলছিলাম, নইলে বাধ্য হয়ে আমাকেও তাদের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

লিলি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, তারপর দৃঢ়তার সহিত বলিল, তুমি বরং নান্টুবাবুকেই একটা টেলিগ্রাম করে এখন আসতে নিষেধ করে দাও। তার কাছ থেকে একটা উত্তর পেলে আমরাই এখান থেকে রওনা হব।

মৃন্ময়ের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না, মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—"আমরা"!

লিলি কহিল, আমরাই—তুমি এবং আমি। তুমি কি ভেবেছ এই সময় তোমায় আমি একলা ছেড়ে দিতে পারব মিনুদা। সে হয় না—তা ছাড়া আমি যতদূর জানি তাদের দেখাশুনা করবার জন্যে সেখানে আর দ্বিতীয় মেয়েছেলে নেই।

মৃন্ময় মৃদুকণ্ঠে বলিল, তুমি যাবে—

লিলি একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না।

মৃন্ময় বলিল, ক্ষতির কথা আমি ভাবছি না লিলি—

লিলি জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে কি ভাবছিলে তুমি মিনুদা—

মৃন্ময় কহিল, ভাবছিলাম তোমারই কথা—

লিলির মুখে পুনরায় একটুখানি হাসি দেখা দিয়া পরক্ষণেই মিলাইয়া গেল। 'আমার কথা'—বলিয়াই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিল, আমার কথা নিয়ে দুর্ভাবনার কোন প্রয়োজন নেই। আমার কথা আমাকেই ভাবতে দাও।···কিন্তু আপাতত এ সব থাক, তুমি খাও মিনুদা।

মৃন্ময় পুনরায় আহারে মনোযোগ দিল। এবং তাড়াতাড়ি নাকে মুখে গুঁজিয়া উঠিয়া পড়িল। লিলি বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার অনুসরণ করিল।

মৃন্ময় তাহার ঘরে আসিতেই লিলি বলিল, দেখি তোমার নান্টুদার চিঠি—

চিঠিখানি তাহার হাতে দিতেই লিলি এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল এবং ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, স্পষ্ট করে কিছু না লিখলেও মনে হচ্ছে সংবাদটা সত্য। তুমি কাল সকালেই কলকাতার ঠিকানায়ও একটা টেলিগ্রাম করে দিও।

লিলি আর অপেক্ষা করিল না।

সারারাত মৃন্ময়ের যেন একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে কাটিল। শুধু এই কথাই সে ভাবিয়াছে যে, এ অবস্থায় তার কর্ত্তব্য কি। ভোরবেলা লিলির সঙ্গে দেখা হইতেই সে বলিল যে, সেখানে তার উপস্থিতির কোনও প্রয়োজন আছে কিনা ইহা না জানিয়া সে ওমুখো হইবে না।

লিলি একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, তোমার আসল বক্তব্যটা কি ?

মৃন্ময় জবাব দিল, অত্যন্ত সাধারণ বিষয়—অপ্রয়োজনে সেখানে গেলে হয়তো তাদের ভাল করতে গিয়ে আরও মন্দ করে বসব লিলি।

লিলি বলিল, যা ভাল বুঝবে তাই করবে, আমার কিছু বলতে যাওয়া বৃথা। মোটের উপর আমি হলে কি করতাম তাই তোমাকে জানিয়েছি।

লিলি চলিয়া গেলে মৃন্ময় আবার নূতন করিয়া ভাবিতে বসিল এবং শেষ পর্য্যন্ত নান্টুকে তার করিয়া সে যেন কতকটা স্থির হইল।

ঐ দিনই নান্টুর জবাব আসিল—'বিলম্ব করিও না। চলিয়া আইস'। মৃন্ময় নান্টুর টেলিগ্রামখানা লিলির হাতে দিতে সে কহিল, যাবার জন্তে লিখেছে এই তো ? কিন্তু আজ আর কোন গাড়ী নেই। কাল সকালেই বেরিয়ে পড়া যাবে। তুমি এই সংবাদটা নান্টুবাবুকে জানিয়ে দাও।

মৃন্ময় একবার লিলির পানে চাহিল। লিলি যেন বাস্তবিকই দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। মৃন্ময় পুনরায় বাড়ীর বাহির হইল। একটা দম দেওয়া ঘড়ির মতই যেন সে চলিয়াছে। কি জানি কেন আজ তার বার বার মনে হইতেছে তার নিকট এ সবের কোনই প্রয়োজন নাই। অথচ আগামী কাল রওনা হওয়া তার অবধারিত এবং নান্টুর নিকট হইতে খবরটা পাইয়া সে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে—চোখে মুখে তার উৎকণ্ঠার ভাবও সুপরিস্ফুট। এই এক আশ্চার্য্য ব্যাপার।

মৃন্ময় ফিরিয়া আসিতে লিলি বলিল, তুমি খামোকা দুশ্চিন্তা করছ মিনুদা একথা আমি জোর করে বলতে পারি।

মৃন্ময় একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কোন বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তা করা আমি বহু দিন ছেড়ে দিয়েছি। আমি ভাবছিলাম অন্ত কথা—

তাহাকে বাধা দিয়া লিলি কহিল, নিজেকে গোপন করবার এই বৃথা চেষ্টায় কি লাভ হয় তোমার বলতে পার ?

মৃন্ময় কহিল, গোপন করবার চেষ্টা তো কোন দিন আমি করি নি। আর একথা তুমি বেশ ভাল করেই জান বলে আমার বিশ্বাস।

লিলির মুখে একটু হাসি দেখা দিল। মৃন্ময়ের তাহা চোখে পড়িল। সে বলিতে লাগিল, জীবনের স্বচ্ছন্দ গতিপথে প্রথম যেদিনে প্রচণ্ড বাধা এসে আমার পথরোধ করে দাঁড়াল সেদিন আমার মনে হয়েছিল আমার এগিয়ে চলা বুঝি চিরদিনের জন্তই ব্যাহত হ'ল। কিন্তু তা হলে ত চলবে না, একটা পথ রুদ্ধ হলেও ভিন্ন পথে চলতেই হবে। কিন্তু সে পথ খুঁজে পাচ্ছি না বলে এগিয়ে যাওয়া আজও সম্ভব হচ্ছে না।

লিলি বলিল, শক্তি নেই বলেই এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, নইলে সামনের ঐ মাটির বাঁধ এতদিনে তুমি ভেঙেচুরে এগিয়ে যেতে পারতে। যাকে প্রচণ্ড বাধা ভেবে ভয়ে পিছিয়ে পড়লে, এগিয়ে গেলে বুঝতে পারতে ওটা নিছক তোমার দৃষ্টি-বিভ্রম, কিন্তু এসব কথা এখন থাক মিনুদা। ধীরে সুস্থে কথাটা ভেবে দেখবার ঢের সময় এর পরে তুমি পাবে। তার চেয়ে জিনিষ-পত্রগুলো তোমার ঠিক করে নাও।...

মৃন্ময় বলিল, একবার রাজাবাবুর কাছ থেকে—

বাধা দিয়া লিলি বলিল, তার প্রয়োজন হবে না। খবর তিনি ঠিক সময়ই পেয়েছেন। যেতে হয়তো পরে ধীরে সুস্থে এক বার ঘুরে এসো। এখন যা বলছি তাই করো।

কিন্তু মৃন্ময়ের যেন কোন কাজেই তেমন উৎসাহ দেখা যাইতেছে না।...কেমন যেন একটা ঔদাসীন্ত তাহাকে পদে পদে দমাইয়া দিতেছে।

২৫

নান্টুর সাক্ষাৎ ষ্টেশনেই পাওয়া গেল। সে একলাই আসিয়াছে। মৃন্ময়দের আসিবার কথা এক লীলা ছাড়া আর কাহাকেও সে জানায় নাই। নান্টুই প্রথমে হাসিমুখে তাহাদের প্রশ্ন করিল, পথে বিশেষ কোন কষ্ট হয় নি তো তোমাদের ?

মৃন্ময় জানাইল, কোন কষ্ট হয় নাই, কিন্তু মঞ্জুষা সম্বন্ধে সে ভালমন্দ কোন প্রশ্নই করিল না, করিল লিলি—মঞ্জুষা কেমন আছেন সে কথা তো আপনি বললেন না ?

নান্টু এতক্ষণে ভাল করিয়া লিলির মুখের পানে চাহিল। মৃদু কণ্ঠে বলিল, দেখুন ইচ্ছে থাকলেও সেখানে আমি যেতে চাই না, তাতে ফল উল্টো হতে পারে এই আশঙ্কায়...একটু থামিয়া সে পুনশ্চ কহিল, আপনি সব কথা শুনেছেন বলেই বলছি। তার খবর আমি রোজই পাই। অবস্থাটা বেশ ঘোরালো বলেই তো সবাই বলছে, কিন্তু এসব কথা বাড়ী গিয়ে শুনবেন, তুই কি বলিস মিনু ?...

মৃন্ময় কহিল, তোমার ওখানেই আমরা যাচ্ছি বোধ হয়।

নান্টু বলিল, আপাতত: এই ব্যবস্থাই আমার সমীচীন মনে হ'ল। পরক্ষণেই লিলিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—"আপনি কি বলেন ?"

লিলি কোন জবাব দিল না, একটুখানি হাসিল মাত্র।

নান্টু বলিল, তবে এ ব্যবস্থা যদি তোমাদের ভাল না

লাগে পরে ভেবে চিন্তে যা হয় করা যাবে—আপাতত ষ্টেশনে বসে এ সমস্যার সমাধান না করলেও ক্ষতি নেই।

মৃন্ময় কহিল, না না নাস্কুদা, এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আবার কি হতে পারে। তা ছাড়া কোন কারণেই আর সে বাড়ীতে গিয়ে আমি সরাসরি উঠতে পারি না, তা কিছুতেই সম্ভবও নয়।

নাস্কু কতকটা বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে মৃন্ময়ের মুখের পানে চাহিল। সে দৃষ্টির সম্মুখে মৃন্ময় কেমন যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। নাস্কু বলিল, এর জবাব তোমায় আমি পরে দেব মিনু—

গাড়ীতে উঠিয়া কেহ আর একটি কথাও কহিল না। সকলেরই কণ্ঠ যেন মূক হইয়া গিয়াছে। অবশেষে বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইতেই নাস্কু বলিয়া উঠিল, এটা লীলার বাড়ী, কিন্তু তাই বলে তোমাদের বিন্দুমাত্র সঙ্কোচের কারণ নেই। ঐ যে লীলাও তোমাদের প্রতীক্ষা করছে।

লিলি নিঃশব্দে গাড়ী হইতে নামিল। লীলা তাহাকে সঙ্গে করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। মৃন্ময় নাস্কুর অনুসরণ করিল।

চা পানান্তে নাস্কুই প্রথম কথাটা পাড়িল। বলিল, আমার মনে হয় খাওয়া-দাওয়ার পরে খানিক বিশ্রাম করে গেলেই চলবে। তোর কি মনে হয় মিনু?

মৃন্ময় বলিল, কথাটা আগে ভেবে দেখি নি, কিন্তু এখন ভাবছি—এ অবস্থায় সেখানে যাওয়া আমার পক্ষে সমীচীন কিনা।

তুমি ভুল বুঝো না মিনুদা—আমি কোন কারণেই আর তাদের উত্তেজিত করতে চাই না।

নাস্কু ঈষৎ হাসিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, তুই মঞ্জুর বাবার কথা ভাবছিস মিনু? তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে আমি তোকে খবর পাঠাই নি। ভদ্রলোক একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। পাছে আবার তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ হয় এই আশঙ্কাও আমি করছি। মাঝে তিনি বেশ ভালই ছিলেন।

মৃন্ময় আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল। কহিল, রাধুও কি এখানেই আছে নাকি?

নাস্কু কহিল, কোন খবরই রাখ না দেখছি। বহুদিন ধরে সে এখানেই আছে। মঞ্জুর নিজ হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানটি এখান থেকে খুবই কাছে। রাধু সেখানেই সস্ত্রীক থাকে। মঞ্জুর অসুখ হওয়ায় তার দেখাশুনা করবার জন্যে তারা এখন ওদের বাড়ীতেই আছে।

মৃন্ময় একটু ইতস্তত: করিয়া কহিল, একবার বোষ্টমদাকে খবর পাঠানো যায় না?

দরকার হলে নিশ্চয় পাঠাব। বলিয়া নাস্কু সহসা স্থানত্যাগ করিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, লীলাকে বলে এলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছে।

মৃন্ময় নীরব। নাস্কু খানিকক্ষণ তার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, ভেবে কোন লাভ হবে না মিনু। বরং আমার মনে হচ্ছে মঞ্জুর এমনি একটা শক্ত অসুখেরই বুঝি প্রয়োজন ছিল। এতে হয়তো শাপে বরই হবে।

মৃন্ময় সহসা মুখ তুলিয়া চাহিল। শান্ত ভাবে বলিল, তা হয় ত হবে নাস্কুদা। কিন্তু আমি আজও মনস্থির করে উঠতে পারি নি।

নাস্কু এতক্ষণ সব বাঁচাইয়া অত্যন্ত সাবধানে অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু মৃন্ময়ের শেষ কথায় সে একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বলিল, তোমার এ কথার মানে মৃন্ময়? তুমি আজও কি এতই ছেলেমানুষ রয়ে গেছ যে, অবস্থার গুরুত্বটাও বোঝ না? তা হলে এসেছ কিসের জন্যে? না মৃন্ময়, তোমার এ সব কথা মোটেই সমর্থন করা যায় না।

মৃন্ময় নাস্কুর এই রূঢ় বাক্যে মোটেই রাগ করিল না। কহিল, তুমি অনর্থক রাগ করছ নাস্কুদা। তোমায় আমি একতিল মিথ্যে বলি নি। আমার সব কথা তুমি জান না বলেই একথা বলতে পারছ।

নাস্কু তেমনি উত্তেজিত ভাবেই বলিতে লাগিল, এর মধ্যে আবার জানাজানির কি থাকতে পারে? না জেনে না বুঝে ভুল যদি করেই থাক তা হলে এখন তা শোধরাবার চেষ্টা করবে—এই হচ্ছে সার কথা।

মৃন্ময় কহিল, বুঝলাম, কিন্তু—আমায় বিশ্বাস কর তুমি, নিতান্ত অকারণে আজ এ কথা আমি বলছি না।

নাস্কু বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, সে কারণটা কি একবার শুনতে পাই?

মৃন্ময় নির্ব্বিকার ভাবে জবাব দিল, আমি বুঝতে পারছি না তুমি এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছ কিসের জন্ত?

নাস্কু কহিল, উত্তেজিত হব না মিনু? তুমি বল কি? এতেও মানুষ উত্তেজিত না হয়ে পারে? নাস্কু থামিল এবং কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব সংযত করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, আমার সব কথা তোকে হয় ত ঠিকমত বোঝাতে পারি নি; কিন্তু বিশ্বাস কর মিনু যে, মঞ্জুর কথা ভাবতে গেলেই আমার নিজেকেই সকলের চেয়ে বেশী অপরাধী বলে মনে হয়। তাই প্রতিকারের আশায় এমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। তা ছাড়া মঞ্জুকে সুখী দেখলে যে, আমি কত বেশী আনন্দিত হব তা তুই কল্পনা করতেও পারবি নে, কিন্তু তবুও হয় ত তার জন্যে তোকে অনুরোধ করতে যেতাম না, যদি তোর মনের সত্যকার ইচ্ছাটা আমার অজানা থাকত।

মৃন্ময় একটুখানি হাসিয়া বলিল, তুমি এত কথা যে কেন বলছ তা কিন্তু বাস্তবিকই এখনও আমি বুঝতে পারছি না নাস্কুদা।

নান্টুর মুখে কেমন এক ধরণের বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিল, তা হলে আসল কথাটা কি মিনু?

মৃন্ময় কহিল, কিছুই না। মঞ্জুর অসুখ মারাত্মক এই দুর্ভাবনাই যথেষ্ট, এর অতিরিক্ত তার সম্বন্ধে আর কিছু ভাবি নি। সে ভাল হয়ে উঠুক এই কামনাই করি এবং সেই আশা নিয়েই ছুটে এসেছি, এর বেশী চিন্তা করবার অবকাশ পেলাম কোথায় নান্টুদা।

নান্টু বলিল, তোমার এ সব কথার কোন মানে হয় না।

মৃন্ময় বলিল, হয় বৈ কি নান্টুদা—নইলে এ কথা আমি বলতাম না। আর আমার এ কথা যে কত সত্য তার প্রমাণ ত আমি নিজেই। পথ হয় ত আজও আমাদের একই আছে, কিন্তু মত যে দুটো হয়ে গেছে এ কথা তুমি ভুলতে পারলেও আমার পক্ষে ভোলা খুব সহজ নয়।···মৃন্ময় থামিল।

নান্টু এ সম্বন্ধে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল না, তার মন সংশয়-দোলায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। সে চুপ করিয়া রহিল।

মৃন্ময় পুনরায় বলিতে লাগিল, তা ছাড়া এমনও হতে পারে যে, নিতান্ত অকারণেই তুমি ভেবে মরছ। শেষ পর্য্যন্ত হয় ত দেখবে এর সবই সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

নান্টু বার বার মাথা নাড়িতে লাগিল। বলিল, অনাবশ্যক প্রমাণ হলেই ভাল। আমি এখনও তোদের মত অতটা তিসেবী হয়ে উঠতে পারলাম না কিনা। যা মনে আসে তাই বলে ফেলি। কিন্তু ঐ যে তোমার বোষ্টমদা এসে পড়েছেন। তোমরা বস, আমি বরং দেখে আসি লীলা তোমাদের খাওয়া-দাওয়ার কতদূর কি করেছে।

মৃন্ময় বুঝিল যে, নান্টু ইচ্ছা করিয়া সরিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সে বাধা দিল না। রাধু ঘরে প্রবেশ করিতেই মৃন্ময় তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিল। রাধু বসিল। কিন্তু কেহই বহুক্ষণ যাবৎ কোন কথা কহিতে পারিল না। মৃন্ময় কি জানি কেন অকারণেই কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। আরও কিছুক্ষণ এমনি ভাবে কাটিলে রাধু মৃন্ময়কে জিজ্ঞাসা করিল, আজ সকালেই বুঝি তোমরা এলে?'

মৃন্ময় বলিল, হ্যাঁ, কিন্তু গাড়ী প্রায় দু'ঘণ্টা দেরীতে এসেছে।

রাধু বলিল, বড্ড কষ্ট হয়েছে তা হলে।

মৃন্ময় কহিল, না কষ্ট আর কি—আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। রাধু পুনরায় বলিল, ডেকে পাঠিয়েছ কেন তা তো বললে না দাদাঠাকুর।

মৃন্ময় একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, এখানে আছ শুনে বড় দেখতে ইচ্ছে হ'ল। মনে হচ্ছে কত যুগ যেন তোমায় দেখি নি—

রাধু কহিল, বড় কম সময় তো নয়। প্রায় ছ'বছর তো হবেই।

মৃন্ময় মৃদু কণ্ঠে বলিল, ঐ রকমই হবে, কিন্তু এরই মধ্যে একেবারে বুড়ো হয়ে গেছ।

রাধু হাসিল, কোন জবাব দিল না।

মৃন্ময় বলিল, বোষ্টমী সঙ্গে এসেছে ত?

রাধু বলিল, নইলে আর যাবে কোথায়?

মৃন্ময় প্রশ্ন করিল, ভাল আছে ত?

রাধু কহিল, প্রভুর কৃপায় একরকম চলে যাচ্ছিল, কিন্তু মঞ্জু-দিদির অসুখে সব গোলমাল হয়ে গেল, কি জানি ঠাকুরের কি ইচ্ছে। রাধুর কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল। সে চোখ মুছিয়া বলিতে লাগিল, প্রাণটা না তার শেষ পর্য্যন্ত নিজের অবহেলায় নষ্ট হয়ে যায়।···মৃন্ময় নীরব।

রাধু বলিতে লাগিল, কি জানি কেন এমন হ'ল। একটা দিনের জন্যও কি শান্তি পেলে। অথচ গরীবের প্রতি কি তার দরদ! দেশ ভাগ হ'ল। যাদের বিষয়-সম্পত্তি ছিল দেশ ছেড়ে চলে গিয়ে মান ও প্রাণ বাঁচালে। বিপদে পড়লাম আমরা যাদের অন্য কোনও উপায় ছিল না। দিদি গিয়ে উপস্থিত। বললে, একটা খবর পাঠালে পারতে বোষ্টমদা। আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। শুধুই কি তাই—গ্রামের দুর্ভাগাদের সাহায্য করতে লাগল প্রাণপণে। তাদের সাদরে ডেকে এনে সাধ্যমত জায়গা জমি দিলে, বাড়ীঘর তৈরি করিয়ে দিলে। তাদের বেঁচে থাকার একটা ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করলে। দিনরাত এই নিয়ে কি অমানুষিক পরিশ্রমটাই তাকে করতে হ'ল, কিন্তু সুখের শরীরে এত ধকল সইবে কেন?

রাধু থামিল। মৃন্ময় তেমনি চুপ করিয়া শুনিতেছে।

রাধু পুনরায় বলিতে লাগিল, শেষ পর্য্যন্ত আমিই হলাম তার অসুখের নিমিত্তের ভাগী। মঞ্জুদিদি বললে, সময় যে আর কাটে না বোষ্টমদা। পরামর্শ দিলাম, দুঃস্থ মেয়েদের জন্যে একটা স্কুল করতে। দিদি আমার নাওয়া-খাওয়া ভুলে কাজে লাগল। কিন্তু রক্তমাংসের শরীর ত দাদাঠাকুর।

রাধু থামিল। একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, কতবার বলেছি এমন করে দেহকে কষ্ট দেওয়া ত ঠিক হচ্ছে না মঞ্জুদি, একটা অসুখ-বিসুখ হলে কি হবে? দিদি আমার হেসে জবাব দিলে, তুমি কি পাগল হয়েছ বোষ্টমদা—অসুখ আমার হয় না। আর যদি হয়ই তবে ভাবনা নেই। তোমরাই ত সারাবার জন্য আছ। তার পর সত্যিই দিদি অসুখে পড়ল। আমরা আছি সে কথা ঠিক, মানুষের সাধ্যমত করাও হচ্ছে সবই, কিন্তু কি জানি আমার যেন কেবলই মনে হচ্ছে, মঞ্জু দিদির আসল রোগের চিকিৎসা হচ্ছে না।

মৃন্ময় এতক্ষণে মুখ খুলিল, বলিল, এ কথা ডাক্তারকে জানালে পারতে বোষ্টমদা।

রাধুর মুখে কেমন যেন একটা দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল, বলিল, জানিয়েছি বৈ কি দাদা। তাই ত তোমার নান্টুদাকে কাছে

পেয়ে দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলেছি, ভগবান তোমার মহিমা না বুঝে কত অন্যায় দোষারোপ তোমার উপর আমরা করি—

রাধুর দুই চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। আকুল কণ্ঠে সে বলিল, বললাম দাদাঠাকুর আমাদের বড় বিপদ। মঞ্জুদিদিকে বুঝি আর বাঁচাতে পারি না।

মৃন্ময় খুব নীচু গলায় প্রশ্ন করিল, এখন কেমন আছে মঞ্জু?

রাধু বলিল, ডাক্তার বলেন ভয়ের কিছু নেই, আমি কিন্তু ভরসাও পাচ্ছি না। আর তেমনি অবুঝ হয়ে উঠেছেন মঞ্জুদিদির বাবা। কখন যে কি বলেন, আর কখন যে কি করেন তার কিছু ঠিক নেই। মেয়ের অসুখের কথা ভেবে ভেবে যেন তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তাঁকে সামলানোই দায় হয়ে উঠেছে।

রাধু থামিল। ক্ষণকাল চক্ষু বুজিয়া, কি চিন্তা করিয়া পুনরায় মৃদু কণ্ঠে বলিতে লাগিল, নান্টুদাকে না পেলে তোমাকেই কি খবর পাঠানো সম্ভব হ'ত। তোমাদের কাছে পেয়ে কত যে ভরসা পাচ্ছি। তুমি অভয় দিলে দিদিকে হয় ত বাঁচাতে পারব।

মৃন্ময় কোন জবাব দিল না।

রাধু একটু ক্ষুণ্ন হইয়া বলিল, আমার কথাটা কি শুনতে পাও নি দাদাঠাকুর?

মৃন্ময় শান্ত ভাবে জবাব দিল, মঞ্জু ভাল হয়ে উঠুক, সে কি আমার কাম্য নয় বোষ্টমদা? ভাল সে নিশ্চয়ই হবে। তোমরা তাকে অত্যন্ত ভালোবাস বলেই এতটা ঘাবড়াচ্ছ।

রাধু একটি নিঃশ্বাস চাপিয়া গিয়া বলিল, হয় ত ঠিকই বলেছ দাদা। কিন্তু ভয় কি আর সাধে পাই—তিন তিনটে দিন এক কোঁটা জল গ্রহণ করে নি, একটা কথা বলে নি। বেহুঁস হয়ে পড়ে ছিল। জ্ঞান হতে জিজ্ঞেস করলাম, এখন কেমন বোধ করছ দিদি? ইশারায় চুপ করতে বললে। কিন্তু তাই কি পারি—বললাম, একটু ভাল বোধ করছ দিদি? ঘাড় নেড়ে জানালে, ভালই আছে—আশান্বিত হয়ে উঠলাম। তার পরে একটি একটি করে পনের দিন কেটে গেল, কিন্তু ভাল লক্ষণ ত কিছুই দেখছি না। মনে হচ্ছে ইচ্ছে করেই সে যেন অসুখটাকে বাড়িয়ে তুলেছে।

মৃন্ময় কহিল, একথা তোমাদের মনে উঠছে কেন বোষ্টমদা?

রাধু বলিল, মনে কি এমনিতে ওঠে দাদাঠাকুর—নিজের কোনো কথাই সে আজ পর্য্যন্ত কাউকে বললে না, শুধু মাঝে মাঝে তার দু'চারটে ভাসা ভাসা কথা থেকে অনেক কিছুই বুঝতে পারি, কারণ গোড়া থেকেই যে তোমাদের দু'জনকেই আমি জানি। তাই ত ভাবি মনের মধ্যে এ আগুন পুষে রেখেও এমন সহজ ভাবে সে এতদিন চলতে পেরেছে কেমন করে।

মৃন্ময় ডাকিল, বোষ্টম দা—সে যেন একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে মনে হইল।

রাধু স্মিতমুখে বলিল, তুমি কি রাগ করলে দাদাভাই—

মৃন্ময় নিজের আচরণে নিজেই লজ্জিত হইল। কহিল, না না, রাগ করব কিসের জন্যে। এতে রাগ করবার কি আছে।

রাধু বোষ্টম পুনরায় বলিতে লাগিল, তাই ত বহুদিন পরে আবার যেদিন তাদের গ্রামে ফিরে যাবার সংবাদ পেলাম সেদিন আকুল আগ্রহে ছুটে গেলাম। তোমাকে মিথ্যে বলব না দাদাঠাকুর, আমি তোমাকেও তাদের সঙ্গে দেখবার আশা করেছিলাম। কিন্তু সে আশা সফল হ'ল না, মনে ব্যথা পেলাম। অনুযোগ দিয়ে বললাম, এ কাজ কেন করতে গেলে দিদি? যখন জানতে না সে ছিল এক—কিন্তু জেনে শুনে তুমি কোন প্রাণে তাকে নিজের ঘর থেকে বিদায় করে দিলে—মঞ্জুদিদির মুখে বড় বিচিত্রমধুর হাসি ফুটে উঠল। বললে, তুমি এত বোঝ আর এই সোজা কথাটা বুঝলে না। প্রাণ গেলেও মিনুদাকে আমি ছোট করতে পারব না। সে আমার সকল কাজের মধ্যে চিরদিন বেঁচে থাকবে বোষ্টমদা।...

মৃন্ময়ের একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। মৃদু কণ্ঠে বলিল, তার পর বোষ্টমদা?

রাধু বলিতে লাগিল, ভাবলাম মঞ্জুদিদি হয় ত ঠিক কথাই বলেছে, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে ওসব শুধু কথার কথা—স্রেফ মনভুলানো কথা। আমি মঞ্জুদিদির মত ভালবাসতে খুব বেশী মেয়ে পারে না, কিন্তু কই সে ভালবাসা ত তোমাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে পূর্ণ হয়ে উঠতে পারলে না।...

রাধু মুহূর্ত্তের জন্য থামিল এবং পুনরায় মুখ তুলিয়া কিছু বলিতে যাইতেই নান্টু আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। রাধুকে বলিল, এত বেলায় না খেয়ে যেও না ঠাকুর।

দেয়াল-ঘড়ির পানে চোখ তুলিয়া রাধু চমকাইয়া উঠিল, বলিল, ইস্, এতখানি বেলা হয়ে গেছে। দাদাঠাকুর ওদিকে তা হলে মঞ্জুদিদির খাওয়া হবে না। আমি যাচ্ছি। সে ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাধু চলিয়া যাইতে নান্টু মৃন্ময়কে বলিল, আশ্চর্য্য লোক এই বোষ্টমঠাকুর। কি ভালই না বাসে মঞ্জুকে। একটু থামিয়া সে পুনরায় বলিল, তোকেও এখন উঠতে হবে মিনু। আমাদের জন্যে ওদের নইলে দেরী হয়ে যাবে।

মৃন্ময় উঠিয়া দাঁড়াইল।

(আগামী বারে সমাপ্য)

"দিনক্ষপামধ্যাগতের সন্ধ্যা" — শিল্পী—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মৎস্য শিকার (রঙীন উডকাট) — শিল্পী—শ্রীহরেন দাস

দার্জ্জিলিং হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য
শিল্পী—শ্রীনন্দলাল বসু
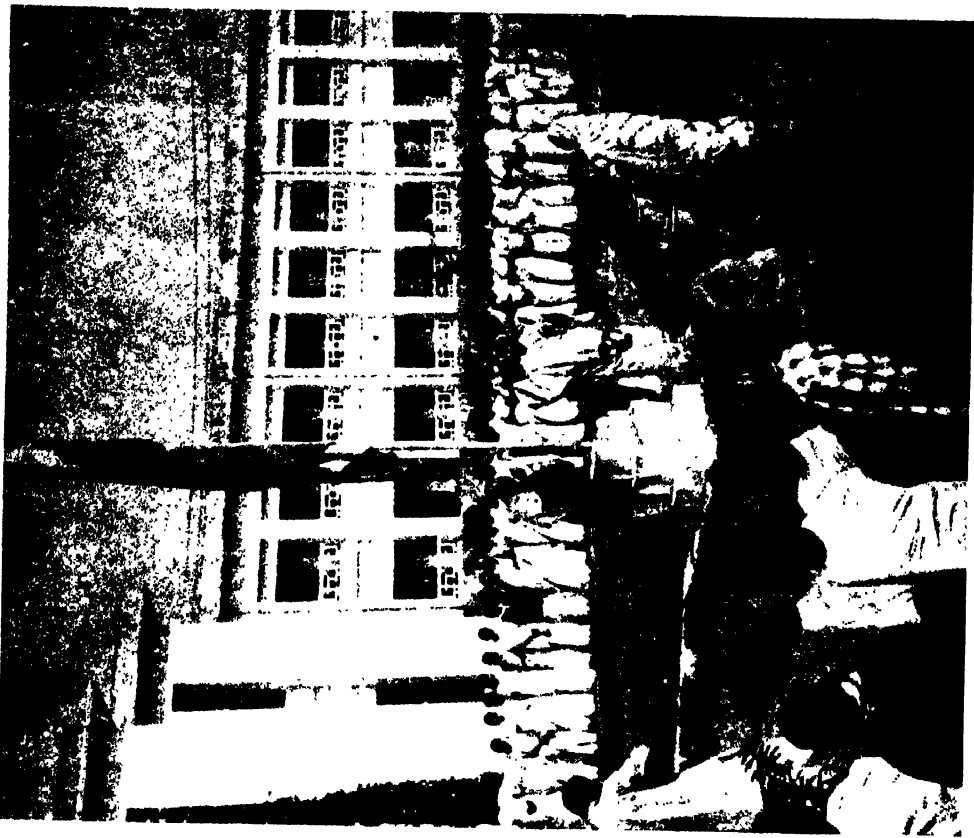
স্বাধীনতা দিবসে লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজে ডাঃ শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
জাতীয় পতাকা উত্তোলন

একাডেমি অফ ফাইন আর্টস্‌-এর শিল্প-প্রদর্শনী

শ্রীসোমেন বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পীদের শিল্পসৃষ্টিকে সর্ব্বসাধারণের সামনে তুলে ধরবার উদ্দেশ্যেই শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন। কিন্তু একই স্থানে নানা পদ্ধতির, নানা বর্ণ ও রেখাময় বিচিত্র শিল্পসৃষ্টির একত্র সমাবেশ দর্শকের দৃষ্টিকে অনেক সময়ই বিভ্রান্ত করে ফেলে, নীরবীক্ষণে রসোপভোগ সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় পাশ্চাত্ত্য 'নভেলে'র আলোচনা-প্রসঙ্গে এই মর্ম্মে বলেছেন যে, এই নভেল বস্তুটি কাঁটাল-গোত্রীয়। এতে নানা ঘটনা-সজ্ঘাতের ভিড়, নানা চরিত্রের অতিপ্রাচুর্য্য। এর রস অনেকের পক্ষে একই সময়ে আস্বাদন করা বা হজম করা সম্ভাব্যের সীমা অতিক্রম করে। বর্ত্তমান লেখকের মতে প্রদর্শনীও এই কাঁটাল-জাতীয়ের পর্য্যায়-ভুক্ত। বস্তুতঃ দেয়ালে টাঙানো ঘন-সংস্থাপিত চিত্রগুলিকে এক ঝলক দেখে শিল্প ও শিল্পীকে ঠিকমত বুঝতে পারা সম্ভব হয় না। একটির রসাস্বাদনের সময় যেন পাশের ছবিগুলি তাদের রং ও রেখার বৈচিত্র্যে দর্শকের দৃষ্টিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। ফলে দেখার দ্রুততায় উপভোগের আনন্দ ব্যাহত হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও 'নান্যঃ পন্থাঃ'। সর্ব্বসাধারণের পক্ষে খ্যাত ও অখ্যাত বহু শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় লাভের অন্য কোনও সহজতর উপায় নেই বলেই প্রদর্শনীর একটা বিশেষ মূল্য আছে —একথা অনস্বীকার্য্য। তবে প্রদর্শনীর নানা ত্রুটি বা অসুবিধাকে এড়ানোও সম্ভব হতে পারে যদি থাকে স্থানের প্রাচুর্য্য বা পরিবেশের প্রসার। সেই প্রশস্ত স্থানে ছবিগুলি সাজানো থাকবে বেশ দূরে দূরে, প্রত্যেকটি ছবির চার পাশে থাকবে বেশ একটুখানি ফাঁকা জায়গা, যেন প্রতিটি ছবিই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে দর্শকের চিত্তকে আকৃষ্ট করতে পারে। ফলে দর্শকের দৃষ্টিবিভ্রমের বা মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ ঘটবে না।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে একাডেমি অফ ফাইন আর্টস্‌-এর যে প্রদর্শনীটির আয়োজন সম্প্রতি হ'ল সেটির একটা বিশেষ মূল্য আছে—কলিকাতা তথা সারা বাংলাদেশে বৎসরে এই একমাত্র শিল্প-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানে যাতে নানা দেশের নানা শিল্পীর রসপরিবেশনের ডাক পড়ে। বিভিন্ন শিল্পীর শিল্প-সৃষ্টির বহুমুখী শাখা-প্রশাখার সামগ্রিক সমন্বয়ে এটি সমৃদ্ধ। দেশী ও বিদেশী উভয় পদ্ধতিতে নানা আঙ্গিকে আঁকা চিত্র নেহাত কম নয়—তার মধ্যে দেখি তেলরং জলরঙের ব্যবহার নিয়ে কত পরীক্ষা। এ ছাড়া আছে মূর্ত্তিশিল্প, উড্‌কাট, লিনোকাট প্রভৃতি। কাজেই শিল্পরসিকেরা যে এই সমন্বটিতে অধীর আগ্রহে এর উদ্বোধনের প্রতীক্ষা করেন তাতে সন্দেহ নেই।

মাছ-ধরা শিল্পী—শ্রীললিতমোহন সেন

এবারকার প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করবার কথা ছিল প্রদেশপাল শ্রীকৈলাসনাথ কাটজুর। কিন্তু তিনি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় সেটা সম্ভব হ'ল না; তাঁর পরিবর্ত্তে উদ্বোধন করলেন শিল্পী শ্রীযামিনী রায়।

উদ্বোধন-দিবসে প্রদর্শনীতে প্রথমেই যে জিনিষটি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সেটি হচ্ছে প্রবেশদ্বারের সজ্জা ও আয়োজনের কতকটা অভিনবত্ব। গত দু' বছর ধরে প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে প্রবেশপথের হরেক রঙের আলো এবং অবিশ্রান্ত সানাই বাজনা এ দুটোই যে শিল্প-প্রদর্শনীর সঙ্গে কিরূপ বে-মানান দর্শকমাত্রেই তা অনুভব করে আসছিলেন। এর দরুন

ভিতরে প্রবেশের পূর্ব্বেই দর্শকের চক্ষু ও কর্ণ এই দুটি ইন্দ্রিয় অকারণে পীড়িত হ'ত।

এবারকার শিল্প-প্রদর্শনীর সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, শিল্পাচার্য্য শ্রীনন্দলাল বসুর ছবি একে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। একাডেমির ইতিহাসে এ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বহু আগে সোসাইটিতে নন্দলাল তাঁর নিজের আঁকা ছবি দিতেন, কিন্তু গত কয় বৎসরের মধ্যে জনসাধারণ তাঁর নব নব অত্যাশ্চর্য্য শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত

সাঁওতাল পরিবার শিল্পী—শ্রীরামকিঙ্কর

হবার সুযোগ পায় নি বললেই চলে। এক শান্তিনিকেতনে গিয়ে তাঁর ছবি দেখা ছাড়া সাধারণের আর গত্যন্তর ছিল না। যা হোক, এবার ভারতের এই শ্রেষ্ঠ শিল্পীর চারখানি চিত্র প্রদর্শনীর গৌরববৃদ্ধি করেছে। নন্দলালের সবকয়টি চিত্রেরই বর্ণসুষমা ও রেখার সৌষ্ঠব, অভিনব অঙ্কন-শৈলী দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেছে। বিশেষতঃ 'বীণাবাদিনী' ও 'নৃত্যরতা' ছবি তাঁর শিল্পী-মানসের অনবদ্য অবদান।

ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা চিত্রাবলীর মধ্যে আরও বহু প্রখ্যাত শিল্পীর সৃষ্টিতে উচ্চাঙ্গের শিল্পপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেল। তন্মধ্যে শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃপাল সিং, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃপাল সিং-এর 'পাতুজী অব্ রাঠোর' বর্ণপ্রয়োগ ও রেখাঙ্কনের অভিনবত্বে নন্দলালের পর এই বিভাগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে। এঁর অন্য ছবিগুলিও উপভোগ্য। 'গোলাপ' ছবিটির উপরে চৈনিক শিল্পের প্রভাব পড়েছে মনে হয়। সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোহন তুলির স্পর্শে কালিদাসের "দিনক্ষপামধ্যগতেব সন্ধ্যা" যেন মূর্ত্ত হয়েছে। খ্যাতনামা শিল্পী অসিত হালদার ও সমরেন্দ্র গুপ্তের ছবি এবার দর্শকদের আনন্দ বিধান করতে পারে নি। শিল্পী হীরাচাঁদ দুগার ও তাঁর পুত্র ইন্দ্র দুগারের ছবিগুলির বৈশিষ্ট্য আছে। অমূল্যগোপাল সেন, বীরেন ব্রহ্ম, নরেন মিত্র প্রভৃতিও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কমলারঞ্জন ঠাকুরের ছবিটির প্রথম স্থান অধিকার করার যোগ্যতা কতটা আছে সে বিষয়ে মনে সংশয় জাগে। কৃপাল সিং-এর ছবি কেন যে বিচারকদের নিকট উপযুক্ত মর্য্যাদালাভ করল না তা বুঝতে পারা গেল না।

তৈলচিত্র-বিভাগটিতে নানা প্রখ্যাত ও অখ্যাত শিল্পীর চিত্রের সমাবেশ দেখা যায়। শিল্পী যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের ল্যাণ্ডস্কেপ সুন্দর; কিন্তু তাঁরই অঙ্কিত ২০৮ সংখ্যক ছবি 'নারীর প্রতিকৃতি' দেখে নিরাশ হতে হয়। রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর ল্যাণ্ডস্কেপ ও অন্য কয়েকটি ছবি সত্যকার শিল্প-প্রতিভার পরিচায়ক। ল্যাণ্ডস্কেপের বর্ণবিন্যাসের সজীবতা বিশেষ লক্ষণীয়। তবে ফ্রেমের মিনা-করা পিতলের অলঙ্করণ স্থূলরুচিসম্পন্ন দর্শকের পর্য্যন্ত চক্ষুপীড়ার উৎপাদন করে। ছবির বিষয়বস্তু, রং ও রেখার সঙ্গে ফ্রেমের এই কারুকার্য্যের আদৌ কোন সঙ্গতি নেই। সত্যেন ঘোষালের ছবিতে বেশ একটি স্বকীয়তার পরিচয় মেলে। লক্ষ্ণৌ কলা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ললিতমোহন সেনের ল্যাণ্ডস্কেপ বা দৃশ্যচিত্রগুলি মনোমুগ্ধকর। তবে ছবিতে প্রকৃতির সঙ্গে দু-একটি প্রাণীরও অবতারণা ঘটালে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হ'ত। সতীশ সিংহের ছবিগুলিতে নূতনত্বের লেশমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না। এঁর আঁকা নগ্নারী-মূর্ত্তিটি একান্ত ভাবেই রুচির স্থূলতার পরিচায়ক। পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে অঙ্কিত এঁর ছবি কোন কোন ক্ষেত্রে রসপিপাসুদের কাছে হাস্যকর বলিয়াও মনে হইবে। রাম লক্ষ্মণ সীতা—রামায়ণের এই শ্রেষ্ঠ তিনটি চরিত্রের মহত্ত্ব পরিস্ফুট হওয়া দূরের কথা, রাম-লক্ষ্মণের চেহারায় পৌরুষের আভাসটুকু পর্য্যন্ত ফুটে ওঠে নি। সীতা আরণ্য নারীর সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছেন।

অতিআধুনিক শিল্পীগোষ্ঠীর অনেকগুলি ছবি এবার প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। তন্মধ্যে শান্তিনিকেতনের শ্রীরামকিঙ্করের ছবির কথা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এঁর ছবিতে দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্ব এবং তুলির টানের বলিষ্ঠতা দুই-ই লক্ষণীয়। বোঝা যায়, একটি স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণা এই শিল্পসৃষ্টির উৎস। কিন্তু এই বলিষ্ঠতা উক্ত গোষ্ঠীর অন্য কোনও শিল্পীর তুলির টানে ফুটে ওঠে নি। সেখানে দেখি, হয় নূতনত্ব সৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টা, নয় পাশ্চাত্য অতিআধুনিক শিল্প-কলার অন্ধ, অক্ষম অনুকরণের প্রয়াস। ড্রাই ব্রাসের কাজে দক্ষতার জন্য গোপাল ঘোষের অনুরাগীরা এবার কিন্তু তাঁর ছবি দেখে নিরাশ হয়েছেন। তা হলেও এ কথা সত্য যে, নব্য পন্থার শিল্পীবৃন্দের মধ্যে ইনি

এমন একজন, যাঁর অনুভূতি ও প্রকাশের মধ্যে কোন ফাঁকি নেই। রথীন মৈত্রের সাঁওতালী ছবির রসোপভোগ করা আয়াসসাধ্য।

বিদেশী পদ্ধতিতে অঙ্কিত জলরঙের ছবির অনেকগুলিই বেশ চিত্তাকর্ষক হয়েছে। বিশেষ করে এল্. ডি. পালরাজের 'মুরগীর লড়াই'র চিত্র একটি সার্থক সৃষ্টি। ছবিটির মধ্যে পাওয়া যায় প্রাণচাঞ্চল্যের পরিচয়। এটি এই বিভাগের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে পুরস্কৃত হয়েছে। কানওয়াল কৃষ্ণ এবং বীরেন দে-র কাজও বেশ উল্লেখযোগ্য।

মূর্ত্তিশিল্পের মধ্যে প্রথমেই সতীশ চক্রবর্ত্তীর কাজের উল্লেখ করতে হয়। ছবিটি গণেশের মূর্ত্তিটি (৫৫৬ সংখ্যক) তাঁর শিল্পপ্রতিভার পরিচয় প্রদান করে। ইন্দুমতী লাম্বাটের আবক্ষ নারীমূর্ত্তিটি (৩২৪ সংখ্যক) চমৎকার। কিন্তু ডাঃ কাটজুর প্রতিকৃতিটিকে সার্থক সৃষ্টি কোনক্রমেই বলা যায় না, এটি কোন্ গুণে পুরস্কারপ্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে তা বুঝতে পারা গেল না। শ্রীদাম সাহার 'ব্রতচারী নৃত্য' প্রশংসার যোগ্য। ধনরাজ ভকতের 'এফেকশন্' মন্দ নয়।

একরঙা ও বহুবর্ণ উড্‌কাটের বিভাগটি দর্শককে সত্যই প্রচুর আনন্দদান করেছে। রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর 'থ্ দি কগ্' উৎকৃষ্ট ছবি। মাখন দত্তগুপ্তের 'মা ও ছেলে,' হরেন দাসের 'মাছ-ধরা' প্রশংসনীয়। কিন্তু সাবিত্রী সেনগুপ্তার পোর্ট্রেটকে উৎকৃষ্ট ছবি বলা যায় না যদিও এটি এই বিভাগের দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছে।

প্রদর্শনীতে ছবি টাঙ্গানো ও সাজানোর পদ্ধতি মোটামুটি মন্দ হয় নি। আলোর সুব্যবস্থার দরুন ছবিগুলি ভাল করে দেখা দর্শকমণ্ডলীর পক্ষে সহজসাধ্য হয়েছে। এবারের শিল্প-প্রদর্শনীর মান উন্নত বলে মনে হ'ল। উদ্যোক্তাবৃন্দের আয়োজন অনেকটা সাফল্যমণ্ডিতই হয়েছে।

ছাপাখানার ভূতের কৈফিয়ত

শ্রীবিজয়কুমার ভৌমিক

অনেক দিন পূর্ব্বে প্রবাসীতে 'ছাপাখানার ভূতের সমস্যা' সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। তখন ইচ্ছা ছিল এই সম্পর্কে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিব। কিন্তু ছাপাখানার ভূত লেখক নহে; এ বিষয়ে সে যেন 'প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ'। তাহার লেখকের মর্য্যাদা গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা এ যাবৎ মনেই রহিয়া গিয়াছে, কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। ইতিমধ্যে অবিরত আমাদের মুদ্রণ-শিল্পের উৎকর্ষের অভাব দেখিয়া ও শুনিয়া, উহার সম্বন্ধে একটা কৈফিয়ৎ দিবার ইচ্ছা মনে জাগিয়াছে। ছাপা বইয়ের ভুল-ভ্রান্তি ও অন্যান্য ত্রুটির জন্য ছাপাখানার ভূতকেই সর্ব্বদা দায়ী করা হয়। তাহার এ বিষয়ে কি বলিবার আছে, তাহা পণ্ডিত ব্যক্তিগণের গোচরে আনিবার জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। ঐ আকাঙ্ক্ষার ফলেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

আমাদের এই প্রদেশে ছাপা যে-কোনও একখানি বই (বিশেষতঃ বাংলা বই) হাতে লইয়া তাহাতে মুদ্রণ-ত্রুটির উদাহরণ বাহির করিতে সাধারণতঃ বিশেষ পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না—পাতা উল্টাইয়া গেলেই চলে। আমাদের ছাপা বইয়ে বানান ও ব্যাকরণগত ভুল সাধারণ শিক্ষিত লোকের চক্ষে অবিরতই পড়িয়া থাকে। সুমুদ্রণ সম্বন্ধে যাঁহাদের কিছু জ্ঞান আছে, তাঁহাদের চক্ষে আরও বহুবিধ ত্রুটি ধরা পড়ে। বিলাতে ছাপা একখানি সাধারণ বইয়ের সহিত আমাদের একখানি সুমুদ্রিত পুস্তকের তুলনা করিলে, এ বিষয়ে আমাদের অনগ্রসরতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। দেখা যাইবে—হয়তো মুদ্রণের অন্যান্য আঙ্গিকে সুন্দর হইলেও প্রচ্ছদপটেই দুই একটি উৎকট বানান ভুল সুন্দরীর অঙ্গে ক্ষতচিহ্নের ন্যায় উহাকে অনাকাঙ্ক্ষণীয় করিয়াছে, নতুবা হয়ত অপেক্ষাকৃত নির্ভুল ভাষা ও সুন্দর চিত্রশোভিত হওয়া সত্ত্বেও শব্দসমূহের অসম ব্যবধান, মুদ্রিত পৃষ্ঠাগুলির গভীরতার অসামঞ্জস্য এবং ফর্ম্মায় ফর্ম্মায় কালির পার্থক্য উহাকে দৃষ্টিকটু করিয়াছে। সকল বিষয়ে ত্রুটিহীন বাংলা বই দুষ্প্রাপ্য বস্তু বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এরূপ হইবার কোনও অপ্রতিবিধেয় কারণ নাই।

কম্যুনিষ্ট অপবাদগ্রস্ত হইবার ভয় না থাকিলে বলিব—আমাদের ছাপা যে খারাপ হয়, তাহার প্রধান কারণ অর্থনৈতিক। সস্তা জিনিস যে ভাল হয় না এবং ভাল জিনিসের জন্য যে একটু বেশী দাম দিতে হয় ইহা সকলেই জানেন ও মানেন। তবু কোনও কিছু ছাপিবার প্রয়োজন হইলে সস্তা ছাপাখানা খোঁজেন। যে-সব ছাপাখানার মালিকেরা সস্তায় কাজ করেন, তাঁহাদের পক্ষে আবার দক্ষ

কর্ম্মী, উপযুক্ত যন্ত্রপাতি এবং উপকরণাদি রাখা সম্ভব হয় না, ফলে ছাপা কিছুতেই ভাল হইতে পারে না।

সস্তা প্রেসে ছাপা ছাড়া পাণ্ডুলিপির ত্রুটিতেও ছাপার অনেক দোষ ঘটে। ইহাও অবশ্য মূলতঃ অর্থনৈতিক—সস্তার মোহ হইতে জাত। অনেক লেখক ও প্রকাশক জানেন না যে, ছাপাখানার পাণ্ডুলিপি উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করা উচিত, নতুবা ছাপাতে ভুল থাকিবেই। ঠিকভাবে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে কিছু ব্যয় করিতে হয়। প্রকাশকেরা সে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন বলিয়াই ছাপায় নানাবিধ ত্রুটি ঘটে। বানান ভুল, একই শব্দের বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন রূপ, ঠিক আকারের অক্ষর ব্যবহার না করা, শব্দসমূহের মধ্যে ব্যবধানের দৃষ্টিকটু অসমতা, ঠিক জায়গায় অনুচ্ছেদ আরম্ভ না করা, যে পংক্তিগুলি অন্তঃপ্রবিষ্ট করিয়া সাজানো উচিত তাহা না করা, এক কথায় মুদ্রণ-পারিপাট্যের বিবিধ ত্রুটি প্রধানতঃ পাণ্ডুলিপির দোষেই ঘটিয়া থাকে।

লেখক ও প্রকাশকদের মনে রাখা উচিত—ছাপাখানার ভূত পণ্ডিত ব্যক্তি নহে; সে পাণ্ডুলিপি-অনুযায়ী অক্ষরের পর অক্ষর সাজাইতে পারে, কিন্তু উহার ত্রুটি সংশোধনের ক্ষমতা তাহার নাই। পাণ্ডুলিপি ত্রুটিপূর্ণ হইলে ছাপা জিনিষেও অবশ্যই ত্রুটি থাকিবে। ইহা বুঝেন না বলিয়াই অধিকাংশ প্রকাশক প্রথমলিখিত খসড়া সংশোধন না করিয়াই ছাপাখানায় পাঠাইয়া দেন—ফলে মুদ্রিত জিনিসটি হয় ভুল-ত্রুটিতে ভরা, অসুন্দর।

অনেকে তাঁহাদের সমস্ত সংশোধন, পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন প্রুফের উপর সারেন। তাহাতে যে কি অসুবিধা হয়, তাহা তাঁহারা বোঝেন না বা বুঝিতে চাহেন না—'নহিলে খরচ বাড়ে'। প্রথম কম্পোজ হইবার পর একটি নূতন শব্দ যোগ করিলে বা একটি শব্দ বর্জ্জন করিলে শব্দসমূহের ব্যবধান ঠিক রাখা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে; সেজন্য হয়তো দুই-তিন পংক্তি ভাঙিতে গড়িতে হয়। একাধিক শব্দ যোগ বা বর্জ্জন করিলে হয়তো সমস্ত অনুচ্ছেদটিই ভাঙিয়া সাজাইতে হয় এবং তাহাতে সমগ্র পৃষ্ঠাটির গঠনই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। একটি অনুচ্ছেদ ভাঙিয়া দুইটি করিতে হইলে যে আরও কত অসুবিধা হয়, তাহা শুধু ভুক্তভোগী ছাপাখানার ভূতেই বুঝে, পণ্ডিত লোকে বুঝেন না। অনেক সময়, এই সমস্ত পরিবর্ত্তন অসাধ্য না হইলেও, নিতান্ত দুঃসাধ্য হয়। এরূপ অবস্থায় ছাপা কিছুতেই সুন্দর বা ত্রুটিহীন হইতে পারে না। এই অসুবিধার এবং তজ্জনিত অযথা শ্রম ও ব্যয়ের কথা ছাপাখানার মালিক মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া থাকেন; কিন্তু কঠোর প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কাজ হারাইবার ভয়ে নীরবে সহ্য করিয়া যান। প্রকাশক বা লেখক ছাপাখানার ভূতের এই অযথা হয়রাণির কথা বুঝেন না বা বুঝিতে চাহেন না; যত দিন সেজন্য তাঁহাদের মূল্য দিতে না হয়, তত দিন বুঝিবার প্রয়োজনও নাই। কিন্তু ইহার ফলে ছাপা যে অসুন্দর হয় এবং ভুলের মাত্রা বাড়ে, তাহা তাহাদের বুঝা ও স্মরণ রাখা উচিত।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছাপা চাহিলে সর্ব্বাগ্রে দরকার উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করা কপি। ব্রিটিশ ষ্ট্যাণ্ডার্ডস ইনষ্টিটিউশন কপি প্রস্তুতের জন্য কয়েকটি নির্দ্দেশ দিয়াছেন। যাঁহারা ভাল ছাপা চাহেন, ইংরেজী কপি সম্বন্ধে তাঁহারা ঐ নির্দ্দেশগুলি অবশ্যই পালন করিবেন। বাংলা মুদ্রণের ক্ষেত্রেও উহা যথা-সম্ভব পালনীয়। আমাদের প্রয়োজনানুরূপ করিয়া নির্দ্দেশগুলি এখানে তুলিয়া দিতেছি।

(১) কপি সুস্পষ্টভাবে পংক্তিগুলির মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রাখিয়া লিখিত হওয়া উচিত। বিশেষ নাম এবং পারিভাষিক ও প্রতীক-শব্দসমূহের প্রত্যেকটি অক্ষর পৃথক করিয়া স্পষ্টভাবে লেখা উচিত।

(২) কপি সর্ব্বদাই একই আকারের কাগজে একপৃষ্ঠে লিখিত হইবে এবং উহার শীর্ষদেশে ও বামপার্শ্বে যথেষ্ট শূন্য স্থান থাকিবে।

(৩) কপির পৃষ্ঠাগুলি পর পর সংখ্যা চিহ্নিত করিয়া দিতে হইবে। সংখ্যা পৃষ্ঠার শীর্ষদেশে দক্ষিণ পার্শ্বে বসিবে এবং পৃষ্ঠাগুলি বামদিকে দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ হইবে। পাতার সংখ্যা খুব বেশী হইলে, সমগ্র পাণ্ডুলিপিটি চব্বিশ-পঁচিশ পৃষ্ঠার পৃথক্ পৃথক্ খণ্ডে ভাগ করিয়া দিতে হইবে।

(৪) সংখ্যা চিহ্নিত করিবার পর যদি কোথাও একটি সমগ্র পৃষ্ঠাব্যাপী কিছু বর্জ্জন করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উহা পরিষ্কারভাবে কাটিয়া দিয়া পৃষ্ঠাটি যথাস্থানে রাখিয়া দিতে হইবে।

(৫) নক্সা, চিত্র, ফলক প্রভৃতি পৃথক কাগজে দিতে হইবে এবং মূল পাণ্ডুলিপিতে উহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে।

(৬) পাদটীকা পৃষ্ঠার নীচে না বসাইয়া, সংশ্লিষ্ট পংক্তির ঠিক নীচে বসাইতে হইবে এবং উপর-নীচে রেখা টানিয়া মূল বিষয় হইতে পৃথক্ করিয়া দিতে হইবে।

(৭) কোনও শব্দ বা শব্দসমূহ মোটা অক্ষরের করিতে হইলে, উহার নীচে একটি সরলরেখা বা তরঙ্গায়িত রেখা টানিয়া দিতে হইবে।

(৮) কোনও অনুচ্ছেদ ক্ষুদ্রতর অক্ষরে ছাপিতে হইলে উহার পার্শ্বদেশে উল্লম্ব রেখা টানিয়া পার্শ্বে "ক্ষুদ্র অক্ষর" শব্দদ্বয় বা যেরূপ অক্ষর প্রয়োজন উহার নাম লিখিয়া দিতে হইবে। শিরোনাম ও উপ-শিরোনামে যে অক্ষর দিতে হইবে, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া উচিত।

(৯) কপিতে অনুচ্ছেদ ও অন্তঃপ্রবিষ্ট অংশের আরম্ভ এবং অনুরূপ ব্যবস্থার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকা দরকার। অনুচ্ছেদের

আরম্ভ নির্দ্দেশ করিবার জন্ত L বা ¶ চিহ্ন এবং অন্তঃপ্রবিষ্ট অংশ নির্দ্দেশ করিবার জন্ত [ ] চিহ্ন ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(১০) অক্ষর সাজাইবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অন্ত কোনও কিছু বক্তব্য থাকিলে, তাহা কপির পার্শ্বে "মুদ্রাকরের প্রতি" শিরোনাম দিয়া লিখিয়া দিতে হইবে।

(১১) পাণ্ডুলিপি সুষ্ঠুভাবে সংশোধিত হওয়া একান্ত দরকার। কোনও সংশোধন করিতে হইলে উহা পার্শ্বে না লিখিয়া কপির মধ্যেই কালি দিয়া লিখিয়া দিতে হইবে এবং পরিত্যক্ত অংশ পরিষ্কারভাবে কাটিয়া দিতে হইবে। কোনও অংশ কাটাকুটির জন্ত অপরিচ্ছন্ন বা দুর্ব্বোধ্য হইলে, উহা পৃথক কাগজে লিখিয়া দিতে হইবে এবং মূল পাণ্ডুলিপিতে ঐ অংশের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে।

এইরূপে প্রস্তুত যে পাণ্ডুলিপি ছাপিবার জন্ত পাঠানো হইবে, তাহাই হইবে উহার চূড়ান্ত পাঠ; নিতান্ত অনিবার্য্য কারণ ব্যতীত ছাপিবার সময় উহার কোনও পরিবর্ত্তন করা চলিবে না।

ঠিকভাবে প্রস্তুত কপি হইতে ছাপা এবং অসংশোধিত প্রস্তুতিহীন কপি হইতে ছাপায় যে কি পার্থক্য ঘটে, এখানে তাহার উদাহরণ দেওয়া সম্ভব নয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহা ভালভাবেই জানেন।

অনেক লেখকের পক্ষে নানা কারণে এরূপ কপি প্রস্তুত করা হয়ত সম্ভবপর হইয়া উঠে না। তাঁহাদের পক্ষে এ বিষয়ে কোনও দক্ষ লোকের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। প্রেসের জন্ত যিনি কপি প্রস্তুত করিবেন, তাঁহাকে সাধারণ নকলনবিশ হইলে চলিবে না। তাঁহার হস্তলিপি স্পষ্ট হওয়া ত চাই-ই, অধিকন্তু পাণ্ডুলিপিতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর জ্ঞান তাঁহার অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে থাকা উচিত এবং উহার ভাষায়, বিশেষতঃ সেই ভাষার বানান ও ব্যাকরণে, তাঁহার বিশেষ দখল থাকাও দরকার। তদুপরি তাঁহার মুদ্রণ-শিল্পের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা আবশ্যক। লিখিত বিষয়ের সম্পাদনার কার্য্য তাঁহাকে করিতে হইবে না বটে, কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়-গুলি তাঁহার অবশ্যকর্ত্তব্য:—(১) অশুদ্ধ বানান সংশোধন করিয়া দেওয়া; (২) বিরাম-চিহ্ন ব্যবহারের ভুল সংশোধন করিয়া দেওয়া; (৩) শব্দ-সমূহের সমাসবদ্ধ-করণে সামঞ্জস্য রক্ষা করা; (৪) বিশেষ নামাদির বানানে এবং যে সকল শব্দের বিভিন্নরূপ বানান আছে তাহাদের বানানে সামঞ্জস্য বিধান করা; (৫) অতিরিক্ত দীর্ঘ অনুচ্ছেদগুলিকে বিষয় অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন অনুচ্ছেদে ভাগ করিয়া দেওয়া; (৬) মূল বিষয়ের সহিত পাদটীকার যাহাতে সঙ্গতি থাকে, তাহা দেখা; (৭) কোনওকিছু সংখ্যা বা অক্ষরের দ্বারা চিহ্নিত হইয়া থাকিলে, উহার ক্রমিকতার প্রতি দৃষ্টি রাখা; (৮) শব্দ প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত রূপের যাহাতে সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য থাকে, তাহা দেখা; (৯) সংখ্যাসমূহ ও উহা অক্ষরে লেখার বিষয়ে যাহাতে সামঞ্জস্য থাকে, তাহা দেখা; (১০) কোন্‌টি কোন্‌ আকারের অক্ষরে হইবে, তাহার নির্দ্দেশ দেওয়া।—অবশ্য যিনি এই সমস্ত করিতে পারিবেন, তাঁহাকে দিয়া কাজ করাইতে হইলে কিছু ব্যয় হইবে। কিন্তু সে ব্যয়ে কুণ্ঠিত হইলে ভাল ছাপা আশা করা যায় কি করিয়া?

কপি সুষ্ঠুভাবে প্রস্তুত হওয়ার পর উহা ভাল প্রেসে ছাপিতে দেওয়া দরকার এবং তাহার পর দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রুফ-রিডার দ্বারা প্রুফ দেখানো প্রয়োজন। কোনওরূপে অক্ষরের পর অক্ষর মিলাইয়া পড়িতে পারিলেই প্রুফ দেখা যায় না। যে বিষয়ের প্রুফ দেখিতে হইবে, প্রুফ-রিডারের সে বিষয়ে কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। উহার ভাষার বানান ও ব্যাকরণে তাঁহার বিশেষ দখল থাকা চাই এবং সর্ব্বোপরি চাই অভিজ্ঞতা ও এমন অভিনিবেশ সহকারে প্রুফ দেখিবার ক্ষমতা, যাহাতে কোনও প্রকারের ভুল, ত্রুটি বা অসামঞ্জস্য দৃষ্টি না এড়াইয়া যায়। কম্পোজিটারদের কার্য্যপদ্ধতি ও সুবিধা-অসুবিধার এবং সাধারণভাবে ছাপাখানার কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধেও তাঁহার মোটামুটি জ্ঞান থাকা দরকার। কপি প্রস্তুতকারকের যে সমস্ত কর্ত্তব্যের কথা বলা হইয়াছে, প্রুফ-রিডারেরও তৎসমুদয়ই করিতে পারা চাই। ভাষাজ্ঞানহীন অদক্ষ প্রুফ-রিডার দ্বারা প্রুফ দেখানোর ফলে বইয়ে নানারূপ বিকৃতি ঘটে; অনেক সময় লেখক যাহা বলিতে চাহেন তাহার বিপরীত অর্থই প্রকাশ পায়। অতএব সুমুদ্রণের জন্ত ভাল কপি ও ভাল প্রেসের ন্যায় সুদক্ষ প্রুফ-রিডারও একান্ত প্রয়োজন।

আমরা ভাল ছাপি না, আমাদের ছাপার নানা ত্রুটি। ইহা অবশ্যই স্বীকার করি। কিন্তু লেখক ও প্রকাশকেরাও কি ভাল ছাপিবার পূর্ব্বে করণীয় বিষয়গুলির প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টি দিয়া থাকেন? সুষ্ঠুভাবে কপি প্রস্তুত করুন, ভাল প্রেসে ছাপিতে দিন এবং সুদক্ষ প্রুফ-রিডার দিয়া প্রুফ দেখান, তাহার পরও যদি ছাপা খারাপ হয়, তখন ছাপাখানার ভূতের নিন্দা করিবেন। দুঃখের বিষয় এদেশে কপি ঠিকভাবে প্রস্তুত ত হয়ই না, সস্তায় ছাপানোকেই ছাপাখানার ও প্রুফ-রিডারের দক্ষতার মান বলিয়া মনে করা হয় এবং ফলে যাহা হইবার তাহাই হইয়া থাকে।

শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথের দান

শ্রীউষা বিশ্বাস, এম-এ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ বহুমুখী প্রতিভা শুধু বাংলা সাহিত্যকেই বিচিত্র রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ করে তোলে নি। তিনি শুধু কবিগুরুই নন, তিনি যুগ-গুরু—এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক। তাঁর চিন্তাধারা বাংলার জাতীয় জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অব্যাহত ভাবে প্রবাহিত হয়েছিল। শিক্ষায় তাঁর দানের মূল্যও বড় কম নয়। তিনি শিক্ষা-জগতে যুগান্তর এনেছেন—প্রবর্তন করেছেন এক নতুন ভাব ও চিন্তার ধারা যার মূল্য আজকের দিনে আমরা সকলেই উপলব্ধি করছি। ঋষি-কবি তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সত্যের অখণ্ড রূপ দেখেছিলেন। তাঁর একান্ত দরদী মন দেশের প্রকৃত কল্যাণের পথ খুঁজেছিল, তিনি চেয়েছিলেন দেশে সত্যিকার মানুষ গড়ে তুলতে। সত্যের সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার যথার্থ গলদ কোথায়—গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতির অন্তঃসারশূন্যতা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর গভীর চিন্তাপ্রসূত, শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি পড়লেই বোঝা যায় তিনি কত বড় শিক্ষাবিদ্ ছিলেন। তিনি এক সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেশের শিক্ষা-সমস্যাগুলির সমাধান করতে এবং এক নূতন আদর্শের ভিত্তিতে দেশের শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। জাপান, রাশিয়া প্রভৃতি প্রগতিশীল দেশের শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষাবিধির তুলনামূলক বিচার করে তিনি শিক্ষা-সংস্কারের পথও নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন। তিনি দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি ও পুরাতন ঐতিহ্য বজায় রাখতে চাইলেও বিদেশী বিদ্যাকে বর্জন করতে চান নি। দেশ যেন বিদেশী বিদ্যাকে সম্পূর্ণ আপনার জিনিষ করে নিয়ে তাকে নিজের ভাষায় পরিবেশন করে—যাতে সেই বিদ্যা সমস্ত দেশের নিজস্ব সম্পদ হয়ে উঠতে পারে, এই ছিল তাঁর কাম্য।

প্রাচীন ভারতে বৈদিক যুগে ছাত্রেরা যেমন গুরুগৃহে বাস করে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, বিশ্বপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে বিদ্যাচর্চ্চা করত, রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন এ যুগেও ছেলেমেয়েরা তেমনি করে আশ্রমের সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়ে উন্মুক্ত উদার আকাশের তলে, মুক্ত বাতাসে, স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়ায় বসে গুরুর কাছ থেকে বিদ্যালাভ করবে। দেশদেশান্তর থেকে আগত শিষ্যেরা গুরুকে কেন্দ্র করে এমনি ভাবে স্বভাবের নিয়মেই গড়ে তুলবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়—প্রাচীন তপোবনের—বৌদ্ধযুগের নালন্দা, তক্ষশীলা বিক্রমশীলার আদর্শ। তারা অনুভব করবে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তাদের জীবনের নিবিড় গভীর যোগ। গুরুশিষ্যের মধ্যে গড়ে উঠবে আত্মীয়তার অতি নিকট সম্পর্ক। গুরু অধিকার করবেন ছাত্রদের পিতামাতার স্থান—ছাত্রদের সর্ব্ববিধ কল্যাণের উপর নিয়ত থাকবে তাঁর স্নেহ-সজাগ দৃষ্টি। এই গুরু শুধু শিক্ষা দেবার যন্ত্রস্বরূপ নন্—তিনি সত্যিকার মানুষ। মানুষই মানুষ গড়তে পারে—প্রাণ থেকেই প্রাণ সঞ্চারিত হয়। আলোকশিখা থেকেই আলোক শিখা জ্বলে ওঠে—এই ছিল কবির অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনটিতে বিদ্যাসমবায়ের একটি সুবিশাল ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে—যেখানে সর্ব্বদেশের বিদ্যার চর্চ্চা হবে—ভাবের আদান-প্রদান হবে। তাঁর দেশের বিদ্যানিকেতন পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলন-"নিকেতন" হয়ে উঠবে—এই তাঁর একান্ত কামনা ছিল। তাঁর মতে একমাত্র "সত্যলাভের ক্ষেত্রে"ই মানুষের সঙ্গে মানুষের যথার্থ সম্বন্ধ গড়ে ওঠে—মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্যিকার ঐক্য স্থাপিত হয়। তাই শিক্ষায়তনই মানুষের প্রধান অতিথিশালা, যেখানে সে বিশ্বের সকল মানুষকে আমন্ত্রণ করতে পারে। তাঁর সেই স্বপ্ন আজ কতকাংশে সফল হয়েছে তাঁর অপূর্ব্ব সৃষ্টি "বিশ্বভারতী"তে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন দেশের আপামর সাধারণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার—যেন বিদ্যার অন্নসত্রে সমাজের সকল স্তরের লোকদের সমান অধিকার থাকে—সেখানে যেন কেউই অপাংক্তেয় না থাকে। তিনি বুঝেছিলেন দেশের মুষ্টিমেয় নগরবাসীদেরই শুধু শিক্ষিত করে তুললে চলবে না—শিক্ষার আলোক দেশের অসংখ্য গ্রামের অগণিত জনগণের মধ্যেও পৌঁছানো চাই। তাঁর সেই পরিকল্পনা থেকেই সুরুলে "শ্রীনিকেতনে"র সৃষ্টি হয়। তিনি তাঁর আদর্শকে রূপায়িত করে তুলতে চেয়েছিলেন—তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তন দুটির মধ্যে—"বিশ্বভারতী" ও "শ্রীনিকেতনের" মধ্যে।

দেশের প্রচলিত বিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের স্মৃতি যে আদৌ সুখকর ছিল না সেকথা তিনি নিজেই একাধিকবার বিভিন্ন রচনায় প্রকাশ করেছেন। বিদ্যালয়গৃহের প্রাচীরের মধ্যে বন্দী তাঁর অনতিদীর্ঘ ছাত্রজীবনের দিনগুলির স্মৃতি তাঁর চিরমুক্ত কবিচিত্তকে পরিণত বয়সেও পীড়া দিয়েছে। দেশের বিদ্যালয়রূপ কারাগৃহে জীবনের আরম্ভেই সুকুমারমতি শিশুদের স্বল্পপরিসর কক্ষের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে তাদের কুসুমপেলব সুকোমল মনগুলির নবীনতা ও সরসতা বিনষ্ট করে দেবার দুঃসহ গ্লানি তাঁর অন্তরকে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত করেছিল। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মূলে রহিয়াছে এই বেদনাবোধ। তিনি লিখেছেন—

"I know what it was to which this school owes its origin. It was not any new theory of education, but the memory of my school days."

প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির ব্যর্থতা উপলব্ধি করেই রবীন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার প্রয়াস পেয়েছিলেন—তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনটির মধ্যে দিয়ে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, প্রচলিত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষারূপ যন্ত্রের চাপে শিশুদের স্ফুটনোন্মুখ ব্যক্তিত্বকে পিষে মারবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাই তিনি এগুলিকে—"A manufactory specially designed for grinding out uniform result"—বলে আখ্যাত করেছেন। এই প্রকার শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের কোনও সুযোগই দেওয়া হয় না। তাঁর মতে—"ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাষ্টার এই কারখানার একটা অংশ।... কলের একটা সুবিধা ঠিক মাপে ঠিক ফরমাস দেওয়া জিনিষটা পাওয়া যায়—এক কলের সঙ্গে আর এক কলের উৎপন্ন সামগ্রীর বড় একটা তফাৎ থাকে না—মার্ক দিবার সুবিধা হয়।" কবি বুঝেছিলেন প্রচলিত বিদ্যালয়গুলিতে সম্পূর্ণ মানুষ তৈরি করবার কোন চেষ্টাই করা হয় না—ফলে গড়ে ওঠে এক ছাঁচে ঢালা কতকগুলি প্রাণহীন যন্ত্র—যারা পাঠ্য-পুস্তকে লিখিত কতকগুলি বাঁধা বুলি ছাড়া আর কিছুই শিখতে পায় না। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তাদের জীবনের যে নিবিড় সম্বন্ধ তা অচিরেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

তাই কবি বলেছেন—"আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জ্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চ্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।" বোলপুরে উন্মুক্ত উদার প্রান্তরের নিভৃতির মধ্যে শান্তিনিকেতনের আশ্রমে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই আদর্শটিকেই বাস্তব রূপ দিলেন। সেখানে "প্রকৃতির নির্ম্মল সৌন্দর্য্যের" সঙ্গে "মানুষের চিত্তের পবিত্র সাধনা"কে মেলাবার জন্যে একটি আশ্রম গড়ে তুললেন। ঋষি-কবি ধ্যানযোগে অন্তরে প্রাচীন ভারতের তপোবনের যে সুন্দর ছবিটি এঁকেছিলেন তারই প্রতিচ্ছবি দেখতে চাইলেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যায়তনটির মধ্যে। সেদিনকার সেই প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে যে ক্ষুদ্র বীজটি উপ্ত হয়েছিল তাই আজ "বিশ্ব-ভারতী"-রূপ বিশাল মহীরুহে পরিণতিলাভ করেছে। কালের সঙ্গে কবির আদর্শের ক্রমবিবর্ত্তন ঘটেছে সেকথা তিনি নিজেই বলেছেন—ফল পাকলে যেমন করে তার বাইরের খোসাটার রং বদলে যায়, তার ভিতরকার শাঁসটুকুও বাড়ে, রসে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্যের প্রসার যতই বাড়তে লাগল ততই তিনি নূতন নূতন বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে লাগলেন এবং নব নব পথেরও সন্ধান পেতে লাগলেন। জগতের যে-কোনও জীবন্ত আদর্শ স্থিতিশীল হতে পারে না—অবস্থাভেদে সময়ভেদে তার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কবির সেদিনকার সেই ক্ষুদ্র শিক্ষায়তনটিই আজ "বিশ্বভারতী" নামে বিশ্ব-বিশ্রুত হয়েছে।

প্রাচীন তপোবনের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যায়তনটিতে ছেলেমেয়েদের তরুণ জীবনগুলিকে প্রকৃতির ক্রোড়ে নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে স্বাভাবিক পরিবেষ্টনে গড়ে তুলবার ইচ্ছা কবির ছিল। তাঁর মতে—"মন যখন বাড়িতে থাকে তখন তাহার চারিদিকে একটা বৃহৎ অবকাশ থাকা চাই। বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে সেই অবকাশ বিশালভাবে বিচিত্রভাবে সুন্দর ভাবে বিরাজমান।" বিদ্যালয়-গৃহের কৃত্রিমতা ও সঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়ে দিয়ে তাই তিনি ব্যবস্থা করলেন—ছেলেমেয়েরা মুক্ত আকাশের নীল চন্দ্রাতপ-তলে, ছায়ানিবিড় তরু-বীথিকায় বসে গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করবে, যেমন করে বৈদিকযুগে প্রাচীন ভারতের তপোবনে ছাত্রেরা গুরুর আশ্রমে জ্ঞানার্জ্জনে রত হ'ত। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৌন্দর্য্যের পূজারী—বর্ষা, শরৎ, শীত, বসন্ত ইত্যাদি বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির রূপ কত বিচিত্রভাবেই তাঁর সৌন্দর্য্যপিপাসু মনকে দোলা দিয়েছে। প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্যভাণ্ডার থেকে তাঁর মন যে রস আহরণ করত, তাঁর একান্ত কাম্য ছিল ছাত্রেরা যেন তা থেকে বঞ্চিত না হয়। তিনি বলেছিলেন,—"তরুলতার শাখাপল্লবিত নাট্যশালায় ছয় অঙ্কে ছয় ঋতুর নানা রস-বিচিত্র গীতিনাট্যাভিনয় তাদের সম্মুখে ঘটিতে দাও।"

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন প্রকৃতি যেন তার বিচিত্র সৌন্দর্য্যের ডালিখানি উজাড় করে দেয় এই বিকাশোন্মুখ তরুণ মনগুলির সামনে—তারা যেন অসীম আনন্দে ফুটে ওঠে—"শুভ্র সূর্য্যোদয়ে প্রভাতের কুসুমের মত।" তাঁর মতে—"বাহিরে বিশ্বপ্রকৃতির আবির্ভাব যেখানে বাধাহীন অন্তরে সেইখানেই মন সম্পূর্ণ বিকশিত।" তাই কবি চেয়েছিলেন প্রভাতের নবারুণ রাগ, দিনান্তের অস্তরবির অন্তিম রক্তচ্ছটা, পাখীর কলকাকলী, বসন্তের মলয়হিল্লোল, ফুলের বিচিত্রমধুর সৌরভ, কুসুমরাজির বিচিত্র বর্ণসমারোহ, দিগন্ত-বিস্তীর্ণ প্রকৃতির শ্যামাঞ্চল, বর্ষার সজল কাজল মেঘের নীলাঞ্জন, বাদলের অবিরাম বারিধারা, শরতের মেঘমুক্ত আকাশের প্রশান্ত নীলিমা ও অরুণ আলোর অঞ্জলি, মেঘমেদুর দিনে তরুবীথিকার স্নিগ্ধ ছায়া, পূর্ণিমার চাঁদের রজত-কিরণধারা, শস্যক্ষেত্রের উপর আলোছায়ার লুকোচুরি খেলা, বর্ষায় প্রবাহিণীর উদ্দাম তরঙ্গোচ্ছ্বাস যেন ছাত্রদের প্রাণের তন্ত্রীতে বিচিত্র ঝঙ্কার তোলে—তারা যেন উপলব্ধি করতে পারে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তাদের জীবনের যোগ-সূত্র। বিশ্বপ্রকৃতির এই বিচিত্র সৌন্দর্য্যলীলার মধ্যে তারা

যেন "বিশ্বজননীর প্রত্যক্ষ লীলাস্পর্শ" অনুভব করতে পারে—তারা যেন এর মধ্যে দিয়ে ভূমার আনন্দ উপভোগ করতে পারে। কবির নির্ব্বাচিত স্থানটিও তাঁর আদর্শ বিদ্যালয়ের পক্ষে খুবই উপযোগী হয়েছিল। বোলপুরে আশ্রমটি যেখানে অবস্থিত সেই স্থানটিকে প্রকৃতির লীলাকুঞ্জ বলা যেতে পারে। কবি বলেছিলেন—"অনুকূল ঋতুতে বড় বড় ছায়াময় গাছের তলায় ছাত্রদের ক্লাশ বসিবে। তাহাদের শিক্ষার কতকাংশ অধ্যাপকের সহিত তরুশ্রেণীর মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সমাধা করিবে: সন্ধ্যার অবকাশ তাহারা নক্ষত্রপরিচয়ে, সঙ্গীত-চর্চ্চায়, পুরাণকথা ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া যাপন করিবে।"

পারিবারিক স্নেহবন্ধনহীন বিদ্যালয়ের কঠিন নিষ্করুণতা কবির বালকচিত্তকে বড়ই বেদনা দিয়েছিল। তাই তিনি তাঁর আশ্রমে এমন একটি পরিবেশ রচনা করতে চেয়েছিলেন, যাতে ছেলেরা বুঝতে পারে যে তারা সকলেই একটি বৃহৎ পরিবারভুক্ত। তাঁর মতে শিক্ষায় শিক্ষাদান-প্রণালীই সবচেয়ে বড় কথা নয়—যথার্থ শিক্ষা আদর্শ গুরুর কাছ থেকেই পাওয়া যায়। এই গুরু শুধু একটি শিক্ষার ছাঁচ হবেন না—তিনি হবেন প্রকৃত মানুষ। গুরু যদি শুধু 'মাষ্টার মশায়' হয়ে ওঠেন তা হলে তিনি কখনই শিক্ষার মধ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। শিশুদের পক্ষে এই রকম প্রাণহীন শিক্ষার মত হানিকর আর কিছুই নেই। রবীন্দ্রনাথের সামনে ছিল ভারতের শাশ্বত আদর্শ। গুরু তাঁর নিজের জীবন দ্বারা ছাত্রদের নূতন জীবনে উদ্বুদ্ধ করবেন, তাঁর জ্ঞানের দ্বারা ছাত্রদের জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাবেন, তাঁর আপন হৃদয়-নিঃসৃত স্নেহসুধায় ছাত্রদের জীবনকে অভিষিক্ত করে নিয়ত তাদের কল্যাণের পথে এগিয়ে দেবেন। তা হলেই ছাত্রদের অন্তরের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাভক্তি স্বতঃই তাঁর প্রতি উৎসৃষ্ট হবে। এই রকম করেই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সজীব ও প্রাণবান্ হয়ে উঠবে। স্নেহমমতা-সেবায় পরিপূর্ণ এই রকম সরস শিক্ষার মূল উৎসটি ছাত্রদের প্রাত্যহিক ও সামাজিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ কবির মনকে মুগ্ধ করেছিল। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—ত্যাগকেই ভোগরূপে বরণ করতে হবে—এটি উপনিষদের বাণী। তাই তপোবনের আদর্শে তাঁর আশ্রমটিকে শিক্ষা ও সাধনার মিলনক্ষেত্রে পরিণত করবার উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের ছিল। সেখানে ছাত্রেরা সকল রকম অনাবশ্যক আড়ম্বর ও বিলাসিতা বর্জ্জন করে যথাসম্ভব সাদাসিধে জীবন যাপন করবে—তারা যতদূর সম্ভব নিজেদের কাজ নিজেরাই করবে—সকল বিষয়ে অপরের উপর নির্ভরশীল হবে না। এই রকম করেই ছেলেমেয়েরা বুঝতে শিখবে শ্রমের মর্যাদা—শুধু মুখের উপদেশ শুনে নয়, "প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা"—ব্রহ্মচর্য্যের সাধনায় ছাত্রদের চরিত্র সুন্দর, সংযত ও বলিষ্ঠ হয়ে গড়ে উঠবে—তারা যেন পরবর্ত্তী জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মিতাচারী ও সংযমী হতে পারে। তাঁর মতে শুধু বাঁধা গৎ মুখস্থ করা বা বাহ্যিক কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান পালনই ধর্ম্ম নয়—ধর্ম্ম তার চেয়েও গভীরতর জিনিষ—মানুষের জীবনের সঙ্গে যার অবিচ্ছেদ্য যোগ। "যেখানে মানুষের ধর্ম্মসাধনা অহোরাত্র প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সকল কর্ম্ম ধর্ম্ম-কর্ম্মের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে সেইখানেই স্বভাবের নিয়মে ধর্ম্মবোধের উদ্বোধন হয়"—এই ছিল তাঁর ধর্ম্মশিক্ষার আদর্শ। এই আদর্শই তিনি আশ্রমবাসীদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। আশ্রমের ছাত্রদের প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় ১০।১৫ মিনিট নীরব ধ্যানে বসতে হ'ত। এটাও একটা সাধনা।

এদেশে রবীন্দ্রনাথই প্রথম তাঁর শিক্ষায়তনের ছাত্রদের মধ্যে 'স্বায়ত্তশাসন' প্রবর্ত্তন করতে চেষ্টা করেন। এজন্য তখনকার দিনে তাঁকে কম প্রতিকূলতা ও বিরোধিতা সহ্য করতে হয় নি। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করবার জন্য কিছু শাসনব্যবস্থা থাকা দরকার একথা সকলেই ক্রমে অনুভব করতে লাগলেন। কবি তখন শাসনক্ষমতা শিক্ষকদের কাছ থেকে নিয়ে ছাত্রদের উপর ন্যস্ত করলেন এবং এর ফল ভালই হয়েছিল। তাঁর মত "কঠোর শাসন শাসয়িতারই অযোগ্যতার প্রমাণ। শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা।" ছাত্রদের উপর শাসনভার দেবার উদ্দেশ্যে সব ছাত্রদের নিয়ে একটি আশ্রম সম্মিলনী গঠিত হ'ল। এই সম্মিলনীর দ্বারাই একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি নির্ব্বাচিত হ'ত। এই সমিতির শাসনব্যবস্থাই সকলকে মেনে চলতে হ'ত। নিয়ম প্রস্তুত করা ছিল সম্মিলনীর কাজ এবং সেই নিয়মগুলি ঠিকমত প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা দেখা ছিল সমিতির কাজ। গুরুতর অপরাধের বিচার করবার জন্যে একটি বিচার-সভার আয়োজন করা হ'ত।

তখনকার দিনে প্রচলিত বিদ্যালয়গুলিতে কেবল পুথিগত বিদ্যাশিক্ষা দেবারই ব্যবস্থা ছিল। তাতে শুধু ছেলেমেয়েদের বুদ্ধিবৃত্তিরই অনুশীলন হ'ত—সম্পূর্ণ মানুষ গড়ে তুলবার কোন প্রয়াসই দেখা যেত না। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথই প্রথম খেলাধূলা, সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, অভিনয় চিত্রকলা ও সাহিত্য-চর্চ্চার মধ্যে দিয়ে শিশুমনগুলিকে সম্যকরূপে বিকশিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। আজকাল অনেক শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ই খেলাধূলা, নৃত্য, গীত, চিত্রকলা, সাহিত্য, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদি সৃজনাত্মক কার্য্যকলাপের মধ্য দিয়ে শিশুদের সম্পূর্ণ মানুষ করে গড়ে তুলতে চাইছেন। কিন্তু তখনকার দিনে প্রচলিত বিদ্যালয়গুলিতে এইরূপ শিক্ষাব্যবস্থার কোনও মূল্যই দেওয়া হ'ত না। সকল শিশুর মধ্যেই আত্মপ্রকাশের একটি স্বাভাবিক ইচ্ছা দেখা যায়—এটি তাদের একটি সহজাত

প্রবৃত্তি। শিক্ষায় শিশুদের এই সহজাত প্রবৃত্তিটির সম্যক্ বিকাশ হওয়া দরকার। নইলে তাদের মনের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক পিতা-মাতা এবং শিক্ষক শিক্ষিকাই অজ্ঞতাবশতঃ মনে করেন এই রকম বাজে কাজে শিশুদের শক্তি ও সময়ের অপচয় ঘটছে। তাঁরা তাদের এই সহজাত প্রবৃত্তিটিকে দাবিয়ে রাখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। শিশুদের "প্রাণকোষকের গোপন মর্ম্মস্থলে যে বিকাশবেদনা" সদাই নিহিত থাকে রবীন্দ্রনাথের দরদী মন তা অনুভব করেছিল। তিনি তাই তাঁর বিত্তায়তনে ছেলেমেয়েদের আত্মপ্রকাশের অবাধ ও প্রচুর সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন। তারা সহজ স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দের মধ্যে শিক্ষালাভ করবে—এই ছিল কবির অন্তরের কামনা।

শান্তিনিকেতনের সান্ধ্য-বৈঠকগুলি সাহিত্য-চর্চ্চায় ও সঙ্গীতে মুখর হয়ে উঠত। কত সন্ধ্যায় কবি ছাত্র ও অধ্যাপক-দের পড়ে শুনিয়েছেন—তাঁর নিজের লেখা গল্প, কবিতা; কত ইংরেজি কবিতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেছেন; স্বরচিত কত গান গেয়ে শুনিয়েছেন। শান্তিনিকেতনে বিশেষ বিশেষ ঋতুতে ও বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে নানা উৎসবাদির আয়োজন হ'ত। প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ কত বিচিত্র-ভাষায় ও ছন্দে বিভিন্ন ঋতুকে তাঁর অন্তরের আবাহন জানিয়েছেন। এই সব উৎসব উপলক্ষে কবির স্বরচিত কত নাটক নাটিকা ও প্রহসনাদি অভিনীত হ'ত। এই উৎসবাদির দ্বারাও রবীন্দ্রনাথ ছেলেমেয়েদের মনের খোরাক জোগাতে চেয়েছিলেন, শুধু আনন্দবিধান করাই এই অনুষ্ঠানগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। আবৃত্তি ও অভিনয় শিশুদের আত্ম-প্রকাশের একটি সহজ উপায়। তাদের অনেকেরই হয়তো আবৃত্তি ও অভিনয় করবার স্বাভাবিক শক্তি থাকে। কিন্তু উপযুক্ত অনুশীলনের অভাবে তাদের সেই শক্তিটি ফুটে উঠতে পারে না। কবি ছেলেমেয়েদের আত্মপ্রকাশের এই পথটিকেও সহজ করে দিতে চেয়েছিলেন। অনেক ছেলে-মেয়েরই রচনার ক্ষমতা অল্পাধিক পরিমাণে থাকে। অনেক সময়েই যথোচিত চর্চ্চার অভাবে তাদের সেই স্বাভাবিক ক্ষমতার বিকাশ হয় না। শান্তিনিকেতনে বিত্তালয়ের সকল বিভাগেই নিয়মিত সাহিত্য-সভার আয়োজন করা হ'ত। তাতে ছেলেমেয়েরা তাদের নিজেদের লেখা গল্প, কবিতা, নাটিকা, প্রবন্ধাদি পাঠ করত।

নৃত্যগীত এবং চিত্রাঙ্কনও যে শিশুদের আত্মপ্রকাশের একটি স্বাভাবিক ও প্রকৃষ্ট উপায় একথা রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন। শান্তিনিকেতনে তাই চিত্রকলা এবং সঙ্গীতও স্থান পেয়েছে। কলাভবন ও সঙ্গীতভবন শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ খেলাধুলাকেও ছেলেমেয়েদের শিক্ষা থেকে বাদ দেন নি। মানুষের শরীরের সঙ্গে তার মনের যে কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সেকথা আমরা সবাই জানি। তা ছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে খেলার একটি বিশেষ মূল্য আছে। খেলার মধ্য দিয়ে তাদের মন আনন্দের খোরাকও যথেষ্ট পায়। শান্তিনিকেতনের ছাত্রেরা খেলাধূলাতেও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথই তাঁর বিত্তালয়ে প্রথম সহশিক্ষা প্রবর্ত্তন করেন। শান্তিনিকেতনেই প্রথম ছেলে এবং মেয়েরা একসঙ্গে একই গুরুর নিকট থেকে শিক্ষালাভ করবার সুযোগ পায়। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন যেন এদেশে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সহজ সম্বন্ধ গড়ে ওঠে; তাদের পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারে, দৈনন্দিন আচরণে, কোনও অনাবশ্যক লজ্জা বা সঙ্কোচের অস্বাভাবিক জড়তা থাকবে না। নৈতিক দিক থেকেও যে এ ব্যবস্থা হানিকর নয় সেকথা শান্তিনিকেতনেই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। এ থেকেও কবির মতের ঔদার্য্যের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বাংলাদেশে বাংলাভাষার মধ্য দিয়েই সর্ব্ববিধ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হবে। তাঁর মতে দেশীয় ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা দিলেই 'বিত্তার ফসল' দেশ জুড়ে ফলবার সম্ভাবনা। তিনি বুঝেছিলেন, মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন না হলে দেশে ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার কখনই সম্ভবপর হবে না, তাই এদেশে উচ্চ শিক্ষাও দেশের ভাষায় দিতে হবে। বিদেশী ভাষায় শিক্ষা দেবার ফল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন —"ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত কৃত্রিম অন্নে দেশের পেট ভরাবার মত সেই চেষ্টা; অতি অল্পসংখ্যক পেটেই সেটা পৌঁছায়, এবং সেটাকে সম্পূর্ণ রক্তে পরিণত করবার শক্তি অতি অল্প পরিপাক-যন্ত্রেরই থাকে।" "দেশের চিত্তের সঙ্গে দেশের শিক্ষার এই দূরত্ব এবং সেই শিক্ষার অপ-মানজনক স্বল্পতা" বাস্তবিকই কবির চিত্তে বড়ই বেদনা জাগিয়েছিল। এ বিষয়ে জাপানের দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়। জাপান ইউরোপীয় বিত্তাকে গ্রহণ করেছে। প্রথমে তাকে সেই বিত্তা ইংরেজী ভাষাতেই নিতে হয়েছিল। কিন্তু এর নিস্ফলতা উপলব্ধি করে অচিরেই জাপান সেই বিত্তাকে তার নিজের ভাষায় তার দেশের নিজস্ব সম্পত্তি করে নিলে। এইজন্যই জাপানে ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার এত সহজে সম্ভব হয়েছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নজীর দেখিয়েও কবি বলেছেন আগে ঐ সব দেশে যখন লাটিন ভাষা শিক্ষা দেবার বিধি প্রচলিত ছিল তখন "বিত্তার আলোক পাণ্ডিত্যের ভিত্তিসীমা এড়িয়ে বাইরে অতি অল্পই পৌঁছাত।" কিন্তু ইউরোপের জাতিগুলি যখন থেকে আপন ভাষাকে শিক্ষার বাহন করল তখন থেকেই ব্যাপক ভাবে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার সম্ভব হ'ল। একটি সম্পূর্ণ বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করা সহজ কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তাঁর নিজের বিত্তালয়ে পরীক্ষা করেও দেখেছেন। তিনি কত কঠিন কঠিন ইংরেজী কবিতা

বাংলায় ব্যাখ্যা করে ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝাতেন। তাতে ছেলেমেয়েরা তার রস গ্রহণ করতে পারত—যেটা হয়ত সম্ভব হ'ত না ইংরেজী ভাষায় বোঝালে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির ক্রমবিবর্ত্তনও বিশেষ লক্ষণীয়। ক্রমে যখন তাঁর ক্ষুদ্র আশ্রমটির ছাত্রসংখ্যা বাড়তে লাগল এবং বিদ্যালয়টির কলেবরও যখন ক্রমশ: বড় হতে লাগল তখন তাঁর মূল আদর্শটিরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটল। এই রকম করেই সেটি আজ "বিশ্বভারতী"র মত বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বিশ্বমানবিকতার উদার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই কবি "বিশ্বভারতী"র পরিকল্পনা করেছিলেন। জগতে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে স্বার্থের সংঘর্ষ, ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে হানাহানি, রেষারেষি—রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে নিয়তই আঘাত করেছে। তাই তাঁর কামনা ছিল শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বমানবের মৈত্রী ও ঐক্যসাধন করা। তাঁর সেই উদার আদর্শ আজ মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে তাঁর পরিকল্পিত "বিশ্বভারতী"র মধ্যে। এই বিদ্যায়তনে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যা এবং সংস্কৃতির মিলন ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—"আমার প্রার্থনা এই যে ভারত আজ সমস্ত পূর্ব্বভাগের হয়ে সত্যসাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধনসম্পদ নেই জানি, কিন্তু তার সাধনসম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্ত্তে সে বিশ্বের সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে।" আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে তৈরি—এখানে ভারতীয় বিদ্যা প্রাধান্যলাভ করে নি। তাই কবি চেয়েছিলেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টিতে জগতের সকল সভ্যজাতি আমন্ত্রিত হবে—এখানে বৈদিক, পৌরাণিক, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সি, ইসলাম প্রভৃতি সকল ভারতীয় বিদ্যার পাশাপাশি বিশ্ব-বিদ্যার চর্চ্চা হবে। তিনি বুঝেছিলেন বিদ্যার আদানপ্রদান না হলে বিদ্যা গ্রহণও সম্পূর্ণ হতে পারে না।

এখন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে বিদ্যা শুধু মুষ্টিমেয় লোকের সম্পত্তি হয়ে আছে। তাই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন শিক্ষা—যা মানুষের জন্মগত অধিকার—দেশের সমস্ত মানুষের সম্পদ হয়ে উঠবে। আমাদের দেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ব্যবধান গড়ে উঠেছে তাও এক প্রকার জাতিভেদ। কবি এই রকম জাতিভেদও ঘুচাতে চেয়েছিলেন। জগতে আর কোনও সভ্য দেশের মানুষই এম্নি করে "সপ্তমীর চাঁদের মত অর্দ্ধেক আলোয়, অর্দ্ধেক অন্ধকারে খণ্ডিত হয়ে নেই।" বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের অনেকদিন কেটেছিল—বাংলাদেশের গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে তাই তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবার যথেষ্ট সুযোগ হয়েছিল। গ্রামবাসীদের অজ্ঞতা, অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যহীনতা তাঁকে অত্যন্ত বেদনা দিয়েছিল। তাই তিনি পরবর্ত্তী জীবনে পল্লী-সংগঠন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে অগণিত গ্রাম নিয়ে আমাদের দেশ—সেই গ্রামকে ভুলে থাকলে চলবে না—এই গ্রামের লোকদের শিক্ষিত করে না তুললে, গ্রামের বিবিধ উন্নতি করতে না পারলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হবে না। সুরুল গ্রামে প্রতিষ্ঠিত "শ্রীনিকেতনে" রবীন্দ্রনাথ এই জনশিক্ষার ব্যবস্থাই করতে চেয়েছিলেন। শুধু গ্রামবাসীদের নিরক্ষরতা দূর করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন তারা সমাজে মানুষের মত বাঁচবার শিক্ষা এবং অধিকারও অর্জ্জন করবে। তিনি বলেছিলেন—

> "অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
> চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
> সাহসবিস্তৃত বক্ষপট।"

তাই তিনি গ্রামবাসীদের জীবিকা-সমস্যা সমাধানের সহজ উপায়গুলিও নির্দ্দেশ করতে চেষ্টা করেছিলেন। গ্রামের শিক্ষা-ব্যবস্থায় তিনি শিল্পশিক্ষাকে একটি বিশিষ্ট স্থান দিয়েছেন। বাংলার কুটীরশিল্পগুলির পুনঃপ্রচলন, লুপ্ত পল্লীশিল্পের পুনরুদ্ধার, কৃষির উন্নতি, সমবায় সমিতি স্থাপন ইত্যাদি গঠনমূলক কার্য্যের দ্বারা তিনি গ্রামবাসীদের শিক্ষার পথ সুগম করতে চেষ্টা করেছিলেন। এক হিসাবে "শ্রীনিকেতন" "বিশ্বভারতী"র পরিপূরক। রাশিয়ায় জনশিক্ষা বিস্তারের বিপুল আয়োজন ও প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি এ সম্বন্ধে "রাশিয়ার চিঠিতে" লিখেছেন—"শুধু শ্বেত রাশিয়ার জন্যে নয়—মধ্য এসিয়ার অর্দ্ধ সভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মত বেগে শিক্ষা বিস্তার করে চলেছে—সায়ান্সের শেষ ফসল পর্য্যন্ত যাতে তারা পায়, এই জন্যে প্রয়াসের অন্ত নেই।" রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলেছেন—"আমরা শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়েছি এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্টভাবে তাই করছে। প্রতিদিনই আমি ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার তুলনা করে দেখি আর ভাবি কী হয়েছে আর কী হতে পারত।...কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে এদের জনসাধারণের অবস্থার সাদৃশ্য ছিল—এই অল্পকালের মধ্যে দ্রুতবেগে বদলে গেছে—আমরা পড়ে আছি জড়তার পাঁকের মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন।"

দেশের শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথের অমূল্য দানের প্রকৃত মর্য্যাদা সেদিন দেশের খুব কম লোকেই বুঝেছিল, তার উপযুক্ত মূল্য দেশ সেদিন দেয় নি। কিন্তু আজ সকল শিক্ষাব্রতীই কবিগুরুর সেই অপূর্ব্ব দানের মূল্য বুঝতে পারছেন। তাঁর এই সুমহান্ দান অদূর ভবিষ্যতে এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করবে তার সূচনা এখনই দেখা যাচ্ছে।

ফরাসী-কবি শার্ল্‌ বোদেলের ও তাঁর কাব্য-প্রতিভা

শ্রীনির্ম্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়

এই প্রবন্ধে এমন একজন কবির কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করব যিনি এক সময়ে তাঁর কবিতার অসাধারণ বৈচিত্র্যের দ্বারা কাব্যজগতে যুগান্তর এনেছিলেন, এবং সমস্ত পৃথিবীর বিশিষ্ট কাব্যরসিকগণ যাঁর কাব্য পাঠ করে চমৎকৃত হয়েছিলেন। এই অসাধারণ কবির নাম শার্ল বোদেলের (Charles Baudelaire)। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন। মাত্র ৪৬ বৎসর বয়সের মধ্যে তিনি ফরাসী-কাব্যে যে রসের অবতারণা করে গিয়েছিলেন তা অভূতপূর্ব।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কার কবি বোদেলের কাব্যে যে ভাবধারা ও আদর্শ ব্যক্ত করেছেন তা অতুলনীয়। এ ধরণের ভঙ্গীতে আগে কেউ কাব্য রচনা করেন নি, কেননা বোদেলের-এর পূর্ববর্তিগণের পক্ষে তাঁর কাব্যাদর্শ সম্পর্কে ধারণা করা কল্পনাতীত ছিল। পরবর্তিগণও তাঁর কাব্য পাঠ করে সভয়ে দূরে সরে গিয়ে তাঁকে নমস্কার জানিয়েছেন, এই পর্যন্ত—তাঁর কাব্যের অনুকরণ বা অনুসরণ করা তাঁদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসাধ্য ছিল। বোদেলের যে সময়কার কবি, ফ্রান্সে তখন সাহিত্যের সুবর্ণ-যুগ। বিশেষ করে, উনবিংশ শতাব্দীর ঐ সময়ে ফরাসী-কাব্য উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল। ভিক্তর হিউগো (১৮০২—১৮৮৫), আল্‌ফ্রে দে ম্যুসে (১৮১০—১৮৫৭), তেয়োফিল গোতিয়ে (১৮১১—১৮৭২), লেকঁৎ দে লীল্‌ (১৮২০—১৮৯৪), মিস্ত্রাল্‌ (১৮৩০—১৯১৪), স্যুলি প্র্যুদম্‌ (১৮৩৯—১৯০২), পল্‌ ভেরলেন্‌ (১৮৪৪—১৮৯৬), স্তেফান্‌ মালার্মে (১৮৪৮—১৮৯৮) প্রভৃতি সুবিখ্যাত ফরাসী-কবিবৃন্দ তখন স্ব-স্ব দক্ষতায় জাতীয়-সাহিত্য অলঙ্কৃত করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে স্থান লাভ করে তাঁদের একজন হওয়া তখন ফ্রান্সের যে-কোনও লেখকের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা ছিল।

তরুণ বয়সেই স্বীয় কাব্যপ্রতিভায় বোদেলের উপরি-উক্ত বিশিষ্ট লেখকগণের মধ্যে স্থানলাভ করেছিলেন এবং নিজস্ব পৃথক কাব্যাদর্শ নিয়ে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিলেন। ফ্রান্সের সমালোচকগণ প্রথমে বোদেলেরকে স্বীকার না করলেও পরে তাঁর কাব্যপ্রতিভায় বিস্মিত হয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁকে উপযুক্ত মর্যাদা দেন। বোদেলের-এর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের নাম—'লে ফ্ল্যার দ্যু মাল্‌' (Les Fleurs Du Mal) বা 'অমঙ্গলের পুষ্পরাজি'। বইখানির পেছন দিকে বোদেলের-এর 'স্যাঁৎ ব্যভ' প্রভৃতি কয়েকজনের পত্রাবলী প্রকাশিত করেছিলেন।* ঐ চিঠিগুলি পড়লে বোদেলের-এর কবি-হৃদয়ের ও জীবনদর্শনের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 'স্যাঁৎ ব্যভ' (Charles Augustin Sainte Beuve, 1804—1869) ছিলেন তদানীন্তন ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ সমালোচক; তিনি অত্যন্ত নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। তিনি বোদেলের-এর কাব্য-বৈচিত্র্যে বিমুগ্ধ হয়ে তাঁর বিশেষ সুখ্যাতি করেছিলেন। কবি ভিঞি ও ভিক্তর হিউগো বোদেলের-এর কবিতা পাঠ করে তাঁর প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন।

বোদেলের তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'লে ফ্ল্যার দ্যু মাল্‌' ১৮৫৭ সালে ৩৬ বৎসর বয়সে রচনা করেন এবং এখানি ১৮৬১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বোদেলের লে ফ্ল্যার দ্যু মাল্‌ বিখ্যাত কবি তেয়োফিল গোতিয়েকে (Theophile Gautier) উৎসর্গ করেন। বোদেলের একজন ভাল সমালোচকও ছিলেন; সমসাময়িক সাহিত্যিকদের সম্পর্কে নিজের মতামত প্রকাশ করে তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বোদেলের কিছু গদ্য-কবিতাও রচনা করেছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি এডগার এল্যান পো-র রচনাগুলি অনুবাদ করায় ব্যাপৃত ছিলেন।

বোদেলের-এর কবিতা বাহ্যতঃ 'সেণ্টিমেণ্টাল' নয়; যে ভাবাবেগ তাঁর মধ্যে আছে তার গঠন অত্যন্ত দৃঢ়। বোদেলেরকে বীভৎস ও উৎকট রসের কবি বলা যায়। জগতের যাবতীয় অসুন্দর, কুৎসিত, কদর্য ও মন্দ বস্তুর মধ্যে তিনি অপরূপ সৌন্দর্য ও আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন এবং ঐ সকল বিষয় অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছেন। ইনি সুন্দরকে কদর্য দেখতেন না বটে, কিন্তু কদর্যকে সুন্দর দেখতেন এবং এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

বহু কবিই তাঁদের রচিত কাব্যে পৃথিবীর চিরমনোহারী সৌন্দর্য দেখিয়েছেন এবং এই মরলোকের বাস্তব রূপের সঙ্গে তাঁদের সৌন্দর্যপিয়াসী কবিমনের অপরূপ কল্পনা মিশিয়ে বর্ণাঢ্য কবিতার সৃষ্টি করেছেন। অধিকাংশ কবিই পৃথিবীর রূপে, রসে, বর্ণে, গন্ধে ও সর্বোপরি প্রকৃতির সৌন্দর্যে বিহ্বল ও মুগ্ধ হয়ে কবিতা রচনা করে-

---

* 'লে ফ্ল্যার দ্যু মাল্‌'-এর একটি অতি পুরাতন সংস্করণে এই সমস্ত চিঠিপত্র আছে। কিন্তু আধুনিক সংস্করণে এগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে।

ছেন—মানব হৃদয়ের হাসি কান্নার অপূর্ব সম্পদ তাঁদের কাব্যে দিয়ে গেছেন। কত কবি নারীর প্রেম নিয়ে কত মনোমুগ্ধকর কাব্য রচনা করেছেন, কত মধুর ভাবে নারীর জীবনের লীলা, ছলাকলা প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন। এই সকল কবি 'সমস্ত জগৎই মিথ্যা' বলে প্রচার করেন নি,—পৃথিবীর সমস্ত রূপ-রসকে নিংড়ে নিয়ে তাঁদের পানপাত্র পূর্ণ করেছেন ও সুন্দরকে উপভোগ করেছেন; যদিও তাঁরা জানতেন ভালভাবেই যে, এই জীবন হচ্ছে—'নলিনীদলগত জলমতিতরলম্'! তাই তাঁরা কেবলমাত্র পৃথিবীর সৌন্দর্যই তাঁদের কাব্যে ফোটান নি, উপরন্তু তাঁদের মনের রঙের সংমিশ্রণে জগৎকে আরও রাঙিয়েছেন। তাঁদের কবি-কল্পনা কেবলমাত্র ধরণীর বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি; তাঁরা কল্পনানেত্রের সাহায্যে স্বর্গের সৌন্দর্য-সুষমাও কাব্যে রূপায়িত করেছেন।

কিন্তু এই পৃথিবীর আর একটি দিকে তারা একেবারেই দৃষ্টিপাত করেন নি; তাঁরা এই পৃথিবীর কঠোর বাস্তব রূপ কি দেখেন নি?—নিশ্চয়ই দেখেছেন। তাঁরা পৃথিবীর রোগ, শোক, দুঃখ, কষ্ট, ব্যাধি, জ্বালা, যন্ত্রণা, তাপ, মড়ক, মহামারী, দারিদ্র্য ইত্যাদির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। এমন কি তাঁদের এসব বিষয়ে হয়ত বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও আছে। কিন্তু যা তাঁরা মনে-প্রাণে বর্জন করতে চান, যা তাঁরা সহ্য করতে পারেন না বা পছন্দ করেন না, তা নিয়ে কেন তাঁরা কাব্য রচনা করবেন? তাঁরা চান শ্রান্ত, ক্লান্ত মানবকে ক্ষণিক তৃপ্তি ও আনন্দ দিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও পেতে চান অপরকে তৃপ্তি দেবার গৌরব। তাঁরা সুন্দরেরই বন্দনা করে এসেছেন—অসুন্দর ও অশুভ থেকে সভয়ে দূরে সরে এসে!

কিন্তু বোদেলের এমন একজন কবি যিনি কাব্যে স্বর্গের সুষমা রূপায়িত করেন নি বা পৃথিবীর কোনরূপ সৌন্দর্য যাঁর কাব্যে চিত্রিত হয় নি। তিনি অলীক বা অবাস্তব কোনকিছুর কল্পনা করে তাকে 'স্বরগশোভা বিমণ্ডিত' করেন নি। পূর্বেই বলেছি, তিনি পৃথিবীর অতি কুৎসিত, অতি বীভৎস, বিকট, ভয়াবহ, মর্মান্তিক, অতি কদর্য বিষয়সমূহ তাঁর কাব্যে নিপুণ শিল্পীর মত অঙ্কিত করেছেন। জগতের ও স্বর্গের রূপরাশি ত অনেক কবিই তাঁদের কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন; কিন্তু নরকের সৌন্দর্য এবং এই পৃথিবীর অপর একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকের কাহিনী, তথ্য ও অভিজ্ঞতা আর কোন্ কবি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন?

যদি বলা হয়, এতে আর কি অভিনবত্ব আছে? পৃথিবীর অনেক যুগের অনেক কবিই ত পৃথিবীর বীভৎসতা ও নরকের ভয়াবহতা দেখিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ দান্তের নরক-বর্ণনা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যায়, কিন্তু এখানে বক্তব্য এই যে, পৃথিবীর নানা যুগের বহু কবি অনেক অসুন্দর ও বিকট বস্তু তাঁদের কাব্যে চিত্রিত করেছেন বটে, কিন্তু সে সবের অধিকাংশই তাঁদের ভাব-বিলাস বা বাস্তব-প্রিয়তার পরিচায়ক। তাঁদের কাব্যে কোথাও তাঁরা নরককে সমর্থন করেন নি; বরঞ্চ বলেছেন, এই নরক—এত বীভৎস, এত পঙ্কিল এত অমানুষিক! কিন্তু বোদেলের তা করেন নি—তাঁর কাব্যে যথেষ্ট ভাবাবেগ রয়েছে বলা যায়। নরক বর্জনীয়, বোদেলের তা কোথাও বলেন নি। বরঞ্চ নরকের অতল-গহ্বরে স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দিয়েছেন; তার পঙ্কিল আবর্তে ডুবে গিয়ে অসীম কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন নারকীয় বীভৎসতা, যা-কিছু কদর্য, যা-কিছু অসুন্দর তা যেন তাঁর সত্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাঁরই মধ্যে লীন হয়ে গেছে, যেখান থেকে তাঁর আর উদ্ধারের আশা নেই। তিনি যে স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দিয়ে পড়েছেন নরকের মাঝে সে সম্বন্ধে তাঁর নিজের উক্তি:

"Une Idee, Une Forme, Un Etre
Parti de L'azur et tombe—
Dans Un styx bourbeux et plombe
Ou nai Oeil du Ciel ne penetre."

অর্থাৎ—

"স্বচ্ছ নীলাকাশ হতে একটি ভাবনাদল, একটি মূর্তি, একটি সত্তা ঝাঁপিয়ে পড়েছে নরকের পঙ্কিল বৈতরণীর 'পরে যেখানে স্বর্গলোকের সমস্ত দৃষ্টিপথ রুদ্ধ।"

বোদেলের কাব্যের প্রেরণা ও সৌন্দর্যানুভূতি নিম্নলোক অর্থাৎ নরকের বীভৎসতা থেকে পেয়েছেন। তিনি নরকের পঙ্কিলতার মধ্যে এসে পড়ে তাতেই সত্যম্, শিবম্ ও সুন্দরম্‌কে খুঁজে পেয়েছেন এবং তাই কাব্যে বর্ণিত করেছেন।

কাজেই বোদেলেরকে বাস্তববাদী কবি বলে কেউ যেন ভ্রম না করেন। বোদেলের তাঁর কাব্যে বাস্তব-পৃথিবীর কঠোর রূপটিই কেবল ফুটিয়েছেন তা ভাবলে ভুল করা হবে। বরঞ্চ তিনি তাঁর কাব্যের উপকরণ কল্পনানেত্রের সাহায্যে এবং যেখানে যা-কিছু আশ্চর্য, অস্বস্তিকর ও অস্বাভাবিক বস্তু আছে তাকেই অদ্ভুত ও বিচিত্র রূপকের দ্বারা পেয়েছেন। যেখানে যা-কিছু বিকট, কদর্য, অসুন্দর ও বীভৎস বস্তু আছে সেখানেই এই কবির আশ্চর্য টান, অদ্ভুত প্রীতি ও বিস্ময়কর রীতি!

এবার বোদেলের-এর কবিতার রীতি-প্রকৃতি (form ও style) লক্ষ্য করা যাক।

একটি স্ত্রীলোকের শবদেহকে সম্বোধন করে বোদেলের বলছেন:

"বল্ মোরে ওরে ঘৃণ্য শব !
জীবিত থাকিতে দিয়া সব প্রেম পারনি করিতে তৃপ্ত যারে,—
সে-পুরুষ তবে তোর সে অসাড় মাংসস্তূপের শোণিতধারে—
মিটায়ে নিল কি কামনা সব ?

— বল্ রে হিংস্রদংষ্ট্রা নারী !
সে কি তোরে তার ক্ষিপ্র বাহুর কঠিন বাঁধনে চাপিয়া ধরি,—
চুম্বন-ঝড় বয়ালি তোর তুষার-নিথর দন্তোপরি,
—শেষবারের আদর তাঁরি ?"…

এই কবিতা পড়ে কবির মনোবিকারের সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে কেউ কেউ কঠোর মন্তব্যও হয়ত করবেন। যাঁরা রুচিশীল ও নীতিবাগীশ তাঁরা ঘৃণায় মুখ বিকৃত করবেন। কেউ-বা বলবেন যে, এসব অশ্লীলতা ও কুরুচি অসহ্য ইত্যাদি। যাঁদের ফরাসী-সাহিত্যে যৎসামান্য জ্ঞান আছে—তাঁরা বলবেন, এ আর এমন নূতন কি! এ-সব ত জোলা, বালজাক, মোপাসাঁ, ফ্লোবেয়ার প্রভৃতির রচনাবলীতে বহুল পরিমাণে আছে। কিন্তু এই সাহিত্যিক ক'জন ফরাসী হলেও বোদেলের-এর রচনার সঙ্গে তাঁদের কোনও সাদৃশ্য নেই। আপাতদৃষ্টিতে বোদেলেরকে জোলা, মোপাসাঁ, ফ্লোবেয়ার প্রভৃতির সমগোত্রীয় বলে মনে হতেও পারে, কিন্তু যাঁরা আরও গভীরে যাবেন তাঁরা বুঝতে পারবেন যে তাঁরা ভ্রান্ত।

অনেকেই বোদেলেরকে অশ্লীলতার কবি বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বোদেলের বীভৎস-রসের কবি হলেও কখনই অশ্লীলতার সমর্থক ছিলেন না। এই জগতে যা নিত্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে অথচ যা আমরা দেখেও দেখি না, বোদেলের তাঁর দিব্যদৃষ্টি ও অসাধারণ কৌতূহল নিয়ে তা লক্ষ্য করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তাঁর কবিতা শ্লীল ও অশ্লীলের অনেক উর্ধ্বে। তা হচ্ছে রহস্যময় ও সংবেদনশীলতায় পরিপূর্ণ।

সুন্দর, শোভন বস্তুকে তিনি যেন দেখেও দেখেন নি। যখনই তাঁর কাব্যে সৌন্দর্যের আভাস এসে পড়েছে তখনই তা যেন কোনও অসুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য-চেতনার অসম্বৃত রূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কেননা বোদেলের সুন্দরের আড়াল থেকে তির্যক ভাবে দেখেছেন। যে কদর্যতা তিনি বাস্তব পৃথিবী থেকে খুঁজে পেতেন না—আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে সে সব তাঁর বিচিত্র মনোজগৎ থেকে খুঁজে আনতেন। আবার যা-কিছু ঘৃণ্য, যা-কিছু অবজ্ঞেয়, যা-কিছু অপাংক্তেয় অবহেলার বস্তু, তাই তিনি গভীর দরদের সঙ্গে বুকে টেনে এনেছেন সংবেদনশীল কবিমন নিয়ে। উদাহরণস্বরূপ তাঁর আর একটি বিখ্যাত কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি :

"ফাঁসিকাঠে আজ দোদুল্যমান একটি অসাড় দেহ !
পচাগলা সেই শবেরে হেথায় কেহ না করিছে স্নেহ।
বিকট আকার শতেক পক্ষী মৃতদেহটিরে ঘিরে'—
মহা উল্লাসে তীক্ষ্ণচঞ্চু-প্রয়োগে ফেলিছে ছিঁড়ে !
অঙ্গে ঠোকর মারিয়া তাহারা জঞ্জাল উপাড়ে যত—
ছিঁড়িয়া, ফাড়িয়া সে দেহ করিছে ক্রমে ক্ষত-বিক্ষত !

চোখ দুটি তার পড়েছে গলিয়া অক্ষিকোটর হ'তে—
দুর্গন্ধেতে ভরপুর দিক ; লোকজন নাহি পথে।
উদর বিদারি নাড়ীভুঁড়ি সব উরুর উপরে পড়ে,
বাহিরিয়া আসে অন্ত্রসমূহ, কুবাসে যে দিক ভরে !
কদাকার যত শ্বাপদের দল বদন-ব্যাদানে ফিরি
করাল-দংষ্ট্রা দ্বারা শবদেহ ধীরে ধীরে লয় ছিঁড়ি !

— যেথায় মলয় করে মৃদু মর্মর,
ভালবাসা যেথা দেবতার নীড়, নীল-নভ সুন্দর,
শুভ্র-স্বচ্ছ সেই দেশ-মাঝে জন্ম লভেছ তুমি।
নানা কদাচারে আজ তুমি হেথা চিরতরে আছ ঘুমি,
বহুবিধ তব পাপানুষ্ঠানে আজ তুমি হায়, তবে
অন্তিম তব শেষ কর্মেতে চির-বঞ্চিত হবে।
চিরকাল ধরি এমন ভাবেতে হেথায় ঝুলিয়া রবে,
এই তুমি হায়, নীরবে তোমার এত অপমান সবে !

—ক্ষুদ্র তুচ্ছ প্রাণী তুমি !…হাসি তোমারে হেরিলে আসে,
এখন তোমার শবদেহখানি সান্ধ্যবাতাসে ভাসে !
তাকায়ে তোমার মৃতদেহ পানে যেন এক অতিকায়
কোন্ বেদনার অতি পুরাতন সুতীব্র স্মৃতি হায়,
ব্যথা-বিষাক্ত নদীর মতন মোর তালু ঠেলি তায়,
বমনের মত বাহির হইল প্রায় !

মহান্ স্মৃতির সহিত জড়িত, হায় রে ঘৃণ্য শব !
তোমা পাশে আমি দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে নিজে করি অনুভব,
কদাকার যত বায়সের সেই করাল ঠোঁটের সাথ,
কৃষ্ণ-বদন শ্বাপদের সেই তীক্ষ্ণ-দন্তাঘাত,
এককালে যারা হিংস্রোল্লাসে আমার মাংসরাশি
নখাঘাতে করি ছিন্নভিন্ন আনন্দে নিত গ্রাসি।"

এই কবিতার প্রথম দুটি স্তবক পাঠ করলে মনে হতে পারে যে, কবি বোদেলের নিশ্চয়ই উগ্র বস্তুতান্ত্রিক কবি এবং রিয়্যালিজম তাঁর কাব্যে অন্যান্য বাস্তববাদী কবিদের মতই প্রকাশিত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এই ধারণা হওয়া স্বাভাবিক এবং সেই কারণেই বোদেলের যখন এই ধরণের কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন তখন ফ্রান্সের অপরাপর বাস্তববাদী সাহিত্যিকবৃন্দ বোদেলেরকে সাগ্রহে নিজেদের দলে আমন্ত্রণ করেন। অবশ্য পরে তাঁদের ভুল ভেঙে যায়।

আলোচ্য কবিতাটির প্রথম দুটি স্তবক পাঠান্তে যাঁরা বোদেলেরকে বস্তুতান্ত্রিক বলে ভাবছেন পরের স্তবকটি পাঠ করলে তাঁদের ধারণার পরিবর্তন হবে।

ফাঁসিমঞ্চে দোদুল্যমান একটি পচা-গলা শবের প্রতি

তাঁর যে মনোভাব ও বক্তব্য তা কি সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব নয়? তাঁর বক্তব্য: "ওগো! তোমার দুঃখ যে আমারই দুঃখ, তোমার পাপ যে আমারই পাপ।" তাই একটি ঘৃণ্য শবদেহের পরিণতি দেখে তাঁরও মনে হচ্ছিল নিজের কথা, অতীতের সেই ব্যথাজর্জর দিনগুলির কথা। কবির চোখে এই নির্মম সত্যটাই ফুটে উঠেছে যে, এই বিশাল জগৎ ব্যাপক ভাবে নির্যাতনের একটি যন্ত্র মাত্র; যাবতীয় বস্তু সেখানে বিদলিত ও নিষ্পিষ্ট হচ্ছে। কবি রূপকের সাহায্যে সেই সত্যটাই তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন:

"তোমার রাজ্যে ওগো প্রেম দেব! দেখিতে পেয়েছি আমি
ফাঁসিকাষ্ঠের প্রতিচ্ছবিটি শুধুই দিবস-যামী;
মঞ্চের 'পরে ঝুলিয়া রয়েছে আমারি ছায়া যে হায়!
...এমন শক্তি, এমন সাহস আমারে দাও হে প্রভু,
(যেন) চাহিয়া দেখিতে নিজ হৃদি, দেহে ঘৃণা নাহি হয় কভু!"

এই যে অদ্ভুত কল্পনা ও চিন্তাধারা, এই হ'ল তাঁর পৃথক্ জীবনদর্শনের বিষয়বস্তুর নিদর্শন। ফাঁসিকাঠে একটি শবদেহ নির্দয়ভাবে ঝুলছে। কিন্তু সে কে? তিনি দেখছেন, এ কি! এ যে তিনি নিজে। ফাঁসিকাঠে তাঁর মৃতদেহই যেন দোল খাচ্ছে—তাই তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন তাঁর বুকে সাহস দেবার জন্য, শক্তিসঞ্চয় করবার জন্য, যেন নিজের প্রতি চেয়ে দেখতে তাঁর ঘৃণা না হয়।

এই সব কবিতায় যেন তাঁর ব্যক্তিগত ও অতীত জীবনের ঘটনাসমূহ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। অবশ্য কাব্যের বিচার কবির কবিতা নিয়েই, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে নয়।

এই পৃথিবীর যে আর একটি বিশিষ্ট রূপ আছে তা বোদেলের-এর সংবেদনশীল, অনুভূতিসম্পন্ন ও মরমী কবি-মনের কাছে সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হয়েছিল। তিনি একটি বড় কবিতায় (Le Voyage) বলেছেন:

"বিপুল পৃথিবী ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়াছি সব স্থান,
তিক্ত হয়েছে বিরাট জগৎ ব্যভিচারে ভরা প্রাণ!
চির-অজ্ঞান তবু গর্বিতা নারী ক্রীতদাসী-প্রায়
শ্রান্তিবিহীন ভালবাসা দেয়, পূজিতে হাসি না পায়!
কামে উন্মাদ ভোগী সে পুরুষ, বিকট, রুক্ষ-প্রায়,
দাসীদের দাস, পঙ্কেতে বাস, নরকের ঘৃণা তায়!
জল্লাদ ডাকে বীভৎস-রবে, কসাই হানিছে ছোরা,
রক্তের ঘ্রাণে জমে কোলাহল, বেলা পড়ে আসে ত্বরা।
ক্রিয়া-কর্মেতে উন্মাদ ধ্যান করিছে পশুরা সবে,
মরণের বেড়া পাতিছে নিয়তি নিষ্কৃতি চায় যবে;
বুঁদ হয়ে যায় মৃত্যু-আফিমে সংজ্ঞাহীনের প্রায়,
এই দুনিয়ার চিরকাল শুধু এই সংবাদ হায়!...

ওগো অভিজ্ঞ! মহান্ মৃত্যু নাও নাও তুমি মোরে;
অসহ এই মর্ত্ত্য জীবন, নাও মোরে তুলে ক্রোড়ে।
...অচিন অতলে ডুবিব যে আমি, পরাণ নূতনে লবে,
স্বরগের পুরী কিংবা নরক—সেকথা ভেবে কি হবে?"

এই কবিতাটিতে কবির দৃষ্টিভঙ্গী সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে, তিনি যা বলেছেন তা নির্মম হলেও খাঁটি সত্য এবং তাঁর উক্তির যাথার্থ্য অনস্বীকার্য। এই পৃথিবীর আর একটি যে রূপ রয়েছে তা হচ্ছে চিরন্তন, এবং অনাদিকাল হতে সত্য। তাঁর বক্তব্য নির্দয় ও তীব্র, হৃদয়-বিদারক, কিন্তু তা যথার্থ। বোদেলের তাঁর নির্মম লেখনীমুখে জগতের এই চিরন্তন কদাচার লোকসমক্ষে উদ্ঘাটিত করেছেন। আমরা তা জানি এবং ভয়ে ভয়ে আমাদের এই সত্যকার রূপ গোপন করে থাকি। প্রত্যক্ষদর্শী কবি বোদেলের তাই অভিজ্ঞ মন নিয়ে এই বাস্তব সত্যের উপলব্ধি করেছেন এবং নির্মমভাবে অথচ সুতীব্র বেদনার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। এই পৃথিবীর বীভৎসতাকে তাই তিনি আর সহ্য করতে না পেরে মরণকে ডাকছেন; 'প্রাচীন কর্ণধার' বলে মরণকে অভিহিত করে তারই তরণী এনে তাঁকে এই ভঙ্গুর পৃথিবী থেকে উদ্ধার করতে বলছেন। এই পৃথিবীর পঙ্কিল-জীবন তাঁর দুর্বহ বলে মনে হচ্ছে, তিনি নূতন কোন অনামী-রাজ্যে যেতে চান—হোক সে স্বর্গ, হোক সে নরক। কবির পৃথিবী-ত্যাগের তীব্র বাসনা তাঁর 'Le Voyage' কবিতায় ফুটে উঠেছে আবেগপূর্ণ ভাষায়।

কবি বলেছেন:

"মম অন্তর-নরকের মাঝে দাবাগ্নিসম
লেলিহান শিখা জ্বলে!"

সেই শিখায় এই পৃথিবীর একটি বিচিত্র নূতন রূপ যেন প্রতিভাত হচ্ছে।

জীবন-যুদ্ধে পরাজিত, লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত দুঃস্থজনের প্রতি তাঁর অসীম সহানুভূতি ছিল। যে কুটিল নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য নাগপাশ তাদের নিষ্পিষ্ট করছে, যে অদৃষ্ট তাদের নিয়ে খেলা করছে, তার প্রতি কবি বোদেলের-এর একটা সুতীব্র ঘৃণা ও আক্রোশ ছিল। ভাগ্যহীন, বঞ্চিতদের প্রতি তাঁর সেই সহানুভূতি নিম্নের কবিতাটিতে রূপকের সাহায্যে ব্যক্ত হয়েছে:

"—ভাগ্যবতীর সন্তান! ওগো, আরামে খাদ্য গ্রহণ কর,
তোমার ভাগ্যে দয়ালু বিধাতা অনেক দ্রব্য করেছে জড়।
—ভাগ্যহীনার সন্তান! ওরে তোর লাগি শুধু ধূলির তল,
কর্দমভরা পথের উপরে হামাগুড়ি দিয়া হাঁটিয়া চল্।

—ভাগ্যবতীর হে সুখী পুত্র! অর্চনা কর নিষ্ঠাভরে,
পূজায় তুষ্ট গ্রহরাজি তাই বিরচে প্রভাব তোমার তরে!
—ভাগ্যহীনার দুঃখীতনয়! তোমার এমন দারুণ দুখ
শেষ নাহি আর হবে এ জীবনে? কেবলি ক্লেশেতে ভাঙিবে বুক।

– ভাগ্যবতীর দুলাল ! ভাগ্য পাখা মেলে তব আসিছে উড়ে,
তব সামগ্রী, ধনরাজি সব রাশি রাশি আছে নগর জুড়ে।
– দুখিনী মেয়ের দুঃখীতনয় ! দারুণ-ক্ষুধায় দুপুর ভোর
অগ্নি জ্বলিছে উদরে, যেন রে কুকুর ছিঁড়িছে অন্ত্র তোর।

– রাণীর তনয় ! স্নেহের দুলাল ! তুমি কত সুখ-স্বস্তি পাও,
পরিতোষভরে রাজার কক্ষে সহাস্যমুখে নিদ্রা যাও।
– ভাগ্যহীনার কাঙাল বাছা রে ! তুমি নিতান্ত শিশুর প্রায়,
শীতের রাত্রে, বরিষায় তবু বনে বনে ঘুরে কাঁদিছ হায়।"

কিন্তু এ কি। অবস্থার এ কি পরিবর্তন হ'ল। এর পরে কবি বলছেন :

"– রাণীর দুলাল হে পুত্র ! একি আছাড়িয়া তুমি ধূলায় পড়।
রুক্ষ-শুষ্ক ভূমি শেষকালে রক্ত দিয়াই পুষ্ট কর।
ভাগ্যহীনার দুঃখীতনয় ! আপনার কাজে নিরত থাক,
পরিশ্রমেতে ব্যস্ত থাকিয়া সকল কর্মে দখল রাখ।

ভাগ্যবতীর সুখী সন্তান ! তোমার ভাগ্যে পড়িছে বাজ,
শূকর-হন্তা বর্শার ঘায়ে তরবারি তব ভেঙেছে আজ।
ভাগ্যহীনার কর্মী তনয় ! আজিকে স্বর্গ দখল কর,
বিমুখ বিধির ফিরাও বিধান, গ্রহের প্রভাব সকল হর।"

পৃথিবীতে প্রতিদিনই আমরা সন্ধ্যা দেখে থাকি, কিন্তু কবি প্রতিদিনের পরিচিত এই সন্ধ্যার মধ্যে রহস্যময় সুর ফুটিয়ে তুলেছেন। মৃত্যুকে তিনি প্রেয়সীর মত দেখতেন, তাই জীবন-সায়াহ্নে তাকে বন্দনা করে বলেছেন :

"অপার আঁধার অন্তসদনে নাহি যেন হায় বাঁচার আশ,
পৃথিবীর মাঝে বিলীন এখন শেষ আলোকের আভাস তায় ;
শোণিত-সাগর-মাঝারে মগ্ন সূর্য ডুবিল আপনি হায়,
জয়াল তোমার স্মৃতিটি এখন হৃদয়ে জ্বলিছে পড়িছে শ্বাস।"

এই 'সন্ধ্যার সুরে'র (Harmonie du soir) মূর্চ্ছনায় সমস্ত অন্তর উদাস করে দেয়। কবি মোটেই বস্তুতান্ত্রিক নন, তিনি আমাদের আর একটি জগতের সন্ধান দিয়েছেন, পৃথিবীর পরম সত্যটি আমাদের চোখের সামনে অভিনব ভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি ব্যবহার করেছেন কতকগুলি বিশেষ ধরণের Symbol বা প্রতীক্ যা পীড়াদায়ক, মর্মান্তিক। কেবলমাত্র এইখানেই অন্যান্য কবির সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। যে সাধনার বলে অমঙ্গল বিশ্বরূপ ধারণ করে তাই হচ্ছে বোদেলের-এর কাব্যের ভিত্তি। যা চিন্তার উর্ধ্বে, ভাবনার অতীত, এমন অনন্তের ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন এবং স্থূল জগৎকে অতিক্রম করিয়ে আমাদের আর একটা অদৃশ্য সূক্ষ্ম জগতে নিয়ে গিয়েছেন তাঁর কবিতার যাদুমন্ত্রে। তমসাচ্ছন্ন অন্ধ নিশার পরেই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন "L'Aube Spirituelle" বা 'অধ্যাত্ম-উষা'। তিনি বলেছেন :

"Envole—toi bieu loin de ces miasmes marbides
Va te purifier dans l'air superieur,
Et bois, Comme Une pure et divine liqueur,
Le feu clair qui remplit les espaces limpides."

অর্থাৎ,

বিপুল নিয়ে থাকুক পড়িয়া পৃথিবীর বিষবাষ্পগ্লানি
সান্দ্র-সমীরে আপনারে প্রাণ, আজিকে করো গো প্রস্ফুটিত,
পবিত্র শ্বেত-অগ্নির সম স্বর্গীয় সুধা অকুণ্ঠিত
পান করো আজি, স্বচ্ছ আকাশে যার ধারা জাগে দীপ্তি দানি।"

তাই তিনি এ পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে অনেক উপরে উঠে যেতে চান।

"সূর্যশশীর ছাড়ায়ে সীমানা, আলোকিত ছায়াপথেতে রমি,
নভ-সীমাপারে প্রভাসিত যেথা উজ্জ্বল আলো কোটি তারার,
আত্মা আমার। যাও গো সেথায়।"...

কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন পৃথিবীকে ছাড়িয়ে সুদূর উর্ধ্বে উঠতে উঠতে কবি অপূর্ব ভাষায় তাঁর অভীপ্সা ফুটিয়ে তুলেছেন ; শেষকালে অসীম শূন্যে ভেসে গিয়ে কবি বোদেলের তাঁর শেষ কথা বলেছেন :

"Celui dont les pensers, Comme des alouettes,
Vers les Cieux le matin prennent Un libre essor,
Qui plane sur la Vie et comprend sans effort
Le langage des fleurs et des choses muettes !"

অর্থাৎ,

অবারিত যার চিন্তার ধারা বিমুক্ত কোন পাখার প্রায়
নিত্য অসীম-অম্বরের পানে উধাও ধায় যে প্রভাতী-গানে,
অমরার প্রতি সকরি প্রাণ প্রমুক্ত সে যে,—সহজে জানে
পুষ্পের বুকে কোন্ ভাষা জাগে ঝঙ্কার তোলে মৌন হায়।

মুটে

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

ঘরের গাড়ীর কল বিগড়াইয়াছে, ট্যাক্সির নাগাল পাওয়া যায় না, অথচ মোটা টাকার জরুরি কাজ—নির্দিষ্ট সময়ে সাহেবের সহিত দেখা না করিলেই নয়। সামান্য দেরী হইলেই, সম্বোধন মিষ্টার হইতে বাবুর ধাপে নামাইয়া ফেলিবে, তাহা হইলেই তো কারবার ফাঁস।

বেলা তখন তিনটার কাছাকাছি। গ্রীষ্মকালের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। মাথায় জ্বলন্ত আগুন লইয়াই রাস্তায় নামিয়া পড়িলাম।

হন্তদন্ত হইয়া চলিয়াছি। যার তার সহিত ধাক্কা লাগিয়া যাইতেছে। মন অশুভচিন্তায় ভরিয়া উঠিতেছে। তথাপি গতি থামাই নাই।

অকস্মাৎ পিছন হইতে ধাক্কা খাইলাম। টাল সামলাইতে না পারিয়া টাট্‌কা নরম গোবরের উপর পড়িয়া গেলাম—যাহাকে বলে নাকানিচোবানি খাওয়া হইয়া গেল। এঃ, কলার নেকটাই, কোট গোবরে একেবারে ছয়লাপ হইয়া গিয়াছে। মোটা টাকা লোকসান হইয়া গেল, সাহেবের সহিত আর দেখা করা চলিবে না।

যাহার ধাক্কায় পড়িয়া গেলাম সে-ই দেখি আমাকে ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে, তৎসহিত অনুতাপের বাঁধিবোল আওড়াইয়া চলিয়াছে। লোকটা ডাহা ছোটলোক, জাত মুটে। চেহারা দেখিলেই নিঃসন্দেহ হইতে হয়, দুষ্কর্ম্ম করিয়াই বয়স বাড়াইয়াছে।

মুনাফার দফা শেষ তো হইলই, অধিকন্তু 'জুতা মারিয়া গরু দানের দরদ' প্রদর্শনে 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা'র মত অন্তরে জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলাম। বৃদ্ধের ঠিক পিছনেই একটি সাজোয়ান পুরুষ মোট মাথায় আমার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে।

বৃদ্ধ তখনও আমাকে তুলিবার চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করিয়াও সোজা দাঁড় করাইতে পারিতেছে না—আমারও চেষ্টার অন্ত নাই। দেহের বেশীর ভাগ ওজন সামনে ঝুঁকিয়া থাকায় উভয়ের মিলিত চেষ্টা বিফল হইয়া যাইতেছে। মুখের সামনেই গোবরগাদা, দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছে। সম্ভ্রান্ত ভদ্রজনের এইরূপ অবস্থা দেখিলে যে-কোন মানুষের সহানুভূতি আসিয়া থাকে কিন্তু ছোকরার অগ্রসর হইয়া আসিবার কোনরূপ চেষ্টা নাই, বরং সহযোগীর বিফলতায় যেন উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। ছোকরাই যে সামনে পিচ্ছিল গোবর দেখিয়া অগ্রগামী বুড়াকে আমার উপর ঠেলিয়া দিয়াছিল তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

যুক্তি খুবই সঙ্গত, কারণ অহিংসায় বৃদ্ধ মজা দেখার জন্য ভদ্রলোককে অযথা আছাড় খাওয়াইবার সাহস পাইবে না।

বহুকষ্টে নিজের চেষ্টাতেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি। দুরবস্থার কারণও নির্ভুলরূপে বোধগম্য হইয়াছে। পাজীটার পা-ঝাড়ার দিকে কটমট করিয়া তাকাইলাম। সে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, তদুপরি অপলক দৃষ্টি দ্বারা আমার কঠোর চাহনিকেই অগ্রাহ্য করিবার প্রয়াস দেখাইল। সোজা কথায় সং সাজাইয়া মজা দেখার সময়টা বাড়াইয়া লইতেছিল।

দুষ্কর্ম্মের পর অপরাধ স্বীকার তো দূরের কথা—মজা মারিবার জন্য চুপচাপ দাঁড়াইয়া আছে। এইরূপ ধৃষ্টতা উচ্চ শ্রেণীর মানুষ সহ্য করিলে উচ্ছৃংখলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ডিসিপ্লিন জ্ঞান আমাকে আত্মহারা করিয়া তুলিল। তখন আমার নৈতিক শক্তি লোকটার শারীরিক শক্তি অপেক্ষা বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছে। কালবিলম্ব না করিয়া লোকটার মুখে বিরাশী শিক্কার ওজনে চড় কসাইয়া দিলাম।

চপেটাঘাতের ঝাঁকুনিতে তাহার মাথার মোট মাটিতে পড়িয়া গেল। লোকটা নিজেও প্রায় পড়িতেছিল, কিন্তু কেমন করিয়া টাল সামলাইয়া লইল। তাহার পর 'যুদ্ধং দেহি' ভাবে পালোয়ানের মত হাতের উপর হাত রাখিয়া সোজা দাঁড়াইয়া রহিল। মোট মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছে, তুলিল না, কিংবা একটা কথাও বলিল না।

দেখিলাম চপেটাঘাতে তাহার ঠোঁট কাটিয়া গিয়াছে। রক্তাক্ত ওষ্ঠ দুইটি দারুণ ভাবে স্পন্দিত হইতেছে এবং পূর্ব্ববৎ একদৃষ্টে আমার দিকেই তাকাইয়া আছে। সে চাহনি অদ্ভুত ও অসহনীয়, চোখের পাতা পড়ে না, যেন পালিশ করা মারবেলের গোলা হইতে দৃষ্টি বাহির হইয়া আসিতেছে।

কলিকাতা শহরে, বড় রাস্তার উপর, আমার মত সুসজ্জিত স্ফীতকায় ভদ্র ব্যক্তি গোবরগাদায় নাকানিচোবানি খাইলে একটি মজার দৃশ্য হইয়া দাঁড়ায় বটে।

দেখিতে দেখিতে ঘটনাস্থলটি লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। কুতূহলী দর্শকের ভিতর এক দল আমার দুরবস্থার কারণ অনুসন্ধানে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে, অপর দল ছোকরার রক্তাক্ত ওষ্ঠ দেখিয়া নানা প্রশ্ন সুরু করিয়া দিয়াছে, কিন্তু ছোকরা নির্ব্বাক ও অচল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মাঝে মাঝে কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু শব্দ বাহির হইতেছে না। মনে হইল উহা বোবা সাজিয়া দয়া নিংড়াইবার একটি চেষ্টা। খেই না থাকিলে কেলেঙ্কারী রসহীন হইয়া যায়। লোকগুলি

প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া বেশীর ভাগই আমার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়া উঠিতেছিল।

এরূপ ক্ষেত্রে বিচার ও শাস্তির যোগাযোগ অচিরাৎ ঘটিয়া থাকে। আমার একজন দরদী চকিতে ছোকরার পিছনে গিয়া একটি মনোমত চাঁটি কসাইয়া সরিয়া পড়িল। সঙ্গে আর দুই-এক জন যে যেদিক হইতে সুবিধা পাইল দুই-এক ঘা বসাইয়া দিল।

বৃদ্ধ অধীর হইয়া পড়িয়াছে। আকুলি-বিকুলি করিয়া যাহাকে পাইতেছে তাহাকেই বলিতেছে, মেরো না মেরো না ও ধাক্কা দেয় নি।

দলবদ্ধ হইয়া মাত্র একটি মানুষকে পিটাইবার প্রলোভন পরিহার করিতে পারে কয় জন? আমারই পুনরায় হাত নিশ পিশ করিতেছিল। কিন্তু ভিড় ঠেলিয়া তাহার নিকটবর্ত্তী হইবার সুবিধা ছিল না, তদুপরি পথচলা ও আঘাতের ধকলে বেশ কাবু হইয়া পড়িয়াছিলাম।

তখন চাঁদার মার উচ্চাঙ্গের আর্টের স্তরে উঠিয়া পড়িয়াছে। আত্মপ্রকাশের সহিত আত্মগোপনের এমন দৃষ্টান্ত শ্রেষ্ঠ শিল্পীরাও দেখাইতে পারেন কিনা সন্দেহ। অর্থাৎ যে মার খায় সে মরে কিংবা আধমরা হয় এবং যে মার দেয় সে ধরা পড়ে না। চোরাই চালে ঠ্যাঙানি দিবার রসভোগে যাহারা একবার মজিয়াছে—তাহাদিগকে সুযোগটি নেশার মত পাইয়া বসে। সুতরাং বৃদ্ধের কাকুতিমিনতির কোন ফল হইল না—সকলেই বুঝিল বেকসুর খালাস পাইবার উহা একটি প্যাচ।

আশ্চর্য্যের ব্যাপার—কীল চড় অনবরত পড়িতেছে, কিন্তু ছোকরা নির্ব্বিকার চিত্তে সবকিছুই হজম করিয়া ফেলিতেছে, প্রতিবাদ বা আত্মরক্ষার কিছুমাত্র চেষ্টা নাই। তাহার বলিষ্ঠ দেহকে পাথরের মত কঠিন ও অচল করিয়া রাখিয়াছে এবং কঠোর ভঙ্গীতে আমাকে দেখিতেছে। তাহার কুটিল দৃষ্টিতে কেমন অবজ্ঞার আভাস পাইতেছিলাম।

একটা মুটিয়া ঐ ভাবে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিলে কতক্ষণ সহ্য করা যায়। ভাবিলাম উপযুক্ত শাস্তি সে এখনও পায় নাই। চাঁদার বেহিসাবী চড়ে ঠিকমত ওজন পড়িতেছে না। কি ভাবে ছোটলোকের উপর চড় কসাইতে হয় দেখাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। ক্ষণিকের মধ্যে সিদ্ধান্ত দৃঢ় হইয়া উঠিল, হুঙ্কার দিয়া পাব্লিক পাকাড়ার দিকে অগ্রসর হইতে যাইব এমন সময় বৃদ্ধ করজোড়ে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং জলভরাক্রান্ত চোখে বলিয়া চলিল, "বাবু অন্ধ ছেলেটাকে বাঁচাও, ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই, দোহাই-বাবু সত্যি বলছি, পা পিছলে আমিই তোমার উপর পড়ে গিয়েছিলাম, ও ধাক্কা মারে নি।"

সম্বোধন শুনিয়া পিত্তশুদ্ধ জ্বলিয়া উঠিল। খাস র‍্যাঙ্কিনের বাড়ীর সাহেবী পোশাক দেখিয়া সম্ভ্রম করা তো দূরের কথা।

"বাবু" বলিয়া কথা আরম্ভ করিয়াছে। গালাগালির আর বাকি রহিল কি? তাহার উপর ছেলেটার তরফে ওকালতির কি অপূর্ব্ব কৌশল! চট করিয়া একটি গল্পই তৈয়ারী করিয়া ফেলিল, বলে কিনা "ও ধাক্কা মারে নি"। ষণ্ডামার্কের মত চেহারা, অমন কটমট করিয়া তাকাইয়া আছে, সেই হইল অন্ধ। ছলনা বটে। ওকালতির প্যাঁচ দেখিয়া বৃদ্ধকেই মার দিবার ইচ্ছা হইতেছিল কিন্তু হঠাৎ বিপদের সঙ্কেত শুনিয়া সংযত হইলাম।

কে একজন গলা চড়াইয়া নেপথ্যে বলিতেছিল, "লাগাও শালা বাঙালী সাহেবকে, পোশাক পরেছে দেখ না, যেন লাট-সাহেব।"

আমি শহরের পুরাতন বাসিন্দা। অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিলাম, ইহারই ভিতর খানাতল্লাসি করিবার উদ্দেশ্যে একটি প্রতিকূল দল গড়িয়া উঠিয়াছে—চাঁদার মারের মোড় ঘুরিবার লক্ষণ সুস্পষ্ট। বিচার বটে! আসল বদমায়েসকে ছাড়িয়া নিরীহ ব্যক্তিকে লইয়া টানাটানি, নির্ব্বিচারে একজনকে অপরাধী করিতে পারিলেই হইল।

আর্টের কেরামতির সহিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার প্রস্তাব সুবিধার ঠেকিতেছিল না। নখী, শৃঙ্গী ইত্যাদির সহিত ছোটলোকদেরও বিশ্বাস নাই। আত্মরক্ষার জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলাম।

বাঙালী সাহেবের নাম উঠিতেই দেখি কয়েকজন মাথা উঁচু করিয়া আমাকেই খুঁজিতেছে। প্রমাদ গণিলাম, আস্ত-ভেতো বাঙালীকে অযথা সাহেব বলিয়া সনাক্ত করিয়া ফেলিলেই তো চমৎকার—গোটা দেহে আর বাড়ী ফিরিতে হইবে না।

লোকেদের উত্তেজনা ক্রমান্বয় বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাহাদের উগ্রবৃত্তির সহিত মাখামাখি করিবার প্রবৃত্তি ছিল না।

ভিড়ের বাহিরে ইচ্ছা করিলেই আসিবার উপায় নাই, ব্যূহের ভিতর আটকা পড়িয়া গিয়াছি। রক্ষা এই যাহাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিলাম তাহাদের সপক্ষীয় বলিয়াই মনে হইতেছিল, তবু বাজে লোকদের বিশ্বাস নাই। কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় পুনরায় আত্মীয়তার দাবি শুনিলাম, খোঁজার তাগিদও বাড়িয়া উঠিল। উত্তেজিত জনতার নড়া-চড়ায় আমি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির আড়ালে পড়িয়া গেলাম। সুবিধাটি কাজে লাগিয়া গেল। ক্ষিপ্রতাসহ ভিড়ের আড়ালে গা ঢাকা দিলাম।

ঘটনাস্থল হইতে বেশ খানিকটা দূরে আসিয়া পড়ায় ধড়ে প্রাণ আসিল। তখনও শুনিতে পাইতেছি বৃদ্ধ তারস্বরে চিৎকার করিয়া বলিতেছে—"ওকে মেরো না, মেরো না, ও ধাক্কা মারে নি।"

বৃক্ষরোপণ—ইজরাইলের পুনর্জন্ম

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

গত জুলাই মাসে (আষাঢ়-শ্রাবণ) সমগ্র ভারতরাষ্ট্রে মহাসমারোহে বৃক্ষরোপণ-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি ও খাদ্য সচিব মাননীয় শ্রীযুত কে. এম্. মুন্সী বলিয়াছেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষে তিন কোটি নূতন বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে; ঠিক সংখ্যা মনে পড়িতেছে না।

এই বৃক্ষরোপণ-উৎসবের পশ্চাতে ঠিক কি কি উদ্দেশ্য ছিল জানি না; এবং প্রত্যেক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কি কি পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধেও বিশেষ কোন জ্ঞান নাই। প্রত্যেক পরিকল্পনা কতদূর কার্য্যকরী হইয়াছে তাহাও বলিতে পারি না। তবে দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, সংবাদপত্রসমূহেও পড়িয়াছি মন্ত্রী মহোদয়গণ ছুটাছুটি করিয়া এখানে সেখানে এলোমেলো ভাবে গোটাকতক বৃক্ষের চারা নিজ হস্তে রোপণ করিয়াছেন; সরকারী বেসরকারী উদ্যানসমূহেও কয়েকটা করিয়া বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে। ইহাতে প্রদেশপালও যোগদান করিয়াছিলেন। বড় বড় রাস্তার ধারেও সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্ত্তৃক নূতন নূতন বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে। সাধারণ মানুষেরাও তাঁহাদের বাগান-বাগিচায় বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন।

বৃক্ষরোপণের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি বোধ হয় এই:

(১) বৃক্ষহীন অঞ্চলে অরণ্যের সৃষ্টি করিয়া বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বর্দ্ধিত করা।

(২) জমির ক্ষয় নিবারণ করা।

(৩) জলের সরবরাহ বাড়ানো।

(৪) জালানী কাঠের সুব্যবস্থা করা।

(৫) গৃহ নির্ম্মাণ, আসবাবপত্র, নৌকা, যানবাহন প্রভৃতির উপযোগী কাঠের সরবরাহ বর্দ্ধিত করা।

(৬) নয়নের শোভাবর্দ্ধক বৃক্ষাদি রোপণ, ইহা ছাড়া অন্যান্য উদ্দেশ্যও আছে।

সেদিন এক বন্ধু কথা-প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বাড়ীর সম্মুখে 'দেশবন্ধু' পার্কে যে ২০।২৫টা গাছ লাগানো হইয়াছে ইহার পশ্চাতে কি উদ্দেশ্য আছে", বন্ধুর প্রশ্নের সঠিক কোন উত্তর দিতে পারি নাই।

যাহা হউক, বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য প্রয়োজনমত বৃক্ষরোপণের একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করা বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনারও প্রয়োজন। সম্বদ্ধ ভাবে পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্যে অগ্রসর হইলেই সন্তোষজনক ফল আশা করা যায়। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, পূর্ব্বে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করা হয় নাই, এবং যে সকল পরিকল্পনা বর্ত্তমানে গৃহীত হইয়াছে তাহাদিগকেও কার্য্যকরী করিবার জন্য তেমন কোন স্থায়ী প্রয়াস হয় নাই। এমন অনেক উদাহরণ আছে যেখানে কোন পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ করিয়া উহা অল্পকালের মধ্যেই পরিত্যাগ করা হইয়াছে; অর্থাৎ Continuity (ধারাবাহিকতা) রক্ষিত হয় নাই।

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের *Farmers' Digest*-এ প্রকাশিত "The Rebirth of Israel" (ইজরাইলের পুনর্জন্ম) শীর্ষক প্রবন্ধে জেরুজালেমের বৃক্ষরোপণের একটি সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর বিবরণ আছে।

টেল এভিভ হইতে জেরুজালেম ৩৫ মাইল পথ; শুষ্ক আবহাওয়ার সময়ে অর্থাৎ বৃষ্টিহীন এপ্রিল মাস হইতে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই রাস্তার দুই পার্শ্বের অধিকাংশ অঞ্চলই উত্তপ্ত অবস্থায় থাকে। ঐ সকল স্থান পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা বিশেষ আনন্দদায়কও নহে। এই সকল অঞ্চলে বৃক্ষ নাই বলিলেই চলে, এমন কি কর্ষিত কৃষিক্ষেত্রও নাই। ভ্রমণকারীর মনে হইবে, বাইবেলের বর্ণনা—"জমিতে দুগ্ধ এবং মধুর প্রবাহ চলিতেছে" কবির কল্পনা মাত্র। তাঁহার চোখে কেবলই পড়িবে বৃক্ষহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত, প্রচণ্ড রৌদ্রদগ্ধ মাঠের পর মাঠ, প্রস্তর, শিলা প্রভৃতি। কেবল মার্চ্চ মাসে এই দৃশ্যের পরিবর্ত্তন ঘটে; তখন নানারকম বন্য ফুলে এই অঞ্চলের শোভা কতকটা বর্দ্ধিত হয়।

অবশেষে জেরুজালেমের ১২ মাইল পূর্ব্বের অঞ্চলে পৌঁছিলে ভ্রমণকারী অন্য দৃশ্য দেখিতে পাইবেন; পাহাড় পর্ব্বত আছে বটে, কিন্তু তাহারা শুষ্ক, নীরস এবং তৃণহীন নহে; প্রচুর সবুজ গাছে পরিপূর্ণ। একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, সেই সকল বৃক্ষরাজি এলোমেলো ও স্বাভাবিক ভাবে জন্মে নাই। ইহাদের পশ্চাতে আছে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা; এবং এই সকল গাছের মধ্যে প্রধান হইতেছে "এলেপো পাইন"। পাহাড়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে রোপিত হাজার হাজার 'এলেপো পাইনের' চারা দেখিতে পাওয়া যাইবে। যতই অগ্রসর হওয়া যাইবে ততই অধিকতর সুপরিকল্পিত প্রণালী অনুসারে পাহাড়ে বৃক্ষ রোপণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহা নূতন অরণ্যানীর সৃষ্টি। জেরুজালেমে প্রবেশ করিলে মনে এক অদ্ভুত আনন্দের ধারা বহিয়া যাইবে; সেই দেশের লোকেরা ২,৫৯৩ ফুট উচ্চ পাহাড়ের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিবার এবং জমিকে পুনঃস্থাপন ও পুনর্জীবিত করিবার জন্য কি প্রয়াস করিয়াছে তাহা ভাবিলে মন বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া যাইবে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন ভূমিহীন এক দল লোক তাহাদের বৃক্ষহীন পুরাতন দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল তখন একজন খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজক টেল এভিভ হইতে আসিবার সময় দেখিতে পাইলেন যে, ছোট ছোট পাহাড়ের যে অল্প পরিমাণ জমি আছে তাহাতে অগ্রগামী ইহুদীগণ অতি যত্নপূর্ব্বক বৃক্ষের চারা রোপণ করিতেছেন। একজন ইহুদীকে তিনি বলিলেন, "এই সকল পাহাড়ে পুনরায় অরণ্য স্থাপন করিতে এক শতাব্দী লাগিবে।" ইহুদী উত্তর দিলেন, "এক জন ইহুদীর কাছে এক শতাব্দী কিছুই নহে।" এই বলিয়া তিনি বৃক্ষরোপণের প্রতি মনোযোগ দিলেন। ইহুদীর এই অল্প কথার মধ্যেই ইহুদীদের অরণ্য স্থাপনের গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে; এবং এই কথা হইতেই তাহাদের সুচিন্তিত পরিকল্পনার আভাস পাওয়া যায়। কারণ তাহারা অনবরত ভবিষ্যতের জন্ত পরিকল্পনা করিতেছে এবং সেই অনুসারে বৃক্ষ রোপণ করিতেছে। এ ক্ষেত্রে তাহাদের বিরাম নাই।

ইজরাইলের অরণ্য স্থাপন একটি আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা। ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেটরি গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্যে যোগদান করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহুদীগণের নিজেদের চেষ্টাই এই কার্য্যের সফলতার প্রধান কারণ। তাহারা একটি 'তহবিলের' সৃষ্টি করিয়াছিল; ইহার নাম 'ইহুদীগণের জাতীয় তহবিল' (The Jewish National Fund) এই প্রতিষ্ঠান বৃক্ষ রোপণের উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করে। সারা পৃথিবীর ইহুদীগণ এই তহবিলে অর্থ সাহায্য করে।

প্রিয়জনের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে বা বার্ষিক উৎসবকে মনে জাগরূক রাখিবার অভিপ্রায়ে তথায় কুঞ্জ বা উপবন স্থাপন করা হয়। ইজরাইলের বা অন্যান্ত দেশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সম্মানার্থে প্রস্তরাদি নির্ম্মিত মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে বৃক্ষ রোপণ করা হয়। এমেক ভ্যালির 'বালফুর ফরেষ্ট' ইহার একটি উদাহরণ।

কেবল অরণ্যের বৃক্ষই রোপণ করা হয় না। জেরুজালেমের সন্নিকটে পাহাড়ের পাশে বা উপরে কৃষি উপনিবেশ স্থাপন করা হইয়াছে। এই সকল উপনিবেশে সমবায়-প্রথার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। সমবায় প্রণালীতে নানাবিধ কৃষিকার্য্য চলিতেছে। পশুপালন, শাকসব্জী, ফুল উৎপাদন ব্যতীত ফলের বাগান এবং ফলজাত শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। দুর্গম পাহাড় কাটিয়া আপেল, পিয়ারা, পীচ, কুল, আঙ্গুর প্রভৃতি ফলের চাষ হইতেছে। জেরুজালেমের জলের কল হইতে পাইপের দ্বারা জল আনিয়া অরণ্যের বৃক্ষসমূহে এবং ফলের বাগানে জল সেচন করা হয়।

স্থায়ী বসবাসের জন্ত ইহুদীদিগের প্যালেষ্টাইনে আগমনে জমির প্রতি স্থানীয় অধিবাসীগণের মনোভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অধিকতর প্রগতিশীল আরবগণ তাহাদের নূতন প্রতিবেশীদের নিকট হইতে অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। নীচু জলাজমি হইতে জল নিষ্কাশন করিয়া ইহুদীগণ ম্যালেরিয়ার মশা দূর করিয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়া হইতে 'ইউক্যালিপটাস' গাছ আমদানী করিয়া নিম্ন জমিতে রোপণ করিয়াছিল; এই সকল গাছ জলাজমির জল শোষণ করিয়া লয়। 'ইউক্যালিপটাস' গাছ খুব দ্রুত গতিতে বর্দ্ধিত হয়; ইহার মধ্যভাগের গুঁড়ি যখন কাটিয়া দেওয়া হয় উহার চারিধার হইতে সবল কিশলয় (sprouts) বাহির হয়, এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে উহারা বর্দ্ধিত হইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণের এবং আসবাবপত্র প্রস্তুতের উপযোগী কাঠ সরবরাহ করে। ইহা হইতে জ্বালানীর কাঠও পাওয়া যায়।

অনুর্ব্বর ভূমিতে বৃক্ষ-উৎপাদনের দৃশ্য

মেডিটারেনিয়াম নদীর তীরবর্ত্তী অঞ্চলে অরণ্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে লেবুজাতীয় গাছের কুঞ্জ প্রস্তুত করা হয়। ইজরাইলের লেবুজাতীয় ফল গুণের জন্ত বিখ্যাত। ইংলণ্ড ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াম দেশসমূহ ইহার প্রধান ক্রেতা। স্থানীয় বাজারে টাট্কা ফলই বিক্রীত হয়। ইহা হইতে ফলের রস ও সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত হয়। খোসা গরুকে খাওয়ানো হয়; কারণ ইহার ফলে জমিতে কিছু পরিমাণ জৈব সার সঞ্চিত হইবে। লেবুজাতীয় ফলের কুঞ্জের চারিধারে দীর্ঘ 'সাইপ্রাস' গাছ লাগানো হয়; ইহার দ্বারা প্রবল বাতাসের ফলে লেবুজাতীয় ফলের কোন ক্ষতি হয় না।

উত্তরে অনুকূল জমিতে ও আবহাওয়ায় কলা, ডুমুর জাতীয় এবং খেজুর জাতীয় ফল উৎপাদন করা হয়। জেরুজালেম, হাইফা, টেল এভিভ এবং ইজরাইলের ছোট ছোট শহরে যাইলে ইহুদীগণের গাছের প্রতি অনুরাগের অধিকতর পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক বাড়ীতেই উদ্যান আছে। টেল

এভিভের রাস্তার দুই ধারে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষসমূহ পথচারীর আনন্দ বর্দ্ধন করে এবং উহাকে ছায়া দান করে। একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে যেখানে বর্ত্তমানে তিন লক্ষ অধিবাসীর বাস, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সেই অঞ্চলে একটি গৃহ বা একটি গাছও ছিল না; ঐ অঞ্চল সম্পূর্ণ বালুকাময় ছিল।

আরবদের সহিত যুদ্ধ শেষ হইবার এক মাস পরে ইহুদীগণ "আরবার ডে" পালন করেন। এই দিন ইহুদীগণের পুরুষ, স্ত্রী, বালক বালিকাগণ গ্যালিলিয়ান পাহাড়ের উপর যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার এক স্থানে সমবেতভাবে "এলোপো পাইন" গাছের কুঞ্জরচনা করে। ইজরাইলে "আরবার ডে" একটি জাতীয় উৎসব। বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ থাকে; ছাত্রছাত্রীগণ বৃক্ষ রোপণ করে; বয়স্কগণও ইহাতে সাহায্য করে। ইহার ফলে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ নূতন গাছ রোপিত হয়। এই সকল নূতন গাছের পরিচর্য্যা ও তত্ত্বাবধানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। প্রতি গাছের জন্ত গড়পড়তা দেড় ডলার খরচ ধার্য্য করা হয়। পৃথিবীর সকল অংশ হইতে এই কাজের জন্ত অর্থ সাহায্য প্রচুর পরিমাণে আসিতেছে। পবিত্র স্থানকে (Holy Land) পুনরায় সবুজ করাই সকলের উদ্দেশ্ত।

ইহুদীগণ যখন তাঁহাদের নিজ 'বাসভূমে' প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন তখন হইতেই তাঁহারা প্যালেষ্টাইনকে 'শস্য-শ্যামলা' করিবার চেষ্টা করিতেছেন; তথাকার আবহাওয়ার উপযুক্ত বহু রকমের গাছ ফ্রান্স, ক্যালিফর্নিয়া, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী করিয়া নিজের দেশকে শ্রী ও সৌন্দর্য্যে ভরিয়া ফেলিয়াছেন। অনেক কিছু তাঁহারা করিয়াছেন; এবং এখনও অনেক কিছু করিবার আছে। এ বিষয়ে ইহুদীগণের অদম্য উৎসাহ বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণের তুলনায় আমাদের দেশের প্রচেষ্টা ম্লান হইয়া যায়। আমাদের দেশের বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের পশ্চাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাময়িক উত্তেজনা দেখা গিয়াছিল। বিশেষ কোন পরিকল্পনা ছিল না; নূতন রোপিত বৃক্ষসমূহের পরিচর্য্যার কোন ব্যবস্থা হইয়াছিল বলিয়া এখনও শুনা যায় নাই।

বৃক্ষরোপণ উৎসবের সময় কোন কোন অনুষ্ঠানে পশ্চিম বাংলার খাদ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন "পিতৃবন" স্থাপনের উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে কি কি কার্য্যকরী পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে, জনসাধারণের তাহা জানিবার বিশেষ কৌতূহল আছে। তরুলতা-সমন্বিত বাংলার পুনরুজ্জীবনই আমরা দেখিতে চাই। প্যালেষ্টাইনের পরিকল্পনা হইতে আমাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে।

অজানিতা

শ্রীশান্তি পাল

বৃষ্টিধৌত বনান্তের ওই পরপারে
কে গো তুমি অজানিতা ডাক দিয়া মোরে,
ধূপ-ধুনা চন্দনের স্নিগ্ধ গন্ধভারে,
কবিতার কুঞ্জখানি তুলিতেছ ভ'রে ?
ওগো মোর দিশাহীন কল্পনা অসীমা,
ভাবলোক হ'তে এসো বাণী-মূর্ত্তি ধরি ;
অলক্ষিতে বোসো কাছে মানস-প্রতিমা,
কুহরাক্ কাব্য-পিক পঞ্চমে মুখরি।

আর কিছু নাহি চাহি এর চেয়ে বেশি,
ভুবনের মাঝে হেরি যা-কিছু সুন্দর—
তারে যেন ভালবাসি ; তাহারে অন্বেষি'
তারি বৃন্ত রাগে আমি তোমারে অমর
ক'রে যেন যেতে পারি হে দেবি আমার !
শ্লোকছন্দে রচি' সেতু এ-পার ও-পার।

কি বিচিত্র ভাবি এই জীবনের গতি,
তোমার বিরহ মোরে কোথা লয়ে যায় !
বিচ্ছুরিয়া ওঠে যেথা চিরন্তন জ্যোতি
নীল নভস্তলে, কভু শ্যামবনচ্ছায়।
গ্রহ উপগ্রহ তারা অনন্ত আকাশ
গিরি নদী মরু বন সবে মিলি তারা
মোর কাছে কত রূপে হ'তেছে প্রকাশ,
ধ্যান-রাজ্যে পারিজাত,—স্মৃতির ফোয়ারা !

গোধূলি-কুঙ্কুমে ভরি' রবি অস্তে চলে,
ভাঙা চাঁদ ম্লান মেঘে চাহনি উদাস,
সন্ধ্যার অঞ্চল কাঁপে স্থির নদী-জলে,
মল্লিকা-কেয়ার গন্ধে উতলা বাতাস।
ক্ষণতরে বোসো দেবি, অন্তরের তীরে,
শোনাই শেষের গান ভিতি অশ্রুনীরে।

পুরী ও ওয়ালটেয়ারে কয়েক দিন

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

যে দেশের সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে একদা বাংলার এক মহামানব আত্মহারা হয়ে ঝাঁপ দিয়েছিলেন আমরা সেই শ্রীক্ষেত্রের সমুদ্রতটপ্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হলাম। গাড়ীতে করে ছায়ান্ধনিবিড় ঝাউবীথি দিয়ে আমরা বড়দণ্ড অভিমুখে
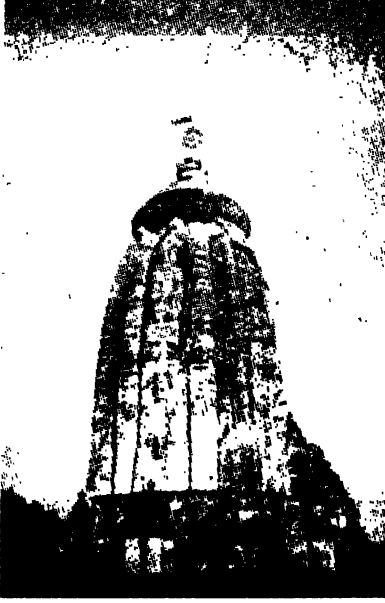
জগন্নাথদেবের মন্দির, পুরী

চলেছি। ব্যাকুল মন বারে বারে প্রশ্ন করছে—শ্রীমন্দির কোথায়? সমুদ্র কত দূরে? এমন সময় বহুদূর থেকে দেখা গেল জগন্নাথদেবের মন্দিরের বিষ্ণুচক্র ও রক্তবর্ণ ধ্বজা-সমন্বিত সুউচ্চ চূড়া প্রভাতের সূর্য্যালোকে ঝলমল করছে। গাড়ী থেকে নেমে গৃহে প্রবেশ করে মালপত্র গোছগাছ করতে লাগলাম। ভাদুড়ী গেলেন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে। ইত্যবসরে মাল নিয়ে উৎকলী মালবাহীদের মধ্যে লেগে গেল তুমুল বচসা। ভাদুড়ী ফিরে এসে অনেক কষ্টে তাদের ঠাণ্ডা করলেন।

আমাদের ঘরখানি ভারি সুন্দর; একেবারে রাস্তার উপর, আর বেশ নির্জ্জন। স্নানাহার সেরে একটু বিশ্রামের আয়োজন করছি এমন সময় সুরু হ'ল পাণ্ডাবাহিনীর আক্রমণ। অবশেষে আমাদের একজন পাণ্ডা ঠিক হ'ল। পাণ্ডাঠাকুর বললে, কাল সে আমাদের মন্দিরে নিয়ে যাবে। কাজেই বিকেলে আমরা বেরিয়ে পড়লাম সমুদ্রের উদ্দেশ্যে। ধীরে ধীরে বহুবিস্তৃত বালুকাবেলা অতিক্রম করে আমরা সেই বিরাটের পদপ্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সমুদ্রের রং ঘন নীল। তার উত্তাল তরঙ্গশীর্ষ ফেনশুভ্র। কোথায় আকাশ আর কোথায় সমুদ্রের শেষ—কূলকিনারা নেই। শুধু এক সুবিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে তরঙ্গায়িত নীল জলরাশি। আমরা অনেকক্ষণ সেই সাগর-তীরে বসে রইলাম।

পরের দিন অতি প্রত্যুষে উঠে আমরা সমুদ্রে সূর্য্যোদয় দেখার জন্ত রওনা হলাম। শেষরাত্রির অন্ধকারাবৃত সম্পূর্ণ অপরিচিত পথ অতিক্রম করে আমরা চলেছি। সাগরতীরে যখন পৌঁছলাম, তখন সবেমাত্র ভোর হচ্ছে। বিস্তীর্ণ বালুকা-বেলা জনহীন নীরব। উত্তাল সিন্ধু প্রবল উচ্ছ্বাসে আকুলি-

জগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বার

বিকুলি করছে। কোন্ ব্যর্থতার গোপন বেদনায় তার এই ক্ষুব্ধ আক্রোশ, কার অসহনীয় বিচ্ছেদে তার এই প্রমত্ত চঞ্চলতা, তা কে জানে? রত্নাকরের অন্তরের তলদেশে কোন্ অব্যক্ত বেদনার প্রচণ্ড দাবানল জ্বলছে তাই বা কে বলতে পারে?

সমুদ্রের বর্ণ তখন ফিকে নীল। নির্নিমেষে তার পানে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ দেখি পূর্ব্বদিগন্ত আরক্তিম হয়ে উঠেছে। প্রতিপলকে বর্ণমাধুরী গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে উঠছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই লাল স্রোতের নীচে নীল সাগরের বক্ষে ফুটে উঠল চমৎকার একটি রক্তপদ্ম। সিন্ধুস্নাত সূর্য্যের হ'ল নবজন্ম লাভ। পূর্ব্বাচলে সূচিত হ'ল নূতন প্রভাত। অপূর্ব্ব অবর্ণনীয় সেই দৃশ্য। যেন সাগরজননী কোলে করে শিশু-সূর্য্যকে ছেড়ে দিয়ে গেলেন, গগন-অঙ্গনে ক্রীড়া করবার জন্ত।

সাগরসৈকত তখন জনসমাগম সুরু হয়ে গেছে। ছন্দা পাপড়ি ঝিনুক কুড়াতে মহাব্যস্ত হয়ে উঠল। বহুক্ষণ পরে সমুদ্র-সৈকত পরিত্যাগ করে আমরা ঘরে ফিরে এলাম।

বিজয়ার দিন সন্ধ্যাবেলা আমরা জগন্নাথদেবের মন্দিরে ঠাকুরের রাজবেশ ও আরতি দেখতে গেলাম। সিংহদ্বারে সেদিন অসম্ভব রকমের ভিড়। সেই প্রশস্ত চৌমাথা রাস্তায় একটি সূচ নির্গত হবারও স্থান নেই। কষ্টে-সৃষ্টে আমরা অরুণ-

লিঙ্গরাজমন্দির, ভুবনেশ্বর

স্তম্ভের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম। মন্দিরের সামনে কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্মিত বাইশ হাত উচ্চ একটি স্তম্ভ আছে, তারই নাম অরুণ-স্তম্ভ। এই স্তম্ভটি পূর্ব্বে কোণার্ক মন্দিরে ছিল। কালাপাহাড়ের অত্যাচারের পরে নাকি পুরীতে এটি স্থানান্তরিত করা হয়েছে। হঠাৎ দেখলাম মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে দুটি সুদৃশ্য চতুর্দ্দোলা বের হয়ে আসছে। তাতে ঠাকুরের শয্যাদ্রব্যাদি বহন করে নগর পরিক্রমণে বেরিয়েছে পাণ্ডামহারাজেরা। উদ্বেল জনতা, সেই ভিড়ের মধ্যে দলিত মথিত হয়ে, চতুর্দ্দোলার একটু স্পর্শলাভ করার জন্য অধীর হয়ে উঠেছে; তাদের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে পূজারীবৃন্দ রক্তনয়নে দাবি করছে দক্ষিণা। চতুর্দ্দোলা বের হয়ে যাবার পর, যাত্রীরা স্রোতের মত মন্দির-অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে লাগল। কিন্তু প্রধান প্রবেশ-পথ হস্তিদ্বার তখন জনস্রোতে রুদ্ধ থাকায় পাণ্ডাঠাকুর এক গুপ্ত পথে আমাদের মন্দির-অভ্যন্তরে নিয়ে এল। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন। চতুর্দ্দিকে শুধু মিটমিট করে জ্বলছে মৃৎপ্রদীপ।

কিন্তু আশ্চর্য্য, আসল মন্দিরে রত্নবেদীতেও জ্বলছে এই ঘৃত-প্রদীপ; কিন্তু এ দীপশিখায় এত ঔজ্জ্বল্য এল কোথা থেকে? রত্নবেদীর উপর দক্ষিণে বলভদ্র, বামে শ্রীকৃষ্ণ ও মধ্যস্থলে সুভদ্রার মূর্তি ও শ্রীকৃষ্ণের পদপ্রান্তে লক্ষ্মীর অতি ক্ষুদ্র এক সুবর্ণ-প্রতিমা স্থাপিত আছে। এখানে ভগবান নাকি দারুব্রহ্ম রূপে বিরাজিত আছেন। দেবমূর্তিগুলিকে সেদিন রাজবেশে সজ্জিত করা হয়েছিল। তাঁদের শ্রীঅঙ্গ মণিমাণিক্যখচিত স্বর্ণালঙ্কারে আবৃত করে দেওয়া হয়েছে। আমার কাছে সবচেয়ে সুন্দর লাগল শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার সুবর্ণমণ্ডিত চরণ-পদ্মগুলি। নিষ্পলক নয়নে সেই দেবমূর্তির পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম; এমন সময় তাগিদ এল ফিরতে হবে। রত্ন-বেদী প্রদক্ষিণ করে, মন্দির থেকে বের হয়ে এলাম।

ব্যাঘ্রগুম্ফা, উদয়গিরি

জগন্নাথদেবের মন্দির-গাত্রের স্থাপত্য-শিল্প সত্যই প্রশংসনীয়। এত অল্প পরিধির মধ্যে এমন মসৃণ প্রস্তরে খোদিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কারুকার্য্য দেখে মনে হয় বাস্তবিক প্রাচীন কালের শিল্পীদের শিল্প-প্রতিভা কত উচ্চাঙ্গেরই না ছিল। তথাকথিত নীতিবোধের মানদণ্ডে তারা শিল্পের মূল্য নির্দ্ধারণ করত না। তাই যদি হ'ত তবে মন্দিরের বহিরঙ্গের কাজ সম্পূর্ণ হবার বহু পূর্ব্বেই রাজরোষে অথবা জনসাধারণের বিক্ষোভে তা ধ্বংস হয়ে যেত। জগন্নাথদেবের প্রধান মন্দিরশীর্ষের উচ্চতা প্রায় ১৯২ ফুট। উৎকলের রাজা গঙ্গপতিবংশীয় অনঙ্গ ভীমদেবের কালে, ১২২৯ শকাব্দে জগন্নাথদেবের প্রধান দেউল নির্ম্মিত হয়। অবশ্য বহু যুগ পূর্ব্বে এই মন্দিরের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠার বিবরণ পাওয়া যায় এবং কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরটি বহু বার বহু রূপে সংস্কৃত হয়েছে। এটির নির্ম্মাণকার্য্যে প্রায় ৩০।৪০ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হয়। মন্দিরের প্রধান দ্বার চারিটি। পূর্ব্বে সিংহদ্বার, উত্তরে হস্তিদ্বার, পশ্চিমে ধ্বজাদ্বার ও দক্ষিণে অশ্ব-দ্বার। এই বিশাল মন্দির-প্রাঙ্গণ বেষ্টনকারী সুবৃহৎ প্রাচীরের

নাম মেঘনাদ। মেঘনাদ-প্রাচীর উচ্চতায় ২৪ ফুট, প্রস্থে ২২ ফুট। পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৬৮৭ ফুট। মন্দিরটি চারি ভাগে বিভক্ত। মূলমন্দির, নাটমন্দির, ভোগমন্দির ও জগমোহনমন্দির। দুইটি বৃহৎ প্রাঙ্গণ—অন্তঃপ্রাঙ্গণ ও বহিঃপ্রাঙ্গণ। সমুদ্রের উত্তর তীরে এই শ্রীমন্দির বিদ্যমান।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্র, শ্রেষ্ঠতম তীর্থক্ষেত্র। জগন্নাথক্ষেত্রে জাতিভেদ-প্রথা নেই। এখানে চণ্ডালের ছোঁয়া অন্ন ব্রাহ্মণে গ্রহণ করলে কোনও দোষ নেই। রথ-যাত্রার সময় স্বয়ং পুরীরাজ চণ্ডালের বেশে সুবর্ণ-নির্ম্মিত সম্মার্জ্জনী দ্বারা যাত্রার সম্মুখস্থ পথ পরিষ্কার করে থাকেন। শিখসম্রাট রণজিৎ সিংহ এই মন্দিরে একটি কোহিনুর দিয়েছিলেন, তার মূল্য তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। সে কোহিনুর বর্ত্তমানে বিলাতের রাজ-ভাণ্ডারে গচ্ছিত আছে।

সতীর একান্ন পীঠের একাংশ নাভিদেশ এই দেউল-প্রাঙ্গণের যে অংশে পতিত হয়েছিল, সেখানে বিমলার মন্দির। জগন্নাথদেবের মন্দিরের উত্তর দিকে বড়-দণ্ডের শেষপ্রান্তে গুণ্ডিচা বা উদ্যান-বাটিকা। একে জগন্নাথদেবের মাসীর বাড়ী বলে। রথযাত্রার সময় ঠাকুর এখানে এসে সাত দিন অবস্থান করেন। আসল মন্দিরের ন্যায় এখানেও ঠাকুরের রত্নবেদী, গরুড়স্তম্ভ, ভোগমন্দির, সাক্ষীগোপাল, মহাপ্রভুর পদচিহ্ন ইত্যাদি বিদ্যমান আছে। গুণ্ডিচাবাড়ীর সন্নিকটে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর। এই সরোবরটি বেশ মনোরম এবং এর মধ্যে অনেক কচ্ছপ আছে। এই সরোবরের তীরে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা এবং রাণীর ও দশাবতারের মূর্ত্তি ও শিবমন্দির আছে। পুরীতে এই রকম আরও তিনটি সরোবর দেখেছি। একটি নরেন্দ্র সরোবর বা চন্দন-পুকুর। দোলযাত্রার সময় এখানে জগন্নাথদেব আসেন। এ ছাড়া আরও কয়েকটি সরোবর আছে। পুরীতে আর একটি দ্রষ্টব্য বস্তু হ'ল সিদ্ধ বকুল। মাত্র একটি বহু পুরাতন ছাদের উপর প্রকাণ্ড এক বকুল গাছ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। স্থানটি বেশ শান্ত ও মনোরম। ঠিক তপোবনের মত।

মহাষ্টমীর দিন ভোরবেলা আমরা ভুবনেশ্বরে এসে পৌঁছলাম। ঠিক হ'ল প্রথমে উদয়গিরি, খণ্ডগিরি হয়ে পরে মন্দিরে যাওয়া হবে। এবার সুরু হ'ল পোশকটে বিচিত্র অভিযান। সুন্দর ভোরবেলাটি আরও সুন্দর হয়ে উঠল এই নির্জ্জন পার্ব্বত্য পথের মনোরম পরিবেশে। ভুবনেশ্বরে যে উড়িষ্যার নূতন রাজধানী তৈরি হচ্ছে, তার চিহ্ন সর্ব্বত্র বিদ্য-মান। গভীর অরণ্য কেটে তৈরি হচ্ছে নূতন জনপদ। এর মধ্যে বহু সুদৃশ্য সরকারী বাসভবন নির্ম্মিত হয়ে গেছে এবং আরও হচ্ছে। শুনেছিলাম ভুবনেশ্বরের পর্ব্বতসঙ্কুল এই গভীর অরণ্য-প্রান্তর একদা বহু হিংস্র শ্বাপদসমূহের আবাসস্থল ছিল। কিন্তু আজ তারা স্থানচ্যুত হয়ে কোথায় আশ্রয় নিয়েছে কে জানে? শুধু মহাকালের সাক্ষীরূপে পথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে আছে অটল উন্নত শৈলশ্রেণী। নূতন কলোনী ছাড়িয়ে রাস্তা

বিশাখাপত্তনম্ পোতাশ্রয়, ওয়ালটেয়ার

ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসতে লাগল। দু'ধারে শুধু আতা, আম, আর কলা-বাগান। আর সেই বনরাজিকে সস্নেহে বক্ষে ধারণ করে রয়েছে ঘন-সন্নিবিষ্ট শৈলশ্রেণী। বেলা প্রায় আটটার সময় বৌদ্ধযুগের ঐতিহ্যপূর্ণ পাদপীঠে আমরা এসে উপস্থিত হলাম। পথের এক ধারে উদয়গিরি, অপর পার্শ্বে খণ্ডগিরি। তার মধ্য দিয়ে চলে গেছে রাঙা সরু সড়ক, বরাবর কটক শহরে। পর্ব্বত-চূড়ায় দাঁড়িয়ে এই পথটিকে দেখতে বেশ সুন্দর লাগে। মনে হয় ঠিক যেন কানন-লক্ষ্মীর সিন্দূর-রঞ্জিত সীমন্তদেশ। পর্ব্বতের পাদদেশে একটি ধর্ম্মশালা ও দু-তিনটি চায়ের দোকান ছিল। এক জন গাইডের সঙ্গে আমরা প্রথমে উদয়গিরি পর্ব্বতে আরোহণ সুরু করলাম। পাহাড় কেটে তৈরি সুন্দর সোপানশ্রেণী একেবারে পর্ব্বতশৃঙ্গে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেই সোপানরাজির স্তরে স্তরে ছোটবড় নানা আকারের গুহাসমূহ অবস্থিত। এই গহন-অরণ্যবেষ্টিত দুর্গম পর্ব্বতকন্দরে যে সকল শিল্পী এই মনোরম গুহা নির্ম্মাণ করেছিলেন সার্থক ছিল তাদের সাধনা। কত যুগ যুগান্তর আগের এই আশ্চর্য্য সৃষ্টি, কালের সহস্র ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে আজও অটুট রয়েছে। এই সকল গুহার অভ্যন্তরে সম্মুখে, পার্শ্বে, পশ্চাতে, কি নিবিড় প্রশান্তি, কি অখণ্ড স্তব্ধতা; সাধনার উপযুক্ত স্থান বটে। এই পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায়

দাঁড়িয়ে প্রাচীনকালে সাধুসন্ন্যাসীরা সূর্য্যোদয় দেখতেন, তাই এর নাম হয়েছে উদয়গিরি।

এখানে সবচেয়ে বৃহৎ দ্বিতল যে গুম্ফাটি আছে তার নাম রাণী-গুম্ফা। তা ছাড়া হস্তীগুম্ফা, সূর্য্য, অনন্ত, সর্প, গণেশ, ব্যাঘ্র, যবন হরিদাস ইত্যাদি ছোটবড় নানা আকৃতির বহু গুম্ফা আছে। পূর্ব্বে এখানে ৭৫০টি গুম্ফা ছিল, বর্ত্তমানে মাত্র ১২০টি গুহা বিদ্যমান। এই সকল গুহাবলীর নির্ম্মাণ-কৌশল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। গুহার অভ্যন্তর-

নৃসিংহদেবের মন্দির, সীমাচলম্
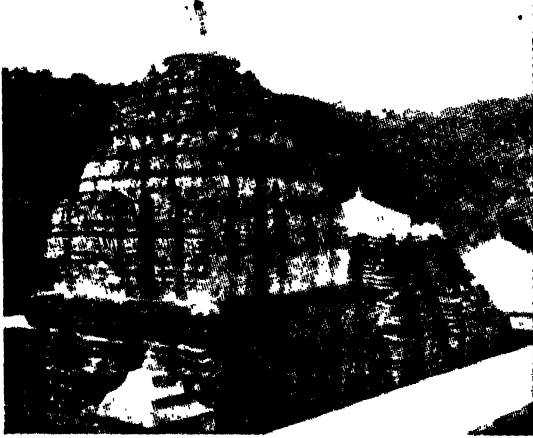
ভাগের প্রাচীরগাত্রে পালিভাষায় লিখিত বহু প্রাচীন শিলালিপি খোদিত আছে। এর মধ্যে সম্রাট্ খারবেলের রাজত্বের বিবরণাদিও আছে। রাণীগুম্ফা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হলেও হস্তীগুম্ফার শিল্পনৈপুণ্য শ্রেষ্ঠ। এই গুম্ফার প্রবেশ-পথে কৃষ্ণ-প্রস্তর নির্ম্মিত দুইটি প্রকাণ্ড হস্তী দণ্ডায়মান। উভয়ের পাদদেশে খোদিত আছে অশোকের ধর্ম্মচক্র। সূর্য্য-গুম্ফার গঠনপ্রণালীও অতি চমৎকার। একটি বড় গুম্ফার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু গুহা আছে। প্রত্যেকটির সম্মুখে আছে অলিন্দ; এবং সেই অলিন্দের চতুর্দ্দিকে দণ্ড হস্তে প্রহরী দণ্ডায়মান। ব্যাঘ্রগুম্ফাটি নৈসর্গিক সৃষ্টি। ঠিক মনে হয় একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র বিকট ভাবে মুখব্যাদান করে রয়েছে। তার মধ্যে একদা মুনিঋষিরা বসে তপস্যাদি করেছেন। প্রত্যেকটি গুহার মধ্যে একটি বিশেষ ধরণের পরিকল্পিত পয়ঃপ্রণালী আছে।

দুইটি পর্ব্বত ভিন্ন, অথচ তাদের শৃঙ্গদেশে মন্দিরনির্ম্মাণের কৌশল দুটি পর্ব্বতকে এক ও অভিন্ন করে দিয়েছে। সেই জন্যই এই পর্ব্বতের নাম হয়েছে খণ্ডগিরি। এখানেও কয়েকটি গুম্ফা, যজ্ঞশালা, দেবসভা ইত্যাদি আছে। দেবসভাটি বাস্তবিক অতি মনোরম। পর্ব্বতকন্দরে একটি প্রশস্ত অঙ্গনে বহু পাষাণ-বেদিকা, স্তম্ভ, দেবদেবীর মূর্ত্তি ইত্যাদি আছে। তা ছাড়া এখানে তিনটি জৈনসম্প্রদায়ের মন্দির আছে। একটির মধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তরে খোদিত মহাবীর পার্শ্বনাথের আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত। অপর দুটিতে আদিনাথ ও পার্শ্বনাথের প্রতিমূর্ত্তি এবং জৈনসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার নাম শুভ্র মর্ম্মরফলকে মুদ্রিত আছে। এই সকল মন্দির বর্ত্তমানে জৈনসম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধানে আছে। এখন এই সকল প্রাচীন মন্দিরের সংস্কারকার্য্য চলছে।

প্রায় সাড়ে দশটার সময় পাহাড় থেকে নেমে, ধর্ম্মশালায় হাতমুখ ধুয়ে, চা খেয়ে আমরা আবার গোযানে উঠে বসলাম। খণ্ডগিরি থেকে ভুবনেশ্বর মন্দির প্রায় মাইল-তিনেক পথ। এ পথ নিতান্ত মেঠো ও অসমতল। এ পথে গোযানে ভ্রমণ করা এক বিচিত্র ব্যাপার। গাড়ী কখনও ঢিমে তালে উপরে উঠছে, আবার কখনও হুড় হুড় করে ছুটতে ছুটতে নীচে নেমে যাচ্ছে। ছন্দা পাপড়ি ত হেসেই অস্থির; আর ঘাড় নীচু করে বসে থাকতে থাকতে আমাদের প্রাণান্ত। কিছুক্ষণ পরে পথের ধারে একটি বেশ বড় কুণ্ড দেখা গেল। জলের রং নীলাভ ও স্বচ্ছ। এর নাম ভীমকুণ্ড। ভীম একাদশীর দিন এখানে বেশ বড় মেলা বসে। আর ভুবনেশ্বর ঠাকুরের সুবর্ণ-বিগ্রহকে এখানে স্নান উপলক্ষ্যে নিয়ে আসা হয়। ভীমকুণ্ডের ধারে আসতেই দূর থেকে দেখা গেল লিঙ্গরাজ মন্দিরের গগনচুম্বী শিখরদেশ। এই সেই ভুবনেশ্বরের মন্দির। বেলা ১২টার মধ্যে আমরা ভুবনেশ্বরে পৌঁছে গেলাম।

একটি ধর্ম্মশালায় জিনিষপত্র রেখে আমরা বিন্দুসরোবরে এলাম স্নান করতে। সরোবরটি ভারি সুন্দর আর প্রকাণ্ড। কাকচক্ষুর মত স্বচ্ছ জল কানায় কানায় টলটল করছে। তার পাড়ে নারিকেলকুঞ্জ, বট আর অশ্বত্থ গাছের নিবিড় ছায়ায় স্থানটিকে আরও স্বপ্নময় করে তুলেছে। সরোবরটি বেশ গভীর। কথিত আছে, ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থের জল বিন্দু বিন্দু করে সঞ্চিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে এই বিন্দুসরোবর। সমস্ত দিনের রৌদ্রতপ্ত দেহ বিন্দুর শীতল সলিলে অবগাহন করতেই স্নিগ্ধ হয়ে গেল। জাহ্নবী মনের আনন্দে স্নান করলেন। স্নানের পালা সমাধা করে আমরা মন্দিরে গেলাম। একটি প্রকাণ্ড ৫২০ × ৪৫৬ ফুট বিস্তৃত প্রাঙ্গণের মধ্যে অনেকগুলি মন্দির আছে। তার মধ্যে লিঙ্গরাজ মন্দিরই হ'ল প্রধান। এই মন্দিরের অভ্যন্তর-ভাগে ভুবনেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। এখানে লিঙ্গরাজ নাকি বসুধাবক্ষ বিদীর্ণ করে উত্থিত হয়েছেন। মন্দির-কক্ষটি ঘোর তমসাবৃত। তার ভিতর মিট মিট করে জ্বলছে কয়েকটি ঘৃত-প্রদীপ। এই মন্দির যে গোটা পাহাড় কেটে নির্ম্মাণ করা হয়েছে, তার চিহ্ন সেখানে সর্ব্বত্র বিদ্যমান। ভূগর্ভের মধ্যে একটি গোলাকৃতি কৃষ্ণ প্রস্তর-খণ্ডের উপর লিঙ্গরাজ অধিষ্ঠিত। তার মস্তকদেশে ব্রহ্মা এবং

নাভিদেশে বিষ্ণু বিরাজিত এবং তাঁর পাদদেশ ধৌত করে প্রবাহিত হচ্ছে তিনটি সঙ্কীর্ণ জলধারা—গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী।

মন্দির-চত্বরে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত বিশালকায় একটি বৃষ উপবিষ্ট। এই হ'ল আসল মন্দির। এ ছাড়া ভুবনেশ্বরী, ভগবতী, লক্ষ্মী, দশাবতার ইত্যাদি বহু বিগ্রহ এবং মন্দির আছে। লিঙ্গরাজ মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে কৃষ্ণপ্রস্তরে খোদিত চমৎকার একটি নিশাপার্ব্বতীর মূর্ত্তি আছে। এটি পূর্ব্বে কোনার্ক মন্দিরে ছিল। কালাপাহাড় কর্ত্তৃক কোনার্ক মন্দির ধ্বংস হওয়ায় হস্ত স্তনযুগল ও নাসিকা ছিন্ন অবস্থায় এই দেবীমূর্ত্তি সেখান থেকে এনে এই স্থানে রাখা হয়েছে। বাস্তবিক এই মূর্ত্তির কারুশিল্প দর্শনীয় বটে। প্রস্তরগাত্রে খোদিত দেবীর বস্ত্র-পরিধানের ভঙ্গী এবং পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে কি সূক্ষ্ম কলা-নৈপুণ্য, অঙ্গের অলঙ্কারাদির কি চমৎকার কারু-কৌশল, দেখে মনে হয় ঠিক যেন কাগজে তুলি দিয়ে আঁকা হয়েছে। আর দৈহিক গঠন, মুখশ্রী, তাই বা কি অপরূপ? কবে কোন্ শতাব্দীতে কোন্ নিপুণ শিল্পী সৃষ্টি করেছিল এই দেবীমূর্ত্তি তা কে জানে? অঙ্গহীনা বলে এই দেবীমূর্ত্তি মন্দির-মধ্যে স্থান পায় নি। দেখে বড় দুঃখ হ'ল, এমন একটি আশ্চর্য্য সুন্দর সৃষ্টি মন্দিরের বহির্ভাগে অতি অযত্নে রাখা হয়েছে বলে।

কোনার্ক থেকে আহৃত আর একটি বিখ্যাত ভাস্কর্য্য-শিল্পের নিদর্শন পুরীতে শ্রীমন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে দেখেছি। সেটিও কৃষ্ণপ্রস্তরে খোদিত একটি সূর্য্য-মূর্ত্তি; কালাপাহাড় কর্ত্তৃক অঙ্গহানি হওয়ায় মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বদ্ধ করে রাখা হয়েছে। ভাস্কর্য্য-বিদ্যা সে যুগে যে কত উৎকর্ষ-লাভ করেছিল, এই সূর্য্যমূর্ত্তি তার প্রমাণ। লিঙ্গরাজ মন্দিরের উদ্যানে কৃষ্ণপ্রস্তরে খোদিত একটি সুবৃহৎ ও সুন্দর গণেশমূর্ত্তি আছে। তা ছাড়া এখানকার রাজারাণী-মন্দিরও অতি চমৎকার। ভুবনেশ্বরের এই লিঙ্গরাজ ও রাজারাণী-মন্দির কলিঙ্গ স্থাপত্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে উৎকীর্ণ বিভিন্ন মূর্ত্তির মধ্যে শিল্পীর বিচিত্র রূপভাবনা বিধৃত হয়ে আছে। অনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। কিন্তু এমনই চমৎকার এর গঠন-কৌশল যে, সুদীর্ঘ কালান্তরেও মনে হয় যেন সবেমাত্র এটির নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়েছে। যেন এক সার্থক শিল্পীর রহস্যঘন স্বপ্নসাধনার অমর অবদান এই দুর্গম অরণ্য ও পর্ব্বতের পটভূমিকায় অক্ষয়রূপে বিদ্যমান। মন্দিরের সূক্ষ্মাগ্র রক্তবর্ণ চূড়া যেন মহাকালের ললাটের রক্ততিলক।

লিঙ্গরাজ মন্দিরের প্রায় মাইল দেড়েক দূরে মুক্তেশ্বর মন্দির ও কেদারগৌরীকুণ্ড। এই মন্দিরে মুক্তেশ্বর শিব ও পার্ব্বতীর মূর্ত্তি বিদ্যমান। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগে পাষাণ-প্রাচীরে প্রস্তরে খোদিত একটি চমৎকার পদ্মফুল আছে। এই পদ্মের প্রত্যেকটি পাপড়িতে শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যরতা সখীবৃন্দের মূর্ত্তি খোদাই করা। এই ভাস্কর্য্যশিল্পের পরিকল্পনা অপূর্ব্ব।

গৌরীকুণ্ড একটি মধুর স্বাদবিশিষ্ট শীতল জলের প্রস্রবণ। কৃষ্ণ-প্রস্তরের সিংহমুখাকৃতি একটি নৈসর্গিক গহ্বর হতে এই জলধারা নিঃসৃত হয়ে কুণ্ডে পড়ছে। জলের বর্ণ ঠিক যেন দুধে-নীল। তাই এর আর এক নাম দুধকুণ্ড। এই জল পান করলে পেটের অসুখ নিরাময় হয়। এই কুণ্ডে স্নানও শরীরের পক্ষে উপকারী। স্থানটি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। কাছে দূরে বহু কুটীর ও স্বাস্থ্য-নিবাস আছে। জায়গাটির প্রাকৃতিক পরিবেশও অত্যন্ত মনোরম। যেদিকে তাকাও শুধু সুনীল শৈলশ্রেণী, সবুজ বনরাজি ও ধূ ধূ করা উন্মুক্ত প্রান্তর।

ওয়ালটেয়ার

কোজাগরী পূর্ণিমার দিন, এম-এস-এম-এর গাড়ীতে উঠে আমরা ওয়ালটেয়ারের পথে পাড়ি দিলাম। এবার সুরু হ'ল উড়িষ্যার পর্ব্বতরাজির মাঝখান দিয়ে যাত্রা। বিভিন্ন আকৃতির কত যে পাহাড় তার আর শেষ নেই। হিমালয় দেখেছি, তার পানে চেয়ে মন শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে যায়; আসামের খাসিয়া-জয়ন্তীয়া পাহাড় দেখেছি—তার শ্যাম সুষমায় মন ভরে উঠেছে অপরূপ স্নিগ্ধতায়, কিন্তু এই পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালার পানে চেয়ে মনে অন্য ভাবের উদ্রেক হয়। মনে হয় এরা যেন প্রকৃতির শিশুসন্তান। দল বেঁধে উন্মুক্ত প্রান্তরে খেলা করছে। প্রায় সন্ধ্যার সময় আমরা রম্ভা ষ্টেশনে এলাম। এখান থেকেই সুরু হ'ল বিখ্যাত চিল্কাহ্রদ। নীল আকাশের নীচে, ধূসর শৈলমালার ক্রোড়ে, শ্যাম অরণ্যানীর বেষ্টনীর মধ্যে অপূর্ব্ব সুষমামণ্ডিত চিল্কা প্রকৃতির বক্ষে ঠিক ছবির মত শোভা পাচ্ছে। চিল্কার সঙ্গে সমুদ্রের সংযোগ আছে, তাই এর জলরাশির এত বিপুল প্রসার। সমুদ্র ও হ্রদের মধ্যস্থলে প্রায় সত্তর ফুট উঁচু একটি বালুকাময় পাহাড় এবং মাঝে মাঝে পলিমাটির কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপ আছে। এর মধ্যে বড়গুলিতে রীতিমত ঘরবাড়ী এবং জনবসতিও আছে, ছোটগুলিতে নানাজাতীয় হরিণ বিচরণ করে। শীতকালে চিল্কার বালুচরে যখন অগণিত হংসবলাকার সমাবেশ হয় তখন এর সৌন্দর্য্য যেন শতগুণে বেড়ে যায়।

রাত্রি প্রায় তৃতীয় যামে, ইচ্ছাপুরম্ ষ্টেশনে আমরা মদ্র-দেশের স্পর্শলাভ করলাম। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না রাত্রি। যেদিকে তাকাই শুধু ধূ ধূ করছে উন্মুক্ত প্রান্তর আর আঁকাবাঁকা পর্ব্বতরাজি। কোজাগরী পূর্ণিমারাত্রি যেন বনপরীর মত ফিরোজা রঙের আঁচল গায়ে জড়িয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

রাত্রি অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওয়ালটেয়ারে এসে পৌঁছলাম। পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালা, আর বঙ্গোপসাগরে ঘেরা ক্ষুদ্র শহর এই ওয়ালটেয়ার। যেদিকে তাকাও শুধু পাহাড় আর নারিকেলকুঞ্জ, সাগর আর বালুকাবেলা। আস্তানায়

পৌঁছে স্নানাহার সেরে, আমরা বিশাখাপত্তনমের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম।

শহর থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে বিশাখাপত্তনম (ভিজাগাপটম) পোতাশ্রয়। শহর ছেড়ে খানিকটা অগ্রসর হতেই সুন্দর ঝাউ-বীথিকার প্রান্ত থেকে দেখা গেল, তরঙ্গ-সঙ্কুল সিন্ধুর ইন্দ্রনীল রূপ, আর জাহাজের মাস্তলের অগ্রভাগ। ক্রমাগত পথ ভুল করে ঘুরে ঘুরে রৌদ্রদগ্ধ হয়ে অবশেষে আমরা গিয়ে উপস্থিত হলাম বন্দরের প্রবেশ-দ্বার-প্রান্তে। কিন্তু হা হতোস্মি, লম্বা সেলাম ঠুকে দ্বারী জানালে সকাল আটটা থেকে বিকেল চারিটা পর্য্যন্ত বন্দরে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এখন কি করা যায়? এতদূর এসে আবার ফিরে যাব? আমাদের হাতে আর বেশী সময়ও নেই। সেখান থেকে একটু দূরে পোর্ট এডমিনিষ্ট্রেশন আপিসে গিয়ে ভাদুড়ী স্পেশ্যাল পারমিট সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন; তখন মনের আনন্দে আমরা পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করলাম। সিন্ধিয়া কোম্পানীর "জলপদ্ম" নামে একখানি জাহাজ জলে ভাসছে। যেখানা কিছুদিন পূর্ব্বে মাননীয় শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব জলে ভাসিয়েছিলেন। আর একখানির নির্ম্মাণকার্য্য সবেমাত্র শেষ হয়েছে। তখন সেখানে শুনেছিলাম, সিন্ধিয়া কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলা যাচ্ছে না, কেননা তাদের হাতে এখন আর কোনও কাজ নেই। কিন্তু কয়েকদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে দেখলাম, ভারত গবর্ণমেণ্ট সিন্ধিয়া কোম্পানীকে আরও তিনখানি জাহাজ নির্ম্মাণের বায়না দিয়েছেন। ভারতীয় নৌশিল্প যত দ্রুত প্রসারলাভ করে দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। বন্দরে ব্রিটিশ, আমেরিকান প্রভৃতি বিভিন্ন কোম্পানীর আরও কয়েকখানি জাহাজ নোঙর করা ছিল। ব্রিটিশ কোম্পানীর এজেণ্ট বাঁড়ুয্যে মশাই অত্যন্ত যত্ন করে আমাদের সমস্ত দেখালেন। এখানকার সমুদ্রখাতটি ভারি চমৎকার। দু'ধারে পর্ব্বতমালা। মাঝখান দিয়ে সমুদ্রের একটি সঙ্কীর্ণ শাখা বেরিয়ে এসে বন্দরে মিশেছে। এই খাতের মধ্য দিয়ে জাহাজ যখন বন্দরে প্রবেশ করে তখন সে দৃশ্য নাকি দেখতে চমৎকার। এখানে ডলফিন নোজ নামে একটি পর্ব্বতশৃঙ্গ আছে। এই চূড়াটিকে দূর থেকে ঠিক ডলফিন মাছের নাকের মত দেখায় লাগে। তাই এর এই নাম হয়েছে। জায়গাটি ভারি মনোরম। অনেকে এখানে পিকনিক করতে আসে। এই পাহাড়ের এক দিকে বন্দর অপর দিকে উত্তাল সিন্ধু। একটি আমেরিকান মালবাহী জাহাজে তখন ম্যাঙ্গানীজ ভরা হচ্ছিল ক্রেণের সাহায্যে। বিশাখাপত্তনমের পোতাশ্রয়ের জাহাজগুলির মাস্তলের অগ্রভাগ তখন মধ্যাহ্নসূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণে ঝকমক করছিল। সব কিছু দেখে আমরা পোতাশ্রয় ত্যাগ করলাম, তখন বালুকা-বেলা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল।

ওয়ালটেয়ারে প্রধান দর্শনীয় বস্তু আছে দুটি। একটি সমুদ্রোপকূল, অপরটি পোতাশ্রয়। এখানে বঙ্গোপসাগরের আর এক রূপ দেখলাম। জল এখানে অত্যন্ত গভীর; এবং জল-মধ্যে স্থানে স্থানে অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা উন্নত শিরে দণ্ডায়মান সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গরাশি যখন ক্ষুব্ধ আক্রোশে সেই পর্ব্বত-গাত্রে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর শুভ্র ফেণপুঞ্জ চূর্ণ হীরকের মত সাগরের নীল বক্ষ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয় তখন মনে হয় সমুদ্রের উন্মত্ততা দেখে শৈলরাজের মুখে ফুটে উঠছে শুভ্রসুন্দর হাসি. এখানকার সাগরতীর বেশ নির্জ্জন ও সুপ্রশস্ত। স্থানে স্থানে বিশ্রাম-বেদিকাও আছে। ধনী ও অভিজাত ব্যক্তিদের বাস-ভবনগুলি এই মনোরম সাগরতীরে অবস্থিত।

ওয়ালটেয়ার থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে, সীমাচলম পর্ব্বতমালা। সকাল সাতটার সময় একটি বাসে করে আমরা সীমাচলম যাত্রা করলাম। ওয়ালটেয়ার শহর ছাড়িয়ে বিশাখা-পত্তনমের পোতাশ্রয় পিছনে ফেলে আমাদের বাস ক্রমশ: সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য পথ ধরে ছুটে চলতে লাগল। পথের দু'ধারের পর্ব্বতশ্রেণীকে শ্যামল করে রেখেছে, আতা আর কলা বাগান। কত যে সুন্দর সুন্দর পাখী বনপ্রান্তে উড়ে বেড়াচ্ছে তার অন্ত নেই। বেলা প্রায় নয়টার সময় আমরা সীমাচলম পর্ব্বতের পাদমূলে এসে উপস্থিত হলাম। বার শত সোপান অতিক্রম করে আমাদের এই পর্ব্বতশৃঙ্গের উপরে মন্দিরে পৌঁছাতে হবে, পাহাড় কেটে সুন্দর সোপানশ্রেণী নির্ম্মিত হয়েছে। দু'ধারে প্রশস্ত কার্ণিশ। তাতে শ্রমক্লান্ত পথিকেরা অনায়াসে উপবেশন করতে পারে। সোপান-পথের উভয় পার্শ্বস্থ পর্ব্বতবক্ষ ঘন অরণ্যে আবৃত। কত যে সুন্দর সুন্দর পুষ্প বন আলো করে ফুটে রয়েছে, কে তার সৌন্দর্য্য দেখে! পর্ব্বতের কোন্ গোপন গুহা থেকে নেমে এসেছে এক পাগলা ঝোরা। মানুষ নিজ প্রয়োজন অনুসারে তার উদ্দাম গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছে। দুর্ব্বার বেগে উচ্ছ্বসিত জলধারাকে কোথাও স্নানের, কোথাও পানের, আবার কোথাওবা বস্ত্র-ধৌতির কার্য্যে আবদ্ধ রেখে অবশেষে তার গতিপথকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে পর্ব্বতগাত্রের কলাবাগানের মধ্যে। এখানে আতা এবং কলার চাষ করা হয়। এই জলধারার প্রত্যেকটি উৎসমুখ সুন্দর কারুকার্য্যময় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার এবং হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুদের মুখাকৃতিবিশিষ্ট পাঁচ শত সোপান অতিক্রম করার পর পথের দু'পাশে প্রস্তরে খোদিত বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি নজরে পড়ল। ৯৮৬টি সোপান অতিক্রম করার পর পাওয়া গেল একটি গ্রাম। এখানে চা দুধ কল ফুল প্রভৃতির কয়েকটি ছোট ছোট দোকান আছে এবং কয়েকটি বেশ সুন্দর পান্থনিবাস আছে। এই গ্রামের পিছনে আরও অনেকগুলি সোপান অতিক্রম করে আমরা একটি নৃত্যচপল নির্ঝরিণীর সাক্ষাৎ পেলাম। তার

পিছনে সীতারাম এবং লক্ষ্মীমন্দির আছে। সবগুলো সোপান অতিক্রম করে সুনিবিড় ছায়া-ঘেরা ঝর্ণাধারার পাশে অবসন্ন দেহে আমরা বসে পড়লাম। ক্লান্তি অপনোদনের পর ঝর্ণার জলে স্নান করে আমরা নৃসিংহ-মন্দিরের পথে অগ্রসর হলাম। মন্দিরের পথে যেতে দেখতে পেলাম প্রকাণ্ড একটি বটবৃক্ষ অসংখ্য ঝুরি বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। কত প্রাচীন যে এই বটবৃক্ষ তা কে জানে? কিছুদূর অগ্রসর হতেই সুমুখে
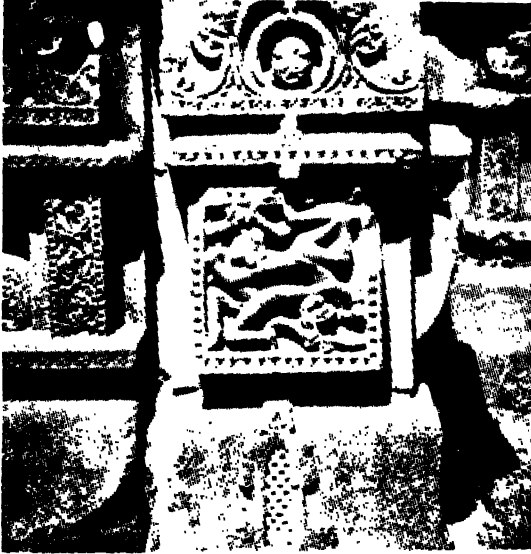
গৌরীকুণ্ড, ভুবনেশ্বর

দেখা গেল মন্দিরের স্বর্ণ-চূড়া। তখনও মন্দির দ্বার উদ্ঘাটিত হয় নি, কাজেই আমরা বাইরে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করতে লাগলাম। নির্জ্জন পর্ব্বতশীর্ষে কি অনাবিল প্রশান্তি; কি অপূর্ব্ব এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য; চতুর্দ্দিকে বিরাজ করছে এক অখণ্ড নীরবতা। এখানেও পর্ব্বতের পাষাণগাত্রে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত আছে। গাইড আমাদের বললে, প্রায় ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা কর্ত্তৃক এই নৃসিংহ মন্দির নির্ম্মিত হয়। এই মন্দিরে মহারাজা প্রদত্ত বহু দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। মন্দিরের সুবর্ণ-চূড়ায় সোনা আছে ৬৫৫ তোলা এবং মন্দিরের আরও স্বর্ণ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে। সর্ব্বত্র একটা রাজসিক চিহ্ন বিদ্যমান। মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতা হলেন বরাহ নৃসিংহ অবতার। নৃসিংহাবতার কর্ত্তৃক রাজা হিরণ্যকশিপু নাকি এই স্থানেই নিহত হন। তাই এখানে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সীমাচলম থেকে কিছু দূরে বিমলিপটম নামক স্থানে সমুদ্র-তীরবর্তী পর্ব্বতচূড়া থেকে নাকি রাজা হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহ্লাদকে বুকে পাষাণ বেঁধে সিন্ধুবক্ষে নিক্ষেপ করেছিলেন। সেইখানে আছে নৃসিংহ অবতারের আদি মন্দির।

প্রতি বৎসর অক্ষয় তৃতীয়ার দিন এই মন্দিরে বিশেষ উৎসব হয় এবং তদুপলক্ষ্যে বহু জনসমাগম হয়ে থাকে। নৃসিংহ-দেবের আসল বিগ্রহটি মৃত্তিকাগর্ভে আছে। কেবল এই উৎসব জনসাধারণ সেই আসল দেবমূর্ত্তির দর্শনলাভ করে। কিন্তু প্রত্যহ সকলে যে মূর্ত্তি দর্শন করে, সে শুধু ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে অবলেপিত বিশাল শ্বেত চন্দনের স্তূপ। বেলা প্রায় এগারোটার সময় ঠাকুরের ভোগান্তে মন্দিরের দ্বার খোলা হ'ল। এখানেও মন্দির অভ্যন্তরে জ্বলছে ঘৃতপ্রদীপ। এই দীপাধারগুলি এত ঘনসন্নিবিষ্ট যে তার উজ্জ্বল আলোকরশ্মি বৈদ্যুতিক
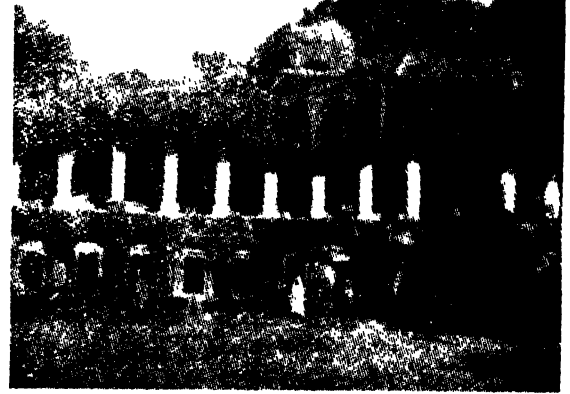
রাণীগুম্ফা উদয়গিরি, ভুবনেশ্বর

আলোককেও ম্লান করে দেয়। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ বন্ধুর, অসমতল হলেও বেশ প্রশস্ত এবং বৃহৎ। একটি প্রকাণ্ড সুদৃশ্য রৌপ্যসিংহাসনে নৃসিংহদেবের চন্দনমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এখানে কর্পূর, নারিকেল আর চম্পক ফুলই হ'ল দেবপূজার প্রধান উপকরণ। মন্দিরের বিশাল প্রাঙ্গণে আরও বহু দেবদেবীর মন্দির আছে। এখানেও ঠাকুরের ভোগান্ন বিক্রয় হয়। নাট-মন্দিরে কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত একটি সুবৃহৎ রথ আছে। সেই রথের অশ্বযুগল এবং তার চক্রের গঠন-কৌশল অতুলনীয়। বোধ হয় কোনার্ক মন্দিরের সূর্য্যরথের অনুকরণেই এটি নির্ম্মিত হয়েছিল। মন্দিরে পূজাদি সেরে আমরা ভাবলাম সেই সুন্দর ঝর্ণাটির উৎসমুখ কোথায় দেখে আসব; কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দারা নিষেধ করে বললে, সেখানে গভীর অরণ্যে হিংস্র প্রাণীসমূহ বাস করে। কাজেই ঝর্ণার উৎপত্তিস্থল আমাদের আর দেখা হ'ল না। একটি পান্থনিবাসে বসে আহার-পর্ব্ব সমাধা করে আমরা আবার সেই সোপান-পথের মুখে এসে উপস্থিত হলাম। সেই অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে দাঁড়িয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। আর হয়ত কোনও দিন এখানে আসব না, কিন্তু এই সমুদ্র আর পর্ব্বত, বালুকাবেলা আর নারিকেল-কুঞ্জ ঘেরা সুন্দর দেশটির কথা মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে জেগে থাকবে চিরদিন।*

* এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত ছবিগুলি শ্রীঅশোককুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত।

এক পেয়ালা চা

শ্রীশান্তি রায়

"তুমি না হয় এক পেয়ালা চা-ই দিও"।

কথাটা বললে শ্রীলতা তার মাকে। সকালবেলা বড়-গিন্নীর ঘরে আসর বসেছে। আসরে আছে গিন্নীর মেয়েরা আর তাদের ছেলেমেয়ে, শ্রীলতার কথায় হাসির যেন বড় বয়ে যায়।

বড় মেয়ে সুখলতা তার চার বছরের ছেলে বিটুকে জোর করে একটা জামা পরাচ্ছিল, হাতের জামা হাতেই থেকে যায়। হাসতে হাসতে সুখলতা মেঝের উপর বসে পড়ে। বিটু অবাক হয়ে খানিকক্ষণ দেখে এদিক-ওদিক, তার পর ধীরে সুস্থে মুখে একটা আঙুল পুরে দিদিমার কোলের উপর বসে।

মেজ মেয়ে প্রীতিলতা সাদা পাথরের গ্লাসে মায়ের জন্য বেলের সরবৎ নিয়ে সবে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে—শ্রীলতার কথায় তাড়াতাড়ি হাতের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে হাসতে আরম্ভ করে। ওর হাসিটা আসে কম, কিন্তু একবার এলে থামতে চায় না।

বড়গিন্নী নিজেও হাসেন, বিরাট মেদবহুল দেহ নিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছেন দেয়াল ঘেঁষে, হাসির ধমকে তাঁর বড় বড় চোখ দুটি ছোট হয়ে আসে।

বারান্দা থেকে ছুটে আসে সেজ মেয়ে সুলতা, হাসতে হাসতে বলে, অরে, অই শ্রী, কি হয়েছে রে?

প্রীতিলতার বড় মেয়ে অনিতা ফ্রক ছেড়ে সবে শাড়ি ধরেছে, বড়দের কথায় হাসিতে যোগ দেয় ভয়ে ভয়ে। ফিক্ ফিক্ করে হাসছিল, মাসির কথার উত্তর দেয়, বুঝলে সেজ মাসি, দিদিমা···

কথাটা শেষ হয় না, আবার হাসতে সুরু করে। শ্রীলতা খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে বড়দির ছোট মেয়ে বিনির চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল শেষের দিকটা সম্পূর্ণ করে। বললে, মা বলে, মা কি করবে?

ওদিকে সুলতার মেজ ছেলে ইতু আর প্রীতিলতার ছোট ছেলে কিরণ একটা বেড়ালছানার উপর দখলীস্বত্ব সাব্যস্ত করছিল। লেজের দিকটা ইতুর হাতে আর গলাসুদ্ধ মুখটা জড়িয়ে ধরেছে কিরণ—বেড়ালটার করুণ মিউ মিউ ডাক ঘর-ভর্তি হাসির ধমকে প্রায় শোনা যায় না। দিদিমার গা ঘেঁষে হাঁটুতে মুখ ঠেকিয়ে একটা গেঞ্জি গায় প্রীতিলতার তৃতীয় সন্তান অতুল বেড়াল নিয়ে এদের খেলা দেখছিল, তার লজ্জা হয় ওদের সঙ্গে খেলতে। ওদের মত অতুলের প্যাণ্ট ত কোমর ছাড়িয়ে নেমে পড়ে না। প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে দেখছিল, ওদের খেলা। এবার একটা সুযোগ পেলে, চেঁচিয়ে বলে উঠল মা, ও মা, দেখ কিরণ আর ইতুর কাণ্ড দেখ!

বেড়ালছানাটার যা দশা, দুই বীরপুরুষের ভাগাভাগিতে হাড়গোড় ভেঙে প্রায় দু' টুকরো হয়ে যায় আর কি। সুলতার রাগ বেশী, চট করে ছুটে এসে টিপ টিপ দুটো কিল বসিয়ে দেয় ইতুর পিঠে, চীৎকার করে প্রতিবাদ জানায় ইতু, কিন্তু সে ছাড়বে না তার দখল। অনিতার ছোট বোন সুনীতা দৌড়ে এসে বলে, দাও, ওটা আমার। আমার মিনির বাচ্চা—

কিরণ আর ইতু বেড়াল ছেড়ে নিজেদের দিকে নজর দিয়েছিল একটু, একযোগে দু'জনে সাপটে তুলে নেয় বাচ্চাটাকে।

এদিকে প্রীতির চোখ পড়েছে অতুলের দিকে, হ্যাঁরে সকাল থেকে তোর খাবার নিয়ে বসে, খাওয়ার সময় হয় না তোর।

বিনু আর অতুলে ভাব বেশী। বিনু চেঁচিয়ে বলে, এ্যা অতুদা খাও নি এখনও, আমরা সেই সক্কালে খেয়ে নিয়েছি—

দিদিমা অতুলের পিঠের ওপর একটা হাত বুলিয়ে বলেন, যাও দাদা, খাবার ফেলতে আছে? যাও লক্ষ্মী দাদু।

অতুল পিঠটা বেঁকিয়ে বলে, ইস! দিলে ত পিঠটা ভেঙে, বলি নি ও গদা তুলে দিও না আমার পিঠে—

যুদ্ধরত দুই পুরুষবাচ্চা আর সুনীতা ছাড়া ঘরটা যেন আবার প্রচণ্ড হাসিতে ভেঙে পড়ে। সুখলতা বিটুর জামা নিয়ে ওকে দিদিমার কোল থেকে নিয়ে আসছিল, জামাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে ওঠে, বাবা বাবা, মা এমনি করে বাঁচব না, পালাই বাবা—

বলতে বলতে মুখে আঁচল দিয়ে পালিয়ে যায়। কিরণ আর ইতু এক মুহূর্ত্ত সাদা ফ্ল্যাগ তুলে দেখে ব্যাপারটা কি? কিন্তু সুমিতা চট করে বেড়ালছানাটা তুলে ছুট দেয় বাইরে। কিরণ আর ইতুর এতটুকু দেরি হয় না, ওরাও ছুটে যায় পেছনে পেছনে, ইতুটা প্রায় কেঁদেই ফেলে—এও একটা হাসির ব্যাপার। শ্রীলতা শুয়ে পড়েছিল কাত হয়ে, উঠে বলে, কৈ মা উত্তর দাও···

দিদিমা ভাল করে দেখেন এদের, এতগুলি হাসিমুখ, মেয়েরা হাসছে, নাতিনাতনী সব খেলা করছে। কোলের উপর এই একরত্তি বিটু আপনমনে খেলছে, চেয়ে চেয়ে গভীর তৃপ্তি বোধ করেন, তারপর বলেন, হ্যাঁরে, অই প্রীতি, অরে হাসছিস যে

বড়। বলি ওরে অই শ্রী, তোমা যে হেসে কুল পাচ্ছিস না, বৌমা কোথায় রে। বলি, অই, লতা এদের···

অতুল শুনে কথাটা, বলে, কে মাসিমা ?

এটা অতুলের অনিতার অধিকারে হাত দেওয়া, অনিতা একটা ধমক দেয় বলে, তুই চুপ কর। কার কথা বলছ দিদিমা ?

দিদিমা বললেন, বলি তোদের মাসিমা, অরে অই সু বৌমা কোথায় রে ? আমার বৌমা,···

বারান্দার দিকে দরজায় একটা পর্দা—পর্দা সরিয়ে একটি মুখ জবাব দেয়। এই যে আমি, আমায় ডাকছ মা ?

শ্রীলতার চোখ পড়ে মুখখানির উপর, বলে, বাঃ বৌদি বেশ ! কেন তোমার কি ভেতরে আসা মানা ?

বড়গিন্নীর প্রায় পেছনে দরজাটা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখার মত অবস্থা নয়, ঘাড়টা একটু গুছিয়ে বলেন, বলি অ বৌমা, সবাই রয়েছে, তুমি কেন বাইরে দাঁড়িয়ে ?

শ্যামলী, বাড়ীর একমাত্র বৌ, হাসিমুখে আসে ভেতরে। শ্যামলীর রংটা ফর্সা। মুখখানা একটু লম্বাটে ধাঁচের, গালের ওপর কাল মেচেতা, হাত পা সরু সরু, দাঁতগুলি সুন্দর, কিন্তু হাসিটা বেমানান। শ্যামলী এসে দাঁড়ায় খাটের এক-পাশে একটু দূরে, একটু ফাঁকায়। প্রীতি বেলের সরবৎ মায়ের সামনে ধরে বলে, নাও মা, খেয়ে নাও, ওরে ও হত-ভাগা অতু, উঠবি নে তুই।

বিটু মায়ের খোঁজে বাইরে গিয়েছিল, আবার কি ভেবে দিদিমার কোলে এসে বসে, দিদিমার প্রশস্ত নরম কোল ছেড়ে যেতে ওর ইচ্ছা হয় না। খাটের ওপর থেকে শ্রীলতা নামে, বলে, অতু, ওঠ, যাও, নইলে।

অতু ওঠে দাঁড়ায়, বলে, নইলে, কি ?

বিমু একটা ধমক দেয়, অতু !

প্রীতি মায়ের সামনে গ্লাসটা রেখে হাত বাড়ায় অতুর দিকে, তোমায় আজ আমি ঘরে বন্ধ করে রাখব সারাদিন।

অতু ছুট দেয় বলতে বলতে, ইস ! বড়মামাকে বলে দেবো, দেখো তখন !

অতুলের কথায় চমক লাগে শ্যামলীর—একটা হাসির রেখা ফুটে ওঠে মুখের উপর। শ্রীলতা দেখে বৌদিকে বলে, আচ্ছা বৌদি তুমিই না হয় বলে দাও, মা ত ভেবে ভেবেই সারা।

শ্যামলী অবসর পায় না কিছু বলতে। গিন্নী বলেন, তা ভাববো না আমি ! বলি ওরে অই শ্রী, আমার ছেলে আসবে বাড়ী আর আমি ভাববো না ! বুঝলে বৌমা,. কাল রাত থেকে সুরু হয়েছে ওদের সলাপরামর্শ, সবকিছু সব কাজ ওরা ভাগ করে নিয়েছে, তা আমি কি করব ?

উত্তর দেয় সুলতা, বাঃ তুমি আবার করবে কি ? তুমি বসে বসে দেখবে।

প্রীতি খুঁত ধরে, এখানে বসে থাকবে মা, তোমরা কি করছ, কি করে দেখবে ?

শ্রীলতা হাত নেড়ে থামিয়ে দেয়, আঃ ! কি জ্বালা, তোমরা যে লজিক সুরু করলে ! বৌদি, মা দেবে এক পেয়ালা চা, সেই সব চেয়ে ভালো !

শ্যামলী মাথা নাড়ে, কিন্তু কথা বেরয় না ওর মুখ দিয়ে—ঢিপ ঢিপ করে বুকটা। তা হলে সত্যিই আসছে। হাসি-মুখে বড়গিন্নী অপেক্ষা করেন বৌমার জবাবের, জবাব না পেয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরোয়। বলেন, তোর কি, তুই ত বলেই খালাস, 'মা দেবে এক পেয়ালা চা'। হ্যা, বৌমা বলি, চা করবার ক্ষমতা আছে, যেমন কপাল আমার, নড়তে পারি না।···

অনিতা সুযোগ পায় একটা কিছু বলার—দিদিমা যেন কি রকম। তুমি নড়তে যাবে কি করতে, আমরা রয়েছি কেন ?

প্রীতি বলে, ইস্, খুব কাজের হয়ে উঠেছে আমার মেয়ে বুঝলে মা।

ওদিকে সুলতা কথাটা ঘুরিয়ে দেয়, বেশ, তা হলে তাই তোমরা কর। এদিকে বেলা কত হয়েছে খেয়াল আছে ?

শ্রীলতার কাজের তাড়া পছন্দ হয় না, সেজদির কেবল কাজ কাজ বাই, তা হলে মা ঐকথা রইল, তুমি বড়দাকে চা করে দেবে—

বড়গিন্নী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ঘরে এলেন বড়কর্ত্তা। দীর্ঘ বলিষ্ঠ গড়ন, উজ্জ্বল গৌর গায়ের রং, নাকটা তীক্ষ্ণ।

ঘরে ঢুকে বলেন, বাঃ বাঃ, এই ত চমৎকার সব গল্প হচ্ছে, কি গল্প হচ্ছে রে শ্রী ?

শ্রী সকলের ছোট মেয়ে, বাবার উপর আবদার সবচেয়ে বেশী।

—ওঃ সে কত গল্প, আচ্ছা বাবা, মা যদি বড়দাকে চা করে দেয় কেমন হবে।

বড়কর্ত্তা হাসেন, বেশ ত বেশ ত ! তা বড়গিন্নী কি ওসব পারবে !

বড়গিন্নী বলেন, দেখ না, এত করে বলছি, ওরে ওসব চা টা তৈরি করা তোদেরই আসে, তা শুনবে না, শ্রী ধরে পড়েছে চা-ই কর।···

বড়কর্ত্তা দেখেন প্রত্যেককে, হাসিমুখে তাকান গিন্নীর দিকে। বলেন, বেশ ত ওরা যখন বলছে না হয় করেই দিও—

বড়গিন্নী হতাশভাবে বলেন, কিন্তু করে দিলেই ত হ'ল না, সে চা আবার খোকা খেতে পারে তবে ত হয়।

খোকা ! খোকাই বটে ! শ্রী বলে উঠে, বড়দা বুঝি এখনও খোকা, হ্যা বৌদি শুনলে মায়ের কথা !

উত্তর দেন বড়কর্ত্তা, তা খোকা পারবে, মায়ের হাতের চা বললে বরং বার দুয়েক চেয়ে নেবে।

বড়গিন্নী একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন স্বামীর মুখের দিকে। মনে মনে ভেসে ওঠে অতীতের ছবি, স্বামী তখন যুবক, তিনি তরুণী বধূ, খোকা তার কোল আঁকড়ে পড়ে থাকত।

কর্ত্তা বৌমার দিকে তাকিয়ে বলেন, আর বৌমা কি করছে।

উত্তর দেয় শ্রীলতা, বৌদির কোন কাজ নয়, সেজেগুজে বসে থাকবে।

সবাই হেসে ওঠে কথাটায়। শ্যামলীর কানের পাশটা রাঙা হয়ে ওঠে, কর্ত্তাও হেসে ওঠেন, তা চায়ের ব্যবস্থা যা করতে হয় করে ফেলবে, সময় খুব বেশী নেই কিন্তু—

বলতে বলতে বেরিয়ে যান ঘর থেকে। পায়ের সাদা কটকী চটি থেকে সামান্য শব্দ উঠে, ঘরের ভেতর চাঞ্চল্য পড়ে যায়। প্রীতি আর সুলতা বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

শ্যামলীও বেরিয়ে যাবার উপক্রম করে, শ্রীলতা ডাকে, হ্যা বৌদি বেশ তুমিও চললে! মায়ের কাছে বসবে কে?

শ্যামলী দাঁড়িয়ে যায়। বলে, মা যে চা তৈরি করবে, কেংলি কাপ—

শ্রী হেসে ফেলে, দু'হাত দিয়ে বৌদির গলা জড়িয়ে বলে, ইস্, খুব তাড়া দেখছি যে, ওসব তোমার কিছু করতে হবে না, তুমি বাড়ীর বৌ, চুপচাপ বসে থাকবে, তার পর মায়ের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে, হ্যা মা থাকবে বসে তোমার সঙ্গে? শ্যামলী অস্থির হয়ে উঠে, বসে থেকে অনেক দিন ত কেটেছে।

বড়গিন্নী বলেন, না রে না, বৌ-মানুষ এখানে আমার পাশে বসে থেকে করবে কি। বৌমা তুমি সব গুছিয়ে ফেলগে যাও—

চিটু উঠে আসে দিদিমার কোল থেকে, মামীমার কোলে উঠবে, হাত বাড়িয়ে নাক কুঁচকে অনুনাসিক স্বরে কি যেন বলে। শ্যামলী চিটুকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে যায়, শ্রীও যায় সঙ্গে।

বারান্দায় ছেলেরা খেলায় মন দিয়েছে, এদিকে এক কোণে সুনীতা আর বিনু গুটি খেলছে মন দিয়ে। ইতু বেচারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, ও ছোট, খেলায় ডাকে নি।

এক ফাঁকে লাল রঙের বলটা নিয়ে এক ছুট দেয়। বিরু ক্রিকেট ব্যাটটা নিয়ে লাফিয়ে একটা হুংকার ছাড়ে, বলটা ছেড়ে দিয়ে ইতু চেঁচিয়ে বলে, হা: তারি ত বল, বড়মামা নিয়ে আসবে জানো, এই এত্ত বড়ো বল একটা!

রান্নাঘরে জুটেছে মেয়েরা। শ্রীলতার হৈ চৈ-টাই বেশী, একটা কেংলি চাপিয়েছে উনুনের ওপর, ঠাকুর নালিশ তোলে, খণ্ডে খণ্ডে হাঁড়ি নামালে, ভাত হবে না দিদিমণি।

শ্রীলতা তাড়া দেয়, হ্যা হনুমানের দৌড় দেখ না! ভাত হবে না! ভাবনায় ওর মাথা ছিঁড়ে পড়ছে, জানিস হাঁদারাম, বড়দা ভাত খান না।

'হনুমান' অনেক কালের ঠাকুর, বড়দার পছন্দ অপছন্দের খবর রাখে, তবু কি মনে হয়! কি জানি কত কাল আগের কথা! বলে, হ্যা দিদিমণি বিলাইতে কি খেত বড়দা বাবু?

শ্রীলতা গম্ভীর হয়ে জবাব দেয়, চা।

একতলার এদিকে বাইরের ঘরে, নূতন কার্পেট পাতা হয়েছে, বাড়ীর কর্ত্তা চাকরকে দিয়ে টেবিল, চেয়ার সাজিয়ে রাখছেন। এটা খোকার বসার ঘর হবে। ঘরে আসেন ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী, রিটায়ার্ড সেরেস্তাদার, পাশাপাশি বাড়ী— খবরের কাগজ নিয়ে প্রচুর তর্কের ফাঁকে ফাঁকে ঘনশ্যামের সঙ্গে এ বাড়ীর কর্ত্তার ঘনিষ্ঠতা পেকে উঠেছিল। কর্ত্তা বলেন, এসো ঘনশ্যাম এসো, কাগজ-টাগজ আজ রাখ, আজকের কাগজে সবচেয়ে বড় খবরটা কি জান?

ঘনশ্যাম চশমার ফাঁক দিয়ে ঘরটা দেখেন, আলোর নূতন শেড্ দেওয়া হয়েছে, মেঝে ঢাকা হয়েছে কার্পেটে। জবাবে বলেন, কি খবর? আপনার খোকার আগমনবার্ত্তা?

—ঠিক বলেছ ঘনশ্যাম, এত বড় এঞ্জিনিয়ার, বার বছর বিদেশে কাটিয়ে এই প্রথম দেশে ফিরছে, কি বল ঘনশ্যাম, এসব ছেলে দেশের এসেট্—ওরে ঐ, কি নাম তোর, যা যা হয়েছে, তামাক সেজে আন দেখি।

চাকরকে আদেশ দিয়ে বলেন ঘনশ্যামকে, তা ঘনশ্যাম, বসো, তামাক খাও, আমি এই,...

বলতে বলতে তিনি চলে যান উপরে, বড়গিন্নীর ঘর থেকে ভেসে আসা নানা কথা আর হাসির টুকরো তাকে যেন টেনে নিয়ে যায়।

বড়গিন্নী চা করছেন। শ্রী বসেছে পাশে, মেঝেতে একটা কেংলি, একটা টিপট আর পেয়ালা, দুধের পট, চিনির কৌটো, একটা কৌটায় চা।

কর্ত্তা বলেন, এটা একটা কি পেয়ালা এনেছিস রে...

শ্রী বলে, কয় দু' পেয়ালা চা, আমরা খেয়ে দেখি, নাও মা...

সুখলতা বলে, হ্যারে বৌদি কোথায়...

এক কোণ থেকে শ্যামলী উত্তর দেয়, এই যে আমি...

কর্ত্তা বলেন, উঁহু, এতে চলবে না, ওরে শ্রী, এর চেয়ে ভাল পেয়ালা নেই না কি, একি একটা...

সুখলতা শ্যামলীকে টেনে নিয়ে আসে। বলে, বা: বেশ! তুমি রইলে কোণে দাঁড়িয়ে! ওমা শুনছ, দেখ তোমার বৌকে সাজিয়েছি আমরা...

শ্রী উঠে দাঁড়ায় বলে, এত গোলমাল! একটা ধমক দেয় ছোটদের, তোরা এখানে কি করছিস, পালা সব...

শ্যামলীর রোগা শরীরের অনুপাতে গহনা একটু বেশী

চাপানো হয়েছে, গিন্নী দেখেন শ্যামলীকে, বলেন, বৌমা, মাণিক কোথায় ?

সুলতা উত্তর দেয়, মাণিক গিয়েছে ষ্টেশনে···

শ্রী চায়ের পেয়ালাটা উঠিয়ে নিয়ে বলে, অ বৌদি, উঃ, শাড়ী আর গয়নার বহরে মেয়ের আজ মাথা ঘুরে গেছে। বলি, লুকোনো পেয়ালা-টেয়ালা আছে কিছু ?

শ্যামলী মাথা নেড়ে ঘর থেকে চলে যায়। অনিতা কোথা থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হয়। কোমরে শাড়ীর আঁচলটা জড়ানো—দাদামশায়ের পাশে এসে দাঁড়ায়।

পেয়ালা বারো বছর আগেকার। শ্যামলী ট্রাঙ্কের তলা থেকে কাগজে জড়ানো পেয়ালাটা নিয়ে আসে। ট্রাঙ্কের তলায় আছে আরও কত কি, কতদিন দেখা হয় নি সে সব, পুরোণো ব্যবহৃত এ-ও-তা—শ্যামলীর বুকটা টিপ টিপ করে। ··বাসা থেকে ষ্টেশন মাত্র কয়েক মিনিটের পথ, মাণিকের সঙ্গে এক্ষুণি হয় ত উনি এসে পড়বেন।

পেয়ালাটা শ্যামলী গিন্নীর কাছে মাটিতে বসিয়ে রাখে। শ্রী বলে, অই ভাখো, যা বলেছি, কোথায় যেন লুকোনো ছিল।

শ্যামলী হাসিমুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কর্ত্তা বলেন, বাঃ বেশ পেয়ালাটি, হ্যাঁ, ও রকম পেয়ালায় চা খেতেই···

কিন্তু ছোটদের চেঁচামেচি আর মেয়েদের হাস্যোচ্ছ্বাসে কর্ত্তার কণ্ঠস্বর ডুবে যায়। সারা বাড়ীতে কেমন যেন একটা খুশীর আমেজ লেগেছে।

শ্রী আবার একটা ধমক দেয় ছোটদের। প্রীতি বলে, যা তোরা বাইরে···

ছোটরা কান দেয় না ধমকে। কর্ত্তা চটিতে চট চট শব্দ তুলে বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

বড় মেয়ে সুখলতা বলে, বড়দার চায়ের কি নেশা ছিল মনে আছে মা, সন্ধ্যেবেলা খেলার মাঠ থেকে ফিরে এসে উঠোনে দাঁড়িয়েই কেমন 'চা চাই' 'চা চাই' বলে চেঁচাতে থাকত। এখন তো চায়ের নেশা আরো বেড়ে যাবার কথা। কিন্তু এমন আরম্ভ করেছে সব, মা তো চায়ে চিনি দিতেই ভুলে যাবে 'খন।···

বড়গিন্নী বলেন, 'তাই তো আগে ভাগে এমন তাড়াহুড়ো করছি রে। বাড়ীতে পা দিয়েই চা পেলে খোকা কেমন খুশী হবে বল দেখি'।···একটু থেমে, 'ওরে অই শ্রী দে মা সব, বলি মাণিক ত অনেকক্ষণ গিয়েছে ষ্টেশনে, ওকে'···

প্রীতি বলে, তুমি মাণিকের ভাবনায় সারা, ওর বাবা আসছে ও যাবে না !

শ্যামলী কথাটা শুনে বার বার, মনে মনে বলে, ওর বাবা আসছে ও যাবে না।

টি-পটে গরম জল ঢালেন বড়গিন্নী। খোকা বুঝি এসে পড়ল ! হাতটা কাঁপে, একটু বুঝি বাইরে গড়িয়ে পড়ে। ছোটরা চুপ হয়ে যায়, মেয়েরাও কথা কয় না, শ্যামলী চোখ বুজে নেয় মুহূর্ত্তকাল—চায়ের জন্ত তাড়া ছিল সবচেয়ে বেশী, ঐ পেয়ালায় খেত চা,···মাণিক গিয়েছে ষ্টেশনে···

শ্রীলতার হাত থেকে চায়ের কৌটো নেন বড়গিন্নী। দু'চামচ চায়ের পাতা জলে ছেড়ে দিয়ে চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে হঠাৎ বলে উঠেন, মাণিক গিয়েছে ষ্টেশনে, ভালই হয়েছে।

শ্যামলীর মনটা চমকে ওঠে, পিতাপুত্র একসঙ্গে ফিরে আসবে, প্রথম দৃষ্টিতেই কি পিতা চিনবে পুত্রকে ! চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে শ্যামলী, গায়ে কত রকমের গহনা, ননদেরা পরিয়েছে জোর করে, মাণিকটা দেখলে বলবে কি···

শ্যামলী বলে, মা এবার হয়ে গিয়েছে···

শ্রী হাতটা বাড়িয়ে বাধা দেয়, না মা ভিজুক আর একটু, এটা প্রথম পেয়ালা মায়ের হাতের। বুঝলে বৌদি বড়দা ত এসে পড়ল বলে···

সুখলতা কথাটায় সায় দেয়, ঠিক ঐ প্রথম পেয়ালার চা-ই দেওয়া ভাল বড়ছেলেকে।

সুলতা আপত্তি তোলে, বেশ বললে, যদি দেরী হয় দাদার আসতে, ঠাণ্ডা চা দেবে না কি !

বড়গিন্নী টিপট থেকে পেয়ালায় চা ঢালেন ধীরে ধীরে। পেয়ালাটা পূর্ণ হয়ে ওঠে, ওদের কথাবার্ত্তা বন্ধ হয়ে যায়। পাত্র থেকে দুধ মেশাতে চমৎকার একটা রং ফুটে ওঠে। দু'চামচ চিনি তুলে দেয় শ্রী মায়ের হাতে, চিনি মিশিয়ে সন্তর্পণে নাড়েন চা-টা—কেউ কথা কয় না।···

বড়কর্ত্তার চটির শব্দ পাওয়া যায়। গম্ভীর মুখে তিনি ঢুকেন ঘরে। চা হয়ে গিয়েছে, বড় গিন্নী হাসিমুখে তাকালেন কর্ত্তার দিকে, কর্ত্তা ম্লান হাসি হাসেন, তারপর বলেন, 'বড়গিন্নী, খোকা টেলিগ্রাম করেছে'— একটুখানি চুপ করে বলেন আবার, 'খোকা চাকরী পেয়েছে, এখন আসতে পারছে না'।

দরজার পাশে মুকি ঝিটা এসে দাঁড়িয়েছিল। পা টিপে টিপে চলে যায়। কর্ত্তা যেন কি বলতে চান, কিন্তু কিছু না বলেই বেরিয়ে যান ঘর থেকে। রান্না ঘরের দিকটা চুপচাপ হয়ে গিয়েছে। শ্যামলীও বেরিয়ে যায়। বারান্দায় এসে রেলিং ধরে দাঁড়ায় একটু। বিনু আর অতু গলা জড়িয়ে কি পরামর্শ করছিল, বিনুর চোখ পড়ে মামীমার ওপরে।

—ইস্ মামীমার হাতের চুড়িগুলি দেখ, কি রকম চিক্ চিক্ করছে।

শ্যামলী মনে মনে বলে, মাণিক গিয়েছে ষ্টেশনে, নিজের ঘরে এসে আশ্রয় নেয়।

বড়গিন্নীর ঘর ছেড়ে ওরা চলে যায় একে একে। বিনু বুঝি গিয়েছিল একবার মায়ের কাছে, ফিরে এসে নালিশ জানায়।

—দিদীটা, কাঁদছে কেন ?

বড়গিন্নীর কান্না, শব্দহীন। চোখের জল গড়িয়ে মোটা মুখখানি করুণ হয়ে ওঠে।

* * *

ছেলেমেয়েদের চেঁচামেচি বন্ধ হয়ে যায় ক্রমে। রান্না-ঘরের দিকে গোটাকয়েক কাক এসে জোটে। কা কা করে একটা বিবাদের সূত্রপাত করছিল, মুকি একটা ঝাঁটা নিয়ে তাড়া দেয়।

—'মরণ হয় না, মর মর। যত শত্তুর!'

নীরব নিস্তব্ধ বাড়িতে একটা গাড়ী এসে দাঁড়ায়। মাণিক আর তার বড় পিসেমশায় সুরেনবাবু, মেজ জামাই পরেশ আর তার ছোট ভাই, একে একে সবাই গাড়ী থেকে নেমে আসে চুপচাপ। কর্ত্তা দাঁড়িয়ে আছেন দোরগোড়ায়, সুরেনবাবু কিছু বলবার উদ্যোগ করতে কর্ত্তা হাতের টেলিগ্রামটা নেড়ে বলেন, হঁয়ে, টেলিগ্রাম করেছে খোকা, এখন আসতে পারছে না।

ওরা উপরে চলে যায় নীরবে।

গিন্নীর ঘরটা খালি, কোন রকমে মোটা দেহটাকে টেনেটুনে তিনি খাটে গিয়ে উঠেছেন। মেঝের উপর টিপট, একটা কেৎলি, দুধের পট, চিনি আর চা-পাতার কৌটো আর এক পেয়ালা চা—জলের একটা ধারা মেঝের উপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়েছে।

পর্দ্দা সরিয়ে সবাই দেখে যায় ঘরটা, চোখ পড়ে গিন্নীর উপর, নজরে পড়ে চায়ের পেয়ালা।

বহুক্ষণ কেটে যায়। শ্রী আসে কি বলতে, বলা হয় না। বড়গিন্নী বলেন, নারে থাক, কিছু খেতে আমার··· আর বলতে পারেন না। শ্রী বেরিয়ে যায়।

মুকি আসে ঝাঁটা নিয়ে রান্নাঘর ঝাঁট দিতে। কেৎলি, টিপট সব নিয়ে যায় গজ্ গজ্ করতে করতে। বড়গিন্নী চেয়ে থাকেন নীরবে। মোক্ষদা আবার আসে, বিবর্ণ ঠাণ্ডা চা-টা নিয়ে চলে যায় বাইরে, কলতলায় নর্দ্দমায় ঢেলে দেয়। কানাই এক বোঝা বাসন মাজছিল, চাপা সুরে একটা ধমক দেয়:—অই অই মুকি, ওকি করছিস, পেয়ালাভরতি চা ঢেলে দিলি নর্দ্দমায়।

বিবেকানন্দ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

তুমি ত্যাগী, তুমি যোগী, বৈদান্তিক তুমি যে সন্ন্যাসী,
তবুও বৈরাগী নহ, সেবাব্রতী বিরাট মানব,
জীবে প্রেম শিক্ষা দিলে, এনে দিলে মানস-বিপ্লব,
আত্মার সন্ধান পেলে এ-আত্মবিস্মৃত দেশবাসী।
নব জীবনের গানে নব যুগ উঠিল উচ্ছ্বাসি,
যে বাণী মন্দ্রিত হ'ল আজো তাহা হয়নি নীরব।
প্রচারিলে সারা বিশ্বে, বীর শিষ্য, গুরুর গৌরব,
চাহিলে দেশের মুক্তি, মন্ত্রদ্রষ্টা হে মোক্ষপ্রয়াসী!

অবজ্ঞাত যে দেবতা চিরভেদক্লিষ্ট এ সংসারে,
সে দরিদ্র-নারায়ণে সেবিবার দিলে যে নির্দ্দেশ।
ভারত প্রবুদ্ধ হ'ল ও-বাণীর বিদ্যুৎ-সঞ্চারে,
কর্ম্মযোগী, তব পাশে কর্ম্মের প্রেরণা পেলে দেশ
ধরণী সমৃদ্ধ করি' অধ্যাত্মের ঐশ্বর্য্য-সম্ভারে,
শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য মনোরাজ্যে করিলে প্রবেশ।

ভারতের জল-তাড়িত বিদ্যুৎ

শ্রীশিবব্রত ঘোষ

কোন দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে সেই দেশের শক্তির সংস্থান, প্রাচুর্য্য ও উহার সহজলভ্যতার উপর। বিশেষতঃ এই যান্ত্রিক বা কলকারখানার যুগের অর্থনৈতিক উন্নতি শক্তির উৎস ও তাহার সরবরাহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। শক্তির উৎস বলিতে প্রধানতঃ বুঝায় কয়লা, খনিজ-তৈল এবং জল-তাড়িত বিদ্যুৎ-শক্তি। এ পর্য্যন্ত শক্তি উৎপাদনে কয়লা এবং খনিজ-তৈলের ব্যবহার অধিকমাত্রায় প্রচলিত হইলেও জল-তাড়িত বিদ্যুতের প্রাধান্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আশা করা যায়, কিছুকালের মধ্যেই কয়লা বা খনিজ-তৈল অপেক্ষা জল-তাড়িত বিদ্যুৎ শক্তি-উৎপাদনের জন্য অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইবে। কারণ কয়লা ও খনিজ-তৈলের সংস্থান অনেক পরিমাণে সীমাবদ্ধ। ক্রমাগত উত্তোলনের ফলে এই দুই খনিজ পদার্থের সঞ্চয় কোন এক সময়ে নিঃশেষিত হইবে; অর্থাৎ উহাদের ভাণ্ডার শূন্য হইয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, একবার শূন্য হইলে ইহাদের স্থান আর পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু জল-তাড়িত বিদ্যুতের ভাণ্ডার অফুরন্ত। যে দেশের পার্ব্বত্যপ্রদেশে প্রবাহিত নদনদী সারা বৎসর নিয়মিত প্রচুর পরিমাণ জল সমানভাবে সরবরাহ করিয়া গতিপথে এক বা একাধিক জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়া প্রবাহিত হয়, সে দেশে জল-তাড়িত বিদ্যুৎ চিরকালই উৎপন্ন করা যায়। অর্থাৎ জল-তাড়িত বিদ্যুতের ভাণ্ডার শূন্য হইবার নহে। কয়লা বা খনিজ তৈল উত্তোলন করিবার কাল হইতে উহাদ্বারা শক্তির উৎপাদন পর্য্যন্ত প্রচুর ব্যয় পড়িয়া যায়, কিন্তু জল-তাড়িত বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে সেরূপ ব্যয় হয় না; এই শক্তির উৎপাদন ব্যয় অল্প। এই সকল কারণে জল-শক্তির প্রাধান্য ও ব্যবহার জগতের বিভিন্ন দেশে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

বর্ত্তমানে অধিক পরিমাণে জল-তাড়িত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ভারতে বিশেষ প্রয়াস চলিতেছে। ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থা এই বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের বিশেষ সহায়ক বলিয়া এদেশের মোট জল-তাড়িত বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা বা ক্ষমতা রহিয়াছে প্রচুর। বিশেষজ্ঞদিগের মতে একমাত্র কোশী পরিকল্পনার মত একটি পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলেই তাহা হইতে উৎপন্ন বিদ্যুতের দ্বারা ভারতে রেল চলাচলে নিয়োজিত সমস্ত শক্তির সমপরিমাণ শক্তি সরবরাহ করা যাইতে পারে। যাহা হউক, নীচের তালিকাটি লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জল-তাড়িত বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন দেশগুলির মধ্যে ভারতের স্থান কোথায়:

বিভিন্ন দেশে জল-শক্তি উৎপাদন সম্ভাবনা

দেশের নাম	মোট উৎপাদন-ক্ষমতা লক্ষ অশ্বশক্তি
সোভিয়েট রুশিয়া	৭৮১
ভারতবর্ষ	৩৯০
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৩৩৫
কানাডা	২৬১
চীন	২৩০
নরওয়ে	১৬০
জাপান	৭২
ফ্রান্স	৬০
সুইডেন	৪০
সুইজারল্যাণ্ড	৩৬
জার্ম্মানী	২০
ব্রিটেন	৭
পাকিস্তান	৫

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, সম্ভাবনার দিক হইতে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। কিন্তু জল-তাড়িত বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণের দিক হইতে অবস্থা অন্যরূপ। জগতের বিভিন্ন দেশের মোট উৎপাদিত জল-তাড়িত বিদ্যুতের পরিমাণের তুলনায় ভারতের স্থান নগণ্য। এক্ষেত্রে পরিমাণের দিক হইতে সোভিয়েট রুশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার নামই উল্লেখযোগ্য; কিন্তু জল-শক্তি উৎপাদনের উৎকর্ষের দিক হইতে ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড, নরওয়ে, জার্ম্মানী ও জাপানের নামই সর্ব্বাগ্রে করিতে হয়। কয়লা বা খনিজ-তৈলের সাহায্য না পাইয়াও একমাত্র জল-তাড়িত শক্তির সহায়তায় বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের দ্বারা দেশের কত দূর উন্নতিবিধান করা যায় তাহার দৃষ্টান্ত হইতেছে ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড ও নরওয়ে। যাহা হউক, বর্ত্তমান কালে জগতের কোন্ দেশ কি পরিমাণ জল-তাড়িত বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতেছে তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল:

দেশের নাম	উৎপন্ন শক্তি লক্ষ কিলোওয়াট
সোভিয়েট রুশিয়া	২২৪
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	১৪৫
কানাডা	৭৭

জাপান	৫৮
ফ্রান্স	৩৭
জার্ম্মাণী	৩২
সুইডেন	২৬
নরওয়ে	২৪
সুইজারল্যাণ্ড	২৪
চীন	৬
ভারতবর্ষ	৫
ইংলণ্ড	৫
নিউজিল্যাণ্ড	৫
অষ্ট্রেলিয়া	৩

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে, বর্ত্তমানে ভারত মাত্র ৫ লক্ষ কিলোওয়াট জলতাড়িত-বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতেছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় এই পরিমাণ অতি নগণ্য; কারণ যে পরিমাণ বিদ্যুৎ ভারতে উৎপন্ন হইতে পারে ইহা তাহার শতকরা ১·৩ ভাগ মাত্র। সুতরাং জল-তাড়িত বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভারত এখনও অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতে প্রথমে জল-তাড়িত বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৮৯৭ সালে এবং কানাডায় স্থাপিত হয় ১৯০০ সালে। অর্থাৎ ভারতের তিন বৎসর পরে প্রথম কারখানা স্থাপিত করিয়াও কানাডা বর্ত্তমানে ভারতের উৎপন্ন বিদ্যুতের মোট পরিমাণের ১৫ গুণ উৎপাদন করে।

১৮৯৭-৯৮ সালে দার্জ্জিলিং শহর আলোকিত করিবার উপযোগী ভারতের প্রথম বেসরকারী জল-তাড়িত বিদ্যুতের কারখানা স্থাপিত হয়। ১৯৬০ কিলোওয়াট পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করিবার সামর্থ্য ইহার ছিল। ইহার পর ১৯০২ সালে অপর একটি কারখানা মহীশূরে স্থাপিত হয়। উহার পর হইতে ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে মোট ১৫টি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এইগুলির সম্মিলিত উৎপাদনের পরিমাণ ৪০৪৫১০ কিলোওয়াট। ইহাদের মধ্যে ৯টি কেন্দ্রের মালিকানা-স্বত্ব সরকারের; অবশিষ্টগুলি বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক পরিচালিত। ভারতে উৎপন্ন বিদ্যুতের প্রায় সমুদয় অংশই শহরবাসীদের জন্ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণ লোক এবং গ্রামবাসিগণ বৈদ্যুতিক শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ বলিলেই হয়। মাদ্রাজ ও মহীশূর ব্যতীত অন্য কোনও রাজ্যের গ্রামসমূহে আজ পর্য্যন্ত কাহারও বিদ্যুতের আলো ব্যবহার করিবার সৌভাগ্য হয় নাই। ভারতের উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তির শতকরা ৫০ ভাগ কেবল বোম্বাই ও কলিকাতা শহরের জন্ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জল-তাড়িত বিদ্যুৎ উৎপাদনে বোম্বাই বিশেষ উন্নত। বর্ত্তমানে ভারতের কোন্ রাজ্য কত পরিমাণে এই শক্তি উৎপন্ন করিতেছে তাহার হিসাব দেখান গেল :

বিভিন্ন রাজ্যে উৎপাদিত জল-তাড়িত বিদ্যুৎ

নাম	কিলোওয়াট
বোম্বাই	২৩৫৭১৪
মাদ্রাজ	৯৮২৯০
মহীশূর	৭১২০০
পূর্ব্ব পঞ্জাব	৪৯৭৫০
উত্তর প্রদেশ	২২৭০০
ত্রিবাঙ্কুর	১৩৯০০
কাশ্মীর ও জম্মু	৪৩১৫
পশ্চিম বাংলা	২৩৬০
আসাম	৫০০

ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্ম ব্যাপকভাবে শিল্পপ্রসারের একান্ত প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই ভারতে শিল্পোন্নতির সূচনা হইয়াছে। ভারতে খনিজ-তৈলের অভাব, প্রয়োজনানুযায়ী কয়লার অপ্রাচুর্য্য আছে, কিন্তু জলজ-শক্তি উৎপাদন স্বল্প ব্যয়সাধ্য সেই হেতু শিল্পোন্নতির জন্ম ভারত-রাষ্ট্র আজ এদিকে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ভারতে অধিকতর জল-শক্তি উৎপাদনের জন্ম নানারূপ চেষ্টা চলিতেছে। ভারত-সরকার ছোট বড় নানারূপ মোট ১৯টি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনাগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য হইল ভারতীয় শিল্পকেন্দ্রগুলিকে প্রয়োজনানুরূপ জল-তাড়িত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা। ভারতের যন্ত্র-শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিসরবরাহের জন্ম এবং দেশকে উপযুক্ত ভাবে আলোকিত করিতে হইলে মোট ৪৪৯৯০ লক্ষ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন। ১৯৪৮ সালে ভারতে মোট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইয়াছিল ১৪২২০ লক্ষ কিলোওয়াট এবং তন্মধ্যে জল-তাড়িত বিদ্যুতের পরিমাণ ছিল পাঁচ লক্ষ কিলোওয়াটের কিছু বেশী। বর্ত্তমানে যে সকল জলশক্তি উৎপাদনের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইতেছে এবং যেগুলির পরিকল্পনা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে সেগুলি চালু হইলে ভারতে আরও ১ কোটি ৪০ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাইবে। ফলে পৃথিবীতে সর্ব্বাধিক জল-তাড়িত বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পরেই ভারত-রাষ্ট্র স্থান লাভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

ভারতে অধিক পরিমাণ জল-তাড়িত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্ম ভারত-সরকার যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কতকগুলির কার্য্য ইতিমধ্যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, কতকগুলির কার্য্য আরম্ভের জন্ম বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান চলিতেছে; এতদ্ব্যতীত কতকগুলি পরিকল্পনা সবেমাত্র গ্রহণ করা হইয়াছে। যে সকল পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে দামোদর-উপত্যকা পরিকল্পনার নামই প্রথম করিতে হয়। বিহার এবং

পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত দামোদর নদীর জলকে বাঁধ বাঁধিয়া আটকাইয়া বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইবে এবং উহার দ্বারা জল-তাড়িত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে, ইহাই হইল উক্ত পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। বিহারে দামোদর উপত্যকার যে অংশ তাহার বিভিন্ন স্থানে ১০টি বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া উহা হইতে জলতাড়িত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইবে। বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করিয়াছেন এই পরিকল্পনার কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে ৩০০০০০ কিলোওয়াট জল-শক্তি পাওয়া যাইবে।

মহানদী উপত্যকা পরিকল্পনা

ইহা দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা। উড়িষ্যার মহানদী উপত্যকায় তিনটি বাঁধদ্বারা জল অবরোধ করিয়া বিভিন্ন কার্য্যে নিয়োজিত করা হইবে এবং ইহার দ্বারা প্রায় ৪০,০০০০০ লক্ষ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইবে। ইহার তিনটি বাঁধের মধ্যে হীরাকুণ্ড বাঁধের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

ডাকরা ও নাঙ্গল পরিকল্পনা

পূর্ব্বপঞ্জাবের শতদ্রু নদীর উপর ডাকরা ও নাঙ্গল নামক স্থানে দুইটি বিরাট জলাধার নির্ম্মাণ করিয়া উহার জলপ্রপাতের ব্যবহার দ্বারা দুইটি জল-তাড়িত বিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপিত করা হইতেছে। এই দুই কেন্দ্র হইতে যথাক্রমে ১৬০০০০ ও ৪৮০০০ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যাইবে।

এ ছাড়া অন্যান্য জল-তাড়িত বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী যে সকল পরিকল্পনাকে বর্ত্তমানে কার্য্যকরী করা হইতেছে তাহাদের মধ্যে মাদ্রাজের তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা, পশ্চিম বাংলার মোর পরিকল্পনা এবং উত্তরপ্রদেশ ও বিহাররাজ্যের শোননদী-উপত্যকা-পরিকল্পনার নামও উল্লেখযোগ্য। এই পরিকল্পনা-গুলির কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে যথাক্রমে ৬০০০০ কিলোওয়াট ৩০০০ কিলোওয়াট ও ১৫০০০০ কিলোওয়াট জল-তাড়িত বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইবে।

যে সকল পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানাদি করা হইতেছে তাহাদের মধ্যে কোশী পরিকল্পনা, তিস্তা পরিকল্পনা, মাদ্রাজের রামপদসাগর পরিকল্পনা ও মধ্য-ভারতের নর্ম্মদা, তাপ্তী উপত্যকা পরিকল্পনাই প্রধান। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কোশী পরিকল্পনা ও তিস্তা পরিকল্পনা হইতেই ১ কোটি ৮০ লক্ষ কিলোওয়াট এবং ৩ লক্ষ কিলোওয়াট জল-শক্তি উৎপাদন সম্ভব হইবে। উল্লিখিত পরিকল্পনাগুলি ব্যতীতও বহু পরিকল্পনা ভারত-সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। সরকারী মতে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে এই সকল পরিকল্পনার কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে। সুতরাং আমরা আশা করিতে পারি যে, ১৯৬০ সালের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনে ভারত বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।

শ্রীঅরবিন্দ-স্মরণে

শ্রীএণা দেবী

বর্ত্তমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ঋষিকল্প মহাপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে কোন কথা বলতে যাওয়া যে আমার পক্ষে কতটা ধৃষ্টতার পরিচায়ক তা আমার অবিদিত নেই। কিন্তু বিরাট অনন্তের যে মহিমা প্রদীপ্ত সূর্য্য প্রকাশ করে, ক্ষুদ্র বনফুলেও কি তাই প্রকাশমান নয়? পূর্ণিমার চাঁদ দেখে সাগরের জলে তরঙ্গ ওঠে, বৃহৎ নদ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তবু সমুদ্রাভিমুখী ক্ষুদ্র নদীটির বুকে যে স্পন্দন জাগে সেও যে তারই আবেগে, একথা ত অস্বীকার্য্য নয়।

১৯২৯ সালে যখন বঙ্গব্যাপী প্রচণ্ড বৈপ্লবিক আন্দোলনের গোপন প্রস্তুতি চলছিল সেই সময় শ্রীঅরবিন্দের নাম বিশেষ ভাবে শুনি। কে তিনি? অতি পবিত্র এই নাম নবীন কর্ম্মীদলের মধ্যে মুখে মুখে ঘুরতে লাগল। অরবিন্দ বাংলা, তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-যজ্ঞের প্রথম ঋত্বিক, বিপ্লববাদের জন্মদাতা। শোনা গেল, তিনি মহাপণ্ডিত, ইংলণ্ডে প্রতিপালিত —শোনা গেল, করায়ত্ত বিপুল ঐশ্বর্য্য তিনি ত্যাগ করেছেন দেশের মুক্তিকামনায়। বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে তিনিই নাকি প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে তাকে রূপায়িত জীবন্ত করে তুলেছেন। দেশকে ভৌগোলিক সীমার মধ্যে নিবদ্ধ না রেখে তাকে মাতৃরূপে চিন্তা করার যে কল্পনা বঙ্কিম দিয়েছিলেন অরবিন্দই প্রথম তাকে স্বীকার করে নিলেন। সেদিন দেশ-প্রাণ, জনসাধারণ এই বিপ্লবীকে নবীন দল মনে মনে শ্রদ্ধা জানাল। সেদিন ও আজকের দিনে অনেক প্রভেদ—সেদিন কি তাঁকে জানার উপায় ছিল? স্বাধীনতার যজ্ঞাগ্নিতে যাঁরা সমিধ জুগিয়েছেন তাঁদের নামই উচ্চারণ করা তখন নিষিদ্ধ ছিল। তার পর নিজেকে অরবিন্দ গোপন করে রেখে-ছিলেন সুদূর পণ্ডিচেরীর আশ্রমে। দুরন্ত মনকে আকর্ষণ করে।

তাঁর কথা জানবার আমাদের উপায় ছিল না, তবু এই রহস্যময় অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে জানবার জন্য মনের মধ্যে একটা ব্যাকুলতা জেগেছিল।

১৯৪৬ সালে পণ্ডিচেরীর উৎসব-মুখরিত সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে অন্তরের স্পন্দন অনুভব করছি। শ্রীঅরবিন্দ সন্দর্শনে এসেছি। কি দেখব? কেমন দেখব? বিভিন্ন দেশ থেকে এত যে লোক সমাগত হয়েছে তাঁর দর্শনের আশায়—সে কিসের প্রেরণায়? সেই মহাবিপ্লবী মহাজ্ঞানী কি রত্ন আহরণ করেছেন বিশ্ববাসীর জন্য। ভারতের নানা প্রদেশের লোক চারদিকে ভিড় করেছে। দেশমান্য মনীষীদের উপস্থিতির আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাঁদের মধ্যে। ৪৬-এর সেই আগষ্ট মাসে অখণ্ড বাংলার অতিনগণ্য এক অধিবাসী আমার মনে অকস্মাৎ একটা অহঙ্কার জাগল। স্পষ্ট বুঝলাম এত দূর দেশেও আমি অপরিচিত নই—আমার একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত পরিচয় প্রকাশমান—আমি বাঙালী; শ্রীঅরবিন্দের স্বদেশবাসী। লোকগুরু শ্রীঅরবিন্দ বাংলামায়েরই দরদী সন্তান।

১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দ দর্শনদান করেন। নিঃশব্দে সশ্রদ্ধচিত্তে হাজার হাজার লোক প্রতীক্ষমাণ। সকলেই উপবাসী, দর্শন না করে জলগ্রহণ করবেন না। ক্রমানুসারে দর্শনলাভ করতে অনেক বেলা হয়ে যায়। তবু প্রতীক্ষারত নর-নারীর মধ্যে চাঞ্চল্য নেই। সকলের হাতে পুষ্পগুচ্ছ। ফুলের গন্ধে চারদিক ভরে আছে। এত ফুলের সমারোহও বিস্ময়কর। কম্পিত বক্ষে জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, মনে প্রশ্ন জাগছে—এত লোকের এই যে ব্যাকুলতা কি দেখবে বলে? কি দেখব? যে সনাতন ভারতবর্ষ যুগে যুগে বিশ্বকে অমৃত বিলিয়েছে তাকেই কি দেখতে পাব। নিভৃতে ধ্যানময় এই যোগীপুরুষে কি প্রত্যক্ষ করব। অনেক লোকের সঙ্গে সতর্ক পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছি। সিঁড়ির উপরে একটা ছোট ঘরে সুদৃশ্য পর্দা দিয়ে সজ্জিত জায়গায় বড় একখানা সোফায় মায়ের পাশে শ্রীঅরবিন্দ উপবিষ্ট। প্রথম দৃষ্টিপাতেই মন চমকে উঠল। এই ত শাশ্বত ভারতবর্ষ। শুভ্র বর্ণ—অংসোপরি বিলম্বিত শুভ্রকেশ, পরিধানে গরদের ধুতি ও চাদর, চোখের পানে পলকের জন্য মাত্র তাকাতে পারা গেল। মানবচক্ষু যে এত প্রদীপ্ত হতে পারে তা কল্পনাতীত। অকস্মাৎ আমার মন বলে উঠল এই তো বিশ্বামিত্র। অরবিন্দ নিজে এক বার স্ত্রীকে লিখেছিলেন, "ক্ষাত্রবলই একমাত্র বল নয় আমি তার সঙ্গে জ্ঞানকে মিলাতে চাই"—তাই বটে ক্ষাত্রতেজে ব্রহ্মতেজে মিশ্রিত এ এক দিব্য জ্যোতিঃপুঞ্জ। বৈশাখের সূর্য্যকে যদি কেউ বর্ণনা করতে পারেন, যজ্ঞাগ্নিকে যদি রূপ দেওয়া সম্ভব হয় তবে এই মহাতপস্বীকে বর্ণনা করা সাধ্যায়ত্ত হতে পারে। যে জ্ঞানী ভারতবর্ষকে মনে মনে আমরা চিরদিন পূজা করে আসছি শ্রীঅরবিন্দকে দেখলাম সেই ভারতেরই মূর্ত্তবিগ্রহস্বরূপ—শান্তসমাহিত তেজঃপুঞ্জ। প্রসন্নতায় মন ভরে গেল। প্রণাম করে হাতের পুষ্পগুচ্ছ ও প্রণামী সম্মুখস্থ টেবিলে রেখে তেমনি নিঃশব্দে নেমে এলাম। দুয়ারের নিকট ধুতি ও গরদের পাঞ্জাবী পরিহিত একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক স্ত্রীপুত্রকন্যা সহ দাঁড়িয়ে ছিলেন। একটি সুগভীর শ্রদ্ধাও যেন তাঁকে ঘিরে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। দেখে মনে হ'ল এই বিজ্ঞানের যুগেও নূতন চিন্তা এবং ভাবধারায় ভাবিত পশ্চিমকেও জ্ঞানের জন্য ভারতেরই দ্বারস্থ হতে হয়েছে।

মহাপুরুষের কি মৃত্যু আছে? তিনি নিজে বলেছেন, বাসুদেব যে জ্ঞান বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তি দান করেছেন তা তাঁকেই প্রত্যর্পণ করা উচিত। জীবনের সুদীর্ঘকাল শ্রীঅরবিন্দ সেই অমৃতের সাধনাই করেছেন। জনসাধারণ হতে বহু দূরে বাস করেও তিনি আপন অন্তরের মকরন্দ গোপন করতে পারেন নি—অমৃতপিপাসী মধুপচিত্ত আপনা হতেই এসে ভিড় করেছে। দিব্য অরবিন্দের আত্মিক স্পর্শে নিজেকে পবিত্র বলে মনে করেছে। দেহত্যাগ ঘটলেও এই দিব্য-মানব অরবিন্দের সৌরভ কি বিলীন হয়ে যাবার? যুগধর্ম্মানুযায়ী চিন্তাধারার সঙ্গে মিলিয়ে ভারতীয় দর্শনকে তিনি প্রচার করেছিলেন—আবার ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য নূতন কোনো মহামানবের অভ্যুদয় না হওয়া পর্য্যন্ত লীলাময়ের লীলারবিন্দের সৌরভ অক্ষয় থাকবে নিঃসন্দেহ।

ভারতীয় সংবিধানে মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষা

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ভারতীয়গণ কর্তৃক সার্বভৌম গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রণয়ন ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। অবশ্য কোন দেশে কোন কালেই মানুষের রচিত সংবিধান সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিশূন্য হয় নাই। আমাদের দেশের সংবিধানের ভুলত্রুটি থাকিতে পারে, কিন্তু উহা যে খুবই কৃতিত্বের সহিত প্রণয়ন করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ইতিমধ্যে মৌলিক অধিকার লইয়া রাষ্ট্রপরিচালন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে মতানৈক্য প্রকাশ পাওয়াতে এবং উহার জন্ত শাসনকার্যে কিছু কিছু প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হওয়ার দরুন নানা উদ্বেগের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কিন্তু আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে সংবিধানের যথারীতি সংশোধন দ্বারা এই অসামঞ্জস্য দূরীভূত হইবে।

মৌলিক অধিকার

সংবিধানের ২৯ (১) ধারায় এরূপ ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে যে, ভারতরাষ্ট্রের কোন স্থানে কোন এক শ্রেণীর নাগরিকগণের বিশেষ কোন ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতি বর্তমান থাকিলে তাঁহাদের তাহা রক্ষা করিবার অধিকার থাকিবে।

ঐ ধারার (২) উপধারায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাষ্ট্রকর্তৃক স্থাপিত বা রাষ্ট্রের সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্ম, জাতি ও ভাষার অজুহাতে কোন শিক্ষার্থীর প্রবেশ নিষিদ্ধ করা যাইবে না।

সংবিধানের ৩০ ধারার (১) এবং (২) উপধারায় ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় মৌলিক অধিকারের বিষয় আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, যে-কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের (ধর্ম ও ভাষার দিক দিয়া) নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনের অধিকার থাকিবে এবং রাষ্ট্র কোন সংখ্যালঘু ধর্মসম্প্রদায় বা ভাষাভাষীর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনে সংখ্যালঘুদের জন্ত সাহায্যদানে অস্বীকৃত হইবে না।

ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ভারতের দূরদর্শী রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ সংবিধান প্রণয়নের সময় সংখ্যালঘুদের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকাররূপে এই সকল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বহু জাতি, বিভিন্ন সংস্কৃতি ও নানা ভাষাভাষীর দেশ এই ভারতবর্ষ। সুতরাং এদেশের পক্ষে এইরূপ বিধান যে খুব সমীচীন হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যবিধানের ঐতিহ্য ভারতের আছে। ভারতবর্ষের আদর্শ মহাভারতের সৃষ্টি। এই মহান্ আদর্শই ধ্বংসের হাত হইতে বহু মানবগোষ্ঠি, ভাষা ও সভ্যতার দেশ ভারতবর্ষকে আজ পর্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে এবং নবরচিত সংবিধানও ভারতের জাতীয় আদর্শের উপযোগী হইয়াছে।

রাষ্ট্রভাষা হিন্দী

সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে অবহিত থাকিলেও ভারতীয় সংবিধান সমগ্র ভারতের ঐক্যের জন্ত সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে দেবনাগরী অক্ষরের হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়াছে। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কীয় বিধানগুলি সংবিধানের সপ্তদশ অংশে লিপিবদ্ধ আছে। ৩৪৩ ধারার (১) উপধারায় দেবনাগরী লিপিতে লিখিত হিন্দী ভাষাকে ভারতের সরকারী ভাষা করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিধানে ইংরেজী আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহারের বিধি আছে। অবশ্য সাময়িকভাবে পনর বৎসরের জন্ত ইংরেজী ভাষাকে সরকারী ভাষা রাখা হইয়াছে। কিন্তু এই পনর বৎসরের মধ্যেও রাষ্ট্রপতি ইংরেজী ভাষা ও সংখ্যা-ব্যতীত হিন্দী ভাষা ও সংখ্যা যে-কোন সরকারী কার্যে ব্যবহৃত হইবার জন্ত নির্দেশ দিতে পারিবেন। এখানে সংবিধানের উদ্দেশ্য পরিষ্কাররূপেই বুঝা যায়। ইংরেজ ভারত ত্যাগ করিয়াছে, ভারতে সার্বভৌম গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সুতরাং ইংরেজী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে রাখা ভারতের পক্ষে গৌরবের নহে। স্বাধীন দেশে স্বদেশীয় ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হয়, ইহা বুঝাইতে যুক্তিতর্কের আবশ্যক করে না। তবে ভারত এত দিন ইংরেজের অধীন ছিল, সরকারী কাগজপত্র রাখা, শিক্ষা প্রভৃতি ইংরেজীর মাধ্যমে হইয়াছে বলিয়া এই ভাষা এদেশের শিক্ষিত-মহলে সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহাকে স্থানচ্যুত করিয়া স্বদেশী ভাষার প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী হইলেও কিছু সময়সাপেক্ষ, এজন্তই পনর বৎসর সময় লওয়া হইয়াছে। আশা করা যায়, এই সময়ের মধ্যে একদিকে যেমন অ-হিন্দী ভাষাভাষী প্রদেশগুলিতে হিন্দীভাষার বহুল প্রচার হইতে পারিবে, অন্য দিকে সরকারী দপ্তরে ক্রমে ক্রমে হিন্দীভাষা প্রতিষ্ঠালাভ করিবে। হিন্দীর ক্রমপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কেও পরবর্তী ধারাগুলিতে ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রভাষার ক্রমপ্রসার

৩৪৪ (১) ধারায় লিখিত হইয়াছে যে, সংবিধান কার্যকরী হইবার (২৬ শে জানুয়ারী ১৯৪৯) পাঁচ বৎসর পরে, রাষ্ট্রপতি একজন সভাপতি ও সংবিধানের অষ্টম তপশীলে উল্লিখিত চৌদ্দটি বিভিন্ন ভাষার (প্রাদেশিক) প্রতিনিধি লইয়া একটি কমিশন নিযুক্ত করিবেন। এই কমিশন রাষ্ট্রপতির নিকট নিম্নলিখিত বিষয়ে সুপারিশ করিবেন :

(ক) ভারতরাষ্ট্রে হিন্দীভাষা সরকারী কার্য্যের জন্ম কিরূপে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে ;

(খ) কিভাবে ইংরেজী ভাষার সরকারী ব্যবহার সংকোচ করা যায় ;

(গ) ৩৪৮ ধারায় উল্লিখিত বিষয়গুলির কোন্‌টাতে বা সমপ্রভাবে কোন্ ভাষার ব্যবহার হইবে ;

(ঘ) রাষ্ট্রের দপ্তরে কোন্ প্রকার সংখ্যামালার ব্যবহার হইবে ;

(ঙ) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার কিংবা বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে কোন্ ভাষায় চিঠিপত্র বা লেখার আদান-প্রদান হইবে, এই বিষয়েও কমিশন রাষ্ট্রপতির নির্দ্দেশ-ক্রমে অভিমত জ্ঞাপন করিবেন।

উপরোক্ত বিধানের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে একটু আলোক-পাত হওয়া দরকার। যে তপশীলভুক্ত চৌদ্দটি ভারতীয় ভাষার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা (১) অসমীয়া, (২) বাংলা, (৩) গুজরাটি, (৪) হিন্দী, (৫) কানাড়ী, (৬) কাশ্মীরী, (৭) মালয়ালম, (৮) মারাঠী, (৯) ওড়িয়া, (১০) পঞ্জাবী (১১) সংস্কৃত, (১২) তামিল, (১৩) তেলেগু এবং (১৪) উর্দ্দু। এই সকল ভাষার প্রতিনিধিগণ রাষ্ট্রপতি-নিযুক্ত কমিশনের সদস্য হইবেন —উপরোক্ত (গ) বিধানে ৩৪৪ ধারায় এরূপ উল্লেখ আছে। উক্ত ধারায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে, পার্লামেণ্ট অপর কোন ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত, ইংরেজী ভাষার ব্যবহার চলিবে এরূপ বিধান আছে :

(ক) সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের কার্য্যবিবরণী ;

(খ) পার্লামেণ্টে বা প্রাদেশিক আইন সভাসমূহে যে সকল আইনের খসড়া (বিল) উপস্থাপিত হইবে ;

(গ) পার্লামেণ্ট, প্রাদেশিক আইন-সভা কর্ত্তৃক যে সকল আইন, বা রাষ্ট্রপতি রাজ্যপাল এবং রাজপ্রমুখ কর্ত্তৃক যে সকল অর্ডিনান্স জারি হইবে ;

(ঘ) ইহা ব্যতীত সকল অর্ডার, রুল, রেগুলেশন এবং উপবিধি যাহা সংবিধান অনুযায়ী পার্লামেণ্ট বা প্রাদেশিক আইন-সভার মতে প্রকাশিত হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সংবিধান অনুযায়ী আইন সম্পর্কীয় বিষয়ে ইংরেজী ভাষার প্রাধান্য স্বীকার ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় অপর কোন ব্যবস্থার সৃষ্টি করা সম্ভব নহে, একটু ভাবিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তদন্ত

কমিশন রিপোর্ট দাখিল করিবার পূর্ব্বে ভারতের শিল্প, সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং অ-হিন্দী ভাষাভাষী প্রদেশ-সমূহের সরকারী কর্ম্মচারিগণের ন্যায্য দাবি ও স্বার্থের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

পার্লামেণ্টের লোক-পরিষদ (House of the People) হইতে কুড়ি এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদ (Council of State) হইতে দশ জন মোট ত্রিশ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি কমিটিতে উপরোক্ত কমিশনের রিপোর্ট বিবেচিত হইবে। কমিটি কমিশনের রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট নিজেদের মন্তব্য প্রদান করিবেন। এই মন্তব্য বিচার করিয়া রাষ্ট্রপতি চূড়ান্তভাবে নিজের নির্দ্দেশ প্রদান করিবেন।

হিন্দীভাষাকে পুরাপুরিভাবে রাষ্ট্রভাষা করিবার পূর্ব্বে বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে যাহাতে সম্পন্ন হইতে পারে তাহার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে এবং যতদূর সম্ভব অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার গুরুত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। অষ্টম তপশীলে উল্লিখিত ১৪টি ভাষার মধ্যে হিন্দীও একটি প্রাদেশিক ভাষা মাত্র। কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত উল্লিখিত প্রত্যেক ভাষাই চল্‌তি ভাষা। সংস্কৃত প্রচলিত এবং কথ্য ভাষা না হইলেও প্রত্যেক প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ভাষার জননী বা আদিভাষা, সুতরাং সংস্কৃতকে স্বীকার ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না।

উর্দ্দুভাষা সম্বন্ধেও এখানে কিছু আলোচনা আবশ্যক মনে করি। উর্দ্দুকে ভারতীয় ভাষা বলিয়া, বিশেষতঃ ভারতীয় মুসলমানগণের ভাষা বলিয়া স্বীকার ও দাবি করা হয়। উর্দ্দুভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস বিচিত্র। উর্দ্দু একটি তুর্কী শব্দ, অর্থ শিবির বা ক্যাম্প। উর্দ্দু জবান অর্থ শিবিরের ভাষা বা 'Language of the Camp'। প্রকৃতই এই ভাষার জন্ম হইয়াছে মোগল-শিবিরে। বিদেশাগত মুসলমানগণ নানাজাতীয় লোক ছিলেন। তুর্কী, ইরাণী, আরবী, আফগান, মোগল ও নানা জাতির মুসলমান নানা সময়ে বা একই সময়ে বিজয়ী, ব্যবসায়ী, ধর্ম্মপ্রচারক প্রভৃতি নানারূপে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। এই বিরাট্ জনসমষ্টি নিজেদের মাতৃভাষাকে কয়েক পুরুষেই ভুলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল এবং তৎ-পরিবর্ত্তে হিন্দী বা হিন্দুস্থানীকে নিজেদের জবান বা ভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছিল। অবশ্য দিল্লীর আশেপাশে বাজারে রাস্তায় যে ভাষার ব্যবহার হইত তাহাই 'হিন্দুস্থানী' নামে পরিচিত। এই ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং সাধারণের বোধগম্য হইলেও ইহার কোন সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই। ইহা কথ্য-ভাষা স্থানীয়। ইহা ফারসী ও দেবনাগর হরফে লিখিত হইত। ইহার মধ্যে ফারসী আরবীর মিশ্রণ আছে, তবে উর্দ্দুর মত অতিরিক্ত ভাবে নহে। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই ভাষাকে রাষ্ট্রীয় কারণে রাষ্ট্রভাষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু সক্ষম হন নাই।

হিন্দী, হিন্দুস্থানী হইতে এই অর্থে পৃথক যে, ইহা উত্তর-ভারতের বিশেষভাবে দিল্লী ও সন্নিহিত অঞ্চলের প্রাচীনতম কথ্য ও সাহিত্যিক ভাষা। রাজা পৃথ্বীরাজের সময়েও এই ভাষা গদ্য-সাহিত্যে সমৃদ্ধ ছিল। প্রাচীন হিন্দীর কাল

১১০০-১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময়কে তাহার জন্মকাল বলা চলে। ভক্তগণের গাথা ও কবিতা এই সময়কার সাহিত্য। হিন্দী সাহিত্যের মধ্যযুগ ১৫৫০ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত। ইহাকে হিন্দী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত উর্দু সাহিত্য, প্রধানতঃ কাব্য-সাহিত্য হিসাবে উন্নতিলাভ করে। কেহ কেহ মনে করেন। তৈমুরের আক্রমণের (১৩৯৮) পর হইতেই উর্দু সাহিত্যের জন্ম। এই অনুমান সঠিক বলিয়া মনে হয় না। উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের জন্ম হইবার পূর্ব্বে বিদেশী মুসলমান ও ভারতীয় হিন্দুর মধ্যে বিপুলভাবে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান হইয়াছিল। আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫) এরূপ আদান-প্রদান বিশেষ ভাবে হয়। ১৬০৫ সনের ১৭ই অক্টোবর আকবর পরলোকগমন করেন। তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসীতে অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তাঁহার সভার পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে জ্ঞানের আদান-প্রদান হইত। আকবর-প্রবর্ত্তিত এই প্রকারের আদান-প্রদান তাঁহার মৃত্যুর পরেও চলিতে থাকে, যদিও ঔরংজীবের সময় ইহাতে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে।

একদিকে ভারতবর্ষীয়গণের সংস্পর্শে, বিবাহদ্বারা ও অন্যান্য কারণে মোগল তথা বিদেশী মুসলমানগণ ভারতীয় হইয়া পড়িল, অন্যদিকে এক শ্রেণীর ভারতীয়গণ—যাহারা মোগল দরবারের সান্নিধ্যে বা সাহচর্য্যে আসিল তাহারা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী না হইলেও অনেকটা ইসলাম ভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। বর্ত্তমানে ইঙ্গ-করণের সহিত ইহা তুলনীয়। এইরূপ পরিবেশে উর্দুর জন্ম। দরবারের ভাষা তখন ফারসী। ফারসী-আরবী অলঙ্কার পরা হিন্দী ফারসী হরফে উর্দুর আকারে দেখা দিল। ইহা হইল অভিজাতের—মুসলমান ও হিন্দু—উভয়ের কথ্য ও সাহিত্যের ভাষা। হিন্দী তখন অবজ্ঞাত হইতে লাগিল। কতকটা ফারসী আরবী দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলেও হিন্দী জননী সংস্কৃতের অঞ্চল ত্যাগ করে নাই। কিন্তু ইহা হইয়া গেল সাধারণ হিন্দুর ভাষা। সাধু, সন্ত ও ধর্ম্মপ্রচারক এই ভাষাকে গৌরবদান করিয়া গাথা ও সঙ্গীতে সমৃদ্ধ করিলেন। হিন্দী হইল সংস্কৃতমুখী আর উর্দু হইল ফারসী আরবীমুখী। উভয়ের হরফ ভিন্ন। শিক্ষিতের এবং রাজ-অনুগ্রহের ভাষা ও সাহিত্য হিসাবে উর্দু আফগানিস্থানের সীমা হইতে বঙ্গের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। দাক্ষিণাত্যে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের স্বাধীন মুসলমান নরপতিগণ উর্দুকে রাজসভার ভাষা করিলেন। উত্তর-ভারতে ফারসী ছিল আদালতের প্রধান ভাষা, আর উর্দুও চলিত। অবশ্য দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন মুসলমান রাজ্যগুলি ঔরংজীব ধ্বংস করিয়া হিন্দুরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে হায়দরাবাদে নিজামের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে সেখানেও চলিল উর্দুর প্রাধান্য। বিহার বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখানেও উর্দু চলিত। ভূদেব মুখোপাধ্যায় শিক্ষাবিভাগে উচ্চ পদে নিযুক্ত থাকাকালীন বিহারে হিন্দীকে শিক্ষার বাহন হিসাবে প্রচলিত করিতে সাহায্য করেন।

কিন্তু হিন্দী ও উর্দু উভয়ের গদ্য-সাহিত্যের জন্ম ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত (১৮০০) হইবার পর। আধুনিক বাংলা গদ্যের জন্মকালও প্রায় এই সময়ে।

১৮৩৭ সনে ফারসী ভাষার স্থলে দেশীয় ভাষাকে আইন ও আদালতের ভাষা করা হয়। ইহার পর হইতে ব্যাপকভাবে ফারসীর প্রচার কমিয়া যায়, কিন্তু উর্দু ভারতীয় ভাষা হিসাবে পূর্ব্বের মতই ভারতব্যাপী চলিতে থাকে। কারণ হিন্দু-মুসলমানের মিলিত চেষ্টায় ইহার ক্রমোন্নতি হইতেছিল এবং নবাব রাজরাজড়ার সভায় দরবারে ও পণ্ডিত-মহলে ইহা অনেক সময় হিন্দী অপেক্ষা বেশী আদরলাভ করিত। দীর্ঘকাল পরাধীন থাকার দরুন হিন্দুর যে দাসমনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর পক্ষে উর্দুকে হিন্দী অপেক্ষা সম্মান দিবার অন্যতম কারণ সন্দেহ নাই। এমন কি উর্দু সাহিত্যে অধিক পরিমাণে ফারসী, আরবী বিশেষ করিয়া ফারসী শব্দ প্রয়োগের জন্যও অনেকে হিন্দু ব্রাহ্মণ-কায়স্থগণকে দায়ী করেন। এ কথার মধ্যে অনেকখানি সত্য আছে সন্দেহ নাই। হিন্দী সাহিত্যের পুনর্গঠন ও প্রচারে উনবিংশ শতাব্দীতে বাবু হরিশ্চন্দ্র (১৮৫০-১৮৮৫) এবং রাজা শিবপ্রসাদের (১৮২৩-১৮৯৫) নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংরেজ আমলে অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের মত হিন্দীও শক্তিমান হইয়াছে এবং বহুল প্রচারলাভ করিয়াছে। তবে বাংলা কিংবা মরাঠি, গুজরাটি ভাষার মত এত শক্তিমান হইতে পারে নাই। ইহার কারণ অবশ্য এই যে, বাংলাদেশে বহু দিক্‌পাল সাহিত্যিক ও প্রতিভাবান মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়া বাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। হিন্দীর পক্ষে সে সৌভাগ্য হয় নাই।

যাহা হউক, হিন্দী এক বৃহৎ জনসমষ্টির ভাষা হিসাবে, বিশেষতঃ উত্তর-ভারতে এবং দক্ষিণ-ভারতের পশ্চিম উপকূল প্রদেশে সাধারণবোধ্য ভাষা হিসাবে শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করিয়া আছে। দেবনাগর বর্ণমালার প্রচার এবং হিন্দী ভাষার প্রসারে বাংলার দান কম নহে। সর্ব্ব-ভারতীয় একতার স্বপ্ন বাঙালী প্রথম দেখিয়াছে এবং সেই সম্পর্কে সর্ব্ব-ভারতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজীর স্থান হিন্দী দ্বারা পূর্ণ করিবার কথাও ভাবিয়াছে। আজ কেশবচন্দ্র, ভূদেব, রাজনারায়ণ, সারদাচরণ প্রভৃতির চিন্তার দান ও কর্ম্মের কথা বাঙালীর ভুলিলে চলিবে না। হিন্দী যদি আজ রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা লাভ করিয়া থাকে তবে বাঙালী মনীষীগণ সে পথ অনেকটা সুগম করিয়া দিয়াছিলেন ইহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয়।

প্রাদেশিক ভাষা

এখন প্রাদেশিক ভাষা সম্বন্ধে সংবিধান কি ব্যবস্থা করিয়াছে দেখা যাক। ৩৪৫ এবং ৩৪৬ ধারায় এরূপ বিধান করা হইয়াছে—কোন প্রদেশ বা রাজ্য (state) আইন দ্বারা সেই প্রদেশে বা রাজ্যে সরকারী কার্য্যের জন্ত প্রাদেশিক ভাষা বা হিন্দীর ব্যবহার প্রচলন করিতে পারিবে। অবশ্য যে পর্য্যন্ত তাহা না হইবে, ইংরেজী চলিবে। কিন্তু অপর প্রদেশ বা রাজ্যের সহিত কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত লেখাপড়ার কাজ কেন্দ্রীয় সরকার যে ভাষার ব্যবহার করিবেন সেই ভাষায় করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা দ্বারা কেন্দ্রীয় একতা এবং সর্ব্ব-ভারতীয় মিলনের বা ভাষার আদান-প্রদানের পথ পরিষ্কার রাখা হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় এবং সুষ্ঠু শাসন পরিচালনার দিক হইতে ইহাই একমাত্র সমীচীন ব্যবস্থা। দুইটি রাজ্য পরস্পরের ব্যবস্থামত হিন্দীতে লেখাপড়া চালাইতে পারিবে এ ব্যবস্থাও এই ধারায় আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যাহাতে ধীরে ধীরে হিন্দীর প্রসার হয় সংবিধানে সেইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশের ভাষা বিভিন্ন রাজ্যের ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠালাভ করিবারও বিধান রহিয়াছে।

এই সম্পর্কে ৩৪৭ ধারার বিধানটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, হিন্দী প্রাদেশিক ভাষার অন্ততম। এজন্ত হিন্দী ভাষার 'সাম্রাজ্যিক প্রতিষ্ঠা'র ভয় অমূলক নাও হইতে পারে। এজন্তও সাবধানতা দরকার। হিন্দীকে যদি রাষ্ট্রভাষার সম্মান দেওয়া হইয়া থাকে, তবে তাহা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দী ভাষাভাষীর চাপে নহে; হিন্দী সাহিত্যের উৎকর্ষের জন্যও নহে, সর্ব্বভারতীয় একতা ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং বিদেশী ইংরেজী ভাষা স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া। ইহাতে অ-হিন্দী ভাষাভাষী যে স্বার্থত্যাগ দেখাইয়াছে তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয় ও স্মরণীয়। এজন্যই সংবিধান এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছে যাহাতে হিন্দী ভাষা বা অপর কোন প্রাদেশিক ভাষার চাপে কাহারও মাতৃভাষা বিপন্ন না হয়।

৩৪৭ ধারায় এরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, কোনও রাজ্যের (প্রদেশের) যথেষ্টসংখ্যক অধিবাসী রাষ্ট্রশক্তির নিকট তাহাদের (কথ্য) মাতৃভাষা তাহাদের রাজ্যে 'রাজ্য-ভাষা' রূপে স্বীকৃত হউক বলিয়া দাবি জানাইলে, তিনি উহা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলে ঐ ভাষাকেও রাজ্যের সর্ব্বত্র বা অংশ-বিশেষের সরকারী ভাষারূপে ব্যবহৃত হইবার জন্ত নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন। বর্ত্তমান প্রদেশগুলি এক একটি ভাষার ভিত্তিতে গঠিত না হওয়ায় এই ধারা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। ইহা কেবল বিহার কিংবা আসাম প্রদেশের বাঙালী সংখ্যালঘুর সমস্তা নহে, প্রত্যেক প্রদেশের এইরূপ সমস্তা অল্পবিস্তর রহি-য়াছে। পরস্পরের সুবিধার প্রতি সহানুভূতির সহিত বিষয়গুলি বিচার করিলেই এই সকলের মীমাংসা হইতে পারে এবং যে স্থলে ইহার মীমাংসা সম্ভব হইবে না, চরম মীমাংসার ক্ষমতা এই ধারায় রাষ্ট্রপতির উপর দেওয়া হইয়াছে।

আদালতের ভাষা

৩৪৮ এবং ৩৪৯ ধারায় সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট ইত্যাদিতে ভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পনর বৎসর পর হিন্দী ইংরেজীর স্থান গ্রহণ করিবে। কিন্তু এই পনর বৎসর যাহাতে রাষ্ট্রের কার্য্যে কোন ভাষা-বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে এবং ইংরেজী ভাষাকে যথাযথ স্থানে রাখা হইয়াছে।

বিশেষ সাবধানতার সহিত সংবিধান ৩৫০ ধারায় এরূপ নিয়ম করিয়াছে যে, কোন ব্যক্তি কোন অন্যায়ের প্রতিকারের জন্ত ভারতে বা রাজ্যবিশেষে প্রচলিত যে কোন ভাষায় যে-কোন সরকারী কর্ম্মচারী, রাষ্ট্রের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ভারত-সরকার বা রাজ্য-সরকারের নিকট দরখাস্ত করিতে অধিকারী হইবেন। এ বিধান দ্বারা প্রত্যেককে মাতৃভাষায় বক্তব্য পেশ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কীয় শেষ অর্থাৎ ৩৫১ ধারায় যাহাতে হিন্দী ভাষার গঠন ও উন্নতি অষ্টম তপশীলে লিখিত ১৪টি ভাষার, বিশেষ করিয়া আদি ও দেবভাষা সংস্কৃতের ভিত্তিতে হয় এরূপ কর্ত্তব্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্তস্ত করা হইয়াছে। এই ধারার অন্ততম উদ্দেশ্য ভারতের সকল ভাষা হইতে, বিশেষ ভাবে কথ্য হিন্দুস্থানী ভাষা হইতে শক্তি আহরণ। হিন্দী ভাষার বর্ত্তমান অবস্থায় উহার রাষ্ট্রভাষা হওয়ার পক্ষে অনেক অসম্পূর্ণতা দেখা যায়, কিন্তু জাতীয় ইচ্ছাশক্তি ও কঠোর সাধনা যে এই সমস্যার সমাধান করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

উপসংহার

এই সঙ্গে প্রাদেশিক ভাষাগুলিও যাহাতে উন্নত হয় প্রত্যেক প্রদেশ বা রাজ্যের তাহাও লক্ষ্য হওয়া উচিত। হিন্দীর সহিত অন্তান্ত প্রান্তিক ভাষার বিরোধ দ্বারা উভয়েরই ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সর্ব্ব-ভারতীয় একতা নিতান্ত কাম্য এই কথা স্মরণ রাখিয়া সকলেরই রাষ্ট্রীয় সংবিধান অনুযায়ী কার্য্য করিয়া যাওয়া উচিত। কোন বিষয়ে উৎসাহের মাত্রা ছাড়াইয়া যেন আমরা দেশের, জাতির মাতৃভাষা কিংবা রাষ্ট্রভাষার ক্ষতি না করি। আমরা একদিকে যেমন মাতৃ-ভাষার সেবা ও গৌরববৃদ্ধি করিব, অন্তদিকে তেমনই রাষ্ট্র-ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া সর্ব্ব-ভারতীয় একতার সমিধ যোগাইব। আমাদের শিক্ষার বাহন হইবে মাতৃভাষা, বিশ্বের দরবারে এবং সর্ব্ব-ভারতীয় ব্যাপারে ব্যবহার করিব রাষ্ট্র-ভাষা। শিক্ষার্থীকে মাতৃভাষার অতিরিক্ত আরও দুই-একটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। ভবিষ্যতের হিন্দী লেখকও সকল প্রদেশ হইতে আসিবেন এবং প্রান্তিক ভাষার সাহিত্যিকও অন্ত প্রদেশের লোক হইবেন। বর্ত্তমানেই ইহার সূচনা আরম্ভ হইয়াছে।

"জাতীয় গ্রন্থাগারে"র জন্মকথা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

বিগত ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্টের পর হইতে ভারত-সরকার 'ইম্পিরিয়াল' শব্দটি বর্জ্জন করিয়া ক্রমশ: নিজস্ব প্রতিষ্ঠানসমূহে ইহার স্থলে 'ন্যাশনাল' বা 'জাতীয়' কথাটি ব্যবহার করিতেছেন। কলিকাতায় 'ইম্পিরিয়াল' লাইব্রেরীরও নামকরণ হইয়াছে 'ন্যাশনাল' লাইব্রেরী বা 'জাতীয়' গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারটির ইতিহাস বড়ই বিচিত্র। এখানে আমরা ইহার জন্মকথা আলোচনা করিতে চাই।

তবে এ প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। 'ইম্পিরিয়াল' বা ইদানীন্তন 'ন্যাশনাল' লাইব্রেরী বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার প্রতিষ্ঠা হয় ১৯০৩ সনের ৩০শে জানুয়ারী। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জ্জনের আগ্রহাতিশয়ে মেট্‌কাফ হলস্থিত কলিকাতা পাব্‌লিক লাইব্রেরীর সঙ্গে সরকারী কয়েকটি বিভাগীয় গ্রন্থাগার মিলিত হইয়া 'ইম্পিরিয়াল' লাইব্রেরী গঠিত হয়। ১৮৯১ সন হইতেই কিন্তু উক্ত বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলি 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী' নামে পরিচিত হইতে থাকে। এ সকল সত্ত্বেও কলিকাতা পাব্‌লিক লাইব্রেরীই বর্ত্তমান 'জাতীয়' গ্রন্থাগারটির ভিত্তি বা কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল। এ হেতু এই লাইব্রেরীটির গোড়ার কথাই আজিকার বিবেচ্য।

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের ভারতবর্ষ ত্যাগ এবং লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের ভারতবর্ষে আগমন—ইহার মধ্যবর্ত্তীকালে (মার্চ্চ ১৮৩৫—ফেব্রুয়ারী ১৮৩৬) সার চার্লস থিওফিলাস মেট্‌কাফ এক বৎসরের জন্য অস্থায়ী বড়লাটের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়কার তাঁহার একটি প্রধান কীর্ত্তি—১৮২৩ সনে বঙ্গের, ১৮২৫ সনে বোম্বাইয়ের এবং ১৮২৭ সনে মাদ্রাজের মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা অপহারক আইনগুলি রদ করিয়া সমগ্র ভারতেই মুদ্রাযন্ত্রকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান। ৩রা আগষ্ট ১৮৩৫ তারিখে এই আইনটি বিধিবদ্ধ হইয়া পরবর্ত্তী ১৫ই সেপ্টেম্বর কার্য্যে পরিণত হয়। ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতার স্থানীয় দেশী-বিদেশী অধিবাসীদের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ বহু সভা-সমিতির আয়োজন হইল। এই উদ্দেশ্যে ১৮৩৫, ২০শে আগষ্ট কলিকাতা টাউন হলে যে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে স্থির হয় যে, কলিকাতার কেন্দ্রস্থলে মেট্‌কাফের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের স্থায়ী নিদর্শনস্বরূপ 'মেট্‌কাফ লাইব্রেরী বিল্‌ডিং' নামে একটি ভবন নির্ম্মিত হইবে। এইখানে সাধারণের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইবে, মেট্‌কাফের একটি তৈলচিত্র টাঙানো থাকিবে আর ইহার একটি প্রকাশ্য অংশে এই কথা কয়টি লিখিত হইবে—

"In commemoration of the Freedom of the Indian Press having been recognised by Law under the Government of Sir Charles Theophilus Metcalfe."

এই উদ্দেশ্যে একটি কমিটিও গঠিত হইল।

সার জন পিটার গ্রাণ্ট

২

কলিকাতা পাব্‌লিক লাইব্রেরী কিন্তু ইহা হইতে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান রূপেই আবির্ভূত হয় উক্ত জনসভার মাত্র এগার দিনের ব্যবধানে, ১৮৩৫ সনের ৩১শে আগষ্ট তারিখে। কলিকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ অনেকেই উভয় অনুষ্ঠানে যোগ দিলেও এবং উদ্দেশ্য কতকটা এক হইলেও উভয়েরই কর্ম্মপ্রণালী ছিল একেবারে বিভিন্ন। ঐ দিনে কলিকাতা পাব্‌লিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা সভার সভাপতিত্ব করেন সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি সার জন পিটার গ্রাণ্ট। তিনি খুব স্বাধীনচেতা ব্যক্তি ছিলেন। বোম্বাই সরকারের সঙ্গে মতদ্বৈধ হওয়ায় তিনি তথাকার সুপ্রিম কোর্টের (বর্ত্তমান হাইকোর্ট) বিচারপতির পদ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন এবং স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরে ভারত-সরকার কর্ত্তৃক তিনি কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের

বিচারপতি পদে বৃত হইলেন। ভারতবাসীর সর্ব্ববিধ উন্নতি-প্রচেষ্টার সঙ্গেই গ্রাণ্টের অকৃত্রিম যোগ ছিল। তবে সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকার জন্ত কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না,

দ্বারকানাথ ঠাকুর

তাঁহার এরূপ প্রবৃত্তিও হয়ত ছিল না। উক্ত সভায় সভাপতির বক্তৃতায় তিনি স্পষ্টত:ই বলিলেন, কোন 'রাজনৈতিক' উদ্দেশ্ত দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তাঁহারা এইরূপ একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হন নাই, নিছক সাহিত্যের অনুশীলন এবং সাহিত্যালোচনায় জনসাধারণের অনুরাগবর্দ্ধনই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্ত। দক্ষিণ-আফ্রিকার কেপ কলোনীতে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা দ্বারা, এমন কি বোম্বাই এবং মাদ্রাজেও বিভিন্ন সভার মাধ্যমে সাহিত্য-চর্চ্চার কোন-না-কোন আয়োজন করা হইয়াছে, কলিকাতায় এরূপ একটি না থাকা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। প্রারম্ভিক আলোচনাদির পর উক্ত উদ্দেশ্তসাধনকল্পে সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইল। প্রথম প্রস্তাবটিতে লাইব্রেরীর মূল লক্ষ্য এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :

"That it is expedient and necessary to establish in Calcutta a Public Library of reference and circulation that shall be open to all ranks and classes without distinction, and sufficiently extensive to supply the wants of the entire community in every department of literature."

এই উদ্দেশ্ত কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ত সভায় চব্বিশ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে লইয়া একটি অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সার জন পিটার গ্রাণ্ট, বিচারপতি সার এডওয়ার্ড রায়ান, হিন্দু কলেজের প্রধান অধ্যাপক (পরে অধ্যক্ষ) ক্যাপটেন রিচার্ডসন, 'সমাচার দর্পণ' ও 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যান প্রভৃতি। কমিটিতে মাত্র দুই জন বাঙালী স্থানলাভ করিয়াছিলেন—হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত ছাত্র 'জ্ঞানান্বেষণ'-সম্পাদক রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং উক্ত কলেজের সেক্রেটারী সুবিদ্বান রসময় দত্ত। লাইব্রেরীর মূলধন সংগ্রহের জন্ত ধার্য্য হয় যে, এককালীন বা বৎসরে তিন কিস্তীতে তিন শত টাকা দিয়া যে-কেহ ইহার প্রোপ্রাইটর বা অংশীদার হইতে পারিবেন। চাঁদাদাতাদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিলে অর্থাগমের পথ সুগম হইবে এরূপ কথাও সভায় আলোচিত হইল। তবে লাইব্রেরীর জন্ত অর্থসংগ্রহ, নিয়মকানুন প্রণয়ন, পুস্তকাদি ও আসবাবপত্র ক্রয় এবং গৃহান্বেষণ প্রভৃতি সমুদয় ভারই অস্থায়ী কমিটির উপরই অর্পিত হয়। এই প্রসঙ্গে দুইটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাদ্রী জশুয়া মার্শম্যান মারফত ডা: এফ. পি. ষ্ট্রং লাইব্রেরী স্থাপনের কথা শুনিয়া তাঁহার ১০নং এসপ্লানেড রো ভবনের নিম্নতল বিনা-ভাড়ায় ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাবসহ একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন। বদান্তবর দ্বারকানাথ ঠাকুর কলিকাতা পাব্‌লিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠাকল্পে সর্ব্বপ্রথম পাঁচ শত টাকা দিয়া ইহার প্রথম 'প্রোপ্রাইটরে'র সম্মানলাভ করেন। 'জাতীয়' গ্রন্থাগারে তাঁহার যে আবক্ষ-মূর্ত্তি এখনও সংরক্ষিত আছে তাহা তাঁহার এতাদৃশ কার্য্যের প্রতি কৃতজ্ঞতাদ্যোতক বলিয়া মনে হয়। অস্থায়ী কমিটির অবৈতনিক সেক্রেটারী হইলেন 'ইংলিশম্যান' সম্পাদক জে. এইচ. ষ্টকোয়েলার। এরূপ একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কথা তাঁহারই মনে প্রথম উদিত হইয়াছিল বলিয়া এই সভায় তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

৩

পরবর্ত্তী ৩রা সেপ্টেম্বর অস্থায়ী কমিটির প্রথম অধিবেশন হইল। লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করার জন্ত দুইটি সাব্-কমিটি গঠিত হয়। টাকাকড়ি ও অন্যান্ত বিষয় সংক্রান্ত কার্য্য পরিচালনার নিমিত্ত সার এডওয়ার্ড রায়ান, সার জে. পি. গ্রাণ্ট, সি ডাব্‌লিউ. স্মিথ এবং কর্ণেল ডানলপ এই চারি জন অস্থায়ী ট্রাষ্টী নিযুক্ত হইলেন। সাব্-কমিটি দুইটির সহায়তায় অস্থায়ী কমিটির কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। ১৮৩৫, ৭ই নবেম্বর পুনরায় সাধারণ সভার অধিবেশন হইল। তাহাতে কমিটি তাঁহাদের কার্য্যের একটি বিবরণ প্রদান করেন। বিবরণে প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ লাইব্রেরী হইতে ইউরোপীয় ভাষার পাঁচ হাজার পুস্তক কয়েকটি সর্ত্ত সাপেক্ষে কলিকাতা পাব্‌লিক লাইব্রেরীকে প্রদান করিয়াছেন, বিভিন্ন লোকের নিকট হইতে দেড় হাজার বইও সংগৃহীত হইয়াছে। কমিটি চাঁদাদাতাদের তিন শ্রেণীতে

বিভক্ত করিয়া তাঁহাদের দেয় চাঁদা এইরূপ ধার্য্য করিলেন—প্রথম শ্রেণীর চাঁদাদাতার প্রবেশিকা কুড়ি টাকা এবং পরবর্তী প্রতি মাসের চাঁদা ছয় টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবেশিকা ষোল টাকা ও পরবর্ত্তী প্রতি মাসের চাঁদা চারি টাকা এবং তৃতীয় শ্রেণীর প্রবেশিকা দশ টাকা ও পরবর্ত্তী প্রতি মাসের চাঁদা দুই টাকা। পূর্ব্বের নির্দ্দেশমত তিন শত টাকা দিলেই প্রোপ্রাইটর বা অংশীদার হওয়া যাইবে স্থির হয়। সাধারণ সভা আহ্বান করিতে হইলে পাঁচ জন প্রোপ্রাইটর বা অংশীদার অথবা অংশীদার ও চাঁদাদাতায় মিলাইয়া দশ জনের স্বাক্ষর প্রয়োজন হইবে। লাইব্রেরীর কর্ম্মপরিচালনার ভার থাকিবে সাত জন 'কিউরেটর' বা অধ্যক্ষের উপর। পুস্তক আদান-প্রদানের নিয়মাবলীও তাঁহারা প্রণয়ন করিয়া দিলেন। আরও স্থির হইল যে, আপাততঃ এক জন লাইব্রেরিয়ান বা গ্রন্থাগারিক এবং এক জন সাব্-লাইব্রেরিয়ান বা সহকারী গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা হইবে। সাধারণ সভা এই সকল বিষয় বিভিন্ন প্রস্তাবের আকারে গ্রহণ করিলেন।

১৮৩৫ সনের নবেম্বর নাগাদ মিঃ হাফ্ (Hough) সাময়িক ভাবে লাইব্রেরিয়ান বা গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত হইলেন। ষ্টকোয়েলারের প্রতি সাধারণের মনে অসন্তোষের ভাব বিদ্যমান ছিল। তাঁহার দ্বারা পাছে লাইব্রেরীর কার্য্য দ্রুত আরম্ভ হইবার পক্ষে অসুবিধা হয় এই আশঙ্কা নিরসনের জন্য তিনি এ সময় অস্থায়ী সম্পাদকের পদে ইস্তফা দেন। সংবাদ-পত্রে লাইব্রেরীর অংশীদার সংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থসংগ্রহ, সহঃ গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারিক নিয়োগের কথা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল। হিন্দু কলেজের অন্যতম বিখ্যাত ছাত্র প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৩৫, ডিসেম্বর মাসেই সাব্ লাইব্রেরীয়ান (সহঃ গ্রন্থাগারিক) পদে নিযুক্ত হন। ৯ই ডিসেম্বর তারিখে 'ইংলিশম্যান' তাঁহার নিয়োগ সম্বন্ধে লেখেন :

"Pereechund, an intelligent Hindu youth educated at the Hindu college, had been appointed assistant Librarian."

জানুয়ারী মাস নাগাদ সত্তর জন প্রোপাইটর বা অংশীদার পাওয়া গেল, অর্থ সংগৃহীত হইল তিন হাজার টাকা। অস্থায়ী গ্রন্থাগারিকের বদলে এই পদে এক শত টাকা বেতনে স্থায়ী-ভাবে নিযুক্ত হইলেন মিঃ ষ্ট্যাসী (Stacy)।

ইতিমধ্যে লাইব্রেরীর কার্য্য আরম্ভ হইলেও প্রকাশ্যভাবে ইহার দ্বার উন্মোচিত হয় ১৮৩৬ সনের ৮ই মার্চ্চ। এই দিনে সার জন পিটার গ্রান্টের সভাপতিত্বে পুনরায় একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হইল। গণ্যমান্য ইউরোপীয় ও ভারতীয়গণ সভায় যোগদান করেন। বাঙালীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রসময় দত্ত, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ। অস্থায়ী কমিটি কর্ত্তৃক রচিত নিয়মাবলী সামান্য অদল বদল করিয়া এখানে গ্রহণ করা হইল। স্থির হইল, রবিবার এবং বার্ষিক সভার পূর্ব্ববর্ত্তী সাত দিন বাদে গ্রন্থাগার প্রত্যহ সকাল ৯টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। 'কিউরেটর' বা অধ্যক্ষ-সংখ্যা সাত জন হইতে কমাইয়া তিন জন করা হইল। প্রথম স্থায়ী কিউরেটর পদে নিযুক্ত হন ডব্লিউ. পি. গ্রাণ্ট, কর্ণেল ডব্লিউ ডান্‌লপ ও জেম্‌স কিড। পুস্তক-তালিকা মুদ্রিত হইলে তাহার মূল্য এক টাকা হইবে ধার্য্য হইল। পুস্তক-তালিকার পাণ্ডুলিপি তখনই প্রস্তুত হইতেছিল।

প্যারীচাঁদ মিত্র

ইহার পর ১৮৩৬, ৬ই আগষ্ট ও ৮ই নবেম্বর তারিখে কলিকাতা পাব্‌লিক লাইব্রেরীর অংশীদারদের আর দুইটি সাধারণ সভার অনুষ্ঠান হয়। প্রথম সভায় কর্ণেল ডানলপের স্থলে কর্ণেল বিট্‌সন কিউরেটর নিযুক্ত হন। চাঁদাদাতাদের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবেশিকা মকুব করিয়া দিয়া আট টাকা ও ছয় টাকা মাসিক চাঁদা ধার্য্য হইল। লাইব্রেরীর অন্যতম কিউরেটর জেম্‌স কিড ২০শে অক্টোবর মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার স্থলে শেষোক্ত দিনের সভায় জন বেল কিউরেটর নিযুক্ত হইলেন।

৪

এখন মেট্‌কাফ লাইব্রেরী বিল্‌ডিং কমিটির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। এত দিনে এ কথা বুঝিতে বিশেষ বাকী রহিল না যে, কলিকাতা পাব্‌লিক লাইব্রেরী এবং মেট্‌কাফ লাইব্রেরী বিল্‌ডিং উভয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য প্রায় একই ধরণের ছিল। তবে দ্বিতীয়টি মেট্‌কাফের স্মৃতিরক্ষার্থ একটি ভবন নির্ম্মাণের উপরই

বিশেষ জোর দিতে থাকেন। তাঁহারা ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের (বর্ত্তমান লালদীঘি) উত্তর-পূর্ব্ব পার্শ্বে খোলা জায়গার উপরে একটি গৃহ-নির্ম্মাণের জন্ত ১৮৩৬, ২রা জুলাইয়ের অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গবর্ণমেণ্টের নিকট উক্ত ভূমিখণ্ড চাহিয়া আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষকেও তাঁহারা জানাইয়া দেন যে, প্রস্তাবিত গৃহের এক অংশে ইহার জন্ত স্থান করিয়া দেওয়া হইবে। লাইব্রেরী-কর্ত্তৃপক্ষ বিল্ডিং কমিটি ও গবর্ণমেণ্ট উভয়কেই তাঁহাদের সম্মতির বিষয় জ্ঞাপন করিলেন।

বিল্ডিং কমিটি ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে ১৪ই জুলাই ১৮৩৬ হইতে ১লা নবেম্বর ১৮৩৭ পর্য্যন্ত উপযুক্ত স্থানলাভের আশায় পত্র-ব্যবহার চলে। এই পত্রগুলি হইতে নানা কৌতুককর অথচ জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায়। রাইটার্স বিল্ডিংস (বর্ত্তমানের পরিবর্দ্ধিত আকার ও গঠনের নহে) পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি ছিল না। গবর্ণমেণ্ট ট্যাঙ্ক স্কোয়ারে স্থান দান সম্পর্কে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের মতামত জানিতে চাহিলে রাইটার্স বিল্ডিংসের মালিকের পক্ষে এড্‌ভোকেট বারওয়েল জানান যে, ঐ স্থানে একটি সুদৃশ্য ভবন নির্ম্মিত হইলে উক্ত বিল্ডিংসের গুরুত্ব কমিয়া যাইবে, উপরন্তু উহা বিক্রয়ের যে প্রস্তাব চলিতেছে তাহাতেও বিঘ্ন জন্মিবে। এ কারণ সরকার ঐ স্থানে গৃহ-নির্ম্মাণে বিল্ডিং কমিটিকে অনুমতি দিলেন না। বিল্ডিং কমিটি অতঃপর টাউন হলের সম্মুখে বা অকটারলোনি মনুমেণ্টের অব্যবহিত বিপরীত দিকে, বিভিন্ন সময়ে গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী ভূমি দিতে অনুরোধ জানাইলেও গবর্ণমেণ্ট কোন প্রস্তাবেই রাজী হইলেন না। এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানীকে ১৮৩৭, ২৫শে মার্চ্চ হইতে মেটকাফ বিলডিং কমিটির সেক্রেটারী রূপে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে পত্রালাপ করিতে দেখি। ইহা হইতে বুঝা যায়, দ্বারকানাথ ইহার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

অগত্যা কমিটি ২৮শে নবেম্বর ১৮০৮ তারিখের চাঁদাদাতাদের একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া এই মর্ম্মে প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, যদি কলিকাতা পাব্‌লিক লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ গৃহ নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের গচ্ছিত তহবিল প্রদান করিয়া বিল্ডিং কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা করিতে সম্মত হন তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে শেষ বারের মত এই অনুরোধ করিবেন যেন তাঁহারা লর্ড হেষ্টিংসের মূর্ত্তি সম্বলিত বাটীর পার্শ্বের ভূমি প্রদান করেন। এ প্রস্তাবেও গবর্ণমেণ্ট অসম্মত হইলে তাঁহারা এক বৎসরের মধ্যে সংগৃহীত অর্থ চাঁদাদাতাদের প্রত্যেককে প্রত্যর্পণ করিবেন। সরকার অবশ্য এ প্রস্তাবেও সম্মত হন নাই। তবে শীঘ্রই নিরাশার মধ্যেও আশার ক্ষীণ রেখা দেখা দিল।

৫

ইহার কয়েক মাস পূর্ব্বে ১৮৩৮ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারী-কলিকাতার দেশী-বিদেশী গণ্যমান্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ মেট্‌কাফকে কলিকাতায় আনিয়া এক ভোজে আপ্যায়িত করেন। ইহা সে যুগে "Free Press Dinner" নামে আখ্যাত হয়। এই সময় মেট্‌কাফ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (এখনকার উত্তর প্রদেশ) গবর্ণর ছিলেন। মেট্‌কাফের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ কলিকাতায় যে সকল প্রতিষ্ঠান স্বতন্ত্র ভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন তাঁহারা এ বিষয়ে সমবেত ভাবে অগ্রসর হইবার প্রয়োজনীয়তা তখনই অনুভব করেন। মেট্‌কাফ লাইব্রেরী বিল্ডিং কমিটির একক চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হওয়া দুরূহ দেখিয়া অন্ত প্রতিষ্ঠানগুলিও এই উদ্দেশ্যে মিলিত হইতে ক্রমে উত্তোগী হইলেন। দুই বৎসরের মধ্যেই তাঁহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ফলবতী হইয়া উঠিল। এ বিষয়ে পরে বিশদভাবে বলিতেছি।

এই সম্মিলিত প্রয়াসের মধ্যে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর কৃতিত্বও কম নহে। তবে এ বিষয়ে বলিবার পূর্ব্বে গ্রন্থাগারটির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা আবশ্যক। গ্রন্থাগারের সাধারণ অধিবেশনগুলিতে অর্থসামর্থ্য, পুস্তকসংগ্রহ, পুস্তক রাখিবার আলমারি, তাক ও আসবাবপত্রাদি ক্রয়, অংশীদার ও চাঁদাদাতা সংখ্যা, পুস্তক আদান-প্রদানের হিসাব প্রভৃতির বিষয় বিজ্ঞাপিত হইতে লাগিল। ৩রা জুন ১৮৩৭ তারিখের মাসিক সাধারণ অধিবেশনে প্রকাশ, তাইস সম্বার লাইব্রেরীর গচ্ছিত তহবিলে পাঁচ শত মুদ্রা দান করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ১লা জুলাইয়ের সভায় মুদ্রিত পুস্তক-তালিকার মূল্য ধার্য্য হইল দুই টাকা। লাইব্রেরী ১৮৩৮ সনের জানুয়ারী মাসে এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত মেডিক্যাল এণ্ড ফিজিক্যাল সোসাইটির পুস্তকাবলী প্রাপ্ত হইলেন। সার বি. মাল্‌কিম নিজ পুস্তক-সংগ্রহের ২৭৪ খানি মূল্যবান পুস্তক এখানে দান করেন। বিভিন্ন সূত্রে আরও বহু মূল্যবান পুস্তক, সাময়িকপত্র এবং বিভিন্ন সোসাইটির কার্য্যবিবরণ পাওয়া যায়। ১৮৩৮, ৭ই জুলাইয়ের মাসিক সাধারণ সভায় বিজ্ঞাপিত হইল যে, রামগোপাল ঘোষ লাইব্রেরীর একজন প্রোপ্রাইটর হইয়াছেন। পুস্তক আদান-প্রদান যথানিয়মে চলিতে লাগিল। পাঠক-সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল। লাইব্রেরীর এরূপ দ্রুত উন্নতির মূলে সহকারী গ্রন্থাগারিক প্যারীচাঁদ মিত্রের কৃতিত্ব বিশেষ লক্ষণীয়। সহকারী গ্রন্থাগারিক রূপে কর্ম্মারম্ভের অল্পকাল মধ্যেই তিনি যে লাইব্রেরী কর্ত্তৃপক্ষের এবং পাঠকসাধারণের সন্তোষবিধানে সমর্থ হইয়াছিলেন, সার জন পিটার গ্রাণ্ট লিখিত ৮ই জুলাই ১৮৩৬ তারিখের পত্র হইতেই তাহা জানা যায় ("Where I understand he has given satisfaction by his attention and good conduct")। পাঠকদের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের অভিরুচি অনুযায়ী পুস্তক আদান-প্রদান গ্রন্থাগারিকের একটি প্রধান গুণ।

এই গুণটি প্যারীচাঁদের মধ্যে বিশেষরূপে বর্ত্তমান থাকায় পাঠকসাধারণ ক্রমেই কলিকাতা পাব্‌লিক লাইব্রেরীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উঠিলেন।

দেখিতে দেখিতে আমরা ১৮৩৯ সনে উপনীত হইতেছি। বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে ১৮৩৯, ৩১শে জানুয়ারী লাইব্রেরীর কিউরেটর বা অধ্যক্ষত্রয়ের একটি সভা হইল। ইহাতে তাঁহাদের নাম রহিয়াছে—ডব্‌লিউ. পি. গ্রাণ্ট, এইচ. এম. পার্কার ও ডব্‌লিউ. কার। এ সময় জন বেলের পরিবর্ত্তে ডব্‌লিউ. কার নূতন অধ্যক্ষ হইয়াছেন। এবারে লাইব্রেরিয়ান বা গ্রন্থাগারিক রূপে প্যারীচাঁদ মিত্রকে দেখিতেছি। 'প্যারীচাঁদ মিত্র, লাইব্রেরিয়ান' এই স্বাক্ষরে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৮৩৯ তারিখে উক্ত সভার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রেরণ করেন, এবং পর দিনের 'বেঙ্গল হরকরা'য় তাহা মুদ্রিত হয়। আমরা ইতিপূর্ব্বে মেট্‌কাফ লাইব্রেরী বিলডিং কমিটির প্রস্তাবের বিষয় জানিয়াছি। সে সম্বন্ধীয় আলোচনা আসন্ন বার্ষিক অধিবেশনে হইবে স্থির হইল।

অংশীদার ও চাঁদাদাতাদের লইয়া লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশন হইল ১৮৩৯, ৪ঠা মার্চ্চ। এবারেও দেখা যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র 'লাইব্রেরিয়ান' পদেই অধিষ্ঠিত। প্রোপ্রাইটর বা অংশীদারদের সংখ্যা এ বৎসর দাঁড়াইয়াছে ৭২ জন, লাইব্রেরীর গচ্ছিত তহবিল ৪,১০৩৲ টাকা। পুস্তক বাহিরে আদান-প্রদানেরও একটি হিসাব প্রদত্ত হইল। পাঠকদের নিকট বাহিরে গিয়াছে এক বৎসরে—পুস্তক ১৪,৯৯৫ এবং সাময়িক-পত্র ১,৭২১; মোট ১৬,৭১৬ খানি। পর বৎসর (১৮৪০) বাৎসরিক সভা হয় ২৮শে ফেব্রুয়ারী। এবারেও লাইব্রেরীর উন্নতি অব্যাহত রহিয়াছে। প্রোপ্রাইটর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৮০ জন, তন্মধ্যে ৯ জন মৃত। এ বৎসর বাইশ হাজারের উপর পুস্তক ও সাময়িকপত্র পাঠকদের নিকট বাহিরে গিয়াছে। লাইব্রেরীর আয় দশ হাজার টাকার উপরে; ইহা হইতেই যাবতীয় ব্যয়সংকুলান হইয়াছে। গচ্ছিত তহবিল সামান্য কিছু বাড়িয়া দাঁড়ায় ৪,২৭৩ টাকা। লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা হইতে প্রথম পাঁচ বৎসরে চাঁদাদাতা ও চাঁদার পরিমাণ কিরূপ বাড়িয়া চলে নিম্নের হিসাব হইতে তাহা পরিস্ফুট হইবে:

সন	চাঁদাদাতা	চাঁদা
১৮৩৬	৫	২২৲
১৮৩৭	৩৮	২০০৲
১৮৩৮	৫৯	৩১০৲
১৮৩৯	১০০	৪৯৮৲
১৮৪০	১৩৮	৬৯২৲

৬

১৮৪০ সনেও লাইব্রেরিয়ান পদে প্যারীচাঁদকেই দেখিতে পাই। এই বৎসরের প্রারম্ভেই বুঝা গেল, গ্রন্থাগারের সুদিন অনতিদূরে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদানে অস্থায়ী বড়লাট সার চার্লস থিওফিলাস মেট্‌কাফ যে জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধাপ্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং ইহার নিদর্শনস্বরূপ বিভিন্ন সোসাইটির পক্ষে যে সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল

মেট্‌কাফ হল ফোটো: শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। মেট্‌কাফের নামে একটি ভবন নির্ম্মাণকল্পে গবর্ণমেণ্ট অভীপ্সিত ভূমিখণ্ড প্রদানে অঙ্গীকৃত হইলে মেট্‌কাফ লাইব্রেরী বিলডিং কমিটি কলিকাতা পাব্‌লিক লাইব্রেরীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাও বলা হইয়াছে। ১৮৩৯ সনের মাঝামাঝি উভয়ের মধ্যে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা সুরু হয়। কলিকাতা পাব্‌লিক লাইব্রেরী ও মেট্‌কাফ লাইব্রেরী বিলডিং কমিটির সঙ্গে মেট্‌কাফ টেষ্টিমনিয়াল এবং এগ্রিকাল্‌চারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি (কৃষি-সমাজ) ক্রমে যোগদান করেন।

১৮৪০, ২৮শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত বাৎসরিক সভায় লাইব্রেরীর অধ্যক্ষদের পক্ষে ডব্‌লিউ. পি. গ্রাণ্ট বিবরণ পাঠ করেন। তাহা হইতে জানা যায়, এই প্রতিষ্ঠান চতুষ্টয়ের মধ্যে আলাপ-আলোচনা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। তাঁহারা সম্মিলিত ভাবে একটি দ্বিতল ভবন নির্ম্মাণে বদ্ধপরিকর। ইহার সঙ্গে মেট্‌কাফের নাম যুক্ত থাকিবে। এগ্রিকাল্‌চারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি এবং কলিকাতা পাব্‌লিক লাইব্রেরী এই দুইটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের প্রতিই মেট্‌কাফ বিশেষ প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন। একারণ উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ একমত হইয়া স্থির করিলেন যে, প্রস্তাবিত ভবনের নিম্নতল এগ্রিকাল্‌চারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটির জন্ত সংরক্ষিত থাকিবে, দ্বিতলটি সম্পূর্ণ কলিকাতা পাব্‌লিক লাইব্রেরী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইবে। গ্রাণ্ট মহোদয় আরও বলেন যে, এরূপ একটি দ্বিতল গৃহের নির্ম্মাণ-ব্যয় অনেক পড়িবে। তাঁহাদের হাতে

কিছু কম চল্লিশ হাজার টাকা রহিয়াছে। এই টাকার মধ্যে দশ হাজার টাকা দিয়াছেন কৃষি-সমাজ। লাইব্রেরীকেও অনুরূপ টাকা দিতে হইবে, সুতরাং সঞ্চিত তহবিল বাদে তাঁহাদের আরও ছয় হাজার টাকা সংগ্রহ করা প্রয়োজন।* তখনও পর্য্যন্ত কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভূমি প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় নাই। তবে তাঁহাদের সমবেত আবেদন এবারে একান্ত বিফল হইবে না।

৭

বস্তুত: এই সম্মিলিত প্রয়াস সফল হইল। সরকার শেষ পর্য্যন্ত উক্ত উদ্দেশ্যসমূহ সাধনের নিমিত্ত কলিকাতার হেয়ার ষ্ট্রীট এবং ষ্ট্রাণ্ড রোডের মোড়ে এক খণ্ড ভূমি দান করিলেন এই সর্ত্তে যে, এখানে সুষ্ঠু স্থাপত্য রীতি অনুগ একটি সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এই ভূমির উপর একটি পোড়ো বাড়ী বিদ্যমান ছিল। সার ইভান এ. কটনের ভাষায় "a building rapidly falling into decay which has been temporarily appropriated to the 'Sailors' Home' (*Calcutta Old and New*, p. 788.)। অর্থাৎ, এই পোড়ো বাড়ী সাময়িক ভাবে 'নাবিক-আবাসে' পরিণত হইয়াছিল। এস্থলে মহাসমারোহে ১৮৪০ সনের ১৯শে ডিসেম্বর নূতন গৃহের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হইল। বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ড ও তাঁহার পারিষদবর্গ, উক্ত চারিটি কমিটির সদস্যগণ, বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা এবং দেশী-বিদেশী গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই উৎসবে যোগদান করেন। সেযুগে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন-উৎসব একটি বিশেষ আড়ম্বরের ব্যাপার ছিল। কলিকাতায় হিন্দু (সংস্কৃত) কলেজ ও সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলের সময়ও এইরূপ উৎসব প্রতিপালিত হইয়াছিল। ইহার কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, বেথুনের কলিকাতা বালিকা-বিদ্যালয় প্রভৃতির বেলায়ও ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন-উৎসব বিপুল সমারোহে সম্পন্ন হয়। মেট্‌কাফ হলের ভিত্তি-প্রস্তরে উৎকীর্ণ লিপি হইতে ইহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও জানা যাইবে। একারণ এটি এখানে হুবহু প্রদত্ত হইল:

IN THE REIGN OF
HER MOST GRACIOUS MAJESTY VICTORIA,
And Under the Auspices of The
EARL OF AUCKLAND,
Governor General of India.
THE FOUNDATION STONE OF
THE METCALFE HALL,
was laid with Masonic Honours
BY
JOHN GRANT, Esq.,
Provincial Grand Master of Bengal and its Territories,
ASSISTED BY
JAMES BURNES, K. H.
Provincial Grand Master of Western India,
W. C. BLACQUIERE, Esq., Past D.P.G.M. Bengal.
SIR EDWARD RYAN, Kt., P.G.S.W.
MAJOR W. BURLTON, P.G.J.W.
and a highly numerous and respectable convocation
of the craft.

ON SATURDAY THE NINETEENTH DAY OF DECEMBER,
IN THE YEAR OF OUR LORD 1840.
IN THE ÆRA OF MASONRY 1840.

THIS EDIFICE WAS ERECTED AS A
TESTIMONY OF RESPECT TO
SIR CHARLES THEOPHILUS METCALFE
who on the 15th day of Sept. in the year of our Lord 1835,
in virtue of his authority as Governor-General of India,
and with a generous and enlightened regard
for the cause of truth and the interests of mankind,
GAVE LIBERTY TO THE PRESS OF INDIA.

These walls will not merely record a name that
can never be forgotten; but receive and preserve
A PUBLIC LIBRARY
and the
MUSEUM,
OF THE AGRICULTURAL & HORTICULTURAL
SOCIETY OF INDIA,
and thereby contribute to the public good, and object
of the dearest importance to the liberal mind and
benevolent heart
of
SIR CHARLES METCALFE.

ON THE REVERSE OF THE PLATE.

The funds for the erection of this Edifice were raised chiefly by public subscription. The valuable piece of ground on which it stands, was the munificent grant of the RIGHT HONORABLE THE EARL OF AUCKLAND, GOVERNOR OF BENGAL, who is ever ready to support the interests of the people, now happily under his administration, and to foster every undertaking that may benefit or adorn the City of Calcutta.

The building was designed by C. K. ROBISON, Esq.,
MAGISTRATE OF CALCUTTA,
and built by Messrs. Burn and Company.*

৮

এদিকে লাইব্রেরীর কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। পুস্তক-সংখ্যা এত বাড়িয়া গেল যে, ডা: ষ্ট্রংয়ের বাটীর নিম্নতলে স্থানসঙ্কুলান হওয়া কঠিন হইল। ১৮৪১ সনের জুলাই মাসের শেষ ভাগে আগেকার রাইটার্স বিল্ডিংসে (তখন ফোর্ট উই-

---

* কলিকাতা পাব্‌লিক লাইব্রেরী প্রদত্ত টাকার পরিমাণ সম্বন্ধে দুইটি মত রহিয়াছে। কটন সাহেব *Calcutta Old and New* পুস্তকে (পৃ. ৭৮৭) বলেন, লাইব্রেরী মেট্‌কাফ হল নির্ম্মাণে ছয় হাজার টাকা দিয়াছেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের পৌত্র সুরেন্দ্রলাল মিত্র *The National Magazine* for February, 1914-এ লাইব্রেরী-প্রদত্ত টাকার পরিমাণ ১৬,৪০০ শত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই অর্থসংগ্রহে প্যারীচাঁদের অশেষ পরিশ্রমের কথাও তিনি বলিয়াছেন। তাঁহার মতে এই হল নির্ম্মাণে মোট ব্যয় হইয়াছিল ৬৮০০০৲ টাকা।

**The Bengal Hurkaru and India Gazette,* December 21, 1840.

লিয়ম কলেজের আবাসস্থল ছিল) স্থানান্তরিত হইল। এই সময়ে লাইব্রেরীর কিউরেটর বা অধ্যক্ষ-পদে প্রাণ্ট এবং পার্কারের সঙ্গে কর্ণেল ডব্লিউ. ডামলপেরও নাম পাইতেছি। এ সময়ও লাইব্রেরিয়ান বা গ্রন্থাগারিক পদে প্যারীচাঁদ মিত্র অধিষ্ঠিত ছিলেন। সাব্-লাইব্রেরিয়ান বা সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদে দয়ালচাঁদ শেঠের নাম পাওয়া যাইতেছে। চাঁদাদাতাগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। তবে চাঁদা দান বিষয়ে প্রথম দুই শ্রেণীর সম্বন্ধে একটু নূতনত্ব দেখিতেছি। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর চাঁদাদাতারা প্রবেশিকা সমেত মাসিক চাঁদার হার পূর্ব্বানুযায়ী দিতে পারিতেন, অথবা প্রবেশিকা না দিয়া প্রতি মাসে আট টাকা করিয়াও তাঁহাদের চাঁদা দিলে চলিত। উক্ত বিকল্প নিয়মে দ্বিতীয় শ্রেণীর চাঁদার হার নির্দ্ধারিত হয় মাসে ছয় টাকা। তৃতীয় শ্রেণীর পক্ষে প্রবেশিকা ছয় টাকা এবং পরবর্ত্তী প্রত্যেক মাসের জন্ত দুই টাকা চাঁদাই পূর্ব্ববৎ ধার্য্য ছিল।

মেট্‌কাফ হল নির্ম্মাণ শেষ হইতে প্রায় সাড়ে তিন বৎসর লাগিয়াছিল। ১৮৪৪ সনের জুন মাসে হলের দ্বিতলে কলিকাতা পাব্‌লিক লাইব্রেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সাময়িক আবাস হইতে উঠিয়া আসিল। লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার আট বৎসরের মধ্যেই এইরূপে ইহার একটি স্থায়ী গৃহ নির্ম্মিত হইল। কলিকাতা যে দ্রুত সমগ্র ভারতের জ্ঞান-কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল, কলিকাতা পাব্‌লিক লাইব্রেরীর মত প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব তাহার মূলে রহিয়াছে অনেকখানি। মেট্‌কাফ হল দেশী-বিদেশী বিদগ্ধ জনের জ্ঞানানুশীলনে ধন্ত হইতে লাগিল।*

* প্রবন্ধ রচনায় *The Calcutta Monthly Journal* for 1835, '36, '37, '38, '39 & '40 ("Asiatic News") হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। Cotton-কৃত *Calcutta Old and New* পুস্তকেও (পৃ. ৭৮৬-৮৯) 'কলিকাতা পাব্‌লিক লাইব্রেরী' ও 'মেট্‌কাফ হল' সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। উক্ত সমসাময়িক 'জর্ন্যাল'ই অধিকতর প্রামাণিক বলিয়া তথ্যাদি সম্পর্কে যেখানে বিরোধ দেখিয়াছি উহা হইতেই গ্রহণ করিয়াছি।—লেখক।

মহিলা-সংবাদ

গত ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দুই জন ছাত্রী একত্রে

শ্রীশক্তি চৌধুরী

প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁহাদের একজন শ্রীমতী শক্তি চৌধুরী। এই বৎসর জানুয়ারীর কনভোকেশনে পরীক্ষার কৃতিত্বের জন্ত শ্রীমতী শক্তি তিনটি সুবর্ণমণ্ডিত পদক পাইয়াছেন। পদকগুলির নাম—কেশবচন্দ্র সেন পদক, হেমন্তকুমার পদক ও গঙ্গামণি পদক।

শ্রীমতী শক্তি প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী ও সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চৌধুরীর কনিষ্ঠা কন্তা।

শ্রীসুনন্দা সেন গত বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষায় এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। গত ১২ই জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে তিনি ব্রহ্মময়ী স্বর্ণপদক, অন্নপূর্ণা দেবী স্বর্ণখচিত পদক, সার আশুতোষ মুখার্জ্জী পদক, রামাইচন্দ্র মিত্র পুরস্কার এবং ক্ষেত্রমণি পুরস্কার প্রাপ্ত হন। উক্ত পরীক্ষায় একমাত্র তিনিই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসরে কেহই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই।

শ্রীমতী সেন ১৯৪৭ সালে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় বাংলা অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। ঐ বৎসরও বি-এ পরীক্ষায় অপর কেহ বাংলা ভাষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন নাই। উক্ত পরীক্ষায় তিনি পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট জুবিলি স্কলারশিপ, ডি-পি-আই স্কলারশিপ, পদ্মাবতী সুবর্ণ পদক, সুরেন্দ্রনলিনী স্বর্ণবলয়যুক্ত পদক, সুজাতা দেবী স্বর্ণবলয়যুক্ত পদক, শ্রীশ্রীমৎ তারাচরণ পরমহংস পদক এবং সারদাসুন্দরী গুপ্তা পদক প্রাপ্ত হন। সুনন্দা মাত্র

১৩ বৎসর বয়সে কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীসুনন্দা সেন

শ্রীমতী সুনন্দা রাঁচীপ্রবাসী শ্রীকুমুদকান্ত সেনের একমাত্র কন্যা।

লেখিকা হিসাবে তিনি ইতিমধ্যেই পরিচিতা হইয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি বিহারে মগধ মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা।

বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅতুল দাসগুপ্তের কন্যা এম-এ ক্লাসের ছাত্রী শ্রীমতী সুমিত্রা দাসগুপ্তা গত আন্তঃবিশ্ব-

শ্রীসুমিত্রা দাসগুপ্তা

বিদ্যালয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি গত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় রবীন্দ্র-সঙ্গীতে প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। চিত্রবিদ্যা সূচীশিল্প ইত্যাদি বিবিধ শিল্পবিদ্যায় দক্ষতার জন্য অল বেঙ্গল মিউজিক কলেজ হইতেও তাঁহাকে একটি বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে।

আকাশের চাঁদ সে যে

শ্রীসুনীলরঞ্জন ঘোষ

আকাশের চাঁদ সে যে, আকাশের চাঁদ,
পাবে না ত তারে হাত বাড়ায়ে।
তাহারে চেয়েছ তুমি ফিরে ফিরে হায়,
পৃথিবীর পারে একা দাঁড়ায়ে।

সে শুধু ফিরিয়া গেছে থামে নাই,
তোমার দুয়ারে এসে নামে নাই,
চুপি চুপি চাওয়া সেই চাওয়াতেই
চোখে চোখে গেছে হায় হারায়ে।
আকাশের চাঁদ সে যে আকাশের চাঁদ,
পাবে না ত তারে হাত বাড়ায়ে।

জীবনের মধুমাসে আশার মেশায়
যা কিছু চেয়েছ তুমি—পেলে কি ?
দূরের যা র'য়ে গেছে অজানা দূরেই,
কাছের যা কাছে তাও মেলে কি ?

মনের দুরাশা শুধু মনে রয়,
বনের পাখী সে বনে বনে কয়,
দু'জনার মাঝে পথ—আলো নেই,
কে যাবে সে ছায়াপথ ছাড়ায়ে!
আকাশের চাঁদ সে যে আকাশের চাঁদ,
পাবে না ত তারে হাত বাড়ায়ে!

নিমন্ত্রণ

শ্রীকমল সরকার

পর পর দু'খানা ট্রাম বেরিয়ে গেল। তাতে তিলধারণের স্থান ছিল, কিন্তু মানুষ ধরবার জায়গা হ'ল না। ট্রামের ভিতরে ত নয়ই, বাইরেও নয়। তৃতীয় ট্রাম কত দূরে দেখবার জন্যে সমর ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নেমেছে এমন সময় হঠাৎ একখানা প্রকাণ্ড বুইক গাড়ী একেবারে তার গায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

গাড়ীর ভিতর চেয়ে দেখে নি সমর। ভেবেছিল, সামনে অন্য গাড়ী এসে পড়ায় হঠাৎ ব্রেক কসেছে। পিছু হটে গাড়ীখানাকে যেতে দেবে, এমন সময় কে যেন ভিতর থেকে তার নাম ধরে ডাকলে। অবাক হবারই কথা। এমন বড়লোক বন্ধু বা আত্মীয় সমরের কেউ কোথাও নেই যে এত বড় গাড়ী হাঁকিয়ে কলকাতা শহরে বেড়ায়। কিন্তু আরও আশ্চর্য্য হ'ল সমর যখন সে গাড়ীর আরোহীর দিকে তাকালে। তার ব্যাক্-ব্রাশ করা চুল, চোখে মোটা সেলুলয়েড ফ্রেমের চশমা, মুখে পাইপ, গলায় ঘোর লাল রঙের সিল্কের টাই, অঙ্গে নিখুঁত সাহেবী পোশাক। মোটাসোটা দিব্যি গোলগাল চেহারা। মুখের আদলটা চেনা-চেনা, অনেকটা সন্তোশ গুহর মতন। কিন্তু ছ-সাত বছরে মানুষের এত পরিবর্ত্তন সম্ভব? যে সন্তোশকে সমর চিনত, সে ছিল ছিপছিপে রোগা—খাটো ধুতি আর একটা আধ ময়লা ছিটের হাফ শার্ট পরে কলেজে আসত। মাথার চুল উসকো-খুসকো, মাসের মধ্যে বিশ দিন নাইত না। দাড়ি গোঁফ বেশী লতিয়ে গেলে কাঁচি দিয়ে ছেঁটে আসত, কামানোতে ভীষণ ভয় ছিল। অবস্থাও তার মোটেই ভাল ছিল না। এই সুবেশ, সুকেশ হৃষ্টপুষ্ট সাহেবকে সেই সন্তোশ বলে হঠাৎ সনাক্ত করা বিপজ্জনক। অনুমানে ভুল হলে অপ্রস্তুতের একশেষ।

—কি রে, অবাক হয়ে গেলি যে—

হঠাৎ সমরের চোখে পড়ল, গাড়ীর পেছনের সিটে একটা দামী চামড়ার হ্যাণ্ড ব্যাগ। উপরে মালিকের নাম—মিষ্টার এস. গুহ। সমর যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এ তা হলে সন্তোশই! কিন্তু এখন তাকে সম্বোধন করা যায় কি বলে? পুরনো দিনের মত 'তুই' বলে ডাকতে কিছুতেই সমর পেরে উঠল না, বাধ বাধ ঠেকতে লাগল। শেষকালে সম্বোধন এড়িয়ে ঘুরিয়ে বললে, অবাক হলে দোষ দেওয়া যায় না। পুরনো দিনের সেই সন্তোশ গুহকে এই সাহেবী পোশাকের মধ্যে থেকে রীতিমত আবিষ্কার করতে হয়।

সন্তোশ হা হা করে খানিক হেসে নিলে। পরে বললে, খুব বদলেছি, না?...তার পর ট্রামের জন্যে দাঁড়িয়ে? যাবি কোথায়?

—দশটার সময় বাঙালী-সন্তান আর কোথায় যায়? কলম পিষতে।

—অর্থাৎ ডালহৌসী স্কোয়ার?

সমর মাথা নাড়লে।

—উঠে আয় তা হলে, যেতে যেতে কথা বলি। আমি যাচ্ছি পার্ক ষ্ট্রীট অঞ্চলে, তোকে চৌরঙ্গীতে নামিয়ে দেব।

হুস্ হুস্ করে গাড়ী ছুটে চলেছে। ঝাঁকানি নেই, এঞ্জিনের গর্জ্জন নেই, পেট্রলের কড়া গন্ধ নেই। শুধু একটা একটানা সোঁ সোঁ আওয়াজ। সামনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হয় পথটা ছুটতে ছুটতে এসে গাড়ীর তলায় লুটিয়ে পড়ছে। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগছে, কপালে গলায়। আঃ! শরীর যেন জুড়িয়ে গেল! কোথায় ভিড়ের মধ্যে গলদ্ঘর্ম্ম হয়ে ট্রামে-বাসে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া, আর কোথায় এই মোলায়েম কুশনের ওপর দেহভার এলিয়ে দিয়ে পথকে ফাঁকি দেওয়া! কথা কইবে কি, সমরের ইচ্ছে হ'ল কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চোখ বুজে এই আরামটুকু উপভোগ করে।

আচ্ছা গাড়ীখানা কার? সন্তোশের নিজের? অন্যায় কৌতূহল। গাড়ী সন্তোশের হোক না হোক, সমরের তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নেই। তবু জানতে দোষ কি?

—গাড়ীখানা নূতন মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ, এই হ'ল মাস আষ্টেক। তোর কাছে বলতে বাধা কি, খুব দাঁও মেরেছি। দোকানে এ গাড়ীর সেল প্রাইস আঠারো হাজার, আমি পেলাম দশে। আমাদের এক আমেরিকান সাহেবের গাড়ী, বড়জোর মাস দুই-আড়াই চলেছিল, তার পর সাহেব হঠাৎ দেশে চলে গেল।

দশ হাজার! দশ হাজার দিয়ে যে গাড়ী কিনতে পারে সে কত টাকার মালিক! মনে মনে টাকার ওপর টাকা জুড়ে সমর একটা বিরাট অঙ্ক বানিয়ে ফেললে। আরও কতক্ষণ বোধ হয়, টাকার অঙ্ক স্বগতঃ আউড়ে যেত, কিন্তু চমক ভাঙল সন্তোশের ডাকে।

—গাড়ীখানা কেমন?

—চমৎকার। মালিকের উপযুক্ত গাড়ী। কিন্তু আমেরিকান সাহেবের সঙ্গে আলাপ হ'ল কোথায়?

—পানাগড়ে।

—যেখানে আমেরিকান ছাউনি পড়েছে?

—হ্যাঁ, ঐখানে। তিন বছর ত ঐখানে কাটালাম। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসি দু-চার দিনের জন্যে।

কি কাজ করে সন্তোশ তা ভেঙে বললে না, সমরও জিজ্ঞাসা করলে না। জিজ্ঞাসা করবার দরকার ছিল না। সন্তোশ কি কাজ করে সে প্রশ্ন অবান্তর। যেটা কাজের কথা সেটা হ'ল এই যে, যুদ্ধের বাজারে সে পয়সা রোজগার করেছে দু'হাতে। সে পয়সার পরিমাণ দশ-বিশ হাজারও হতে পারে, দু-পাঁচ লাখও হতে পারে।

খুশী হবার ভাব দেখিয়ে সমর বললে, বাঃ বাঃ, ভাল কাজ দেখছি। আর শুধু কাজে ঢোকা নয়, একেবারে উন্নতির চরম শিখরে—

—দোহাই সমর, তোর ঐ সব বড় বড় বাংলা বুলিগুলো মাঠে মারা যাবে। ধরতেই পারব না, ভাল কথা বলছিস না গাল দিচ্ছিস।

সমর হেসে ফেলে বললে, আচ্ছা বলব না। কিন্তু ক'বছরে অভিজ্ঞতা কেমন হ'ল তা তো জিজ্ঞেস করতে পারি ?

—ওঃ, সে বলতে গেলে এক মহাভারত। কত রকম দেখলাম, কত লোকের সঙ্গে মিশলাম, তোদের মত পেটে বিদ্যে থাকলে কেতাব লিখে ফেলতাম।

—কি রকম শুনি ?

—আজ আর হয় না। এই তো প্রায় এসে পড়লাম। আর একদিন গল্প করা যাবে।

—এ প্রস্তাব উত্তম। কবে কোথায় সুবিধে জানতে পারলে—

—আমি আছি গ্র্যাণ্ড হোটেলে, হয় সেখানে না হয় তোর বাড়ী—

এর পরে বলা যায় না, 'তোমার এসে কাজ নেই, আমিই হোটেলে যাব।' সমর সেজন্তে বললে—গরীবের বাড়ী যাবার কথা বলতে সাহস হচ্ছিল না। অসুবিধে না হলে আমার বাড়ীতেই একবার পদার্পণ হোক্। এবং সেই সঙ্গে আহারও। কাল রবিবার আছে, কালই ভাল।

গাড়ী চৌরঙ্গীতে এসে থামল। সন্তোশ পকেট থেকে ডায়েরী বার করে পাতা উল্টে দেখলে। বললে, নাঃ, কাল দুপুরে কোন এন্‌গেজমেণ্ট নেই দেখছি। বেশ, তা হলে কালই বারোটা একটা নাগাদ যাব। তোর ঠিকানা কি ?

ঠিকানা দিয়ে সমর গাড়ী থেকে নেমে পড়ল।

শনিবার তাড়াতাড়ি আপিসের ছুটি। অন্ত শনিবার ছুটির পরও দু-তিন ঘণ্টা সমর আপিসে থাকে। কিন্তু আজ কিছুতেই সে কাজে মন বসাতে পারলে না। থেকে থেকে কেবলই মনে পড়তে লাগল সকালের ঘটনা। বন্ধুর প্রতি ঈর্ষা নয়, কিন্তু একটা তুলনার ভাব আপনা থেকেই মনে আসে। ঐ সন্তোশ আই-এটাও পাস করে নি, সেকেণ্ড ইয়ারের মাঝামাঝি পড়া ছেড়ে দিলে। সামান্ত অবস্থা থেকে সে আজ হাজার হাজার টাকার মালিক। গ্র্যাণ্ড হোটেলে তার থাকবার জায়গা, গাড়ী হাঁকিয়ে কলকাতার বড় বড় সোসাইটিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর সমর ? সকাল দশটায় এ-জি'র আপিসে হিসাব নিয়ে বসে, সারাদিনই হিসাবের কাজ। আজ বলে নয়, চাকরি বজায় থাকলে দশ-বিশ বছর বাদেও সে ঐ যোগ-বিয়োগই কষতে থাকবে। কোথায় রইল তার যৌবনের আদর্শ, কি পেলে তার এম-এ পাসের মূল্য ? আজ সমরের দাম কিছু বেড়ে এক-শ' কুড়িতে এসে দাঁড়িয়েছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়তে সমরের চমক ভাঙল। এসব কি সে ভাবছে ? পৃথিবীতে কেউ সারা জীবন পায়ের উপর পা তুলে বসে থাকে, কেউ দু'মুঠো অন্নের জন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। ও নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই।

কাগজ-পত্র সরিয়ে রেখে সমর আপিস থেকে বেরিয়ে পড়ল। আজ বরং বিকেলের ট্যুইশানটা বেলাবেলি সেরে বাড়ী ফেরা যাক্।···

মাণিকতলা অঞ্চলে সমরের বাসা। বাড়ী ফিরে চা খেতে খেতে সে বেণুকে বললে, কাল সকালে একটি বন্ধুকে খেতে বলেছি। বন্ধু বড়লোক, ভয়ানক রকম বড়লোক।

—কে গো ?

—সে তুমি চিনবে না। কলেজের বন্ধু ছিল, ছ-সাত বছর পরে আজ আপিস যাবার পথে দেখা। যুদ্ধের দৌলতে হাজার হাজার টাকার মালিক।

শুনে বেণুর মুখ শুকিয়ে গেল। বললে, এত বড়লোককে ডেকে আনছ, খেতে দেবে কি ?

—কি করব, উপায় ছিল না। নিজে থেকে বললে, এড়ানো গেল না।

বেণু চুপ করে রইল। খানিক পরে চায়ের বাটিটা নামিয়ে সমর জিজ্ঞাসা করলে, তোমার কাছে সংসার-খরচের টাকা কিছু আছে ? আমার পকেট তো প্রায় খালি।

—চারটে টাকা আছে। কিন্তু মাসকাবার হতেও তো তিন দিন বাকী। চার টাকায় তিন দিনের বাজার-খরচ কোনও রকমে চলবে।

খুব অসুবিধের পড়তে হবে সমরও বুঝলে। সে লাজুক প্রকৃতির মানুষ, লোকের কাছে ধার চাইতে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। এর আগে দু' একবার ধার করে সময়মত ফেরত দিতে পারে নি। কিন্তু উপায় কি ? কথা যখন দিয়েছে যে করে হোক ব্যবস্থা করতে হবে। বেণুর কাছে চায়, তার কাছে

টাকা দুই—এই ছ' টাকা সম্বল। খরচ কত হবে কে জানে। বেণুকে জিজ্ঞাসা করলে, কি কি রাঁধবে বলত ?

—একে বাইরের লোক, তায় বড়লোক। মাছ, মাংস দুটো ত করতেই হয়। তা ছাড়া দই মিষ্টি আছে। এদিকে ডাল আর ভাজাভুজি, না হয় ঘরে যা আছে তাই থেকে করে নেব।

মাছ, মাংস, দই, মিষ্টি! মাছ, মাংস একপো করে আনলেও বার আনা বার আনা দেড় টাকা। দুটো বড় মিষ্টি আট আনা, দই পোয়াখানেকের দামও আনা আটেক। তারপর মাংসের জন্তে আদা পেঁয়াজ আছে, আরও দু-পাঁচটা তরিতরকারি আছে। তার মানে এক জনকে খাওয়াতে কমপক্ষে তিন টাকা খরচ। বাড়ীর লোকের জন্তে বেশী করে আনলে অন্ততঃ পাঁচ টাকা। হাতে আছে ছ' টাকা। অর্থাৎ এক টাকায় তিন দিন চালাতে হবে।

মনে মনে হিসাব করে সমর বললে, চার টাকা পড়ে যাবে। এ তিন দিন ডাল-ভাত খেয়ে থাকতে হবে আর কি। সে যা হোক হবে, মান আগে।...মাছ, মাংস, দই একপো করে আনলে চলবে ত ?

—সকলের কুলোবে না, তবে একপো করেই এনো, কুলিয়ে নেব।

—আর শোন, চার আনার মিষ্টি দুটির বেশী আনব না। শুধু সন্তোশের জন্তে। মিষ্টিটা লুকিয়ে রেখ, খোকা দেখলে আবার বায়না ধরবে। যদি বাঁচে, পরে খাবে'খন।

বেণুর চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল। তাদের বাড়ীতে ভাল খাওয়া ধরতে গেলে হয়ই না। এক দিন যদি বা একটা ভাল জিনিষ আসছে, ছেলের কাছ থেকে তা লুকিয়ে রাখতে হবে, স্বামীর পাতে দিতে পারবে না।

—খোকাকে না হয় নাই দিলাম। কিন্তু তোমরা দু'জনে একসঙ্গে খেতে বসবে, তোমার পাতে মিষ্টি না দিলে তোমার বন্ধু লক্ষ্য করবে না ?

—সে কোনো ছুতো করে এড়িয়ে যাব। হয় পরে খাব, না হয় বলব, মিষ্টি খাওয়া আমার বারণ।

পরদিন। ছুটির বার, তবু একটু বেলা অবধি শুয়ে আরাম করবে, তার উপায় নেই বেণুর। এমনিতেই ভোর হতে না হতে খোকা উঠে পড়ে। মায়ের গায়ের ওপর ঝাঁপাঝাপি করে, চুল ধরে টেনে খেলা করে, দস্যি ছেলের উৎপাতে একটু যদি বেণু চোখ বুজতে পারে। আজ উঠাও দরকার তাড়াতাড়ি। ঠিকে ঝি দু' দিন আসে ত তিন দিন আসে না। এলেও শুধু বাসন ক'খানা মেজে দিয়ে চলে যায়। জলতোলা, বাটনা বাটা, কুটনো কোটা—এ সবই বেণুকে একলা হাতে সামলাতে হয়।

সাড়ে সাতটার মধ্যে বেণু বাসিপাট সেরে চা করে আনলে। সমরকে ডেকে বললে, চা খেয়ে বাজারটা একটু তাড়াতাড়ি এনে দাও।

ছ' দিনের পর এক দিন ছুটি। ছ' দিন সকাল, দুপুর, সন্ধ্যে সমরের ছোটাছুটি করে কাটে। আপিস, সকাল-বিকাল ছেলে পড়ানো, তা ছাড়া বাজার করা, রেশন আনা এসবও আছে। ছ' দিনের ক্লান্তি জমা হতে হতে ছুটির দিন শরীর এলিয়ে পড়ে, ইচ্ছে করে সারাক্ষণ বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকে। বিশেষ করে সকালবেলাটা। কিন্তু আজ শুয়ে থাকলে চলবে না। বাজার না আনলে রান্না চড়বে না।...

দু' হাত থেকে বাজারের থলি নামিয়ে সমর বললে, আমার আসতে দেরী হয়ে গেল। তোমার উনুন খালি যাচ্ছে বোধ হয় ?

—না ছোলার ডাল বসিয়েছিলাম, এই নামালাম।...কি বাজার আনলে দেখি।...কৈ, পান আনো নি ত ?

—ঐ রে, একেবারে ভুলে গিয়েছি। যাক্‌গে, সাজা পান আনাব'খন। ভাল কথা মনে পড়ল, সিগারেটও আনতে হবে এক প্যাকেট।

—এক প্যাকেট পুরো লাগবে ? তুমি ত খাও না।

—দুপুরবেলাটা থাকবে সন্তোশ, এক প্যাকেটই এনে রাখা ভাল।

—আচ্ছা। তুমি এখন একটু খোকাকে নিয়ে থাক, আমি কাজ সারি। তোমার আর একবার চা চাই ত ?

—হলে ত ভাল হয়, যদি অবশ্য উনুন আর হাত খালি থাকে। চা খেয়ে কিন্তু আমি রান্নাঘরে এসে বসব।

—কেন ?

—কেন আবার কি, একলা হাতে সব করবে—

বেণু মুখ টিপে হেসে বললে, সেকথা ঠিক। তুমি তা হলে না হয় মাছটা কুটে দাও। বাটনাটা না জেনে বেটে ফেলেছি, নয়ত সে কাজটাও দিতাম।

—পারি না ভাবছ ?

—খু-উ-ব পার। কিন্তু রক্ষে কর, আজকের দিনটা বাদ দাও। তোমাকে অন্য কাজ দিচ্ছি।

—কি ?

—বাইরের ঘরটা অগোছাল হয়ে রয়েছে, ওটা একটু পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখ।

—ঘর গোছাতে যাচ্ছিলাম এক্ষনি। তোমার চাবিটাও অমনি দিও। কাঁচের ডিসগুলো আলমারী থেকে বার করে ধুয়ে রাখি।

এমনিভাবে সারা সকাল ওরা দু'জনে খাটলে। সমর ঘরদোর পরিষ্কার করলে, সাবানজল দিয়ে কাঁচের বাসন ধুয়ে,

সাবান আর কাচা তোয়ালে রেখে এল কলতলায়। তার নিজের বিছানায় ফর্সা চাদর পেতে, বালিশের ওয়াড় বদলে রাখলে—যদি সত্যেশ দুপুরে শোয়। বেণু আটকে রইল রান্নাঘরে। যা রাঁধবার কথা ছিল, তার চেয়ে কিছু বেশীই রাঁধলে। মোচা ছিল ঘরে, তাই দিয়ে চপ তৈরি করলে, একটা চাটনী রাঁধলে, ভাজাভুজিও দু'চারখানা একজনের মতন করে নিলে। এর মধ্যে সময় করে ছেলেকেও নাওয়ালে, খাওয়ালে। তারপর কাজের ফাঁকে একবার সমরের কাছে এসে দাঁড়াল। ঘরের জিনিষপত্র গোছানো দেখে বললে, বাঃ, এ যে আমাকেও হার মানালে দেখছি।

—মাছ কুটতে দিলেও হারিয়ে দিতাম। একটু হয়ত দেরী হ'ত। তোমার রান্নার কতদূর?

—*এই হয়ে এল। কটা বেজেছে বল ত?*

—*বারোটা বাজে*

—*ভদ্রলোক ক'টায় আসবেন বলেছেন?*

—সাড়ে বারোটা একটা নাগাদ।

একটা বাজল সত্যেশের দেখা নেই। বেণু উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আসবেন ত ঠিক?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় আসবে বললে। আমার বাড়ীর ঠিকানা টুকে নিলে। আসবে ঠিক, তবে কোথায় হয়ত আটকে পড়েছে কি বাড়ী খুঁজে পায় নি।

যখন দেড়টা বাজল, তখন সমর দুর্ভাবনায় পড়ল। কথা দিয়ে সত্যেশ কি সত্যি সত্যি ভুলে গেল? গ্র্যাণ্ড হোটেলে একবার টেলিফোন করবে? টেলিফোনও ত এ পাড়ায় কাছাকাছি কোথাও নেই।...

টেলিফোন করবার দরকার হ'ল না, কারণ এই সময় বাড়ীর বাইরে মোটরের হর্ণ বেজে উঠল। হর্ণ শুনেই সমর জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলে সত্যেশের গাড়ী। সাহেব মানুষ—ঠিক লাঞ্চ খাবার সময়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি একটা হাফ-সার্ট গায়ে দিয়ে পায়ে চটিটা গলিয়ে সমর দোর খুলতে গেল। যাবার সময় বেণুকে ডেকে বললে, এসে গেছে সত্যেশ। তুমি খাবার জোগাড় কর।

বাইরে আসতে গাড়ী থেকে নেমে এল ড্রাইভার। সমরকে দেখে জিজ্ঞাসা করলে, আপ্ মিত্তর্ সাব হ্যায়?

—হাঁ।

ড্রাইভার বুক-পকেট থেকে একখানা চিঠি বার করে দিলে। তাতে লেখা—

"ভেরি সরি। আমার এক বিজ্নেস্ পার্টনার একটু আগে ফারপো'তে লাঞ্চ খাবার নেমন্তন্ন করলেন। 'না' করতে পারলাম না। কিছু মনে করিস নি—প্লীজ। তোর ওখানে আর একদিন যাওয়া যাবে।—সত্যেশ।"

'অসমীয়া' সংস্কৃতি ও বাঙালী

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রিটিশ আমলের প্রথম যুগ হইতে বাঙালীরা যখন যে প্রদেশে গিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই সেই সেই প্রদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের আলোচনা ও গবেষণা করিয়াছেন এবং দুই পক্ষকেই সমৃদ্ধ করিয়াছেন। আসামেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। আসামের আর একটি বিশেষ সুবিধা ছিল। শ্রীহট্ট আসামভুক্ত থাকায় শ্রীহট্টবাসী বাঙালীরা অনেকেই আসামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। কেহ কেহ গত এক শত বৎসরের বাঙালীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিতেছেন। তাহারও বিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৩০ সনে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত *The Asiatic Journal*, May-Aug 1830 সংখ্যায় দেখিতেছি হেলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনের "আসামের ইতিহাস" সম্বন্ধে একটি সমালোচনা-প্রবন্ধ রহিয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ঐ সময়ে 'ইণ্ডিয়া গেজেট' নামক সংবাদপত্রে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী অসমীয়া ভাষায় লিখিত আসামের এক ইতিহাসের সমালোচনা করিয়াছিলেন। ঐ ইতিহাসের এইরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে:

"The first contains an account of the reigns of Assamese Princes from the earliest to the latest period, the second details the mode of administering government and justice in Assam. The third gives the geography of Assam with an account of its holy places and the fourth enumerates the products of the country and illustrates the division of castes, the manners of the people and their mode of worshipping the supreme being."

এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, একজন বাঙালী মনীষীই ফুকনের ইতিহাসকে তখনকার শিক্ষিত-সমাজে পরিচিত করাইয়া দেন। ফুকনের বুরুঞ্জীর প্রথম অংশ নাকি এখনও পাওয়া যায় নাই। ফুকন সম্বন্ধে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

"The zeal he has manifested, the labour he has

undergone and the pecuniary interest he has sacrificed in the publication of this book surely entitles him to much high praise."

আধুনিককালে বাঙালীদের মধ্যে পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে আসাম সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক গবেষণার পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে। কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি স্থাপনান্তর "কামরূপ শাসনাবলী" প্রকাশ করিয়া তিনি আসামের অতীত ঐতিহ্যের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির কথা দেশবাসীর নিকট প্রকাশ করেন। অবশ্য ইহার পূর্ব্বে, রবিনসন্, গর্ডন, গেট, গ্রিয়ারসন প্রমুখ রাজপুরুষেরাই আসামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোচনা করিয়াছেন। আসাম গবর্ণমেণ্ট লাইব্রেরী, রেকর্ড রুম এবং সরকারী পুরাতন দপ্তরে আসামের, তথা ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে এত উপকরণ আছে যে, সেগুলিকে গবেষণার এক অপূর্ব্ব ভাণ্ডার বলা যাইতে পারে। ডক্টর সূর্য্যকুমার ভূইঞা এই বিভাগের অধ্যক্ষরূপে একাই বহু বুরুঞ্জীর সম্পাদনা করিয়াছেন ও তাঁহার অনুসন্ধানলব্ধ পুস্তকগুলি সাধারণের জন্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে আসাম সম্বন্ধে গবেষণা ও আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে রাজ্যপাল শ্রীজয়রামদাস দৌলতরামের সভাপতিত্বে শিলঙে সম্প্রতি একটি ইতিহাস-পরিষদ গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ তত্ত্বভূষণও ইংরেজীতে *The Background of Assamese Culture* এবং অসমীয়া ভাষায় 'গৌরবময় অসম', 'ভক্তিরত্নাকর', প্রভৃতি গ্রন্থ এবং শ্রীশঙ্কর দেব মাধব দেবের বরগীত প্রকাশ করিয়া অসমীয়া সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল দিকে প্রচুর আলোকপাত করিয়াছেন। আসামের বাঙালী পরিচালিত বৃহত্তম পুস্তক-প্রতিষ্ঠান জাতীয় সঙ্গীত, কথাদশম, নামতী, স্মৃতিতীর্থ (কবি নলিনীবালা দেবী প্রণীত) কুমারসম্ভব, শকুন্তলা প্রভৃতি নানা পুস্তক অসমীয়া ভাষায় প্রকাশ করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহারা কৃষ্ণকান্তের উইল, পরিণীতা, দেবদাস, রাজর্ষি মাটি আরু মানুহ (ন্যুট হামসুনের *Growth of the Soil*) প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। শিলঙের লেডী কীন গার্লস্ কলেজ এবং স্কুলও বাঙালীদের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল।

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য ছাড়া আরো কোনো কোনো বাঙালী আসামের সাহিত্য, ইতিহাস, জাতিতত্ত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন। বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় পর্য্যন্ত বহুকাল পূর্ব্বে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে অসমীয়া গদ্য সাহিত্যের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। আসামের সতী-শিরোমণি জয়মতীর কাহিনী আসামের ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়। এই রাজমহিষীর অতুলনীয় আত্মত্যাগের কাহিনীকে বিস্মৃতির অন্ধকারগহ্বর হইতে লোকলোচনের সমক্ষে প্রথম উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন শ্রীহট্টের সুখর গ্রাম-নিবাসী একজন বাঙালী—পরলোকগত গোপালকৃষ্ণ দে। সতী জয়মতী সম্বন্ধে শ্রীহট্টের শ্রীরজনীকান্ত রায় দস্তিদারের একটি প্রবন্ধও 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে আসামের আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে শ্রীনলিনীকুমার ভদ্রের গবেষণাপূর্ণ পুস্তকাদি ও প্রবন্ধাবলী উল্লেখযোগ্য। আসাম-পর্য্যটক শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী আসাম সম্বন্ধে বহু তথ্য বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত 'আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি' সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ। বর্ত্তমান লেখকের 'বৈষ্ণব সাধনার ইতিহাসে মহাপুরুষ শঙ্করদেব' ও 'অসমীয়া বীর লাচিত বরফুকন' প্রভৃতি প্রবন্ধ সম্প্রতি বাংলা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এমনি আরো বহু বাঙালী লেখক বাংলা ও আসামের সাংস্কৃতিক মিলনের ক্ষেত্রকে প্রশস্ততর করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে সকলের নাম এখানে উল্লিখিত হইল না।

এই প্রসঙ্গে 'আহোম' ও 'অসমীয়া' এই দুইটি শব্দের পার্থক্যের কথা বলা যাইতেছে। ১৮৪১ সনে প্রকাশিত Robinson's এর *Descriptive Account of Assam*-এ দেখি আসামকে বলা হইয়াছে 'অ সম' 'unequalled' or 'unrivalled'. সার এডোয়ার্ড গেটও 'peerless' এই অর্থে ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাই শাখার শানেরা যখন এই প্রদেশে আসে তখন তাহাদের আ সাম অসম, আ-চাম অহম বলা হইত। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, বিজেতারা দেশটিকে "মিউং ডুন্ চুণখাম" বা 'সোনার দেশ' বলিয়া বর্ণনা করিত, কিন্তু শান দেশ হইতে আগত বলিয়া তাহাদের আ সাম বা আ হম বলা হইত। ঐ বিজেতাদের বংশধরেরা তাহাদের নিজস্ব ভাষা কতকটা রক্ষা করিয়াছেন, তাহাকেই "আহোম" ভাষা বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই বিজেতারাই ক্রমশঃ পুরাদস্তর হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া তাহাদের ধর্ম্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিল, আহাম রাজা স্বর্গদেবদের রাজত্ব স্থাপিত হইল। ষোড়শ শতাব্দীর সূর্য্য দৈবজ্ঞ লিখিত দরং রাজ বংশাবলীতে লিখিত আছে যে, অসম বলিতে ঐ বিজয়ী শানদেরই বুঝাইত। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর দৈত্যারি ঠাকুরের শঙ্কর-চরিতে শান বা আহোমদের নানাভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। বহু পরে রচিত কামরূপ বুরুঞ্জীতে 'আহাম' কথাটি পাওয়া যায়। অসম বুরুঞ্জীতে উদ্ধৃত (১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দ) মীরজুমলা (মজুম খাঁ) ও অহম রাজের সন্ধিপত্রের যে বিবরণ আছে তাহার বর্ণনা এইরূপ "লিখিতং শ্রীজয়ধ্বজ সিংহ রাজা আচাম···"

ঐতিহাসিকরা সকলেই স্বীকার করেন, আসাম নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে এখনও কোন সন্তোষজনক মীমাংসা হয় নাই।

গ্রিয়ারসন ব্রহ্মদেশীয় শান কথার সঙ্গেই আসামকে জড়িত করিয়াছেন। ডাঃ প্রবোধ বাগচী শানকে মনখ্‌মের শিলা-লিপি শিন্ শ্যামের সঙ্গে যুক্ত করেন। তাই ভাষায় চাম বলিতে পরাজয় বুঝাইত। আ চাম বলিলে অপরাজিত বুঝায়। আসামের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাঃ বাণীকান্ত কাকতি এই সব তথ্য আলোচনা করিয়া আসামের নামকরণকে "Phonetic vagary" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অসমীয়া ভাষা বাংলা ভাষার মতই মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশ। এই সম্বন্ধে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত উল্লেখযোগ্য :

"Assamese under her independent Kings and her Social life entirely self-contained became an independent speech although her sister dialect North Bengali accepted the vassalage of the literary speech of Bengali."

মোট কথা, শান জাতির অহম শাখার লোকেদের আগমনের বহু পূর্ব্বেই এখানে অষ্ট্রিক নিগ্রোবটু, কিরাত বোডো, তিব্বতীয়, দ্রাবিড় মোঙ্গোলীয় এবং আর্য্যেরা আসিয়াছে। শুধু মগধ, গৌড় হইতে লোক আসে নাই ; মিথিলা, কনৌজ, কাশ্মীর, গুজরাট, দাক্ষিণাত্য হইতে বৌদ্ধ শ্রমণ আসিয়াছে ; তান্ত্রিক, কাপালিক, আসিয়াছে, সহজিয়ার দল, শিল্পী, হাটকেশ্বরের পূজারীরা, নদীয়ার ব্রাহ্মণরা, বৈষ্ণবগুরুরা আসিয়াছে। তাহারা ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তরতম সত্তাকে এই খানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কামরূপ, প্রাগজ্যোতিষকে অহমদের সংস্কৃতির সঙ্গে মিশাইয়া দিয়া একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্কৃতির বীজ বপন করিয়া গিয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই বাঙালীর দানও তাহাতে আছে। এজন্য বাঙালীর গর্ব্ববোধ করিবার কারণ বিদ্যমান।

আজ সর্ব্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে অসমীয়া ভাষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে তাহার নিজস্ব স্থান দিতেই হইবে এবং আজকের এই সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীই একমাত্র বাঁচিবার পথ। বাঙালীর সবচেয়ে বড় দান এই ভারতপথের পথিকত্ব। আজ আমরা প্রতিবেশী প্রদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মর্ম্মকথাকে সেই সর্ব্বভারতীয় কেন্দ্রেই প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। শঙ্কর দেব মাধব দেব শুধু অসমীয়াদের নন. তাঁদের অপূর্ব্ব সাহিত্য, ধর্ম্ম-দর্শন শুধু অসমীয়াদের মধ্যেই আবদ্ধ না থাকিয়া যেন সর্ব্ব-ভারতীয় মর্য্যাদা লাভ করে।

আলোচনা

"বাংলাদেশের মন্দির"

শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ জ্যোতিবিনোদ

'প্রবাসী', পৌষ সংখ্যায় শ্রীবিমলকুমার দত্ত 'বাংলাদেশের মন্দির' শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মন্দির সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রবন্ধে বাংলাদেশের সকল স্থাপত্য-রীতির মন্দির সম্পর্কে আলোচনা করেন নাই, উহাদের এদেশে প্রচলিত নামগুলিও ব্যবহার করেন নাই এবং উহাদের প্রাচীনত্ব বিষয়ে—সন, তারিখ বা ঘটনার উল্লেখ করিয়া—কোন আভাস দেন নাই।

আমরা অধুনালুপ্ত "মেদিনীবাণী" পত্রিকায় প্রায় এগার বৎসর পূর্ব্বে "চেতুয়া ও বাসুদেবপুর কাহিনী" নামক প্রবন্ধে এবং "দাসপুরের ইতিহাস" নামক প্রবন্ধে ঐ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি।

আমাদের মতে বাংলাদেশের মন্দির নির্ম্মাণ-রীতি প্রধানতঃ তিন প্রকার—(১) নিজস্ব, (২) মিশ্র ও (৩) বৈদেশিক। ঐ সকল রীতিতে নির্ম্মিত মন্দিরের শ্রেণী বারটি ;—নিজস্ব রীতি (১) চারচালা বা চতুঃশাল, (২) আটচালা বা অষ্টশাল, (৩) দ্বিশাল বা জোড়বাংলা, (৪) সমতল ছাদযুক্ত। মিশ্ররীতি —(১) একরত্ন বা আলগোছচুড়ী, (২) পঞ্চরত্ন, (৩) নবরত্ন, (৪) একুশ রত্ন। বৈদেশিক—(১) উৎকলীয়, (২) উত্তরভারতীয়, (৩) ইসলামীয়, (৪) খ্রীষ্টীয়।

লেখকের প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট "একক মন্দিরের" চিত্রটি নিজস্ব রীতির চতুঃশাল মন্দিরের উদাহরণ। উহা নদীয়া জেলার চাক-দহের নিকটবর্ত্তী পালপাড়ায় অবস্থিত। উহাতে কোন লিপি নাই। মন্দিরটি সংরক্ষিত। ঐ অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদমতে উহা রাজা গন্ধর্ব্ব রায়ের প্রতিষ্ঠিত। উক্ত গন্ধর্ব্ব রায়ের উল্লেখ কবি কৃত্তিবাসের "আত্মবিবরণী"তে আছে। ঘটক পুস্তকে "গন্ধর্ব্ব রায়ী" দোষের উল্লেখ পাওয়া যায়। গন্ধর্ব্ব রায়ের বংশীয়েরা এখনও পালপাড়ায় আছেন। উঁহারা ঐ অঞ্চলের সমাজপতি-ব্রাহ্মণ। গন্ধর্ব্ব রায় কৃত্তিবাসের সমসাময়িক, সুতরাং ঐ মন্দিরটির বয়স আনুমানিক পাঁচ শত বৎসরের অধিক। মেদিনীপুরের ঘাটালে ঐ শ্রেণীর যে সিংবাহিনী মন্দির আছে, তাহাতে প্রাচীন অক্ষরে শকাব্দ ১৪১২ লিখিত আছে। মুর্শিদা-বাদ অঞ্চলের ঐ শ্রেণীর মন্দিরগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। অন্যান্য স্থানেও ঐ রীতির মন্দির আছে। উহারা বাংলার নিজস্ব প্রাচীনতম রীতিতে গঠিত।

লেখকের প্রবন্ধের দ্বিতীয় চিত্রটি অষ্টশাল বা আট-চালা মন্দিরের নিদর্শন। ঐ শ্রেণীর সর্ব্বপ্রাচীন মন্দির হাওড়া জেলার ম্যাকড় গ্রামে আছে। উহা রাজা মুকুন্দপ্রসাদ

চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত ৺গোপাল জীউর মন্দির। মন্দিরটি উচ্চে যতখানি ভূগর্ভেও ততখানি প্রোথিত বলিয়া রূপনারায়ণ নদীর ভাঙ্গনের হাত হইতে টিকিয়া আছে। উহাতে শকাব্দ ১৫৭৩ খোদিত আছে। ঐ মুকুন্দপ্রসাদ উৎকলরাজ মুকুন্দ-প্রসাদের সহিত একই প্রাসাদে লালিত-পালিত হন বলিয়া প্রবাদ আছে। ঐ শ্রেণীর মন্দির নানা স্থানে আছে। শান্তিপুরের শ্যামচাঁদ মন্দির ঐ শ্রেণীর বৃহত্তম মন্দির। কলিকাতার নন্দরাম সেনের মন্দির বাং ১০৮১ (?) সনে ও নিমতলার মদনমোহন দত্তের মন্দির ১৭১৬ শকে (অঙ্গৌষধীশ ধরণীধর সিতরশ্মি...শাকসময়ে) নির্ম্মিত। ভূকৈলাসেও ঐ শ্রেণীর দুইটি মন্দির আছে। কলিকাতার এই চারিটি মন্দিরের শিবলিঙ্গই প্রকাণ্ড। মেদিনীপুর ঘাটাল নিমতলার ঐ শ্রেণীর হেমন্তনাথ শিবের মন্দির বাংলার শিবাজী রাজা শোভা সিংহের ভ্রাতা হেমন্ত সিংহের প্রতিষ্ঠিত ও দ্বিশতাধিক বৎসরের প্রাচীন। কলিকাতা কালীঘাটের কালীমাতার মন্দিরও এই শ্রেণীর। প্রাচীন নিদর্শনগুলির উপরের চালটি নিম্নের চালের সহিত প্রায় সংলগ্ন।

দ্বিশাল বা জোড় বাংলা মন্দির বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুরের রাণীচক ও কাশীধামের দুর্গাবাড়ী প্রভৃতি অঞ্চলে আছে। এই তিন প্রকার মন্দিরই বাংলার তিন শ্রেণীর চালাঘরের আদর্শে পরিকল্পিত। সমতল ছাদের মন্দির নানা স্থানে অসংখ্য আছে। উহাদের কোন কোনটির চারিদিকের অলিন্দ যুগ্ম-স্তম্ভ যুক্ত। ঐ শ্রেণীর অনেক প্রাচীন মন্দিরের ছাদ খিলানে নির্ম্মিত; উহাতে কড়ি বা বরগার ব্যবহার নাই।

মিশ্র রীতির একরত্ন বা আলগোছটুঙ্গী মন্দির বাংলায় কয়েকটি অঞ্চলে আছে। মেদিনীপুরেই ঐ শ্রেণীর সংখ্যা বেশী। জলপাইগুড়ির জল্পেশ্বর মন্দির, নদীয়া কৃষ্ণনগরের আনন্দময়ী মন্দির ঐ শ্রেণীর। মেদিনীপুর ডেবরা থানার পুণ্ডাপাটে এই শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শনটি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। হাওড়া গড়-ভবানীপুরের প্রাচীন ভূরীশ্রেষ্ঠ রাজকুলের লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরটির অবস্থাও শোচনীয়। দাসপুরের রঙ্গরাম চৌধুরীর মন্দির ১১০৬ সালে নির্ম্মিত। সমতল ছাদের উপরিস্থ উহার চূড়াটি ছত্রাকার। দাসপুরের মধু সিংহের মন্দির চিত্রবহুল ও রাধাকান্তপুরের দাসেদের মন্দিরে সুদীর্ঘ বাংলা পত্রলিপি আছে। ক্ষীরপাই ও কর্ণগড়ের এই শ্রেণীর মন্দিরগুলি ঝামা পাথরে নির্ম্মিত। ঐ প্রকার প্রস্তর নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল।

পঞ্চরত্ন মন্দির বাংলাদেশে অসংখ্য। এই শ্রেণীর মন্দিরের পাঁচটি চূড়াই একটি সমতল ছাদের উপর অবস্থিত। ক্ষীরপাইয়ের নিকট নবগ্রামে যে পঞ্চরত্নটি আছে উহা ১৬৪০ শকাব্দায় (খবেদরস সংযুক্তে শাকে চৈব নিশাপতৌ)—চেতুয়া বাসুদেবপুরের মুক্তারাম ভট্টাচার্য্যের দামোদর মন্দির ১৭২৩ শকাব্দায় (দহন যমনগগ্লৌসম্মিতে শাকবর্ষে) নির্ম্মিত।

নবরত্ন মন্দিরের দুই থাকে নয়টি চূড়া। দিনাজপুর কান্ত-নগরের কান্ত নামের মন্দির এই শ্রেণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। উহার দারুময় আদর্শ কলিকাতা যাদুঘরে আছে। মেদিনীপুর চন্দ্রকোণা লালগড়ের বর্ত্তমানে লুপ্ত গিরিধারীজীর নবরত্ন মন্দির তাম রাজমহিষী লক্ষণাবতী কর্ত্তৃক ১৫৭১ শকাব্দায় নির্ম্মিত (শাকেঽশ্চি মুনি বাণে ন্দৌ বৈশাখে শুক্লপক্ষকে)। মেদিনীপুর ডেবরাগোল গ্রামের সর্ব্বমঙ্গলা মন্দির দ্বিশতাধিক বৎসরের প্রাচীন ও অধুনা ভগ্ন। সয়েশপুরের নবরত্নের নয়টি চূড়া একই থাকে অবস্থিত। কলিকাতা দক্ষিণেশ্বরের বিখ্যাত কালীমন্দির ও কালীঘাটের নিকটস্থ বাওয়ালির মণ্ডলদের মন্দির এই শ্রেণীর। এই তিন প্রকার রত্নশ্রেণীর মন্দির দ্বিতল বা ত্রিতল। প্রাচীরগাত্রের ইষ্টক-সোপান-যোগে উপরিতন তলসমূহে আরোহণ করা যায়। আধুনিক মন্দিরগুলিতে এই প্রকার সোপান নাই।

ফরিদপুর জেলায় রাজা রাজবল্লভের রাজধানী রাজনগরে পূর্ব্বে একুশ রত্ন মন্দির ছিল। সম্ভবতঃ পাঁচটি থাকে উহার একুশটি চূড়া শোভা পাইত। উহাকে ধ্বংস করিয়া পদ্মা কীর্ত্তি-নাশা নাম ধারণ করিয়াছে।

মেদিনীপুর জেলার কর্ণগড়ের দণ্ডেশ্বর ও মহামায়ার মন্দির, গড়বেতার সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির, বলহরার বটেশ্বর মন্দির, তমলুকের বর্গভীমার মন্দির প্রভৃতি উৎকল-রীতির প্রাচীন নিদর্শন—মেদিনীপুর জেলায় এই শ্রেণীর মন্দির অসংখ্য। হাওড়া জেলার খাঁন্নার পঞ্চাননের মন্দিরটিও এই শ্রেণীর। সুদূর উত্তরাখণ্ডের সকল মন্দিরই এই ধাঁচের।

মেদিনীপুর দাসপুরের চেতুয়া বাসুদেবপুর হাটে গুলার দত্তের শিবমন্দিরটি হিন্দু রীতির সহিত ইসলামীয় রীতির মিশ্রণের নিদর্শন। উহার উর্দ্ধভাগ কতকটা গম্বুজাকৃতি। গাত্রে অলংকরণ বাহুল্য। ইহা প্রায় দুই শত বৎসরের পুরাতন।

কলিকাতা জগন্নাথ ঘাটের জগন্নাথ মন্দির উত্তর ভারতীয় রীতিতে নির্ম্মিত। নাড়াজোলের রাজবাটীতেও এই শ্রেণীর একটি মন্দির আছে।

কলিকাতা প্রভৃতি নগরীতে বর্ত্তমানে যে সকল মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে তন্মধ্যে অনেকগুলির চূড়ার সূক্ষ্ম আকৃতি খ্রীষ্টানদের গীর্জ্জার সূক্ষ্মাগ্র চূড়ার অনুরূপ বলিয়া ঐগুলি খ্রীষ্টীয় রীতিতে নির্ম্মিত বলা যাইতে পারে। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের চূড়া এই রীতির নিদর্শন।

বাংলার মন্দির সম্পর্কে অনেক কথা বলিবার আছে। বহু মন্দিরেরই উপরিভাগের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ অলংকরণ-পদ্ধতি আছে। বাংলার নিজস্ব ঝামা পাথরের সুদৃঢ় পীঠে ঐ পাথরেই নির্ম্মিত অনেক প্রাচীন মন্দির আছে। বাংলার মন্দির সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হওয়া উচিত।

"শ্রীঅরবিন্দ"

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

প্রবাসীর পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীসুরেশচন্দ্র দেবের "শ্রীঅরবিন্দ" প্রবন্ধে একটা ভুল রহিয়াছে। ইহার "রাজনৈতিক চিন্তা" শীর্ষক অংশে সুরেশবাবু লিখিয়াছেন :

"তখন সবেমাত্র শ্রীঅরবিন্দ বরোদার মহারাজার অধীনে চাকুরী লইয়া আসিয়াছেন। ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ১৪ বৎসর বিলাতে কাটাইয়া তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন। ১০ বৎসর বয়সে তিনি বিলাতে গিয়াছিলেন।"

প্রবন্ধের "ইংলণ্ডে প্রবাস" অংশে লিখিয়াছেন :
"১৮৯৩ সালে যে যুবক কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন, তিনি দশ বৎসর বয়সে মাতৃক্রোড়বিচ্যুত হইয়া বিদেশে গিয়াছিলেন;"......... বিলাতে যাওয়ার বয়স সম্বন্ধে দুইটি স্থানে একই রকমের ভুল।

অরবিন্দ দশ বৎসর বয়সে বিলাতে যান নাই; তিনি বিলাতে গিয়াছিলেন সাত বৎসর বয়সে ১৮৭৯ সালে। পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি দার্জ্জিলিং শহরে সেণ্ট পল্‌স্ স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং দুই বৎসর সেখানে পড়িয়া তৎপর পিতার সঙ্গে বিলাত যান। ১৮৯০ সালে ১৮ বৎসর বয়সে সিবিল সার্বিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৯২ সালে Classics Tripos পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। বরোদার মহারাজার অধীনে চাকুরী লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে।

অরবিন্দের চৌদ্দ বৎসর বিলাতে থাকা এবং ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন তর্কিত নহে। সুরেশবাবুর প্রবন্ধেই উহার নির্ভুলতার স্বীকৃতি আছে। সুতরাং সাত বৎসরের পরিবর্ত্তে দশ বৎসর বয়সে অরবিন্দকে বিলাতে পাঠাইতে হইলে তাঁর বিলাত যাওয়ার বৎসর ১৮৭৯ সালের পরিবর্ত্তে তিন বৎসর বাড়িয়া দাঁড়াইবে ১৮৮২ সাল, এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের বৎসর ১৮৯৩ সালের পরিবর্ত্তে তিন বৎসর বাড়িয়া দাঁড়াইবে ১৮৯৬ সাল। সুরেশবাবুর ভুল পরিষ্কার ভাবেই ধরা পড়ে তাঁর নিজের স্বীকৃত ১৪ বৎসর বিলাত-প্রবাসের কাল এবং অন্যান্য সন-তারিখ হইতে।

সুরেশবাবু তাঁহার প্রবন্ধে শ্রী কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার রচিত যে অরবিন্দ-চরিতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতেও লিখিত আছে :—"In 1879 Dr. Krishnadhan Ghose and his wife took Aurobindo and his brothers, Benoybhushan and Manmohan, to England." Page 26 (Second Edition). অরবিন্দের জন্ম ১৮৭২ সালের ১৫ই আগষ্ট এবং ইহা সর্ব্বজন-স্বীকৃত সন-তারিখ। অধ্যাপক ডাঃ কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রণীত "শ্রীঅরবিন্দ" নামক ইংরেজী জীবনী প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী, এখন দ্বিতীয় সংস্করণ চলিতেছে। এই গ্রন্থরচনায় লেখক পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সহযোগিতা ও সাহায্য পাইয়াছেন এবং পুরাতন কাগজপত্র ও গ্রন্থাদি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ প্রণীত "শ্রীঅরবিন্দ" নামক বাংলা জীবনীখানিও নির্ভরযোগ্য। ইহা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪১ সনের ফাল্গুন মাসে। এই বইখানিতেও অরবিন্দের বিলাতে যাইবার এবং স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তনের সন-তারিখের সঙ্গে অধ্যাপক আয়েঙ্গারের জীবনীতে প্রদত্ত সন-তারিখের সম্পূর্ণ মিল আছে। আর একখানা ছোট বাংলা জীবনী আছে। বইখানির নাম "শ্রীঅরবিন্দ," ইহার লেখক শ্রীবিষ্ণুভাস্কর সরস্বতী। এই পুস্তিকার ভূমিকা লিখিয়াছেন শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ পণ্ডিচেরী আর্য্য আপিসে বসিয়া ১৩২৮ সনের ৭ই জ্যৈষ্ঠ। বইখানির প্রকাশ-কাল জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ সন। এই পুস্তিকায় প্রদত্ত বিলাত যাওয়ার এবং অন্যান্য সন-তারিখ পূর্ব্বোল্লিখিত জীবনী দুইখানিরই অনুরূপ।

কিশোর-প্রতিষ্ঠান 'মণিমেলা'র ষষ্ঠ বার্ষিক মহাসম্মেলন

সম্প্রতি কলিকাতার লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজ-প্রাঙ্গণে মণিমেলার ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠান বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হইয়াছে।

মণিমেলা মহাসম্মেলনের উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ শেখ আবদুল্লা
ফটো—শ্রীহরিগোপাল

গত ২২শে ডিসেম্বর সকাল আটটায় সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে গিয়া বাংলার প্রদেশপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু বলেন, "আজকের এই কিশোরের দল ভবিষ্যতে দেশের পরিচালক হয়ে উঠবে। তারা তাদের মা বাবা, শিক্ষক এবং গুরুজনদের শ্রদ্ধা দেখিয়ে মণিমেলার মধ্য দিয়ে এইভাবে নিজেদের চরিত্রকে সুগঠিত করে তুলতে পারলেই দেশের সত্যকারের কল্যাণ হবে।"

এর পরে সাড়ে দশটায় সময় আরম্ভ হয় 'আশীর্ব্বাদ আহরণী' অনুষ্ঠান। মণিমেলার 'মণি'রা পশ্চিম বাংলা রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতির ব্যবস্থাপনায় কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে প্রায় ১৫০০০ হাজার রোগীকে নিজেদের শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ কমলালেবু ও ফুল উপহার প্রদান করে।

সম্মেলনের মূল সভাপতি শেখ মহম্মদ আবদুল্লা তাঁর ভাষণে বলেন যে, কলিকাতায় এসে প্রথমেই কিশোরদের সঙ্গে মিলিত হবার এবং কিছু বলবার সুযোগ পেয়ে তিনি বিশেষ আনন্দিত। তিনি আশা করেন, ইংরেজ আমলের সমস্ত কুশিক্ষা দূরীভূত হয়ে সুশিক্ষালাভ করে কিশোরেরা মানুষ হয়ে উঠবে এবং দেশের স্বাধীনতা-রক্ষার সমর্থ হবে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন আবদুল্লা সাহেবকে সম্মেলনের সভাপতিত্ব করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মূল অধিবেশনের পর বিকাল সাড়ে চারটায় শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী আদর্শ নগরী 'মণিনগরের' উদ্বোধন করেন।

হরেকরকম হাতের কাজের বিরাট্ এক প্রদর্শনীও সম্মেলনের অন্যতম অঙ্গ ছিল। প্রদর্শনী, বিজ্ঞানঘর, কিশোর-পাঠাগার ও মনস্তত্ত্ব বিভাগের উদ্বোধন করেন গবর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

সন্ধ্যা ৬টায় 'মাতৃমিলনী' বৈঠক হয়। ইহাতে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন শ্রীসরলবালা সরকার।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান সুরু হয় সকাল আটটায় বাৎসরিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়া। বিকাল চারটায় মণি-ভাইবোনেরা নানা রকম হাতের কাজ করিয়া দেখায়। তারপর সেদিনকার সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান 'স্বপনপুরী' সুরু হয় সন্ধ্যায়। জমকালো পোশাকে সজ্জিত শিশুদের হাব-ভাব, অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি দেখিয়া দর্শকেরা বিশেষ প্রীত হন।

মণি ভাইদের ব্রতচারী নৃত্যানুষ্ঠান ফটো—শ্রীকানন মুখোপাধ্যায়

নিউ দিল্লীতে বেঙ্গলী ক্লাবের উদ্যোগে মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল ও হায়দারাবাদ সিটি পুলিশদলের খেলোয়াড়দের সম্বর্দ্ধনা

ছোট মণিভাইদের মুষ্টিযুদ্ধও দর্শকদের বিশেষ আনন্দদান করে।

তৃতীয় দিনে মন্ত্রী শ্রীহেমচন্দ্র নস্করের পৌরোহিত্যে যে প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান হয় তাহাতে প্রায় পাঁচ হাজার কিশোর ও তাদের অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রাক্তন সভ্যদের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' অভিনয় দর্শকমণ্ডলীকে চমৎকৃত করে। বেলা একটায় প্রায় হাজারখানেক ছেলেমেয়ে এবং তাদের অভিভাবক-অভিভাবিকারা এক 'সহভোজে' মিলিত হন। বেলা দুইটায় অভিভাবকদের এক সভা হয়। বিকালে হাজার হাজার দর্শকের সমক্ষে কিশোরদের খেলাধূলা ও ব্রতচারী নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়।

সম্মেলনের শেষ দিন সকালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, জেলা ও শহরের প্রতিনিধিদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন মহাকেন্দ্রের পরিষদপতি শ্রীজ্ঞানশঙ্কর সেনগুপ্ত। এই সভায় মণিমেলার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা ও কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বিকাল তিনটায় পুরস্কার বিতরণী ও সমাবর্ত্তন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

দশ সহস্রেরও অধিক দর্শকের উপস্থিতিতে 'বিচিত্রানুষ্ঠান' আরম্ভ হয়। ছোটদের নাচ, গান, হাস্যকৌতুক ইত্যাদি সকলকে মুগ্ধ করে। রাত সাড়ে নয়টায় সুরু হয় সম্মেলনের কর্ম্মী ও মহাকেন্দ্রের কর্ম্মীদের 'কবির গান'। সর্ব্বশেষে 'আনন্দ-নাড়ু' অভিনয় ও বিতরণের পর এবারকার মত সম্মেলনের পরিসমাপ্তি হইল বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

দিল্লীতে খেলোয়াড় দলের সম্বর্দ্ধনা

বিগত ১লা জানুয়ারী নিউ দিল্লী মিণ্টো রোড বেঙ্গলী ক্লাবের উদ্যোগে দিল্লীপ্রবাসী বাঙালীরা ডুরাণ্ড কাপ-যোগদানকারী মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল ও হায়দরাবাদ সিটি পুলিশ দলের খেলোয়াড়গণকে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে সম্বর্দ্ধিত করেন। ক্লাবের সভাপতি শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার এই তিনটি দলের খেলোয়াড়গণের উন্নততর ক্রীড়ানৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়া বলেন যে, গত অর্দ্ধশতাব্দী কাল মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবদ্বয় ফুটবল খেলাকে উত্তর-ভারতে যেরূপ জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছেন, আশা করা যায় ডুরাণ্ডবিজয়ী হায়দরাবাদ সিটি পুলিস ক্লাবের ক্রীড়ানৈপুণ্যে এবং কর্ম্মতৎপরতায় অদূর ভবিষ্যতে এই খেলা দক্ষিণ-ভারতেও অনুরূপ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিবে।

দিল্লীর চীফ কমিশনার শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতায় উক্ত তিনটি দল যোগদান করায় আনন্দপ্রকাশ করেন। এই অনুষ্ঠানে দিল্লীর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ক্লাবের সভ্যগণ খেলোয়াড় ও অতিথিবৃন্দকে গীত-বাদ্যাদি ও জলযোগের দ্বারা আপ্যায়িত করেন। "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা" গানটির দ্বারা অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

সিগনেট প্রেস পরিচালিত নতুন বই-এর দোকান

কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসের খুব কাছে:

১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট

সিগনেট বুকশপ

* সিগনেট প্রেসের বই ছাড়াও দেশী ও বিদেশী সব বই থাকবে॥
* গ্রন্থ ও গ্রন্থকার বিষয়ে প্রাপ্তব্য তথ্য সাগ্রহে সংগ্রহ করে দেওয়া হবে॥
* উপহারের জন্য কেনা বই সুদৃশ্য কাগজে সুন্দর প্যাকেট করে দেওয়া হবে॥

রুচিশীল পাঠকপাঠিকার দাবী আমরা পূরণ করতে পারব বলে আশা করি।

সিগনেট বুকশপ ১৩ই জানুয়ারী থেকে খোলা হয়েছে

বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি নাট্যকার ও সমালোচক বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে পাতিপুকুর যক্ষ্মা হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন।

ঢাকা জেলায় বিজয়বাবুর জন্ম হয়। ছাত্রাবস্থায় ঢাকার জগন্নাথ কলেজের জনৈক অধ্যাপকের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তিনি কলেজ ত্যাগ করেন। এই সময় তিনি ঢাকা হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা "বর্ত্তমান জগৎ" সম্পাদন করিতেন। উক্ত পত্রিকায় গার্লিক হত্যার সমর্থনে লিখিত একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জন্য রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। চারি বৎসর কারাবাসের পর ১৯৩৪ সালে তিনি মুক্তিলাভ করেন। ১৯৩৭ সালে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার ইংরেজী সাপ্তাহিক *News & Views*-এর সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। ১৯৩৯ সালে তাঁহার প্রথম পুস্তক "কয়েকটি রাশিয়ার ছোট গল্প" প্রকাশিত হয়। "নাৎসী যুদ্ধের রীতি-নীতি" এবং "রাশিয়া ও বিশ্বসংগ্রাম" পুস্তক দুইখানি রচনা করিয়া তিনি পাঠকমহলে পরিচিত হন। তিনি বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় সাহিত্য এবং বিজ্ঞান উভয় বিষয়ে ১৫।১৬ খানি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে 'একটি রাত্রির কাহিনী', 'এ যুগের সাহিত্য', *Indian War of Independence* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বিজয়বাবু ১৯৫০ সালে ত্রৈমাসিক সংকলন 'ক-সা-স্' বা 'কবিতা সাহিত্য সমালোচনা' সম্পাদনায় ব্রতী হন। তিনি অনেক বিখ্যাত পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। রোগশয্যায় তাঁহার শেষ লেখা *Glimpses of Indian Literature* তাঁহার জীবিতাবস্থায়ই *Hindusthan Standard*-এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। নীট্‌শে ও গ্যেটের উপর তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। বিজয়বাবু অকৃতদার ছিলেন।

অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বীরভূমের প্রসিদ্ধ কয়লা-ব্যবসায়ী ও অক্লান্ত সমাজসেবী অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন হইল পরলোকগমন করিয়াছেন। পরিণত বয়সেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। কিন্তু বাঙালী ব্যবসায়ীসম্প্রদায় ও সমাজসেবী শ্রেণী তাহাতে আত্মীয়-বিয়োগব্যথা অনুভব করিবেন।

উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অবিনাশচন্দ্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে (বর্ত্তমানে উত্তর প্রদেশ নামে পরিচিত) অধ্যাপনাকার্য্যে ব্রতী হন। ব্যবসায়ক্ষেত্রেও তিনি সেই সেবার ভাব লইয়া আসেন এবং ভারতীয় কয়লাখনির মালিক ও ব্যবসায়ীবৃন্দকে সংগঠন করিয়া জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করেন। কিন্তু শিক্ষা-বিস্তারে আগ্রহ তাঁহাকে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সেবায় আকৃষ্ট করে। তিনি গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন।

আমরা অবিনাশচন্দ্রের পরিবার-পরিজনের উদ্দেশে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

অষ্টাবক্র—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়। যুগবাণী—সাহিত্যচক্র, ২৮, কবীর রোড, কলিকাতা। মূল্য ৩৸৹ আনা।

উপন্যাসখানির নামকরণে অভিনবত্ব আছে। পুরাকালে অষ্টাবক্র মুনি অষ্ট অঙ্গের বক্রতাহেতু এই নামের অধিকারী ছিলেন—কিন্তু শারীরিক কোন্ কোন ক্ষেত্রে সেই বক্রতা ছিল—তাহা জানা যায় না। লেখকের মতে শারীরিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রের বক্রতা লইয়া আধুনিক যুগের অষ্টাবক্ররা পৃথিবীতে ভিড় জমাইয়াছেন। শীর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বিভ্রান্ত বোধশক্তি, বিকৃত প্রবৃত্তি ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিহীনতা বাংলাদেশেও বিরল নহে। শুধু এখনকার মানুষ নহে—সমাজ ধর্ম্ম আচার অনুষ্ঠান, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সবকিছুর মধ্যেই অষ্টাবক্রীয় রীতি বিদ্যমান। ব্যঙ্গ ও কৌতুকের মধ্য দিয়া লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সহিত দেখাইয়াছেন—সমাজ-ব্যবস্থায় কোথায় জমিতেছে গ্লানি, জাতীয় চরিত্রের দুর্ব্বলতা কোন মূল বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া পরিপুষ্ট হইতেছে—এবং শিক্ষা সংস্কৃতি প্রভৃতিতে মিথ্যাচার মিশিয়া মানুষকে কিরূপে মেরুদণ্ডহীন করিতেছে।…বিদ্রূপের উজ্জ্বল আলোয় তাঁহার সৃষ্ট স্থান কাল ও পাত্রগুলি স্পষ্টতর হইয়াছে—সেগুলিকে আমরা মুহূর্ত্তের মধ্যেই চিনিতে পারি। কিন্তু শুধু ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ শর হানিয়াই লেখক তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই; বলিষ্ঠ চিন্তা ও অন্তরের মমত্ববোধ মিলিয়া তাঁহার রচনাকে প্রাণবন্ত করিয়াছে। তিনি গতানুগতিক প্রচারমূলক গল্প জমাইবার চেষ্টা করেন নাই। এই কারণে গল্পের প্রারম্ভে যে চরিত্র প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিবে বলিয়া পাঠক-চিত্তে প্রত্যাশা জাগায়, গল্পের শেষে তাহার প্রয়োজন অনুভূত হয় না এবং মধ্যভাগে যে চরিত্র সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে তাহার চারিপাশে রোমান্সের প্রচুর উপাদান থাকাসত্ত্বেও সস্তা ভাববিলাসিতার প্রাধান্য দেখা যায় না। এই বলিষ্ঠ চরিত্রই গল্পের প্রাণকেন্দ্র। ইহাতে একটি গতির তরঙ্গ সৃষ্ট হইয়া চারি পাশের বহুযুগসঞ্চিত অপরিণত অপুষ্ট বিকৃত বস্তুপুঞ্জকে অগ্রগতির পথে সজোরে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে। সে পথে বন্ধনহীন অনন্তের আভাস ও মৃত্যুহীন জীবনের মহিমা অপরূপ হইয়া দেখা দিয়াছে। এই ভাবে আলোচ্য উপন্যাসে যে সমস্যাগুলির উপর লেখক আলোকপাত করিয়াছেন তাহাদের লইয়া ভাবিবার অবকাশ যথেষ্ট রহিয়াছে এবং সমস্যাগুলি যুগধর্ম্মে সঞ্জীবিত বলিয়া লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণ করিতে করিতে কৌতূহলের অভাব বোধ হয় না। চিন্তাশীল পাঠকের কাছে উপন্যাসখানি সমাদৃত হইবে।

আমরা আবার বাঁচব—শ্রীনগেন দত্ত। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲ টাকা।

তেরশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ, তেরশো তিপ্পান্নর মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এবং চুয়ান্নর মাউণ্টব্যাটেন সালিশীতে খণ্ডিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভ—এই কয়টি মুখ্য ঘটনার অন্তরালে বাঙালী-জীবনে যে ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছে—তাহারই চিত্র বইখানির মধ্যে পাওয়া যায়। এক সময়ে কোন মতে বাঁচিবার জন্য যে বঙ্গবিভাগকে আমরা মানিয়া লইয়াছি এবং যাহা মানিয়া লওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ খণ্ডিত বাংলায়

আমাদের বহু যুগসঞ্চিত শিক্ষা-সংস্কৃতির মূলে প্রচণ্ড আঘাত নামিয়া আমাদের সমাজ-জীবনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে এবং তাহারই ফলে সত্যভ্রষ্ট নীতিভ্রষ্ট মানুষ ধ্বংসের অতলে তলাইয়া যাইবার মত হইয়াছে—সেই সব মূলগত পরিবর্ত্তনের প্রতি দরদী লেখক ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইহাকে গল্প বলিলে সত্যকার পরিচয় দেওয়া হয় না এবং প্রবন্ধ আখ্যা দিলে যে ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি বৃহৎ একটি যুগ-বিপ্লবের ধারাকে গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া রস-বিস্তার করিয়াছে তাহার প্রতিও অবিচার করা হয়। মোট কথা—রস-সাহিত্যের কুশীলবগণকে অনিবার্য্য ঘটনা-প্রবাহ হইতে উদ্ধার করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আবদ্ধ করা হইয়াছে মনে হয়। নিম্নবিত্ত মানুষ—সমাজে যাহারা অবহেলিত—যাহাদের বাস্তব-জীবনের কঠোরতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় অল্প, তাহারাই কাহিনীর অনেকখানি জুড়িয়া বসিয়াছে। তাই আমরা কেন্দ্রবিন্দুস্বরূপ গান্ধী-আদর্শ অনুপ্রাণিত কর্ম্মী সীতানাথকে ভুলিতে পারি না। স্পষ্ট দেখিতে পাই—পরাণ, সৌদামিনী, ডালিম-কন্যাদের; সোনা মিঞা, সুভদ্রা, দমুজ, সুখদা বসন্ত, সোনা খোপা, কেষ্টা বাউল প্রভৃতিকে অত্যন্ত পরিচিত গ্রাম্য-পরিবেশে আমাদেরই ভাবনা-চিন্তা সুখ-দুঃখের অংশ লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখি।

লেখকের ভাষা স্বচ্ছ ও সাবলীল। তিনি বিচ্ছিন্ন বাংলার সমস্যা ও বেদনাকে চমৎকার ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সাহিত্যরসিক চিন্তাশীল পাঠক বইখানি পড়িয়া আনন্দলাভ করিবেন।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

তোমরাই ভরসা—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট। দাম পাঁচ টাকা।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রচনা সর্ব্বসাধারণের আকর্ষণের বস্তু। ছোট গল্পে তিনি যেমন স্নিগ্ধ-মধুর, উপন্যাসের কাহিনী-সংযোজনে এবং চরিত্র-চিত্রণে তিনি তেমনই কুশলী কথাকোবিদ। উপন্যাসের ক্ষেত্রে "নীলাঙ্গুরীয়" এবং "স্বর্গাদপি গরীয়সী" তাঁহাকে যে মর্য্যাদা দান করিয়াছে "তোমরাই ভরসা" তাহা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করে নাই। বিভূতিভূষণের রচনার প্রধান আকর্ষণ তাঁহার কাহিনীর সাবলীল প্রবাহ এবং তাঁহার বলিবার সহজ সরল ভঙ্গী। কোন চরিত্র অথবা ঘটনার আবর্ত্তে তাঁহার গল্প কেবলই পাক খাইয়া মরে না। তাহা থামে না, কখনও দ্রুতবেগে চলে, কখনও মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়। "তোমরাই ভরসা"র সূচনা রোমান্টিক। বিস্ময় ও বৈচিত্র্য রোমান্সের প্রাণ। কিন্তু রচনা ও বর্ণনার গুণে লেখক অসাধারণকে সাধারণের পর্য্যায়ে আনিয়াছেন। মা ও মেয়ে কোন বিপদ হইতে আত্মগোপন করিয়া পলাইতেছে। ট্রেনে প্রথম তাহাদের দেখিতে পাই। এই দুজন গল্পের প্রধান নারী-চরিত্র। মেয়েটির নাম জাহ্নবী। শৈশব হইতেই জাহ্নবী জীবনকে নানা বিপদ-আপদের মধ্য দিয়া যে ভাবে দেখিয়াছে তাহা জীবনের প্রকৃত রূপ নয়। অভিজ্ঞতা দৃষ্টির যে বিকৃতি সাধন করিয়াছিল তাহা সহসা অন্তর্হিত হইল। এমনিই হয়। প্রেমের মধ্য দিয়া জীবন সত্য রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অম্বিকাচরণ, অন্নদাঠাকরুণ, নারায়ণী, ডোরা-দি—সকল চরিত্রগুলিই চমৎকার ফুটিয়াছে। ছোট গল্প-লেখক বিভূতিভূষণ আজ ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ রূপে সাহিত্যে আনন্দ-বিতরণ করিতেছেন। যে শান্ত কৌতুকরস বিভূতিভূষণের রচনার বৈশিষ্ট্য তাহারও অভাব ইহাতে নাই। "তোমরাই ভরসা" সৃষ্টি হিসাবে সার্থক হইয়াছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

পঙ্কজ—শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়। চক্রবর্তী চাটার্জি এণ্ড কোং। কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

সুবোধবাবুর প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'শ্রাবণ' কাব্যামোদীদের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থখানিও কাব্যরসিকদের সমাদরলাভ করিবে, আশা করি। কবির হৃদয় এবং প্রকাশ-নৈপুণ্য দুই-ই সুবোধবাবুর আছে। শেষের একটি কবিতা ইকবালের 'আস্‌রার-ই-খুদীর' প্রস্তাবনা অংশের এবং আর একটি শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজী কবিতার অনুবাদ।

ছেলেদের হাতের কাজ—শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী। আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা।

বইখানি ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দের এবং শিক্ষার খোরাক জোগাইবে। খেলাধুলার মধ্য দিয়া তাহারা কত রকম হাতের কাজ শিখিতে পারে, গল্প আর ছবির সাহায্যে লেখক তাহা সুন্দর ভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। কাঠের, বাঁশের, টিনের, কাগজের কত রকম খেলনা তাহারা নিজেরাই গড়িতে পারে, তাহা দেখিয়া তাহারা নিশ্চয়ই শিল্প-রচনায় উৎসুক হইবে।

সঙ্কলিতা—শ্রীসপ্ত ভট্টাচার্য্য। পূর্ব্বাশা লিমিটেড। পি-১৩ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা।

"মেঘে ছায়াঘন হ'ল আকাশের দিন
পৃথিবীতে আজ তমাল হয়েছে কালো
তোমাদের দেহ-যমুনায় চলো রাধা
কাঁদে না উর্ম্মিমালা?...
হিমগিরি হতে মেঘের ধ্বনি কি শোনো?
উমা, তোমাদের দেবতা মেলেনি আঁখি,
কত যুগ গেল, যাবে আরো কত যুগ,
কত মেঘ, কত ব্যথা।"

কবির মন অতীতের রহস্যছায়া, বর্ত্তমানের স্রোতধারা, ভবিষ্যতের স্বপ্নমায়া সব মিলাইয়া সৌন্দর্য্যসৃষ্টির আনন্দে বিভোর। কল্পনায় অবিশ্বাস নাই, বাস্তবের অস্বীকৃতি নাই, কবিতাগুলিতে রসানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় আছে।

তরঙ্গ—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সাহা। ভারতী লাইব্রেরী, ১৪৫, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২৲।

সচিত্র কবিতার বই।

বাণী—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ কর। শ্রীমতী প্রতিমারাণী দেবী কর্তৃক পোঃ আনিসাবাদ, পাটনা হইতে প্রকাশিত। দাম—১।০।

বিনয়বাবুর ভাব এবং কল্পনা আছে, রচনারীতি গদ্য পদ্যের মাঝামাঝি, পড়িতে মন্দ লাগে না। উৎসর্গ-কবিতায় "দিলাম তোমায় মিলায়" অর্থহীন এবং শ্রুতিকটু।

অগ্নিহোত্রী—বিজয়গোপাল। ১১এ, হালদার লেন, কলিকাতা। মূল্য—১৲।

দেশানুরাগ-প্রণোদিত কবিতার সমষ্টি। আন্তরিকতা ও বলিষ্ঠ-প্রকাশভঙ্গীর গুণে কবিতাগুলি সুখপাঠ্য হইয়াছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গান্ধী-দর্শন—কংগ্রেস পুস্তক-প্রচার-কেন্দ্র, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৭২, মূল্য—১।০ আনা।

অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিই গান্ধীমতবাদের সহিত কোন-না-কোন ভাবে পরিচিত। বাণীতে, বক্তৃতায়, লিখিত বহু হিন্দী, গুজরাটী ও ইংরেজী প্রবন্ধে—মহাত্মাজীর উপদেশগুলি ছড়াইয়া আছে। বিভিন্ন বিষয়ে মহাত্মাজীর মতামত জানিতে সকলেরই কৌতূহল জাগে। এই সমস্তের সার সংগ্রহ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে প্রকাশিত করিয়া কংগ্রেস সাহিত্য-সঙ্ঘ গান্ধীভক্তদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। মহাত্মাজী নিজেই বলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার জীবনই তাঁহার বাণী। গান্ধী-দর্শনকে গান্ধী-জীবন হইতে পৃথক করিয়া দেখাও যায় না, ভাবাও যায় না। আশা করি, পরবর্ত্তী সংস্করণে প্রকাশকগণ 'গান্ধী-দর্শনের' সহিত মহাত্মাজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযোজিত করিয়া পুস্তকখানিকে পূর্ণতা দান করিবেন।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

কালোর বই—শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার। দিগন্ত পাবলিশার্স, ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা—১৯। মূল্য ২।০ টাকা।

ছেলেদের সচিত্র বই। কালো, ধলো, তাদের বাবা, পিসি এবং মামা ও নানা পশুপক্ষী লইয়া লেখক একটি চমৎকার গল্প রচনা করিয়াছেন। বাংলা শিশু-সাহিত্যে এ ধরণের পুস্তক বিরল। পশুপক্ষীরও মনোভাব প্রকাশের নিজস্ব ভাষা আছে। কিন্তু তাহা মানুষের দুর্ব্বোধ্য। লেখক তাহাদের ডাকের তাৎপর্য্য বুঝিবার এবং গল্প ও কতকগুলি ছড়ার সাহায্যে তাহা শিশুদের বোধগম্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ঘটনা বর্ণনে এবং মনুষ্য ও পশু-চরিত্র চিত্রণে লেখক বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। সবকিছু মিলিয়া এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাহা শিশু-চিত্তকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করিবে। এই কাহিনীতে মানুষ এবং পশু যেন পরস্পরের পরিপূরক হইয়া কাহিনীকে স্বাভাবিকত্ব দান করিয়াছে। কোথাও কষ্ট কল্পনার লেশমাত্র নাই। স্বচ্ছন্দ গতিবেগে গল্পের ধারাটি

তর তর করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। কালো, ধলো, তাদের বাবা, পিসিমা এবং মামা, বাঘাকুকুর, ছিটকোকিলের বাবা, চড়ুই পাখী, ছাগল, সাপ প্রভৃতি প্রত্যেক মানুষ এবং জন্তুই নিজ নিজ ভাষা ও আচরণগত বৈশিষ্ট্য লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পুস্তকখানি শুধু ছেলেদেরই নয়, বয়স্কদেরও আনন্দদান করিবে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

এ যুগের সাহিত্য—বিজয় ব্যানার্জ্জি। শ্রীগুরু লাইব্রেরী। ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। দাম ৩।০ টাকা।

পুস্তকখানি লেখকের মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে প্রকাশিত। ইহা নিম্নলিখিত কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত: (১) আধুনিক ইংরেজী সাহিত্য, (২) আমেরিকান্ সাহিত্য, (৩) বিংশ শতাব্দীর রাশিয়ান উপন্যাস ও গল্প, (৪) বর্ত্তমান জার্ম্মান সাহিত্য, (৫) ফরাসী উপন্যাস, (৬) উর্দ্দু সাহিত্যের গল্প ও উপন্যাস, (৭) এ যুগের হিন্দী কবিতা, (৮) আধুনিক কালে বাংলা সাহিত্যে গল্প ও উপন্যাস, (৯) আধুনিক বাংলা কবিতা। বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশে যে সকল কবি কথাসাহিত্যিক এবং নাট্যকারের সাধনায় সাহিত্যে নূতন ধারার প্রবর্ত্তন হইয়াছে, যুগচেতনা প্রতিফলিত হইয়াছে যাহাদের রচনায়—এই গ্রন্থে লেখক প্রধানতঃ তাঁহাদের জীবন ও সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

আলোচনা সকল ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। আমেরিকান সাহিত্যের প্রসঙ্গে লেখক হুইটম্যান, এডগার এলেন পো, এমারসন, মার্ক টোয়েন, থরো প্রমুখ উনবিংশ শতাব্দীর লেখকদের রচনা সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। "আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গল্প ও উপন্যাস" অধ্যায়টি পড়িলে বুঝা যায় যে, লেখক বর্ত্তমান বাংলা কথাসাহিত্যের অক্লান্ত পাঠক ছিলেন। তাঁর মতে "আধুনিক বাংলা সাহিত্য বলতে প্রধানতঃ সেই সাহিত্যকে বুঝায়, যে সাহিত্য সুরু হয়েছে কল্লোল-যুগ থেকে। অর্থাৎ, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।" এ সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ আছে—কল্লোলযুগের সাহিত্য অতি-আধুনিক সাহিত্য নামেই পরিচিত। যাঁদের কথা লেখক এই অধ্যায়ে বলিয়াছেন তাঁদের অনেকেই কল্লোল যুগের লেখক নন এবং কল্লোলগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তও নন। যেমন—বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, প্রমথনাথ বিশী, মনোজ বসু, পরশুরাম, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ প্রভৃতি। আলোচনায় যে তথ্য-ঘটিত অনেক ভুল আছে লেখক ভূমিকায় তাহা স্বীকার করিয়াছেন। অনেক ভুলত্রুটি এবং অসঙ্গতি সত্ত্বেও স্বল্পপরিসরের মধ্যে এযুগের বিশ্ব-সাহিত্যেরপরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়া লেখক সাধারণ বাঙালী পাঠকের ধন্যবাদভাজনহইয়াছেন।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

পরমহংস শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ সরস্বতী—সঙ্কলয়িতা ও প্রকাশক স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী, আনন্দ আশ্রম কালনা, বর্দ্ধমান। পৃষ্ঠা ।৵০+৩৮০, মূল্য তিন টাকা মাত্র।

সঙ্কলয়িতা সন্ন্যাসিনী মাতাজী পরমহংসের শিষ্য তিনি মাতাজীর বিস্তারিত জীবন-বৃত্তান্ত, উপদেশামৃত এবং আনন্দাশ্রমে আচরিত কার্য্যাবলী ও স্তবগীতিসমূহ এই গ্রন্থে সঙ্কলন করিয়াছেন।

ভারতে নারী-গুরু এবং নারী-সন্ন্যাসী প্রাচীন কালের ন্যায় কলিকালেও যে বিদ্যমান তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মাতাজীর জীবন। ইনি ভারতের একজন বিশিষ্ট স্বাধীন নৃপতির আদরের দুহিতা। আশৈশব সাধন-ভজনে তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ। কৈশোরে সুখৈশ্বর্য্য এবং ভোগের মোহপাশ ছিন্ন করিয়া তিনি স্বীয় রাজগুরুবংশীয়া মহাসিদ্ধা এক সন্ন্যাসিনীর আশ্রয়ে ত্যাগের পথ অবলম্বন করেন। সদ্গুরুর কৃপায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি পরমহংস শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ সরস্বতী রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেন এবং কালনায় 'আনন্দ আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করিয়া শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। সমৃদ্ধ দরিদ্র নির্ব্বিশেষে বহু নর-নারী তাঁহার কৃপাশ্রয়ে ধন্য হইয়াছিলেন। সঙ্কলয়িতা যথেষ্ট শ্রমস্বীকার করিয়া এই দুর্লভ জীবনকাহিনী সাধারণের গোচরীভূত করিয়াছেন। মাতাজীর উপদেশাবলী ধর্ম্মানুরাগীমাত্রেরই জীবনে পরম উপকার সাধিত করিবে।

তরণী-বিহার—শ্রীমৎ স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী। বর্দ্ধমান, কালনা—আনন্দ আশ্রম হইতে শ্রীক্ষেত্রনাথ ডাঙ্গালী (ঘোষ) কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৪০, মূল্য আট আনা।

বাংলা পদ্যানুবাদসহ সরল সংস্কৃতে শ্রীকৃষ্ণলীলাগীতি বিষয়ক কাব্য-পুস্তিকা। গৌরচন্দ্রিকাসহ নয়টি বিরামে শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিহার-লীলাকথা সহজ সংস্কৃত কবিতায় গ্রন্থকার বর্ণনা করিয়াছেন। মূল এবং অনুবাদ দুইই সহজ ও শ্রুতিমধুর হইয়াছে। নমুনাস্বরূপ একটি কলিকা উদ্ধৃত করা গেল:

"নাম ধাম চ, বিদ্ম নহি তব, হা বয়ং নিরুপায়াঃ।
উচ্ছ্বসিত জল-ভঙ্গ-দর্শন-বিহ্বলা যমুনায়াঃ।"
"জানি না তব নাম, চিনি না তব ধাম, ভরসা নাহি কিছু জাগে।
যমুনা ঢেউগুলি, উঠিছে দুলি দুলি, হেরিয়া বুকে ওর লাগে।"

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীতাপসরঞ্জন রায়। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ, ১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ।৵০+১৫৩। মূল্য দেড় টাকা।

প্রতি বৎসর বঙ্গদেশে সাড়ম্বরে বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এবারেও সম্প্রতি ইহা উদ্‌যাপিত হইয়াছে। মহাপুরুষের আবির্ভাব ও তিরোভাবকে হিন্দুগণ বাৎসরিক ক্রিয়াকলাপের অঙ্গ করিয়া লইয়া থাকেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বাঙালীর চিত্তে এমন দৃঢ় আসন লাভ করিয়াছেন যে, এখনই তাঁহাদের এই গৌরব দান করিয়া জাতি নিজেকে ধন্য বোধ করিতেছে। এতাদৃশ চিত্তজয়ী মহাপুরুষদের জীবন-কথা বাঙালীর যতদিন ভাষা ও সাহিত্য থাকিবে ততদিনই আলোচিত হইয়া চলিবে।

স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজী বাংলা জীবনীগ্রন্থ বহু রহিয়াছে। কাজেই তৎসম্বন্ধীয় নূতন কোন জীবনী হস্তগত হইলেই যাহা জানি তাহা ছাড়া আরও কিছু জানিবার আগ্রহ হয়। আলোচ্য পুস্তকখানি কিশোর পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশ করিয়াই লিখিত। ইহাতে নূতন কিছু আশা করা সমীচীন নহে, এত স্বল্প পরিসরে কোন বিষয়ের বিশদ আলোচনা সম্ভবও নহে। তথাপি একই স্থলে স্বামীজীর চোখা চোখা কথা আর মর্ম্মস্পর্শী বাণী আবার কিছু পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম। ইদানীং বাংলাভাষায় জীবনী রচনার নূতন ভঙ্গীর সূচনা হইয়াছে। ছোট ছোট কথা, ছোট ছোট প্যারা, যেন কেহ চোখের সম্মুখে কথা কহিয়া যাইতেছে এইরূপ। সার্থক শিল্পীর হাতে এরূপ ভঙ্গী সরস হইয়া উঠে। লেখার গুণে যাঁহার কথা পাঠ করি, তাঁহার সশরীরে উপস্থিতিও যেন অনুভব করিতে পারি। এই মানদণ্ডে বিচার করিলে লেখকের রচনা কতকটা সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের সারগর্ভ 'মুখবন্ধ'টি পুস্তকখানির গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছে। স্বামীজীর বাণী ভারতবাসীকে স্বাধীনতা-মন্ত্রে উজ্জীবিত করিয়াছিল। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সেযুগেই ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল। ডক্টর মজুমদারের মুখবন্ধে পুনরায় এ কথা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইলাম।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২,আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

বিষয়-সূচী—চৈত্র, ১৩৫৭

রঙীন ছবি

মুষ্টি গ্রহণ

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ঠক্কর বাপা ও মহাত্মা গান্ধী

কোরিয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর সেবাকার্য্যে রত ৬০তম ভারতীয় এম্বুলেন্স ইউনিটের অফিসার মেজর এন বি. ব্যানার্জ্জি

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫০শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৫৭

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ১৯৫১

বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত তদন্ত লইয়া নানারূপ বাদানুবাদ চলিয়াছে। ইহার ফলাফল সাধারণভাবে প্রকাশ করা উচিত কি অনুচিত সে বিষয়েও পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ করা কেন হইবে না সে বিষয়ে যে শেষ উত্তর পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী দিয়াছেন আইন কানুনের হিসাবে তাহার মূল্য ও ওজন যাহাই হউক তাহা সাধারণের নিকট যথাযথ বলিয়া গৃহীত হয় নাই। কিন্তু ইহা না প্রকাশ করার সমীচীন কারণ আছে।

কোনও বিশেষ পরিবারের দোষত্রুটি বা তাহার সমর্থক-বর্গের কার্যাকলাপের মুখরোচক বিবরণ পাঠের জন্য সাধারণের যে ঔৎসুক্য আছে তাহা অবশ্য এই রিপোর্ট প্রকাশ না করায় পূর্ণ হইল না এবং পরনিন্দা বা পরচর্চার যে প্রত্যক্ষ মূল্য সাধারণ লোকে দিয়া থাকে তাহা হইতে সংবাদপত্রগুলি বঞ্চিত হইল ইহাও ঠিক। কিন্তু অন্য দিকে ইহা প্রকাশ করিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারত ও জগতের উচ্চ-শিক্ষিত সমাজে অকারণে সম্পূর্ণ ভাবে পতিত ও হীন বলিয়া গণ্য হইত ইহাও ঠিক। এই রিপোর্ট যাঁহারা স্থিরভাবে পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিয়াছেন যে, ইহা অসম্পূর্ণ এবং বহিরঙ্গ, দারোগার তদন্তের অনুরূপ। ইহাতে এই মাত্র বুঝা যায় যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যাপারে সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং ন্যায়সঙ্গত ভাবে উহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত তদন্তের মূল বিষয় হওয়া উচিত জীর্ণ পুরাতন প্রতিষ্ঠানকে আঘাত না করিয়া তাহার সংস্কার ও উন্নতির পথ নির্দেশ করা। ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তি-সমষ্টিকে হীন ও দোষী প্রতিপন্ন করার আগ্রহে অবিবেচকের ন্যায় অতি খেলো ভাবে চালিত তদন্তের ফলাফল প্রকাশ করিয়া সেই প্রতিষ্ঠানকে ধূলিসাৎ করার সপক্ষে আমরা কোনও যুক্তি পাই নাই। আমাদের মতে এই তদন্তের রিপোর্ট এই-মাত্র প্রমাণ করিতেছে যে, এই ব্যাপারের পূর্ণাঙ্গ ও সমীচীন তদন্তের প্রয়োজন ও অবকাশ রহিয়াছে।

যাহাই হউক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন ও পরিরক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা নূতন হওয়া উচিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৯০৩ সালের ব্যবস্থায় পরিচালিত হওয়ায় ইহা পিছাইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিল প্রণয়ন করিয়াছেন ও সম্প্রতি উহাকে সিলেক্ট কমিটির মতামতের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ কমিটির মতামত প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত এই বিলের সম্যক্ আলোচনা ও বিচার করা সম্ভব নয়, কেননা কমিটির বিচার যদি সুক্ষ্ম হয় তবে অনেক বিষয়ে অল্পবিস্তর পরিবর্তন হওয়া সম্ভব।

যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা-আয়তনের পরিচালনা প্রধানতঃ আচার্য্য, অধ্যক্ষ, শিক্ষক ইত্যাদি শিক্ষাব্রতী বিশেষজ্ঞ-দিগের হাতে থাকা উচিত ইহা স্বতঃসিদ্ধ নীতি। এই মূল নীতির ব্যতিক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা দান বা গবেষণা ও তথ্যানু-সন্ধান কার্য্য ব্যাহত ও ক্ষুণ্ণ হইতে বাধ্য। একথা স্মরণ রাখিয়া উপস্থিত বিলের সকল ধারা অতি সুক্ষ্মভাবে আলোচিত হওয়া উচিত এবং উহার পূর্ণ বিচারের পর পরিষদের সম্মুখে আসা উচিত। শিক্ষাদান ও জ্ঞান অর্জ্জনের পথ নিষ্কণ্টক রাখা চাই।

আমাদের মতে প্রাদেশিক সরকারের ৭ সংখ্যক ধারা অনুযায়ী তদারকের ক্ষমতা, ১০ সংখ্যক ধারা অনুযায়ী ভাইস-চ্যান্সেলার নিয়োগের ক্ষমতা, সেনেট গঠন ও ইহার ক্ষমতা নির্দ্ধারণ এই তিন বিষয়ে বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন। না হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের তপ্ত কটাহ হইতে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপের ভয় আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট কন্‌ষ্টিটিউয়েণ্ট কলেজে উচ্চতম শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা বা গবেষণাগার স্থাপন সম্পর্কেও বিচার হওয়া প্রয়োজন। আয়ের সমীচীন ব্যবস্থা না থাকিলে ঐরূপ আয়োজনে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কার্য্যের অবনতি হইতে বাধ্য ইহা মনে রাখা প্রয়োজন।

বাংলার বাজেট

বাংলার বাজেট পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে পেশ হইয়াছে। যে আকারে উহা পেশ হইয়াছিল সেই আকারেই পাসও প্রায় হইয়া গিয়াছে। এবার পরিষদে একটি বিরোধী দল থাকায় ছাঁটাই প্রস্তাবে প্রবল আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু সওয়াল জবাব সকলের মধ্যেই আমরা অনেক স্থলে একটা অবাস্তবের পরিচয় পাইয়াছি। তর্ক উত্থাপন যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারা যেভাবে সাদা-কালো সব কিছুই কালোই বলিয়াছেন, উত্তরদান কালে সমান জোরেই কালো-সাদা সব কিছুকেই সাদা বলা হইয়াছে। ইহাই বিলাতী পার্টি পলিটিক্স এবং এই পিচ্ছিল পথেই দেশ নীচে নামিতেছে।

বাজেটের বরাদ্দ লওয়ায় এবং তাহার খরচে আমরা বিশেষ কোন কৃতিত্ব দেখিতে পাই নাই। জনকল্যাণের বরাদ্দ টাকা খরচ হয় নাই কিন্তু বিভাগীয় খরচ খুব বাড়িয়াছে। এই ব্যয়বৃদ্ধি যাঁহারা অনেকটা সংযত করিতে পারিতেন তাঁহারা করেন নাই। খাদ্যক্রয় ব্যাপারে বহু টাকা আগাম দেওয়া হইয়াছে, উহার সমস্ত আদায় হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, অনাদায়ী টাকার অধিকাংশ বাকীর হিসাব হইতেও বাদ পড়িয়া গিয়াছে। ষ্টেট ট্রান্সপোর্টের বরাদ্দ অত্যন্ত অদ্ভুত ভাবে উপস্থিত করা হইয়াছে। বাসের সংখ্যা, কর্ম্মচারীদের সংখ্যা ও বেতন, পেট্রলের পরিমাণ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক সংবাদ বাদ রাখিয়া কেবলমাত্র ঢালা বরাদ্দ হইয়াছে। মাদ্রাজ, বোম্বাই, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতির ষ্টেট ট্রান্সপোর্টের হিসাবের পাশে আমাদের বরাদ্দ অতিশয় হাস্যকর বলিয়া মনে হইবে।

বাজেটে একটি প্রকাণ্ড গলদ আমরা লক্ষ্য করিতেছি। গত তিন বৎসর যাবৎ জনকল্যাণের নামে প্রায় ১৪ কোটি টাকা মূল বাজেট পরিষদে উপস্থিত করিবার সময় বরাদ্দ করা হইতেছে। ঐ সঙ্গে ডিপার্টমেন্টগুলির কাজ বাড়িবে বলিয়া বাড়াইয়া লওয়া হইতেছে। বৎসরের মাঝখানে বাজেট সংশোধন করিয়া জনকল্যাণের বরাদ্দ অর্দ্ধেক করিয়া ফেলা হইতেছে। প্রকৃত খরচের হিসাব বাহির হইলে দেখা যাইতেছে খরচ তার চেয়েও কম হইয়াছে। বছরের পর বছর এইরূপ চলিতে থাকিলে জনসাধারণ ইহাকে ডিপার্টমেন্টের খরচ বাড়াইবার ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছু ভাবিতে পারে না। এ বৎসর বাস, ট্যাক্সির উপর নূতন কর বসানো হইতেছে কিন্তু ঘোড়দৌড় প্রভৃতি বাজীর উপর ট্যাক্স কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ক্যাপিটাল বরাদ্দগুলি কিরূপে ইচ্ছামত ঢালা সাজা করা হইতেছে তার খানিকটা নিদর্শন দেওয়া গেল :

	১৯৪৯-৫০ বরাদ্দ লক্ষ টাকা	১৯৪৯-৫০ প্রকৃত খরচ লক্ষ টাকা	১৯৫০-৫১ মূল বরাদ্দ লক্ষ টাকা	১৯৫০-৫১ সংশোধিত বরাদ্দ লক্ষ টাকা	১৯৫১ ৫২ মূল বরাদ্দ লক্ষ টাকা
রাস্তা তৈরি	২৩৫	১৯২	২৫৪	৩১৩	২৯৭
কাঁচড়াপাড়া স্কীম	১৭৮	৫৪	৪৭	২৬	৮৪
ময়ূরাক্ষী.স্কীম	৮৬	৮১	২	১১½	২
দামোদর স্কীম	৩৫৭	২১০	৪৬১	৩৮৮	৬৭১
পুনর্ব্বসতি	১৬৩	?	২৫৯	৪৬	৮৪
বাস	৭২	৩৮	৭৫	৭৩	৪৮
উত্তর কলিকাতা বিদ্যুৎ স্কীম	২১	১৫	২৪	২৪	২৩
শিল্প সংগঠন	৬২	২১	১১	২৬	৩৩
খাদ্যের ব্যবসা	৩৪২	২২৩	১৬০	১৬৩	১০
	১৫,১৬	৮,৩৪	১৪,৯১	৮,৭২	১৪,৯২

এই তালিকায় দেখা যাইতেছে যে, ক্যাপিটাল বরাদ্দ রূপে প্রতি বৎসর ১৪।১৫ কোটি টাকা ব্যবস্থা-পরিষদে উপস্থিত করা হয়, কিন্তু সংশোধিত বাজেটে বা প্রকৃত খরচে উহা ৮ কোটির ঘরে নামাইয়া আনা হয়।

জনকল্যাণের বরাদ্দগুলিরও ঠিক এই অবস্থা। নীচের তালিকা তার প্রমাণ। ১৯৪৯-৫০-এর প্রকৃত খরচের হিসাব পাওয়া যায়। ঐ বৎসর মূল বাজেটে—সংশোধিত বাজেট এবং প্রকৃত খরচের তুলনা করিলেই আসল ব্যাপার ধরা পড়িবে।

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যোন্নতির বরাদ্দ

	১৯৪৯-৫০ মূল বাজেট টাকা	১৯৪৯-৫০ সংশোধিত বাজেট টাকা	১৯৪৯-৫০ প্রকৃত খরচ টাকা
গ্রাম্য ডিস্পেন্সারী ও হেল্থ ইউনিট	৮০ লক্ষ	৭১,৪৫,০০০	২৩,৫২,৮৬৪
চালু হাসপাতালের উন্নতি	১৫ „	৭,৮২,০০০	৫,৫৮,১৬২

কলিকাতায় সংক্রামক			
ব্যাধি হাসপাতাল	৩ ,,	২,৫০,০০০	১৬,০০০
নূতন এম্বুলেন্স	৬ ,,	১৩,৬৮,০০০	৪৫,৪৫৯
যক্ষা হাসপাতাল	১৩ ,,	১১,২৭,০০০	৯,৫১,৪৯৫
নীলরতন সরকার			
মেডিকেল কলেজ	১০ ,,	৪,৪০,০০০	২,৪২,৭২৫
ফার্মেসি শিক্ষা	২½ ,,	৫০,০০০	৯,১০০
হেল্থ এডুকেশন	১ ,,	×	×
প্রসূতি ও শিশু-			
কল্যাণ	২ ,,	১,০০,০০০	৫৯,২০১
কুষ্ঠ চিকিৎসা	২,২৪,০০০	১,৮১,০০০	৩০,৯৫০
ম্যালেরিয়া			
নিবারণ	২ লক্ষ		

স্বাস্থ্যোন্নতি জাতির সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য এবং এটি প্রধানমন্ত্রীর নিজের বিভাগ। এইখানেই এই অবস্থা। শিক্ষার বরাদ্দেও উহা ভিন্নরূপ নহে।

	১৯৪৯-৫০ বরাদ্দ	১৯৪৯-৫০ প্রকৃত খরচ
যাদবপুর কলেজ	৯০ হাজার	৬৪ হাজার
ছাত্রদের বিদেশে শিক্ষালাভার্থ		
স্কলারশিপ	৪ লক্ষ	১,১৭,৬৯২
গ্রাজুয়েট শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী		
ট্রেনিং	২,১৫,০০০	৫৬,০৮২
বনিয়াদী স্কুল	৩,৫০,০০০	১,৮৭,৫৬৩
প্রাইমারি ট্রেনিং কলেজ	৫ লক্ষ	১,৭৬,৫২৬
মেয়েদের কলেজ	১,৭৫,০০০	৯৫,২০০

ডিপার্টমেণ্টগুলির খরচ কিভাবে বাড়িয়াছে তার নিদর্শন :

মূল বরাদ্দ	১৯৪৯-৫০ হাজার টাকা	১৯৫০-৫১ হাজার টাকা	১৯৫১-৫২ হাজার টাকা
সেক্রেটারিয়েট	৫,৬৪	৬,৫০	৭,০০
জেলা শাসন	৭০,০৫	৮০,৮৭	৮৪,৫৬
সাধারণ শাসন	২,২১,৭২	২,৩৮,০০	২,৭০,৯৩
বিচার বিভাগ	৭০,১৭	৯৪,১৮	১,০০,৩০
জেল	৭১,৩৮	৯১,০০	১,০৩,৮১
কলিকাতা পুলিস	১,৪৫,৮৬	১,৬৭,১৭	১,৯১,০৫
মোট পুলিস	৪,৬১,৯১	৪,৮২,৭৬	৫,৪৬,৩৪

দাঙ্গার বছরে কলিকাতা পুলিসের বরাদ্দ ছিল ৬৩,৯৬,০৪০ টাকা, উহা বাড়িয়া এবারে হইয়াছে ১,৯১,০৫,০০০ টাকা। অবিভক্ত বঙ্গে পুলিসের খরচ ছিল ৩ কোটি, এক-তৃতীয়াংশ বঙ্গে উহা হইয়াছে সাড়ে ৫ কোটি, অর্থাৎ প্রায় ৬ গুণ বৃদ্ধি। যদি দেখিতাম পুলিসের কাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে তবে কিছু বলিবার ছিল না। কিন্তু তাহার অভাবে আমরা বলিতে বাধ্য যে, শুধু বরাদ্দ বাড়াইলেই দেশে শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যবস্থা হয় না।

খাদ্য ক্রয়ের জন্ত আগাম টাকা দেওয়া হয়। এই টাকা আদায় এবং বাকীর হিসাব নিম্নোক্ত রূপ :

	আগাম দেওয়া হইয়াছে টাকা	আদায় হইয়াছে টাকা	বাকী পড়িয়াছে টাকা
১৯৪৭-৪৮ (প্রকৃত খরচ)	৪৩,৪৮,৫০২	১৫,৮০৬	৪৩,৩২,৬৯৬
১৯৪৮-৪৯ (ঐ)	৬৪,৪৮,৬৯৭	৪২,২৩,৩৫১	২২,২৫,৩৪৬
১৯৪৯-৫০ (ঐ)	৭২,৭৮,৯০০	২০,৫৬৭	৭২,৫৮,৩৩৩
			১,৩৮,১৬,৮৭৫

১৯৫০-৫১ সালের বাজেটে নূতন আগাম বরাদ্দ হইল ৭৯ লক্ষ টাকা এবং আদায় ধরা হইল ১ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা। এবারকার বাজেটে আগাম বরাদ্দ হইয়াছে ৮২ লক্ষ টাকা এবং আদায় আশা করা গিয়াছে ৭৩ লক্ষ টাকা অর্থাৎ আবার ৯ লক্ষ টাকা বাকী পড়িবে। ১৯৫০-৫১ সালের আশা করা বকেয়া ৪৬ লক্ষ টাকা আদায় হইলেও ১ কোটি টাকা বাহিরে পড়িয়া থাকে। এই টাকা কোথায় কাহার নিকট আছে তাহার হিসাব দেওয়া হইল না কেন?

ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট বাজেট আলোচনা করিলে এবং ক্ষয়পূরণ, মূলধনের সুদ, পেট্রল ইত্যাদির বাকী প্রভৃতি হিসাব করিলে প্রতি বৎসর মোটা টাকা লোকসান হইবে বলিয়া মনে হয়। কারবারের ফলাফল এইরূপ :

	নিযুক্ত মূলধন	নীট আয়	লাভ
১৯৪৮-৪৯	২৭,৫৪,১৫৬	৪,৮২,৭৬৮	২৮,০০০
১৯৪৯-৫০	৬৬,১১,৮১০	৩,৩৮,৮৯৭	
১৯৫০-৫১	১,৩৮,০৯,৮১০	৫,০০০	
১৯৫১-৫২	১,৮৬,৫৮,৮১০	৫,১০,০০০	

লাভ-লোকসানের খতিয়ান বাজেটে দেওয়া হয় নাই। ১৯৫১-৫২ সালের বরাদ্দ নীট আয় লাভ দাঁড়াইবে, তর্কের খাতিরে ইহা ধরিয়া লইলেও দেখা যায় শতকরা ২।০ টাকা মাত্র লাভ হইবে। বাংলা-সরকারের কিঞ্চিদধিক ২০০ বাস আছে, তন্মধ্যে ১১৫।১২৫টি রাস্তায় খাটে। এই কয়টি বাস চালাইয়া বছরে ৪৮ লক্ষ টাকার টিকিট বিক্রয় হইতেছে, ইহাতে আয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। বোম্বাইয়ে ষ্টেট ট্রান্সপোর্টে ১৯৪৮-৪৯ সালে মোট মূলধন লগ্নী হইয়াছিল ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকা, ইহাতে বাস কেনা হইয়াছে ৫৪৩টি, ১৬৩টি রুটে দৈনিক গড়ে ৪০,৭০০ মাইল বাস চলিয়াছে, ৪৮ লক্ষ টাকার টিকিট বিক্রী হইয়াছে এবং নীট আয় হইয়াছে ১৭ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। ৫৪৩টি বাস খাটাইয়া ৪৮ লক্ষ

টাকার টিকিট বিক্রী করিয়া বোম্বাই ১৭ লক্ষ টাকা নীট আয় দাঁড় করাইয়াছে; আর পশ্চিমবঙ্গ ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট ১২৫টি বাস খাটাইয়া ৪৮ লক্ষ টাকার টিকিট বিক্রী করিয়া ১৯৫০-৫১ সালে নীট আয় ৫ হাজার এবং ১৯৫১-৫২ সালে ৫ লক্ষ দেখাইতেছেন। ইহাতে আমাদের মনে খটকা লাগিতেছে। খরচের প্রভেদ কোথায় সেটা পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

পুনর্ব্বসতি বিভাগের ১৯৪৯-৫০ সালের অডিট করা হিসাব বাজেটে দেওয়া হয় নাই কেন তাহাও জানান উচিত ছিল।

বাজেটে যে সব টাকা বরাদ্দ হয়, বিশেষতঃ শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং রাস্তা নির্ম্মাণের বরাদ্দের টাকাগুলি বৎসরের মধ্যে কেন খরচ হয় নাই তাহার কৈফিয়ত প্রত্যেক বৎসর বাজেট-বক্তৃতায় দেওয়া উচিত। নিজেদের ইচ্ছামত বাজেট বরাদ্দে মোটা টাকা দেখাইয়া পরে সেটা বৎসরের শেষে বিনা বাক্যে কাটিয়া দেওয়া গণতন্ত্রের মন্ত্রিসভার পক্ষে অত্যন্ত অশোভন।

কলিকাতা কর্পোরেশন

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে কলিকাতা কর্পোরেশন বিল পেশ করা হইয়াছে। উহার মূল ধারাগুলি এইরূপ:

কর্পোরেশন, সাতটি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি এবং একজন কমিশনারকে লইয়া কলিকাতা মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে।

৮১ জন প্রতিনিধি লইয়া কর্পোরেশন গঠিত হইবে; তন্মধ্যে ৭৫ জন নির্ব্বাচিত কাউন্সিলার, ৫ জন অলডারম্যান এবং ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান।

নিম্নলিখিত সাতটি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি হইবে—

১। শিক্ষা
২। হিসাব
৩। ট্যাক্স ও ফিনান্স
৪। স্বাস্থ্য
৫। শহর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন
৬। ওয়ার্কস
৭। বিল্ডিংস।

নয় জন কাউন্সিলার অথবা অলডারম্যান লইয়া এক একটি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠিত হইবে। কোন একজন কাউন্সিলার বা অলডারম্যান দুইটির বেশী কমিটির সদস্য থাকিতে পারিবেন না। ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি তিন জন বাহিরের লোক লইতে পারিবে; ইঁহারা কমিটি মিটিং-এ ভোট দিবেন।

চার হইতে পাঁচটি ওয়ার্ড লইয়া একটি বরো গঠিত হইবে এবং প্রত্যেক বরোতে একটি করিয়া বরো কমিটি থাকিবে।

কলিকাতা শহর মোট ৭৫টি ওয়ার্ডে বিভক্ত হইবে। কাউন্সিলার নির্ব্বাচনে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা হইবে নিয়োক্ত রূপ:

১। কর্পোরেশনকে যে কোনরূপ ট্যাক্স দেওয়া চাই;

২। নির্ব্বাচনের আগের বছর অন্ততঃ ছয় মাস ৮ টাকা বাড়ীভাড়া অথবা বস্তিতে থাকিলে ৪ টাকা ঘরভাড়া দেওয়া চাই।

৩। ম্যাট্রিক পাস বা অনুরূপ কোন টেকনিকাল ডিপ্লোমা থাকা চাই।

বর্ত্তমান চীফ একজিকিউটিভ অফিসারের পরিবর্ত্তে একজন কমিশনার থাকিবেন। ইনি হইবেন কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা।

কমিশনার গবর্মেণ্ট কর্তৃক তিন বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন এবং তিনি কর্পোরেশনের সদস্য হইবেন না। গবর্মেণ্ট তাঁহাকে ইচ্ছা মাত্র অপসারিত করিতে পারিবেন, কিন্তু কর্পোরেশন তিন-চতুর্থাংশ ভোটে ছাড়া তাঁহাকে সরাইতে পারিবে না। কমিশনারের বেতন হইবে ৩৫০০ টাকা, এই টাকা দিবে কর্পোরেশন। কমিশনারের ছুটি গবর্মেণ্ট মঞ্জুর করিবেন, কর্পোরেশন নহে। সাধারণতঃ কমিশনার কর্পোরেশনের প্রস্তাব মানিয়া চলিবেন, কিন্তু গবর্মেণ্ট ইচ্ছা হইলে কর্পোরেশনের যে কোন প্রস্তাব বাতিল করিতে পারিবেন। অর্থাৎ কর্পোরেশনের কোন প্রস্তাব কমিশনারের মনঃপূত না হইলে কমিশনার তাহা গবর্মেণ্টকে দিয়া বাতিল করাইবার চেষ্টা করিতে পারিবেন। জরুরী অবস্থায় জনস্বার্থের অথবা কর্পোরেশনের স্বার্থের খাতিরে কমিশনার কর্পোরেশনকে অগ্রাহ্য করিয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পারিবেন এবং তার জন্য যে টাকা খরচ হইবে মিউনিসিপাল ফাণ্ড হইতে তাহা দেওয়া হইবে। কমিশনার কি করিয়াছেন তাহা সংশ্লিষ্ট ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিকে জানাইলেই চলিবে।

কর্পোরেশনের সমস্ত কর্ম্মচারী কমিশনারের অধীন থাকিবেন।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার, ফিনান্স অফিসার ও চীফ একাউণ্টেণ্ট, হেলথ অফিসার, সেক্রেটারী এবং এক বা দুই জন ডেপুটি একজিকিউটিভ অফিসার কর্পোরেশন কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন, কিন্তু তাঁহাদের নিয়োগ, বেতন, ভাতা, কাজের সর্ত্ত এবং অপসারণ গবর্মেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষ হইবে। কোন নিয়োগ গবর্মেণ্ট অনুমোদন না করিলে ৪৫ দিনের মধ্যে নূতন নাম পাঠাইতে হইবে। ইঁহারা ছাড়া ৬০০ টাকা বেতনের উপরের কর্ম্মচারীদের কর্পোরেশন নিযুক্ত করিবেন। ৬০০ টাকার কম বেতনের অফিসার নিয়োগ করিবেন কমিশনার।

গবর্মেণ্টের পাবলিক সার্ভিস কমিশন যে নাম পাঠাইবেন তার মধ্য হইতে চীফ ইঞ্জিনিয়ার, ফিনান্স অফিসার, চীফ একাউণ্টেণ্ট, হেলথ অফিসার, সেক্রেটারী এবং ডেপুটি একজিকিউটিভ অফিসার নিয়োগ করিতে হইবে।

একটি মিউনিসিপাল সার্ভিস কমিশন গঠিত হইবে।

ইঁহাদের সুপারিশ ক্রমে কর্পোরেশন অথবা কমিশনার ৩০০ টাকার অধিক বেতনের কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবেন। তার নীচের নিয়োগ কমিশনার নিজে করিবেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের একজন সদস্য মিউনিসিপাল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হইবেন; একজন সদস্য গবর্মেণ্ট মনোনীত করিবেন এবং একজন সদস্য কর্পোরেশন মনোনীত করিবেন।

কর্পোরেশনের সমস্ত কনট্রাক্ট কমিশনার কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইবে। ৫০ হাজার টাকার বেশী কনট্রাক্ট হইলে তাঁহাকে কর্পোরেশনের অনুমোদন লইতে হইবে। পাঁচ হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকার কনট্রাক্টের জন্য ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির অনুমোদন লইতে হইবে। পাঁচ হইতে এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত কনট্রাক্ট তিনি নিজ দায়িত্বে করিতে পারিবেন, ১৫ দিনের মধ্যে ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটিকে উহার সংবাদ জানাইলেই চলিবে। কনট্রাক্টের কাজ, দাম এবং সময় কমিশনার স্থির করিবেন। তবে চুক্তিনামায় কর্পোরেশনের শীলমোহর বসাইবার সময় একজন কাউন্সিলার বা অলডারম্যানকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার স্বাক্ষর লইতে হইবে।

কর্পোরেশন তার দায়িত্ব পালন করিতে পারিতেছেন না বলিয়া মনে করিলে গবর্মেণ্ট উহা ভাঙ্গিয়া দিয়া একজন এডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারের হাতে কর্পোরেশন পরিচালনার ভার দিতে পারিবেন। এডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারের নামে কোন আদালতে মামলা করা চলিবে না।

পুরাতন কর্পোরেশনে অশেষ অনাচার হইয়াছে, এক দল অযোগ্য ও স্বার্থান্বেষী কাউন্সিলারের নানা কারসাজিতে। ইহাতে নাগরিকদিগের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু সে কারণে নাগরিকের ন্যায্য অধিকার ক্ষুন্ন হওয়া উচিত নয়। আমরা দেখিতে চাই যে, নাগরিকের মতামত সক্রিয়ভাবে পৌর-প্রতিষ্ঠানে থাকে। যে পার্টি সরকারের গদী দখল করিবেন, তাঁহারা কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানও সঙ্গে সঙ্গে হস্তগত করিতে পারিবেন না এরূপ ব্যবস্থা আমরা দেখিতে চাই। সুতরাং এই সকল বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা হওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি।

মানভূম সত্যাগ্রহ

গান্ধীজীর আদর্শের দীপশিখা ভারতের যে অল্প কয়েকটি সঙ্ঘ আজও উজ্জ্বল রাখিয়াছেন মানভূম লোকসেবক সঙ্ঘ তন্মধ্যে অন্যতম। গত ২৬শে জানুয়ারী মানভূমের কুমীর নামক স্থানে সঙ্ঘের কর্ম্মীদের একটি সম্মেলনে খাদ্যাবস্থা বিশদ ভাবে আলোচিত হইয়াছিল। গত ১ই মার্চ্চ হইতে তাঁহারা বিহার গবর্মেণ্টের খাদ্য সম্পর্কিত আইন ভঙ্গ করিয়া সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছেন। জেলার জনসাধারণের বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ন্যূনতম খাদ্যশস্য জেলায় রক্ষা করা এবং সরকারী নীতি ও কার্য্য ব্যবস্থার ফলে খাদ্যশস্যের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে তাহা হইতে আত্মরক্ষার জন্য সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে।

ঐ প্রদেশে প্রধান খাদ্যের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে গবর্মেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীন। উৎপাদনের ব্যবস্থা চাষীদের হাতে থাকিলেও গবর্মেণ্ট হইতে শস্য উৎপাদন বিষয়ে তাহারা কোনরূপ কার্য্যকরী সাহায্য পায় না। মানভূমে সরকারী বিধি-নিষেধের ফলে উৎপাদন ব্যাহতই হইয়া থাকে। লোকসেবক সঙ্ঘের মুখপত্র "মুক্তি" লিখিতেছেন যে, "খাদ্য নিয়ন্ত্রণে সরকার সর্ব্বময় কর্ত্তা কিন্তু কার্য্যপরিচালনার অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা অন্তহীন অত্যাচারের রাজত্ব ছাড়া আর কিছু নয়।" কেবলমাত্র মানভূম নহে, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র খাদ্য আইনগুলি অনাচার ও অত্যাচারের প্রতীক হইয়া উঠিতেছে। উৎপন্ন খাদ্যশস্যের উপর নিয়ন্ত্রণ, সরবরাহ, বণ্টন ও নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থাগুলির মধ্যে যদি শোচনীয় অব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় এবং এগুলি নিয়ন্ত্রণের নামে যদি কতকগুলি যুক্তিহীন এবং নানাক্ষেত্রে অসুবিধাজনক আইনকানুনের প্রবর্ত্তন করা হয় যাহার ফলে দেশের জনজীবনে খাদ্যের অবস্থা ক্রমান্বয়ে কষ্টকরই হইতে থাকে তবে তাহার জন্য গবর্মেণ্টকেই সম্পূর্ণ দায়ী করিতে হয়। "মুক্তি" লিখিতেছেন,

"দেশবাসীর জীবনে খাদ্যশস্যের মতো এমন একটা জীবনমৃত্যুর সমস্যা গবর্মেণ্টের দায়িত্বে শোচনীয় অব্যবস্থার ফলে সঙ্কটজনক অবস্থায় আসিতে থাকিলে দেশহিতৈষী মাত্রেরই প্রথম কর্ত্তব্য সে বিষয়ে গবর্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং তাহাদের গঠনমূলক অভিমত প্রদান এবং মানুষের জীবনমরণের এই সঙ্কটজনক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানকল্পে তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ সহযোগিতা প্রদান করা। গবর্মেণ্ট যদি প্রকৃত জনসাধারণের হিতার্থে জনসাধারণের গবর্মেণ্ট হয় তবে এরূপক্ষেত্রে তাহারা দেশবাসীর গঠনমূলক অভিমত ও সহযোগিতা গ্রহণ করিয়া নিজেদের ত্রুটি সংশোধন করিয়া সুব্যবস্থার জন্য চেষ্টিত হয়। যদি গবর্মেণ্ট উহা করিতে অক্ষম হয় বা যে ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া উদাসীন থাকে, অধিকন্তু আরও শোচনীয় অব্যবস্থাদ্বারা এই সঙ্কটজনক অবস্থাকে আরও সঙ্কটতর করিয়া তোলে, সেক্ষেত্রে দেশবাসী জনসাধারণের পক্ষে কেবল আত্মরক্ষার তাগিদেই অব্যবস্থাকে প্রতিরোধ করিয়া ইহার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। মানভূম লোকসেবক সঙ্ঘ নিয়মতান্ত্রিকতার পথে প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের খাদ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিমণ্ডলীর সরকারী অবস্থার ফলে মানভূমে সৃষ্ট শোচনীয় খাদ্যাবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ও তাহাদের সচেতন করিবার বহু চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তবক্ষেত্রের অভিজ্ঞতায় তাহাদের গঠনমূলক অভিমত প্রদান করিয়া এই খাদ্যসঙ্কটের সুব্যবস্থাকল্পে তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ সহযোগিতা প্রদানের প্রস্তাবও তাঁহারা

পরাঙ্মুখ হন নাই। দেশহিতৈষী ও মানুষের কর্ত্তব্য হিসাবে তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত কি প্রাদেশিক, কি কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট সকলকেই এ বিষয়ে অবহিত করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন।...অনন্তোপায় হইয়া লোকসেবক সঙ্ঘ অহিংস সত্যাগ্রহের পথ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছে এবং ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের পর যে কোনদিন সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবে বলিয়া শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বিহারের প্রধানমন্ত্রীকে জানাইয়াছেন। কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টই হউক আর প্রাদেশিক গবর্মেণ্টই হউক, তাঁহারা অন্যায় ও অবিচারের পথে চলিয়াছেন এবং অন্যায়কে সমর্থন করিতেছেন বলিয়াই ভারতবর্ষে তাঁহারাই আজ এই দুর্দ্দিনের সৃষ্টি করিয়াছেন। দেশবাসীও একদিকে এই অন্যায়কে মানিয়া লইয়াও অপরদিকে প্রকৃত পথে ইহার প্রতিরোধে সচেষ্ট নন বলিয়া তাহাদেরও এই দুর্দ্দিনের মধ্য দিয়া চলিতে হইতেছে। একমাত্র অহিংস সত্যাগ্রহই যাহারা অন্যায় করে তাহাদের বিনাশ না করিয়া তাহাদের অন্যায় হইতে নিবৃত্ত হইবার অবস্থা সৃষ্টি করে। দেশের জাতীয় গবর্মেণ্ট যাহারা পরিচালনার দায়িত্ব ও ক্ষমতা লইয়া তাহার অপব্যবহার দ্বারা দেশে সঙ্কট সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করিয়া চলিয়াছেন তাঁহাদিগকে সেই অবস্থার সৃষ্টির চেষ্টা সত্যাগ্রহের পথেই আজ রোধ করিতে হইতেছে। সত্যাগ্রহের পথে দেশের সংগঠিত জনমত যদি সর্ব্বপ্রকার অন্যায়কে স্বীকার না করিবার বা মানিয়া না লইবার দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দিতে পারে তবে গবর্মেণ্টে যাঁহারাই থাকুন তাঁহাদিগকে অন্যায়ের পথ বন্ধ করিতেই হইবে এবং তাহা দ্বারা দেশবাসী ও গবর্মেণ্ট উভয়েরই কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইবে। প্রকৃত সত্যাগ্রহ সমস্ত সঙ্কটেরই সমাধান করিয়া থাকে, অন্যায় ও মিথ্যাই কেবল সঙ্কটের সৃষ্টি করে। ব্যক্তিগত সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবন সর্ব্বক্ষেত্রেই ইহা চিরন্তন সত্য।"

মানভূম লোকসেবক সঙ্ঘ প্রথম দিন পুরুলিয়ায় এবং দ্বিতীয় দিন ঝালিদায় সত্যাগ্রহ করিয়াছেন। পুলিস কোন বাধা দেয় নাই। বিহার ব্যবস্থা-পরিষদে এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠিলে স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী শ্রীবিনোদানন্দ ঝা বলিয়াছেন যে, সত্যাগ্রহের সংবাদ তাঁহারা পাইয়াছেন এবং এই সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে জনসাধারণের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই এ কথা তাঁহারা জানেন। প্রাদেশিক সরকার উহা লক্ষ্য করিতেছেন এবং প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কোন সত্যাগ্রহই আরম্ভ হওয়ার দুই তিন দিনের মধ্যে প্রবল আকার ধারণ করে না। যে সত্যাগ্রহের কারণ ন্যায়সঙ্গত এবং পরিচালনকারীরা স্বার্থলেশহীন তাহার সাফল্য সুনিশ্চিত। মানভূম সত্যাগ্রহ এই কারণে দেশের হিতকামী ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

খাদ্যে ভেজাল

ভারতবর্ষ প্রায় চারি বৎসর হইল স্বাধীন হইয়াছে, লোকায়ত্ত গবর্মেণ্ট কেন্দ্রে এবং প্রদেশে গঠিত হইয়াছে। খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ, বেকারসমস্যা, মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি বড় বড় সমস্যার কথা না হয় ছাড়িয়া দেওয়া গেল, কিন্তু খাদ্যে ভেজাল নিবারণের ন্যায় একটা সাধারণ অথচ অপরিহার্য্য কাজও তাঁহারা করিতে পারিলেন না। বিদেশী শাসকরা ভারতবাসীর স্বাস্থ্য ভাল না হউক ইহা চাহিতে পারে এবং তার জন্য ভেজাল নিবারণে উদাসীন থাকিতে পারে, কিন্তু স্বাধীন ভারতের লোকায়ত্ত গবর্মেণ্ট ইহা উপেক্ষা করিতে পারেন না। দিল্লীতে এশিয়ার খেলোয়াড়েরা আসিয়াছে, তাহারা উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যের পরিচয় দিতেছে। তাহাদের দেশে খাদ্যে ভেজাল সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট হইতে সুরু করিয়া প্রতিটি লোক অতিমাত্রায় সতর্ক। জাপানী গোয়ালা দুধে জল মিশানো সব চেয়ে বড় পাপ কাজ মনে করেন, ইহাতে শিশুর খাদ্য খারাপ হইবে, ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা ভগ্নস্বাস্থ্য ও দুর্ব্বল হইয়া গড়িয়া উঠিয়া জাতিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে। আমাদের দেশে গবর্মেণ্ট ভেজাল নিবারণ করা দূরে থাকুক, গবর্মেণ্টের লোকে খাদ্যে ভেজাল দেয়। কোন রেশনের দোকানে ভেজাল ছাড়া খাদ্য পাওয়া যায় না। হরিণঘাটায় সরকারী গোশালার দুধে ভেজালের কথা গবর্মেণ্ট ঢাকঢোল পিটাইয়া, প্রেস নোট বাহির করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সে দিন দেখিলাম ছোলায় ভেজাল—এক পোয়া ছোলায় সিকি পোয়া ঠিক ছোলার চেহারার পাথর ভেজাল। মানুষ না হয় পাথর বাছিয়া লইল, কিন্তু গরুকে যে ছোলা খাইতে দেওয়া হইবে তাহা কে বাছিয়া দিবে? গরুর জাব কেহ বাছিয়া দেয় না, ঐ পাথর গরুর পেটে যাইবে এবং তার পরিণাম দুধের উপর নির্ভরশীল শিশুদের ভুগিতে হইবে। খাদ্যে ভেজাল আমাদের দেশে এত ব্যাপক হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহা নিবারণের জন্য দেশব্যাপী চেষ্টা দরকার। গবর্মেণ্ট এবং জনসাধারণ উভয়কেই এবিষয়ে সমানভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। ঘিয়ে ভেজাল লইয়া কিছুটা আন্দোলন হইতেছে, তাহাও কেবলমাত্র দালদা মিশানো সম্পর্কে। ইহা যথেষ্ট নয়। ঘি এবং মাখনে দালদা ছাড়া চর্ব্বি প্রভৃতি অন্যান্য অনেক জিনিষ মেশানো হয়। ভেজালের ব্যাপারটা সমগ্র ভাবে না ধরিলে এবং অতি কঠোর হস্তে প্রথম হইতেই অগ্রসর না হইলে কাজ হইবে না। দেশের লোক এখনও কিছুদিন নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইবে না। ইহা ধরিয়া লইয়াই কাজে অগ্রসর হইতে হইবে। এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে হইবে গবর্মেণ্টকে।

ভেজাল ধরা যদি চোরাবাজারী ধরার মত পুলিসেরই উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয় তবে সে চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইতে বাধ্য। এই সকল অনাচার বন্ধ করিতে হইলে নূতন ব্যবস্থা করিতে

হইবে। যে সরিষার ভূত বরিয়াছে তাহা ফেলিয়া দিয়া নূতন সরিষা আনিতে হইবে। না হইলে অবস্থা "যে তিমিরে সেই তিমিরে"ই থাকিবে।

পাকিস্থানে হিন্দু বাড়ী দখল

পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে বাজেট আলোচনাকালে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দত্ত হিন্দুবাড়ী দখলের প্রতিবাদ করিয়া একটি ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। গবর্ন্মেণ্ট যে ভাবে বাড়ী দখল করিতেছেন তাহাকে তিনি জবরদস্তি এবং জুলুম আখ্যা দেন। ক্ষতিপূরণ না দিয়া বাড়ী ও জমি কোন আইনে দখল করা হইতেছে তাহাও তিনি জানিতে চাহেন। শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন যে, বাড়ী দখল সম্বন্ধে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা উহা দুই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতেছেন। প্রথম উদ্দেশ্য সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্য বাড়ী সংগ্রহ, কিন্তু দ্বিতীয় উদ্দেশ্য যে অন্ততঃ মিউনিসিপাল শহরগুলি হইতে হিন্দু তাড়ানো এ কথা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে বলিতে হইতেছে। তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে ইহার প্রমাণ দিতে চাহেন। মাইনরিটিদের বাড়ী দখল করা অথবা দখলে রাখা সুস্পষ্টভাবে দিল্লী-চুক্তির বিরোধী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখনও প্রায় ৩০০ বাড়ী গবর্ন্মেণ্টের দখলে রহিয়াছে। ইহার মধ্যে ২০০ বাড়ী ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য দিয়া দেওয়া হইয়াছে। তিন শত হিন্দু বাড়ী দখল করিয়া তার মধ্যে দুই শত বাড়ী গবর্ন্মেণ্ট নিজের কাজে না লাগাইয়া ব্যক্তিগতভাবে মুসলমান প্রজাদের দিয়া দিলে ইহাই প্রমাণ হয় যে, সরকারের প্রয়োজনে বাড়ী দখল করা হয় নাই। দিল্লী-চুক্তির পর এগুলি ফেরত দেওয়া হয় নাই। আরও দুঃখের বিষয়, ইউরোপীয়দের ব্যবহারের জন্য গবর্ন্মেণ্ট হিন্দু বাড়ী দখল করিয়া দিয়াছেন। দিল্লী-চুক্তির পর কোন হিন্দু বাড়ী দখল করা হইবে না এই সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ ভঙ্গের একটি দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, খুলনা টাউনে ৮ই এপ্রিলের পর একটি বাড়ী দখল করা হয়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিস করিলে তিনি বলেন যে, দখলটা ৮ই এপ্রিলের পর হইয়াছে ইহা ঠিক। কিন্তু দখলের ইচ্ছাটা তার অনেক আগে হইয়াছিল সুতরাং ইহাতে সামান্য টেকনিকাল ত্রুটি মাত্র হইয়াছে। এই যদি দিল্লী-চুক্তির ব্যাখ্যা হয় তবে উহার সার্থকতা কোথায় থাকে? ক্ষতিপূরণের নমুনা দিবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, মসজিদের নিকটে কোন হিন্দুবাড়ী থাকিতে দেওয়া হইবে না এই অজুহাতে একজন পুলিস ক্লার্কের জন্য একটি বাড়ী দখল করা হয়। উহাতে ১১টি শয়নঘর আছে; ভাড়া ঠিক হয় মাসে ২২ টাকা। সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্য যে সব বাড়ী দখল করিয়া দেওয়া হয় তাহার ভাড়া প্রায়ই দেওয়া হয় না। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা সাব-জজ শ্রেণীর কর্ম্মচারীরাও ভাড়া দেন নাই এরূপ দৃষ্টান্ত আছে।

অভিযোগের উত্তরে বক্তৃতা দিয়া রাজস্বসচিব মৌলবী তোফজ্জল আলি এক কথায় সমস্ত উড়াইয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, সব সময়েই দেখা যায় যে এই জাতীয় অভিযোগের অধিকাংশই মিথ্যা থাকে। আইনতঃ এবং কার্য্যতঃ যাহা করা সম্ভব তাঁহারা তাহা করিতেছেন।

পাকিস্থানের সহিত ব্যবহারে ভারত-সরকার যে শোচনীয় দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়া চলিয়াছেন তাহাতে এই জাতীয় অতি ন্যায়সঙ্গত অভিযোগের প্রতিকার কি ভাবে হইবে আমরা তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। ভারতের মর্ম্মান্তিক দুর্ব্বলতা পাকিস্থান খুব ভালভাবে বুঝিয়া লইয়াছে বলিয়া বুক ফুলাইয়া তাহারা দিল্লী-চুক্তি ভঙ্গ করিয়া চলিয়াছে। ইহার বিহিত অনতিবিলম্বে করিতে না পারিলে ভারতে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তাহাতে আবার সাম্প্রদায়িকতা প্রবল হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়।

এই সাম্প্রদায়িকতা এখনও এদেশে রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। তবে এখন প্রশ্ন এই যে, কোন অজুহাতে যদি পাকিস্থানের মাইনরিটিকে বেদখল করা হয় তবে এখানকার মাইনরিটির উপর অত্যাচার বন্ধ করা যায় কি করিয়া? পণ্ডিত নেহরু ও তাঁহার সমর্থকবর্গই এ কথার উত্তর দিতে পারেন। আমরা শুধু ব্যর্থতাই অনুভব করিতেছি।

খাদ্য-সংগ্রহ নীতির পরিবর্ত্তন

১১ই ফাল্গুনের এক সরকারী ঘোষণায় পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য-সংগ্রহ নীতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে: "বঙ্গীয় খাদ্যশস্য সংগ্রহ আদেশানুযায়ী নির্দ্দেশের দ্বারা ধান চাউল সংগ্রহের ব্যাপারে এবং এই বৎসর কৃষকদিগকে পারমিট দেওয়া নিষিদ্ধ করিয়া পূর্ব্বে যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তৎফলে কৃষকদিগকে যে দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, তদ্বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আবেদন-নিবেদন প্রাপ্ত হইয়াছেন। সরকার বিশেষ সতর্কতার সহিত এই সব আবেদন বিবেচনা করিয়া সরকারী খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কৃষকদের প্রকৃত অভিযোগ দূর করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন:—

(১) নদীয়া ও কোচবিহার জেলা ব্যতীত অন্যান্য জেলায় যে সব কৃষকের ১৫ বিঘা এবং তদপেক্ষা কম ধানী জমি আছে এবং নদীয়া ও কোচবিহার জেলার যে সব কৃষকের ২৫ বিঘা এবং তদপেক্ষা কম ধানী জমি আছে নির্দ্দেশ জারীর দ্বারা তাহাদের নিকট হইতে শস্য সংগ্রহ করা হইবে না। নদীয়া ও কোচবিহার জেলার ব্যাপারে পৃথক ব্যবস্থার কারণ এই যে, এই বৎসর এই দুই জেলায় অন্যান্য জেলা অপেক্ষা প্রতি বিঘার উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে।

তবে কৃষকগণ যদি স্বেচ্ছায় সরকারের নিকট খাদ্যশস্য বিক্রয় করে, তবে এইরূপ বাধানিষেধ প্রযোজ্য হইবে না।

তবে ইহাও প্রকাশ থাকে যে, যদি ১৫ অথবা ২৫ বিঘার

কম জমির মালিকের নিকট প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত দেখা যায়, যাহা শুধু নিম্নলিখিত প্যারাগ্রাফে বর্ণিত হিসাবানুযায়ী তাহার প্রয়োজনেরই অতিরিক্ত নহে, পরন্তু ১৫ অথবা ২৫ বিঘা জমির আনুমানিক উৎপাদন অপেক্ষাও অধিক, তাহা হইলে তাহাকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ আদেশের আওতা হইতে রেহাই দেওয়া হইবে না। (২) খাদ্যশস্য সংগ্রহের নির্দ্দেশ দানের সময় এখন হইতে কৃষককে নিম্নলিখিত রূপে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইবে এবং নিম্নলিখিত পরিমাণ শস্য তাহার বার্ষিক প্রয়োজন বলিয়া গণ্য করা হইবে :—

তাহার পরিবারের জন্য মাথা পিছু সাত মণ ধান, তদতিরিক্ত বিঘা পিছু দশ সের ধান বীজ হিসাবে : তাহা ছাড়া কৃষক যদি তাহার কৃষিকার্য্যের জন্ম কৃষি-মজুর নিয়োগ করে ও মজুর যদি তাহার সহিত আহার্য্য গ্রহণ করে, তাহা হইলে বিঘা পিছু এক মণ ধান ; (৩) ইউনিয়ন খাদ্য ও সরবরাহ উপদেষ্টা বোর্ডসমূহ অথবা গ্রাম্য পঞ্চায়েৎসমূহের সহিত পরামর্শ না করিয়া খাদ্য সংগ্রহের নির্দ্দেশ দেওয়া যাইতে পারিবে না ; (৪) কৃষকদিগকে পারমিট দান নিষিদ্ধ করিয়া যে আদেশদেওয়া হইয়াছিল, তাহা প্রত্যাহৃত হইল এবং কৃষকদিগকে পারমিট ইস্যু করার ব্যাপারে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসৃত হইবে :—

(ক) যদি কোন কৃষকের বেষ্টনী এলাকায় খাদ্য জমি থাকে ও তাহার বাসস্থান ঐ বেষ্টনী এলাকার বাহিরে হয় এবং যে এলাকায় তাহার বাস সেই এলাকায় তাহার কোনরূপ খাদ্যোৎপাদন না হয় অথবা উপরোক্ত ২নং প্যারাগ্রাফে বর্ণিত হিসাবের কম হয়, তাহা হইলে যথোপযুক্ত তদন্তান্তর এবং বেষ্টনী এলাকায় তাহার উৎপন্ন ধানের অবশিষ্টাংশ পূর্ব্বেই সরকারের (জেলা খাদ্যশস্য সংগ্রহ এজেণ্টগণ ও অনুমোদিত চাউল কলসমূহ সমেত) নিকট বিক্রয় করিয়াছে, এই মর্ম্মে রসিদ দেখাইলে তাহাকে একটি পারমিটবলে বেষ্টনী এলাকা হইতে ঘাটতি পরিমাণ খাদ্যশস্য আনিতে দেওয়া হইবে ; (খ) কৃষকদের পারমিটের জন্ম কৃষককে ১৯৫১ সালের ১৫ই মার্চ্চের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ফরমে বেষ্টনী অঞ্চল যাহার এলাকাভুক্ত, সেই এ আর সি পির নিকট আবেদন করিতে হইবে। বেষ্টনী এলাকার উদ্বৃত্ত মজুত ধান পূর্ব্বেই সরকারের (ডি পি এজেন্টস এবং অনুমোদিত চাউল কলসমূহ সহ) নিকট বিক্রয় করা হইয়াছে, এই মর্ম্মের বিক্রেতার রসিদ আবেদনের সহিত দাখিল করিতে হইবে। উক্ত রসিদে সংশ্লিষ্ট ইন্সপেক্টর, এসেসর অথবা জুনিয়র এসেসরের স্বাক্ষর থাকিতে হইবে, (গ) ১৯৫১ সালের ২১শে এপ্রিলের মধ্যেই যে সব এলাকায় ঐ সব জমি অবস্থিত, সেই সব এলাকার এসিষ্ট্যাণ্ট রিজিওনাল প্রকিওরমেণ্ট কন্ট্রোলার অথবা কন্ট্রোলারগণ কর্তৃক তদন্তান্তে পারমিট ইস্যু করা হইবে ; (ঘ) বেষ্টনী এলাকা হইতে খাদ্য লইয়া যাওয়ার জন্ম পারমিট-হোল্ডারগণকে ১৫ দিনের বেশী সময় দেওয়া হইবে না এবং কোনমতেই ঐ সময় ১৯৫১ সালের ১০ই মের পর হইবে না ; (ঙ) দুইভাগে বিভক্ত পারমিটের একাংশ শেষ পরীক্ষাস্থলে দিয়া দিতে হইবে এবং অপরাংশ পারমিট-হোল্ডারের নিকট থাকিবে। শেষ পরীক্ষাস্থলে পারমিটের যে অংশ দাখিল করিতে হইবে, তাহা যদি নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দাখিল না করা হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি উহা দাখিল করিবে না, নির্দ্দিষ্ট তারিখের পর তাহার খাদ্য সরকার হস্তগত করিয়া লইবেন ; (চ) দ্রুত পরীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করার জন্ম এবং নৌকা অথবা গরু-মহিষের গাড়ী যাহাতে বেশীক্ষণ আটক করিতে না হয়, তদুদ্দেশ্যে দেড়-মণি বস্তায় বেষ্টনী এলাকা হইতে খাদ্য অপসারণ করিতে হইবে ; (ছ) পারমিটে যে রাস্তা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে, সেই রাস্তা দিয়া বেষ্টনী অঞ্চল হইতে ধান লইয়া যাইতে হইবে ; অন্ত কোন পথ দিয়া নহে।"

এই পরিবর্ত্তনে কৃষকশ্রেণীর নানাবিধ অসুবিধা কতটা দূর হইবে, তাহা পরীক্ষার বিষয়। সেই ভরসা করিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম মুখপত্র "সমাচার" নিম্নলিখিত সংবাদটি ১৫ই ফাল্গুনের সংখ্যায় পরিবেশন করিয়াছেন :

নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, মুর্শিদাবাদ জেলাবাসীর সুবিধার্থে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জেলার খাদ্য-সংগ্রহ নীতির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিছু দিন পূর্ব্বে জেলা কংগ্রেসের এক সভায় মুর্শিদাবাদের খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে এগারো দফার প্রস্তাব সম্বলিত একটি অনুরোধ-পত্র গৃহীত হইয়া রাজ্য সরকারকে তাহার অনুলিপি প্রেরণ করা হয়। তাহা ছাড়া জেলা সমাহর্ত্তাও খাদ্য-সংগ্রহ ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্ম কয়েকটি প্রস্তাব দিয়াছিলেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই সমস্ত বিবেচনা করিয়া নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন অনুমোদন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে :—

(১) সাগরদীঘি ও নবগ্রাম থানার কর্ডন তুলিয়া দেওয়া হইবে ; (২) আন্তর্থানা শস্য-চলাচলে বাধা থাকিবে না ; (৩) ১৫ বিঘার কম জমি যাহার আছে, তাহার শস্য সংগ্রহ হইবে না। ১৫ বিঘা পর্য্যন্ত ডিরেকটিভ থাকিবে না ; (৪) কর্ডন বা বেষ্টনীর মধ্যে জমি থাকিলে ও বেষ্টনীর বাহিরে বাস করিলে, আইনমত চাউল বা খাদ্য বেষ্টনীর মধ্য হইতে আনিতে দেওয়া হইবে ; (৫) মাথা পিছু খাইবার জন্ম ৭/০ মণ, বিঘা প্রতি দশ সের বীজ ও ১/০ মণ মজুরি বাবদ বাদ দিয়া, উদ্বৃত্ত খাদ্য সংগ্রহ করা হইবে ; (৬) শস্যসংগ্রহ আইনাবলী সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করার ব্যবস্থা হইবে।

এই নূতন সরকারী নীতিকে সত্বর কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র কৃষি কলেজ

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর পশ্চিমবঙ্গে কৃষি-শিক্ষার কোন ব্যবস্থা রহিল না। এই অভাব পূর্ণ করিবার জন্ত কলিকাতা বিশ্ববিভালয় অগ্রণী হইলেন; দমদমের নিকটবর্ত্তী স্থানে কোঠাবাড়ী প্রস্তুত করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন।

তারপর কি ঘটিল জানি না। কোন একটা গণ্ডগোল দেখা দিয়াছিল নিশ্চয়ই। সমস্ত পরিকল্পনাটি বানচাল হইয়া যাইত যদি মেদিনীপুর ঝাড়গ্রামের রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব এই বিপদে রক্ষা না করিতেন। তিনি প্রায় সোয়া চারি শত বিঘা জমি দিলেন; এক লক্ষ টাকা দিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের মুখ রক্ষা হইল।

কিন্তু ঝাড়গ্রামকে নির্ব্বাচন করিবার পক্ষে অন্তান্ত যুক্তিও আছে। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে কৃষির উন্নতির বহু সম্ভাবনা আছে। পূর্ব্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ আজ অপর রাষ্ট্রের ভাগে পড়িয়াছে; মধ্যবঙ্গের কৃষি মেদিনীপুর জেলার পূর্ব্বাঞ্চল, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলা হইতে উন্নততর।

এই সব প্রয়োজনে ঝাড়গ্রামে কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠার আমরা পক্ষপাতী। অন্তান্ত জেলায়ও তাহা সম্ভব। ধনীলোকের অভাব নাই; স্থানীয় অভাব বোধের অভাব। আমরা ঝাড়গ্রাম রাজের জনহিতৈষণার অনুকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিতে পাইব এই আশায় আছি।

এই কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর প্রশান্ত সেন উভোগী পুরুষ। কিন্তু কেবল আই-এস্‌সি, বি-এস্‌সি, এম্-এস্‌সি প্রভৃতি উপাধি লাভ করিয়া পুথিগত বিভালাভ করিলেই 'কৃষক' হওয়া যাইবে না। বাঙালী পরীক্ষার পাসে বিশেষ কৌশলী তাহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না।

ঝাড়গ্রাম সম্বন্ধে আমাদের মনে কিন্তু একটা খটকা আছে। আমরা যতদূর জানি এই অঞ্চলে জলাভাব অত্যন্ত বেশী। কোন বাঁধ বা বহতা খাল নাই বলিলেই হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটা সেচখাল কাটার মনস্থ করিয়াছেন শুনিয়াছি। এই অবস্থায় কৃষির প্রসার কি করিয়া সম্ভব তাহা বুঝিতেছি না। অল্প জলেও কৃষি হয়, উন্নত কৃষি হয়—সেই কথা শুনিয়াছি। সেই সম্ভাবনা এই কলেজে পরীক্ষিত হইবে কি? তাহা সফল হইলে ডক্টর প্রশান্ত সেন কীর্ত্তি অর্জ্জন করিবেন।

সমবায় সমিতির অসুবিধা

বালী শহরের পাক্ষিক 'সাধারণী' পত্রিকার পরিচালকবর্গ স্থানীয় ঘটনাবলীর আলোচনা দ্বারা অনেক বিষয়ের উপর আলোকপাত করিয়া থাকেন। গত ১লা ফাল্গুন সংখ্যায় 'সমবায় সমিতির অসুবিধা' সম্বন্ধে যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে সারা দেশের একটি সমস্তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। সেইজন্ত আমরা তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম:—

"দুই বৎসরেরও অধিক হ'ল কনট্রোলের কাপড় বিক্রয় উপলক্ষ ক'রে পশ্চিম বাংলায় বহু সমবায় সমিতি গঠিত হয়। লোকে নিজ গ্রাম বা শহরের সমিতির অংশ ক্রয়ের জন্য টাকা দেয়। এই অর্থকে মূলধন ক'রে সমিতির কাজ চলে। আমাদের বালিতেও এইরূপ একটি সমবায় সমিতি হয়েছে।...

"কিন্তু বহু উদ্দেশ্য দূরে থাক, এক আধটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে মন ও উভোগ চাই তার পরিচয় বা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কার্য্যতঃ দেখা যাচ্ছে, সমবায় সমিতি নাম দিয়ে যা গঠিত হয়েছে তা একখানা দোকানমাত্র—বহু অসুবিধার মধ্যে সেই দোকানকে কাজ করতে হচ্ছে এবং বহু পরিশ্রম করেও দোকানের ঠিকমত ব্যবস্থা সম্ভব হচ্ছে না।

"দ্রব্যাদির সুষ্ঠু বণ্টন সমবায় সমিতির একটি কর্ম্ম। কনট্রোলের কাপড় যথাসম্ভব ঠিকমত বণ্টন করে বহুমুখী সমিতি লোকের সুবিধা করতে পেরেছে এবং জনপ্রিয় হয়েছে। কিন্তু কাপড় যোগাড় করতে প্রাণান্ত হয়ে উভোগীদের ধৈর্য্যপরীক্ষা চরমে পৌছেছে। স্বীকার করি, কনট্রোলের কাপড় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত পাওয়া বিধিমত সম্ভব নয়, তথাপি সমবায় সমিতিগুলিতে নিয়মিত কাপড় সরবরাহের কতকটা বিশেষ সুবিধা যদি গবর্ন্মেণ্ট না দেন, তবে অবস্থা ক্রমশঃ অচল হয়ে উঠবে।...

"গবর্ন্মেণ্ট বহু বুদ্ধিবিবেচনাপূর্ব্বক সমবায় সমিতি পরিচালনের জন্য নানাপ্রকারের খাতাপত্রের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা যখন করা হয় তখন সমবায় সমিতির বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে তাঁদের কোন ধারণা ছিল বলে মনে হয় না। কর্ম্মক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, খাতাপত্রের এই ব্যবস্থা 'বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি'র মত হয়েছে। তার পর কাপড় যোগাড় করবার জন্যে নিত্য ছুটাছুটি, কাপড়ের অফিসের কথার খেলাপ, ঘুসীমত অভদ্রতা ও অবজ্ঞা এবং কাপড় পাবার সুনিশ্চিত অনিশ্চয়তা, এই সকল কারণে সমবায় সমিতির পরিচালকদের উৎসাহের শেষ উত্তাপটুকু হিম হয়ে আসছে। সমবায় সমিতি যে গবর্ন্মেণ্টেরও কাম্য তার কোন পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না।"

আমাদের সর্ব্ব অঙ্গে ব্যথা 'ওষুধ' দিব কোথা?—এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে উদয় হয়। মূল কথা হইল দ্বিজেন্দ্রলালের আকুল আহ্বান—'আবার তোরা মানুষ হ'। দেশের লক্ষ্মীর আগমন এই মানুষের সাধনায় সম্ভব হইবে; আর কোন সহজ পথ নাই।

পূর্ব্ববঙ্গের অভিজ্ঞতা

ঢাকার "ইমরোজ" ("অদ্য") নামক মাসিক পত্রিকায়

গত পৌষ সংখ্যায় নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা অবলম্বন করিয়া অনেক কথাই লেখা যায়। *সে প্রলোভন আমাদের দমন করিতে হইবে।* পাকিস্থানী উন্মাদনার একদিন শেষ হইবে। তৎপূর্ব্বে "ইমরোজে"র মতামত জানিয়া রাখা ভাল। এই সংখ্যায় "বাঙালী" শীর্ষক একটি রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙালী মুসলিমের মনের *ক্ষোভ তাহার মধ্যে রূপ গ্রহণ করিয়াছে :*

"রাজনৈতিক দলাদলি যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে তা হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমাহিত পবিত্রতা, শান্তিময় আবহাওয়া আপনিই নষ্ট হয়ে যায়। পূর্ব্ব পাকিস্থানী ও পশ্চিম পাকিস্থানীর রাজনৈতিক পার্থক্য অর্থাৎ বাঙালী অবাঙালীর রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেও ঢুকিয়েছেন কতিপয় অবাঙালী। এতে আমরা সত্যি সত্যিই দুঃখিত। এই সমস্ত অবাঙালী সবাই প্রায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রীধারী যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানতম ডিগ্রীকেও অবিভক্ত বাংলার কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর সমান গণ্য করা হ'ত। সেই বিদ্যালয়ে ডিগ্রী নিয়েই তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানতম শিক্ষক নির্ব্বাচিত হতে পেরেছেন শুধু মাত্র বিভাগের জন্যই। তাঁরাই যখন এখানকার প্রধানতম ডিগ্রীধারীদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে দলাদলি সৃষ্টি করেন তখন তাঁদের শুধু বাঙালী বিদ্বেষই প্রকাশ পায়, অন্য কিছুই নয়। তাঁদের অনেকেরই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহর তাঁদের বাইরের পোষাক-পরিচ্ছদের বাইরে প্রকাশনীয় নয়। এদের সঙ্গে স্যুট ও টাইয়ের বিচার করলে আইনষ্টাইনকে নিকৃষ্টতম মূর্খ বললেও অন্যায় হবে না। এদের মনে রাখা উচিত ফ্যাসান দুরন্ত স্যুট-টাই বা আদবকায়দা-দুরন্ত পোষাকই জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিমাপ নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিমাপ অন্য কাজে। আমাদের অবাঙালী শিক্ষকরা যদি স্যুট-টাই ও superficial smartness-এর দিকে নজর না দিয়ে সত্যিকার জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি নজর দেন তা হলে তাঁদের বাঙালী বিদ্বেষই শুধু লয় পাবে না, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক বিভাগেও যথেষ্ট উন্নতি হবে।

* * *

"প্রাদেশিকতাকে আমরা সর্ব্বতোভাবে নিন্দা করি ; কিন্তু পাকিস্থানের অন্য প্রদেশের অধিবাসীরা যখন অহেতুক বাঙালী বিদ্বেষ ছড়িয়ে নিজেদের প্রাধান্য জাহির করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তখন আমরা সত্যিই হতভম্ব না হয়ে পারি না। পশ্চিম পাকিস্থানের সংবাদপত্রগুলো দেখা যাচ্ছে বাঙালী নাম শুনলেই আঁতকে ওঠেন। বাঙালীর চাকরীর বা প্রমোশনের কথা উঠলেই তাঁরা efficiency'র ধুয়া ধরে তাকে নস্যাৎ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেন। পশ্চিম পাকিস্থানী অনেক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের যে বিদ্যাবুদ্ধির বহর দেখেছি তাতে তাঁদের efficiency ফ্যাসান-দুরন্ত স্যুট-টাই বা আদবকায়দা-দুরন্ত পোষাকের মধ্যে নিহিত বলেই মনে হয়েছে ; মস্তিষ্কের efficiency কিছু আছে এমন ভাববার মত অবস্থা আমরা দেখতে পাই নি। সুদূর করাচীতে বসে যাঁরা বাংলার মুসলিমদের efficiency বিচার করতে যান তাঁদের মস্তিষ্কের তারিফ করতে হয়। তবে তাঁদের আমরা এইটুকু বলতে *পারি যে, পশ্চিম পাকিস্থানীরা শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশের* Substitute নন্ এবং মস্তিষ্ক ও যোগ্যতা তাঁদের একাধিকার (monopoly) নয় একথা তাঁরা যত শীঘ্র উপলব্ধি করতে পারেন ততই তাঁহাদের পক্ষে ও পাকিস্থানের পক্ষেও মঙ্গলকর।"

ভারতরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়

ভারতে স্বাস্থ্যখাতে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় সেই সম্পর্কে সাধারণের ধারণা জন্মাইবার উদ্দেশ্যে ১৯৪৬-৪৭ এবং ১৯৪৮-৪৯ সালের হিসাব নিয়ে প্রকাশ করা হইল। তালিকায় মাথাপিছু ব্যয়ের হিসাব উল্লেখ করা হইয়াছে।

	১৯৪৬-৪৭			১৮৪৮-৪৯		
	টা.	আ.	পাই	টা.	আ.	পাই
কুর্গ	১	৬	০	৩	০	০
মাদ্রাজ	০	৯	৫	০	১১	২
বোম্বাই	০	১৪	১১	১	৬	৯
পশ্চিমবঙ্গ	০	১১	২	০	১২	২
উত্তর প্রদেশ	০	৪	১০	০	৭	১
পূর্ব্ব-পঞ্জাব	০	৭	০	০	৮	৫
বিহার	০	৫	০	০	৬	৩
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	০	৩	১০	০	৫	১১
আসাম	০	৬	৫	০	৯	১
উড়িষ্যা	০	৬	৫	০	১২	৩
গড়	০	৮	৩	০	১০	১১

বোম্বাই রাজ্যে বাঁধ

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ সেদিন ময়ূরাক্ষী বাঁধের ভিত্তি-স্থাপন উপলক্ষে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তার মধ্যে বিহার রাজ্যের নাগরিকবর্গের ভাবিবার অনেক বিষয় আছে। তিনি এই বাঁধের কল্যাণে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের উভয়েরই কৃষির উন্নতি হইবে এই ভরসার কথা আমাদের শুনাইয়াছেন। তাঁহার ভরসা সার্থক হউক।

এই সম্পর্কে বোম্বাই রাজ্যের "কাকড়াপাড় বাঁধে"র বিবরণ পাঠ করিয়া আশান্বিত হইলাম। কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ সেই পরিকল্পনা সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন তাহা রূপ গ্রহণ করিলে, বোম্বাই রাজ্যের ভাগ্য খুলিয়া যাইবে। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। এই বিবরণ পাঠ করিয়া মনে হয় যে, বিদ্যুৎ উৎপাদনই এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ; সেচের উন্নতি ও নৌকা চলাচলের বিস্তৃতি গৌণ হইলেও আশাপ্রদ।

কাকড়াপাড় বাঁধ পরিকল্পনায় দুইটি শক্তিশালী বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই দুই কেন্দ্র স্থাপন সম্পন্ন হইলে বোম্বাই রাজ্যে দ্বিগুণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাইবে। বাঁধ পরিকল্পনার প্রথম দফার কাজ মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় জলশক্তি, সেচ ও নৌবহর কমিশনের তত্ত্বাবধানে কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

বোম্বাই রাজ্য কয়লার খনি-অঞ্চল হইতে বহু দূরে অবস্থিত হওয়ায় পাম্পের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে গেলে ব্যয় অনেক বেশী পড়ে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং তাহা সরবরাহ করিতে মোট ইউনিট প্রতি দুই পয়সা পড়িবে। ইহা শুধুমাত্র কয়লার খরচের চাইতেও কম।

তথাপি উপত্যকার বহুবিধ উন্নয়নের যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে কাকড়াপাড় বাঁধ তাহারই অংশবিশেষ। কেন্দ্রীয় জলশক্তি, সেচ ও নৌবহর কমিশন সম্প্রতি এই পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি সচিত্র পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

এই বাঁধের দরুণ যে জলাশয়ের সৃষ্টি হইবে তাহা আকারে বাখড়া ও হীরাকুদ বাঁধের পরই বৃহত্তম হইবে। ইহা হইতে যে সেচের ব্যবস্থা করা হইবে তাহাতে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টন অধিক খাদ্য ও ১৬ হাজার টন অধিক তুলা উৎপন্ন করা যাইবে। ইক্ষুচাষের জন্যও এত অধিক জমি থাকিবে যে সেই জমির ইক্ষু দিয়া ছয়টি চিনির কল চালান যাইবে। এই বাঁধের সাহায্যে বন্যাও নিয়ন্ত্রিত করা চলিবে এবং সমুদ্র হইতে ৩ শত মাইল পর্য্যন্ত নৌবহরের উপযুক্ত হইবে।

কাশ্মীর-কথা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের পক্ষ হইতে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানকল্পে একটি নূতন প্রস্তাব সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের স্বস্তি পরিষদে পেশ করা হইয়াছে। তার মধ্যে একটি সর্ত্ত এই যে, রাজ্যের গণভোটের সময়ে কোন অঞ্চলে যদি কোন সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকে তবে তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্রে—ভারত বা পাকিস্থানে যোগদান করিতে পারিবে। অর্থাৎ, কাশ্মীর বিভাগের ব্যবস্থা হইল।

এদিকে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও ব্রিটেনের সংবাদ-পত্রের অধিকাংশ পণ্ডিত নেহরুর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিতেছে। "ওয়াশিংটন পোষ্ট" ত বলিয়া বসিয়াছে যে, "পণ্ডিত নেহরু পাকিস্থানের বিরুদ্ধে অর্থনীতিক যুদ্ধ চালাইতেছেন।"

ইহা সম্পাদকীয় মন্তব্য নয়; ডোরিস ক্লিসল নাম্নী ব্যাখ্যাকারিণীর টিপ্পনী—সপ্তাহে যাহা একবার প্রকাশিত হয়। এই মার্কিনী মহিলা আবার ক্ষেপিয়া বলিতেছেন যে, "মার্কিনী নীতির বিপক্ষতা করিয়া পণ্ডিত নেহরু নিজের বিলাসমত খাদ্যশস্য উৎপাদনের জমি পাট ও তুলা উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করিতেছেন; ইহা চড়া দামে বিদেশে বিক্রয় করিবেন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট খাদ্যশস্যের জন্য হাত পাতিবেন। আমাদের খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত, তাহা সম্ভব হইয়াছে আমাদের বিজ্ঞানের কল্যাণে, আমাদের বাস্তববাদের (materialism) জন্য যাহা এশিয়া ঘৃণা করে।"

কাশ্মীর সম্বন্ধে ভারতবাসীর, বিশেষতঃ কাশ্মীরী হিন্দুর, মনোভাব দোদুল্যমান। দিল্লীর "অর্গানাইজার" পত্রিকা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক মণ্ডলীর মুখপত্র। তার ৭ই ফাল্গুন সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তার প্রতিপাদ্য বিষয়ও কাশ্মীর বিভাগের পরোক্ষ সমর্থন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, কাশ্মীর রাজ্যের পূর্ব্বপ্রদেশে হিন্দুগরিষ্ঠতা বিদ্যমান। সেই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত দুইটি অঞ্চল আছে—ভাদরওয়া ও কিস্তওয়ার। প্রথমটির পরিধি দৈর্ঘ্যে ৩০ মাইল, প্রস্থে ১০ মাইল। ভাদরওয়ার চেনাব নদীর শাখা নীরু নদীর উপত্যকায় অবস্থিত; এই নামের অর্থ "সুন্দর স্রোত"। এই অঞ্চল সমুদ্রের উপকূল হইতে ৫,০০০ মাইল উর্দ্ধে অবস্থিত, যেমন কাশ্মীর উপত্যকা। ইহার অল্প দূরে ১০,০০০ মাইল উর্দ্ধে অবস্থিত "কৈলাস কুণ্ড"। এই অঞ্চলের সম্পদ দেবদারু গাছ; ভূতত্ত্ববিদ্‌রা নাকি বলেন যে এখানকার মাটির নীচে প্রচুর অভ্র আছে।

কিস্তওয়ার উপত্যকা চেনাব নদীর সংলগ্ন; উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর উপত্যকা ও উত্তরে লাডাক পর্য্যন্ত ইহা বিস্তৃত। কিস্তওয়ার "কষ্ট-নিবার" এই শব্দের অপভ্রংশ। এই দুই অঞ্চল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে কাশ্মীর উপত্যকাকে হার মানায়। ভাদরওয়ার ফল কাশ্মীর উপত্যকার ফল অপেক্ষা সুমিষ্ট ও আকারে বড়। ইহা চম্বা রাজ্যের সঙ্গে হাঁটা-পথে সংযুক্ত; চম্বা আজ হিমাচল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। আর একটি যুক্তি হইল "রাজৌরী"; "রাজতরঙ্গিণীতে" যার উল্লেখ আছে। ইহা কাশ্মীর উপত্যকার বহির্দেশে অবস্থিত। ইহা ১৯৪৭ সালে হিন্দুর নিকট নূতন করিয়া পবিত্র হইয়াছে। প্রায় সহস্র হিন্দু নারী এখানে "জহর" ব্রত অবলম্বন করিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন।

এই সব যুক্তির পিছনে ভাদরওয়া ও কিস্তওয়ার এই দুই অঞ্চলের ইতিহাস বিশ্লেষণের প্রয়োজন বুঝিতে কষ্ট হয় না। কাশ্মীর বিভাগ কি কাশ্মীর রাজ্যের হিন্দু নাগরিকের গ্রহণীয়? এই ব্যবস্থার বিপদ আছে। ভারতরাষ্ট্রের সাড়ে তিন কোটি মুসলমান বিপন্ন হইবে। সেইজন্যই শেখ আবদুল্লা ধর্ম্মের ভিত্তিতে কাশ্মীর বিভাগের বিপক্ষে। কিন্তু তিনি কি কাশ্মীরের মুসলমান সম্প্রদায়কে স্বমতে আনয়ন করিতে পারিবেন? —যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন তাঁহার বিরুদ্ধে জোট পাকাইতেছে।

দিল্লীর গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা

"দিল্লী রাজ্যের ৩০৫টি গ্রামের ১,২৫,০০০ জন নিরক্ষরকে লিখিতে ও পড়িতে শিখাইবার উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ন্মেণ্টের শিক্ষা-দপ্তর ও দিল্লী রাজ্যের শিক্ষা-বিভাগ এক নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী দিল্লী নগরীর ১২ মাইল দূরবর্ত্তী আলীপুর গ্রামের সন্নিকটে একটি পুরাতন ভবনে গত ডিসেম্বর (১৯৫০) মাসে জনতা কলেজ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। কেন্দ্রটি খোলার সঙ্গে সঙ্গে আলীপুর গ্রামের নিকটবর্ত্তী ১০টি গ্রামের কত সংখ্যক লোকের লেখাপড়া শিখান আবশ্যক, সে বিষয়ে খোঁজখবর লওয়া হইতেছে। একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই জনগণের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন সম্ভব—এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই দিল্লী রাজ্যে এই পরিকল্পনার গৃহীত হইয়াছে। শুধু নিরক্ষরতা দূর করাই উক্ত পরিকল্পনার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; লেখাপড়া শিখিয়া জনগণের যাহাতে নাগরিক, আর্থিক ও সামাজিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আত্মশক্তি উদ্বোধিত হয় তাহাই এই পরীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

নিরক্ষরতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে প্রতি গ্রামে ১৫ জন হইতে ২০ জন শিক্ষক সাময়িকভাবে অবস্থান করিয়া ১৪ হইতে ৪৫ বৎসর বয়স্ক সকল নিরক্ষরকে লিখিতে ও পড়িতে শিখাইবেন। যাঁহারা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে- ছেন তাঁহাদের প্রতি তিন জনের মধ্যে একজনকে দেড় মাসের জন্য উক্ত কার্য্যে নিয়োগ করা হইবে। ফলে শিক্ষকগণও অধ্যাপনা বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। দিল্লীতে শিক্ষিত প্রাথমিক শিক্ষকদের অভাব হইবে না। কারণ উক্ত রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য তিনটি ট্রেনিং কলেজ রহিয়াছে।

নিরক্ষরেরা যাহাতে অতি সহজে পড়িতে শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে আয়বৃদ্ধি, কৃষিকার্য্য, কুটিরশিল্প, গৃহনির্ম্মাণ, পশুপালন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নাগরিকতা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে তাহাদের জন্য বিচিত্র পুস্তক রচিত হইতেছে। বয়স্ক নিরক্ষরদের জন্য পুস্তক রচনা কার্য্যে ভারত গবর্ন্মেণ্টকে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও কৃষ্টি সংস্থা ভারতে একজন বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করিয়াছেন।

যে পুরাতন ভবনে জনতা কলেজ খোলা হইয়াছে তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাচীর দুর্গের ন্যায় সুরক্ষিত। দালানে লেখাপড়া, কুটিরশিল্প, কারখানা, মালপত্র রাখা ও বসবাসের জন্য যথেষ্ট স্থান রহিয়াছে। তাহা ছাড়া শিক্ষক ও ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য কতকগুলি তাঁবু উহার উপকণ্ঠে খাটান হইয়াছে।

জনতা কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রদের ভরণপোষণের জন্য কলেজ-সংলগ্ন ৬০ একর জমিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাদ হইতেছে বলিয়া ছাত্রেরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ সম্পর্কেও কার্য্যকরী জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেছে।

কলেজ ভবনটির মেরামত কার্য্য শিক্ষক ও ছাত্রগণ নিজেরাই করিবেন এবং উহার ফলে পল্লী অঞ্চলের পুরাতন গৃহাদির সংস্কার কার্য্য সম্পর্কেও তাহাদের সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইতেছে। কলেজের ছাত্রদিগকে নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্য্যে নিয়োজিত করা হইবে বলিয়া কালক্রমে আলীপুর গ্রামাঞ্চলে সামাজিক শিক্ষা ও গ্রাম্য উন্নয়নমূলক বিভিন্ন গবেষণাগার গড়িয়া উঠিবে।

যাহারা শিক্ষা গ্রহণান্তে স্ব-স্ব গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শিক্ষকতা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে, প্রথমে এইরূপ ছাত্রই জনতা কলেজে ভর্ত্তি করা হইবে। প্রতি দলে ৫০ জন ছাত্র ২ হইতে ৩ মাসকাল শিক্ষা গ্রহণ করিবে। শিক্ষা-কার্য্য প্রথমতঃ ১০টি গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও আগামী ৩ বৎসরের মধ্যে দিল্লী রাজ্যের ৩০৫টি গ্রামে অর্থাৎ প্রায় ৫৭৪ বর্গ মাইল এলাকায় উহা প্রসার লাভ করিবে। ঐ কার্য্য খুব বেশী কষ্টকরও হইবে না; কারণ রাজ্যটি বিশেষ ক্ষুদ্র বলিয়া উহার কোন গ্রামই রাজধানী হইতে ২৫ মাইলের বেশী দূরে অবস্থিত নয়।

মেলার সাহায্যে শিক্ষা

গত বৎসর হইতে দিল্লীতে মেলার সাহায্যে জনগণকে শিক্ষাদান কার্য্য সুরু হইয়াছে। প্রতিটি মেলাতে ৪টি মোটর ভ্যান থাকে। একটি মোটর ভ্যানে একটি পাঠাগার থাকে; দ্বিতীয় ভ্যানটিতে থাকে একটি স্বয়ংপূর্ণ ছায়াচিত্র ও অভিনয়ের সাজসরঞ্জাম এবং অবশিষ্ট অন্য দুইটি ভ্যানে অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদি থাকে, এবং চলমান মেলায় ছায়াচিত্র প্রদর্শন ও বক্তৃতা প্রদান করিয়া বেড়ায়।

শিক্ষকের দল

মোটর বাহিত মেলা স্থানান্তরে গমনের পরেই ১৫ হইতে ২০ জন শিক্ষকের এক একটি দল আসিয়া উপস্থিত হয়। তাঁহারা স্থানীয় লোকদিগকে কাজের সময়ে বিরক্ত না করিয়া গ্রামবাসীর জীবনের নানা সমস্যা বুঝিতে চেষ্টা করেন; তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে উপদেশ দেন।"

এই বিবরণ পাঠ করিয়া একটি কথা মনে হইল। গ্রামাঞ্চল হইতে শিক্ষকবর্গ নিযুক্ত হইলেই এইরূপ আয়োজন ও উদ্যোগ সার্থক হইবে।

উৎকলের 'আদিম' জাতির উন্নতি

উৎকল ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অনুন্নত অঞ্চল বলিয়া পরিচিত ছিল। গত তিন বৎসরের মধ্যে কিন্তু সেই অখ্যাতি দূর করিবার জন্য আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যের নাগরিকবর্গ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তার পরিচয় তাঁহাদের অনেক কাজেই পাইতেছি। সম্প্রতি 'যুগান্তর' পত্রিকায় ১৫ই ফাল্গুন সংখ্যায়

উৎকলের 'আদিম' জাতিসমূহের উন্নতিকল্পে যাহা করা হইতেছে তার একটি সচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় রাজ্যের কর্তৃপক্ষ ও নাগরিকবর্গ এই বিষয়ে তাঁদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত রহিয়াছেন; শহর নগরের ঢক্কা-নিনাদের মধ্যে তাহা ডুবিয়া যায় নাই। তার বিবরণের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেরও অনেক শিক্ষা করিবার আছে। আমাদের মধ্যেও ত 'আদিম' জাতি আছে। তাঁদের উন্নতির জন্য কি করা হইতেছে, তাহা এখনও অজানিত। কিন্তু উৎকল আগাইয়া যাইতেছে।

নুয়াগাঁও আদর্শ আশ্রম

"কটক থেকে প্রায় আড়াইশো মাইল দূরে ফুলবনী জেলায় নুয়াগাঁওয়ে আদিবাসী খোণ্ড সম্প্রদায়ের বালক শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নুয়াগাঁও একটা চমৎকার জায়গা। সমুদ্র সমতল থেকে আড়াই হাজার ফুট উঁচুতে একটি পার্ব্বত্য উপত্যকার উপর অবস্থিত। মনোরম পরিবেশ। আদিবাসীদের নবজীবনের শিক্ষাপ্রদান কেন্দ্র হিসেবে জায়গাটি আদর্শস্থানীয়। এদের জীবন পরিবেশের মাঝখানেই এ ধরণের শিক্ষাকেন্দ্র আদিবাসীদের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে যে সুষ্ঠুরূপে সার্থক করে তুলবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নগর ও গ্রামের মধ্যে এই সেতুবন্ধ রচনা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য সারা উড়িষ্যায় যে আটটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে তাদের মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ। এই শিক্ষা কেন্দ্রটিতে ৭০ জন খোণ্ড শ্রেণীর আদিবাসী বালক শিক্ষা লাভ করছে। কৃষিকাজ, মিস্ত্রীর কাজ, তাঁত বোনা, পোলট্রি, মৌমাছি পালন, বেতের কাজ, মাদুর নির্ম্মাণ, পুতুল নির্ম্মাণ প্রভৃতি ছাড়াও সাধারণভাবে মধ্য উচ্চ ইংরেজীর মান পর্য্যন্ত এদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এদের খাওয়া, থাকা, কাপড়-জামা প্রভৃতি সমস্ত ব্যয়ই সরকার বহন করছেন।"

"বিদ্যালয়ের সংলগ্ন পনেরো একর জমিতে প্রধান শিক্ষক শ্রীপাথানি মিশ্র ও তাঁর সুযোগ্য সহকর্ম্মীদের সহযোগিতায় ছাত্ররা চমৎকার একটি শাকসব্জি ও ফুলের বাগান তৈরি করেছে। বাগানটির প্রত্যেকটি গাছপালা ও ফুল-ফলের দিকে তাকালেই শিক্ষার্থীদের যত্ন, শ্রম ও আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। মাটির মানুষ এই আদিবাসী সম্প্রদায় সত্যিকারের জীবন দর্শনের সন্ধান পেয়েছে।"

আদর্শ পরিবেশ

"এই খোণ্ড সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা আজ তাদের গ্রামাঞ্চলেই নবজীবনের ভিত্তি রচনা করেছে, অথচ এদের পূর্ব্বপুরুষরা প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে আদিম মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রা যাপন করে গেছেন। এদের এই উন্নয়ন কার্য্যে বিশেষ উৎসাহী ও তৎপর হচ্ছেন জেলা ওয়েলফেয়ার অফিসার শ্রীজে. কে. দাস, শ্রীঅলেখ পাত্র ও শ্রীবাসিরাম পাত্র। এঁদের সহযোগিতা ও উৎসাহের ফলেই নুয়াগাঁও আশ্রম অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

"এ পর্য্যন্ত ১৪০টি স্কুল স্থাপিত হয়েছে অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য। এই সব স্কুলে তাঁত বোনা, উদ্যান নির্ম্মাণ, স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীদের প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করা হয়। এসব আশ্রমের মধ্যে, বাপুজী সেবাশ্রম, বেরভাকলা সেবাশ্রম, হুদিয়া সেবাশ্রম, বালুমহো সেবাশ্রম, পাকনাড গ্রাম সেবাশ্রম, রাণিপাথার ও ঝাদারিদি সেবাশ্রম উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক আশ্রমেই ৪০।৫০ জন করে শিক্ষার্থী অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে শিক্ষা লাভ করছে।"

অগ্রগতির পথে

"উড়িষ্যার দুরধিগম্য পার্ব্বত্য অঞ্চলের নিভৃত গ্রাম্য পরিবেশে এই যে সুপ্ত মানুষের দল জাগছে, তাদের চোখে আলো এসে লাগছে, এটাই নবজীবনের সূত্রপাত। সমস্যাক্লিষ্ট ভারতবর্ষ যদি এমনি করে আজ গ্রামের দিকে তাকায় তা হলে যে জনগণেশের ঘুম ভাঙবে তাতে সারা ভারতবর্ষেরই কল্যাণ হবে। উড়িষ্যার আদিবাসী মন্ত্রী শ্রীরণজিৎ বরিহা সে পথের সন্ধানেই অনগ্রসর আদিবাসীদের গ্রামগ্রামান্তরে নবজীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহান্বিত।"

এই অগ্রগতির দিনে পশ্চিমবঙ্গ কোথায়?—এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠিবে? মন্ত্রী শ্রীনীহারেন্দু দত্তমজুমদার তার কি উত্তর দিবেন?

হিমালয় অঞ্চলের রাজ্যপুঞ্জ ও ভারতরাষ্ট্র

সম্প্রতি চীন, তিব্বত ও নেপালে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে ভারতের পক্ষে তাহার উত্তর সীমান্তের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখার অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে এই অঞ্চল সকল সময়েই ভারতের দ্বাররক্ষক হইয়া রহিয়াছে।

উহার উচ্চতম অঞ্চলগুলির অধিকাংশই নেপালের অপর পারে অবস্থিত। হিমালয় অঞ্চলের রাজ্যসমূহে যাহাতে শান্তি ও স্থায়িত্ব রক্ষিত হয় সেজন্য ভারত স্বভাবতঃই উদ্বিগ্ন।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত ভারতবাসী বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করিতে চায়; তাহারা তাহাদের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে; সেই সঙ্গে ইহাও চায়—ঐ রাষ্ট্রগুলি শক্তিশালী ও প্রগতিশীল হইয়া গড়িয়া উঠুক।

ভুটান

ভুটানের আয়তন ১৮ হাজার বর্গমাইল। মধ্য হিমালয়ের দক্ষিণাঞ্চলের নিম্নভূমির দিকে উহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে ১৯০ মাইল দীর্ঘ। ১৮৬৫ সালে এবং ১৯১০ সালে তৎকালীন ভারত ও ভুটান গবর্ণমেন্টদ্বয়ের মধ্যে যে সন্ধি স্থাপিত হয় সেগুলির ফলেই ভারত-ভুটান সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ১৯৪৯ সনের আগষ্ট মাসে ভুটানের সহিত ভারতের একটি স্থায়ী শান্তি ও

সৌহার্দ্যপূর্ণ সন্ধি স্থাপিত হয়। ঐ সন্ধির ফলে স্থির হয় যে, ভারত ভুটানের আভ্যন্তরীণ পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করিবে না, এবং ভুটান তাহার বহির্দেশীয় ব্যাপারে ভারতের পরামর্শে চালিত হইবে। যত দিন ঐ সন্ধি অক্ষুণ্ণ থাকিবে তত দিন ভারত-সরকার ভুটান-সরকারকে প্রতি বৎসর ৫ লক্ষ টাকা করিয়া প্রদান করিবে। সদিচ্ছার নিদর্শন-স্বরূপ ভারত সরকার দেওয়ানগিরি নামক ৩২ বর্গ মাইল আয়তনের একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ড ভুটানকে ফিরাইয়া দিতে সম্মত হইয়াছেন।

সিকিম

নেপাল ও ভুটানের তুলনায় সিকিম ক্ষুদ্র রাজ্য। এই রাজ্যটি পূর্ব্ব হিমালয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার আয়তন ২,৮১৮ বর্গমাইল; জনসংখ্যা প্রায় ১,২০,০০০ এবং বাৎসরিক রাজস্ব ৫ লক্ষ টাকা। সিকিমে ৩টি রাজনৈতিক দল আছে—সিকিম ষ্টেট কংগ্রেস, রাজ্যপ্রজা সম্মেলন ও জাতীয়তাবাদী দল।

১৮১৭ সালে সিকিমের সহিত ভারতের রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ঐ সম্পর্ক ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে পরিচালিত হইত। রাষ্ট্রের ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তাহা স্থিতাবস্থা চুক্তির দ্বারা চালিত হয়। ঐ চুক্তির ফলে সাবেক ব্যবস্থাই অটুট থাকে। গত ডিসেম্বর মাসে উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে একটি নূতন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

১৯৫০ সালে মার্চ্চ মাসে ভারত-সরকার ও সিকিমের মহারাজ-কুমারের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি সাময়িক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। ঐ বৎসর ৫ই ডিসেম্বর তারিখে একটি নূতন চুক্তি স্থির করা হয়। ঐ চুক্তিবলে সিকিম ভারতের রক্ষণাধীনে থাকিবে, তবে তাহার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার থাকিবে। রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা, পররাষ্ট্র এবং যোগাযোগ-ব্যবস্থার ভার ভারত-সরকারের হাতে আছে। ঐ রাজ্যের মধ্যে যে কোন স্থানে সৈন্য-স্থাপনের ক্ষমতা ভারত-সরকারের থাকিবে। সিকিমের উন্নয়নের প্রয়োজনে ভারত-সরকার প্রতি বৎসর ৩ লক্ষ টাকা করিয়া ঐ রাজ্যকে দিতে সম্মত হইয়াছেন।

১৯৪৭ সালের আগষ্ট হইতে ঐ রাজ্যে কিছু কিছু রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা দেয়। ১৯৪৯ সালে ঐ আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠে। তখন রাজ্যের শাসনকর্ত্তার অনুরোধে ভারত-সরকার মিঃ জে. এস. লালকে সিকিমের দেওয়ানপদে নিযুক্ত করেন। সেই সময় হইতে তিনি উপদেষ্টা পরিষদের সাহায্যে শাসনকার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন।

নেপাল

সীমান্তের রাজ্যসমূহের মধ্যে নেপাল বৃহত্তম এবং উহার ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মধ্য হিমালয়ের দক্ষিণাঞ্চলের নিম্নভূমির দিকে নেপাল রাজ্য ৫২০ মাইল দীর্ঘ, উহার প্রস্থও অধিক নহে। ঐ রাজ্যের আয়তন ৫৬ হাজার বর্গমাইল, এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৫৫ লক্ষ।

১৭৯২ সালে ভারত ও নেপালের মধ্যে একটি বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অতঃপর ১৮১৫ সালে উভয় রাজ্যের মধ্যে আর একটি চুক্তি সম্পন্ন হয়। অতঃপর যে সকল চুক্তি, সন্ধি ইত্যাদি স্থিরীকৃত হইয়াছে সেগুলি সব ১৯২৩ সালের চুক্তিতে পাকাপাকি করা হয়। নেপালের সহিত ভারতের সম্বন্ধ সংস্কৃতি, জাতি ও ধর্ম্মগত। তাহা ১৯৫০ সালের শান্তি ও সৌহার্দ্য চুক্তি ও বাণিজ্য চুক্তির দ্বারা পুনরায় সুদৃঢ় করা হইয়াছে।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ নেপালে স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন চলিতেছে। নেপালের আভ্যন্তরীণ সংগ্রামে ভারত কঠোরভাবে তাহার নিরপেক্ষতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ১৯৫০ সালের ৬ই নবেম্বর নেপালের পরিস্থিতির মধ্যে একটা বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। নেপালের রাজা মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবন বীরবিক্রম শা দেব তাঁহার পরিজনবর্গসহ কাটমুণ্ডুস্থিত ভারতীয় দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তিন দিন পরে ভারতে আগমন করেন। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী নেপালের যুবরাজের তিন বৎসর বয়স্ক দ্বিতীয় পুত্রকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহাতে নেপাল কংগ্রেসের স্বায়ত্তশাসন সংগ্রাম প্রবলতর হইয়া উঠে। তাহার পরের ঘটনা ইতিহাসের অঙ্গ। মহারাজা রাজ্যে ফিরিয়া গিয়াছেন, প্রধানমন্ত্রী আত্মক্ষমতা সংযত করিয়াছেন। মনে হয় নেপালের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতে পারে।

তিব্বত

তিব্বত ভারতের আর একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র। এই রাজ্যের ঘটনাবলী সম্পর্কে ভারত বিশেষ উদ্বিগ্ন। যে সময় চীন সরকার তিব্বতের মুক্তির কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন তখন হইতে ভারত-সরকার ঐ ব্যাপারের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য পিকিংস্থিত রাষ্ট্রদূতের মারফত তাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া আসিয়াছেন। পুরাতন স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা অটুট থাকুক; ইহা ভারতের কাম্য। তাহার উপর ভারতবর্ষ চীনের সার্ব্বভৌমত্ব কখনও অস্বীকার করে নাই। তিব্বতের সহিত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য ভারত একান্ত উন্মুখ।

গত ২৫শে অক্টোবর চীন সৈন্য তিব্বতে প্রবেশ করে। ইহাতে সকলেরই মনে বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। কারণ ঐ সময় তিব্বতের প্রতিনিধিমণ্ডলী আলোচনার জন্য পিকিং রওনা হইয়া গিয়াছিলেন। পরদিন ভারত-সরকার চীন গবর্ণমেণ্টের নিকটে যে পত্র প্রেরণ করেন তাহাতে তাঁহারা তিব্বতের উপর চীনের বল-প্রয়োগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। ঐ

পত্রে আরও জানানো হয় যে, বিশ্বের বর্ত্তমান পরিপ্রেক্ষিতে চীন সৈন্যদের তিব্বত আক্রমণ একটি শোচনীয় ব্যাপার। উহা চীন দেশের স্বার্থের বা শান্তির পক্ষে অনুকূল নহে। ৩০শে অক্টোবর তারিখে চীন সরকার উত্তরে জানান যে, ভারত-সরকারের অভিমত তিব্বতস্থ চীন-বিরোধী বৈদেশিক শক্তিদ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। ভারত-সরকার চীন গবর্ণমেণ্টের এই জবাবের প্রতিবাদ করেন এবং দৃঢ়ভাবে জানাইয়া দেন যে, ভারতের বৈদেশিক নীতি সম্পূর্ণ নিজস্ব। উহার লক্ষ্য আন্তর্জ্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা এবং বিশ্বের বর্ত্তমান অশান্ত অবস্থার শেষ। তাহার পর যাহা ঘটিতেছে তাহা অনেকটা অজ্ঞাত, তাহা জল্পনা-কল্পনার খাদ্য যোগাইতেছে।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ কর্ত্তৃক পরিবেশিত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া দেওয়া হইল। ভারত-রাষ্ট্রের নাগরিকবর্গের পক্ষে তাহার গুরুত্ব অনুভব করার সময় আসিয়াছে। এখন আমাদের আত্মশক্তির অনুশীলনে অতন্দ্র দৃষ্টি দিতে হইবে।

কোরিয়া রণাঙ্গনে ভারতীয় সেবাব্রতী

কোরিয়া রণাঙ্গনে প্রায় ১৪ মাস হইতে এক দল ভারতীয় সেবাব্রতী যুদ্ধাহত সৈন্যসামন্তের সেবা করিতেছেন। গত ১৫ই ফাল্গুন 'মার্কিন বার্ত্তা' এই সংবাদটি পরিবেশন করিয়াছে।

"কোরিয়ার যুদ্ধে সেবাব্রতে নিযুক্ত ভারতীয় চিকিৎসক দলটি তাঁহাদের কাজের জন্য উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। কোরিয়ার সাধারণ নাগরিকবৃন্দ এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের সৈন্যগণ সকলেই ভারতীয় চিকিৎসক দলটির সেবাকার্য্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেছে বলিয়া "ভয়েস্ অব আমেরিকার" সংবাদদাতা রবার্ট লাশার লিখিয়াছেন :

অসামরিক কোরিয়াবাসীদের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত রাষ্ট্র-সঙ্ঘের "সিভিল এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কম্যাণ্ড টীম" নামক দলটির অধিনায়ক মেজর ডয়ল্ বলিয়াছেন যে, 'তাঁহার দলের সহিত ভারতীয় চিকিৎসকের দলটি খুব চমৎকার সহযোগিতার পরিচয় দান করিয়াছে। 'কিয়ং-সাং-পুকতো' এলাকায় চিকিৎসা সম্পর্কিত সেবাকার্য্যের সাফল্যের জন্য এই ভারতীয় সেবাব্রতী দলটির কৃতিত্ব কিছু কম নহে'।"

ভারতীয় সেবাব্রতী চিকিৎসক দলটির অধিনায়ক হইতেছেন মেজর ব্যানার্জ্জি। মেজর ব্যানার্জ্জির নিকট হইতে রবার্ট লাশার জানিতে পারিয়াছেন যে, প্রতি ছয় সপ্তাহ অন্তর তাঁহার দলটি অগ্রবর্ত্তী যুদ্ধাঞ্চল হইতে বিশ্রাম লইবার জন্য একবার তায়েগু শহরে ফিরিয়া আসেন। এই বিশ্রাম গ্রহণের সময়েও তাঁহারা তায়েগু শহরের অধিবাসীদের নানা ভাবে এবং বিনা মূল্যেই সেবা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে এখানকার হাসপাতালে ৮ জন ভারতীয় অস্ত্রচিকিৎসক (সার্জ্জন) স্থানীয় চিকিৎসকগণকে অস্ত্রোপচার-কার্য্যে সাহায্য করিতেছেন।

কোরিয়ার যুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত এই চিকিৎসক দলটিকে ভারত-সরকার গত নবেম্বর মাসে কোরিয়ায় পাঠাইয়াছিলেন। ছুইটি অস্ত্রচিকিৎসক এবং একটি দন্তচিকিৎসক দল লইয়া এই সেবাব্রতী দলটি গঠিত।

ভারতরাষ্ট্র ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে মৈত্রী-চুক্তি

১৭শে ফাল্গুন ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রের রাজধানী জাকার্ত্তা হইতে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রেরিত হইয়াছে : "ইন্দোনেশিয়া অদ্য ভারতের সহিত প্রথম মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করিয়াছে। এই চুক্তিতে উভয় দেশের স্থায়ী কল্যাণ, শান্তি ও বন্ধুত্বের ব্যবস্থা হইয়াছে।"

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের শেষে ইন্দোনেশীয় পররাষ্ট্রসচিব ডাঃ মহম্মদ রোয়েম ভারতীয় দূত ডাঃ পি. সুব্বারায়নের সহিত করমর্দ্দন করিয়া উভয় দেশের সাংস্কৃতিক ও আত্মিক বন্ধনের কথা এবং বিশেষ করিয়া ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারতের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন।

ডাঃ সুব্বারায়ন বলেন, "স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া দ্বারা ভারতের সহিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ভারতের পক্ষে গর্ব্বের বিষয়।"

ডাঃ রোয়েম তাঁহার ভাষণে বলেন যে, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে মৈত্রীচুক্তি উভয় দেশের সখ্য, পরস্পরের প্রতি মর্য্যাদাবোধ এবং শান্তি ও বন্ধুভাবে অবস্থানের সঙ্কল্পের দ্যোতক হইবে। যত বৎসর যাইবে, তত আমাদের উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও প্রগাঢ় হইয়া উঠিবে বলিয়া আশা করা যায়।

ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা অর্জ্জনে ভারতের অবদানের কথা উল্লেখ করিয়া ডাঃ রোয়েম বলেন যে, ১৯৪৫ সালেই ভারত ইন্দোনেশিয়ার দাবির প্রতি সমর্থন জানাইয়াছিলেন। গান্ধী ও নেহরুর ন্যায় বিরাট পুরুষদের দ্বারা পরিচালিত ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন হইতেই ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রাম প্রেরণা লাভ করিয়াছিল। গান্ধী ও নেহরুর নাম ইন্দোনেশিয়ার ঘরে ঘরে মানুষের মুখে ফেরে।

ভারতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীন সত্তা প্রতিষ্ঠার পক্ষে যথেষ্ট চিন্তা ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ১৯৪৮ সালে দিল্লী নগরীতে সর্ব্ব-এশিয়া সম্মেলন আহ্বান করিয়া তিনি এই দাবির সমর্থনে সর্ব্ব-এশিয়ার দেশসমূহকে সংগঠিত করেন। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি সেইজন্য এই দাবি স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। সেই কথা, আশা করি, এখনও ইন্দোনেশিয়ার নেতৃবর্গের স্মরণে আছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এরূপ উপকারের মূল্য বেশী নয়। ইন্দোনেশিয়া ইহার ব্যতিক্রম হইলে সুখী হইব।

জাপানকে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত

করষ্টার ডুলাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের বিশেষ

দূতরূপে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। তিনি ৬ই ফাল্গুন তারিখে অষ্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরায় অষ্ট্রেলিয়ার ও নিউজিল্যাণ্ড রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদ্বয়ের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করিয়াছিলেন। আলোচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল পরাজিত জাপানের সঙ্গে সন্ধির সর্ত্তাদি স্থির করা। এবং চার দিন আলোচনার ফলাফল একটি যুক্ত বিবৃতিতে তাঁহারা সকলকে জানাইয়া দিয়াছেন। এই বিবৃতি পাঠে জানা যায় যে, এই তিন রাষ্ট্র এমন কিছু করিবেন না যার ফলে জাপানীদের জঙ্গীভাব আবার মাথা তুলিতে পারে; জঙ্গীবাদের (militarism) পুনরুজ্জীবন হইতে পারে। অথচ এই রাজনীতিক ধুরন্ধর তিন জন বলিতেছেন, তাঁহারা আশা করেন যে জাপানীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের সনদ মানিয়া গণতন্ত্র রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যোগদান করিবে; বিনা যুদ্ধে সকল বিবাদ মীমাংসার সর্ত্ত স্বীকার করিয়া লইবে।

এই যোগদানের উদ্দেশ্য বুঝিতে কষ্ট হয় না। পূর্ব্ব-এশিয়ায় কম্যুনিষ্ট অগ্রগতি রোধ করিতে জাপানীদের সাহায্যের প্রয়োজন। জাপানী জঙ্গীভাব তাহাতে প্রশ্রয়লাভ করিতে পারে এই আশঙ্কা ফরষ্টার ডুলাস, মিঃ পার্সি স্পেণ্ডার ও মিঃ ডইজের মনে যে উদয় হয় নাই তাহা বলা যায় না। জার্ম্মান জাতিকে লইয়া ইউরোপ-খণ্ডেও এই সমস্যা দেখা দিয়াছে। এই দুর্দ্ধর্ষ জাতিকে সংযত রাখিতে হইবে; অথচ তাহাদিগকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিতে হইবে। এই পরস্পর বিরুদ্ধ নীতির সমাধান সম্ভব ছিল যদি জার্ম্মানীকে দুই ভাগ না করা হইত। পট্সড্যাম চুক্তির কল্যাণে জার্ম্মান জাতিকে করা হইয়াছে দ্বিধা-বিভক্ত। এই ব্যবস্থা কোন সজাগ জাতি স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। জার্ম্মানরাও পারে নাই। তাহারা অপেক্ষায় আছে কখন বিজয়ী শক্তিবর্গ স্ব-স্ব স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে তাহাদের দ্বারস্থ হইবে। সেই সুযোগ আসিয়াছে। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহ ও রাশিয়া একমত হইতে পারিতেছে না।

অর্থাৎ জাপানের যে সমস্যা, জার্ম্মানীরও সেই সমস্যা। আপাততঃ ইহার সমাধানের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। কিন্তু মানব বুদ্ধিও নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই।

রাশিয়া বসিয়া নাই। এই সম্বন্ধে তাহার পক্ষ হইতে এই অঞ্চলের শান্তি-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। গত ১৬ই ফাল্গুন মিঃ ডুলাস ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে জাপ-শান্তি চুক্তি সম্বন্ধে "আমি আবার মঁসিয়ে মালিকের সঙ্গে দেখা করিব।" এই ঘোষণার উত্তরে মঁসিয়ে মালিক বলিয়াছেন:

"মিঃ ডুলাস ১৬ই ফাল্গুন আমার সঙ্গে যে আলাপের কথা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমি একথা বলা প্রয়োজন মনে করি যে, জাপ-শান্তিচুক্তি সম্বন্ধে আমি মিঃ ডুলাসের সঙ্গে কোন আলোচনা চালাই নাই। এ-বিষয়ে আমার নিকট তাঁহার বাণী সম্বন্ধে এবং জাপ-শান্তিচুক্তি সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা করিতে আমার আগ্রহ আছে বলিয়া তিনি যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।"

সোভিয়েট রাষ্ট্রের পূর্ব্ব-এশিয়ায় শান্তির জন্য আগ্রহের প্রমাণ মঁসিয়ে মালিকের উত্তরে পাওয়া যায়!

আমেরিকার আধ্যাত্মিক সম্পদ

"যন্ত্রযুগের প্রভাব আমেরিকাকে তার আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার হইতে একেবারে বঞ্চিত করে নাই। উচ্চাঙ্গের শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি তাহার আকর্ষণ এবং আধ্যাত্মিক গভীরতার প্রতি শ্রদ্ধা আমি লক্ষ্য করিয়াছি।"

"কনসার্ট হলে উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীত শুনিবার প্রত্যাশায় এবং শিল্প-সংগ্রহশালায় প্রবেশের জন্য অপেক্ষমান জনতার সুদীর্ঘ সারি আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"

প্রখ্যাত মিশরীয় পণ্ডিত ডক্টর আজিজ সুরীয়ল আতিয়া এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে উক্তরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি আলেকজান্ড্রিয়ার ফারুক-বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যযুগীয় ইতিহাসের অধ্যাপক। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়েও পূর্ব্বে তিনি অধ্যাপনা করিয়াছেন। গত বৎসর তিনি কায়রোর দক্ষিণ অঞ্চলে অতি প্রাচীনকালের লেখা এক তালপাতার পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন।

প্রাচীন আরবী পাণ্ডুলিপির অতি-ক্ষুদ্রাকৃতি যে সব ফটোগ্রাফ (মাইক্রো-ফিল্ম্) তোলা হইয়াছে সেই সব যথাযথ রূপ সম্পাদন করিবার জন্য ডাঃ আতিয়াকে মার্কিন কংগ্রেস-লাইব্রেরি হইতে একটা বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। এই বৃত্তির সাহায্যে তিনি ছয় মাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করিবেন।

"পৃথিবীকে প্রচুর বস্তু-সম্পদ যে আমেরিকা দান করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই; এই বস্তু-সম্পদের অতি বিপুল পরিমাণের পরিমাপ করিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে অপর সম্পদের দানও বিশ্ব-ভাণ্ডারে আমেরিকা কিছু কম করে নাই।"

হলিউডের তৈরি ছায়াচিত্রাদি দেখিয়া সাধারণতঃ আমেরিকা সম্বন্ধে যে রকম ধারণা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়া তাঁহার সেই ধারণা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। মার্কিন শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসঙ্গে ডক্টর আতিয়া বলেন: "মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আমার বরাবরই খুব উচ্চ ধারণা ছিল। মার্কিন শিক্ষার যথার্থ মূল্য আমি ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করিয়াছি এবং আমার কতিপয় ছাত্রকে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য মিশর হইতে মার্কিন রাষ্ট্রে পাঠাইয়াছি।"

বিদেশী অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বিদেশীদের সহিত আমেরিকাবাসীদের আলাপ পরিচয় করিবার আগ্রহ খুব বেশী। ডক্টর আতিয়া বলেন, "বিদেশের চিন্তাধারা এবং আধ্যাত্মিক মর্য্যাদার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও বোঝাপড়া করিবার জন্য মার্কিন অধিবাসীরা বিশেষ উৎসুক।"

সঙ্কেত ঃ রবীন্দ্রনাথ—রাজা

শ্রীপ্রিয়তোষ ভট্টাচার্য্য

রূপক সৃষ্টির মূলে যে বীজ নিহিত রহিয়াছে সেই বীজ হইতেই সঙ্কেত উদ্ভিন্ন হইলেও উহারা পরস্পর ভিন্নধর্মী। একটি স্তরের রূপের মাধ্যমে অন্য স্তরের আর একটি রূপের ইঙ্গিতদানই রূপকের প্রধান বৈশিষ্ট্য, এবং ইংরেজী allegory [এলেগরি] শব্দটি যে অর্থ বহন করে তাহার একটি বাঁধাধরা সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে। তাহার আঙ্গিকটি আলঙ্কারিক রীতিসমন্বিত ও বুদ্ধিপ্রধান হইলেই চলিয়া যায়; কল্পনার অমিত অবকাশ সেখানে বড় বেশী থাকে না। শুধু নিরূপিত ও সীমাবদ্ধ আয়তনের ভিতর তত্ত্বকে প্রকাশ করিবার জন্য যতটুকু ইঙ্গিতপ্রধান তথ্যের প্রয়োজন তাহার সমাবেশ করিলেই 'এলেগরি'র কাজ সুসম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু সঙ্কেতময়ী রসলক্ষ্মী তাহাতে আদৃতা হন না। তাঁহার পরিবেশ কিছু রহস্যময় এবং পরিধিও বিস্তৃততর। সেই জন্য সাঙ্কেতিকতা বা symbolism রূপক হইতেও প্রগাঢ় এবং ব্যাপক। প্রথমটিতে বহিঃপর্য্যালোচনার অবকাশ কম থাকে বলিয়াই অন্তরলোক উদ্ঘাটিত হয় আর দ্বিতীয়টিতে দৃশ্যলোক স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া উহার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতার তন্ময়তা হারাইয়া ফেলে।

ইহার কারণও সুস্পষ্ট। প্রস্তাবিত বিষয়টিকে ঘুরাইয়া বলিলেও রূপকের প্রকৃত অর্থটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে আমাদের বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। রূপককার যাহা বলিতে চান তাহা হয় একটি নিরেট তথ্যবিশেষ, নয় তো বা উপদেশাত্মক কিছু। উদ্দেশ্য হয়ত আমাদের প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার কোন ত্রুটির ফাটল বাহিয়া উহার আমূল সংস্কারের নির্দ্দেশ দেওয়া, অথবা পারিপার্শ্বিক অব্যবস্থাকে আয়ত্তে আনিবার একমাত্র যুক্তিস্বরূপ চারিত্রিক উন্মেষের প্রয়োজনীয়তাকে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা এবং এই উদ্দেশ্যটিকেই কৌশলে আবরিত রাখিয়া বহিরবয়বটিকে সরস ও প্রাঞ্জল করাতেই রূপকের শিল্প সার্থক হইয়া উঠে। কিন্তু যেই আবরণটি উন্মোচিত হইল অমনি উহার অভ্যন্তরে নিহিত অর্থটি অনায়াসলভ্য হইয়া পড়িয়াই অতি পরিচ্ছিন্ন ও স্থূল হইয়া গেল।

কিন্তু সঙ্কেতের ক্ষেত্রে এই রসবস্তুটি থাকে অক্ষুণ্ণ এবং উহার রহস্যের নিগূঢ়তাও বুদ্ধির আলোকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়া পড়ে না। সঙ্কেতের রাজ্যটি এমনই রহস্যঘন যে, কল্পনার মুক্ত অশ্ব সবেগে ছুটাইয়াও তাহার মর্ম্মোদ্ঘাটন সর্ব্বত্র সম্ভব হইয়া উঠে না। অথবা মাধুরী ধরা না দিয়া কল্পনার দূতীকে শুধুই চমকে ঝলকে দেখা দিয়াই দূরে মিলাইয়া যায়। তখন সেই অপ্রাপণীয়ের বেদনাই মনোজগতে জাগাইয়া তুলে এক সূক্ষ্ম অনুরণন এবং সেই রণনের পরিণতিতে অনুভূত হয় একটি মধুর রসাস্বাদ। রসের এই পূর্ণতার ইঙ্গিতেই সঙ্কেত সুন্দর ও সার্থক হইয়া উঠে।

বস্তুতঃ রূপক হইতে সঙ্কেতের সাহায্য লইয়া সাহিত্যকে রসোত্তীর্ণ করিতে হইলে সৃজনক্ষম প্রতিভা ও আত্মীকৃত ধারণার সামগ্রিকতার প্রয়োজন। মনোজগতের অন্তর্মুখীন অব্যক্তপ্রায় আবেদনকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবলই বাহ্যেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ানৈপুণ্য বা 'একশন'কে বড় করিয়া প্রস্তাবিত করিলে মঞ্চের কাজ সমাধা হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সঙ্কেতের অমরাবতী সৃষ্টি উহাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যায়। সঙ্কেত-স্রষ্টাকে প্রতি ছত্রে সেই অস্পষ্ট ইঙ্গিতময়ীর সর্ব্বব্যাপী প্রকাশ ও ব্যক্তিত্বকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে এমন একটি আবেগমুখর অনতিক্রমণীয় ভাষা ও রচনাশৈলীর সাহায্যে যাহাতে রসিকচিত্তজন সেই রহস্যময়ীর পশ্চাতে পশ্চাতে অনুধাবন করিয়াও রহস্যের সম্পূর্ণ অবগুণ্ঠন মোচনে অসমর্থ থাকিয়া যাইবে।

অবশ্য এইরূপ সঙ্কেতসৃষ্টিতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন হইয়া পড়ে; যেন রূপকে প্রধান করিতে গিয়া অ-রূপ অপ্রধান না হইয়া যায়, কিংবা অরূপকে প্রধান করিতে গিয়া রূপ অপ্রধান না হইয়া উঠে। কারণ রূপ ও অরূপের সুসামঞ্জস্য এবং সম পরিবেশনেই সঙ্কেত শিল্প-গৌরব লাভ করে।

এই দিক দিয়া বিচার করিলে বলিতে হইবে আধুনিক জগতে রবীন্দ্রনাথ সঙ্কেতসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা এবং এক 'রাজা' নাটকেই তাহার উপযুক্ত সাক্ষ্যের নিদর্শন আছে। সেই প্রমাণ দাখিল করিবার পূর্ব্বে আধুনিক সাহিত্যে সাঙ্কেতিকতার আবির্ভাব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক্।

সাহিত্যের ক্রমবিকাশের পরিণতিতে সাঙ্কেতিকতা মানুষের মননশীলতার উদ্বর্ত্তমান সৃষ্টি। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে যুগ-পরিবর্ত্তনের প্রভাব ও লোকরুচির চেতনার উন্মেষ। সেক্স্পীয়র তাঁহার নাটকে রূপকে প্রমূর্ত্ত করিয়াছেন ঘটনা বৈচিত্র্য, ক্রিয়া-নৈপুণ্য, দৃশ্য-সমাবেশ, মানুষের জীবনে নিয়তির কঠোর প্রভাব ও তাহার ঘাত-

প্রতিঘাত অথবা মনোজগতে সুপ্ত মানুষের মাংসল কামনা-বাসনা-বেদনার জাগ্রত এক-একটি অবলম্বনের দ্বারা। বাগ্‌ভঙ্গির অজস্রতা ও সৌন্দর্য্যের সহিত ঐহিক-মানসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ একত্রিত হইয়া সেখানে 'একৃশ্যন'কেই বড় করিয়া দিয়াছে। সেইজন্য একমাত্র হ্যামলেট নাটকের গর্ভাঙ্কটুকু বাদ দিলে তাঁহার আর কোন নাটকই সঙ্কেত ত দূরের কথা, রূপক পর্য্যায়েই পড়ে না। এক অতিপ্রাচীন গ্রীকদেশীয় 'fables' বা ভারতীয় 'পঞ্চতন্ত্র'কে বাদ দিলে রূপক অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগের সৃষ্টি। তাই পাই বানিয়ন ও সুইফ্‌টকে। কিন্তু সাহিত্যে সাঙ্কেতিকতা আধুনিক জগতের অবদান। এখানে ধর্ম্মসাহিত্যকে বাদ দেওয়া হইল। কারণ ধর্ম্মসাহিত্য সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালেই মুখ্যতঃ সঙ্কেতমূলক।

প্রকৃত প্রস্তাবে ইউরোপখণ্ডে উচ্চতর সঙ্কেতের প্রবর্ত্তন করেন ইবসেন ও মেটারলিঙ্ক। তন্মধ্যে শেষোক্তের প্রভাবই ব্যাপকতর। তাঁহার মতে নাটকে আজ 'একৃশ্যনে'র প্রয়োজন কমিয়া আসিয়াছে। জাগতিক পরিবেশের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মানস-প্রতিবেশও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তাই কেবলমাত্র 'একৃশ্যনে'র উল্লম্ফনই এখন আর রস-বৈচিত্র্য আনিবার পক্ষে প্রশস্ত নয়—এখনকার যুগের তাৎপর্য্য হইল মানবজীবনের পুঞ্জীভূত ব্যর্থতার অন্তরালে যে রহস্যঘন দুর্জ্ঞেয় কারণ রহিয়াছে তাহারই নির্দ্দেশ দেওয়া।

সত্য। মানুষের মানস-প্রতিবেশ যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই এবং ত্রিধারা আসিয়া সেই পরিবর্ত্তনকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। একটি সমাজ-সচেতনতা, দ্বিতীয়টি বুদ্ধিপ্রবণতা এবং তৃতীয়টি অন্তর-অন্বীক্ষা। ইহাদের কোনটিই অধুনা উদ্ভূত নয় তবে প্রাচীনকাল হইতে ইহারা মাঝে মাঝে পট-পরিবর্ত্তন করিয়া আসিতেছে। আধুনিক কালের রঙ্গমঞ্চে পটপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দুইটির পুরোহিত হইলেন ইব্‌সেন ও বার্নার্ড শ, এবং তৃতীয়টির অনুশীলনের ভার মেটারলিঙ্কের উপর ন্যস্ত হইলেও উহার প্রকৃত পৌরোহিত্য গিয়া পড়িল উদ্গাতা রবীন্দ্রনাথের উপর।

মেটারলিঙ্কের নাটকে ঘটনা-সঙ্ঘাত উপেক্ষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বিষয়বস্তুর অবলম্বন ও তদ্দ্বারা সূচিত ইঙ্গিত একটি ধোঁয়াটে অস্পষ্টতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে মাত্র। কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য বা বিশ্বাসের লেশমাত্র স্বীকৃতি উহাতে নাই। জীবন ও জগৎ রহস্যময় এবং এই দুর্জ্ঞেয় জগতের ভারও দুর্ব্বহ, তাই হেঁয়ালী অস্পষ্টতাই যেন জীবনের একমাত্র পরিণতি হইয়া তাঁহার নাটকে দেখা দিয়াছে। জীবনের যেন কোন সুদৃঢ় আদর্শ নাই। এইরূপ সংশয় ও অনিশ্চয়তার ইসারা দেওয়াই মেটারলিঙ্কের তথা তাবৎ ইউরোপীয় 'symbolism' বা সাঙ্কেতিকতার লক্ষ্য।

কিন্তু এই অস্পষ্টতার নেপথ্যে যে অঘটনঘটনপটীয়সী এক চিন্ময় সত্তা বর্ত্তমান থাকিয়া জগতের অণু-পরমাণু, বৃক্ষের পত্রপুষ্প ও মানুষের প্রতি মুহূর্ত্তের জীবনযাত্রাকে বিধৃত রাখিয়াছেন এবং তাঁহারই অনির্নিমেষ দৃষ্টির ঈষৎ ইঙ্গিতেই যে যাবতীয় মরলোক মৃত্যুর বাধাকে উত্তরণ করিয়া নব নব সৃষ্টির অপার আনন্দে আগাইয়া চলিয়াছে—"অন্য কোথা অন্য কোনখানে"—সেই পরোবরীয়ান্ এক চেতনানন্দের অভিমুখে, সর্ব্ব অগোচর তাঁহার এই বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় প্রকাশটির কোন উল্লেখই বর্ত্তমান ইউরোপীয় সাহিত্যে নাই। অথচ উহাই হইতেছে ক্ষণভঙ্গুর মানুষের সংশয়-বিধ্বস্ত জীবনযাত্রার একমাত্র অবলম্বন ও সান্ত্বনা। কিন্তু ইহা একান্তই ভারতীয় আদর্শ। অতএব ইউরোপীয়গণ এত দূর অগ্রসর হইবেন কেমন করিয়া? মেটারলিঙ্কও তাই তত দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। শুধু বাহির হইতে জীবনের বিপর্য্যয় ও অনিশ্চয়তা দেখিয়া উহাকেই জীবনের চূড়ান্ত পরিণাম বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন এবং সেই অসমাপ্ত দৃষ্টির তুলিকাস্পর্শেই একটি সমাধানহীন অস্পষ্ট লোক সৃষ্টি করিয়া তাবৎ ইউরোপখণ্ডে বিস্ময়ের প্লাবন আনিয়াছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সংশয়ী নহেন, বিশ্বাসী। তাই তিনি জীবনের আপাতদৃষ্ট ব্যর্থতাকেই একমাত্র সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারেন নাই। বরং বৃহত্তর জীবনের একটি রসময় সুষ্ঠু ইঙ্গিতই তিনি বারম্বার দিয়া আসিয়াছেন। 'রাজা' নাটক তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই নাটকে তিনি অস্পষ্টতাকে অবলম্বন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা শুধু রহস্যকেই নিবিড়তর করিবার জন্য; রূপ হইতে অরূপের আলোকভূমায় উন্নীত হইবার অদৃশ্য সরণীটিকে বিশেষরূপে সুগম ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত করিবার জন্য—কেবল অস্পষ্টতাকেই সত্য বলিয়া প্রস্তাবিত করিবার জন্য নহে।

এই জীবন-রহস্যের যাহা কিছু দুর্বোধ্য তাহার কেন্দ্রেই যে এক অদ্বয় সত্তা চিরবিরাজমান, কোনরূপ সংশয় ও যুক্তির কুঠারাঘাতই যাঁহার অব্যয়ত্বকে নাশ করিতে পারে না তাঁহাকেই তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সাধনালব্ধ সেই অনুভূতিকেই শিল্প-পুষ্পে সজ্জিত করিয়া মালাকারে আমাদের পরিবেশন করিয়াছেন তাঁহার কাব্যে, গানে, নাটকে—শান্তিনিকেতন-প্রবন্ধাবলীতে ও অন্য বিবিধ রচনায়। ইউরোপীয়গণ যেখানে জগতের তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় বলিয়া দুর্জ্ঞেয় মাত্রকেই চরমের তত্ত্বরূপে সঙ্কেত

করিয়া জীবনকে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ সেই অসমাপ্ত সমাধানের মধ্য হইতে জীবনকে উদ্ধার করিয়া আকাশের ব্যাপ্তিতে ছাড়িয়া দিয়াই মানুষের রুদ্ধপ্রায় নিঃশ্বাস ও লুপ্ত চরিত্রবল সগৌরবে ফিরাইয়া আনিয়াছেন।

বস্তুতঃ দৃষ্টিকে প্রসারিত করিলেই দেখা যাইবে জীবনের সীমারেখা ঐখানে ঐ অস্পষ্ট কুয়াশালোকেই বদ্ধ নহে, উহা কুয়াশার ভিড়-করা দুশ্চিন্তাকে অতিক্রম করিয়া আরও অধিক দূর আগাইয়া চলিয়াছে সেখানে—যেখানে দিক্-উদ্ভাসনকারী সূর্য্যের অনির্ব্বাণ কল্যাণরূপটি নিহিত রহিয়াছে এবং সেই হিরণ্ময় পাত্রের আবরণটি অনাবৃত করিয়া উহার অভ্যন্তরনিবাসী সত্যস্বরূপ কল্যাণপুরুষকে লক্ষ্য করাই আর্য্য-সাধনার অভিজাত বলিষ্ঠতা। জীবনের চতুষ্পার্শ্বে যে অস্পষ্ট তমসা আবৃত হইয়া রহিয়াছে উহা কখনও জীবনের সত্য হইতে পারে না; উহা কলুষ, উহা মিথ্যা, উহা মায়া এবং সেই মায়াকেই ছিন্ন করিয়া তমসার অন্তরালবর্ত্তী জ্যোতির্ম্ময় সত্যকে জানিবার ব্যাকুল বেদনা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মুখে উচ্চারিত হইয়াছে—"তমসো মা জ্যোতির্গময়"।

আজন্ম বিশ্বাসী ও উপনিষদের একনিষ্ঠ পূজারী ঋত্বিক রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শকেই জীবনের সত্য ও অবলম্বনস্বরূপ জানিয়াছেন। তাই ইউরোপীয় সংশয়বাদ নহে—ভারতীয় এই বিশ্বাসবাদই তাঁহার বিবিধ রচনায়, বিশেষ করিয়া 'রাজা' নাটকে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে যেন এই গৌরবেই যে, জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য যাহা তাহাকে বুঝিবার পথ 'নেদম্ যদিদং উপাসতে'।

"পালী উপাখ্যানে আছে, কোন দেশের রাজা অত্যন্ত কালো ও কুৎসিত ছিলেন বলিয়া প্রজাগণের সমক্ষে বাহির হইতেন না, অন্তরাল হইতে রাজকার্য্য চালাইতেন। এই সামান্য বস্তু-সঙ্কেত হইতে রবীন্দ্রনাথ 'অব্যক্ত বিশ্বরাজ ও সৃষ্টি-সংহার কারণ' বিষয়ে এই অনুপম সিম্বলিক প্রসঙ্গ রচনা করিয়াছেন। রাজা কাব্যের রসনিষ্পত্তির নায়ক-নায়িকা অন্ধকার গৃহনিবাসী অদর্শনীয় 'কালো রাজা' ও তাঁহার রাণী সুদর্শনা।"—(বাণীমন্দির)

ভারতীয় দর্শনের মূল কথাটি হইতেছে ঈশ্বর কেবল অনুভূতির রাজ্যে স্বপ্রকাশ, পার্থিব জগতে সর্ব্বব্যাপক; কিন্তু তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং বুদ্ধিগোচর নহেন। এক, বিশ্বাসের সমুদ্রে নিজেকে নিমজ্জিত করিয়া হৃদয়কে প্রেমার্দ্র করিতে পারিলে তবেই সেই অবাঙ্‌মনসগোচর ভক্তের আস্বাদন-মাত্র-গোচরে আসিতে পারেন, নচেৎ তাঁহার অস্তিত্বের একেবারে চাক্ষুষ প্রমাণ চাহিয়া বসিলে তিনি শূন্যবৎ অবিজ্ঞাত থাকিয়া যান; চেষ্টা দ্বারা বা গ্রন্থার্থ ধারণাশক্তি দ্বারা তাঁহার বিন্দুমাত্র আস্বাদলাভ সম্ভব হইয়া উঠে না—এমন কি 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'। আমার মনে হয়, রাজা নাটকটির আঙ্গিক উপরি-উদ্ধৃত পালী উপাখ্যানসম্মত হইলেও উহার ফলশ্রুতিতে এই সত্যের সাক্ষ্য রহিয়াছে।

কালোর নিজস্ব কোন রূপ বা অভিধা নাই। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সকলপ্রকার রূপ ও রশ্মির অসংহিত অবস্থাই কালোর বাচক। রাজাকে তাই কালো ও অদর্শনীয় দেখানো হইয়াছে। তাহা ছাড়া তিনি অন্ধকার গৃহনিবাসী। এই অন্ধকার অতি প্রকাশ্যের বিপরীত অন্ধকারও বটে, আবার কুশাগ্রবুদ্ধিরূপ অহমিকার অতীত অন্ধকারও বটে। কেন?

কারণ এই, তিনি গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠম্; সচেতন রূপ-লোকের অন্তরালবর্ত্তী অতি-চেতন গুহালোকেই তাঁহার অবস্থিতি। যদিচ, তাঁহা হইতেই আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া রূপে রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জগৎকে নিত্য প্রকাশিত করিয়া দিতেছে, কিন্তু সেই আলোক দিয়াই তাঁহার রূপকে ধারণা করা যাইবে না, কারণ তিনি আলোকে লিপ্ত নহেন। তাই মুখর দিবালোকে কোন বিশেষ মূর্ত্তিতে আসিয়া উৎসাহী অথচ সংশয়ী মনের সম্মুখে আপনার অস্তিত্ব জ্ঞাপনের ইচ্ছা আদৌ তাঁহার নাই।

অনুভূতিতে তাঁহার আস্বাদনকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবল মাত্র চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহাকে বুঝিয়া পাইবার উদগ্র বাসনা প্রথম অবস্থায় রাণী সুদর্শনাকেও পাইয়া বসিয়াছিল। প্রতি ডাকে সে তাহার প্রমাণ চাহিয়া বসিয়াছে। ইহাই তাহার সংশয়।

রাজা তাহার স্বামী, এবং তাহার সহিত সে অন্তরঙ্গ ভাবে যুক্ত। রাজার অদৃশ্য ও অধৃষ্য প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্ব জ্ঞাতসারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক, সুদর্শনাকে অন্তরে বাহিরে বিপুলবেগে আকর্ষণ করিতেছে, বাঁশীর শব্দে বৃন্দাবনের কালো রাজা যেমন আকর্ষণ করিয়াছিল তাঁহারই হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপা সোনার পুতুলী রাধাকে।

কিন্তু সুদর্শনা সম্পূর্ণই রাধা নহে। তাহার সংশয়ী মন যুক্তিদ্বারা এই আকর্ষণের কারণ অনুসন্ধান করিয়াছে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিদ্বারা স্বামীকে অদৃশ্য রহস্যান্ধকার হইতে উদ্ঘাটন করিয়া প্রত্যক্ষতার আলোক-সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, অধৃতকে ধৃতির মধ্যে আনিয়া অসীমকে সীমার মধ্যে বাঁধিতে চাহিয়াছে।

কিন্তু অন্ধকারনিবাসী অদর্শনীয় কালো রাজা আলোক-সন্ধানী রাণী সুদর্শনার নিকট প্রত্যক্ষ রূপে ধরা দিলেন কৈ? প্রত্যক্ষের গোচরে আসিবার দৈনন্দিন পথটি যে অত্যন্ত প্রাকৃত, নিতান্তই স্থূল। তাই অনোরণীয়ান্ সূক্ষ্ম

রাজা সে পথে ধরা দিবেন কেমন করিয়া? তিনি তো শুধুই অণু হইতেও ক্ষুদ্র নহেন—তিনি গুরুগরীয়ান। তাই কোনরূপ গুরু পদার্থেই তাঁহার সীমা আঁটিয়া দেওয়া যায় না, আঁটিয়া দিলেও তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় তো ঐখানেই সীমাবদ্ধ রহে না। যাহাতেই তিনি আশ্রয় লইবেন তাহাকে ছাড়িয়া আরও অনেক দূরে তিনি অবস্থান করিবেন। এই সত্যটি শুধু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বা দার্শনিক যুক্তিদ্বারা মেলে না। ইহা গভীর অনুভূতির কথা; এবং এই অনুভূতির চারু উদয় ঠিক বস্তু-সাপেক্ষ চিন্তা দ্বারা হয় না—হয় বস্তু-নিরপেক্ষ বিশ্বাসের দ্বারা।

অথচ সুদর্শনার এই বিশ্বাস ও অনুভূতির সুকোমল পদ্মটি তখনও ছিল অপ্রস্ফুটিত। তাই তাহার তত্ত্ববাদী জিজ্ঞাসা ও সংশয়ী কৌতূহল স্বামী-রাজাটির লুকাইয়া থাকিবার কারণ এবং চিরকাল অন্ধকারপুরের স্বামী থাকার তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

রাজার প্রতি সুদর্শনার আকুতির শেষ নাই। সে তাঁহাকে নানাভাবে পাইতে চাহে; দৃশ্যের মধ্যে পাইতে চাহে, অস্তিত্বের মধ্যে পাইতে চাহে, প্রেমের মধ্যে পাইতে চাহে। এই লৌকিক আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া রাজারও কৌতুকের শেষ নাই। তিনি তাহাকে আভাসে-ইঙ্গিতে ধরা দিতেছেন আর রাণী উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছে। তিনি তাহাকে ক্রমেই ভুলভ্রান্তির ভিতর দিয়া রহস্য হইতে রহস্যান্ধকারে পরিচালিত করিতেছেন, অমনি রাণীও ততই গভীর হইতে গভীরতর দেশে তলাইয়া যাইতেছে। রাজা যদি প্রত্যক্ষভাবে তাহাকে দেখা দেন তবে সেই বিশ্বরূপ সহসা রাণী সহ্য করিবে কেমন করিয়া? তাই মধুর লীলা-চ্ছলে তিনি ক্রমেই দূর হইতে দূরে সরিয়া গিয়াই রাণীকে ধীরে ধীরে মিলনের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন।

রাণীর এইরূপে নিকটে পাইবার অতৃপ্ত বাসনা এবং লীলা-কৌতুকবশে রাজার এই প্রেমের ছলনা পাশাপাশি থাকিয়া সমগ্র নাটকটিকে ভয়ঙ্কর ও মধুরের অপূর্ব্ব সমাবেশে রহস্যপূর্ণ ও কাব্যোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

এইরূপে নাটকটির পরিণতি যখন ঘনাইয়া আসিল তখন দেখা গেল সুদর্শনার সেই প্রকাশ্যে জানিবার অভিমান চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অনুভূতির স্নিগ্ধ আলোকে তাহার সমস্ত তনুমন প্লাবিত হইয়া গিয়া তাহার আত্মরতিপ্রবণতা জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহাতেই রাজার সহিত মিলিত হইবার পথটি তাহার সুগম হইয়া গেল। অবশেষে যবনিকা পতনের ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তে দেখা গেল রাজা ও রাণী মুখোমুখি দাঁড়াইয়া। সুদর্শনা বলিতেছে, তুমি সুন্দরও নহ, তুমি কুৎসিতও নহ—তুমি অনুপম।

এই অপরূপ মিলনের দৃশ্যটি স্বতঃই বৈষ্ণব কবিদের ভাব-সম্মিলনের কথা আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়।

বস্তুতঃ বৈষ্ণব মহাজন-পদকর্ত্তাদের কল্পনার সহিত রাজা নাটকের পরিকল্পনার কিঞ্চিৎ যোগ থাকিলেও ভাবগত পার্থক্য রহিয়াছে যথেষ্ট। বৈষ্ণব পদাবলীতে ভক্ত ও ভগবানের একটি মধুর সম্বন্ধের বর্ণনা আমরা পাই। রাধার মান-অভিমান, আকুতি-বিরহ প্রভৃতি রস-বৈচিত্র্যের লক্ষণার অভাব সুদর্শনাতেও নাই। কিন্তু সুদর্শনাকে যাহা রাধা হইতে পৃথক করিয়াছে তাহা এই, বৈষ্ণব কবির রাধা তাহার 'কালো রাজা' কৃষ্ণের দেখা পাইয়া স্পর্শ পাইয়াও অতৃপ্ত; কিন্তু সুদর্শনার অভিমান শুধু একবার রাজার চাক্ষুষ দেখা পাইবার জন্যই। সুদর্শনাতে রাধার সেই প্রেম-বৈচিত্র্য নাই। তাহা ছাড়া রাধা অপেক্ষা সুদর্শনা একটু বেশী তত্ত্ববাদী। অবশ্য শিল্পের দিক হইতে উহাই নাটকটির উৎকর্ষের একটি হেতু হইয়া উঠিয়াছে, কারণ তাহাতে সুদর্শনার আভ্যন্তরীণ ঘাত-প্রতিঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব অনেক সূক্ষ্ম ও ব্যাপক ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণবের বৃন্দাবন-রাজা কৃষ্ণ দূরে নহেন—নিকটে, এমন কি দৃশ্যের মধ্যেই। আর রবীন্দ্রনাথের অদর্শনীয় রাজা অন্ধকার ছাড়িয়া আলোকে আসেন না। এই বৈষম্য বশতঃই তত্ত্বের দিক হইতে উভয়ের মধ্যে কিছু বৈষম্য আসিয়া গিয়াছে এবং ইহাই রাজা নাটকটির মৌলিকত্ব।

ভগবান যে ভক্ত হইতে দূরে নহেন ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বৈষ্ণব-কবি ভগবানের অসীমত্ব বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহাকে পার্থিব প্রণয়ীতে রূপান্তরিত করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই অসীমের ব্যাপকতা ও প্রগাঢ় রহস্যকে সীমার বাঁধনে বাঁধিয়া ক্ষুণ্ণ করেন নাই। তাঁহার রাজা যদিও ভক্তহৃদয়ের অন্তরঙ্গ স্বামী এবং প্রতিমুহূর্ত্তে "সে যে আসে আসে আসে", তথাপি তাঁহার অবস্থান আলোকের অতীত লোকে; এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বও একক অথবা 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধ'।

শুধু নাটকটির পরিণতিতে বৈষ্ণবের আত্মবিসর্জ্জনের ভাবটি চমৎকার অভিব্যক্ত হইয়াছে; যাহার মূল কথাটি হইল, অহঙ্কারকে চূর্ণ না করিলে সে বঁধু আপনার হয় না।

রাজা নাটকটির ভিতর ঈশ্বরানুভূতির এই সামগ্রিক প্রভাব অখণ্ডভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে, রূপ হইতে অরূপে, সীমা হইতে অসীমে ঈশ্বরের এই সহজ সঞ্চরণশীলতা নাটকের ছত্রে ছত্রে, দৃশ্যে দৃশ্যে এবং প্রতি পাত্র-পাত্রীর ইঙ্গিতপ্রবণ রহস্যময় সংলাপের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-চমকের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হইয়া একটি সৌরলোকের সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপ বিষয়বস্তু লইয়া সার্থক সঙ্কেত-শিল্প সৃষ্টি করিতে হইলে যে ঘটনা ও চরিত্রের সুসমঞ্জস সংস্থান দরকার নাটকটিতে তাহার কোথাও ত্রুটি নাই।

নূতনের আহ্বান

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১

নূতন যা-কিছু তাই মনোহর—তাতেই মানুষের আসক্তি বেশী—এ কথাটা এক ফাঁকে কে যেন বলেছিল। সুধাংশুর ঠিক মনে পড়ছে না—যে বলেছিল তার স্বরে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর···কথাটিকে মনের মধ্যে স্থায়ী করে দিয়েছিল—আজও তার রেশ মিলিয়ে যায় নি।

বিয়ের আনুষ্ঠানিক পর্ব্বগুলি সারা হয়ে সবে ও তখন বাসরঘরে অধিষ্ঠিত হয়েছে—দিদিশাশুড়ী ও শালিকা-সম্পর্কীয়েরা বহু আকাঙ্ক্ষিত পরিহাসের তূণমুক্ত শরগুলিতে শাণ দিচ্ছিলেন—নানা ধাঁচে পরা রঙ-বেরঙের শাড়িতে আর অসংখ্য প্যাটার্ণ-শোভিত অলঙ্কারে বিদ্যুৎ আলো ঠিকরে পড়ছে—আলোয় গন্ধে আর কলরবে ছোট ঘরখানিতে বসেছে মেলার আসর। মেলাটা বলতে পারা যায় সৌন্দর্য্যের কিন্তু বিচিত্র প্রকাশভঙ্গীর ঠাস-বুনানিতে তা থেকে দৃষ্টি ফিরে আসছে—ধনীর বাড়ির নিমন্ত্রণ সভায় আহ্বানের চেয়ে প্রচারের ঘটা যেমন বেশী তেমনি আর কি! একজন দিদি-শাশুড়ী ওকে আদর করে কোলে তুলে নিলেন—কথাটা সেই অবসরেই কে যেন বললেন।

নূতন পরিবেশে ও যেন নূতন মানুষ হয়ে গেছে। ওর মূল্য সম্বন্ধে এমন সচেতনতা কারও ব্যবহারে ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্য করে নি। না বাড়িতে না বা আপিসে কেউ ওকে জানায় নি তোমাকে পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি—অন্ততঃ লাভবান হয়েছি এ ইঙ্গিতও কেউ দেয় নি। সাধারণ গৃহস্থ—যারা মাসের মাহিনায় সংসার চালানোর দুরূহ দায়িত্ব বহন করে, তারা এক বারও ভাবে না তারা কি? ইংরেজ রাজত্বে তাদের যে সমস্যা ছিল—নিজের রাজত্বেও তা রয়েছে। অশন-বসনের কৃচ্ছ্রতা দিন দিন বাড়ছে—স্বাধীনতার স্বাদ তেমন স্বাদুতর বোধ হচ্ছে না। অন্ততঃ ট্রামে বাসে ট্রেনে আপিসে ক্লাবে রেষ্টুরেন্টে সবাই তাই বলে। কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে—তিমির অপগত হ'ল—পূর্ব্বদিগন্তে প্রকাশিত হলেন কাশ্যপেয়—সে দেখার দৃষ্টি বা সে শুভবার্ত্তা গ্রহণ করবার শক্তি তার নাই। কোনমতে যোগাড় করেছিল একটা চাকরি, তারই রসদে চলছে সংসার। সংসারের চাকায় মাসের শেষে ওঠে আর্ত্তনাদ—মানুষগুলির কলরব হয় প্রচণ্ড। তবু মাস কেটে যায়—নূতন ভরসায় নূতন দিনগুলি এগিয়ে আসে। এমনি একঘেয়ে চলতে চলতে এসে গেল বিয়ের লগ্ন। গতানুগতিক ধারা থেকে মুক্ত হয়ে ও নিশ্বাস ফেলে বাঁচলে, জীবনের অর্থ নূতন করে প্রণিধান করলে সুধাংশু। সত্য কথা—নূতন যা-কিছু তাই মনোহর—তাতেই মানুষের আসক্তি বেশী এবং তা জীবনীশক্তিপ্রদায়িনী।

শোভার সঙ্গে পরিচয় হ'ল এবং মুহূর্ত্তে সে পরিচয় পৌঁছল অন্তরঙ্গতার অঙ্গনে। দু'জনেই বুঝলে—দু'জনকে যথেষ্ট ভাল-বেসেছে।

কাল খুড়শ্বশুর এসেছিলেন নিমন্ত্রণ করতে। বলেছিলেন, যাওয়া চাই শোভাকে নিয়ে—না গেলে আমরা অত্যন্ত··· ইত্যাদি সব স্নেহগর্ভ কথা।

এই নিয়ে চার জন শ্বশুরস্থানীয়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণ হ'ল। এ ছাড়া পাড়াসম্পর্কীয় গুরুজনেরা কত আদরযত্ন যে করে থাকেন। শ্বশুরবাড়ি গেলে সেখানকার চা-জলখাবার খাওয়ার ফুরসৎ সুধাংশুর ঘটে না। কেউ এসে বললেন, ওগো ঠাকুরঝি, জামাইকে একবার পাঠিয়ে দিও বিকেলবেলা। চা-টা ঐখানেই খাবে।

কেউ রেকাবিতে নানান রকমের ফলমিষ্টি নিয়ে এসে বললেন, এসো ত ভাই—একটু মিষ্টি-মুখ কর।···ওমা মিষ্টি বুঝি ভালবাস না? একি আহার—পাখীর মত খালি ঠোকরাচ্ছ!

নূতন জিনিস কিনে মানুষ যেমন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বাজিয়ে ঘষে নানা ভাবে পরীক্ষা করে—নূতন মানুষকে নিয়ে তেমনি পরীক্ষার রীতি। তবে এ পরীক্ষায় বাতিলের ভ্রূকুটি নাই—সমাদরের প্রীতি ষোল আনা।

সুধাংশু পুলকিত মনে ভাবে—ভারি অন্যায় করেছিলাম এতকাল বিয়েতে সম্মতি না দিয়ে। জীবনের যাত্রাপথে এ পাথেয় সবচেয়ে প্রয়োজনীয়—একে প্রত্যাখ্যান করার নির্ব্বুদ্ধিতা কেন যে হয় মানুষের!

২

শোভা বললে, বাঃ রে, এখনও শুয়ে আছ, মণিকাকা নেমন্তন্ন করে গেছেন—মনে নেই বুঝি?

আছে। ওঁদের যা প্রোগ্রাম আজ ফিরতে পারব কি?

কে মাথার দিব্যি দিয়েছে ফিরতে! গ্রীবা হেলিয়ে হাসলে শোভা। ওদের বাড়িতে ঘরের অভাব নেই—

আমি কি তাই বলছি। কিন্তু আমার ভারি লজ্জা করে।

কেন?

উনি গবর্ণমেণ্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। ছেলেরা কেউ আই-এম-এস ডাক্তার, কেউ বি-সি-এস ম্যাজিষ্ট্রেট কেউ আপিসের বড়কর্ত্তা—ওখানে তৎসমধ্যে বকো যথা হয়ে থাকতে—

শোভা হেসে বললে, তুমি যে ওঁদের চেয়েও বড়—নতুন জামাই—

ঠাট্টা ভাল লাগে না। মুখ গম্ভীর করে সুধাংশু আলনা থেকে জামাটা টেনে নিলে।

না গো সত্যি। মণিকাকাকে আমরা কখনও বিদ্যে জাহির করতে দেখিনি। দেখনি ওঁর মেয়েদের বাসরঘরে—বি-এ, এম-এ পাস করে কেউ মেমসায়েবের মত ইংরেজি বলেছে! ওরাও আমাদের মত শাকচচ্চড়ি রাঁধতে জানে—আর খায়ও তারিফ করে।

সুধাংশু হেসে উঠল, তোমায় পারা দায়। কিন্তু একটা কথা সত্যি বল ত—তোমার কি মাঝে মাঝে মনে হয় না ওদের যারা স্বামী হবে তারা কত বিদ্বান—অর্থবান—

বা: রে, নিজের খোল কেউ নাকি টক বলে! প্রত্যেকের কাছেই স্বামী খুব—খুব বড়।

আর খুব—খুব ভালও—কেমন!

ভালই ত।

এক প্রস্ত আদর-সোহাগ হয়ে যাওয়ার পর ওরা বেশবাসে মনোযোগ দিলে।

গিয়ে দেখলে পরিবেশটি অত্যন্ত মনোরম। নূতনের পক্ষে সহজে নিঃশ্বাস নেবার মত। সম্পদ চারদিকে ছড়িয়ে আছে স্বাভাবিক ভাবে—এক জায়গায় জড়ো হয়ে কোলাহল তুলছে না—আমি আছি, আমি আছি। মনে হ'ল প্রতিদিন আলো দিয়ে রাত্রিকে নিঃশেষ করে আনে যে সূর্য্য তাঁরই মত এঁরা মিতবাক্—স্বচ্ছন্দ-গতিশীল—গৃহসজ্জা—আলাপ—আহার এবং স্নেহ প্রকাশ কোনটিতেই বাহুল্য নাই। রাজনীতির আলোচনা তাও বেশ সুষ্ঠুভাবে করলেন এঁরা। এঁরা বললেন, রাষ্ট্রের কর্ণধার যাঁরা দায়িত্ব বহনের গুরুভার নিয়েছেন—তাঁদের সমালোচনায় বসলে মনের উগ্রতাকে একপাশে সরিয়ে রাখা প্রয়োজন। ভারত-সমস্যার সমাধানে প্রাত্যহিক ঘটনাপুঞ্জের উপরে বিচারবুদ্ধিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বর্ত্তমানকে বিশ্লেষণ করতে হবে অতীতের অভিজ্ঞতা আর ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পরিণতি দিয়ে। এক দিকের দুঃখে উত্তেজিত হয়ে ভারসাম্য নষ্ট করলে চলবে না।

সুষ্ঠু আলোচনায় সুধাংশু যেন নূতন জগতে প্রবেশ করলে।

মণিকাকার বাড়ি থেকে বিকেলে বেড়াতে গেল আর এক শ্বশুর-সম্পর্কীয়ের বাড়িতে। সেখানেও প্রচুর আদর-আপ্যায়ন। নূতন সম্পর্ককে সবাই সুনজরে দেখছে। সে তো এই বাড়ির কেউ নয়—তবু মনে হচ্ছে কত না আত্মীয়। এই বাড়ির ঐশ্বর্য্য ও আন্তরিকতা তার সেবায় নিয়োজিত হয়ে সার্থক হচ্ছে।

বিকেলে ব্যবস্থা হ'ল সিনেমা দেখবার। চা জলযোগ সেরে শ্যালিকা ও সেই সম্পর্কীয়দের নিয়ে ও যখন গদি-আঁটা চেয়ারে গিয়ে বসলে তখন কৌতূহল জাগল না—বইটা ভাল হবে কি মন্দ লাগবে। গল্প যে ভাবেই রূপায়িত হোক না কেন, রূপালী পর্দায় জীবনের উপভোগ অংশকে কিছু সমৃদ্ধ করা ছাড়া ওর আর সার্থকতা কতটুকু! সিনেমা শেষে মনে হ'ল এত বিচিত্র রস-উপভোগের ক্ষেত্রও রয়েছে মনের মধ্যে? শুধু হাসি শুধু খেলা এ ছাড়া জীবনধারণের কোন উদ্দেশ্যই নাই—থাকলেও সে উদ্দেশ্য নিয়ে মাথা ঘামানোর বয়সে অন্তত: ওরা পৌঁছয় নি।

৩

আজও মনে পড়ে বিয়ের এক মাস পরে ঠাণ্ডা লেগে ক'দিন জ্বর জ্বর ভাব হয়েছিল—আপিসে যেতে পারে নি সুধাংশু। খবর পেয়ে ছুটে এলেন শ্বশুরবাড়ির প্রায় সকলেই। শিয়রে বসে কেউ রাখলেন কপালে হাত, কেউ চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে ওকে সান্ত্বনা দিলেন। টেবিলের ওপর ফল-মূল যা জমল তার মূল্য হিসাব করলে দশ দিনের সংসার খরচের কুলান হয়। আর সে কি উদ্বেগ প্রকাশ! ভাল ডাক্তার দেখছে ত? যে ডাক্তার যথার্থ রোগনির্ণয় করতে পারে, হাতে রেখে চিকিৎসা করে না, যার ফিয়ের টাকা নেহাৎ-না-নিলে-নয় গোছের নয় এবং দামী ষ্টেথস্কোপ ও মল-মূত্র, থুথু ও রক্তচাপ পরীক্ষার যন্ত্রাদি আছে। ওষুধগুলো নামী দোকান থেকে আনা হচ্ছে ত? অনেক দোকান আছে যেখানে বিশেষ একটি ওষুধ না থাকলেও ব্যবস্থাপত্র ফেরত দেয় না। দিনে তিন বার ফুটবাথ নাকি এ রোগের চমৎকার দাওয়াই। লবঙ্গ-তালমিছরি সর্ব্বদা মুখে রাখবে। টেবিলের শিশি গুণে দেখলে সুধাংশু—পাঁচটা এক পাউণ্ডের তালমিছরির শিশি জমেছে।

সবাই চলে গেলে হাসল,—তা শোভা, এমন অসুখ মাসে একবার করে হলে মন্দ হয় না। মেওয়া-মিছরি খেয়ে শরীরটা চাঙ্গা করে নেওয়া যায়।

শোভা বলে, হুঁ রোজ রোগ হলে লোকের বয়ে গেছে দেখতে!

রাখ বাজী? বিছানা চাপড়ে সুধাংশু হাসলে।

দু' মাস পরে আর একবার অসুখ হওয়াতে বাজীটা জিত হয়েছিল সুধাংশুর।

শোভা কৃত্রিম কোপে বললে, অসুখ না ছাই, খালি আমাকে জব্দ করবার মতলব।

যাই হোক, নূতন রঙে আর গভীর নেশায় এমনি করে একটা বছর কেটে গেল। অনুরাগ কেমন করে এবং কখন ফিকে হ'ল সুধাংশু বুঝলে না। ও তখন স্বাভাবিক পর্য্যায়ে পৌঁছেছে—আপিস আর সংসার—সংসার আর আপিস—এর সীমানায় পুরাতন জীবনের স্রোত নিঃশব্দে চলেছে। চলতে

চলতে এক দিন সুধাংশুর স্বপ্ন অকস্মাৎ ভেঙে গেল—ও সত্যিই অসুস্থ হয়ে পড়ল।

রাখালের পালে বাঘ-পড়ার গল্পটা শিশুকালে পড়লেও মনের কোণে দাগ কেটে বসে। বছর দুই পরে সুধাংশু পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়ল।

পড়শীরা এলেন—এলেন কাছের দূরের কুটুম্ব স্বজন। পথ্যে ঔষধে টেবিল ভরে উঠল কিন্তু বাজী জেতার আনন্দে সুধাংশু উল্লসিত হয়ে উঠল না। সে বললে, শোভা, সত্যিই বুঝি রাখালের পালে বাঘ পড়ল।

শোভা শিউরে উঠে বললে, শীতকালের কাসি শীঘ্র সারে না।

হুঁ—তার সঙ্গে যদি জ্বর থাকে।

দেখ অমন অলক্ষুণে কথা যদি বল—অশ্রুতে ভার হয়ে এল শোভার স্বর। নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে বললে, আমাকে ভয় দেখিয়ে তোমার লাভ ?

না গো না—ভয়—আমার ভারি সাধ হয় দেখতে—অনেক—অনেক দিন ধরে যদি বিছানায় শুয়ে থাকি তোমাদের আদর-যত্ন—

যাও, তোমার মত নিষ্ঠুর আমি দেখিনি। ঝরঝর করে চোখের জল ফেললে শোভা।

সুধাংশু অবাক হয়ে গেল প্রথমটা, এতে কাঁদবার কথা কি হ'ল। মুহূর্ত্তে ওর মনেও সে ভয় সঞ্চারিত হ'ল। অসুখ নিয়ে এমন নিষ্ঠুর পরিহাস সত্যই ভাল হয় নি। মানুষ অমর নয়—দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করে না সকলে। হারানোর ভয় আছে বলেই পরিহাসও সময়ে সময়ে মর্ম্মান্তিক হয়।

ওকে আদর করবার জন্য হাত বাড়িয়ে সুধাংশু হাসলে, আরে ঠাট্টাও বোঝ না এত শীগগির যদি মরব ত দুঃখকষ্ট ভোগ করবে কে ?

অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে শোভা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুধাংশু কেঁপে উঠল। ওর মুখ দিয়ে ধ্রুব সত্যই কি স্খলিত হয়ে পড়ল!

এক দিন মণিকাকা দেখতে এলেন। প্রশ্ন করলেন অনেকগুলি। জ্বর কখন হয়—কাসিটা কখন বাড়ে—রাত্রিতে ঘাম হয় কি না ? সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন তাপের পার্থক্য কতখানি ? গলার স্বরটা কি হঠাৎ ভেঙে গেছে ?

প্রথমে কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে প্রশ্ন করছিলেন, কয়েকটি জবাব লাভের পর একটু সরে বসলেন। শোভাকে বললেন, একটু জল দে ত মা—কার্ব্বলিক সাবান আছে ?

হাত ধুয়ে চেয়ারটা আর একটু দূরে টেনে নিয়ে বসলেন। বললেন, ভয় নেই সেরে যাবে। ওকি রে আবার একরাশ মিষ্টি ফলমূল এ সব কেন ? একটুও মুখে দিতে পারব না মা, পেটের গোলমাল চলছে ক'দিন ধরে।

বহু অনুরোধেও তিনি খাবার স্পর্শ করলেন না। যাবার সময় বললেন, মনে স্ফূর্ত্তি রাখ বাবাজী—কিছুতে ঘাবড়ে যেও না। আমি আবার এসে খবর নিয়ে যাব।

শোভা দুয়ার পর্য্যন্ত এসে কাঁদ কাঁদ গলায় বললে, বাবাকেও আসতে বলবেন। একলা মানুষ কি যে করব ভেবে পাইনে।

আসব, আসব বই কি মা। আশ্বাস দিলেন মণিকাকা।

কিন্তু তিনি আর এলেন না। লিখলেন, কলেজে ভারি গোলযোগ চলছে, সামনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা, আমার নড়বার যো নাই। খবর আমি নিয়তই পাচ্ছি, ভয় কি।

প্রথম প্রথম ভায়েরা আসত, ক্রমে তারাও আসা বন্ধ করে দিলে। এক দিন বাবা আসতেই শোভা কেঁদে ফেললে, তোমরা যদি না দেখ ত কার ভরসায়—

বাবা বললেন, রোগটা খারাপ মা, নরু-সরুকে পাঠাই কোন্ সাহসে! ডাক্তার বারণ করে দিয়েছে আমাদের আসতে।

তবে আস কেন ? অভিমানভরে শোভা প্রশ্ন করলে।

কি করব মা, মন বোঝে না। একটু থেমে বললেন, কোন হাসপাতালে দেবার ব্যবস্থা করি কি বল ?

না। তোমরা যা ভাবছ তা নয়—তা নয়। কাঁদতে লাগল শোভা।

ও কিছুতেই মানবে না সুধাংশুর দুরারোগ্য ব্যাধি হয়েছে। ইস্পাতের মত শক্ত যার দেহ, রোগ নিয়েও যার হাসি-তামাশার বিরাম নাই—সে কিনা···না, না, কিছুতেই স্বীকার করবে না শোভা।

৪

দিনরাতের মুহূর্ত্তগুলি অতঃপর অবিচ্ছিন্ন ভাবেই দেখা দিল। অবিচ্ছিন্ন এবং সুদীর্ঘ। আকাশের মন্থর মেঘের গায়ে অদৃশ্য হস্তে আলিম্পন আঁকা চলে—বর্ণাঢ্য রেখা কখনও বা ফিকে হয়ে আসে—চিলের পাখায় দুপুরের অলস মুহূর্ত্ত ভেসে বেড়ায়—ফটিক-জল প্রার্থনার করুণ রেশে মধ্যাহ্ন-মুহূর্ত্ত হয়ে ওঠে করুণ। চারদিকে কিসের চুপি চুপি কথা—কি যেন অঘটন ঘটবে তারই সভয় আলোচনা। চোখের জল চেপে শোভা এসে দাঁড়ায় সুধাংশুর শিয়রে। রোগজীর্ণ পাণ্ডুর মুখে ওর স্বাস্থ্যের অনুপম আলো লেগে নাই—জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে নাই জীবনের তৃষ্ণা। অলস মেঘের মৃদু সঞ্চরণে তবু গতি আছে—সুধাংশু যেন সব চলার দায় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেছে। পৃথিবী হতে ও বিচ্ছিন্ন—সেই সঙ্গে জীবনও হয়েছে বিস্বাদ।

কতবার সন্তর্পণে উঁকি মেরে ফিরে যায় শোভা। দীর্ঘ

নিঃশ্বাস দুরন্ত হয়ে উঠলে অতি কষ্টে তাকে শাসন করতে হয়—চোখের জলে সঞ্চিত বেদনা খানিকটা উপচে পড়ে। পৃথিবী বর্ণ হারিয়েছে, ক্রমশঃ কোমলতা হারাচ্ছে। সঞ্চিত অর্থ দ্রুত নিঃশেষিত হ'ত না যদি রোগের রাজসিকতা না থাকত। কিন্তু উপায় নাই—যে খুঁটিতে ঘরের চালাখানি নির্ভর করছে তাকে যে কোন উপায়ে খাড়া রাখতেই হবে। পোষ্ট আপিসের পাস বই—অঙ্গের অলঙ্কার—আর ঘরের আসবাবপত্র এ সবের মূল্য কত তুচ্ছ! একটা জীবন কত না মহার্ঘ্য।

সুধাংশু আর্ত্তস্বরে বলে, এ তুমি কোথায় নামছ শোভা। তোমার বাবাকে খবর দাও।

কি খবর দেবে শোভা! পিতৃস্নেহ সন্দেহের বস্তু নয়—কিন্তু তিনি ত একমাত্র শোভারই পিতা নন্। আরও পাঁচটি সন্তান তাঁর আছে, তাদের ন্যায্য দাবি অস্বীকার করবেন কেমন করে। ডাক্তার কি বলেন নি—একটার জন্য পাঁচটা জীবন নষ্ট করবেন না মশায়। টাকা গেলে টাকা আসে কিন্তু জীবন গেলে—

সেই আশাতেই সর্ব্বস্ব পণ করেছে শোভা। টাকা যাক, জীবনের মূল্যে সার্থক হোক সম্পদ।

তবু একটা কথা বুঝছে শোভা—মানুষ মানুষকে ভাল-বাসে যতখানি তার চেয়ে বেশী করে ভয়। বছরকয়েক আগেকার কথা, তখন ও প্রাপ্তবয়স্ক—বিয়ে হবার ঠিক দু' বছর আগে সামান্য কয়েকদিন রোগভোগের পর মা গেলেন মারা। মারা যাবার সময় তাঁর বুকের ওপর আছড়ে পড়ে কি কান্নাটাই না কেঁদেছিল শোভা। ওর মনে হয়েছিল—বুক ফেটে যাবে বুঝি। সব চেয়ে প্রিয়জন যদি চলে যান ত বেঁচে থেকে কি লাভ!

সেই দিন সন্ধ্যাকালে দাহ শেষে ফিরে এসে যে হরিবোল ধ্বনি দিয়েছিল সবাই তার শব্দে শোভা কেঁপে উঠেছিল। কান্নার সঙ্গে কেমন যেন ভয় ভয় করেছিল। কিসের ভয়—কে জানে! পিসিমা যখন বললেন, এ ঘরে একটা পিদীম জেলে দাও আর যে কেউ একজন শুয়ে থাক ঘরে। শ্রাদ্ধ-শান্তি না চুকে গেলে মায়াবদ্ধ জীবাত্মা নাকি শেষ পার্থিব বন্ধনের জায়গাটিতে ঘোরাফেরা করতে থাকে। ভালবাসার জনদের প্রতি তখনও তার টান থাকে প্রবল।

তুই শুবি শোভা?

প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে সে বলেছিল, না।

কেন—আমিও শোব'খন।

না।

পরে মনে হয়েছিল ভারি অন্যায় করেছে ও। মায়ার বশে মা যদি সেই রাত্রিতে অলক্ষিতে এসে ওর চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে সান্ত্বনাই দিতেন দমকা হাওয়ার রীতি বলে ও হয়ত আলগা বেণীতে একটা শক্ত গিঁট দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ত। তিনি কখন এসে কি ভাবে স্নেহ প্রকাশ করতেন তা ওর মনের অগোচরে থাকত। কিন্তু তিনি হয়তো আসবেন এই প্রত্যাশায় ভয়ের খাদটা বড় বেশী মেশান ছিল। শরীরী যাঁকে ভাল লাগে—অশরীরী তিনি বিভীষিকার বস্তু!

সুধাংশুকে দেখে ওর ভয় হচ্ছে। ও যে এ জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে তাতে সংশয়মাত্র নেই, কিন্তু ওদের মধুর ভালবাসা আতঙ্কের আঘাতে নিঃশেষ হয়ে যাবে—সে আঘাত কি করে সহ্য করবে শোভা! হাঁ—ভালবাসার পারদরেখা দ্রুত নেমে যাচ্ছে তাপমান যন্ত্র থেকে। সুধাংশুর কথা ভেবে যত না আকুল হচ্ছে, নিজেকে নিয়ে ওর ভাবনা বাড়ছে। সত্যি ও বাঁচতে চায় না—বাঁচতে পারবে না—কিন্তু বাঁচতে না চাওয়া আর মৃত্যু এক বস্তু নয়। বাঁচতে না চাওয়াটা নৈরাশ্য-সঞ্জাত নিজের ভবিষ্যৎকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে কিনা এই সন্দেহ ও দুর্ব্বলতার লালনে উৎপন্ন একটি মনোভাব। সেটির পিছনে ধ্রুব-প্রস্তুতির ভূমি নাই। আর সত্যিই মরতে হবে এই বিশ্বাস মানুষকে সব দিক দিয়ে শূন্য করে তোলে—প্রবল ভয়ে সে বিচলিত হয়ে জীবনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে—না, না, তোমায় আমি চাই না—চাই না। এটা পরিহাসের মত, কিন্তু এইটাই সত্য। ভালবাসা থেকে আসক্তি ছেঁকে নিলে যা থাকে—তা দিয়ে জীবনের প্রয়োজন মেটে না।

৫

সুধাংশুর ভাবনা অন্য রকম। শোভার মত ভবিষ্যতের চিন্তা নয়—অতীত ওর কাছে অত্যন্ত উজ্জ্বল। সময়ের প্রবাহে যে মুহূর্ত্ত-চিহ্নিত ঘটনাগুলি একদা ভেসে গিয়েছে—উজান স্রোতে তার অধিকাংশই ফিরে আসছে। শুধু সুতোয় গাঁথা শুকনো ফুলের সমষ্টি নয়—তার শোভা, গন্ধ আর বার্ত্তা সব-কিছুতে পরিপূর্ণ এক একটি টাটকা ফুল গ্রন্থিবদ্ধ হচ্ছে। মুহূর্ত্ত থেমে থাকে না—তাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দু'দণ্ড নিরীক্ষণ করার দুরাশা যে জাগে মনে! সে দুরাশা জলের অবয়ব কল্পনার মত। যে আছে অথচ নাই তাকে রূপের মধ্যে বন্দী করে উপভোগ করার নেশা মানুষের সব চেয়ে বড় নেশা হয়তো—তাই পলায়নতৎপর মুহূর্ত্তগুলিকে সপ্রেমে সস্নেহে নিরীক্ষণ করার মত্ততা।

এরই মধ্যে ভবিষ্যৎ উঁকি মারে। যাকে ধ্রুব সত্য জেনে আশঙ্কায় মন ওঠে শিউরে—তাকে এক এক ফাঁকে দেখবার ইচ্ছা করে। পরিণাম ধ্রুব সে বস্তু কেমন? সব আকাঙ্ক্ষা যার সান্নিধ্যে এসে বিলুপ্ত হবে, সব বিক্ষোভ এবং দুর্ভাবনাও। ভালবাসার উৎস হয়তো শুকাবে—কিন্তু তাই কি মানুষের চরম বিলুপ্তি?

অর্দ্ধ নিশীথে নিভৃতে নীরবে—

এই দীপখানি নিতে যাবে যবে
বুঝিব কি কেন এসেছিনু ভবে—

অস্ফুটকণ্ঠে বার বার আবৃত্তি করে সুধাংশু।

শোভা ওর অস্ফুট স্বরে ছুটে এসে শিয়রে দাঁড়ায়। জিজ্ঞাসা করে, কিছু বলছ ?

সুধাংশু শোভার পানে তাকায়। দৃষ্টিতে তার বিস্ময় ও অপরিচয়ের অন্ধকার। এই অন্ধকারে উন্মুখ-যৌবনা মেয়েটিকে রহস্যের প্রতীক বলে মনে হয়। ওর মনে যে উদ্বেগ—সুধাংশুর দৃষ্টিতে তার ছায়া ভাসে না। ওরা পরস্পরবিরোধী জগতের প্রাণী। ভাষার মাধ্যমে ভাব বিনিময় হয়—কিন্তু বোবা ভাষা অক্ষম ভাবকে বহন করে নিয়ে যাবে কতটুকু দূরে ? এক হৃদয়ের প্রান্ত থেকে অন্য হৃদয়ের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত দূরত্ব যে লক্ষ যোজন ক্রোশ।

না—শোভাকে বলবার কি-ইবা আছে! মাথা নাড়ে সুধাংশু। না, বলবার কিছু নাই।

আপন মনে ও বলে, যা কিছু নূতন তাই মনোহর—তাতেই মানুষের আসক্তি বেশী।

কথাটা যেই বলুক—তারই অনুসরণে সুধাংশু বহদূর এগিয়েছে। যে নূতন ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে বিমুখ করবার ক্ষমতা ওর নাই।

শোভা কেঁদে বললে, ওগো তুমি তো এমন নিষ্ঠুর ছিলে না—একবার বল আমায়—

সুধাংশু ক্ষীণভাবে হাসলে। বিয়োগ-সম্ভাবনা মুহূর্ত্তে মানুষের এমন আর্ত্তস্বর ও বহুবার শুনেছে সে স্বর বহুদূর থেকে ভেসে আসে, সে স্বর অনাত্মীয়ের। সে স্বরে প্রাণের ব্যাকুলতা থাকলে নূতন পথের যাত্রী ফিরেও চাইত না কি একবার! না, পৃথিবীতে তেমন দৃষ্টান্ত নাই।

সুধাংশু আবার মনে মনে বলে, যা-কিছু নূতন তাই মনোহর তাতেই মানুষের আসক্তি বেশী এবং তাই ধ্রুব সত্য।

সত্যমপ্রিয়ম্

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ব্রিটিশ! তোমরা ধর্ম্মের সীমা করিছ অতিক্রম,
সে অমিত তেজ কোথায় ? কোথা সে মানসিক বিক্রম ?
আড়াল করিয়া তব বিবেকের স্তিমিত দীপের শিখা—
বিভীষিকা আর অহমিকা সহ দাঁড়ায়েছে আমেরিকা।
তোমার পুণ্য, আয়ু, যশ, জয় দ্রুত হইতেছে ক্ষয়,
অতি দর্পের আতিশয্যকে কেন দাও প্রশ্রয় ?
"কোরিয়া"কে করি ধর্ম্মক্ষেত্র 'ডলারে'র গুরু ভারে,
'এটম বোমার' কর্ম্মকাণ্ড চলিবে নির্ব্বিচারে।
পাপ-প্রদিগ্ধ, রক্তসিক্ত সৌখ্য করিতে ভোগ
করিছ মহান্ ঐতিহ্যের মুখাগ্নি উদ্যোগ ?

খ্রীষ্টের বাণী ভুলেছ তোমরা, ভুলেছ তাঁহার ক্ষমা,
ধরেছ তাঁহার ক্রুশ এক হাতে, অন্য হস্তে বোমা।
তোমার জাতির প্রার্থনা স্মর,—সে পণ, প্রতিশ্রুতি,
কল্যাণকৃৎ কি লোভে হতেছ ধ্বংসকার্য্যে ব্রতী ?
বীর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ অজেয় জলে স্থলে,
রেখেছে তাদের চরণের চিনে বিপুল ভূমণ্ডলে,
ভোগ ও ত্যাগের প্রতীক মুছিয়া, মুছি' আদর্শ হেন,
ব্যাঘ্রের থাবা নখরের চিনে রাখিয়া যাইবে কেন ?
রাজসূয় যারা করিতে পারিত নন্দিত করি দেশ
তাহাদের সব আয়োজন হবে মারণ যজ্ঞে শেষ ?

'ইউ, এন, ও' কি তাহা তোমরাই জানো—এটুকুও জেনে নিয়ো,
গৃহবিরোধ সে মিটাইতে আসি জ্বালাইয়া দেয় গৃহ।
বসাইতে গিয়া মহামানবের মহা-মিলনের মেলা,
জটিল কুটিল ষড়যন্ত্রের সে পাতায় জুয়াখেলা।
বিশ্বশান্তি, মঙ্গল ব্রত, বড় বড় ধ্বনি মুখে
বৃষ্টি হইতে রক্ষা সে করে ডুবায়ে নদীর বুকে।
ক্ষীতি কখনোই স্থিতি আনে নাকো ডেকে আনে শুধু ক্ষয়
উহাতে সৃজনী জীবনী শক্তি নাহিক সুনিশ্চয়।
হও সতর্ক, আছে তোমাদের কিছু হিতাহিত বোধ
অকীর্ত্তিকর অবাঞ্ছনীয় অভিযান কর রোধ।

তোমার মহৎ বৃহৎ জাতিতে একটা কি নাই প্রাণ ?
সদর্পে বলে "পাশবিকতার চাই চাই অবসান।"
বৃথা কৃষ্টির জয়গান কর, কি মূল্য আছে তার ?
বসুধাকে যদি করে তোলে তাহা বিশাল হত্যাগার।
শক্তিপূজারী গড়িতে চাহিছে যারা ভুবনেশ্বরী
অহঙ্কারেতে বিমূঢ়, নাচিছে ছিন্নমস্তা গড়ি'।
কলুষিত করি, কুৎসিত করি সজ্জিত এ ভুবন,
কোথায় রহিবে আজিকার সব দম্ভী দুর্য্যোধন ?
ভাবিছে যাহারা হর্ত্তাকর্ত্তা, কতটুকু তার দাম ?
ইতিহাসে রবে অভিশপ্ত ও গ্লানিকর ক'টা নাম।

সংস্কৃত ছন্দ

শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ

সকল ভাষাতেই কবিতা আছে এবং কবিতার বিবিধপ্রকার ছন্দ আছে। বাংলা ভাষায় বহুবিধ ছন্দ আছে। তন্মধ্যে পয়ার ও ত্রিপদী সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। বর্তমান যুগের কয়েক বৎসর বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যে যত পদ্য-রচনা আছে তাহার প্রায় সমস্তই পয়ার ছন্দে লেখা। কাশীরাম দাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, বিবিধ পাঁচালী প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, প্রভৃতি কবিদের রচনা প্রায় সবই পয়ার ছন্দে। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তির পূর্বেকার রচনার অধিকাংশই এই ছন্দে। আধুনিক দুইখানি বড় কাব্য পৃথ্বীরাজ ও শিবাজী এই পয়ার ছন্দেই রচিত। মোট কথা, পয়ার ছন্দে লিখিত কবিতার তুলনায় পয়ারেতর ছন্দে লেখা কবিতার পরিমাণ অতি সামান্য। এই পয়ারের অতিপরিচিত লক্ষণ বিবৃত করিবার আবশ্যকতা নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে :

গণিত-শিক্ষক এক অতি দুর্বিনীত,
ছন্দের ব্যাখ্যান লাগি' হেথা উপনীত।

চৌদ্দ অক্ষর, শেষ অক্ষরের মিল, তৎপূবের স্বরবর্ণের মিল, আট অক্ষরের পরে যতি, পয়ারের এই সকল লক্ষণই ইহাতে আছে।

প্রচলিত বাংলা ছন্দের মধ্যে পয়ারের পরই ত্রিপদী। যেমন :

উঠি তেতলায় বসি নিরালায়
চাহি জানালার পানে।
খুলি রাফ্ খাতা পাতায় পর পাতা
ভরিনু কবিতা গানে।

এই প্রকার ছন্দকে ত্রিপদী না বলিয়া ষট্‌পদী বলাই বোধ হয় সমীচীন। পয়ার ও ত্রিপদীর বহুপ্রকার রীতিভেদ থাকিলেও মোটের উপর এই দুইটি ছন্দই ক্লাসিক্যাল—বাংলার সর্বাধিক প্রচলিত ছন্দ।

বাংলায় যেমন পয়ার ও ত্রিপদী, সংস্কৃত ভাষায় তেমনই অনুষ্টুপ ও উপজাতি। এ সম্বন্ধে এখন বলিতেছি।

সংস্কৃত কবিতায় একটি শ্লোকে চারটি চরণ থাকে। প্রতি চরণে এক বা একাধিক অক্ষর। প্রতি চরণে সম-সংখ্যক অক্ষর থাকে এবং প্রত্যেকটী চরণে কোন্ অক্ষরটি লঘু হইবে বা কোন্ অক্ষরটি গুরু হইবে, তাহা নির্দিষ্ট থাকে।

লঘুত্ব ও গুরুত্ব সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই—

সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ।
বর্ণসংযোগপূর্বশ্চ তথা পাদান্তগোঽপি বা।

অ, ই, উ এবং ঋকারান্ত অক্ষর লঘু; আ, ঈ, ঊ, ৠ, ৯, এ, ঐ, ও, ঔ-কারান্ত অক্ষর গুরু। বিসর্গান্ত ও অনুস্বারান্ত বর্ণ এবং সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী বর্ণ গুরু। কোন চরণের শেষ অক্ষরটি লঘু হইলে উহাকে লঘু বা গুরু উভয়ই ধরা যাইতে পারে। এই নিয়ম অনুসারে চরণের প্রতি অক্ষরের লঘুত্ব বা গুরুত্ব নির্ণীত হয়।

প্রতি চরণের অক্ষরসংখ্যা ও অক্ষরের লঘুত্ব ও গুরুত্ব নির্দিষ্ট হইলে একটি ছন্দ গঠিত হয় এবং সেই ছন্দের একটি নামকরণ করা হয়।

ছন্দ বহুপ্রকার এবং ইহাদের নামও বহুবিধ। কোন ছন্দে প্রতি চরণে কতগুলি অক্ষর থাকিবে এবং তাহাদের কোন্‌টি লঘু হইবে এবং কোন্‌টি গুরু হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য প্রতি ছন্দের জন্য এক একটি সূত্র রচিত হয়। এই সূত্রগুলিতে সাংকেতিক হিসাবে নিম্ন-লিখিত চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে :

লঘু—ল
গুরু—গ

ম (গ গ গ), ন (ল ল ল), ভ (গ ল ল),
য (ল গ গ), জ (ল গ ল), র (গ ল গ),
স (ল ল গ), ত (গ গ ল)।

যদি কোন ছন্দ সম্বন্ধে বলা হয় যে, উহার প্রতি চরণে ভ ম স থাকিবে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে উক্ত ছন্দে প্রতি চরণে নয়টি অক্ষর আছে এবং সেগুলি গ ল ল গ গ গ ল ল গ। এই ছন্দটির নাম 'মণিমধ্য'।

পূর্বেই বলিয়াছি, সংস্কৃত ছন্দের মধ্যে অনুষ্টুপ ও উপজাতি সমধিক প্রচলিত। তন্মধ্যে অনুষ্টুপই সর্বাধিক প্রচলিত। সুতরাং ইহাকে সংস্কৃতের পয়ার ছন্দ বলা যাইতে পারে। এই ছন্দের লক্ষণ এই :

পঞ্চমং লঘু সর্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ।
গুরুষষ্ঠঞ্চ পাদানাং শেষেষনিয়মো মতঃ।

প্রতি চরণের পঞ্চম অক্ষরটি লঘু, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের সপ্তম অক্ষরটি লঘু, প্রতি চরণের ষষ্ঠ অক্ষর গুরু এবং অন্যান্য অক্ষর সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। অন্যান্য অক্ষরগুলি সম্বন্ধে সূত্রানুসারে কোন নিয়ম না থাকিলেও,

প্রচলিত প্রথা এই যে প্রতি চরণের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অক্ষরের অন্ততঃ একটি গুরু হইবে। উপরে যে সূত্রটি দেওয়া হইয়াছে, উহাও অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত। আরও দুই-একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যেমন:

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়।

লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, প্রতি চরণের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অক্ষরের অন্তত একটি গুরু, পঞ্চমটি লঘু, যষ্ঠটি গুরু, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের সপ্তম অক্ষরটি লঘু।

গল্প আছে, জনৈক পণ্ডিত বিক্রমাদিত্যের সভায় গমনকালে যে পাল্কীতে ছিলেন কবি কালিদাস নাকি সেই পাল্কীর বাহকরূপে ছদ্মবেশে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে পাল্কীর ভিতর হইতে পণ্ডিত মহাশয় অনুষ্টুপ-ছন্দে বলিলেন:

ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জাল্ম স্কন্ধস্তে যদি বাধতি।

কবি কালিদাস এই ব্যাকরণবিভ্রাট সহিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন:

ন বাধতে তথা স্কন্ধো যথা বাধতি বাধতে।

বাধ্ ধাতুটি আত্মনেপদী বলিয়া বাধতি-শব্দটি কবি কালিদাসকে পীড়া দিয়াছিল।

একটি উদ্ভট শ্লোক:

অগাধজ্ঞানসঞ্চারী বিকারী ন চ পণ্ডিতঃ।
গণ্ডুষজ্ঞানমাত্রেণ ভাস্করো বকবকায়তে।

ইহার একটি পাঠান্তর এইরূপ:

অগাধজলসঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিতঃ।
গণ্ডুষজলমাত্রেণ ভাস্করশ্চকচকায়তে।

জনৈক রাজভক্ত পণ্ডিত আকবর সম্পর্কে অনুষ্টুপ ছন্দে বলিয়াছেন:

বিধিনা তুলিতাবেতৌ সেকেন্দর-পুরন্দরৌ।
গুরুঃ সেকেন্দরঃ পৃথ্বীং লঘুরিন্দ্রো দিবং যযৌ।

এক পণ্ডিত মহাশয় কাঁঠালের বীজ খাইতে ভালবাসেন। তাই তিনি লিখিলেন:

অস্তি চেৎ পানসং বীজং ব্যঞ্জনৈঃ কিং প্রয়োজনম্।
নাস্তি চেৎ পানসং বীজং ব্যঞ্জনৈঃ কিং প্রয়োজনম্।

দেবতারা যে দুর্বলকেই বিনাশ করিতে ভালবাসেন, তাহার প্রমাণ:

ব্যাঘ্রং নৈব গজং নৈব সিংহং নৈব নৈব চ।
অজাপুত্রং বলিং দদ্যাৎ দেবো দুর্বলঘাতকঃ।

যশোহরের আশ্চর্য ব্যাপার সম্পর্কে কবি অনুষ্টুপ ছন্দে বলিতেছেন:

জগৎপ্রাণো হরেৎ প্রাণান্ জীবনং হন্তি জীবনম্।
যশোহরে কিমাশ্চর্যং প্রাণদা যমদূতিকা।

যমদূতিকার অর্থ তেঁতুল।

সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতায় পীড়িত হইয়া কবি অনুষ্টুপ ছন্দে আক্ষেপ করিতেছেন:

সুর্যাদয়ো গ্রহাঃ সর্বে তুষ্যন্ত্যাচিতদানতঃ।
সর্বস্বেনাপি ন তুষ্যেৎ জামাতা দশমো গ্রহঃ।

জনৈক কবি দুইটি ভার্যার স্বামীর সৌভাগ্য সম্বন্ধে বলিতেছেন:

বিলাদ্বহির্বিলস্থাস্তঃ স্থিতমার্জারসর্পয়োঃ।
আখুমধ্য ইবাভাতি দ্বিভার্যো দুর্বলো নরঃ।

আখুর অর্থ ইঁদুর। 'গর্তের মধ্যে সাপ, বাহিরে বিড়াল, তাহার মাঝখানে যেমন ইঁদুর, তেমন দুই ভার্যার মধ্যে দুর্বল স্বামী।'

দেবী কমলা কেন কমলে শয়ন করেন, মহাদেব কেন হিমালয়ে বাস করেন এবং নারায়ণ কেন ক্ষীরসমুদ্রে শয়ন করেন, তাহার কারণ সম্বন্ধে জনৈক কবির গবেষণার ফল অনুষ্টুপ-ছন্দে বিবৃত হইয়াছে:

কমলে কমলা শেতে হরঃ শেতে হিমালয়ে।
ক্ষীরাব্ধৌ চ হরিঃ শেতে মন্যে মৎকুণশঙ্করা।

মৎকুণের অর্থ ছারপোকা।

বাঙালীর ভোজের সময়ে পরিবেশন সম্পর্কে একটি সূত্র অনুষ্টুপ-ছন্দে লিখিত হইয়াছে:

হাঁ হাঁ দদ্যাদ্ হুঁ হুঁ দদ্যাদ্ দদ্যাচ্চ করকম্পনে।
শিরসঞ্চালনে দত্তান্ন দদ্যাদ্ ব্যাঘ্রঝম্পনে।

কতকগুলি ছন্দ আছে, যাহাদের প্রতি চরণে অক্ষর-সংখ্যা সমান এবং লঘু-গুরু-বিন্যাসও প্রায় সমান। যেমন ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দ। উভয়েরই প্রতি চরণে এগারটি অক্ষর আছে। ইন্দ্রবজ্রার লক্ষণ এই:

স্যাদিন্দ্রবজ্রা যদি তৌ জগৌ গঃ।

দুইটি ত, একটি জ এবং দুইটি গ পর পর সাজাইলে ইন্দ্রবজ্রা হয়। পূর্বোক্ত নির্দেশ অনুসারে ইহার রূপ:

গ গ ল গ গ ল ল গ ল গ গ

ঠিক এই ছন্দেরই প্রথম অক্ষরটি গুরু না হইয়া যদি লঘু হয়, তাহা হইলে এই ছন্দটিকে উপেন্দ্রবজ্রা বলা হয়। সূত্রটি এই:

উপেন্দ্রবজ্রা প্রথমে লঘৌ সা।

যে সকল শ্লোকের কোন কোন চরণ এক ছন্দের এবং কোন কোন চরণ অপর এক ছন্দের, তাহাকে উপজাতি ছন্দের শ্লোক বলা হয়। সাধারণতঃ উপজাতি বলিতে উপেন্দ্রবজ্রা ও ইন্দ্রবজ্রার সংমিশ্রণই আমরা বুঝি, কারণ এই জাতীয় শ্লোকের সংখ্যা অগণ্য এবং এগুলি অতিপ্রচলিত। অনুষ্টুপের পরেই এই প্রকারের উপজাতি ছন্দের প্রচলন সমধিক। ইহার অগণিত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। দুই-একটির উল্লেখ করিতেছি। যেমন:

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাঽপি।

ইহার দ্বিতীয় চরণটি ইন্দ্রবজ্রা, অপর তিনটি উপেন্দ্রবজ্রা।

একবার একটি স্কুলে ইন্স্পেক্টর গিয়াছিলেন। একটি ক্লাসে গিয়া প্রথামত কতকগুলি প্রশ্ন করেন। প্রশ্নগুলি কঠিন নহে। কিন্তু থতমত খাইয়া সেই প্রশ্নগুলির উত্তর কেহ ভাল করিয়া দিতে পারিল না। ইন্স্পেক্টর চলিয়া যাইবার পরক্ষণেই একটি বালক খাতায় একটি উপজাতি ছন্দের শ্লোক লিখিয়া সহপাঠীদিগকে পড়িয়া শুনাইল। শ্লোকটি এই :

ইন্স্পেক্টরে বৈ পরিদৃশ্যমানে
ভীতিশ্চ লজ্জা সমুদেতি চিত্তে।
বালাঃ স্বভীতা ইহ কম্পমানা
জ্ঞাত্বাঽপি জিজ্ঞাসিতমত্র মূকাঃ।

'ইন্স্পেক্টরে' কথাটিতে যদি কাহারও আপত্তি থাকে, তাহা হইলে 'বিদ্যালয়ে' লেখা যাইতে পারে। ছন্দ ঠিক থাকিবে।

আমরা সাধারণতঃ মিথ্যাভাষণকে দূষণীয় বলিয়া মনে করি। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে মিথ্যাভাষণ দূষণীয় নহে। তাহার প্রমাণ উপজাতি ছন্দে গ্রথিত হইয়াছে :

ন নর্মযুক্তং বচনং হিনস্তি
ন স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহকালে।
প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে
পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি।

অবশ্য ইহাতে মাত্র পাঁচ প্রকার অনৃতের ব্যবস্থা আছে। তবে একবার আরম্ভ করিলে পাঁচ হইতে ছয়ে এবং ছয় হইতে সাতে যাওয়া মোটেই কঠিন নহে।

লৌকিক মতে মূর্খত্বের কয়েকটি লক্ষণ আছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি কবি উপজাতি ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন :

খাদন্ ন গচ্ছামি হসন্ ন জল্পে
গতং ন শোচামি কৃতং ন মন্যে।
দ্বাভ্যাং তৃতীয়ো ন ভবামি রাজন্
কথং তু ভোজ ভবামি মূর্খঃ।

এই শ্লোকটিতে প্রথম ও তৃতীয় চরণ ইন্দ্রবজ্রা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ উপেন্দ্রবজ্রা।

সংস্কৃত যে-কোন কাব্য লক্ষ্য করিলেই অনুষ্টুপ ও উপজাতির অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যাইবে। কবি কালিদাস 'রঘুবংশ' আরম্ভ করিয়াছেন অনুষ্টুপ-ছন্দে :

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ।

'কুমারসম্ভবে'র আরম্ভ উপজাতি ছন্দে :

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়নিধীবগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।

চরণগুলি দ্বাদশ-অক্ষরবিশিষ্ট, এরূপ একটি ছন্দের নাম 'তোটক'। ইহার সূত্র :

বদ তোটকমব্ধিসকারযুতম্।

লঘু-গুরু হিসাবে ইহার লক্ষণ :

ল ল গ ল ল গ ল ল গ ল ল গ

উদাহরণস্বরূপ অতিপরিচিত একটি স্তবের উল্লেখ করা যাইতে পারে :

প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং
গুণহীনমহীশগরাভরণম্।
রণনির্জিতদুর্জ্জয়দৈত্যপুরং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।

'বসন্ততিলক' নামে একটি ছন্দ আছে। ইহার প্রতি চরণে চৌদ্দটি অক্ষর। ইহার সূত্র :

জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজাজগৌগঃ।

অর্থাৎ ত, ভ, জ, জ, গ, গ মিলিয়া একটি চরণ হয়। লঘু-গুরু হিসাবে লিখিলে এইরূপ হয় :

গ গ ল গ ল ল ল গ ল ল গ ল গ গ

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে :

প্রাক্ পাদয়োঃ পততি খাদতি পৃষ্ঠমাংসং
কর্ণে কলং কিমপি রৌতি শনৈর্বিচিত্রম্।
ছিদ্রং নিরূপ্য সহসা প্রবিশত্যশঙ্কঃ
সর্বং খলস্য চরিতং মশকঃ করোতি।

'মশক খলের চরিত্র অনুসরণ করে। প্রথমে পায়ে পড়ে, পরে পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে, কর্ণে বিচিত্র মধুর স্বর তোলে, তারপর ছিদ্র পাইলেই নিঃশঙ্কচিত্তে দংশন করে।'

সুপরিচিত 'মন্দাক্রান্তা' ছন্দে প্রতি চরণে সতেরটি অক্ষর থাকে। সূত্রটি এই :

মন্দাক্রান্তাঽম্বুধিরসনগৈর্মো ভনৌ তৌ গযুগ্মং।

অর্থাৎ :

গ গ গ গ ল ল ল ল ল গ গ ল গ গ ল গ গ

কবি কালিদাসের 'মেঘদূতে'র প্রথম শ্লোক :

কশ্চিৎকান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু।

ইহারই অনুরূপ আর একটি শ্লোক :

একা ভার্যা প্রকৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া
পুত্রোঽপ্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ।
শেষঃ শয্যা সদনমুদধৌ বাহনং পন্নগারিঃ
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ।

এই শ্লোকে বিষ্ণুর দারুময় মূর্তিধারণের কারণ বর্ণিত হইয়াছে।

অনেক ব্রাহ্মণ-কবি দৈবদুর্বিপাকে কুম্ভকারবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হইয়া তাঁহার নূতন বৃত্তির কথা মন্দাক্রান্তা ছন্দে বর্ণনা করিতেছেন—

চিন্তাচক্রে ভ্রমতি নিয়তং মন্মনোমৃত্তিকেয়
মার্দ্রীভূতা নয়নসলিলৈ র্ভ্রাম্যতে দৈন্যদণ্ডৈঃ।
আশাকুম্ভাঃ কতি কতি কৃতাশ্ছেদিতাঃ কর্মসূত্রৈ
র্জাত্যা বিপ্রঃ পুনরহমহো কুম্ভকারোঽস্মি বৃত্ত্যা।

অর্থাৎ, আমার মনমৃত্তিকা সতত চিন্তাচক্রে নয়নসলিলে সিক্ত হইয়া দৈন্যদণ্ড দ্বারা বিঘূর্ণিত হইতেছে, অনেক আশাকুম্ভ নির্মিত হইয়া কর্মসূত্র দ্বারা ছিন্ন হইতেছে। অহো! জাতিতে ব্রাহ্মণ হইয়াও আমি বৃত্তিতে কুম্ভকার।

মহৎপ্রাণ ব্যক্তিরা নিপীড়িত হইলেও মহত্ত্ব পরিত্যাগ করেন না, এই কথা মন্দাক্রান্তা ছন্দে কবি বলিতেছেন :

ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং পুনরপি পুনশ্চন্দনং চারুগন্ধং
ছিন্নং ছিন্নং পুনরপি পুনঃ স্বাদু চৈবেক্ষুকাণ্ডম্।
দগ্ধং দগ্ধং পুনরপি পুনঃ কাঞ্চনং কান্তবর্ণং
প্রাণান্তেঽপি প্রকৃতিবিকৃতি র্জায়তে নোত্তমানাম্।

'শার্দূলবিক্রীড়িত' নামে একটি ছন্দ আছে। তাহার প্রতি চরণে উনিশটি অক্ষর। সূত্রটি এই :

অর্কাশ্বৈর্মসজস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দূলবিক্রীড়িতম্।

লঘু-গুরু অনুসারে উনিশটি অক্ষর এইরূপ :

গ গ গ ল ল গ ল গ ল ল ল গ গ গ ল গ গ ল গ

কবি এই ছন্দে কদলীবৃক্ষের গুণ বর্ণনা করিতেছেন :

বল্কং শ্রাদ্ধবিধায়কং তব ফলং দেবাদিসন্তর্পণং
পুষ্পং ব্যঞ্জনমুত্তমং পরিভবেৎ মূলং দরিদ্রাদনম্।
পত্রং ভোজনসৌখ্যদং কিমপরং ক্ষারেণ বস্ত্রং শুচি
ধন্যস্ত্বং কদলীতরো পরহিতে যদ্ দেহপাতঃ পণঃ।

'তোমার বল্কলে শ্রাদ্ধাদি কার্য সম্পন্ন হয়, ফলে দেবাদির তর্পণ হয়, পুষ্পে উত্তম ব্যঞ্জন হয়, মূল দরিদ্রেরা ভক্ষণ করে, পত্রে আহারে সুখ হয়, ক্ষারে বস্ত্র শুচি হয়; পরহিতে দেহপাত তোমার পণ, তুমি ধন্য।'

একটি গল্প আছে। একবার বিক্রমাদিত্যের সভায় প্রচার করা হইল যে, যে কবি সম্পূর্ণ নূতন একটি শ্লোক শুনাইতে পারিবেন তাঁহাকে একটি উত্তম পুরস্কার দেওয়া হইবে। বিচারের দিনে সভায় তিন জন শ্রুতিধর পূর্ব-নির্দেশ অনুসারে উপস্থিত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন যে-কোন শ্লোক একবার শুনিলে, অপর একজন দুইবার শুনিলে এবং তৃতীয় জন তিনবার শুনিলেই কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতে পারিতেন। প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতগণ একে একে উপস্থিত হইয়া কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন শ্লোকই নূতন বলিয়া প্রতিপন্ন হইল না। কারণ শ্লোকটি একবার আবৃত্তি করা হইলেই, প্রথম শ্রুতিধর বলিলেন, 'এ ত আমার জানা শ্লোক, এই আমি পুনরাবৃত্তি করিতেছি।' এইরূপে দুইবার আবৃত্ত হইলে দ্বিতীয় শ্রুতিধর বলিলেন, এটা ত আমিও জানি, এই দেখ আমি আবৃত্তি করিতেছি। এইরূপে তিনবার আবৃত্ত হইবার পর তৃতীয় শ্রুতিধরটিও উহার পুনরাবৃত্তি করায় মোটের উপর শ্লোকটির নূতনত্ব অপ্রতিপন্ন হইল। এইরূপে সকল কবিই প্রতারিত হইলেন। কিন্তু কবি কালিদাস আসল ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া এমন একটি শ্লোক রচনা করিলেন যাহা কোন শ্রুতিধরের পক্ষেই একবার শুনিয়া কণ্ঠস্থ করা সম্ভব নয়। এই শ্লোকটি শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রচিত :

বার্চারেড়্ধ্বজধগ্ ধৃতোড়্ধিপতিঃ কুধ্রেড়্জজানির্গণেড়্
গোরাড়ারূড়্ রঃসরেড়্ রুক্তরগ্রৈবেয়কভ্রাড়্রম্।
উদ্যদ্দৃগ্ নরকাস্থিধৃক্ ত্রিদৃগিভেড়ার্দ্রাজিনৈঃ সচ্ছবিঃ
সোঽস্ত্বাদস্মুমদস্মুদালিগলরুগ্ দেবো মুদে বো মৃড়ঃ।

বার্চার—জলচর, বার্চারেশ্—মকর, বার্চারেড়্ধ্বজ—কন্দর্প, বার্চারেড়্ধ্বজধক্—কন্দর্পকে যিনি দহন করিয়াছেন, উড়্—নক্ষত্র, উড়্ধিপতি—চন্দ্র, ধৃতোড়্ধিপতি—যিনি চন্দ্রকে ধারণ করেন, কু—পৃথিবী, কুধ্র—পর্বত, কুধ্রেশ্—হিমালয়, কুধ্রেড়জ—পার্বতী, কুধ্রেড়জজানি—পার্বতীর পতি; ইত্যাদি।

এই শ্লোকটিতে মহাদেবের প্রশস্তি রচিত হইয়াছে। ইহা একবার শুনিয়া মুখস্থ করা সম্ভব কি?

'স্রগ্ধরা' নামে একটি ছন্দ আছে। ইহার প্রতি চরণে একুশটি অক্ষর। ইহার সূত্র :

ম্রভ্নৈর্যানাংত্রয়েণ ত্রিমুনিযতিযুতা স্রগ্ধরা কীর্তিতেয়ম্।

লঘু গুরু অনুসারে ইহার রূপ :

গ গ গ গ ল গ গ ল ল ল ল ল ল গ গ ল গ গ ল গ গ

উদাহরণস্বরূপ আলিবর্দি খাঁর শ্রাদ্ধ-উপলক্ষে সিরাজ-উদ্দৌলা ব্রাহ্মণগণকে স্রগ্ধরাছন্দে রচিত যে নিমন্ত্রণপত্র দিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নাকি বাণেশ্বর তর্কালঙ্কার দ্বারা শ্লোকটি রচনা করাইয়াছিলেন। শ্লোকটি এই :

খোদাপাদারবিন্দদ্বয়ভজনপরো মাতৃতাতো মদীয়
আলীবর্দীনবাবো বিবিধগুণযুতোঽন্নামুখঃ পশ্চিমাস্যঃ।
মর্ত্যাং দেহং জহৌ যং মুনসরমুলুকঃ সীরজদ্দৌলনামা
যাচেঽহং মাং ভবন্তো গলধৃতবসনঃ শুদ্ধতাং সংনয়ন্তাম্।

ইলিশ মাছ বাঙালীর প্রিয়। জনৈক কবি স্রগ্ধরা ছন্দে ইহার প্রশস্তি গাহিয়াছেন :

বিশ্বাধারো হি বায়ুস্তদুপরি কমঠস্তত্র শেষস্ততো ভূ
স্তস্যাং কৈলাসশৈলস্তদুপরি ভগবান্ মস্তকে তস্য গঙ্গা।
স্নিগ্ধঃ পীযূষতুল্যস্তদুদরকুহরে শ্রীলিশোঽকিল্বিষোঽস্তি
মাহাত্ম্যং তস্য কো বা প্রকথয়িতুমলং ভক্ষণাদ্ যস্য মুক্তিঃ।

অর্থাৎ, বিশ্বের আধার বায়ু, তাহার উপর কচ্ছপ, তাহার উপর নাগরাজ, তাহার উপর পৃথিবী, তাহার উপর

কৈলাস পর্বত, তাহার উপরে ভগবান্, তাহার মস্তকে গঙ্গা, তাহার উপরে স্নিগ্ধ পীযূষতুল্য সুনির্মল ইলিশ মাছ, ভক্ষণে তে' 'র মুক্তি। তাহার মাহাত্ম্য কে বর্ণনা করিতে পারে?

কমঠের অর্থ কচ্ছপ। অকিঞ্চিষের অর্থ নিষ্পাপ, নির্মল।

কয়েকটি মাত্র ছন্দের উদাহরণ উল্লিখিত হইল। এইরূপ বহু ছন্দ আছে। একটি চরণে একটি অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া একটি চরণে ত্রিশটি অক্ষর পর্যন্ত থাকিতে পারে। বিভিন্ন প্রকার বৃত্ত ছন্দের সংখ্যা এক শত পঁচিশেরও বেশী।

বৃত্ত ছন্দের প্রতি চরণের প্রতি অক্ষরের লঘুত্ব ও গুরুত্ব সুনির্দিষ্ট। আর এক শ্রেণীর ছন্দ আছে, তাহাকে মাত্রা-ছন্দ বলে। ইহাতে প্রতি চরণের মাত্রার সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে। একটি লঘু অক্ষরকে অর্ধ মাত্রা, দুইটি লঘু অক্ষরকে এক মাত্রা এবং একটি গুরু অক্ষরকে এক মাত্রা ধরা হয়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে:

নলিনীদলগতজলমতিতরলং
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।

এখানে নলি এক মাত্রা, নী এক মাত্রা, দল এক মাত্রা, গত এক মাত্রা, লং এক মাত্রা ইত্যাদি। এইরূপে গণনা করিলে দেখা যাইবে, এই শ্লোকের প্রতি চরণে আটটি করিয়া মাত্রা আছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দের 'রতিসুখ-সারে গতমভিসারে' মাত্রাছন্দের উদাহরণ।

আরও এক শ্রেণীর ছন্দ আছে, তাহাকে সাধারণ ভাবে বৈদিক ছন্দ বলা হয়। বেদ-উপনিষদাদিতে ভাবেরই প্রাধান্য, ছন্দ বা ভাষার নহে। এই সকল ছন্দে প্রতি অক্ষরের লঘুত্ব ও গুরুত্ব এবং প্রতি চরণের অক্ষরসংখ্যা সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট নিয়ম নাই। এমন বহু ছন্দ আছে, যেগুলি অনেকটা উপরিবর্ণিত কোন কোন বিধিবদ্ধ ছন্দের মত হইলেও ঠিক তদনুরূপ নহে। অথচ পড়িলেই বুঝা যায়, উহা সম্পূর্ণ গদ্যও নয়। যেমন:

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষো বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্।

ইহার আকার ও গঠন অনেকটা সাধারণ উপজাতির মত, কিন্তু উপজাতির সব লক্ষণ ইহাতে নাই।

আর একটি কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। সংস্কৃত ভাষাকে অনেকে কটমট অর্থাৎ রূঢ় ও কর্কশ ভাষা বলিয়া মনে করেন। ইহা যে সত্য নয়, যাঁহারা অতি সামান্যও এই ভাষার চর্চা করিয়াছেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন। কেহ কেহ মনে করেন, সংস্কৃত ছন্দে প্রতি অক্ষরের লঘুত্ব ও গুরুত্ব নির্দিষ্ট হওয়ায় উহার স্বাভাবিক মাধুর্য ও লালিত্যের হানি ঘটে। কিন্তু এ কথাও ঠিক নয়। সংস্কৃত ভাষা শব্দসম্ভারে অতীব সমৃদ্ধ। ইহার শব্দ-সংখ্যার ইয়ত্তা নাই। সংস্কৃত সকল শব্দ সন্নিবিষ্ট থাকিবে, এমন কোন অভিধান প্রণয়ন অসম্ভব। সুতরাং ভাষাভিজ্ঞ কবি এই সকল ছন্দোবদ্ধ শ্লোকের মধ্যেও ভাবানুযায়ী শব্দসম্ভার সঞ্চয়ন করিতে এবং কাব্যের সকল প্রকার গুণ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। সামান্য একটি উদাহরণ দিতেছি।

বিশ্বামিত্রের আশ্রমে রাক্ষসেরা উৎপাত করিতেছে এবং আশ্রমস্থ মুনিগণের তপস্যার বিঘ্ন ঘটাইতেছে। তপোবলে বহু অসাধ্য সাধন করিতে পারিলেও রাক্ষস-গণের বিরুদ্ধে ইঁহারা কিছুই করিতে পারিতেছেন না। অবশেষে তাঁহারা বীর পুত্র দুইটিকে পাঠাইয়া রাক্ষসগুলিকে বিতাড়িত ও বিনষ্ট করিতে রাজা দশরথকে অনুরোধ করিলেন। দশরথ সম্মত হইলেন এবং রাম ও লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের আশ্রম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন শরৎ কাল। পথে নানাপ্রকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া তরুণ বীরদ্বয় পরম আনন্দ লাভ করিলেন। এক স্থানে দেখেন, গোপাঙ্গনাগণ মন্থনদণ্ড ও রজ্জুর সাহায্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দধি মন্থন করিতেছেন। এই দৃশ্যটি কবি বর্ণনা করিয়াছেন উপজাতি ছন্দে:

বিবৃত্তপার্শ্বং রুচিরাঙ্গহারং
সমুদ্বহচ্চারুনিতম্বরম্যম্।
আমন্দ্রমন্থধ্বনিদত্ততালং
গোপাঙ্গনানৃত্যমনন্দয়ত্তম্।

শ্লোকটি পড়িলেই একটি নৃত্যের তাল যেন আপনি জাগিয়া উঠে। আবার আশ্রমে পৌঁছিবার পর রুক্ষ পিঙ্গল ঊর্ধ্বমুখী কেশ—শিরাল জঙ্ঘা—প্রকাণ্ড চক্ষুবিশিষ্ট রাক্ষস-সমূহ বর্ষাকালের মেঘের মত আকাশমার্গে আবির্ভূত হইলে কবি তাহার বর্ণনা করিতেছেন সেই উপজাতি ছন্দেই:

আপিঙ্গরুক্ষোর্ধ্বশিরস্তবালৈঃ
শিরালজঙ্ঘৈর্গিরিকূটদঘ্নৈঃ।
ততঃ কপাটৈঃ পৃথু পিঙ্গলাক্ষৈঃ
খং প্রাবৃষেণ্যৈরিব চানশেহক্ষৈঃ।

উপরোক্ত দুইটি কবিতাই উপজাতি ছন্দে। লঘুত্ব ও গুরুত্বের একই শৃঙ্খলে বাঁধা প্রতি চরণের প্রতি অক্ষর। অথচ বিষয়বস্তুর প্রভেদে এবং তদনুসারী ভাষানৈপুণ্যে ইহাদের মধ্যে কত পার্থক্য! ভাষাজ্ঞান ও কবিত্বের নিকট ছন্দের শৃঙ্খল তুচ্ছ।*

* এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট কয়েকটি শ্লোক পূর্ণচন্দ্র দে-সঙ্কলিত 'উদ্ভটসাগর' নামক পুস্তক হইতে গৃহীত।

বাঁধ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

২৬

এই মাত্র চারিটা বাজিল। লীলা ও লিলি প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে।

নাঙ্কু বলিল, এ কি এখনও তৈরি হতে পার নি মিনু। আমি যে কখন তোমায় বলে গেলাম।

মৃন্ময় যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে এমনি ভাবে চমকাইয়া সোজা হইয়া বসিল। সে জামাটা গায়ে দিয়া বলিল, আমি তৈরি নাঙ্কুদা। চলো।

মৃন্ময় উঠিয়া দাঁড়াইল।

মৃন্ময়ের আজিকার চালচলন, তার কথাবার্ত্তা নাঙ্কুর কাছে কেমন যেন রহস্যময় মনে হইতেছে। কিছুতেই যেন প্রাণের সাড়া নাই। এমনটি সে আশা করে নাই! তার মনে হইল যে, মৃন্ময়ের মনের কোথাও যেন এমন একটা সঙ্কোচের সৃষ্টি হইয়াছে যাহার প্রভাব সে সহজে কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। কিন্তু এমন হইলে তো চলিবে না। নাঙ্কু ইহাতে প্রাণপণে বাধা দিবে। একবার যে ভুল সে করিয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তি যাহাতে না ঘটে সেজন্য অত্যন্ত সাবধানে তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে।

লিলি সম্বন্ধেও তার মনে একটা সংশয়ের ছায়া ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছিল। সে সংশয় সম্পূর্ণরূপ দূর না হইলেও অন্ততঃ লিলির দ্বারা যে কোন বাধার সৃষ্টি হইবে না একথা সে জানিতে পারিয়াছে।

লীলা তাহাকে খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করিলে লিলি জবাব দিয়াছিল, একটা পাখী পুষলেও তার উপর ভালবাসা জন্মায়। এটা স্বভাবধর্ম্ম। আজ ছ' বছর ধরে যে লোকটিকে সে আগলে আছে তার প্রতি একটুও মমতা থাকবে না এ কেমন করে সম্ভব হতে পারে। তা ছাড়া মৃন্ময়ের জীবনের এই বিপর্য্যয় যে তাকেই কেন্দ্র করে, এ কথা ভোলা কি এতই সহজ!

লীলা হাসিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল এটা কি নেহাত কৃতজ্ঞতার কথা হ'ল না?

লিলি প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল, কৃতজ্ঞতা তো বটেই। আর এই কৃতজ্ঞতা যে তাকে অন্ততঃ নূতন করে দুঃখ দেবে না এ বিশ্বাস আপনারা অনায়াসে করতে পারেন, এবং সেইজন্যেই মিনুদার সঙ্গে আমার এত দূরে ছুটে আসার প্রয়োজন হয়েছে।

ইহার পরে আর বলিবার কিছু থাকিতে পারে না। তথাপি লীলা প্রশ্ন করিল, তবুও দেখুন মৃন্ময়ের আচরণে নাঙ্কু নাকি ঝড়ের আভাস পাচ্ছে।

ইহার উত্তরও লিলি হাসিয়াই দিয়াছিল, নাঙ্কুবাবুর ভুলও হতে পারে। আপনারা অনর্থক ভাববেন না, মিনুদাকে আমিও খানিকটা জানি। কোন অন্যায় কাজ তিনি করবেন না—করতে পারেন না। আর ঝড় যদি সত্যিই দেখা দেয় তা হলেও আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কারণ সে ঝড়ে লিলি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও মৃন্ময় সোজা হয়েই দাঁড়িয়ে থাকবে।

কথা কয়টি লিলি হাসিতে হাসিতে বলিলেও লীলা নাকি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়াছিল। নাঙ্কুকে আড়ালে ডাকিয়া লীলা তাহাকে বলিল, ছিঃ ছিঃ নাঙ্কু, ভুল করে এ তুমি আমায় কোথায় পাঠিয়েছিলে!

নাঙ্কু বলিয়াছিল, ভুল তো আমি করি নি লীলা। বরং আমার ধারণা যে অভ্রান্ত তারই প্রমাণ আমি পেলাম। আর আমার কোনো সংশয় নেই।

লীলা বলিয়াছিল, লিলি যে একতিল মিথ্যে বলে নি এ কথা আমি তোমায় হলপ করে বলতে পারি।

নাঙ্কু বলিয়াছিল, হলপ করবার প্রয়োজন নেই লীলা। লিলিও যেমন তোমায় মিথ্যে বলে নি, আমিও তেমনি ভুল করি নি। তুমি আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিও না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মৃন্ময় লিলির মনের এই গভীর ভালোবাসার কথা শুধু যে আভাসে টের পেয়েছে তা নয়, তার প্রতি দিনের প্রত্যেকটি কাজের মধ্য দিয়ে সেটা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছে এবং আজ যখন তার পুরনো অবস্থার মধ্যে ফিরে আসবার পথ উন্মুক্ত হয়েছে তখনই সে চমকে উঠেছে। নিজেকে যাচাই করে দেখতে গিয়ে সে তার দ্বিধাবিভক্ত মনের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারছে না। দু'দিক থেকেই তাকে টানছে। কিন্তু এই দোটানার মধ্যে দোদুল্যমান থাকতে তাকে দেবে না বলেই হয়তো লিলি তার সঙ্গে এসেছে।

লীলা বলিয়াছিল, তা বলে তুমি কেন এ নিয়ে এত ব্যস্ত হচ্ছ নাঙ্কু?

ব্যস্ত যে সে কেন হইয়াছে, মঞ্জুষার দুঃখ যে তার কতখানি বাজিতেছে, তার সুখে যে সে কতখানি তৃপ্ত হইবে এসব লীলা জানে না তাই এই প্রশ্ন করিয়াছে। নাঙ্কুও সহজ ভাবেই উত্তর দিল, ঘটনাচক্র একদিন ওর ভাগ্যের সঙ্গে আমার জীবনকেও জড়িয়ে দিয়েছিল সেকথা তো তোমায় আমি বলেছি লীলা, সুতরাং দায় ঘাড়ে না নিলেও দায়িত্বটা একেবারে অস্বীকার করি কেমন করে!

লীলা বলিয়াছিল, সে তো নিতান্তই একটা অবাঞ্ছিত আকস্মিক ঘটনা নাঙ্কু।

নাস্তু জবাব দিয়াছিল, তা হলেও সেটা একটা বিশেষ ঘটনা লীলা, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মঞ্জুষার একটা পাকা ব্যবস্থা করে দিতে পারি, ততক্ষণ ইচ্ছে করলেই তাকে একেবারে অস্বীকার করতে পারি না।

ইহার জবাব লীলা বেশ গম্ভীরভাবেই দিয়াছে, তোমাকে যতটা অবুঝ এতদিন ভেবেছি দেখছি তুমি তা নও। কেজো বুদ্ধিও তোমার বেশ আছে।

নাস্তু ইহার কোন জবাব দেয় নাই।...

গাড়ীর দ্রুত গতির সহিত পাল্লা দিয়া ঘটনাগুলি একের পর এক নাস্তুর স্মৃতিপথে আনাগোনা করিতেছিল। গাড়ী আসিয়া মঞ্জুষাদের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইতেই তাহার চিন্তা-স্রোতে বাধা পড়িল। সে ক্ষিপ্রহস্তে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল। একে একে আর সকলেও নামিল। রাধু বোষ্টম সম্ভবতঃ কাছাকাছি কোথাও প্রতীক্ষা করিতেছিল, সে দ্রুত বাহির হইয়া আসিল এবং উহাদের সঙ্গে করিয়া অগ্রসর হইল। রাধু কিন্তু তাহাদিগকে সরাসরি রোগীর ঘরে লইয়া আসিল না। বসিবার ঘরে আনিয়া বলিল, তোমাদের এখানে একটু বসতে হবে। ডাক্তার বলে গেছেন রোগী যেন কোন কারণে উত্তেজিত না হয়ে ওঠে।

নাস্তু বলিল, মঞ্জুর ঘরে কে আছেন? তার বাবা?

রাধু বলিল, আজ্ঞে না—নার্স। বড়বাবু এখন ঘুমুচ্ছেন।

নাস্তু প্রশ্ন করিল, ঘুমুচ্ছেন?

রাধু বলিল, হাঁ ঘুমুচ্ছেন। গত কয়েক রাত ধরেই তার চোখে ঘুম ছিল না। ডাক্তার ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে গেছেন।

নাস্তু আর কোন প্রশ্ন করিল না।

রাধু বলিতে লাগিল, বড় গোলমাল করছিলেন। ঠিক স্বাভাবিক অবস্থা একে বলে না।...

লিলি বলিল, তার মানে দু' ঘরে দুটি রোগী?

লিলির কথায় সায় দিয়া রাধু বলিল, ঠিক তাই দিদি।

লীলা বলিল, মঞ্জুকে দেখে আসতে পারা যায় না রাধু?

রাধু বলিল, আপনারা বুঝি এখনি চলে যাবেন?

লীলা মৃদু কণ্ঠে বলিল, বসে থেকে তোমার তো কোন কাজে লাগতে পারব না বোষ্টম ঠাকুর।

রাধু বলিল, তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু কথাটা কি জানেন... আপনারা কাছে থাকলেও অনেকটা ভরসা পাই।

লিলি এতক্ষণে কথা কহিল, এত লোকের ত কোন দরকার নেই বোষ্টমদা। ওঁরা যাবেন বৈ কি। আমি রইলাম, তোমার মিনুদাদা থাকবেন—আর কত লোকের দরকার?

রাধু বোষ্টম উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তার দুই চোখ চকচক করিয়া উঠিল, কিন্তু মুখে সে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, তুমি আমায় বাঁচালে দিদি। মনে হচ্ছে আজ ক'দিন পরে একটু ঘুমিয়ে বাঁচব।

লীলা বলিল, একটু আগেই যে বললে মঞ্জুর জন্তে নার্স রয়েছে—

রাধু বলিল, তা আছে বৈ কি, কিন্তু ওরা হ'ল মাইনে করা লোক, ওদের ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, মন খুঁত খুঁত করে...এই বুঝি অযত্ন হ'ল—

লীলা বলিল, সে যাই হোক, তুমি বোষ্টমঠাকুর বরং এক বার নার্সের কাছ থেকে মঞ্জুর সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি নিয়ে এসো। রাধু প্রস্থান করিতেই লীলা নাস্তুকে বলিল, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে নাকি?

নাস্তু অসম্মতি জানাইল, বলিল, না, আমি আর যেতে চাই না। তোমার সঙ্গে বরং লিলি যাক।

রাধু ইতিমধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে। নাস্তুর কথায় সেও সায় দিল, এবং তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লঘুপদে অগ্রসর হইয়া চলিল। উহারা দৃষ্টির বাইরে যাইতেই নাস্তু মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, মিনু—

মৃন্ময় সাড়া দিল, কিছু বলবে নাস্তুদা?

নাস্তু তেমনি মৃদুস্বরে বলিল, ভাবপ্রবণতা তোকে ছাড়তে হবে মিনু। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সব কিছু দেখবার চেষ্টা করিস ভাই।

মৃন্ময়ের মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে জবাব দিল, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সমস্ত ঘটনাকে দেখতে গিয়েই তো নূতন সমস্যা আজ দেখা দিয়েছে নাস্তুদা। নইলে তোমার কথায় সেদিন আমি রাজী হতে পারি নি কেন? আজকেই বা পথ আমার সমস্যাসঙ্কুল হয়ে রয়েছে কিসের জন্ত?

নাস্তু বলিল, অবশ্য সকলে একই চোখে সব জিনিষ দেখে না। আমার কাছে যেটা ভাবপ্রবণতা তোমার কাছে হয়তো সেইটেই বাস্তব সত্য, কিন্তু কথাটা তা নয়—ও নিয়ে তর্ক করেও কোন মীমাংসা হবে না। কিন্তু এত দিনের এত শ্রম, এত সাধনার পর ফুলের যে কুঁড়িটি বের হয়েছে, দোহাই মিনু, তাকে ফুটে উঠবার সুযোগ তুই দিস। নির্ম্মমভাবে তাকে বোঁটা থেকে ছিঁড়ে ফেলিস নে।

মৃন্ময় প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, ব্যবস্থাটা অবস্থার উপর নির্ভর করে নাস্তুদা। কিন্তু আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না তুমি কেন এ নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছ। আমিও একটা মানুষ। স্নেহ-ভালবাসা আমার মধ্যেও আছে, কিন্তু তাকে আপনার বেগে এগিয়ে যেতে দেওয়াই আমার মতে সমীচীন। জোর করে তাকে থামিয়ে দেওয়াও যেমন চলে না, ঠেলেঠুলে এগিয়ে দেওয়াও তেমনি সঙ্গত নয়। আমাকে নিজের মত করেই তোমরা চলতে দাও। অযথা আমায় বিব্রত করে তুলো না—এ আমার একান্ত অনুরোধ।

ইহার পর আর বলিবার কি থাকিতে পারে। তথাপি নান্টু নীরব থাকিতে পারিল না। সে বেদনাভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলিল, অকারণে কেউ দুঃখ পাক্ এ আমি সইতে পারি নে মিনু। যুক্তিতর্কের চেয়ে অন্তরের সত্যটাই আমার কাছে বড়, নইলে যা হবার সে তো হবেই তবু এ ব্যাকুলতা কিসের জন্ম! কিন্তু এ নিয়ে আর একটি কথাও নয়। এতে নিজেও আমি দুঃখ পাই, তোকেও হয়তো অকারণে উত্তেজিত করে তুলি।···

একটু থামিয়া সে পুনশ্চ বলিল, সম্ভবতঃ কালই আমি কলকাতা থেকে চলে যাব। বোধ হয় কিছুদিন ওয়াল্‌টেয়ারে থাকব। অবশ্য এ ইচ্ছে শেষ পর্য্যন্ত আমার টিকবে কিনা তা জানি না।

মৃন্ময় বলিল, কালই চলে যাবে?

নান্টু বলিল, এখানে থেকে ত কারুর কোন কাজেই আসতে পারব না মিনু। যাবার আগে আর হয়তো দেখা হবে না, তাই আমার যা-কিছু বলবার তা এখুনি শেষ করে ফেলি।··· তুমি মানুষ, তোমার প্রাণ আছে এবং তা আর দশ জনার চেয়ে অনেক বড় এই বিশ্বাস নিয়েই এক দিন তোমাকে অনুরোধ করতে ভরসা পেয়েছিলাম, কিন্তু আমার সে বিশ্বাসের ভিত্তিমূল আজ শিথিল হয়েছে। তার জন্যে কোন দিনই অন্তরের সহিত তোমায় অনুযোগ দিতে পারি নি বরং নিজেকেই সর্ব্বতোভাবে দায়ী করেছি। জীবনের এত জটিল সমস্যার সমাধান কেউ কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে করতে পারে না এ কথাটা আমার বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু আগাগোড়াই আমি দুনিয়াটাকে নিজের মত করে ভাবতে গিয়ে ভুল করেছি।

থাক সে-সব কথা। আজ আর নূতন করে তোমায় অনুরোধ করতে যাব না এবং ভবিষ্যতে তোমাদের চোখের সামনেও আমায় আর পাবে না। কারণ তাতে করে শুধু নিজের দুঃখটাই বড় হয়ে ওঠে।

মৃন্ময় ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, তুমি যদি অকারণে দুঃখ পাও নান্টুদা তা হলে আমি নাচার···

নান্টু সহসা সোজা হইয়া বসিল। মৃন্ময়ের মুখের পানে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আমার সব কথা কেউ বুঝবে না। বোঝাতে আমি চাইও না, কিন্তু তোমার এই উক্তির সঙ্গে আচরণের যদি সত্যিই সামঞ্জস্য দেখা যায় তা হলে আমার চেয়ে সুখী বোধ হয় পৃথিবীতে আর কেউ হবে না! আমার এ কথাটা তুই বিশ্বাস করিস মিনু। কিন্তু আর নয়, ঐ যে লীলা ওরা ফিরে এসেছে। নান্টু উঠিয়া দাঁড়াইল। লিলির সহিত দৃষ্টিবিনিময় হইতে বড় করুণ এবং মধুরভাবে একটু হাসিয়া বলিল, চলি বোন—

নান্টু আর অপেক্ষা করিল না, লীলাকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া গেল। লিলি নিষ্পলক দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়া যাইতেই মৃন্ময়কে প্রশ্ন করিল, নান্টুবাবু এমন করে চলে গেলেন কেন মিনুদা?

মৃন্ময় একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, জানি না।

লিলি আর দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করিল না বটে, কিন্তু ঘণ্টা-কয়েক পূর্ব্বেকার লীলার কয়েকটি অপ্রীতিকর প্রশ্ন, এখন নান্টুর এমনি অপ্রত্যাশিত ভাবে চলিয়া যাওয়া এবং মৃন্ময়ের এই ছাড়া ছাড়া উত্তর, সবকিছুতে মিলিয়া তার মনে একটা সংশয়ের সৃষ্টি হইল। অবশ্য তার অন্তরের কথা অন্তর্যামীই জানিলেন, বাহিরে কিছুই প্রকাশ পাইল না, কিন্তু সে আরও সজাগ হইয়া উঠিল।

লিলি ধীরে ধীরে আসিয়া মৃন্ময়ের পাশের চেয়ারে বসিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাধু বোষ্টম আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

২৭

নান্টু চলিয়া গেল। আর এক দিনও এমনি করিয়াই চলিয়া গিয়াছিল। একে একে কত কথাই মৃন্ময়ের মনে পড়িতেছে। সেদিন সে মনে একটা মস্ত বড় বিশ্বাস লইয়া গিয়াছিল আর আজ গেল ঠিক তার বিপরীত ভাব লইয়া। বাহ্যতঃ সে তাহাকে কোন অনুরোধ করিল না বটে, কিন্তু তার অন্তরের কাছে যেন ঐকান্তিক আবেদন জানাইয়া গিয়াছে। কিন্তু কেন, কিসের জন্ম নান্টু আজ এমন অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। মৃন্ময় কারণ অনুসন্ধান করিতে বসিয়া ব্যথিত হইয়া উঠে।

মৃন্ময় মঞ্জুষার শিয়রের কাছে বসিয়া আছে। ঘরে নীল আলো জ্বলিতেছে। নার্স কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ঘণ্টাখানেকের জন্ম বিদায় লইয়া গিয়াছে। মঞ্জুষা আচ্ছন্নের মত পড়িয়া আছে। মৃন্ময়ের উপস্থিতির কথা সে এখনও জানিতে পারে নাই।

মঞ্জুষার বাবা পাশের ঘরে ঘুমাইতেছেন। ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন যে, কালও পর্য্যন্ত এমনি গভীর নিদ্রা তাঁহার হইবে। দুশ্চিন্তা এবং অনিদ্রার জন্যই তাঁহার এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। পরিপূর্ণ বিশ্রামে ঠিক হইয়া যাইবে।

লিলি ইতিমধ্যে একবার মাত্র এ ঘরে আসিয়াছিল, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্তের বেশী দেরী করে নাই। নান্টুর চলিয়া যাওয়ার ধরণটা তাহাকে কেমন ভাবাইয়া তুলিয়াছে। ভিতরে ভিতরে একটা কিছু ঘটিয়াছে বলিয়া তাহার কেমন সন্দেহ হইয়াছে। মৃন্ময়কে জিজ্ঞাসা করিয়া অবশ্য কোন উত্তর পায় নাই। মৃন্ময়ের মনের সঠিক খবর সে রাখে না। রাখিবার প্রয়োজনও তার ফুরাইয়া গিয়াছে। নিজের জন্ম আর সে ভাবে না, কিন্তু মৃন্ময়ের জন্য সে খানিকটা চিন্তাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

মঞ্জুষার অসুখ সারিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে, জীবানন্দও মনে হয়, অচিরেই ভাল হইয়া উঠিবেন। মৃন্ময়ের উপস্থিতির

প্রয়োজন ছিল—সে আসিয়াছে। যাহার প্রয়োজন নাই সে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া নান্টু চলিয়া গেল কেন? এই রহস্যোদ্ঘাটন লিলিকে করিতেই হইবে। পুনরায় নিঃশব্দে আসিয়া মঞ্জুষার ঘরে প্রবেশ করিল। মৃন্ময় একাগ্র দৃষ্টিতে মঞ্জুষার রোগ-পাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া আছে। লিলির আগমন সে টের পাইল না। মন তখন তার নানা চিন্তায় মগ্ন। মঞ্জুষার পানে চাহিয়া চাহিয়া বিগত দিনের কত কথাই না আজ তাহার মনে পড়িতেছে। আশ-পাশের সবকিছুই যেন একেবারে মুছিয়া গিয়াছে। অতীতের নানা বিস্মৃতপ্রায় ঘটনা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।...পদ্মার ঢেউ প্রচণ্ড বেগে তীরে আসিয়া আছাড় খাইয়া ফাটিয়া পড়িতেছে—ঢেউয়ের তালে তালে কত নৌকা পাল তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। পদ্মাতীরের বুড়া বটগাছতলায় দুই আত্মহারা তরুণ-তরুণী কলগুঞ্জনে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। আশেপাশে কোথাও বৌ কথা কও পাখীটাও কি সময় বুঝিয়া ডাকিয়া উঠিল।

লিলি একটু নড়িয়া চড়িয়া তার উপস্থিতির আভাস দিল। মৃন্ময় যেন ঈষৎ চমকাইয়া উঠিয়াছে। আর একবার ভাল করিয়া সে মঞ্জুষার মুখের পানে চাহিল। ঐ লিলি আর এই মঞ্জু। লিলির কাছেও যে তার অনেক দেনা। মুখ ফুটিয়া কোন দিন কিছু চাহে নাই, হয়তো জীবনে কোন দিন চাহিবেও না। নিঃশব্দে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সে শুধু অঞ্জলি ভরিয়া দিয়াই গিয়াছে। আজ হিসাব-নিকাশ করিতে বসিয়া তাই তো মৃন্ময় এমন করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। পুঁজি তার যৎসামান্য। কিন্তু লিলি চাহে নাই বলিয়াই সে নিতান্ত স্বার্থপরের মত আর এক জনের জন্য সব সরাইয়া ফেলিতে দ্বিধাবোধ করিতেছে।

মৃন্ময় লিলির মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিল, কিন্তু তার মুখ দেখিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। লিলি মৃন্ময়কে ইসারায় ডাকিয়া লঘুপদে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। মৃন্ময় তাহার অনুসরণ করিল।

কোনপ্রকার ভূমিকা না করিয়া মৃদুকণ্ঠে লিলি বলিল, নান্টুদা অমন করে চলে গেলেন কেন, একথা তুমি জান এবং এর কারণটা আমাকেও জানাতেই হবে মিনুদা।

মৃন্ময় বলিল, যদি বলি যে আমি জানি না।

লিলি বলিল, তা হলে বুঝব তুমি আমায় মিথ্যে বলছ। সত্য কথা বলবার মত সাহসটুকুও তুমি হারিয়ে ফেলেছ।

মৃন্ময় শান্তকণ্ঠে বলিল, তুমি উত্তেজিত হয়ে উঠেছ। কিন্তু তোমায় আমি মিথ্যে বলি নি। তবে আমার অনুমানের কথা যদি জানতে চাও সে আলাদা বিষয়।

মৃন্ময় থামিল। লিলি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সে পুনরায় বলিতে লাগিল, যে কোন কারণেই হোক নান্টুদা আমার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে।

লিলি অনুনয় বিনয় করিয়া কহিল, আমাকে কিছু লুকিও না। তার এই আস্থা হারানোর কি সত্যিই কোন কারণ ঘটেছে?

মৃন্ময় একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, তোমার একথার উত্তর নান্টুই ঠিক দিতে পারত। তবে আমার মনে হয় আমাদের দু'জনকে কেন্দ্র করেই সন্দেহটা তার মনে জেগেছে।

লিলি কিছুক্ষণ নত মস্তকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া যখন মুখ তুলিয়া চাহিল তখন সেখানে যেন রক্তের লেশমাত্র নাই। মৃন্ময়ের সেদিকে হুঁস নাই। সে অন্যমনস্ক ভাবে উপরের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। লিলির কণ্ঠস্বরে সে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল।

লিলি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিল, আমি ভাবছিলাম, তার মনে এ সন্দেহ পোষণ করবার সুযোগ করে দিলে কে মিনুদা? নিশ্চয়ই তুমি। কিন্তু জিজ্ঞেস করি এমনি করে অপমান আমায় না করলেই কি তোমার চলত না? তা ছাড়া কতটুকু তুমি জান আমার—এত সাধারণ তুমি কেমন করে হতে পারলে মিনুদা? ছিঃ ছিঃ......

এ ধিক্কার মৃন্ময় নীরবেই মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিল। লিলির অনুমান একেবারে মিথ্যা নয়। ইতিপূর্বে সে লিলির সম্বন্ধে বহু কথাই নান্টুকে চিঠিতে জানাইয়াছে।

লিলি পুনরায় বলিতে লাগিল, অত্যন্ত ভুল করেছ তুমি মিনুদা। লিলির আর যত দোষই থাক জেনে শুনে কোন দিনই তোমায়...কথাটা লিলি শেষ না করিয়াই অন্য প্রসঙ্গে আসিল। বলিল, শেষ পর্য্যন্ত তুমিও আমার মর্য্যাদাকে একেবারে হাটের মধ্যে এনে দাঁড় করালে। এ যে আমার কাছে কতখানি মর্ম্মান্তিক সে তুমি বুঝবে না—

মৃন্ময় আত্মবিস্মৃতের ন্যায় বলিল, কিন্তু এত কথা ত আমি কোন দিনই ভাবি নি লিলি। এ সব নিয়ে খামোকা তুমি এত বিচলিত হচ্ছ কেন?

লিলি যেন জ্বলিয়া উঠিল, তুমি বলতে চাইছ কি? মানুষের চামড়া নেই আমার দেহে, না মানসম্ভ্রম বলেও কোন বস্তু আমার নেই? আজ নান্টুদা মনগড়া একটা কথা ভাববে, কাল লীলা এগিয়ে এসে দশটা প্রশ্ন করবে, পরন্তু মঞ্জুষা অর্থ-পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে। এ সব তোমার ভাল লাগতে পারে, কিন্তু আমার সইবে না। আর কেনই বা আমি তোমাদের এই সব ভালমন্দর সঙ্গে নিজেকে জড়াতে যাব। কি ভেবেছ তুমি বল তো মিনুদা? এমনি করে লিলির দুঃখ লাঘব করবে? এ যদি ভেবে থাক তা হলে এর চেয়ে মারাত্মক ভুল তুমি জীবনে আর করো নি। কিন্তু লিলির মিনুদা যে এর চেয়ে ঢের বড়। সে আদর্শ পুরুষ। একনিষ্ঠ প্রেমিক।

লিলির দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল এবং তাহাই গোপন করিতে সে দ্রুত প্রস্থান করিল। মৃন্ময় ব্যথিত দৃষ্টিতে সেই

দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল, তারপর একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় মঞ্জুষার ঘরে আসিয়া তার পরিত্যক্ত আসনে স্থির হইয়া বসিল।

যাহার যাহা মনে আসিতেছে, যাহা প্রাণে চাহিতেছে, বলিয়া চলিয়াছে, মৃন্ময় জোর করিয়া একটা প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিতে পারিতেছে না। আশ্চর্য্য। মৃন্ময়ের আজ কি হইয়াছে! এ কথাটাও সে বলিতে পারিল না যে, লিলিকে কেহ তো তাহার ভালমন্দর মধ্যে মাথা গলাইতে বলে নাই—কিসের জন্য সে তাহার সঙ্গে আসিয়াছে, আর কেনই বা এত কথা শুনাইতেছে।...

একটা অস্ফুট আহ্বান মৃন্ময়ের কানে আসিল। তাহার সমস্ত সত্তা উন্মুখ হইয়া উঠিল। শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হইয়া উঠিয়াছে, নিজের হৃৎস্পন্দন-শব্দ মৃন্ময় যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছে।

মঞ্জুষা জাগিয়াছে—তার আচ্ছন্নভাব কাটিয়াছে।

মঞ্জুষার ক্ষীণ কণ্ঠের আহ্বান পুনরায় তার কাণে আসিল, বোষ্টমদা—এবারে আর পূর্ব্বের ন্যায় ততটা অস্পষ্ট নয়। মঞ্জুষার জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। এক একটি মুহূর্ত্তের ব্যবধানে তাদের অতীত জীবনের এক একটি অধ্যায় মৃন্ময়ের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়া মিলাইয়া যাইতেছে।...বালিকা মঞ্জুষা একটা খরগোসের কান ধরিয়া টানিয়া আনিতেছে, কৈশোরে মঞ্জুষা নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া তাহার জন্য জল-পদ্ম তুলিতে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, যৌবনে মঞ্জুষা তার প্রতিটি দিবসকে স্নিগ্ধ মাধুর্য্যে পূর্ণ করিয়া তুলিতে সুরু করিয়াছে···এমনি সময় অকস্মাৎ দেখা দিল প্রচণ্ড ঝড়। তার প্রচণ্ড দাপটে সব লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। কোথায় গেল মঞ্জুষা আর কোথায় রহিল সে।...

ঝড় আজ থামিয়া গিয়াছে। তাদের জীবনের গোটা-কয়েক অধ্যায়কে একেবারে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছে। আগামী বসন্তের উপরেও আজ আর ভরসা নাই।

ঘরের ম্লান নীল আলো তেমনি ভাবে জ্বলিতেছে। একটা স্নিগ্ধ কমনীয়তা সর্ব্বত্র বিরাজমান। কোথাও আর ঝড়ের চিহ্ন-মাত্র নাই। শুধু তারই ঝাপ্‌টায় বিপর্য্যস্ত দুইটি মানুষকে দেখা যাইতেছে। যাহারা আজও তাদের হারানো দিনগুলিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

মৃন্ময়ের চোখের সম্মুখ হইতে তার বর্ত্তমান একেবারে মুছিয়া গিয়াছে। অতীতের মৃন্ময় যেন আজ দীর্ঘদিনের ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। হৃদয়ে তার স্নেহপ্রীতির বন্যা নামিয়াছে, চোখে-মুখে তারই আভাস। অন্তরের সবটুকু মাধুর্য্য প্রকাশ পাইল তার কণ্ঠে। মৃন্ময় মঞ্জুষার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মৃদু কণ্ঠে ডাকিল, মঞ্জু—

মঞ্জুষা অস্বাভাবিকভাবে চমকাইয়া উঠিল। একবার চোখ মেলিয়া বিহ্বল ব্যাকুল দৃষ্টিতে মৃন্ময়ের মুখের পানে চাহিয়াই পুনরায় ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করিল।...

* * *

পরদিন অতি প্রত্যুষে রাধুর আহ্বানে মৃন্ময় অলসভাবে চোখ মেলিয়া চাহিল। রাধু মৃন্ময়ের হাতে একখানি চিঠি দিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল। কোন প্রশ্ন করিবার অবকাশও সে দিল না। চিঠিখানি লিখিয়াছে মাঙ্গু।...

মৃন্ময়—

আমার চিঠি যখন তোমার হাতে পৌঁছুবে আমরা তখন অন্তত শ'খানেক মাইল দূরে চলে গেছি। আমায় অনুযোগ দিও না। অনেক চেষ্টা করেও থাকা আর সম্ভব হ'ল না। এর কারণ, তোমাকে আজ আর আমি দ্বিধাহীন চিত্তে বিশ্বাস করতে পারছি না। শুধু তাই নয়—আমার নিজের উপরও আর আস্থা নেই। মন আমার দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। আমার মনের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত কেঁপে উঠেছে। ভয় হচ্ছিল পাছে একেবারে হারিয়ে যাই, কিন্তু আজ আর তার জন্যে আমার খেদ নেই। হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে আমি আমার বাঁচার মন্ত্র আবিষ্কার করেছি।

জানি না ভুল করলাম কিনা—আর যদি করেই থাকি তার জন্যেও কোন দিন আমি দুঃখ করব না।

অনেক কথা তোমাকে আমার বলবার ছিল, কিন্তু তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোন কথাই গুছিয়ে বলতে পারি নি, পাছে তোমায় আঘাত করে বসি এই ভয়ে। এখন মনে হচ্ছে সত্যি হোক, মিথ্যে হোক যে কথা আমার মনে জেগেছে তা প্রকাশ করাই শ্রেয়ঃ।

মনে হচ্ছে, যে মিথ্যা অপপ্রচার এক দিন তোমার জীবনের স্বচ্ছন্দ গতিপথে বাধার সৃষ্টি করেছিল সেই মিথ্যাটাই সত্যের ছায়ারূপ ধরে তোমাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে। এ বাধা অপ-সারণের প্রয়োজন আছে মিনু। নইলে সেদিনের সেই পর্ব্বত-প্রমাণ মিথ্যাটাই যে তোর জীবনে সত্য হয়ে বেঁচে থাকবে তাই।

লিলি আজ তোমার চলার পথে এক প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করেছে—চলতে গিয়ে তাই বারে বারে হোঁচট খাচ্ছ। চতুর্দ্দিক কুয়াশায় আচ্ছন্ন মনে হচ্ছে। কিন্তু এই কুয়াশা যে ক্ষণস্থায়ী সেকথাটা একবার ভেবে দেখছ না কেন?

লিলির জন্যে তোমার মনে যে স্নেহ ও প্রীতি জমে উঠেছে সেটা খুবই স্বাভাবিক। সব কথা আমি জানি না। জানা আমার পক্ষে সম্ভবও নয়—তবুও বলছি যে, লিলিকে তোমার আরও ভাল করে জানা উচিত ছিল।

তুমি মনে করো না মিনু, আমার আজকের বক্তব্যটা শুধু আমার নিজেরই মনগড়া ভাবনার ফল, তুমি নিজেই যে এ কথা বলবার সুযোগ করে দিয়েছ। চিঠিতে তুমি যে সকল

উক্তি করেছিলে তাই আজ আমার কথায় প্রকাশ পাচ্ছে, কিন্তু এইটেই বড় কথা নয়—আসল কথা হচ্ছে লিলিকে তুমি ভুল বুঝেছ, এবং কথাটা যে মুহূর্ত্তে সে উপলব্ধি করেছে তারপরে আর দেরি করে নি। আমার কাছে ছুটে এসেছে।

খোলা মনে স্বীকার করতে পেরে আমি আনন্দ পাচ্ছি এইজন্তে যে, ভুল করে লিলির উপর যে অবিচার করেছিলাম সেই ভুল আমার ভেঙে গেছে। লিলিও আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছে। লীলার কোন আপত্তি নেই। এই ভবঘুরের সঙ্গে লিলিও একটা আশ্রয় পেয়ে গেল।

কোথায় চলেছি তা এখনও জানি না। তবে ওয়ালটেয়ারে যাব না এ কথা ঠিক।

আমার কথা ছেড়ে দাও। আমার মত ছন্নছাড়া লোকগুলোর যদি কোনকিছুর ঠিক থাকে। তোমার নান্টুদার অপূর্ব্ব দায়িত্বজ্ঞান এক দিন লীলার সঙ্গে তার নিজের অদৃষ্টকে জড়িয়ে ফেলেছিল, সেইটেই লিলিকে বেঁধে রাখার ব্যবস্থাও নির্ব্বিচারে করতে পেরেছে।

যদি পার আমাদের একেবারে মন থেকে মুছে ফেলো—নূতন করে মনে করিয়ে দেবার জন্তে আর কোন দিন তোমার চলার পথে দেখা দেব না। এতদিন অনেক দুশ্চিন্তা করেছি। বুঝেও করেছি, না বুঝেও করেছি। আজ সকল বোঝা মাথা থেকে নামিয়ে রেখে বিদায় নিলাম। বড় হাল্কা লাগছে। অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে এগিয়ে চলেছি। আমার ডাইনে লিলি বাঁয়ে লীলা। এইতো জীবন...বিদায়।

ইতি

নান্টু

* * *

চিঠিখানি পড়া শেষ করিয়া মৃন্ময় স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল। ব্যাপারটা সে ঠিক যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। নান্টু চলিয়া যাইবে ইহা জানা কথা, কিন্তু লিলি কেন তাহার সঙ্গে অনির্দ্দেশ্য পথে পা বাড়াইল...

* * *

নান্টু আর লিলি। দুটি নদীর দুটি ধারা। একই লক্ষ্য-পথ ধরিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। এক দিন হয়তো তাদের আশা সফল হইবে...হয়তো হইবে না, কিন্তু সেকথা তাহারা ভাবিয়া দেখিতে চায় না, প্রয়োজন বোধও করে না—শুধু চলাটা তাদের অব্যাহত থাকে।...

সমাপ্ত

মৃত্যুজয়ী চল্‌বি কে ?

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

আসে, লক্ষ বুকের প্রলয় ডাক ঐ বীরের দল আজ চল্‌বি কে ?
চল্, বিঘ্ন-পাহাড় ভাঙবি কে আজ বজ্রবাদল দলবি কে ?
শোন্, ক্রন্দনাদের হাহাকারে ফাটছে আজি ঐ পাষাণ,
ওই, দুর্নীতদের দুর্নীতিতে চাচ্ছে সবাই পরিত্রাণ।
তোরা, সর্বহারার রক্ষা লাগি' মৃত্যুপণ আজ করবি কে ?
চল্, বর্ব্বরতার গর্বনাশে সর্ববিপদ বর্‌বি কে ?

ডাকে, সপ্তপুরুষ তপ্তবুকের রক্তেগড়া ধাত্রী তোর,
চল্, রক্তসাগর-মৃত্যুমথন-অমৃতেরি রাত্রি ভোর।
ওরে, মুক্ত হাওয়ার মতন যে এই দুঃখনাশের মুক্তিরণ,
ইহা, অন্যায়েরি সঙ্গে ন্যায়ের দ্বন্দ যে তাই ঝনাৎঝন্।
চল্, সর্বপাপের সর্পদের আজ দর্পদমন করবি কে ?
আয়, দুর্নীতি পাপ শূন্য করে' পুণ্যদেশ আজ গড়বি কে ?

আয়, লক্ষ কোটি দীপ্ততরুণ সূর্যতেজের শৌর্য্য তোর,
আজ, আকাশ ফেটে উঠুক বেজে সর্বজয়ের তূর্য্য তোর।
ওঠ্, ছুটিয়ে দে তোর দীপ্ত ঘোড়া ঝড়ের মতো দুরন্ত,
আজ, অত্যাচারের চাই প্রতিরোধ আর দেরী নয় তুরন্ত।
চল্, লক্ষ পাপের অমঙ্গলের জঙ্গল আজি দল্‌বি কে ?
আয়, ভগ্নীভাইয়ের অগ্নিদাহের মুক্তিতে আজ চল্‌বি কে ?

ওই, ডাক্‌ছে মাটি পাহাড় নদী ডাক্‌ছে আকাশ সমুদ্দুর,
চল্, আর দেরী নয় ওঠরে দাঁড়া রাস্তা নয় আর বহুৎ দূর।
শোন্, মত্তগণের কল্লোলে ঐ লক্ষ ফণার হুহুঙ্কার,
আজ, খুলুক নবজন্মে তোদের ঝঞ্ঝনিয়া সিংহদ্বার।
চল্, স্বাধীনতার রক্ষা লাগি স্বার্থসুখ আজ দল্‌বি কে ?
আয়, জন্মভূমির রুদ্র ডাকে মৃত্যুজয়ী চল্‌বি কে ?

ত্রিপুরার ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা

শ্রীউপেন্দ্র সাহা

ত্রিপুরার মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্য সাতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার গুরুভক্তি এরূপ প্রবল ছিল যে, তাঁহার রাজত্বকালে রাজকীয় মোহরে 'শ্রীগুরু আজ্ঞা' এই কয়েকটি শব্দ সংযোজিত হইয়াছিল। তিনি স্বীয় গুরু বিপিনবিহারী গোস্বামীর উপদেশ ও পরামর্শ অনুসারে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। তাঁহার কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র ও কুমার নবদ্বীপচন্দ্র নামে দুই পুত্র ছিলেন; সাধারণতঃ ত্রিপুররাজগণ প্রধানা রাজমহিষীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এবং তিনি কোন কারণে অযোগ্য প্রতিপন্ন হইলে তৎপরবর্ত্তী পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেন। কিন্তু পুত্রদ্বয় অল্পবয়স্ক বলিয়া ঈশানচন্দ্র তাঁহাদের কাহাকেও যুবরাজপদের জন্য নির্ব্বাচিত না করিয়া প্রাপ্তবয়স্ক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুমার বীরচন্দ্রকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করেন। কালক্রমে ঈশানচন্দ্র পরলোকগমন করিলে বীরচন্দ্র রাজ্যপাট অধিকার করিয়া নিজেকে ত্রিপুরাধিপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সময়ে রাজ্যের উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া ত্রিপুরা-রাজ্যে ঈষৎ চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয় এবং রাজ্যের কর্ম্মচারিগণ ও জনসাধারণের মধ্যে এ বিষয়ে নানাপ্রকার আলাপ-আলোচনা চলিতে থাকে। এমন সময়ে এক দিন ঈশানচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর কুমার নবদ্বীপচন্দ্র এক দিন সুযোগ বুঝিয়া গোপনে রাজধানী আগরতলা পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রিটিশ ত্রিপুরার সদর ষ্টেশন কুমিল্লায় প্রস্থান করেন। এ বিষয়ে তিনি কোন কোন রাজকর্ম্মচারীর সহায়তালাভ করিয়াছিলেন।

নবদ্বীপচন্দ্র একপ্রকার নিঃসম্বল অবস্থায়ই কুমিল্লায় আসিয়াছিলেন। তিনি তথায় আসিবার পর অপর এক ব্যক্তির অর্থসাহায্যে রাজত্বলাভের জন্য বীরচন্দ্রের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আদালতে এক মোকদ্দমা রুজু করেন। কলিকাতা হাইকোর্টে এই মোকদ্দমার বিচার হয়। তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার সণ্ট্রো সাহেব এই মোকদ্দমায় নবদ্বীপচন্দ্রের পক্ষ-সমর্থন করেন। কিন্তু হাইকোর্টের বিচারে বীরচন্দ্রই রাজ্য ও রাজপদ লাভ করেন; ভৃত্যের বেতন সহ নবদ্বীপচন্দ্রের মাসিক ৫২৫৲ টাকা ভাতা নির্দ্ধারিত হয়।

ত্রিপুরার জনসাধারণ এই বিচারে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। তাহারা ভাবিয়াছিল যে, বীরচন্দ্র স্বয়ং রাজপদ অধিকার করিলেও ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের মহত্ব ও সদাশয়তার কথা স্মরণ করিয়া কুমার নবদ্বীপচন্দ্রকে অন্ততঃ যৌবরাজ্য প্রদান করিবেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া স্বীয় পুত্র কুমার রাধাকিশোরকে যুবরাজ ও কুমার সমরেন্দ্রচন্দ্রকে বড়ঠাকুর পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এ সময়ে ত্রিপুরার রাজ্যাধিকার লইয়া ত্রিপুরার সর্ব্বত্র জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ আলোচনা হইতে থাকে এবং এ বিষয়ে কয়েকটি গান রচিত ও ত্রিপুরার সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। 'নবদ্বীপ রাজপুত্র, যে না পাইল রাজছত্র' ইত্যাদি পদসমন্বিত সঙ্গীতগুলিতে নবদ্বীপচন্দ্রের প্রতি ত্রিপুরার জনসাধারণের সহানুভূতি এবং হাইকোর্টের বিচার ও বীর-চন্দ্রের প্রতি অসন্তোষের ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছিল।

নবদ্বীপচন্দ্র অতঃপর কুমিল্লায় বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া তথায়ই স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। তিনি বুদ্ধিমান্, শান্তপ্রকৃতি ও চরিত্রবান্ ছিলেন এবং কুমিল্লার কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন হইয়া-ছিলেন। তিনি ত্রিপুরার বিবিধ জনহিতকর কার্য্য ও প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং অনেক দিন ত্রিপুরা জেলা-বোর্ডের ভাইস্-চেয়ারম্যান ও কুমিল্লা মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানের কার্য্য সাতিশয় যোগ্যতার সহিত নির্ব্বাহ করেন। নবদ্বীপচন্দ্র কোন বিদ্যালয়ে রীতিমত শিক্ষালাভ না করিলেও স্বীয় চেষ্টায় ইংরেজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার পাঠাগারে বহুসংখ্যক বাংলা পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভ্য ছিলেন। কুমিল্লায় যখন 'ত্রিপুরা সাহিত্য-সম্মিলনী' নামে সাহিত্য-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং এই প্রতিষ্ঠানটি কালক্রমে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের শাখারূপে পরিণত হইলেও তিনিই ইহার সভাপতি-পদ অলঙ্কৃত করিয়া-ছিলেন। 'সাবিত্রী সত্যবান', 'শৈব্যা' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা সুরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত 'ত্রিবেণী' নামক মাসিকপত্রে নবদ্বীপচন্দ্রের লিখিত 'আবর্জ্জনার ঝুড়ি' শীর্ষক আত্মকাহিনীর কতকাংশ প্রকাশিত হয়। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই এই পত্রিকাটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ায় এই কাহিনী সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। এই প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ হইলে হয়ত ত্রিপুরারাজ্যের ইতিহাসের একটি অলিখিত অধ্যায় লোকলোচন সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইত। নবদ্বীপচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী রাণী নিরুপমা দেবীও কাব্যানুরাগিণী ছিলেন। তাঁহার রচিত কয়েকটি সুন্দর কবিতা 'ত্রিপুরা সাহিত্য-সম্মিলনী'র এক অধিবেশনে পঠিত হয়। নবদ্বীপচন্দ্র ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বৃন্দাবনের ব্রজমণ্ডলের প্রধান মোহান্ত ১০৮ শ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবার নিকটে দীক্ষালাভ করেন। কুমিল্লার প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্বজ্ঞান সভা'রও তিনি সভাপতি ছিলেন।

ভাগ্যবিড়ম্বিত নবদ্বীপচন্দ্র জীবনে সুখী হইতে পারেন নাই। তাঁহার পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা ছিল। তন্মধ্যে তাঁহার জীবিতকালেই দুই পুত্র ও কন্যাত্রয়ের মৃত্যু হয়। অবশিষ্ট তিন পুত্রের মধ্যে দুই জন তাঁহার পরলোকগমনের পর দেহত্যাগ করিয়াছেন। এখন একমাত্র তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কুমার শচীন্দ্র দেববর্ম্মণ জীবিত আছেন। তিনি উৎকৃষ্ট গায়ক ও সঙ্গীত-বেত্তারূপে প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তৎপ্রণীত 'সুরের লিখন' নামক একটি সঙ্গীতগ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে।

আগরতলা পরিত্যাগের পর সুদীর্ঘকাল ত্রিপুরার রাজ-কার্য্যের সহিত নবদ্বীপচন্দ্রের কোন সংস্রব ছিল না। পরিশেষে বৃদ্ধবয়সে মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের আগ্রহাতিশয়ে তিনি ত্রিপুরারাজের মন্ত্রিপদ গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে তিনি আমরণ ত্রিপুরার রাজকার্য্যের সহিত কোন না কোন ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, সুকবি, রসজ্ঞ, গীতবাদ্যানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কাব্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলায় ত্রিপুরা-রাজবংশের অনুরাগ এবং স্বাভাবিক পারদর্শিতা সম্বন্ধে যে খ্যাতি আছে, বীরচন্দ্র মাণিক্যে তাহা বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল। বাংলাদেশের তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ গুণী ও ওস্তাদগণের অনেকেই বীরচন্দ্রের রাজসভায় সমাগত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে রবাব-বাদ্যবিশারদ কালেম আলি খাঁ, যদু ভট্ট, কেশব মিত্র প্রভৃতি গীত-বাদ্য নিপুণ ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবি মদনমোহন মিত্র বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময়ে ত্রিপুরার রাজকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত 'জীবনময় কাব্য' নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ তৎকালীন ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বীরচন্দ্র স্বয়ং উৎকৃষ্ট সঙ্গীত-রচয়িতা ছিলেন। তাঁহার রচিত—

"মন্দ মন্দ বহত পবন,
বিরহিণীজন হৃদয়-দাহন,
পিয়া কো কারণ ঝুরত নয়ন,
আহেরি ফাগুন আহেরি"

এবং—

"জয় জগতবন্দিনী,
হরি-হৃদয়-রঙ্গিণী,
ব্রজ-রমণী মুকুটমণি, রাধিকে শ্রীরাধিকে"

প্রভৃতি কান্ত-কোমল পদাবলীসমন্বিত সঙ্গীতগুলি অনবদ্য লালিত্য ও মাধুর্য্যরসে অভিষিক্ত। শুনিতে পাওয়া যায়, এই সকল সঙ্গীতের একটি সংগ্রহ-পুস্তিকা তদীয় পুত্র কুমার ত্রিপুরেন্দ্রচন্দ্রের নিকটে ছিল। কিন্তু ত্রিপুরেন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যুর পর এই পুস্তিকাখানি কি অবস্থায় আছে, কিংবা কাহার হস্তগত হইয়াছে, কিছুই জানা যায় না। বীরচন্দ্র মাণিক্যের রচিত সঙ্গীত ও কবিতাসমূহ সংগৃহীত হইলে বাংলার কাব্য-ভাণ্ডারের সম্পদ বৃদ্ধি পাইত সন্দেহ নাই। ত্রিপুরাবাসী কোন উৎসাহী সাহিত্যিক বা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ এই সকল সংগ্রহের চেষ্টা করিতে পারেন।

দীনেশচন্দ্র সেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুলের হেড্‌মাষ্টার থাকাকালে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক যে বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহার প্রথম সংস্করণ মহারাজা বীরচন্দ্রের অর্থানুকূল্যে কুমিল্লাস্থিত চৈতন্য যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। কুমিল্লার বীরচন্দ্র সাধারণ পাঠাগার এবং টাউন হলও প্রধানতঃ বীরচন্দ্রের অর্থসাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্ন হৃদয়' কাব্য প্রকাশিত হইলে মহারাজা বীরচন্দ্র তাহা পাঠ করিয়া কবির মধ্যে কবিত্বশক্তি বিকাশের যে বিরাট সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা উপলব্ধি করেন এবং কবিকে তাঁহার মনোভাব জ্ঞাপনের জন্য প্রাইভেট সেক্রেটারী রাধারমণ ঘোষকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন,

"মনে আছে, এই লেখা (ভগ্নহৃদয়) বাহির হইবার কিছুকাল পরে কলিকাতায় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের মন্ত্রী আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। কাব্যটি মহারাজের ভাল লাগিয়াছে এবং কবির সাহিত্যসাধনার সফলতা সম্বন্ধে তিনি উচ্চ আশা পোষণ করেন, কেবল এই কথাটি জানাইবার জন্যই তিনি তাঁহার অমাত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।" (১৮৬ পৃ.)।

মহারাজা বীরচন্দ্রের এই আশা সার্থক হইয়াছে। উক্ত ঘটনা হইতেই বীরচন্দ্রের তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধি, গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং সূক্ষ্ম কাব্যরসানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময় হইতেই ত্রিপুরারাজের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। এই পরিচয় কালক্রমে ঘনিষ্ঠতর হইয়া প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্যে পরিণত হয়। এই প্রীতিসূত্রের আকর্ষণে রবীন্দ্রনাথ কয়েকবার আগরতলায় গমন করেন। পরবর্ত্তীকালে ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য তাঁহাকে 'ভারত-ভাস্কর' উপাধি প্রদান করেন। রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' নামক উপন্যাস এবং 'বিসর্জ্জন' নাটকও ত্রিপুরার কাহিনী লইয়া বিরচিত হইয়াছে।

মহারাজা বীরচন্দ্র দীর্ঘকাল রাজত্ব করিবার পর মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর যুবরাজ কুমার রাধাকিশোর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময়ে ত্রিপুরার যৌবরাজ্য সম্পর্কে বড়ঠাকুর কুমার সমরেন্দ্রচন্দ্রের সহিত রাধাকিশোরের বিরোধ উপস্থিত হয়। ত্রিপুরারাজ্যে মহারাজার পর যুবরাজ ও তৎপর ছিল বড়ঠাকুরের স্থান। পূর্ব্বতন রাজার মৃত্যুর পর যুবরাজ রাজা হইলে তৎপরবর্ত্তী বড়ঠাকুরের পক্ষে যৌবরাজ্য লাভের আশা করা স্বাভাবিক। এই যুক্তি অনুসারেই বড়ঠাকুর সমরেন্দ্রচন্দ্র যৌবরাজ্যের জন্য দাবি

উপস্থাপিত করেন। এই বিষয় বিচারের জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট উত্থাপিত হইলে কর্তৃপক্ষ এরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, রাজা ইচ্ছানুসারে যুবরাজ নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন এবং রাজার মৃত্যুর পর যুবরাজই রাজা হইবেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সমরেন্দ্রচন্দ্রের দাবি প্রত্যাখ্যাত হয় এবং রাধাকিশোর তৎপুত্র কুমার বীরেন্দ্রকিশোরকে যুবরাজ-পদে নিয়োগ করেন। এই সময় হইতে ত্রিপুরা রাজ্যে 'বড়ঠাকুর' পদবী উঠিয়া যায়। কুমার সমরেন্দ্রচন্দ্র বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে আগরতলা পরিত্যাগপূর্ব্বক কলিকাতায় চলিয়া যান এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল তথায় অতিবাহিত করিয়া পরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

মহারাজা রাধাকিশোর উদারপ্রকৃতি ও দানশীল ছিলেন। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য তিনি প্রচুর অর্থ দান করেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাঁহার নিকট অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার সময়ে আগরতলায় 'উজ্জয়ন্ত' রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। ইহার পূর্ব্বে তথায় ইষ্টকালয়ের সংখ্যা ৩।৪টির বেশী ছিল না। কাশীধামে মোটর-দুর্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

মহারাজা রাধাকিশোরের দেহত্যাগের পর যুবরাজ কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি এক জন উচ্চ শ্রেণীর চিত্রশিল্পী ছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত চিত্র 'উজ্জয়ন্ত' প্রাসাদে রক্ষিত আছে। বীরেন্দ্রকিশোরের সময় হইতে ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজ-পরিবারের সহিত ত্রিপুরা রাজপরিবারের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ইহার পূর্ব্বে বৈবাহিক সম্বন্ধাদি ত্রিপুরা ও মণিপুর এই দুই রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বীরেন্দ্রকিশোরের সময়েই সর্ব্বপ্রথম নেপাল, পাতিয়ালা, ঢোলপুর, বলরামপুর ও পান্না প্রভৃতি রাজ্যের রাজবংশীয় কুমারীদিগের সহিত মহারাজা ও রাজপরিবারস্থ কুমারদিগের বিবাহ হয়। ইতিপূর্ব্বে ত্রিপুরার রাজমহিষীগণ সাধারণতঃ মণিপুর রাজবংশ হইতে এবং রাজার সহিত দাম্পত্য সম্বন্ধবিশিষ্ট অন্যান্য অন্তঃপুরিকাগণ ত্রিপুরার অভিজাত 'ঠাকুর' পরিবারসমূহ হইতে গৃহীত হইতেন। মহারাজার এই শেষোক্ত পত্নীগণ 'কাচরাণী' নামে অভিহিত হইতেন।

মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র যুবরাজ বীরবিক্রমকিশোর রাজা হন। তিনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান্ ও কর্ম্মকুশল ছিলেন। ত্রিপুররাজগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে স্যার ও কে. সি. এস্. আই. উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার রাজত্বকালে ঢাকা জেলার অন্তর্গত রায়পুর অঞ্চলে মুসলমান দুর্বৃত্তগণ হিন্দু অধিবাসীদিগের উপর ভীষণ অত্যাচার করিবার ফলে বহুসংখ্যক হিন্দু স্বীয় বাসস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক ত্রিপুরারাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি সেই সকল গৃহহারাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন এবং কয়েকটি নূতন গ্রাম স্থাপন করিয়া ইহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করেন। তাঁহার পরিকল্পনানুসারে আগরতলায় বসতবাটীসমূহ নির্ম্মিত হওয়ায় শহরের সৌষ্ঠব বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর তাঁহার জীবিতকালেই শিশুপুত্র কুমার কিরীটবিক্রমকিশোরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর বালক কিরীটবিক্রম রাজপদ লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার মাতা রাজপ্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিতেছেন। সম্প্রতি ত্রিপুরারাজ্য ভারত-ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ব্রিটিশ শাসনকালে ইহা বাংলা সরকারের রক্ষণাধীনে ছিল।

ত্রিপুরা অতি প্রাচীন রাজ্য। বর্ত্তমান রাজবংশ সুদীর্ঘকাল যাবৎ ত্রিপুরায় রাজত্ব করিতেছেন। ভারতবর্ষে নিরবচ্ছিন্নভাবে এত দীর্ঘকালস্থায়ী অপর কোন রাজবংশ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ত্রিপুরারাজের প্রবর্ত্তিত ত্রিপুরাব্দ নামে যে সাল প্রচলিত আছে, তাহা বঙ্গাব্দের তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত হইয়াছে। বাংলা পঞ্জিকাসমূহেও ত্রিপুরাব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য ত্রিপুরায় বর্ত্তমান রাজবংশের রাজত্ব আরম্ভ হওয়ার বৎসর হইতেই এই অব্দ প্রবর্ত্তিত হয় নাই, মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে ইহার সূচনা হইয়া থাকিবে।

বহুকাল হইতেই ত্রিপুরার লেখাপড়া সংক্রান্ত রাজকার্য্যাদি বাংলা ভাষায় সম্পন্ন হইতেছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত ত্রিপুরার সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকারের সহিত রাজ্যসম্পর্কিত লেখাপড়ার কাজ আবশ্যকবোধে ইংরেজী ভাষায় চলিলেও রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সকল কার্য্য বাংলা ভাষায়ই নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে অনেক ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি ত্রিপুরায় রাজকর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত থাকিলেও এই নিয়মের তাদৃশ ব্যতিক্রম হয় নাই।

ত্রিপুরারাজ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলাভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা চলিয়া আসিতেছে। বাংলা ভাষার অন্যতম প্রাচীন ইতিহাস-গ্রন্থ 'রাজমালা' মহারাজা ধর্ম্মমাণিক্যের রাজত্বকালে তদীয় রাজসভার পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর কর্ত্তৃক বাংলা পদ্যে সঙ্কলিত হয়। সম্প্রতি 'রাজমালা'র একটি মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং হিতবাদীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ বিভিন্ন সময়ে 'রাজমালা'র কতক কতক অংশ সম্পাদন করেন। অবশেষে ত্রিপুরারাজ্যের কর্ম্মচারী কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণের সম্পাদকতায় 'রাজমালা' পূর্ণাঙ্গ হইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, খ্যাতনামা ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ 'রাজমালা' নামে ত্রিপুরার ইতিহাস প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত আগরতলা

উমাকান্ত একাডেমির ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যানিধি 'ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত' নামে ত্রিপুরার অপর একটি ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন।

পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ আগরতলায় থাকাকালে ত্রিপুরারাজ্যের বিভিন্ন স্থান হইতে কতকগুলি শিলালিপি সংগ্রহ করিয়া ইহাদের বিবরণসমন্বিত "ত্রিপুরার শিলালিপি" নামক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই সকল শিলালিপিতে ত্রিপুরার ইতিহাসের অনেক উপকরণ নিহিত আছে। ত্রিপুরা রাজ-পরিবারেও কয়েকজন সাহিত্যিকের আবির্ভাব হইয়াছে। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের কন্যা রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী একজন সুকবি ছিলেন। তদ্রচিত 'প্রীতি', 'কণিকা', 'শোকগাথা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ আগরতলা বীরযন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বড়ঠাকুর কুমার সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা ত্রিপুরা-রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের স্থাপত্য ও পূর্ত্ত-কীর্ত্তিসমূহের বিশদ বিবরণ এবং চিত্রসমন্বিত 'ত্রিপুরার স্মৃতি" নামক এক তথ্যবহুল গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কুমার মহেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা সঙ্গীতবিষয়ক একখানি উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কুমার সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মার সম্পাদকতায় আগরতলা হইতে 'বঙ্গভাষা' নামক একটি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইবার কিছুকাল পরই বন্ধ হইয়া যায়। কুমার বিমলচন্দ্র দেববর্ম্মা 'গোপবালা' নামক কাব্যের রচয়িতা। এতদ্ব্যতীত ত্রিপুরা রাজ-পরিবারের আরও কত সাহিত্যামোদীর অপ্রকাশিত রচনা নীরবে কীটদষ্ট হইতেছে, কিংবা গ্রন্থাগারের নিভৃত কোণে অজ্ঞাতবাস করিতেছে অথবা কালক্রমে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। পূর্ব্বোক্ত সাহিত্যিকগণ ব্যতীত রাজ-পরিবারেও কাব্য এবং সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তির অভাব নাই। তন্মধ্যে কুমার ব্রজেন্দ্র-কিশোর দেববর্ম্মার নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি বোলপুরস্থ শান্তি-নিকেতনের ভূতপূর্ব্ব বিদ্যার্থী এবং রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহ-ভাজন ছিলেন। তাঁহার নিকট লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী ইতিপূর্ব্বে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছে।

রাজ-পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ ব্যতীত রাজ-পারিষদগণের মধ্যেও কেহ কেহ সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ত্রিপুরনৃপতির ভূতপূর্ব্ব এডিকং ও অমাত্য কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মার নাম উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব-সংশ্লিষ্ট একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি এইরূপ:—একবার রবীন্দ্রনাথ আগরতলায় গিয়াছিলেন। তথায় অবস্থিতিকালে একদিন প্রত্যূষে তিনি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত-ভাবে কর্ণেলের গৃহে উপস্থিত হন। কর্ণেলপত্নী তখনও শয্যা-ত্যাগ করেন নাই, সহসা রবীন্দ্রনাথের আগমনে তিনি শঙ্কা-সরমজড়িত সন্ত্রস্তভাবে গাত্রোত্থান করেন। প্রকাশ, এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি রচনা করেন:

"কেন যামিনী না যেতে জাগালে না নাথ।
বেলা হ'ল মরি লাজে,
সরমে জড়িত চরণে কেমনে যাইব পথের মাঝে।
নিশার প্রদীপ নিবিয়া বাঁচিল ঊষার আলোক লাগি,
গগনের শশী গগনে লুকাল ঊষার কিরণ মাগি,
পাখী বলে গেল চলি বিভাবরী, বধূ চলে জলে লইয়া গাগরী
আমি কেমনে শিথিল কবরী আবরি যাইব পথের মাঝে।"

ত্রিপুরারাজ্যের ঠাকুরবংশীয়দিগের মধ্যেও কেহ কেহ সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়া থাকেন। ঠাকুরবংশীয় প্যারীমোহন দেব-বর্ম্মার লিখিত প্রবন্ধ বিভিন্ন মাসিক-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

সুখের বিষয়, ত্রিপুর-নৃপতির অধীনে পার্ব্বত্যজাতিসমূহের যে সকল সামন্ত রাজা আছেন, তাঁহাদের মধ্যেও বাংলা ভাষার অনুশীলন হইতেছে। ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের পরলোকগমন উপলক্ষ্যে কুকি নামক পার্ব্বত্য জাতির রাজা বালখাম্‌পুই রচিত একটি সুন্দর কবিতা প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে 'নব্যভারতে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

ত্রিপুরা বয়ন-শিল্পেও বিশেষ উন্নত। ত্রিপুরা রাজ্যবাসী মণিপুরীদের মধ্যে বয়ন-শিল্পের বহুল প্রচলন আছে। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরাই বয়নকার্য্যে নিরত থাকে। ইহাদের প্রস্তুত লেচিং-ফী (তুলাভরা শীতবস্ত্র), পরীর চাদর, তোয়ালে প্রভৃতি সুদৃশ্য ও ব্যবহারের বিশেষ উপযোগী।

ত্রিপুরার গৌরবোজ্জ্বল অতীতে ত্রিপুর-নৃপতিগণের প্রতিষ্ঠিত বহুসংখ্যক স্থাপত্য-কীর্ত্তির নিদর্শন এবং রাজা ও রাণীদের নির্দ্দেশে খনিত অনেকগুলি বিশাল সরোবর অদ্যাপি ত্রিপুরা রাজ্যের বহু স্থানে বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে কুমিল্লার প্রতিষ্ঠিত এবং বর্ত্তমানে জরাদশায় পতিত 'সতর রত্তম' নামক সপ্ততল মঠাকৃতি হর্ম্ম্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সরোবরসমূহের মধ্যে ত্রিপুরা জেলার কুমিল্লা সদর উপবিভাগের চৌদ্দগ্রাম থানার এলাকায় অবস্থিত জগন্নাথ দীঘি নামক সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত জলাশয়, কুমিল্লার ধর্ম্মসাগর, কসবার কল্যাণসাগর, মোগড়ার গঙ্গাসাগর প্রভৃতি বিশাল দীর্ঘিকা ত্রিপুররাজগণের এবং কুমিল্লার রাণীদীঘি, নানুয়ার দীঘি, কসবার কমলাসাগর প্রভৃতি ত্রিপুরার রাণীদের পুণ্যস্মৃতি বহন করিতেছে। ত্রিপুর-রাজ-গণের নির্ম্মিত বিভিন্ন দেবায়তনের মধ্যে ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব রাজধানী উদয়পুরের ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির বিখ্যাত। এই উদয়পুর একটি পীঠস্থান। ত্রিপুরার উদয়পুর অঞ্চলে রাধা-কিশোরপুর গ্রামের দেড় মাইল দূরে পাহাড়ের উপর সুদর্শন-চক্রে ছিন্ন সতীর দক্ষিণ চরণ পতিত হওয়ায় এই স্থানটিও একটি মহাপীঠে পরিণত হইয়াছে। এ স্থানে দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী, ভৈরব ত্রিপুরেশ। ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির ব্যতীত কুমিল্লার রাজ-রাজেশ্বরী কালী-মন্দির এবং জগন্নাথদেবের মন্দির ও কসবার কালী-মন্দির প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঝাঁসী—'মেরি ঝাঁসী দেঙ্গি নেহি'

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বেলা সাড়ে আটটায় ঝাঁসী পৌঁছিলাম। ঝাঁসী বেশ বড় রেলওয়ে জংসন। এখান হইতে আগ্রা, দিল্লী, গোয়ালিয়র, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ—সর্বত্র যাওয়া চলে। ঝাঁসীর ষ্টেশনটি বৃহৎ ও সুন্দর। ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দূরবর্তী শহরের বড়বাজার নামক বাণিজ্যকেন্দ্রে পৌঁছিতে আমাকে মাত্র চারি আনা টাঙ্গা-ভাড়া দিতে হইয়াছিল। পথঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ষ্টেশনের অল্প দূরে একটি ছোট পাহাড়। বিরাট উঁচুনীচু প্রান্তরের মধ্যে শহর। শহরের কাছে ও দূরে পাহাড়ের পর পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা হোটেল, ডাকবাংলো পার হইয়া শহরের দিকে চলিলাম। ঝাঁসী শহরের চারিদিক ঘিরিয়া প্রস্তরনির্মিত প্রাচীর। উহার দৈর্ঘ্য হইবে প্রায় সাড়ে তিন মাইল। প্রাচীরবেষ্টিত এই শহরের আয়তন প্রায় এক বর্গমাইল।

একটি তোরণ পার হইতেই আমরা একেবারে ঝাঁসী-দুর্গের পাশ দিয়া চলিলাম। রাজা বীরসিংহ রাজদেও বা দেবের সময় বাঁগড়া পাহাড়ের উপরকার এই দুর্গটি নির্মিত হয়। ঝাঁসীরাজ্য বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। প্রথমে ইহা ছিল রাজা বীরসিংহ দেবের শাসনাধীন। কথিত আছে, রাজা বীরসিংহ দেবই ঝাঁসী নগর প্রতিষ্ঠা করেন। সে ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তখন ঝাঁসী ছিল একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। ক্রমশঃ উহার সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয়তন বাড়িল। চারিদিকে লোকজনের বসতির সঙ্গে সঙ্গে নগরেরও শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ঝাঁসী নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। এক দিন নাকি বোরছার রাজা বীরসিংহ দেও এবং জৈতপুরের রাজা একসঙ্গে বসিয়াছিলেন। বীরসিংহ দেও তাঁহার নবনির্মিত দুর্গের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া জৈতপুরের রাজাকে বলিলেন, 'আপনি কি এখান থেকে আমার নূতন দুর্গ দেখতে পাচ্ছেন?'

জৈতপুরের রাজা উত্তর করিলেন, 'ঝাঁসী'—মানে ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছে। সেই ঝাঁসী কথাটি হইতে নগরের নাম হইল ঝাঁসী।

আমরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ধর্ম্মশালায় আসিয়া পৌঁছিলাম। বেশ বড় ধর্ম্মশালা। ম্যানেজার অতি সজ্জন, তিনি আমাকে উপরের একটি ঘর দিলেন, ঘরটি বেশ বড়। ধর্ম্মশালার খাতায় নাম-ধাম ও পরিচয় সব লিখিয়া, ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া বেশ আরামবোধ করিলাম। বেলা প্রায় বারোটার সময় ভোজনপাট সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে হোটেলের সন্ধানে চলিলাম। খানিক দূর যাইতেই দেখিলাম ইংরেজীতে ও দেবনাগরী হরফে লেখা আছে "চন্দ্র" হোটেল। হোটেলটি একজন মারাঠীর। সেখানে ডাল, ডালনা ইত্যাদি প্রত্যেকটিতে প্রচুর পরিমাণে লঙ্কার বহর। কোনমতে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া ধর্ম্মশালায় আসিয়া শুইয়া পড়িলাম।

ঝাঁসী রেল ষ্টেশন

বিকালের দিকে শহরের রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইলাম। বড়বাজার অঞ্চলের রাস্তাটি তেমন প্রশস্ত নয় এবং পরিচ্ছন্নও নয়। দুই দিকেই সারি সারি দোকান—এমন কি, পথের উপরেও ফেরিওয়ালারা বসিয়াছে। একটি ছোট রাস্তা ধরিয়া কিছুদূর যাইতেই এক বিরাট তোরণের কাছে আসিলাম। একটি লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এই তোরণের নাম 'লছমী দরোয়াজা'। লছমী গেট পার হইয়া খানিকদূর যাইতেই দেখা গেল—দূরে বৃত্তাকার জলাশয়, নাম "লছমী তালাও"। বিরাট হ্রদ, হ্রদের পথে রাজা গঙ্গাধর রাওয়ের সমাধি-উদ্যান নজরে পড়িল। লক্ষ্মীবাঈয়ের স্বামী গঙ্গাধর রাও ১৮৫৩ সালে পরলোকগমন করেন। লছমী তালাও হ্রদের পাড়ে তাঁহার চিতাভস্মের উপর অতি সুন্দর সমাধিমন্দির নির্মিত হয়, তাহার নিকটে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং উদ্যানও রচিত হইয়াছিল। উদ্যানের প্রবেশদ্বার বন্ধ ছিল, তাই ভিতরে প্রবেশ করিতে পারি নাই।

লছমী দরোয়াজার ন্যায় ঝাঁসীতে নগর-প্রাচীরে খাণ্ডেরাও, দাতিয়া, উনাও, ভাণ্ডীর, বড়গাঁও, লছমী, সগর, বোরছা, সইনর এবং ঝির্নান দরজা আছে। তন্মধ্যে ভাণ্ডীর দরজা সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ এবং ঝির্নাম দরজা পরিপূর্ণভাবে উন্মুক্ত। এখনও সেই সকল দরজার কাঠের কপাট ইত্যাদিতে তোপের গোলাগুলির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত চারিটি খিড়কি-দরজা আছে। তাহাদের নাম

যথাক্রমে—গদাধরগির খিড়কি, আলিখোলকি খিড়কি, সুজনকি খিড়কি ও সগর খিড়কি। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে স্যার হিউ রোজ তাঁহার তোপশ্রেণী সাঁইনর এবং খির্মান দরজার মধ্যে সজ্জিত করেন। সেই অংশ এখনও সংস্কৃত হয় নাই।

ঝাঁসী দুর্গ

গদাধর রাওয়ের সমাধি-ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীমহালক্ষ্মী দেবীর মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের সন্নিকটে দুই দিকে দুইটি সরোবর তারপর লক্ষ্মী তালাও নামক বিরাট হ্রদ। মন্দিরে যাইবার জন্য আগেকার দিনে প্রস্তর দ্বারা যে সেতুটি নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা এখনও বিদ্যমান। শ্রীমহালক্ষ্মীদেবীর উপর রাণীর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। প্রতি শুক্র ও মঙ্গলবারে স্বীয় দত্তক পুত্র দামোদর রাওকে লইয়া তিনি দেবীদর্শনে যাইতেন। রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের ও ঝাঁসীরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সুন্দর দেবমন্দির ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে। ইঁট-পাথর খসিয়া পড়িয়াছে, ভগ্ন তোরণ-দ্বার পতনোন্মুখ। ভিতরের প্রাচীরগাত্রের বিচিত্র চিত্রাবলী বিনষ্টপ্রায়। পূজারীর সঙ্গে ঘুরিয়া সব দেখিতে লাগিলাম। শ্রীমহালক্ষ্মীর মর্ম্মর-প্রস্তরনির্ম্মিত অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। দেবী যেন হাসিতেছেন। মন্দিরের দ্বিতলে তিনটি প্রকোষ্ঠ। যেখানে বসিয়া মহারাণী দেবীর অর্চ্চনা করিতেন, নৃত্য-গীত উপভোগ করিতেন, সে স্থান দেখিয়া ঝাঁসীর গৌরবময় অতীতের কথা মনে পড়িল, কিন্তু আজ মন্দির শ্রীহীন, ভোগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব। পুরোহিত বলিলেন, সরকারের নিকট দরখাস্ত করিয়াও বিশেষ কোন ফল হয় নাই। অতীতের স্মৃতি বুকে লইয়া মন্দির এখনও দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু তার মহিমা বিলুপ্তপ্রায়।

পূজারী ঠাকুরের অনুরোধে নৌকা-ভ্রমণে বাহির হইলাম। মন্দিরের একজন ভৃত্য নৌকা বাহিয়া চলিল। বিরাট হ্রদ। হ্রদের তীরে তীরে মন্দির। নৌকায় ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিলাম। নির্ম্মল স্ফটিক-স্বচ্ছ গভীর জল টল্‌টল্ করিতেছে। মন্দিরের ছবি জলে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িতেছেন—শান্ত সৌন্দর্য্য। দিকে দিকে রবি লোহিত আভা বিকীর্ণ করিয়া যেন শেষ বিদায় চাহিতেছেন। হ্রদের পশ্চিম তীরে প্রকাণ্ড বাগান, নাম রানবাগ। এই বাগানে রাণী লক্ষ্মীবাঈ অবসরবিনোদন করিতেন, দোলায় দুলিতেন, আনন্দোৎসব উপলক্ষে নৃত্য ও গীতে এই সুন্দর উদ্যান মুখরিত হইয়া উঠিত। আবীরের রঙে লালে লাল হইয়া যাইত। এখন বাগান নীরব নির্জ্জন। ফুল ফুটে। গাছে ফল ধরে, কিন্তু তাহা ঝরিয়া পড়ে লোকচক্ষুর অগোচরে!

হ্রদের তীরে এক সন্ন্যাসীর ডেরা দেখিয়া সেখানে গিয়া উঠিলাম। ধুনি জ্বলিতেছে। শিষ্যেরা গঞ্জিকার কলিকা সাজিয়া গুরুর হাতে দিতেছে, গুরুদত্ত মহাপ্রসাদ হাতে হাতে ঘুরিতেছে। সাধু বাংলার কথা, দেশের কথা অনেক জিজ্ঞাসা করিলেন। সংস্কৃত বেশ ভাল জানেন। ঝাঁসীতে অল্প দিন আসিয়াই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। আসন্ন সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিলাম।

ধর্ম্মশালা আমার বেশ ভাল লাগে। এখানে একটা চল-চঞ্চল ভাব। এক দল আসিতেছে, এক দল যাইতেছে। নিত্য জনস্রোত। আমার সঙ্গে কত জনের আলাপ হইল। কত দেশের লোক তাঁহারা, কেহ আসিয়াছেন ব্যবসা উপলক্ষে, কেহ আসিয়াছেন ভ্রমণে, কেহ আসিয়াছেন রাজকার্য্যে। ঝাঁসীতে এত বাঙালী থাকিতে আমি কেন ধর্ম্মশালায় উঠিয়া 'তকলিফ' ভোগ করিতেছি, কেহ কেহ সেকথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

রাত্রিতে বেশ ঘুম হইল। বাহিরে শুইয়াছিলাম। পরদিন সকালে শীতের প্রভাবটা একটু কমিলে চা ও গরম পুরি-তরকারি খাইয়া দুর্গের দিকে বাহির হইলাম। বিরাট দুর্গ, শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। একটি পথ দুর্গের উপর দিকে চলিয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে উপরে উঠিলাম। চোখে পড়িল উন্মুক্ত সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর—দূরে দূরে পল্লী, তরুলতা গুল্মবিহীন শিলাকীর্ণ পাহাড়, সবুজ সুন্দর বনানী। দুর্গের চারিদিক ঘুরিয়া দেখিলাম, ভিতরে প্রবেশ করিয়া সব দেখিতে হইলে 'পাশে'র প্রয়োজন, তাহাতে দুই-একদিন সময়ের দরকার। শিবরাত্রির দিন শুধু দুর্গের ভিতরে সর্ব্বসাধারণের প্রবেশাধি-কার আছে। সৌভাগ্যক্রমে স্থানীয় একটি কলেজের ছাত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, তাহার সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হইলাম। তাহার চেষ্টায় দুর্গের ভিতরে অল্প দূর পর্য্যন্ত যাইবার সুযোগ আমার হইয়াছিল—দুর্গের অভ্যন্তরভাগ সমতল—বিস্তৃত। যে দুর্গপ্রাকারে দাঁড়াইয়া লক্ষ্মীবাঈ সৈন্য পরিচালনা করিয়া-ছিলেন, যে স্থানে তোপমঞ্চ ছিল সেই মঞ্চ ও বুরুজ দেখিলাম, দূরে শিবের মন্দিরচূড়াও দৃষ্টিগোচর হইল।

প্রথমে আমার নবলব্ধ তরুণ বন্ধু আমাকে 'রাণীমহল' দেখাইতে লইয়া চলিলেন। বিরাট প্রাসাদ; বর্ত্তমানে কোতোয়ালিতে পরিণত হইয়াছে। রাণী যে ঘরে থাকিতেন, প্রসাধন করিতেন, সেরূপ দুই-তিনটি কক্ষ ছাড়া গোটা বাড়ীটাই কোতোয়ালির লোক-লস্করে ভরা।

পথ তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে। দুই পাশে তরুবীথি। খ্রীষ্টানদের একটি গির্জ্জা দেখিলাম। তাহার চারিদিকে সুন্দর বাগান। নগরচূড়ায় জাতীয় পতাকা উড়িতেছে। অবশেষে নগর-প্রাচীর ও দুর্গের পাশ দিয়া নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। পথে একটি গ্রন্থাগার দেখিলাম, গ্রন্থাগারটির নাম "সার্ব্বজনিক পুস্তকালয়"—নামটি আমার বেশ লাগিল। এই লাইব্রেরীতে হিন্দী, ইংরেজী, সংস্কৃত, উর্দ্দু প্রভৃতি নানা ভাষার বই আছে, বাংলা বইয়ের সংখ্যা নগণ্য, এই গ্রন্থাগারে সর্ব্বসাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকার আছে।

'মহারাণী লক্ষ্মীবাঈ কন্যা বিদ্যালয়' দেখিয়া মহারাণী লক্ষ্মীবাঈ ব্যায়াম ভবনে প্রবেশ করিলাম। প্রথমেই চোখে পড়িল যোদ্ধবেশে অশ্বারূঢ়া লক্ষ্মীবাঈয়ের মূর্ত্তি—মূর্ত্তিটি মর্ম্মর-প্রস্তর দ্বারা গঠিত। হস্তে তরবারি, মুক্ত কেশপাশ, রণোন্মত্তা লক্ষ্মীবাঈয়ের তেজোদৃপ্ত মূর্ত্তি দেখিয়া অভিভূত হইলাম, ব্যায়ামাগারে লক্ষ্মীবাঈয়ের বিরাট তৈলচিত্র প্রলম্বিত এবং অন্যান্য বীরত্বব্যঞ্জক চিত্রও আছে। আমরা এখানে প্রায় এক ঘণ্টা কাল ছিলাম। সেখানকার ব্যায়াম শিক্ষক ও একজন শিল্পী লক্ষ্মীবাঈ সম্বন্ধে নানা গল্প ও কাহিনী বলিলেন।

ঝাঁসী শহরের রাস্তা-ঘাট যেমন পরিষ্কার তেমনি বাড়ী ঘরগুলিও দেখিতে সুন্দর। অবশ্য সিটি ও ক্যান্টনমেন্ট এই দুই অংশে অনেকটা পার্থক্য আছে। ঝাঁসীতে অনেক বাঙালী বাস করেন। এমন বাঙালী পরিবার আছেন যাঁহারা প্রায় দুই শত বৎসরকাল যাবৎ এখানে বাস করিতেছেন।

যে মহীয়সী বীরাঙ্গনার প্রিয় ঝাঁসী দেখিতে উৎসাহিত হইয়া এখানে আসিয়াছিলাম এইবার তাঁহার কথা কিছু বলিব।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় এদেশের সর্ব্বত্র স্বাধীনতার জন্য একটা আগ্রহ ও উন্মাদনার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার পরিণাম যে এদেশবাসীর পক্ষে শুভ হয় নাই তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু সেই বিদ্রোহকালে ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ যে মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নিজের সৈন্যদল লইয়া অসাধারণ সাহসিকতার সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাহা অতুলনীয়।

মহারাষ্ট্রদেশে সাতারার নিকটবর্ত্তী কৃষ্ণা নদীর তীরে 'বাই' নামক গ্রামে কৃষ্ণরাও নামে এক 'করহদে' ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইনি পেশোয়া-সরকারে কাজ করিতেন। ইঁহার পুত্র বলবন্ত, শ্রীমন্ত পেশোয়ার অনুগ্রহে তাঁহার খাস ফৌজে একটি কাজে নিযুক্ত হন। বলবন্তের দুই পুত্র মোরোপন্ত ও সদাশিব রাও। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমন্ত বাজীরাও ম্যালকম্ সাহেবের নিকট রাজ্যের স্বত্বত্যাগপত্র লিখিয়া দেন এবং বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকার বৃত্তি

পথের পাশে গির্জ্জাঘর

গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে বিঠুরে আসিয়া বসবাস সুরু করেন। তিনি বাকী জীবন সেখানেই অতিবাহিত করেন। মোরোপন্ত শ্রীমন্ত দ্বিতীয় বাজীরাও সাহেবের সহোদর চিমাজী আপ্পা সাহেবের অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন। ওদিকে চিমাজী আপ্পা পুণার রেসিডেন্ট সাহেবের প্রস্তাব অনুযায়ী দশ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়ের পুণারাজ্যের ভার ত্যাগ করিয়া কাশী-বাসের ইচ্ছা প্রকাশ করেন—ইংরেজ-সরকার সম্মত হইয়া তাঁহাকে কাশীতে পাঠাইয়া দিলেন। সেই সময়ে তাঁহার সঙ্গে যে সব লোকজন কাশীতে আসেন মোরোপন্তও ছিলেন তাঁহাদের একজন। মোরোপন্ত সপরিবারে কাশীতে বাস করিতে থাকেন। ইনি শ্রীমন্ত আপ্পাজীর দেওয়ানপদে নিযুক্ত ছিলেন। মোরোপন্তের পত্নী ভাগীরথী বাঈয়ের গর্ভে কাশী-ধামে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই নবেম্বর এক কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। এই কন্যার নাম মনুবাঈ। মনুবাঈয়ের বয়স যখন তিন-চারি বৎসর মাত্র তখন তাঁহার মাতা ভাগীরথী বাঈয়ের মৃত্যু হয়।

মনুবাঈ ছিলেন সুন্দরী ও গুণবতী। কিন্তু করহদে ব্রাহ্মণকন্যার পাত্র করহদে ব্রাহ্মণই হওয়া চাই। ঝাঁসীর রাজা গঙ্গাধর রাও ছিলেন করহদে ব্রাহ্মণ। বিপত্নীক গঙ্গাধর রাওয়ের সহিত মাত্র আট বৎসর বয়সে মনুবাঈয়ের বিবাহ হইল। ঝাঁসীর রাজপরিবারের নিয়ম অনুসারে মনুবাঈয়ের নাম বদলাইয়া রাখা হইল লক্ষ্মীবাঈ। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মীবাঈয়ের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তিন মাস পরেই শিশুটির মৃত্যু হয়। পুত্রের মৃত্যুতে গঙ্গাধর রাও হতাশ মনে তাঁহার এক দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতিভ্রাতা বাসুদেব নেবলকরের পুত্র আনন্দরাওকে দত্তকরূপে গ্রহণ

করেন। আনন্দরাওয়ের নূতন নামকরণ হইল দামোদর গঙ্গাধর রাও। মৃত্যুর পুর্ব্বদিন মহারাজা গঙ্গাধর রাও ইংরেজ সরকারকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের বিষয় জানাইলেন এবং এই পোষ্যপুত্র গ্রহণ মঞ্জুর করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট

রাণীমহল—কোতোয়ালি

আবেদন করিলেন। কিন্তু তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডালহৌসী স্বত্বভ্রংশনীতি বা উত্তরাধিকারীবিহীন রাজ্যের (Doctrine of Lapse) নীতি অনুসারে গঙ্গাধর রাওকে দত্তকরূপে স্বীকার করিলেন না। সরকারের অনুমোদিত উত্তরাধিকারীর অভাবে যে সকল দেশীয় রাজ্য ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইয়াছিল ঝাঁসী তাহাদের অন্যতম।

লক্ষ্মীবাঈকে মাত্র ৫০০০ টাকা মাসিক বৃত্তি দেওয়া হইল এবং রাজা গঙ্গাধর রাও অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন বলিয়া ঝাঁসীরাজ্য ইংরেজ সরকার অধিকার করিলেন।

লক্ষ্মীবাঈয়ের স্বামীর কোন স্মৃতি থাকিবার ব্যবস্থাই রহিল না। এই অপমানে লক্ষ্মীবাঈয়ের হৃদয় দুঃখে, ক্ষোভে ও রোষে জর্জ্জরিত হইল—তাহার প্রাণে প্রতিহিংসার অনল প্রজ্বলিত হইল। তাহার কারণও ছিল। গঙ্গাধর রাওয়ের পূর্ব্বপুরুষ রামচন্দ্র রাওয়ের সহিত ইংরেজ সরকারের কৃত সন্ধিপত্রে উল্লেখ ছিল, ঝাঁসীর মালিকানা স্বত্ব বংশপরম্পরাক্রমে বজায় থাকিবে। এখন তাহা উপেক্ষিত হওয়াতে রাণী বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। পুত্র দামোদর রাওয়ের উপনয়নকালেও লক্ষ্মীবাঈকে ইংরেজ সরকারের সহিত অপমানজনক সর্ত্তে রাজী হইয়া, চারি জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে জামিনদার করিয়া তবে কোম্পানীর নিকট গচ্ছিত অর্থ পাইতে হইয়াছিল। তিন লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া দামোদর রাওয়ের উপনয়নকার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল।

১৮৫৭-১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে বঙ্গদেশে সিপাহীদের দ্বারা সিপাহী-বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। ক্রমশঃ উহা মীরাট, দিল্লী, কানপুর প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়িল। মীরাট এবং দিল্লীর বিদ্রোহের বার্ত্তা ঝাঁসীতেও আসিয়া পৌঁছিল। ক্রমে ঝাঁসী প্রভৃতি স্থানেও বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। ঝাঁসীতে সে সময় দ্বাদশ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের একাংশ, চতুর্দ্দশ সংখ্যক অনিয়মিত অশ্বারোহী-দলের একাংশ এবং কতিপয় গোলন্দাজ সৈনিক অবস্থান করিতেছিল। ইহাদের অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন ডনলপ্। যেদিন ঝাঁসী ইংরেজ সরকারের দখলে আসিল, সেদিন হইতেই ক্যাপ্টেন স্কিন্ কমিশনারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের মনে কোন দিন এমন আশঙ্কা হয় নাই যে, ঝাঁসীতে বিদ্রোহের আগুন প্রধূমিত হইতে পারে। কিন্তু অবশেষে তাহাই হইল। রাণী এই সময়ে ইংরেজদিগকে সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্গের বিদ্রোহী সেনাদের হাত হইতে ইংরেজদের রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। রাজ্য ত ইংরেজের—তিনি ত বৃত্তি-ভুক্ মাত্র।

এদিকে সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগকে হত্যা করিয়া উত্তেজিত ভাবে দলে দলে আসিয়া ঝাঁসীর রাজপ্রাসাদ অবরোধ করিল এবং রাণীর নিকট তিন লক্ষ টাকা দাবি করিল। তাহারা বলিল—টাকা না পাইলে তাহারা তোপের মুখে রাজপ্রাসাদ উড়াইয়া দিবে। রাণীর পিতা মোরোপন্ত রাজ্যের ও রাণীর প্রকৃত অবস্থা বিদ্রোহীদিগকে বুঝাইতে গিয়া বন্দী হইলেন। অবশেষে একান্ত নিরুপায় হইয়া রাণী নিজের অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া এক লক্ষ টাকা বিদ্রোহী-দলের সর্দ্দারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সিপাহীরা টাকা পাইয়া তাঁহার পিতাকে মুক্তি দিল এবং আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিতে লাগিল "মুলুক খোদাকা, মুলুক বাদশাকো, অমল রাণী লক্ষ্মীবাঈকা"—দেশ ভগবানের, দেশ বাদশাহের, রাজত্ব রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের। বিদ্রোহী-দল অতঃপর 'দিল্লী চলো ভেইয়া' 'দিল্লী চলো' বলিয়া হর্ষধ্বনি করিতে করিতে দিল্লী অভিমুখে রওনা হইল। এইরূপ ঘটনাচক্রে ঝাঁসীরাজ্য সম্পূর্ণরূপে লক্ষ্মীবাঈয়ের শাসনাধীনে আসিল।

ইংরেজদের অনুপস্থিতিকালে রাণী লক্ষ্মীবাঈ প্রায় দশ মাস কাল পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে ঝাঁসীরাজ্যের শাসনকার্য্য অতি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেন। ঐতিহাসিকগণ মুক্তকণ্ঠে তাঁহার যোগ্যতা—শাসনদক্ষতা এবং চরিত্রের দৃঢ়তার প্রশংসা করিয়াছেন।

ন্যায়নিষ্ঠ ইংরেজ লেখকগণ যাঁর মাহাত্ম্যের প্রশস্তি গাহিয়াছেন সেই লক্ষ্মীবাঈ সম্বন্ধে ইংরেজরা অমূলক সন্দেহ পোষণ করিলেন। তাঁহাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, ঝাঁসীর বিদ্রোহী সেনাগণ কর্ত্তৃক ইউরোপীয় স্ত্রী-পুরুষকে নৃশংসভাবে হত্যাকার্য্য রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের অনুমোদন অনুসারেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। রাণীর খাস-সৈন্য তখন দেড় শত দুই শতের অধিক

ছিল না। এ সময়ে ঝাঁসীর রাণী নানা ভাবে বিপন্না হইয়া পড়িয়াছিলেন। একজন অল্পবয়স্কা অসহায়া বিধবা ঝাঁসীরাজ্যের শাসনকর্ত্রী, এই ত উত্তম সুযোগ, ইহা মনে করিয়া ঘোরছার রাজ্যের দেওয়ান নথে খাঁ বিশ সহস্র সৈন্য লইয়া ঝাঁসী আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে রাণী পাঠানী বেশে নিজে সৈন্য-পরিচালনা করিয়াছিলেন। নথে খাঁ পরাজিত হইলেন। ঝাঁসীর আকস্মিক বিপদ এই ভাবে দূরীভূত হইল। রাণী ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে, বিশেষতঃ হ্যামিণ্টন সাহেবকে সমুদয় অবস্থা জানাইয়া পত্র দিয়াছিলেন, কিন্তু শত্রুর হস্তগত হওয়ায় সে পত্র তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে নাই। পৌঁছিলেই বা কি হইত তাহা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। রাণী লক্ষ্মীবাঈ ইংরেজদের হইয়াই রাজ্য শাসন করিতেছিলেন; কিন্তু ইংরেজ কর্তৃপক্ষীয়েরা বুঝিলেন অন্যরূপ, তাঁহারা মনে করিলেন, রাণী বিদ্রোহীদলভুক্ত হইয়াছেন, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তাঁহারা ঝাঁসীর রাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ ইংরেজ সেনাপতি স্যার হিউ রোজ সসৈন্যে ঝাঁসীর দ্বারদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। ২৩শে তারিখ হইতে প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাণীর সুদক্ষ পরিচালনাগুণে ২৩শে মার্চ্চ হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত সপ্তাহকাল ঝাঁসীর সৈন্যগণ দক্ষ ইংরেজ সৈন্যগণের সঙ্গে সমান তালে যুদ্ধ করিয়াছিল। ঝাঁসীদুর্গের গোলন্দাজেরা, বিশেষতঃ দক্ষ গোলন্দাজ গোলাম গোস খাঁ 'শত্রু সংহার' নলদার, কড়ক-বিজলী, ঘনগর্জ্জ প্রভৃতি তোপ হইতে গোলাবর্ষণপূর্ব্বক ইংরেজ সৈন্যদের অনেককে আহত ও নিহত করিয়াছিলেন। অবশেষে ৫ই এপ্রিল ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে—স্যার হিউ রোজ ঝাঁসী দুর্গ ও প্রাসাদ অধিকার করিলেন। সে সময়ে ইংরেজ সৈন্যেরা স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে নগরবাসীদের উপর যে অত্যাচার করিয়াছিল তাহা ইংরেজজাতির ইতিহাসে কলঙ্ককালিমা লেপন করিয়াছে। রাণী একান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িলেন এবং তিনি ও তাঁহার সহচরীরা পুরুষবেশ ধারণ করিয়া বিশ্বস্ত অনুচরবর্গসহ ভাণ্ডীর নামক সিংহদ্বার পার হইয়া ঝাঁসী হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং কাল্পী নামক স্থানে তাঁতিয়া টোপী ও নানাসাহেবের ভ্রাতা শ্রীমন্তরাও সাহেব পেশোয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নানাসাহেব পূর্ব্বেই বিপন্না ঝাঁসীর রাণীকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁতিয়া টোপীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি ইংরেজের হাতে পরাজিত হইয়া কাল্পীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। এখানে তিনি রাণীর সহিত মিলিত হইলেন।

কাল্পী হইতে তাঁতিয়া টোপী ও লক্ষ্মীবাঈ গোয়ালিয়র বিজয়ে অগ্রসর হইলেন। অতি সহজেই তাঁহারা গোয়ালিয়র অধিকার করিতে সক্ষম হন, কিন্তু রাও সাহেব 'দশহরা' উপলক্ষে বিজয়-উৎসবে মত্ত হইয়া উঠিলেন। এদিকে অক্লান্তকর্ম্মা স্যার হিউ রোজ বিদ্রোহীদিগকে পরাভূত করিতে করিতে ক্রমশঃ গোয়ালিয়রের নিকটবর্ত্তী মুরারের ছাউনিতে আসিলেন। রাও সাহেব যখন এ সংবাদ জানিলেন, তখন

আদালতগৃহ—ঝাঁসী

আবার তাঁতিয়া টোপী ও রাণীর উপর যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। কিন্তু সে সময়ে রাও সাহেব স্বপক্ষীয় সৈন্যদের কোনরূপ সুব্যবস্থা করেন নাই। এদিকে ইংরেজ আসিয়া পড়িয়াছে। রাণী লক্ষ্মীবাঈ পুরুষবেশ ধারণপূর্ব্বক অশ্বারূঢ় হইয়া ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অমিত বিক্রমে শত্রুসংহার করিতে লাগিলেন। তিন দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। ইংরেজদের রণ-কৌশলে বিদ্রোহী সেনারা পরাজিত হইতে লাগিল। একদল ইংরেজ-সৈন্য প্রচণ্ড বিক্রমে রাণীর সৈন্যদলকে আক্রমণ করিল, তাহারা পরাজিত হইয়া পলাইয়া গেল।

এইরূপ অবস্থায় রাণী অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেও নিরাশ হইলেন না- তিনি তাঁহার দুই তিন জন বিশ্বাসী সর্দ্দার ও তিন জন পরিচারিকাসহ কোনরূপে শত্রুর হাত এড়াইবার জন্য সবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। ইংরেজ ঘোড়সওয়াররা তাঁদের অনুসরণ করিল। তাঁহার দাসী সুন্দরা সহসা চীৎকার করিয়া কহিল—'রাণী ঠাকরুণ, প্রাণ গেল, বাঁচান।" দাসীর চীৎকার শুনিয়া রাণী পশ্চাতে ফিরিয়া আসিয়া পলক মধ্যে সুন্দরার আক্রমণকারী ইংরেজকে বধ করিয়া আবার সবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।

একটা ক্ষুদ্র খালের কাছে আসিয়া ঘোড়া থমকিয়া দাঁড়াইল। রাণীর প্রিয় অশ্বটি আহত হওয়ায় তিনি সিন্ধিয়ার অশ্বশালা হইতে এই ঘোড়াটি বাছিয়া লইয়াছিলেন। ঘোড়াটি যাহাতে খাল অতিক্রম করে সেজন্য তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন, ঘোড়া কিন্তু কিছুতেই অগ্রসর হইল না। যে দুই জন ইংরেজ ঘোড়সওয়ার তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল, তাঁহারা

অতি দ্রুত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাণী আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে তরবারি উত্তোলন করিলেন। দুই পক্ষে ভীষণ ভাবে অসিযুদ্ধ চলিল। অবশেষে একজন ইংরেজ অশ্বারোহীর তরবারির আঘাতে রাণীর মস্তকের দক্ষিণ ভাগ একেবারে ছিন্ন

ঝাঁসীর একটি দেবালয়

হইয়া গেল এবং একটি চক্ষুও উৎপাটিত হইল। ইহার পরেও আক্রমণকারী তাঁহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া সঙ্গীনের আঘাত করিল। এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে পড়িয়াও বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈ সেই আঘাতকারী ও তাহার একজন সঙ্গীকে অসির আঘাতে নিহত করিলেন।

রাণী তাঁহার বিশ্বস্ত প্রভুভক্ত অনুচর সর্দ্দার রামচন্দ্র রাও দেশমুখকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন—'দেখ, মৃত্যু আমার নিকটে আসিয়াছে। আমার এই মিনতি, আমার মৃতদেহ যেন ইংরেজের হাতে না পড়ে। তাহা হইলে আমার আত্মা কোন রূপেই শান্তি লাভ করিতে পারিবে না।'

সর্দ্দার রামচন্দ্র রাও ও অন্যান্য সর্দ্দারেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী একটি পর্ণকুটিরে লইয়া গেলেন। সেই কুটিরে গঙ্গাদাস বাবাজী নামে একজন সাধু থাকিতেন। রাণী অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িয়া জলপানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, বাবাজী তাঁহাকে পবিত্র গঙ্গাজল পান করিতে দিলেন। রাণী লক্ষ্মীবাঈ রুধিরাপ্লুত দেহে—একবার শুধু শেষ বারের মত তাঁহার প্রিয়তম পুত্র দামোদর রাওয়ের দিকে গভীর স্নেহভরে চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন—তারপর এই তেজস্বিনী মহারাণী বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈ অমরলোকে মহাপ্রয়াণ করিলেন। "মেরি ঝাঁসী দেঙ্গি নেহি"—বীররাণীর এই উক্তি যুগে যুগে তাঁহার বীরত্ব-কাহিনীকে স্মরণীয় ও বরণীয় করিয়া রাখিবে। ১৯১৫ বিক্রম সংবতের জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে ইংরেজী ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে রাণী মহাপ্রয়াণ করেন।

সন্ধ্যায় ঝাঁসী ছাড়িলাম। তখন ব্যাণ্ড বাজিতেছিল। পুণ্যকামী ব্যক্তি তীর্থদর্শনে যান, আমিও তীর্থ দেখিতে আসিয়াছিলাম। দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। গাড়ী চলিতেছিল, আমার কাণে ভাসিয়া আসিতেছিল—'মেরি ঝাঁসী দেঙ্গি নেহি।'

ভারতবর্ষ

শ্রীকরুণাময় বসু

এখানে অনেক চিহ্ন পুরাকাল দিয়ে গেছে এঁকে,
অনেক বন্যার ঢেউ সরে গেছে, পলিমাটি শুধু গেছে রেখে ;
অস্থির তরঙ্গ-ঘাতে ভেঙে গেছে তীর—
তবুও অম্লান আত্মা, পরিপূর্ণ জীবন গভীর
কালের সমুদ্রতীরে বিস্তারিল সীমা ;
নিঃশব্দ গৌরবহীন মৃত্যুর উপরে প্রকাশিল প্রাণের মহিমা।
অনেক হয়েছে ক্ষতি, হয়েছে গভীর ক্ষত,
অনেক অমিল ছিল তবু তারা হয়েছে সংহত
শতাব্দীর তীর্থপথে।
দেখিতেছি উদ্ভাসিত সূর্য্যের আলোতে
খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি
অবিচ্ছেদ্য স্বর্ণসূত্রে পরস্পর ছুঁয়েছে অঙ্গুলি ;—
তাই তার মাঠ ঘাট, শস্যক্ষেত, পাহাড় পর্ব্বত
হাজার মাইল ধরি চলে যায় ; জয়যাত্রা রথ
নহে শুধু প্রতিকূল পরিবেশে তবু।
শুনেছি কালের শব্দ, রথধ্বনি থামিবে না কভু,
এখনো অনেক দূর, অসমাপ্ত এই অর্দ্ধ পথ ;
সূর্য্যদীপ্ত প্রাণে প্রাণে উচ্চারিত উদ্দীপ্ত শপথ।
সত্য জানি আবার জমেছে মেঘ,
নিরাশ্বাস জীবনের রিক্ত ক্ষুব্ধ উত্তাপ, উদ্বেগ
আকাশে আঘাত হানে ;
তবু জানি রুক্ষ রিক্ত দৈন্য যতো ঘুচে যাবে,
এই মাটি সত্য যাদু জানে—
বিদীর্ণ হৃদয় হ'তে পরিপূর্ণ শস্য দিবে আনি
শ্যামল অঞ্চল ভরি ; জীবনের সত্যতম বাণী
শুনিতেছি আজ এই বঙ্গের সন্ধ্যায়,
অদূরে ফসলক্ষেত, বাঁকা নদী, স্তব্ধ নেত্রে চেয়ে আছে
আগামী অধ্যায়।

কচ্ছদেশের উদ্বাস্তু-নগর গান্ধীধাম

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

ভারত-বিভাগের পর উদ্বাস্তুদের দেশত্যাগের কাহিনী আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসের একটি বেদনাময় অধ্যায়। দেশ বিভক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান হইতে লক্ষ লক্ষ নরনারী নিজেদের বাস্তুভিটা এবং বিষয়-সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে ভারতরাষ্ট্রে আসিয়া আশ্রয় লইতে সুরু করিল, প্রতিকূল অদৃষ্টের তাড়নায় তখন তাহাদিগকে যে দুঃখদুর্গতি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়।

সমগ্র সিন্ধুপ্রদেশে সেদিন হিন্দুদের জন্য এমন একটু স্থানও ছিল না যেখানে তাহারা নিজেদের আর্থিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সত্তাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে। অনন্যোপায় হইয়া এই বাস্তুহারার দল যাযাবরের মত এক শহর হইতে অন্য শহরে গিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, ফলে তাহাদের আর্থিক, ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক সংহতি বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইল।

উদ্বাস্তুদের এই শোচনীয় অবস্থায় বিচলিত হইয়া তাহাদের জন্য একটি স্থায়ী বাসভূমির ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে 'সিন্ধু পুনর্ব্বাসন করপোরেশন লিমিটেডে'র অগ্রগণ্য কর্ম্মী শ্রীপ্রতাপ দয়ালদাস- মহাত্মা গান্ধী, সর্দ্দার প্যাটেল এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কচ্ছের মহারাওয়ের নিকট আবেদন জানাইলে পর তিনি কচ্ছদেশের কাণ্ডলা বন্দরের নিকটবর্ত্তী ২৭ বর্গমাইল পরিমিত জমি উদ্বাস্তুদের জন্য একটি নগর নির্ম্মাণ করিবার উদ্দেশ্যে দান করিলেন। স্থির হইল যে, জাতির জনকের নামানুসারে এই নগরীর নামকরণ হইবে গান্ধীধাম। কচ্ছদেশের হিন্দু এবং সিন্ধুর হিন্দুদের ভাষা এক এবং ইহারা একই সামাজিক বন্ধনে ও সাংস্কৃতিক সূত্রে আবদ্ধ বলিয়া কচ্ছদেশের এই অঞ্চলটিই উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসন-ক্ষেত্ররূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে, কেননা এখানে তাহারা স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আনন্দপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে বাস করিতে পারিবে। ভারত গবর্ণমেন্ট কাণ্ডলা বন্দরের উন্নয়নের জন্য ষোল কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে কাণ্ডলা কচ্ছ এবং সৌরাষ্ট্রের উপকূলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দরে পরিণত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহাতে করাচী ভারতরাষ্ট্রের বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় যে বাণিজ্যিক ক্ষতি হইয়াছে তাহার পূরণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভারত-সরকার ১,২০০,০০,০০০৲ টাকা ব্যয়ে দুইটি রেলপথ নির্ম্মাণ দ্বারা ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের সহিত কাণ্ডলার যোগস্থাপনের জন্য এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া কাজ সুরু করিয়াছেন।

এখন সিন্ধু পুনর্ব্বাসন করপোরেশন লিমিটেড নামক সংস্থাটির মোটামুটি পরিচয় দেওয়া দরকার। পাকিস্তানের,
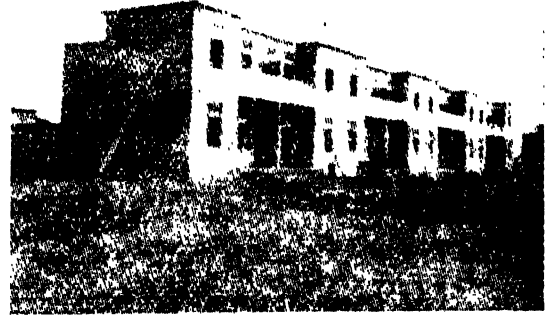
গান্ধীধামের নবনির্ম্মিত একটি একতলা গৃহ

বিশেষতঃ সিন্ধুর বাস্তুহারা হিন্দুদের পুনর্ব্বাসনের উদ্দেশ্যে তিন বৎসর পূর্ব্বে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। নূতন নূতন শহর এবং কলোনি স্থাপন করিয়া উদ্বাস্তুদিগকে শুধু আশ্রয়দানই নহে, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যবিষয়ক পরিকল্পনাসমূহকে কার্য্যকরী করিয়া তাহাদের জীবিকার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়াও এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। আচার্য্য কৃপালনী ইহার বোর্ড অব ডাইরেক্টর্সের চেয়ারম্যান।

সৌরাষ্ট্র এবং কচ্ছরাজ্যের মধ্যবর্ত্তী কচ্ছ উপসাগরের শেষ-প্রান্তস্থ কাণ্ডলা বন্দরের নিকটে গান্ধীধাম নগরটির নির্ম্মাণকার্য্য সুরু হইয়াছে। সিন্ধু পুনর্ব্বাসন করপোরেশন লিমিটেডের অনুমোদিত মূলধন (Authorised Capital) আড়াই কোটি টাকা ২০ হাজার অংশে বিভক্ত দুই কোটি টাকা বিক্রয়যোগ্য মূলধন (Issued capital) সম্বল করিয়া করপোরেশন কাজ চালাইয়া যাইতেছেন। উপরোক্ত অঞ্চলে উদ্বাস্তু-নগর নির্ম্মাণের জন্য কচ্ছের পরলোকগত মহারাও করপোরেশনকে ১৭,৫০০ একর ভূমি দান করেন। গবর্ণমেণ্ট শুধু করপোরেশনকে এখানে নগর নির্ম্মাণের অনুমতি দিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই, উহার শেয়ারের শতকরা ২৫ ভাগ ক্রয়ও করিয়াছেন। উপরন্তু শরণার্থীদের জন্য ৪০০০ সাদাসিধা ধরণের গৃহ নির্ম্মাণকল্পে এক কোটি দশ লক্ষ টাকা কর্জ্জদানও সরকার মঞ্জুর করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই এই প্রতিশ্রুত অর্থের মধ্যে ৯০ লক্ষ টাকা করপোরেশনকে দেওয়া হইয়াছে।

ম্যারিও ব্যাচিওসি নামক জনৈক ইটালীয় স্থপতির পরিকল্পনা অনুসারে নগরের প্রাথমিক নির্ম্মাণকার্য্য সুরু হইয়াছিল,

সম্প্রতি বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয় তরুণ স্থপতিগণ কর্ত্তৃক নবপরিকল্পিত উপায়ে একটি বিশিষ্ট এবং অভিনব পদ্ধতিতে গৃহাদি নির্ম্মাণের চেষ্টা চলিতেছে।

নগরের দুই প্রান্তে দুইটি উপনিবেশ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে। একটি কারখানা অঞ্চল—বর্ত্তমানে আদিপুর নামে পরিচিত, কেননা গৃহনির্ম্মাণের উপকরণাদির কারখানা-সমূহ ওদিকে অবস্থিত। উক্ত অঞ্চলের বর্ত্তমান বাসিন্দাদের সংখ্যা প্রায় ৮০০০। সর্দ্দার প্যাটেলের নামানুসারে অপর অঞ্চলটির নামকরণ হইয়াছে সর্দ্দারগঞ্জ। প্রধান রেলওয়ে ষ্টেশনের জন্য যে স্থানটি নির্ব্বাচিত হইয়াছে তাহার নিকটে ইহা অবস্থিত। এই অঞ্চলে ২০৮৬টি বাসাবাড়ী এবং দোকান-ঘরের নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণপ্রায়।

লিঙ্ক রোড নামে ২০০ ফুট চওড়া এবং পাঁচ মাইল দীর্ঘ, যানবাহন চলাচলের উপযোগী একটি রাস্তার দ্বারা দুইটি কলোনির মধ্যে যোগ স্থাপিত হইবে—রাস্তাটির নির্ম্মাণকার্য্য এখনও শেষ হয় নাই।

আদিপুর (কোয়ার্টার—এ) শিনাই পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে কাণ্ডলা বন্দর হইতে এগার মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার আয়তন ৩০৩ একর।

হইয়াছে। এই সমস্ত নলকূপ হইতে ২৪ ঘণ্টায় দুই লক্ষ গ্যালনেরও অধিক জল সরবরাহ হইয়া থাকে।

গান্ধীধামে জল-সরবরাহের যন্ত্রপাতি

ভারত-সরকারের ভূতত্ত্ববিদ এবং অন্যান্য বিদেশী বিশেষজ্ঞদের ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে শহর-এলাকার অনতিদূরে, ভূগর্ভে প্রচুর জল সঞ্চিত আছে এমন বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমস্ত স্থান খুঁড়িয়া বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছে।

গৃহ—টাইপ বা নমুনা	এখানকার গৃহ-সংখ্যা এইরূপ : পরিকল্পিত গৃহের সংখ্যা	নির্ম্মিত গৃহের সংখ্যা	নির্ম্মাণকার্য্য চলিতেছে এরূপ গৃহের সংখ্যা
এক কক্ষযুক্ত কোয়ার্টার —	১০৬৪	৬৬৭	৩৯৭
এক „ বাসাবাড়ী—	২৪০	২৪০	—
দুই „ „ —	৩৭২	১৪০	২৩২
তিন „ „ —	২০	২০	—
দোকানঘর—	২১৮	৮৬	১৩২
	১৯১৪	১১৫৩	৭৬১

সর্দ্দারগঞ্জ (কোয়ার্টার—বি) কাণ্ডলা বন্দর হইতে সাড়ে চার মাইল দূরে অবস্থিত—আয়তন ৯০১ একর।

গৃহ—নমুনা	এখানকার গৃহ-সংখ্যা : পরিকল্পিত গৃহের সংখ্যা	নির্ম্মিত গৃহের সংখ্যা	নির্ম্মাণকার্য্য চলিতেছে এরূপ গৃহের সংখ্যা
এক কক্ষযুক্ত কোয়ার্টার—	৪০০	—	৪০০
এক „ বাসাবাড়ী—	১৮০	১৮০	—
দুই „ „ —	১২২০	১০৪০	১৮০
তিন „ „ —	—	—	—
দোকানঘর—	২৮৬	২২	২৬৪
	২০৮৬	১২৪২	৮৪৪

জল-সরবরাহ—বর্ত্তমানে এ এবং বি এই দুইটি উপ-নিবেশেরই পানীয় জল সরবরাহ হয় শিনি হ্রদের ফিডার লাইন এবং তিরি উৎস হইতে। গান্ধীধাম (এ) কলোনিতে অনেক-গুলি নলকূপ (Tubewell) প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, বিবিধ কার্য্যের জন্য আবশ্যক জলের চাহিদা মিটিবার অনেকটা সুবিধা

তিরি হইতে শহর পর্য্যন্ত জলনালী (Pipeline) বসানোর পরিকল্পনাও প্রণয়ন করা হয়। তন্মধ্যে অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন পরি-কল্পনাটি নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে এবং তদনুসারে যে জলনালী বসানো হইয়াছে তাহাদ্বারা শিনাই হইতে দুইটি কলোনিতেই ২৪ ঘণ্টায় ৮ লক্ষ গ্যালন জল

সরবরাহ হইতেছে। ৪৫ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া পাইলট স্কিম নামক দ্বিতীয় পরিকল্পনাটিকে কার্য্যকরী করিবার তোড়-জোড় পুরাদমে চলিতেছে। এই প্রচেষ্টা সফল হইলে ২৪ ঘণ্টায় চার-পাঁচ লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহ হইবে।

জল-নিষ্কাশন—নর্দ্দমা কাটিয়া জল-নিষ্কাশনেরও সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। শহরের দূষিত জল নর্দ্দমা দ্বারা বাহিত হইয়া অনেকগুলি ঢাকনা-দেওয়া ছোট ছোট চৌবাচ্চায় গিয়া পড়ে। সেগুলি দিনে দুইবার খালি করা হয়।

বৈদ্যুতিক আলোক-সরবরাহ—মোট ২৮৫ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন-ক্ষমতাবিশিষ্ট তিনটি জেনারেটার সম্বলিত একটি বৈদ্যুতিক শক্তি-গৃহ (power station) আদিপুরে নির্ম্মিত হইয়াছে। বি কোয়ার্টারেও (সর্দ্দারগঞ্জ) ১৭৫ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন-ক্ষমতাবিশিষ্ট জেনারেটার সম্বলিত শক্তিগৃহ স্থাপিত হইয়াছে। ইহা এই

গান্ধীধামের আদিপুর কলোনির একটি দৃশ্য

কলোনিতে বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহ করিয়া থাকে। অবশ্য এই ব্যবস্থা সাময়িক, পরে উভয় কলোনিতে আরও প্রচুর পরিমাণে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে মোট এক হাজার কিলোওয়াট উৎপাদনক্ষম তিনটি জেনারেটারসহ শক্তিগৃহ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা প্রস্তুত আছে।

একটি আবহতত্ত্ব বীক্ষণাগারও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে নিয়মিতভাবে বায়ুপ্রবাহ এবং বৃষ্টিপাতের রেকর্ড রাখা হয়। এই বীক্ষণাগারে সংরক্ষিত তথ্যসমূহ হইতে ভবিষ্যতে শহরে বিমানঘাঁটি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মূল্যবান হদিস পাওয়া যাইবে।

গান্ধীধামে শরণার্থীদের পুনর্ব্বাসন :—

৪০০টি কক্ষসমন্বিত একটি অস্থায়ী আশ্রয়-শিবিরে বিভিন্ন ক্যাম্প এবং শহর হইতে আগত উদ্বাস্তুদের সাময়িকভাবে অবস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। নিজেদের স্থায়ী বাসাবাড়ীতে যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাদিগকে এখানে থাকিতে হইবে। গান্ধীধামের বর্ত্তমান জনসংখ্যা মোট ১২০০০, তন্মধ্যে ৮০০০ হইতেছে বাস্তুহারা।

গান্ধীধামে এক সভায় বক্তৃতারত ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীপ্রতাপ দয়ালদাস

সিন্ধু পুনর্ব্বাসন করপোরেশনের চেষ্টায় গান্ধীধাম বন্দর এবং কচ্ছ সরকারের এলাকাভুক্ত অন্যান্য অঞ্চলে মোট ১৪০৫টি পরিবারের পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা হইয়াছে। জীবিকা অর্জ্জনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সমস্ত উদ্বাস্তু নিযুক্ত আছে তাহাদের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল :

ম্যানুফেকচারিং ডিপার্টমেণ্টে কর্মরত টেকনিকাল ষ্টাফ—(এঞ্জিনীয়ার, ওভারসিয়ার, ফোরম্যান, মিস্ত্রী, প্রভৃতি এই বিভাগের অন্তর্গত)—মোট সংখ্যা ২৫৩ জন ; (ডাক্তার কম্পাউণ্ডার শিক্ষক, কেরাণী, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ইত্যাদি ১৯২ জন ; পিয়ন, চৌকিদার, জমাদার এবং মেথর ১২৫। সরবরাহ,
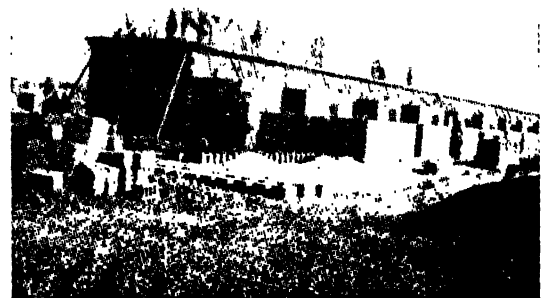
গান্ধীধামে দুইটি কক্ষযুক্ত একটি গৃহের নির্ম্মাণকার্য্য

কৃষি এবং এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে দিন-মজুর ১২৫, কারুজীবী ; অর্থাৎ ছুতার, মিস্ত্রী, তাঁতী, পালিশকারক প্রভৃতি ২২০ ; মাটির কাজ, বৈদ্যুতিক তার লাগানো ইত্যাদির কণ্ট্রাক্টর ২৩ ; কচ্ছ পুলিস বিভাগের কর্ম্মে নিযুক্ত ৯৭ জন ; ব্যবসায়ী,

দোকানদার এবং ফেরিওয়ালা ২২০ জন; গৃহাদি নির্ম্মাণ এবং ফ্যাক্টরী বন্দর ও রেলওয়েতে বিভিন্ন কায়িক শ্রমে নিযুক্ত ৯৫০ জন।

গান্ধীধামে একটি মাতৃমঙ্গল হাসপাতাল

সরকারের চেষ্টায় যে সমস্ত পরিবার গান্ধীধামে পুনর্বাসনের জন্ত প্রেরিত হয় তাহাদের সংখ্যা ৬৭৯। এই সমস্ত পরিবারের মোট লোকসংখ্যা ২০০৮ জন। ১৯৫১ সালের মার্চের শেষাশেষি গান্ধীধামে প্রায় ২৫০০০ জনের বাসস্থান এবং জীবিকার বন্দোবস্ত করা হইবে। এই উদ্বাস্ত-নগরে উক্ত করপোরেশনের প্রতিষ্ঠিত বাসার প্লেট, জর্জ্জ প্লেট প্রভৃতি ফ্যাক্টরীসমূহে গৃহনির্ম্মাণের উপকরণাদি প্রস্তুত হইতেছে। পোল ফ্যাক্টরী, পাইপ ফ্যাক্টরী, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, 'স'-মিল প্রভৃতি লইয়া কারখানার সংখ্যা সবসুদ্ধ নয়টি।
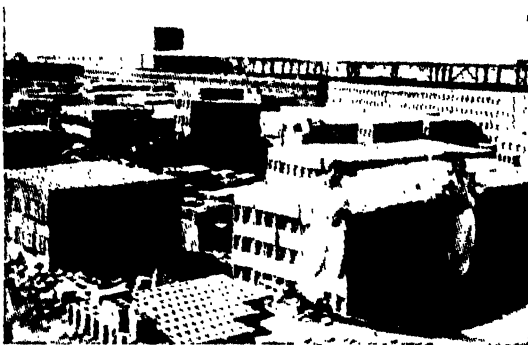
গান্ধীধামের ফ্যাক্টরীসমূহে প্রস্তুত ফাঁপা সিমেন্টের স্তূপ

গান্ধীধাম সমুদ্রোপকূলের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী বলিয়া এখানকার ধূলিসমাচ্ছন্ন প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ বিশেষ ক্ষতিকর। কাজেই এখানকার আবহাওয়াকে অনুকূল করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সনের এপ্রিল মাসে বৃক্ষরোপণের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৫০-এর এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর এই কয় মাসের মধ্যে রাস্তার পাশে চার হাজার গাছ লাগানো হয় এবং বিভিন্ন স্থানে ৬৪০০ ফুট দীর্ঘ বাত্যানিরোধক বেড়া নির্ম্মিত হয়।

গান্ধীধামের বাসিন্দাদের দুগ্ধ এবং সর, মাখন, দধি, ইত্যাদি দুগ্ধজাত দ্রব্যের চাহিদা মিটাইবার জন্ত ১৯৫০-এর অক্টোবরে ২০টি গরু লইয়া একটি গোশালা খোলা হয়।

বর্ত্তমানে দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা বাড়িয়া হইয়াছে ২৮টি এবং পাঁচটি মহিষও রাখা হইয়াছে। রোজ সকালে এবং বিকালে পাঁচটার সময় শহরের বাড়ী বাড়ী নিয়মিত ভাবে দুধ পাঠানো হয়। দুধের সের আট আনা।

পচা সার—আদিপুর এবং সর্দ্দারগঞ্জের সমস্ত আবর্জ্জনা ও বিষ্ঠা সারে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে গর্ত্তে সঞ্চয় করা হয় এবং তাহা শস্যক্ষেত্রের উর্ব্বরতাবৃদ্ধির জন্ত ব্যবহৃত হয়।
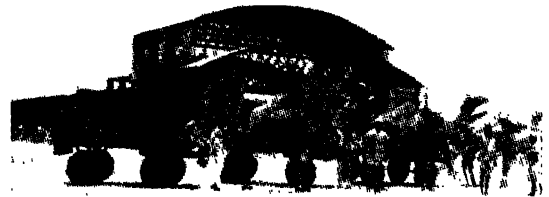
গান্ধীধামের ফ্যাক্টরিসমূহে প্রস্তুত গৃহনির্ম্মাণের উপকরণবাহী উটের গাড়ী

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান—বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে কাজ চলিতেছে।

১। কিণ্ডারগার্টেন স্কুল—ভর্ত্তি হইয়াছে ২৪ জন
২। দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয়—ভর্ত্তি হইয়াছে ২২৯ জন
ভর্ত্তির প্রতীক্ষায়—৫ ,,
৩। মাধ্যমিক স্কুল— ভর্ত্তি হইয়াছে ১০২

এই বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার বর্ত্তমান মাসিক ব্যয় প্রায় ৩,৩০০৲ টাকা। নারী এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদিগকে রাষ্ট্রভাষায় পরীক্ষাদানের উপযুক্ত করিয়া তুলিবার জন্ত হিন্দীর ক্লাসও নিয়মিত ভাবে হইতেছে।

ওভারসিয়ারী প্রভৃতি বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিবার জন্ত একটি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং ফিটারের কাজ, কাঠের কাজ প্রভৃতি শিক্ষাদান নিয়মিত ভাবে সুরু হইবারও আর বেশী দেরি

নাই। বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রেরা যাহাতে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কলপাতি ও টাকা কর্জ্জ পাইতে পারে সে চেষ্টাও চলিতেছে।

আদিপুর কারখানা অঞ্চলে একটি করাতের কল

নারীশালা—উদ্বাস্তু স্ত্রীলোকদিগকে হাতের কাজ এবং হিন্দী ভাষা শিক্ষাদান এই দুই উদ্দেশ্যে 'নারীশালা' খোলা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই ৩০ জন নারী হিন্দী ক্লাসে যোগদান করিয়াছেন।

চিকিৎসালয়—একজন উপাধিপ্রাপ্ত এবং বহুদর্শী চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে একটি উন্নত ধরণের আরোগ্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি মাতৃমঙ্গল বিভাগও আছে। এই চিকিৎসালয়ের রোগীর সংখ্যা গড়পড়তা সপ্তাহে ৯৫০ জন, ইহার মাসিক ব্যয় ১৭৫০৲। উত্তম ব্যবস্থা-যুক্ত একটি রোগবিভা-গবেষণাগারও স্থাপিত হইয়াছে—একজন এম-বি, বি-এস উপাধিধারী চিকিৎসক ইহার তত্ত্বাবধায়ক।

বিবিধ জনকল্যাণমূলক কর্ম্মপ্রচেষ্টা:—সাধারণভাবে কচ্ছ প্রদেশে এবং বিশেষভাবে গান্ধীধামে যে-সকল বাস্তুত্যাগীর পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাদের জীবিকার সংস্থান করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে মৈত্রীমণ্ডল নামে একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উদ্বাস্তুদের বেকার-সমস্যার সমাধান এই সঙ্ঘের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও গান্ধীধামের নাগরিকদের মধ্যে যাহাতে সামাজিক দায়িত্ববোধ জন্মিতে পারে সেইজন্য এই সঙ্ঘ বিবিধ কল্যাণকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। শহরে খেলাধুলার জন্য একটি ক্লাবও গড়িয়া উঠিয়াছে। কলোনির অধিবাসীদের মধ্যে ইহার সভ্য-সংখ্যা প্রচুর। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর চিরন্তন সংস্কারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কলোনিতে দুইটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে সমুদ্রোপকূলস্থ বিস্তীর্ণ পতিত জমিতে উদ্বাস্তু করপোরেশনের কর্ম্মীবৃন্দের অক্লান্ত চেষ্টায় এবং সরকারের আংশিক অর্থানুকূল্যে যুগোপযোগী যাবতীয় ব্যবস্থা-সমন্বিত যে শহর গড়িয়া উঠিতেছে তাহার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। ইহার নিকটবর্ত্তী কাণ্ডলা বন্দরটির যেরূপ উন্নতিসাধন হইতেছে তাহাতে এই অঞ্চলটি যে অদূর ভবিষ্যতে শিল্পে-বাণিজ্যে খদ্ধ হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই—কাজেই গান্ধীধামও যে একদিন ভারতরাষ্ট্রের একটি সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হইবে তাহা সুনিশ্চিত।
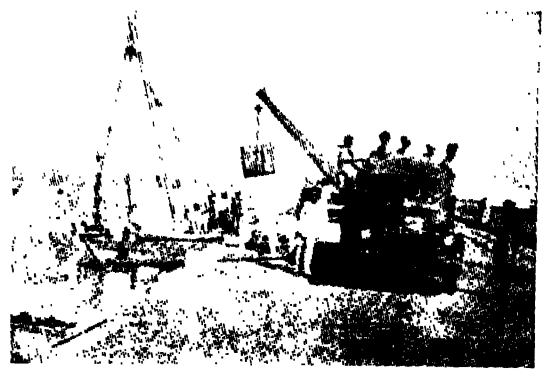
কাণ্ডলা বন্দরের নিকটবর্ত্তী একটি দৃশ্য

গান্ধীধাম একদিকে যেমন সিন্ধুর বাস্তুহারাদের স্থায়ীভাবে আশ্রয় দিয়াছে, অন্য দিকে তাহাদের জীবিকা অর্জ্জনের নূতন নূতন পথও খুলিয়া দিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সমস্যার সমাধানের পক্ষেও গান্ধীধামের প্রতিষ্ঠাতাদের অনুসৃত পন্থা বিশেষভাবে সহায়ক হইতে পারে। ইহাদের জন্য গান্ধীধামের অনুরূপ আদর্শ উদ্বাস্তু-নগরের প্রতিষ্ঠা সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে সরকার, দেশবাসী এবং উদ্বাস্তু-কর্ম্মী সকলেরই গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা উচিত।

আমেরিকার কৃষির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

আমাদের দেশের বহু ব্যক্তি নানা উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশে গিয়াছেন এবং এখনও যাইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা বিভিন্ন দেশের শস্য, গাছপালা ইত্যাদি কি পরিমাণে আমাদের দেশে আনীত এবং প্রচলিত হইয়াছে তাহার কোন সঠিক বিবরণ আছে কিনা জানি না। গত ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে এইরূপ ভাবে আনীত এবং প্রচলিত কোন গাছপালা দেখি নাই বা উহাদের কথা শুনি নাই। তবে 'কচুরীপানার' ইতিহাস জানি। নিজের জীবনে ইহার আবির্ভাব এবং ইহার দ্বারা দেশের ক্ষতি ও অনিষ্টের পরিমাণ দেখিয়াছি, এখনও দেখিতেছি।

লুসার্ণ ঘাস

আমেরিকার কৃষি এবং গাছপালার ইতিহাস বিচিত্র; প্রধানতঃ বেসরকারী ব্যক্তি, পর্য্যটক, বিদেশী, উপনিবেশবাসিগণ প্রভৃতির দ্বারা তথাকার অধিকাংশ গাছপালা প্রথমে আনীত এবং প্রচলিত হইয়াছে। আমেরিকার কৃষির প্রথম অবস্থাকে ভারত ও ইউরোপের কৃষির সংমিশ্রণ বলা যাইতে পারে। গত ৩০০ বৎসরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দানে ও সাহায্যেই আমেরিকা কৃষি এবং বৃক্ষসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াছে। এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে না যে, বর্ত্তমানে তথাকার প্রত্যেক প্রধান শস্যই বিদেশ হইতে আনীত। উপনিবেশবাসিগণ তাঁহাদের বসতি স্থাপনের সময় নিজ নিজ দেশ হইতে নানাবিধ গাছপালা আনিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত জাহাজের নাবিকগণ, ধর্ম্মপ্রচারকগণ, বৈদেশিক বাণিজ্যদূত ও *প্রতিনিধিগণ এবং বৃক্ষ-আবিষ্কারকগণ বহু দেশের বহু* রকমের বীজ, গাছপালা ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আমেরিকায় প্রবর্ত্তন করেন। প্রথমে তথাকার বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন রকমের মাটি, আবহাওয়া এবং লোকের প্রয়োজন অনুসারে উহাদের অতি সাধারণভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। পরীক্ষাকালে কত ভুল-ভ্রান্তি ঘটিয়াছিল। পরে সুচিন্তিত প্রণালীতে পরীক্ষা আরম্ভ করা হয়। ইহার ফলে বহু দেশের বহু রকমের গাছপালা বর্ত্তমানে "আমেরিকাবাসী" হইয়া পড়িয়াছে।

বাস্তবিক আমেরিকায় পৃথিবীর নানাস্থানের গাছপালা এবং শস্যাদির এইরূপ সংমিশ্রণ দ্বারা খুবই সফলতা অর্জ্জিত হইয়াছে। ইহার ফলে বর্ত্তমানে আমেরিকায় ১২৫ নিখর্ব্ব টাকার কৃষিজাত শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকাবাসীদেরই খাদ্য সম্বন্ধে প্রাচুর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং অন্যান্য দেশে খাদ্যসরবরাহ ও বিশেষজ্ঞের উপদেশদান সম্বন্ধে আমেরিকা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমর্থ। এই ভাবেই আমেরিকা অন্যান্য দেশ হইতে আনীত বৃক্ষের প্রতিদান দিতেছে।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই আমেরিকায় নূতন নূতন বৃক্ষের প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে তদানীন্তন ফেডারেল গবর্ণমেণ্ট যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ১,৮৫,০০০ রকমের গাছপালা সংগ্রহ করা হয়। ইহাদের মধ্যে শতকরা ৮০টি বর্ত্তমান সময়ে খুবই পরিচিত। এখনও বহু রকমের গাছ, শস্য ইত্যাদির পরীক্ষা চলিতেছে। বিদেশী শস্যের মধ্যে সয়াবীন, আল্‌ফাল্‌ফা এবং লেস্‌পিডিজা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া হইতে সয়াবীন আসিয়াছিল; বর্ত্তমানে সয়াবীনের যে সকল 'জাতি'র চাষ হইতেছে, ২০ বৎসর পূর্ব্বে কৃষি-বিভাগের দুইজন কর্ম্মচারী উহাদের বীজ প্রথম আনয়ন করেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের দুই বৎসরের অভিযানের জন্য ৫০,০০০ ডলার ব্যয় হইয়াছিল। কিন্তু এই অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে; বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকায় সয়াবীন সম্পর্কীয় যে নূতন কৃষিশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মূল্য এক নিখর্ব্ব ডলারের উপর। কেবলমাত্র এই একটি ফসলের দ্বারাই আমেরিকায় গাছপালা, শস্য প্রভৃতি সম্পর্কীয় বিবিধ পরীক্ষণের যাবতীয় ব্যয় বহু গুণে উশুল হইয়া গিয়াছে। সয়াবীন কেবল যে মানুষ ও পশুদের খাদ্য হিসাবে, মার্গারিন প্রস্তুতে, ময়দায়, কোন দ্রব্য কড়া বা মচ্‌মচে করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় তাহা নহে, ইহা প্ল্যাস্টিক, সাবান, পেণ্ট, রবার প্রভৃতি প্রস্তুতেও প্রয়োজন। আল্‌ফাল্‌ফাও একটি প্রসিদ্ধ শস্য। ইহার আর একটি নাম লুসার্ণ। প্রথমে ইহা

চিলি এবং জার্ম্মানী হইতে আসিয়াছিল; যদিও ইহার প্রথম প্রবর্ত্তনের পর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ইহার চাষ এক কোটি কুড়ি লক্ষ একর জমিতে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু এক প্রকার রোগের দ্বারা ইহার খুবই ক্ষতি হইত। কৃষি-বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ রোগপ্রতিরোধকারী শ্রেণীর অনুসন্ধানে পশ্চিম চীন, উত্তর-ভারত, উত্তর-পূর্ব্ব ইরাণ, তুর্কীস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে গমন করিলেন। এই সকল অঞ্চলে বহু কাল হইতে বহু প্রকারের আল্‌ফাল্‌ফার চাষ হইতেছিল। তাঁহারা অনেক রকমের আল্‌ফাল্‌ফার

বহু বৎসরের পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে বর্ত্তমানে সুপরিচিত 'রেঞ্জার' নামক আল্‌ফাল্‌ফা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা অশ্ব-গবাদির একটি উত্তম খাদ্য। ইহা শীত ও রোগ প্রতিরোধ করিতে পারে। ১৯৩০ সালের মাঝামাঝি উত্তর তুরস্ক হইতে আর একরকমের নূতন শ্রেণী আমদানী করা হইয়াছিল। ইহার একটি গাছ জমিতে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়িয়া ছড়াইয়া পড়ে; মাটির নীচেয় হইতে নূতন নূতন গাছ জন্মে। এই শ্রেণীর গাছও উত্তম পশু খাদ্য।

দক্ষিণ মিসিসিপি উপত্যকাবাসী কৃষকদিগের নিকট লেস্‌পিডিজা অতি প্রয়োজনীয় শস্য। ইহাও বিভিন্ন প্রকারের। ইহা এক বৎসরের ফসল। সাধারণ লেস্‌পিডিজা এবং কোরিয়ান লেস্‌পিডিজা মাটির উৎকর্ষসাধনে অতুলনীয়। ইহাদের প্রবর্ত্তনের ফলে দুই কোটি একর জমির চাষের ব্যাপারে যুগান্তর ঘটিয়াছে; উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কোরিয়ান লেস্‌পিডিজার প্রবর্ত্তনের ৩০ বৎসর পরে, ইহার দ্বারা দক্ষিণ মিসিসিপি উপত্যকাবাসী কৃষকগণের বার্ষিক আয় ১২০ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

আজ পর্য্যন্ত কেহই জানে না ঠিক কি ভাবে "সাধারণ লেস্‌পিডিজা" এশিয়া হইতে আমেরিকায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অনুমান হয়, ইহা এক শত বৎসরের পূর্ব্বে আমেরিকায় প্রথম গিয়াছিল। কোরিয়ান লেস্‌পিডিজার প্রবর্ত্তন খুবই আশ্চর্য্য-জনক। কোরিয়া হইতে অর্দ্ধ আউন্স বীজ আনয়ন করিয়া

ক্লোভার ঘাস

ইহার প্রাথমিক পরীক্ষা আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে ইহার চাষ চার কোটি একর জমিতে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে।

সকল শস্যই এশিয়া হইতে যায় নাই। 'ল্যাডিনো ক্লোভার' ইটালী হইতে এবং "ষ্ট্রবেরী" ফ্রান্স হইতে গিয়াছিল। ওয়াশিংটন কমলালেবুর আদি নিবাস ব্রেজিল। নানা প্রকারের জইয়ের উৎপত্তি-স্থান অষ্ট্রেলিয়া।

তিন শত বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্বে ইউরোপ হইতে যখন মানুষ আমেরিকায় বাস করিতে আসে তখন হইতেই নানা গাছপালার প্রবর্ত্তন হয়। নিজেদের ও পশুদের খাদ্যের

জন্য তাহারা নানা রকমের শস্যের চাষ করিয়াছিল। ইহার মধ্যে তাহাদের প্রধান শস্য ছিল ভুট্টা (Indian corn)। ইহা ছাড়া তাহাদের দেশের গম, রাই, যব, জই প্রভৃতিও ছিল। ভারতবাসীর নিকট হইতে তাহারা কেবল ভুট্টা পায় নাই; মিষ্টি আলু, টোম্যাটো, লাউ-কুমড়া জাতীয় শস্য, তরমুজ, সীম, মটর, আঙুর, জাম, চীনাবাদাম, তামাক, তুলা প্রভৃতির জন্যও তাহারা ভারতীয়দের নিকট ঋণী। গম প্রধান শস্যরূপেই পরিগণিত হইয়াছিল। তাহার পর ছিল রাই ও যবের স্থান। ভারতীয় কৃষি-প্রণালী অনুসারে ভুট্টার চাষ হইত। প্রধানতঃ শূকর এবং অশ্বাদি পশুর খাদ্যের জন্যই ভুট্টা ব্যবহৃত হইত।

উপনিবেশবাসিগণ নানাবিধ ফলেরও আমদানী করিয়াছিলেন। স্থানীয় বনজঙ্গল হইতেও বিবিধ ফলের গাছ সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা তাহাদের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। প্রথম অবস্থায় বীজ হইতেই ফলের চারা উৎপাদন করা হইত। পরে 'কলম' প্রস্তুত আরম্ভ হয়, এই উদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রথম ব্যবসায় হিসাবে যে সকল নার্শারি স্থাপিত হয় তাহাদের মধ্যে উইলিয়ম প্রিন্স কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "লিনিয়ান্ বোটানিক্ গার্ডেন" অন্যতম। ১৭৭১ সালে তিনি ২৪টি আপেল, ৯টি এপ্রিকট, ১৮টি চেরী, ১২টি নেকটারিন, ২৯টি পীচ্, ৪২টি পিয়ার এবং ৩৩টি কুলজাতীয় ফলের "কলম" বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে তিনটি আপেলের কলম "আমেরিকাবাসী" ছিল। অন্যান্য ফলের উৎপত্তিস্থান—ইউরোপ।

বর্ত্তমানের প্রধান সব্জী সাদা আলু দক্ষিণ আমেরিকা হইতে আসিয়াছিল। প্রথমতঃ ইহা নিজেদের ব্যবহারের জন্য উৎপাদিত হইত; ১৮০০ সালের পর বিক্রয়ের জন্য ইহার চাষ আরম্ভ হইয়াছিল। অন্যান্য সব্জীর প্রবর্ত্তন এবং চাষের ইতিহাসও এইরূপ। অর্থাৎ, প্রথমতঃ নিজেদের খাদ্যের জন্য ইহাদের চাষ হইত। যানবাহনের অসুবিধা, বিক্রয়ের সুযোগের অভাব এবং শাকসব্জীর পচনশীলতা প্রভৃতিই অধিক পরিমাণে চাষের অন্তরায় ছিল।

প্রথম অবস্থায় শোভাবর্দ্ধনকারী গাছপালার প্রতি কাহারও বিশেষ আগ্রহ ছিল না। ইহা ছাড়া কৃষিক্ষেত্রে, সব্জী-বাগানে, অরণ্যে সারাদিন পরিশ্রমের পর গাছপালার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির প্রতি মনোযোগ দিবার অবসরও ছিল না। রবিবার বিশ্রামের দিন বলিয়াই গণ্য হইত। সচ্ছল অবস্থার জন্য যাঁহাদের অল্প অবসর ছিল তাঁহারা ফুলের বাগান তৈরি করায় কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিয়াছিলেন। ইহার ফলে ফুলের বাগানের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল।

বিদ্রোহের পর যখন সামাজিক এবং বাণিজ্যিক জীবনের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল এবং যাযাবর জীবন স্থায়ী জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন হইতেই ব্যবসায় হিসাবে কৃষির সূচনা। ভদ্রশ্রেণীর কৃষকের (gentlemen farmers) আবির্ভাব এই সময়েই দেখা দেয়। ওয়াশিংটন ও জেফারসনকে এই বিষয়ে অগ্রণী বলা যায়। প্রায় সকল প্রকার শস্যের বিভিন্ন শ্রেণীর পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার দিকে সাধারণের আগ্রহ তাঁহাদের চেষ্টাতেই বর্দ্ধিত হয়। অচিরে কৃষির উন্নতির প্রতি অনেকেরই মনোযোগ আকর্ষিত হইয়াছিল।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে নিউ ইয়র্কের কৃষি, কলা এবং শিল্পী-সম্প্রদায়ের উন্নতিমূলক প্রতিষ্ঠান (Society for the Promotion of Agriculture, Art and Manufaturers) তথাকার ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করেন যে, স্থানীয় বন্দর হইতে যে সকল জাহাজ যাইবে তাহাদের নায়কগণকে যেন বিভিন্ন দেশের অধিবাসিদের প্রধান প্রধান খাদ্যশস্যের এক কোয়ার্ট বীজ সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়। যদিও গম, যব, রাই, জই, ভুট্টা প্রভৃতি শস্য সেই সময়ে আমেরিকায় উৎপাদিত হইতেছিল, তথাপি বিভিন্ন স্থানে উৎপাদিত এই সকল শস্যের বীজ সংগ্রহের জন্যও অনুরোধ করা হইয়াছিল। কারণ বিভিন্ন স্থানের সংগৃহীত এই সকল শস্যের বীজ পরীক্ষার ফলে উৎকৃষ্টতর শ্রেণীর শস্য উদ্ভাবিত হইতে পারে এবং ইহার দ্বারা সুফলও পাওয়া গিয়াছিল। আকস্মিক ভাবে সংগৃহীত সাদা আঁশযুক্ত গমের প্রবর্ত্তন এইরূপ ভাবেই ঘটিয়াছে। এই শ্রেণীর গম পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে।

কৃষির উন্নতিসাধনে সরকারী প্রচেষ্টা প্রথমে তত প্রবল ছিল না; সাধারণতঃ ইহা ব্যক্তিগত সমস্যা হিসাবে গণ্য হইত। ব্যক্তিগত কৃষিক্ষেত্র যখন সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং অধিকতর পরিমাণে উৎকৃষ্টতর শস্যাদির চাহিদা বাড়িতে লাগিল তখনই কৃষির উন্নতির প্রতি সরকারী কর্ম্মচারীগণের মনোযোগ আকর্ষিত হইল। ইহার প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট জন কুইনসি এডাম্‌স তাঁহার বৈদেশিক প্রতিনিধিগণকে এইরূপ নির্দ্দেশ দেন যে, তাঁহারা যেন দুষ্প্রাপ্য গাছের চারা এবং বীজ সংগ্রহ করিয়া ওয়াশিংটনে পাঠান। ইহার পর ১৮৩৯ সালে কংগ্রেস কৃষির উন্নতিসাধনের জন্য প্রথম অর্থ মঞ্জুর করেন। 'পেটেন্ট আপিসকে' বীজ সংগ্রহ ও বিতরণের জন্য এবং নানাবিধ তথ্যসংগ্রহের জন্য ১০০০ ডলার দেওয়া হয়। এইরূপ সামান্য প্রচেষ্টা হইতে ১৮৬২ সালে কৃষি সম্পর্কীয় কার্য্যকলাপ এবং সমস্যা এত অধিক বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, সেই বৎসর সরকারী কৃষিবিভাগ পৃথক্ ভাবে স্থাপিত হয়। নূতন নূতন গাছপালা এবং শস্যাদির প্রবর্ত্তনের জন্য সাধারণের আগ্রহ ও চাহিদা ক্রমশঃ প্রবলতর হইতে লাগিল। ১৮৯৮ সালে কৃষিবিভাগ পৃথক্ একটি শাখা খুলিলেন। উহার নাম হইল "Foreign Seed and Plant Introduction Office"। এই প্রতিষ্ঠান এখনও পরিচালিত হইতেছে, যদিও

ইহার নাম এবং কার্য্যপরিচালনার কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

বিংশ শতাব্দীতে কৃষির যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহার ফলে বহু নূতন নূতন সমস্যা এবং নূতন নূতন গাছপালার চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়াছে। কেবল যে নূতন নূতন গাছের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা বাড়িয়াছে তাহা নহে, বর্ত্তমানে যে সকল গাছপালা, শস্যাদির চাষ হইতেছে বনে জঙ্গলে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে প্রজননসম্বন্ধীয় (genetic) যে সকল 'জাতি' আছে, সেই সকল জাতের গাছপালার প্রয়োজন হইয়াছে। ইহাদের প্রবর্ত্তনের ফলে ব্যাধি, কীট-পতঙ্গের আক্রমণ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে উদ্ভূত বহু সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে। বর্ত্তমানে কৃষির উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে যে কত দিক হইতে গবেষণা চলিতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কৃষিসম্পর্কীয় সকল বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করা হইতেছে।

১৯৪৮ সালে "Division of Plant Exploration and Introduction" নামক প্রতিষ্ঠানকে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয়। এই অর্থের সাহায্যে "জাতীয় সমবায় পরিকল্পনা" প্রস্তুত হয়। উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে গাছপালা সংগ্রহ, প্রবর্ত্তন, পরীক্ষা, উহাদের মূল্য ও সংখ্যা নির্ণয়, রক্ষণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই পরিকল্পনার সূত্রপাত হইতে নূতন নূতন গাছপালা সংগ্রহের জন্য পাঁচটি অভিযান আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল, গোয়াটিমালা, ভারতবর্ষ, মেক্সিকো, তুরস্ক এবং উরুগুয়েতে পাঠানো হইয়াছে। ইহার ফলে ১২০০০ রকমের নূতন গাছপালা সংগৃহীত হইয়াছে এবং উহাদের মধ্যে বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন অবস্থায় ২০০০ রকমের গাছপালা লইয়া পরীক্ষা চলিতেছে।

বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহারের উপযোগী নানাবিধ গাছপালা লইয়া গবেষণা ও পরীক্ষা চলিতেছে। পেন্‌সিল্‌ভেনিয়াতে 'পাইরেথ্রমের" চাষ সফল হইতে পারে, কিন্তু জমির মূল্য, শ্রমিকের পারিশ্রমিকের হার প্রভৃতি এত অধিক যে, জাপান এবং আফ্রিকার কেনিয়া কলোনীতে পরীক্ষণের খরচের সহিত প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হইবে না। কোন কোন আঁশযুক্ত শস্যও সফলতার সহিত চাষ করা যাইতে পারে; শ্রমিকের সাহায্যে আঁশ ছাড়াইবার খরচ ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান অপেক্ষা অধিক হইবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষি-কার্য্যের উপযোগী পশুদিগের উৎকর্ষসাধনে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবই প্রধান অন্তরায় ছিল। যাহা হউক, টিমোথি, রাই গ্রাস, ক্লোভার প্রভৃতির প্রচলনের দ্বারা এই অভাব দূরীভূত হইয়াছে।

আমার এক জন ইংরেজ বন্ধু বহু দিন যাবৎ কলিকাতায় ছিলেন। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী মধ্যমগ্রামে প্রায় এক শত বিঘা জমিতে তাঁহার ঘর, বাড়ী কৃষিক্ষেত্র ছিল। পরে তিনি বাঙ্গালোরে ইহা অপেক্ষা বৃহৎ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করেন। তিনি সাংবাদিকও ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিবার জন্য অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়াছেন। সেখানেও তিনি কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে যাইবার সময় নানাবিধ গাছপালা, বীজ লইয়া গিয়াছেন। ইহার ফলে তাঁহার দ্বারাই হয় ত অষ্ট্রেলিয়ায় নূতন নূতন গাছপালা প্রবর্ত্তিত হইবে। আমরা কৃষিপ্রধান দেশের অধিবাসী বলিয়া গর্ব্ব করি। কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জনের কৃষির প্রতি এইরূপ অনুরাগ ও আগ্রহ আছে? অনেকেই ত পৃথিবীর নানাস্থান পর্য্যটন করিয়াছেন, নানাস্থানের বিবিধ গাছপালা দেখিয়াছেন; কিন্তু কয়জন স্বদেশে প্রবর্ত্তনের জন্য তথাকার গাছপালা, বীজ সঙ্গে আনিয়াছেন?

উচ্চতর কৃষিশিক্ষার জন্য সরকারী ব্যয়ে বহু যুবক ও কর্ম্মচারীকে বিদেশে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। ইঁহাদের মধ্যে লেখকের উক্ত ইংরেজ বন্ধুর ন্যায় কয় জন প্রত্যাবর্ত্তনের সময় গাছপালা, বীজ ইত্যাদি সঙ্গে আনিয়াছেন জানিতে কৌতূহল হয়।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আমাদের এই ঔদাসীন্যের জন্যই কৃষি শিক্ষার নিমিত্ত বিদেশে ছাত্রপ্রেরণ অনাবশ্যক মনে করিতেন; এবং ইহার জন্য যে অর্থব্যয় হইয়াছে বা হইত তাহাকে "ন দেবায় ন ধর্ম্মায়" বলিতেন।

দেশ এখন স্বাধীন। সুতরাং কৃষির উন্নতিসাধনে এত দিনের জীর্ণ পরিকল্পনাসমূহ পরিত্যাগ করিয়া দেশের উপযোগী নূতন নূতন পরিকল্পনা গ্রহণে আর কোন অন্তরায় নাই। আমেরিকার অনুকরণে আমরা আমাদের দেশের উপযোগী অনেক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারি।*

* *Farmers' Digest*-এ প্রকাশিত "The World is a Nursery" নামক প্রবন্ধ হইতে তথ্যাদি গৃহীত।

রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন

শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য্য, কাব্যতীর্থ

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত মজিলপুর নামক গ্রামে কাশ্যপ গোত্রীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণের গৃহে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রপিতামহ রঘুরাম ন্যায়রত্ন হাওড়া জেলার প্রতাপপুর গ্রাম হইতে আসিয়া মজিলপুরে বসবাস আরম্ভ করেন। তখন উক্ত গ্রাম নিবিড় জঙ্গলে আবৃত ছিল এবং গঙ্গা ক্ষীণধারায় প্রবহমানা ছিলেন। রামনারায়ণের পিতামহ রূপরাম তর্কবাগীশ ও পিতা কৃষ্ণরাম বিদ্যাবাগীশ। কৃষ্ণরামের জীবনবৃত্তান্ত সবিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে ইহা অবিসম্বাদিত যে, তিনি দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত পাটদহ নামক স্থানের জমিদার কেশব রায়চৌধুরীর গৃহে সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রায় শত বৎসর জীবিত ছিলেন।

রামনারায়ণ কৈশোরে নব্যন্যায় শিক্ষা করিবার প্রয়াসে নবদ্বীপে গমন করেন ও তৎকালীন বাংলার শিক্ষাকেন্দ্র নবদ্বীপ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নব্যন্যায়, নব্যস্মৃতি ও ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎকালীন নবদ্বীপের টোলের ছাত্র-বিবরণীতে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। নবদ্বীপে পাঠকালে তিনি বীরস্বামীকৃত শ্রুতাধ্যায় ব্যাখ্যার একটি পুঁথি নকল করেন। তাহার উপসংহারে তিনি লিখিতেছেন, "গঙ্গাসমীপশ্রবণৈকবর্ম্মণা * * ব্যালেখি পুস্তক পঠনেককর্ম্মণা শ্রীরামনারায়ণ দেবশর্ম্মণা। শক ১৬৩৫। * * নত্বা রামনারায়ণ: শিবং নবদ্বীপে পঠন্ন্যায়ং লিলেখি * *।" সাহিত্যদর্পণ নামক অলংকার গ্রন্থের একটি পুথি তিনি ঐ সময়ে লিখিয়াছিলেন "নবদ্বীপ মধ্যেঽসৌ গ্রন্থো বিলিখিত ময়া।" উক্ত নিদর্শনসমূহ হইতে স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে, রামনারায়ণ নবদ্বীপে শিক্ষালাভ করিয়া নব্যন্যায়ে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি নবদ্বীপ শিক্ষাকেন্দ্র হইতেই 'তর্কপঞ্চানন' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া তৎকালীন বঙ্গদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক রূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক মহামহোপাধ্যায় ডা: সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁহার *History of Indian Logic* নামক অনুপম গ্রন্থে এই সত্যটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।*

প্রবাদ আছে তাঁহার নবদ্বীপ পাঠাভ্যাসকালে পাটদহে কেশব রায়চৌধুরীর গৃহে কোনও এক দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়া ভাগবতের কূট বিচারে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত আহ্বান করেন। রামনারায়ণের পিতা কৃষ্ণরাম তখন সভাপণ্ডিত। কেশব রায়চৌধুরীর উৎসাহে ও বিশেষ অনুরোধে এবং নিজে বার্দ্ধক্যবশত: অসমর্থ হওয়ায় কৃতী পুত্র রামনারায়ণকে নবদ্বীপ হইতে আনিবার উদ্যোগ করেন। রামনারায়ণ নবদ্বীপ হইতে ১৬ বাহকের তাঞ্জামে করিয়া পাটদহে আসিয়া উপস্থিত হন। পূর্ব্বে সমস্ত ঘটনা জানিয়া, আসিবার সময় পথিমধ্যে ভাগবতের শ্লোকসমূহের দ্ব্যর্থমূলক ব্যাখ্যা রচনা করিয়া লইয়া আসেন ও তাহার সাহায্যে উক্ত পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত করেন। তখন তাঁহার বয়স ১৭।১৮ বৎসর, এই অল্প বয়সে উক্ত পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া দক্ষিণ অঞ্চলে বিরাট-বরণে একাধিপত্য, ভট্টাচার্য্য উপাধি ও বহু বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। আজ তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে ভাগবতের উক্ত দ্ব্যর্থমূলক রচনা 'কূলভাগবত' নামে পরিচিত। কিন্তু দু:খের বিষয় পুথিখানি আজও পাওয়া যায় নাই।

পাঠান্তে রামনারায়ণ স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শাস্ত্রালোচনার জন্য একটি টোল স্থাপন করেন। সেই সময়ে উক্ত মজিলপুর গ্রামে প্রায় ২৪.২৫টি টোল ছিল ও তত্রস্থ পণ্ডিতগণের অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানের প্রভাবে উহা 'দ্বিতীয় নবদ্বীপ' রূপে পরিচিত ছিল। রামনারায়ণের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে (১৮১৫ খ্রী: অ:) একটি মন্দিরগাত্রে খোদিত লিপি হইতে উক্ত গ্রামের তৎকালীন সাংস্কৃতিক অবস্থার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। লিপিটির কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল: "দ্বিজৈশ্ছাত্রৈর্দেবগৃহৈর্মজুলপুর..." ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রাভ্যাসরত ছাত্রসমূহে ও দেবালয়ের প্রাচুর্য্যে গ্রামটি ছিল ভরপুর। এখনও কয়েকটি ভগ্ন মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায়। রামনারায়ণের সমসাময়িক উক্ত গ্রামের কয়েকজন পণ্ডিতের নাম নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:

১। রাজারাম বাচস্পতি

২। রামেশ্বর ন্যায়বাগীশ (১৭২০ খ্রী: অ:)

৩। রামকৃষ্ণ ন্যায়বাগীশ

৪। অযোধ্যারাম তর্কবাগীশ

৫। মথুরেশ ন্যায়ালঙ্কার

রামনারায়ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি—'কারিকাবলি' নামক একখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ব্যাকরণ। এই অমূল্য গ্রন্থখানির প্রতি ছত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। পুস্তকটি
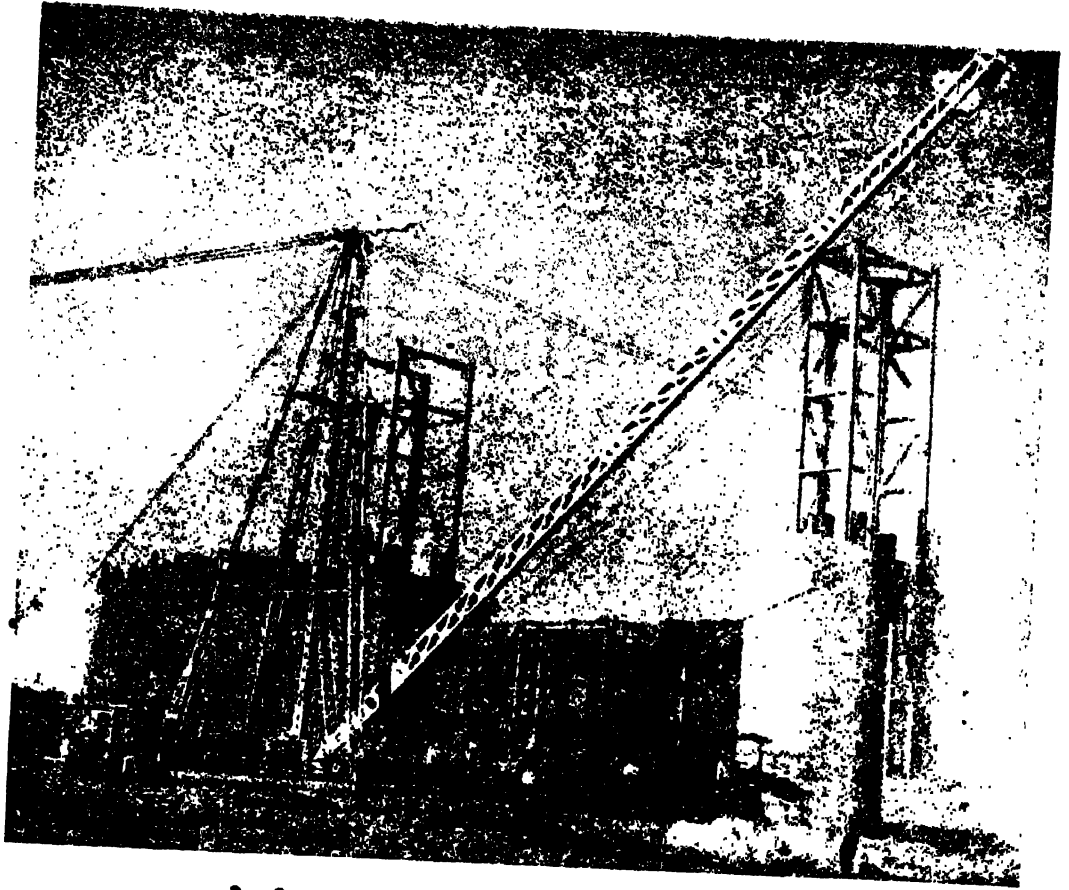
---

* "The Nadia University has produced numerous logicians of eminence since the time of Raghunath Siromoni. During recent times the following were the senior logicians of Bengal:

(1) Hariram Siddhantaratna (1730 A.D.)
(2) Ram Narayan Tarkapanchanan (1760) A.D.)
(3) Buno Ramnath (1770 A.D.)
(4) Krishnakanta Vidyavagis (1780 A.D.)
(5) Sankar Tarkavagis (1780 A.D.)

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা। তিলপাড়া বাঁধ ; জলধারক লৌহদ্বারের নির্ম্মাণকার্য্য

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা। মশানজোড় , প্রধান বাঁধের স্থান

তিলপাড়া সেচবাঁধের সম্মুখদৃশ্য

তিলপাড়া সেচবাঁধের খালের জলপ্রবেশ-মুখ
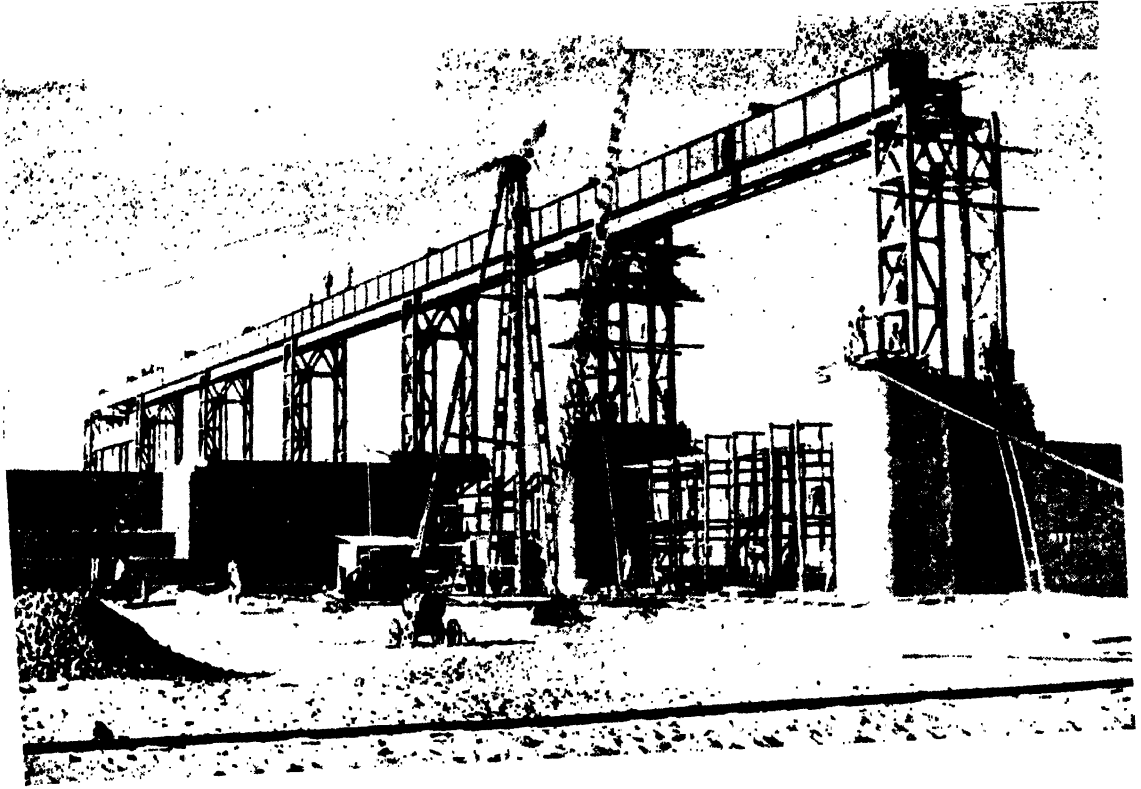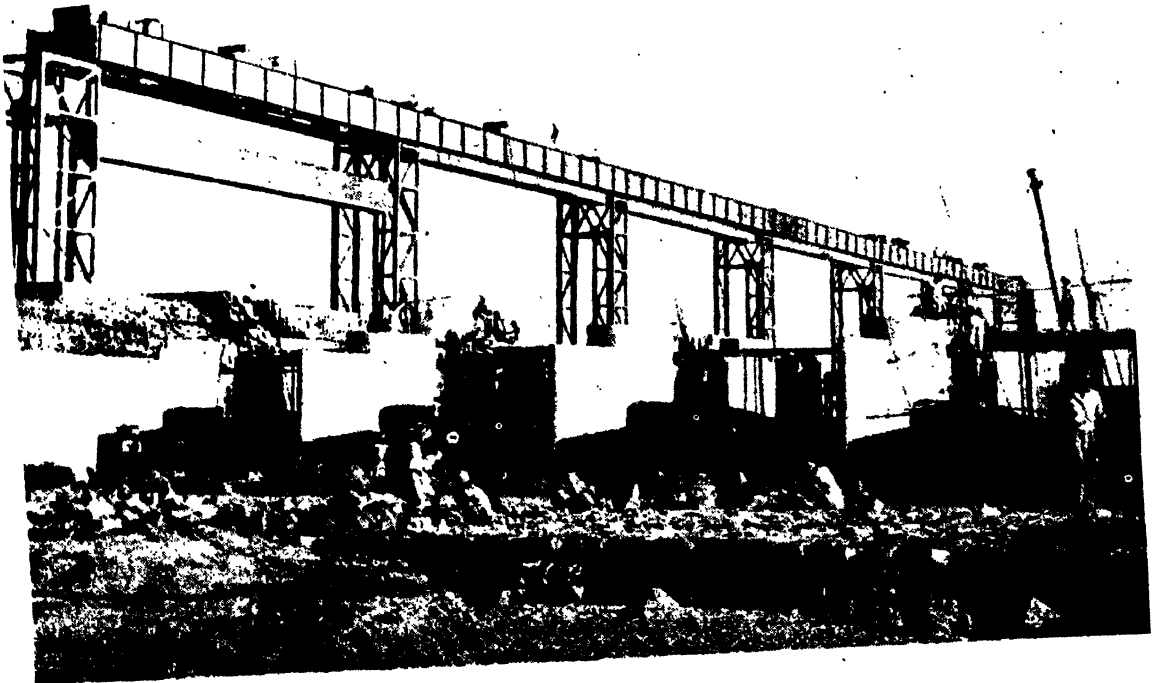
[চিত্রগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সৌজন্যে

প্রচারিত হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণসমূহের মধ্যে অত্যুচ্চ আসন লাভ করিবে সন্দেহ নাই। উহার মৌলিকতা এই যে, সুললিত সংস্কৃত ছন্দে ব্যাকরণের যাবতীয় বিষয়গুলি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট আছে। শুনা যায়, সেই সময়ে তিনি উক্ত ব্যাকরণের জন্য স্বদেশে ও বিদেশে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। উক্ত পুথিটি মজিলপুরনিবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমুদকুমার ভট্টাচার্য্যের নিকট দেখিয়াছি। এখানে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি: প্রাচীন পুথি আকারে ৬৪ পাতায় সম্পূর্ণ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৬।৭ পংক্তি। লিপি অস্পষ্ট ও মাঝে মাঝে বিলুপ্ত। প্রারম্ভে লেখক ইষ্টপ্রণামাদি করিয়া যথার্থ বিষয়ের অবতারণা করিতেছেন—

> "সিদ্ধিদং পুরুষার্থানাং জ্ঞানবিজ্ঞানসাধনং
> নারায়ণং নমস্কৃত্য ক্রিয়তে কারিকাবলিঃ॥
> পূর্ব্বতন্ত্রাণি সংলোচ্য প্রয়োগানুপলভ্য চ।
> স্পষ্টসংক্ষেপসারোক্ত্যা পদ্যেনেয়ং মযোচ্যতে॥"

উপসংহারে লেখক নিজ পরিচয় দিয়াছেন—

> "অজনিধরণি মধ্যে বিশ্ববিভ্রান্তকীর্ত্তিঃ
> কবিকুলতিলকঃ শ্রীকৃষ্ণরামোহস্য সূনোঃ

ইহবিরতিমগচ্ছৎ উদিত প্রত্যয়ানাং পরিশেষ ইতি কৃতঃ শ্রীরামনারায়ণস্য।"

রামনারায়ণের চার পুত্র ও এক কন্যা ছিল। প্রথম বাসুদেব সার্ব্বভৌম, দ্বিতীয় রামপ্রসাদ বিদ্যালংকার, তৃতীয় অযোধ্যারাম বিদ্যাবাগীশ ও কনিষ্ঠ রামরাম তর্কালংকার। দ্বিতীয় পুত্র রামপ্রসাদ পিতার ন্যায় কৃতী ছিলেন। তিনি উক্ত 'কারিকাবলি' ব্যাকরণের একটি টীকা রচনা করেন। প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন:

> "প্রণম্য জানকীকান্তং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং
> ব্যাখ্যাস্তে শব্দকূটার্থানি পিত্রোক্তান্ কারিকাবলেঃ।"

ঐ টীকাটি সম্পূর্ণ পুথি আকারে পাওয়া গিয়াছে। লিপি অত্যন্ত অস্পষ্ট। রামপ্রসাদ পিত্রোক্ত 'পূর্ব্বতন্ত্রাণি' শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন "পূর্ব্বেষাং পাণিন্যমরসিংহসর্ব্ববর্ম্ম-প্রভৃতীনাং তন্ত্রাণি ব্যাকরণানি সম্যগালোচ্য" ইত্যাদি। অর্থাৎ রামনারায়ণ পাণিনি, অমরসিংহ ও সর্ববর্ম্ম প্রভৃতি বৈয়াকরণদিগের গ্রন্থসমূহ আলোচনা করিয়া 'কারিকাবলি' ব্যাকরণ রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। রামপ্রসাদ কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পরামর্শক্রমে অযোধ্যাধামে গিয়া শ্রীশ্রীলক্ষ্মণ জীউর একটি বিগ্রহ আনয়ন করেন। উক্ত বিগ্রহ আজও তাঁহার বংশধরগণের বাস্তভিটায় বর্ত্তমান আছেন।

রামনারায়ণের আর একটি কীর্ত্তি—সাগরযোগ মহাকাব্য। অতি জীর্ণাবস্থায় পুথিটি অদ্যাপি বর্ত্তমান। সপ্তসর্গাত্মক মহাকাব্যটি কবিপ্রতিভার অপূর্ব্ব নিদর্শন। প্রথম সর্গে ভূপতিবর্ণন তাঁহার কাব্যসাধনার পূর্ণতম অভিব্যক্তি। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সর্গে যথাক্রমে প্রভাতবর্ণন, বিরহবর্ণন, বসন্তবর্ণন, মৃগয়াবর্ণন ও বৈরাগ্যোৎপত্তিবর্ণন। কবিত্ব-শক্তির দিক হইতে কালিদাসোত্তর যুগের যে-কোন কবির সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে। অনুপ্রাস, উপমা ও উৎপ্রেক্ষা কবির প্রিয়তম অলংকার। চতুর্থ সর্গটি কবি যেন বিভিন্ন প্রকার অলংকার প্রদর্শন করিবার জন্যই রচনা করিয়াছেন। সেইজন্য উহার নামকরণ করিয়াছেন "অলঙ্কার-নিদর্শনে বসন্তবর্ণনং নাম চতুর্থসর্গঃ"। মাঝে মাঝে অনাবৃত্তি, যমক, একাক্ষরাপাদ প্রভৃতি যোজনা করিয়া শব্দবন্ধনের প্রহরণচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন।

ষষ্ঠ ও সপ্তম সর্গে কবি আর এক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছেন। উহার প্রতিটি শ্লোক বিভিন্নপ্রকার ছন্দে গ্রথিত। তন্মধ্যে কয়েকটি অখ্যাত বিচিত্রপ্রকার ছন্দের উল্লেখ করিতেছি—মহালক্ষ্মী, সুসমা, অমৃতগতি, মণিমালা, চণ্ডী, চন্দ্রিকা, কণিকা নান্দীমুখী, বনকোকিলক ইত্যাদি।

রামনারায়ণ গঙ্গাষ্টকং নামে একটি গঙ্গাস্তোত্র ও তাহার টীকা প্রণয়ন করেন। অলংকার-বৈচিত্র্যে ও অর্থের গভীরতায় শ্লোক কয়টি অনুপম সৌন্দর্য্যে ভূষিত।

রামনারায়ণের এক ছাত্রের নাম পাওয়া যায়—রামগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী। তাঁহার সহিত রামনারায়ণ কন্যার বিবাহ দেন। তাঁহার বংশধরগণ আজও মজিলপুর গ্রামে বর্ত্তমান আছেন।

নৈয়ায়িকপ্রবর রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী একাধারে দার্শনিক, কবি, বৈয়াকরণ ও স্মার্ত্ত রূপে প্রায় সার্দ্ধ-দুই শত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া তৎকালীন বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন ও নব্যন্যায়ের বিবর্ত্তনে অন্যতম হেতুরূপে নিজ কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

তিব্বতের শিক্ষাব্যবস্থা ও ছোটদের আমোদ-প্রমোদ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

তিব্বতে শিশুদিগের হাতে খড়ি সুরু হয় পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সে। বর্ণমালা শিখিবার পর বানান শিক্ষার পালা। দ্বিতীয় ধাপে আরম্ভ হয় কঠিন বানান শিক্ষা।

বর্ণমালা শিখিবার পর হইতেই সুরু হয় হাতের লেখার পালা। প্রথমে শিখান হয় বড় বড় হরফে বর্ণমালা লেখা।

তিব্বতের সাধারণ স্কুল

ক্রমশঃ ছোট ছোট অক্ষর লিখিতে শিখান হয়, লেখা আরম্ভ হয় কাঠের শ্লেটে বাঁশের কলমের সাহায্যে। হাত পাকিলে লিখিতে দেওয়া হয় কাগজে। কোন কোন স্কুলে দুই-তিন বৎসর কেবলমাত্র লিখিতেই শিখান হয়। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হাতের লেখাই চলিতেছে। তিব্বতে হাতের লেখার উপরই নজর দেওয়া হয় বেশী। মুক্তার মত ঝকঝকে ও সুন্দর গড়নের অক্ষরগুলি না হওয়া পর্য্যন্ত হাতের লেখার পালা চলে। লেখার ফাঁকে ফাঁকে চলে অঙ্ক শিক্ষা ও পড়া। মুখস্থ করাই পড়ার প্রথম ও প্রধান ধাপ। সাত-আট বৎসরের তিব্বতী বালকবালিকা অর্থ না বুঝিয়াই বড় বড় স্তোত্র, মহাজনবাণী ও বিখ্যাত গ্রন্থের অংশবিশেষ অনায়াসে মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বাংলার পল্লীর পাঠশালাতেও হাতের লেখা সুরু হইত কলাপাতায় বড় বড় হরফে। তার পর লেখা শিখান হইত তালপাতায় ও শ্লেটে, এবং সকলের শেষে কাগজে লিখিতে দেওয়া হইত। তখন কলম ছিল হয় খাগের নয় হাঁস বা ময়ূরের পালকের। নিবের কলম পাওয়া যাইত অনেক বড় হইলে। তখনকার পাঠশালায় মুখস্থের পালাও ছিল। তিব্বতের মত উচ্চরবে সমস্বরে পড়াও ছিল। বিশেষ করিয়া নামতা পড়া ত ছিল কোরাস্ গানের তালিমের মত। তিব্বতী ছেলেমেয়েদের মুখস্থ করিবার শক্তি অসাধারণ।

অঙ্কশাস্ত্রে তিব্বতী বালকবালিকা বড় কাঁচা। হিমালয় পাহাড়ের বেশীর ভাগ স্থানেই পাহাড়ীগণ অঙ্কে ওস্তাদ হইতে পারে না দেখিয়াছি।

ছেলেকে না মারিয়া লেখাপড়া শিখান যায় ইহা তিব্বতী শিক্ষক বিশ্বাস করিতে রাজী নহেন।

তিব্বতে সকল বালকবালিকাকেই যে একই বিদ্যা শিখিতে হয় তাহা নহে। বর্ণপরিচয় প্রভৃতি হইলেই ঠিক হয়—ছেলে ধর্ম্মশিক্ষায় জীবন কাটাইবে, কিংবা সাংসারিক বিদ্যা শিখিবে। যে লামা হইবে, শিক্ষার আরম্ভেই তাহার শিখা রাখিয়া মাথা কামাইয়া দেওয়া হয়। লামার নিকট তাহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। লামা শিক্ষক তাহাকে নূতন ধর্ম্মনাম দেন। এই নামাকরণের সময় যে শিখাটুকু মাথায় ছিল তাহাও কামাইয়া ফেলিয়া সন্ন্যাসীর মত পরিষ্কার ভাবে মস্তক মুণ্ডন করা হয়। তাহাদের শিক্ষা আরম্ভ হয় "গোম্ফাতে"—অর্থাৎ মঠে বা বিহারে। বিহারের শিক্ষায় বুদ্ধিকে জাগানো ও মন তৈয়ারি করা একই সঙ্গে চলে। তের-চৌদ্দ বৎসরের বালকের জীবন যেভাবে গঠিত হইয়া উঠে তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যজনক।

যে সব ছেলে লামা হইবে বলিয়া শিক্ষা আরম্ভ করে তাহারা সকলেই যে শেষ পর্য্যন্ত জীবনে পুরোহিত বা লামা হয় তাহা নহে। অনেকে এই পথ ছাড়িয়া সংসার-গৃহস্থালীও করিতে যায়।

যাহারা সংসারে থাকিবে তাহারা যায় সাধারণ স্কুলে। তথায় পড়া, লেখা, সাধারণ অঙ্ক শিক্ষা দেওয়া হয়।

যাহারা গবর্ণমেণ্ট চাকরীতে ঢুকিবে তাহারা যায় এক বিশেষ স্কুলে। এই সকল ছাত্রকে গবর্ণমেণ্টের কিনাজ আপিসে 'ৎসি-কাঙ্'-এ থাকিয়া হিসাব ও চিঠিপত্র লিখিতে শিক্ষা করিতে হয়। এই সব ছাত্রের মধ্যে ধনী ও লামা দুই-ই থাকে। তিব্বতে সরকারী কর্ম্মচারীর মধ্যে কিছু থাকে লামা, এবং বাকী সব অলামা। লামার মধ্যে যাঁহারা

সরকারী চাকরী করিতে চাহেন তাঁহাদিগকেও লামার এক বিশেষ স্কুলে শিক্ষালাভ করিতে হয়। এই সকল শিক্ষার্থী বালক বা যুবক লামা যে সব সময়ে বিহারে বা মঠে থাকিয়াই চাকরীর শিক্ষা লাভ করেন তাহা নহে; অনেকে বাড়ীতে থাকিয়াও বিদ্যালয়ে যান।

তিব্বত গবর্ণমেণ্টের চিঠিপত্র লিখিতে শিক্ষা করা তত সহজ নহে; কারণ যাঁহার নিকট চিঠি যাইবে তাঁহার পদমর্য্যাদা অনুসারে চিঠির বয়ান হইবে। সম্মান প্রদর্শনের উপায়ও বিচিত্র। যেমন বিদ্বান ব্যক্তিকে "জ্ঞানসাগর" বলিয়া উল্লেখ করিয়া সম্মান দেখাইতে হইবে। চিঠির বয়ান শিখাইবার জন্ত বই আছে। উহার নাম "ঈক্-কুর্-ন্নাম্-শা"। ফিনান্স আপিসের স্কুলের পরীক্ষা বৎসরে দুই বার হয়—গ্রীষ্মকাল ও শীতকালে। ভাল ছাত্রদিগকে পারিতোষিকও দেওয়া হয়। পরীক্ষার মানও ক্রমশঃই কঠিন হইতেছে।

পল্লীর স্কুলে ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ ছয়-সাত বৎসর বয়স হইতে পনর-ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পড়াশুনা করে। ছেলেরা গুরুগৃহেই থাকে। গুরুর সংসারের কাজকর্ম্মে সাহায্য করিয়া তাহার বিনিময়ে শিক্ষালাভ করে। মেয়েরাও গুরুগৃহে থাকে। চা পরিবেশন বা সংসারের অন্তান্ত মেয়েলি কাজে তাহারা সাহায্য করে। সাধারণতঃ অনাত্মীয় শিক্ষকের বাড়ী থাকিতে ছাত্রীরা পছন্দ করে না।

কোন কোন ছেলে গ্রামের স্কুলের বিদ্যা শেষ করিয়া লাসা, গ্যাংচি, শীগাতসী প্রভৃতি শহরের স্কুলে গিয়া শিক্ষালাভ করে। এরূপ ছাত্রের সংখ্যা খুবই কম। কারণ আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে থাকিবার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে শহরের বিদ্যালয়ে ছেলে পাঠান যায় না।

সরকারী চাকুরীতে ঢুকিবার জন্ত লাসাতে দুইটি গবর্ণমেণ্ট স্কুল আছে, একটি "ৎসি-ল্যাপ-ট্রা" স্কুল। এখানে যে সব লামা সরকারী চাকুরীতে ঢুকিতে চান তাঁহারা শিক্ষালাভ করেন। অপরটি "ৎসি-ক্যাঙ্গ"। উহা ফিনান্স আপিসের অধীন। এই স্কুল যাঁহারা লামা নহেন তাঁহাদেরই জন্ত।

সাধারণতঃ অর্থশালী জমীদারগণই তাঁহাদের নিজ নিজ এলাকায় স্কুল খুলিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের সাধারণ স্কুল নাই।

বড়লোকের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠান হয় না। বাড়ীতেই গৃহশিক্ষক রাখিয়া লেখাপড়া শিখান হয়। বাড়ীর ঝি চাকর ও নিকটস্থ নিজ প্রজাদের ছেলেমেয়েদেরও শিক্ষা সেই শিক্ষকের নিকট হইতে পারে। চাকরের ছেলে ও মনিবের ছেলে একই ঘরে বসিয়া একই সময়ে লেখাপড়া করে, কিন্তু ভিন্ন আসনে দূরে বসে।

বৌদ্ধ বিহারে নিম্নশিক্ষার পরেও উচ্চস্তরের শিক্ষা দেওয়া হয়। উহা অনেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথা অনুযায়ী। এক একজন অধ্যাপক এক এক বিষয়ে আজীবন অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। কোন কোন বিষয়ে বিদ্যা শেষ করিতে পনর-বিশ বৎসরও লাগে। আমাদের দেশে যতটা বিদ্যা হইলে পিএইচ ডি উপাধি দেওয়া হয় তিব্বতে ঠিক সেই স্তরের বিদ্যাও শিক্ষাদানের ও উপাধি দিবার ব্যবস্থা আছে। ছাত্রেরা বিহারের বিদ্যা শেষ করিয়াই যে ক্ষান্ত হয় তাহা নহে। অনেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত জ্ঞানচর্চ্চা করে।

স্কুলের ছাত্রগণ কাঠের শ্লেটে হাতের লেখা লিখিয়া দেখাইতেছে

কোন কোন বৌদ্ধবিহারে প্রায় দুই-তিন হাজার ছাত্রও থাকে। এক-একটি বিহারের মোট জনসংখ্যা কম নহে, ড্রেপুং বিহারে ৭৭০০, সেরা বিহারে থাকেন ৫৫০০, এবং গ্যানডেন্ বিহারে ৩৩০০ জন লামা। বৌদ্ধ বিহারের শিক্ষার বিশেষত্ব এই যে, শিশুকালেই জীবনটাকে এমন ভাবে তৈয়ারি করা হয়, এবং চিন্তার মোড় ফিরাইয়া আত্মজ্ঞান জাগাইয়া দেওয়া হয় যাহাতে ভবিষ্যৎ জীবনে সে সকল প্রকার বাধাবিঘ্নের সহিত যুঝিয়া জয়ী হইতে পারে এবং জীবনটাও হয় তাহার শান্তি ও আনন্দে ভরপুর।

এক-একটি বিহারে তিন-চারিটি কলেজ আছে। ড্রেপুং বিহারে নেপালীদিগের জন্য একটি বিশেষ কলেজ আছে। তন্ত্রশিক্ষার জন্যও আর একটি কলেজ আছে। এই তান্ত্রিক কলেজেই বজ্রভৈরবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেকটি কলেজে বিষয় হিসাবে শিক্ষা দিবার জন্য বিভিন্ন বিভাগ আছে। ছাত্রদিগের রুচি অনুযায়ী বিষয়ে তাহারা শিক্ষালাভ

করে। অবসর সময়ে ছাত্রদিগকে জল বহিয়া আনা, কাপড় সেলাই করা ইত্যাদি নিজেদের কাজ দলবাঁধিয়া নিজ হাতেই করিতে হয়। বিহার হইতে কোথাও যাইতে হইলে কেবলমাত্র অধ্যক্ষের অনুমতি লইলে চলে না, নিজ অধ্যাপকের অনুমতিও লইতে হয়। প্রতি বিহারেই সংলগ্ন ফলের বাগান অথবা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ আছে। অধ্যাপকগণ কখনও কখনও তথায় অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। ছাত্রগণ হয়তো উন্মুক্ত স্থানে পাঠাভ্যাস অথবা বিতর্ক-সভা করিয়া থাকে। প্রতি বিহারেই বড় পাঠাগার আছে।

বরফের উপর তিব্বতী নৃত্য

চিত্রাঙ্কন, পুস্তক মুদ্রণ এবং অন্যপ্রকার চারুশিল্পের কাজও কোনও কোনও বিহারে হয়।

লামাগণ বিহারের অভ্যন্তরে পুলিশের কাজও করেন।

প্রতি বিহারের জন্য জমিজমা আছে। জমি হইতেই প্রধান আয়। কৃষকগণ বিহারের প্রজা হিসাবে ঐ সকল জমি চাষ করে।

তিব্বতের বৌদ্ধবিহারগুলিতে চরম সত্য উপলব্ধির জন্য স্ব স্ব মত অনুযায়ী পথ অনুসরণ করিবার স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই আছে। আস্তিক বা নাস্তিক হউক অথবা বৌদ্ধমতের যে-কোনও সম্প্রদায়ের সাধকই হউক, চাপ দিয়া কাহারও মত পরিবর্ত্তন করিবার রেওয়াজ তথায় নাই।

ড্রেপুং বিহারে চীনপ্রীতি ও ইউরোপবিদ্বেষ আছে। এই স্থানের অধিকাংশ লামা চীনঅধিকৃত পূর্ব্ব-তিব্বত হইতে আসিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহাদের চীনপ্রীতি প্রবল। বর্ত্তমান সময়ে তিব্বত গবর্ণমেণ্টের উপর ড্রেপুং, সেরা ও গ্যান্‌ডেন্ বিহারের প্রভাবও বড় কম নহে।

তিব্বতী ছেলেমেয়েরা এখনও বিদেশী কোন খেলাই শিখে নাই। দেশের খেলাধুলা লইয়াই তাহারা এখনও মাতিয়া আছে। কুস্তি, দূরে প্রস্তর নিক্ষেপ, লক্ষ্যস্থলে পাথর ফেলা, লাফানো, উঁচে লম্ফন, দূরে লাফাইয়া পড়া এই সব হয় সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে। তিব্বতে একবার বিচিত্র কুস্তি দেখিলাম। দুই জন পালোয়ানই ঘোড়ায় চড়িল। উভয়ের শরীরেই তেল মাখান। ঘোড়ায় বসিয়া বসিয়াই কুস্তি সুরু হইল। আমাদের দেশে মাটিতে কুস্তির চেয়ে ইহা কঠিন বলিয়া মনে হইল, কারণ অপর পক্ষকে পরাস্ত করিবার প্যাঁচ শুধু হাতের সাহায্যে খাটাইতে হইবে, পায়ের সাহায্য পাওয়া যায় না। এদিকে ঘোড়াকেও সামলাইতে হইবে। তাহার উপর আছে তেলমাখান শরীর।

খালি পায়ে দৌড়, ঘোড়ায় দৌড় আছেই। শিশুদের এক প্রিয় খেলা হইতেছে হাতের উপর ভর দিয়া মাথা নিচু করিয়া উপরে পা তুলিয়া বেশী সময় থাকিবার প্রতিযোগিতা করা।

"বাঘ ভেড়া" ও "নেকড়ে ভেড়া" প্রভৃতি খেলা হয় বাহিরে। আর ঘরের ভিতরে হয় পুতুল খেলা। মাটির পুতুল তৈরি করা হয়। বাঙালী পল্লীর মেয়ের মত তিব্বতী মেয়েরাও পুতুল তৈরি করিয়া সংসার সাজাইয়া খেলা করে। পথেঘাটে সর্ব্বত্রই দেখিয়াছি শিশুরা 'টিকি' খেলা খুব পছন্দ করে। একটি ছোট হালকা বলকে পায়ের আঘাতে বেশী সময় উঁচুতে রাখার প্রতিযোগিতাই এই খেলা। মেয়েরা এই খেলা খুব পছন্দ করে।

আমোদের সময় ছাড়াও কাজের ফাঁকে ফাঁকে গান চলে ছোট-বড় সকলের মুখে মুখে। শিশুরা হয়ত পুনঃ পুনঃ একই গান গাহিতেছে, তাহাতে ক্লান্তি নাই।

ছোটরা দেশের নাটকের নাচ বা 'ঘুরনা' নাচ খুব নকল করে। দুরন্ত শীতে চারিদিক যখন বরফে ঢাকা তখনও ছোটরা বাহিরের নাচ বন্ধ করে না। বরফের উপর স্ফূর্ত্তির সহিত নাচ চলে। এই নৃত্যরত শিশুদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও গায়ের জামা এত ছেঁড়া যে তুষার গায়ের চামড়ার উপরেই পড়ে, তথাপি নাচ চলে তাথৈ তাথৈ।

বড়দের নাটকের নকলও ছোটরা করিয়া থাকে। তিব্বতের নাটকের বিষয় সাধারণতঃ হয় ভারতবর্ষ বা চীনের বড় বড় রাজারাজড়া বা ধর্ম্মবীরের জীবনী আশ্রয় করিয়া। তিব্বতে বেড়াইবার সময় প্রাচীন বাংলা ও ভারতের কৃষ্টির অভিযানের প্রমাণ দেখিয়া নিজেকে যেমন গৌরবান্বিত মনে করিয়াছি, তেমনি বর্ত্তমান বাংলার জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেলিয়াছি।

এটম-বোমার আপন দেশে

শ্রীঅমলেন্দু সেন

আজ থেকে প্রায় এগার বছর আগে আমেরিকার কয়েক জন বৈজ্ঞানিক নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, পরমাণুকে চূর্ণ করলে যে বিপুল শক্তির উদ্ভব হয়, তা কয়লা, পেট্রল, বিদ্যুৎ কিংবা ডিনামাইটের চেয়ে বহু সহস্র গুণ বেশী। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এ বিষয়ে অক্লান্ত গবেষণা চলে আসছে। আজ এ বিষয়ে কাজ চলছে সে দেশের বিভিন্ন স্থানে বার শ'রও বেশী প্রতিষ্ঠানে। এর মধ্যে আছে কলেজের ছোট ছোট ল্যাবরেটরী থেকে সুরু করে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানা পর্য্যন্ত।

এই কাজে আমেরিকা এগার বছরে খরচ করেছে ৩৫০ কোটি ডলার, আজকালকার হিসাবে যার মূল্য প্রায় ১৬৬২১ কোটি টাকা। ১৯৪৬ সন থেকে প্রতি বৎসর গড়ে ৫০ কোটি ডলার এর পিছনে খরচ করা হচ্ছে। এই কাজে হাজার হাজার লোক খাটছে। এদের কাজ হ'ল মারণাস্ত্র নির্ম্মাণ, তেজষ্ক্রিয় রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন এবং পরমাণুর শক্তিকে শিল্প, কৃষি, চিকিৎসা, জীববিদ্যা, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা-ঘটিত কি কি কাজে লাগানো যেতে পারে, সে সম্বন্ধে গবেষণা করা।

সমস্ত প্রচেষ্টাটির উপর কর্ত্তৃত্ব করেন সরকারী একটি দপ্তর—এটমিক এনার্জি কমিশন (সংক্ষেপে এ-ই-সি)। ১৯৪৭ সনের গোড়াতেই এঁরা সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের হাত থেকে পরমাণু-শক্তিসংক্রান্ত সকল কাজের ভার নিয়ে নেন এবং সমস্ত ব্যাপারটাকে ঢেলে সাজতে সুরু করেন। এক গৃহ-নির্ম্মাণের কাজেই এঁরা ৭০ কোটি ডলার খরচ করেছেন। তা দিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুড়িটি কারখানা স্থাপন করা হয়েছে, এর কোন কোনটিতে ১৫০০০ লোক কাজ করে। এ-ই-সি নিজে কোনও গবেষণা করে না, বেশীর ভাগ কাজই করানো হয় বেসরকারী কারখানা বা কলেজের ল্যাবরেটরী ইত্যাদির সঙ্গে চুক্তি করে। আমেরিকার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান এঁদের কাজ করেন। ক্যানসার, থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড ইত্যাদির উপর পরমাণু-শক্তির ক্রিয়া পরীক্ষা করানো হচ্ছে অনেকগুলি হাসপাতালে। এর জন্য প্রায় ১০০ রকম তেজষ্ক্রিয় পদার্থ আর ১৫০ রকম তেজষ্ক্রিয় পদার্থ-ঘটিত দ্রব্য নিয়মিতভাবে প্রস্তুত করে শত শত গবেষণাগারে বিতরণ করা হচ্ছে। আমেরিকার বাইরেও বাইশটি দেশে গবেষণার উদ্দেশ্যে এগুলি পাঠানো হয়ে থাকে।

এলিনয় প্রদেশের আর্গোন শহরে একটি জাতীয় গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে। এর পরিচালনা করেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়। এর সঙ্গে সহযোগিতা করেন অনূ্যন ত্রিশটি বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যায়তন এবং গবেষণাগার। আর্গোনে নানারকমের গবেষণার ব্যবস্থা, বিশেষতঃ পরমাণু চূর্ণ করবার আধুনিকতম যন্ত্রপাতি আছে। আর আছে একটি বাগান, যেখানে সমস্ত গাছ এবং ফলকে তেজষ্ক্রিয় করে নেওয়া হয়েছে। মানুষের এ বাগানের ফল খাওয়া বারণ, কিন্তু উদ্ভিদ এবং অন্যান্য জীবদেহের উপরে এর প্রয়োগফল পরীক্ষা করা চলছে।

নিউইয়র্কের কাছে ব্রুকহ্যাভেন শহরে এ-ই-সি কর্ত্তৃক স্থাপিত জাতীয় গবেষণাগারের কাজেও আশপাশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য করছেন। এখানে পরমাণু চূর্ণ করবার একটি যন্ত্র তৈরি হচ্ছে, যাতে তিন শ' কোটি ভোল্ট তাড়িত শক্তি উৎপন্ন করা যাবে। টেনেসী প্রদেশের ওক-রিজ শহরের জাতীয় গবেষণাগারে প্রধানতঃ তেজষ্ক্রিয় পদার্থ উৎপাদন করা হয় এবং সে বিষয়ে গবেষণাও চলে। এর বাড়ীটি চার তলা—এক মাইল লম্বা আর তিন শ' হাত চওড়া। এর দু' হাজার বিঘা জমিতে আরও ছোট ছোট ১০টি বাড়ীতে কাজ চলে, ৪৭০০ জন কর্ম্মী সেখানে খাটে।

অন্যান্য বড় বড় বীক্ষণ-কেন্দ্রের মধ্যে এইগুলির নাম করা যেতে পারে,—আইওয়া প্রদেশের আমেস শহরের ধাতুতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণাগার; নিউ মেক্সিকোর লস্-আলামোস শহরের মারণাস্ত্রসম্পর্কিত গবেষণাকেন্দ্র; বার্কলে শহরে কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তেজোবিকীরণ বিষয়ক বীক্ষণাগার; এবং নিউইয়র্কের রচেষ্টার শহরে চিকিৎসা ও জীববিদ্যায় পরমাণুশক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে গবেষণাগার।

অসামরিক উদ্দেশ্যে পরমাণুশক্তিকে নিয়োগ করবার পথও যে এ-ই-সি'র বৈজ্ঞানিকরা না খুঁজছেন, এমন নয়। কিন্তু তাঁদের প্রয়াস চলছে বেশীর ভাগই মারণাস্ত্র নির্ম্মাণে। পরমাণুশক্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনও উপযুক্ত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা হচ্ছে না বলেই আণবিক গবেষণা এই পথ অবলম্বন করেছে।

১৯৪৮ সনের মে মাসে প্রশান্ত মহাসাগরে এনিওয়েটক প্রবালবলয়ে তিনটি উন্নত ধরণের এটম বোমা পরীক্ষা করা হয়। তার পর এ দু' বৎসরে এই মারণাস্ত্রটিকে এতটা মারাত্মক করে তোলা হয়েছে যে, হিরোশিমায় বা নাগাসাকিতে যে বোমা ফেলা হয়েছিল, তা এর কাছে নিতান্তই প্রাথমিক একটা আবিষ্কার মাত্র।

এটম বোমার নানা অংশ আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়

তৈরি হয়। তারপর হিসাবমত নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটা কেন্দ্রীয় কারখানায় এনে বোমাটাকে গড়ে তোলা হয়। কি নমুনায় গড়া হবে, তা ঠিক করে দেওয়া হয় লস্-আলামোসের গবেষণাকেন্দ্র থেকে।

নিউ মেক্সিকোর জনবিরল বন্ধুর প্রান্তে ৭৫০০ ফুট উঁচু একটি পাহাড়ের মাথায় প্রায় এগার বর্গমাইল জায়গা জুড়ে লস্-আলামোস গবেষণা কেন্দ্রটি অবস্থিত। এরই কাছাকাছি এক মরুভূমিতে ১৯৪৫ সনের জুলাই মাসে প্রথম এটম-বোমা ফাটিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল। আল্‌বুকার্ক শহরে এর একটি শাখা-বীক্ষণাগার আছে। এই দু' জায়গায় প্রায় ৩০০০ কর্ম্মী কাজ করেন, তার অর্দ্ধেকই বৈজ্ঞানিক, যন্ত্রী এবং এঞ্জিনীয়ার।

সব পদার্থের পরমাণুকে ভাঙা যায় না। ভাঙবার মত পরমাণু পাওয়া যায় প্রধানতঃ প্লুটোনিয়াম আর ইউরেনিয়াম থেকে। প্রথমটিকে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু একে তৈরী করে নেওয়া যায় এবং তা করাও হচ্ছে। ইউরেনিয়াম কিছু কিছু পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তার ভাল ধাতু-প্রস্তর (ore) আমেরিকায় খুবই কম আছে। তা আনিয়ে নিতে হয় কানাডা এবং বেলজিয়াম কঙ্গো থেকে। আমেরিকার কলোরেডো মালভূমিতে যে নিকৃষ্ট ধাতু-প্রস্তর পাওয়া যায় তাকেও কাজে লাগান হচ্ছে বটে, কিন্তু তাতে খরচ বেশী পড়ে। তাই সারা দেশ জুড়ে প্রতিটি প্রস্তর-স্তরে অনুসন্ধান চলছে। ধাতু গালাই করবার কারখানা, খনি, তৈলকূপ ইত্যাদির উপরেও দৃষ্টি রাখা হচ্ছে, কারণ সে সব জায়গায় গৌণভাবে উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ইউরেনিয়াম মিলে যাওয়া অসম্ভব নয়। অনুৎকৃষ্ট ধাতু-প্রস্তর থেকে ইউরেনিয়াম বের করে নেওয়ার জন্য এক কলোরেডো অঞ্চলেই পাঁচটি কারখানা আছে। দেশের নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত বারটি কলে এই ইউরেনিয়াম শোধিত করে নেওয়া হয়। তাকে আরও বিশোধিত করবার জন্য অতিরিক্ত চৌদ্দটি রসায়নাগার সেখানে ইউরেনিয়ামকে একটা পাটল বর্ণের চূর্ণে পরিণত করা হয়। তার থেকে তৈরী করা হয় একটি পদার্থ, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'সবুজ লবণ'।

এখন মুশকিল এই যে, ইউরেনিয়ামের দুইটি রূপ। একটিকে বলা হয় ইউরেনিয়াম—২৩৫, অপরটির নাম ইউরেনিয়াম—২৩৮। শেষেরটিকে ভাঙা যায় না, অথচ যত ইউরেনিয়াম পাওয়া যাবে, তার ১৪০ ভাগের ১৩৯ ভাগই এই ইউরেনিয়াম—২৩৮।

একে আলাদা করতে হলে 'সবুজ লবণ'টিকে একেবারে বাষ্পে পরিণত করে নিয়ে নানারকম প্রক্রিয়া করতে হয়। এটা করা হয় দু'জায়গায়—ওক-রিজ গবেষণাগারে, আর রিচল্যাণ্ড নামক স্থানে।

আর এক উপায়েও ইউরেনিয়াম—২৩৮কে কাজে লাগানো হয়। মিশ্র ইউরেনিয়ামকে ভেঙে ফেললে তার মধ্যে যে অংশ ইউরেনিয়াম—২৩৮, তার খানিকটা প্লুটোনিয়ামে পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়, যার পরমাণুকে চূর্ণ করা সম্ভব। এই ধাতু থেকে যে তেজ বিকীর্ণ হয় তা এত শক্তিশালী এবং অনিষ্টকর যে, এ নিয়ে কাজ করবার সময় সীসা ও সিমেন্টের তৈরী পর্দার আড়ালে আত্মরক্ষা করে, চিমটের সাহায্যে ধরে এবং পেরিস্কোপ দিয়ে দেখে বৈজ্ঞানিকদের কাজ চালাতে হয়। যে যন্ত্রে কাজ করা হয় তা এমন বিষাক্ত এবং তেজস্ক্রিয় হয়ে যায় যে, তাকে মেরামত করবার জন্য পর্য্যন্ত ছোঁয়া যায় না।

ওক-রিজ্ আর রিচল্যাণ্ড ছাড়া আর একটি জায়গায় অন্য প্রণালীতে কাজ করবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেখানে 'সবুজ লবণ'কে বাষ্পে পরিণত না করে ইলেকট্রো-ম্যাগ্‌নেটের সাহায্যে ইউরেনিয়াম—২৩৮কে আলাদা করা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের ১৫টি প্রদেশের ২৫ জায়গায় ৩০টি কারখানায় হাজার হাজার লোক খাটছে শুধু এই ভঙ্গুর-পরমাণুবিশিষ্ট ধাতুগুলি উৎপাদনের জন্য। কাজেই দেখা যাচ্ছে, মানুষকে মারবার জন্যও মানুষের কতই না আয়োজন!

জনার্দ্দন রায় সাহিত্যিক

শ্রীঅলোকানন্দ দাস

একদা গ্রীষ্মসন্ধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাত্রী তাদের হোষ্টেলের প্রসাধন-কক্ষে এইরূপ আলোচনায় ব্যাপৃত ছিল।

"এতদিনে বনামধন্য জনার্দ্দন রায়ের দর্শন পাওয়া গেল।"

"তরুণ সাহিত্যিকদের অভ্যর্থনা করবার সময়ে অধ্যাপক বিনয়েন্দুবাবু জনার্দ্দন রায়ের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার কি প্রশংসাই না করলেন। তিনি বললেন যে, জনার্দ্দন রায় একাধারে কবি, গল্পলেখক, সমালোচক, নাট্যকার এবং রস-সাহিত্যিক।"

"কিন্তু, ভাই, ওঁর ভক্তরা যে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত বলে জনার্দ্দন রায়ের এত প্রশংসা করেন, রবীন্দ্রপ্রভাবের অভাবই কি একটা মস্ত গুণ?"

ঘন সুদীর্ঘ কেশ বিন্যাস করতে করতে ঊর্ম্মিলা চৌধুরী বললে, "যে লেখকের নিজস্ব প্রতিভা নেই, সে-ই কেবল অন্ধকারে অন্যের অনুকরণ করে।"

কমলা মুখে স্নো মাখাতে মাখাতে সত্যেন দত্ত আবৃত্তি করে বললে, "রবিরথের ঘোড়ার খুরেও জন্মে যে সব ছন্দ—"

নিভা বললে, "জনার্দ্দন রায়ের সব লেখার মধ্যেই একটা নূতনত্ব আছে—তাই ওঁর লেখা আমার এত ভাল লাগে।"

কমলা একটু দ্বিধা করে বললে, "জনার্দ্দন রায়ের লেখা আমারও ভাল লাগে, যদিও একটু 'হাই ব্রাউ'। কিন্তু শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে ওঁর মতবাদ আমি মোটেই সমর্থন করতে পারি না।"

ঊর্ম্মিলা বললে, "শরৎবাবুর লেখার মধ্যে একটা পপুলার এ্যাপিল আছে এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু যে লেখা কেবল চিপ সেন্টিমেন্টে এ্যাপিল করে, তা পপুলার হলেও উঁচুদরের সাহিত্যের আসন পেতে পারে না, এই কথাটাই ওঁর বক্তব্য ছিল। অবিশ্যি এ বিষয়ে মতভেদ নিশ্চয়ই হবে, এবং শরৎবাবু যে শুধু চিপ সেন্টিমেন্টে এ্যাপিল করেছেন, এ কথাও আমরা মানব না। কিন্তু জনার্দ্দন রায়ের প্রকাশভঙ্গী যে অতিশয় মনোজ্ঞ হয়েছিল, আশা করি এ বিষয়ে মতভেদ হবে না।"

ক্ষুণ্ণ মনে কমলা বললে, "তা তুমি যাই বল না কেন, শরৎবাবুর লেখা পড়তে খুব ভাল লাগে।"

মুকুরে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে ঊর্ম্মিলা উত্তর দিলে, "শরৎ চন্দ্রের যুগ কেটে গেছে। নব যুগে নূতন কোনও মেসেজ যদি কেউ দিতে পারে তো সে জনার্দ্দন রায়।"

"তোর কানপাশা জোড়া কোথায় গড়িয়েছিস ঊর্ম্মি?"

ঊর্ম্মিলা বোম্বাইয়ের এক বিখ্যাত কারিগরের নাম করলে। কলকাতা ও বোম্বাইয়ের স্বর্ণকারদের নৈপুণ্য এবং পারিশ্রমিকের তুলনামূলক সমালোচনা করতে করতে তারা সকলেই উদীয়মান তরুণ সাহিত্যিক জনার্দ্দন রায়কে সেদিনকার মতন বিস্মৃত হ'ল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান "সাহিত্যচক্রে"র উদ্যোগে আশুতোষ হলে বাংলা দেশের তরুণ সাহিত্যিকদের সভা হয়েছিল; তার মধ্যে, সকলের চেয়ে উপভোগ্য হয়েছিল উদীয়মান সাহিত্যিক জনার্দ্দন রায়ের বক্তৃতা। সভা ভঙ্গ হবার পর ছাত্রীনিবাসে ফিরে এসেও তাই অনেকক্ষণ ধরে মেয়েদের মধ্যে সেই বিষয়েই আলোচনা চলেছিল। সাহিত্যিকদের রচনা-কৌশল থেকে আরম্ভ করে তাদের আকৃতি, প্রকৃতি, পেশা, নেশা, এমন কি, তাদের ব্যক্তিগত স্বভাবচরিত্র পর্য্যন্ত সেই আলোচনার অঙ্গ থেকে বাদ যায় নি।

ঊর্ম্মিলা চৌধুরী ইংরেজী সাহিত্য ক্লাসের ছাত্রী এবং "সাহিত্যচক্রে"র একজন উৎসাহী কর্ম্মী। সভাভঙ্গের পরে বিশিষ্ট অতিথি-অভ্যাগতদের চা ও মিষ্টিসহযোগে তৃপ্ত করবার ভার পড়েছিল তার উপর। দেখা গেল যে, সাহিত্যিক জনার্দ্দন রায় প্রবীণ অধ্যাপকবৃন্দের প্রশংসাবাক্য বা সাহিত্য-রসিক ছাত্রদের মুগ্ধ স্তুতিবাদের চেয়ে অধিক মূল্য দিলেন এই সুন্দরী আধুনিকার মতামতকে।

ঊর্ম্মিলা পাঠ্য বই-পড়া ভাল ছাত্রী নয়। ক্লাসের পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাবার জন্যে তার বিশেষ উৎসাহ ছিল না। পড়াশুনা ভালবাসলেও আমোদ-প্রমোদ বা বেশভূষা, প্রসাধন, কোনও বিষয়েই সে উদাসীন ছিল না। তার সাহিত্যানুরাগ তাকে পাঠ্য পুস্তকের পাতার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে দেয় নি; বরঞ্চ পাঠ্য পুস্তককে কিঞ্চিৎ অবহেলা করেই ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যের নানা বই পড়তে তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সাহিত্য-চক্রের সাপ্তাহিক অধিবেশনে তাকে সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকতে দেখা যেত। সাধারণ অধিবেশনে তারা, চক্রের সভ্যেরা, নিজেরাই সাহিত্যসম্বন্ধীয় কোনও প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনা করত। বিশেষ অধিবেশনে পৌরোহিত্য করবার জন্যে তারা আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসত বাইরে থেকে বিশিষ্ট সাহিত্যিক-দের। এই রকম একটা বিশেষ অধিবেশনেই ঊর্ম্মিলার সঙ্গে জনার্দ্দন রায়ের প্রথম আলাপ হয়েছিল।

জনার্দ্দন রায় কথাপ্রসঙ্গে ঊর্ম্মিলাকে বলেছিল যে, বাঙালী লেখকদের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত কেউ একটা বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গল্প বা উপন্যাস লেখেন নি। সেইজন্যে তাঁরা সবাই নাম ক্ষুদ্র-

ছেন কেবল বাঙালীর কাছে। বাংলার বাইরে তাঁদের খ্যাতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে নি; পড়বে না কোনও দিন। জনার্দন রায়ের এমন একখানা বই লেখবার ইচ্ছা আছে, যার খ্যাতি হবে ভারতবিদিত। যে সমস্তা নবযুগের নরনারীকে বিচলিত করেছে, তার সমাধানের জন্তে রবীন্দ্রনাথ কি শরৎ চন্দ্রের শরণ নিলে চলবে না। নব যুগের বাণী দেশবাসীকে শুনাবার ভার গ্রহণ করতে হবে নব যুগেরই কোনও তরুণ লেখককে—জনার্দন রায়ের মুখে এই সব কথা শুনে উর্ম্মিলার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, আধুনিক সাহিত্যে নব যুগের নূতন বাণী শোনাতে পারে একমাত্র জনার্দন রায়। বই লেখবার আগে সমগ্র ভারত পর্য্যটন করে বিভিন্ন প্রদেশের ভাবধারা ও বিশেষ বিশেষ সমস্তার সঙ্গে পরিচিত হতে চেষ্টা করবে, জনার্দন রায় উর্ম্মিলাকে এমন কথাও জানিয়েছিল।

২

গোড়াকার কথাটা এইবার বলে নেওয়া যাক। উর্ম্মিলার বাবা বিরাজ চৌধুরী শিবপুর থেকে পাস করে বাংলাদেশে এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ঢুকেছিলেন। বয়স ছিল তখন কাঁচা। দেশ দেখবার বাসনা ছিল প্রবল। তাই এক দিন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে তিনি অন্ন উপার্জ্জনের এই প্রশস্ত রাজপথ পরিত্যাগ করে আফ্রিকার জঙ্গল কেটে রেললাইন বসাবার কাজ নিয়ে চলে গেলেন। সেখানে যিনি ছিলেন প্রধান এঞ্জিনিয়ার, কাজে পারদর্শিতা দেখিয়ে তাঁর সুনজরে পড়লেন। আফ্রিকার কাজ যখন শেষ হ'ল, তখন সেই ইংরেজ এঞ্জিনিয়ার চৌধুরীকে তাঁর বোম্বাইয়ের কাজের অংশীদার করে নিলেন। সেই থেকে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁর উপর সুপ্রসন্ন। সম্প্রতি তিনি বোম্বাই শহরে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করছেন।

পাঠ্যাবস্থাতেই বিরাজ চৌধুরীর বিবাহ হয়েছিল। তাঁর শ্বশুর ছিলেন পুরাতনপন্থী, তাই প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার সুযোগ এবং সুবিধা বিরাজের স্ত্রীর হয় নি, মাইনর স্কুলের নীচের কয়েকটি শ্রেণী অতিক্রম করেই পাঠ সমাপন করতে হয়েছিল। দেশের বাড়ীতে তিনি কর্ত্রী ছিলেন না, তাঁর উপরে ছিলেন অনেক গুরুজন, সুতরাং নিজের স্বাধীনতা প্রকাশ করবার অবসর হয় নি কোনও দিন।

বোম্বাইয়ে এসে বিরাজের স্ত্রী দেখলেন যে সমাজে তাঁকে মিশতে হয়, সেখানে অত্যধিক পরিমাণে ইংরেজী ভাষা চলিত। ধনগৌরবে বিরাজ যাঁদের সমকক্ষ, তাঁরা বাস করেন শহরের নূতন অঞ্চলের আধুনিক প্রাসাদোপম গৃহে। তাঁরা থাকেন সাহেবী ধরণে, খান সাহেবী খানা। বিরাজের স্ত্রী বুদ্ধিমতী। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে তাঁর বিলম্ব হ'ল না। এমন কি, কয়েক বছরের মধ্যেই সাহেবিয়ানার প্রতিযোগিতায় সঙ্গিনীদের অনেককেই তিনি পরাজিত করতে সক্ষম হলেন। ইংরেজী বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর যে ত্রুটি ছিল তার পরিশোধন করলেন তিনি ইংরেজী আদব-কায়দা নিজগৃহে প্রচলন করে।

বৈঠকখানার পরিবর্ত্তে দেখা দিলে সোফা-সেটিতে সজ্জিত ড্রয়িং রুম, তার গবাক্ষে সুদৃশ্য লেসের পর্দা, দেয়ালে বিলাতী ছবির নকল ও কোণায় সুবৃহৎ পিয়ানো। বিরাজের স্ত্রী বুঝলেন যে, তাঁর সঙ্গিনীদের সকলেই যখন কাঁটা-চামচে লাঞ্চ ডিনার খেয়ে থাকেন, তখন আসনে বসে কাঁসার থালায় পোলাও কালিয়া খেলেও তাঁদের মধ্যে প্রতিপত্তি রক্ষা করা সম্ভব হবে না। রান্না করবার জন্ত দেশ থেকে যে ঠাকুর এসেছিল, তাকে আবার দেশেই ফেরত পাঠানো হ'ল এবং তার পদে নিযুক্ত হ'ল পঞ্চাশ টাকা মাহিয়ানার এক ওস্তাদ গোয়ানি রাঁধুনি, বিরাজের স্ত্রী স্বয়ং কিনে আনলেন সাহেব দোকান থেকে আধুনিকতম ডাইনিং-রুম স্যুট—বহুমূল্য চিনামাটির বাসন।

বিরাজের স্ত্রীকে ইংরেজী আদব-কায়দা, কথাবার্ত্তা শেখাবার জন্ত এক মেমসাহেব নিযুক্ত হলেন। বিরাজ-গৃহিণী মল খুলে ফেলে পায়ে দিলেন সাড়ে তিন ইঞ্চি খুরওয়ালা জুতো; অনন্ত, বাজু ও মকর-মুখো বালার পরিবর্ত্তে হাতে পরলেন রিষ্টওয়াচ এবং আর্মলেট; চুল বাঁধলেন হাল-ফ্যাশানে; কাপড় পরলেন আধুনিক ধরণে। পুরাতনপন্থী পরিবারের কন্যা এবং বধূ অবগুণ্ঠন মোচন করে হয়ে উঠলেন উগ্র রঙের আধুনিকা।

বিরাজের ব্যবসা চলেছে দ্রুতবেগে। বসবার ঘরে ফরাসের পরিবর্ত্তে কখন ড্রয়িং-রুম স্যুট এসেছে, মাছের কালিয়ার পরিবর্ত্তে পাতে পড়েছে মাটন চপ, সে-সব লক্ষ্য করবার মতন অবসর তাঁর নেই। তাম্বুলরাগের পরিবর্ত্তে কোন দিন গৃহিণীর অধরোষ্ঠ রঞ্জিত হয়েছে লিপষ্টিকে, নয়নপল্লবের কাজল মুছে গিয়ে দেখা দিয়েছে আই ব্রাউ পেন্সিলের রেখা—তাও হয় তো তাঁর চোখে পড়ে নি।

তথাপি বিরাজের স্ত্রী নিজেদের আধুনিকতায় সম্পূর্ণ সুখী হতে পারেন না। নিজের মধ্যে কিসের জানি অভাব রয়েছে বলে মনে হয়, এবং সেটা তিনি পূর্ণ করে নিতে চান তাঁর কন্যাকে দিয়ে। নিজগৃহে তিনি সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, কন্যাকে ভর্ত্তি করে দিয়েছেন কনভেণ্ট স্কুলে। তথাপি খাবার-টেবিলে, অথবা ক্ষণিক বিশ্রামের সময়ে বিরাজকে মাঝে মাঝে কিছু কিছু অভিযোগ শুনতে হয়।

বিরাজ সেদিন সন্ধ্যার সময়ে হাল্‌কা একটা মাসিক পত্রিকা পড়ছিলেন। স্ত্রী তখন সবে ঘোষসাহেবের বাড়ী থেকে টি-পার্টি শেষ করে ফিরলেন, বললেন, "দেখ, তোমার মেয়ে দিন দিন বড্ড হোপলেস হয়ে যাচ্ছে।" সস্নেহে কন্যা উর্ম্মিলার দিকে দৃষ্টিপাত করে বিরাজ বললেন, "কি আবার হ'ল?" গৃহিণী সখেদে বললেন, "ঘোষ সাহেবের মেয়েটি কি

চমৎকার। মিসেস্ ঘোষ বললেন যে, সে বাংলা অক্ষর পর্য্যন্ত চেনে না, বাংলা এক দুই তিন গুনতে পারে না, কিন্তু পিয়ানো বাজিয়ে চমৎকার ইংরেজী গান শুনিয়ে দিলে। সবাই কত প্রশংসা করলেন। ইংরেজীতে নাকি সে কবিতা পর্য্যন্ত লেখে। আর তোমার মেয়েকে বলা হ'ল—সে রবিবাবুর একটি কবিতা গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত আবৃত্তি করলে, কোথাও একটু ঠেকল না। গান গাইতে বলা হ'ল, তা আবার সেই রবিবাবুর গান। সবাই এ ওর মুখের দিকে তাকায়—বললে, "বেশ হয়েছে, কিন্তু মানে তো বুঝতে পারা গেল না, মিসেস্ চৌধুরী, এ সবের তেমন চলন এদেশে নেই। আমি ত লজ্জায় মরে গেলাম। মেমসাহেব রেখে গান শেখানো হচ্ছে, সাহেবী স্কুলে লেখাপড়া শিখছে, সবই কি বৃথাই যাচ্ছে?"

বিরাজ অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর করলেন, "ঠিক কথাই তো।"

মাসিক পত্রিকার গল্পলোক থেকে মুক্তি পেয়েই মনটা তাঁর উড়ে গিয়েছিল কর্ম্মস্থলে। এই ঘটনার পর থেকে মিসেস্ চৌধুরী আরও সতর্ক হলেন। কন্যার পাঠগৃহ থেকে বাংলা বই সম্পূর্ণ নির্ব্বাসিত হ'ল। বাংলা গান শেখা বা কবিতা-পাঠ একেবারেই বন্ধ হ'ল। দিনের মধ্যে কোনও কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাংলায় বাক্যালাপ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হ'ল। বাপ-মাকে ড্যাডি এবং মাম্মি বলে, কথায় কথায় প্লিজ, সরি এবং থ্যাঙ্ক ইউ সহযোগে শিষ্টতা রক্ষা করতে শিখলে। মায়ের সতর্ক দৃষ্টি প্রহরায় রইল যেন কন্যা কেবল সেই সব মেয়ের সঙ্গেই মেশে যারা নিজেদের মধ্যেও সর্ব্বদাই ইংরেজীতে বাক্যালাপ করতে অভ্যস্ত। বাঙালী মেয়ের ইংরেজী ভাষা ও আদব-কায়দায় দুরস্ত হবার পথে আর কোনও বাধা রইল না।

এ সমস্তই বিরাজ চৌধুরীর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল।

৩

দু-চার বছর পরের কথা।

বিরাজ চৌধুরী এষ্টিমেট করছিলেন একটা মস্ত ব্রীজ তৈরি করবার। এক পার্শী কণ্ট্র্যাক্টর দাঁড়িয়েছে এই বিষয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। বিরাজের জেদ চেপে গেছে যে তাকে পরাজিত করতেই হবে। দশ-পনর হাজার টাকা যদি ক্ষতিও দিতে হয়, তথাপি এ কণ্ট্র্যাক্ট তিনি নেবেনই নেবেন।

এমন সময়ে উর্ম্মিলা এসে বললে, "ড্যাডি, গোটামা কে জান? তার গল্প বল না, আমাকে স্কুল থেকে লিখে নিয়ে যেতে বলেছে।"

দিনকয়েক আগে মার্কো পোলোর গল্প বলতে হয়েছিল। বিরাজ মনে করলেন সেই রকমই কেউ হবে, বললেন, 'বুক অফ নলেজ' থেকে পড়ে নাও, আমি এখন বড় ব্যস্ত আছি।

কি একটা ছুটির দিনে সবাই মিলে মোটরে করে বেড়াতে গেছেন ইলোরায়। গুহার মধ্যে প্রবেশ করেই উর্ম্মিলা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলে, "ড্যাডি, সেদিন তুমি বলতে পারলে না, এই ত সেই গোটামা, এই ত বুড্‌ঢা।"

ভগবান বুদ্ধের নামের এই বিকৃত উচ্চারণ বিরাজ চৌধুরীর সহ্য হ'ল না। এতকাল যে গভীর পরিবর্ত্তন তাঁর চোখেই পড়ে নি, আজ এক দিনের একটি ঘটনায় তা স্পষ্ট ভাবে দেখা দিয়ে তাঁকে ব্যথিত করলে। বিরাজ মনে মনে স্থির করলেন "আর নয়।" তিনি এককথার মানুষ। দাম্পত্য জীবনে এই প্রথম তিনি গৃহব্যবস্থায় গৃহিণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করলেন—কিন্তু দৃঢ়ভাবে। তাঁর অনুনয়-বিনয়, অশ্রুজল সব অগ্রাহ্য করে মেয়েকে বাংলা দেশে পাঠিয়ে দিলেন, কলকাতায় হোষ্টেলে থেকে স্কুলে পড়বার জন্যে।

৪

উর্ম্মিলার জীবনে সুরু হ'ল একটা নূতন অধ্যায়। আবার তার শিক্ষা-দীক্ষার রঙ বদলাতে সুরু করল। বাপমার কথা "ড্যাডি" "মাম্মি" বলে উল্লেখ করলে সহপাঠিনীরা হাসে, ঠাট্টা করে, কাজেই সে অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হ'ল। সাহেবী খানা খাবার নৈপুণ্য অক্ষুণ্ণ রেখেও সে হাতে করে ভাত খেতে শিখল। নিখুঁত উচ্চারণে ইংরেজী বলতে সক্ষম হয়েও সে বান্ধবীদের গলা জড়িয়ে "ভাই" বলে বাংলায় রহস্যালাপ করতে শিখল। পাশ্চাত্ত্য ধরণধারণ বাল্যকালেই তার নরম মনের গভীরে যে সুদৃঢ় মূল বিস্তার করেছিল, তার উচ্ছেদসাধন সম্ভব হ'ল না, কিন্তু তার শাখায় পল্লবে নূতন রঙ ধরল। বিলিতী মৌসুমী ফুলের গাছে চোখ-জুড়ানো রঙীন ফুলের পাশে পাশে যেন ফুটে উঠল মনভুলানো কামিনী-করবী কাঞ্চন গন্ধরাজ। বিলাতী প্রসাধনরঞ্জিত সুন্দর মুখের পাশে শোভা পেল সুক্ষ্ম কারুকার্য্যখচিত "ওরিয়েণ্টাল" কর্ণভূষণ আর বিলাতী গন্ধদ্রব্যসুরভিত ঘন কালো কেশদামে রচিত হ'ল অজন্তা খোঁপা।

শুধু তাই নয়, কলকাতায় এসে একটি নূতন জগৎ উর্ম্মিলা আবিষ্কার করলে বাংলা সাহিত্যের মধ্যে। যে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা তার মুখে শুনে তার মা ভয় পেয়েছিলেন এই ভেবে যে মেয়ের শিক্ষার আভিজাত্য বুঝি বা নষ্ট হ'ল, কলকাতায় এসে উর্ম্মিলা দেখলে যে, তাঁরই লেখা সহপাঠিরা সকলে পড়ে, আলোচনা করে। নিজে পড়ে দেখলে সে লেখার মাধুর্য্য চিত্তকে অভিভূত করে।

সুন্দর মুখ ও সপ্রতিভ স্বভাবের গুণে উর্ম্মিলা সকলেরই প্রিয়পাত্রী ছিল। কলকাতায় হোষ্টেলে থেকেই সে একে একে ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ পাস করে এম-এ পড়বার জন্য ভর্ত্তি হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্য-বিভাগে। যখন এম-এ ক্লাসে পড়ছে, তখন উর্ম্মিলা হয়ে উঠল উঁচুদরের সাহিত্য-রসিক এবং সেই সূত্রেই যে তার আলাপ পরিচয় হ'ল তরুণ সাহিত্যিক জনার্দ্দন রায়ের সঙ্গে সেকথা পূর্ব্বেই বলা

হয়েছে। এম-এ পাশ করে উর্ম্মিলা ফিরে চলে গেল বোম্বাই শহরে।

৫

বোম্বাই শহরে আবার এসেছে উর্ম্মিলা। উর্ম্মিলার সেই বয়স, যে বয়সে মেয়েরা মুকুরে বারংবার আপনার প্রতিবিম্ব দেখে, পুষ্পমাল্যে কবরী রচনা করে, নয়নাভিরাম বস্ত্র পরিধান করে এবং "নার্সিসাসের" মত নিজের রূপে নিজেই মুগ্ধ হয়। এ যেন জ্যোৎস্নারাত্রির জন্ত প্রতীক্ষমাণা বসন্ত-সন্ধ্যা। যে সন্ধ্যা বলে, "আমি সুন্দরী।" মেয়েরা এই বয়সে চায় স্তব, চায় পূজা।

সপ্তাহখানেক হ'ল জনার্দ্দন রায় তার পুরনো মোটর নিয়ে বোম্বাই এসেছে, এবং পুরাতন পরিচয়ের সূত্র ধরে উর্ম্মিলার আতিথ্যগ্রহণ করেছে। উর্ম্মিলা তাকে নিয়ে বোম্বাই শহর প্রদক্ষিণ করে সকল দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়েছে। মিসেস কাপ্রের বাড়ীর টি-পার্টিতে না গিয়ে জনার্দ্দনের সঙ্গে জুহুর সমুদ্রতীরে সূর্য্যাস্ত দেখেছে। প্রিয় বান্ধবী রুক্মিণি মনসুখানিকে অবহেলা করে জনার্দ্দনের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাব্যালোচনা করেছে। জনার্দ্দন রায় বর্ষার দিনে কবিতা লিখেছে "ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনের ভিড়ে দাঁড়কাক"। শান্ত সন্ধ্যায় মালাবার পাহাড়ের বুড়ো অশ্বত্থগাছের নীচে বসে জনার্দ্দন উর্ম্মিলাকে কবিতা লিখে শুনিয়েছে:

"স্পেন দেশের সাণ্টানমী ফুলের মত তুমি সুন্দর ও পবিত্র!

জ্যোৎস্নারাত্রির শীতল সাগর-উর্ম্মির মত তোমার ওষ্ঠ শীতল।

সূর্য্য-চুম্বিত সাগর-বারি উষ্ণ হয়।" ইত্যাদি।

৬

সেদিন দ্বিপ্রহরে নিদাঘ-রবি অত্যন্ত প্রখর। মিসেস চৌধুরী গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন। ড্রয়িং রুমে বসে উর্ম্মিলা সাহিত্য আলোচনা করছিল জনার্দ্দন রায়ের সঙ্গে। মালাবার পাহাড়ের এই নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর, সজ্জিত কক্ষ, আরব সাগরের খণ্ডিত রূপ—যা উন্মুক্ত গবাক্ষ থেকে দৃষ্টিগোচর হয়, এ সবই জনার্দ্দনের ভাল লাগে। আর সকলের চেয়ে ভাল লাগে এই সুরূপা, সুবেশা তরুণীর সঙ্গে মধুর আলাপ। জনার্দ্দন নব যুগের বাণী মনে মনে জপ করে…None but the brave deserves the fair!

প্রস্তাব করে, "চলুন, বেড়িয়ে আসা যাক।"

"এখন?" বিস্মিত হয়ে উর্ম্মিলা প্রশ্ন করে।

জনার্দ্দন বলে, "এক দিন না হয় নিয়মভঙ্গই হ'ল!"

চণ্ডীদাসের কবিতা, বোম্বাই শহরের সৌন্দর্য্য, নাগরিক জীবনের আদর্শ—এই সব নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে করতে মোটর শহর ছাড়িয়ে চলে যায়। উর্ম্মিলার যখন খেয়াল হয় তখন মোটরখানা শহরতলী অতিক্রম করে বহুদূরে চলে এসেছে। অনুনয়ের সুরে বলে, "এইবার ফেরা যাক, কি বলেন? না হলে অনেক দেরী হয়ে যাবে।"

জনার্দ্দন মৃদু হেসে বলে, "নিয়ম ভঙ্গ করে যে যাত্রার সুরু হ'ল, নিয়ম পালন করেই কি তার অবসান হবে! ফেরবার নিয়ম যদি হয় সন্ধ্যা, না হয় আজ হোক মধ্যরাত্রি। কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যা হবে, উর্ম্মিলা দেবী। আকাশে চন্দ্রোদয় হবে আর আপনি আছেন আমার পাশে বসে। কি পরম শুভক্ষণ এল আজ আমার জীবনে।"

উর্ম্মিলা তার এই একুশ বছর বয়সের জীবনে কোনও দিন কোনও নিয়মভঙ্গ করে নি। তার এ সব ভাল লাগে না। কিন্তু কি করে বারণ করবে বুঝতে পারে না। গাড়ী চলতে থাকে। ধীরে ধীরে সূর্য্য নীচে নামে। মৃদুমন্দ পবন বইতে সুরু হয়।

যখন এসে পড়েছে প্রায় খাণ্ডালার কাছে, জনার্দ্দন রায় উর্ম্মিলার হাত ধরে বলে, "নিওলিথিক এজ থেকে যুগে যুগে তুমিই আমার লীলাসঙ্গিনী হয়ে এসেছ! তোমার কি মনে নেই উর্ম্মিলা—কালিদাসের যুগে তোমার নাম ছিল মালবিকা? তারপরে আর এক যুগে স্পেনের দ্রাক্ষাকুঞ্জে তোমার সঙ্গে প্রণয়ালাপ, সে কি তুমি বিস্মৃত হয়েছ? যেদিন প্রথম তোমাকে দেখেছি, সেদিনই তোমাকে চিনেছি। কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে কপট শিষ্টাচারের অভিনয় আর আমাদের কত দিন চলবে উর্ম্মিলা? আমি লোনাভালায় আমার বন্ধু দেশপাণ্ডেকে লিখে দিয়েছি, সে আমাদের বিয়ের সব বন্দোবস্ত করে রাখবে। আজ রাত্রেই—"

এত দিন জনার্দ্দন রায় কেবল করেছে স্তব, আর উর্ম্মিলা ড্রয়িং-রুমে বসে শুনেছে…জনার্দ্দন ছিল পূজারী আর দেবীর আসন অধিকার করে ছিল উর্ম্মিলা। তার যে অন্ত কোনরূপ ব্যত্যয় হতে পারে সে তা স্বপ্নেও ভাবে নি। পূজা সে গ্রহণ করেছে, স্তুতিগান উপভোগ করেছে এবং নিজেরই অজ্ঞাতসারে এসকলকে মেনে নিয়েছে নিজের রূপযৌবনের প্রাপ্য অর্ঘ্য বলে। পূজারীর দিকে দৃষ্টিপাত করবার তার প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু পূজারীর কামনা যখন পূজা করেই শুধু সন্তুষ্ট রইল না, সম্পূর্ণভাবে লাভ করতে চাইল দেবীকে, তখন বিস্মিত হয়ে দেবী মনে মনে ভাবল, "কি অমার্জ্জনীয় ঔদ্ধত্য!" জনার্দ্দন রায়ের আজকের এই ব্যবহারে উর্ম্মিলার স্বপ্ন ভেঙে গেল। জনার্দ্দনের উষ্ণ হাতের স্পর্শ তার কাছে স্পর্দ্ধা বলে মনে হ'ল।

ক্রোধ দমন করে উর্ম্মিলা বললে, "আর নয়, এবার ফিরুন!"

জনার্দ্দন বলে, "সে কি করে হতে পারে?"…

পূর্ণবেগে, দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে মোটর ছুটে চলতে থাকে।

৭

অমিতাভ পড়ে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে, পুণায়। বিলাত থেকে যে একদল ক্রিকেট খেলোয়াড় এসেছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে টেষ্ট ম্যাচ খেলবার জন্য, সেদিন পুণায় তাদের খেলা শেষ হয়েছে। ভারতবর্ষীয় দল ৫০ রাণে পরাজিত হয়েছে। অমিতাভর প্রিয় খেলোয়াড় ৪ রাণ করেই আউট হয়েছে। অমিতাভর মেজাজ ভাল নেই, তাই সে খেলার শেষে তার মোটর-সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছে পুণা-বোম্বাইয়ের রাস্তা ধরে।

যখন কার্কী ছাড়িয়ে গেছে, রাস্তা পেয়েছে ফাঁকা, গতিবেগ করেছে বর্দ্ধিত, খেলার শোচনীয় পরাজয়ের কথা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়েছে। অমিতাভর মনে হচ্ছে যে, সে আজ দিগ্বিজয় করতে বেরিয়েছে, বেরিয়েছে এড্‌ভেঞ্চারের সন্ধানে। অপ্রতিহত গতিতে প্রচণ্ড বেগে চলার মাদকতায় নিজেকে মগ্ন করে সে মোটর-সাইকেল চালিয়েছে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে।

যখন লোনাভালা ছাড়িয়ে গেছে, সামনে দেখা গেল অনতিদূরে পূর্ণবেগে একখানা মোটর আসছে রাস্তার ভুল দিক দিয়ে, আর তার একটু আগেই একখানা গরুর গাড়ী। হর্ণ দেওয়া, ব্রেক্ চাপা সবই বৃথা হ'ল—ঐ এসে পড়ল—ঐ বুঝি লাগল সংঘাত! তারপরে কয়েকটি আতঙ্কময় মুহূর্ত!— অমিতাভর মনে হ'ল যে, গাড়ী দুটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে আরোহীসমেত। মোটর-সাইকেল থামিয়ে সে কয়েকটি মুহূর্ত্ত স্থাণুর মতন নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলে যে দুর্ঘটনায় ক্ষতি যা হয়েছে তা মারাত্মক নয়, গরুর গাড়ীর চালক এবং মোটরের আরোহী সকলেই অক্ষত আছে।

এক্‌সিডেণ্টের পরে মোটর থেকে যে মেয়েটি নেমে এল তার মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্রও নেই। হেসে সে বললে, "হালো অমিতাভ, তুমি ঠিক সময়েই এসে পড়েছ!"

জনার্দন রায়কে দেখিয়ে বললে, "এ ভদ্রলোকের লোনাভালায় একটু কাজ আছে, কিন্তু আমি বোম্বাই ফিরতে চাই তোমার মোটর-সাইকেলের ব্যাক্-সীটে চড়ে। তোমাকে দু' ঘণ্টা সময় দিলাম। কেমন, পারবে তো?"

অমিতাভ বলে, "আই এম্ গেম্—কিন্ত তুমি ভয় পাবে না তো?"

উর্ম্মিলা হেসে মাথা নেড়ে বলে, "নিশ্চয়ই নয়!"

অমিতাভ মোটর-সাইকেলে ষ্টার্ট দেয়, আর বিমূঢ় জনার্দনের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে উর্ম্মিলা বলে, "চিয়ারিও!"

৮

পরের দিন উর্ম্মিলা যখন ঘুম থেকে উঠল তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে যেন তার কঠিন রোগ হয়েছিল, আজ রোগমুক্তি হ'ল। মনের কোথাও কোন গ্লানি নেই। ভাবলে এ কয়দিন বৃথাই গেল। এর চেয়ে অনেক ভাল হ'ত যদি পাশের বাড়ীর সিন্ধী মেয়ে রুক্মাণি মমসুখানির সঙ্গে শাড়ি ব্লাউজ-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা যেত। রুক্মাণি কয়েক বৎসর শান্তিনিকেতনে ছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে পারে। শরৎ চন্দ্রের উপন্যাস পড়েছে। শ্রেষ্ঠ বাংলা মাসিক ও দৈনিক পত্রিকাও পড়ে।

স্নান সমাপন করে উর্ম্মিলা চলল রুক্মাণির বাড়ীতে। ডাকওয়ালা একখানা চিঠি দিয়ে গেছে—সেখানা হাতে করেই চলল।

বান্ধবীর বাড়ীতে গিয়ে চিঠি খুলে দেখে, জনার্দন রায় লিখেছে:

"কালিফোর্ণিয়ার গ্রীষ্মকালীন গোধূলির মতন,
হায়াসিন্থ ফুলের মতন,
তোমার চক্ষু নীল।
সেই নীল চক্ষু হতে সেদিনের শুভক্ষণের স্মৃতি কি
অপসারিত হ'ল?
আমরা দু'জনে না প্রতিজ্ঞা করেছিলাম
এ স্মৃতি কোনও দিন মলিন হবে না।
হায়রে প্রতিজ্ঞা!"

উর্ম্মিলা কৌতুকের সুরে রুক্মাণিকে প্রশ্ন করে, "আমার চোখ কি নীল?"

রুক্মাণি বলে, "কালো হরিণ চোখ!"

উর্ম্মিলার মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আরব সাগরের পশ্চিম সমীরণ তার চূর্ণ কুন্তল নিয়ে ক্রীড়া করে।
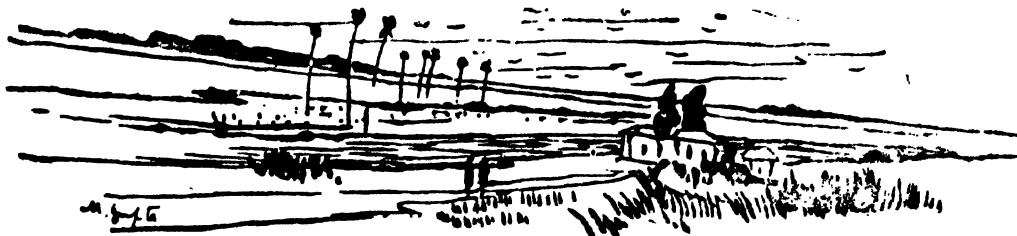
ফ্লোরেসেন্ট টিউব আলো

শ্রীপুষ্পেন্দু মুখোপাধ্যায়

মহানগরীর রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে বিভিন্ন দোকানে নানা-ভাবে সাজানো লম্বা লম্বা ফ্লোরেসেন্ট টিউবগুলো সকলেরই চোখে পড়ে। আধুনিক কালে বিজ্ঞানের যে কিরূপ অগ্রগতি হচ্ছে ফ্লোরেসেন্ট টিউব তার অন্যতম প্রমাণ। এর দৌলতে আজ প্রায় সূর্য্যালোকের মত উজ্জ্বল আলো উৎপাদন সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করবার পূর্ব্বে প্রথমেই একথাটা বলে রাখা উচিত যে, এর মূলতত্ত্ব অনেক আগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। এখানে নিয়ন আলোর বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন।

বহু দিন আগে বিজ্ঞানীরা টিউবের ভিতরে বিদ্যুৎ পুরে বিদ্যুতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গবেষণা আরম্ভ করেন। প্রথমে পরীক্ষার ফলাফল খুব আশাপ্রদ হয় নি। কারণ দেখা গেল টিউবের ভিতরকার বাতাস বিদ্যুৎকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে বাধা দিচ্ছে। তখন Giessler পাম্পের সাহায্যে টিউবের ভিতরকার বাতাস আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালালেন। তখন দেখা গেল, বাতাস কমে যাওয়ার ফলে বিদ্যুৎ—যা ইলেকট্রনের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়, এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে চলেছে। তার পর ক্রমশ: টিউবের ভিতরের বাতাস কমিয়ে কমিয়ে বিদ্যুৎ পাঠিয়ে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

বায়ুশূন্য টিউবের ভিতরে বিদ্যুৎ-প্রেরণ সম্পর্কিত গবেষণা এইখানেই শেষ হ'ল না। বিজ্ঞানীরা এর পর আরগন, নিয়ন জাতীয় বিভিন্ন প্রকারের নিষ্ক্রিয় গ্যাস ঐরূপ টিউবের ভিতরে ঢুকিয়ে বিদ্যুৎ চালনা করে গবেষণা আরম্ভ করলেন। এই পরীক্ষার ফলে দেখা গেল টিউবের ভিতরে নিয়ন গ্যাস থাকলে লাল আলো বের হতে থাকে। তাঁরা এই ধরণের দু' তিন রকম গ্যাসের মিশ্রণ করে এবং কখনো কখনো তৎসহ গ্যাসীয় পারদ টিউবে ঢুকিয়ে তাতে বিদ্যুৎ পূর্ণ করে পরীক্ষা চালালেন। বৈজ্ঞানিকেরা দেখেছিলেন যে, কেবলমাত্র গ্যাসীয় পারদ ঢুকিয়ে বিদ্যুৎ পাঠালে খুব সামান্য আলো বার হয় যা চোখে দৃশ্যমান হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে বের হতে থাকে অদৃশ্য অতিবেগুনী রশ্মি। এই পরীক্ষাই হ'ল ফ্লোরেসেন্ট আলোসৃষ্টির গোড়াকার কথা। কিন্তু তার আগে বিষয়টিকে সহজবোধ্য করবার উদ্দেশ্যে আলো সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি কথা বলে নিচ্ছি।

আলো তরঙ্গ-ধর্ম্মী, অর্থাৎ পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যেমন তরঙ্গের সৃষ্টি হয় ঠিক সেই রকম আলো হ'ল এক ধরণের তরঙ্গসমষ্টি। এই তরঙ্গের এক মাথা থেকে অপর মাথার দূরত্বকে বলা হয় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বা wave-length। আমাদের চোখ সব রকমের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সম্পন্ন রশ্মি দেখতে পায় না, পায় নির্দ্দিষ্ট কতক-গুলো তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যসম্পন্ন আলো। তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশী তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হ'ল লাল আলোর আর সব চেয়ে কম হল বেগুনী আলোর। এই বেগুনী আলোর পরই আরম্ভ হ'ল আলট্রা-ভায়োলেট বা অতিবেগুনী রশ্মি যার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আরও কম এবং তা যে আমরা দেখতে পাই না সেকথা আগেই বলেছি।

কতকগুলো রাসায়নিক পদার্থের এই অদৃশ্য অতি-বেগুনী রশ্মি শোষণ করে অধিক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যসম্পন্ন, দৃশ্য আলোর বর্ণ পরিবর্ত্তন করার ক্ষমতা আছে। বিজ্ঞানীরা এই সব পদার্থের নাম দিয়েছেন ফ্লোরেসেন্ট পদার্থ। এই রাসায়নিক পদার্থ-গুলোর মধ্যে ক্যাডমিয়াম ফসফেট্ দেয় লাল আলো, জিঙ্ক বেরিলিয়াম সিলিকেট দেয় হলদে আলো, জিঙ্ক সিলিকেট্ সবুজ আলো আর ম্যাগনেসিয়াম টাংষ্টেট নীল আলো। প্রয়োজন মত এগুলো মিশিয়ে মিশ্র আলোর টিউব তৈরী করা হয়।

এইবার দেখা যাক, এই সমস্ত পরীক্ষণের ফল কি হয়। বাতাসশূন্য ফ্লোরেসেন্ট টিউবের ভিতরে থাকে সামান্য পরিমাণ আরগন নামক নিষ্ক্রিয় গ্যাস, আর খুব অল্প পরিমাণ গ্যাসীয় পারদ আর টিউবের কাঁচের গায়ে লাগানো থাকে সাদা ফ্লোরেসেন্ট পদার্থ। এখন টিউবের ভিতর বিদ্যুৎ পাঠালে আরগনের বিদ্যমানতার জন্য একটা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ দেখা দেয়। আর তখন টিউবের ভিতর গ্যাসীয় পারদ থাকায় প্রচুর অতি-বেগুনী রশ্মি নিঃসৃত হতে থাকে এবং কাঁচের গায়ে লাগানো ফ্লোরেসেন্ট পদার্থ ঐ অতি-বেগুনী রশ্মি শোষণ করে স্নিগ্ধ দৃশ্য আলো বিকীরণ করতে আরম্ভ করে। মোটামুটি এই হ'ল ফ্লোরেসেন্ট আলোর মূল তত্ত্ব। এবার ফ্লোরেসেন্ট টিউবের বিভিন্ন যন্ত্রপাতির কাজের কথা বিশ্লেষণ করে বোঝাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

ক খ হ'ল ফ্লোরেসেন্ট টিউব। 'ক প ও খ প' হ'ল দুটো গোল ক্যাপ যা লাগানো থাকে যে-কোন একটা টিউবের দুই মুখে। এই ক্যাপ দুটোর মধ্যে থাকে পাকানো পাকানো টাংষ্টেন ধাতুর তার ("ট" ও "ঠ") যাদের সামনে থাকে দুটো গোল চ্যাপ্টা চাকতি। এই তারের গায়ে লাগানো থাকে উচ্চ-তাপরোধকারী রাসায়নিক পদার্থ। তারের ভিতর বিদ্যুৎ পাঠালে তার ভীষণ গরম হয়। তখন যাতে ঐ তার

গলে না যায় তাই ঐ ব্যবস্থা। সু হ'ল ষ্টার্টার সুইচ। এটা এমন একটা যন্ত্র যার মধ্যে দুটো বিভিন্ন ধাতুর পাত এরূপ ভাবে বসানো আছে যা গরম হলে বিভিন্ন দিকে বেঁকে যায়। এই সুইচ টিপে দিলে পাতের দুটো মুখ জোড়া লেগে যায় ফলে তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ স্বচ্ছন্দে চলতে আরম্ভ করে। কিছুক্ষণ পরে গরম হয়ে আপনা থেকেই পাত দুটো বেঁকে গিয়ে মুখের জোড়াটা খুলে যায়, ফলে বিদ্যুৎপ্রবাহ ঐ পথে রুদ্ধ হয়। চ হ'ল 'প্রতিরোধ' (resistance)। পর্য্যায়ক্রমিক (alternating) কারেন্টের বেলায় চোঙ ব্যবহার করে বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রেরণ করলে কমানো বাড়ানো যায়। অর্থাৎ এর কাজ হ'ল বিদ্যুৎপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা। প হ'ল মেনের প্লাগ বা মেন কারেন্টের (মূল প্রবাহের) সুইচ। "প" প্লাগ বা সুইচ সাধারণতঃ লাগানো থাকে মেনের সঙ্গে আর ষ্টার্টার সুইচ টিপে আলো জ্বালানো হয়।

ষ্টার্টার সুইচ "সু" টিপে ধরার সঙ্গে সঙ্গে মেন থেকে বিদ্যুৎপ্রবাহ 'প্রতিরোধের' (চ) ভিতর দিয়ে গিয়ে ঢু' দিকের ক্যাপের ভিতরের টাংষ্টেন তারকে গরম করতে আরম্ভ করল। কিছুক্ষণ গরম হবার পর ও "ট ও ঠ" তার থেকে ইলেকট্রন বার হতে আরম্ভ হবে। এই ইলেকট্রন তখন পারদ-পরমাণুকে আঘাত করে ভেঙে পরমাণুর ইলেকট্রনকে বেগে বার করে দেবে, ফলে সেই পরমাণু ইলেকট্রনের অভাবে নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ধনাত্মক ধর্ম্মী আয়নে পরিবর্ত্তিত হবে। এই ভাবে পাকানো তারের ইলেকট্রনের আঘাতে ইলেকট্রনে ও ধনাত্মক বা positive পারদ আয়নে বহু পরমাণু ভেঙে যাবে। তখন পারদের এই ধনাত্মক আয়ন বা পজিটিভ আয়ন পাকানো নেগেটিভ তারের সামনে যে চাকতি আছে সেটির দিকে ছুটে যাবে। আর ওদিকে হাল্কা ইলেকট্রনও ধাবিত হবে পজিটিভ চাকতির দিকে। এই ভাবে বহু ইলেকট্রনের আঘাতে অসংখ্য পারদ-পরমাণু ভেঙে যাবে এবং ক্রমে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হবে যখন ঢু' দিকের চাকতি দুটোর মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন স্রোত, যাকে বলে discharge—দেখা দেবে। এই অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের মূলে আছে টিউবস্থিত সামান্য পরিমাণ আরগন নামক নিষ্ক্রিয় গ্যাস।

যন্ত্রের এমন ব্যবস্থা আছে যে, ঠিক এই সময়, অর্থাৎ ডিসচার্জ্জ দেওয়ার কালে সুইচের ভিতরের পাত দুটো গরম হয়ে ফাঁক হয়ে যাবে, ফলে সুইচের ভিতর দিয়ে আর বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত হবে না। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কেন এ রকম ব্যবস্থা করা হয়। সংক্ষেপে এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করছি। এটা বোঝা যাচ্ছে যে, বিদ্যুৎপ্রবাহ—যাকে বলা হয় কারেন্ট, এসে পাকানো তার গরম করে ইলেকট্রনকে বার করে দিচ্ছে। সুতরাং ফ্লোরেসেন্ট আলোসৃষ্টির মূলে আছে ঐ পাকানো তার গরম করার ব্যাপার। দেখা গেছে, টিউবের মধ্যে ডিসচার্জ্জ একবার আরম্ভ হয়ে গেলে ঐ ডিসচার্জ্জই নিজের উত্তাপে তারকে গরম করে ইলেকট্রন বিকীর্ণ করতে সাহায্য করে। সুতরাং বাইরে সুইচের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ না গেলে ক্ষতি ত নেই-ই
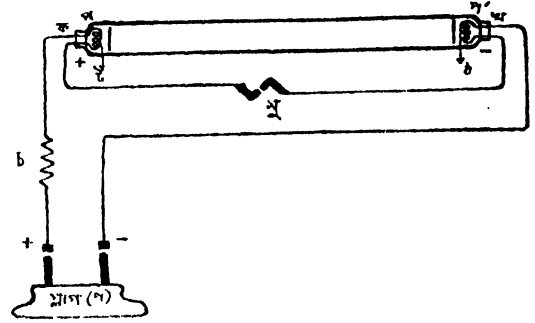
বরং লাভ আছে। কারণ ডিসচার্জ্জ-এর ফলে উত্তরোত্তর টিউবে ইলেকট্রনের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। সুতরাং বাইরে থেকে সুইচের ভিতর দিয়ে আগমনশীল আরও বিদ্যুৎপ্রবাহ অধিকতর ইলেকট্রন ছাড়তে সাহায্য করবে, ফলে হয় ত টিউবটা ফেটে যেতে পারে কিংবা টিউবের পাকানো তারও নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তাই ঐ ব্যবস্থা। এতেও বিজ্ঞানীরা টিউবের বিদারণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। তাঁরা তাই আরও একটা জিনিষ ব্যবহার করলেন যার নাম হ'ল 'প্রতিরোধ'। এই 'প্রতিরোধে'র কি কাজ তা মোটামুটি আগেই বলা হয়েছে। যে লোহায় চুম্বক তৈরি করা হয় 'প্রতিরোধ' সেই লোহার তৈরি এমন একটা চোঙ, যার গায়ে তার জড়ানো থাকে, আর এমনই এটির গঠনকৌশল যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ কোন রকমেই টিউবে প্রবেশ করতে পারে না। এর ভিতর দিয়ে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত হয়ে টিউবের ক্যাপের তার গরম করে।

এতক্ষণে আমরা বুঝতে পারলাম, কি ভাবে ইলেকট্রনের আঘাতে পারদ-পরমাণু ভেঙে যায় আর সেই সঙ্গে কেমন করে টিউবের ভিতরে সামান্য দৃশ্য আলোর সঙ্গে প্রচুর অদৃশ্য অতি-বেগুনী রশ্মি বার হতে থাকে। এই অদৃশ্য আলোই টিউবের গায়ে লাগানো ফ্লোরেসেন্ট পদার্থকে শোষণ করে নয়নপরিতৃপ্তিকর স্নিগ্ধ দৃশ্যমান আলো বিকীর্ণ করতে থাকে।

এই আলোর খরচ কম পড়ে কেন এবার সে বিষয় আলোচনা করব। আমরা যে বৈদ্যুতিক আলো দিয়ে কাজ চালাই তাকে বলে incandescent lamp। বিদ্যুৎপ্রবাহ বালবের পাকানো সরু তারের ভিতর দিয়ে যাবার সময় প্রচণ্ড বাধা পায় বলেই এই নাম। ফলে ঐ তারটা দারুণ গরম হয়ে সাদা আলো ছড়াতে আরম্ভ করে। এই সঙ্গে উত্তাপও

বিকীরণ করে, কিন্তু আমরা দেখতে পাই না, অনুভব করি মাত্র। এতে শতকরা পঁচাশি ভাগ বিদ্যুৎ শুধু উত্তাপ বিচ্ছুরণ করেই নষ্ট হয়। কিন্তু ফ্লোরেসেন্ট টিউবে তা হয় না। এতে যা পাওয়া যায় তার বেশীর ভাগই আলো, তাপের পরিমাণ খুব কম। তাপের জন্তে বিদ্যুতের অপচয় হয় না বলেই এতে খরচ কম হয়। আসল খরচ যা সে হ'ল বালবের বেলায়। মেনের বিদ্যুৎ এসে ক্যাপের তার গরম করলে তারের ইলেকট্রন প্রচণ্ড বেগে বার হতে আরম্ভ হয় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই টিউবের ভিতরে পারদ-পরমাণু ভাঙার দরুন আরও একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি হয়, যাকে বলে আয়ন কারেণ্ট। উত্তরোত্তর ইলেকট্রন বৃদ্ধির ফলে এই আয়ন কারেণ্টের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। সেইজন্ত ষ্টার্টার সুইচ বন্ধ হয়ে গেলে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বা কারেণ্টের পরিমাণ বেশ কিছু পরিমাণ কমে যাবে। কারণ তখন বিদ্যুৎপ্রবাহ আর সুইচের ভিতর দিয়ে যেতে পারবে না। ব্যাপার হ'ল এই যে, মেন কারেণ্ট অর্থাৎ যে কারেণ্ট মেন থেকে আসছে সেটা তখন আর সুইচের ভিতর দিয়ে যেতে পারে না। তখন টিউবের মধ্যে থাকে পারদ আয়ন সৃষ্টি হওয়ার ফলে আয়ন কারেণ্ট। এই আয়ন কারেণ্টের পরিমাণ সমস্ত কারেণ্টের তুলনায় অনেক কম। কারণ ষ্টার্টার সুইচ লাগানো থাকলে সুইচ যে লাইনে সংশ্লিষ্ট তাতেও কারেণ্ট প্রবাহিত হ'ত। কিন্তু ষ্টার্টার সুইচের অভাবে সেই কারেণ্ট আর সুইচের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হতে পারছে না। কেন না এতে অল্প কারেণ্ট খরচ হওয়ায় অর্থব্যয়ও কম হয়। সামান্ত আরো খানিকটা বিদ্যুৎ প্রবাহ খরচ হয় সুইচ বন্ধ হবার পর ঐ ডিসচার্জ চালু রাখতে। বেশী বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় মেন থেকে, আর ঐ সামান্ত বিদ্যুৎপ্রবাহকে চালিত করতে যা লাগে তা হ'ল voltage (ভোল্টেজ) যাকে বাংলায় বলা যেতে পারে বিদ্যুৎ-চাপ। কারণ এই বিদ্যুৎ চাপই বিদ্যুৎপ্রবাহকে (যা ইলেকট্রনের স্রোত ছাড়া কিছুই নয়) ঠেলে নিয়ে যায় এক প্রান্ত থেকে অন্ত প্রান্তে। একটা নলের ভিতর দিয়ে তোড়ে জল যাওয়ার সঙ্গে বিদ্যুতের চালিত হওয়া ব্যাপারটির তুলনা করলে বলা যায়, জলকণা হ'ল যেন ইলেকট্রন, তোড়টা হ'ল বিদ্যুৎ চাপ বা ভোল্টেজ।

রাস্তায় যেতে যেতে লক্ষ্য করলে দেখা যায়—যে সব জায়গায় ডাইরেক্ট কারেন্ট ব্যবহার করা হয় সে সব জায়গায় টিউবের এক দিকটা তেমন ভাল আলো দিচ্ছে না। তার কারণ হ'ল ডাইরেক্ট কারেণ্টের বেলায় টিউবে একটা দিক থাকে সব সময় পজিটিভ আর একটা দিক সব সময় নেগেটিভ। পারদের পজিটিভ আয়নের জন্তেই অতি-বেগুনী-রশ্মি নির্গত হয় এটা আমরা আগে বলেছি। টিউবের পারদ-পরমাণু ভেঙে গিয়ে যে সব পারদের পজিটিভ আয়ন বেরোয় সেগুলো পজিটিভ বলে টিউবের নেগেটিভ চাকতির দিকে ছুটে যায়, ফলে টিউবের পজিটিভ চাকতির দিকে পারদ-পরমাণু না থাকায় অতি-বেগুনী রশ্মির অভাব হওয়াতে সে দিকটায় মোটেই আলো হয় না। কিন্তু A. C.র বেলায় টিউবের প্রত্যেক দিকই প্রতি মুহূর্তে একবার পজিটিভ এবং একবার নেগেটিভ হচ্ছে আর সেই জন্তে পারদ-পরমাণু ক্রমাগত দু'দিকে ছুটাছুটি করছে। এই কারণে A. C.তে টিউবে দু'দিকেই উত্তম আলো হয়। এখন D. C.র বেলায় যদি মাঝে মাঝে টিউবটা ঘুরিয়ে উল্টে দেওয়া হয় তা হলে সাময়িক ভাবে দু'দিকে সমান আলো দেবে। কিন্তু এরূপ না করে যদি দু'তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর টিউবে 'প' প্লাগটা ঘুরিয়ে ফের বসিয়ে দেওয়া হয় তা হলেই সব চেয়ে বেশী সুবিধা হবে। মোটামুটি এই হ'ল ফ্লোরেসেন্ট টিউবের কথা। এ ছাড়া এতে যান্ত্রিক আরও এমন অনেক জটিলতা আছে যা সাধারণ পাঠকের না জানলেও ক্ষতি নেই।

যাই হোক, আজকাল নানা রকমের রাসায়নিক পদার্থ এবং অনেক সময় বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ মিশিয়ে টিউবে ঢুকিয়ে হরেক রকম আলোর টিউব তৈরি করা হচ্ছে। চল্লিশ ওয়াটের একটি বিজলী বাতি জ্বালাতে যা খরচ সেই খরচে প্রায় আশী ওয়াটের একটা ফ্লোরেসেন্ট টিউব আলো জ্বালানো যেতে পারে। তা ছাড়া এতে বালবের মত গাঢ় ছায়াপাত হয় না। তার কারণ, আলোর উৎস সারা টিউব জুড়ে ছড়িয়ে আছে। এই জন্তে ফ্লোরেসেন্ট আলো বড় বড় কলকারখানায় ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ কারখানায় মেশিনের কাছে ছায়া হলে বিপদের আশঙ্কা খুব বেশী।

"জাতীয় গ্রন্থাগারে"র পঁচিশ বৎসর

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

"জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্মকথা" শীর্ষক প্রবন্ধে কলিকাতা পাব্‌লিক লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা এবং প্রথম কয়েক বৎসরের কর্ম্ম-প্রচেষ্টার কথা বিবৃত করিয়াছি। তখন কলিকাতায় তথা ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষে আধুনিক ধরণের বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে গ্রন্থাগার পরিচালনার ব্যবস্থা এখানেই আরম্ভ হয়, যদিচ বোম্বাই ও মাদ্রাজে সাহিত্যালোচনার জন্য বিভিন্ন আয়োজন ইহার পূর্ব্ব হইতেই ছিল। ১৮৩৯ সনের প্রথমে সার চার্লস থিওফিলাস মেট্‌কাফ জামাইকার গবর্ণর পদে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যান। তাঁহার ভারতত্যাগের পূর্ব্বে ১৮৩৮ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁহাকে কলিকাতায় "Free Press Dinner"-এ আপ্যায়িত করা হয়। এই সময় হইতেই তাঁহার স্মৃতিকে স্থায়ী রূপ দিবার জন্য যে প্রচেষ্টা সুরু হয় তাহারই পরিণতি হইল 'মেট্‌কাফ হল' প্রতিষ্ঠায়। এই গৃহের খুঁটিনাটি কিছু কিছু কাজ বাকী থাকিলেও ১৮৪৪ সনের জুলাই মাসে কলিকাতা পাব্‌লিক লাইব্রেরি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সাময়িক আবাস হইতে ইহার দ্বিতলে চলিয়া আসে, নীচের তলায় স্থান হয় কৃষি-সমাজের।

'মেট্‌কাফ হল' নির্ম্মাণে কলিকাতা পাব্‌লিক লাইব্রেরি প্রদত্ত অর্থ সম্বন্ধে পূর্ব্বে দুইটি মতের উল্লেখ করিয়াছিলাম। এই ভবন নির্ম্মাণে মোট ব্যয় হয় ৬৮,০০০ টাকা। লাইব্রেরির পক্ষে ইহার এক-চতুর্থাংশ দিবার কথা ছিল। ইহার কর্তৃপক্ষ সর্ব্বসাকুল্যে ১৬,৩৯৮-০-৮ পাই দিয়াছিলেন। এই পরিমাণ টাকা সংগ্রহ সম্পর্কেও একটু ইতিহাস আছে। 'মেট্‌কাফ হল' নির্ম্মাণের আনুমানিক ব্যয় চল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে অংশমত লাইব্রেরির দশ হাজার টাকা দিবার প্রথম কথা হয়। তখন কিন্তু ইহার তহবিলে মাত্র চারি হাজার টাকা গচ্ছিত ছিল। নির্ম্মাণকার্য্য অগ্রসর হইলে গ্রন্থাগারের অন্যতম কিউরেটর বা অধ্যক্ষ ডবলিউ. পি. গ্রাণ্ট ১৮৪৩ সনের ২৩শে মার্চ্চ বিনা সুদে এবং বিনা জামিনে গ্রন্থাগারকে পাঁচ হাজার টাকা ধার দেন। গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ ১৮৪৪, ১২ই আগষ্ট ইহার চারি হাজার টাকা শোধ করিতে সমর্থ হন।

কিন্তু 'মেট্‌কাফ হল' নির্ম্মাণ শেষ হইলে দেখা গেল, ইহার ব্যয় আগেকার বরাদ্দ হইতে অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। তখন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স পীল গ্রন্থাগারের পক্ষে চারি হাজার টাকা অর্পণ করায় ইহার অংশ পুরাপুরি প্রদত্ত হইল। গ্রাণ্টের যে এক হাজার টাকা পরিশোধ হইতে বাকী ছিল তাহা তিনি বিতলের রেলিঙের জন্য গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষকে ১৮৪৬, ১৬ই নবেম্বর দান করিলেন। গ্রন্থাগারের গচ্ছিত তহবিল ১৮৪৬-৪৭ সনে সাড়ে চারি হাজার টাকা মাত্র ছিল। স্যার লরেন্স পীলের ১৮৪৫ সনের প্রস্তাব অনুযায়ী অংশীদারদের নিকট হইতে নূতন চাঁদা তুলিবার ব্যবস্থা হয়। ইহার ফলে ১৮৪৮ সন নাগাদ গচ্ছিত তহবিল বাড়িয়া দাঁড়ায় ৮,৯২০ টাকা। বিভিন্ন দাতার দানে ও অংশীদারদের সময়োচিত আনুকূল্যে গ্রন্থাগার আর্থিক দায়মুক্ত হইয়া সচ্ছলতা লাভ করিল। ইহার বার্ষিক আয়ও ক্রমশ: বাড়িয়া চলিল।

এই সকল সাফল্যের মূলে একজন বঙ্গ-সন্তানের অক্লান্ত পরিশ্রম লক্ষ্য করি। তাঁহার গুণপনা ও কার্য্যকলাপের বিষয় গ্রন্থাগারের বার্ষিক বিবরণ সমূহে প্রায় প্রতিবারই উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি হইলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। প্রতিষ্ঠাবধি সহকারী পদে নিযুক্ত থাকিলেও ১৮৩৯ হইতে ১৮৪১ সন পর্য্যন্ত তাঁহাকে গ্রন্থাগারিক রূপে কার্য্য করিতে দেখি। ইহার পরও দুই-এক বৎসর তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। পরে ষ্টাসি পুনরায় লাইব্রেরিয়ান হইয়া আসিয়া থাকিবেন। ১৮৪৭ সনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কয়েক বৎসর গ্রন্থাগারের বার্ষিক বিবরণ পাই নাই। তবে গ্রন্থাগারিক পদে স্থায়ী ভাবে নিয়োগের জন্য ১৯শে জানুয়ারী ১৮৪৮ তারিখে লিখিত 'কিউরেটর' বা অধ্যক্ষদের পক্ষে আর. ওয়াকারের যে পত্র পাওয়া যাইতেছে তাহা হইতে জানা যায়, প্যারীচাঁদ এই সময় সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার গুণপনায় মুগ্ধ হইয়া গ্রন্থাগারের কর্ম্মকর্ত্তারা এই বৎসরই তাঁহাকে স্থায়ী গ্রন্থাগারিক পদ প্রদান করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, গ্রন্থাগারিক রদ-বদলের কথা ১৮৪৭-৪৮ সনের বার্ষিক বিবরণে আদৌ উল্লিখিত হয় নাই। এই বিবরণ উপস্থাপিত হইবার তারিখ '১৭ই মার্চ্চ ১৮৪৮'। পরবর্ত্তী অন্যান্য বিবরণের মত ইহাতে 'কিউরেটর'দের স্বাক্ষর নাই, লেখা আছে "(By order) / Peary Chand Mittra / Librarian, Calcutta Public Library।" উক্ত বিবরণে প্যারীচাঁদ সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে:

> "Baboo Peary Chand Mittra himself has performed his duties the past year with the same care, vigilance and ability, which he has ever exhibited since his attachment to the Institution."

অর্থাৎ, প্যারীচাঁদ মিত্র গত বৎসর সেইরূপ যত্ন, সতর্কতা এবং যোগ্যতার সহিত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছেন, যেমন তিনি স্থাপনাবধি প্রতিষ্ঠানটির জন্য করিয়া আসিতেছেন।

২

কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসর

পর হইতেই বুঝা যাইতে লাগিল, ইহা একটি সত্যকার 'জাতীয়' প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিবে। গ্রন্থাগার গ্রন্থের আগার তো নিশ্চয়ই, ইহা দেশী-বিদেশী জ্ঞানভাণ্ডারের সুষ্ঠু সমাবেশস্থলও বটে। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি এইরূপ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই গঠিত হইয়াছিল। আর এই উদ্দেশ্যে ইহার কার্য্যাদিও নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল। দেশী-বিদেশী কৃতী ব্যক্তিদের উৎসাহ, চিন্তা এবং প্রয়াসও ইহার মূলে কম রসদ জোগায় নাই।

গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন অংশীদার ও চাঁদাদাতাগণ। তাঁহাদের পক্ষে তিন জন কিউরেটর বাৎসরিক অথবা বিশেষ সাধারণ সভায় নিয়োজিত হইয়া ইহার কার্য্য পরিচালনা করিতেন। দৈনন্দিন কর্ম্ম চালাইবার জন্য লাইব্রেরিয়ান বা গ্রন্থাগারিকের অধীনে কয়েকজন বেতনভোগী কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বড়লাটকে ইহার 'পেট্রন' বা বান্ধব করিয়া লইবার রীতি দৃষ্ট হয়। তিনিও কিন্তু নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিয়া লাইব্রেরির প্রোপ্রাইটর বা অংশীদার হইতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পুস্তক ক্রয় ও সংগ্রহ, পুস্তকতালিকা প্রকাশ, পুস্তক আদান-প্রদানের নিয়মাদি রচনা, চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা, আয়-ব্যয়ের সমতা বিধান, গচ্ছিত তহবিল বর্দ্ধন, গৃহসংস্কার, সময়োপযোগী নিয়মাদি পরিবর্ত্তন প্রভৃতি নানা বিষয়েই গ্রন্থাগার-কর্ত্তৃপক্ষ মনোযোগী হইলেন। আর একটি বিষয়েও কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ তৎপর হন এবং তাহার ফল সুদূরপ্রসারী হয়। তাহা হইতেছে—সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানাদি-সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে গবর্ণমেণ্টকে অনুপ্রেরণা দান। এই সকল বিষয়ই আমরা পর পর জানিতে পারিব।

এখানে আর একটি বিষয় বলা দরকার মনে করি। বিভিন্ন ধরণের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাস আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশেরই অঙ্গ। মনীষী রাজনারায়ণ বসু প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বেই এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এই সকল প্রতিষ্ঠানের পূর্ব্বাপর ইতিহাসের খসড়া রচনা করিতে হইলে উহাদের বার্ষিক রিপোর্ট বা বিবরণগুলি একান্ত আবশ্যক। এই সমুদয় বিবরণের মধ্যে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের উন্নতি বা অবনতির সূত্রও গ্রথিত রহিয়াছে। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি বা আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারের ইতিহাস-রচনায়ও ইহার বার্ষিক বিবরণ-গুলি বিশেষ কার্য্যকরী।

৩

গ্রন্থাগারিক পদে প্যারীচাঁদ মিত্রের নিয়োগ-বৎসর ১৮৪৮ সন হইতে আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারটির দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ হয়। এই বৎসর ভারতে নবাগত বড়লাট লর্ড ড্যালহৌসী ইহার প্রোপ্রাইটর (অংশীদার) এবং 'পেট্রন' বা বান্ধব হইলেন। ডেপুটি গবর্ণর সার জন হাণ্টার লিটলারও একজন বান্ধব ও অংশীদার হন। ডবলিউ. পি. গ্রাণ্ট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৩৫ সনের ৩১শে অক্টোবর হইতে ১৮৪৮ সনের ২৩শে আগষ্ট পর্য্যন্ত তিনি একাদিক্রমে তের বৎসর কাল গ্রন্থাগারের কিউরেটর বা অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বিলাত যাত্রা করায় ২৪শে আগষ্ট তারিখে তাঁহার স্থলে বড়লাটের ব্যবহার-সচিব জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারী হইতে পরবর্ত্তী জানুয়ারী পর্য্যন্ত সময়ের কার্য্যকলাপ বার্ষিক বিবরণে লিপিবদ্ধ হইত। ১৮৪৮-৪৯ সনের বিবরণে দেখি, বেথুন ছাড়া গ্রন্থাগারের আর দুই জন অধ্যক্ষ ছিলেন—যথাক্রমে জি. টি. মার্শাল এবং ডবলিউ. উইলিস। একটি নিয়ম ছিল—কোন অংশীদারের মৃত্যুর বা ভারতবর্ষ-ত্যাগের পাঁচ বৎসরের মধ্যে কোন ওয়ারিশান না পাওয়া গেলে এই সময় অন্তে তাঁহার অংশ গ্রন্থাগারের সম্পত্তি হইবে। এইরূপ নিয়মে ১৮৪৮-৪৯ সনে লাইব্রেরির নিজস্ব অংশ এবং অংশীদারদের অংশ সর্ব্বসমেত ছিল ৮৬টি।

এ বৎসর বিভিন্ন দিকেই গ্রন্থাগারটির উন্নতি সূচিত হয়। নিয়মাবলী রদবদলের প্রস্তাব সমূহ রচিত ও আলোচিত হইয়া পরবর্ত্তী বার্ষিক সভায় গৃহীত হইল। প্রধানতঃ আয়-বৃদ্ধি এবং পাঠকদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ইহা করা হয়। অংশীদারদের প্রত্যেকের দেয় টাকার পরিমাণ চারি শত হইতে পাঁচ শত টাকায় বাড়িয়া গেল। কোন চাঁদা-দাতা এই পরিমাণ অর্থ চাঁদা হিসাবে পুরাইয়া দিলে তাঁহাকেও অংশীদার করিয়া লইবার রীতি ছিল, তবে তাঁহাকে প্রথম চাঁদা দানের তারিখ হইতে শতকরা পাঁচ টাকা হারে উক্ত টাকার উপরে সুদ দিতে হইত। চাঁদাদাতারা তিন শ্রেণীর পরিবর্ত্তে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন এবং তাঁহাদের মাসিক চাঁদা ধার্য্য হইল এইরূপ: প্রথম শ্রেণী—৮৲, ২য় শ্রেণী—৪৲, ৩য় শ্রেণী—২৲ এবং ৪র্থ শ্রেণী—১৲ টাকা। অংশীদার ও চাঁদাদাতা শ্রেণী হিসাবে নিম্নরূপ পুস্তকাদি পাইতেন:

		নূতন গ্রন্থ	পুরাতন গ্রন্থ	সাময়িক পত্র
অংশীদার ও	১ম শ্রেণী	১ গ্রন্থ	৪ গ্রন্থ	১
	২য় শ্রেণী	১ ,,	৩ ,,	১
	৩য় শ্রেণী	০ ,,	২ ,,	০
	৪র্থ শ্রেণী	০ ,,	১ ,,	০

কি ধরণের পুস্তক কত দিন রাখা যাইবে তাহাও ঠিক করিয়া দেওয়া হইল। সাময়িক পত্র এবং উপন্যাসাদি অপেক্ষা-কৃত অল্প সময়ের মধ্যে ফিরাইয়া দেওয়ার কথা হয়। বিজ্ঞান এবং মনন-সাহিত্যমূলক পুস্তকাদি পনর দিন হইতে পঁয়তাল্লিশ দিন পর্য্যন্ত রাখা চলিত।

গ্রন্থাদি সত্বর আদান-প্রদান, অপচয়-নিবারণ প্রভৃতির জন্য সুষ্ঠুভাবে সাজাইয়া রাখিবারও ব্যবস্থা হইল। বেথুনের

প্রস্তাবে প্রত্যেকখানি পুস্তকের উপরে স্থান-নির্দেশক নম্বর বসাইবার ব্যবস্থা হয়। যেমন, একখানি বইয়ের নম্বর ১৪ গ ২৭। ইহার অর্থ—১৪ নং আলমারীর গ সংখ্যক তাকে ২৭ নং পুস্তক পুস্তক চাহিবার চিরকুটেও এইরূপ ঘর কাটিয়া লেখার ব্যবস্থা হয়: তারিখ—প্রেস মার্ক—গ্রন্থের নাম—স্বাক্ষর। ব্রিটিশ মিউজিয়মে পুস্তক সাজাইবার নিয়মই বেথুনের প্রস্তাব-ক্রমে গ্রন্থাগারিক এতদ্বারা অনুসরণ করেন। পুস্তক আদান-প্রদান নির্দেশক একখানি বহিও চারি আনা দিয়া প্রত্যেককে ক্রয় করিতে হইত। গ্রন্থাদি কলিকাতা, চব্বিশ পরগণা, চুঁচুড়া ও হুগলী পর্য্যন্ত সভ্যদের নিকট পাঠাইবার রীতি ছিল।

গ্রন্থাগার প্রত্যহ খোলা ও বন্ধ হওয়ার সময়, ছুটির দিন ইত্যাদিরও কিছু পরিবর্ত্তন হইল। লাইব্রেরির পাঠাগার (News Rooms) সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খোলা থাকিত। আসল কার্য্য, অর্থাৎ পুস্তক আদান-প্রদান চলিত সকাল ৯টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। ছুটির দিন ধার্য্য হইল এইরূপ: রবিবার, বড়দিন, গুডফ্রাইডে, ১লা জানুয়ারী ও রাণীর জন্মদিনের ছুটি বাদে হিন্দু পর্ব্বে—দুর্গাপূজায় ৮ দিন ও সরস্বতীপূজায় ১ দিন।

কলিকাতার এই গ্রন্থাগারটিকে দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তকাদির একটি সত্যকার আগার করিয়া তোলাই এদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৪৮ সনের ১৭ই অক্টোবর সত্যচরণ ঘোষাল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রামগোপাল ঘোষ এবং প্যারীচাঁদ মিত্র গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষদের নিকট একখানি পত্র লেখেন। ইহাতে তাঁহারা গ্রেট ব্রিটেনের বিভিন্ন পণ্ডিত-সভার এবং সম্ভব হইলে তাঁহাদের মারফত ইউরোপের অন্যান্য দেশ ও আমেরিকারও সভাসমূহের প্রকাশিত কার্য্যবিবরণ, জর্ন্যাল এবং গবেষণা-পুস্তকাদি পাঠাইবার জন্য পত্র লিখিতে অনুরোধ জানান। এই পত্রে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও ইতিহাস সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা পাঠে জানা যায়, তখন গ্রন্থাগারে কুড়ি হাজার বই আমানত ছিল। অংশীদার, চাঁদাদাতা বাদে ছাত্র ও আগন্তুক সকলের নিকটই ইহার দ্বার উন্মুক্ত এবং যে-কেহ এখানে বসিয়া যে-কোন পুস্তক পাঠে অধিকারী। পত্রখানির এক স্থানে তাঁহারা লেখেন:

"One of the great objects of the formation of this Institution is the dissemination of European literature and science in this country. As the promotion of the real interests of India, and we may add the happiness of the inhabitants, mainly depend upon the successful prosecution of those efforts which have been made for some years past to foster a taste for elegant literature and sound knowledge of the West, it may be considered a duty incumbent on every Englishman, whatever may be his station, to assist in furthering this object."

পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে যথার্থ পরিচয় ঘটিলে স্বদেশের সুখ-সমৃদ্ধি বাড়িয়া যাইবে, ঐ যুগের নেতৃবৃন্দের মনে

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এইরূপ দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল। তখনকার সরকারী কলেজ-সমূহেও এক একটি করিয়া গ্রন্থাগার ছিল। গ্রন্থাগারের পঠিত পুস্তকাবলীর উপরে ছাত্রদের পরীক্ষা গৃহীত হইত। উৎকৃষ্ট ছাত্রদের যথারীতি সুবর্ণপদক দেওয়ারও সরকার হইতে ব্যবস্থা ছিল। উক্ত পত্রখানি অধ্যক্ষগণ ১৮৪৮, ৮ই ডিসেম্বর নিজ মন্তব্যসহ যথাস্থানে প্রেরণ করেন। ইহাতে যে ফল হইয়াছিল একটু পরেই আমরা তাহা বুঝিতে পারিব।

৪

নূতন ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের কার্য্য উত্তমরূপে চলিতে লাগিল। ১৮৪৯ সনের কার্য্যবিবরণের সময় ফেব্রুয়ারী হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত। ইহার পর, জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্তই গ্রন্থাগারের বৎসর গণনা হইত। এই সনে রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নূতন অংশীদার হইলেন। অংশীদার-সংখ্যা হইল ৮৭। অধ্যক্ষ-সভা ও গ্রন্থাগারিক পূর্ব্ববৎই রহিলেন। তবে এবার লাইব্রেরিয়ানকে সেক্রেটারী এবং কলেক্টর বা চাঁদা-আদায়কারীর কার্য্যও করিতে হয়। ইহার পর হইতে তাঁহার পদের নাম হয় "Secretary and Librarian"—সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক। দুইটি নূতন কমিটি গঠিত হইল—পুস্তক-নির্ব্বাচন কমিটি এবং গৃহ-কমিটি। প্রথমোক্ত কমিটি প্রতি বৎসর বিজ্ঞ ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হইত। এই কমিটির কার্য্য গ্রন্থাগারের পক্ষে যে খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ ছিল ইহার নাম হইতেই তাহা বুঝা যায়। গ্রন্থাগারে যে-

সব লোক আসিতেন তাঁহাদের হিসাব রাখিবার জন্ত ১৮৪৯, ১৭ই আগষ্ট একখানি "Visitors' Book" খোলা হইল। গ্রন্থাগারে বসিয়া যাঁহারা পুস্তক ও পত্রিকা পড়িতেন তাঁহাদের নাম ইহাতে লেখা হইত। এ বৎসর, ১৮৪৯ সনের ৪ঠা জানুয়ারী অধ্যক্ষ-সভা গবর্ণমেণ্টের নিকট এই মর্ম্মে একখানি পত্র লেখেন যে, তাঁহারা কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরিকে "Charter of Incorporation" অনুযায়ী একটি বিধিসম্মত প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য করাইতে চান। এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত আন্দোলনের ইহাই সূচনা।

১৮৫০ সনেও 'কিউরেটর' বা অধ্যক্ষ-সভা পূর্ব্ববৎ ছিলেন। এবারকার অংশীদার সংখ্যাও ৮৭। নূতন অংশীদের মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষ এবং রাধানাথ শিকদারের নাম পাইতেছি। রাধানাথ গ্রন্থাগারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়া পড়িলেন। পাঠকদের পক্ষ হইতে এবারে অভিযোগ আসে যে, এখানে গল্প উপন্যাস পুস্তকের বড়ই অভাব। ইহার উত্তরে দেখানো হয়, সাধারণ সাহিত্যের তুলনায় গল্প উপন্যাস দ্বিগুণ বাহিরে যায়। তবে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হয় যে, এটি এমন একটি গ্রন্থাগার যেখানে বসিয়া গবেষণার সহায়ক মূল গ্রন্থাবলী পাঠ করা যায়, আবার বাহিরেও পাঠের জন্য গ্রন্থাদি দেওয়া হয়। ("A general Library, combining the advantages of a Library of Reference and resort with those of a Circulating Library.")

গ্রন্থাগারের পক্ষে প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক ও অন্যান্য গ্রন্থকারের রচনা এবং প্রামাণ্য পুস্তকাদি প্রেরণের জন্য বিলাতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পুস্তক-বিক্রেতা কোম্পানীর উপর ভার দেওয়া হইত। ১৮৫০ সনে ভার ছিল টেলর ওয়াণ্টন এণ্ড মেবারলি কোম্পানীর উপর। গ্রন্থাগারিক প্যারীচাঁদ ৩০শে যে তারিখে যে পত্র লেখেন তাহাতে আছে :

"The Committee trust you will kindly continue to keep an eye on historical and biographical works, as well as other publications of special interest, with the view of sending books, in consultation with Professor Malden."

অধ্যাপক ম্যালডেন ক্রেতব্য পুস্তকগুলি দেখিয়া শুনিয়া দিতেন। গ্রন্থাগারটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইলে শুধু বিদেশী ভাষায় রচিত পুস্তক রাখিলেই চলিবে না, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার পুস্তকাদিও এখানে সংগ্রহ করা প্রয়োজন। ১৮৫০ সনেই গুজরাটী, মরাঠী, পালী, পঞ্জাবী ভাষার বিস্তর পুস্তক সংগৃহীত হইল। তামিল ও তেলুগু পুস্তকের জন্ত মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট কর্তৃপক্ষ আবেদন করিলেন। জগতের বড় বড় গ্রন্থাগারগুলি দানের দ্বারাই পুষ্ট। ব্রিটিশ মিউজিয়ম সরকারী অর্থে পরিচালিত হইলেও, ইহার প্রধানতম অংশ দানে পাওয়া। সুতরাং গ্রন্থাগারের পক্ষে অধ্যক্ষগণ নানা স্থানে আবেদন-পত্র প্রেরণ করিতে দ্বিধা করিলেন না। বাংলা-সরকারের মারফত বিলাতে কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্সের নিকটেও আবেদন করা হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরির পুস্তক তালিকা, কোর্ট কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক, পুস্তিকা, রিপোর্ট সকলই পাওয়া আবশ্যক, আবেদনে এইরূপ লিখিত হয়। কোর্ট তাঁহাদের আবেদন মঞ্জুর করিলেন। মঞ্জুরির নিদর্শন-স্বরূপ অন্যান্য পুস্তক-পুস্তিকার সঙ্গে সন্ত প্রকাশিত ম্যাক্স্-মূলারের ঋগ্‌বেদও তাঁহারা পাঠাইয়া দেন।

বিভিন্ন পণ্ডিত-সভার নিকট ১৮৪৮ সনে গ্রন্থাগারের পক্ষে যে পত্র প্রেরিত হইয়াছিল তাহাতে কাজ হইল। গ্রেট ব্রিটেনের এশিয়াটিক সোসাইটি, ওরিয়েণ্টাল ট্রান্স্লেশন ফাণ্ড, সোসাইটি কর দি ট্রান্স্লেশন অব্ ওরিয়েণ্টাল টেক্সট্‌স, জিওলজিক্যাল সোসাইটি, ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স পেটেণ্ট অফিস প্রমুখ প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজ নিজ কার্য্যবিবরণ, পুস্তিকা ও গবেষণা পুস্তকাদি পাঠাইতে সম্মত হইলেন। গ্রেট ব্রিটেনের এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষে অবৈতনিক সম্পাদক আর. ক্লার্ক লিখিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের পুস্তকাদি তো পাঠাইবেনই, অপিচ ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত গবেষণা-কার্য্যে ভারতীয় পণ্ডিতগণকে সাহায্য করিতেও অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছেন।

গ্রন্থাগার আরও একটি বিষয়ে এ বৎসর হইতে সুবিধা পাইতে লাগিলেন। বিলাত হইতে যে-সব বই আসিত, পি এণ্ড ও জাহাজ কোম্পানী প্রতি মাসে একবার করিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থলে ("7 cubic feet") বিনা ভাড়ায় আনিতে সম্মত হন। এ বৎসরের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির মত অব্যবসায়ী জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক '৪৩শ, ১৮৫০ আইন' দ্বারা বিধিসম্মত গঠিত সভা বলিয়া স্বীকার। এই আইন বলে বিভিন্ন সময়ে নির্ব্বাচিত অধ্যক্ষদের নামে কোম্পানীর কাগজ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষমতা লব্ধ হইল। অংশীদারগণও অপরের নামে আদালতে অভিযোগ আনিতে, অথবা তাঁহারা নিজেরাও অভিযুক্ত হইতে পারিবেন, স্থির হইল। লাইব্রেরির পক্ষে ইহার গঠনতন্ত্র, পরিচালনার নিয়মাবলী, আয়ব্যয়ের হিসাব প্রভৃতি সহ একটি স্মারকলিপি প্রদানেরও কথা হইল।

অন্যান্য বারের মত অধ্যক্ষগণ গ্রন্থাগারের কর্ম্মচারী, বিশেষ করিয়া গ্রন্থাগারিক প্যারীচাঁদ মিত্রের বিশেষ প্রশংসা করিলেন। গ্রন্থাগারের বহুমুখী কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মূলে যে প্যারীচাঁদের ঐকান্তিক যত্ন রহিয়াছে তাহারও উল্লেখ করিতে তাঁহারা ভুলেন নাই। তাঁহারা বলেন :

"The curators gladly avail themselves of the opportunity of recording, as they have done on previous occasions, their high sense of merits of the Librarian himself, Baboo Peary Chand Mittra. His zeal for the interest of the Institution continues unflagging. To these he adds ability and discretion in carrying on the details of business and in suggesting improvements. The manner in which he performed his

duties during the last year deserves the best acknowledgements of the curators."

গ্রন্থাগার সম্পর্কে অধ্যক্ষগণের আর একটি উক্তিও স্মরণীয় :

"While the question of establishing public lending libraries is agitated in England, it must be a source of pride to the inhabitants of this Metropolis to know that they already possess one which in point of liberality and subservience to public benefit, may challenge comparison with any European Institution."

লেণ্ডিং লাইব্রেরী তখনও বিলাতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

গত বৎসরে বিধিবদ্ধ ৪৩শ আইনের পূর্ণ সুযোগ লওয়ার আয়োজন হইল। ১৮৫১ সনের ৫ই মে গ্রন্থাগারকে রেজিষ্ট্রী করিবার অনুমতিদানের জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট পরবর্ত্তী ১৪ই মে আবেদন মঞ্জুর করিলেন। ১৮৫১ সনের আয়ব্যয়ের হিসাবসহ একখানি স্মারকলিপি সেখানে প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। আইন অনুযায়ী গ্রন্থাগার ১৮৫১ সনেই এক বৎসরের জন্য দুই জন হিসাব-পরীক্ষক নিযুক্ত করিলেন—ইঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ রাধানাথ শিকদার। তিনি বিনা পারিশ্রমিকে বিশেষ যোগ্যতার সহিত এই কার্য্য সম্পাদন করেন। এবারে গ্রন্থাগারের নূতন অংশীদের মধ্যে ছিলেন বাঙালী-প্রধান ওয়েলিংটন দত্ত-পরিবারের রাজেন্দ্র দত্ত এবং শিক্ষা-সমাজের সেক্রেটারী ডক্টর ফ্রেডারিক জন মৌএট। অংশী-সংখ্যা ছিল পূর্ব্ববৎ ৮৭। চাঁদাদাতাদের সংখ্যাও ক্রমশ: বাড়িতে লাগিল। ১৮৫০ ও ১৮৫১ সনে গ্রন্থাগারের পাঠক-সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬,৬০৩ এবং ৫,৮২৩। চাঁদাদাতা ও পাঠকগণের মধ্যে বাঙালীদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়।

কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির আদর্শে বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা সুরু হইল। পাদ্রী লঙ প্যারীচাঁদ মিত্রকে একখানি পত্রে লিখিলেন যে, কলিকাতা, আগড়পাড়া, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর ও রতনপুরে ইংরেজী পুস্তকের লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল স্থানে এবং ঠাকুরপুকুর, সোলো, চাপরা, বল্লভপুর ও কাপাসডাঙ্গায় বাংলা গ্রন্থাগার ("Vernacular Libraries") প্রতিষ্ঠার সংবাদও তিনি এই পত্রে দিয়াছিলেন। তিনি আরও লেখেন যে, কলিকাতায় বাংলা গ্রন্থাগারটিতে তখন পর্য্যন্ত ছয় শত পুস্তক-পুস্তিকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থাগারের জন্য নূতন পুস্তক সংগ্রহ বা ক্রয়েরও ব্যবস্থা আছে।

'জাতীয় গ্রন্থাগারে'র পক্ষে এবৎসরকার একটি প্রধান দু:খময় ঘটনা—অন্যতম কিউরেটর বা অধ্যক্ষ বেথুন সাহেবের মৃত্যু (১২ই আগষ্ট ১৮৫১)। এদেশের উন্নতিমূলক নানা কার্য্যে, বিশেষত: স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তাঁহার কৃতিত্ব অনন্যতুল্য। নানা কাজের মধ্যেও জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে তিনি সবিশেষ অবহিত ছিলেন এবং ইহা যে তখন দেশ-বিদেশের বিদগ্ধ সমাজের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিল তাহার মূলেও ছিল বেথুনের ঐকান্তিক প্রয়াস। তাঁহার মৃত্যুতে অধ্যক্ষগণ যে শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করেন, অংশীদারগণের বিশেষ

জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন

সাধারণ সভায় ২২শে সেপ্টেম্বর তাহা হুবহু গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি এই :

"It is with deep regret that the Committee of Curators of the Calcutta Public Library record the death since their last meeting of one of their members, the Honourable J. E. D. Bethune.

"This gentleman became one of the Curators of the Calcutta Public Library on the 21th August 1848 and from that moment as his colleagues now testify, took the liveliest interest in its welfare and despite other and more important avocations uniformly lent his active, able, and influential aid both here and at home in promoting the useful objects of the institution.

The Curators feeling that they alone can best appreciate the loss which the Calcutta Public Library sustained by the death of Mr. Bethune, record this minute in token of their respect for the memory and in grateful acknowledgement of the services of the late lamented colleague."

উক্ত সভাতেই বেথুনের স্থলে জন রেড্ডি অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনিও পরবর্ত্তী ২৮শে নবেম্বর ইহলীলা সংবরণ করেন। কাজেই বৎসরের অবশিষ্টাংশ দুই জন অধ্যক্ষকেই কাজ চালাইতে হইয়াছিল।

৬

১৮৫২ সনে নূতন অধ্যক্ষ হইলেন জে. ডব্লিউ. ডালরিম্প্‌ল। নূতন অংশীদের মধ্যে দুই জন খ্যাতনামা বঙ্গসন্তানের নাম পাইতেছি—কিশোরীচাঁদ মিত্র ও রামবাগান দত্ত-পরিবারের শশীচন্দ্র দত্ত। শশীচন্দ্র সে যুগের একজন বিখ্যাত ইংরেজী-নবিশ, রমেশচন্দ্র দত্তের খুল্লতাত। ২৬শে মার্চ সাধারণ সভায় স্থির হয় যে, অতঃপর গবর্ণমেণ্ট ও ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গলের ছুটি অনুসারে গ্রন্থাগারেরও ছুটি থাকিবে। এত দিন জাহাজ কোম্পানী বৎসরে একবার করিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ পুস্তক বিনা ভাড়ায় আনিয়া দিতেন; এবারে তাঁহারা দুই বার আনিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-প্রদত্ত পুস্তকের অনেক খণ্ড বাংলা-সরকার নিজ ব্যয়ে নূতন করিয়া বাঁধাইয়া দেন। ইহাতে তাঁহাদের ব্যয় হয় ২,৮৫৫।০ আনা। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, কলিকাতার নিকটে ও দূরে নানা স্থানে গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছিল। মেদিনীপুর পাব্‌লিক লাইব্রেরি ও উত্তরপাড়া সরকারী স্কুল সংলগ্ন সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার বিষয়ও জাতীয় গ্রন্থাগারের গোচরে আসে এবং বাতিল ও অতিরিক্ত পুস্তকাদি দিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতে কর্ত্তৃপক্ষ সম্মত হন। ইতিমধ্যেই, ১৮৫০ সনে তাঁহারা এইরূপ পুস্তক 'নাবিক নিবাস' (Sailors' Home) এবং হাওড়া ইন্‌ষ্টিটিউটকে দিয়াছিলেন।

দেখিতে দেখিতে ১৮৫৩ সনে আমরা পৌঁছিতেছি। এত দিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে জাতীয় গ্রন্থাগার নানা বিভাগে কিরূপ উন্নতিলাভ করে, ১৮৪৬-৪৭ এবং ১৮৫৩ সনের নিম্নে প্রদত্ত তুলনামূলক পরিসংখ্যান দৃষ্টে তাহা বেশ উপলব্ধি হয় :

সন	বাহিরে প্রদত্ত পুস্তক ও পত্রিকা	চাঁদাদাতা (প্রতি মাসে গড়)	গচ্ছিত তহবিল
১৮৪৬-৪৭	৩১,০০০	১১৭	৪,৫০০৲
১৮৫৩	৫৬,৮১৩	৪০৩·৫	১০,৫০০৲

মাসে দুই বার করিয়াও বিলাত হইতে জাহাজে সমস্ত বই ও পত্রিকা আনা সম্ভব হইল না। ১৮৫৩ সনে মেল ষ্টীমারে অত্যাবশ্যক পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা আনানো হইতে লাগিল। এবারে পি. এন্‌. এস্‌. জাহাজ কোম্পানীও বিনা ভাড়ায় পুস্তক আনিয়া দিতে সম্মত হন। পার্লামেণ্ট-প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকা পাইবার সম্ভাবনা দেখা দিল। গ্রন্থাগারের পুস্তক, পুস্তিকা ও পত্রিকার সংখ্যা এই কয় বৎসরে অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ায় নূতন তালিকা প্রস্তুতের প্রয়োজন হইল। এ বিষয়ে উদ্যোগ-আয়োজনও আরম্ভ হয়। এবারে অতিরিক্ত পুস্তক অনেকগুলি মেদিনীপুর গ্রন্থাগারকে দেওয়া হইল। কলিকাতা ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি বাংলা পুস্তক সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার নিজ পুস্তক-সংগ্রহ এখানে রাখিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তবে প্রয়োজন হইলে তাঁহারা এই সকল ইচ্ছামত স্থানান্তরে লইয়া যাইতে পারিবেন এরূপ একটি সর্ত্তের কথাও তাঁহারা বলেন। ১৮৫৩, ২১শে ফেব্রুয়ারী বিশেষ সাধারণ সভায় স্থির হয় যে, দেশীয় ছুটির দিনে গ্রন্থাগার খোলা থাকিবে। এবারকার অধ্যক্ষত্রয়ের মধ্যে দুই জনই নূতন—ডক্টর এ. সি. ম্যাক্রি ও হড্‌সন প্র্যাট।

১৮৫৪ ও '৫৫ সনেও গ্রন্থাগারের কার্য্য অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকে। '৫৪ সনে গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ ডব্লিউ. আর্ল মারা গেলে তৎস্থলে পাদ্রী টি. স্মিথ অন্যতম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এবারে পুস্তক-নির্ব্বাচন কমিটিতে ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স পীল। প্র্যাট সাহেব বৎসর শেষে স্থানান্তরে গমন করার দরুন অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করেন। গ্রন্থাগারের এবারকার নূতন অংশীদারদের মধ্যে ডক্টর দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

১৮৫৫ সনে নূতন অধ্যক্ষ হইলেন কলিকাতা সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতের বিচারপতি চার্লস বিনি ট্রেভর। এ বৎসরে নূতন অংশীদের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্র দত্ত (মৃত রসময় দত্তের স্থলে), মানকজী রুস্তমজী (মৃত রুস্তমজী কাওয়াসজীর স্থলে) এবং হীরালাল শীলের (মৃত মতিলাল শীলের স্থলে) নাম পরিদৃষ্ট হইতেছে। পাদ্রী স্মিথ ডিসেম্বর মাসে বিলাত গমন করিলে তাঁহার পদ শূন্য হইল। এ বৎসরের একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা—জুলাই মাসে গ্রন্থাগারের পূর্ণাঙ্গ পুস্তক-তালিকা প্রকাশ। প্রতি খণ্ডের মূল্য দুই টাকা ধার্য্য হইল।

৭

জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় বর্ত্তমান আলোচনার শেষ পাঁচ বৎসরে (১৮৫৬-৬০) আমরা উপনীত হইতেছি। ১৮৫৬ সনে মেজর আর্থার ব্রুম নূতন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। এই পাঁচ বৎসরে তিনি ব্যতীত ডাঃ এ. সি. ম্যাক্রি ও সি. বি. ট্রেভরও অধ্যক্ষ ছিলেন। সিপাহী যুদ্ধও এই সময়ের মধ্যে ঘটে। কিন্তু বিবরণে প্রকাশ, নানারূপ বিপর্য্যয় দেখা দিলেও এ সময়ে গ্রন্থাগারের যথাপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াই চলিয়াছিল। বড়লাট লর্ড ক্যানিং ১৮৫৬ সন হইতে গ্রন্থাগারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও অন্যতম অংশী হইলেন। প্রখ্যাতনামা বাঙালীগণ অধিক সংখ্যায় ইহার অংশী শ্রেণীভুক্ত হইতে লাগিলেন। এই কয় বৎসরের মধ্যে ডক্টর সূর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্ত্তী (১৮৫৬), শম্ভুনাথ পণ্ডিত ('৫৯), গিরিশচন্দ্র ঘোষ, প্রাণকৃষ্ণ সেন ('৬০) প্রমুখ অনেকে গ্রন্থাগারের অংশী হন।

গ্রন্থাগার ১৮৫০-এর ৪৩শ আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রী করা হয় বটে, কিন্তু সরকারী অর্থবিভাগ রেজিষ্ট্রীকৃত হইলেও উহার কোম্পানীর কাগজ নূতন করিয়া বদল করিতে অনুমতি দেন

নাই। গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষ পুনরায় আইন সংশোধনের জন্য ১৮৫০ সনের ২৮শে নবেম্বর সরকারকে পত্র লেখেন, তদনুযায়ী কার্য্য হইতে আরও তিন-চার বৎসর কাটিয়া যায়। তবে তাঁহারা এ সম্বন্ধে আন্দোলন পরিচালনা করিতে ক্ষান্ত হন নাই। আইন-সভা দ্বারা গঠিত সিলেক্ট কমিটি—জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীসমূহ সম্পর্কিত আইনের আলোচনাকালে ১৮৫৭ সনের ৩০শে মে এই মর্ম্মে মন্তব্য করেন যে, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দাতব্য বিষয়ক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র আইন প্রণয়ন বাঞ্ছনীয়। এইরূপ একটি আইনের খসড়া যথারীতি ১৮৫৮ সনে আইন-সভায় উপস্থাপিত হইল এবং ২৩শে নবেম্বর তারিখে দ্বিতীয় বার পঠিত হইল। খসড়াটি আলোচিত হইবার পর ১৮৬০ সনের মে মাসে বিধিবদ্ধ হইয়া '২১শ আইন—১৮৬০', নামে পরিচিত হয়। এ আইনটির পুরা নাম: "An Act for the Registration of Literary, Scientific and Charitable Societies"। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি এই আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রীকৃত হইল। আইনটি যে জাতীয় গ্রন্থাগারের দীর্ঘকালব্যাপী প্রচেষ্টারই পরিণতি, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।

১৮৫৭ সনে কলিকাতায় দেশীয় অঞ্চলে গ্রন্থাগারের একটি শাখা স্থাপনের কথা হয়। এজন্য চাঁদাদাতাদের একটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ নূতন বাজারে দুইখানি প্রকোষ্ঠ দিতেও সম্মত হন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ইহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সিপাহী যুদ্ধের সময়ও গ্রন্থাগারের কার্য্য সুষ্ঠুরূপে চলে, বলিয়াছি। এই সময় গ্রন্থাগারের অতিরিক্ত পুস্তকসমূহ আহত সৈনাদের পাঠের জন্য দমদম সৈন্য-ঘাঁটিতে প্রেরিত হইত। মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরি, হাওড়া ইনষ্টিটিউট, সেলর্স হোম ব্যতীত আরও বহু স্থানে গ্রন্থাগারের অতিরিক্ত পুস্তক প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে এই কয়টি উল্লেখযোগ্য—দমদম ও অন্যান্য সৈন্যঘাঁটি, ফিভার হাসপাতাল, জেনারেল হাসপাতাল, আমস হাউস, লেবার এসাইলাম, নেভ্যাল ব্রিগেড ও আউটরাম ইনষ্টিটিউট।

এই সময়ের মধ্যে অন্য দিকেও গ্রন্থাগারের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। সঞ্চিত তহবিল সাড়ে দশ হাজার টাকা হইতে সাড়ে তের হাজার টাকায় দাঁড়াইল। পুস্তক ও পাঠক-সংখ্যাও অতি দ্রুত বাড়িয়া চলিল। ১৮৫৮ সনে কিছু কমিশন বাদ দিয়া এককালীন চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা হওয়ায় অর্থাগমও প্রচুর হইতে থাকে।

প্রতি বৎসরই প্রায় চারি-পাঁচ শত করিয়া নূতন পুস্তক গ্রন্থাগারে ক্রীত ও সংগৃহীত হইত। এজন্য ১৮৫৫ সনে পুস্তক-তালিকা প্রকাশিত হইলেও কর্তৃপক্ষকে তিন বৎসরের মধ্যে একটি অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশেরও ব্যবস্থা করিতে হয়। ১৮৬০ সনে এইরূপ একটি তালিকা প্রকাশিত হইল। প্রতি বৎসর যে যে নূতন পুস্তক আসিত ১৮৫৮ সন হইতে তাহার বিষয়ক্রমিক উল্লেখ করা হইতে থাকে। প্রথম বৎসরে এইরূপ বিষয়-বিভাগ দেখিতেছি: ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, শিক্ষা, ব্যবহারশাস্ত্র, ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, পুরাতত্ত্ব, ইষ্ট ইণ্ডিজ, ব্যবহারিক বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসা-শাস্ত্র, প্রাণী-বিদ্যা, ললিতকলা, কবিতা, ব্যাকরণ, উপন্যাস, বিবিধ, গ্রীক ও লাটিন, ওরিয়েণ্টাল ও হিব্রু এবং ফরাসী।
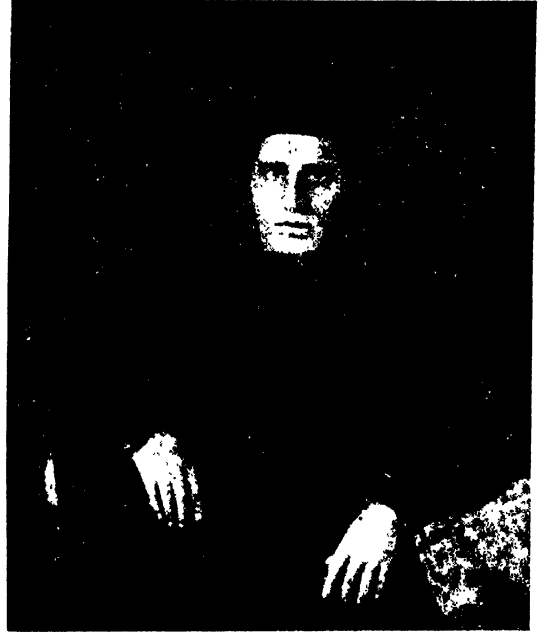
রাধানাথ শিকদার

গ্রন্থাগারটি বিদ্বজ্জনসমাগমে মুখরিত হইয়া উঠিল। বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, ব্যবহার-জীবী, সিবিলিয়ান প্রমুখ পদস্থ সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী, শিল্পরসিক ও সাহিত্যিক নানা লোকই এখানে আগমন করিতেন। বাঙালী সমাজের প্রতিপত্তিশালী বিভিন্ন ব্যক্তিও যে ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং ইহার কার্য্যে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেন তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। এখানে বহু বঙ্গ-সন্তান রীতিমত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া নানা বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আহৃত জ্ঞান জীবনে ও কর্ম্মে—সাহিত্যানুশীলনে, সংবাদপত্রসেবায়, ধর্ম্মালোচনায়, শিক্ষাপ্রসারে এবং সমাজসংস্কারে নানারূপে তাঁহাদের দ্বারা বিনিয়োজিত হয়। এই প্রসঙ্গে শ্যামাচরণ সরকার, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ বাংলার মুখোজ্জ্বলকারী নেতৃবৃন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থাগার-মুকুরে আমরা তখন প্রতীচ্যের সত্যকার মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া নিজেদের অবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করি এবং নিজেদের উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে প্রেরণা পাই।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা। তিলপাড়া সেচবাঁধের মডেল

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

ঋষির ধ্যানে বঙ্গমাতার রূপ ছিল ঃ

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্॥

আজ বঙ্গমাতার সন্তানসন্ততি অন্নবস্ত্রের অভাবে প্রপীড়িত, দুঃস্থ ও পরমুখাপেক্ষী। এই অবস্থার মূলে বহু প্রবল শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত আছে—কিছু নৈসর্গিক, কিছু রাষ্ট্রনৈতিক এবং কিছু প্রাকৃতিক। তবে ঐ সকলের মধ্যে প্রাকৃতিক, অর্থাৎ যাহাকে সহজ ভাষায় বলে "দেবতার মার" তাহাই প্রচণ্ডতম। অবশ্য তাহারও পিছনে আছে মানুষের দূরদৃষ্টির অভাব—যাহার দরুন আমরা গাছ কাটিয়া জঙ্গল শেষ করিয়াছি, কিন্তু চারা বুনি নাই, খোয়াইয়ের ভাঙন হইতে ক্ষেত বাঁচাই নাই, সেচ খালের মুখ ও বুক হইতে বালি এবং পলিমাটি সরাই নাই- দীঘির জল টানিয়াছি, কিন্তু পঙ্কোদ্ধার করি নাই। সে যাহাই হউক—আমাদের স্বকৃত দোষত্রুটির ফলেই হউক বা বিধাতার অভিশাপেই হউক- আজ দেশের সকল অভাব অভিযোগের মূলে জলাভাব, যাহার ফলে দেশ আজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, শস্যশ্যামলা বঙ্গমাতার অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার ক্রমেই রিক্ত।

আবার ঐ যে জলাভাব সেও একটু বিশেষ প্রকার। এ অভাব যে ক্রমাগত অনাবৃষ্টির ফলেই হইয়াছে তাহাও নহে। সাধারণ হিসাবে গড়পড়তায় বাংলাদেশে বৃষ্টি বিশেষ কম হয় না। যাহা হয় তাহাতে ফসল পুরাই হওয়ার কথা, যদি সে বৃষ্টি সময়মত হয়। যদি ঠিক চৈত্র-বৈশাখে কালবৈশাখী জল দেয়, যদি 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' মেঘ দেখা দেয় ও ঢল নামে, যদি শ্রাবণের বারিধারায় ক্ষেত ভরিয়া যায় ও তার পরে বারিসিঞ্চন ঠিকমত হয়, তবে চাষীর সুসময় আসে। তার পর "যদি বর্ষে মাঘের শেষ" তবে ক্ষেত সরস হইয়া উঠে, এবং দেশে অভাব কিছুই থাকে না। কিন্তু সে রকম হয় কোথায়?

কেহ বলেন, ঋতুকালের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, কেহ বলেন, আমাদেরই বুদ্ধি-উদ্যম এ সকল কমিয়া গিয়াছে; আবার বেশীর ভাগই বলেন, সরকারী কর্ত্তাব্যক্তিরা দেশের লোকের কথা ভাবেন না বলিয়াই এই দুর্দ্দশা। বিশেষতঃ, যাঁহারা সেই গদীর উপর নজর রাখিয়া কথা বলেন, তাঁহারা সকল অভাব-অভিযোগের চাপ ও দায়িত্ব চাপাইতে চাহেন বর্ত্মকর্ত্তাদিগের উপর। যেন দেশের দুর্দ্দশা ও অভাব দূর করিবার বিষয়ে দেশবাসীদের কোন কিছু কর্ত্তব্য নাই, চেষ্টা ও উদ্যোগের প্রয়োজন নাই এবং অপোগণ্ড শিশুর মত কোনও দায়িত্বজ্ঞান থাকার প্রয়োজনও নাই।

যখন বিদেশী সরকারের হাতে শাসনদণ্ড ছিল, তখন তাহার প্রয়োগ হইয়াছিল শুধু শোষণের ব্যবস্থাতেই। আগেকার দিনের খাল তাহারা নষ্ট হইতে দিয়াছে, প্রাচীন দীঘি জলাশয় তাহাদের অবহেলার ফলে মজিয়া গিয়াছে—যেগুলি ছিল আগেকার দিনের সেচ ও জলসঞ্চয়ের ব্যবস্থা, যাহার দরুন তখন চাষীর অসময়ে ও অনাবৃষ্টিতে জলাভাব দূর হইত। তবে একথাও আমরা বলিতে বাধ্য যে, আমাদেরও সমষ্টিগত উদ্যম ও সহযোগিতার অভাব না হইলে এতটা দুর্দ্দশা সম্ভবতঃ হইত না। চাষী আকাশের

বর্ত্তমান ইডেন খালের এণ্ডারসন বাঁধ র
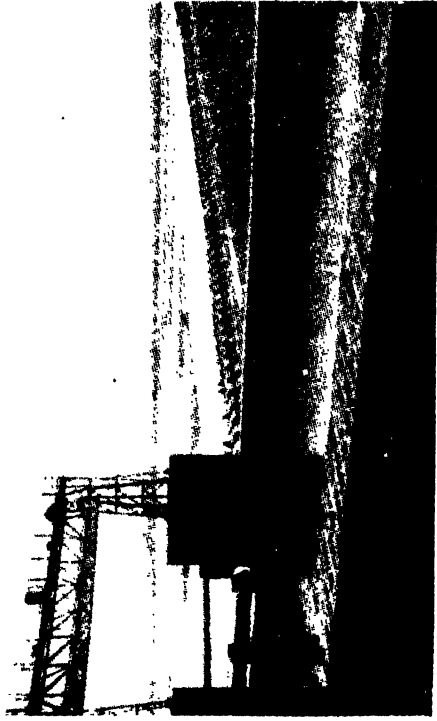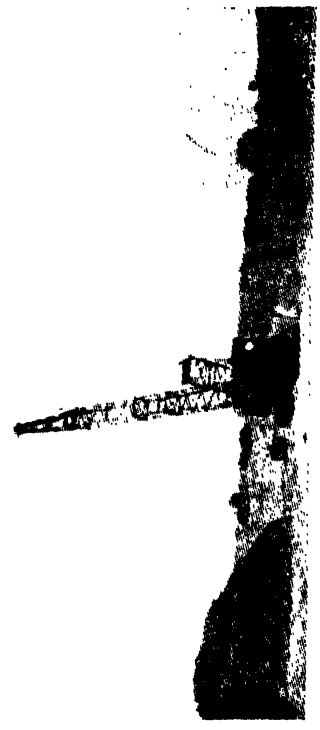
বর্ত্তমান ইডেন দামোদর খালের মুখ রণডিহা

অজয় নদে উপর ালসরবর হর র্ম্মিত ও

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা। যন্ত্রদানব-"ড্রাগলাইন এক্সকাভেটর"—খাল কাটিতেছে

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা। যন্ত্রদানবের কাটা খাল

দিকে তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের ন্যায় তাকাইয়া আছে, আকাশে মেঘের দেখা নাই, যেটুকু জল ডোবা, মজা পুকুর-বিল হইতে পাইয়াছে তাহাতে চারা গজাইয়া কপাল চাপড়াইতেছে, কিন্তু তাহাকে সেচ-খাল বা দীঘির পাঁক সময়মত কাটিবার বা পরিষ্কার করিবার কথা কেহ বলে নাই, আর বলিলেও সে তাহা করে নাই। কারণ সুবুদ্ধি দিবার লোক, উদ্যমের পথে অভাব দূর করিবার পরামর্শ দিবার লোক যদিই বা তাহার কাছে ক্বচিৎ-কদাচিৎ গিয়াছে, কিন্তু দুর্বুদ্ধি দিবার লোকের অভাব তাহার কখনও হয় নাই। কাজেই বিদেশী সরকারের অবহেলা-অবজ্ঞা তাহাকে এতটা ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতে পারিয়াছে।

আজ বিদেশী সরকার গিয়াছে, কিন্তু চাষী ও শ্রমিকের কুপরামর্শদাতার সংখ্যা শত গুণ বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই। যে মহাশয় ব্যক্তিগণ পথে-ঘাটে, সভায়-আসরে ব্যবস্থা পরিষদে কৃষক-প্রজা-মজুরের দুঃখ লইয়া কুম্ভীরাশ্রুর বান ডাকাইতেছেন, তাঁহারা চাষীকে ধান পুড়াইয়া কৃষিলক্ষ্মীকে পদাঘাত করিবার উপদেশ দিতে খুবই আগ্রহ দেখাইয়াছেন; কিন্তু একটা মজা দীঘির পঙ্কোদ্ধার করিতে চাষীকে বলেন নাই, সরকারী খাল কাটায় শ্রমিককে সহযোগিতা করিবার উপদেশ দেন নাই, এমন কি খাল কাটার সুযোগে তাহাদের নিজেদের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিতেও বলেন নাই। সম্প্রতি, কিছুদিন যাবৎ আমরা দেখিতেছি, কয়েক স্থানে বাংলার মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর যুবকদের মধ্যে এ বিষয়ে কিছু উৎসাহ জাগিয়াছে। তাহার ফলে দেশে কোন কোন স্থলে লোকেরা এ বিষয়ে নিজেরাই হাত দিয়াছেন এবং সরকারী সহযোগিতার আংশিক সাহায্যে কার্য্যোদ্ধারে চেষ্টিত হইয়াছেন। ইহা আশার কথা এবং দেশবাসীর উচিত ইহাদের অভিনন্দিত করা। যাহা হউক, ইহা হইতেছে পরের কথা।

বাংলার অন্নাভাব দূর করিতে হইলে ক্ষেতের ফসল বাড়াইতে হইবে। যদি সম্ভব হয়, সেচের জল দিয়া জমি সরস করিয়া তাহাতে সবুজ, কম্পোষ্ট বা অন্য রূপ সার প্রয়োগে উর্ব্বর করিয়া একের স্থলে দুইটি ফসল উৎপাদন করিতে হইবে, একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। মূল কথা, জলের ব্যবস্থা হইবে কি করিয়া?

এদেশে বৃষ্টি সারা বৎসর সমান ভাবে হয় না এবং সমস্ত বৎসরের হিসাবেও প্রতিবৎসর এক রকম হয় না। হয়ত যথাসময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় চাষী মাত্র দশ আনা ফসলের রোয়া-বোনা করিতে পারিল। আবার অসময়ে অতিবৃষ্টি হইয়া প্লাবনের জলে ধান ডুবিয়া ভাসিয়া গেল বা পড়িয়া যাইয়া পচিয়া গেল। এইরূপ "দেবতার মারে"র প্রতিকার কি?

দেবতার এই মারাত্মক লীলাখেলার কথা ভাবিয়াই পূর্ব্বকালে বড় বড় দীঘি-জলাশয় কাটানো বা বাঁধানো হইয়াছিল, এবং তৎসঙ্গে বহু ছোটবড় সেচখালও কাটা হইয়াছিল। কেননা দেবতার মার রোধ করিবার জন্য এইগুলিই শক্তিশালী রক্ষাকবচ। তখনকার তুলনায় বর্ত্তমানে দেশে লোকসংখ্যা বহুগুণ বাড়িয়াছে, সুতরাং এখন প্রয়োজন পুরাতন সেচব্যবস্থার সংস্কার এবং নূতন নূতন বিরাট জলাশয় ও সেচখাল কাটা। এ বিষয়ে বাংলা-সরকারের অবহিত হওয়া উচিত সেকথা সকলেই বলে—আমরাও বলিয়া থাকি। কিন্তু দেশের লোকেরও যে বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন সেকথা বলিতে আমরা সকলেই ভুলিয়া যাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছোটবড় অনেকগুলি পুরনো সেচখাল ও বাঁধের সংস্কার এবং উদ্ধারের কাজ হাতে লইয়াছেন। ইহার মধ্যে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাঁকুড়া জেলায় কুকুনী ও কুলাই সেচখাল, মেদিনীপুর জেলায় পুত্রাজী, বীরভূমে হিংলো বাঁধ ও হুগলীতে কুন্তী-চন্দননগর খাল কাটা ও সংস্কারের কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। এই কয়টি খাল কাটানোর ফলে প্রায় ৪৫০০০ বিঘা জমিতে চাষের বিশেষ উন্নতি হইবে আশা করা যায়। উন্নতির ফলে ঐ সকল অঞ্চলে বাৎসরিক প্রায় ২,৫০,০০০ মণ খাদ্যশস্যের ফলন বৃদ্ধি পাইবে।

ইহা ছাড়া ১৯৫১-৫২ সালে আরও ছয়টি কাজ শেষ

হইবার কথা আছে; যথা—চব্বিশ পরগণার হরহটুগঞ্জের জলাভূমির জলনিকাশের খাল কাটা, বাঁকুড়ায় বিড়াই সেচখালের উদ্ধার, মুর্শিদাবাদে জীবন্তিবাঁকির জলাভূমির জল নিকাশের খাল, মেদিনীপুরে পানিপিয়া এবং সোয়াদীঘি-গঙ্গাখালি জলনিকাশের খাল, জলপাইগুড়িতে জাম্পই সেচখাল। এইগুলি শেষ করিতে ৫৪ লক্ষ টাকার কিছু বেশী খরচ হইবে। কাজ শেষ হইলে প্রায় ২,২৫,০০০ বিঘা জমিতে চাষের ব্যবস্থা বা বিশেষ উন্নতি হইবে যাহার ফলে প্রায় ৬,৫০,০০০ মণ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা। মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার ও প্রদেশপাল কাটজু। পাশে তিলপাড়া ব্যারাজ মডেল

বাকী উদ্ধার ও সংস্কার কাজের মধ্যে আরও চারিটি ১৯৫২-৫৩ সালে শেষ হইবে আশা করা যায়; যথা—মেদিনীপুরে ঝাড়গ্রামে সেচের খাল কাটানো, বাঁকুড়ায় বিখ্যাত "শুভঙ্করের দাঁড়া" সেচখালের সংস্কার ও উদ্ধার, হুগলীতে দামোদরপারের সেচব্যবস্থা ও হুগলী-হাওড়ার সরস্বতী খালের জলনিকাশের ব্যবস্থা। এইগুলিতে খরচ হইবে ৩১·৩৩ লক্ষ টাকা, জমি উদ্ধার ও সেচব্যবস্থা হইবে আড়াই লক্ষ বিঘা ও ফসল বাড়িবে প্রায় পাঁচ লক্ষ মণ।

ইহা ছাড়া ছোটখাটো আরও এক শত ছয়টি কাজ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে আছে, যাহার মধ্যে সাড়ে এগার লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫৩টির কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে এবং প্রায় তিন লক্ষ বিঘা জমির উপকার হইয়াছে। এইগুলিতে খাদ্যশস্যের ফলন বৃদ্ধি পাইবে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ মণ। বাকি ৫৩টি এই বৎসরেই শেষ হইয়া যাইবে, যাহাতে আরও সাড়ে তিন লক্ষ বিঘা জমিতে ফলন বাড়িবে। ফসলবৃদ্ধির পরিমাণ আন্দাজ সাড়ে নয় লক্ষ মণ হইবে।

বাংলায় জলাভাব ইত্যাদি দূর করিবার জন্য দুইটি বিরাট পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে সংস্কার ও পুনরুদ্ধারের অনেকগুলি ছোটবড় প্রচেষ্টা। বড় দুইটির মধ্যে প্রথমটি দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা, যাহার কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান (দামোদর-ভ্যালি কর্পোরেশন) গঠিত হইয়াছে। দ্বিতীয়টি ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা; ইহা বাংলা সরকারের সেচবিভাগের হাতে রহিয়াছে এবং ইহারই বিষয় এই প্রবন্ধে বলা হইতেছে। কেননা ইহার কার্য্যাবলী প্রত্যক্ষ দেখিবার সুযোগ লেখকের সম্প্রতি ঘটিয়াছিল।

সিউড়ি আমরা মোটরের পথেই গিয়াছিলাম। ইহাতে বর্ত্তমান ইডেন দামোদর খালের কাজ ও রণডিহায় তাহার এণ্ডারসন বাঁধও দেখা হয়, যাহাতে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের তুলনাত্মক একটা অনুমান মনে জাগে। দামোদর খালে ফলাফলের হিসাবে দেখিলাম, খালের পাশে অধিকাংশ স্থলেই এই দুর্বৎসরেও বিঘাপতি বারো মণ ধান জন্মিয়াছে। এমনকি, যেখানে চাষী উদ্যোগী হইয়া কম্পোষ্ট ও অন্য সার দিয়াছে সেখানে ষোল-সতের মণ পর্য্যন্ত ধান পাইয়াছে। নিজের চোখেই দেখিলাম, দামোদর খালের পাশের চাষীর অবস্থা এবং খালের জল যেখানে পায় না সেখানকার অবস্থা।

তার পর পানাগড় হইয়া অজয় নদ পার হইলাম ইলমবাজারের কাছে। নদের উপর মোটর ও মাঝারি ভারী লরী যাতায়াতের জন্য অস্থায়ী কজওয়ে সাঁকো বাঙালী ঠিকাদার সরকারী খরচে করিয়াছে। সাঁকো সুদৃঢ় এবং সুগঠিত, তাহাতে পার হওয়া গেল। শুনিলাম ঐ ঠিকাদার কঠোর প্রতিযোগিতার মুখে কাজ লইয়া সাফল্য দেখাইয়াছে। শুনিয়া ও দেখিয়া বুঝিলাম বাঙালীর পরাজিত মনোভাবের মূলে শ্রমবিমুখতা ও উদ্যমের অভাব ছাড়া আর কিছু নাই।

অজয় নদ পার হইয়া দুই ধারে চোখে পড়িল দিগন্তবিস্তৃত ধানক্ষেত, অভাব জলের ও যানবাহন চলাচলের পথের। যেখানকার মাটি জল পাইয়াছে, সেখানে সোনা ফলিয়াছে। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে যদি পথঘাটেরও সুব্যবস্থা হয় তাহা হইলে বীরভূম পূর্ব্বেকার শ্রী ফিরিয়া পাইবে। এখনই দেখিলাম যেখানে ময়ূরাক্ষীর নূতন কাটা সেচখালে বর্ষার জল দাঁড়াইয়াছে সেখানকার চাষী সোনা ফলাইয়াছে এ তাহাদের মধ্যে যাহারা বুদ্ধিমান ও উদ্যমী
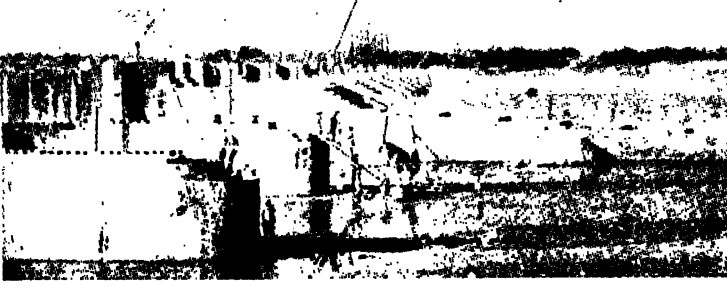
ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা। তিলপাড়া (সিউড়ি) সেচবাঁধের পশ্চাৎ ভাগ

তাহারা বাকী জলের সাহায্যে সরিষা আলু ইত্যাদি বুনিয়াছে, ফলনও খুব ভাল হইয়াছে। পথে দেখিলাম বিরাট খাল কাটা চলিয়াছে।

ধূলায় ধূসর হইয়া (রঙীন বলা উচিত কেননা "রাঙ্গামাটি"র ধূলায় সর্ব্বাঙ্গ গৈরিক হইয়া গিয়াছিল) সিউড়ি পৌছান গেল। পৌছিয়াই রৌদ্র-ধূলা অগ্রাহ্য করিয়া তিলপাড়ার সেচবাঁধ দেখিতে ছুটিলাম। বাঁধ দেখিয়া মনে আশা জাগিয়া উঠিল, শ্রান্তি-ক্লান্তি ধুইয়া গেল। দুই ঘণ্টা বাঁধ দেখিয়া, খাল কাটা দেখিয়া ও ছবি তুলিয়া ফিরিলাম। স্নানাহারের পর আবার চলিলাম লৌহকবাট বসানো দেখিতে। ঐদিন প্রদেশপাল কাটজু ও পশ্চিমবঙ্গের সেচমন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদারও উপস্থিত ছিলেন।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ :

"বাংলাদেশে এপর্যন্ত যে ক'টি দীর্ঘমেয়াদী সেচ-পরিকল্পনার কাজে হাত দেওয়া হয়েছে, ময়ূরাক্ষী জলাধার-পরিকল্পনাই হচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড়। এই পরিকল্পনাটি কাজে পরিণত করতে খরচ পড়বে প্রায় পনর কোটি টাকা। পরিকল্পনার কাজ শেষ হলে ছ' লক্ষ একর জমিতে সেচ দেবার ব্যবস্থা হবে এবং তার ফলে তিন লক্ষ টন ধান আর পঞ্চাশ হাজার টন গম, আলু এবং ডাল ইত্যাদি রবিশস্যের উৎপাদন বাড়বে। এর অর্থ এই যে, এতে ঐ অঞ্চলের জমির বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণটা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে। এ ছাড়া উপরি লাভ হিসাবে পাওয়া যাবে প্রায় চার হাজার কিলোওয়াট-এর মতন বৈদ্যুতিক শক্তি। জলপ্রবাহের মুখ থেকে এই বৈদ্যুতিক শক্তিটা আপনা-আপনিই পাওয়া যাবে। শুধু সেটাকে ধরে কাজে লাগালেই হ'ল। কাজেই এখান থেকে অতি কম দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা চলবে। তাতে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম এই দুইটি জেলায় এবং বিহারের সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে শিল্পের উন্নতির একটা পথ তৈরি হবে। সুতরাং এই ভাবে প্রতি বৎসর উৎপাদন-বৃদ্ধি এবং সস্তায় বিদ্যুৎ-সরবরাহের ব্যবস্থা হওয়ার ফলে মাত্র এক পুরুষের মধ্যেই ঐ অঞ্চলের লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে একটা বিপ্লব ঘটে যাবে।

"ময়ূরাক্ষী-পরিকল্পনায় যে-পরিমাণ জল দরকার হবে তার বেশীর ভাগ জলই পাওয়া যাবে ময়ূরাক্ষী নদী থেকে। এই নদীটি বিহারের অন্তর্গত সাঁওতাল পরগণার উচ্চভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার অসমতল ভূভাগটুকু অতিক্রম করে দত্তবাটীর কাছে ভাগীরথী নদীতে পড়েছে। নদীটি ছোট ; এর মোট দৈর্ঘ্য দেড়শো মাইল। সমতল ভূমিতে গিয়ে পড়বার আগে উৎপত্তিস্থল থেকে ষাট মাইল দূরে মশানজোড় নামক স্থানে একটি পাহাড়ী পথের মধ্য দিয়ে এটি প্রবাহিত হয়েছে। এই জায়গাটিতেই জল আটক করে রাখবার জন্য একটি বাঁধ তৈরি করবার প্রস্তাব হয়েছে। ময়ূরাক্ষীর অববাহিকায় যে ক'টি ছোটখাট নদী প্রবাহিত, সেগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, বক্রেশ্বর এবং কোপাই প্রধান। এগুলি সবই সাঁওতাল পরগণার পাহাড়গুলি থেকে উৎপন্ন, আর এদের সব কয়টিই ময়ূরাক্ষী নদীর সঙ্গে প্রায় সমানস্তরালভাবে প্রবাহিত।

"এই নদীগুলির সব কয়টিই বর্ষাকালে ভীষণ খরস্রোতা হয়ে ওঠে কিন্তু শীতকালে সব কয়টিই প্রায় শুকিয়ে যায়। বর্ষায় এরা প্রায়ই দুই কূল ছাপিয়ে ফসলের ক্ষতি করে এবং জমি ক্ষইয়ে দেয়। পরিকল্পনা কার্য্যকরী হলে এই ক্ষুদ্র নদীগুলি নিয়ন্ত্রিত হবে। তখন সেচের কাজে এদের জল ব্যবহৃত হতে পারবে আর এদের জলপ্রবাহের শক্তি থেকে বিদ্যুৎও উৎপন্ন হবে। তা ছাড়া বন্যার সম্ভাবনা বিদূরিত হবে। আর ময়ূরাক্ষী উপত্যকায় বর্ত্তমানে যে পরিমাণ জমি ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে তাও অনেক পরিমাণে বন্ধ হবে।

"পরিকল্পনার প্রধান বিষয় হচ্ছে একটি জলাশয় প্রস্তুত। মশানজোড়ের কাছে ময়ূরাক্ষীর বুকে একটি বাঁধ দিয়ে এই জলাশয়টি তৈরি হবে। এই বাঁধটির দৈর্ঘ্য হবে দু' হাজার এক শ' সত্তর ফুট আর সবচেয়ে গভীর জায়গায় এর খাড়াই হবে একশো পঞ্চাশ ফুট। দুই পার্শ্বে উচ্চ জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে ঘেরা, বহু বর্গমাইল বিস্তৃত এই জলাশয়টির দৃশ্যও হবে অতি মনোরম।

"দুর্ভাগ্যক্রমে, এই জলাশয়টি যে স্থানে নির্মিত হবে সে অঞ্চলে জনবসতি খুব বিরল নয়। কাজেই বাঁধটি তৈরি করতে গিয়ে প্রায় ছয় হাজার একর চাষের জমি এবং পনেরো হাজার অধিবাসীর বাসভূমি—প্রায় নব্বইটি গ্রাম এই বাঁধের আওতায় পড়ে সম্পূর্ণভাবে বা অংশতঃ নষ্ট হবে। কাজেই এই বাঁধ তৈরির জন্য এখান থেকে যে সব লোককে অন্যত্র সরে যেতে হবে, তাঁদের পুনর্ব্বসতির জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থার ভার নিয়েছেন সরকার। হয় সাঁওতাল পরগণায় আর না হয় বীরভূম জেলায় ঐ বাঁধের কাছাকাছি জায়গাতেই সুবিধাজনক সর্ত্তে তাঁদের জমি ও বাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। সেচের জন্য জল এবং সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করার যথাসম্ভব সুযোগ তাঁদের দেওয়া হবে। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ত্তমানের তুলনায় অনেক বেশী উন্নত হয়ে উঠবে বলেই আশা করা যেতে পারে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা। তিলপাড়া সেচবাঁধের লৌহকবাট বসান হইতেছে

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা। শ্রীবিনোদানন্দন ঝা, শ্রীগ্যাডগিল এবং শ্রীভূপতি মজুমদার—বিহার সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার পক্ষে যথাক্রমে স্বাক্ষর করিতেছেন

[প. ব. স.

"বাঁধ থেকে প্রায় কুড়ি মাইল এবং বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ি থেকে দু' মাইল দূরে একটি ১,০১৩ ফুট দীর্ঘ 'বারাজ' তৈরি করা হয়েছে। ঐ 'বারাজ' থেকে নদীর উভয় তীরে দুটি প্রধান খাল কেটে বার করা হচ্ছে। প্রধান খাল দুটির প্রত্যেকটিকেই মিনিটে প্রায় তেরো লক্ষ গ্যালন করে জল নিকাশ করবার যোগ্য করে কাটা হচ্ছে। প্রধান খালগুলি থেকে আবার বিভিন্ন দিকে বহু ছোট ছোট খাল কেটে বার করা হবে। শাখাপ্রশাখা-সমন্বিত এই সব খালের মোট দৈর্ঘ্য হবে ৮৪০ মাইল।
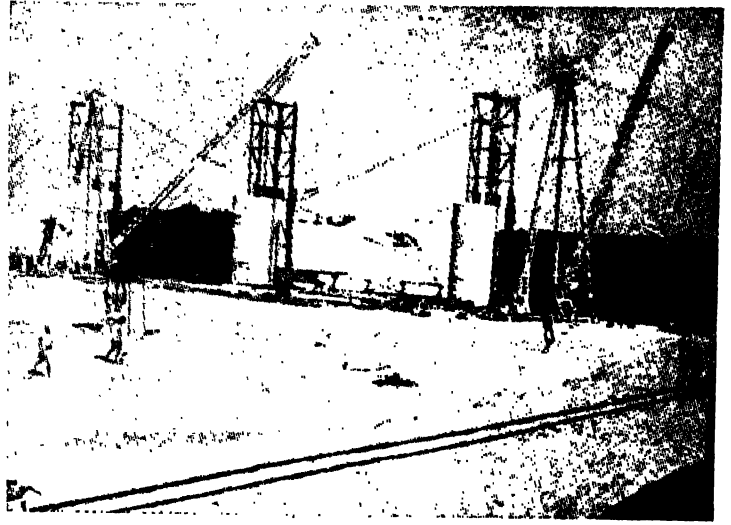
"পরিকল্পনার সমস্ত কাজ ১৯৫৪ সালের গ্রীষ্মকাল নাগাদ সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়। তবে প্রথম ফলটা লক্ষ্য করা যাবে এ বছরেই। প্রায় এক লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা বর্ত্তমান বছরেই হবে মনে হয়। পাকা গাঁথুনির কাজে যে সব সরঞ্জাম ও মালমশলা লাগে, সে সবের দর বর্ত্তমানে অনেক বেশী বেড়ে গেছে; তার ওপর উপযুক্ত সংখ্যক শ্রমিক পাওয়াও আজকাল অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়েছে। কিন্তু এসব অসুবিধা সত্ত্বেও পরিকল্পনার কাজ বেশ এগিয়ে চলেছে। মূল 'বারাজ'টির নির্ম্মাণকার্য্য প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। খালকাটা এবং জলাশয়-নির্ম্মাণের কাজও বেশ এগিয়ে চলেছে। বাঁধ-তৈরির প্রাথমিক কাজও আরম্ভ হয়ে গেছে।

"এমন বিরাট একটা কাজকে একটা সঙ্গত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হলে কেবলমাত্র লোকবলের দ্বারা তা সম্ভব হয় না। নির্দ্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে এ কাজ শেষ করতে হলে হরেকরকমের ভারি ও হাল্কা যন্ত্রপাতিরও দরকার হয়। এ কাজের জন্য যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে তার দাম এক কোটি টাকারও বেশী।"

যন্ত্রপাতি ও মালমসলার অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি এবং বাংলাদেশে শ্রমিক মজুর পাওয়ার অশেষ বাধা—যাহার দরুণ শতকরা ৯৫ জন মজুর অন্ধ্রপ্রদেশ হইতে চড়া মজুরীতে আনিতে হইয়াছে—তৎসত্ত্বেও সিউড়ীতে তিল-

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা। সেচক্ষেত্রের মানচিত্র [প. ব. স.
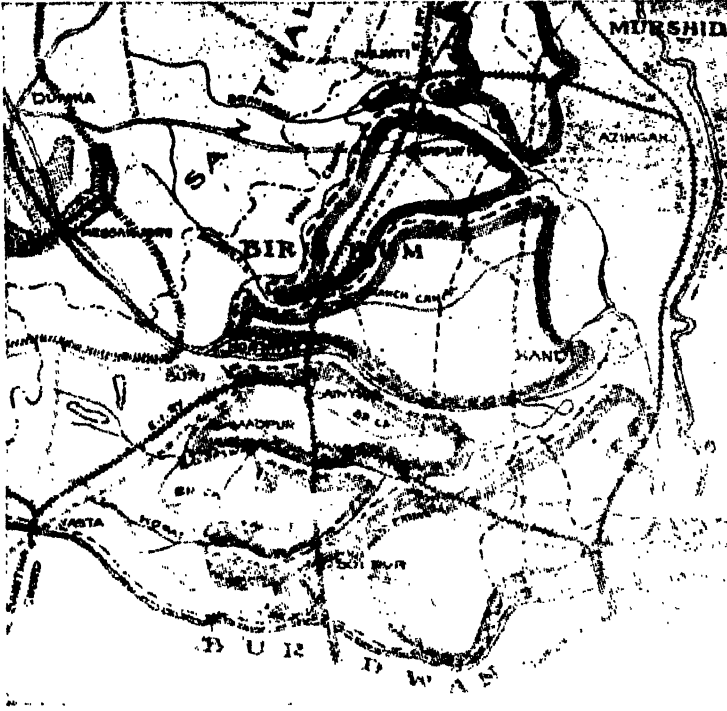
পাড়ার সেচবাঁধের কাজ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। কাজ প্রায় পনেরো মাস পূর্ব্বে শেষ হওয়ায় খরচও, মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও, বেশ কিছু কমই হইয়াছে। যদি বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রমকাতর না হইত এবং তাহাদের পরামর্শদাতা মহাশয়েরা নিজেদের স্বার্থের কথা ভুলিয়া সত্য সত্যই দেশের ও দশের কথা ভাবিতেন তবে খরচ আরও কম হইত, কাজ আরও আগাইয়া যাইত এবং বাংলার শ্রমিক মজুরও দুই-চার কোটি টাকা উপার্জ্জন করিত। যাহা হউক, একথা এখন সত্য সত্যই অবান্তর, কেননা "ধর্ম্মের কাহিনী" কাহাকেই বা শোনানো হইবে?

মশানজোড়ের মূল বাঁধ এতদিনে প্রাদেশিকতার বাধা অতিক্রম করিয়া আরম্ভ হইল, এ কাজ শেষ হইতে লাগিবে তিন বৎসর। তবে সিউড়ির তিলপাড়া সেচবাঁধ নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে সেচখাল কাটাও অনেকদূর অগ্রসর হওয়ায় আগামী বৎসর "খরিফ" চাষের সময় প্রায় তিন লক্ষ বিঘা জমি জল পাইবে। সুতরাং বীরভূম জেলা অদূরভবিষ্যতেই ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার উন্নয়ন-ক্ষমতার কিছু পরিচয় পাইবে।

পরিকল্পনা শেষ হইলে বীরভূমে মুড়ারাই, নলহাটি, রামপুরহাট, ময়ূরেশ্বর, মোল্লারপুর, মহম্মদবাজার, সিউড়ি, সাঁইথিয়া, নানুর, লাবপুর, ইলমবাজার ও বোলপুর থানার অঞ্চল, মুর্শিদাবাদে সাগরদীঘি, নবগ্রাম, খরগ্রাম, ভরতপুর, বরওয়ান ও মির্জ্জাপুর থানার অঞ্চল এবং বর্দ্ধমানে কেতুগ্রাম থানার অঞ্চল সেচের জল পাইবে। এই সমস্ত এলাকা ১৩৪০ বর্গমাইল বিস্তৃত এবং প্রায় ১৮ লক্ষ বিঘায় ধানক্ষেত জল পাবে। তাহা ছাড়া রবিশস্যের কালে প্রায় তিন লক্ষ বিঘায় সেচের জল যাইবে। পতিত জমি উদ্ধার হইবে ৭৫০০০ বিঘা। সেচের জলের মূল খাল ১৪০ মাইল ও শাখাপ্রশাখা প্রায় ৭০০ মাইল কাটা হইতেছে এবং অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। এই কাজ শেষ হইলে বাংলায় খাদ্যশস্যের পরিমাণ অন্ততঃপক্ষে ৯০ লক্ষ মণ বেশী জন্মাইবে যদি চাষী কম্পোষ্ট ও অন্য সার যথাযথভাবে ব্যবহার করে ও জলের পূর্ণ সুযোগ লয় তবে এই পরিকল্পনার দরুনই ফসল গড়পড়তায় দেড় কোটি মণ বাড়িবে নিঃসন্দেহ।

সমগ্র পরিকল্পনার খরচ অনুমান করা হইয়াছে ১৫ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। এখন পর্য্যন্ত খরচ অনুমান অনুযায়ীই হইয়াছে, কাজও সময়ের আগেই চলিয়াছে। এখানে সমস্ত কাজের ভার বাঙালীর হাতে। মন্ত্রী, প্রধান পরামর্শদাতা ও পরিকল্পনাকর্ত্তা বাঙালী, সর্ব্বোচ্চ অধ্যক্ষ বাঙালী, তত্ত্বাবধায়ক সকলে বাঙালী, চতুর্দ্দিকের কর্ম্মপরিদর্শক বাঙালী, কেবলমাত্র লৌহদ্বার-নির্ম্মাতা ৯ জন ইঞ্জিনিয়ার জার্ম্মান ও তাহাদের কারিগর পঞ্জাবী। ইহাদের সজাগ দৃষ্টি ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে কাজ যেরূপ সুষ্ঠুভাবে ও সময়মত অগ্রসর হইয়া চলিতেছে তাহাতে বাঙালীর কৃতিত্বের যশ বাড়িবে। শুধু যাহা দুঃখের কথা—শ্রমিকমজুর ও মজুরী। মজুরীতে কোটি কোটি টাকা লইল অবাঙালী ও ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় কায়িক পরিশ্রমের গৌরব শতকরা ৯৫ ভাগ থাকিবে তাহাদেরই।*

* বীকারোক্তি ব্যতীত প্রবন্ধের অন্য চিত্রগুলি লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত ফোটো হইতে।

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস—বাঙ্গালোর অধিবেশন

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস এম-এস্‌সি

এবারে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের আটত্রিশতম অধিবেশন বসেছিল বাঙ্গালোর ইনষ্টিটিউট অব সায়ান্সের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে। অন্যান্য বারের মত ভারতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু এই কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন। মহীশূরের মহারাজা এবারকার অধিবেশনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। এই কংগ্রেসের সঙ্গে প্যান-ইণ্ডিয়ান ওসেন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশন বসেছিল এবং সমগ্র পৃথিবীর খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণ এই অধিবেশনে যোগদানের জন্য বাঙ্গালোরে সমবেত হয়েছিলেন। ডক্টর এইচ. জে. ভাবা বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি হয়েছিলেন এবং অধ্যাপক পি এম. এস. ব্লাকেট, স্যার জন রাসেল, ডক্টর আই, জি. বোভেন, ডক্টর রস, ডক্টর কাইসার প্রভৃতি মনীষিগণ এই অধিবেশনে যোগদান করে সভার গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

সাধারণ সভাপতি ডক্টর ভাবা তাঁর অভিভাষণে কিরূপে পদার্থ-বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কার দ্বারা পদার্থ-জগতের আভ্যন্তরীণ গঠনপ্রণালী জানা সম্ভব হয়েছে তার একটি সুন্দর বিবৃতি দেন। পদার্থের অণুকে বিভক্ত করে পরমাণু এবং পরমাণুকে বিভক্ত করে ইলেকট্রন ও প্রোটন (১৯৩০) আবিষ্কৃত হয়। ক্রমশঃ দেখা গেল কেবলমাত্র ইলেকট্রন ও প্রোটনের সাহায্যে পরমাণুর গঠন সম্ভব নয়। বিবিধ পরীক্ষার ফলে নিউট্রন আবিষ্কৃত হ'ল। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে পজিট্রন ও মেসন নামক আরও দুইটি স্বতন্ত্র কণা আবিষ্কৃত হয়। এই রূপে ক্রমেই নূতন নূতন পদার্থকণার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে পদার্থ-বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতিও পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বিজ্ঞান-কংগ্রেসের উদ্বোধনের পর সকল বিভাগের কার্য্যাবলী সুরু হয়ে গেল। রসায়ন বিভাগের সভাপতিত্ব করেছিলেন ডক্টর আর. সি. শা। তিনি পুণায় ন্যাশনাল কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করে রসায়ন-শিল্পের উন্নতিসাধনে এই প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট সহায়তা করবে এরূপ আশা প্রকাশ করেন। তিনি জৈব রসায়নের কতকগুলি মৌলিক তথ্যের বিষয় আলোচনা করেন এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব হয়েছে বলেন। ডক্টর আর. সি. শার সভাপতিত্বে রসায়ন বিভাগে বহু মৌলিক গবেষণাত্মক প্রবন্ধাদি পঠিত হয়েছিল। বিশুদ্ধ এবং ফলিত রসায়ন, আধুনিক জৈব রসায়নের গবেষণালব্ধ আবিষ্কার-সমূহ এই বিভাগে সমালোচিত হয়েছিল।

স্যার জে. সি. ঘোষ ভারতবর্ষে সিন্থেটিক পেট্রল প্রস্তুতের সম্ভাব্যতার বিষয় আলোচনা করেন। ভারত-সরকার কয়লা থেকে পেট্রল প্রস্তুত সম্বন্ধে বহুকাল যাবৎ বিবেচনা করছেন। প্রকৃতিজাত পেট্রলের পরিমাণ অত্যন্ত কম হওয়ায় এরূপ গবেষণার আশু প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বর্তমানে কয়লা থেকে আলকাতরা প্রভৃতি উৎপন্ন করতে যে সব প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয় তাতে প্রচুর লোকসান হয়। নিম্ন টেম্পারেচারে আলকাতরা প্রস্তুত করে হাইড্রোজেনেট করলে এরোপ্লেনের উপযোগী পেট্রল তৈরী হবে। একমাত্র বাংলাদেশ থেকেই প্রায় এক সহস্র লক্ষ টন কয়লা এজন্য পাওয়া যায়।

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে সভাপতিত্ব করেছিলেন শ্রীবি. বি. মুণ্ডকর। তিনি ছত্রাক (Fungus) শ্রেণীর কীটাণুসমূহের কার্য্যকারিতার বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করেন। কীটাণুর দ্বারা উদ্ভিদ-জগতের ক্ষয় হয় এবং উৎপন্ন খাদ্যশস্যের অধিকাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইরূপে ১৮৪৬-৪৭ সালে আয়ারল্যণ্ডে দুর্ভিক্ষ সৃষ্ট হয় এবং বহু লোক নিরাশ্রয় হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যায়। আর এক শ্রেণীর কীটাণু দ্বারা সিংহলের কাফি চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইরূপ কীটাণু মধ্য-আমেরিকার রবার-চাষের ধ্বংস সাধন করেছিল এবং সমগ্র দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ার রবার-চাষ ইহাদের দ্বারা বিপদগ্রস্ত হয়। কীটাণুশ্রেণী এক দিকে যেমন ধ্বংসসাধনে ব্যস্ত, অন্য দিকে আবার এদের প্রচুর উপকারিতাও দেখা যায়। শিল্পজগতে এদের উপযোগিতা পরিলক্ষিত হয়েছে। অনেকগুলি রাসায়নিক শ্রেণীর এনজাইম, ঔষধ এবং ভিটামিন এই সকল ছত্রাকদ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতি কয়েকটি এন্টিবায়োটিক এই ছত্রাকদ্বারা উৎপন্ন হয়েছে—আজ ছত্রাকের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে শেষোক্ত শ্রেণীর গবেষণার প্রচুর সম্ভাবনা আছে।

শারীর-বিজ্ঞান বিভাগে সভাপতিত্ব করেছিলেন অধ্যাপক এস. এম. ব্যানার্জ্জি। তিনি মানবসভ্যতার বিকাশের সঙ্গে কিরূপে শারীর-বিদ্যার ক্রমোন্নতি ঘটেছে তার একটি সুন্দর বিবরণ প্রদান করেন। তিনি পৃথিবীর ইতিহাসকে তিনটি পর্য্যায়ে ভাগ করেন: (১) খ্রীষ্ট জন্মাবার পূর্ব্বে (২) খ্রীষ্টজন্ম থেকে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত এবং (৩) চতুর্দ্দশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে মিশরের সভ্যতা যখন উন্নতির শীর্ষে উঠেছিল তখন থেকে আরম্ভ করে আর্য্য এবং বৈদিক সভ্যতা পর্য্যন্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কথা আলোচনা করেন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, পরাশর জতুকর্ণ, হরিত, ক্ষারপাণি, অগ্নিবেশ, আত্রেয় প্রভৃতি ঋষিগণের চিকিৎসাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণ-যুগে (খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২০০০ বৎসর) ধন্বন্তরি, বৈতারণ এবং সুশ্রুতের কীর্ত্তির বিবরণ পাওয়া যায়। হিপোক্রেটিস (খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪৬০-৩৭০), আরিষ্টটল (খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩০০) আধুনিক ঔষধের প্রথম প্রচার করেন। ক্লডিয়াস গ্যালেনকে (১৩১-

২০০ খ্রীষ্টাব্দ) আধুনিক শারীর-বিজ্ঞানের জনক বলা যায়। গ্রীসদেশের গ্যালেনের প্রায় সমসাময়িক ভারতবর্ষে চরকের নাম শুনা যায়। চরকসংহিতায় চিকিৎসাসম্বন্ধীয় অনেক মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। ইহার পর প্রায় সহস্র বৎসর ইউরোপে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয় না। ভারতবর্ষে ভাগবত, চক্রপাণি, সারঙ্গধর প্রভৃতি ঋষিগণের কথা শুনা যায়।

তৃতীয় যুগের আবির্ভাব হ'ল ১৩০০ থেকে ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ। জার্ম্মানী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ক্রমে কয়েকটি চিকিৎ-সমিতি সংগঠিত হ'ল। মুলার, লুডভিগ, ফিসার, ল্যাণ্ডর-সিয়ার, ফষ্টার, কলিন, ভ্যানল্লাইক প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ শারীর-বিজ্ঞানের চর্চ্চায় মনোনিবেশ করলেন এবং আধুনিক শারীর-বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন হ'ল। চিকিৎসাশাস্ত্রে নূতন নূতন আবিষ্কার হতে লাগল এবং রক্ত, হৃদযন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র, পুষ্টি, পেশী ও স্নায়ু, মূত্রাশয় প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের কার্য্যকারিতা ও গঠনসম্বন্ধীয় নূতন নূতন তথ্যাদি আবিষ্কৃত হতে লাগল। অধ্যাপক ব্যানার্জ্জি বিশেষ করে মূত্রাশয়সম্বন্ধীয় গবেষণা ও তার ফলাফলের বিষয় বুঝিয়ে বলেন। এ বিষয়ে আরও অধিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি বিশেষ জোর দেন। ভবিষ্যতে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হবে এরূপ আশাও তিনি প্রকাশ করেন।

প্রাণীতত্ত্ব বিভাগের সভাপতিত্ব করেছিলেন শ্রী জে. এল. ভাদুড়ী। তিনি সেলেন্টিয়া (ব্যাঙ) সাহায্যে নির্দ্ধারণ করবার প্রক্রিয়ার বিষয় আলোচনা করেন। ভাদুড়ী প্রচলিত পদ্ধতিসমূহের সহিত এই নূতন নিয়মের তুলনা প্রসঙ্গে ইহার নির্ভুল সময়-নিরূপণ-ক্ষমতার বিষয় উল্লেখ করেন। গবেষণার ফলে বহু মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে তিনি আশা করেন।

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে সভাপতিত্ব করেছিলেন ডক্টর সি. এস ভেঙ্কটাশ্বরণ। তিনি অণুবিজ্ঞানে (Molecular Physics) স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক স্যার সি. ভি. রামণের নেতৃত্বে বিগত ত্রিশ বৎসর যাবৎ যে সকল মৌলিক গবেষণা হয়েছে তার বিস্তৃত বিবরণ দেন। প্রধান বিষয়বস্তু ছিল 'আলোক বিকীরণের ডপলার এফেক্ট' (Doppler effect in light scattering) তিনি ভারতবর্ষে এরূপ উন্নত ধরণের গবেষণার উচ্চ প্রশংসা করেন এবং পদার্থ-বিজ্ঞানে পৃথিবীর মধ্যে ভারতের স্থান যে বহু উচ্চে, তাহাও ঘোষণা করেন।

স্যার সি. ভি. রামণ প্রস্তরখণ্ড ও খনিজ পদার্থসমূহের রং বিকীরণ সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন। এ বিষয়ে তিনি বহু মূল্যবান গবেষণা করেছেন। প্রকৃতির রঙের খেলা সর্ব্বত্রই দেখা যায়, বিশেষতঃ খনিজ জগতে এই রঙের বৈচিত্র্য দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। শিলাখণ্ডের গঠনসম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা দেন। তাঁর ল্যাবরেটরিতে এই শ্রেণীর প্রস্তর সম্বন্ধে গবেষণা চলছে এবং ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান তথ্য সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। স্যার সি. ভি. রামণের বক্তৃতাটি জনপ্রিয় হয়েছিল।

অধ্যাপক কাইসার এড্রিনাল গ্লাণ্ড থেকে নিঃসৃত কার্টিক্যাল হরমোন সম্বন্ধে একটি জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন।

ডক্টর রস আপেক্ষিকতত্ত্ব সম্বন্ধে বেশ সহজ ও সুন্দর ভাষায় বলেন।

কৃষিবিজ্ঞানবিদ্ স্যার জন রাসেল মৃত্তিকার মধ্যে কীটাণু-সমূহের প্রভাব বিষয়ে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন।

চির বসন্তের দেশ বাঙ্গালোর শহরে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক-গণের একত্র সমাবেশে এক সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল।

বসন্ত

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

পৃথিবীর পাশে আসে শীতান্তে বসন্ত ফিরে ফিরে,
জাগে আনন্দ, জাগে যৌবন তাহার অঙ্গ ঘিরে।
জানি বার বার ফেরে দিন তার ঋতুর আবর্ত্তনে,
দক্ষিণ বায়ু দিয়ে যায় সেই বার্ত্তা যে বনে বনে।

কেউ জানে না কো মানুষের মনে বসন্ত আসে কবে,
অশান্ত বীণা ঝঙ্কারি ওঠে কত সঙ্গীত-রবে,
পুষ্পে পুষ্পে ভ'রে যায় তার অন্তর-বনবীথি,
মানসে যে গীতি গুঞ্জরি ওঠে নাহি তার পরিচিতি।

হৃদয় কখনো মনে হয় যেন নীরস ধূসর মরু,
শুষ্ক—সরস হয় যে সহসা, দেখি সেথা শ্যাম তরু।
জানি না জানি না কেমনে সে আসে, সে কোন্ শুভ-ক্ষণে,
জীবন পরম-রমণীয় হয় আনন্দ-পরশনে।

সে কি বিস্ময়, পূর্ণ করিয়া সকল অসদ্ভাব,
অপূর্ব্ব সেই আকস্মিকের পরম আবির্ভাব।
নাহি কালাকাল, নাহি প্রস্তুতি, নাহি কোন আয়োজন,
অভাবনীয় সে মধু-মাধবের অজান্তে-আগমন।

অলংকারে আভিজাত্য
এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স
সুখ্যাত গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী
১২৪, ১২৪।১, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ফোন: বি, বি, ১৭৬১
ব্রাঞ্চ- হিন্দুস্থান মার্ট বালিগঞ্জ
১৫৯/১/বি রাসবিহারী এভিনিউ • কলিকাতা
MBS

ফণিভূষণ ব্রহ্ম

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র, আলীপুরের উকীলপ্রধান ফণিভূষণ ব্রহ্ম ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। খুলনা জেলায় তাঁহার জন্ম; কলিকাতা কর্ম্মস্থান। এই নগরীর সেবায় তিনি জীবনের বহুকাল কাটাইয়াছিলেন। ফলে কলিকাতার নাগরিকের শ্রেষ্ঠতম সম্মান] তাঁহার লাভ হইয়াছিল। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের উদ্দেশে আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

৬৩ বৎসর বয়সে এই স্বদেশী সেবাব্রতী জন্মভূমি আড়িয়াদহ গ্রামে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইনের সর্ব্বশেষ পরীক্ষা পাশ করিয়া তিনি সেখানেই ব্যবসায়ে সাফল্যলাভ করেন। গান্ধীজীর অনুপ্রেরণায় তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন, তাহার পর ব্রিটিশের আইন ভঙ্গই তাঁহার ব্রত হইল। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০) প্রভৃতি সকল রাজনৈতিক প্রচেষ্টার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। শেষ জীবনে স্বীয় অঞ্চলে গঠনমূলক কার্য্যে তিনি ব্রতী হন। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে দুর্গতদের সেবায়ও তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ সহোদর, সংস্কৃতিগত-প্রাণ এই পুরুষশ্রেষ্ঠ গত ১৯শে ফাল্গুন জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতে ৮৩ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছেন। এই নীরব জ্ঞানসাধক লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যে সব মহৎ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহার মাহাত্ম্য দেশবাসী একদিন বুঝিবে।

বিধুভূষণ দে

৬৫ বৎসর বয়সে এই বিপ্লবী দেহত্যাগ করিয়াছেন। "স্বদেশী" যুগে বিধুভূষণের বিপ্লবী-জীবন আরম্ভ হয়। ১৯০৯ সালে খুলনা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হইয়া তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। পর বৎসর তিনি আন্দামানে প্রেরিত হন এবং সেখানে শ্রীবারীন্দ্র ঘোষ, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিপ্লবী বন্দীদের সঙ্গে একত্রে বাস করেন। ১৯১৭ সালে বিধুভূষণ মুক্তিলাভ করেন বটে, কিন্তু ভাগ্যে তাঁহার আরও দুর্ভোগ ছিল; তিনি জেলের বাহিরে পদার্পণ করা মাত্র অন্তরীণ দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হন। ১৯২৩ সালে তিনি "ফরওয়ার্ড" পত্রিকায় যোগদান করেন, ইহাই তাঁহার জীবনের সন্ধিক্ষণ। ভবিষ্যতে যে তিনি "আলফা প্রচার প্রতিষ্ঠান" গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা ফরওয়ার্ডের অভিজ্ঞতার কল্যাণে। বহু সৎকার্য্যে সাহায্যকারী দরদী একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির তিরোধানে সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইল।

নকুলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

৮০ বৎসর বৎসর বয়সে নকুলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। খুলনা—সাতক্ষীরা উকীল সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি এবং শ্রেষ্ঠ আইনজীবী রূপে তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করেন। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে তাঁহার গোপন দানের অন্তরালে এক মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যাইত। এই গুণে তিনি লোকপ্রিয় হইয়াছিলেন। বঙ্গ-বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে তিনি জন্মভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সেই বিচ্ছেদের দুঃখ তাঁহার শেষ জীবনকে বেদনায় ভারাক্রান্ত করিয়াছিল।

পরিমল মুখোপাধ্যায়

নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক পরিমল মুখোপাধ্যায় গত ১২ই পৌষ মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পাশ করিয়া তিনি শিক্ষকতা ও সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-সেবা করিতেছিলেন। তাঁহার কয়েকখানি উপন্যাস ও গল্পের বই প্রকাশিত হইয়াছে। 'পটভূমি' তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে প্রকাশিত শেষ গল্পের বই। গত চার বৎসর কাল তিনি শিক্ষক-সমিতির সহিত সংযুক্ত ছিলেন।

রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি-মন্দির

চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বোড়াল গ্রামে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের জন্মস্থান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার বাসভবন আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার দেওঘরের সম্পত্তিও হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি রাজনারায়ণ স্মৃতিরক্ষা সমিতি তাঁহার বোড়ালের বাসভবনটিকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার একটি উপযুক্ত স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছেন। সমিতির উদ্দেশ্য উক্ত স্মৃতি-মন্দির, একটি লাইব্রেরী, একটি বালিকা বিদ্যালয় ও একটি মাতৃ-সদন স্থাপন এবং রাজনারায়ণের পুস্তকগুলি পুনর্মুদ্রণ করা। এই উদ্দেশ্যে প্রথম দফায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রয়োজন। তন্মধ্যে মাত্র ৯০০০৲ নয় হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। অবশিষ্ট টাকার অভাবে নির্ম্মাণকার্য্য আপাততঃ স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। যথোপযুক্ত অর্থ-সাহায্য দ্বারা মহাপুরুষের স্মৃতিরক্ষার এই আয়োজনকে সাফল্যমণ্ডিত করা দেশবাসীর একান্ত কর্ত্তব্য। এতদুদ্দেশ্যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীভূপতি মজুমদার, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ডাঃ রাধাবিনোদ পাল, শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, ডাঃ কালিদাস নাগ, শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীসরোজিনী ঘোষ, ডাঃ সুবোধকুমার বসু এবং ডাঃ প্রশান্তকুমার বসুর স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্র সমিতি-কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে। টাকাকড়ি নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য :—

(১) শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র (সম্পাদক, রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি-রক্ষা সঙ্ঘ), বোড়াল পোঃ আঃ ২৪ পরগণা,

(২) শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (সভাপতি), ১২।১০ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্মৃতিরক্ষা কমিটি

নদীয়া জেলার বিল্বগ্রাম পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্মস্থান। উক্ত জেলার বিদ্যানুরাগী ভদ্রমণ্ডলীর উদ্যোগে সম্প্রতি মদনমোহনের বাস্তুভিটায় একটি জনসভায়

অধিবেশন হয়। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ অনুকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল, পিএচ্-ডি মহাশয়কে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে উক্ত সমিতি মদনমোহনের স্মৃতিরক্ষার্থে স্থানীয় টোল ও প্রাথমিক বিদ্যালয়টি তাঁহার বাস্তুভিটায় স্থাপন করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। সমিতি ঐ বাস্তুভিটায় মদনমোহনের নামে একটি বালিকাবিদ্যালয় ও একটি সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, তাঁহার লিখিত রচনাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশ ও একটি অতিথিশালা স্থাপনের অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পবিভাগের ডিরেক্টরের আনুকূল্যে স্থাপিত শিল্পশিক্ষা বিদ্যালয়টিকেও তাঁহার বাস্তুভিটায় স্থানান্তরিত করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা এবং বিধবা ও অনাথ বালকবালিকাদিগের জন্য সাহায্য-ভাণ্ডার খুলিবার সঙ্কল্পও সমিতির আছে। স্থির হইয়াছে যে, সমিতির কার্য্যসৌকর্য্যার্থে কলিকাতায় ১০নং প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটে একটি আপিস খোলা হইবে। এই সকল সদনুষ্ঠানের জন্য বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। যিনি যাহা দান করিবেন তাহা নিম্ন ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে:

ডাঃ শ্রীঅমৃতলাল ভট্টাচার্য্য,
কোষাধ্যক্ষ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্মৃতিরক্ষা কমিটি,
পোঃ বিল্বগ্রাম, জেলা নদীয়া,
অথবা
১২০, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

গীত-সরস্বতী শ্রীসুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়

গায়কশ্রেষ্ঠ শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুলেখা কণ্ঠসঙ্গীতে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। অল্পবয়সেই তিনি বিষ্ণুপুর রামশরণ-প্রতিযোগিতায় উপর্য্যুপরি দুই বৎসর ধ্রুপদ ও খেয়াল গানে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া

শ্রীসুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃত্তি পাইয়াছেন। বড় বড় জলসাতে সঙ্গীত-কুশলতার দরুন তিনি কতকগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্য পদকও লাভ করিয়াছেন—নৃত্য-কলায়ও তাঁহার নিপুণতা আছে। বাংলার প্রদেশপাল ডাঃ কাটজু যখন বিষ্ণুপুর সঙ্গীতকলেজ পরিদর্শন করিতে যান তখন তিনি সুলেখার গানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে একটি স্বর্ণপদক দান করেন।

শ্রীসাধনরঞ্জন সরকার

শ্রীসাধনরঞ্জন সরকার উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। ১৯৫০ এর জুন মাসে তিনি হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজনেস এডমিনিষ্ট্রেশন (ব্যবসা পরিচালনা) বিষয়ে এম-এ ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন।

হারভার্ডে অধ্যয়নকালে বরাবর তিনি বিশেষ মেধাবী ছাত্র বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন এবং অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের সহিত তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ব্যাপক পাঠ্য বিষয় অধিগত করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফরাসী ভাষায়ও ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে পূর্ণতর এবং কার্য্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৪৯-এর গ্রীষ্মকালে শ্রীসরকার রোডস দ্বীপ হাসপাতাল ট্রাষ্ট কোম্পানীর ইনভেষ্টমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টে কিছুকাল কাজ করেন। ১৯৫০

হইতে তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈদ্যুতিক কারখানা 'জি. ই. সি.'র টারবাইন ম্যানুফ্যাকচারিং বিভাগে সংখ্যাতত্ত্ববিদ রূপে

শ্রীসাধনরঞ্জন সরকার

কাজ করিতেছেন। উৎপাদন-পদ্ধতি, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, দাদন-নীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়েও তিনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দির

গত ৬ই ফাল্গুন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ায় নব-নির্ম্মিত "শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দিরে"র উদ্বোধন
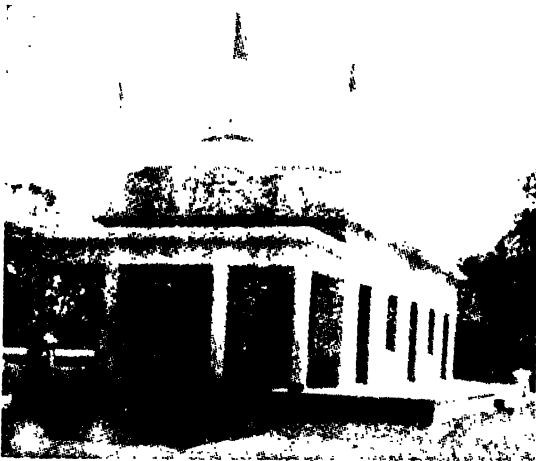
শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দির, গুপ্তিপাড়া

করিয়াছেন। প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ স্বামীর আবির্ভাব-স্থানে, তাঁহার তিরোধানের পঞ্চাশ বৎসর পরে সাধারণের দানে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। এই অনুষ্ঠানে কলিকাতা এবং শান্তিপুর, নবদ্বীপ ও হুগলী জেলার নানা স্থান হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন। সভায় কৃষ্ণানন্দ স্বামীর স্মৃতি তর্পণ করিতে গিয়া সভাপতি মহাশয় ও অন্যান্য ব্যক্তিরা ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতার বৈশিষ্ট্য রক্ষাকল্পে স্বামীজীর অদম্য প্রচেষ্টা, তাঁর অশেষ শাস্ত্রজ্ঞান ও অপূর্ব্ব বাগ্মিতার বিষয় উল্লেখ করেন এবং তাঁহার দেশভক্তি ও মহান্ আদর্শ দ্বারা সকলকে উদ্বুদ্ধ হইতে অনুরোধ করেন। সভায় ডাঃ ইন্দুভূষণ রায় স্বামীজী-রচিত অনেকগুলি ধর্ম্মসঙ্গীত গাহিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। স্মৃতিরক্ষা-সমিতির অধ্যক্ষ শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন বলেন, এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে ১১ হাজার টাকা ব্যয় পড়িয়াছে। মন্দির সম্পর্কিত অন্যান্য কার্য্যের নিমিত্ত আরও ৫.৬ হাজার টাকা আবশ্যক। টাকাকড়ি শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন, অধ্যক্ষ, কৃষ্ণানন্দ স্মৃতিরক্ষা সমিতি, গুপ্তিপাড়া, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

লক্ষ্মীনগরে সাংস্কৃতিক সম্মেলন

সম্প্রতি দমদম অঞ্চলের লক্ষ্মীনগর পল্লীতে স্থানীয় জনকল্যাণ সঙ্ঘের উদ্যোগে এক সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। প্রথমে স্থানীয় বালক-বালিকাদের আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতায় বিচারকের কাজ করেন শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী এবং শ্রীমতী পঙ্কজবাসিনী ভট্টাচার্য্য। সভায় শ্রীমতী পঙ্কজবাসিনী একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল বাঙালীর সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এক চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর জনকল্যাণ সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র সঙ্ঘের জন্মকথা ও বহুমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টার বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। সভাপতির ভাষণের পর আবৃত্তিকারীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অতঃপর শ্রীতারাপদ ঘোষের পরিচালনায় পল্লীর বালকবালিকারা বিশেষ সাফল্যের সহিত সিরাজোদ্দৌল্লা নাটকের অভিনয় করে। শ্রীমান্ শঙ্কর ভৌমিক (বয়স ১০ বৎসর), কুমারী গীতা ভৌমিক (১২ বৎসর), রাণী বল, মীরা মজুমদার, ইরা রায় প্রভৃতির অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজন তাহাদিগকে কয়েকটি স্বর্ণ ও রৌপ্য-পদক দিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

শরৎ-পরিচয়—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা—৩৭। মূল্য দেড় টাকা।

বলা বাহুল্য, এ পুস্তকখানি স্বনামধন্য সাহিত্যিক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন-পরিচয়। শরৎ চন্দ্র সম্বন্ধে গ্রন্থকারের এখানি তৃতীয় পুস্তক। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্ভুক্ত "শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" তাঁর প্রথম পুস্তক। দ্বিতীয় পুস্তকে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তিকে লিখিত শরৎ চন্দ্রের পত্রাবলী প্রকাশিত করেন। প্রথম পুস্তকের মূল বিষয় হচ্ছে শরৎ চন্দ্রের ব্যক্তি-জীবন এবং সাহিত্য-জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, শরৎ চন্দ্রের পত্রাবলীও এই পুস্তকে স্থানলাভ করেছে। এই পুস্তকখানি প্রধানতঃ প্রথম পুস্তকের ভিত্তির উপরই লিখিত; এমন কি সহসা মনে হওয়াও আশ্চর্য্য নয় যে, এ পুস্তকখানি প্রথম পুস্তকেরই নূতন সংস্করণ। কিন্তু সতর্ক পাঠকের চক্ষে আলোচ্য পুস্তকখানির বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়তেও বিলম্ব হয় না। শরৎ পরিচয়ের বিবৃতির মধ্যে সামান্য যা কিছু অস্পষ্টতা, অসম্পূর্ণতা বা ভুলভ্রান্তি ছিল, এই পুস্তকে সেগুলি সযত্নে সংশোধিত এবং নিরাকৃত হয়েছে। নূতন এবং গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্যও পুস্তকখানিতে সংযোজিত হয়েছে।

অল্প সময়ের মধ্যে ব্রজেন্দ্রবাবু শরৎ চন্দ্র সম্বন্ধে তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করলেন। এর দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রকাশ পাচ্ছে, শরৎ চন্দ্রের খামখেয়ালি ছন্নছাড়া জীবনের একটা একান্ত নির্ভরযোগ্য ইতিবৃত্তে উপনীত হবার তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ, এবং ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকের অবিচল ও নিষ্ঠা-কঠিন দৃষ্টি ও শ্রম নিয়ে তদ্বিষয়ে অগ্রগতি হওয়ার উদ্যম। শরৎ চন্দ্রের একটি সুবৃহৎ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার তাঁর ইচ্ছা আছে কিনা জানি না, কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কেউ তেমন গ্রন্থ রচনা করবার ইচ্ছা করেন, তাঁর পথ আলোচ্য গ্রন্থখানির দ্বারা প্রশস্ত হ'ল, সে কথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি। শরৎ চন্দ্রের জীবনের তথ্য নিবিড় গুহায় নিহিত এবং সে বিষয়ে এত পরস্পরবিরোধী ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ তথ্য আছে যে, ব্রজেন্দ্রবাবুর ন্যায় নির্ভীক ও সত্যানুসন্ধায়ী ব্যক্তির পক্ষেই মিথ্যা হতে সত্য বাছাই ক'রে নেওয়াই সম্ভব। সময় সময় তিনি শরৎ চন্দ্রের উক্তিকেও নাকচ করতে পশ্চাৎপদ হন নি, এ সাহস 'জাত' ঐতিহাসিকের সাহস।

বইখানি নানা বিষয় অনুযায়ী এমনভাবে বিভক্ত করা হয়েছে যে, যাঁর যে বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রয়োজন, অতি সহজেই তিনি সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য পাবেন। বইখানি শুধু সাধারণ পাঠকেরই উপযুক্ত হয় নি, শরৎ-সাহিত্য-পাঠকের পক্ষে অপরিহার্য্য হয়েছে। পুস্তকের শেষে সন্নিবিষ্ট "সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী" দৃষ্টিমাত্র উপকারে আসার যোগ্য হয়েছে। আলোচ্য পুস্তকখানিতেও শরৎ চন্দ্রের কয়েকটি চিঠি সংযোজিত হয়েছে যেগুলি ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তকে প্রকাশিত হয় নি।

বইখানির ছাপা ও কাগজ ভাল, সেই হিসাবে মূল্য সুলভ হয়েছে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংস্কার—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়। অনাথগোপাল সেন স্মৃতি-সমিতি, ১নং ডোভার লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১০০, মূল্য ১৵০ আনা।

জ্ঞানবৃদ্ধ অধ্যাপক কর্তৃক লিখিত এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া অনাথগোপাল সেন স্মৃতি-সমিতি বাঙালী পাঠকবর্গকে ঋণী করিয়া রাখিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার-পথ বাহির করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাধাকৃষ্ণণ কমিশন নিযুক্ত হয়। তৎপূর্ব্বেই আচার্য্য যোগেশচন্দ্র এই বিষয়ে তাঁহার জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতাপ্রসূত এই প্রবন্ধ রচনা করেন।

পাঠকবর্গ দেখিবেন, তিনি গত ৬০।৭০ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বর্ত্তমান শিক্ষা "সমাজ ব্যতিরিক্ত", ভারতীয় সংস্কৃতি হইতে বিচ্যুত। অথচ এই শিক্ষার ফলেই আমাদের মধ্যে নবজাগৃতির বান ডাকিয়াছে। প্রাকৃতিক জগতে যেমন বানের জলে অনেক বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত দ্রব্য ভাসিয়া আসে, সেইরূপ এই শিক্ষার বানেও তাহা হইয়াছে। মনুষ্য সমাজের ইহাই চিরন্তন অভিজ্ঞতা।

এই কথা মনে রাখিয়া আমাদের শিক্ষা-সংস্কারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইংরেজী শিক্ষার ফলে আমাদের সমাজ-মন একভাবে গঠিত হইয়াছে; ইংরেজী-শাসন প্রত্যাহৃত হইবার পর এখন নূতন করিয়া তাহা গড়িতে হইবে। আচার্য্যদেবের প্রবন্ধের মধ্যে সেই প্রক্রিয়ার বহু পরিচয় পাওয়া যায়।

সবগুলি প্রস্তাবের ফলাফল পরীক্ষাসাপেক্ষ। বাস্তব মন লইয়া আমাদের এই সংস্কারাবলী পরীক্ষা করিবার ধৈর্য্য থাকা চাই, শক্তি থাকা চাই। বাঙালী সমাজের তাহা আছে কিনা তাহাও পরীক্ষার বিষয়। নানা বিষয়ে আমাদের অবনতি হইয়াছে—আচার্য্যদেবের এই মতের সহিত আমরা একমত। তবুও ভরসা করিয়া চলিব, পরীক্ষা করিয়া চলিব। এই উপদেশ ও আশীর্ব্বাদই আমরা তাঁহার নিকট চাহিতেছি।

ছেড়ে আসা গ্রাম—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু। গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং, ১১নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। পৃষ্ঠা ১১০।

পুস্তকের প্রচ্ছদপট দুইটি ও অন্য একখানি ছবি বাংলার পল্লী-শ্রী, নদী-মাতৃক বঙ্গদেশের স্নিগ্ধ রূপের পরিচয় প্রদান করে। শেষ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ছবিখানি দুই নারীপুরুষের অনির্দ্দিষ্ট যাত্রার ইঙ্গিতের দ্যোতক, যাহা পূর্ব্ববঙ্গের পাকিস্থান-তাণ্ডবের ফলে এক মর্ম্মান্তিক ভবিষ্যতের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে। সেই নির্দ্দেশ বাঙালীর পরাজয় নয়—"একশো বছর পরে" বাঙালী কি হইবে তার দিগ্‌দর্শন আছে এই চিত্রে।

লেখক এই ভরসার কথা শুনাইয়াছেন। কিন্তু "ছেড়ে আসা গ্রামের" কথা বলিতে গিয়া তাঁর ভাষা হইয়াছে অশ্রুভারাক্রান্ত; "বংশীনদী" কথা কহিয়াছে তাঁর একতারার ঝঙ্কারে। পরাণের পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগের কাহিনী, রেলে ভ্রমণ এই দুই অভিজ্ঞতা রক্তের অক্ষরে লিখিত ইতিহাসের একটি দুর্ঘটনার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

বাংলা সাহিত্যের আলোচনা—শ্রীমদনমোহন কুমার। দ্বিতীয় সংস্করণ। পৃ. ৩৫৭। মূল্য ৪।০।

পুস্তকখানি প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত হইলেও সাধারণ পাঠকও ইহাতে জ্ঞানের ও রসের খোরাক পাইবেন। বিষয়গুলি কালানুক্রমিক সজ্জিত নয়, গদ্য-সাহিত্য ও কাব্য-সাহিত্যভেদেও বইখানি বিভক্ত নয়, মোটামুটি যে সব বই বি এ, এম-এ ক্লাসে পাঠ্য, সেগুলিকে কেন্দ্র করিয়া 'বাংলা সাহিত্যের আলোচনা'। এই আলোচনার অনেকগুলি লেখকের ছাত্রাবস্থায় রচিত; ছাত্র-প্রবন্ধের গন্ধ থাকিলেও মোটের উপর অনেক কাজের কথা এগুলিতে আছে। লেখক সর্ব্বত্র শাস্ত্রসম্মতভাবে সাহিত্য-বিচার করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, অথচ তত্ত্বের ভারে প্রবন্ধগুলি পীড়িত নয়। রচনা সুখপাঠ্য। তবে প্রধানতঃ ছাত্রদের জন্য রচিত এই গ্রন্থ তথ্যের দিক্ দিয়া নির্ভুল হইলে শোভন হইত। সেরূপ ভুল থাকিয়া গিয়াছে; যথা: ২১০ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে, 'বুঝলে কি না' পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের রচনা। তাঁহার রচনা হইলে আত্মকথাতে তিনি রচিত অন্যান্য পুস্তকের সহিত এখানিরও উল্লেখ করিতে ভুলিতেন না—এ কথা গ্রন্থকার ভাবিয়া দেখেন নাই। প্রকৃতপক্ষে পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে অভিনীত এই প্রহসনখানির রচয়িতা—মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভগিনীপতি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ৩১৬ পৃষ্ঠায় 'ব্রাহ্মণসেবধি'কে "রামমোহন-পক্ষীয় সাময়িক পত্র" বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহা যে রামমোহন রায়ের নিজেরই রচনা

তাহার অন্যতম প্রমাণ—উহা রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও পুনঃপ্রকাশিত রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলি'তে স্থান পাইয়াছে। পরবর্ত্তী সংস্করণে বইখানিকে নির্ভুল দেখিব আশা করি।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপকথা—শ্রীস্বর্ণচন্দ্র গুহ। সরস্বতী লাইব্রেরী, সি১৮।১৯, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

রূপকথার জগতের প্রধান উপাদান কল্পনা। স্মরণাতীত কাল হইতে এই কল্পনাকে নানা রঙে রাঙাইয়া মন ভুলানোর আয়োজন—পৃথিবীর সব দেশেই দেখা যায়। বাস্তবের কাঠিন্য বা একঘেয়েমি যখনই মনকে আঘাত করে, মন সেই মুহূর্ত্তে উধাও হইয়া যায় কল্পলোকে, সৃষ্টি করে কল্পিত পরিবেশ—কল্পিত নর-নারী দেবতা স্বর্গ প্রভৃতি লইয়া গড়িয়া উঠে অপরূপ সব কাহিনী। অবশ্য এই কল্পনার মধ্যেও বাস্তবের প্রতিফলন থাকে—যে ভাবে মানুষ প্রকৃতিকে দেখে ও জীবনকে উপলব্ধি করে তাহাই কল্পনায় রূপায়িত হয়। শুধু বাস্তবের কঠিন বাধাগুলি, আনন্দরস উপভোগের জন্য মানুষ সযত্নে সরাইয়া রাখে। আদিযুগের মানুষ সহজ বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইত—তাই সে যুগের রূপকথায় পৃথিবীর রূপ ছিল সরল।.. মানবীয় প্রধান বৃত্তিগুলিই সেকালের দেবদেবীর রূপ ধরিয়া গল্পের আসরে জাঁকিয়া বসিত। এই দেবদেবীরা বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গেও একাত্ম ছিল। ইহাদেরই মধ্য দিয়া মানুষের মনে বিশ্ব-দর্শনের সূচনা জাগে। আলোচ্য বইয়ের পাঁচটি রূপকথার মধ্যে—এই সুর লেখক ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কাহিনীগুলি প্রাচীন ব্যাবিলন, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশের সাহিত্য হইতে সংগৃহীত। এগুলির মূল্য পাঠক-সমাজে স্বীকৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বইটির মুদ্রণ-পারিপাট্য ও প্রচ্ছদপট প্রশংসনীয়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১। **ইন্দ্রধনু** ২। **রূপমঞ্জরী**—শ্রীকানাই সামন্ত। জিজ্ঞাসা, ১৩৩-এ রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে দুই টাকা ও তিন টাকা।

গীতিকবিতার বই। "ইন্দ্রধনু"তে সাতাশটি কবিতা আছে। কতকগুলি কবিতা ভগবানের উদ্দেশে ভক্তের নিবেদন, কতকগুলি প্রকৃতির উদ্দেশে রচিত, কতকগুলি অন্তরের আনন্দ বেদনার প্রকাশ। ঝঞ্ঝামুখর অবিরল ধারা-বর্ষণের একটি ছবি ষোল-সতেরটি ছত্রের মধ্যে অতি সহজে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

> তাণ্ডবনৃত্যের তালে তালে আজ এ
> গুরু গুরু গম্ভীরে ডম্বরু বাজে।

একটি কবিতায় পাই,

> যাত্রী, ওরে যাত্রী,
> ধরিত্রী এই তোর দু'দিনের ধাত্রী।

আর একটি কবিতায় আছে,

> পথ বাজে ঐ দূর হ'তে দূরে
> বিভাসে ললিতে সাহানার সুরে
> আমারই গানের, পথিক সে কই
> মনে এই মনোব্যথা।

রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' কি পাওয়া যাচ্ছে? ফাল্গুন তো শেষ হয়ে গেল! 'মহুয়া' অনেকদিন ফুরিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পুলিন বাবু খবর পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত করলেন—বিশ্বভারতী এ বইয়ের কাগজে বাঁধাই নতুন সংস্করণ সম্প্রতি তৈরী করেছেন।

কিন্তু অজিত দত্তের বিখ্যাত কবিতার বই 'কুসুমের মাস' বহুকাল পরে আবার কারা ছাপিয়েছিলেন? অতি সৌভাগ্যবান জনকয়েক পাঠক তার মাত্রই কয়েকখানি কপি সংগ্রহ করতে পেরেছেন। আর বই কোথায়? জীবনানন্দ দাসের 'মহাপৃথিবী'-ও আর ছাপা নেই! সঞ্জয়বাবু জানালেন জীবনানন্দ এ গ্রন্থে আরও কিছু নতুন কবিতা যোগ করতে চান, তার পরেই দ্বিতীয়বার ছাপা হবে। বিষ্ণু দে-র 'চোরাবালি'? প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ফেরারী ফৌজ'?—নতুন ছাপা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' আবার নতুন সংস্করণ পাওয়া যাচ্ছে। এবং তাঁর নতুন কাব্যগ্রন্থ 'চিরকুট'—যাতে রয়েছে 'অগ্নিকোণ'-কবিতাটি। কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের নতুন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে—'নীল আকাশ'। রবীন্দ্রনাথের উপরে তাঁর বিখ্যাত কবিতাটি এ গ্রন্থেরই অন্তর্গত। সুসংবাদ: জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' আবার পাওয়া যাচ্ছে। আর পাওয়া যাচ্ছে সুকান্তর 'পূর্বাভাস'।

খুঁজবেন না—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'শেলী' ছাপা নেই। সিগনেট বুকশপ কয়েকটি লাইব্রেরীর লিস্টে এ বই দিয়ে শেষে মহা অপ্রস্তুত!

সরকারী দপ্তর থেকে বিদায় নেওয়ার আগে অন্নদাশঙ্কর আরও একখানা গল্পের বই প্রকাশ করলেন—'যৌবন জ্বালা'। কি সুন্দর প্রচ্ছদ এঁকেছেন লীলা রায়। অন্নদাশঙ্করের রচনাবলীতে আর একটি নতুন সংযোজন—'রাঙা ধানের খই'। সুন্দর নামটি! আচ্ছা, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-র নতুন সংস্করণ ছাপাতে দেরি করেছেন কেন বেঙ্গল পাবলিশার্স? এত বড় উপন্যাস ছাপাতে সময় কি কম লাগবে? তার উপর এই ফাঁকে তারাশঙ্কর যদি নতুন করে পরিমার্জনা করতে বসেন—তা হলে?

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'স্বর্ণসীতা' এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না, ফুরিয়ে গেছে। সাহিত্য-সভার সভাপতি হয়ে ঝাড়গ্রাম থেকে পূর্ণিয়া ছুটোছুটি করতে করতে খ্যাতি বর্ধিত মনোজ বসু আর একখানা নতুন উপন্যাস বের করেছেন—'নবীন যাত্রা'। অনেকদিন পর মনোজ বাবুর একখানা নতুন বই বেরুলো।

খবরটা নিশ্চয়ই ভালো যে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্প 'বরযাত্রী' সিনেমাতেও বিখ্যাত হয়েছে। সেই সঙ্গে আরও খবর তাঁর নতুন দু'খানা গ্রন্থ প্রকাশ। এক: 'রূপান্তর', দুই: 'তোমরাই ভরসা'। সিনেমার প্রসঙ্গেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাম মনে পড়বে। তিনি গা-ছম্-ছম্ নতুন এক ফিল্ম তুলতে ব্যস্ত আছেন। এ ধরণের ভূতে-পাওয়া আবহাওয়া সৃষ্টি করতে তিনি সিদ্ধহস্ত। ছবিটির নাম হবে—'হানা বাড়ি'।

সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়েছেন তো? বেশ বাজি রাখুন, আপনি না পেলে কি হবে, সব দোকানেই পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য নতুন সংস্করণ!

কিন্তু এখনো আরও কিছুদিন সুভাষচন্দ্রের 'ভারত পথিক' পাবেন না। নতুন করে ছাপা হচ্ছে। কিন্তু তার আগেই তৈরি হয়ে যাবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাস 'পঞ্চশর'।

নিছক যাঁরা কবি আর সাহিত্যিক, আজকাল সময় সময় তাঁরাও নয়াদিল্লীর নিমন্ত্রণ পাচ্ছেন। অবশ্য এবার সরকারী ভাবে নয়। শিল্পী সাহিত্যিকের স্বাধীন মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেশে দেশে বিপন্ন হতে চলেছে দেখে নয়াদিল্লীতে মার্চের শেষে যে সংস্কৃতি সম্মেলন হচ্ছে বুদ্ধদেব বসু সেই সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছেন। বিদেশী কবি শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা এ সম্মেলনে আসছেন বলে জানা গেছে তাঁদের মধ্যে আছেন কবি অডেন আর স্টিফেন স্পেণ্ডার।

গীতিকার বলিতেছেন,

আমি কেবল গান গেয়েছি
সুখের বেদনাতে।

বলিতেছেন,

সুর ছিল তো গানের আমার
ছিল না হায় কোন কথাই।
দেবার কিছু ছিল না, যার
প্রাণে ছিল দেবার ব্যথাই।

কবি একান্তই আত্মনিমগ্ন। হৃদয়ের অনুভূতিই তাঁহাকে প্রেরণা দিতেছে, বাহিরের বস্তু নয়। সমাজ-সংসার সব যেন মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। "ইন্দ্রধনু"র ভূমিকা কবিতায় তিনি বলিতেছেন,

নিজেরে ভুলাই শুধু নিজেরই এ গানে।

"রূপমঞ্জরী" চার ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ "চেরী ও চন্দ্রমল্লিকা"। ছোট ছোট আটচল্লিশটি কবিতা আছে। এ অংশের কবিতাগুলি চীনা, জাপানী ও ইংরেজী কবিতার ভাবান্তর। দ্বিতীয় ভাগ "শিরীষ সোনা-ঝুরি" রাজনৈতিক কয়েদীদের জেলখানা সমসে লেখা। কয়েকটি কবিতা দুই অথবা তিন ছত্রে সমাপ্ত। যথা,

কৃষ্ণচূড়া ফুলগুলি আলো করে আছে
বনপথে শ্যাম অন্ধকার।

তৃতীয় ভাগ "পারিজাত-রজনীগন্ধা"। চতুর্থ ভাগ "অপরাজিতা"। একটি কবিতায় পাই "ধুলায় বসিয়া চিরদিন গাই মন্দার বন্দনা"

"সত্য চেয়ে স্বপ্ন ভালবাসি," ইহা লেখকের অন্তরের কথা। ক্ষণিকের আনন্দ-বেদনাকে ছন্দে বন্দী করিয়া "ইন্দ্রধনু" ও "রূপমঞ্জরী"র কবি পাঠককে উপহার দিয়াছেন। ভাষার লালিত্য এবং ভাবের অতিসৌকুমার্য্য পাঠকের মনে মায়া-স্বপ্নের সন্ধান আনিয়া দিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

শান্তিনিকেতন আশ্রম—অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। থ্যাকার স্পিঙ্ক, ৩ এস্‌প্ল্যানেড ইষ্ট, কালকাতা—১। পৃ. ১১৬। মূল্য এক টাকা।

পুস্তকখানির দুইটি অংশ। প্রথম অংশ 'শান্তিনিকেতনের স্মৃতি", অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত। দ্বিতীয় বা শেষাংশ তাঁহারই মধ্যম পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথের রচনা। 'শান্তি-নিকেতনের স্মৃতি' বহুপূর্ব্বে 'প্রবাসী'তে কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন আমরা ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান পুস্তকখানিতে তাহা এবং তদতি- আরও অনেক কিছু পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ পাই- মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর বিভিন্ন সংস্করণে তাঁহার বৃহদাকার জীবনীতে ইতিপূর্ব্বে আশ্রম সম্বন্ধে কথা প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্রমবাসী অঘোরনাথ দেবেন্দ্রনাথের মুখে এবং স্থানীয় লোকের স্মৃতি-শ্রুতি ও নানা সূত্রে যে-সব কথা জানিতে পারিয়াছেন, এবং নি যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেই সমুদয় প্রথম লিপিবদ্ধ হওয়ায় আশ্রম সম্বন্ধে ইহাই প্রামাণিক বলিয়া অ স্বীকার করিয়া লইতে পারি। মহর্ষির জীবনচরিতেও সম্পর্কে এমন সব কথা আছে যাহা ইহার নিরিখে যাচ সংশোধন করিয়া লওয়া সম্ভব।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ-রচিত অংশও নানা তথ্যে পূর্ণ। তাঁ শৈশব ও কৈশোর শান্তিনিকেতনে কাটিয়াছে। তিনি র স্থাপের ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের প্রাচীন ছাত্র। শান্তিনিকে কিছুকাল অধ্যাপনাও করিয়াছেন। এই স্থানটির সঙ্গে যোগ জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়াও ছাড়িতে পারেন অধিকন্তু রবীন্দ্রনাথের দ্বারা তাঁহার ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবন ভাবে প্রভাবিত। কাজেই তাঁহার রচনাও যে বিশেষ বহুল এবং হৃদয়গ্রাহী হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? ক শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথকে এবং তাঁহার সৃষ্ট আশ্রম-বিদ্যালয় সম্যক্ বুঝিবার পক্ষে এ ধরণের রচনা বিশেষ উপযো ইহার বহুল প্রচার হইবে নিশ্চয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বা

নিয়তি নির্ণয় সঙ্কেত—পণ্ডিত শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্য শ্রীমানিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক ৯৩,৪, হরিঘোষ ষ্ট্রীট কলিকাতা প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

ইহাতে হাঁচি, টিকটিকির ডাক, কাকচরিত্র, শৃগালচরিত্র, ইত্যাদি সম্বন্ধে সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীনলিনীকুমার

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা